বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রী প্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটিড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

।। প্রসঙ্গ কথা।।

এক. বনফুলের 'উপন্যাস সমগ্র'-র চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হল বিভিন্ন সময়ে লেখা তার নয়টি উপন্যাস। 'উপন্যাস সমগ্র'র প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের গ্রথিত উপন্যাসের সংখ্যা ছিল দশটি করে। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এ খণ্ডে পরিবেশিত নয়টি উপন্যাসের নাম ও প্রকাশ কাল দেওয়া হল।

এক.	নির্মোক	১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
দুই.	স্বপ্নসম্ভব	১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
তিন.	মানদণ্ড	১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
চার.	কষ্টিপাথর	১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
পাঁচ	লক্ষ্মীর আগমন	১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
ছয়.	দুই পথিক	১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
সাত.	প্রচ্ছন্নমহিমা	১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
আট.	গোপ্পালদেবের স্বপ্ন	১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ
নয়.	অধিকলাল	১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ

উপরের তালিকাটির দিকে চোখ বুলোলে পাঠকদের অন্তত দুটি বিষয় নজরে পড়বে। প্রথমটি হল এই যে বনফুলের সাহিত্য জীবন বিস্তৃত ছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ দশক জুড়ে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ উপন্যাস 'হরিশচন্দ্র'-এর প্রকাশ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারিতেই বনফুল প্রয়াত হন। কাজেই এ খণ্ডে পরিবেশিত নয়টি উপন্যাস লেখা অথবা প্রকাশের ক্রম অনুযায়ী ঘটে নি। পাঁচটি দশকে বিন্যস্ত নয়টি উপন্যাস ইতস্তত নির্বাচিত হয়েছে। তাই লেখকের মানসিক ও শৈলীর ঠিকানাকে অনুসরণ করে কোনো নির্দিষ্ট দর্শনে পৌঁছোনো একটু কঠিন হতে পারে। কেননা বনফুলের পাঠকদের অবশ্যই জানা আছে তিনি সারা জীবনে ছোট বড় মিলিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন ছাপ্পান্নটি। তার মধ্যে যেমন ছিল জঙ্গম, উদয় অস্ত, স্থাবর প্রভৃতির মতো এপিকধর্মী উপন্যাস, তেমনি ছিল কিছুক্ষণ, ভুবন-এ সোম-এর মতো ছোট উপন্যাস। তাছাড়া একই উপন্যাসে গদ্য ও ছন্দের ব্যবহার করে কিছু চম্পূকাব্যধর্মী উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। কাজেই তাঁর লেখক জীবনের এ বিস্তৃতি থেকে এলোমেলো কয়েকটি উপন্যাস নির্বাচন করে এগোনো একটু কঠিন। প্রসঙ্গত আরেকটি কথাও এখানে মনে রাখা দরকার। বনফুলের প্রথম প্রকাশিত বই ছিল একটি কাব্যগ্রন্থ। তার নাম ছিল 'বনফুলের

কবিতা' প্রকাশ কাল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। বনফুলের পাঠকমাত্রেই জানেন তিনি অজস্র গল্প ও উপন্যাস ছাড়াও লিখেছিলেন প্রচুর কবিতা। বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রবন্ধের বই যার প্রায় সবগুলিই অনুরাগীদের নন্দিত করতে সমর্থ। তাঁর গল্পের ভুবন স্বভাবত স্বতন্ত্র। বেশ কিছু নাটক গভীর ও মনোগ্রাহী। জীবনী নাটক রচনায় তাঁকে কুশলী বলে স্বীকার করতেই হবে। তাঁর কবিতা, বিশেষ করে ব্যঙ্গ কবিতা একটি নতুন ধারার প্রবর্তক ছিল। প্রবন্ধ সমূহও চিন্তার উদ্রেককারী। এ হেন অক্লান্ত বিচিত্রমুখী লেখককে নির্দিষ্ট কিছু সূত্রে বেধে ফেলা কঠিন। তার উপর তা যদি আবার কালানুক্রমিক না হয় তাহলে আলোচনায় খানিক অসংলগ্নতাও চলে আসতে পারে।

দুই. এ খণ্ডে সংকলিত উপন্যাসগুলির প্রতি আরেকটি কারণেও পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে। তা হল পাঁচ দশক ব্যাপী উপন্যাস রচনার সংগ্রহ থেকে এ খণ্ডে অন্তত তিনটি দশক ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ত্রিশের দশক বাদ গেছে। চারের দশক থেকে তিনটি (নির্মোক, স্বপ্নসম্ভব ও মানদণ্ড)। পাঁচের দশক থেকে দুটি ('কষ্টিপাথর' ও 'লক্ষ্মীর আগমন)। ছয়ের দশক থেকে তিনটি (প্রচ্ছন্ন মহিমা, গোপালদেবের স্বপ্ন ও অধিকলাল) এ খণ্ডে রয়েছে। এ খণ্ডে পরিবেশিত প্রথম উপন্যাসে 'নির্মোক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০-এ এবং শেষ উপন্যাস অধিকলাল-এর প্রকাশকাল ১৯৬৯। এ নয়টি উপন্যাস কর্ষণ করে পাঠক পুরো তিন দশকব্যাপী বনফুলের মননপ্রক্রিয়া ও শিল্পসৃষ্টির বিবর্তনকে কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন।

আরেকটি বিষয়ও সম্ভবত আগ্রহী পাঠকদের নজর এড়াবে না এবং তা হল তিনদশকব্যাপী বনফুলের এ সাহিত্যচর্চার প্রথম সাত বছরে পড়ছে প্রাক স্বাধীনতাপর্ব। পরবর্তী তেইশ বছরে বাংলার ইতিহাসের এক বিচিত্র গড়া ও ভাঙার ইতিহাসের পর্ব। কাজেই আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে প্রথমে বাংলার ইতিহাসের এ উচ্চাবচতার রেখাচিত্রকে সংক্ষেপে হাজির করা হবে। দেখতে হবে সময়ের হলকর্ষণ বনফুলের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কোন চেহারায় ধরা পড়ে আছে।

১৯৪০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে কালক্রম অনুসারে।

এক. ১৯৪০ মুসলিম লিগের লাহোর সম্মেলনের পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত। প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন ফজলুল হক যিনি মাত্র বছর কয়েক আগেই প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লিগের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন।

দুই. (ক) ১৯৪১ সুভাষ চন্দ্র বসু অন্তরীণ অবস্থায় ব্রিটিশ প্রহরা এড়িয়ে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করলেন। পরে নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে জর্মানী হয়ে জাপানে গিয়ে অক্ষশক্তির সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন।

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ

তিন. ১৯৪২ মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন।

চার. ১৯৪৩ বাংলায় দুর্ভিক্ষ যা ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত হয়ে আছে। এ দুর্ভিক্ষে বাংলায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ (মতান্তরে পঞ্চাশ লক্ষ) মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা গিয়েছিলেন।

পাঁচ. ১৯৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি। অক্ষশক্তি সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যজনক বিমানদুর্ঘটনা ও তথাকথিত মৃত্যু।

ছয়. ১৯৪৬ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রচুর মানুষের মৃত্যু। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এ দাঙ্গা চলেছে। এখনো মাঝে মাঝে তার স্ফুরণ দেখা যায়।

সাত. ১৯৪৭ স্বাধীনতালাভ ও দেশভাগ। উদ্বাস্তু সমস্যার শুরু যা এখনো পুরোপুরি মেটে নি।

আট. ১৯৫০ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আবার ভয়াবহ দাঙ্গা।

নয়. ১৯৫২ প্রথম সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে কংগ্রেস বিজয়ী।

দশ. পাঁচ ও ছয়ের দশক জুড়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং দুর্গাপুর আসানসোল প্রভৃতি অঞ্চলে ভারি শিল্পের প্রবর্তনা। কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি

এগারো ১৯৫৫ সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ণধার বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের ভারত সফর

বারো. ১৯৫৯ খাদ্য আন্দোলন। বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি

তেরো. ১৯৬২ ইন্দোচীন সংঘর্ষ। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব।

চোদ্দ ১৯৬৪ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু

পনেরো ১৯৬৫ ভারত পাক সংঘর্ষ। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব। নতুন করে উদ্বাস্তুদের আগমন

ষোলো ১৯৬৪ কমুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত। ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী প্রতিষ্ঠা। ক্রমে এ পার্টি পশ্চিমবঙ্গে প্রধান হয়ে দাঁড়াল

সতেরো : ১৯৬৭ চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল পর্য্যুদস্ত। বামপন্থী দলগুলির ক্ষমতা লাভ। অবশ্য শাসন ক্ষমতায় থাকা তাদের পক্ষে ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। প্রথম রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন।

আঠারো : ১৯৬৯ যুক্ত ফ্রন্ট প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি আবার ভাগ হল। ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) পার্টি প্রতিষ্ঠিত। এ দলের সমর্থকেরা নকশালপন্থী বলে অভিহিত হল।

উনিশ : ১৯৭০ দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের গঠন। পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন

বিশ : সারা পশ্চিমবঙ্গে (এবং ভারতেও) নকশালপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত। সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান। সারা সত্তর দশক জুড়ে চলল খুনজখম।

ঘোষিত হল সত্তরের দশক মুক্তির দশক।

এ তালিকায় বাদ গেল হয়তো আরো আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ।

তালিকাটির দিকে চোখ বুলোলে দেখা যাবে তিনটি দশকের মধ্যে বাঙালির জীবন যাপন কত ধরনের সংকট ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। বিবিধ ভাঙাগড়া মূল্যবোধের অপচয়, প্রচুর নাস্তি ও অস্তির দ্বান্দ্বিকতা বাঙালি মননকে তাড়িত রেখেছিল। চল্লিশ দশকের নানা বিপর্যয়কে অতিক্রম করে পঞ্চাশের দশক থেকে নবীন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা গর্ব শুরু হয়েছিল এ সময়সীমার মধ্যেই। বাঙালি লেখককুল এ বিষয়ে ক্রান্তিকারী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বনফুলের লেখার মধ্যে এ ক্রান্তিকালের উৎখনন ঘটেছিল। আলোচ্য উপন্যাস সমূহে তার পরিচয় রয়ে গেছে। অবশ্য প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখা দরকার এ উৎখননকে যান্ত্রিকভাবে অনুধাবন করা সঠিক হবে না, কেননা শক্তিশালী সৃষ্টিশীল লেখক সময়কে আত্মস্থ করে নিতে পারেন।

তিন. 'নির্মোক' বনফুলের লেখা ষষ্ঠ উপন্যাস। 'মৃগয়া'র সমসাময়িককালেই প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। বই হিসেবে বেরোবার আগে এ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৩৪৬-এর (১৯৩৯) আশ্বিন সংখ্যা থেকে ১৩৪৭-এর (১৯৪০) আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত প্রবাসী পত্রিকায়।

এ উপন্যাস রচনার একটি পশ্চাৎপট রয়েছে। বনফুলের পাঠকমাত্রেই জানেন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুযোগ পেলেই বনফুল ভাগলপুর থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন রবীন্দ্রসান্নিধ্য পাবার প্রত্যাশায়। এ তথ্যও সকলের জানা আছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়জনদের অকাতরে গল্পের প্লট সরবরাহ করতেন। প্রসঙ্গত 'দেবী' গল্পের কথা মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্লট থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ গল্পটি লিখেছিলেন। বনফুলকেও এভাবেই একটি প্লটের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার বনফুলে শান্তিনিকেতনের খোয়াই দেখে ফিরলে পর রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন সেখানে তিনি কোনো গল্পের প্লট পেলেন কিনা। বনফুল বললেন, 'পেলাম না তো!' তখন 'রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর হঠাৎ বললেন, তোমাকে একটা গল্পের প্লট দেব। তুমিই ঠিক পারবে। ভেবে দেখলুম আমার পক্ষে ও গল্প লেখা অশোভন হবে। তুমি ওটাকে বাগিয়ে লেখ দিকি। তোমার হাতেই ওটা ওৎরাবে'। বনফুল জানতে চাইলেন কি রকম প্লট। রবীন্দ্রনাথ জানালেন পরে লিখে পাঠিয়ে দেবেন।

অতঃপর ১৩৪৫য়ের ৮ই চৈত্র তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্লটটি লিখে পাঠালেন। চিঠির পুরোটাই এখানে তুলে দেওয়া হল।

'সময়টা সেকালের প্রান্ত ঘেঁষা। মা ঠাকরুণ বড় ঘরের ঘরণী—স্বামী সহকারে চলেছেন তীর্থ পরিদর্শনে। শেমিজ জুতোয় লজ্জা, অশ্বযানে সংকোচ, বাল্যাবধি পাল্কি বাহিনী, আধুনিক পন্থার স্বামীর তত আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে সনাতনী আচার শ্বশুরকুলের বংশানুগত আভিজাত্য আঁকড়ে ছিল তার

কোনো ব্যত্যয় গৃহিণী সইতে পারতেন না, যদিও পুরুষ মানুষের অনাচারে ধৈর্য রক্ষা করতে অগত্যা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেটি আধুনিক লরেটোর শিক্ষিত মেয়েকে বাপমায়ের অগোচরেই বিয়ে করেছিল, মেয়েটির বয়স গৌরীর কাছাকাছি যায় নি বলে দুঃসহ ক্ষোভে পরিবারে একদা আলোড়িত হয়েছে। অল্পদিনে প্রমাণ হল এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে হয় না। এমন কি যে সকল আচার ও পূজার্চনায় তার অভ্যাস ও বিশ্বাস ছিল না তারও খুঁটিনাটি সে মেনে চলত। স্বামী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজনার বৃথা চেষ্টা করত। একটি কথা মেয়েটি বুঝতে পারত না কেন স্বামী সহবাস থেকে সে বঞ্চিত ছিল। সে সমস্যার সমাধান এই। স্বামীর স্বভাব চরিত্র ভালো, কিন্তু একবার পদস্খলন হয়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে ভয় নেই, কিছুকাল চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হবে। সেই আশ্বাসে শ্বশুরের একান্ত ব্যস্ততায় ও সুন্দরীর লোভে সে বিয়ে করলে কিন্তু সংক্রামকসঙ্গ বিপত্তি থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে চললে। রোগ উপশমের বাহ্যলক্ষণ যতই আশ্বাসজনক হোক, তবু ভয় ছিল রোগটা পাছে সন্তান পরম্পরায় সংক্রামিত হয়। এদিকে স্ত্রীর বিশ্বাস এই সংযম স্বামীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক শুচিতার লক্ষণ। তাই জোড় মিলবার চেষ্টায় নিজের প্রবৃত্তিও দমন করে চলত। অবশেষে হঠাৎ একটা অসংযমের উদ্দীপনায় স্বামীকে অপরাধ স্বীকার করতে হল। ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর গৃহত্যাগ অথচ অন্তরের মধ্যে নিরন্তর জ্বলুনি। একবার অপরাহ্নে যা ঘটল তার আভাস পেয়েছ। ছেলেটার কলঙ্ক অথচ চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা চিন্তা করে দেখো।'

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যখন বনফুলকে এ প্লটটির কথা লিখেছিলেন তখন তাঁর মাত্র চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ গল্প কথাকার হিসেবে তাঁর আবির্ভাব তখনো চার বছর পেরোয় নি। তাই লেখক হিসেবে তাঁকে কতটা শক্তিশালী ভাবলে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি জটিল সমস্যামূলক প্লট নিয়ে লেখার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। বনফুল অবশ্য-এ প্লটটি অনুসরণ করে কোনো উপন্যাস লেখেন নি। তবে একটি উপন্যাসে সমস্যাটি উপকাহিনী হিশেবে ব্যবহার করেছিলেন। এ উপন্যাসটিই হল নির্মোক। অবশ্য এ কথাও স্মরণযোগ্য যে প্লটটি পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বনফুল এটিকে নিজের উপন্যাসে ব্যবহার করেছিলেন। এ উপন্যাসটিই হল 'নির্মোক'।

ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বনফুল চাকরিজীবন শুরু করেন মুর্শিদাবাদ জেলের আজিমগঞ্জের সদর হাসপাতালে। বছরখানেক পরে এ চাকরি ছেড়ে তিনি ভাগলপুরে চলে আসেন। দীর্ঘ চল্লিশবছর এখানে অতিবাহিত করেন। তিনি জীবনের শেষ কয়েকটি বছর কাটান কলকাতার লেকটাউনে। মাত্র একবছর আজিমগঞ্জ কাটালেও বনফুল আজীবন সে-স্মৃতি লালন করেছিলেন। নির্মোক, তৃণখণ্ড, বৈতরণী তীরে (বনফুল উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য) উপন্যাসে তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

এ উপন্যাসের নায়ক একজন ডাক্তার। নাম বিমল মুখোপাধ্যায়।

বনফুলের পাঠকদের নিশ্চয়ই লক্ষ পড়বে যে তাঁর বহু উপন্যাসই একজন প্রধান অথবা অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসেবে রয়েছেন একজন ডাক্তার। তার ফলে নিজের রচনায় বনফুলের অভিক্ষেপ ঘটেছিল বেশ ভালভাবেই।

উপন্যাসটির সূত্রপাত ঘটেছে আত্মজীবনীর রীতিতে। লেখক জানিয়েছেন, " বিমল তাহার আত্মজীবনী লিখিতেছিল—এখানে এক বৎসর কাটিয়া গেল। সময় কত শীঘ্র কাটিয়া যায়. মনে হইতেছে এই তো সেদিন মাত্র আসিলাম। এই এক বৎসরে জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে। জীবনের নূতন স্বাদ পাইয়াছি।' জীবনের এ অভিজ্ঞতা ও স্বাদ বিমল পরিবেশন করেছে পাঠকদের কাছে। চলমান জীবন কত বিচিত্র ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে পারে তারই আংশিক ছবি প্রকাশ পেয়েছে এ উপন্যাসে। তবে বনফুল জানেন অংশের মধ্য দিয়েও স্পর্শ করা যায় পূর্ণতাকে। বিমলের আত্মকথন এ পূর্ণতারই দ্যোতনা। বিমলের আত্মকথন তাই অনেকটাই হয়ে উঠেছে বনফুলের প্রথম যৌবনের আত্মানুসন্ধান।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে পাঠক অবশ্যই লক্ষ করবেন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্লটটি অবলম্বন করে বনফুল 'নির্মোক'কে পুরোপুরি গড়ে তোলেন নি। তিনি এ প্লটকে প্রয়োগ করেছেন 'নির্মোক'-এর উপকাহিনী হিশেবে। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের পাঠানো প্লটটি বনফুলকে তেমন প্রাণিত করতে পারে নি। তাই যেন অনেকটা অসংলগ্নভাবেই মূল উপন্যাসের সঙ্গে উপকাহিনীটি গ্রথিত হয়ে আছে। এবং তাও সমস্যার জটিলতাকে অনেকটাই অস্বীকার করে। সম্ভবত এ উপন্যাসটি রচনার সময়ে বনফুলের মানসিকতা উপকাহিনীটির জটিলতাকে বিশ্লেষণ করার উপযোগী ছিল না, অথচ রবীন্দ্র-প্রেরিত কাহিনীকে অগ্রাহ্যও করতে পারেন নি। অথবা চান নি। তথ্য বিশ্লেষণ করলেও এ সত্য প্রমাণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে যে চিঠিতে প্লটটি পাঠিয়েছিলেন। তার তারিখ হল ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে। 'নির্মোক' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাস থেকে। তখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত। তাই রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্ত ও প্রসন্ন করবার বাসনা নিয়েই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্লটটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বনফুল। অথচ প্লটটির মধ্যে জীবনের যে জটিলতার আভাস ছিল বনফুলের পূর্ণ মনোযোগ তাকে সার্থক করে তুলতে সমর্থ ছিল।

চার. 'স্বপ্নসম্ভব' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। বনফুল রচিত ত্রয়োদশ উপন্যাস। সময়টি ছিল অবিভক্ত বঙ্গদেশের পক্ষে একটি ক্রান্তিকাল। রাজনীতির এ উত্তাল দশকে বনফুল নিজস্ব সময়কে ধরতে চেয়েছিলেন এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর আদর্শ ও বাস্তবতার ব্যর্থতা তাঁকে নিরন্তর তাড়না করে চলছিল। সাম্প্রদায়িকতার ক্লিষ্ট পরিবেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে দেশভাগের সম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ডামাডোল যে কোনো সচেতন শিল্পীকে আলোড়িত করে। এ প্রসঙ্গে বনফুল তাঁর আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট'-এ লিখেছেন 'এই সময়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক মহলে খুব একটা

ডামাডোল চলছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পার্লামেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবেন। কাহাকে দিবেন, কংগ্রেসকে না মুসলিম লিগকে ইহা লইয়া নানারূপ কল্পনা জল্পনা, আলাপ আলোচনা, সভা মিছিল প্রভৃতি হইতেছিল। জিন্না দাবী করিতেছিলেন যে তাঁহারা একটা 'নেশন' সুতরাং তাঁহারা আলাদা রাজত্ব চান। হিন্দু নেতারা প্রতিবাদ করিতেছিল তাহার, জহরলাল নেহেরু, গান্ধীজী বলিলেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া নাই, ইংরেজ আছে বলিয়াই এ ঝগড়া। ইহার পরই নোয়াখালিতে ভীষণ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাঁধিল। তাহার পর বিহার, তাহার পর অন্যান্য নানা জায়গায়। কলিকাতায় তখন মুসলিম লিগ গভর্ণমেণ্ট। সেখানে নিদারুণ ক্যালকাটা কিলিং হইয়া গেল। সুরাবর্দি তখন মুখ্যমন্ত্রী এবং মুজিবর রহমান তাহার দক্ষিণ হস্ত। সারা দেশে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার একটা ঝড় বহিতে লাগিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বাধা দিবার ভান করিলেন, কিন্তু প্রকৃত বাধা দিলেন না। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন 'স্বপ্নসম্ভব' নামে একটি বই লিখিয়াছিলাম।' এখানে তথ্য পরিবেশনে বনফুল একটু গোলমাল করে ফেলেছেন। অংশটি পড়লে মনে হয় কলকাতায় দাঙ্গা বেধেছিল নোয়াখালি ও বিহারের পরে। কিন্তু তা নয়। ১৯৪৬ এর ১৬ ই আগস্ট মুসলিম লিগের ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পরিণতি পেয়েছিল কলকাতা দাঙ্গায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি ও তারপরে বিহারে দাঙ্গা হয়েছিল।

সে যাই হোক, আসল বিষয়টি তাতে বদলায় না। 'স্বপ্নসম্ভব' উপন্যাস লেখার প্রেক্ষিতটি এ আত্মকথনে স্পষ্ট হয়েছে। আসলে রাজনীতিকে অবলম্বন করে দেশব্যাপী যে অনৈতিকতা ব্যাপক গ্রাস করে চলেছে সেকথাই বনফুল বলতে চেয়েছেন এ উপন্যাসে। যেকোনো বিবেকি লেখকই সমকালের দ্বন্দ্বদীর্ণ পরিবেশকে এড়িয়ে চলতে পারেন না।

কিন্তু বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বনফুল বাস্তবতার দৈনন্দিনতায় নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন না। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যতীনের প্রবাহিত স্বপ্নচেতনা একটা প্রতীতিতে পৌঁছোতে চেয়েছে। এ প্রতীতির সংলগ্নতা উপন্যাসের আপাত ছিন্ন অংশগুলোকে বৃহত্তর সত্যের সমীপে উপনীত করেছে। রাজধানীর অভিঘাত একজন অনুভবী মানুষকে কিভাবে বিচলিত করে তুলতে পারে এবং তার থেকে পরিত্রাণের উপায় সে কিভাবে খুঁজে নিতে পারে 'স্বপ্নসম্ভব' তারই খতিয়ান। তাই এ উপন্যাসে শেষপর্যন্ত রাজনীতির তুলনায় জাগতিক নীতিবোধই প্রধান হয়ে ওঠে। সমকালের বাঙালি পাঠকদের কাছে বনফুল উপলব্ধির এ বার্তাই পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন।

এ উপন্যাসটি বনফুল Dream and reality নাম দিয়ে নিজেই অনুবাদ করেছিলেন।

পাঁচ. 'মানদণ্ড' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। এ উপন্যাসেরও অন্যতম

প্রধান বিষয় হল রাজনীতি। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে জমছে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ। স্বাধীনতার অন্তরালবর্তী নানা ধাক্কা দেশবাসীর কাছে বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কেননা স্বাধীনতার তুলনায় দেশভাগে অনেক বেশি মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। তাই ক্রমে এ পরিবেশে এ বাংলায় বামপন্থী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। সাম্যবাদের প্রতি আনুগত্য ছিল বামপন্থীদের কাছে ব্যাপক ও গভীর। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশবিপ্লব ছিল তার প্রেরণা। এ সময় থেকেই কম্যুনিজমের প্রতি বাঙালির মন ঝুঁকে পড়তে থাকে। গত সাড়ে পাঁচদশকে নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বামপন্থা তথা সাম্যবদ বাঙালিকে প্রণোদিত করে আসছে।

বনফুল সাম্যবাদের এ আগ্রাসন পছন্দ করেন নি। রাজনৈতিক একটি বিশেষ মহল থেকে যেমন এখনো সাম্যবাদকে বিদেশি দর্শন বলে প্রচার করা হয়ে থাকে, গোড়ার যুগেও তেমনটি বলা হত। 'মানদণ্ড' অনেকটাই এ মনোভাবকে প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে বনফুল লিখেছেন 'সাম্যবাদ' বলতে আমি বুঝি সেই আদর্শ যে আদর্শ মনে করে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। তিনি সর্বক্ষেত্রেই সমান—এক এবং অভিন্ন তেমনই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছে তাকে সম্মান করতে যখন আমরা ভুলে যাই তখনই আমরা নিজেদের আনত করি ও আদর্শচ্যুত হই। এবং আমার মনে হয় এই আদর্শ পৃথিবীর সব ধর্মে প্রকৃত ধার্মিকদের অবলম্বন। প্রকৃত ধার্মিক তিনি যে ধর্মেরই হউন তিনি কোনো ধর্মকে খাটো বা ছোটো করেন না। তবে বাস্তবিক দেখা যায় যে দুটি মানুষ সমান নয়। অর্থ সামর্থ রূপ বিদ্যা সবদিক পার্থক্য। .... কিন্তু সভ্য সমাজের লক্ষ থাকা উচিত আমাদের এই বাইরের দিয়েই অসাম্য সত্ত্বেও আমরা যে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারি যাতে সবাই মোটামুটি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে।'

আমরা জানি এ কথাগুলি মূলত ভাববাদী। শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার করে শ্রেণীসমন্বয়ই এ আদর্শবাদের অবলম্বন। এ আদর্শ নিয়ে সমাজের অসাম্যকে যদি দূর করা যেত তাহলে মধ্যযুগের সাধকরা অনেক আগেই সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারতেন। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব কিন্তু ভাববাদকে প্রশ্রয় দেয় না, বনফুল শ্রেণীবিন্যাসের একটি নতুন চেহারা উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছিলেন। একারণেই এ উপন্যাসের পুঁজিবাদীরা তার কাছে করুণার পাত্র। জাগতিক সুখ বা অসুখ টাকার উপর নির্ভর করে না। তাই প্রাচীন ভারতীয় আর্য সভ্যতার আদর্শকেই তিনি বরণীয় মনে করেন। হিরণ্য চরিত্রটি তাঁর কাছে তাই প্রিয়। অর্থ তাকে দাম্ভিক করে ফেলেনি, প্রাচীন সভ্যতার পবিত্র বাণী দিয়ে তার অন্তর পরিপূর্ণ। তাই অসম সামাজিক বিবাহ বন্ধন করিয়ে সে তৃপ্ত হয়। ধনের অসাম্য থাকা জাতের পার্থক্য তাকে বিচলিত করতে পারে না। এ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়েই বনফুল লিখেছিলেন, 'রাশিয়ায় যে পদ্ধতিতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি মনে করতাম না তা এদেশে সম্ভব। আমরা

বুঝেছি আর্যসভ্যতার আমল থেকে যে সাম্যবাদ চলে এসেছে তাই শ্রেয়। সাম্যকে কেবল অর্থের সমতায় বিচার্য নয়, বিচার্য মনে।' কথাগুলি ভাববাদী দর্শনের সমর্থক। প্রাচীন আর্যসভ্যতা সাম্যবাদকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে নি। তাই যদি হত তাহলে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটত না। তবে একথাও সত্য বনফুল এ উপন্যাসে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা কাহিনীবিন্যাস চরিত্রচিত্রণে সার্থক হয়ে উঠেছে।

ছয়. 'কষ্টিপাথর' ও 'লক্ষ্মীর আগমন' লেখা হয়েছিল তিন বছরের ব্যবধানে। তাঁর একুশতম ও তেইশতম উপন্যাস। এ সময়ের মধ্যবর্তী কালে লেখা হয়েছিল 'স্থাবর'।

বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে বনফুল বরাবরই বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তৃণখণ্ড, বৈতরণীতীরে, সে ও আমি অথবা স্থাবর প্রভৃতি উপন্যাসে তার পরিচয় রয়েছে। 'কষ্টিপাথর'ও এমনই বিষয় ও আঙ্গিকের দিক নতুন ধরনের। উপন্যাসটি চিঠির আকারে লেখা। এটিকে তাই বলা হয়েছে পত্রোপন্যাস। এ চিঠিগুলোর প্রধান লেখক অসিত। বাকিগুলো লিখেছে অতুল মহেন্দ্র ও মহেন্দ্রর স্ত্রী চিত্রা। অসিতের শ্বশুর নীলাম্বরবাবুর লেখা কয়েকটি চিঠিও এ উপন্যাসে রয়েছে।

এ উপন্যাসটি লেখার একটি পূর্বসূত্র রয়েছে। সচিত্র ভারত পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বনফুলকে একটি উপন্যাস তাঁর পত্রিকায় লেখার জন্য অনুরোধ করেন। কি লিখবেন এ বিষয় নিয়ে তিনি যখন চিন্তামগ্ন, তাঁর স্ত্রী লীলাবতী বনফুলের হাতে কিছু পুরোনো চিঠি তুলে দিলেন। চিঠিগুলো বহুকাল পূর্বে বনফুল স্ত্রী লীলাবতীকেই লিখেছিলেন। পুরেনো চিঠিগুলো পেয়ে বনফুল নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস লিখলেন, নাম 'কষ্টিপাথর'। সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থান কত প্রশ্নবোধক হতে পারে, বনফুল তারই রহস্য সন্ধান করলেন এ উপন্যাসে। তাকে পাওয়া যাবে ইবসেনের নোরা চরিত্রের পরম্পরায়, রবীন্দ্রনাথের মৃণালের উত্তরসূরী হিশেবে।

অবশ্য হাসি নিজেকে সর্বাংশে মৃণালের অনুরূপ ভাবে নি। সে বরং বলেছে 'নিজের সম্পর্কে আমার বলবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের যেসব সুবিধা ছিল। আমার সে সব কিছুই নেই। তোমাদের তরলের কোনো নির্যাতন আমাকে ঘরছাড়া করে নি। আমি পালিয়েছিলাম লজ্জায়।'

এখানেও বোধহয় সবটা ঠিক বলা হয় নি। এ উপলব্ধির কিছু পরেই হাসি জানিয়েছে জ্ঞান হবার পর থেকে তার চারদিকে যে অদৃশ্য একটা প্রাচীর ছিল তাকে সে বুঝতে পারত না। কিন্তু একদিন তার জীবনের রহস্য প্রকাশ পেল এবং তখনই সে জানল তার অবস্থান এ সংসারে ঠিক কোথায়। তাই হাসির গৃহত্যাগ কি নোরা বা মৃণালের মতো প্রশ্ন তুলে আসে নি। তার আত্মগোপন আসলে আত্মরক্ষারই নামান্তর ছিল। জীবনের অভিজ্ঞতাই ছিল তার কষ্টিপাথর।

'লক্ষ্মীর আগমন' উপন্যাসও বনফুল বিষয় ও আঙ্গিকের নতুন বিন্যাস

ঘটিয়েছেন। এ উপন্যাসের একাধিক চরিত্র যেন দীর্ঘ স্বগতোক্তি করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে একটি পিকনিকের পরিবেশ নানা জটিলতার কাল বিস্তার করে একটি পরিশীলিত সমে পৌঁছেছে। অবনীশ, নীরা ও অন্যান্য চরিত্রগুলি যেন প্রাকৃতিক উপকরণকে আত্মস্থ করে অপূর্ব এক অলৌকিক জগতকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাস সম্পর্কে সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, যে কল্পনার জোয়ারে প্রকৃত অপ্রাকৃতের সীমা ভাসিয়ে যায়, মহামনির অস্ফুট অভিলাষকে শরীরী মূর্তিরূপে ফুটাইয়া তোলে, যাহা লৌকিককে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার স্থূল অবয়বের মধ্যে অলক্ষিতভাবে অলৌকিক ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে, তাহাই নিবিড় জ্যোৎস্নাবেশ রূপে উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত হইয়াছে। ইহার মানব চরিত্রগুলি যে এই জ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর এক একটি ফেনঃশুভ্র বুদ্বুদ, কুড়ানি মেয়েটির জীবন উৎসব যেন এভাবেই লক্ষ্মীর আগমন-হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

'দুই পথিক' বনফুলের তেত্রিশতম উপন্যাস। লেখক হিসেবে তখনো তিনি তরুণদের মতো অক্লান্তকর্মা। এ অজস্রতার মধ্যে মিলিত হয়েছে পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা। মনে রাখতে হবে এ অন্তর্বর্তী সময়ে বনফুল শুধু যে অন্তত আটখানি উপন্যাস লিখেছিলেন তা নয়, তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছিল বেশ কিছু গল্প, গুটিকত নাটক, প্রচুর কবিতা ও অন্যান্য গদ্যরচনা। বস্তুত বনফুলের মত বহুপ্রজ লেখক বাংলা সাহিত্যে বেশ বিরল।

'দুই পথিক' উপন্যাসের পরিবেশটি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোনো এক নদীর খেয়াঘাটে রাতের বেলা মিলিত হয়েছেন দুজন পথিক। তাঁদের একজন গোবর্ধন। তিনি নদীর ওপারে যাবে জনৈক সৌদামিনীর কাছে একটি পরিচয়পত্রের প্রত্যাশা নিয়ে। খেয়াঘাটে রয়েছে এক পীরবাবার সমাধি। সেখানেই গোবর্ধনের সঙ্গে পরিচয় হল এক গেরুয়াধারী ব্যক্তির। নানা বিস্ময়কর ঘটনা গেরুয়াধারী বলে চলেছেন নিজের অভিজ্ঞাতার পরিমাণ জানাতে। কিন্তু একটা সময় এল তার এ সত্যকথনের প্রতিবাদ জানাতেই অতিলৌকিকভাবে আবির্ভূত হল একটা সাপ। তখন প্রকাশ পেল গেরুয়াধারী আসলে একজন গোয়েন্দা। সৌদামিনীর স্বামী নাকি ডাকাত, তিনি চলেছেন তাকেই গ্রেপ্তার করতে। দারুণ দুর্বিপাক অগ্রাহ্য করে গোবর্ধন তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল এবং তার ফলে তার দশহাজার টাকা পেয়ে একটি সম্মানযোগ্য জীবিকাপ্রাপ্তির মুখোমুখি হল। শেষ পর্যন্ত গোবর্ধন ক্যাসিয়ারের পদ পেল কিনা সে তথ্য এ উপন্যাসে অবান্তর হয়ে দাঁড়াল। বরং মুখ্য হল সংসারে দৈনন্দিন জীবনযাপনের টানাপোড়েনে পারস্পরিক হৃদয়গত সম্পর্ক কতটা ফলবান ও মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে। জগতের পথে সকলেই পথিক, কারুর জানাশোনার সীমানা হয়ত বেশিদূর প্রসারিত নয়, তবু তার জন্যও অবিরত নির্মাণ চলতে থাকে মহিমাময় মনুষ্যত্বের। বনফুল সারাজীবন এ

মহিমাকেই উদ্ভাসিত করে গেছেন।

সাত. প্রচ্ছন্ন মহিমা-এ বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে বনফুলের রচনা বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। এখানে আদি মধ্য অন্ত সমন্বিত কোনো কাহিনী গ্রথিত করা হয় নি। কিছু চরিত্র। গুটিকত চিঠি। আপাতঅসংলগ্ন কতগুলি ঘটনা পরিবেশিত হয়ে একটি বহমান সত্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। মনুষ্যসভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্য ও মূল্যবোধ এ উপন্যাসের অবলম্বন।

রঞ্জু, কুশলা অমিলা চৌধুরী এবং অজমুণ্ড রাবণ মিলে যে ঐকতানের সৃষ্টি করেছিল তার নির্বহণ ঘটেছে ব্যাপক ধ্বংসলীলায়। নিরর্থক এ ধ্বংসলীলাই কি সভ্যতার নিয়তি। বনফুল যেন পাঠকদের কাছে এ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন সভ্যতার বিপর্যয়ের মধ্যে কোন মহিমা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সভ্যতার নিয়তি মনুষ্যসমাজকে কোন উপসংহারের অভিমুখে চালনা করছে।

'গোপালদেবের স্বপ্ন' ও 'অধিকলাল' লেখা হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। বনফুলের পঁয়তাল্লিশ ও সাতচল্লিশতম উপন্যাস।

'গোপালদেবের স্বপ্ন'ও একটি নতুন রীতির উপন্যাস। সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন শাখায় বনফুল বরাবরই নতুনত্বের অন্বেষণে অক্লান্তকর্ম ছিলেন। বিষয় ও বিন্যাসের মধ্যে প্রতিবারই স্বতন্ত্র স্বাদ বহমান করার আশ্চর্য অভীপ্সা ও ক্ষমতা তাঁর ছিল। শুধুমাত্র আয়তনের বৈচিত্র্য নয়, শৈলীর মৌলিকত্বও তাঁকে সমকালীন লেখদের মধ্যে আলাদা করে চিহ্নিত করে দেয়।

'অধিকলাল' উপন্যাসটির কথাই ধরা যাক। এই উপন্যাসের কথক নক্ষত্রকান্তি ঘোষ, তিনি অধিকলালের জীবনী পাঠকের কাছে পেশ করেছেন। খাতাটাও অধিকলালের নয়, যদিও এটি পাওয়া গিয়েছিল অধিকলালেরই পেটিকায়। খাতার লেখাগুলোর বিষয় অধিকলাল হলেও পাঠক তা জানতে পারে তার বন্ধু যোগেনের জবানীতে। খাতাও ছিল জীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ পাঠক ত্রিস্তর অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন।

অধিকলাল সমাজের পিছড়ে বর্গের সন্তান, জাতিতে দোসাদ। বর্ণহিন্দুদের কাছে সে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ এ সমজ থেকে এলেও, বরং বলা ভাল এ সমাজ থেকে এসেছে বলেই তার সততা ও জীবন দেখায় মৌলিকত্ব তাকে পারিপার্শ্বিক থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। বনফুলের নানা উপন্যাস ও আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট'-এ এই শ্রেণীর মানুষের ছবি বহুবার এসেছে। উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গীর মতই অধিকলালের জীবন যেন অসম্পূর্ণ তবু তার মধ্য দিয়ে এক পূর্ণতর মানবমহিমা উদ্ভাসিত হতে থাকে। অধিকলাল আদ্যন্ত সৎ, তার ট্র্যাজিক বীজ হল এ সততা। তাই তার মহতী বিনষ্টি পাঠককে এক গভীর ধাক্কার মুখোমুখি করে দেয়। বনফুল যেন বলতে চান আমাদের ভারতীয় সমাজের সঠিক মুক্তি ঘটবে অধিকলালের মত মানুষের সংখ্যাবহুলতায়। তাদের সমাজসংলগ্নতা আমাদের অজস্র অনুপপত্তিকে সরিয়ে দেবে।

'গোপালদেবের স্বপ্ন' মূলতঃ বনফুলেরই স্বপ্ন। ষাটের উত্তাল দশকে

ভারতীয় এবং সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব নৈরাজ্যে আক্রান্ত ছিল। এ নিবন্ধের গোড়ায় যে তথ্য পেশ করা হয়েছে পাঠক তা আরেকবার দেখে নিতে পারেন। চিনের সঙ্গে সংঘর্ষ, জওহরলাল ও লালবাহাদুরের মৃত্যু, পাকিস্তনের সঙ্গে যুদ্ধ, জাতীয় কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজন, রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাদের সময়কে এক প্রবল বাঁকের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে দু-দুবার যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন ও তার ব্যর্থতা প্রতিটি বিবেকী মানুষকে চিন্তাদীর্ণ করে তুলেছিল। আমাদের ইতিহাস যে একটি পাশ ফেরবার উদ্যোগ নিচ্ছে তা অনেকেই অনুভব করছিলেন। বনফুলের অনুভব 'গোপালদেবের স্বপ্ন' হিসেবে অভিব্যক্ত হল।

বাংলার প্রাচীনকালের এক আখ্যানকে অবলম্বন করে বনফুল এ অনুভবকে রূপ দেবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। গোপালদেব কোনো রাজবংশের উত্তরাধিকার নিয়ে আসেননি। তিনি সাধারণ প্রজাপুঞ্জের দ্বারা নির্বাচিত নরপতি, ঐতিহাসিক কালের অন্তর্গত কোনো দেশে বা কালে অনুরূপ কোনো সংঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় না। এই যে নিতান্ত মৌলিক ও বিস্ময়কর ঘটনাটি একদা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল বনফুল তার মধ্যে একটি ইতিহাসের ইতিবাচক নির্বহণের সন্ধান পেয়েছিলেন।

এ উপন্যাসের রচনারীতিও বনফুলের বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে। লেখক যেন ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া খাতার বর্ণনা পাঠকের কাছে পেশ করছেন। তার ফলে এ উপন্যাসে সংহত ক্রম অনুযায়ী বর্ণনা আসেনি। পর্দার উপর ছায়াছবির মত কম্পমান ধূসরতাকে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছে।

বনফুল এ উপন্যাসে অন্য অনেক বিষয়ের মধ্যে আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির লুপ্তপ্রায় পরিচয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেইসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বাঙালির অবদান বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে তার বীর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ কি ভাবে অবহেলিত ও অস্বীকৃত হচ্ছে সে কথা অত্যন্ত বেদনাময় আবেগের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। গোপালদেবের স্বপ্ন তাই শুধু বনফুলের স্বপ্ন নয়, বাঙালির আত্মপ্রকাশের এক অনিবার্য স্বপ্ন দর্শন।

পুনশ্চ : 'মানদণ্ড' সম্পর্কে একটি তথ্য এখানে পরিবেশিত হচ্ছে। এ উপন্যাসটির চিত্ররূপ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি। রতন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তুলসী চক্রবর্তী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মা দেবী, অনুভা গুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীরা। ছবি জনপ্রিয় হয়েছিল। 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রঙ্গনা' ও অন্যত্র বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে।

বিষ্ণু বসু

অধিকলাল

প্রাথমিক নিবেদন

অধিকলালের জীবনের অসমাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ কাহিনী এটি। অসমাপ্ত, কারণ অধিকলাল এখনও বাঁচিয়া আছে। অসম্পূর্ণ, কারণ কাহিনীর খানিকটা খানিকটা উইপোকায় মাঝে মাঝে নিঃশেষ করিয়াছে। জীবন-কাহিনীটি লিখিয়াছিল অধিকলালের বন্ধু যোগেন এবং সেটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক।

অধিকলালের জীবনের প্রথম পর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মালমসলা আমিই যোগেনকে দিয়াছিলাম। কলিকাতায় যখন পড়িতে যাই তখন যোগেনের সহিত আমারও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। যোগেন এ কাহিনী ছাপাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু অধিকলাল কিছুতেই মত দিল না। সে খাতাটি কাড়িয়া লইয়া একটা কাঠের সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেই সিন্দুকের নীচের দিকটা উই-পোকায় ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে। অধিকলালের জীবন-কাহিনীর খানিকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রথম পর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে আমার কল্পনা কিঞ্চিৎ রং ফলাইয়াছে। অধিকলাল রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই তাহার কণ্ঠস্থ। তাই মাঝে মাঝে তাহার জবানিতে আমি যোগেনকে রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতে উৎসাহিত করিয়াছি। কবিতা আমিই বাছিয়া দিয়াছি। বর্তমান যুগে অধিকলালের নাম কেহ জানে না। নিজের ঢাক নিজে না পিটাইলে বর্তমান যুগের ক্ষণস্থায়ী চেতনায় নিজেকে প্রতিফলিত করা সম্ভব নহে। অধিকলালের একটা জয়ঢাক আছে, কিন্তু তাহা সে পিটায় নাই, কাহাকেও পিটাইতে দেয়ও নাই। তাই আমাদের দেশের অসংখ্য নাম-না-জানা ভালো লোকের দলে সে হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের প্রকৃত ভালো লোকেরা সকলেই প্রায় অখ্যাত। এমন কি সে যখন চাকরি ছাড়ে তখনও তাহার নাম খবরের কাগজে বাহির হয় নাই। কাগজে নাম বাহির করিতে হইলেও যে তদ্বির করা প্রয়োজন সে তদ্বির করিবার উৎসাহও অধিকলালের ছিল না। আমি তাহার অধীনে চাকুরি করিয়াছি। আমি জানি সে কত ভালো অফিসার ছিল। কিন্তু ভালো অফিসারের কদর নাই। তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবারই নানারূপ আয়োজন চতুর্দিকে। অধিকলাল এখন আমাদের বাড়িতেই থাকে। তাহাকে না জানাইয়া তাহার ভাঙা বাক্স হইতে বইটা চুরি করিয়া ছাপিতে দিলাম। জানি না বই বাহির হইলে সে কি বলিবে। অধিকলাল স্বল্পবাক। হয়তো বিশেষ কিছু বলিবে না, একটু মুচকি হাসিবে শুধু। হয়তো মনে মনে ভাবিবে—কি একটা বাজে কাজ করিয়া পয়সা নষ্ট করিয়াছ। তনুর ছেলে বিলাত যাইতেছে, এই টাকায় তাহার কিছু ভালো জামাকাপড় হইয়া যাইত। কিংবা হয়তো—। এই ধরনের কথাই সে ভাবিবে। কিন্তু বইটি ছাপাইয়া আমি বড় তৃপ্তি লাভ করিলোম। ইহার বেশী আমার আর কোন কৈফিয়ৎ নাই।

শ্রীনক্ষত্রকান্তি ঘোষ

প্রথম পর্ব

।। ১ ।।

রংলাল রামগোবিন পাঁড়ের চাকর। রামগোবিন এখন অবস্থা-সম্পন্ন লোক, বড় গোলা আছে, ফালাও কারবার। তাছাড়া আছে জাহাজ ঘাটের কুলি কন্ট্রাক্ট। প্রচুর লাভ। জনশ্রুতি, কয়েক লক্ষ টাকার মালিক তিনি। কিন্তু আগে এমন ছিল না। আগে রামগোবিনও চাকর ছিল। রেলের চাকর। স্টেশন মাস্টার লক্ষ্মীবাবু তখন মালিক ছিলেন তার। রামগোবিন নামে যদিও ছিল পয়েন্টসম্যান, কিন্তু সব কাজ করিতে হইত তাহাকে। স্টেশনের অন্যান্য কুলিরা 'ডিউটি' শেষ হইলেই চলিয়া যাইত, রামগোবিন যাইত না। রামগোবিন লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে গিয়া 'মাইজি'র আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। 'মাইজি' যদিও বন্ধ্যা ছিলেন, নিজের ছেলে-মেয়ে ছিল না, কিন্তু পোষ্য ছিল অনেকগুলি। গাই ছিল, ছাগল ছিল, দুই তিন রকম পাখি ছিল, তাছাড়া ছিল ভুনিয়া, মুনিয়া, রামদাসোয়া, পেটি, রামদুলারী প্রভৃতি একপাল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। কুলিপাড়ার ছেলেমেয়েরা। ইহাদের সকলকেই প্রশ্রয় দিতেন লক্ষ্মীবাবুর সেকেলে স্ত্রী। অনেক রকম কুসংস্কার ছিল তাঁহার। স্বামীর নাম লক্ষ্মী বলিয়া তিনি লক্ষ্মীঠাকুরকে ফক্কিঠাকুর বলিতেন। প্রত্যহ কয়েক ঘড়া গঙ্গাজল প্রয়োজন হইত। পাঁড়েই তাহা রোজ বহিয়া আনিত। মাঝে মাঝে যখন বাতে শয্যাগত হইয়া পড়িতেন পাঁড়েই রান্না করিয়া দিত। ঠাকুর ঘরে বসিয়া অনেকক্ষণ পূজা করিতেন সুরেশ্বরী। পূজার যোগাড়ও পাঁড়েই করিত। ফুল তুলিত, চন্দন ঘষিয়া দিত, পূজার ঘরটি গঙ্গাজলে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত সে। খুব কাজের লোক ছিল রামগোবিন পাঁড়ে। এই সময়েই তাহার রংলালের সঙ্গেও ভাব। রংলালও স্টেশনের একজন কুলি ছিল তখন এবং স্টেশন মাস্টারের বাড়ির বাসন মাজিত সে। কিন্তু সে দোসাদ ছিল জাতে। তাহার হাতের মাজা-বাসনও সুরেশ্বরী গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিতেন না। এজন্য তিনি একজন জল-চল চাকর খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু রামগোবিন বলিল আমি গঙ্গা হইতে জল আনিয়া মাজা বাসনগুলির উপর ঢালিয়া দিব, সব শুদ্ধ হইয়া যাইবে। এ ব্যবস্থায় সুরেশ্বরী আর আপত্তি করেন নাই। রংলালের উপর মনে মনে তিনি প্রসন্ন ছিলেন, বাসনগুলি যখন মাজিয়া আনে তখন ঝকঝক করে একেবারে। বাড়ির হাতা এবং বারান্দাগুলি যখন ঝাড়ু দেয় তখন একটুও ফাঁকি দেয় না। রংলালের জন্য তাঁহার বাড়ি ঘরদোর তক্তক্ করে। হ্যাঁ, রংলালের উপর মনে মনে খুশীই ছিলেন সুরেশ্বরী। ভাবিতেন, "লোকটা সত্যিই ভালো। পূর্বজন্মের পাপে বোধহয় এ জন্মে নীচ ঘরে জন্মেছে। আহা—"। রংলাল 'শুখা' বেতনে কাজ করিত। মাসে পাঁচ টাকা বেতন পাইত সে। কিন্তু সুরেশ্বরী রোজ তাহাকে কিছু খাইতে দিতেন। কোনদিন বাসী রুটি, কোনদিন মুড়ি, কোনদিন মোয়া, কোনদিন ছাতু। রংলাল বাড়ি যাইবার আগে রোজ বলিতেন, ওরে দাঁড়া। খাবার নিয়ে যা। রংলাল মলিন গামছাটা পাতিয়া কুণ্ঠিত মুখে উঠানে দাঁড়াইত, সুরেশ্বরী আলগোছে ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া তাহার গামছায়

খাবার দিতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর ছেলেপিলে ক'টি? রংলাল ছেকাছিনি ভাষায় যাহা বলিয়াছিল তাহার বাংলা—আপনার আশীর্বাদে দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে আমার। সুরেশ্বরী আরও খান চারেক রুটি দিয়াছিলেন তাহাকে। বলিয়াছিলেন—নিয়ে আসিস ওদের একদিন। রামগোবিন সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল, ওর বড় ছেলে অধিকলাল, খুব 'তেজ' আছে। পণ্ডিতজি বলছিলেন ছোকরা পহেলা নম্বরের। রামগোবিন মাঝে মাঝে বাংলায় নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করিত। রংলালের বড় ছেলে অধিকলাল ক্লাসে সব বিষয়েই প্রথম হয় এই কথাটাই বুঝাইবার চেষ্টা করিল সে। সুরেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, ও তাই নাকি। আচ্ছা, নিয়ে আসিস একদিন দেখব।

রামগোবিন সত্যই ভালবাসিত রংলালকে। সে যদিও পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ কিন্তু তাহার ছোঁয়াছুয়ির বিচার ছিল না তেমন, রংলাল যখন হাতের চেটোয় চুন দিয়া খইনি মলিয়া তাহাকে দিত তখন আপত্তি করিত না সে। মুখবিবরে সেটা ফেলিয়া দিয়া জিহ্বার সাহায্যে ঠোঁটের তলায় সেটাকে চালান করিয়া দিত। তাহার পর 'পচ' করিয়া একবার থুতু ফেলিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিত রংলালের দিকে। রংলালের মুখেও হাসির আভা ফুটিত। সত্যই বন্ধুত্ব ছিল দুই জনের। 'মেকী' নয় খাঁটি।

বলিষ্ঠ তাগড়া জোয়ান ছিল রামগোবিন পাঁড়ে। আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল প্রশস্ত ছাতি, পেশীসমৃদ্ধ বাহু, জঙ্ঘা। মুখটা সুন্দর নয় কিন্তু শক্তিব্যঞ্জক। মনে হইত, একটা গণ্ডারের মুণ্ডুকে যেন তাহার বৃষস্কন্ধের উপর বসাইয়া দিয়াছে। গণ্ডারের মতো ঊর্ধ্বমুখী খড়্গ নাই বটে, কিন্তু তাহার নাকটা খড়্গেরই মতো। তখন হইতেই রামগোবিন বুঝিয়াছিল, পুরুষকারই পুরুষের একমাত্র সম্পদ। তখন হইতেই তাহার দিনচর্চা বিস্ময়কর ছিল। সে থাকিত গুমটির নিকট রেলের একটা ছোট ঘরে। ঘরটা বে-মেরামত পড়িয়াছিল, লক্ষ্মীবাবুর অনুমতি লইয়া সেই ঘরটাতেই ঘুমাইত রামগোবিন। উঠিত ভোর চারটের সময়। তাহার সম্পত্তির মধ্যে ছিল একটি কম্বল, একটি খড়ের বালিশ, এবং একটি লোটা। উঠিয়াই সেগুলি গুছাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিত সে। তাহার পর করিত ডন বৈঠক। তাহার পর লোটা-কম্বল লইয়া সে চলিয়া যাইত গঙ্গার ধারে। স্টেশনের নীচেই গঙ্গা। জাহাজঘাটও আছে। সেখানে শিবলাল হালুয়াইয়ের দোকানে নিজের কম্বলটি সে রাখিয়া দিত শিবলালের চাকর গঙ্গারামের নিকট। গঙ্গারাম তখন উঠিয়া উনানে আঁচ দিত। তাহার পর রামগোবিন চলিয়া যাইত ঠেটন গোয়ালার বাথানে। গঙ্গার ধারেই ঠেটন গোয়ালার বাথান। অনেক গরু-মহিষ ছিল তাহার। রামগোবিন সেখানে মহিষের দুধ দুহিত। খুব ভালো দুধ দুহিতে পারিত সে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে প্রায় আধমণ দুধ দুহিয়া ফেলিত। ইহার জন্য ঠেটন তাহাকে নগদ চার আনা পয়সা এবং খাঁটি এক সের দুধ দিত। দুধ দুহিবার পর সে আবার চলিয়া যাইত শিবলালের দোকানে। সেখানে দুধের ঘটিটি রাখিয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিত। শিবলালের দোকানেই তাহার শুকনো কাপড়টা থাকিত। ভিজা কাপড়টা ছাড়িয়া শিবলালের দোকানের পিছনেই লম্বা করিয়া শুকাইতে দিত সেটাকে। একটা খুঁট বাঁধিত বেঁটে আমগাছটার ডালে আর একটা খুঁট শিবলালের দোকানের ঝুঁকিয়া-পড়া চালের একটা বাতায়। গঙ্গা যথাকালে কাপড়টা তুলিয়া রাখিয়া দিত। গঙ্গা তখন হইতেই রামগোবিনের ভক্ত ছিল খুব। পরে সে রামগোবিনের ব্যবসায়ে 'মুনিম্‌জি' অর্থাৎ ম্যানেজার হইয়াছিল। গঙ্গাস্নান করিয়া রামগোবিন যাইত মহাবীরজির থানে। গঙ্গার ধারেই

শিবলালের দোকানের একটু দূরে মহাবীরজির থান। একটি আমগাছের নীচে সিন্দুরলিপ্ত মহাবীরজির একটি প্রস্তর মূর্তি। বড় জাগ্রত দেবতা। রামগোবিন এই মূর্তির সামনে দুই কান ধরিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত, ঠোঁট দুইটি নড়িত কেবল। তাহার পর সাষ্টাঙ্গে সে প্রণাম করিত মহাবীরজিকে। তাহার পর সে আবার ফিরিয়া আসিত শিবলাল হালুয়াইয়ের দোকানে। প্রকাণ্ড উনুনটা তখন ধরিয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা দুধও গরম করিয়া রাখিয়াছিল। রামগোবিন উনুনের ধারে বসিয়াই অর্ধেকটা দুধ পান করিয়া ফেলিত। বাকিটা সন্ধ্যার পর আসিয়া পান করিবে। গঙ্গার হেপাজতেই দুধটা থাকিত। দুগ্ধ পান শেষ করিয়া রামগোবিন উনুনের পাশে একটা মোড়ায় বসিয়া গঙ্গাকে বলিত—আব, কঢ়াই চড়াও। গঙ্গা প্রকাণ্ড কড়াটা চড়াইয়া খানিকটা ঘি তাহাতে ঢালিয়া দিত। বড় ছান্‌চাটা হাতে লইয়া অপেক্ষা করিত রামগোবিন। গঙ্গা কিছু লুচি বেলিয়াই রাখিয়াছিল। ঘি গরম হইলেই রামগোবিন কড়াইয়ে লুচি ছাড়িতে শুরু করিত। সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত শিবলালের দোকানে লুচি ভাজিত রামগোবিন। ইহার জন্য মজুরি পাইত দশখানা লুচি, কিছু শাক (নিরামিষ তরকারি) এবং খানিকটা বুটের ডাল। সাড়ে ছয়টার সময় উনুনের ধারে বসিয়াই আহার সমাধা করিত রামগোবিন। তাহার পর স্টেশনে চলিয়া আসিত। স্টেশনে ঠিক সাতটার সময় ডিউটি। সাড়ে সাতটায় গাড়ি আসিবে। স্টেশনেও নানারকম কাজ। স্টেশনের কাজ তো আছেই, তাছাড়া আছে বড়বাবু এবং ছোটবাবুর নানারকম ফাইফরমাশ। সদ্য-আগত টিকিট কালেক্টারবাবুর নববিবাহিত বধূটি বড়লোকের মেয়ে। গৃহস্থালীকাজে তেমন পারদর্শিনী নয়, তাহার উনুনটাও রামগোবিন রোজ ধরাইয়া দিয়া আসিত। ট্রেন চলিয়া যাইত নয়টার সময়। তাহার পর সমস্ত দিন স্টেশনের তেমন কোনও কাজ থাকিত না। কিন্তু লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে তখন প্রচুর কাজ। সেখানেও গরু দোহা, ছাগল দোহা, পাখিদের স্নান করানো, মাইজির জন্য গঙ্গাজল আনা, বাজার করা, এমন কি কাপড় কাচা পর্যন্ত—বাড়ির যাবতীয় কাজ রামগোবিনই করিত। সুরেশ্বরী যেদিন অসুস্থ হইয়া পড়িতেন সেদিন তাহাকে রান্নাঘরেও ঢুকিতে হইত। বাঙালী রান্না রামগোবিন রাঁধিতে পারিত না। ভাতে-ভাত, ডাল এবং 'ভুজিয়া' বানাইত। মাছ মাংস স্পর্শ করিত না সে। সে জন্য কোনও অসুবিধাও হইত না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে খবরটা পৌঁছাইয়া দিলেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মাছের তরকারি পাঠাইয়া দিতেন। রামগোবিনের দুপুরের খাওয়াটা লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতেই হইত। লক্ষ্মীবাবুর নিকট সে কোন বেতন লইত না। বেতনের কথা বলিলেই হাত-জোড়া করিত। কেন সে এরূপ করিত তাহার রহস্য জানিত কেবল রংলাল। কিন্তু সে কিছু বলিত না, মুচকি মুচকি হাসিত কেবল। লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির কাজকর্ম শেষ করিয়া দুপুরের খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া রামগোবিন লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির বারান্দায় হাতে মাথা এবং চোখে গামছা দিয়া শুইয়া পড়িত খানিকক্ষণ। শুইবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়িত সে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাক ডাকিত। ঠিক আড়াইটার সময় উঠিয়া পড়িত সে। তিনটার সময় লক্ষ্মীবাবুর চা খাওয়ার অভ্যাস। তাঁহাকে চা করিয়া দিয়া রামগোবিন হাটে চলিয়া যাইত। কাছে-পিঠের প্রতি গ্রামেই একদিন না একদিন হাট বসে। লক্ষ্মীবাবুর জন্য রোজ টাটকা তরি-তরকারি কিনিয়া আনিত। নিজেরও কাজ করিত একটু। যে কাজটা তখন 'একটু' ছিল, তাহাই বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পরে। হাটে যাইবার পথে সে রংলালের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া হাঁক দিত—হো রংলাল, চল্‌, চল্‌ টাইম ভে গেল্‌। রংলাল কাঁধে একটি বস্তা লইয়া বাহির হইয়া আসিত। বাহির হইতেই বোঝা যাইত বস্তার

ভিতর ছোট বড় কয়েকটি পুঁটুলি আছে। এইবার ব্যাপারটা খুলিয়া বলা প্রয়োজন। স্টেশনে 'সাইডিং'-এ অনেক মালগাড়ি থাকিত। মালগাড়িতে থাকিত মাল। নানারকম মাল। ধান গম চাল ডাল আটা ময়দা সবই বস্তা বস্তা। রামগোবিন গভীর রাত্রে উঠিয়া বস্তায় ফুটা করিয়া প্রতি বস্তা হইতে চার পাঁচ সের করিয়া মাল সরাইত। তাহার পর গুণ ছুঁচ ও সুতলি দিয়া ছিদ্রটি মেরামত করিয়া দিত। মাল রাখিত সে রংলালের কুঁড়ে ঘরে। রংলাল ভীতু লোক। চোরাই মাল রাখিতে ভয় পাইত সে। কিন্তু সে আরও বেশী ভয় পাইত তাহার স্ত্রী সমুন্দরিকে। যদিও তাহার চারটি ছেলে মেয়ে, বয়স কিন্তু বাইশ তেইশের বেশী নয়। তাহা ছাড়া প্রচণ্ড যৌবন। তাহার সমুন্দরি নামটা সার্থক ছিল সত্যই। তাহার সর্বাঙ্গে যেন যৌবনের ঢেউ উত্তাল। রংলাল বাড়ির মালিক ছিল না, মালিক ছিল সমুন্দরি। সে যাহা বলিত তাহাই হইত। সে-ই রামগোবিনের চোরাই মাল লুকাইয়া রাখিত, তাহারই আদেশে রংলাল সেই চোরাই মালের পুঁটুলিগুলি বস্তায় ভরিয়া হাটে লইয়া যাইত। সমুন্দরির বিরুদ্ধাচরণ করিবার সাহস ছিল না তাহার। কিন্তু মনে মনে খুবই বিরক্ত হইত সে। হাটে যাইবার পথে রোজই সে রামগোবিনকে বলিত—ভাইয়া, ই সব কাম ছোড় দে। চোরা কিন্তু ধর্মের কাহিনী শুনিত না। রামগোবিন তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত পৃথিবীতে সবাই চোর, সবাই ডাকাত। কিষুণজির ছেলেবেলায় নাম ছিল 'মাখখন চোর'। মহাবীরজিকে ডাকাত ছাড়া আর কি বলা যায়। অত বড় রাবণের লঙ্কাটা সে—। সমুন্দরি কিন্তু এসব দার্শনিক তত্ত্বে ভোলে নাই। তাহাকে টাকায় চার আনা বখরা দিতে হইত। সপ্তাহে সাতটি হাটে ঘুরিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা রোজগার করিত রামগোবিন। ইহা হইতে দশ বারো টাকা সমুন্দরিকে দিতে হইত। সমুন্দরি সে টাকা দিয়া 'জেবর' (গহনা) কিনিত। রূপার গহনা। এজন্য একটা বদনামও রটিয়া গিয়াছিল তাহার। অনেকেই সন্দেহ করিত রামগোবিনের সহিত নিশ্চয়ই একটু 'নট্‌ঘট্' আছে। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। রামগোবিনের অবশ্য সামান্য একটু দুর্বলতা হইয়াছিল একদিন। সে তাহার গণ্ডারের মতো মুখটাকে যথাসম্ভব কোমল করিয়া বলিয়াছিল, 'আনা মেরা পাস রাতসে একদিন গুম্‌টিমে।' চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল সমুন্দরি। 'চোট্টা ভাবনা, ফের ইসব বাত কহবি তো ঝাড়ু দেকে তোরা থোতনা চুরি' দেব—'। রামগোবিন চতুর লোক। সে সঙ্গে সঙ্গে মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর। সমুন্দরিও সঙ্গে সঙ্গে মাপ করিতে দ্বিধা করে নাই। যৌবনোচ্ছলা নারীরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। তাহারা ইহাও জানে যে অধিকাংশ পুরুষদের চিত্তের ভারসাম্য তাহাদের সন্নিধানে বজায় থাকে না। সেজন্য তাহারা প্রায় অনুকম্পাশীলাও হয়। সুতরাং ক্ষতি কিছু হয় নাই। রামগোবিন সমুন্দরি প্যাক্ট প্রায় তিনি বৎসর অটুট ছিল। এই তিন বৎসরে রামগোবিন প্রায় দশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়া স্থানীয় পোস্টাফিসে জমাইয়া অবশেষে 'রাম-গোলা' নামে তাহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমুন্দরিও গহনা গড়াইয়াছিল অনেক। রংলাল বেচারাই কেবল পায় নাই কিছু। সে কেবল হাটে হাটে বোঝা বহিয়া বেড়াইয়াছে মাত্র। কিন্তু কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিছু পাইয়াছিল বই কি। সৎ হইয়া থাকার যে আনন্দ তাহা সে পাইয়াছিল। তাছাড়া আর একটা জিনিসও ঘটিয়াছিল—কিন্তু সে কথা পরে বলিব। যাঁহারা মনে করিতেছেন যে চোর রামগোবিনকে রংলালের পুলিশে ধরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল তাঁহারা রংলাল-জাতীয় লোকদের চেনেন না। রংলালদের শাস্ত্রে 'চুগলি' খাওয়া মহাপাপ। কাহারও সাতে-পাঁচে

তাহারা থাকিতে চায় না। তাহারা পরের অসঙ্গত অন্যায় আবদার, এমন কি অত্যাচারও, মুখ বুজিয়া সহ্য করে। তাহা লইয়া চীৎকার চেঁচামেচি হাহুতাশ বা বিলাপ করা তাহাদের স্বভাব নয়। রংলালকে চিনিত তাহার বউ সমুন্দরি। মনে মনে শ্রদ্ধাও করিত তাহাকে। কিন্তু সে জানিত বাহিরে দাপটের চোটে দাবাইয়া না রাখিলে এই সব 'সাধুসন্ত' প্রকৃতির লোক সংসারটাকেই 'চৌপট' করিয়া দিবে। কিন্তু আসল লোকটাকে চিনিতে সে ভুল করে নাই। আর একজনও তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিল, সে তাহার আট বছরের ছেলে অধিকলাল। শুধু তাহাকে নয়, তাহার মাকে এবং রামগোবিনকেও চিনিয়াছিল সে। আমরা মনে করি ছোট ছেলেরা কিছু বুঝিতে পারে না। কিন্তু সেটা আমাদের ভুল ধারণা। ছোট ছেলেরা নিখুঁত বিচারক। তাহাদের বিচার নির্ভুল। অধিকলাল বুদ্ধিমান ছেলে, সে সবই বুঝিতে পারিত। সে তাহার নিরীহ গোবেচারা পিতাকে খুবই শ্রদ্ধা করিত। মাকেও সে ভালবাসিত, কারণ সে মা, কিন্তু তাহার রণচণ্ডী মূর্তিটা মোটেই ভালো লাগিত না তাহার। আর সে ঘৃণা করিত রামগোবিনকে। তাহার মনে হইত ও মানুষ নয়, ও দৈত্য। তাহার মন বিষাইয়া উঠিত যখনই সে ভাবিত ওই লোকটির সহিত তাহাদের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রামগোবিনের টাকা লইয়া তাহার মা যখন 'জেবর' (গহনা) গড়াইত, রামগোবিন যখন তাহার বাবাকে অভিভাবকী ভঙ্গীতে আদেশ করিত তখন যে ক্ষোভ ঘৃণা দুঃখ তাহার মনে জাগিত তাহাকে ভাষা দিবার মতো তাহার বয়স হয় নাই তখন। তখন অধিকলালের বয়স মাত্র আট বৎসর।

বছর তিনেক পরে লক্ষ্মীবাবু বারসোই বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন আবদুল জাব্বার নামে একজন মুসলমান ভদ্রলোক। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে মুরগী চরিতে লাগিল। বদনা, পিকদানি এবং পরদার আমদানি হইল। সেই সময়ই রামগোবিন স্টেশনের চাকরি ছাড়িয়া দিল। রংলালকেও সঙ্গে লইয়া গেল সে। বলিল স্টেশনে তুমি যে বেতন পাইতে আমি তাহার অপেক্ষা এক টাকা বেশী বেতন দিব। তুমি আসিয়া আমার গোলার কাজকর্ম কর। গ্রামের মাঝখানে অনেকখানি জায়গা কিনিয়া রামগোবিন তাহার গোলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। শিবলালের দোকানের গঙ্গা কিছু লেখা-পড়া জানিত। সেও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দোকানের কাজকর্ম কমিয়া গেলে গোলায় যাইত এবং সমস্ত দিনের হিসাবপত্র একটা খাতায় লিখিত। তখনই দেখা গেল রামগোবিনের স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। প্রত্যেক দিনের সমস্ত খুঁটিনাটি—কাহাকে কত পয়সা দিল, কাহার নিকট হইতে কত পয়সা পাইল, কে কত ধান চাল ডাল প্রভৃতি লইয়াছে এ সমস্তই সে মনে করিয়া রাখিত এবং তাহার মুখ হইতে শুনিয়া গঙ্গা সে সব টুকিয়া রাখিত। রাত্রি নয়টার পর আসিতেন দুবেজি। স্থানীয় মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত। তাঁহার নিকট রামগোবিন ইংরেজি, হিন্দী এবং অঙ্ক শিখিবে প্রস্তাব করিয়াছিল। দুবেজি বলিলেন—ওসব তো তুমি অধিকলালের কাছেই শিখতে পারবে। ওর কাছে পড়া যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি পড়াব। এখন আমি বরং রোজ তোমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাই।

নয়টার পর দুবেজি রামগোলায় সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেন। রামগোবিন জোড় হস্তে বসিয়া তাহা শুনিত। শুনিতে শুনিতে রামগোবিনের সুরেশ্বরীকে মনে পড়িয়া যাইত বার বার। সুরেশ্বরী সমস্ত অশুদ্ধ জিনিসের উপর গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া সেগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইতেন। দুবেজি তেমনি রামনামের ছিটা দিয়া তাঁহার সমস্ত পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করিতেছেন মনে করিয়া ভারি একটা তৃপ্তি হইত রামগোবিনের। দুবেজির

আদেশও অমান্য করে নাই সে। অধিকলালের নিকটই সে হিন্দী ও ইংরেজী অক্ষরের প্রথম পাঠ লইল। অধিকলাল রামগোবিনকে তেমন পছন্দ করিত না কিন্তু রামগোবিনের মতো অমন একটা হোমরা-চোমরা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড লোক যে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চায় ইহাতে সে ভারি একটা আমোদ অনুভব করিল। সানন্দেই সে রামগোবিনের গুরুগিরি শুরু করিয়া দিল। তাহার আর একটা কথাও মনে হইত। রামগোবিনই তো তাহাদের সংসার চালাইতেছে। তাহার বাবা এখানেই চাকরি করে। কিছুদিন পরে মা-ও আসিয়া গোলায় বাহাল হইল। সে সমস্ত শস্য কুলায় ঝাড়িয়া বাছিয়া আলাদা আলাদা করিয়া রাখিয়া দেয়। রামগোবিনের নিকট দুবেজিও বেতন পান। অধিকলালের জীবনে রামগোবিন ওতপ্রোত হইয়া আছে। রামগোবিনকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু—হ্যাঁ ওই 'কিন্তু'টাই তাহার সমস্ত মনকে মাঝে মাঝে বিষাইয়া দেয়। সে জানে রামগোবিনের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি—অসাধুতা—চুরি। ইহার বিরুদ্ধে বালক অধিকলালের সমস্ত চিত্ত মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করিয়া উঠিত কিন্তু কার্যত কিছুই করিতে পারিত না সে। রামগোবিনের অনুগ্রহ-পাশ ছিন্ন করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহা একটা বিরাট অক্টোপাসের মতো তাহার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

রামগোবিনের ব্যবসায় দেখিতে দেখিতে ফাঁপিয়া উঠিল। সে মাল বহিবার জন্য দুইটি গরুর গাড়ি কিনিল। দুধ খাইবার জন্য এবং বিক্রয় করিবার জন্য কয়েকটি মহিষও। মহিষের সমস্ত দুধ জাহাজঘাটের হালুয়াই শিবলালই কিনিয়া লইত। দুধ বিক্রি করিয়াও বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল রামগোবিনের।

কিছুদিন পরে দেখা গেল রামগোবিন জমিদারের কাছারিতে আনাগোনা করিতেছে। নায়েব মহাশয়ের বাড়িতে হাঁড়ি হাঁড়ি দুধও পাঠাইতে লাগিল সে। একদিন কাজিগ্রামের হাট হইতে প্রকাণ্ড একটা রোহিত মৎস্য কিনিয়া নিজে গিয়া নায়েব মহাশয়ের বাড়িতে দিয়া আসিল। প্রায়ই দেখা যাইতে লাগিল সে হাত-জোড় করিয়া নায়েব মহাশয়ের সেরেস্তায় মাটিতে উবু হইয়া বসিয়া আছে। এইভাবে কিছুদিন ধর্না দিবার পর তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হাঁসোয়ারা গ্রামের প্রান্তে এক প্লটে যে দুইশত বিঘা জমি 'পড়তি' ছিল সেটি কিছু সেলামী এবং নামমাত্র খাজনা দিয়া রামগোবিন নিজের নামে খারিজ-দাখিল করিয়া লইল। তাহার পরই সে মাতিয়া উঠিল চাষ-বাস লইয়া। বলদ কিনিল, হাল কিনিল, জমিরই একপ্রান্তে মাটি এবং খড় দিয়া ছোট একটা ঘরও বানাইয়া ফেলিল সে। সকলে সেটার নাম দিল রামগোবিনের 'ডোটা'। 'ডোটা' কথাটার মানে সম্ভবত আস্তানা। রামগোবিন তাহার দিনচর্যা পূর্ববৎ বহাল রাখিয়াছিল। খুব ভোরে উঠিয়া সে বার কয়েক ডন বৈঠক করিত, তাহার পর গঙ্গায় ডুব দিয়া মহাবীরজির সামনে কান ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত খানিকক্ষণ। তাহার পর গোলায় গিয়া কয়েকটি মহিষ দুহিয়া ফেলিত। শিবলালের দোকানে গিয়া লুচি ভাজিবার সময় আর সে পাইত না। শিবলালই একটু পরে তাহার জন্য লুচি, ডাল এবং শাক লইয়া হাজির হইত এবং মহিষের দুধ মাপিয়া দোকানে লইয়া যাইত। রামগোবিনের জন্য ভালো প্যাঁড়াও সে প্রস্তুত করিয়া আনিত মাঝে মাঝে। রামগোবিন 'জল খৈ' শেষ করিয়া পদব্রজে হাঁসোয়ারার দিকে রওনা হইয়া যাইত। মাত্র দুই ক্রোশ পথ। আটটা নাগাদ সেখানে সে পৌঁছিয়া যাইত। সেখানে গিয়া যদি সে দেখিত যে 'হালবাহারা' (যাহারা হাল চালায়) কাজ আরম্ভ করে নাই তাহা হইলে তুলকালাম্ কাণ্ড করিয়া ফেলিত সে। গালাগালি তো দিতই, মারধোরও করিত। কেহ বিদ্রোহ করিত না, কারণ

সকলেই রামগোবিনের খাতক। সকলকেই রামগোবিন ঋণের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রামগোবিনের বিশেষত্ব, রামগোবিন ঋণের জন্য কখনও তাগাদা তো করিতই না, প্রয়োজন হইলে আবার ধার দিত। মাঝে মাঝে সুবিধা মতো তাহাদের বেতন হইত কিছু কিছু কাটিয়া লইত। তাহাদের খাইবার জন্য 'সিধা'ও দিত সে। অর্থাৎ নূতন রকম দাসত্ব-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিল রামগোবিন। যে তাহার অধীনে একবার চাকরি করিয়াছে সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না, চাহিতও না।

সত্যই রামগোবিনের ভাগ্যদেবতা তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। রামগোবিন যাহাই ধরে তাহাই সুফল-প্রসূ হইয়া ওঠে। সত্যই তাহার হস্তে ধূলি-মুঠি সোনা-মুঠিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

হাঁসোয়ারার দুইশত বিঘা জমিতে সেবার দুই হাজার মণ গম ফলিল। সেবার গমের দামও চড়িয়া গেল কিছু। বারো টাকা মণের কম ভাল 'দুধিয়া' গম দুষ্প্রাপ্য হইল বাজারে। রামগোবিন সাহেবগঞ্জের এক ধনী ব্যবসাদারকে বলিল 'তুমি যদি আমার সব গম একসঙ্গে কিনিয়া লও, তোমাকে দশ টাকা মণ হিসাবে গম বেচিব। শুধু তাহাই নয়, তুমি যদি বোরা দাও তাহা হইলে সেগুলি বোরায় পুরিয়া বিনা খরচায় নৌকাতেও উঠাইয়া দিব। আমার অনেক জনমজুর আছে তাহারা সেটা আমার খাতিরে বিনা মজুরিতে তোমার নৌকায় তুলিয়া দিবে। তবে টাকাটা আমাকে 'একাঠ্ঠা' (একসঙ্গে) দিতে হইবে। তিনি ইহাতে রাজী হইলেন। রামগোবিন একসঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়া গেল। নগদ পাঁচ সিকা খরচ করিয়া মহাবীরজিকে 'শিরনি' চড়াইল এবং নগদ পাঁচ টাকা খরচ করিযা বন্ধুবান্ধবদের দহি চূড়া খাওয়াইল। ইহার কিছুদিন পরেই 'খুদ্দি' বাবুর সহায়তায় জাহাজঘাটের কুলি কন্ট্র্যাক্টিও পাইয়া গেল সে।

মুসলমান স্টেশন মাস্টারটি বেশী দিন রহিলেন না। কেন জানি না, হিন্দু-প্রধান স্টেশনে থাকিতে তাঁহার ভালো লাগিল না। তিনি নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া একটি মুসলমান-প্রধান স্টেশনে বদলী হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন খর্বকায় ক্ষুদিরাম মিত্র। খুব করিৎকর্মা লোক। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ও অঞ্চলে 'খুদ্দি' বাবু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। রামগোবিন একদিন তাঁহার নিকট হাত-জোড় করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে এক হাঁড়ি ভালো দই ও এক কাঁধি মর্তমান কলা। রামগোবিন তাহার জমির ধারে ধারে প্রচুর কলা গাছ লাগাইয়াছিল।

"এসব কি!" পুলকিত খুদ্দি বাবু প্রশ্ন করিলেন।

"আমি হুজুর লক্ষ্মীবাবুর নোকর ছিলাম। এখন সামান্য "ক্ষেতি গিরস্তি' করি. কিছু 'বেওসাও' (ব্যবসা) আছে ছোটা-মোটা। আপনি হাকিম্ মানুষ, আপনাদের যদি 'কিরপা' থাকে—"

"আমিও সামান্য লোক! আমি আর তোমাকে কি কৃপা করতে পারি—"

"হুজুর হিনছা (ইচ্ছা) করলে বহুত কুছ হোতে পারে। শুনছি ঘাটের কুলি কনট্রাক্টে নতুন কনট্র্যাকটার নেবেন আপনারা। গিরবরধারিলাল কনট্র্যাক্ট্ নাকি ছেড়ে দিচ্ছেন—"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে কনট্র্যাকট কি তুমি নিতে পারবে, অনেক টাকার মামলা—"

"কত টাকা—"

"বেশ কিছু টাকা রেল কম্পানিতে জমা দিতে হবে জামানত স্বরূপ। তাছাড়া পানটানও খাওয়াতে হবে নানা জায়গায়। হাজার দশ বারো লেগে যাবে—"

"হুজুর যদি 'কিরপা' করেন যোগাড় করে ফেলব টাকা—"

খুদ্দিবাবু কৃপা করিয়াছিলেন শ' পাঁচেক টাকা সেলামী লইয়া। উপর-মহলে তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল। রামগোবিনকে কন্ট্রাকটরিটি পাওয়াইয়া দিবার আগে তিনি আর একটি কাজও করিয়াছিলেন। তিনি রামগোবিনকে বলিলেন—"দেখ তোমার ওই পাঁড়ে উপাধিটা বদলাতে হবে। স্টেশনে স্টেশনে যারা প্যাসেঞ্জারদের জল দেয় তাদের নাম 'পানি পাঁড়ে'। আমাদের যিনি বড় সাহেব তিনি বিলেতের খানদানি বংশের ছেলে। তিনি হয়তো তোমার ওই 'পাঁড়ে' উপাধির জন্যই তোমাব দরখাস্ত নামঞ্জুর করে দেবেন। তিনি যে সে লোককে কনট্র্যাক্ট্ দেবেন না। তোমাকে একটা খানদানি উপাধি নিতে হবে—"

"সমঝা নেই হুজুর, খোলকে কহিয়ে—"

"উপাধিটা রেস্‌পেক্‌টেবল (respectable) হওয়া চাই। শুনলেই মনে হবে—হ্যাঁ মানী লোক। শুনলেই যাতে 'গম্' করে কানে লাগে। সাহেব 'না' বলতে পারবে না—"

"কি করব আপনিই বাতিয়ে দিন—"

"তোমাকে আরও একশ টাকা খরচ করতে হবে। কাশীতে আমার জানা-শোনা একটি টোল আছে। তারা একশ টাকা পেলেই 'শাস্ত্রী' উপাধি দেয়। তুমি যদি টাকা দাও সেই উপাধি তোমাকে একটা আনিয়ে দিই।"

"আপনি যা হুকুম করবেন তাই হোবে।"

মাস দুই পরেই রামগোবিন শাস্ত্রী জাহাজঘাটের রেলোয়ে কুলি কন্ট্রাক্ট্ পাইয়া গেল। জাহাজ হইতে ট্রেনে এবং ট্রেন হইতে জাহাজে মাল তুলিবার জন্য যে কুলি দরকার তাহাই রামগোবিনকে প্রত্যহ জাহাজঘাটে মজুত রাখিতে হইবে এবং প্রতি কুলি পিছু রেল কম্পানি প্রত্যহ তাহাকে আট আনা করিয়া দিবে। ঘাটে দুইশত কুলি মাল বহিবার জন্য মজুত থাকা চাই। ইহাই হইল কন্ট্র্যাক্ট। রামগোবিনের হাতে জন-মজুরের সংখ্যা কম ছিল না। ইচ্ছা করিলে সে দুইশত কুলিই ঘাটে মজুত রাখিতে পারিত। কিন্তু কোনদিনই সে তাহা রাখে নাই। চল্লিশ পঞ্চাশটি কুলির দ্বারাই সে কাজ চালাইত। তাহাদেরও পুয়া মজুরি দিত না। কারণ তাহারা প্রায় সকলেই ছিল তাহার বেতনভুক ভৃত্য এবং অনেকেই অনুগ্রহপ্রার্থী খাতক। ওই চল্লিশ-পঞ্চাশ জন কুলিই প্রত্যহ মুখ বুজিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটাছুটি করিয়া জাহাজের ও ট্রেনের মাল খালাস করিয়া দিত। ট্রেন অবশ্য মাঝে মাঝে 'লেট' হইয়া যাইত এজন্য। কিন্তু স্টেশনের বাবুরা 'পান' খাইয়া সমস্ত 'ম্যানেজ' করিয়া দিতেন। রামগোবিন শাস্ত্রীকে মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি বাঁধিয়া একটা রেশমের শাদা কুর্তা গায়ে দিয়া জুতা পরিয়া দুবেলা ঘাটে হাজির থাকিতে হইত এবং সাহেব দেখিলেই সেলাম করিত সে। প্রত্যহ তাহাকে দুই ঘণ্টা করিয়া চার ঘণ্টা জামা-জুতা পরিয়া অকথ্য কষ্ট সহ্য করিতে হইত। খুদ্দিবাবুর নির্দেশেই করিতে হইত। সুফলও ফলিতেছিল। দেখিতে দেখিতে রামগোবিন শাস্ত্রী ও অঞ্চলে বিখ্যাত ধনী বলিয়া সকলের নিকট সম্মান লাভ করিল। কিছুদিন পরে সে তাহার গোলার নিকটে জগন্নাথ পাঠকের দুই বিঘা জমিটাও হস্তগত করিয়া ফেলিল। জগন্নাথ জমিটা বন্ধক রাখিয়া তাহার নিকট দুইশত টাকা ধার লইয়াছিল। সে ধার সে আর পরিশোধ করিতে পারিল না। জগন্নাথকে রামগোবিন কিন্তু পথের ভিখারী করে নাই। তাহাকে তাহার 'ফাঁসিয়াতলা' কামতের কামতি করিয়া সেখানেই তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। রামগোবিন হু হু করিয়া চারিদিকে জমি কিনিতেছিল। ব্যবসায়েও খুব লাভ

হইতেছিল তাহার। কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষপতি হইয়া গেল সে। এই সময়ে আর একটা জিনিস প্রকাশিত হইল যাহা আগে কেহ জানিত না। রামগোবিন জগন্নাথ পাঠকের জমির উপর একটি পাকা বাড়ি বানাইয়া ফেলিল এবং প্রচার করিল যে এইবার সে দেশে গিয়া তাহার 'কনিয়ান্'কে এবং পুত্রকে লইয়া আসিবে। দেশে যে তাহার বউ ছেলে ছিল একথা ঘুণাক্ষরেও সে জানায় নাই কাহাকেও। সকলেই অবাক হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে 'কনিয়ান্' তাহার পুত্র যোগীকে লইয়া আসিয়া পড়িল। স্টেশনে রামগোবিন ছিল না। সে কামতে গিয়াছিল। বয়েল গাড়ি লইয়া হাজির ছিল রংলাল।

বয়েল গাড়ি যখন রামগোবিনের নবনির্মিত পাকা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল তখন অধিকলাল সেই বাড়িরই বারান্দার একধারে বসিয়া লেখা-পড়া করিতেছিল। যোগী নামিল। তাহাব ন্যাড়া মাথায় প্রকাণ্ড একটি টিকি। কানে সোনার মাকড়ি। পরনে হলদে কাপড়। কিছুদিন পূর্বেই তাহার উপনয়ন হইয়াছিল।

সে গাড়ি হইতে নামিয়া অধিকলালকে প্রশ্ন করিল—তুমি কে?

তাহাদের আলাপ অবশ্য হিন্দীতেই হইয়াছিল। আমি বাংলায় তর্জমা করিয়া দিতেছি। অধিকলাল কোনও উত্তরই দিল না। রংলাল শশব্যস্ত হইয়া পড়িল যেন। একটু আগাইয়া আসিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল—"আমার ছেলে বাবুয়া—"

"তোমার ছেলে! তুমি তো আমাদের 'নোকর'—"

"হ্যাঁ, বাবুয়া—"

"নোকরের ছেলে আমাদের বাড়িতে আছে কেন!"

"ও এখানে বসে পড়াশোনা করে। এখনি চলে যাবে—"

অধিকলাল সঙ্গে সঙ্গে বই খাতা গুছাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরে কিছুদূর গিয়া ভাবিল—কোথায় যাইব? আমাদের বাড়িতে তো পড়িবার স্থান নাই। একটা ছোট কুঁড়ে ঘরে কতটুকুই বা স্থান থাকিবে। যতটুকু আছে ততটুকুও তাহার মা চাল-ডাল-ধান-গম প্রভৃতিতে ভরিয়া রাখিয়াছে। রামগোবিনের গোলা হইতে রোজ সে যতটা পারে 'দানা'ই লইয়া আসে, নগদ পয়সা লয় না। কিছুদিন পরে যখন 'দানা'র দাম চড়ে তখন রামগোবিনের গোলাতেই তাহা বিক্রয় করিয়া বেশী পয়সা রোজগাব করে সমুন্দরি।

অধিকলাল রামগোবিনের গোলার একধারে বসিয়া লেখা-পড়া করিত। রামগোবিনকে সে কিছু 'হিসাব' এবং হিন্দী অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। রামগোবিন এখন হিন্দীতে নিজের নামটা সহি করিতে পারে। রামগোবিন রহস্য করিয়া তাহাকে 'গুরুজি' বলিয়া ডাকে। অধিকলাল যদিও মনে মনে রামগোবিনের উপর প্রসন্ন ছিল না, তবু তাহার কেমন যেন একটা ধারণা ছিল রামগোবিনের উপর তাহার একটা অধিকার আছে। কি সে অধিকার, সে অধিকারের বনিয়াদ কত শক্ত তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার মতো বয়স হয় নাই তাহার। কিন্তু যোগীর কথা শুনিয়া এক নিমেষে সে বুঝিতে পারিল রামগোবিনের বাড়িতে বসিয়া তাহার লেখাপড়া করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে রাস্তা ধরিয়া বই খাতা বগলে লইয়া হাঁটিতে লাগিল। স্কুলের দিকেই যাইতে লাগিল সে। হঠাৎ বটগাছটা নজরে পড়িল তাহার। স্কুলের সম্মুখে মাঠের মাঝখান যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে সেই গাছটা। সে গিয়া তাহারই তলায় বসিয়া পড়িল। স্কুলের 'হোমটাস্ক' কয়েকটি অঙ্ক তখনও কষা হয় নাই। পেন্সিলটা কোমরে

গোঁজা ছিল। খাতা বই বাহির করিয়া অঙ্কে মনোনিবেশ করিল সে। সেদিন রবিবার, স্কুলের তাড়া ছিল না। একমনে অঙ্ক কষিতে লাগিল অধিকলাল। অধিকলালের বয়স তখন তেরো বৎসর। আগামীবার সে মাইনর পরীক্ষা দিবে। স্কুলের উজ্জ্বল রত্ন সে। সব বিষয়েই প্রথম হয়। স্কুলেব সমস্ত শিক্ষকই ভালবাসেন তাহাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাহার সম্বন্ধে হতাশ। প্রত্যেকেই জানেন গরীব রংলালের পুত্র অধিকলাল যত বুদ্ধিমানই হোক না কোন, শেষ পর্যন্ত সে তুচ্ছতার অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইবে। মাইনর স্কুলে তাহার বেতন লাগে না, বই খাতাও এখন যাহা লাগে তাহা রংলালের সাধ্যাতীত নহে, কিন্তু তাহার পর? তাহাকে উচ্চতর শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তো রংলালের নাই। স্কুলের শিক্ষকরা এইসব জল্পনা-কল্পনা করিয়া নিজেদের মধ্যে দুঃখ করেন কিন্তু অধিকলাল ইহা লইয়া মোটেই মাথা ঘামায় না। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যেন জানে যে সে উন্নতি করিবেই। যত বাধাই আসুক না কেন সে বাধা সে উত্তীর্ণ হইবেই। কবে কি বাধা আসিবে কেমন করিয়া সে উত্তীর্ণ হইবে এ কথা সে জ্ঞাতসারে ভাবে না, কেবল নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন । সেইদিনই তাহার জীবনের একটা প্রধান ঘটনা ঘটিয়া গেল। অথচ কত সহজেই ঘটিল।

অধিকলাল একমনে অঙ্ক কষিতেছিল। হঠাৎ পেছন হইতে ডাক আসিল—"কি খুদরুয়া যে। এখানে কি করছ!" অধিকলালের ডাক নাম 'খুদরুয়া'। কথাটি সম্ভবত সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' হইতে উৎপন্ন। ইহার বাংলা সংস্করণ 'খুদু'।

অধিকলাল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ডাক্তারবাবুর ছেলে নখু (ভালো নাম নক্ষত্র) এবং তাহার ছোট বোন তনু (ভালো নাম তন্ময়া) দাঁড়াইয়া আছে। নখু অধিকলালের চেয়ে বয়সে ছোট। তাহার চেয়ে নীচের ক্লাসে পড়ে। তনু আরও ছোট, তাহার বয়স মাত্র ছয় বছর। কিন্তু তাহারা ডাক্তারবাবুর ছেলে মেয়ে। চাকরের ছেলে অধিকলাল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্ভ্রমসহকারেই প্রশ্ন করিল—"আপনারা এখানে কেন এসেছেন?"

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। অধিকলাল যে মাইনর স্কুলে পড়িত সে স্কুলে বাংলা হিন্দী দুইই পড়ানো হইত। স্কুলের হেড পণ্ডিত ভূতনাথ শর্মা বাংলা এবং অঙ্ক পড়াইতেন। ভূতনাথ শর্মা একদিন অধিকলালকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ বাবা, তুমি ভালো ছেলে। তোমাকে একটা সৎপরামর্শ দিচ্ছি। হিন্দী তোমার মাতৃভাষা। সেটা এমনই তুমি বাড়িতে শিখতে পারবে। কিন্তু স্কুলে তুমি বাংলাটা শেখ। বাংলা সাহিত্যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে একটি। বাংলা শিখলে তুমি লাভবান হবে।"

অধিকলাল স্কুলে বাংলাই পড়িত এবং ভালো বাংলাও শিখিয়াছিল। সে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের সহিত পরিষ্কার বাংলায় কথা বলিতে পারিত। ডাক্তারবাবুর বাড়ির সকলকেই মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করিত সে। ডাক্তার তপনকান্তি ঘোষ এ অঞ্চলের একজন নামী ডাক্তার। খুব প্র্যাকটিস্, লোকও খুব ভালো। গরীবদের নিকট 'ফি' নেন না। বেশী গরীব লোক হইলে ঔষধের দামও দিয়া দেন। ছেলেবেলায় অধিকলালের একবার নিউমোনিয়া হইয়াছিল। তপনবাবুই তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন বিনা পয়সায়। অধিকলাল দূর হইতেই ইঁহাদের বাড়ির সকলকেই শ্রদ্ধা করিত। কাছে যাইতে সাহস করিত না। ভাবিত উহারা এমন একটা জগতের লোক যেখানে আমরা বেমানান। সে উহাদের সহিত মিশিবারও চেষ্টা করে নাই কোনদিন। নখুবাবু কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া স্কুলে আসে, কাহারও সহিত ঝগড়া বা

মারামারি করে না, তাহার মুখে কখনও সে কোনও খারাপ কথা শোনে নাই। সেও খুব ভালো ছেলে, নিজের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অথচ কোন দেমাক নাই। একটা ভদ্র আভিজাত্য সর্বদা তাহাকে যেন ঘিরিয়া আছে।

অধিকলাল স্কুলের ভালো ছেলে। নখু তাহাকে চিনিত। সকলেই চিনিত তাহাকে।

নখু হাসিয়া বলিল—"তুমি এখানে বসে পড়াশোনা করছ? বাঃ বেশ তো।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে রামগোবিনের ছেলে যোগী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

তনু বলিল—"দাদা, কি করে পাড়বে তুমি বটপাতা। ও তো অনেক উঁচুতে।"

"রামধনিয়া তো বলেছে একটু পরে পেড়ে দেবে!"

তনু মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিল—"না এখুনি পেড়ে নিয়ে চল। তুমি পারবে না?"

"আমি গাছে উঠতে পারি না।"

অধিকলাল বলিল, "আমি পারি। আমি পেড়ে দিচ্ছি। কি হবে বটপাতা নিয়ে?"

"কাল আমরা একটা ছাগল কিনেছি। কি সুন্দর যে সেটা দেখতে। তাকে খাওয়াব। বটপাতা খেতে খুব ভালোবাসে। তুমি দেবে?"

অধিকলাল সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠিয়া গেল এবং উপর হইতে কয়েকটা বটের ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল। আনন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল তনু। তাহার পর অধিকলাল যখন গাছ হইতে নামিয়া আসিল তনু বলিল—"তুমি দাদাকে 'আপনি' বললে কেন! তুমি তো রংলাল মামার ছেলে। তুমি তো আমাদের ভাইয়ে. মতন। ভাইকে কেউ আপনি বলে নাকি!"

তনু হাসিমুখে উত্তরের প্রত্যাশায় অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিল। অধিকলাল কোনও উত্তর দিতে পারিল না একটা উত্তর তাহার মনে আসিয়াছিল—কিন্তু 'আপনারা আমার বাবার মনিব-পর্যায়ের লোক, আপনাদের আমি আমার সমান ভাবিব কি করিয়া'—এ উত্তরটা দেওয়া সে সঙ্গত মনে করিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সে।

নখু বলিল, "খুদরু তুমি এখানে বসেই রোজ পড় তাতো জানতাম না।"

"রোজ পড়ি না। আজই এসেছি। বাড়িতে আমার পড়বার জায়গা নেই।"

তনু বলিল—"তাই নাকি। তুমি আমাদের বাড়িতে চল। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটা তো খালি পড়ে থাকে। সেইখানে তুমি পোড়ো!"

"যেতে পারি। কিন্তু—"

কথাটা কিন্তু অধিকলাল শেষ করিল না।

"কিন্তু আবার কি!" নখু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

"সে তোমার বাবাকে বলব।"

"আমিও বাবুকে বলব। বাবু আমার কথা খুব শোনে—"

তনু গিন্নীর মতো মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিল অধিকলালকে।

তাহার পর বাস্তব সমস্যাটার দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। অধিকলাল বটগাছের উপর উঠিয়া অনেক ডালপালা ভাঙিয়া নীচে ফেলিয়াছিল। এগুলিকে এখন বাড়ি লইয়া যাইবে কে।

"দাদা এগুলো কি আমরা নিয়ে যেতে পারব? যতটা পারি নিয়ে যাই চল। ছিনটুর নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে খুব, সকাল থেকে তো বাঁধা আছে—"

"ছিন্টু বুঝি ছাগলটার নাম?"

অধিকলাল প্রশ্ন করিল।

"হ্যাঁ। পরশু দিন ওটাকে হাট থেকে কিনে আনা হয়েছে, দুটো বাচ্চা সুদ্ধ। মা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। তিন তিনবার দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে, তাই মা ওর নাম রেখেছে ছিন্টু!"

তনু অকৃত্রিম আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

"মা বাচ্চা দুটোরও নাম দিয়েছে ঝিণ্টা আর পিণ্টা—"

আবার হাসি।

নখু বলিল—"চল আমরা একটা করে ডাল টেনে টেনে বাড়ি নিয়ে যাই। তারপরে রামধনিয়া এসে বাকিগুলো নিয়ে যাবে—"

"আমিই সব পৌঁছে দিচ্ছি—"

একটু দূরেই একটা জমিতে বড় বড় 'কসাল' ঘাস ছিল অনেক। অধিকলাল গিয়া একগোছা বড় বড় ঘাস লইয়া আসিল। তাহা দিয়া সব ডালপালাগুলোকে একত্রে বাঁধিয়া ফেলিল সে। তাহার নিজের বই ও খাতা সেই বোঝাটার উপর বাঁধিয়া একটা বুনো লতা জড়াইয়া মজবুত করিয়া ফেলিল বোঝাটাকে। খানিকটা লতা বাড়তি হইয়া একধারে ঝুলিতে লাগিল।

"চল এইবার—"

সেই লতাটা টানিতে টানিতে অধিকলাল নখু ও তনুর অনুসরণ করিল।

রংলাল তখন গোবিনলালের নবাগত পরিবারের ও 'বাবুয়া'র ফাইফরমাশ খাটিতেছিল আর সমুন্দরি রামগোবিনের গোলায় বসিয়া ঝাড়িতেছিল কলাই। তাহাদের ছোট ছেলে আজবলাল লাট্টু ঘুরাইতেছিল। তাহার পড়াশোনায় মন ছিল না। প্রায়ই পাঠশালা হইতে পলাইয়া আসিত। তাহার ছোট বোন দুইটাও নিকটে বসিয়া ধূলামাটি লইয়া খেলা করিতেছিল। একটির নাম সুলিয়া (ভালো নাম সুলোচনা) আর একটির নাম তিলিয়া (ভালো নাম তিলোত্তমা)। এই দুইজনের নামকরণ লক্ষ্মীবাবুর স্ত্রী সুরেশ্বরী করিয়াছিলেন।

ইহারা কেহ বুঝিতেই পারিল না যে অধিকলাল তাহাদের ছাড়িয়া আর একটা নূতন জগতে চলিয়া গেল। তাহার নূতন জগৎ এবং পুরাতন জগতের মধ্যে একটা দোলাও দুলিয়াছিল। সেই দোলায় চড়িয়া নানারকম দোলও খাইতে হইয়াছিল অধিকলালকে।

এ কাহিনী সেই দোলের কাহিনী। যে পটভূমিকায় সেই দোলটা দুলিয়াছিল তাহারই ছবি আঁকিলাম এতক্ষণ।

।। ২ ।।

সর্বাগ্রে তনু লাফাইয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে নখু। নখুর পিছনে অধিকলাল পাতার বোঝাটাকে টানিয়া টানিয়া আনিতেছে। তপনবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া কলে বাহির হইতেছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি ঘোড়ার রাশটা টানিয়া ধরিলেন।

তনু চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবা, তুমি নাম ঘোড়া থেকে। আমরা খুদবুকে ডেকে এনেছি। সে এখানে পড়বে—"

সত্যই ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন তপনবাবু। তনু ছুটিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—"জান বাবা, খুদরুই ছিনটুর জন্যে এইসব বটপাতা পেড়ে দিয়েছে। দেখলাম সে ওই বটগাছটার নীচে বসে পড়ছে। বলছে তার বাড়িতে পড়বার জায়গা নেই। আমি তাকে ডেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের পশ্চিম দিকের ঘরটা তো খালি পড়ে আছে। সেইখানে ও পড়ুক না?"

"বেশ তো। এই ব্যাপার, না আর কিছু?"

"আর কিছু নয়।"

তপনবাবু অধিকলালকে চিনিতেন। সে যে স্কুলে ভালো ছেলে এ খবরও শুনিয়াছিলেন তিনি। বলিলেন—"রংলালের ছেলে তুমি? এতো বড় হয়ে গেছ। বেশ তো আমাদের পশ্চিম দিকের ঘরটায় বসে পড়াশোনা কর—"

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল—"আমাকে আপনি একটা কাজ দিন।"

"কি কাজ! তুমি স্কুলে পড়, তুমি আবার কি কাজ করবে। পড়াশোনা করাই তো এখন তোমার কাজ।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "আমি কাজ করেও পড়াশোনা করতে পারব।"

তপনবাবু তাহার মুখভাবে কেমন যেন একটা জেদের ভাব লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি 'কল' থেকে ফিরে আসি। তারপর ভেবে দেখব তোমাকে কি কাজ দিতে পারি—"

হাসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতা পার হইয়া মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল। খুদরুর কথা শুনিয়া তনু পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমি কাজ করতে চাও? ভালোই তো, আমার কাজ কর না, অনেক কাজ দেব তোমাকে।"

"তোমার কি কাজ!"

"ওমা! আমার আবার কাজ নেই!"

সমর্থনের জন্য নখুর দিকে সে ফিরিয়া চাহিল। নখু বলিল—"হ্যাঁ, যতো সব বাজে কাজ।"

"বাজে কাজ! দোলন-টাঙানো বাজে কাজ। বেশ, যখন টাঙানো হবে তুমি উঠবে না তো!"

"উঠব না কেন, নিশ্চয় উঠব।"

"কেন উঠবে? কতদিন থেকে খোশামোদ করছি, টাঙাবার ব্যবস্থা তো করতে পারনি।"

অধিকলাল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার বলিল, "চল, আমি টাঙিয়ে দেব। কোথায় টাঙাবে?"

"আমাদের বাড়ির পিছন দিকে যে আমগাছটা আছে সেইখানে।"

"শক্ত দড়ি আছে?"

"না। খালি দোলনাটা আছে—"

"আচ্ছা, চল দেখি। দড়ি বাজার থেকে কিনে আনলেই হবে।"

তাহারা সকলে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

তনু নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া একেবারে শোওয়ার ঘরের বারান্দার উপর উঠিয়া ডাক দিল— "দেখ মা, কাকে এনেছি। ছিনুটুর জন্যে খাবারও এনেছি অনেক—।"

তপনবাবুর স্ত্রী ভগবতী বাহির হইয়া আসিলেন।

"ওমা এ কি কাণ্ড! এত বটপাতা খাবে কে! ছিনুটুকে বাইরের মাঠে বেঁধে দিয়ে এসেছে হুকরু। ও কে খুদরু না কি! রংলালের ছেলে! এস বাবা এস—"

অধিকলাল আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা এস। তোমার বাবা তো আজকাল পাঁড়েজির গোলায় কাজ করে?"

"হ্যাঁ—"

তনু বলিল—"ও এইবার আমাদের বাড়িতে থাকবে। পশ্চিমের খালি ঘরটায় পড়াশোনা করবে। আর আমার কাজ করবে।"

"ও তাই নাকি—।"

"হ্যাঁ, বাবাকে বলছি। বাবা বলেছে, বেশ তো। আমার দোলনাটা এখনই টাঙিয়ে দে খদরু।"

"দাঁড়াও আগে দড়ি যোগাড় করি।"

ভগবতী দেবী বলিলেন—"না বাবা দোলনা টাঙিয়ে দিও না। পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে।"

অধিকলাল বলিল—"না, আমি খুব নীচু করে টাঙিয়ে দেব। যদি পড়েও যায় বেশী লাগবে না।"

তনু নিকটে দাঁড়াইয়া অকারণে লাফাইতে লাগিল।

"বেশ তাই দিও তবে!। যা দস্যি মেয়ে—"

"আগে কিছু দড়ি যোগাড় করি।"

"দড়ি দিচ্ছি তোমাকে। কুয়ো থেকে জল তোলবার নারকেলের দড়ি আনানো হয়েছিল, কিন্তু হুকরু বললে পাটের দড়ি চাই। নারকেলের দড়িতে তার নাকি হাতে ফোস্কা পড়ে যাবে। অনেকখানি দড়ি আছে—"

ভগবতী দেবী চঞ্চলপদে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যেও একটা চঞ্চলা বালিকা সর্বদা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, সে বালিকা তাঁহার কন্যা তনুরই সমবয়সী। একগোছা দড়ি লইয়া চঞ্চলপদেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"এই নাও—। এতে হবে তো—"

"হবে। একটু ন্যাকড়াও দিন।"

"ন্যাকড়া কি হবে—"

"খুকু যেখানটা ধরবে সেখানটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে দেব। তাহলে হাতে আর লাগবে না। দড়িটা সত্যিই বড় খর-খরে। আমি ঠিক করে দেব সব।"

একটু পরে দেখা গেল আমগাছে দোলনা টাঙানো হইতেছে। সকলেই লাগিয়া পড়িয়াছে। নখু, তনু, খুদরু এমন কি ভগবতীও। তিনি গাছের উপরও উঠিয়াছেন। মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত।

দোলনা যখন টাঙানো হইয়া গেল তখন তিনিই সর্বাগ্রে দোলনায় বসিয়া একবার দুলিয়া লইলেন।

অধিকলাল বলিল—"আমি এইবার একটু পড়তে বসব। অঙ্ক এখনও বাকি আছে কয়েকটা—"

পশ্চিম দিকের বারান্দাতেই বসিয়া পড়িল সে।

"তুমি বাড়িতে খেতে যাবে না?"

"আমি খেয়ে এসেছি—"

"কি খেয়েছ?"

"ছাতু—"

"দিনে আর কিছু খাবে না?"

"না, রাত্রে একেবারে ভাত খাব।"

একটু পরে সে দেখিল ভগবতী দেবী একটা রেকাবিতে খানিকটা মোহনভোগ এবং চারখানা মাছ ভাজা লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পিছনে পিছনে তনু।

"এ কি!" অবাক হইয়া গেল অধিকলাল।

"ছেলেদের জন্যে করলুম। ডালাবীর থেকে একটা বড় রুই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে দিনু মহলদার। খাওয়াদাওয়া করতে দেরি হবে আজ। নখু বলছে ঘি-ভাত আর দমপোক্ত করতে। তুমিও এখানে খাবে আজ। কেমন? এখন এগুলো খেয়ে নাও।"

অধিকলাল কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। তনু তাহার পিঠের দিকে গিয়া দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

"কোন কথা বলছ না কেন?"

"কি বলব—"

"বল, আচ্ছা।"

"আচ্ছা।"

ভগবতী ধমক দিলেন।

"অসভ্য মেয়ে, নাব ওর কাঁধ থেকে—"

তাঁহার চোখ-মুখ হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেইদিন বেলা দুইটার সময় অধিকলাল যখন বারান্দার একধারে বসিয়া আহারে ব্যাপৃত ছিল তখন সমুন্দরি আসিয়া উপস্থিত। ছেকাছেনি ভাষায় বলিল—"এ কি তুই এখানে। আমি চারদিকে খুঁজে মরছি—"

ভগবতী বলিলেন, "আমরা ওকে আজ 'নেওতা' দিয়েছিলাম। তুই খাবি? অনেক রান্না হয়েছে।"

"নেই মাইজি। আমার সুলিয়া তিলিয়া আজুয়া কেউ খায়নি এখনও—"

"ওদের জন্যেও দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যা।"

তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। সমুন্দরি অধিকলালের খাওয়া দেখিতে লাগিল। ইহাতে আশঙ্কার কিছু ছিল না, তবু একটা অজানা আশঙ্কা তাহার মনে যেন ছায়াপাত করিল।

।। ৩ ।।

অধিকলালের সহিত তপনবাবুর নিভৃতে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাতে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। অধিকলাল থামিয়া থামিয়া সসঙ্কোচে যাহা বলিয়াছিল তাহার মর্ম এই— "আমি আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটায় বসিয়া যদি লেখাপড়া করিবার সুবিধা পাই তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইয়া যাইব। আমার বাড়িতে বা রামগোবিনজির গোলায় বসিয়া আমি পড়াশোনা করিতে পারি না। বাড়িতে স্থানাভাব, রামগোবিনের গোলায় তাহার পুত্র যোগীন্দ্রনাথ আসিয়াই যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা মর্মান্তিক। তাহার ও কথার পর আর ওখানে যাওয়া চলে না। তাই আমি ঠিক করিয়াছিলাম ওই বটগাছটার নীচে বসিয়াই পড়াশোনা করিব। কিন্তু নখু আর তনু আমাকে জোর করিয়া এখানে আনিয়াছে। বলিতেছে, পশ্চিম দিকের ঘরটায় তুমি লেখাপড়া কর। আপনিও সে কথা বলিয়াছেন, মায়েরও আপত্তি নাই, কিন্তু আমার একটি কথা আছে। আপনার অনুগ্রহের আওতায় আমরা চিরকাল বাস করিয়াছি। সে আওতার বাহিরে যাইবার সাধ্য আমার নাই। তবু একটা কথা বলিবার আছে। একেবারে কিছু না করিয়া কেবল আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আপনার বাড়িতে থাকিব ইহাতে আমার মন সরিতেছে না। ইহাতে আমি শান্তি পাইব না। আমি আপনার বাড়িতে থাকিব, কিন্তু আপনি আমাকে একটা কাজ দিন। যে কোনও কাজই আমি পারিব। আপনার ঘোড়ার জন্য মাঠ হইতে রোজ ঘাস আনিতে পারি। আপনার বাগানের কাজও করিতে পারিব আমি। মাইজি যদি আমাকে দিয়ে বাসন মাজাইয়া লন বা আমাকে যদি ঘর ঝাড়ু দিতে বলেন তাহাও আমি সানন্দে করিব। কিন্তু আপনার কোনও উপকারে না লাগিয়া আপনার বাড়ির একটি ঘর দখল করিয়া বসিয়া থাকিব ইহা আমার মোটেই ভালো লাগিতেছে না।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন—"যে সব কাজ তুমি করতে চাইছ তার জন্যে তো আমার লোক আছে। তাছাড়া ওসব কাজ করলে তুমি লেখা-পড়া করবে কখন।"

"রাত্রে—"

তপনবাবু অধিকলালের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন তাহার সঙ্কল্প অটল। বলিলেন, "তাহলে তুমি এক কাজ করো—"

"কি বলুন—"

"আমার লাইব্রেরিটার ভার নাও। তুমি বাংলা জানো তো?"

"জানি। স্কুলে বাংলাই তো পড়ি, হিন্দী পড়ি না। বাংলা আর ইংরেজী।"

"হিন্দীও শেখ। যত ভাষা শিখবে ততই লাভ হবে। তাছাড়া হিন্দী তোমার মাতৃভাষা ওটা শেখা চাইই।"

"হিন্দী বই আমি পড়তে পারি।"

"বেশ তাহলে তুমি আমর লাইব্রেরিটার দেখাশোনা কর। আমি প্রতিমাসেই কিছু কিছু বই কিনি। সব অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে। যে পড়তে নিয়ে যায় সে আর ফেরত দেয় না। তুমি বইগুলোর একটা 'লিস্ট্' তৈরি করে ফেল আস্তে আস্তে। তারপর এক এক রকম বই এক জায়গায় রাখ—"

"বেশ, তাই করব।" খুব খুশী হইল অধিকলাল। তাহার মনের মতো কাজ। "কোথায় আপনার লাইব্রেরি?"

"ওই যে বাগানের ভিতর ছোট আর একটা বাড়ি আছে সেইখানেই। তাতে দুটো ঘর আছে। একটা বড় আর একটা ছোট। বাইরে থেকে কোনও অতিথি এলে ছোট ঘরটায় থাকেন। বড় ঘরটায় লাইব্রেরি আছে। আলমারি টেবিল সব আছে সেখানে—"

তপনবাবু টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটা চাবি বাহির করিয়া দিলেন তাহাকে।

"এই নাও ওই বাড়ির চাবি। লাইব্রেরিতে বসেই তুমি পড়াশোনা করতে পার। পশ্চিম দিকের ঘরে থাকবার দরকার কি। ও ঘরটা আরও নির্জন—"

অধিকলাল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। একটু পরেই সে লাইব্রেরি ঘরটি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল অনেক বই। কুড়িটা আলমারিতে বই ঠাসা! ঘরে কিন্তু চতুর্দিকে ধূলা। ঘরের কোণে কোণে মাকড়শার জাল। সে তৎক্ষণাৎ একটা ঝাঁটা আনিয়া ঘরটা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। একটু পরেই তনু আর নখু আসিয়া হাজির। তনু কপালে চোখ তুলিয়া সভয়ে বলিল, "এখানে কি করছ খুদরু!"

নখু ধমক দিল।

"ফের খদরু বলছিস? মা খুদরুদা বলতে বলে দিয়েছে না?"

তাহার পর খুদরুর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—"আমিও তোমাকে খুদরুদা বলব এখন থেকে। তুমি আমাদের চেয়ে বয়সে বড় কিনা।"

তনু মাতৃআজ্ঞা অমান্য করিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে ভাবটা সামলাইয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"তুমি এ ঘরটা খুলে পরিষ্কার করছ কেন খুদরুদা?"

"আমি এই ঘরেই থাকব। ডাক্তারবাবু বলেছেন। তিনি আমাকে লাইব্রেরিয়ান করে দিয়েছেন!"

"এই ঘরে থাকবে তুমি! এ ঘরে থেকো না। হুকরুকে বাবা এই ঘরে শুতে বলেছিল, সে বললে এখানে আমি কিছুতে শোব না। এখানে হাওয়া আছে।"

"হাওয়া তো সব জায়গায় আছে—"

"হুকরু যে হাওয়ার কথা বলেছে সে হাওয়া মানে ভূত। রাত্রে কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা কয় আর খিক খিক করে হাসে।"

নখু বলিল, "ও সব বাজে কথা খুদরুদা। হুকরুটা গাঁজা খায়। আর গাঁজার ঘোরে যা তা বলে। ও বলছিল সমস্ত গিধারা (শকুনরা) ভূত। দিনের বেলায় পাখি সেজে মড়া খায় আর রাত্তির বেলা জিন হয়ে জ্যান্ত মানুষ খায়। শকুন দেখলেই তাই ও রাম নাম করে—"

এমন সময় হাসিমুখে ভগবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কি হচ্ছে এখানে সব?"

তনু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "খুদরুদা এখানে থাকবে বলছে, বাবা ওকে 'লাইবেলিয়ান' করে দিয়েছে। খুদরুদা এখানে বসেই পড়াশোনা করবে। রাত্রে এখানে শোবে। হুকরু বলেছিল এ বাড়িতে হাওয়া আছে—তাই না?"

"তুই থাম!" এক ধমকে তাহাকে থামাইয়া দিলেন ভগবতী।

তাহার পর অধিকলালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাঃ, তুমি তো ঘরটাকে পরিষ্কার করে ফেলেছ দেখছি। তুমি এই ঘরেই দিনে পড়াশোনা কোরো। কিন্তু রাত্রে এখানে শোওয়া চলবে না। এই একটেরে বাগানের মধ্যে একা ছেলেমানুষ রাত্রে থাকবে কি করে? ওই পশ্চিম দিকের ঘরটাতেই রাত্রে শুয়ো। এখানে রাত্রে ভয় করবে। ও ঘরে খাটিয়াও আছে—"

অধিকলাল শান্ত কণ্ঠে কহিল—"আমার ভয় করবে না।"

"না বাপু দরকার নেই। আমার মনে স্বস্তি থাকবে না তুই এখানে শুয়ে থাকলে। তুই ওই পশ্চিম দিকের ঘরটাতেই শুবি। এখন সব খাবি চল। লুচি ভাজছি। খুদরু তুইও আয়—"

"আমি এখন খাব না। আমি একেবারে ছাতু খেয়ে স্কুলে যাব, রোজ যেমন যাই।"

"তবু দু'একখানা লুচি খাবি আয়।"

ভগবতী জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। রান্না-ঘরের বারান্দায় বসিয়া নখু ও তনুর সহিত সে আট-দশখানা গরম গরম সদ্যভাজা লুচি আলু চচ্চড়ি সহযোগে খাইয়া ফেলিল। খুব ভালো লাগিল। পেটও ভরিয়া গেল। লুচি খাইয়া সে আবার চলিয়া গেল লাইব্রেরি ঘরে। মেঝেতে এবং টেবিলের উপর অনেক ধূলা পড়িয়াছিল। ঝাড়ু দিয়া সে সমস্ত পরিষ্কার করিল। তাহার পর চাবিটা লইয়া সে একটা আলমারি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল উপরের তাকে রবীন্দ্রনাথের অনেক বই। একট বই পাড়িয়া খুলিতেই চোখে পড়িয়া গেল একটা লাইন—"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী। মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি।" যদিও ইহার পুরা অর্থ তাহার বোধগম্য হইল না, কিন্তু তাহার অন্তরতম সত্তা যেন বাজিয়া উঠিল। সেও যেন নীরব সঙ্গীতে বলিতে লাগিল "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তোমার বাঁশরী আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু কি করিয়া যাইব তোমার কাছে—"

সমস্ত কবিতাটা পড়িয়া অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

"খুদরুবা—"

বাহিরে আসিয়া দেখিল সমুন্দরি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ময়লা কাপড়, তাহার মাথায় অপরিষ্কৃত চুলের বোঝা, তাহার চোখের কোণে পিঁচুটি, তাহার হলুদ রঙের দাঁত তাহার চোখ মুখের হিংস্র ভঙ্গী, তাহার ময়লা শতচ্ছিন্ন কুর্তার অন্তরালে তাহার দুগ্ধ-স্ফীত স্তনযুগলের অভব্য প্রকাশ হঠাৎ অধিকলালের চেতনায় এমন একটা আঘাত হানিল যে সে কয়েক মুহূর্তের জন্য মুহ্যমান হইয়া গেল। এই তাহার মা! হাস্যময়ী সুন্দরী স্নেহপরায়ণা সভ্যভব্য ভগবতীর সহিত ইহার তুলনা চলে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে ভগবতী তাহার মা নয়, সমুন্দরিই তাহার মা।

"তুই খেতে গেলি না? স্কুলে যাবি না?"

"এখনি স্কুলে যাচ্ছি। এখন আর খাব না। মাইজি আমাকে লুচি খাইয়েছে—"

"লুচি! সেদিন পোলাও খেয়েছিস, আজ লুচি খাচ্ছিস, ব্যাপার কি! মাইজি তোকে 'দুলহা' (জামাই) বানাবে না কি!"

অধিকলালের চোখের দৃষ্টি দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে সে কোন কথা বলিল না। তবু তাহার চোখে মুখে যাহা ফুটিয়া উঠিল তাহার অর্থ—মুখ সামলে কথা বল।

অধিকলাল লাইব্রেরি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল সমুন্দরি খোলা দ্বারটার দিকে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ময়লা আঁচলের আড়াল হইতে বাহির করিল ময়লা

গামছায় বাঁধা একটা পুঁটুলি। সেই পুঁটুলিটা সজোরে সে ছুঁড়িয়া দিল ঘরের মধ্যে। তাহার পর দুম দুম করিয়া চলিয়া গেল। অধিকলাল ঘরের ভিতর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পুঁটুলিতে কি আছে সে তাহা জানিত। তবু আগাইয়া গিয়া খুলিয়া দেখিল। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহাই ছিল পুঁটুলির ভিতর। এক ডেলা বুটের ছাতু, তাহার ভিতর একটা কাঁচা লঙ্কা গোঁজা। ছাতুর ডেলাটা হাতে করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। যদিও তাহার ক্ষুধা ছিল না, তবু সে সেটা খাইয়া ফেলিল। তাহার কেমন যেন মনে হইতে লাগিল না খাইলে অন্যায় হইবে।

।। ৪ ।।

তপনবাবু অধিকলালকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যতই তাহাকে দেখিতেছিলেন ততই ভালো লাগিতেছিল। স্কুলে খবর লইয়া জানিয়াছিলেন যে সে প্রতি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকাব করে। অথচ অন্য কাজ করিতেও কম পটু নয়। একদিন সহিস আসে নাই, সেদিন সে ঘোড়াব ঘাসও আনিয়া দিয়াছিল। লাইব্রেরিটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া গুছাইয়া ফেলিযাছে। একদিন দেখিলেন বাগানে গাছের গোড়াগুলিও খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া দিতেছে। হকরুরই ইহা করিবার কথা, কিন্তু সে প্রায়ই এ কাজে ফাঁকি দেয়। সকালে নখু এবং তনুরও পড়া বলিয়া দেয় অধিকলাল। তাহাদের লইয়া খুব সকালেই পড়িতে বসিয়া যায় সে। নিজের পড়া রাত্রে পড়ে লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া। তাহার একটা জীর্ণ লণ্ঠন ছিল। কাচটা ফাটা, চিমনি ধোঁয়ায় কালো। তপনবাবু তাহাকে ভালো একটা আলো কিনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মনের নেপথ্যলোকে আর একটা বাসনাও অঙ্কুরিত হইয়াছে। মাইনার স্কুলের হেডমাস্টার হরিপদবাবু একদিন দুঃখ করিয়া তাঁহাকে বলিযাছিলেন—"অধিকলাল একটি জুয়েল। কিন্তু দারিদ্র্য-দোষ ওর গুণরাশিকে মলিন করে দেবে। ওকে 'হাইয়ার এডুকেশন' দেবার ক্ষমতা তো রংলালের নেই। আমাদের দেশে সদাশয় লোকেরও অভাব। বিদ্যাসাগর একটাই জন্মেছিল এ দেশে—"

হরিপদবাবুর এসব কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু কিছু বলেন নাই। তিনি বরাবরই স্বল্পভাষী লোক। কিন্তু তাঁহার মনের নেপথ্যলোকে একটা সঙ্কল্পেব অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। তাই রংলাল যখন একদিন তাঁহাকে বলিল—"খুদরু কয়েকদিন থেকে বাড়ি যাচ্ছে না, আপনার এখানেই আছে। আপনি কি ওকে কোনও কাজে বাহাল করেছেন?"

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"হ্যাঁ। ও এখন এইখানেই থাকুক।"

রংলাল ইহার উত্তরে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মুখ কাচুমাচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ তাহার পর মাথা চুলকাইয়া প্রশ্ন কবিল—"ওর মা বলছিল ওর 'তলব্' (মাইনে) যদি কিছু ঠিক করে থাকেন—"

"সেটা ঠিক করেছি। কিন্তু কাউকে বলিনি এখনও। বলবার দরকারও নেই আপাতত—"

রংলালের মুখ আরও কাচুমাচু হইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুও চলিয়া গেলেন নিজের ডিসপেন্সারিতে। ডিসপেন্সারি হইতে তিনি 'কলে' বাহির হইয়া গেলেন। সমুন্দরি আর সহজে তাঁহার নাগাল পাইল না। কিন্তু সে ছাড়িলও না। সে ভগবতীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"মাইজি আপনি খুদরুবাকে 'যতন' করে রেখেছেন এটা তো ওর 'বড়া ভাগ' (মহাভাগ্য), কিন্তু মাইজি, আমরা

'গরিবগুর্বা' 'দুখ-ধান্দা' করে দিন চালাই। ওকে দিয়ে আপনি যত খুশি কাজ করান, ও সব কাজ করতে পারবে, কিন্তু ওর একটা 'তলব্' ঠিক করে দেন। বিনা তলবে ও আপনার বাড়িতে খাটবে কি করে?"

ভগবতী একটু হাসিয়া ভদ্রভাবেই বলিলেন, "কিন্তু আমরা তো ওকে চাকর বাহাল করিনি। ও আমাদের এখানে এসেছে নিরিবিলিতে পড়বে বলে। ও বললে ঘরে ওর পড়বার জায়গা নেই। তাই আমরা ওকে এখানে থাকতে দিয়েছি। কাজকর্ম যা করে তা ও নিজের খুশি মতো করে। আমাদের তো কাজ করবার চাকর আছেই। ও বাড়ির ছেলের মতো আছে এখানে।"

"সেদিন কে বললে ও আপনাদের ঘোড়ার জন্যে ঘাস 'ছিলে' এনেছে। আপনার খোকাবাবু কি ঘোড়ার ঘাস গড়ে?"

"আমার খোকা তো কিছুই পারে না। পড়াশোনাতেও ও কি খুদরুর মতো? খুদরু লেখাপড়তেও যেমন, কাজকর্মেও তেমন। ছেলে তোমার খুব ভালো। আমবা ওকে 'নোকর' করে বাহাল করিনি, ওর পড়াশোনার সুবিধে হবে বলে আমাদের লাইব্রেরিতে ওকে থাকতে দিয়েছি।"

"কিন্তু মাইজি, গরীবেব ছেলের লেখাপড়া শিখে 'নাফা' কি?"

"অনেক 'নাফা'। ভালো করে লেখাপড়া শিখলে অনেক উন্নতি হবে। বড় চাকরি হবে, সবাই খাতির করবে--"

"হামাদের মতো গরিবগুর্বাদের তা কি হবে? বড়লোকের ছেলেরাই হাকিম, তাকিম হয়। গরীবের ছেলেরা মেহনতী কাম করে। কুয়া থেকে জল তোলে, বরতন মলে, ঘোড়ার ঘাস 'গড়ে' কুলি মজুর হয় এই তো বরাবর দেখে আসছি মাইজি—"

"সে কাল আর নেই। এখন গরীবের ছেলেরাও লেখাপড়া শিখে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে। ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জজ, ব্যারিস্টার এমন কি মিনিস্টারও হচ্ছে। খুদরু খুব ভালো ছেলে, আমার বিশ্বাস ও যদি পড়বার সুযোগ পায় তাহলে ও অনেক উন্নতি করবে।"

"কিন্তু আমার 'মাইজি' ভয় করে। ছেদির ছেলে ম্যাট্রিক পাস করেছে। কিন্তু হাকিমও হয়নি 'হুকিমও' হয়নি। হয়েছে একটা বদমাশ লুচ্যা। 'না ঘাটকা, না ঘরকা।' ছেদির মতন বরতনও মলতে পারে না, কোথাও নোকরিও হয় না। গুণ্ডা হয়েছে একটা। তাড়ি খায়, বউকে মারে, আর 'চোরি ডাকাইতি' করে ফুটানি করে। পাঁড়েজির গোলাতে 'সিন' কেটে চোরি হয়েছিল, শুনেছি ছেদির ব্যাটা পর্মা নাকি সে দলে ছিল। কাল পুলিশে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। লিখা-পড়া শিখার তো এই হালৎ।"

ভগবতী হেসে বললেন, "সবাই কি একরকম হয় নাকি। দুনিয়ায় যে এত চোর বদমাইশ তারা কি সবাই ম্যাট্রিক পাস? তোমার খুদরু খুব ভালো ছেলে হবে, দেখো—"

"না মাইজি। আমার ডর লাগে। গরীবের ছেলে গরীবের মতো মানুষ হওয়াই ভালো। তোমার এখানে পুরি হালুয়া খেয়ে ওর চাল বেড়ে যাবে, তখন ও আমাদের পুছবে না। আমি ওকে আজই বাড়ি নিয়ে যাই।"

তনু এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। এই কথায় সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"না, খুদরুদা যাবে না—"

সমুন্দরি এক মুখ হাসিয়া দুই হাত বাড়াইয়া ডাকিল "আবো খোখি, আব—"

"তুমি খুদরুদাকে নিয়ে যাবে না—"

"আমি যে ওর মা। ও আমার কাছে থাকবে না!"

"না! ও আমাদের কাছে থাকবে। ও আমাকে খরগোশ এনে দেবে বলেছে—"

"খরগোশ আমিই এনে দিব। আজুয়া স্টেশন মাস্টারজির বাড়ি থেকে একটা মেঙে (চেয়ে) এনেছে। আমাকে বড় দিক করে। সেইটেই তোমাকে দেব আমি—"

"তা দিও। খুদরুদা কিন্তু যাবে না। আমি যে ওর কাছে পড়ি—"

"কি পড়—"

"অ আ ক খ—"

ভগবতী বলিলেন, "ওদের পড়াবার জন্যে ভূতনাথবাবু আসেন। ওরা কিন্তু খুদরুর কাছে পড়তেই ভালোবাসে। দিনরাত তো ওর সঙ্গেই আছে—"

সমুন্দরি অনুভব করিল এখানে আর অধিক সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাহাকে গোলাতে গিয়া এখন অনেক 'গহুম' ফটকাইতে (কুলা দিয়া ঝাড়িতে) হইবে। এ বিষয়ে বোঝা-পড়া করিতে হইলে অধিকলালের সহিতই কথাবার্তা বলা উচিত।

"খুদরুবা কোথা?"

"লাইব্রেরিতে আছে বোধহয়। আজ তো ছুটির দিন। ওইখানেই আছে—"

অধিকলাল লাইব্রেরি ঘরেই ছিল। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুইটি চরণে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিল সে।

ডাকে বার বার ডাকে
শোন রে, দুয়ারে, দুয়ারে, আঁধারে আলোকে।

কথাগুলি সহজ। কিন্তু অর্থটা তো খুব সরল নয়। আঁধারে আলোকে, দুয়ারে দুয়ারে,—বার বার কে ডাকিতেছে? কেন ডাকিতেছে? সে ডাকের ভাষা কি? তাহা কি কান দিয়া শোনা যায়? কই সে তো শুনিতে পায় না। অথচ ইহাও সে অনুভব করে একটা অবিশ্রান্ত আহ্বান তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জরন করিয়া ফিরিতেছে। সে আহ্বান কাহার, কি করিয়া সে আহ্বানে সে সাড়া দিবে এই দুরূহ সমস্যায় সে যখন নিমগ্ন তখন আর একটা কবিতার দুইটা লাইন তাহার চোখে পড়িল।

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

আরও সব গোলমাল হইয়া গেল যেন। আপন হতে বাহির হওয়া যায় নাকি! গেলেও বাহিরে দাঁড়ানো কি সম্ভব? এ সবের কোনও সদুত্তর তাহার মাথায় আসিতেছিল না। কিন্তু ইহাও সে অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না যে তাহার মনের নেপথ্যলোকে অস্পষ্টভাবে কি যেন একটা রূপ-পরিগ্রহ করিবার আকুলতায় উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। আরও একটা গান চোখে পড়িল—

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।

এ সবের অর্থ কি? অর্থ যে আছে তাহা তাহার অন্তর্যামী আভাসে অনুভব করিতেছে। কিন্তু—।

"খুদরু—।"

দ্বারপ্রান্তে সমুন্দরি আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোক হইতে চ্যুত হইয়া অধিকলাল হতভম্ব হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত।

"খুদরুবা—"

গীতবিতান আলমারিতে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল অধিকলাল।

"কি বলছ—"

"তোমার ব্যাপার কি? তুমি দিনরাত এখানে পড়ে আছ কেন?"

"এখানে আমি নোকরি করি।"

" নোকরি কর? 'তলব' কত?"

"তলব টাকায় পাই না। কিন্তু এমন একটা ভালো ঘর পেয়েছি পড়াশোনা করবার জন্য। মাইজি খেতেও দেন। এটাই কি কম?"

"এতে আমাদের কি 'নাফা'? রামদাসের বেটা ভুট্টা রোজ জাহাজঘাটে কুলিগিরি করে মায়ের হাতে নগদ পয়সা এনে দেয় কোনদিন এক টাকা কোনদিন দেড় টাকা।"

"আমি সে সব পারব না। রামগোবিনের পায়ে তেল দিয়ে কুলিগিরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তুমি কি করবে তাহলে—"

"আমি পড়ব।"

"পড়বে? পড়ে তোমার কি 'পুছড়ি' (ল্যাজ) বেরুবে, না দশটা হাত গজাবে?"

সমুন্দরির চোখের দৃষ্টিতে একটা কুৎসিত ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল। অধিকলাল কোন উত্তর দিল না। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সে কপাটে খিল লাগাইয়া দিল। হিংস্র দৃষ্টিতে সমুন্দরি চাহিয়া রহিল সেই বন্ধ দ্বারের দিকে। তাহার পর আগাইয়া গিয়া কপাটে দুম দুম করিয়া কিল মারিতে লাগিল।

"কপাট খুলবি কি না—"

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কপাটে আরও কয়েকবার ধাক্কা মারিল সমুন্দরি। কিন্তু বদ্ধদ্বার খুলিল না। যদি খুলিত সমুন্দরি দেখিতে পাইত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অধিকলাল কাঁদিতেছে।

॥ ৫ ॥

কয়েকদিন পরে রামগোবিন শাস্ত্রী আসিয়া তপনবাবুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রামগোবিন যখন লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে চাকরি করিত তখন দরকার পড়িলে (অর্থাৎ হকরু অন্তর্ধান করিলে) তপনবাবুর বাড়িতেও তাহাকে চাকরের কাজ করিতে হইত। এখন ব্যবসা করিয়া সে প্রচুর ধনোপার্জন করিয়াছে কিন্তু সে যে একদিন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চাকরের কাজ করিয়াছিল একথা সে ভোলে নাই। ইহাও সে মনে মনে সন্দেহ করিত যে তাহার এই ব্যবসায়ের ভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত তাহা আর কেহ না জানুন ডাক্তারবাবু জানেন। তিনি এ

অঞ্চলে অনেকদিন হইতে ডাক্তারি করিতেছেন, সকলের সহিতই তাহার পরিচয় আছে, এখানকার স্টেশন মাস্টার, দারোগা, পোস্টমাস্টার, জমিদারের আমলারা সকলেই তাঁহার পরিচিত। সুতরাং রামগোবিনের আঙুল ফুলিয়া কলা-গাছ হওয়ার রহস্যটা নিশ্চয়ই তাহার অবিদিত নাই। তাছাড়া রামগোবিনও বহুভাবে তাঁহার নিকট উপকৃত। এখনও তিনি বিনা পয়সায় তাহার চিকিৎসা করেন। এই সব কারণে রামগোবিন যখনই তপনবাবুর নিকটে আসে তখনই তাহার চোখে-মুখে একটা ভিজা-বিড়াল গোছ ভাব ফুটিয়া ওঠে।

সে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তপনবাবু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি শাস্ত্রীজি, খবর কি তোমার। ব্যবসাপত্তর ভালো চলছে তো?"

"হাঁ হুজুর। আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে একরকম।"

"অনেকদিন পরে এসেছ আজকে। কোনও দরকার আছে না কি?"

"জি হুজুর। ওই খুদরুবার ওয়াস্তে (জন্যে) এসেছি। ওর মা—রংলালের জেনানি সমুন্দরি—বড় হাল্লা মাচাচ্ছে—"

"কেন, কি ব্যাপার?"

"খুদরুবা খুব তেজ লেড়কা। ওর কাছে আমি অছ্ছর (অক্ষর) শিখেছি। ওকে আমি গুরুজি বলি। তাই আমি সমুন্দরিকে বলেছিলাম ও যদি আমার ছেলে যোগীনাথকে পড়ায় তাহলে ওকে আমি মাসে পন্দ্রহ (পনের) রুপিয়া কোরে তলব দিব। সমুন্দরি তখন বললে ও আপনার ছেলেমেয়েকে নাকি পড়ায়—তখন আমি বললাম—তাহলে আমি ওর ভিতর পড়ব না—"

তপনবাবু বলিলেন, "না, খুদরু তো আমার ছেলেমেয়েকে পড়ায় না। ভূতনাথবাবু ওদের পড়ান। তিনি খুদরুকেও পড়িয়ে দেন—"

"তাহলে খুদরুকে আমি বহাল করতে পারি কি?"

"খুদরু যাবে না। সে পড়তে চায়—"

"আপনার বাড়িতে থাকে কেন?"

"একদিন এসে আমাকে বললে আমার পড়বার জায়গা নেই বাড়িতে, তাই আমি গাছতলায় বসে পড়ছিলাম, নখু আর তনু আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি তখন বললাম বেশ তুমি এখানেই থাক, আমার লাইব্রেরি ঘরটা খালি পড়ে থাকে সেইটেকেই তুমি তোমার পড়ার ঘর কর। সেই থেকেই ও আছে এখানে। নখুর মা ওকে খেতে টেতে দেয় তাই আর বাড়ি যাওয়ার দরকার করে না ওর।"

রামগোবিন হাতজোড় করিয়া চোখ বুজিয়া শুনিল সব। তাহার পর বলিল—"আপনি হুজুর মহাত্মা লোক, বড়া আদমী। আমরা সব 'মুরুখ্' (মূর্খ)—তবু একঠো বাত আপনাকে বলচি। দুব্রি (দূর্বা) কখনও পিপর (বট) হবে না। খুদরু হচ্ছে দুব্রির জাত তাকে পিপর করবার চেষ্টা করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। দুব্রি দুব্রিই থাকবে কভি (কখনও) পিপর হোবে না। আপনি ওকে ছোড়িয়ে (ছেড়ে) দিন।"

তপনবাবু হাসিয়া বললেন,—"আমি তো ওকে জোর করে ধরে রাখিনি। ও নিজেই এসেছিল, আমি ওকে থাকতে দিয়েছি। এখন বলতে পারি না তুমি চলে যাও। ছেলেটি সব দিক থেকেই ভালো। ওর সঙ্গে অভদ্রতা করব কি করে? ও নিজে যদি চলে যায় আমি

আপত্তি করব না। কিন্তু ওকে তাড়িয়ে দিতে পারব না আমি। দুব্‌রি আর পিপরের যে উপমাটা তুমি দিলে মানুষের বেলায় তা খাটে না। মানুষের বেলায় অনেক 'দুব্‌রি' 'পিপর' হয়েছে এ কথা অনেকেই জানে। তোমার কথাই ধর না, তুমিও তো দুব্‌রি ছিলে, এখন কত বড় হয়েছ। যদি লেখাপড়া জানতে আরও বড় হতে। আমার বিশ্বাস খুদরু অনেক বড় হবে—"

রামগোবিন হাত জোড় করিয়া নীরব রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"আর একটা 'বাত' আছে ডাক্তারবাবু। ও দিনরাত এখানে পড়ে থাকে, মা বাপের কাছে একবারও যায় না। ওর মায়ের বুকে বড় 'চোট্' লাগে এজন্য। হাজার হোক ছেলে তো—"

"আচ্ছা, আমি ওকে বলে দেব মায়ের কাছে রোজ যেন যায়। আসল কথা কি জান রামগোবিন, এসব জিনিস জোর জবরদস্তি করে হয় না, মায়ের কাছে ছেলে যাচ্ছে না, এর নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে, কারণটা কি তা আমরা জানি না, অনেক সময় বাইরে থেকে সেটা বোঝাও যায় না, কিন্তু কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, আমি ওকে বলে দেব, মায়ের কাছে যেন ও যায়।"

রামগোবিন দেখিল ডাক্তারবাবু যাহা বলিতেছেন তাহা 'ওয়াজিব', সুতরাং যুক্তি দিয়া তাহা খণ্ডন করা যাইবে না। আর একটা কথা তাহার মনে হইল, সেইটাই বলিল সে।

"খুদরু লেখাপড়া শিখলে হয়তো বড় হবে। কিন্তু ওকে পড়াবে কে। কলেজের পাস না হলে তো 'উঁচা-দরজার কাম' পাবে না। কিন্তু ও রংলালের ছেলে, ওকে পড়াবে কে বলুন?"

"ভালো ছেলেরা অনেক সময় 'জলপানি' পায়, অনেক সময় তাদের মাইনেও মাপ হয়ে যায়। এর উপর কেউ যদি সামান্য কিছু খরচ করে ওকে সাহায্য করে তাহলেই হয়ে যাবে—"

"কিন্তু কে করবে, সেই তো মুশকিল—"

"রংলাল তোমার বন্ধু, এখন তোমার গোলায় চাকরি করে, ভগবানের দয়ায় তোমার ব্যবসাও ভালো চলছে, তুমিই ইচ্ছে করলে ওকে সাহায্য করতে পার। এই ভালো কাজটি করলে ভগবান তোমার ভালো করবেন, খুদরুও চিরকাল তোমার গুণ গাইবে, সুযোগ পেলে তোমাকে সাহায্যও করবে—"

রামগোবিন যদিও বলিয়া উঠিল, "ই তো ঠিক বাত, ই তো ঠিক বাত"—কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সে একটু বেকায়দায় পড়িয়া গেল।

তপনবাবু বলিলেন—"দেখো রামগোবিন, ভগবান কাকে যে কখন কিভাবে সাহায্য করেন তা আমরা বলতে পারি না। তাই খুদরুকে পরে কে পড়াবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই এখন। ও এখান থেকে পরীক্ষাটা তো আগে পাস করুক, তারপর দেখা যাবে।"

রামগোবিনকে এ কথাতেও সায় দিতে হইল। ইহার পর কিন্তু সে আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না। ডাক্তারবাবু আবার তাহাকে কি প্যাঁচে ফেলিয়া দিবেন কে জানে। রংলালের ব্যাটা খুদরুবাকে কলেজে পড়ার খরচ দিতে হইলেই তো হইয়াছে! অথচ ইহাও সে মনে মনে জানে যে ডাক্তারবাবু যদি জিদ ধরিয়া বসেন তাহাকে দিতেই হইবে। ডাক্তারবাবুর কথা অমান্য করিবার সাধ্য তাহার নাই।

ডাক্তারবাবুর কথায় খুদরু তাহার পর দিনই সকালে তাহার মায়ের সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল তাহার মা ছাতু পিষিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার মা যে ভাষায়

তাহাকে সম্বোধন করিল সে ভাষায় সে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত। এই তীক্ষ্ণ ছেকা-ছেনি ভাষা গালাগালিতে শ্লেষে ব্যঙ্গে অতিশয় সমৃদ্ধ। সমুন্দরি অধিকলালের দিকে একনজর চাহিয়া দেখিল তাহার পর শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"কি রে বড়া আদমীর কুত্তা। এখানে এসেছিস কেন। 'লাত' (লাথি) মেরে তাড়িয়ে দিলে না কি—।"

যে সমাজে তাহার জন্ম সে সমাজে এই ধরনের ভাষাতেই সকলে কথা কয়। অধিকলাল এ ধরনের ভাষা অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু বিস্মিত হয় নাই। আজ সে সহসা বিস্মিত হইল। আজ সে সহসা উপলব্ধি করিল তাহার এবং তাহার মায়ের মাঝখানে একটা দুস্তর নদী যেন বহিয়া চলিয়াছে। সে নদী পার হওয়া শক্ত, পার হইবার ইচ্ছাও তাহার নাই। এই কয়দিনে শুধু তাহার বাহিরের চেহারা নয়, মনের চেহারাও যেন বদলাইয়া গিয়াছে। ভগবতী তাহাকে আলাদা একটি সাবান দিয়াছেন, চিরুনিও দিয়াছেন। তাহাকে রোজ নিজের জামা-কাপাড় সাবান দিতে হয়, মাথা আঁচড়াইয়া মাথা পরিষ্কার করিতে হয়। নিজেই তিনি একদিন তাহার মাথা আঁচড়াইয়া উকুন বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—দেখ, তোর মাথায় কত 'ঢিলা' (উকুন) আছে। রোজ যদি ভালো করে আঁচড়াস সব চলে যাবে। তাহাদের সকলের মাথাতেই 'ঢিলা' আছে এ কথা সে জানে, তাহার মা-ও জানে, কিন্তু তাহার মা ইহা লইয়া কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করে নাই। মাঝে মাঝে তাহার মা তাহার বোনদের এবং ছোট ভাইটাকে লইয়া পড়ে, তাহাদের মাথা হইতে 'ঢিলা' 'চুনিয়া' সেগুলি পুটপুট মারিয়া ফেলে। সে যখন ছোট ছিল তখন তাহারও মাথা হইতে সমুন্দরি ঢিলা বাছিয়াছে। কালুয়ার মায়ের সহিত পরনিন্দা এবং পরচর্চা করিতে করিতে এই ধরনের অবসর-বিনোদনের বহু চিত্র তাহার মনে আঁকা আছে। কিন্তু ইহার সহিত ভগবতী দেবীর স-স্নেহ সভ্য আচরণের তফাৎ যে কতটা—টুকটুকে লাল যে সরু চিরুনিটি তিনি তাহাকে দিয়াছেন তাহার পিছনে বর্ণবহুল যে সংস্কৃতির আভাস সে দেখিতে পাইয়াছে—তাহার মূল্য যে কি তাহা সে বুঝিতে ভুল করে নাই। কিন্তু তবু— । হ্যাঁ, তবু। ডাক্তারবাবুর কথাগুলো তাহার মনে পড়িল—'তবু ওই তোমার মা। ওর মনে কষ্ট দিলে তোমার পাপ হইবে। মায়ের আশীর্বাদ না পাইলে জীবনে বড় হইতে পারিবে না। মা-বাবাকে খুশী রাখিতে হইবে। আমার এখানে থাকিয়া তুমি লেখাপড়া কর। আমার এখানে খাওয়া-দাওয়াও কর। কিন্তু মা-বাবার মনে দুঃখ দিও না। তুমি রোজ সকালে গিয়া মা-বাবাকে প্রণাম করিয়া আসিবে। মা যাহা খাইতে দিবে তাহা খাইবে। লোকে যেন না মনে করে আমি তোমার মা-বাবার নিকট হইতে তোমাকে ছিনাইয়া আনিয়াছি। তাহা করিবার মোটেই ইচ্ছা নাই আমার। সন্তানকে মা-বাবার নিকট হইতে কাড়িয়া আনিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না। তুমি বড় হও, কিন্তু মা-বাবার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিও না।"

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া একছুটে বাহির হইয়া গেল।

"ই কি ঢং ছে—।" (এ আবার কি ঢং।) সমুন্দরি অবাক হইয়া তাহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রংলাল জাহাজ-ঘাটে কুলি খাটাইতেছিল। সে-ও অবাক হইয়া গেল যখন অধিকলাল তাহাকে প্রণাম করিয়া ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। তাহার মনে হইল—এ কি ব্যাপার! ছেলেটার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি।

।। ৬ ।।

পৃথিবীতে সব অনিবার্য ঘটনাকে মানুষ শেষ পর্যন্ত মানিয়া লয়। ভূমিকম্প, ঝড় বা বন্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই ইহা সবাই জানে। গভীর শোকও মানুষ সহ্য করে। আমরা প্রথম প্রথম কষ্টে কাতর হই বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কষ্টের তীক্ষ্ণতা কমিয়া আসে। অধিকলালের সহিত যখন তাহার মা-বাবার সম্বন্ধ শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া আসিতে লাগিল, যখন তাহারা বুঝিল যে অধিকলাল কিছুতেই তাহাদের মতো আর জনমজুরি কামাইবে না, সে 'বাবুভেইয়া'দের দলে গিয়া মিশিয়াছে, 'অংরেজি' শিখিয়া হাকিম বনিবার ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আর এ ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর মতো লোক যখন তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—তখন ব্যাপারটাকে তাহারা মানিয়াই লইল। রংলাল ভাবিল অধিকলাল যদি মরিয়াই যাইত, (ছোটনের অত বড় ছেলেটা তো মাঠে গরু চরাইতে গিয়া সাপের কামড়ে মারা গেল) কিংবা যদি নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত (বিশুর বড় ব্যাটা ঘিসু একটা আড়িকাঠির পাল্লায় পড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না)—এসব হইলে কি করিত সে? কিছুই করিত না। এখন বরং অধিকলালকে সে চোখের সামনে দেখিতে পায়। প্রণাম করিবার জন্য কাছেও আসে একবার।

এই প্রণাম রহস্যটা সে সমাধান করিয়াছে। অবশেষে ডাক্তারবাবুর আদেশেই অধিকলাল রোজ প্রণাম করিতে আসে। ইহাতে ডাক্তারবাবুর উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। সমুন্দরির মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ। সে দ্বিতীয় দিনই অধিকলালকে এক ধমকে ভাগাইয়া দিয়াছিল। ওসব ঢং তাহার ভালো লাগে না। নিজের ছেলে পর হইয়া গিয়া এখন 'পরনামের' ভড়ং করিতে আসিয়াছে। অধিকলাল কিন্তু অত সহজে ভাগে নাই। বরং সে একটা মজা পাইয়া গিয়াছিল যেন। সে রোজ উঠানে ঢুকিয়া দূর হইতেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বলে "পরনাম মাই—"। সঙ্গে সঙ্গে সমুন্দরি মুখে গালির তুবড়ি ছুটাইয়া তাহার পিছু পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারে না। সে যখন নাগালের বাহিরে চলিয়া যায় তখন সমুন্দরির মুখেও একটা হাসি ফোটে। এমন কি সে রোজ মনে মনে প্রতীক্ষাও করে খুদরুবা প্রণামের ঢং করিতে কখন আসিবে।

মোট কথা খুদরুবা যে তাহাদের ছাড়িয়া তপনবাবুর বাড়ির লোক হইয়া গিয়াছে, তাহার চাল-চলন কথা-বার্তা 'রহন-সহন' এমন কি চেহারাটাও যে বাঙালীবাবুদের মতো হইয়া গিয়াছে এই সত্যটা সমুন্দরির কাছে প্রথমটা যত মর্মান্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন ততটা মর্মান্তিক আর নাই। রংলালের নিকট কোনদিনই ইহা ততটা দুঃখদায়ক ছিল না। সে সরল মানুষ। সে বুঝিয়া লইয়াছিল ভগবান যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য করেন। খুদরুর ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। ডাক্তারবাবুর মতো লোকের নজরে যখন সে পড়িয়াছে তখন ভালোই হইবে আশা করা যায়।

খুদরুবা নিশ্চিন্ত চিত্তে পড়াশোনায় মন দিল। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তাহাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতে লাগিল। অবসর পাইলেই সে রবীন্দ্রনাথের বই লইয়া বসিত। সেদিন সে তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল ঃ

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাস ভরে
বন্ধুর শিলাসরণে
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ-হৃদয়-হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুলুকুলু সুর
ফুটে অবিরল তরল মধুর
সদা শিঞ্জিত মানিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।

সব কথার অর্থ তাহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। কিন্তু ছন্দের সুরে সে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বারান্দায় ধুপধাপ শব্দ শুনিয়া হঠাৎ তাহার সুর কাটিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলিয়া এবং তিলিয়া—তাহার দুই বোন—দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উঁকি দিল।

"তোরা কি করছিস এখানে—"

খুদরু বাহির হইয়া আসিল। দেখিল সুলিয়া আর তিলিয়া তনুর দুইটি পুরাতন ফ্রক গায়ে দিয়াছে। অদূরে আজুয়াও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার গায়ে নখুর একটি পুরাতন কামিজ। তিলিয়া একমুখ হাসিয়া তাহার ফ্রকটি দেখাইয়া বলিল—"মাইজি দেলকে।" একটু পরে সমুন্দরিও বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—"চল্, ঘর চল্।" খুদরুর কান দুইটি গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমুন্দরির দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি মাইজির কাছে ভিখ মাংতে এসেছিলে নাকি!" সমুন্দরি ছেকাছেনি ভাষায় যে জবাব দিল তাহা বেশ ঝাঁঝালো। তাহার মর্ম—'আমার সমর্থ ছেলে আমাদের দিকে ফিরে তাকায় না। বড়লোকের দেওয়া কাপড় জামা পরে, বড়লোকের বাড়িতে থেকে অংরেজি পড়ছে, নিজের আখের দেখছে, আমাদের দিকে, নিজের ভাই-বোনদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আমার কপাল পোড়া, তাই আমাকে 'ভিখমাংনি' (ভিখারিনী) হতে হয়েছে—চল্ চল্—ঘর চল্—"

গরু ছাগলকে লোকে যেমন করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যায় সমুন্দরি তিলিয়া, সুলিয়া এবং আজুয়াকে তেমনিভাব তাড়াইয়া লইয়া গেল। যাইবার পূর্বে সে খুদরুবার দিকে যে দৃষ্টি হানিয়া গেল তাহা অগ্নিগর্ভ। সে দৃষ্টির ভাষা কথায় অনুবাদ করা যায় না, কিন্তু তাহা মর্মে গিয়া মর্মান্তিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা হইতেই সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতেছে—

ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহু দূর দেশে।
কিসের করিস চিন্তা বসি পথে শেষে,
কোন দুঃখে কাঁদে প্রাণ? কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধ নেত্র মেলি? কার কথা শুনে
মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে?

* * *

মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো।
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর ক্ষত।
নীরবে জ্বলিবে তব পথের দুধারে
গ্রহ-তাবকার দীপ কাতারে কাতারে।

অদ্ভুত একটা আনন্দ পাইল সে। অদ্ভুত একটা বিস্ময়। সত্যই সে যেন পথের দুধারে গ্রহ-তারকার দীপালিকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল।

সেই বছরই অধিকলাল সসম্মানে মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল সে। মাসিক চার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইল। তপনবাবু খোঁজ লইয়া জানিলেন সে নাকি রেকর্ড মার্ক পাইয়াছে। তপনবাবুই স্কুলের সেক্রেটারি। তিনি এই উপলক্ষে স্কুলে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় গ্রামের গণ্যমান্য সকলকেই আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বিশেষ লোক সমাগম নাই। রামগোবিনের চাকর রংলালের পুত্র অধিকলালকে অভিনন্দিত করিতে কেহ ব্যগ্র নহে। যাহাদের আমরা ছোটলোক বলি তাহারাই আসিয়াছিল বেশী। অধিকলালের জাত-ভাইরাই পাড়া ঝাঁটাইয়া আসিয়াছিল এবং মাটির উপর আসিয়া বসিয়াছিল। চেয়ারগুলি সব প্রায় খালিই পড়িয়াছিল। স্কুলের শিক্ষকগণ অবশ্য ছিলেন। তপনবাবু আশা করিয়াছিলেন রামগোবিন অন্তত আসিবে। কিন্তু সেও আসে নাই। ডাক্তারবাবু অধিকলালকে কিছু বাংলা এবং কিছু ইংরেজি বই উপহার দিলেন। বাংলা বইগুলি সবই প্রায় রবীন্দ্রনাথের বই। অধিকলাল যে রবীন্দ্রনাথের বই পড়িতে ভালোবাসে ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শিক্ষকরাও সকলে অধিকলালের খুব প্রশংসা করিলেন। ডাক্তারবাবু পরিশেষে যাহা বলিলেন তাহাতে একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। তিনি গ্রামের লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোমাদের অধিকলাল তোমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু সে গরীবের ছেলে, বেশী দূর পড়িবার সঙ্গতি তাহার নাই, গ্রামের লোকেদের উচিত তাহার পড়ার ব্যবস্থা করা। আপনারা সকলে যদি চাঁদা করিয়া তাহার নামে পোস্টাপিসে কিছু টাকা জমা করিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভালো হয়। আমি নিজে একশত টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সকলেই উসখুস করিতে লাগিল। স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ দুই টাকা করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তপনবাবু নিজের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া একটি মালাও গাঁথিয়া অধিকলালকে উপহার দিয়াছিলেন। মালাটি গাঁথিয়াছিল তনু। সেই মালাটি পরিয়া এবং বইগুলি লইয়া সভার একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল অধিকলাল। সে সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমুন্দরির কাছে চলিয়া গেল। সমুন্দরি পিছনে ভিড়ের মধ্যে মাটিতে বসিয়াছিল। অধিকলাল সেখানে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া গলার ফুলের মালা এবং বইগুলি তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল—মা, এই লে। হম্ আর নেহি পঢ়বো। হামরা ওয়াস্তে কাম খোজ্। তাহার পর সভার ভিতর আসিয়া ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্যে যা করেছেন তা কেউ করেনি। আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। তবে আমি একটা জিনিস ঠিক করে ফেলেছি, ভিক্ষার টাকা দিয়ে আমি পড়ব না। আমি রোজগার করতে আরম্ভ করব, যদি কিছু জমাতে পারি, তাহলেই পড়ব আবার। আমার মা বাবা যদি আমাকে পড়াতেন তাহলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু তাঁরা গরীব, তাঁরা—"

হঠাৎ অধিকলালের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে আর কিছু বলিতে পারিল না। টপ টপ

করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল সে।

॥ ৭ ॥

খুদরু ভোরে সোজা জাহাজঘাটে গিয়া রামগোবিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমি আর পড়ব না, আমাকে কোনও কাজ দিন।"

"আমি আগেই জানতাম পড়াশোনা করা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে। বেশ, তুমি যোগীনাথকে পড়াও। পনর টাকা মাইনে দেব—"

"ও কাজ আমি করব না। আমাকে অন্য কাজ দিন। আপনার কামতের কাজ—"

"কামতে অন্য লোক আছে। কুলির কাজ তুমি করতে পারবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে থেকে তুমি 'বাবু' হয়ে গেছ। ভারি ভারি মাল বওয়া তোমার কর্ম নয়। অন্য কি কাজ দেব তোমাকে?"

জাহাজ আসিয়া ঘাটে ভিড়িয়াছিল। প্যাসেঞ্জার ছিল অনেক। খুদরু সেই দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল সে একটি প্যাসেঞ্জারের স্যুটকেস ও বিছানা মাথায় লইয়া আসিতেছে। রামগোবিন পাগড়ি পরিয়া ট্রেনের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। খুদরুকে দেখিয়া হাত উলটাইয়া বলিল—'ই ছোকরাকা দিমাক (মাথা) খারাব হো গিয়া মালুম হোতা হ্যায়—রে খুদরুবা শুন শুন ইধর শুন।—"

খুদরু কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। একজন প্যাসেঞ্জারের মাল ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আবার জাহাজের দিকে ছুটিল সে।

হঠাৎ রামগোবিনের নজরে পড়িল সমুন্দরি কিছু ছাতু এবং মুড়ির মোয়া লইয়া স্টেশনের সামনে বসিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে—"সাততু সাত্তু বুটকা সাত্তু—লাড্ডু লাড্ডু মুড়িকে লাড্ডু।" সমুন্দরি মাঝে মাঝে স্টেশনের ধারে বসিয়া নিজের হাতে-পেষা ছাতু এবং নিজের হাতের তৈরী মোয়া বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা উপার্জন করে।

রামগোবিন তাহার দিকে আগাইয়া বলিল, "তোর ব্যাটার কাণ্ড দেখেছিস। কুলিগিরি করছে। ওই দেখ—"

সমুন্দরি দেখিল খুদরুবা প্রকাণ্ড এটা বিছানা ঘাড়ে বহিয়া আনিতেছে। হাতে একটা প্রকাণ্ড টিফিন কেরিয়ার। বিছানার ভারে ঘারটা বাঁকিয়া পড়িয়াছে বেচারার। কতই বা বয়স। মাত্র চোদ্দ বৎসর।

রামগোবিন টিপ্পনী কাটিল একটা। অন্য উপমা ব্যবহার করিল এবার। তপনবাবুকে 'দুবরি' এবং 'পিপর' গাছের কথা বলিয়াছিল সমুন্দরিকে বলিল, " 'শিয়ার' (শৃগাল) কভি 'সিং' (সিংহ) নেহি হোগা—ই তো হাম্ পহলেই কহা থা—।" (শৃগাল কখনও সিংহ হবে না, এ তো আমি আগেই বলেছিলাম)।

সমুন্দরি এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সোজা খুদরুবার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘাড় হইতে বিছানাটা এক ঝটকায় নীচে ফেলিয়া দিল "ছোড় ই সব। ঘর যো—"

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোক পিছনেই ছিলেন, তিনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতেই সমুন্দরি তাঁহাকেও এক ধমক দিল। "ছোটা বুতরুকা (বাচ্চার) শিরপর কোন আকিল সে এতনা বড়া বোঝা লাদ দিয়া বাবু!" তাহার পর নিজেই সে বিছানাটা কাঁধে করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল। টিফিন কেরিয়ারটা লইয়া খুদরুবা গাড়িতে উঠিয়াছিল। সেটাও তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আবার বলিল—"যো তু ঘর যো!" খুদরুবা নামিয়া গেল। প্যাসেঞ্জারবাবুটি চার আনা পয়সা বাহির করিয়া দিতে গেলে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল সমুন্দরি। "চার আনা পয়সা! অত ভারি বোঝার জন্য মোটে চার আনা।"

"ওর সঙ্গে তো চার আনাই কড়ার হয়েছিল—"

"ও তো বুতরু। ও কি জানে। ও লিখাপড়ি জানে। ও কি কুলিব কাম কোনও দিন করিয়েসে?"

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোককে বাঙালী দেখিয়া সমুন্দরি বাংলা ভাষাতেই কথা বলা সঙ্গত মনে করিল।

"ছ আনা পয়সা লাগবে বাবু। ওহি রেট—"

খুদরুবা নীচে হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল যে সে চার আনা পয়সাতেই রাজী হইয়াছিল।

"চুপ র—"

এক ধমকে তাহাকে থামাইয়া দিল সমুন্দরি।

প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোককে শেষে ছ আনাই দিতে হইল। পয়সাটি নিজের আঁচলে গিঁট দিয়া বাঁধিয়া সমুন্দরি ট্রেন হইতে নীচে নামিল। খুদরুবা তখনও ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

"কুছ খাইলো ছে?"

(কিছু খেয়েছিস?)

খুদরুবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল কিছু খায় নাই। বলিল সে খুব ভোরে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মাইজির তখনও ঘুম ভাঙে নাই। সমুন্দরি তখন দুইটি মুড়ির লাড়ু আনিয়া তাহার হাতে দিল।

"খো। অব ঘর যো—"

খুদরুবা কিন্তু ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, আর পড়িবে না, সে গরীব, পড়িতে হইলে যে পয়সা চাই সে পয়সা সে ভিক্ষা করিয়া আহরণ করিবে না। সুতরাং আজ হইতেই সে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। সমুন্দরির দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

"হাম কহৈছি, তু ঘর যো—"

(আমি বলছি তুই বাড়ি যা)

খুদরুবা তবু দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল ডাক্তারবাবুর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারিবে না সে। তাহার লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছে।

'কোন চিজ কে লাজ?"

(কিসের জন্য লজ্জা?)

খুদরুবা কোনও উত্তর দিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার চক্ষু দুইটি

আবার সহজ হইয়া আসিল। সমুন্দরি নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ তাহার পর গালে হাত দিয়া বলিল—"দেখো, তামাসা দেখো, কি ভেলে তোরা?" (দেখ কাণ্ডখানা। কি হল তোর?) খুদরুবা সহসা মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া আবার হাঁটিতে শুরু করিল। দেখিতে দেখিতে প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে হারাইয়া গেল সে। সমুন্দরি হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ছাতুর টুকরিটা মাথায় তুলিয়া সেও বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। আবার তাহার দেখা হইল রামগোবিনের সঙ্গে। রামগোবিন খুদরুবাকে ভিড়ের মধ্যে দ্রুতপদে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহার মনে হইয়াছিল ছোকরা রণে ভঙ্গ দিয়া বুঝি পলায়ন করিতেছে, হুঁ হুঁ কুলিগিরি করা অত সহজ নয়। সমুন্দরিকে দেখিয়া সে বলিল, "শিয়ারোয়া উধর ভাগলো। ফের আইতে। বনকা গিদড় ভাগে কা কিধর—"

(শিয়ালটা ওই দিকে পালাল। ফের আসিবে। বনের শিয়াল যাবে কোথা)।

সমুন্দরির চক্ষু দুইটি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শিয়ার শিয়ার কাহে করৈছ। উ সিং হোতে, দেখিও।"

(শিয়াল শিয়াল করছ কেন। ও সিংহই হবে দেখো।) সমুন্দরি হনহন করিয়া চলিয়া গেল। রামগোবিন থতমত খাইয়া গেল একটু। সে ধনী হইয়াছে বটে কিন্তু মজুরনী সমুন্দরিকে সে ভয় করে। মানুষ তো নয়, যেন একটা ইন্‌জিন্।

খুদরুবা জাহাজঘাট হইতে গ্রামের ভিতর ঢুকিয়া পথে পথে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার খুব ইচ্ছা করিতেছিল আবার সে তাহার লাইব্রেরি ঘরটিতে ফিরিয়া যায়, আবার রবীন্দ্রনাথের একখানা বই খুলিয়া বসে, আবার তনুকে তাহার পড়া বলিয়া দেয়, কিন্তু—হ্যাঁ ওই কিন্তুটাই তাহাকে যাইতে দিতেছে না। তাহার বার বার মনে হইতেছিল ও বাড়িতে যাইবার অধিকার তাহার আছে কি? ওখানে সে বেমানান। হঠাৎ হকরুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আরে খুদরুবা, চল, মাইজি বোলাইছে—"

(আরে খুদরুবা, চল, মাইজি ডাকছে)

খুদরুবা বলিতে পারিল না, আমি যাইব না। নীরবে হকরুর অনুসরণ করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল দারিদ্র্যের জন্য লজ্জা কি? দারিদ্র্য তো পাপ নয়। হঠাৎ তাহার আব্রাহাম্ লিংকনের জীবনী মনে পড়িল। কয়েকদিন আগেই লিংকনের জীবনী পড়িয়াছে সে। কি গভীর দুঃখের জীবন ছিল তাহার। সে তুলনায় তো সে রাজার হালে আছে। ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিতেই তনু ছুটিয়া আসিল। সে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল এতক্ষণ।

"খুদরুদা তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমরা চারদিকে তোমাকে খুঁজছি তখন থেকে। জান, মা আজ 'চপ' ভেজেছে। চল খাবে চল। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধহয়। আর জান খুদরুদা, লাইব্রেরি ঘরের বারান্দায় শালিক বোধহয় বাসা তৈরি করছে। দুটো শালিক খড়কুটো মুখে নিয়ে ওই জানলার উপরে দেওয়ালে যে ফাঁকটা আছে সেইখান ঢুকছে। বাচ্চা হলে বেশ মজা হবে, না? আমাকে একটা খাঁচা এনে দিও, কেমন?"

অধিকলাল কোনও উত্তর দিতেছিল না, তনুর ইচ্ছা করিতেছিল তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিতে। কিন্তু তাহার মা অধিকলালের গায়ে হাত দিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। এসব বিষয়ে ভগবতী দেবীর খুব কড়া নজর।

একটু পরে নখুও আসিয়া হাজির হইল। সে ঘরের ভিতর ছিল।

"খুদরুদা কোথায় ছিলে তুমি—"

খুদরু একটু মুচকি হাসিল কোন উত্তর দিল না।

"বল না, ভোরে উঠেই কোথা গিয়েছিলে?"

খুদরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিল—"আমি জাহাজঘাটে গিয়েছিলাম কাজ খুঁজতে। আমার পড়া তো শেষ হয়ে গেল, আর পড়া তো হবে না। তোমাদের বাড়িতে থেকে কি হবে আর--তাই—"

"তোমার পড়া হবে না কে বললে। বাবা বলেছেন সে ব্যবস্থা করবেন। তুমি সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়বে বোর্ডিংয়ে থেকে—চল না তুমি বাড়ির ভিতর—"

তনু শোরগোল তুলিয়া বাড়ির ভিতর ছুটিয়া চলিয়া গেল—"মা, খুদরুদা এসেছে। তুমি ওকে বকে দাও— বলছে আর পড়বে না।"

তপনবাবু তখনও কলে বাহির হইয়া যান নাই। তিনি খুদরুকে দেখিয়া বলিলেন—, "কোথায় ছিলে তুমি সকাল থেকে? তুমি আজ বিকেলের ট্রেনেই সাহেবগঞ্জে চলে গিয়ে সেখানাকার স্কুলে আর বোর্ডিংয়ে ভর্তি হয়ে যাও। সেখানকার হেডমাস্টারমশাই আমার চেনা লোক, তাঁর নামে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব—"

অধিকলাল ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—"কিন্তু আমি বোর্ডিংয়ের খরচ তো চালাতে পারব না।"

"সে জন্যে তোমার ভাবনা কি, তার ভার আমি নিচ্ছি। তুমি আজই বিকেলে চলে যাও—"

অধিকলাল নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনার টাকায় আমি পড়ব না। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন—"

আবার চুপ করিয়া গেল। ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আগাইয়া আসিয়া স-স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তোর হয়েছে কি বল দেখি। তুই এতদিন আমাদের কাছে রইলি, এতদিনেও তুই আমাদের আপনার লোক হলি না? তুই যদি আমার বড় ছেলে হতিস তাহলে কি তোকে আমরা পড়াতাম না? পয়সার অভাবে তোর মতন ভালো ছেলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এ কখনও হতে পারে! মাসে দশ টাকা করে দিলেই তোর বোর্ডিংয়ের খরচ চলে যাবে। সে দশ টাকা কেউ না দেয় আমি দেব —"

অধিকলাল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবতী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

"মাইজি—"

উঠানের একপ্রান্তে সমুন্দরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ভগবতী দেবী বাহির হইয়া দেখিলেন সমুন্দরি একটা ট্রাংক মাথায় বহিয়া আনিয়াছে।

"কি সমুন্দরি ও ট্রাংক কার?"

"হামার।"

সমুন্দরি অতিকষ্টে ট্রাংকটা বারান্দার উপর নামাইল। তাহার পর অধিকলালের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"ওই ছোঁড়াপুতাটা (ছোঁড়াটা) আজ জাহাজ-ঘাটে কুলির কাজ করতে গিয়েছিল। কাল আপনারা দশজনকে ডেকে ওকে কত খাতির করলেন, আজ সকালে ওর এই বুদ্ধি। বলছে আমি ভিক মেঙে (ভিক্ষে করে) পড়ব না, আমি কুলিগিরি করব। জানেন মাইজি, কুত্তার দুম্ (কুকুরের লেজ) কখনও সিধা (সোজা) হয় না। মগর (কিন্তু) আমি ওকে সিধা করব। তাই এই "পেটারি" (ট্রাংক) ঢুয়ে (বয়ে) নিয়ে এসেছি। হামার 'যমানি উমার' (যৌবন কাল) থেকে 'যেতো' (যত) 'জেবর' (গহনা) গড়িয়েছি সব ওই পেটারির ভিতর আছে। হাজার ভরির কম হবে না। সব চাঁদির (রূপার) জেবর। তাছাড়া আছে পাঁচশ টাকা নগদ। আমি 'সোভই' (সবই) ওই ছোঁড়াপুতার হাতে দিয়ে দিচ্ছি, কারো কাছে তোকে ভিখ মাংতে হোবে না, তুই কত পঢ়বি পঢ়।"

এই কথাগুলি বলিয়া সমুন্দরি স্পর্ধাভরে অধিকলালের দিকে চাহিতে লাগিল।

ভগবতী দেবী বলিলেন, "সমুন্দরি তোর যে এতো উঁচু মন তাতো জানতাম না। খুদরু অত ভালো ছেলে, ওর পড়া বন্ধ করলে কি চলে? ওর পড়বার ব্যবস্থা আমরাই করব। ও আজ সাহেবগঞ্জে চলে যাক—স্কুলে আর বোর্ডিংএ নাম লিখিয়ে আসুক—"

"আর আমার 'জেবর'।"

তপনবাবু বলিলেন—"ওগুলো বিক্রি করে যা টাকা হবে তা অধিকলালের নামে ব্যাংকে জমা করে দেব। সেই টাকা থেকে ওর লেখাপড়া চলবে—"

ভগবতী অধিকলালকে বলিলেন—"চল, এখন খাবি চল। চপগুলো গরম করে দিই। সমুন্দরি তুইও নিয়ে যা খানকয়েক তোর ছেলেমেয়েদের জন্য।"

সকলে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। সমুন্দরি গেল না। সে তাহার জেবরের পেটারি আগলাইয়া বসিয়া রহিল

দ্বিতীয় পর্ব

।। ১ ।।

অধিকলাল যেদিন সাহেবগঞ্জে আসিয়া বোর্ডিংয়ে ভরতি হইল, সেদিন তাহার সহিত তাহার বাবা বংলালও আসিয়াছিল। অধিকলালকে ডাক্তারবাবু জামা জুতা কোট কাপড় সবই কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে সে রংলালের ছেলে। অধিকলালের বাক্স বিছানা সে-ই স্টেশন হইতে বহন করিয়া আনিয়াছিল. তাহাকে সাধারণ কুলি বলিয়াই মনে হইতেছিল। সে-ই যে অধিকলালের বাবা বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। কিন্তু বোর্ডিংয়ে আসিয়া বৈরিয়া গ্রামের তেওয়ারিজির পুত্র ভূপেশ্বর তেওয়ারির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ভূপেশ্বর তেওয়ারির বাবা রূপেশ্বর তেওয়ারি একজন বড় কণ্ট্র্যাকটর। তিনি যখন মনিহারি অঞ্চলে একটি রেলোয়ে ব্রীজ প্রস্তুত করাইতেছিলেন তখন রংলাল তাঁহার অধীনে কুলির কাজ করিত। তাঁহার বাসনও মাজিয়া দিত। ভূপেশ্বর স্কুলে পড়িত তখন। অধিকলালের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। সে যখন পাশ করিয়া চলিয়া আসে তখন অধিকলাল স্কুলে ভরতিও হয় নাই। ভূপেশ্বর ভালো ছেলে ছিল না। স্কুলে প্রতি ক্লাসেই অনেকবার ফেল করিয়া তবে সে প্রমোশন পাইয়াছে। এখন সে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেছে। গতবারেও সে টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই. এবারেও পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। তাহার বাবা রূপেশ্বর তেওয়ারী ধনী লোক। তিনি চারজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিয়াছেন. ছেলেকে ম্যাট্রিকুলেশনটা তিনি পাশ করাইবেনই। তাহার পর তাহাকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবেন। অনেক লোক রূপেশ্বরকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে ছেলেকে যখন শেষ পর্যন্ত ব্যবসাতেই ঢুকাইতে হইবে তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করাইয়া লাভ কি হইবে। রূপেশ্বর বলিয়াছিলেন---লাভ কিছু হইবে না, লোকসানই হইবে। কিন্তু আমি কণ্ট্র্যাকটর মানুষ. যে কণ্ট্র্যাকটে হাত দিই তাহাতে লাভ লোকসান যাহাই হউক সেটাকে শেষ না করিয়া ছাড়ি না। ভূপেশ্বর রংলালকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল।

"কি বংলাল নাকি। তুমি আজকাল এইখানে কুলিগিরি করছ?"

"না, বাবুয়া। আমি আমার ছেলেকে ভরতি করাতে এসেছি এখানে। আমার ছেলে খুদ্রু জিলার মধ্যে পহেলা হয়ে জলপানি পেয়েছে।"

"কই তোমার ছেলে?—"

"এই যে। খুদরু তেওয়ারজিকে গোড় লাগ—"

অধিকলাল ভূপেশ্বর তেওয়ারিকে প্রণাম করিল কিন্তু তিওয়ারি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। রংলাল দোসাদের ছেলে জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে! ওই দোসাদের ছেলেটা এখন হইতে তাহাদের সহিত এই বোর্ডিংয়ে থাকিবে না কি!

অধিকলালের জিনিসপত্র (একটা বাক্স এবং বিছানা) তাহার নির্দিষ্ট ঘরটিতে রাখিয়া রংলাল চলিয়া গেল। কিন্তু সে অধিকলালের কি সর্বনাশ যে করিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূপেশ্বর বোর্ডিংয়ে প্রচার করিয়া দিল যে অধিকলাল দোসাদের ছেলে। তাহার বাবা রংলাল তাহাদেরই বাড়িতে একদিন বাসন মাজিযাছে।

অধিকলাল যে ঘরে 'সীট' পাইয়াছিল সেটি ফোর সীটেড রুম। সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তিনটি বিছানায় তিন জন বসিয়া আছে—যোগেন সা, বিলট্ ঝা এবং জ্ঞান বসাক। তিন জনেই তাহার সমবয়সী। ইহারাও বাহির হইতে আসিয়াছে এবং তাহার সহিত একই ক্লাসে পড়িবে। অধিকলালও নিজের বিছানাটি চৌকির উপর পাতিয়া লইল।

"তুমি কি নতুন ভরতি হলে না কি—"

"হ্যাঁ—"

"কি নাম তোমার?"

"অধিকলাল পাসমান।"

যোগেন সা-ই প্রশ্ন করিতেছিল।

বিলট্ ঝা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"পাসমান? পাসমান তো দোসাদ। তুমি কোন জাত?"

"আমিও দোসাদ।"

জ্ঞান বসাক বলিল—"তুমি কোন স্কুল থেকে এসেছ?"

"মনিহারি স্কুল থেকে—"

"মনিহারি স্কুল তো এবার পূর্ণিয়া জেলায় ফার্স্ট হয়েছে। তুমি কি সেই ফার্স্ট বয় না কি?"

অধিকলাল ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেট মহিম সেন প্রবেশ করিলেন। তিনি স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। বোর্ডিংয়েই থাকেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন—"অধিকলাল, তুমি তোমার 'সীট' পেয়েছ তো? বাঃ। তোমার যদি কোনও অসুবিধা হয় আমাকে গিয়ে বোলো, আমি নীচে কোণের ঘরটায় থাকি।"

তাহার পর অন্য ছেলেদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"অধিকলাল পূর্ণিয়া জেলার ফার্স্ট বয়, আশা করি শুনেছ তোমরা। সবাই তোমরা মিলে মিশে ভালোভাবে পড়াশোনা কর। আমি জানি আজকালকার ছেলেরা সবাই ভালো। বাঃ—"

"বাঃ' বলাটা মহিম সেনের একটি মুদ্রাদোষ। সকলে আড়ালে তাঁহাকে 'বাঃ-মাস্টার' বলে। মহিম সেন চলিয়া যাইবার পর জ্ঞান বসাক বলিল—"একটা অঙ্ক পারছি না ভাই। থার্ড মাস্টার হোম টাসক্ দিয়েছেন, অঙ্ক করে না নিয়ে গেলে মারবেন—অথচ এই অঙ্কটা কিছুতেই হচ্ছে না—"

"দেখি—"

অধিকলাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অঙ্কটা দেখিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"হ্যাঁ, হয়ে যাবে।"

পাটিগণিতের শক্ত অঙ্কটা অধিকলাল দশ মিনিটের মধ্যেই করিয়া দিল।

বিলট্ ঝা বলিল—"আমারও দুটো অঙ্ক করে দাও তাহলে। থার্ড মাস্টার বড় 'মারখুন্ডা'। অঙ্ক ঠিক না হলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেয়।"

অধিকলাল তাহার অঙ্ক দুইটিও কষিয়া দিল। বিলট্ ঝা-ও অবাক হইল। কিন্তু সে যাহা বলিল তাহাতে বিস্ময়ের বা কৃতজ্ঞতার সুর ফুটিল না। বলিল, "ভাই অধিকলাল, তুমি আমাদের ঘরে এসেছ এতে আমাদের পড়াশোনার খুব সুবিধে হবে। কিন্তু আমাদের 'জাত'টা মেরো না ভাই। আমাদের খাবার টাবার যেন ছুঁয়ে দিও না, গাঁয়ের লোকে যদি শোনে আমরা দোসাদের ছোঁয়া খেয়েছি তাহলে আমাদের জাতে ঠেলে দেবে।"

অধিকলাল গম্ভীরভাবেই বলিল—"না, তোমাদেব খাবার আমি ছোঁব কেন। আমি দূরেই সরে থাকব।"

যোগেন সা দেওয়ালে ঠেস দিয়া নিজের বিছানায় পা দুইটি ছড়াইয়া বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিল—"আমার অত জাতবিচার নেই। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে। আমাদের চাকরবাকর সব মুসলমান। মা তাদের হাতের ছোঁয়া জল নেন না, কিন্তু দুধ নেন। আমি গফুরের বাড়িতে লুকিয়ে মুরগিও খেয়েছি। আমার কোন অসুবিধা হবে না ভাই—"

যোগেন হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া অধিকলালকে জড়াইয়া ধরিল।

সেই দিনই খাইবার সময় একটা কাণ্ড হইল। বোর্ডিংয়ের নীচে একটা 'হল' মতন ছিল। তাহাতেই বোর্ডিংয়ের ছেলেরা পাশাপাশি বসিয়া খাইত। খাওয়ার ঘণ্টা যখন হইল তখন যোগেন বলিল, "চল, অধিকলাল নীচে গিয়ে খেতে হবে।" সকলে পাশাপাশি গিয়া বসিল। অধিকলালও গিয়া পঙক্তির একধারে বসিয়াছিল।

ভূপেশ্বর তেওয়ারি বসিয়াছিল আর এক প্রান্তে। ভূপেশ্বর তেওয়ারি আদেশের ভঙ্গীতে বলিল—"তুম অলগ্ বৈঠো।"

(তুমি আলাদা বস)

"অলগ বসবে কেন? ও কি মানুষ নয়?"

প্রতিবাদ করিল যোগেন সা।

"ও দোসাদ—"

"না আমরা কেউ ওর সঙ্গে বসে খাব না।"

অধিকাংশ ছাত্রই দাঁড়াইয়া উঠিল।

রামচরণ ঠাকুর পরিবেশন কবিবার জন্য ভাতের হাঁড়িটা লইয়া আসিয়া দেখিল সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"কা ভাইল্?"

(কি হল)

তখন তেওয়ারি বলিল—"আজ একটা দোসাদের ছেলে এখানে ভরতি হয়েছে। তার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে খাব কি করে?"

রামচরণ গম্ভীর হইয়া সমর্থন করিল এ কথা।

"ঠিক বাত—"

অধিকলাল বলিল—"আমি উঠোনে বসে খাব। ঠাকুরজী আমাকে ওইখানেই ভাত দাও।"

অধিকলাল নিজের থালা বাটি গেলাস লইয়া উঠোনে নামিয়া গেল। উঠোনের একধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল বোর্ডিংয়ের চাকর—রণছোড়। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"তুমি বাবুয়া এখানে আংনাতে (উঠোনে) বসছ কেন?"

"আমার সঙ্গে ওরা একসঙ্গে বসে খেতে চাইছে না—"

রণছোড় বাসন ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিষ্ঠ বিশাল চেহারা রণছোড়ের। একটা দৈত্য যেন। সে চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেল।

অধিকলাল উঠানে বসিয়াই আহার সমাধা করিল এবং স্কুলে চলিয়া গেল। অপমানে তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল কিন্তু ইহাও সে অনুভব করিতেছিল ইহা লইয়া ঝগড়া করিলে সেটা আরও লজ্জার কারণ হইবে।

স্কুলে গিয়া সে ক্লাসে একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ফোর্থ মাস্টাব মহাশয় ক্লাস লইতেছিলেন। শীর্ণকান্তি খর্ব লোক। নাকটি খুব টিকলো। চক্ষু দুইটি বুদ্ধি-দীপ্ত। তিনি জ্যামিতি পড়াইবেন। ক্লাসের নবাগত ছেলেদের পবিচয় লইয়া তিনি ফেল-কবা ছেলে নুটবিহারীকে বলিলেন—"নুটে তুই বোর্ডে গিয়ে একটা ত্রিভুজ আঁক তো।"

নুটবিহারী উঠিয়া গিয়া বোর্ডে একটা ত্রিভুজ আঁকিল।

"ত্রিভুজের ইংরিজি কি?"

"ট্র্যাংগ্‌ল্ সার।"

"ঠিক হয়েছে। তুই লেখাপড়ায় মন দিয়েছিস তাহলে। আচ্ছা এবার ওটার একটা নাম দে। না, A B C না P Q R দে—"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের পড়াইবার ধরন ওইরূপই ছিল। তিনি ক্লাসের ভালো ছেলেদের প্রতি তেমন নজর দিতেন না, খারাপ ছেলেদের লইয়াই থাকিতেন। তাহাদের বিশেষ করিয়া পড়াইতেন।

"ট্র্যাংগেলের অ্যাংগেল তিনটেতে দাগ দে—ঠিক হয়েছে। এইবার অ্যাংগেল তিনটের নাম দে—"

এইভাবে পড়া চলিতেছিল, এমন সময় স্কুলের চাকর হরদেও আসিয়া বলিল, হেডমাস্টার মহাশয় অধিকলালকে আপিস ঘবে ডাকতেছেন। অধিকলাল আপিস ঘরে গিয়া দেখিল বোর্ডিংয়েব চাকব রণছোড দাঁড়াইয়া আছে।

হেডমাস্টার মহাশয় শান্ত ধীর গম্ভীর লোক। অধিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ খাওয়ার সময় কি কি হয়েছিল বল।"

"আমি জাতে দোসাদ। খাবার সময় সবাই এক সারিতে খেতে বসেছিলাম। কিন্তু তেওয়ারিজি আমাকে উঠে যেতে বললেন। আমি উঠে গেলাম। উঠোনেই আমি খেয়েছি—"

রণছোড়েব নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল। মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। সে হিন্দী ভাষায় হেডমাস্টার মহাশয়কে যাহা বলিল তাহার মর্ম এই—"আপনি 'ইন্‌সাফ্' (সুবিচার) করুন। অধিকলাল শুনলাম খুব ভালো ছেলে। শুধু 'দোসাদ' বলেই ওকে অপমান সহ্য করতে হবে? 'দোসাদ' কি মানুষ নয়? ওকে যদি ওই 'হলে' বসে খেতে না দেওয়া হয়, তাহলে

আমিও আর ওই বোর্ডিংয়ের বাসন মাজব না। আমিও জাতে 'দোসাদ'। দোসাদের এ অপমান আমি সহ্য করব না। মিউনিসিপালিটির মেথররাও আমার দোস্ত। আমার অপমানে তারাও 'বদ্‌লা' (প্রতিশোধ) নেবে। বোর্ডিংয়ের পায়খানা তারা 'কামাবে' না (পরিষ্কার করবে না)।"

হেডমাস্টার মহাশয় অধিকলালকে বলিলেন, "যাও তুমি ক্লাসে যাও—"

অধিকলাল চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় বোর্ডিংয়ের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মহিমবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"দেখ, অধিকলাল একটা মহা মুশকিল হয়েছে। হেডমাস্টার মশাই আজ ভূপেশ্বর তেওয়ারিকে ডেকে বলে দিয়েছেন সে যেন এ স্কুল ছেড়ে চলে যায়, তাকে কালই তিনি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। এটা হয়েছে তুমি ওদের সঙ্গে একসারে খেতে বসেছিলে বলে।"

এই বলিয়া তিনি অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অধিকলাল সবই জানিত। কিন্তু এ ব্যাপারে তাহার কি কর্তব্য থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে বলিল, "আমি তো সার উঠে গিয়ে উঠোনে বসেছিলাম। রণছোড় গিয়ে যে হেডমাস্টার মশাইকে বলবে তা তো আমি জানতাম না। জানলে বারণ করতাম। কিন্তু এখন আমি কি করব বলুন—"

"ভূপেশ্বর তেওয়ারি এ বছর ম্যাট্রিক দেবে। ওকে যদি স্কুল থেকে চলে যেতে হয় তাহলে ওর ক্ষতি হবে খুব—সে কথাটা ভেবে আমাদের সকলেরই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যদি এক কাজ কর, তাহলে—"

"কি বলুন—"

"তুমি হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে চলে যাও। গিয়ে বল তেওয়ারিকে চলে যেতে বলবেন না। আমি আলাদা বসেই খাব।"

"বেশ আমি এখনই যাচ্ছি—"

স্কুল কম্পাউণ্ডেই মাস্টার মহাশয়ের কোয়ার্টার ছিল। অধিকলাল সেইখানেই গেল। অনেকক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল সে। তাহার পর হরদেওকে সে দেখিতে পাইল। তাহাকেই বলিল—মাস্টার সাহেবের সহিত সে একটু দেখা করিতে চায়। হেডমাস্টার মহাশয় ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন।

"কে?"

"আমি অধিকলাল—"

"কি চাও। ও—। তোমাকে আর বোর্ডিংএ কেউ অপমান করবে না আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

"আমি আপনার কাছে এসেছি অন্য কারণে। তেওয়ারিজিকে আপনি বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেবেন না, সার। ওঁর এ বছর পরীক্ষা দেবার কথা। আমি আলাদা বসেই খাব, ওতে আমার কোন অপমান হবে না। রণছোড়কে আমি আপনার কাছে আসতে বলিনি, ও নিজেই এসেছিল। ওকে আমি এখনি বলব গিয়ে ও যেন কোন গোলমাল না করে—"

হেডমাস্টার মহাশয় এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

"এতে তোমার অপমান হয়নি বলছ?"

"আমার সঙ্গে বসে কেউ যদি না খেতে চায় তাহলে তাকে দোষ দেব কি করে। এই তো আমাদের দেশের নিয়ম। আমিও যে দোসাদ হয়ে জন্মেছি তাতেও আমার কোনও দোষ নেই। তাই আমি অপমানিত হইনি। তেওয়ারিজি আমাকে অপমান করেন নি, তিনি দেশের যা নিয়ম তাই মেনে চলবার চেষ্টা করেছেন। আমি এ নিয়ে তাঁর মনে কষ্টের কারণ হয়ে থাকতে চাই না। আপনি—"

"আচ্ছা, তুমি যাও।"

অধিকলাল চলিয়া গেল। হেডমাস্টার মহাশয় তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেটির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। সে যে লেখা-পড়ায় ভালো এ খবর তিনি তাহার পরীক্ষার ফল দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। এখন অনুভব করিলেন তাহার চরিত্রও অসাধারণ।

মহিম সেন, পণ্ডিতজি (জানকীনাথ ওঝা) এবং গণিতের শিক্ষক থার্ড মাস্টার (হাবুল বোস) তেওয়ারির চলিয়া যাইবার সম্ভাবনায় মর্মাহত হইয়াছিলেন। কারণ তেওয়ারি তাঁহাদের নিকট প্রাইভেট পড়িত এবং প্রত্যেককে কুড়ি টাকা করিয়া বেতন দিত। তাঁহারাই পরামর্শ করিয়া অধিকলালকে হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মহিম সেন তাঁহাদেরই মুখপাত্র হইয়া অধিকলালকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অধিকলাল ফিরিয়া আসিয়া মহিমবাবুকে গিয়া বলিল—"হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে আমি সব বলেছি। বলেছি যে আমি আলাদা বসেই খাব, আপনি তেওয়ারিজিকে চলে যেতে বলবেন না—"

"বাঃ—। কিছু বললেন তোমাকে?"

"না—"

একটু পরেই কিন্তু হেডমাস্টার মহাশব বোর্ডিংয়ে আসিয়া হাজির হইলেন। মহিমবাবুর ঘরে গিয়া বলিলেন—"ভূপেশ্বর তেওয়ারিকে ডাকুন—"

ভূপেশ্বর তেওয়ারি আসিলে বলিলেন—"এখনি অধিকলাল আমার কাছে গিয়েছিল। সে বলছে তোমাকে যেন স্কুল থেকে তাড়ানো না হয়, সে আলাদা বসেই খাবে। তুমি স্কুলের ওঁছা ছেলে, প্রত্যেক ক্লাসে দু'তিনবার করে ফেল করেছ, আর অধিকলাল একটি রত্ন। পূর্ণিয়ার বোর্ড পরীক্ষায় সে সব বিষয়ে প্রথম হয়ে এই স্কুলে এসে ভরতি হয়েছে। সে দোসাদের ঘরে জন্মেছে বলে তাকে ছোট করবার অধিকার কারো নেই। তাই আমি ঠিক করেছি যে সে বোর্ডিংয়ের খাওয়ার 'হলে' বসেই খাবে। তবে সকলে যদি আপত্তি করে সামান্য একটু দূরে বসে খাবে। সে উঠোনে খাবে এ কখনই হতে পারে না। তোমার এতে আপত্তি আছে?"

তেওয়ারি বলিল—"না সার। আমি তো—"

"আচ্ছা যাও—"

অধিকলাল 'হলে'ই একটু তফাতে বসিয়া খাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার মর্যাদা আরও যেন বাড়িয়া গেল।

॥ ২ ॥

অধিকলাল স্কুল লাইব্রেরিতে বই লইবার জন্য গিয়াছিল। ফোর্থ মাস্টারই স্কুল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। তিনি প্রতি শনিবারে এক ঘণ্টা করিয়া লাইব্রেরিতে বসেন। অধিকলাল গিয়া দাঁড়াতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"তুমি এর আগে বই নিয়েছ কি?"

"না—"

"তাহলে ওই প্রথম আলমারিটা থেকে শুরু কর। প্রথম তাকে প্রথম যে বইটা আছে, সেইটে নিয়ে এস।"

অধিকলাল ডিকেন্সের লেখা 'অলিভার টুইস্ট' বাহির করিয়া আনিল এবং সেইটাই বাড়ি লইয়া গেল। পড়িতে গিয়া কিন্তু দেখিল, বিশেষ কিছু বোঝা যাইতেছে না। অভিধান দেখিয়া সাতদিনে পাতা চার পড়িল সে। পরের শনিবার বইটি লইয়া সে আবার ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের কাছে গেল।

"বড় শক্ত বই সার। ভালো বুঝতে পারছি না। ডিক্‌শ্‌নারি দেখে পড়তে হচ্ছে, সাতদিনে মাত্র চার পাতা পড়তে পেরেছি। আমাকে একটা সহজ বই দিন।"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "ওই বইটাই আবার নিয়ে যাও। ডিক্‌শ্‌নারি দেখে পড়তে হবে না, এমনি পড়ে ফেল।"

"কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না যে সার।"

"তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আগাগোড়া পড়ে ফেল সবটা। যখন কোন অচেনা শহরে যাও, তার সব কি বুঝতে পার? রাস্তায় রাস্তায় পার্কে ময়দানে হেঁটে বেড়ালেই যথেষ্ট মনে হয়। সবটা বোঝবার দরকার কি। তুমি পরে যদি ইংরেজি সাহিত্য পড় ও বই তোমাকে আবার পড়তে হবে, তখন ভালো করে পোড়ো। এখন এমনই পড়ে যাও—"

ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ের এই অদ্ভুত উপদেশ অনুসারে অধিকলাল দুই তিন মাসের মধ্যেই আলমারির সমস্ত ইংরেজি বইগুলি পড়িয়া ফেলিল—ডিকেন্স্, স্কট, জর্জ ইলিয়ট্, ফিলডিং বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যের যতগুলি নামজাদা ক্ল্যাসিক্যাল বই স্কুলে ছিল সবগুলিরই পাতা উল্টাইয়া গেল সে। অধিকাংশ বইয়েরই প্রকৃত অর্থ সে বুঝিল না বটে, কিন্তু দুই একটা কথা যাহা সে বুঝিল তাহারই সাহায্যে তাহার কল্পনা এক একটা নূতন নূতন গল্প সৃষ্টি করিল তাহার মনে। অনেক বইয়ে ছবিও থাকিত, ছবি থাকিলে অধিকলালের কল্পনা পাখা মেলিয়া উড়িত যেন। ইংরেজি বইয়ের আলমারি যখন শেষ হইয়া গেল তখন বাংলা বইয়ের আলমারি আরম্ভ হইল। তখন স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের সতী, বেহুলা, জড়ভরত, রামায়ণী কথা প্রভৃতি পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকলাল সেগুলি এক একদিনেই শেষ করিতে লাগিল। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় একদিন তাহাকে বলিলেন—"এক আলমারি ইংরেজি বই তো পড়ে ফেললে, এ বইগুলোর ইংরেজি অনুবাদ কর না। পারবে না?"

"পারব না কেন। করে ফেলতে পারি, কিন্তু আমার তো অনেক ভুল হবে সার। সেগুলো ঠিক করে দেবে কে—"

ফোর্থ মাস্টার যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল অধিকলাল।

"আমি রোজ রাত্রে আটটার সময় খাওয়াদাওয়ার পর হাঁটতে বেরুই। তুমি যদি অনুবাদ করে রাখ আমি রাত নটার সময় রোজ তোমার বোর্ডিংয়ে যাব। 'কমন রুমে' বসে সেগুলো দেখে দেব।"

"আচ্ছা সার, আমি করব—"

সেইদিন হইতে অধিকলাল প্রত্যহ অনুবাদ করিয়া রাখিত। ফোর্থ মাস্টার মহাশয়ও প্রতিদিন আসিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন। অধিকলাল ম্যাট্রিকুলেশন না পাশ করা পর্যন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ফোর্থ মাস্টার মহাশয় অবিবাহিত লোক ছিলেন। দেশ হইতে একটা বুড়ো চাকর আনিয়াছিলেন, সে-ই তাঁহার সব করিত। ছোট একটি বাসা ভাড়া করিয়া আলাদা থাকিতেন তিনি। ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক এবং সংস্কৃত খুব ভালো জানিতেন। প্রাইভেট ট্যুশনি করিতেন না। তেওয়াবি অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে পড়াইতে রাজি হন নাই।

॥ ৩ ॥

অধিকলালের স্কুলজীবনের বিস্তারিত বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। যে ঘটনাগুলিতে অধিকলাল-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাই বলিব। এই ইস্কুলেও হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় অধিকলাল সব বিষয়ে প্রথম হইল। সাফল্যের এই দীপ্তিতে সে যে নীচজাতীয় দোসাদ এ কথাটা যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল। হাবুল বোসের মতো দুর্ধর্ষ মাস্টারও তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। হাবুল বোসের পড়াইবার কায়দা ছিল প্রত্যেক ছেলেকে প্রচুর 'হোম টাসক্' দিতেন, প্রত্যেককেই বাড়িতে কুড়ি পঁচিশটি অঙ্ক কষিতে হইত। যাহারা পারিত না, তাহারা হাবুল বোসের নিকট মার খাইত। হাবুল বোস ক্লাসেও খুব তাড়াতাড়ি পড়াইতেন। তখন ইংরেজিতেই পড়ানো হইত। হাবুল বোস জ্যামিতি অনেকটা সিনেমার কায়দায় পড়াইতেন। বোর্ডের কাছে গিয়া বলিতেন—আজ ফার্স্ট বুক থেকে শুরু করছি। আমি বোর্ডে এঁকে যাচ্ছি তোমরা বলে যাও আমার সঙ্গে। বোর্ডে একটি সরলরেখা আঁকিলেন এবং তাহার নাম দিলেন A B। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের সমস্ত ছেলেদের বলিতে হইবে—Let A B be a straight line ঃ তাহার উপর আর একটি সরলরেখা দাঁড় করাইয়া দেন হাবুল বোস, তাহার নাম দেন C D ঃ সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের ছেলেদের বলিতে হইবে—Let the straight line C D stand upon it ঃ তাহার পর দুইটি সন্নিহিত কোণে দাগ দিবামাত্র ছেলেদের বলিতে হইবে—It is required to prove that the two adjacent angles are together equal to two right angles ঃ এইভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রথম থিয়োরেম পড়ানো হইয়া যাইত। তাহার পর আরম্ভ করিতেন দ্বিতীয় থিয়োরেম। এইভাবে একঘণ্টার মধ্যে তিনি ফার্স্ট-বুকটা শেষ করিয়া ফেলিতেন। কোন ছেলের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না, সমস্ত ছেলেকে 'নামতা ঘোষা'র মতো করিয়া বলিয়া যাইতে হইত। কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হাবুল বোস সঙ্গে সঙ্গে তাহার চুল টানিয়া দিতেন, বার বার আবৃত্তি করিয়া ছেলেরা জ্যামিতিটাকে মুখস্থ করিয়া ফেলিত। হাবুল বোস এই শিক্ষা পদ্ধতিকে গুড্ ওলড্ মেথড (Good old

method) বলিতেন। ফোর্থ মাস্টারও সপ্তাহে দুইদিন 'রিভিশন ক্লাস' (revision class) লইতেন। তিনিও জ্যামিতি পড়াইতেন, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে। তাঁহার লক্ষ্য থাকিত নুটে, ক্যাবলা, লখাই প্রভৃতি খারাপ ছেলেদের উপর। হাবুল বোস ছেলেদের বাড়ি হইতে 'extra' করিয়া আনিতে বলিতেন। অনেকেই পারিত না। হাবুল বোস দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিতেন। তাহার পর অবশ্য কোনও ভালো ছেলেকে বলিতেন—তুমি বোর্ডে গিয়ে এটা বুঝিয়ে দাও। অধিকলালকে প্রায়ই বোর্ডে গিয়া 'একস্ট্রা' বুঝাইতে হইত। ক্লাসের সব ছেলেই হাবুল বোসের নিকট একবার না একবার (অনেকেই একাধিকবার) মার খাইয়াছে, কিন্তু অধিকলাল একদিনও মার খায় নাই। হাবুল বোস তাহাকে যে শুধু ভালোবাসেন তাহা নয়, শ্রদ্ধাও করেন মনে মনে। সব মাস্টারই ভালোবাসেন তাহাকে। এমন কি পণ্ডিতজিরও দোসাদ-বিরোধী শক্ত মনোভাব অনেকটা নরম হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃতে এতো ভালো ছেলে তিনি একটিও পান নাই। তাছাড়া সে বিনয়ী, স্বল্পবাক, সত্যবাদী। একটিও মিথ্যাকথা কখনও বলে না। একদিন কিন্তু বলিয়াছিল, সেই ঘটনাটিই বলিব।

অধিকলাল বোর্ডিং-এ যে ঘরটিতে ছিল সে ঘরের অন্য তিনজনও যোগেন সা, বিলট্ ঝা এবং জ্ঞান বসাক অধিকলালের সহপাঠী। দোসাদ বলিয়া অধিকলালের বিরুদ্ধে তাহাদের মনে যে ক্ষোভ ছিল তাহার তীক্ষ্ণতা কমিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, অধিকলাল না থাকিলে হাবুল বোসের মারের চোটে তাহাদের পিঠের চামড়া হয়তো উঠিয়া যাইত। অধিকলালই সব অঙ্ক কষিত। তাহারা টুকিয়া লইত। সুতরাং অধিকলালের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞও ছিল তাহারা। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাফল ওয়ালের (baffle wall) আড়ালে সৈনিকরা যেমন আত্মরক্ষা করে অধিকলালের আড়ালে ইহারাও তেমনি নিজেদের কান এবং পিঠ বাঁচাইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই একটা মুশকিল হইল। ঘরে চুরি আরম্ভ হইয়া গেল। পয়সা চুরি। বিলট্ ঝার বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ নয়। সে একদিন বলিল তাহার জামার পকেটে খুচরা টাকা ছিল। বেশী নয়, মাত্র তিনটি। কিন্তু তাহা চুরি হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান বসাক বালিশের তলায় পয়সা রাখিত। সে একদিন বলিল আট আনা পয়সা কে সরাইয়াছে। যোগেন সা বলিল তাহারও বাক্স হইতে টাকা চুরি গিয়াছে। বিলট্ ঝা আড়ালে একদিন সকলকে বলিল—এ অধিকলালেরই কাজ। পড়াশোনায় হাজার ভালো হোক, ছোটলোকের ছেলে তো! কিন্তু একথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলা গেল না। তাহার পর আর এক কাণ্ড হইল। অধিকলাল একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখিল তাহার তালাটিও ভাঙিয়া কে তাহার সযত্ন-সঞ্চিত দশ টাকার নোটটি লইয়া গিয়াছে। এই নোটটি তাহাকে ভগবতি দেবী আসিবার সময় দিয়াছিলেন। অধিকলাল ঠিক করিয়াছিল নিতান্ত বিপদে না পড়িলে সে এটি খরচ করিবে না। বাক্সের তালা খুব মজবুত ছিল না। সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু চুপ করিয়া রহিল সে। বিলট্ ঝা এবং জ্ঞান বসাক বলিল যে সম্প্রতি তাহাদেরও টাকা-পয়সা চুরি গিয়াছে। তাহার পরদিন একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিল। যোগেন সা একটা এয়ার গান কিনিয়া আনিল। বলিল তাহার বাবা তাহাকে নাকি জন্মদিনে টাকা পাঠাইয়াছেন। সকলে অবাক হইয়া গেল। জ্ঞান বসাকের একটু হিংসাও হইল। সে গরীব ছেলে। তাহারও একদা 'এয়ার গান' কিনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বাবা কিনিয়া দেন নাই, দিতে পারেন নাই। বিলট্ ঝা

কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। দিন দশ পরে আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেদিন রবিবার। হঠাৎ দাড়িওলা গাঁট্টাগোঁট্টা একটি লোক আসিয়া হাজির। পরনে খাকীর প্যাণ্ট ও শার্ট। হাতে একগাছা লক্‌লকে বেত।

"যোগেন কোন ঘরে থাকে—"

যোগেন বাহির হইয়া আসিল।

"তুমি এয়ার গান কিনেছ?"

যোগেন মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"তুমি এদের বলেছ যে আমি তোমার জন্মদিনে তোমাকে টাকা পাঠিয়েছি?"

যোগেন মিথ্যা কথা বলিবার চেষ্টা করিল—"না, আমি—"

তিনি পকেট হইতে চিঠি বাহির করিলেন—"এই যে তোমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহিমাবাবু আমাকে লিখেছেন—"

বিলট্‌ ঝা বাহির হইয়া বলিল—"আমাদের টাকা পয়সা প্রায় চুরি যাচ্ছে।"

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে যোগেনের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে চাবকাইতে লাগিলেন।

"আমি দারোগা। অনেক চোরকে শায়েস্তা করেছি। আমার ঘরেই চোর জন্মেছে! আজ খুন করে ফেলব তোকে—"

শপাশপ্‌ বেত পড়িতে লাগিল। যোগেনের আর্তনাদে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। বোর্ডিংয়ের সব ছেলেরা নিজেদের ঘর হইতে বাহির হইয়া একটু দূরে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া যেন মজা দেখিতে লাগিল। মারের চোটে যোগেন পড়িয়া গেল, তবু তাহার বাবা তাহাকে মারিতে লাগিলেন।

অধিকলাল হঠাৎ আগাইয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

"আর মারবেন না ওকে—"

"আগে আমি জানতে চাই এ বন্দুক কেনার টাকা কোথা থেকে পেল—"

"আমি দিয়েছি।"

"তুমি? তুমি কে—"

"আমি ওর সঙ্গে পড়ি। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। আমরা এক ঘরে থাকি—"

মহিমবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি যোগেনের বাবাকে নীচে লইয়া গেলেন। অধিকলাল যোগেনকে মাটি হইতে তুলিয়া ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। যোগেন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। বিলট্‌ ঝা প্রশ্ন করিল—"তুমি ওকে বন্দুক কেনবার টাকা দিয়েছিলে? তবে তুমি যে বললে তোমার বাক্স ভেঙে কে দশ টাকা চুরি করেছে?"

সে কিছু বলিল না। স্বল্পবাক অধিকলাল বেশী কথা বলিত না। বিলট্‌ ঝা আরও কয়েকবার প্রশ্ন করিল। কিন্তু অধিকলাল কোন উত্তর দিল না।

একটু পরে মহিমবাবু তাহাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অধিকলাল গিয়া দেখিল যোগেনের বাবাও বসিয়া আছেন।

"তুমিই যোগেনকে বন্দুক কেনবার টাকা দিয়েছিলে?"

"হাঁ, সার—"

"তুমি টাকা কোথা পেলে? তোমার টাকা তো তপনবাবু ডাক্তার প্রতিমাসে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন—"

"আমি যখন এখানে আসি তখন মা আমাকে দশ টাকা দিয়েছিলেন।"

"তোমার মা? তোমার মা তো শুনেছি—"

"আমার মা নয়, তপনবাবুর স্ত্রী। তাঁকেও আমি মা বলি। আপনার বিশ্বাস না হয় চিঠি লিখে জানতে পারেন।"

"তুমি ও টাকা যোগেনকে দিতে গেলে কেন?"

"দেখলাম ওর ওই বন্দুকটা কেনার খুব ইচ্ছে। তাই দিলাম।"

মহিমবাবু ও যোগেনের বাবা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। যোগেনের বাবা পরের ট্রেনেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ছেলে যে চোর নয় ইহার প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন অনেকটা হালকা হইয়া গিয়াছিল। অধিকলাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যোগেন তেমনিভাবেই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতেছে। পরদিন যোগেন স্কুলে গেল না। স্কুল হইতে ফিরিয়া অধিকলাল দেখিল যোগেন নাই। টেবিলের উপর এয়ারগানটি রহিয়াছে। আর একটি চিঠি।

ভাই অধিকলাল, আমি আর এ ইস্কুলে পড়িব না। বাড়ি যাইতেছি। বন্দুকটি তোমাকে দিয়ে গেলাম। ইতি যোগেন।

।। ৪ ।।

অধিকলাল যেবার সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিল সে বছর তাহাকে একটি বড় সোনার মেডেল দেওয়া হইল। স্বর্গীয় জমিদার নিবারণ সিংহ বহুকাল পূর্বে এই মেডেলের টাকা দিয়াছিলেন। শর্ত ছিল—সব বিষয়ে যে ছেলে প্রথম হইবে তাকেই এই মেডেল দেওয়া হইবে। গত পনের বছর কোন ছেলে সব বিষয়ে প্রথম হয় নাই। অনেক টাকা জমিয়া গিয়াছিল। সেই টাকায় সোনার মেডেলই হইয়া গেল। মেডেলটি পাইবার পরই অধিকলাল বাড়ি চলিয়া গেল। সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের কাছেই মেডেলটি রাখিল সে। সমুন্দরি একটা ঝঙ্কার দিয়া পা সরাইয়া লইল।

"ই সব সোনা দানা লেকে হাম কি করব? মাইজিকে পাস দে যা কে—"

(এ সব সোনা দানা নিয়ে আমি কি করব। মাইজিকে দে এসব—)

সমুন্দরি মুখে একথা বলিল বটে কিন্তু তাহার চোখে মুখে গর্বের একটা দীপ্তি ঝলমল করিতে লাগিল। মেডেলটা তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল সে।

"চল মাইজিকে পাস্।"

(চল মাইজির কাছে)

তপনবাবু রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা হইল না। তনু দূর হইতে অধিকলালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর খবর দিল—"মা খুদরুদা এসেছে—।"

আগে তনু আসিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত এখন আর তাহা করে না। এখন সে বড়

হইয়াছে. এখন আগেকার মতো চপলতা প্রকাশ করিতে লজ্জা করে। সে বাহিরের দরজায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল এবং আনন্দে দুই হাত কচলাইতে লাগিল।

"নখু কোথা?"

"সে লাইব্রেরি ঘরে আছে। সেই তো এখন লাইব্রেরিয়ান। ডেকে আনব? পড়ার সময় বিরক্ত করলে সে রেগে যায়। জান? ভারী রাগী হয়েছে আজকাল।"

"এবারই তার পরীক্ষা. না?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, থাক ডাকতে হবে না। আমিই তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।"

সমুন্দরি বাড়ির ভিতর চলিয়া গিয়াছিল এবং ভগবতীকে মেডেলটি দিয়া বলিতেছিল—"ই তু, রাখ্‌খি দে। হামরা হুঁয়া চোরি হো যাইবে। যোগিয়া এক নম্বর চোর ছে—"

(তোর কাছেই রেখে দে। আমার ওখানে চুরি হয়ে যাবে। যোগিয়া একের নম্বর চোর)

"যোগিয়া আবার কে?"

"রামগোবিনোয়া কা বেটা—"

(রামগোবিনের ছেলে)

অধিকলাল গিয়া ভগবতী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"কি সুন্দর মেডেল পেয়েছিস তুই খুদক। চমৎকার মেডেলটি. তোর মা বলছে তোর বৌয়ের গলায় পরিয়ে দেবে।"

তনু বলিয়া উঠিল--"তোমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে জান খুদকুদা। ভগতলালের মেয়ের সঙ্গে। অনেক দেবে-থোবে। তোমাকে সাইকেল দেবে. ঘড়ি দেবে—"

অধিকলাল ইহাতে বিস্মিত হইল না। তাহাদের সমাজে এই বয়সেই তো বিবাহ হয়। সে ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক বই পড়িয়াছে। অনেক বাঙালী সাহিত্যিকই বাল্য-বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। তবু কিন্তু এ খবর শুনিয়া তাহার মন বিরূপ হইল না। ভালোই লাগিল বরং। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—

> বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে
> গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি
> বাঁধা কূপ, তরুতল বালিকা তুলিছে জল
> খরতাপে ম্লান মুখখানি

একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল মনে। ভগতলাল কোথায় থাকে, কি করে, কোন গ্রামে তাহার বাড়ি সে কিছুই জানে না. তবু মনে হইল রবীন্দ্রনাথ যাহা কল্পনা করিয়াছেন সেই পরিবেশেই বোধহয় তাহার বালিকা-বধূও মানুষ হইতেছে।

ভগবতী দেবী অধিকলালকে খাবার আনিয়া দিলেন। সমুন্দরিকে বলিলেন—"আজ মালপো করেছি। তোর আজবলাল আর সুলিয়া তিলিয়ার জন্যেও নিয়ে যাস। আজবলাল তো কখনও আসে না, সে পড়াশোনা করছে তো?"

সমুন্দরি বলিল—"উ বদমাশ ছে মাইজি, খালি গুড্ডি আর কবাড্ডি—"

(ও দুষ্টু ছেলে মাইজি, খালি ঘুড়ি আর হাড্ডু খেলা নিয়ে থাকে)

তনু বলিল—"ও সব ক্লাসেই ফেল করছে। মাইনার পাস করতে করতেই ওর গোঁফ উঠে যাবে।" বলিয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তুই চুপ কর। নখুকে ডেকে আন—"

অধিকলাল বলিল, "নখু পড়ছে ওকে এখন বিরক্ত করার দরকার নেই। আমি যাবার সময় ওর সঙ্গে দেখা করে যাব। নখুর রেজাল্ট্ কেমন হচ্ছে?"

"দাদাও ফার্স্ট হয় ক্লাসে। তুমিই ওর আদর্শ—"

তনু আবার ফোড়ন কাটিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"ক'দিনের ছুটি?"—ভগবতী দেবী প্রশ্ন করিলেন।

"আমি কালই চলে যাব। মাকে মেডেলটা দিতে এসেছিলাম।"

"খুব খুশী হয়েছি আমরা। এমনি করে দেশের দশের মুখোজ্জ্বল কর।"

অধিকলাল হঠাৎ প্রশ্ন করিল।

"আমার টাকা কি আপনারা পাঠান?"

"তোমার মায়ের সব গয়না বিক্রি করে যে টাকা হয়েছে সে টাকা উনি ব্যাঙ্কে fixed deposit করে দিয়েছেন। তার থেকে যে সুদ আসে তা তোমাকে পাঠিয়ে দেন, উনিও কিছু দেন।"

সমুন্দরি গজগজ করিয়া উঠিল। ছেকাছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ ডাক্তারবাবুর কথায় সব গহনাগুলো বিক্রয় করিয়া ভুল করিয়াছে সে। এখন পুতহুকে (পুত্রবধূকে) সে কি দেবে। মেয়েদেরও বিবাহ দিতে হইবে।

ভগবতী আশ্বস্ত করিলেন তাহাকে।

"সে হবে এখন, তার জন্যে ভাবছিস কেন। অধিকলাল যদি দাঁড়িয়ে যায় ওই সব করবে।"

অধিকলাল আর সেখানে দাঁড়াইল না।

"চল, নখুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

তনু বাহিরে গিয়া চুপিচুপি বলিল—"খুদরুদা, তোমার বউকে আমি দেখেছি। এখানে একদিন বাবার কাছে দেখাতে এনেছিল, চোখের জন্য। চোখটা একটু ট্যারা। বাবা বললে ও যেমন আছে থাক, লক্ষ্মী ট্যারা সুলক্ষণ। রং ফরসা—"

"তোর পছন্দ হয়েছে?"

"খুব যে একটা আহা-মরি তা নয়, তবে ভালোই। অনেক দেবে-থোবে। বাবার সঙ্গেই কথা হয়েছে সব।"

"তোমার বাবার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ। রংলাল বললে ডাক্তারবাবু যা বলবেন তাই হবে। তাই বাবাকে কথা বলতে হল।"

তনু পাকা গিন্নীর মতো ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া তাহার বিবাহের নানারকম খবর তাহাকে দিতে লাগিল। ভগতলাল নাকি খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। চৌরিয়া গ্রামে বাড়ি। জমিজমা আছে। মহিষের বাথানও আছে।

"বাবা রংলালকে বললেন এখানে বিয়ে হলে শ্বশুর পরে তোমার পড়ার খরচও চালাতে পারবে।"

"শ্বশুরের কাছ থেকে আমি পড়ার খরচ নেব না।"

"নেবে না?"

"না—"

"নেবে না কেন, শ্বশুর তো আপন লোক।"

"তুই থাম।"

লাইব্রেরি ঘরের সামনে আসিয়া অধিকলাল ডাক দিল, "নখু—"

সঙ্গে সঙ্গে নখু বাহির হইয়া আসিল।

"কে খুদরুদা, এস এস।"

"পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?"

"হচ্ছে একরকম। তোমার খবর কি।"

তনু বলিল—"খুদরুদা সোনার মেডেল পেয়েছে। মাকে দিতে এসেছে—"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। কি সুন্দর দেখতে মেডেলটা, আর কত ভারি! এক ভরি হবে বোধহয়, না খুদরুদা?"

"জানি না—"

"মা বলেছে ওটা ওর বউকে দেবে। একটা সরু সোনার হারে লকেটের মতো করে দিলে সুন্দব মানাবে।"

নখু ধমকাইয়া উঠিল—"তুই চুপ কর। এতো ফাজিল হয়েছিস তুই—"

অধিকলালের দিকে তাকাইয়া তনু মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"বলিনি তোমাকে, দাদা আজকাল ভয়ানক তিরিক্ষি হয়েছে। কথায় কথায় রেগে ওঠে।"

লাইব্রেরির আলমারির একটা খুরায় সরু লোহার শিকল বাঁধা ছিল একটা। সেটা দেখাইয়া অধিকলাল জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কি, কুকুর পুষেছিলে নাকি?"

"ও সে কথা তো তোমাকে বলাই হয়নি। কুকুর নয়, নেউল বাচ্চা পুষেছিলাম একটা। লেধু গোয়ালা মাঠ থেকে এনে দিয়েছিল।"

তনু ঘটনাটা সোৎসাহে বর্ণনা করিবার জন্য আগাইয়া আসিল।

"কই সেটা—"

"ওরে বাবা। ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছি। তাও যেতে চায় না। প্রথম দিন এসেই তো আমাদের পাত থেকে মাছ তুলে নিয়ে গেল। মারলেও শোনে না। হরুর শেষকালে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে। ও কি দড়িতে বাঁধা থাকবার পাত্র! কুটুস করে কেটে দিলে দড়ি। তারপরে রান্নাঘরে ঢুকে কাঁচা মাছই নিয়ে এল একটা। মার মার ধর ধর—শোনে কি। শেষ কালে বাবা বললে একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ। আমাদের টম কুকুরের একটা শিকল ছিল, সেইটে খুঁজে হরুর যেই বাঁধতে গেছে—অমনি তার হাত কামড়ে দিলে। রক্তারক্তি কাণ্ড। তবু হরুর ছাড়েনি, গলায় শিকল বেঁধে এইখানে নিয়ে এল। তারপর আমি যেই দুধ দিতে গেছি—সে কি রাগ—গরগর গরগর করে আমাকে তেড়ে এল। আমি তো দে ছুট! আর একটু হলেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। মা বললে ওকে রাখতে হবে না। বিদেয় করে দে। লেধু বললে দু'চার দিন পরেই পোষ মেনে যাবে, বিল্লীর মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে। কিন্তু মা কিছুতেই রাজী হল না।

ছেড়ে দেওয়া হল। তবু যেতে চায় না। শেষে দেখ মার করতে পালাল। এখন মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দেয় এসে!"

"ও, আচ্ছা—"

ইহার বেশী অধিকলাল কিছু বলিল না। তনু একটু দুঃখিত হইল ইহাতে। তাহার মনে হইল খুদরুদাও কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

অধিকলাল বলিল—"লাইব্রেরিটা ঠিক করে রেখেছ তো?"

"হ্যাঁ—"

"নতুন বই কি কি কেনা হয়েছে?"

"পুরোনো মাসিক পত্রগুলো বাঁধিয়েছি। শরৎচন্দ্রের কিছু বই কেনা হয়েছে।"

"চল দেখি।"

অধিকলাল সেদিন যখন ফিরিয়া আসিল তখন একটি কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার বিবাহ হইবে। তাহার মনের আকাশ নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। তাহার ভাবী বধূ যে ঈষৎ ট্যারা এ সংবাদে সে বর্ণচ্ছটার মহিমা এতটুকু কমিল না।

তনু তাহার বাল্যসঙ্গিনী। সে সুন্দরী, তাহাকে সে ভালও বাসে কিন্তু তাহাকে সে তাহার প্রণয়িনী বা পত্নীরূপে একবারও কল্পনাও করিল না। এ সম্ভাবনা তাহার মাথাতেই আসিল না। তখনও সে অনাধুনিক ছিল। 'সব মানুষই সমান' এই মন্ত্রের মদিরা পান করিয়া তখনও সে সহস্রবাহু স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী হয় নাই। পশুদের সহজাত সংস্কারের মতো সেকেলে নীতি তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। কোনদিনই সে একেলে আধুনিক হইতে পারে নাই, এইটাই বোধহয় তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি।

॥ ৫ ॥

অধিকলাল যেবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠিল সেবার একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। রংলাল এবং সমুন্দরি বোর্ডিংয়ে আসিয়া হাজির। সমুন্দরির মাথায় প্রকাণ্ড একটা কাপড় ঢাকা রঙীন ডালাতে প্রচুর 'ঠেকুয়া' এবং 'খাবুনি'। কয়েকদিন আগে 'ছট্ পরব' হইয়া গিয়াছিল। তাহারই 'পরসাদ' আনিয়াছে। অধিকলালের জন্যই সমুন্দরি নাকি মানত করিয়াছিল। এবারও অধিকলাল ফার্স্ট হইয়া প্রমোশন পাইয়াছে।

অধিকলাল একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এত 'প্রসাদ' লইয়া সে কি করিবে। দোসাদের বাড়ির 'প্রসাদ' তো কেহ খাইবে না।

মাকে বলিল—"এত প্রসাদ খাবে কে? তুই কি ভুলে গেছিস আমরা 'দোসাদ', আমাদের ছোঁয়া কেউ খাবে না! এখানে সব 'উঁচা' জাতের ছেলেরা থাকে।"

রংলালও একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

"আমিও তাই বলেছিলাম। কিন্তু তোমার মাকে তো চেন, যা জিদ ধরবে ছাড়বে না।"

সমুন্দরির দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইল। সে ছেকাছেনি ভাষায় যাহা বলিল

তাহার সরল বাংলা—দেবতার প্রসাদ লইয়া যাহারা জাত-বিচার করে তাহারা মানুষ নয়। দেবতার কাছে আবার 'উঁচা' জাত 'নীচা' জাত কি। সব জাতই সমান।

স্তান বসাক আগাইয়া আসিয়া কহিল—"ঠিক বলেছিস মাই। আমার কোন জাত-বিচার নেই আমাকে প্রসাদ দে—"

সে হাত পাতিয়া প্রসাদ লইল এবং খাইয়া ফেলিল। বিলট্ ঝা ঘরের ভিতর বসিয়া পড়ার ভান করিতেছিল।

স্তান বলিল—"বিলট্ তুমি খাবে নাকি, চমৎকার খাবুনি। খেয়ে ফেল, দেবতার প্রসাদে দোষ নেই—"

বিলট্ ঝা তবু 'গুম' হইয়া বসিয়া রহিল।

স্তান বলিল—"এক কাজ করি। পণ্ডিতজির ঘরে গঙ্গাজল আছে, সেই গঙ্গাজল এনে ছিটিয়ে দি ওগুলোর উপর। তাহলে শুদ্ধ হয়ে যাবে।"

সমুন্দরি বলিল, "না বেটা। ভগবানের প্রসাদকে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয় না, আমি তোমাদের জন্য এনেছি, যার খুশি হয় খাও, আমি কোন জবরদস্তি করছি না। এর বিচার ছট্ মাই করবেন, সুরুয দেব (সূর্যদেব) করবেন। ওঁদের 'দোয়াতে'ই (আশীর্বাদেই) আমার খুদরু প্রত্যেক ইন্‌তিহানে (পরীক্ষায়) ভালো করেছে। তাই আমি তোমাদের জন্যও এনেছি। তোমরা ভালো হও এই আমি চাই—।"

বিলট্ ঝা সেবার ইংরাজিতে ফেল করিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সে একটু দ্বিধায় পড়িল। এমন সময় বোর্ডিংয়ের চাকর রণছোড় আসিয়া হাজির। বোর্ডিংএ সেই অধিকলালের গার্জেন ছিল। যখন তখন আসিয়া খবর লইত। সেই একমাত্র লোক যে তাহাকে বলিয়াছিল তোমার কোন ভয় নাই। কোন বিপদে পড়িলে আমি 'জি জান' (জীবন) দিয়া তোমাকে রক্ষা করব। অধিকলাল স্কুলের নাম-করা ভালো ছেলে এবং সে জাতে 'দোসাদ', 'তাহারই জাত', এই অহঙ্কারে সে মশগুল হইয়া থাকিত। অধিকলালের মা-বাবা আসিয়াছে সে জানিত না। সে-ও অধিকলালের জন্য দুইটি 'ঠেকুয়া' শালপাতায় মুড়িয়া লইয়া আসিয়াছিল। অধিকলালের বাবা-মার পরিচয় পাইয়া এবং এক ডালা ঠেকুয়া খাবুনি দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল সে। সমুন্দরিকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—"মাই হাম ভি তোর বেটা ছি।"

খুব খুশী হইল সমুন্দরি। বলিল, "তাহলে এই প্রসাদগুলো তুই সকলের মধ্যে বেঁটে (ভাগ করে) দে।"

"জরুর।"

রণছোড় কয়েকখানা খাবুনি তুলিয়া অধিকলালের ঘরের ভিতরই প্রবেশ করিল।

"তোমরা সব খেয়েছ?"

স্তান বলিল—"বিলট্ ঝা খায়নি। ও দোসাদের ছোঁয়া খাবে না।"

"ই-স"

রণছোড় ফোঁস কবিয়া উঠিল:

"চৌবাচ্চার যে জলে রোজ 'আস্নান' (স্নান) কর সে জল কে তোলে? দোসাদ রণছোড়। যে বাসনে রোজ খাও সে বাসন কে মলে (মাজে)? দোসাদ রণছোড়। দোসাদের ছোঁয়া ছটের

'পরসাদ' তুমি খাবে না? লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হচ্ছে তোমার! 'মন্ যব চাংগা কঠৌতিমে গঙ্গা' (মন শুদ্ধ থাকিলে বাটির জলও গঙ্গাজল বলে মনে হয়) এ কথা কি তুমি জান না?"

অধিকলাল হঠাৎ রুখিয়া দাঁড়াইল।

"ওর যখন প্রবৃত্তি হচ্ছে না তখন জোর করে ওকে খাওয়াবার দরকার কি। ওর টেবিলে একটা রেখে দাও ওর ইচ্ছে হলে খাবে না হলে খাবে না।"

বিলট্ ঝা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"দাও, দাও খাচ্ছি।"

বিলট্ ঝা একটা খাবুলিন লইয়া গপগপ করিয়া খাইতে লাগিল।

সমুন্দরি বলিল মাস্টারবাবুদের বাড়িতে গিয়াও সে প্রসাদ দিয়ে আসিবে।

অধিকলালের মা-বাবা আসিয়াছে শুনিয়া বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেন্ট আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিলেন। তাহাদের দেওয়া প্রসাদ মাথায় ঠেকাইয়া তাহাদের সামনেই একটু ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন।

বলিলেন, "চমৎকার হয়েছে, সবটাই খেয়ে ফেলতুম। কিন্তু আমি পেটরোগা লোক।"

এক পণ্ডিতজি ছাড়া সব মাস্টারই পরমানন্দে ছটের প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। পণ্ডিতজি একটি ঠেকুয়া মাথায় ঠেকাইয়া সেটি রণছোড়কেই দিয়া দিলেন—"তোহি খা যা" (তুইই খেয়ে ফেল)।

অধিকলাল মা ও বাবাকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বরাবরই একটু মুখ-চোরা প্রকৃতির, এভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া সে যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"বেকার ঠেকুয়া লে করি কে কি সব হাল্লা মাচাইছি।"

(ঠেকুয়া নিয়ে কি সব বাজে হইচই করছিস)

সমুন্দরির চোখের দৃষ্টি রোষদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে সংক্ষেপে উত্তর দিল—"হামরা খুশি।"

রংলাল মুখ কাঁচুমাচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে-ও একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু কিছু বলে নাই। এইবার বলিল—"আব তো সব ভে গেল। আব ঘর চ—"

"তু চুপ র। অব্ চল হেডমাস্টার বাবুকা পাস। খুদরু তু চল হামারা সাথ।"

(তুই চুপ কর। এবার চল হেডমাস্টার বাবুর কাছে। খুদরু তুই সঙ্গে চল—)

অধিকলাল ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"নেই, হাম্ নেই যাইবো।"

(না, আমি যাব না)।

"কাঁহে? তো কো যানেই পড়তে।"

(কেন? তোকে যেতেই হবে)

অধিকলাল ইতস্তত করিতেছিল কিন্তু সমুন্দরি তাহাকে হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

সেদিন ছুটির দিন ছিল। হেডমাস্টার মহাশয় বাড়িতেই ছিলেন। তিনি সমুন্দরি ও রংলালকে খুব খাতির করিলেন। চেয়ারে বসিতে দিলেন। চেয়ারের সামনে ছোট একটি টেবিল দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা আনাইয়া চিনেমাটির প্লেটে খাইতে দিলেন। জল দিলেন কাচের গ্লাসে। সমুন্দরি এতটা সাড়ম্বর অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করে নাই। সে অভিভূত হইয়া পড়িল। রংলাল প্রথমে চেয়ারে বসিতে চাহে নাই। কিন্তু মাস্টার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত

তাহাকে বসিতে হইল। হেডমাস্টার মহাশয় ভালো হিন্দী জানিতেন না। তিনি সমুন্দরিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"আপ রত্নগর্ভা হেঁ। অধিকলাল খুব ভালো ছেলে হ্যায়।"

সমুন্দরি উত্তরে বলিল—"বড়া ভিতরগুম্‌মা (ভিতর-বুঝে) ছে, মাস্টার সাহেব।"

হেডমাস্টার 'ভিতরগুম্‌মা' বুঝিলেন না। সহাস্যবদনে বলিলেন—"সব ঠিক হয়ে যাবে। উন্নতি করবে ও জীবনে।"

অধিকলালকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা বাবাকে ভক্তি কোরো। ওঁদের মনে কোনও কষ্ট দিও না।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার মাকে সহসা সে যেন নূতন রূপে আবিষ্কার করিল। যে মা রামগোবিনের গোলায় গহুম ফাটকায়, সেই ব্যক্তি আর এই ব্যক্তি এক? কেমন স্বচ্ছন্দে গর্বিতভাবে হেডমাস্টার মহাশয়ের সামনে চেয়ারে বসিয়া আছে। মায়ের দিকে চাহিয়া সত্যই সে বিস্মিত হইয়া গেল।

।। ৬ ।।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পরই অধিকলালের বিবাহ হইয়া গেল। যদিও ডাক্তারবাবু বেশী খরচ করিতে মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুন্দরি তাঁহার মানা শোনে নাই। বেশ ধুমধাম করিয়াই প্রথম পুত্রের বিবাহ দিল সে। তখন লাউডস্পীকারের প্রচলন হয় নাই। তবু ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসি এবং রামশিঙা বাজাইয়া চতুর্দিক সচকিত করিয়া তুলিল সমুন্দরি। অনেক 'গোতিয়া' (আত্মীয়) আসিয়া পুরি (লুচি), তরকারি, দহি (দই), বুনিয়া (বোঁদে) এবং 'লাড্‌ডুর' (মণ্ডার) ভোজ খাইল। দোসাদ সমাজে একটা ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সমুন্দরি যে এতটা করিতে পারিবে তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই। শুধু ইহাই নয়, সে ভগবতী দেবীর জন্য একটি ভালো শাড়ি, ডাক্তারবাবুর জন্য ভালো ধুতি-চাদর, তনুর জন্য একটি রঙীন শাড়ি এবং নখুর জন্যও একটি ধুতি কিনিয়া আনিয়া এক ডালিয়া খাবার সহ মাইজিকে 'পরণাম' (প্রণাম) করিতে গেল। গিয়া খুব বকুনি খাইল। ডাক্তারবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন। সমুন্দরির এইসব বাহাদুরি দেখিয়া তিনি খুব রাগারাগি করিতে লাগিলেন। সমুন্দরিকে প্রশ্ন করিলেন টাকা লইয়া এমনভাবে ছিনিমিনি খেলাব মানে কি। সমুন্দরি সংক্ষেপে উত্তর দিল—"হামার খুশি বাবু। গালি নেহি দে, দোয়া মাঙেই ছি।"

(আমার খুশি বাবু। গাল দিও না, আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি)

সমুন্দরির মলিন বসন দেখিয়া ভগবতী প্রশ্ন করিলেন—"তুই নিজে তো ভালো কাপড় পরিসনি—"

"না মাইজি। পয়সা ওরাই গেলে। খুদরুয়াকো বাপ রো বাস্তে, লাল পাগড়ি—"

বলিয়াই সে ঘাড় ফিরিয়াই মুখে কাপড় ঢাকা দিল। হঠাৎ লজ্জা হইল তাহার। রংলালের জন্য সে একটি লাল পাগড়ির কাপড় কিনিয়াছিল, এ কথাটা বলিতে পারিল না সে। রংলাল যে সেই লাল পাগড়ি পরিতে চাহিতেছে না এ কথাও সে বলিতে পারিল না।

"তুই এত টাকা পেলি কোথা?"

"কর্জা করলি।"

(ধার করেছি)

"কর্জা করে করেছিস, কর্জা শুধবে কে?"

"খুদরুবা, আর কে। উ যব হাকিম বনতে তব শোধ করতে।"

(খুদরুবা, আর কে। ও যখন হাকিম হবে তখন শোধ করবে)।

"ও যে হাকিম হবে তা তোকে কে বললে?"

"হাম জানৈছি।"

(আমি জানি)

"হাকিম হওয়া কি মুখের কথা! সেই ভরসায় তুই কর্জা করছিস?"

"জরুর।"

ডাক্তারবাবু সমুন্দরির দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া মনে মনে কৌতুকবোধ করিলেন। কিছু না বলিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন তিনি।

ভগবতী দেবী বলিলেন—"তোকে আমি একটা নতূন শাড়ি দিচ্ছি। এটা তুই পরবি। তোর বউয়েব শাড়ি তো পাঠিয়ে দিয়েছি। পছন্দ হয়েছে?"

"হ্যাঁ বড়া বঁঢ়িয়া। রেশম ছে—"

("হ্যাঁ, খুব সুন্দর। রেশম তো)

"তোর বউয়ের নাম কি?"

"ফুলেশ্বরী।"

"বাঃ, বেশ বাহারের নাম তো। বউ পছন্দ হয়েছে?"

"জিদ্দি মালুম হৈ ছে—"

(মনে হচ্ছে জিদি)

"কি করে বুঝলি?"

সমুন্দরি বলিল, রাত্রে পুরি দিলাম। বউ বলিল, পুরি আমি খাইব না। কিছুতেই খাইল না, ভাত চাই। অত রাত্রে শেষে ভাত রাঁধিয়া দিতে হইল। ওইটুকু মেয়ে, তার জেদ দেখ! ওকে টিট্ করিতে সময় লাগিবে।

অধিকলালের কিন্তু ফুলেশ্বরীকে ভালোই লাগিল। কতই বা বয়স। বারো তেরোর বেশী নয়। কিন্তু সকলেই তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল— ফুলের মালাগাছি, বিকাতে আসিয়াছি, পরখ করে সবে করে না স্নেহ। তনু ঠিক খবরই দিয়াছিল। ডান চোখটা সামান্য টেরা। কিন্তু তাহাতে খুব খারাপ দেখাইতেছে না তো, তাহার তো বেশ ভালোই লাগিল। সুলিয়া তিলিয়া দুইজনেই বলিল বউ নাকি বেশ রাগী। তাহারও সে কথা মনে হইয়াছে। বিছানায় বাঁকিয়া শুইয়াছিল। সে যখন বলিল 'সিধা হোক হটকে শুতো' (সোজা হয়ে সরে শোও) তখন সে সরিয়া শুইল না। তাহার পর অধিকলাল যখন তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল তখন সে বলিয়া উঠিল—'ভক্' (যাঃ)। একটু রাগীই। কিন্তু অধিকলালের তবু খারাপ লাগে নাই। ভালোই লাগিয়াছিল। বিবাহান্তে সে যখন কলেজে গিয়া

ভরতি হইল তখনও মাঝে মাঝে ফুলেশ্বরীর স্বপ্নটা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িত।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে।

মনে হইত :—

আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়
বুঝিতে পারি নে তব
কত ভাব নব নব
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হোক।

কিছুদিন পরেই পরীক্ষাব ফল বাহির হইল। অধিকলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। দুইটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মেডেলও পাইয়াছে সে। সংস্কৃতে এবং বাংলায় 'লেটার'। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তপনবাবু তাহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার এক আত্মীয় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন। ভরতি করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। সে ইডেন হিন্দু হোস্টেলেও ভর্তি হইতে পারিত। কিন্তু সে মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি ছোট মেসে গিয়া উঠিল। সেই মেসে তাহার বন্ধু স্তান বসাকও ছিল। সে ভরতি হইয়াছিল বঙ্গবাসী কলেজে। থার্ড ডিভিসনে কোনরকমে পাশ করিয়াছিল সে। পাঁচ ছয়টি গরীব ছেলে মেসের একতলায় তিনটি ঘরে থাকিত। বাড়িওয়ালা থাকিতেন দ্বিতলে। হঠাৎ একদিন বাড়িওয়ালার সহিত দেখা হইয়া গেল অধিকলালের।

"অধিকলাল তুমি এখানে? চিনতে পারছ আমাকে?"

অধিকলাল চিনিতে পারে নাই। স্তান বসাক পারিল।

"আরে যোগেন যে। তুমি এখানে!"

"এটা তো আমারই বাড়ি। আমি দোতালায় থাকি। দেশে গিয়েছিলাম আজ ফিরেছি। নীচের তলায় মেসটা অনেকদিন থেকে আছে, বাবার আমোল থেকে। তোরা এই মেসে জুটে যাবি তা ভাবতেই পারিনি—"

অধিকলাল সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল—"তোমার বাবা কেমন আছেন?"

"তিনি মারা গেছেন!"

"ও। তুমি কোথায় পড়ছ?"

"আমি আর পড়ছি না। ব্যবসা করি। ওপরে থাকি, আর দোকানে যাই।"

"কিসের দোকান—"

"কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান করেছি একটা। তুমি?"

"আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েছি এবার!"

"ইডেনে জায়গা পেলে না বুঝি—"

"পেয়েছিলাম কিন্তু ওখানে বড্ড বেশী খরচ। আমি চালাতে পারব না। তারপর জ্ঞানের সঙ্গে দেখা হল—এই মেসেই চলে এলাম।"

হঠাৎ যোগেন অধিকলালের দুই হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল—"তোমার কথা আমি ভুলিনি ভাই। তুমি আমার বাড়িতে এসেছ এতে আমি কি যে খুশী হয়েছি তা তোমাকে কি বলব। নীচের ঘরে তোমার কষ্ট হয় তুমি আমার উপরের ঘরে এসে থাক। আমি ওপরে একা থাকি—বিয়ে থা করিনি—"

অধিকলাল মৃদু হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা সে দেখা যাবে এখন!"

যোগেন আরও বার কয়েক তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল কিন্তু অধিকলাল উপরের ঘরে গিয়া যোগেনের স্বাচ্ছন্দ্যে ভাগ বসায় নাই।

[এইখানে খানিকটা উইপোকায় নষ্ট করিয়াছে। এইটুকু মাত্র পড়া যায়]

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধিকলাল একটি অদ্ভুত জীবরূপে গণ্য হইয়াছে। রসিক বাঙালী সহপাঠীরা নানা রকম নামকরণ করিয়াছে তাহার। অনেকেই আড়ালে তাহাকে 'জন্তু' বলিয়া ডাকে। 'ধিক ধিক' নামকরণও করিয়াছে কেহ কেহ। তাছাড়া সে যে ছাতুখোর ইহা লইয়াও তাহাদের মধ্যে রসিকতার অন্ত নাই। 'রুফু' 'আমব্রেলু' 'যবচূর্ণ' প্রভৃতি নানা নামে ডাকে তাহারা তাহাকে। অধিকলাল যদি রাগরাগি করিত তাহা হইলে তাহারা জো পাইয়া যাইত। কিন্তু অধিকলাল রাগিত না, হাসিত। একদিন একটি ছেলেকে কেবল বলিয়াছিল, এসো আমরা দু'জনে ভাব করি—আমি সাতু তুমি ভাতু। চমৎকার মিল আছে।

[ইহারও পরে খানিকটা নাই................................।]

একদিন একটি ছেলে তাহার টিকি কাটিয়া লইয়াছিল। অধিকলাল নাকি হাসিয়া বলিয়াছিল, "টিকি আবার গজাবে। কিন্তু তুমি আর গজাতে পারবে কি? নিজেকেও তুমি কেটে ফেলেছ যে—"

[যে যে অংশ নাই তাহা কেবল......এই চিহ্ন দিয়া চিহ্নিত করিলাম]

....

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অধিকলাল এবার ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার সহিত ব্র্যাকেটে আর একটি ছাত্রও এ সম্মান পাইয়াছে। তাহার নাম জ্যোতির্ময় রাহা। গুজব রটিয়াছে যে জ্যোতির্ময় জনৈক নামজাদা প্রফেসারেব পুত্র বলিযা তাহাকে জোর করিয়া অধিকলালের পাশে বসানো হইয়াছে। আসলে ছেলেটি নাকি তত ভালো নয়। অন্যান্য বিষয়ে মোটেই ভালো নম্বর পায় নাই। তবে এটা গুজবও হইতে পারে। কারণ অধিকলাল নিজে বলিল, জ্যোতির্ময় ইংরেজিতে সত্যই খুব ভালো ছেলে। সম্প্রতি তাহার বিবাহ হইয়াছে, এবং বউ লইয়া খুব মাতামাতি করিয়াছে, তাই পরীক্ষায় খুব ভালো ফল হয় নাই। পরীক্ষার আগেও বই ছোঁয় নাই। বউকে দৈনিক দু'খানা করিয়া চিঠি লেখে নাকি। একটা গদ্যে, আর একটা পদ্যে। তাহার স্ত্রীর চিঠিও জ্যোতির্ময় তাহাকে দেখাইয়াছে। গোলাপী কাগজের উপর সবুজ কালিতে লেখা। চমৎকার চিঠি। ফুলের মতো যেন—এই উপমাটাই অধিকলালের মনে

হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নিজের বউ ফুলেশ্বরীকেও মনে পড়িয়াছিল তাহার। মনে হইয়াছিল, এখন নিশ্চয় আরও বড় হইয়াছে। এখনও তো 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হয় নাই। এ কথাও তাহার মনে হইয়াছিল নাম যদিও ফুলেশ্বরী কিন্তু অমন ফুলের মতো চিঠি লিখিতে পারিবে? চিঠি যদি নাও লেখে ....

অধিকলালের প্রকৃত বন্ধু ছিল দুইজন। একজন বাংলাদেশের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আর একজন আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন্। যখনই তাহার জীবনে কোনও সমস্যার উদ্ভব হইত তখনই সে ভাবিবার চেষ্টা করিত এ অবস্থায় পড়িলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বা আব্রাহাম লিংকন্ কি করিতেন। আর সে ভক্তি করিত রবীন্দ্রনাথকে। রোজ সকালে উঠিয়া সে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাঠ করিয়া পড়াশোনা আরম্ভ করিত।

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এই কবিতাটি তাহার প্রিয়তম কবিতা। এটি সে আবৃত্তি করিত প্রত্যহ সকালে। . .

... .ছাতু খাইয়া আজকাল থাকে সে। মেসে খাওয়া ছাড়িয়া দিযাছে। একটি প্রাইভেট ট্যুশনিও লইয়াছে। তাহার ভাই আজবলালকে পড়াইবার জন্য মাসে মাসে টাকা পাঠাইতে হয়। সেদিন মায়ের জন্য একটি শাড়ি কিনিয়া পাঠাইয়াছে, বাবার জন্যে একটি কামিজ। এজন্য যোগেনের নিকট কিছু ধার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরের মাসেই সে ধার শোধ করিয়া দিয়াছে। যোগেন টাকা ফেরৎ লইতে চাহে নাই, কিন্তু অধিকলাল না-ছোড়।

....

সেদিন একজন প্রফেসর নাকি তাহাকে বলিয়াছেন তোমার 'অধিকলাল' নামটা বদলাইয়া ফেল। ও নামের কোন অর্থ হয় না, শুনিলে হাসি পায়। তোমার রং কুচকুচে কালো, তোমার নাম অধিকলাল মানায় কি? অধিকলাল সবিনয়ে উত্তর দিয়াছিল আমার বাবার রাখা নাম আমি কি বদলাইতে পারি? নামের সহিত লোকের জীবনের মিল হয় না সব সময়ে। আপনার নাম যজ্ঞেশ্বর, আপনি কি—। যজ্ঞেশ্বরবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন—ঠিক বলেছ, আমার নাম হওয়া উচিত ছিল কীটাণুকীট। তাঁহার পেপারে অধিকলাল পরের বার কিন্তু খুব কম নম্বর পাইয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরবাবু বিদ্বান লোক, প্রফেসারও ভালো, কিন্তু উদার নন। অধিকলাল কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তায মুগ্ধ। সে একদিন যোগেনকে বলিয়াছিল—'আমি ওঁকে ভক্তি করতে চাই, কিন্তু পারি না। সেটা আমারই অক্ষমতা। হিমালয় পাহাড়ে কি সবাই উঠতে পারে? আমি ....

অধিকলাল কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিল তাহার বাবা রংলাল আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রংলালের চেহারা সামান্য কুলির মতো। কাঁচা-পাকা গোঁফ। মাথার চুলও কাঁচা-পাকা। যোগেন তাহাকে প্রথমে আমল দেয় নাই। সে যখন বলিল অধিকলালের বাবা সে, তখনও কথাটা বিশ্বাস করে নাই। জ্ঞান কিন্তু অধিকলালের বাবাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

সমুন্দরি আর রংলাল যখন খাবুনি লইয়া বোর্ডিংয়ে গিয়াছিল তখন জ্ঞান ছিল, যোগেন ছিল না। রংলালের চেহারায় এই কয় বৎসরে বয়সের ছাপ পড়িয়াছে। মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। তাহার মুখের সেই অপ্রস্তুত কুণ্ঠিত হাসিটা কিন্তু ঠিক আছে। এই হাসিটি দেখিয়াই জ্ঞান তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। রংলাল অধিকলালের কাছে একটি বৈষয়িক প্রয়োজনে আসিয়াছিল। তিলিয়া এবং সুল্যিার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। একটি সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের দুইটি ছেলেকে সমুন্দরি পছন্দ করিয়াছে। পাত্র-পক্ষও আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে তিলিয়া সুলিয়াকে। খবর পাঠাইয়াছে যে তাহারা বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছে যদি রংলাল তাহার দুই মেয়েকে এক এক হাজার টাকার জেবর (গহনা) দেয়। ইহা ছাড়া পাত্র দুইটিকেও সোনার হাতঘড়ি, সাইকেল, ভালো রেশমের জামা ও মূল্যবান জুতা দিতে হইবে। এসব ছাড়াও শাশুড়ী-জাতীয়া প্রণম্যাদের জন্য কাপড় আছে, গোতিযাদের (কুটুম্বদের) ভোজ আছে, বাজা-বাজনা আছে (সমুন্দরির খুব ইচ্ছা বিবাহে লাউডস্পীকার সহযোগে গান বাজানো হয়)—কিন্তু এ সবের জন্য টাকা দরকার। অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা। রামগোবিন টাকা দিবে বলিয়াছে। কিন্তু সে হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া তবে টাকা দিবে। অধিকলালের বিবাহেও দুই হাজার টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। সে টাকাও রামগোবিন দিয়াছিল। সে টাকার জন্য হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে হইবে। রামগোবিন বলিয়াছে অধিকলালকেই হ্যাণ্ডনোটে সই করিতে হইবে। তাছাড়া রংলালকে দিতে হইবে টিপসই। রংলাল হ্যাণ্ডনোটটি লিখাইয়া লইয়া আসিয়াছে। অধিকলালের সই চাই। রামগোবিন রংলালের উপর কিঞ্চিৎ কৃপাও যে করে নাই তাহা নহে। সে বলিয়াছে যে যেহেতু রংলাল তাহার পুরাতন 'দোস্ত' সেহেতু সে তাহার নিকট হইতে সুদ লইবে না। অধিকলাল নীরবে সব শুনিল, তাহার পর হ্যাণ্ডনোটখানা পড়িল। বলিল, "আমি তো এখনও কিছু রোজগার করতে পারি না, পরে কত রোজগার করতে পারব তাও জানি না, ধার যদি শোধ না করতে পারি তাহলে কি হবে?" রংলাল অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর বলিল—"রামগোবিনই আমাকে কিছুদিন আগে তার জমির পাশে পাঁচ বিঘে জমি কিনে দিয়েছিল। আমি প্রতি মাসে খেটে খেটে সে জমির দাম উসুল করেছি। এখন আমিই সে জমির মালিক, টাকা যদি শোধ না হয় সেই জমিই রামগোবিনকে দিয়ে দেব। এর জন্যে আর একটা বন্ধকী দলিলও করতে হবে। তুমি এখন এই কাগজটায় সই করে দিলেই রামগোবিন টাকা দিয়ে দেবে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে যাক তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। সবই ভগবানের হাত।"

অধিকলাল কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল তাহার পর সই করিয়া দিল।

তাহার পর বলিল—"বাবু, চল তোমাকে ভালো শরবত খাওয়াই। কাছেই খুব ভালো একটা শরবতের দোকান আছে।"

যোগেন বলিল, "চল না একটা ভালো হোটেলে যাওয়া যাক—।"

অধিকলাল হাসিয়া উত্তর দিল, "বাবু মাছ মাংস খান না। হোটেলে গিয়ে কি হবে। তার চেয়ে বরং কোনও দোকান থেকে ভালো মালপোয়া কিনে" ....

একদিন মেসে হইহই পড়িয়া গেল। অধিকলাল বাংলায় কবিতা লিখিয়াছে একটা। চমৎকার কবিতা। সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল। কলেজের একজন অধ্যাপকও বলিলেন—

"চমৎকার হয়েছে কবিতাটা। এটা কোনও ভালো মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দাও।" তিনি সেকালের একটা নামজাদা মাসিক পত্রিকার নাম করিলেন। অধিকলাল যোগেনকে বলিল, "আমার ভাই কোনও পত্রিকায় পাঠাতে লজ্জা করে।" যোগেন খুব বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল। সে বলিল, "তোমাকে পাঠাতে হবে না, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব। ও পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। তুমি দাও আমাকে কবিতাটা।" তাহার পর দিন যোগেন মহানন্দে আসিয়া খবর দিল—কবিতা ওঁদের খুব ভালো লেগেছে। পরের মাসেই প্রকাশিত হবে। তুমি আরও কবিতা লেখ। ওঁরা ছাপাবেন বলেছেন। তুমি সাহিত্য-জগতে যদি নাম করতে পার, তাহলে তোমার জীবনের রং বদলে যাবে। কথাটা শুনিয়া অধিকলালের মনেও বোধহয় একটা স্বপ্ন জাগিয়াছিল। সে কল্পনা করিয়াছিল হয়তো তাহার ছবি কাগজে বাহির হইবে, হয়তো তাহার বই ছাপিবার জন্য প্রকাশকেরা তাহার কাছে ভিড় করিবে, হয়তো তাহার নিকট বাণী লইবার জন্য কলেজের ছেলে-মেয়েরা ভীড় করিবে, হয়তো নানা সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ আসিবে তাহার নিকট, তাহার বাণী তাহার বক্তৃতা তাহার কবিতা হয়তো দেশকে নূতন পথ দেখাইবে, নূতন প্রেরণা দিবে, নূতন যুগের কবি হিসাবে তাহার নাম হয়তো আগামী যুগের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে—এই ধরনের বহু বর্ণবহুল 'হয়তো' বোধহয় তাহার কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু সে মুখে কিছুই বলে নাই। পরের মাসে সেই বিখ্যাত মাসিকপত্রে কবিতাটি প্রকাশিত হইল না। তাহার পরের মাসেও না। তাহার পরের মাসে যাহা ঘটিল তাহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। অন্য একটি কাগজে কবিতাটি প্রকাশিত হইল ভিন্ন নামে। কবির নাম অধিকলাল নয়, অমিত সিংহ। যোগেন বিখ্যাত কাগজের আপিসে গিয়া খবর লইয়া জানিল জনৈক যুবক একদিন আপিসে গিয়া কবিতাটি নাকি লইয়া আসিয়াছে, বলিয়াছে সেই নাকি কবিতাটির রচয়িতা, তাহার ইচ্ছা কবিতাটি অন্য কাগজে দিবে বলিয়া সে ঠিক করিয়াছে। তাহার বন্ধু সহকারী সম্পাদক বলিলেন, 'সুতরাং তাঁকে কবিতাটি দিয়ে দিয়েছি। তারপর তা কোথায় প্রকাশিত হয়েছে তা আমরা জানি না। ও সম্বন্ধে কোনও দায়িত্বও আমাদের নেই।' ক্রুদ্ধ যোগেন আসিয়া একজন উকিলের পরামর্শ লইয়াছিল, উকিল উকিল-সুলভ পরামর্শ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আদালতে যদি প্রমাণ করা যায় লেখাটি আপনার বন্ধুর তাহলে খেসারত আদায় করা যেতে পারে। এর জন্যে সাক্ষী যোগাড় করতে হবে, দরকার হলে মিথ্যে সাক্ষী সৃষ্টি করতে হবে। ওই অমিত সিংহ নিশ্চয়ই বলবে কবিতাটি তারই লেখা অধিকলালই সেটা চুরি করে টুকে নিয়ে ছাপতে দিয়েছিল অন্য কাগজে। সেও ছাড়বে না, সেও সাক্ষী তৈরী করবে। সুতরাং আদালতে না গেলে বোঝা যাবে না কেস আমরা জিতব কিনা।' অধিকলাল যোগেনকে আদালতে যাইতে দেয় নাই। সাহিত্যিক হইবার স্বপ্নও তাহার নিবিয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে সাহিত্যের হাটেও চোর, বাটপাড়, পকেটমার আছে, সাহিত্যের ফসলও ঠিক ন্যায়ের বাটখারায় মাপা হয় না সাহিত্যের হাটে। সেখানেও অসাধুদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়.....না, সে ওসব করিবে না, করিবার প্রবৃত্তি নাই।.....

অনেকদিন পর যোগেনকে অধিকলাল যে পত্রটি লিখিয়াছিল তাহাতে যে খবরটি আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। অধিকলালের মতো ছেলেও কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে নাই। কামনার পঙ্ক তাহার মনেও লাগিয়াছিল। সে লিখিতেছে—

'ভাই যোগেন, তুমি বিপথে গেছ বলে অনুতাপ করেছ অনেক এবং আমার সঙ্গে নিজের তুলনা করে যা যা লিখেছ তাতে আমার গর্ব অনুভব করা উচিত। কিন্তু ভাই, যদিও বিপথে যাওয়া যাকে বলে তা আমার জীবনে ঘটেনি, কিন্তু সত্যি কথা যদি বলি তাহলে স্বীকার করতেই হবে ও পাপ আমার মনকেও একদিন স্পর্শ করেছিল, জীবু, বরেন, রহিম এরা আমার সহপাঠী ছিল। এদের কাছ থেকে আমি পর্ণোগ্রাফির অনেক বই পেতাম এবং লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। বলতে যদিও লজ্জা করছে তবু বলব পড়তে ভালোই লাগত। নূতন একটা জগৎ আবিষ্কার করেছিলাম। পুরুষের সদ্যজাগ্রত কামনা নিয়ে বিচরণ করতাম সে জগতে। দেহের শিরা-উপশিরা উত্তেজনায় দপ দপ করত। আমাদের ক্লাসের সুঁটকো মেয়েটাকেও মনে হত অপ্সরী। ইচ্ছে করত তার সঙ্গে ভাব করি। মনে হত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে বলি—

ফেল গো বসন ফেল ঘুচাও অঞ্চল
পর শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন-আবরণ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথই শেষে আমাকে রক্ষা করলেন। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম এই কাম-লোকে আমি শাশ্বত ভারতের সন্ধান পাব না, যে ভারতে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম সতীত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' বইটিতে 'সতী' নামে যে কবিতাটি আছে সেটি পড়েছ কি? তার প্রথম দু'লাইন হচ্ছে—

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা

এই কবিতায় তিনি বলেছেন সতীদের মধ্যে কলঙ্কিনীরাও আছে। কারণ অন্তর্যামীই সতীত্বকাহিনীর মর্মকথা জানেন। সে মর্মকথা আর যাই হোক তা কাম নয়। তা প্রেম। হঠাৎ আমার স্ত্রী ফুলেশ্বরী এসে যেন আমার সেই গোপন লোকে প্রবেশ করল। হাসিমুখে চাইল আমার দিকে একবার তারপর, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিল সব। আমার ঘোর কেটে গেল। আমার বিশ্বাস তোমারও যাবে ....

....

অধিকলাল সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পরীক্ষার সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া সে খুব ভালো পরীক্ষা দিতে পারে নাই। অসুস্থ না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের মধ্যে তাহার নাম থাকিত। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরই একটা মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটিল। তাহার বাবা রংলাল হঠাৎ মারা গেল। অধিকলাল যে বি. এ. পাশ করিয়াছে এ খবর সে শুনিয়া যাইতে পারে নাই। তিলিয়া সুলিয়ার বিবাহের পর অধিক উপার্জনের আশায় সে রামগোবিনের চাকরি ছাড়িয়া কাটিহারে একটি মিলে কাজ লইয়াছিল। মিলের চাকায় কাপড় আটকাইয়া গিয়া অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। খবর পাইয়া অধিকলাল চলিয়া গেল। কিন্তু সে তাহার বাবাকে দেখিতে পায় নাই।

মিলের মালিকরা নাকি রংলালের পরিবারকে হাজার দুই টাকা খেসারতস্বরূপ দিয়াছে। সমুন্দরি পাইয়াছে টাকাটা। রামগোবিন বলিয়াছিল টাকাটা আমাকে দাও আমি ঋণের দলিলে উসুল করিয়া লইব। সমুন্দরি দেয় নাই। বলিয়াছিল ঋণ যথাকালে খুদরুবা শোধ করিবে। যদি না করে তখন আদালত আছে, সেখানে গিয়া যাহা খুশি করিও, এ টাকা আমি দিব না। অধিকলাল

সব শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিল সে। রণছোড় আসিয়া রামগোবিনের গোলায় চাকরি করিতেছে। সকরিগলিতে তাহার বাড়ি ছিল। কলেরায় তাহার বউ ছেলে-মেয়ে সব নাকি মরিয়া গিয়াছে। বেশী দিন কামাই করার জন্য সাহেবগঞ্জ বোর্ডিংয়ের চাকরিটিও আর নাই। সুতরাং রংলালের বাড়ির পাশেই সে ছোট একটু ঝোপড়ি (কুঁড়ে) বানাইয়া লইয়াছে। সমুন্দরিই দুই বেলা তাহাকে খাইতে দেয়, অবশ্য বিনা পয়সায় নয়, এজন্য তাহাকে মাসে পনেরো টাকা করিয়া দিতে হয়। ইহাতে রণছোড়ের সুবিধাই হইয়াছে। সে রামগোবিনের কুলি কন্ট্র্যাক্টেও কাজ করে, গোলাতেও করে। তাহার মহিষের মতো স্বাস্থ্য, মহিষের মতো খাটিতে পারে সে। সর্বসুদ্ধ মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা পোস্টাপিসে জমায়। অধিকলালকে দেখিয়া সে খুব আনন্দিত হইল। অধিকলাল বি. এ. পাশ করিয়াছে শুনিয়া প্রশ্ন করিল—'অব কি করবি? মাস্টারি? সাহেবগঞ্জকা স্কুল মে যো হেডমাস্টার ছেলৈ—উ ভি বি. এ পাশ—তু হেডমাস্টার বনি যা—"

["এখন কি করবি? মাস্টারি? সাহেবগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টারও বি. এ. পাশ ছিল, তুই হেডমাস্টার হয়ে যা—"]

সমুন্দরি সেখানে ছিল। সে সগর্বে বলিল—"মাস্টার কাহে, উ হাকিম বনতে!"

[মাস্টার কেন, ও হাকিম হবে]

তাহার পরই অধিকলালের 'গওনা'র (দ্বিরাগমনের) প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল।

অধিকলাল বলিল, "না আমি রোজগার না করা পর্যন্ত বউকে আনিব না। তাহাকে খাওয়াইব কি?"

সমুন্দরি উত্তর দিল—"হাম্ খিলাইব। বহুকো দু মুঠ্ঠি ভাত দেনে কো তাগদ হামরা ছে।"

[আমি খাওয়াব। বউকে দুমুঠো ভাত দেবার ক্ষমতা আমার আছে।]

অধিকলাল গিয়া দেখিল আজবলাল একটি অকাল কুষ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ঘাড় চাঁছা, লম্বা জুলফি, চবর চবর করিয়া পান চিবাইতেছে, পরনে শৌখিন ধুতি এবং চপ্পল। এবারও পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে।

অধিকলাল মাকে বলিল—"এক্‌রা পঢ়াকে কী নাফা হোতে? কোই কাম মে লাগা দে—"

(একে পড়িয়ে লাভ কি! কোনও কাজে লাগিয়ে দে)

সমুন্দরি ছেকা ছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্ম—"সবার বুদ্ধি কি একরকম হয়? এবার ফেল করিয়াছে, আগামী বার পাশ করিবে। ও কি এখন আর মজুরের কাজ করিতে পারিবে? লেখাপড়া শিখিয়া উহাকে বাবু বনিতে হইবে। হাকিম হইতে না পারে, কিন্তু হাকিমের কেরানীও কি হইতে পারিবে না?"

ডাক্তারবাবুর বাড়িতেও গেল অধিকলাল। তাহাকে দেখিয়া সেখানে সবাই মহা খুশী। নখু ছিল না, সে-ও কলেজে পড়িতেছে। কলিকাতায় তাহার সহিত মাঝে মাঝে দেখা হয় তাহার। তনুকে দেখিয়া সে কিন্তু অবাক হইয়া গেল। কি সুন্দর হইয়াছে সে। একটা পুষ্পিতা লতা যেন। অধিকলালকে দেখিয়া তাহার চোখ মুখ যদিও আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল কিন্তু কোনও প্রগলভতা প্রকাশ করিল না সে। আগে সে অধিকলালের হাত ধরিয়া টানাটানি করিত এখন দূরে সরিয়া রহিল।

"খুদরুদা, আশা করেছিলাম এবারও তুমি কম্‌পীট করবে—"

"অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম ভাই। ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি। পাশ করেছি এই যথেষ্ট—"

তপনবাবু কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ভগবতী দেবীকে দেখিয়া অধিকলাল আশ্চর্য হইয়া গেল। তাঁহার মাথার সামনের দিকের খানিকটা চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। সেই শাদার মধ্যে সিঁদুরের শোভা যেন আরও মহিমাময় মনে হইল অধিকলালের। অনেক দিন আগে সে একবার শাদা স্তর-মেঘের মধ্যে সূর্যোদয় দেখিয়াছিল। সেই ছবিটা মনে পড়িল তাঁহার। ভগবতী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কপালে চুম্বন দিলেন।

"তুই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিস খুদরু। আহা, রংলালের জন্যে বড় দুঃখ হচ্ছে। সে বেচারা চিরকাল কষ্ট করেই গেল, সুখের মুখ আর দেখতে পেলে না বেচারা। কি খাবি? মাংস রেঁধেছি আজ। চারটি মাংস ভাত খেয়ে যা না এখানে দুপুরে—"

"এখন যে অশৌচ, মাংস খাব কি করে—"

"ও ঠিক তো। তবে একটু ক্ষীর খাবি আয়।"

ক্ষীর এবং মুড়ি খাইতে খাইতে অধিকলাল প্রশ্ন করিল—"তনুর পড়াশোনা নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে।"

"ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। শ্বশুর খুব বড়লোক, জামাই বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এই ফাল্গুনেই বিয়ে হবে।"

"বাঃ খুব আনন্দের কথা। বিয়ের সময় আমি আসব।"

"তোর বউ কবে আসবে? এতদিনে বড়সড় হয়েছে নিশ্চয়।"

"বউ এনে রাখবো কোথায় কাকীমা? আমি আগে রোজগার করি—"

"সমুন্দরি কিন্তু ওসব কথা শুনবে না। সে বলছিল সবাই নাকি নিন্দে করছে, সে বউকে এখানেই আনবে।"

"আপনারা মাকে একটু বুঝিয়ে বলুন না। এখন বউকে নিয়ে এসে লাভ কি—"

"তোমার মা কি কারো কথা শুনবে? যা খাণ্ডারাণী, ও নিজের মতে চলবে।"

অধিকলাল চুপ করিয়া রহিল। অসহায় বোধ করিতে লাগিল একটু। কিন্তু এ বিষয়ে আর কিছু বলিল না।.........

.......তপনবাবু রংলালের 'কিরিয়া'তে (শ্রাদ্ধে) পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিল রামগোবিনও কিছু দিবে। কিন্তু সে নাকি কিছুই দেয় নাই। সমুন্দরি তাহার গোলার কাজ ছাড়িয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী হরিবোল সার গোলায় কাজ লইয়াছিল। সে গতর খাটাইয়া খায়, কাহারও পরোয়া করে না। যখন তখন যেখানে সেখানে রামগোবিনকে 'চোট্টা বাভনা' বলিয়া উল্লেখ করিতেও ইতস্তত করে না সে। খুব ভোরে উঠিয়া এক গৃহস্থের বাড়িতে সে ঢেঁকিতে ধান, চাল, চিঁড়া প্রভৃতি কুটিয়া দেয়। ইহাতেও তাহার রোজগার হয় বেশ। কোন কোন দিন নিজের বাড়ির উঠানে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সে রংলালের জন্য কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে যে রংলাল তাহার মানা না শুনিয়া কাটিহারের মিলে গিয়া চাকরি লইয়াছিল। টাকার জন্যই সে প্রাণটা দিল! ওই 'চোট্টা বাভনা'র দলিলই তাহাকে 'বাউলা'

(পাগল) করিয়া তুলিয়াছিল, এক মুহূর্ত তাহার 'চেইন' (শান্তি) ছিল না। রণছোড় তাহাকে সান্ত্বনা দিত।..........

অধিকলাল আই. এ. এস পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া পাশ করিল। ট্রেনিং লইবার জন্য দিল্লী যাইতে হইল তাহাকে। সমুন্দরির স্বপ্ন সফল হইল শেষ পর্যন্ত। এ সময় সে বেশ একটু অর্থকষ্টের মধ্যে ছিল। কারণ তপনবাবু লিখিলেন যে তাহার মায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকা তিনি ব্যাংকে fixed deposit করিয়াছিলেন তাহা সমুন্দরি তুলিয়া লইয়াছে। আজবলাল সেই টাকা দিয়া একটি মনিহারী দোকান করিয়াছে বাজারে। পড়াশোনা ত্যাগ করিয়াছে। একজন স্কুলের মাস্টারকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া স্কুল হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে। তপনবাবুই তাহাকে একশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন তনু টাকাটা পাঠাইতেছে। বিবাহের সময় সে অনেক টাকা পাইয়াছিল। সেই টাকা হইতে সে তোমাকে টাকাটা উপহার দিতেছে। তুমি যেন আবার আত্মসম্মানের আধিক্যবশত টাকাটা ফেরত দিও না। সে বড় দুঃখ পাইবে। তনুর স্বামীর দিল্লীরই কোনও কলেজে অধ্যাপক হইয়া যাইবার কথা। ঠিকানা এখনও জানি না, পাইলে তোমাকে জানাইব। তুমি যখন ম্যাজিস্ট্রেট হইবে তখন যদি পূর্ণিয়াতে আস আমরা খুবই গর্ব অনুভব করিব। ইচ্ছা আছে গ্রামে একটা সভা করিয়া তোমাকে অভিনন্দন জানাইব। নখুও আগামী বৎসর অল-ইণ্ডিয়া সার্ভিসের পরীক্ষা দিবে, অবশ্য যদি বি. এ. পরীক্ষায় ভালো ফল হয়। আমার শরীরটা সম্প্রতি ভালো যাইতেছে না। হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগিতেছি। বিশ্রাম লওয়া উচিত, কিন্তু.. ....

বছর দুই পরে অধিকলাল যখন পূর্ণিয়া জেলাতেই ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গেল তখন ডাক্তার তপনকান্তি মারা গিয়াছেন। ভগবতী দেবী জব্বলপুরে তাহার বাপের বাড়িতে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়িটা শূন্য পড়িয়া আছে। নখু কলিকাতায়, তনু শ্বশুরবাড়িতে। নখুর ইচ্ছা বাড়িটা বিক্রয় করিয়া সেই টাকাটা ভগবতী দেবীর নামে জমা করিয়া দেওয়া হোক। তপনবাবু 'খরচে' লোক ছিলেন, ব্যাংকে নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এ অঞ্চলে অনেকের হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচুর শ্রদ্ধা জমা হইয়া আছে, কিন্তু তাহা দিয়া সংসার খরচ চলে না। প্রায় দশবিঘা জমির উপর তপনকান্তিবাবুর বাড়ি। বিক্রয় করিলে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাওয়া যাইবে। এই টাকাটা ভগবতী দেবীর নামে জমা করিয়া দিলে তাঁহাকে ভবিষ্যতে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। তিনি স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি থাকিতে পারিবেন। নখুর ইহাই মত।

রামগোবিন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া বাড়িটা কিনিতেও প্রস্তুত আছে। তনু কিন্তু ইহাতে মত দিতেছে না। তনুর মতের মূল্য আছে, কারণ তপনবাবু কোন উইল করিয়া যান নাই। সুতরাং সেও ওই বাড়ির একজন উত্তরাধিকারিণীরূপে গণ্য হইবে। তনু বলিয়াছে যে ওই বাড়িতে তপনকান্তির নামে একটি হাসপাতাল করা হোক। তনুর স্বামীর একজন বন্ধু বিলাত-ফেরত ডাক্তার। সে গ্রামে গিয়া প্র্যাকটিস করিতে চায়। সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক সে। বিবাহ করে নাই, করিবেও না। সে বলিয়াছে তপনবাবুর নামে যদি হাসপাতাল করা হয় তাহা হইলে সে গিয়া হাসপাতালের ভার লইবে। নখু এবং তনু দুইজনেই অধিকলালের পরামর্শ চাহিয়া তাহাকে পত্র দিয়াছিল। অধিকলাল উত্তর দিয়াছিল, তোমাদের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে আমাকে

জড়াইও না। তোমরা নিজেরাই পরামর্শ করিয়া যাহা ঠিক করিবার কর। যদি হাসপাতাল হয় আমি খুব সুখী হইব এবং চেষ্টা করিব যাহাতে গভর্ণমেন্টও এ ব্যাপারে কিছু আর্থিক সাহায্য করে। গ্রামে ভালো হাসপাতাল করা গভর্ণমেন্টেরও অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে। জানি না কতদূর কি করিতে পারিব। নখু যাহা লিখিয়াছে, তাহাও অবশ্য উড়াইয়া দিবার মতো নহে। মায়ের নামে কিছু টাকা থাকিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন। নখু ভালো ছেলে, সেও ভালো চাকরি পাইবে, তখন মায়ের কোনও ভাবনা থাকিবে না। আমি নিজের তরফ হইতে এটুকু বলিতে পারি আমি যতদিন রোজগার করিব মাকে টাকার অভাবে কষ্ট পাইতে দিব না। আমি যতটা পারি তাঁহাকে সাহায্য করিব। তিনি শুধু তোমাদের মা নন, আমারও মা... ....

অধিকলালের কোয়ার্টারে ফুলেশ্বরী আসিয়াছে, সমুন্দরিও আসিয়াছে। অধিকলাল বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ফুলেশ্বরী বিদ্যায় গো-মূর্খ, কিন্তু তাহার চালচলন ঠাট্ঠমব মেমসাহেবের মতো। বগল-কাটা লো-নেক (low neck) জামা পরিয়াছে, পায়ে দিয়াছে হাই-হিল জুতা, ঠোঁটে লিপ্স্টিক, মুখময় চুনকাম, চোখে বিলাতী কাজল। অধিকলালের মনে হইতে লাগিল যে একটা 'সং' ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দুই-একটা ইংরেজি বুকনিও শিখিয়া নিজেকে আরও হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছে সে। চাকরকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া 'বুই' 'বুই' (Boy) বলিয়া ডাকিতেছে। অধিকলাল বলিয়াছিল, "তুমি তো মেমসাহেব নও। এ সব করিতেছ কেন? তুমি বিহারী, তুমি তোমার স্বাভাবিক পোশাকে থাক, মাতৃভাষায় কথা বল, তাহা হইলে তোমাকে আরও ভালো দেখাইবে।"

ফুলেশ্বরী কিন্তু এ সদুপদেশ শোনে নাই—এবং বিহারী সুরে টান দিয়া বলিয়াছিল—এঃ। যাহার বাংলা অর্থ—ইস্'। সমুন্দরিও ফুলেশ্বরীর দিকে। সে বলিতেছে—"হাকিম কা জনানী কি মজুরনী কা এইসা রহিতে? জরুর উ ইন্সান্ বন্তে। হাকিম কা জনানী, খেলোড় ছে কি!"

(হাকিমের বউ মজরুনীর মতো থাকবে নাকি! ওকে ভদ্রলোকের মতো থাকতেই হবে। হাকিমের বউ, খেলা নাকি!)

সমুন্দরি কিন্তু হাকিমের মা সাজিতে চায় না। সে বাহিরের দিকে একটা ঘরে জাঁতা বসাইয়াছে। ডাল প্রস্তুত করে, ছাতু ও আটাও পেষে। যে ময়লা কাপড় সে আগে পরিত সেই ময়লা কাপড় এখনও পরে। মাথায় তেল দেয় না। খসখস করিয়া দুই হাত দিয়া মাঝে মাঝে মাথাটা চুলকায়—অর্থাৎ মাথায় যে অনেক উকুন আছে তাহা বেশ বোঝা যায়। সমুন্দরি লুকাইবারও চেষ্টা করে না। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। বাহিরের ঘরেই বেশীর ভাগ থাকে সে। ওই ঘরে বসিয়াই 'হুক্কা' খায়। পচ্ পচ্ করিয়া থুতুও ফেলে যেখানে সেখানে। চাকরবাকর খানসামা-বেয়ারাদের সঙ্গেই তাহার ভাব বেশী। তাহাদের সঙ্গেই আড্ডা দেয়। মাঝে মাঝে ঝগড়াও করে। শাসায় তাহাদের—ফের যদি এমন করিস তোদের চাকরি খেয়ে দেব।

সমুন্দরির এই সব আচরণে অধিকলালের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। একদিন কমিশনার সাহেব তাহার বাড়িতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "তোমার বাড়ির দাইটাকে সামনের ঘরে থাকিতে দিয়াছ কেন। পিছনের দিকে তো উহাদের থাকিবার জন্য আলাদা ঘর আছে।" অধিকলাল খুব লজ্জিত হইল, কিন্তু সত্য কথাই বলিল সে। বলিল, "উনি আমার মা। উনি ওইভাবেই থাকিতে চান। কি করিব বলুন—"

কমিশনার সাহেব বাঙালী, সেকালের আই. সি. এস.। একথা শুনিয়া তিনি অবাক হইয়া বলিলেন—"ওহ্ আই সি! তোমার মা! তিনি আগাইয়া গেলেন এবং সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মাইজি, নমস্তে।" সমুন্দরিও দুই হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিল বটে, কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল না। রোদে পিঠ দিয়া হুঁকা-হাতে যেমন রোদ পোহাইতেছিল তেমনি পোহাইতে লাগিল। কমিশনার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "মাইজি আপনি বাইরের দিকে এমন ভাবে বসে থাকেন কেন। ভিতরের দিকেও তো অনেক ঘর আছে।" ইহার উত্তরে সমুন্দরি সেই কথাগুলিই বলিল যাহা সে ইতিপূর্বে অনেকবার অনেককে বলিয়াছে—

"হামারা খুশি—"

কমিশনার সাহেব মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। মায়ের কাণ্ড দেখিয়া অধিকলালের কিন্তু লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কমিশনার সাহেবের হাস্যদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে যে ঝলকটা সে দেখিয়াছিল তাহা ব্যঙ্গের ঝলক। তিনি সুসভ্য বাঙালী-কুল-তিলক, বাহিরের ভব্যতা নিখুঁত, অনেক দিন বিলাতে ছিলেন কিন্তু ওই ঝলক দেখিয়া মনে হয় মুখে তিনি যাহাই বলুন মনে মনে ভাবিতেছেন—মেড়োদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। অধিকলালের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। মায়ের উপর একটু রাগও হইল। কিন্তু সেদিন সে কিছু বলিল না।

....

আকর্ণ দন্ত বিকশিত করিয়া রামগোবিন আসিযা হাজির হইল একদিন। সঙ্গে প্রচুর 'ভেট' আনিয়াছিল সে। ভালো দই, ভালো চিঁড়া, মর্তমান কলা এক কাঁদি, দুইটা বড় বড় তরমুজ। অধিকলাল বলিল—এ সব ভেট আমি লইব না।

সমুন্দরি রুখিয়া উঠিল। ছেকা ছেনি ভাষায় বলিল—নিবি না কেন? সব হাকিমই তো ভেট নেয়, তুই নিবি না কেন! অধিকলাল কিন্তু কিছুতেই লইতে রাজী হইল না। রামগোবিন ইহা প্রত্যাশা করে নাই। ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া গেল।

আপিস হইতে ফিরিয়া অধিকলাল দেখিল তাহার মায়ের ঘরে রামগোবিনের 'ভেট' সাজানো রহিয়াছে। বড় বড় তরমুজ দুইটাই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

"এ কি এগুলো রেখেছ কেন!"

"হামারা খুশি!"

তাহার পর ছেকা ছেনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্ম এই যে ওই 'চোট্টা বাভ্না' আমাদের বরাবর ঠকাইয়াছে। রংলালকে পুরা মজুরি কখনও দেয় নাই, আমি যখন মজুরির পরিবর্তে 'দানা' লইতাম তখন ওজনে কম দিত। রংলালকে ও যদি দলিলের নাগপাশে না বাধিত তাহা হইলে সে মিলে চাকরি করিতে ছুটিত না। এখন যখন উহাকে বাগে পাইয়াছি ছাড়িয়া দিব কেন, যতটা পারি উসুল করিয়া লই। হাকিমকে সকলেই তো খোশামোদ করে, কোন হাকিম তো খোশামোদ লইতে আপত্তি করে না। তুমিই বা এই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করিতেছ কেন।

অধিকলাল চিরকালই স্বল্পবাক। সমুন্দরির ভাষায় 'ভিতরগুম্‌মা'। সে চুপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সে চাপরাসীকে আদেশ দিল ওই তরমুজ, চিঁড়া প্রভৃতি যেন বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফোন আসিল কোথায় যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। অধিকলালকে জিপে করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে হইল।......সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল সমুন্দরিও চলিয়া গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছে, আর সে এখানে আসিবে না.......।

বমাল সুদ্ধ রামগোবিন ধরা পড়িয়াছে। এ অঞ্চলে সম্প্রতি খুব ডাকাতি হইতেছিল। কাজিগ্রামে এক জমিদারের বাড়িতে দুইটি খুন হইয়াছে, গহনাপত্র এবং নগদ টাকাতে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকার জিনিস লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে ডাকাতেরা। সেই সব জিনিস পাওয়া গিয়াছে রামগোবিনের গুদামে। এমন আরও অনেক জিনিস পাওয়া গিয়াছে যাহা নিঃসন্দেহে চোরাই মাল। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে, এ অঞ্চলে যত চুরি হয় তাহা রামগোবিনের সহায়তাতেই হয়, চোরাই মালগুলি সে-ই রাখে, সুবিধা মতো বিক্রয় করে এবং চোর-ডাকাতরা তাহার বখরা লয়। রামগোবিনকে হাতকড়ি দিয়া গ্রেফতার করিয়া আনিয়াছেন এস-পি যোগীন্দর সিং। তাহাকে জামিনে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে।

যোগীন্দর সিং করিৎকর্মা লোক। তিনি আসিয়া অধিকলালকে চোখ টিপিয়া বলিলেন, "রামগোবিন শাঁসালো মাল। একটু চাপ দিলেই হাজার কয়েক টাকা গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।"

যোগীন্দর সিং একথা অবশ্য বলিলেন না যে টাকাটা আমরা দুজনে অনায়াসে ভাগ করিয়া লইব। কিন্তু তাঁহার ভাব-ভঙ্গী হইতে সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। অধিকলাল সংক্ষেপে বলিল, উহাকে জামিন দিব না। কয়েকদিন পরে অধিকলালের কোর্টেই উহার বিচার হইল। বিচারের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় রামগোবিনের 'মুনিম্‌জি' (manager) অধিকলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। একটি খাম তাহার হাতে দিয়া বলিল—মালিক বলিয়াছেন এটা আপনাকে ফিরাইয়া দিতে। অধিকলাল খাম খুলিয়া দেখিল—এটা সেই হ্যাণ্ডনোটটা যাহাতে সে ছাত্রজীবনে সই করিয়াছিল। অধিকলাল বলিল—"এটা ফেরত নেব কেন? টাকা দিয়ে তবে নেব।"

"মালিক বলেছেন ও টাকা আপনাকে আর দিতে হবে না।"

"তোমার মালিকের দান আমি নেব কন? এখনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে—"

মুনিমজি হ্যাণ্ডনোটটি লইয়া ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল। বিচারে রামগোবিনকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়া অধিকলাল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। রামগোবিন তাহার বাবার বন্ধু ছিল, ছেলেবেলাকার নানা ছবি মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু নিজের দুর্বলতার জন্য আইনের অমোঘ নিয়মকে সে কি করিয়া লঙ্ঘন করিবে বিচারকের আসনে বসিয়া।

........মাস ছয়েক পরেই কিন্তু রামগোবিন ছাড়া পাইয়া গেল। সে আপীল করিয়াছিল। আপীলে নাকি অধিকলালের রায় টেকে নাই। আর একটা খবরও অধিকলালের কানে আসিল। এস-পি যোগীন্দর সিং এবং একজন এস-ডি-ও নাকি রামগোবিনের জন্য ভিতরে ভিতরে অনেক তদ্বির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাত দিয়াই নাকি রামগোবিন প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। রামগোবিন ছাড়া পাইবার কিছুদিন পরেই অধিকলাল একটি উকিলের চিঠি পাইল।

রামগোবিন লিখিয়াছে এক মাসের মধ্যে হ্যাণ্ডনোটের টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে। অধিকলাল গভর্ণমেণ্ট প্লীডারকে চিঠিটি দেখাইল। তিনি সব শুনিয়া যে উত্তর লিখিয়া দিলেন তাহার মর্ম এই যে আমার মক্কেল অধিকলাল মণ্ডল, যখন ওই হ্যাণ্ডনোটে সই করিয়াছিল তখন সে নাবালক। সে তাহার পিতার আদেশ পালন করিয়াছিল মাত্র। সুতরাং আইনের চক্ষে তাহাকে এজন্য দায়ী করা যাইবে না। ঋণটা স্বর্গীয় রংলাল করিয়াছিল এবং তাহার বিষয় হইতেই এ ঋণ উসুল করা উচিত।.......কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সাশ্রুনয়নে রামগোবিন

আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়া বলিল—বাবুজি, আমি ওই টাকার জন্য তোমার নামে কি মোকর্দমা করিতে পারি? আমার মুনিমজি আমাকে না জানাইয়া উকিলের সহিত পরামর্শ করিয়া ওই চিঠি তোমাকে পাঠাইয়াছে। আমি আজ হঠাৎ টের পাইলাম। ছিয়া, ছিয়া, ছিয়া। অধিকলাল তাহাকে যে জেলে পাঠাইয়াছিল এবং টাকার জোরে সে যে আবার জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এ কথার উল্লেখমাত্র সে করিল না। অধিকলাল বলিল—আমার হাতে টাকা নাই এখন। পরে আমি বাবার ঋণ শোধ করিয়া দিব। কিংবা বাবার যে পাঁচবিঘা জমি আছে শুনিয়াছি, সেটা আপনি বিক্রয় করিয়া আপনার ধার শোধ করিয়া লইতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাতে। রামগোবিন বলিল—সে জমিতে সমুন্দরি গিয়া বাস করিতেছে। রণছোড়ও সেখানে জুটিয়াছে। সে জমির ত্রিসমীমানায় যাইবার সাধ্য আমার নাই........। জেনানীর সহিত কাজিয়া (ঝগড়া) লড়াই করিয়া..........।

এস-পি যোগীন্দর সিংকে লইয়া অধিকলাল একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরা অবিবাহিত, সুরূপ, অসমসাহসী এবং নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত। বড়লোকের ছেলে। নিজের একটা ভালো মোটরকার আছে। সেটাকে লইয়া সর্বত্র দাবড়াইয়া বেড়ায়। উচ্চপদস্থ অফিসার, সুতরাং সে প্রায় অপ্রতিহতগতি। লোকে তাহার নানাবিধ কুকীর্তি সম্বন্ধে উদাসীন নহে, তবুও তাহাকে সকলে সেলাম করে। অধিকলাল পপুলার নহে, কিন্তু যোগীন্দর সিং পপুলার। এই যোগীন্দর সিং অধিকলালের বাড়িতে যখন তখন আসিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় অধিকলালের অনুপস্থিতিতেও। ফুলেশ্বরী একমুখ হাসিয়া তাহাকে সম্বর্ধনা করিত। কারণও ছিল ইহাব। অধিকলাল সরকারী কাজ ছাড়া আপিসের গাড়ি ব্যবহার করিত না। ফুলেশ্বরীর ইচ্ছা গাড়ি লইয়া বাজারে বাজারে ঘোরে, সিনেমায় যায়, অন্যান্য অফিসারদের বাড়িতে গিয়া আত্মআস্ফালন করে। কিন্তু অধিকলাল আপিসের গাড়ি ব্যবহার করিতে দেয় না। বলে—যাইতে চাও রিকশায় যাও। ফুলেশ্বরী উত্তর দেয়—কালেকটার সাহেবের বউ আমি রিকশায় যাইব কি। আমাব কি মানসম্ভ্রম নাই? অধিকলাল কোনও উত্তর দেয় না। কিন্তু গাড়িও দেয় না। সিনেমা হাউসের মালিকরা 'পাস' পাঠায়, কিন্তু অধিকলাল সে 'পাস' ব্যবহার করে না। বলে—যদি সিনেমা দেখিতে চাও পয়সা খরচ করিয়া যাও। এইরকম যখন অবস্থা তখন যোগীন্দর সিং রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন, তাঁহার সদ্য-কেনা চকচকে মোটরখানা লইয়া। ফুলেশ্বরীকে একদিন আড়ালে বলিলেন, আমাদের কালেক্‌টার সাহেব একটু ছিট্‌গ্রস্ত লোক, অনেস্টির (honesty) বাতিক তাঁহাকে 'বাউরা'র (পাগলের) পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। যাই হোক, আপনি কিছু ভাবিবেন না। আমার মোটর আপনি যখনই চাহিবেন পাঠাইয়া দিব। আমার আপিসে 'ফোন' করিলেই হইবে। যোগীন্দর সিংয়ের মোটর লইয়া ফুলেশ্বরী রোজই প্রায় বাহির হইয়া যাইত। অধিকলাল বাধা দিত না কারণ সে অনুভব করিত বাধা দিলে যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে তাহাতে তাহার সংসারই পুড়িয়া যাইবে হয়তো। সে আশা করিয়া রহিল একদিন ফুলেশ্বরীর আত্মসম্মানবোধ স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠিবে তখন সে নিজেই সামলাইয়া লইবে নিজেকে। একদিন কিন্তু বাধা দিতেই হইল। কয়েকটি দোকান হইতে 'বিল' (Bill) লইয়া জনকয়েক দোকানদার একদিন সসঙ্কোচে অধিকলালের সহিত দেখা করিলেন। সকলেই প্রায় এক কথাই বলিলেন। কোনও দোকান হইতে মেমসাহেব কিছু শাড়ি ধারে লইয়া আসিয়াছেন, কোনও দোকান হইতে এসেন্স, পমেড জাতীয় প্রসাধন দ্রব্য, একটা দোকান হইতে

ঝুটা পাথর-বসানো একটা গিল্টির হার। অধিকলাল প্রশ্ন করিল, আপনাদের কোনও ক্রেডিট মেমোতে কি উনি সই করিয়া লইয়া আসিয়াছেন? সকলেই বলিল, না, তাহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, দাম পাঠাইয়া দিব। কিন্তু এখনও পাঠাইয়া দেন নাই। হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন। এখনই টাকাটা দিবার দরকার নাই পরে কোনও সময় পাঠাইয়া দিবেন। আমরা শুধু—।

অধিকলাল তাহাদের থামাইয়া দিল। হিসাব করিয়া দেখিল দেড়শ টাকার বিল। হাতে টাকা ছিল, তখনই সব শোধ করিয়া দিল। একবার ইচ্ছা হইল তাহাদের বলিয়া দেয়—আর ধারে কোনও জিনিসপত্র মেমসাহেবকে দিও না। কিন্তু একথা সে বলিতে পারিল না। তাহার আত্মসম্মানে বাধিল। ফুলেশ্বরীকে গিয়া প্রশ্ন করিল—"তুমি বাজার হইতে এইসব জিনিস ধারে কিনিয়া আনিয়াছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমার হাতে নগদ পয়সা ছিল না, তুমি তো নগদ পয়সা কিছু দাও না, সুতরাং ধার করিয়াই কিনিতে হইয়াছে।"

"ধার করিয়া আর কিছু কিনিও না। কিনিলে শোধ করিতে পারিব না। আমার মাহিনার অর্ধেক আমি জমা করিতেছি আমাদের ঋণ শোধ করিবার জন্য। সেজন্য কিছুকাল কষ্ট করিয়াই থাকিতে হইবে।"

"ওই জন্যই কি দিনে কেবল ছাতু খাইয়া থাক?"

"ছাতু সস্তা, ছাতুর জন্য ডাল তরকারি প্রয়োজন নাই। তাছাড়া ছাতু আমার ভালোও লাগে। আর একটা কথা। তুমি যোগীন্দর সিংয়ের মোটরে চড়িয়া বেড়াও কেন?"

"যোগীন্দর সিং আমাদের বন্ধুলোক। চড়িলে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কি তাহা তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।"

[উল্লিখিত কথোপকথনগুলি সম্ভবত হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল। অধিকলালের মুখেই এগুলি যোগেন শুনিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তাই সে শুদ্ধ ভাষায় ব্যবহার করিয়াছে। মাঝে মাঝে এরূপ শুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন আরও আছে]

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল ফুলেশ্বরী ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। যোগীন্দর সিংয়ের মোটর রোজ আসিত, ফুলেশ্বরী সাজিয়া গুজিয়া রোজ বাহির হইয়া যাইত। একদিন হঠাৎ অধিকলালের নজরে পড়িল একটা দামী শাড়ি পরিয়া ফুলেশ্বরী বাহির হইয়া যাইতেছে।

"আবার শাড়ি কিনিলে নাকি?"

"কিনি নাই। এ শাড়িটা আমাকে উপহার দিয়েছে—"

ইহার পর অধিকলাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সহসা তাহার মনে হইল ফুলেশ্বরী কখনও মা হইতে পারে নাই। তাহার জননীত্ব লাভের আশাও নাই। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিয়াছে তাহার ইনফ্যানটাইল ইউটেরাস্ (infantile uterus)—সন্তান লাভ করিলে হয়তো তাহার চরিত্রে পরিবর্তন আসিত। সন্তানের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষাও আছে। চাপরাসীর ছোট ছেলেটাকে লইয়া প্রায়ই সে আদর করে। সহসা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা তাহার মনে পড়িল—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলাম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ফুলেশ্বরীর মনেও ইচ্ছা আছে। কিন্তু হায় তাহা পূর্ণ হইবে না। তাই সে যখন শাড়িতে জরির ঝলক বিচ্ছুরিত করিয়া গটগট করিয়া যোগীন্দর সিংয়ের মোটরে গিয়া উঠিল, তখন তাহার প্রতি অনুকম্পা হইল অধিকলালের। রাগ হইল না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটাই তাহার মনের মধ্যে গুন গুন করিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল—এ দুর্বলতা তো ভালো নয়। শাসন করা দরকার। আবার রবীন্দ্রনাথই তাহার কানে কানে বলিলেন—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' ওঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।

কিন্তু তবু সে ফুলেশ্বরীকে শাসন করিতে পারিল না। ফুলেশ্বরীকে সত্যই সে ভালোবাসিয়াছিল। বিলাস-লোলুপ মেয়েটার একদিন মোহ-ভঙ্গ হইবে, সে নিজেই একদিন 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার মতো তাহার কাছে অনুতপ্তচিত্তে ফিরিয়া আসিবে এই আশাই সে মনে মনে করিতে লাগিল। মুখে কিছুই বলিল না, মুখে সে কোনদিনই কিছু বলিতে পারে না, সে প্রাণপণে কেবল নিজের আদর্শটাকে আঁকড়াইয়া রহিল.......

সামান্য একটা কেরানী নিয়োগের ব্যাপারে যে এতটা অপমানিত হইতে হইবে অধিকলাল তাহা কল্পনা করে নাই। রাজপুত ভুঁইহার, কায়স্থ, মৈথীল, মুসলমান, বাঙালী প্রভৃতি অনেকগুলি প্রার্থী ছিল। হরিজনও ছিল দুইজন। অধিকলাল নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। মার্কশীট দেখিয়া এবং ইণ্টারভিউ লইয়া বাঙালী প্রার্থীটিকেই যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তাহারই নাম উপরে 'রেকমেণ্ড' করিয়া পাঠাইল সে। উপরওলা মিনিস্টারই নিয়োগ করিবার মালিক। অধিকলাল যাহাকে রেকমেণ্ড করিয়া পাঠাইয়াছিল মিনিস্টার তাহাকে নিযুক্ত করিলেন না। নিযুক্ত করিলেন একজন জাতভাইকে। অধিকলাল ছাড়িল না, খোঁজ করিল কেন উপযুক্ত প্রার্থীকে চাকুরি দেওয়া হইল না। খবর পাইল বাঙালী ছোকরাটির সম্বন্ধে পুলিশ রিপোর্ট নাকি ভালো নয়। আর একটা খবরও পাইল সে। যে লোকটি চাকরি পাইয়াছে সে নাকি হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছে। কাহার হাতে দিয়াছে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইল না। বাঙালী ছোকরাটি প্রথম শ্রেণীর এম-এ। সে বিবর্ণমুখে একদিন আসিয়া প্রশ্ন করিল—'কি করব সার। আমি গরীব, ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। থাকলেও দিতাম না, অন প্রিন্সিপল্ দিতাম না।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে—এখন কি করি। আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টেও যদি সুবিচার না হয়, তাহলে বাঁচব কি করে আমরা।'

অধিকলাল তাহার কথার জবাব দিতে পারিল না। সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার........

আজবলাল একটি গুণ্ডায় পরিণত হইয়াছে। তাহার দাদা ম্যাজিস্ট্রেট এই হুমকি দেখাইয়া সে নাকি অনেক লোকের কাছে অনেক অন্যায় সুবিধা আদায় করিতেছে। তাহার দলে ও-অঞ্চলের যত 'লোফার' এবং গুণ্ডা প্রকৃতির লোক জুটিয়াছে। আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাতে আজবলালের সুবিধা হইয়া গিয়াছে। রামগোবিনের একমাত্র পুত্র যোগীনাথ এক পতিতার বাড়িতে ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিছুদিন পূর্বে। রামগোবিনের আর পুত্র হয় নাই। সবই কন্যা। আজবলালই নাকি যোগীনাথের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়াছে আজকাল। রামগোবিনের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছে সে। আজবলালের একটা সুনামও হইয়াছে ও অঞ্চলে। সে গুণ্ডা বটে কিন্তু 'রবিন্‌হুড' জাতীয় গুণ্ডা। বড়লোকের ধনসম্পত্তি সে লুট করে কিন্তু লুটের টাকা নিজে সবটা আত্মসাৎ করে না। গরীবদেরও দান করে। এজন্য সে ও অঞ্চলে খুব 'পপুলার' হইয়াছে। মদ খায়, চরিত্রহীন, তবু পপুলার, কারণ গরীবদের সে 'মা বাপ'। ও অঞ্চলে সে নাকি একটা ডাকাতের দলই গঠন করিয়াছে। তাহারা ডাকাতি করিয়া যাহা রোজগার করে তাহার কিছুটা আজবলাল গরীবদের দেয়, বাকিটা দেয় রামগোবিনকে। আজবলালের চর অনুচরদের সহায়তায় সে সব চোরাই মাল রামগোবিন নাকি বড় বড় শহরে পাচার করিয়া দেয়। সে আর নিজের গুদামে চোরাই মাল রাখিতে সাহস করে না। একটা রাজনৈতিক দলেও নাকি আজবলাল পাণ্ডা হইয়াছে। রামগোবিনকে সে বুঝাইয়াছে আজকাল রাজনীতির যুগ, টাকা খরচ করিয়া একটা রাজনৈতিক দলকে যদি নিজেদের হাতে রাখা যায় তাহা হইলে সুবিধা হইবে। রামগোবিনও সেটা উপলব্ধি করিয়াছে, তাই টাকা খরচ করিতে সে আপত্তি করিতেছে না। ভ্রাম্যমাণ একজন মিনিস্টারকে সে নাকি খুব খাতির করিয়া ভোজ খাওয়াইয়াছে, দশ সের খাঁটি ঘৃতও নাকি উপহারস্বরূপ দিয়াছে। সমুন্দরির সহিত আজবলালের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে নাকি একদিন মদ খাইয়া বাড়িতে মাতলামি করিতেছিল, সমুন্দরি তাহাকে 'ঝাড়ু' মারিয়া বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। অধিকলাল আজবলালকে চিঠি লিখিয়াছিল, তুমি সৎপথে থাকিয়া ভদ্র জীবন যাপন কর। আবার যদি পড়িতে চাও পড়, আমি তোমাকে টাকা পাঠাইব। আজবলাল এ চিঠির জবাব দেয় নাই, নিজের স্বভাবও বদলায় নাই।........

আর একটি নিদারুণ সংবাদ বিচলিত করিয়াছে অধিকলালকে। সমুন্দরি নাকি রণছোড়কে চুমানা করিয়াছে। কেন করিয়াছে তাহার জবাব সমুন্দরি নিজেই দিয়াছে তাহার গোতিয়াদের (কুটুম্বদের)। বলিয়াছে, লোকেদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই এ কাজ করিয়াছে সে। তাহাকে গতর খাটাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়। অতি ভোরে উঠিয়া সে ঢেঁকি কোটে। তাহার পর প্রায় মাইল দুই দূরে নিজের জমিতে গিয়া কাজ করে। তাহার পর ফিরিয়া আসে আবার বাজারে। সেখানে গোলায় আসিয়া 'দানা' (শস্য) ফাটকাইতে (কুলা দিয়া ঝাড়িতে) হয়। সন্ধ্যার সময় তাহার পা দুইটা খুব ব্যথা করে। 'পুতহু' (পুত্রবধূ) বা মেয়ে কাছে থাকিলে

তাহাদের কাহাকেও দিয়া সে পায়ে একটু গরম তেল লাগাইয়া পা টিপাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহারা কেহ তো কাছে নাই। নিজেই সে নিজের পায়ে তেল লাগাইয়া টিপিত। একদিন রণছোড় বলিল—আমি যদি টিপিয়া দিই তুমি আপত্তি করিবে কি।

ইহাতে সে আপত্তি করে নাই। কিন্তু সে 'কিরিয়া' খাইয়া (দিব্যি গালিয়া) এ কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে তাঁহার মনে কোন পাপ ছিল না। রণছোড়ের মনেও ছিল না। তাহার কোনও বদচাল সে কোনদিন দেখে নাই। সে প্রত্যহ নিজের আংনার (উঠানে) হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া বসিত, রণছোড় তেল গরম করিয়া তাহার পা মলিয়া (টিপিয়া) দিত। এই সামান্য ঘটনাতেই অনেকের রসনা 'ছন্‌ছন্‌' (চনমন) করিয়া উঠিল। সকলে নানা রকম কুৎসা রটাইতে শুরু করিল। তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই রণছোড়কে সে 'চুমানা' করিয়াছে। করিবেই বা না কেন? ছেলে মেয়ে কেউ তাহার কাছে থাকে না, তাহাকে কাছে লইয়া যাইবারও উৎসাহ বা আগ্রহ কাহারও নাই। আজবলাল বিবাহ করে নাই, সে দারু (মদ) খাইয়া রান্‌ডির (বেশ্যার) বাড়িতে পড়িয়া থাকে। তাহাকে দেখিবে কে? স্ত্রীলোকমাত্রেরই কি উচিত নয় একজন শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষের আশ্রয়ে থাকা? তাহার ভয়ও করে মাঝে মাঝে। এখানকার নূতন দারোগা সাহেবের চোখে লোলুপ দৃষ্টি সে দেখিয়াছে, লোকটা প্রৌঢ়, তাহার বাড়ির চারিদিকে সে মাঝে মাঝে আসিয়া ঘোরাফেরা করে। তাহার চাল-চলন ভালো লাগে না সমুন্দরির। এই সব কারণে সমুন্দরি চুমানা করিয়াছে। তাহার খুশি হইয়াছে তাই করিয়াছে, সে কি কাহারও খায়, না, কাহারো পরোয়া করে।....

সমুন্দরির বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু দারোগা সাহেবের চোখে লোলুপ দৃষ্টি জাগাইবার ঐশ্বর্য তাহার দেহে তখনও ছিল।

অধিকলাল সব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। বলিবেই বা কি? চুমানা করা তো বে-আইনী কাজ নয়। হঠাৎ তাহার মনে হইল এত লেখাপড়া শিখিয়া কি লাভ হইয়াছে! কাহার কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারিয়াছে সে। তাহার চাপরাসী লাট্টু, লেখাপড়া শেখে নাই। সে তাহার মা বউ ছেলে মেয়ে লইয়া সুখেই আছে। তাহারই কম্পাউণ্ডে থাকে তাহারা। তাহাদের মধ্যে আদর্শের বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘাত নাই। উহারা নিখুঁত নয়, মূর্খ, উহাদের অনেক দোষ আছে, কিন্তু উহাবা সুখী। অন্তত আমার চেয়ে সুখী।

....

অধিকলাল যেন ঘরে-বাইরে মার খাইতে লাগিল। একদিন দেখিল একটি মরা ছেলে লইয়া একদল লোক তাহার বাংলোর সামনে বসিয়া আছে। আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কি ব্যাপার? একটি লোক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল—হুজুর, আমার ছেলে। হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিলাম, বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে। হাসপাতালের নার্স ঔষধের একটি ফর্দ লিখিয়া দিয়াছিল কেবল। বাজারে গিয়া দেখিলাম সে ঔষধের মূল্য কুড়ি টাকা। আমার কিনিবার সামর্থ্য নাই। হাসপাতালে একফোঁটা ঔষধ দেয় নাই ছেলেটাকে। যখন ইংরেজ বাহাদুর এদেশে ছিল তখন হাসপাতালে বিনা পয়সায় দাবাই (ঔষধ) মিলিত, বিনা পয়সায় রোগীকে পথ্য দেওয়া হইত। এখন সে সব কিছুই নাই। এখন নগদ 'রূপিয়া' (টাকা) না ফেলিলে

ডাক্তারবাবুরা 'নবজ্' (নাড়ী) পর্যন্ত দেখেন না।......অধিকলাল অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিল ব্যাপারটা সত্যই। হাসপাতালে গরীব রোগীরা ঔষধপথ্য পায় না। হাসপাতাল কয়েকজন সরকারী ডাক্তার ও নার্সের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের শিকার-ক্ষেত্র হইয়াছে। উহা হাসপাতাল নয়, ফাঁদ। ওখানে গরীব অসহায় রোগীদের ফাঁদে ফেলিয়া শোষণ করা হয়, দোহন করা হয়। অধিকলাল এ বিষয়ে সিভিল সার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন সব রোগীকে বিনা মূল্যে ঔষধপথ্য দিবার মতো অর্থ হাসপাতালের তহবিলে নাই। অধিকলাল কিন্তু খবর পাইল যে হাসপাতাল হইতে বাহিরের কোন কোন দোকানদার ঔষধ কম মূল্যে কিনিয়া বেশী মূল্যে বিক্রয় করেন। যে বড় ঔষধ বিক্রেতাটি প্রতি মাসে হাসপাতালে ঔষধ সরবরাহ করিয়া থাকেন তিনি নাকি ঔষধই পাঠান না, শুধু 'বিল' পাঠান এবং সে 'বিল' 'পাস' হইয়া যায়। হাসপাতালের খাতায় ঔষধগুলি মিথ্যা করিয়া জমা করা হয় এবং মিথ্যা করিয়াই খরচ দেখানো হয়। আসলে ঔষধ হাসপাতালে আসেই না। এইসব খবর সংগ্রহ করিয়া অধিকলাল উপরে একটি কন্‌ফিডেনশাল (confidential) রিপোর্ট পাঠাইল যাহাতে এইসব অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করা হয়। কিন্তু উপরের দপ্তর-অরণ্যে তাহা কোথায় যে হারাইয়া গেল তাহার সন্ধান অনেকদিন মিলিল না। খবরটা চাপা থাকে নাই। অধিকলালের আপিস হইতেই হাসপাতালের ডাক্তাররা এবং সিভিল সার্জন খবরটা পাইয়া গেলেন। তদ্বির করিবার জন্য উপরে লোক ছুটিল। ডাক্তারদের চটাইয়া অধিকলালই বিপদে পড়িয়া গেল। ফুলেশ্বরীর তলপেটে একদিন খুব ব্যথা। সিভিল সার্জনকে 'কল' দিল, কিন্তু তিনি আসিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন একটা জরুরী অপারেশনে ব্যস্ত আছেন, এখন যাইতে পারিবেন না। হাসপাতালের একজন তরুণ অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন একটু পরে মুচকি হাসিতে হাসিতে আসিলেন এবং সব শুনিয়া বলিলেন— লেডি ডাক্তারকে দিয়া ভিতরটা একবার দেখান দরকার। লেডি ডাক্তারও জরুরী অপারেশন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, আসিতে পারিলেন না। অধিকলাল শহরের একজন প্রাইভেট প্রাকটিশনারকে ডাকিয়া ফুলেশ্বরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। হাসপাতালের গরীব রোগীদের দুঃখ-দুর্দশা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারিল না। সে কেবল উপরে রিপোর্ট করিল—আর কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার নাই ....

......মিউনিসিপ্যালিটির একটি রাস্তাও মেরামত হয় নাই। সব রাস্তাই হাড় পাঁজরা-বাহির করা, চারিদিকে গর্ত, খানাখন্দ। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স পেয়াররা (tax payer) একদিন অধিকলালের কাছে আসিয়া হাজির হইল এবং ইহার প্রতিকার করিতে বলিল। ফোন করিতেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সসম্ভ্রমে বলিলেন—আমি চেষ্টা করিতেছি। ফাণ্ডে তেমন টাকা নাই। অধিকলালের সহসা মনে হইল ফাণ্ডে টাকা নাই কেন। ট্যাক্স তো আদায় হইতেছে,— তবে? মনে পড়িল সিভিল সার্জেনও বলিয়াছিল ঔষধ কিনিবার টাকা নাই। সেদিন এক মাড়োয়ারী পেট্রল-বিক্রেতা গভর্ণমেণ্টের মোটরগুলিতে ধারে তেল দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। বলিয়াছে—নগদ দাম দিয়া তেল কিনিতে হইবে। গভর্ণমেন্টকে ধারে তেল দিলে সহজে তাঁহারা প্রাপ্য টাকা দেন না। অনেক দিনের অনেক ধার জমিয়া আছে। গভর্ণমেণ্টের হাতেও নগদ টাকা নাই। সেজন্য অনেক মোটর তৈলহীন অবস্থায় অচল পড়িয়া আছে। টাকা নাই কেন? এত টাকা যে আদায় হয়, এত টাকা যে বিদেশ হইতে ঋণ করিয়া আনা

হইতেছে—সে সব কোন বাবদে কোথায় খরচ হয়? কে খরচ করে? মন্ত্রীরা প্লেনে করিয়া উড়িয়া বেড়ান, হোমরাচোমরা অফিসাররা ক্রমাগত নানা 'মিশনে' বিদেশে যাইতেছেন, দেশের ওজন বাটখারা 'সের'কে 'কিলো'তে পরিবর্তন করিবার জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয়িতও হইতেছে, বিদেশ হইতে আগত অতিথিবৃন্দকে সমারোহে সম্বর্ধনা করিবার আগ্রহ আমাদের কিছুতেই যেন কমিতেছে না......অথচ দেশে চাল নাই, গম নাই, চিনি নাই......শিক্ষা দিবার নামে কতকগুলো স্কুল কলেজ আছে বটে কিন্তু সেখানে শিক্ষা হয় না......শিক্ষকেরা পর্যাপ্ত বেতন পান না, ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল......গ্রাম হইতে একজন 'বি. ডি. ও'র (B. D. O) বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে তিনি নাকি 'দো-হাত্তা' ঘুষ লইতেছেন। গ্রামের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একটি দরখাস্ত পাঠাইয়াছে। এ ধরনের দরখাস্ত প্রায় আসে কিন্তু আপিসে ধামাচাপা পড়িয়া থাকে। এবার কমিশনার সাহেব অধিকলালকে পাঠাইলেন ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য। তদন্ত করিয়া ঘুষের কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু একটি বিষয়ে অধিকলাল নিঃসন্দেহ হইল। সেকালের নায়কেরা যে দাপটে ও যে আরামে গ্রামে বাস করিতেন এই বি. ডি. ও.'-ও সেই দাপটে ও আরামে আছেন। গভর্ণমেণ্ট পুরাতন জমিদারি-প্রথা লোপ করিয়া নূতন ধরনের জমিদারি-প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। ....

....

অধিকলাল দিন দিন ক্রমশ যেন বিমর্ষ হইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল সবই বৃথা, সবই বৃথা। এ শুধু ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে বটে কিন্তু একটি লোকও কি দেশকে আপন বলিয়া মনে করে? সবাই তো নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া মত্ত। ট্রেনের কামরা হইতে আয়না, গদি প্রত্যহই চুরি যাইতেছে। ইলেকট্রিক তার প্রায়ই অন্তর্ধান করিতেছে। বড় বড় অফিসাররাও ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারেন না। সকলেই নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিতে ব্যস্ত—দেশের কথা কেহ কি ভাবে? কেহ কি অনুভব করে? বক্তৃতায় যাহা বলে কাজে তো তাহা করে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িয়া গেল তাহার—

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাতে
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

....

ছুটিয়াছে জাতি-প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে।

....

ফুলেশ্বরী এখনও বদলায় নাই। অধিকলাল প্রতীক্ষা করিয়া আছে ....

....

.....সেদিন অধিকলাল টুর হইতে ফিরিতেছিল। ট্রেনে একটি মাত্র ফার্স্ট ক্লাস 'বগী' ছিল। কিন্তু সেটিও পরিপূর্ণ। অধিকলালের পোশাক-পরিচ্ছদে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাহার চাপরাসী ও ক্লার্ক অন্য কামরায় চড়িয়াছিল। সুতরাং সে যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাহা কেহ চিনিতে পারিল না। অধিকলাল চিরকালই আত্মপ্রচার-বিমুখ, সুতরাং সে সসঙ্কোচেই ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই একজন টিকিট কালেকটার আসিল এবং গাড়িতে উঁকি দিয়াই চলিয়া গেল। কাহারও কাছে টিকিট চাহিল না। অধিকলাল প্ল্যাটফর্মে নামিয়া তাহাকে নিজের টিকিট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি অন্য প্যাসেঞ্জারদের টিকিট চাহিলেন না কেন?"

"উহারা সব স্কুল-কলেজের ছেলে। সব উইদাউট টিকিটে যাতায়াত করে।"

"আপনারা টিকিট চানও না?"

"না। চাহিতে গেলে উহারা আমার প্রাণসংশয় করিবে।"

"পুলিশ নাই?"

"পুলিশ কিছু বলিবে না। তাহারা দাঁড়াইয়া মজা দেখিবে কেবল।"

টিকিট কালেকটার হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অধিকলাল গিয়া ট্রেনে চড়িল। বসিবার জায়গা পাইল না, একধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। পরের স্টেশনে নামিয়া গেল অনেক ছেলে। জন দুই মাত্র রহিল। তাহারাও ছাত্র। আরও দুই স্টেশন পরে নামিবে। অধিকলাল তাহাদের পাশেই বসিল এবং তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। হিন্দীতেই আলাপ হইল।

"আপনারাও ছাত্র?"

"হ্যাঁ—"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ করিবেন না তো?"

"না, না, কি বলুন—"

"আপনারা সব নাকি উইদাউট টিকিটে যান—"

ছাত্রটি আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিল—"যাই!" দ্বিতীয় ছাত্রটি একটু রুখিয়া বলিয়া উঠিল—"যাইব না কেন? সবাই তো লুটেরা (ডাকাত), কোন ন্যায্য ব্যাপারটা হয় বলুন। বাজারে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য, কালোবাজারীরা সেখানে একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছে। আমাদের কলেজে প্রতি মাসে বেতন লওয়া হয়, কিন্তু পড়ানো হয় না, মাস্টাররা ঘুষ খাইয়া খারাপ ছেলেকে ভালো নম্বর দেন, ভালো ছেলেরা পাত্তা পায় না. এ বাজারে যাহার টাকা, যাহার লাঠির জোর তাহারই জয়জয়কার। দেশকে টুকরা টুকরা করিয়া এ স্বাধীনতা লইবার কি দরকার ছিল? কি লাভ হইয়াছে? উদ্বাস্তুতে দেশ ছাইয়া গেল। পাকিস্তানের কাছে আমরা শান্তির জন্য সর্বদা হাতজোড় করিয়া আছি—কি লাভ হইয়াছে এ স্বাধীনতায়? সবাই লুটেরা হইয়া গিয়াছে, আমরাও হইয়াছি—"

"আরে ভাই, ছাড়ো ওসব কথা। আপনি কি করেন সাহেব?"

"আমি সরকারী চাকরি করি। দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমার খুব কষ্ট হয়। বিশেষত ছাত্রদের এইসব বিক্ষোভ, আন্দোলন, উচ্ছৃঙ্খল আচরণে আমি বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়ি। আপনারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—"

"ভাবিবেন না। আমরাই আবার দেশকে ঠিক করিয়া তুলিব। আগে আবর্জনা পরিষ্কার করা দরকার। বাংলাদেশে ইংরেজ আমলে যাহারা বোমা পিস্তল বন্দুক লইয়া অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অভিযান চালাইয়াছিল, তখন তাহাদেরও অনেকে ডাকু, গুণ্ডা, খুনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, তাজা 'খুন' বহাইয়া দিয়াছিলেন, আজ আমরা বুঝিতেছি তাঁহারা মহৎ শহীদ ছিলেন, ডাকু বা খুনী ছিলেন না—"

দ্বিতীয় ছাত্রটি বলিলেন—"কে জানে হয়তো তাহারাই আবার এ যুগে জন্মিয়াছে, এই ভুয়ো-স্বাধীনতার মিথ্যা মুখোশটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য আবার তাহারাই হয়তো প্রাণপণ করিতেছে। এ যুগের ছাত্রদের অত ছোট করিয়া দেখিবেন না, তাহারাও আদর্শবাদী। তাহারা কিন্তু কোথাও আদর্শেব স্বরূপ দেখিতে পাইতেছে না। কোথাও কোনও আশা নাই, সব অন্ধকার। ঘরে, বাহিরে, স্কুলে, কলেজে, হাটে বাজারে, ইলেকশনে, শাসন পরিষদে, এমন কি সাহিত্যিকদের লেখাতেও তাহারা আশা বা আদর্শের আলো পাইতেছে না। তাই তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহারা 'ভুখা', তাহারা পিপাসিত। ছাত্রদের মধ্যে সবাই যে ভালো তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই বলিব সকলে খারাপও নয়—অনেক ভালো আছে—" এই ধরনের অনেক কথা হইল। ছাত্র দুইটি নামিয়া গেল। অধিকলাল...... ......

টুরে বাহির হইয়া নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করে সে। একবার স্টেশনের একটা ওয়েটিংরুমে পরবর্তী ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, একটি ভিখারী আসিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা, চুল রুক্ষ, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। চোখ দুইটা কিন্তু অদ্ভুত। শাণিত ব্যঙ্গ দৃষ্টি চকমক করিতেছে চোখের দৃষ্টিতে। অধিকলাল প্রথমে ভাবিয়াছিল সাধাবণ মূর্খ ভিখারী বুঝি। কিন্তু কথা কহিয়া বুঝিল লোকটা সাধারণ তো নহেই, মূর্খও নহে, যদিও সে নিজের পরিচয় কিছুতেই দিল না। লোকটি বাঙালী, বাংলাতেই কথা হইল।

"ভিক্ষে চাইছ কেন? লজ্জা করে না?"

"লজ্জা কিসের? এ দেশের সব বড় বড় লোকই তো ভিক্ষুক। বুদ্ধদেব ভিক্ষা করতেন না? আমাদের গভর্ণমেন্টই তো ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! দুচারটে লোক ছাড়া এদেশের সমস্ত লোকই তো হয় ভিখারী, না হয় চোর, না হয় ভিখারী প্লাস চোর। আমি শুধু ভিখারী, আমাকে কিছু দিন দয়া করে, দুদিন খাইনি—"

"তুমি নিজেকে ভিখারী মনে করছ কেন? তুমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক একজন—"

লোকটি হাসিমুখে অধিকলালের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল— "স্বাধীনতা?" বলিয়া চটাস্ করিয়া একটা তুড়ি দিয়া আবার চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ।

"ম্যাজিকের মতো এলো আবার উড়ে গেল। কিছু দেবেন তো দিন, আর না দেন তো আর কারো কাছে যাই—"

"দিচ্ছি তোমাকে কিছু। কিন্তু পরিশ্রম করে রোজগার করাই উচিত—"

"ভিক্ষে করতেও তো পরিশ্রম করতে হয় মশাই। সারাদিন টো টো করে হাঁটছি, এতে পরিশ্রম হয় না ভেবেছেন? পরিশ্রম করে অনেক পরীক্ষা পাশ করেছিলাম, কিন্তু কিছু লাভ হয় নি, ভিক্ষে করে বরং কিছু কিছু পাই রোজ—"

আট আনা পয়সা পাইয়া লোকটি হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

"আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছিলেন?"

"সে সব কথা থাক—"

হঠাৎ বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

....

"তুমি যে রোজ এমন সেজেগুজে যোগীন্দরের সঙ্গে বেরোও এতে তোমার লজ্জা হয় না?"

"লজ্জা কিসের? আমি কালেকটার সাহেবের বউ, আমার আবার লজ্জা কি। সবাই তো আমাকে খাতিরই করে দেখি। সাজগোজ না করিয়া গেলেই বরং বেমানান হইত। যে সমাজে আমরা মিশি, সেখানে কেহই 'ন্যাংটা' নয়—"

"কিন্তু চাকর-বাকররা তোমার সম্বন্ধে কি ধারণা করে? তাহারা চাকর হইলেও সব বুঝিতে পারে।"

"তাহারা কি মনে করে না করে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাইতে চাই না।"

"উহাদের চোখের দৃষ্টি যাহা বলে তাহা অত্যন্ত অসম্মানজনক। উহারা আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিয়া বাহিরে সেলাম করে, কিন্তু আসলে উহাদের চোখে আমি একটি 'বুদ্ধু' মাত্র। তোমার চালচলন মোটেই ভদ্র নয়।"

সাপের মতো ফোঁস করিয়া উঠিল ফুলেশ্বরী।

"আমার চালচলন ঠিকই আছে। তাহা লইয়া তোমার মাথা না ঘামাইলে ভালো হয়।"

নখুও ভালো চাকরি পাইয়াছে। সে আই. এ. এস হইতে পারে নাই। বি. সি. এস পরীক্ষাটা ভালোভাবে পাশ করিয়াছে। কিছুদিন চাকরি করার পর অধিকলালকে সে যে পত্রটি লিখিয়াছিল তাহা এই ঃ

খুদরুদা.

আমাদের বাড়িটা তনু কিছুতেই বিক্রয় করিতে দিল না। অগত্যা তাই আমরা একজন কেয়ারটেকার রাখিয়া দিয়াছি। পরে যাহা হয় করা যাইবে। তনুর ছেলের বয়স পাঁচ বৎসর হইল। তনু তাহার ছেলে ও স্বামীকে লইয়া আমাদের বাড়িতে গিয়াছিল। দিন দশেক ছিলও। মা-ও বাপের বাড়ি হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারও ইচ্ছা নয় যে বাড়িটা অপরের হাতে চলিয়া যায়। বিশেষত রামগোবিনের হাতে যাক মা এটা চান না। ওখানকার স্কুলের নূতন হেডমাস্টার শ্যামশঙ্করবাবুই বাড়িটিতে বাহিরের দিকে থাকেন। আমরা যে কেয়ারটেকার চাকরটি রাখিয়াছি, তাহারই সহায়তায় তিনি বাড়িটিকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বাড়ির সামনের বাগানটি এখনও তেমনি চমৎকার আছে। শ্যামশঙ্করবাবুর বাড়ি দেওঘরের কাছে। তিনি চমৎকার কতকগুলি গোলাপ গাছ আনাইয়া নাকি লাগাইয়াছেন। আমি ছুটি পাই নাই বলিয়া যাইতে পারি নাই, তনু আমাকে অনেক করিয়া যাইতে লিখিয়াছিল। ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছি। যদি পাই তাহা হইলে যাইব এবার। তুমিও যদি আসিতে পার খুব আনন্দের হইবে। তনু লিখিয়াছে তুমি যদি আস সেও আবার আসিবে। তুমি খুদরুদা ছুটির দরখাস্ত কর। তুমি আসিবে শুনিলে মাও হয়তো আবার আসিতে পারেন। একটি সুসংবাদ দিতেছি। আমার একটি ছেলে হইয়াছে। আমার বিবাহের সময় তো তুমি আসিতে পারো নাই। ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় কিন্তু আসিতে হইবে। আমি চেষ্টা করিতেছি পূর্ণিয়াতেই বদলি হইবার জন্য। তুমি যদি

তখন থাকো তোমার নিকটেই কিছু কাজ শিখিব। হ্যাঁ আর একটা কথা। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। চিঠিতে তাঁহার নামটা আর করিব না। তিনি বলিলেন—অধিকলাল কাজে কর্মে খুব ভালো। সে যদি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার দ্রুত উন্নতি হইত। কিন্তু তাহার মাথায় ছিট আছে—অনেস্টির (honesty) ছিট। এজন্য কাহারও সহিত সে মানাইয়া চলিতে পারে না। সকলকেই সে চটাইয়াছে। এমনকি জনৈক হোমরা-চোমরা অফিসার নাকি নেহেরুজির কাছে গিয়াও তোমার নামে নালিশ করিয়াছেন। নেহেরুজি সব শুনিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিন্তু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্রলোকটি। নেহেরুজি নাকি বলিয়াছেন—ওই রকম লোকই তো চাই। ওকে পাগলা বলিতেছেন কেন, হি ইজ অনেস্ট। এ খবর যদি সত্য হয় তাহা হইলে নেহেরুজি তোমাকে হয়তো দিল্লীতে লইয়া যাইতে পারেন। তবে খুদরুদা—একটা কথা বলিব? রাগ করিবে না তো। যখন চাকরি করিতেই হইবে তখন ওপর-ওয়ালাদের চটাইয়া কোন লাভ নাই।......

একবার 'টুর' উপলক্ষেই অধিকলাল স্বগ্রামে গিয়াছিল। উঠিয়াছিল সরকারী ডাকবাংলোয়। অনেকেই তাহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য আসিয়াছিল। স্কুলের শিক্ষকেরা পুরাতন কৃতী ছাত্র হিসাবে স্কুলে একটি বিশেষ অভিনন্দন সভার আয়োজনও করিয়াছিলেন। সে সভায় কিন্তু সে যায় নাই। সে স্কুল ফাণ্ডে একশত টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছিল। সমস্তদিন সরকারী ডাকবাংলোয় বসিয়া সরকারী কাজই করিল সে। যে রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা হিসাবে আজবলাল খ্যাতিলাভ করিয়াছিল সেই রাজনৈতিক দলের কয়েকজন ছোকরাকে লইয়া স্বয়ং রামগোবিন আসিয়া হাজির। তাহার 'আর্জি' অধিকলাল যদি উক্ত রাজনৈতিক দলের আপিসে গিয়া একবার পদার্পণ করে তাহা হইলে আজবলাল কৃতার্থ হইয়া যাইবে। সে 'লেহাজসে' (লজ্জায়) নিজে আসিতে পারে নাই। অধিকলাল সংক্ষেপে বলিল—সে এখানে সরকারী কাজে আসিয়াছে, সভা-সমিতি বা অন্য কোন স্থানে সে যাইবে না। তবু সে দুই জায়গায় গিয়াছিল। কাজ যখন শেষ হইল সে গিয়াছিল তপনকান্তিবাবুর বাড়িটাতে। স্কুলের শিক্ষক শ্যামশঙ্করবাবু তখন ওখানে ছিলেন না। বাড়ির 'কেয়ারটেকার' চাকরটাকে লইয়া সে বাড়ির চারিদিকটা ঘুরিয়া দেখিল। যে লাইব্রেরি ঘরটায় বসিয়া সে পড়াশুনা করিত সেই লাইব্রেরির বারান্দায় গিয়া খানিকক্ষণ বসিল। সেই গাছটা এখনও বাঁচিয়া আছে যে গাছে সে তনুর জন্য দোলনা টাঙাইয়া দিয়াছিল। সেই গাছটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। সেই সেকালের ছোট তনুই যেন তাহার আশে-পাশে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল।..... তাহার পর গেল সে তাহার মায়ের কাছে। গিয়া দেখিল মা বাড়িতে নাই, মাঠে গিয়াছে। রণছোড়ও গিয়াছে। কুঁড়ে ঘরটার দিকে চাহিয়া রহিল সে। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। তাহার উপর বড় বড় তালপাতাও রহিয়াছে কয়েকটা। আশেপাশে কয়েকটা ছাগল চরিতেছে। অধিকলাল খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মাঠের দিকেই অগ্রসর হইল সে। সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। গোধূলি আসন্ন। গরুর দল ধূলা উড়াইয়া বাড়ি ফিরিতেছে। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল প্রকাণ্ড একবোঝা ঘাস মাথায় করিয়া সমুন্দরি আসিতেছে। তাহার পিছনে রণছোড়। তাহার মাথাতেও একবোঝা ঘাস। অধিকলাল প্রথমে তাহার মাকে চিনিতেই পারে নাই। ঘাসের প্রকাণ্ড বোঝায় তাহার মুখটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার হনহন করিয়া চলার ধরন দেখিয়াই অধিকলাল চিনিতে পারিল মাকে।

"মা"—

দাঁড়াইয়া পড়িল সমুন্দরি। তাহার পর ধপাস্ করিয়া ঘাসের বোঝাটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অধিকলাল দেখিল তাহার শ্বাসকষ্ট হইতেছে।

"কে খুদরু?"

"হ্যাঁ—"

অধিকলাল খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া মায়ের এই হাঁপানি দেখিল। রণছোড়ও পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"কে বাবুয়া—?" হাসিমুখে আগাইয়া আসিল সে। অধিকলাল তখন বলিল—মা তুমি এই বয়সে এত কষ্ট কেন করিতেছ? তুমি আমার কাছে চল। তোমরা দুইজনেই চল।

সমুন্দরির চোখে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বলিল—না, বেটা আমি মজুরণী। হাকিমের বাড়িতে আমি থাকিতে পারিব না। যে কয়দিন বাঁচিব 'দুখধান্দা' (দুঃখকষ্ট) করিয়া কাটাইয়া দিব। আমার তেমন দুঃখও নাই, কষ্টও নাই, গতর খাটাইয়া খাই, কাহারও দুয়ারে হাতও পাতি না, কাহারও তোয়াক্কাও করি না। আমি কোথাও যাইব না, যেমন আছি তেমনি থাকিব। আমি ভালোই আছি।

তাহার পর সে বোঝাটা মাথায় তুলিয়া লইয়া আবার হাঁটিতে লাগিল। নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল অধিকলাল। সহসা দেখিল সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তলগ্ন একখণ্ড মেঘ যেন রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।..............

তাহার প্রেসিডেন্সী কলেজের এক বন্ধু তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহার খানিকটা টুকিয়া দিতেছি। এ ছেলেটি কিছুদিন আগে ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়াছিল। পসার এখনও জমে নাই বলিয়া মন দিয়াছিল রাজনীতির দিকে। অধিকলালকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করিত। সে লিখিয়াছে—

"তোমার মতো আদর্শবাদী গভর্ণমেণ্টের চাকুরি করিতেছে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বর্তমানে শাসনের নামে যাহা চলিতেছে তাহার সমর্থন কোনও আদর্শবাদী লোক করিতে পারিবে বলিয়া আমি মনে করি না। ডেমোক্রাসির (democracy) নামে এ এক অদ্ভুত ধরনের ডিক্‌টেটারশিপ্ (dictatorship)। টাকার dictatorship । টাকা থাকিলে সব হয় এদেশে। শুধু পাকিস্তান হিন্দুস্তান নয়, আমাদের দেশ আরও বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি। প্রাদেশিকতা ও কম্যুনালিজমের বিষে আমরা জর্জরিত হইয়া আছি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ইংরাজিকে বিতাড়িত করিয়া তাহার স্থানে হিন্দীকে বসাইবার চেষ্টা—হিন্দী ইম্পিরিয়ালিজ্‌মেরই নামান্তর একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছে। এ দেশের হোমরা-চোমরা বড়লোকরা কিন্তু ছেলে-মেয়েদের ইংরাজি পড়াইতেছে। দেশে নূতন নূতন অনেক মার্কিন স্কুল স্থাপিত হইতেছে, যে সব স্কুলের বেতন গরীবদের নাগালের বাহিরে। যাহারা আরও বড়লোক তাহারা নিজেদের ছেলেদের বিলাতে পড়াইতেছে। অর্থাৎ বড়লোকের ছেলেরা ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, গরীবের ছেলেরা হিন্দী পড়িয়া চিরকাল তাহাদের চাকর হইয়া থাকিবে—এই ধরনের একটা মতলবও যেন ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে আমার কাছে। তুমি বিহারী এ বিষয়ে তোমার সত্য অভিমত কি

জানিতে ইচ্ছা হয়। তোমার মত আমার নিকট মূল্যবান, কারণ তোমাকে আমি একজন পক্ষপাতহীন খাঁটি লোক বলিয়া মনে করি। সকলকেই যদি আইন করিয়া ইংরেজি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে তাহার একটা মানে বুঝিতে পারি কিন্তু কতকগুলি লোক টাকার জোরে ইংরাজি শিখিবে আর বাকিরা শিখিতে পারিবে না এ ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিতে পারি না। আমরা ইংরেজদের পোশাক-পরিচ্ছদ খানা-পিনা কিছুই পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের লোকসভা প্রভৃতিও উহাদেরই নকলে, আমাদের স্বাধীনতাও উহাদের দান—আমরা বহুভাবে উহাদের কাছে ঋণী, এমন কি হাত পাতিয়া অর্থসাহায্যও আমরা উহাদের নিকট হইতে লইতে দ্বিধা করিতেছি না। সবই লইতেছি কেবল উহাদের ভাষা ও সাহিত্য—যাহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য—তাহাকেহ 'বয়কট' করিব কেন—ইহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছি না। হিন্দীওয়ালারা নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেশটাকে আবার সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে ঠেলিয়া দিবে নাকি? ইংরেজ আসিবার পরই আমাদের উন্নতি হইয়াছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? ইংরেজ আমাদের শোষণ করিয়াছে, পীড়ন করিয়াছে,—সবই সত্য। কিন্তু তাহারাই আমাদের মানুষ করিয়া গিয়াছে তাহারাই যে 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত'কে একসূত্রে বাঁধিয়া অখণ্ডতা দান করিয়াছে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? কার্জন সাহেবের সবুট লাথিই আমাদের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিয়াছে। সেই লাথিই ঘুমন্ত বাঙালীকে জাগাইয়াছে। সেই জাগ্রত বাঙালী মনীষাই দেশে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনশঙ্খ বাজাইয়াছে এ সব তো ঐতিহাসিক সত্য........বর্তমানের শাসনকর্তারা যেন এসব সত্যকে আমোলে আনিতে চান না। তাঁহারা কতকগুলি half truth সংগ্রহ করিয়া আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের যে বিকৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তুমি দেখিয়াছ কি? তাহা পড়িলে মনে হয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে গান্ধীজীর অহিংস দলই যেন একমাত্র সেনানী। বাংলাদেশের শহীদদের দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন যেন হিংসাত্মক হীন প্রচেষ্টা......এইসব সত্যকে চাপা দিবার প্রয়াস উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের ম্লান করিবার এই সব হাস্যকর স্পর্ধা দেখিয়া.....সম্মুখে নূতন 'ইলেকশন'......তুমি.......।

[চিঠিখানা সব পড়িতে পারা যায় নাই]

ইহার উত্তরে অধিকলাল লিখিয়াছিল—

ভাই তোমার চিঠি পাইলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে একটি ছোট কবিতায় দিয়া গিয়াছেন। সেইটিই উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইতেছি।

হাউই কহিল মোর কি সাহস ভাই
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই
কবি কহে তার গায়ে লাগে নাকো কিছু
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরই পিছু পিছু।

.....হ্যাঁ ইলেকশন আসন্ন। আগামী ইলেকশনে একটা হইচই হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। আমাকে অন্যত্র বদলি করিবে শুনিতেছি। ঠিকই লিখিয়াছ, আমি চাকুরি করি বলিয়া সব সময় বিবেক—নির্দিষ্ট পথে চলিতে পারি না। তবু চেষ্টা করি। কিন্তু সে চেষ্টাও সব সময়ে ফলবতী হয় না। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এই দুইটি অবশ্যকর্তব্য পালন করা ক্রমশই দুরূহ হইয়া

উঠিতেছে। দেশের ভদ্রলোকেরা, ভালো লোকেরা সত্যই বিপন্ন এবং মুমূর্ষু। যে ধর্ম দেশকে সৎপথে চালিত করে সে ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত। সে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমূল পরিবর্তন দরকার। দরকার এক আদর্শবাদী নির্ভীক সমাজ যে সমাজের লোকরা সত্য-শিব-সুন্দরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আত্মবিসর্জন দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। সেই সমাজ, আগামী যুগের সেই যুগন্ধরদের নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাতেই লাগিয়া পড়..........

.........যেখানে অধিকলাল বদলী হইয়া গেল সেখানে ধূমে ধূলায় এবং উত্তাপে রাজনৈতিক গগন বেশ সমাচ্ছন্ন। যাঁহারা শাসন-বিভাবে মন্ত্রীর গদিতে সমাসীন তাহাদের আসন নাকি টলমল। ইলেকশনের সময় খুব গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা।.....আর একটা ব্যাপারও কাক-তালীয়বৎ ঘটিয়াছে। অধিকলালের সহিত যোগীন্দরও বদলী হইয়া আসিয়াছে। ফুলেশ্বরী ভারী খুশী হইয়াছে ইহাতে। অধিকলাল খুশী হয় নাই, কিন্তু অখুশী ভাবটা প্রকাশ করে নাই। প্রকাশ করাটা অশোভন তো বটেই, নিষ্ফলও। আর একটা অস্বস্তিজনক ব্যাপারের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এজন্য একজন পূর্বপরিচিত এবং বন্ধু-স্থানীয় এস-পি আসাতে অধিকলাল একটু নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টাও করিতেছে। কারণ এসব ব্যাপারে পুলিশের আন্তরিক এবং অকুণ্ঠ সাহায্য না পাইলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করা শক্ত হইয়া উঠে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে পোলিং অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। দুইটি পরাক্রান্ত ব্যক্তি ভোটদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। তাহার মধ্যে একজন আবার মন্ত্রী—তাহার মনিব-স্থানীয়। তিনি নিজে অবশ্য তাহাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার অনুগত চরেরা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। বলিয়াছে এবার যদি অমুক বাবু পুনরায় নির্বাচিত হন তাহা হইলে আবার তিনি নিঃসন্দেহে মন্ত্রী হইবেন। যদি মন্ত্রী হন তাহা হইলে অধিকলালের প্রভূত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ এই মন্ত্রী মহাশয় অধিকলালের প্রতিভা এবং সততায় মুগ্ধ। কিন্তু ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি জেতে তাহা হইলে অধিকলালের সমূহ বিপদ। অর্থাৎ.....অধিকলাল সবই বুঝিল। মুখে বলিল—আমি যথাসাধ্য আমার কর্তব্য পালন করিব। দেখিব যাহাতে ভোটাররা ঠিকমতো নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে। দেখিব যাহাতে ভোটগণনার সময় কোনরূপ কারচুপি না হয়। ইহার বেশী আর কি করিতে পারি। মন্ত্রী মহাশয় অনুভব করিলেন এ ছোকরাকে বখশিসের লোভ দেখাইয়া বিপথে চালিত করা সম্ভব নয়। এ গোঁয়ার ছোকরার নিজের সম্বন্ধে হিতাহিত জ্ঞান একেবারে নাই।.....

.........যোগীন্দরজির মোটরে চড়িয়া এখানেও ফুলেশ্বরী ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা লইয়া অনেকে গোপনে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, অধিকলালকেও এই কুৎসার উত্তাপ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সে ইহা লইয়া কখনও কোন উচ্চবাচ্য করে না, বরং মনে হয় সেও যেন যোগীন্দরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।.....কিছুদিন হইতে যোগীন্দরজি ফুলেশ্বরীকে রিভলভার ছোঁড়া শিখাইতেছে। তাহাকে একটা ভালো রিভলভার উপহারও দিয়াছে। যোগীন্দরজি প্রায়ই বক্তৃতা দেয় যে প্রত্যেক ভারতীয় রমণীই বীরাঙ্গনা, সুযোগ পাইলে সকলেই সুভদ্রা, দ্রৌপদী, রানী দুর্গাবাঈ, পদ্মিনী, লক্ষ্মীবাঈ, প্রীতি ওয়াদ্দেদার হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক রমণীরই উচিত কোন না কোন একটা শস্ত্র-শিক্ষা করা। সুযোগ এবং সুবিধা যখন আছে তখন ফুলেশ্বরী রিভলভার ছোঁড়া শিখিবে না কেন? এই উপলক্ষে প্রায়ই তাহারা মাঠে চলিয়া যায় এবং সেখানে রিভলবার লইয়া লক্ষ্যভেদ করিবার চেষ্টা করে......

ইলেকশনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। টেলিগ্রাম করিয়া অধিকলালকে অন্য জিলায় বদলি করা হইল। তাহার স্থানে আসিলেন একজন খয়ের খাঁ ধুরন্ধর অফিসার যিনি দিনকে রাত এবং 'হয়'কে 'নয়' করতে ওস্তাদ। অধিকলাল কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে জানাইল 'আমাকে এখান হইতে বদলি করা হইয়াছে, সুতরাং আমার উপর ইলেকশনের যে ভার দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিরূপে চালাইব নির্দেশ দিবেন'। উপর হইতে হুকুম হইল, 'তুমি কলেকটারশিপের চার্জটা দিয়া দাও নূতন লোককে, কিন্তু ইলেকশনের ব্যাপারটা তোমাকেই শেষ করিয়া আসিতে হইবে'।

ভোট দেওয়া যখন শেষ হইয়া গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর দিন সকাল হইতে ভোট গণনা করিবার কথা, তাহাই সাধারণত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকলালকে একজন গোপনে খবর দিয়া গেল যে সব বাক্সে ব্যালট পেপারগুলি আছে সেগুলি যদি সুরক্ষিত না হয় তাহা হইলে সেগুলি চুরি হইয়া যাইবে, তালা ভাঙ্গিয়া নূতন ব্যালট পেপার তাহার ভিতর পুরিয়া দিবে। অধিকলাল ঠিক করিল রাত্রেই সে সমস্ত ভোট গণনা শেষ করিয়া ফেলিবে। মিলিটারি পাহারার সাহায্য লইয়া চারিদিকে অনেক আলো জ্বালাইয়া সে নিজের সামনে সমস্ত ভোটগুলি গণনা করাইল। এজন্য সে সমস্ত রাত্রি রিভলবার হাতে লইয়া বসিয়া রহিল পোলিং বুথে। দেখা গেল পরাক্রান্ত মন্ত্রী মহাশয় অনেক ভোটে হারিয়া গিয়াছেন। ভোট গণনা যখন শেষ হইয়া গিয়াছে তখন সে নিদারুণ খবরটা পাইল। যোগীন্দরজি (এস পি) নাকি রিভলভারের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। গুলিটা তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে গিয়া বিঁধিয়াছে। তিনি এখন হাসপাতালে। ঘটনাটা ঘটিয়াছে নাকি অধিকলালের বাড়িতেই। অধিকলাল তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়া যাহা দেখিল তাহা আরও ভয়ানক। ফুলেশ্বরী গলায় দড়ি দিয়াছে। টেবিলের উপর যে ছোট চিঠিটা হিন্দীতে লেখা রহিয়াছে তাহার বাংলা এই—

"আমি চলিলাম। পরজন্মে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য অপেক্ষা করিও"......

.....আজবলালও ভোটযুদ্ধে অবতরণ করিয়াছিল। সেও অনেক ভোটে জিতিয়াছে.......নূতন ক্যাবিনেটে একজন মন্ত্রীও হইয়াছে সে......

অধিকলাল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে তাহার মায়ের কাছে গিয়াছিল। ছেকা ছেনি ভাষায় তাহাদের যে কথা হইয়াছিল তাহা এই।

"কি হাকিম সাহেব, কি খবর—"

"আমি আর হাকিম নই। আমি তোমার ছেলে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। তোমার কাছেই থাকব, তোমার সঙ্গেই মাঠে গিয়া চাষবাসের কাজ করব।"

"ও কাজ তুমি পারবে?"

"নিশ্চয়ই পারব—"

"ঢের হয়েছে। ওসব মজুরের কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমি তোমাকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারব। চাকরি ছাড়লে কেন?"

"চাকরি করতে পারলাম না।"

সমুন্দরি অধিকলালকে কোনদিন মাঠে যাইতে দেয় নাই। শেষে অধিকলাল গ্রামেরই

কয়েকটি ছেলেমেয়ে লইয়া একটা পাঠশালার মতো খুলিয়াছিল। বিনা পয়সায় সকলকে পড়াইত। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া পাঠশালার 'পণ্ডিতজি' হইয়াছেন এ সংবাদ রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। অনেক ছেলেমেয়ে জুটিতে লাগিল। রামগোবিন আসিয়া হাজির হইল একদিন। বলিল—তুমি যে মহাত্মা লোক তাহা আমি অনেকদিন আগেই বুঝিয়াছিলাম। এখন বল কিভাবে তোমাকে সাহায্য করিতে পারি? পাঠশালার জন্য একটা পাকা ঘর বানাইয়া দিব? অধিকলাল মাথা নাড়িয়া বলিল—"না এখন সে সব দরকার নাই। এখন আমার পাঠশালা গাছতলাতেই বসুক—"

এইভাবেই কোনক্রমে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহাও চলিল না। সমুন্দরি একদিন মাঠ হইতে ফিরিল না। একটা ডুলিতে করিয়া তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া আনিল মাঠের চাষারা। রণছোড় বলিল প্রকাণ্ড একটা ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া সমুন্দরি বাড়ির দিকেই আসিতেছিল—হঠাৎ পথের মাঝখানে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আর উঠিল না। হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল রণছোড়।

....

[ইহার পর অনেকটা অংশ নাই। নখুকে অধিকলাল যে পত্রটি লিখিয়াছিল সেইটি শুধু আছে]

ভাই নখু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। বেশ, তোমাদের বাড়ি গিয়েই থাকব। তোমার মা যে আমার কাছে এসে থাকতে চেয়েছেন এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি আর কল্পনা করতে পারি না। তোমার ও তনুর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ভার আমি নিশ্চয়ই নিব। বনিয়াদটা ভালো করে দেব, তারপর তাদের বড় স্কুলে কলেজে পড়িও। গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েদেরও আমি পড়াব তোমার বাড়িতে। আমাদের দেশ পুণ্যভূমি। আমাদের দেশে অনেক ভালো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের মানুষ করতে হবে। এখন শিক্ষার দোষে তারা জানোয়ার হয়ে যাচ্ছে। সেটা আমাদের লজ্জা, আমাদেরই অক্ষমতা। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ভালোবাসা মহৎ প্রেরণা দিয়ে তাদের গড়তে হবে। তাদের জন্য সব দিতে হবে, নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মত্যাগ করতে হবে, তবেই তারা মানুষ হবে। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে পড়ছে—

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা
সব দিতে হবে।

আমি সব দিতে প্রস্তুত আছি ভাই। আমার ভালোবাসা নাও। মাকে প্রণাম দিও।

ইতি

গোপালদেবের স্বপ্ন

।। ১ ।।

গঙ্গার তীর। বৈশাখের প্রখর রৌদ্র চারিদিক ঝলমল করিতেছে। একটা শুষ্ক গাছের উচ্চ শাখে বসিয়া তীক্ষ্ণ মিহি সুরে একটা চিল তাহার সঙ্গিনীকে আহ্বান করিতেছে। চারিদিকে ছোট বড় বালুর স্তূপ। শীর্ণ-ধারা গঙ্গা একটা সঙ্কীর্ণ খাতে বহিতেছে। খাতের দুই পাশে নানারকম সবুজ। দূরে দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝাউগাছ। এখানে—এই বালুর চরে—সবই যেন অবাধ। এখানে যেন সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। কোন প্রহরী নাই। নাম-না-জানা কয়েকটা পাখি নদীর উপরে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে ফড়িং প্রজাপতিও দেখা যাইতেছে, একটা ছাগলের পিঠের উপরে ফিঙে বসিয়া আছে একটি। এই বিরাট চরে—এই আলো-বাতাস-আকাশের রাজত্বে—দৃষ্টি দিগন্তরেখায় গিয়ে ঠেকে। কোথাও কোন বাধা নাই।

এই চরে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কার্তিক আসিয়া হাজির হইল। আর তাহার পিছনে পিছনে আসিল একটা ল্যাবরাডর কুকুর। কার্তিকের হাতে একটি ময়লা থলি। থলিটি নামাইয়া বসিল সে। বসিয়া নিজের পা-টা দেখিল। পা-টা মচকাইয়া গিয়াছিল। কুকুরটা তাড়া করিয়া গেল ছাগলটাকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল ছাগলটা।

লর্ড ফিরিয়া আসিল। তাহার চোখে স-প্রশ্ন দৃষ্টি।

"পরের ছাগল ধরতে যেও না। ও ছাগল আমরা হজম করতে পারব না। পারো তো মুর্গি-টুর্গি ধর একটা—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। কার্তিক বাঁ পায়ের পাতাটাকে নাড়াইয়া দেখিল খানিকক্ষণ। তাহার পর কুকুরটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা, লর্ড, তুমি আমার পিছু পিছু বাড়ি থেকে চলে এলে কেন। আমি তো একটা ভ্যাগাবণ্ড, আর তুমি তো একটি রাক্কোস। আমার নিজের খাবার যোগাড় করাই মুশকিল তোমার খাবার পাব কোথায়—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। তাহার পর থাবা গাড়িয়া বসিয়া থাবার উপর মুখটি রাখিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বিস্কুট নেই, লেড়ুয়াও নেই, একটি পয়সা পকেটে নেই। কি খাবি এখন? বোকা ভূত কোথাকার, কেন চলে এলি আমার সঙ্গে—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। লর্ড অভিজাতবংশীয় কুকুর। তাহার কুচকুচে কালো রং রেশমের মতো চকচকে। চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত, দুষ্টু দুষ্টু। মুখটি সুশ্রী, কান দুটি ছোট ছোট, মখমলের মতো নরম। কপালটি চওড়া। বুকটাও চওড়া। কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া সে ক্রমাগত ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

কাছেই একটা বড় অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। কার্তিক উঠিয়া গিয়া তাহারই গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল। খানিকক্ষণ সে সবিস্ময়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড়গুলির দিকে চাহিয়া রহিল। শিকড় নয় যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ, প্রাণপণে মাটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পর থলিটা উপুড় করিল সে। থলি হইতে বাহির হইল একটা ছেতো-ধরা রুটির আধখানা, অনেক তরিতরকারি এবং

ফলের খানিকটা খোসা, বিবর্ণ লাল শাক, একটা লোহার ছোট কড়াই এবং খুন্তি, আর কয়েকটা ছোট ছোট টিন। প্রত্যেকটি টিনের ঢাকনা খুলিয়া খুলিয়া দেখিল সে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। গুঁড়ো মশলা একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। এসব ছাড়াও বাহির হইল একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া জাবদা গোছের খাতা। খাতাটা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল সে।

কার্তিককে দেখিলেই মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ। কয়েকদিনের অনাহারে, অনিদ্রায় এবং পথশ্রমে তাহার মুখে কিন্তু একটা ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে। বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখের কোলে কালী, মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ের পাঞ্জাবী সিল্কের, কিন্তু ময়লা হইয়া গিয়াছে। পায়জামাটার অবস্থাও ভদ্র নহে। পায় জুতা নাই।

লর্ড হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া গেল। গঙ্গার শীর্ণ জলধারার আশেপাশে গোটা তিনেক বাটান চরিতেছিল। উড়িয়া গেল।

"ছি, ছি, লর্ড উড়িয়ে দিলে। আগে দেখতে পেলে আমি গুলতি বার করতুম।"

পকেট হইতে সে একটা গুলতি এবং কয়েকটি মাটির গুলিও বাহির করিল।

আবার লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া গেল, কার্তিক দেখিল সেই বামনটা আসিতেছে। তাহার হাতেও একটা থলি। সার্কাস-পলাতক এই বামনটার সহিত রাস্তায় আলাপ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে লোকটা আর সঙ্গ ছাড়িতেছে না। কার্তিক চাহিয়া রহিল তাহার দিকে কয়েক মুহূর্ত। প্রকাণ্ড মাথা, হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিতেছে। লর্ডের সহিত কয়দিনেই খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। লর্ড তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল।

বামন মুখে আঙুল ঢুকাইয়া জোরে সিটি দিল একটা। তাহার পব মুখ সূচালো করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল—হুই—হুই—হুই--

তাহার পর আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল কয়েক মুহূর্ত। আবার হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। কাছে আসিয়া বলিল—"আমি গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গিয়েছিলাম। তুমি বললে, গঙ্গার ঘাটে যাবো—সেখানে গিয়ে দেখি মেলা লোক চান করছে। অনেক খুঁজলাম তোমাকে। ওদিক পানে গেলাম—গিয়ে দেখি শ্মশান। তারপর এই দিকে এলাম হাঁটতে হাঁটতে—"

"তুমি চরের ওপারে বড় গঙ্গায় গিয়েছিলে?"

"হিঁ। অনেক হেঁটেছি। কোথাও পাই না তোমাকে। কিন্তু আমি বেঁটে বীর আন্‌টারাম, ছাড়বার পাত্র নই। ঠিক করলুম খুঁজে বার করবই। করলামও। হুই—হুই—হুই—"

বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। লর্ডও ঘেউ ঘেউ করিয়া লাফাইতে লাগিল তাহার চতুর্দিকে।

"তুমি হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গেল কোথা। তোমাকে বললাম, চল গঙ্গার ধারে যাই, তার আগে কিছু খাবারও জোগাড় করতে হবে, তারপর গঙ্গার ধারে গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়ব—"

আন্‌টারাম আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া বলিল—"ভীড়ের মধ্যে ঢুকেছিলাম রোজগারের চেষ্টায়। কিছু রোজগার করলামও। নানারকম খেলা দেখালাম। মাথা মাটিতে রেখে পা দুটো আকাশপানে তুলে বনবন করে ঘুরলাম খানিকক্ষণ। চড় চড় চড় করে হাততালি পড়ল।

বললাম—হাততালিতে পেট ভরবে না দাদা। পয়সা চাই। আরও একটা খেলা দেখাচ্ছি। নাচ দেখাব একটা। ভীল সর্দারের ওয়ার ডান্সটা দেখালাম। তরোয়াল ছিল না, কিন্তু একটা বাখারি দিয়েই মাত্ করে দিলাম। অনেক পয়সা পড়ল। তিন টাকা বারো আনা। এই থলিটা কিনলাম। কিছু কুঁচো চিংড়ি আর আধখানা লাউ কিনলাম। কাঁচা লঙ্কাও কিনেছি—তুমি কোনও খাবার যোগাড় করতে পেরেছ—? সন্দেশ কিনব ভাবলাম, কিন্তু বড্ড দাম—"

"আমার পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছে। সেদিন তুমি চপ কাটলেট খেতে চাইলে, তাইতেই সব পয়সা ফুরিয়ে গেল আমার—"

"খাসা ছিল কিন্তু চপ কাটলেটগুলো। আমাকে মোহিনী মাঝে মাঝে খাওয়াত কিনা, তাই লোভ হয়ে গেছে—"

"মোহিনী কে?"

"সার্কাসের একটা মেয়ে। ওস্তাদ মেয়ে। ছাতা নিয়ে তারের উপর গটগট করে চলে যায়। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে টপ্ করে চড়ে আবার টপ করে নাবে। আর সাইকেল যা চালায়—এক চাকায়, দু'চাকায়, দুমড়ে, মুচড়ে সে এক কাণ্ড— !"

"সার্কাস থেকে পালালে কেন?"

"ওই যে বললাম, সবাই আমাকে ক্ষেপাত। আমাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না কেউ। চাকরবাকরগুলোও আমাকে ডাকত—এরে বাম্না, এরে নাটা। মোহিনীকে একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছিলাম—তোকে আমি ভালোবাসি মোহিনী। বললে—জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদা বেঁটে কোথাকার। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাস—"

তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল সে।

"অথচ আমি কোন বংশের ছেলে তা যদি জানত হারামজাদি—"

কার্তিক ও প্রসঙ্গে আর আলোচনা করা সমীচীন মনে করিল না। সে থলি হইতে যে জিনিসগুলা বাহির করিয়াছিল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"ওগুলো কি খাওয়া উচিত?"

"কি ওগুলো, কোথায় পেলে?"

"একটা ডাস্ট্‌বিন হাঁটরে বার করেছি। তার মধ্যে এই খাতাটাও ছিল। একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—"

"যাবে না কেন? পাঁউরুটির ছেতোগুলো ধুয়ে ফেলি। শাক আর খোসাগুলো ধুয়ে ফেলা যাক। তার সঙ্গে লাউ আর কুঁচোচিংড়ি, আর কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলি এস। নুন-টুন আছে তো?"

"আছে। গোলমরিচের গুঁড়ো পেঁয়াজ আর হলুদের গুঁড়োও আছে। একটু তেল পেলে ভালো হতো। মাছগুলো লাল করে ভেজে নিলে—"

"তেল নিয়ে আসছি। কাছেই একটা মুদির দোকান আছে। এখনও আমার পয়সা আছে কিছু—"

আন্টারাম আবার হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

কার্তিক অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়া পায়ের উপর পা-টা তুলিয়া দিল। দশদিন হইল শ্বশুরবাড়ি হইতে অপমানিত হইয়া শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করিয়াছে সে। বড় শালা তাহাকে জুতো ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। মারিবেই তো, বেকার ঘরজামাইকে সেকালে লোকে পুষিত, একালে পুষিতে পারে না। সহসা তাহার মনে হইল সেকালের লোকও কি পুষিত?'প্রহারণে ধনঞ্জয়' কথাটা তো সেকালেরই। না, বেকার লোককে কোনকালেই কেহ প্রশ্রয় দেয় না। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আবার তুলিয়া লইল সে। উপন্যাস পড়িতে বরাবরই ভালোবাসে। কলেজে যখন পড়িত তখন পাঠ্যপুস্তকের দিকে তত আগ্রহ ছিল না। লাইব্রেরি হইতে উপন্যাস প্রচুর পড়িয়াছিল। বি-এতে থার্ড ক্লাস অনার্স পাইয়াছিল ইতিহাসে। চাকুরি জুটে নাই। বাবা মা কেহ নাই। ভাই বোনও না। মামার বাড়িতে মানুষ। চেহারাটা ভালো ছিল বলিয়া এক বড়লোক জমিদার সাধিয়া তাহাকে ঘরজামাই করিয়াছিলেন। একটি ছোট শালা উকিল হইয়াছেন। তিনি অনেকদিন হইতেই বলিতেছিলেন এইবার তুমি চরিয়া খাও, আর আমি তোমার ভরণপোষণ করিতে পারিব না। কার্তিক কথাটায় এতদিন কান দেয় নাই। কারণ সে জানে চরিয়া খাইবার মতো মাঠ নাই দেশে। কিন্তু পাদুকা-প্রহারের পর আর সেখানে থাকা গেল না। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়, তাহার বড় শালার সিল্কের পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া সে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগেও গিয়াছে। সেইদিনই লোকটা হঠাৎ মারমুখী হইয়া উঠিল। স্ত্রী নিমুর রোগা মুখটা মনে পড়িল তাহার। ভাসা-ভাসা অশ্রুভরা চক্ষু দুইটি আবার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহাকে বলিয়া আসিয়াছে দেশে হুগলী জেলায় তাহার যে পৈতৃক ভিটা আছে সেইখানে সে যাইতেছে। গ্রামটার নাম সিংরা। কখনও সেখানে যায় নাই। সেই অচেনা গ্রামে গিয়া সে সংসার পাতিবে। কুঁড়েঘরে শাকান্ন খাইয়া নিমুকে লইয়া সুখে থাকিবে। এই তাহার আশা। এই আলেয়ার পিছনে সে এখন ছুটিতেছে। হাতে পয়সা নাই। জুতা জোড়া একটা মুচিকে বিক্রয় করিয়াছে। বিক্রয় করিবার মতো আর কিছু নাই। হাতে পয়সা থাকিলে ট্রেনে হুগলি যাইত। সেখানে গিয়া সিংরা গ্রামের সন্ধান করিত। কিন্তু পয়সা নাই। হাঁটিয়াই যাইতে হইবে। মুঙ্গের হইতে হুগলী কতদূর? কে জানে। কাল অন্ধকারে হাঁটিতে হাঁটিতে একটা খানার ভিতর পড়িয়া গিয়া পা-টা মচকাইয়া গিয়াছে। ভাগ্যে আন্টা ছিল, সে তাহাকে টানিয়া তুলিল; কিছুদূর কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিল। অসম্ভব জোর ছোঁড়াটার গায়ে। পথের বন্ধু। ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন। নিজের পরিচয় বলিতে চায় না। বলে—সার্কাস হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আর কিছু বলিতে চায় না। আজ হঠাৎ মোহিনীর কথা বলিল। হঠাৎ যেন তাহার মন খুলিয়া গেল। জুতো জোড়া বিক্রয় করিয়া সে পাঁচসিকে মাত্র পাইয়াছিল। রাস্তার পাশের একটা দোকানে বসিয়া চা আর লেড়ুয়া খাইতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, আন্টা তাহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কার্তিক লর্ডকেও খান দুই লেড়ুয়া দিয়াছিল। লর্ডের মুখ হইতে কয়েকটুকরো লেড়ুয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। কার্তিক দেখিল আন্টা সেই টুকরাগুলির উপরও লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তখন তাহাকে বলিতেই হইল—"আপনি চা খাবেন?" সঙ্গে সঙ্গে আন্টা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিয়াছিল—"হিঁ—"। সে 'হাঁ'কে 'হিঁ' বলে। খাওয়া শেষ করিয়া সে যখন আবার চলিতে শুরু করিল দেখিল আন্টাও তাহার পিছু পিছু আসিতেছে। সে যখন মোড় ফিরিল আন্টাও ফিরিল। তখন তাহাকে থামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল,"আপনি কোথা যাবেন—"

"তোমার সঙ্গে। বন্ধু হয়ে গেলাম—"

'আপনি' না বলিয়া সে একেবারেই 'তুমি' বলিল।

মুচকি হাসিয়া কার্তিককে হাতটা বাড়াইয়া দিতে বলিল।

"বেশ চল। কিন্তু জেনে রাখ, আমি বেকার।"

"আমিও তাই। কাজ জুটিয়ে নেব কোথাও না কোথাও। দু'খানা হাত দু'খানা পা আছে তো—অ্যাঁ কি বল!"

"তা তো বটেই। লেখাপড়া কতদূর?"

"সেদিকে অষ্টরম্ভা, ম্যাট্রিক ফেল! সার্কাসে ঢুকেছিলাম! থাকতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম। দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে—"

লর্ডকে কার্তিকই পুষিয়াছিল। একজন বড়লোকের ছেলে তাহাকে বাচ্চাটা দিয়াছিল। এজন্য তাহাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে শালার কাছে। বলিত—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। লর্ড তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। এ লোকটাও জুটিল। আজ কিন্তু সে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছে—এ তো একটা অ্যাসেট্ (asset)—টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। উঠিয়া পড়িল। নদীর ধারে গিয়া ছেতোধরা পাঁউরুটি, শাক আর খোসাগুলো সে ধুইয়া ফেলিল। কড়া আর খুন্তিটাও মাজিল। এ দুইটা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। ঠিক নিজস্ব নয়, শালার পয়সাতেই কেনা। বাড়িতে মাঝে মাঝে রান্না করিত সে। শৌখিন নূতন রকমের রান্না কচু, আলু সিদ্ধ করিয়া তাহাতে প্রচুর আদার রস দিয়া (এবং ঘি দিয়া) কচ্বাদা প্রস্তুত করিয়াছিল একবার। বড় শালাও খাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল অনেক মাছের ছানা জলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গামছা থাকিলে ছাঁকিয়া তুলিতে পারিত। লুব্ধ দৃষ্টিতে মাছের ছানাগুলার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইঁট জোগাড় করিল গোটা চার। শুকনা ডালপাতা জোগাড় করিল কিছু। উনুন চাই। কিন্তু উনুনে খুঁড়িবে কি করিয়া? না খুঁড়িলে কি উনুন ধরিবে? একটু গর্ত মতো হওয়া দরকার।

"লর্ড—লর্ড—"

কোথায় গেল কুকুরটা। গাছের পিছনে যে ঝোপঝাড় ছিল সেখান হইতে লর্ড সাড়া দিল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ। কার্তিক গিয়া দেখে লর্ড সেখানে গর্ত খুঁড়িতেছে। সম্ভবত ইঁদুর বা ছুঁচোর সন্ধান পাইয়াছে। অন্য সময় হইলে কার্তিক তাহাকে বকিত। এখন কিছু বলিল না। খুঁড়ুক খানিকটা। লর্ড বেশ খানিকটা খুঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর তাহার ভিতর মুখ ঢুকাইয়া দিল। নাকে মুখে মাটি লাগিয়া গেল। আবার খুঁড়িল খানিকটা। কোথায় ইঁদুর, কোথায় ছুঁচা, কিছুই নাই।

"সর দেখি—"

কার্তিক আশপাশের জঙ্গল ছিঁড়িয়া গর্তটার চারিদিক পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর হাত দিয়া মাটিগুলা সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে লাগিল গর্তটা কত বড় হইয়াছে। লর্ড ঘাড় বাঁকাইয়া কান খাড়া করিয়া ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে চাহিয়া রহিল গর্তটার দিকে। যদি কিছু বাহির হইয়া পড়ে।

"হুই—হুই—হুই—"

তাহার পরই একটা শিস। আন্টা আসিতেছে বোঝা গেল। কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল আন্টা বেশ দ্রুতপদে আসিতেছে।

"এই শিশিটাও কিনে নিলাম। তেল না হলে রাখব কিসে? রোজই তো তেল লাগবে।"

"বেশ করেছো—"

"আর এই ছুরিটাও। লাউ কুটতে হবে তো—"

"সব খরচ করে ফেললে?"

"না, আনা চারেক আছে এখনও। বাঃ, তুমি তো খাসা উনুন বানিয়েছ দেখছি।"

"লর্ড বানিয়েছে—"

লর্ড ল্যাজ নাড়িতে লাগিল এবং অকারণে চীৎকার করিল—কাপ্ কাপ্ কাপ্।

লর্ডের গলা দিয়া নানারকম ডাক বাহির হয়।

আন্টা নদীর শীর্ণধারার দিকে চাহিয়া বলিল, "এতে কি চান করা চলবে?"

"বোধহয় না—"

" আরে আরে আরে!"

"কি—"

"হুই দেখ—বগমামা। তোমার গুলতিটা কোথা গেল। লর্ডের খাবারটাও যোগাড় করে ফেলি!"

গুলতি লইয়া আন্টা বকটার দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া বসিল। তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। লর্ড হামাগুড়ি দিয়া তাহার পিছু পিছু চলিল। দেখা গেল আন্টার লক্ষ্য অব্যর্থ। বকটা ঝটপট করিয়া কিছুদূরে উড়িল, কিন্তু পড়িয়া গেল শেষ পর্যন্ত। লর্ড বনবন করিয়া ছুটিয়া গিয়া মুখে করিয়া লইয়া আসিল সেটাকে।

"ওটা তুইই খা। দাঁড়া পালকগুলো ছাড়িয়ে দিই—"

লর্ড প্রথমে কিছুতেই দিতে চায় না। অনেক ছুটাছুটি করিয়া তাহার মুখ হইতে আন্টা বকটা কাড়িয়া লইল। কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল—"কুঁচো চিংড়ি কি করে কুটব?"

"এদিকে এস। একটা ইটও আন। ওরই উপর একটু রগড়ে নাও না। তারপর লাল করে ভাজ—"

ঘণ্টা দুই পরে।

আন্টা হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। বকের পালক চারিদিকে ছড়ানো। উনুনটার আগুন নিবিয়া গিয়াছে। কার্তিকের চোখে ঘুম নাই। অশ্বত্থ গাছের জটিল গুঁড়িটার উপর ঠেস দিয়া সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। রৌদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল রোদটা যেন একটা বাঘ। রোজ ভোরে আসে পৃথিবীর বুক হইতে রস শোষণ করিয়া লয়। তাহার পর অসংলগ্নভাবে মনে হইল নিমু কি এখন ছাতে বসিয়া বড়ি দিতেছে? চিন্তাধারা কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল। মনে পড়িল, নিমু তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল। বলিয়াছিল,"চলে যেও না। দাদা রাগী মানুষ, রাগের মাথায় একটা কাজ করে ফেলেছে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি দাদার পাঞ্জাবী আর পোরো না। থাকো, সব ঠিক

হয়ে যাবে। তুমি চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব? ভগবান একটা ছেলেপিলেও তো দেন নি—"। নিমু চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়াছিল। এই ছবিটা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সে তখন নিমুকে বলিয়াছিল—কেঁদো না, আমি সিংরায় পৌঁছে তোমাকে নিয়ে যাব। এরকম গলগ্রহ হয়ে পশু-জীবন যাপন করতে আর বোলো না আমাকে। নিমু তবু কাঁদিয়াছিল। হঠাৎ একটা হাওয়া উঠিল। পাণ্ডুলিপির পাতাটা ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। পাণ্ডুলিপিটা তুলিয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময় লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল আন্টা। তাহার ঘুম খুব সতর্ক।

"কি হল কুকুরটার আবার।"

"কিছু দেখেছে বোধহয়।"

আন্টা উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বোকাটা! গাছের উপর চড়াই পাখি দেখে লাফালাফি করে মরছে। যেন ধরতে পারবে—"

আন্টা শুইল আবার।

"আবার ঘুমুবে না কি।"

"না, আর ঘুম হবে না। একবার ঘুম ভাঙলো তো নিশ্চিন্দি। আর দু'পাতা এক হবে না—"

"তাহলে এইটে শোন—"

"কি ওটা—"

"পড়ছি শোন না।"

"পড়। ছেলেবেলায় রামায়ণ শুনতে খুব ভালো লাগত—পড়, পড়—আমি শুয়ে শুয়ে শুনি—"

কার্তিক পড়িতে শুরু করিল। আন্টা তাহার পাশে শুইয়া পড়িল।

"সূত্রধার প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে চম্পকের মালা। ললাটে রক্ততিলক। কেশদামে মেঘমহিমা। দৃষ্টি স্বপ্নময়। পরিধানের কাষায় বস্ত্রে স্বর্ণ-দ্যুতি। শুভ্র উত্তরীয়টা বন্ধুর মতো কণ্ঠ-লগ্ন। উত্তরীয়ের ফাঁকে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ দেখা যাইতেছে, মনে হইতেছে যেন ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারা। সূত্রধার করজোড়ে নিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সম্ভবত মহাকালকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অনন্ত-বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চে যে মহানাটক বারবার অভিনীত হয়েছে, বারবার অভিনীত হবে, বিস্মৃতির পলিমাটিতে যা বারবার আচ্ছাদিত হয়, আবার সহসা আত্মপ্রকাশ করে নবরূপে নবীন দীপ্তিতে, যার বাণী দিবসে সূর্যের মতো, রাত্রিতে নক্ষত্রময়, যার তেজ নবোদ্ভিন্ন অঙ্কুরে অমর—তারই কথা আমি প্রথমে বলব একটি রূপকের আকারে। তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।"

কিছুক্ষণ নিমীলিত নয়নে থাকিয়া তিনি গোপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোপালবাবু, এবার হয়তো আপনার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হবে। তখন আপনি দেখবেন দুঃসাধ্য সাধনই মানুষের ব্রত, অসম্ভবকে সম্ভব করেই তার কীর্তি কালজয়ী হয়েছে। তার আগে অনলস আর অরূপের রূপকথাটি শুনুন। এই রূপকথাই কাব্যে মণ্ডিত হয়ে ইতিহাসে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখা দিয়েছে নানারূপে। কখনও রক্তসমুদ্র সন্তরণ করে, কখনও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রার পুরোভাগে। যে শক্তি চিরচঞ্চল, সেই অনলস। তাকে আমি পুরুষরূপে কল্পনা

করেছি। আর যার বিশেষ কোন রূপ নেই, কিন্তু যা নানারূপে বিকশিত হবার জন্যে সদা উন্মুখ, সেই অরূপ। এদের কথোপকথন শ্রবণ করুন।

অনলস বলছিলেন—"আমি তো এক মুহূর্ত থামতে পারি না। অনন্তের অন্ত দেখবার অসম্ভব আশা আমাকে পাগল করে তুলেছে। জানি না সে আশা পূর্ণ হবে কিনা—"

অরূপ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন কবিতায়।

"অনন্তের অন্ত পেতে মিথ্যা কেন চেষ্টা ভাই
অন্ত যার স্পষ্ট তার সবটা তুমি দেখতে পাও?
দেখতে পেলে দেখতে তুমি সান্তই যে অনন্ত
পরমাণুর আকাশেতেই মহাকাশ বিলগ্ন।
ছোট্ট ফুল ছোট্ট নয়, সত্যি অতি মস্ত সে
তারই তরে সূর্য ওঠে পবন হয় প্রমত্ত
তারই তরে আকাশব্যাপী ষড়ঋতুর রহস্য
অন্তহীন লীলা তাদের টের পাও কি বয়স্য?"

অনলসের ভ্রূকুঞ্চিত হল। তারপর তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, "না পাই না। কাজের ডাক ছাড়া আর কোনও ডাক শুনতে পাই না আমি। কাজের পর কাজ, তারপর আরও কাজ, একটার পর একটা কাজের মধ্যেই হারিয়ে ফেলতে চাই নিজেকে। কিন্তু পারছি না। তুমি তোমার কাব্যের সেতারে যে মীড় টেনে বার করতে পার আমি তাও পারি না। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব?"

"বল—"

"আমার মনে হয় তুমি সময় নষ্ট করছ। সুরের মীড় টেনে যে স্বপ্ন দেখছ তা অবাস্তব—"

আবার অরূপ হেসে উত্তর দিলেন কবিতায়।

অবাস্তব নয় স্বপ্ন :
বিষ-মগ্ন
ধূর্জটির চোখে পড়েছে স্বপ্নের ছায়া।
পার্বতীর কায়া
স্বপ্ন-বিনির্মিতা;
কর্মের হল-মুখে উঠেছিল স্বপ্ন-সীতা।
শূন্যের নীল আঁখি
থাকি থাকি
বর্ণের আভাস পায় স্বপ্ন থেকে
সন্ধ্যা উষা রামধনু এঁকে যায় যাহা সব
স্বপ্ন তাহা—নয় অবাস্তব।

অনলস একটু বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন অরূপের মুখের দিকে। তারপর বললেন—"আমি স্বপ্ন দেখতে পারি না বলেই হয়তো এত খেটেও ঠিকমতো কিছু করে উঠতে পারি না। আমি জানি কাজের চাকায় জগৎ চলছে, আমি সেই চাকা হতে চাই, তোমার স্বপ্ন কি সে

চাকায় তেল জোগাতে পারবে? তোমার স্বপ্ন তো কোনও কাজে মূর্ত হচ্ছে না। একটা রঙীন ধোঁয়ার মধ্যে বাস করছ তুমি। কি করবে তুমি এই অকেজো স্বপ্ন নিয়ে—"

"কিছুই করব না। কিছু করাটা তো আমার লক্ষ্য নয়, যদি কিছু হয়ে ওঠে আপনি হবে, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। আমি কেবল দেখে মুগ্ধ হই। আমার লক্ষ্য আনন্দ, এবং পেলে সেটা আঁকড়ে ধরে রাখা। কিন্তু রাখা যায় না, মুশকিল ওইখানে। দেখতে দেখতে লাল নীল হয়ে যায়, নীল রূপান্তরিত হয় সবুজে। মদমত্ত মাতঙ্গ প্রজাপতি হয়, দৈত্য দেখতে দেখতে হয়ে যায় পরী। তাই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা আর করি না। আমি স্বপ্ন-বিলাসী। এতে তোমার রাগ কেন—"

"রাগ তোমার নাগাল পাই না বলে। কে যেন আমার মনের ভিতর বসে অনবরত বলছে তোমাকে পেলেই আমার কাজের গোছ হয়ে যাবে। তুমিই আমার কাজের প্রেরণা। কিন্তু তুমি আমার নাগালের বাইরে কখন কোন স্বপ্নের আকাশে যে ঘুরে বেড়াচ্ছ তার ঠিক পাই না। মন খারাপ হয়ে যায়।"

অরূপ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—"আমারও মনের ভিতর কে যেন বলে অনলসের নাগাল না পেলে তুমি সার্থক হবে না। তবু আমি এখনও স্বপ্নের আমেজেই আছি। স্বপ্ন কেন দেখি জান? স্বপ্ন চোখে আটকে থাকে না। আগে আমার আটকে রাখার প্রবৃত্তি ছিল, তাই দুঃখ পেতাম। এখন বুঝেছি চলে যাওয়াটাও সুন্দর। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের শোভাযাত্রা দেখি আজকাল। কি ভালোই যে লাগে।—তুমি কাজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছ সেটাও খারাপ লাগে না। মেঘ দৌড়য়, হাওয়া দৌড়য়, এমন কি গাছের অঙ্কুররাও স্থির হয়ে বসে নেই। নিখিল বিশ্বে সবাই ছুটেছে, তুমিও তার সঙ্গে ছুটছ এটা আমার বেশ লাগে, কিন্তু আমার মনে হয় নিখিল বিশ্বের ছোটার যে ছন্দ তার সঙ্গে তোমার ছোটার ছন্দ ঠিক যেন মিলছে না। বললে বিশ্বাস করবে না, আমিও মনে মনে দৌড়াই তোমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারলে হয়তো আনন্দই পেতাম। কিন্তু পারি না। তোমার কর্ম বড় স্থূল। দড়ির মতো জড়িয়ে যায় হাতে। ও স্বপ্নের মতো চলে যায় না, স্থূল অস্তিত্ব নিয়ে অনড় হয়ে থাকে, আর ফাঁপিয়ে তোলে মিথ্যা অহমিকাকে—"

অনলস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"তুমি গীতা পড়নি?"

"পড়েছি"—উত্তর দিলেন অরূপ—"কিন্তু গীতা পড়লেই গীতার উপদেশ পালন করবার শক্তি হয় না। আসক্তি ত্যাগ কর বললেই কি তা ত্যাগ করা যায়? তুমি আসক্তি ত্যাগ করতে পেরেছ? সত্যি করে বলতো।"

"কাজ যতক্ষণ করি ততক্ষণ তার প্রতি আসক্তি থাকে বই কি। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলেই তার কথা ভুলে যাই আমি—"

"পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি যে স্বপ্নের মিছিল দেখি তা ভুলে যাব একথা ভাবতেও আমার খারাপ লাগে।"

হঠাৎ অনলস সানুনয়ে বললেন—"তুমি এস আমার সঙ্গে অরূপ। এস আমরা দু'জনে মিলে যাই।"

"তা কি করে সম্ভব—"

"শুনেছি সম্ভব। ওই যে দূর দিগন্তে নীল পাহাড়ের উপর শ্বেতচন্দনতিলকের মতো মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে—ওটি কার মন্দির জান?"

"সবাই বলে সরস্বতীর মন্দির। শুনে বিস্মিত হয়েছি। সরস্বতী কি কোন মন্দিরে আবদ্ধ থাকতে পারেন?"

"ও মন্দিরে কোনও প্রতিমা নেই। সুর আছে কেবল। অদ্ভুত সে সুর, সেই সুরে বহু এক হয়। বেসুরা সুরের সন্ধান পায়। ও মন্দিরের ছাত নেই। শুনেছি মাঝে মাঝে আকাশ থেকে স্বয়ং হংসবাহিনী আবির্ভুতা হন ওই মন্দিরে। তিনি স্বপ্নকে বাস্তব করেন, বাস্তবকে স্বপ্ন করে দেন অনায়াসে। অনেকে বলেন ওই মন্দিরে যে বিচিত্র সুর অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে তাই মাঝে সর্বশুক্লা তন্বী তরুণী মোহিনীর রূপ ধারণ করে। তখন তাঁর পদপ্রান্তে স্থান পাবার আশায় আকাশ থেকে ছুটে আসে রাজহংস, তাঁর চতুর্দিকে মূর্ত হয় নীল সরোবর আর তাতে ফুটে ওঠে অসংখ্য শ্বেত-পদ্ম। অসম্ভবকে সম্ভব করবার ক্ষমতা আছে ওই যাদুকরীর। চল আমরা যাই ওখানে—"

"আমার কল্পনা চলে গেছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি সুর সেখানে রঙের শোভায় মূর্ত। ভৈরবীর গৈরিকের সঙ্গে ভৈরবের রক্তরাগ, তোড়ির কনক কান্তির সঙ্গে পূরবীর সন্ধ্যাচ্ছটা মিশেছে সেখানে। কল্পনায় আমি সেখানে চলে গেছি অনলস।"

"কল্পনায় গেলে চলবে না। সশরীরে যেতে হবে । পথ অতি দুর্গম।"

"দুর্গমকে ভয় পাই না। চল এখনই বেরিয়ে পড়ি—"

অরূপ আর অনলস যাত্রা করলেন পর্বতের উদ্দেশ্যে। নভশ্চক্র-রেখালগ্ন বনানীতে একটা মৃদু গুরু গুরু শব্দ জাগল, আসন্ন কোনও আবির্ভাবের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠল সমস্ত প্রকৃতি।

"আমি এখন চললাম। আবার আসব।" সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

পাগলা-গারদে বন্দী গোপালচন্দ্র দেব বিস্ফারিত নয়নে বসিয়াছিলেন। তিনি এতক্ষণ যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন তাহা তাঁহার নিকট অলীক মনে হইল না। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"এ মায়া নয়, স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়, রূপকও নয়, এ সত্যি।"

নাক-ডাকার শব্দে কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বামনটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। লর্ডও তাহার পাশে ঘুমাইতেছে। একটা ঘুঘুর করুণ সুর কখন যে রুক্ষ বালুচরকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা সে টেরও পায় নাই। সে-ও অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল ঘুঘুর ওই করুণ সুরে যেন তাহারই মর্মের বাণী রূপ পাইয়াছে। আবার পড়িতে আরম্ভ করিল সে। এবার মনে মনে।

"গোপাল চন্দ্র দেব সেকালের লোক। একালে হঠাৎ তিনি যেন বেমানান হইয়া গিয়াছেন। তিনি কাঁসার প্রশস্ত বগি থালায় পাঁচ রকম ব্যঞ্জন সহযোগে ভাত খাইতেছিলেন, হঠাৎ কে যেন সে থালাটা তুলিয়া লইয়া শালপাতার উপর কয়েক মুঠা ছাই দিয়া গেল। বলিল—ইহাই খাও। ইহাই এ যুগের খাদ্য। স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন গোপালচন্দ্র দেব। তিনি বড়লোকের ছেলে।

অর্থোপার্জনের জন্য তাঁহাকে কখনও চাকুরি বা ব্যবসার নোংরামির মধ্যে যাইতে হয় নাই। লেখাপড়া লইয়া তেতলার ঘরটাতেই তিনি প্রায় একা একা সারাজীবন কাটাইয়াছেন। পিতার আদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন, একটি পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছে। তিনি কিন্তু সংসারী হইতে পারেন নাই। ছাত্রজীবনে স্কুল কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গেও তিনি তেমন মিশিতে পারিতেন না। তাঁহার একটিমাত্র বন্ধু ছিল। সে এখন এখানকার সিভিল সার্জন। গোপালচন্দ্র দেব যে বিরাট পণ্ডিত একথা বিদগ্ধ সমাজে অবশ্য অবিদিত নাই। এদেশের এবং বিদেশের অনেক নামজাদা পত্রিকায় তাঁহার নানা বিষয়ে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশীরা কেহ তাঁহাকে চেনেন না। সকলের ধারণা তিনি ধনী লোক এবং অহঙ্কারী। সত্যিই তিনি কাহারও সহিত মেশেন না। তাঁহার স্ত্রী দময়ন্তী সংসার চালান। দেব মহাশয়ের বয়স যদিও পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখিলে তাঁহাকে চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মুখটাও ঈষৎ লম্বাটে ধরনের, ভারী চিবুক, পাতলা ঠোঁট, প্রদীপ্ত চোখ। যদিও তিনি পণ্ডিত মানুষ, লেখা-পড়া লইয়াই সারা-জীবন কাটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার চেহারাটা ক্ষত্রিয় সৈনিকের মতো। তাঁহার পেশল সুগঠিত দেহে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব যেন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। স্কুল-জীবন হইতে স্যাণ্ডোর ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম করিতে তাঁহার বাবাই তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। সে অভ্যাস এখনও তাঁহার আছে। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া ডাম্বেল ভাঁজেন। নিজেকে লইয়া থাকেন তিনি সমস্ত দিন। যে জগতে বাস করেন, তাহা বাস্তব জগত নহে, কল্পলোক। নিজের ছেলেমেয়েকেও তিনি চেনেন না। তাহারা তাঁহার তেতলার ঘরে আসিতে ভয় পায়। তাহাদের দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার যে ধারণা হইত তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত। বাঙালীর ছেলে সাহেবী পোশাকে সাজিয়া ট্যাঁসের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাঙালীর মেয়ে সালোয়ার পাঞ্জাবী পরিয়া সিনেমা অভিনেত্রীর নকল করিতেছে—এসব তাঁহার স্কুল বা কলেজজীবনে তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। অথচ তাঁহার নিজের ছেলেমেয়েই এখন ওই সব বিদেশী পোশাক পরিতেছে। তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন। মানে, গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন—ছেলেমেয়েদের এ কি অদ্ভুত সাজে সাজাচ্ছ। গৃহিণী উত্তর দিয়াছিলেন, আজকাল স্কুল কলেজে সব ছেলেমেয়েরাই ওই ধরনের পোশাক পরে। ওই আজকাল ফ্যাশান। তোমাদের যুগে তোমরা যা করেছিলে তা এ যুগে চলবে না। ওরা যদি আলাদা রকম কিছু করতে যায় লোকে ওদের টিট্‌কারি দেবে। গুরুদেবকে জিগ্যেস করেছিলাম, তিনিও বললেন দোলের সময় সবার গায়েই রং লাগে, সে রং বেশীদিন থাকে না। দোল ফুরুলে রং-ও চলে যায়। যুগের ফ্যাশান যুগের সঙ্গেই চলে যাবে, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তাঁহার প্রবীণা গৃহিণী কিছুদিন হইতে একটি ছোকরা বাবাজীকে গুরু-পদে বরণ করিয়াছেন। এবং পেটকাটা কোমর-বাহির-করা ব্লাউজ পরিয়া তাঁহার মেদবহুল কুৎসিত কোমরটাকে সকলের সমক্ষে প্রকটিত করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। অথচ এই মহিলাই একদিন একগলা ঘোমটা দিতেন। আজকাল ঘোমটা উঠিয়া গিয়াছে। এককালে যিনি অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন তিনি আজকাল মুখে ক্রীম পাউডার ঘষিয়া ডগমগে শাড়ি পরিয়া মহিলা সমিতিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় যান। সেখানে ওই গুরুদেবই প্রধান বক্তা। শিষ্য-শিষ্যাদের কলুষিত আত্মাকে পরিষ্কার করিবার জন্য প্রত্যহ নাকি আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দেন। গোপালদেব মনে মনে

অস্বস্তি বোধ করিতেন। কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না। তাঁহার ত্রিতল মহলটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি তিনটি বড় ঘর আছে। একটি ঘরে তাঁহার লাইব্রেরী, আর একটি তাঁহার শয়নঘর। তৃতীয় ঘরটির ভিতর তাঁহার স্নান বাথরুম প্রভৃতির ব্যবস্থা। এখানে তিনি প্রত্যহ ব্যায়ামও করেন। তিনটি ঘরের সামনে প্রকাণ্ড ছাদ। খুব অস্বস্তি বোধ করিলে ছাদের উপর পায়চারি করেন—পৃষ্ঠে নিবদ্ধ হস্তের অঙ্গুলিগুলির সঞ্চালন হইতে তাঁহার মনের ভাব কতকটা হয়তো বোঝা যায়। তিনি আর একটি কাজও করেন। তাঁহার লাইব্রেরী ঘরের দেওয়ালে একটি কোষবদ্ধ তরবারি টাঙানো আছে। মাঝে মাঝে সেটি কোষমুক্ত করিয়া সেটির ধার পরীক্ষা করেন। শিরিষ কাগজ ঘশিয়া সেটিকে পরিষ্কারও করেন মাঝে মাঝে। ঝকঝকে শাণিত তরোয়াল। এটি তাঁহার প্রপিতামহ জীমূতবাহন দেবের অস্ত্র। তিনি একজন নিপুণ তরবারি চালক ছিলেন। এই তরবারির সাহায্যে তিনি বাঘ মারিয়াছিলেন। কথিত আছে এই তরবারির সাহায্যেই তিনি একাই একদা এক ডাকাতের দলকেও নাকি হটাইয়া দিয়াছিলেন। দস্যুসর্দারের ছিন্ন মুণ্ডটি বর্শাফলকে গাঁথিয়া সেটি উপহার দিয়াছিলেন তদানীন্তন এক ইংরেজ রাজপুরুষকে। ইংরেজ রাজপুরুষটি সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি খুশী হইয়া জীমূতবাহনকে রাঘবরাও উপাধি দেন। রাঘবরাওয়ের তরবারিটি বহুকাল দেব-পরিবারের গুদাম-ঘরে পড়িয়াছিল। গোপালদেব সেটি বাহির করিয়া তাহাতে শান দেওয়াইয়া পরিষ্কার করিয়াছেন। সেকালের খাঁটি স্টীল মরিচা-মুক্ত হইয়া পুনরায় নব-দীপ্তিতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্য একটি নূতন সুদৃশ্য খাপও করিয়াছেন গোপালদেব। এই তরবারিটি তাঁহার লাইব্রেরির দেওয়ালে টাঙানো থাকে। তরবারিটি মাঝে মাঝে খুলিয়া তিনি কখনও চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখেন, কখনও মাথার উপর ঘোরান। তাঁহার মনে তখন অদ্ভুত একটা প্রেরণার সঞ্চার হয়। তিনি অনুভব করেন তাঁহার প্রপিতামহ জীমূতবাহন যেন তাঁহার মনের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। যদিও তিনি ত্রিতল হইতে নীচে নামেন না—তাঁহার খাবারও ঠাকুর চাকরে ত্রিতলের ঘরেই দিয়া যায়—যদিও সমাজের সহিত এমন কি নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়ের সহিতও তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কম,—কিন্তু দেশের মধ্যে পাপের আবর্জনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে একথা তাঁহার অবিদিত নাই। কারণ প্রত্যহ তিনি বাংলা ইংরেজি অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়িতেন। তিনি অনুভব করিতেন যে স্বাধীনতার নামে অরাজকতাই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মনে পড়িত ঐতিহাসিক গোপালদেবের কথা। মনে পড়িত তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে দেশে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল, বড়রা ছোটকে গিলিয়া খাইত। মনে পড়িত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার বাংলাদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর পরে তিব্বতীয় বৌদ্ধলামা তারানাথ এই যুগের বাংলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। ফলে লোকের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। সংস্কৃতে এইরূপ অরাজকতার নাম মাৎস্যন্যায়। পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, দেশে অরাজকতার সময় সেইরূপ প্রবল অবাধে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে..."—এইসব কথা স্মরণ করিয়া মনে মনেই তিনি উত্তেজিত হইতেন। ভাবিতেন, আমার নামও তো

গোপালদেব—আমি কি—। তরবারিটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে এইসব কথা তাঁহার মনে হইত। প্রায়ই মনে হইত।

এইখানে, গল্পের মধ্যেই আমি একটা কথা উল্লেখ করিতে চাই। উল্লিখিত কাহিনীর গোপালদেব একটি কাল্পনিক ব্যক্তি। আমিই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই এই গ্রন্থের গ্রন্থকার। আমার নাম ফকিরচাঁদ সামন্ত। আমি ইতিহাসের ছাত্র। হঠাৎ একদিন আমার মনে হইল ইতিহাসে তো কত বীরপুরুষের নাম পড়িয়াছি, তাহাদের কীর্তিকলাপ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাইয়াছি। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? কোনক্রমে একটা সাধারণ মার্চেন্ট আপিসে কেরানী মাত্র হইয়াছি। একজন বড়লোকের ছেলেকে ইতিহাস পড়াই, বিনিময়ে তাহার বাড়িতে থাকিতে পাই। তাহাদের আস্তাবলের পাশে একটা ঘর আছে, সেইটাই আমার বাসস্থান। বড়লোকটি খুবই ধনী। ঘোড়া রাখিয়াছেন রেস খেলিবার জন্য। মাঝে মাঝে পোলোও খেলেন। ঘোড়ার মলমূত্রের গন্ধ, হ্রেষাধ্বনি, সহিসদের দলাইমলাইয়ের শব্দ, সবই আমার সহিয়া গিয়াছে। বড়লোকের ছেলেটির যখন সময় হয় তখন সে আমাকে ডাকিয়া পাঠায়। আমি পোষা কুকুরের মতো যাই এবং ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি—আজ কি পড়বে? ছেলেটি সিগারেট টানিতে টানিতে উত্তর দেয়—আজ কয়েকটা ইমপর্টাণ্ট কোশ্চেনের 'আনসার' লিখে দিন। এবার শুনছি আওরংজীব থেকে কোশ্চেন দেবে। ইহাই আমার কাজ। হঠাৎ একদিন মনে হইল এই হীনতাপঙ্ক হইতে উদ্ধার নাই? যে গোপালদেব, ধর্মপাল, দেবপাল, শশাঙ্ক, শিবাজী, রাণা প্রতাপ সিংহের কথা ইতিহাসে পড়িয়াছি তাঁহাদের মহিমা তাঁহাদের শৌর্যবীর্য কি আমার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে না? শার্লামেন, নেপোলিয়ন, আলেকজান্ডার দি গ্রেট—এলোমেলো অনেকের কথাই মনে হইতে লাগিল। ইহাদের কথা পড়িয়াছিলাম শুধু কি পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য, কেরানীগিরি করিবার জন্য? ওই বড়লোকের ছেলেটার নিকট জুজু হইয়া থাকিবার জন্য? মনে ধিক্কার জাগিত, কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতাম না। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে পথ মিলিয়া গেল। পথের ধারেই ধূলার উপর গুরুর দেখা পাইলাম। তাহাকে 'গুরু' বলিতেছি বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র গুরুত্ব ছিল না। শ্যামবর্ণের কিশোর বালক একটি। পথের ধারে আপন মনে লাট্টু ঘুরাইতেছিল। আমি আপিস যাইতেছিলাম, কিন্তু ছেলেটিকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। অমন কমনীয়কান্তি প্রাণরসে টলমল কিশোর মূর্তি আমি আগে কখনও দেখি নাই। মনে হইল শহরের রাস্তার ধারে একটি সতেজ শিশু শালগাছ যেন কিশোর বালকের রূপ ধরিয়াছে। বিস্মিত হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলাম, ছেলেটির কথায় আমার চমক ভাঙিল।

"কি দেখছেন—"

"তোমাকেই দেখছি। তোমার বাড়ি কোথা।"

"ওসব বৃত্তান্ত জেনে লাভ কি। আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। স্যান্ডার্স সাহেবের ধমকানির ভয় নেই?"

শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আমার আপিসের বড় সাহেবের নাম যে স্যানডার্স তাহা এ জানিল কি করিয়া। আমি যে চাকরি করি তাহাও তো ইহার জানিবার কথা নয়।

"আমি যে আপিস যাচ্ছি তা জানলে কি করে।"

"তোমাকে দেখেই। কেরানী ছাড়া ওরকম কুকুর-মার্কা চেহারা আর তো কারো হয় না।"

ছেলেটি লাট্টু ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম।

"শোন। তুমি আমাকে অপমান করলে কেন!"

"কুকুরকে কুকুর বললে কি অপমান করা হয়?"

"কানাকে কানা বলা কি ভদ্রতা?"

"তুমি কানাও, তোমাকে কিন্তু সে কথা বলিনি।"

ক্রমশই অবাক হইতেছিলাম। কে এই ছোকরা। অথচ ইহার উপর রাগও তো হইতেছে না। চোখে মুখে হাসির বিদ্যুৎ, সর্বাঙ্গে নবীনতার আভাস, একটা প্রাণবন্ত চঞ্চলতা যেন মূর্তি ধরিয়াছে। এ কে? কোথা হইতে আসিল?

"আমাদের আপিসের বড় সাহেবের নাম যে স্যান্‌ডার্স তা তুমি জানলে কি করে?"

মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল ছোকরা।

"তোমার বাবার নাম বলব? হরিপদ সামন্ত। মায়ের নাম জগদ্ধাত্রী। আর একটা কথা বলব? তোমার কপালে রাজতিলক আছে। তুমি যদি তপস্যা কর রাজা হতে পারবে!"

"আমি?"

"হ্যাঁ তুমি।"

"রাজা হতে পারব?"

"পারবে। রাজা মানে হাতী-ঘোড়া, মোটর-এরোপ্লেন, জমিদারি, ব্যাঙ্কের টাকা, এসব নয়—রাজা মানে, সত্যিকারের রাজা!"

"সত্যিকারের রাজা, মানে?"

"পরের ভালো করাই যার জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যে তন্ময় হয়ে নিজেকে যে ভুলে থাকে এবং সেই জন্যেই যে সবার উপরে উঠে যায়, কোন অভাব বোধ থাকে না —সেই রাজা। মাথায় উষ্ণীষ পরে দামী পোশাক পরিচ্ছদ পরে তাঞ্জামে চড়ে যারা বেড়ায় তারা রাজা নয়, দাস। দাসানুদাস। রাজা হতে হলে তপস্যা করতে হবে। এদেশে সন্ন্যাসীদের নামই মহারাজ। ইচ্ছে করলে তুমি রাজা হতে পারবে। কিন্তু তার জন্যে তোমার আগ্রহ থাকা চাই, তার জন্যে অহোরাত্র তপস্যা করা চাই। তা কি তুমি পারবে? পারবে না। বাঙালীর ছেলেরা তপস্যা করতে ভুলে গেছে—"

মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল —"আমি এবার যাই—"

"শোনো—"

"না, এখন তুমি আপিস যাও। সন্ধের পর ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে মাঠে বসে আমি আজ বাঁশী বাজাব। যদি আলাপ করতে চাও, সেইখানে এসো—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপিস যাওয়ার মুখে আলাপ জমবে না। চললুম—"

"শোন, কোথায় থাক তুমি—!"

আবার মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"যদি বলি আকাশে বিশ্বাস করবে?"

আমাকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া হঠাৎ সে পাশের গলিটার মধ্যে অন্তর্ধান করিল।

সেদিন আপিস হইতে যখন বাহির হইলাম তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। যে চায়ের দোকানটায় রোজ বসিয়া চা খাই, সেইখানেই ঢুকিলাম। খান দুই টোস্ট এবং এক কাপ চা খাইয়া যখন বাহির হইলাম তখনও অন্ধকার হয় নাই। অন্য দিন হইলে বাড়ি ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু সেদিন গেলাম না। গড়ের মাঠে ঢুকিয়া পড়িলাম। গড়ের মাঠ আমার আপিসের কাছেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করিলাম। কোথায় সে ছোকরা? বাঁশির শব্দও শুনিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম শেষে। একটা খালি বেঞ্চ পাইয়া তাহার উপরই বসিয়া পড়িলাম। চমৎকার দখিনা হাওয়া বহিতেছিল। সম্ভবত বসিয়া বসিয়াই একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ বাঁশী শুনিতে পাইলাম। উঠিয়া পড়িলাম। সুর লক্ষ্য করিয়া অনেকক্ষণ অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু বংশীবাদককে দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে সহসা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখিতে পাইলাম। নজরে পড়িল একটা গাছের তলায় সবুজ আলোকপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতেছে, ভাবিলাম জোনাকীর দল নাকি, —আগাইয়া গেলাম সেইদিকে। দেখি সেই ছোকরা বসিয়া আছে। আমি যাইবামাত্র সবুজ আলো নিবিয়া গেল।

"ও তুমি এসে গেছ? বস।"

"এইখানে একটা সবুজ আলো দেখলাম যেন।"

"ও কিছু নয়, বস।"

হঠাৎ মনে হইল ছোকরা আমার চেয়ে তো বয়সে অনেক ছোট কিন্তু অসংকোচে আমাকে তুমি বলিতেছে। একটু বিরক্ত হইলাম।

"তুমি ভাবছ আমি বুঝি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট তা নয়। আমার অনেক বয়স।"

একটু অবাক হইয়া গেলাম। আবার আমার মনের কথা টের পাইল কি করিয়া!

"কত বয়স তোমার—!"

"অনেক। গাছ পাথর নেই। আমি বুধ—"

"বুধ? তার মানে?"

"আমি বুধ গ্রহ। যার স্তোত্র তোমরা পাঠ কর এই শ্লোকটি পড়ে—প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যাম রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং ত্বং বুধং প্রণমাম্যহম্। প্রিয়ঙ্গু মানে জান?"

কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

"প্রিয়ঙ্গু মানে জান?"

"না।"

"প্রিয়ঙ্গু মানে শ্যামলতা। প্রিয়ঙ্গুকলিকার মতো সবুজ রং বুধের। বুধ চিরকিশোর। চিরশ্যাম। উন্মুখ যৌবনের প্রতীক সে। সামাজিক জীবনে আমার নাম ছিল ফেলারাম। যখন বুড়ো হয়ে গেলাম শরীর অসমর্থ হয়ে পড়ল—স্ত্রী পুত্র কন্যারা সব মরে গেল তখন একদিন তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লাম। মানে, মরব বলেই বেরুলাম। হরিদ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ পেলাম এক মহাপুরুষের। তিনি বললেন—মরবে কেন! তুমি বুধের আরাধনা কর, যৌবন ফিরে পাবে। তোমার তপস্যা যদি নিশ্ছিদ্র হয় স্বয়ং বুধই এসে হাজির হবেন তোমার শরীরে। আমি অনেকদিন হিমালয়ে কাটিয়েছি বুধের আরাধনা করে। অনেক দিন। প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যাম রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্বগুণোপেতং ত্বং বুধং প্রণমাম্যহম্। এই মন্ত্র জপ করেছি

দিবারাত্রি। এক আধদিন নয়—অনেকদিন। অনেকদিন পরে হঠাৎ গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। হিমালয়ের একটা অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম সেদিন। কাছেপিঠে কেউ ছিল না। আমি গুহায় শুয়ে শুয়ে বুধেরই ধ্যান করছিলাম, শীতে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, ধ্যান কিন্তু অবিচলিত ছিল। বস্তুত আমার দুঃখের অসীম সমুদ্রে ওইটেকেই ভেলা করে আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম। সেই গুহায় হঠাৎ সেদিন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কিন্তু অজ্ঞান হয়েও আমি ধ্যানের সূত্রটি ছাড়িনি—এক চিরকিশোর শ্যামকান্তি দেবতা আমার চোখের সম্মুখে অহরহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তবু মনে হয় আমি অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম, হিমালয়ের শীত বা নিদারুণ ক্ষুধা আর আমি অনুভব করতে পারছিলাম না। আমার দেহটা যেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সীমানা পার হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ জ্ঞান হল। দেখলাম আমার জীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহটা গুহার একধারে পড়ে আছে। আমি তাহলে কে? যে আমি আমার শবদেহটাকে দেখছি সে কি অন্য লোক? আমার বিস্ময় কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। অপরিসীম আনন্দে সমস্ত মন ভরে গেল পরমুহূর্তে, সদ্যজাগ্রত যৌবনের মহিমা অনুভব করলাম সর্বদেহ দিয়ে। তারপরই লক্ষ্য করলাম আমার দেহ থেকে সবুজাভ আলো বেরুচ্ছে একটা। ভয় পেয়ে গেলাম প্রথমে। তারপর লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গুহা থেকে। দেখলাম অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। ঊষার নবারুণ কিরণের আভাস দেখা যাচ্ছে পূর্বদিগন্তে। কাছেই একটা পাহাড়ী ঝরণা ছিল। সেইটের ধারে গিয়ে সেই ঝরণায় নিজের চেহারা দেখলাম। দেখে অবাক হয়ে গেলাম—অবিকল বুধের চেহারা—প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যাম। সেই সৌম্য কিশোরের হাসিমাখা মুখখানা আমার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সেই কলস্বরা স্বচ্ছ জলের ভিতর থেকে। নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর উপলব্ধি করলাম চন্দ্র এবং বৃহস্পতি-পত্নী তারার প্রণয়সঞ্জাত যে শিশু চির-নবীনের প্রতীক হয়ে গ্রহমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে, যার পত্নী ইলা—সহসা মনে হল ইলা কোথায় আছে খুঁজে বার করতে হবে। নিশ্চয়ই কোথাও আছে সে। তার পুত্র পুরুরবা আর পুত্রবধূ ঊর্বশীর কথা মনে আছে কি এখনও? ঊর্বশীকে তো রোজ ঊষা-সন্ধ্যায় আকাশে দেখতে পায়, পুরুরবা কোথায়—। তখনই উঠে পড়লাম ঝরণার পাশ থেকে, ইলা আর পুরুরবাকে খোঁজবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। এর মধ্যে কোন মোহ নেই, শুধু কৌতুক, শুধু কৌতূহল। শত শত জন্মের আবর্তে পুরুরবা কোথায় তলিয়ে গিয়ে কোনরূপে এখন অবস্থান করছে তাই দেখার জন্য আমি নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আজ কলকাতা শহরের রাস্তায় তোমাকে দেখে চিনলুম—তুমিই সেই হতভাগ্য পুরুরবা যে একটা নারীর প্রেমের মোহে নিজের পৌরুষকে বারবার অবনত করেছো। এখনও করছ। এখনও মালিনী নামে যে মেয়েটার স্বপ্নে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, তাকে তুমি পাবে না। সে বড়লোকের মেয়ে, পুরুরবার সঙ্গে যেমন সর্বদা দুটো ভেড়া থাকত, এর সঙ্গে সর্বদা তেমনি দুটো দারোয়ান আছে। ঊর্বশীর নানারকম শর্ত ছিল এরও নানারকম শর্ত আছে যা পালন করবার সামর্থ্য তোমার নেই। তবে তোমার ললাটে একটা অদৃশ্য রাজতিলক দেখেছি। তুমি যদি তপস্যা কর রাজা হতে পারবে। কোন রাজাকে তোমার পছন্দ সবচেয়ে বেশী—"

আমি যাহা শুনিতেছিলাম তাহা অবিশ্বাস্য, তবু বিশ্বাস করিতে হইতেছিল, কারণ প্রত্যক্ষকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু বিস্ময়ে এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

"কোন্ রাজাকে তোমার বেশী পছন্দ?"

"অষ্টম শতাব্দীর রাজা গোপালদেবকে—যিনি মাৎস্যন্যায়ের যুগে বাংলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।"

"বেশ, তাঁরই তপস্যা কর—"

"তপস্যা কি করে করতে হয় আমি জানি না।"

"নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করার নামই তপস্যা—"

"চাকরি করতে করতে তা কি করা সম্ভব?"

"খুব সম্ভব। চাকরি তো করে বাইরের মন। ভিতরের মন অন্তরতম সত্তা—সেই করে তপস্যা। তোমার নিষ্ঠা যদি খাঁটি হয়, আগ্রহ যদি প্রবল হয় তাহলে সে মনকে কেউ বিচলিত করতে পারবে না—"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

সহসা সে প্রশ্ন করিল—"তুমি বই লিখতে পারবে?"

"ছেলেবেলায় লেখার অভ্যাস ছিল। কবিতা-গল্প ছাত্রজীবনে লিখেছি। ছাপাও হয়েছে দু'একটা কাগজে—"

"গোপালদেবকে নিয়ে বইই লেখ তুমি তাহলে একটা। বই লিখতে বসলে তার দিকে একাগ্র হবে তোমার মন, সর্বদা ভাবতে হবে তার কথা—সেইটেই হবে তোমার তপস্যার শুরু। তারপর ক্রমশ গোপালদেব তোমার মধ্যেই আবির্ভূত হবেন।"

"কিন্তু গোপালদেবের ইতিহাস তো তেমন কিছু জানা নেই—"

"ইতিহাস নিয়ে কি হবে। তুমি তাকে সৃষ্টি কর। তোমার সৃষ্টিতেই জীবন্ত হয়ে উঠবেন তিনি। ভগবানের কোন ইতিহাস আছে? কিন্তু কোটি কোটি লোক কোটি কোটি রূপে সৃষ্টি করেছে তাঁকে—আর সব সৃষ্টিই জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের স্রষ্টার চোখে। বুধকে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু ওই একটি শ্লোক অবলম্বন করে আমি মনে মনে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। তাই তিনি মূর্ত হয়েছেন আমার দেহে মনে। গোপালদেবকে তপস্যার আগ্রহ দিয়ে তুমিও যদি সৃষ্টি করতে পার তাহলে তিনিও জীবন্ত হয়ে উঠবেন তোমার মধ্যে—"

"আমি পারব?"

"সে কথা নিজেকেই জিজ্ঞেস কর তুমি। স্থবির ফেলারাম কানুনগো যদি প্রিয়ঙ্গুলিকা-শ্যাম বুধে রূপান্তরিত হতে পারে তাহলে ফকিরচাঁদই বা গোপালদেব হতে পারবে না কেন যদি তার আগ্রহ একনিষ্ঠ হয়। এবার আমি উঠি—"

"কোথা যাবে—"

"ইলাকে খুঁজে পাইনি এখনও। তাকে খুঁজে বার করতে হবে—"

"ইলা?—"

"হ্যাঁ, যে ইলা এককালে তোমার মা ছিল। জানি না এখন সে কোথা—"

হঠাৎ অন্তর্ধান করিল।

আমি গড়ের মাঠে একা বসিয়া রহিলাম। চারিদিকে নানারঙের আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু সেই সবুজাভ প্রাণ-দীপ্ত আলোটি আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি জানি এ গল্প অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বাস করিবার ক্ষমতাও একটা বিশেষ ক্ষমতা যাহা এ যুগে আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা এখন টাকা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করি না। অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ক্ষমতা বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আজকাল আমাদের মর্মে মর্মে শিকড় গাড়িয়াছে। অন্য কোন প্রকার ক্ষমতাকে—বিশেষত আধ্যাত্মিক বা দৈবিক ক্ষমতাকে বুজরুকি বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার বুদ্ধি আমরা তথা-কথিত বিজ্ঞানের কাছে লাভ করিয়াছি। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয় ওই অলৌকিক ঘটনাটা বোধহয় উন্মাদের কল্পনা। হয়তো আমি দিনকয়েকের জন্য উন্মাদ হইয়াছিলাম। একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "এরকম সাময়িক পাগলামি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সেই পাগলামির ঝোঁকে অনেক রকম আজগুবি 'ভিশন্'ও অনেবে দেখেন। আপনি হয়তো তাই দেখেছেন। আপনার অবদমিত কল্পনা হয়তো ছাড়া পেয়েছিল খানিকক্ষণের জন্য।"

অন্তরের অন্তস্তলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমি পাগল নহি। যাহা দেখিয়াছিলাম যাহা শুনিয়াছিলাম সব সত্য, উন্মাদের স্বপ্ন নহে। তাই বুধের আদেশ অমান্য করি নাই। গোপালদেবকে লইয়া উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছি। আমার গল্পের নায়ক যে গোপালদেব, তিনি প্রৌঢ়, বিদ্বান, তথাকথিত আধুনিকতার অনেক ঊর্ধ্বে বাস করেন। তাঁহারই কল্পনায় ইতিহাসের গোপালদেব জীবন্ত হইবেন, এই আমার আশা।

"গোপালদেবের ত্রিতল মহলে তাঁহার একমাত্র বন্ধু তাঁহার পুরাতন ভৃত্য মহাদেব। গোপালদেব তাহাকে মহান বলিয়া ডাকেন। তাহার প্রধান গুণ সে নীরব। কখন আসে কখন নীরবে সমস্ত কাজ পরিপাটি করিয়া নিষ্পন্ন করে গোপালদেব জানিতেও পারে না। মহাদেব প্রত্যহ পোস্টাফিসে গিয়া গোপালদেবের ডাকও লইয়া আসে। খামগুলির ধার নিপুণভাবে কাঁচি দিয়া কাটিয়া চিঠিগুলি প্রত্যহ তাঁহাকে আনিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যায়। গোপালবাবুকে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিতে হয় না। তাঁহার অনেক চিঠি আসে রোজ। দেশের এবং বিদেশের অনেক বিদ্বান লোকেরা তাঁহাকে চিঠি লেখেন। এই চিঠির জগৎও তাঁহার আলাদা একটা নিজের জগৎ। সে জগতে বাহিরের কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। নিজেও তিনি সে জগতের অনেককে চেনেন না। পত্রের মাধ্যমেই আলাপ। কোন কোন ক্ষেত্রে সে আলাপ গভীর আত্মীয়তাতেও পরিণত হইয়াছে। মহান যখন তাঁহার পাশে ডাক রাখিয়া যায় তখন মনে মনে তিনি একটুও চঞ্চল হইয়া ওঠেন। কিন্তু বাহিরে সে চঞ্চলতা প্রকাশ পায় না। বরং তিনি এমন একটা ভাব দেখান যেন চিঠিগুলো তিনি দেখিতে পান নাই। মহানও কোন কথা না বলিয়া নীরবে চলিয়া যায়।

তাঁহার এই ত্রিতল সীমাবদ্ধ-জীবনে এই ডাক সত্যই বাহিরের ডাক। ইহার একমাত্র ডাক যাহার জন্য তিনি মনে মনে আকুল হইয়া বসিয়া থাকেন। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার বিশেষ খবর লয় না। প্রয়োজন হইলে তাহারা গৃহিণীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। গৃহিণী তাঁহার নিকট দুই একবার আসিয়া তাঁহারই আত্মীয়স্বজনের হইয়া দরবার করিয়াছে। কখনও কাহারও ওঁছা ছেলেকে কলেজে ভরতি করাইবার জন্য প্রিন্সিপালের নিকট চিঠি লিখিবার অনুরোধ

করিয়াছেন, কখনও কোনও ফেল-করা ছেলেকে কোন আপিসে ঢুকাইয়া দিবার জন্য সুপারিশ পত্র লইয়াছেন, কাহারও কালো মূর্খ মেয়েকে কোন বিদ্বান সৎ-পাত্রের হস্তে সমর্পণ করাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুকে (পাত্রের পিতা) প্রভাবিত করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁহার এই ধরনেরই সম্পর্ক। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার বা সাহিত্যিক প্রতিভার খবর তাহারা কেহ রাখে না। তবে বিনা পয়সায় দুই-একখানা বই পাইলে সেগুলি বগলদাবা করিয়া লইয়া যাইতে তাহাদের আপত্তি নাই। লইয়া গিয়া সেগুলি সত্যই তাহারা যদি পড়িত তিনি খুশী হইতেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয় হইয়াছেন বই তাহারা পড়ে না। তাহারা যে বই পাইয়াছে এইটা সকলের কাছে আস্ফালন করিয়াই তাহাদের সুখ। সুতরাং প্রত্যহ ডাকেব জন্যই তিনি মনে মনে উন্মুখ হইয়া থাকেন। কারণ, এ ডাক সেই বহির্জগতের ডাক, যেখানে তাঁহার সমানধর্মা নর-নারীরা বাস করেন, যেখানে তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার নিরপেক্ষ আলোচনা কৃতবিদ্য রসিক চিত্তের কষ্টি-পাথরে নির্ধারিত হয়—এক কথায় যেখানে তাঁহার মনের মানুষরা বাস্তব-অথচ-অবাস্তব রূপকথালোক সৃজন করিয়াছেন—সেই অজানা বহির্জগতের সংস্পর্শ লাভ করিবার জন্য মনে মনে তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন প্রত্যহ। তাঁহার মনে এই উন্মুখতার সহিত একটা অস্বস্তির ধারাও অবশ্য নিত্য বহমান। অস্বস্তির কারণ তিনি বুঝিয়াছেন, বর্তমানের সহিত তিনি বেমানান। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যে স্রোতে মহানন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে সে পঙ্কিল স্রোতে তিনি নামিতে পারিতেছেন না। তীরে দাঁড়াইয়া তিনি কেবল অস্বস্তি ভোগ করিতেছেন। স্রোতটা কতটা পঙ্কিল তাহাও তাঁহার জানা নাই। এইটুকু শুধু জানেন তীরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে যাহা দেখিতেছেন মোটেই তাহা স্বচ্ছধারা নহে। এ অবস্থায় কি করিবেন তাহাও তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না, তিনি মনে মনে কন্টকশয্যায় শয়ন করিয়া কেবল যন্ত্রণাভোগই করিতেছিলেন।

এই সময় একদিন বিপর্যয়টি ঘটিল। মহান সেদিনকার ডাক দিয়া গিয়াছিল। গোপালদেব একে একে সেগুলি খুলিয়া পড়িতেছিলেন। একটি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত চিঠি পাইয়া আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন তিনি। পত্রটি লিখিয়াছিলেন একজন অশ্বব্যবসায়ী। যদিও তিনি অশ্বব্যবসায়ী কিন্তু তাঁহার চিঠির পাঠে তাঁহার ছাপা নামের শেষে যে ডিগ্রিগুলি ছিল সেগুলি অক্সফোর্ডের এবং হার্ভাডের। কিছুকাল পূর্বে গোপালদেব হিস্টোরিক্যাল হর্সেস (Historicial Horses) নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন আমেরিকার কোনও কাগজে। প্রবন্ধটিতে অনেক ঐতিহাসিক ঘোড়ার নাম ও বিবরণ ছিল। যে সব ঘোড়ার নাম ইতিহাসে পাইয়াছিলেন তাহাদের নাম তো ছিলই, আরও ছিল নানা যুগের নানারকম ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের সঙ্গে ঘোড়ার সম্বন্ধের মনোরম বিবরণ। অশ্ব-ব্যবসায়ী ওই ইরাণী ভদ্রলোক প্রবন্ধটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং গোপালদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিজ্ঞাপন-পত্রিকা 'দি ইকোয়েস্ট্রিয়ান' (The Equestrian) কাগজে যদি উক্ত প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দেন তাহা হইলে তিনি অতিশয় বাধিত হইবেন। ইহার জন্য তিনি দক্ষিণাও দিতে প্রস্তুত। গোপালদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া দিলেন—'আপনি প্রবন্ধটি আপনার পত্রিকায় ছাপাইতে পারেন আমার আপত্তি নাই। দক্ষিণা কিছু দিতে হইবে না। যৌবনকালে আমার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল। ঘোড়াও ছিল একটা খুব ভালোবাসিতাম তাহাকে। হঠাৎ একদিন সেটা একটা মোটরের সহিত ধাক্কা খাইয়া মারা গেল। সহিস সেটাকে মাঠে লইয়া

যাইতেছিল। তাহার পর আর ঘোড়া কিনি নাই। মনে হইয়াছিল মোটরের যুগে ঘোড়া অচল। কিন্তু এখনও আমার ঘোড়ার জন্য মন কেমন করে। এখনও যদি ঘোড়া পাই, চড়িয়া বেড়াইতে পারি। কিন্তু ঘোড়ার বাজার কাছে-পিঠে কোথাও নাই, আগে শোনপুর মেলায় যাইতাম, সেখান হইতেই ওই ঘোড়াটা কিনি। এখন লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত থাকি, কোথাও আর যাওয়া হয় না। আপনি যদি আমাকে একটা ভালো ঘোড়া দিতে পারেন, কিনিতে পারি। আমার পুরানো আস্তাবলটা এখনও আছে.....'। উচ্ছ্বসিত আনন্দে লম্বা চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন একটা। তাহার পর অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চিঠি পড়িয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন। তাহার পর চিঠিটা এবং উত্তরটা বারবার পড়েন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি উপভোগ করেন প্রত্যেকটি চিঠি।

দ্বিতীয় চিঠিখানি খুলিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিঠির প্রথম লাইনটার দিকেই কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলন তিনি। 'মাই ডিয়ার ফাদার—'। তাঁহার পুত্র প্রবাল তাঁহাকে ইংরেজিতে চিঠি লিখিয়াছে। একই বাড়িতে থাকিয়া ইংরেজিতে চিঠি লিখিবার কি এমন দরকার পড়িল। ইংরেজিতেই বা লিখিয়াছে কেন! বাঙালী পুত্র তাহার বাবাকে বাংলাতে পত্র লিখিবে এইটাই তো প্রত্যাশিত। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বানান ভুলে এবং ভাষার ভুলে পরিপূর্ণ চিঠিখানি। প্রবাল উপর্য্যুপরি তিনবার বি-এ ফেল করিয়াছে। এখন কোন একটা হোটেলে চাকরি করিতেছে। গৃহিণী তাঁহাকে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাকে যদি তিনি বিলাতে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে হয়তো সে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবার পাইবে, কারণ এদেশের স্কুল কলেজে ভালো পড়া হয় না, এখানকার মাস্টাররাও হিংসুটে, গোপালদেব সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব ঈর্ষা-কাতর, সেই জন্য তাঁহার ছেলেকে তাহারা পাশ করিতে দিবে না। বলা বাহুল্য, গোপালদেব গৃহিণীকে আমোল দেন নাই। বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের যাঁহারা গৌরব, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিলাত যান নাই। আমাদের পুত্রটি অপদার্থ, তাহার জন্য বিলাপ কর, তাহার পিছনে আর অর্থব্যয় করিও না। পত্রটি পড়িতে পড়িতে গোপালদেবের মুখ গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইতে লাগিল। প্রবাল যাহা লিখিয়াছে তাহা বাংলায় অনুবাদ করিলে এই দাঁড়ায়।

আমার প্রিয় পিতা,

আপনাকে আমি চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। দূর থেকে শুধু এইটুকু জেনেছি আপনি বিদ্বান এবং যশস্বী লোক। আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির খ্যাতি, আপনার ধনের খ্যাতি, সকলেই জানে, আমিও জানি। এ-ও স্বীকার করব আমি অর্থাভাবে কোন দিন কষ্ট পাইনি। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না। আপনি আপনার মহিমা নিয়ে এমনি সু-উচ্চে বাস করেন যে আমি আপনার নাগাল পাই না। আপনিও আমাকে চেনেন কি? আপনি জানেন আমি একটা বখাটে ছেলে, কু-সঙ্গে পড়ে উচ্ছন্নে গেছি। এ কথা মিথ্যা নয়। সত্যিই আমি খারাপ ছেলে। এমন সব কাজ করি যা আপনাদের নীতির মাপকাঠিতে গর্হিত কাজ। সিগারেট খাই, মদও খাই। বিলাসিতার দিকে লোভ আছে, বিলাসিতার উপকরণও সংগ্রহ করেছি অনেক। সবই অবশ্য হয়েছে আপনার টাকায়। মায়ের কাছেই পেয়েছি সে টাকা। আমি যে আপনার পুত্র নামের

অযোগ্য তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমার যারা সঙ্গী-সঙ্গিনী তারাও আপনার ওই নীতির মাপকাঠিতে সবাই খারাপ। তারা পড়াশোনা করে না, হই-হাল্লা করে কলেজে পোড়ায়, মাস্টার ঠ্যাঙায়, সভা করে, শোভাযাত্রা করে, পুলিশের ব্যাটন খায় আর কাঁদুনে গ্যাসে চোখের জল ফেলে সকলের নিন্দাভাজন হয়। আমিও ওদের দলে। আপনি আশা করি শুনেছেন আমি এখন একটা বড় হোটেলে কেরানীর কাজ করি। মাইনে দু'শ টাকা। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আপনার খাতিরেই ওই হোটেলে আমার চাকরিটা হয়েছে। হোটেলের মালিক আপনার একজন ভক্ত। তিনিও বেশ বিদ্বান লোক। আমি আপনার ছেলে শুনেই আমাকে বাহাল করে নিলেন। আমার দৈনন্দিন নিত্য খরচের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা রোজ রোজ মায়ের কাছে চাইতে আমার লজ্জা করত। তাই একটা চাকরির চেষ্টা করেছিলাম, দৈবাৎ পেয়ে গিয়ে আমার আর্থিক সমস্যা অনেকটা মিটেছে বটে কিন্তু আর একটি সমস্যায় আমি জড়িয়ে পড়েছি। এই হোটেলেই আলতা নামে একটি মেয়ে টাইপিস্টের কাজ করে। মেয়েটি শিডিউলড কাস্টের মেয়ে। শিডিউলড কাস্ট বললে একটু ভালো শোনায়, কিন্তু আসলে মেয়েটি বাগ্দীর মেয়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরেও অমন সুশ্রী মেয়ে দুর্লভ। তাকে আমি দিন সাতেক আগে রেজেস্ট্রি করে আইনত বিয়ে করেছি। মেয়েটির গুণ-বর্ণনা আমি করব না, কারণ সেটা আমার মুখে শোভা পাবে না। তাকে ভালো লেগেছে বলেই তাকে বিয়ে করেছি। মাকে জানিয়ে বিয়ে করেছি। তিনি প্রথমে মত দেন নি, কিন্তু তাঁর গুরুদেব যখন বললেন, মানুষের গুণ আর কর্ম দিয়ে তার জাত-বিচার হয়, কুল আর বংশ দিয়ে নয়—(তাঁর মতে আমি আর আলতা এক জাতের) তখন মা মত দিলেন। আপনার কাছে অনুমতি চাইবার সাহস হয়নি আমার। তবু আপনাকে পত্র লিখছি আর একটি কারণে। দিনচারেক পরে আমাদের বিবাহ উপলক্ষে হোটেলে একটি ভোজ হবে। আড়াইশো লোক খাবে। খরচ পড়বে আড়াই হাজার টাকা। মায়ের কাছে টাকাটা চাইলাম। তাঁর কাছে টাকা চেয়ে কখনও বিফলমনোরথ হই নি। কিন্তু মা এবার বললেন—দিতে পারবে না। নীলার বিয়েতে যৌতুক দেবেন বলে একটা হীরের হার করতে দিয়েছেন, তাইতেই তাঁর সঞ্চিত সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, কিছু ধারও হয়েছে নাকি। আগামী মাসে মগনলাল নামে আপনার একটি ছাত্রের সঙ্গে নীলার বিয়ে হবে সব ঠিক হয়ে গেছে। এ খবর আপনি সম্ভবত জানেন না। না জানাই স্বাভাবিক। আপনি এত ঊর্ধ্বে বাস করেন যে কেউ আপনার নাগালই পায় না। আপনি মাসের প্রথমেই একটা চেক লিখে মহানের হাত দিয়ে সেটা মাকে পাঠিয়ে দেন সংসার খরচের জন্য। সংসারের আর কোনও দায়িত্ব নেবার অবসর নেই আপনার। আপনাকে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-চর্চা করবার সুযোগও আমরা দিয়েছি, কেউ কখনও আপনার ধারে কাছেও যাইনি। অনেকদিন আগে, যখন আমি ছোট ছিলাম, যখন আপনি ঘোড়া চড়তেন, যখন আমাকেও আপনার সামনে ঘোড়ায় চড়িয়ে মাঠে নিয়ে যেতেন—সেই সময়ের কথা মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো মনে হয়। তখন আপনার এত খ্যাতি হয় নি, তখন আপনি আমাদের বাবা ছিলেন। তারপর খ্যাতির যে দেওয়াল আপনার চারদিকে আকাশ-চুম্বী হয়ে উঠল তা ডিঙিয়ে আপনার কাছে যাওয়ার আর সামর্থ্য রইল না আমাদের। আপনার টাকার সহায়তায় আমরা নিজেদের মতে নিজেদের স্রোতে ভাসতে লাগলাম। আপনাকে বিরক্ত করবার সাহস হয় নি কোনদিন। আজও হয়তো হত না। আজ কিন্তু একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। মা টাকা দেবে এই আশায় ভোজের

আয়োজন করেছি, নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে, আপনার ছেলে হিসাবে হোটেলে আমার একটা 'প্রেস্টিজ'ও আছে—এখন যদি টাকার অভাবে ভোজটা বন্ধ করে দিতে হয় তাহলে লজ্জার আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না। আলতার কাছেও আমি খেলো হয়ে যাব। আমি কয়েক জায়গায় টাকাটা ধার করবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোথাও পাইনি। তাই শেষে আপনার কাছে এসেছি। আপনার পক্ষে আড়াই হাজার টাকা দেওয়া কিছু শক্ত নয়। আপনি যদি সম্বন্ধ করে আমার বিয়ে দিতেন তাহলে ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আপনার খরচ হয়ে যেত। প্রসঙ্গত, আর একটা কথাও বলছি। আপনার ওই টাকা আমাদের পূর্বপুরুষের সঞ্চিত টাকা। তাতে কি আমার একটু দাবী নেই? তাঁরা বংশপরম্পরায় জমিদার ছিলেন। আপনিও অনেক দিন জমিদার ছিলেন। কিছুদিন আগেই জমিদারিপ্রথা লোপ পেয়েছে। তাতেও শুনেছি কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছেন আপনি। আমি আপনাদের বংশের একমাত্র বংশধর। আমার বিয়েতে আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ভোজ দেওয়াটা কি খুবই অসঙ্গত? শুনেছি আপনার বিয়েতে নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। আমার দাবী মাত্র আড়াই হাজার টাকা। সেটা কি আপনি দেবেন না? আমার দাবী যদি না মানতে চান, টাকাটা ঋণস্বরূপই আমাকে দিন। আমি ক্রমশ ওটা শোধ করে দেব। আপনি কাল দুপুরে এই চিঠি পাবেন। কালই বেলা তিনটে নাগাদ আমি আপনার কাছে যাব। আশা করি টাকাটা আমাকে দিয়ে আপনি আমার ও নিজের মান রক্ষা করবেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

প্রণত প্রবাল।

চিঠিটা পড়িয়াই গোপালদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার চোখে মুখে যেন বজ্রগর্ভ মেঘ ঘনাইয়া আসিল। অন্য চিঠিগুলো না পড়িয়া তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় নিজের লাইব্রেরি ঘরে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। দুইটি কথাই তাঁহার মনে তপ্ত শলাকার ন্যায় বিঁধিতেছিল। বাগ্দীর মেয়ে—আর দাবী—। সহসা তিনি তরবারিটা দেওয়াল হইতে নামাইয়া কোষমুক্ত করিলেন। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘড়িতে টং করিয়া শব্দ হইতেই চোখ তুলিয়া দেখিলেন—আড়াইটা বাজিল। জীমূতবাহন দেবের তরবারিটা চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর মাথার উপরে সেটা ঘুরাইলেন কয়েকবার। নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, রগের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল, চক্ষুর দৃষ্টি হইতে বিচ্ছুরিত হইল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ।

তিনটা বাজিল। দ্বারপ্রান্তে দময়ন্তী দেখা দিলেন। তাঁহার পিছনে প্রবাল। প্রবালের পরিধানে চোং প্যাণ্ট, গায়ে চকরা-বকরা ছিটের শার্ট। মুখে সূচালো দাড়ি এবং এক জোড়া উদ্ধত গোঁফ। চোখে একটা রঙীন চশমা। গোপালদেবের মনে হইল একটা স্প্যানিশ দস্যু যেন। গোপালদেব প্রবালকে এত সামনাসামনি অনেকদিন দেখেন নাই। এই তাঁহার পুত্র! সুপ্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত দেব বংশের বংশধর—বাগ্দীর মেয়েকে বিবাহ করিয়া হোটেলে উৎসব করিবার জন্য টাকা দাবী করিতে আসিয়াছে! তাঁহার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল এখনই বুঝি মাথা ফাটিয়া আগ্নেয়গিরির লাভার মতো রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইবে।

দময়ন্তী আবদার-মাখা নাকিসুরে বলিলেন—"প্রবাল এসেছে। ওর চিঠি বোধহয় পেয়েছ। কি যে ক্ষ্যাপা ছেলে—কি কাণ্ড যে করে। বিপদে যখন পড়ে গেছে তখন আমাদেরই উদ্ধার করতে হবে—"

"চিরকালের মতো উদ্ধার করে দিচ্ছি—"

গোপালদেব তরবারি তুলিয়া তাড়া করিয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহার হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। প্রবালকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি তলোয়ারটা চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী দুই হাত বাড়াইয়া পুত্রকে রক্ষা করিলেন। কোপটা তাঁহারই কাঁধে পড়িল। তিনি পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোপালদেবও জ্ঞান হারাইলেন।

গোপালদেবের যখন জ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন তিনি যে ঘরে আছেন তাহা তাঁহার লাইব্রেরী নহে। সম্ভবত হাসপাতাল। তাঁহার পাশে নার্স-বেশে সজ্জিতা যে মেয়েটি বসিয়াছিল সে তাঁহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। গোপালদেব অনুভব করিলেন তিনি যাহা করিবেন বলিয়া তরবারি তুলিয়াছিলেন তাহার করিতে পারেন নাই। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে খুন করিয়া ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়া পড়িবেন। এতদিন ধরিয়া মনে মনে যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিতেছিলেন তাহার অবসান হইয়া যাইবে। তাঁহার মেয়ে নীলার চেহারাটা মনে পড়িল। ঠিক যেন একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, ভদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নয়, অভদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাহার পেট-কাটা জামা, উন্মুক্ত বগল, ঠোঁটের এবং গালের অতি উগ্র প্রসাধন, তাহার অভব্য পোশাক পরিচ্ছদ, স্তনযুগলের চোখে-খোঁচা-দেওয়া উদ্ধত ভঙ্গী, তাহার গণিকা-সুলভ চাহনি এবং গমনভঙ্গী বহুদিন হইতেই তাঁহার আদর্শের মুখে লাথি মারিতেছিল। তিনি সকলকে নিঃশেষ করিয়া মরণের অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুভব করিলেন, তাহা পারেন নাই।

একটু পরেই সিভিল সার্জন আসিলেন। তিনি পাশের ঘরেই ছিলেন। সিভিল সার্জন সুরেশ মৌলিক গোপালদেবের বাল্যবন্ধু।

"গোপাল, এখন কেমন আছ।"

"আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন।"

"চিকিৎসার জন্যে। কথা বোলো না। একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি, ঘুমোও খানিকক্ষণ।"

নার্স ইনজেকশন ঠিক করিয়াই আনিয়াছিল। সিভিল সার্জন সেটা দিয়া বলিলেন—"এইবার ঘুমোও।"

"আমার কি হয়েছে।"

"টেমেপোরারি ইনস্যানিটি (temporary insanity), খানিকক্ষণের জন্য মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তোমার। আর কথা নয়। ঘুমোও এবার—"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ভালো ঘুম হইল না। নানারকম স্বপ্ন, নানারকম চিন্তা, নানারূপ ছায়ামূর্তি আসিয়া তাঁহার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল। সকালেই উঠিয়া চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলেন—বাড়ি ফিরিয়া যাইব।

সিভিল সার্জন তাঁহাকে নিজের মোটরে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,"চল।" সোজা তাঁহাকে লইয়া যেখানে তুলিলেন সেটা গোপালদেবের বাড়ি নয়—পাগলা গারদ।

হঠাৎ লর্ড খুব জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার পর তাড়া করিয়া গেল। এক ঝাঁক ছোট পাখি একটু দূরে চরিতেছিল। লর্ডের তাড়ায় তাহারা উড়িয়া গেল। কার্তিকের মনে হইল, সম্ভবত মুনিয়ার ঝাঁক। আন্টা তখনও ঘুমাইতেছিল। কার্তিক খাতাটা বন্ধ করিয়া দূর

দিগন্তে চাহিয়া রহিল। সূর্য অস্তাচলগামী। মুনিয়ার ঝাঁক দেখিয়া তাহার একটা কথা মনে পড়িল।। বহুদিন আগেকার কথা। ছেলেবেলায় মুনিয়া নামে তাহার একটি সঙ্গিনী ছিল। মুনিয়া পাখির মতই সে বনে জঙ্গলে বাগানে বাগানে নদীর তীরে পুকুরের পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত রকম জিনিস সংগ্রহ করিত সে। ঘেঁটু ফুল, মাকাল ফল, আলকুশি লতা, কুকুরশোঁকা গাছ, শ্বেত বেড়েলা, পুনর্ণবা, ঘলঘসে ফুল, ওসব মুনিয়াই তাহাকে চিনাইয়াছিল। তাহার পিঠে বিনুনি ঝুলিত একটা। ফিতা দিয়ে বাঁধা নয়, কাপড়ের পাড় দিয়া বাঁধা। তাহার নামও ছিল মুনিয়া, মুখখানিতেও একটা পাখি-পাখি ভাব ছিল। ছোট্ট মুখ, ছোট্ট চোখ দুইটি। ছোট্ট নাকটি, মনে হইত যেন পাখির ঠোঁট। চোখের দৃষ্টিও ছিল কৌতূহলী, সদা-চঞ্চল। ঠিক পাখির মতো। খুব ভোরে আসিয়া তাহার মামার বাড়ির সামনের রাস্তাটায় ঘুরঘুর করিত আর মাঝে মাঝে ডান হাতটা মাথার উপর তুলিয়া টুসকি দিতে দিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিত আর মুখে শব্দ করিত টুক টুক টুক। ঠিক পাখির মত ছিল সে। মাতৃহীন কার্তিকের ছেলেবেলাটা মামার বাড়িতে কাটিয়াছিল। মুনিয়ারই সমবয়সী সে। মুনিয়াকে দেখিলেই সে বাহিরে চলিয়া আসিত। কেহ মানা করিত না। মামার বাড়িতেও সে ছিল গলগ্রহ। সে বাহিরে চলিয়া গেলেই যেন তাহার মামী স্বস্তি বোধ করিতেন। তাহার প্রাপ্য জলখাবারটা তিনি তখন নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। বলিতেন, ও যখন মুনিয়ার সঙ্গে জুটেছে তখন বাগানে বাগানে ঘুরে ফলটা পাকড়টা খেয়ে নেবে। মুনিয়া সত্যই তাহাকে নানারকম ফল খাওয়াইত। কুল, পেয়ারা, আম, সাপাটু (মল্লিকদের বাগানে সাপাটু গাছ ছিল), গোলাপ জাম, লিচু, কালোজাম— নানারকম ফল সংগ্রহ করিতে পারিত সে। সবই পরের বাগান হইতে চুরি করা। ঢিল ছুঁড়িয়া পাড়িত, হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। মুনিয়ার সঙ্গ কিন্তু বেশী দিন সে পায় নাই। মল্লিকদের বাগানেই একটা বিষধর গোক্ষুর তাহাকে নাকি দংশন করে। তখন তাহার সঙ্গে কার্তিক ছিল না। মুনিয়া বাড়ি ফিরিতে পারে নাই। বাগানেই মরিয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে বাগানের মালীর ছেলেটা তাহাদের বাড়িতে খবর দেয়, সে নাকি সাপটাকে কামড়াইতে দেখিয়াছিল। মুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যায়। মুনিয়ার মা ছিল না। সৎমা ছিল। তাহার বাবা পাশের গ্রামে ধান-কলে কাজ করিত। খবর পাইয়াও সৎমা যায় নাই। বলিয়াছিল, তাহার নাকি বড ভয় করিতেছে। পাড়ার ছেলেরা অনেকক্ষণ পরে মুনিয়ার শবটা যখন বহন করিয়া আনিল তখন দেখা গেল, কাকে তাহার একটা চোখ ঠুকরাইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে। কার্তিক মুনিয়ার শোকে কাঁদিয়াছিল, দুই দিন খায় নাই। তাহার পর বাবা তাহাকে কলিকাতায় একটা বোর্ডিংয়ে ভরতি করিয়া দিলেন। সেইসব কথা এখন মনে পড়িতে লাগিল। আর একটা ছবি মনে পড়িল। মুনিয়ার সেই মুখ-টেপা হাসিটা। কাক তাহার চোখটা নষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু হাসিটা নষ্ট করিতে পারে নাই। মৃত মুনিয়ার মুখেও সেই হাসিটুকু ছিল। মুনিয়ার কথাই নানাভাবে ভাবিতে লাগিল সে। মুনিয়া যদি বাঁচিয়া থাকিত....বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার কোথাও না কোথাও বিবাহ হইত। তখন সুরংকে সে কি চিনিতে পারিত। কার্তিকের ডাক নাম সুরং। কার্তিক নামটা পোশাকী নাম, স্কুলে ভরতি করিবার সময় মামা এ নামকরণ করিয়াছিলেন, কার্তিকের মায়ের নাম ছিল দুর্গা, সেইজন্যই এই নাম তাঁহার মনে হইয়াছিল সম্ভবত। সুরং ভাবিতে লাগিল এই বিপন্ন অবস্থায় সে যদি মুনিয়ার শ্বশুরবাড়িতে গিয়া বলিত—মুনিয়া বড় বিপদে পড়ে এসেছি,

আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমাকে একটু আশ্রয় দিবি? সে কি আশ্রয় দিতে পারিত? আবার মনে হইল নিমুর সহিত বিবাহ না হইয়া তাহার যদি মুনিয়ার সহিতই বিবাহ হইত (হওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ মুনিয়া তাহাদের পালটি ঘরের মেয়ে) তাহা হইলে কেমন হইত? কিন্তু নিমুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই একথা ভাবিতেও খারাপ লাগিল তাহার। তাহার পর হঠাৎ দেখিতে পাইল আকাশ দিয়া তিনটা বক উড়িয়া যাইতেছে। মনে হইল নিশ্চয়ই একটা পুরুষ, আর দুইটি তাহার সঙ্গিনী। হয়তো একজন মুনিয়া আর একজন নিমু। কল্পনার আকাশে খানিকক্ষণ সে বক হইয়া নিমু আর মুনিয়া দুইজনকে লইয়া উড়িতে লাগিল। তাহার পর সহসা তাহার মনে পড়িল উপন্যাসটার কথা। গোপালদেব? কেমন ছিল সে? মাৎস্যন্যায়ের যুগে সকলে ওই লোকটিকেই শাসকরূপে নির্বাচন করিয়াছিল কেন? তখন নির্বাচন কি এখনকার মতো ছিল? গোপালদেব কি কোনরকম ছল-চাতুরী-কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল? সে কি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিল গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এখনকার নেতারা যেমন করে? সে কি বড়লোক ছিল, না গরীব? ইতিহাসে বলে সে ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে। কেন? এইসব নানা কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার পর একটা বড় অদ্ভুত কথা তাহার মনে জাগিল। এটাও তো মাৎস্যন্যায়ের যুগ। আজকালও তো বড় মাছ ছোট মাছকে গিলিয়া খাইতেছে—এখন কি আবার কোন গোপালদেবের আবির্ভাব সম্ভব? কেন নয়। আমিই বা গোপালদেবের ভূমিকায় কেন অবতীর্ণ হইতে পারি না। হঠাৎ এই চিন্তাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল সে। গোপালদেব বৌদ্ধ ছিলেন। সে-ও কি কার্যত বৌদ্ধ নয়? সে তো যাগ-যজ্ঞ মানে না, তেত্রিশকোটি দেবতার উপর তো তাহার বিশ্বাস নাই, আত্মা-পরমাত্মার রহস্য লইয়াও সে কোনওদিন মাথা ঘামায় নাই। ভগবান আছেন কিনা, কি উপায়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় এ ভাবনাও তাহার মনে আসে নাই কোনদিন। বরং নিজের অজ্ঞাতসারে যে নীতিগুলিকে সে এখনও আঁকড়াইয়া আছে তাহা বুদ্ধদেবেরই পঞ্চশীল—হিংসা করিও না, মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না, পরস্ত্রীগমন করিও না, মদ খাইও না। এই সবকেই সেও তো ধর্ম বলিয়া মনে করে। তবে? এ 'তবে'র উত্তর সহসা তাহার মাথায় আসিল না। সে পঞ্চশীল পালন করে বলিয়াই কি তাহার গোপালদেব হইবার যোগ্যতা আছে? সে যুগে অনেক লোকই তো পঞ্চশীল পালন করিত, অনেক লোকই তো ত্রিশরণ লইয়া ভিক্ষু-বেশে সঙ্ঘে গমন করিত, কিন্তু সকলে তো গোপালদেব হয় নাই। কোন বিশেষ গুণের জন্য তিনি সকলের হৃদয় হরণ করিতে পারিয়াছিলেন? এই প্রশ্ন কিছুক্ষণ তাহার মনে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল, তাহার পর মনে হইল স্বয়ং বুদ্ধও তো গোপালদেব হইতে পারেন নাই, বুদ্ধ রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, গোপালদেব মাৎস্যন্যায়ের হিংস্রতাকে শান্ত করিয়া পত্তন করিয়াছিলেন নূতন রাজ্য। দুইজনের জীবন-নীতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সুতরাং বুদ্ধত্ব আর গোপালদেবত্ব এক বস্তু নহে। আবার মনে হইল আমার নাম যেমন কার্তিক অথচ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র সহিত আমার যেমন কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই—এ-ও অনেকটা তেমনি। তখন হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার অধঃপতন ও অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা সবসময়ে পঞ্চশীল অনুসরণ করিত না। এদেশের অনেক এমন জাতি বৌদ্ধ হইয়াছিল যাহারা প্রাণী-হিংসা করিয়াই জীবনযাপন করে—

জেলে, মালো, কৈবর্ত, শিকারী, ব্যাধ—এরকম অনেক নাম তাহার মনে পড়িল। চীন জাপানও বৌদ্ধ, কিন্তু তাহারাও 'হিংসা করিও না' এ নীতি অনুসরণ করে না। তাহারা সব রকম মাছ মাংস খায়, অস্ত্র লইয়া রণাঙ্গনে রক্তপাত করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেকটা এই কাণ্ড হইয়াছে। হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের সহিত ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত একমত হইতে না পারিয়া অনেকে 'ব্রাহ্ম' হইয়াছিলেন। উপনিষদের ধর্মের সহিত নবাগত বিদেশী আচার-ব্যবহারের 'পাঞ্চ' করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল, অনেকে ব্রাহ্ম হইয়াও ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন এরূপ লোক সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। 'কমিউনিজ্‌ম্'ও অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। অনেকেই 'কমিউনিস্ট', কিন্তু প্রকৃত সাম্যবাদীর লক্ষণ কয়জনের জীবনচরিত্রে রূপায়িত? সেইজন্য মনে হয়, গোপালদেব বোধহয় নামেই বুদ্ধ ছিলেন। প্রয়োজন হইলে ক্ষত্রিয়ের মতো তরবারি নিষ্কাশন করিয়া শত্রুর রক্তপাত করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না। কার্তিক কল্পনা করিল, তিনি নিশ্চয় আমিষাশী ছিলেন। হয়তো শিকারীও ছিলেন। একটা ছবি সহসা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল—একটা বিরাট বন্যবরাহকে অনুসরণ করিয়া একজন শিকরী ভল্ল হস্তে বনজঙ্গল ভাঙিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষাত্র পৌরুষের একটা বলিষ্ঠ আবির্ভাব তাহার কল্পনায় মূর্ত হইয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। তাহার মনে হইল যে বাঙালীরা আজ কেরানীগিরি লাভ করিবার জন্য নানাভাবে নিজেদের অবনত করিতেছে এই সমর্থ পুরুষের সহিত কি তাহাদের কোন সম্পর্ক আছে? কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল সে। তাহার পর মনে হইল সম্পর্ক আছে বই কি। কিন্তু যুগের প্রভাবে মানুষ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার নিজের ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়িল। তিনি প্রত্যহ সাত আট ক্রোশ হাঁটিয়া বেড়াইতেন, এক চুমুকে দুই সের দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন, স্বপাক রাঁধিয়া একবেলা খাইতেন, জুতা পরিতেন না, ছাতা মাথায় দিতেন না, জামাও পরিতেন না। তিনি আমারই পূর্বপুরুষ ছিলেন, অথচ তাঁহার সহিত আমার কিছুমাত্র মিল নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া গোপালদেবের কথাটাই তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন? বুদ্ধদেবের কোন বিশেষ বিভূতি তাঁহার চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল কি? হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' কবিতাটা মনে পড়িল। তাহাতে একটা কথা আছে 'করুণাঘন'। এই 'করুণা' গভীর ভালবাসারই নামান্তর। মহৎ লোকেরা সকলকেই করুণা করেন। এ করুণা ইংরেজি 'পিটি'(pity) নহে, ইহা উচ্চ বেদীতে দাঁড়াইয়া অনুগ্রহবর্ষণ নহে, ইহা সহানুভূতি, সহমর্মিতা, দুঃখীর বেদনা নিজের হৃদয় অনুভব করিয়া তাহার জন্য অশ্রুবিসর্জন করা। শুধু তাহাই নহে, কি করিলে সে কষ্ট দূর হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। বুদ্ধদেব তাহাই করিয়াছিলেন। হয়তো গোপালদেবও ওই পথের পথিক হইয়াই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। বুদ্ধত্বের ওই মহৎ গুণটিই হয়তো তাঁহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তিনি সকলকেই ভালোবাসিয়াছিলেন। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়ের জন্যই বেদনাবোধ করিয়াছিলেন তিনি। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন নাই, সকলেরই মঙ্গল চিন্তা করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সকলেরই সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কি তাহা পারিব না? সঙ্গে সঙ্গেই দুইটা মুখ তাহার মনে পড়িল—তাহার শালা কালীকিঙ্করের এবং মিস্টার ভড়ের। মিস্টার ভড়ের পক্ষপাতিত্বের জন্যই সে কেরানীগিরি চাকুরিটি পায় নাই। ভড় মহাশয় তাঁহার আই-এ পাশ পুত্রটিকে আপিসে বাহাল

করিয়া বলিয়াছিলেন—ও সব বি-এ অনার্স-ফনার্সের মুরোদ কতদূর তা আমার জানা আছে। ওরা আপিসে নাক উঁচু করে থাকবে খালি, আর অন্য কোথাও একটু বেশী মাইনে পেলেই ফুডুৎ করে পালিয়ে যাবে। চাকরিতে অবশ্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হইয়াছিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। কার্তিকের খুব আশা ছিল সে যখন বি-এ অনার্স তখন নিশ্চয়ই চাকরিটা পাইবে। মিস্টার ভড়ের ঘটির মতো মুখটা মনে পড়িল, মাথায় টাক, ঘন ভুরু, নাকের নীচে 'টুথব্রাশ' গোঁফ। চক্ষুর দৃষ্টি ব্যঙ্গক্রুর। তাহার শালা (বৈমাত্র শালা, তাহার শ্বশুরের প্রথম পক্ষের পুত্র) কালীকিঙ্করের মুখটাও মনোরম নহে। অনেকটা কোদালের মতো, চতুষ্কোণ এবং নিষ্ঠুর। নামটা গাঁইতির মতো। ইহাদের কি সে ভালোবাসিতে পারিবে? ইহাদের জন্য কি তাহার মনে করুণা জাগিতে পারে? যে সুদখোর মহাজনটা তাহার পিতাকে চক্রবৃদ্ধি সুদের বেড়া-আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছিল তাহাকে ক্ষমার চক্ষে দেখার মতো উদারতা কি তাহার আছে? স্বীকার করিতে হইল, নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন বলিল—এসব লোক কি ক্ষমার যোগ্য? ইহাদের ক্ষমা করা তো কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। নিজের বীর্যবলে ইহাদের যদি স্ববশে আনিয়া তাহার পর ক্ষমা করিতে পারি তাহা হইলেই সে ক্ষমা ক্ষমা নামের যোগ্য। গোপালদেব যদি আমার মতো অবস্থায় পড়িতেন তাহা হইলে ওই কালীকিঙ্করকে, ওই মিস্টার ভড়কে, ওই সুদখোর রাহুল মিত্রকে কি ক্ষমা করিতেন? কখনই না। তিনি নিশ্চয়ই প্রথমে উহাদেব শক্তিবলে জয় করিয়া তাহার পর তাহাদের ক্ষমা করিতেন।

"চল হে এবার ওঠা যাক। তালুকপুরে একটা মেলা বসেছে শুনেছি। সেইখানে যাই চল। কিছু রোজগার তো করতে হবে।"

"কে রোজগার করবে? তুমি?"

"হিঁ। তুমিও করবে। চল বাজার থেকে কিছু আবির আর কিছু কালো রং কিনে নিই। তোমার মুখে মাখিয়ে দিলে খাশা দেখাবে। আমি আমার কাপড়টা খুলে ঘাগরার মতো করে পরব। গামছাটা মাথায় দিয়ে ঘোমটার মতোও করে নেব একটু। তারপর কোমরে হাত দিয়ে লাচব। আর তুমি মুখে রং মেখে আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে। খুব জমে যাবে। লোকে লাচ দেখতে বড় ভালোবাসে। হিন্দী সিনেমাগুলো চলছে খালি লাচের জোরে। আমি অনেক হিন্দী সিনেমা দেখেছি, প্রায় সবগুলোতেই ডবকা ছুঁড়িদের লাচ। সার্কাস তো একটা কাটখোট্টা ব্যাপার, সেখানেও লাচ দিতে হয়। সার্কাসের আমি আর মোহিনী লাচতাম। মোহিনী লাচত আর আমি মুখে কালি ভুষো আর আবির মেখে তার সঙ্গে ইয়ার্কি করতাম। খুব জমে যেত—কি হাততালির ধুম। আমার পার্টটা আজ তোমাকে করতে হবে। চল আর দেরি করা নয়। মেলায় একটা দালাল জোগাড় করতে হবে—পাব কি না জানি না, পেলে ভালো হয়—"

"দালাল? দালাল কি করবে!"

"আমাদের হয়ে দালালি করবে। কিছু পয়সা নেবে অবশ্য, কিন্তু তাতে বেশী রোজগার হবে।"

"তাই না কি।"

"হিঁ। চলই না দেখা যাক কি হয়—। ওই! কুকুরটা আবার মাটি খুঁড়ছে কেন—!"

"ছুঁচোর সন্ধান করছে—"

"যদি আজ ভালো রোজগার হয়, ওকে একটু দুধ খাওয়াব। কি বল?"

কার্তিক একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। মুখে লাল কালো রং মাখিয়া কি ধরনের ফষ্টিনষ্টি করিলে লোকেরা খুশী হইয়া পয়সা দিবে তাহাই সে ভাবিতেছিল বোধহয়।

"চল ওঠা যাক। সন্ধে তো হয়ে গেল। হাঁটতেও হবে খানিকটা—"

"তালুকপুরের খবর কে দিলে তোমায়—"

"বাজারে যেখানে আমি খেলা দেখাচ্ছিলাম তারাই বললে তালুকপুরে প্রতি পূর্ণিমায় মেলা বসে। খুব লোকজন আসে। সেখানে রোজগার বেশী হবে। চল যাওয়া যাক—কুকুরটাকে ডাক, ও যে খুঁড়েই চলেছে—"

"লর্ড—লর্ড—"

লর্ডের ভ্রূক্ষেপ নাই। সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া কান খাড়া করিয়া তাকাইল মাত্র, আবার খুঁড়িতে লাগিল।

"ভারি অবাধ্য কুকুরটা। চল আমরা এগিয়ে যাই। ও আপনিই আসবে—"

আন্‌টা একবার কোমর বাঁকাইয়া নাচিয়া লইল। তাহার পর বার দুই লাফ খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হুই, হুই, হুই। পরিশেষে মুখে আঙুল ঢুকাইয়া সিটি দিল বার দুই।

"আমার মনে জোয়ার এসে গেছে, চল।"

জিনিসপত্র দুইটি থলিতে পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল তাহারা। যখন কিছুদূর গিয়াছে লর্ড তখন মুখ তুলিয়া দেখিল তাহারা চলিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁই বাঁই করিয়া ছুটিল সে তাহাদের পিছনে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের পার হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া লাফালাফি করিতে লাগিল। মুখে একটা দুষ্টু-দুষ্টু হাসি-হাসি ভাব। একটা কান উল্টাইয়া গিয়াছে!

তালুকপুরের মেলায় একজন দালাল পাওয়া গেল। একটা তাঁবুর সামনে দাঁড়াইয়াছিল লোকটা। মুখময় বসন্তর দাগ। আন্‌টার কাছে সমস্ত শুনিয়া সে বলিল,"ঠিক আছে। তোমরা আমার এই তাঁবুটায় ঢোক। ঢুকে সাজগোজ করে নাও। আমি ততক্ষণ ক্যানেস্তারা পিটে লোক জোগাড় করে ফেলছি। রাত্রি দশটার পর কিন্তু তাঁবু ছেড়ে দিতে হবে।"

"কেন?"

"আর একজন আসবে, খেজুর বিবি। তার কারবার রাত দশটার পর।"

তাহার হাতে একটা রিস্ট-ওয়াচ ছিল, সেটার দিকে এক নজর চাহিয়া বলিল—"প্রায় সাতটা বাজে, তোমরা যদি দশটা পর্যন্ত থাকো, তাঁবুর ভাড়া ঘণ্টা পিছু চার আনা লাগবে। তিন ঘণ্টায় বারো আনা। আর আমি যে ক্যানেস্তারা পিটে লোক জড় করব তার জন্যে এক টাকা চাই।"

আন্‌টা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"অত পারব না ভাই। বখরা কর। টাকায় দু'আনা নিও। যত পয়সা পড়বে তা আমি কুড়ুব। তারপর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বখরা দিয়ে দেব। এতে রাজি?"

লোকটা কানে আঙুল ঢুকাইয়া কানটা একবার চুলকাইয়া লইল। তাহার পর বলিল—"তুমি বামন অবতার, তোমার নাচ দেখতে লোক জুটবে। ইনি কি করবেন?" আমাকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিল।

"ইনি হবেন আমার লাগর। আমি লাচব আর ওঁকে লাচাব—"

"তাই না কি—"

"হিঁ গো। দেখো না কেমন জমাই—। রাজি তো?"

"বেশ। ঢুকে পড় তাহলে তাঁবুর ভিতর—আমি ক্যানেস্তারা পিটি—আর এ কুকরটাও তোমাদের না কি।"

"হিঁ। ওটাও লাচবে—"

তিনজনে তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে ক্যানেস্তারা পিটাইয়া লোকটা তারস্বরে বলিতে লাগিল—আসুন, আসুন। এখনি বামন অবতার মাগী সেজে নাচ দেখাবে তার নাগরের সঙ্গে। আর তাদের সঙ্গে নাচবে একটা কুকুরও। দশ নয়া করে দর্শনী লাগবে। দয়া করে কেউ ফাঁকি দেবেন না। ফাঁকি দিলে বামন অবতারের শাপ লাগবে—ঢং ঢং ঢং ঢং।"

ক্যানেস্তারার বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল।

তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া আন্‌টা কার্তিককে চুপি চুপি বলিল, "তুমি গানের এই লাইনটা মনে রেখো। আমাদের সার্কাসের সাঁওতালী সহিসের কাছে শিখেছিলাম এটা। 'ওরে আমার মুংলি সোনা, লাচ দেখারে। গা দুলিয়ে পা খেলিয়ে লাচ দেখা রে—'। এইটে সুর করে গাইবে আর আমি লাচব। আর কুকুরটা আমাদের ঘিরে ছুটোপুটি করবে—"

"লর্ড পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতেও পারে—"

"বাঃ, তাহলে তো খাশা হবে। ওর সামনে পা দুটো ধরে ওকে লাচিও, তাহলে আরও জমে যাবে—। বস, তোমার মুখে রং মাখাই, বাজারে খুব ভালো রং পেয়েছি। নাকটা আর চোখের পাশগুলো লাল করব। থুতনিটাও। আর বাকীটা কালো। তুমি হাত পা তুলে যেমন খুশি লেচো তবে ওই গানটা গাইতে হবে—ওরে আমার মুংলি সোনা, লাচ দেখা রে। গা দুলিয়ে পা খেলিয়ে লাচ দেখা রে। লাচ দেখা রে লাচ দেখা রে লাচ দেখা রে। মনে থাকবে তো?"

"থাকবে—"

কার্তিকের মুখে হাতে রং মাখাইয়া আন্‌টা নিজের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। কার্তিকের সামনেই উলঙ্গ হইয়া পড়িল সে। এতটুকু লজ্জা করিল না তাহার। কাপড়টা কোঁচ দিয়া শাড়ির মতো করিয়া পরিল। তাহার পর তাঁবুর কোণের দিকে তাকাইয়া সে সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—"এ লাগ লাগ, এ লাগ লাগ, লেগে গেছে, মিলে গেছে!"

তাঁবুর কোণের দিকে ছোট ছোট দুইটা ইঁটের টুকরো আর একটু শণের দড়ি পড়িয়াছিল। আন্‌টা ছুটিয়া গিয়া সেগুলি লইয়া আসিল।

"এই ইঁট দুটো দড়ি দিয়ে আমার বুকের দু'পাশে বেঁধে দাও তার উপর আমার রাঙা গামছাখানা। বুকের কাছটা একটু উঁচু না হলে মুলিংকে মানাবে কেন!—"

ভাগ্যিস দড়ি একটু বেশী ছিল—যে মজুররা তাঁবু খাটাইয়াছিল তাহারাই ফেলিয়া গিয়াছিল বোধহয়। বেশী দড়ি না থাকিলে ওই ইঁটের টুকরো দুইটা বুকে বাঁধা যাইত না। কার্তিক ইঁটের টুকরা দুইটাকে বুকের দুই পাশে রাখিয়া দড়ির বহু পাক দিয়া সেগুলিকে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। একটা ছেঁড়া খবরের কাগজও পড়িয়াছিল তাঁবুর ভিতর। আন্‌টা আদেশ করিল, "ওটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দাও। নিটোল হবে তাহলে।" নিজের বুকের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া সে বলিতে লাগিল—"বাঃ ই তো খাশা হয়েছে। মোহিনীর মতো আমার মুখটা যদি হত, তাহলে দেখিয়া দিতাম লাচ কাকে বলে—!"

ভীড় প্রচুর হইয়াছিল। সমস্ত মেলাটাই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল যেন। আন্টার নৃত্য-শিল্প হয়তো উচ্চাঙ্গের ছিল না, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রাচুর্য এত প্রচুর, তাহার উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ এত সাবলীল যে তাহতেই জমিয়া গেল। কার্তিকও মুখে রং মাখিয়া 'লাগরের' পার্টে মন্দ অভিনয় করিল না। সে বিশেষ কিছু করে নাই।—হাত পা নাড়িয়া ওই গানের কলিটা মুখভঙ্গী করিয়া গাহিতে লাগিল কেবল—ওরে আমার মুংলি সোনা লাচ দেখা রে। আন্টাও নাচিতে নাচিতে ইহার উত্তরে আরও খানিকটা গাহিল—লাচব ক্যানে? বাউটি দিবি? পঁইছা দিবি? কাঁকন দিবি? ও মুখ পোড়া, মাকড়ি দিবি? লত দিবি? গোট দিবি? না দিস তো—লাচব ক্যানে, লাচব ক্যানে—? এই বলিয়া সে থুতনিতে আঙুল দিয়া কোমর বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া যে নাচ নাচিল তাহাতে হৈ হৈ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। লর্ডও ইহাদের ঘিরিয়া ঘিরিয়া আনন্দের উদ্দাম নৃত্য জুড়িয়া দিল। পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া কার্তিকেব সঙ্গেও খানিকক্ষণ নাচিল সে। মনে হইতে লাগিল তাহার স্ফূর্তিই যেন সবচেয়ে বেশী।

পয়সা অনেক পড়িয়াছিল। তাঁবুর সামনেই একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। লণ্ঠনটা না কি খেজুরি বিবির। তাহারই একজন চাকর সন্ধ্যা হইতে সেটা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, সম্ভবত খেজুরি বিবির আগমনবার্তা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য। সেই লণ্ঠনের আলোতেই আন্টার নাচেরও সুবিধা হইয়া গেল। সেই আলোতেই সে পয়সাও কুড়াইল। সব সমেত আট টাকা কুড়াইয়া পাইল সে। অনেকে আধুলিও দিয়াছিল। তাঁবুর মালিককে সে একটাকা দিল, খেজুরি বিবির চাকরকেও আট আনা দিয়া সে বলিল—"ভাগ্যিস আলোটা এনেছিলে ভাই, তাই আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। তোমার নাম কি— ?"

চাকরটা হাঁ করিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিল, তাহার পড় বুড়ো আঙুল নাড়িতে লাগিল: বোঝা গেল, সে বোবা। আন্টা মুখ সূচালো করিয়া বলিল—'হুই, কি কাণ্ড।' কার্তিক তাঁবুর ও পাশটায় অন্ধকারে গিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল গোপালদেব কি এরকম পরিস্থিতিতে পড়িয়াছিলেন কখনও?

"হুই কার্তিক কোথা গেলে হে—"

আন্টার ডাক শুনিয়া কার্তিক বাহির হইয়া আসিল।

"চল ওদিকে একটা পুকুর আছে শুনেছি। চান করে আসি।"

"আমি পায়জামা ভিজুব না। দ্বিতীয় কাপড় আমার নেই—"

"দ্বিতীয় কাপড়ের কি দরকার। দিগম্বর হয়ে চানটা করে লাও—পুকুর পাড়ে গাছগাছালি আছে নিশ্চয়—তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে।"

"না সে আমি পারব না। তোমার কাপড় আছে?"

আন্টার হাসিও আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিল। বলিল—"হ্যাংলা বলে ন্যাংটাকে, মাণিক আমায় কাপড় দে—। আমার কাপড় কোথা? একটা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট আছে খালি,—আর এই গামছাখানা, যেটা বুকে বেঁধেছি। ইটা খোলো তো ইঁট দুটোও খোল, খোঁচা মারছে বুকে। গামছাটা পরে চান করতে পার—তাই চল—চল পুকুরটা বার করি আগে—"

কিছু দূরেই একটি রিক্‌শা দাঁড়াইয়াছিল। সেই রিক্‌শা হইতে একটি ডগমগে-লাল-শাড়ি-পরা মেয়ে নামিল। তাহার পায়ে হাই-হিল জুতা, চোখে চশমা, গালে ঠোঁটে রং, পিছনে

সর্পাকৃতি একটি বেণীর অগ্রভাগে জরির ফুল। তাহার উপর পেট্রোম্যাক্সের আলোটা পড়িতেই মনে হইল যেন একটা আবির্ভাব। মেয়েটি সোজা কার্তিকের দিকে আগাইয়া আসিল এবং বিস্মিত কার্তিক কিছু বলিবার পূর্বেই বলিল—"সুরং আমাকে চিনতে পারছ?"

সুরং পারিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কেবল।

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল—"আমি চপলা—"

চপলা! চপলাদি! একটা তীক্ষ্ণ ছুরিকা যেন বিস্মৃতির পরদাটাকে চিরিয়া ফেলিল। সেই ছিন্ন পরদার ভিতর দিয়া সে সহসা ভৈরব-কিঙ্কর প্রাইমারি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা মিস চপলা চক্রবর্তীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বহুকাল আগে কালীকিঙ্করের প্রপিতামহ ভৈরবকিঙ্করের নামে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ে কালীকিঙ্কর যাহাকে শিক্ষিকা পদে বাহাল করেন তিনি কালীকিঙ্করেরই দূরসম্পর্কীয়া শালী ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ চপলা চক্রবর্তী—সুরংয়ের চপলাদি। চপলা কালীকিঙ্করের বাড়িতে থাকিত, নিমুকে এবং জ্যোৎস্না বউদিকে (কালীকিঙ্করের স্ত্রী) ইংরেজি, বাংলা এবং অঙ্ক পড়াইত, ইতিহাসেও প্রচুর দখল ছিল তাহার। নাটক নভেল পড়িত না, ইতিহাসের বই পড়িত। তাহার পর হঠাৎ একদিন সে অন্তর্ধান করিল। নিমু বলিল—কুলে কালি দিয়া গিয়াছে। কালীকিঙ্কর কপাল চাপড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—যাকে ফুলের মালা মনে হয়েছিল সে যে আসলে কালভুজঙ্গিনী তা কে জানত। ইহার পর ভৈরবকিঙ্কর বালিকা (ইংরেজিতে নাম ছিল বি. কে. গার্লস স্কুল) উঠিয়া গেল। ইহার পর আর কোনও শিক্ষিকাই পাওয়া গেল না। জ্যোৎস্না বউদি কোনও শিক্ষিকাকে বাড়িতে স্থান দিতে রাজি হইলেন না। গ্রামের কোনও সম্পন্ন গৃহস্থই হইল না। উপরে সিমেন্ট-অক্ষরে চিহ্নিত বি. কে. গার্লস স্কুলটির পাকা একতলা ভবনটি এখনও আছে। তাহা কালীকিঙ্কর ধান-চালের গুদাম-রূপে ব্যবহার করেন। কতদিন আগেকার কথা? বছর পাঁচেক হইবে। ইহার মধ্যেই চপলা—তাহার চপলাদি—বিস্মৃতির আড়ালে হারাইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য তো। সত্যই মানুষের মন। অনেকদিন আগে এক বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে সে আকাশের নক্ষত্র চিনিতে শিখিয়াছিল! সপ্তর্ষিমণ্ডলীর 'কর কারোলি' (Cor Caroli) নামক ছোট একটা নক্ষত্র সে অনেক কষ্টে চিনিয়াছিল। সে নক্ষত্রটা এখন কোথায় আছে? চিনিয়া বাহির করিতে পারিবে কি? সে হঠাৎ যদি তারার ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া বলে—সুরং আমাকে চিনতে পারছ? সে পারিত না। চপলার আবর্ভাবও যেন অনেকটা সেই ধরনের।

"চপলাদি! তুমি এখানে—?"

"এসে পড়লুম। তুমি মুখে রং মেখে সং সেজেছ, কিন্তু তবু তোমাকে চিনেছি আমি। চল, সব বলছি—"

যে বোবা চাকরটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনের কাছে বসিয়াছিল চপলা তাহাকে প্রশ্ন করিল—"তাঁবুর ভিতর বিছানাটিছানা পেতেছিস?"

সে ঘাড় নাড়িয়া উদ্ভাসিত চক্ষে জানাইল পাতিয়াছে। কার্তিক বলিল—"তাঁবুটা শুনেছি খেজুরি বিবি ভাড়া করেছেন।"

"আমিই খেজুরি বিবি। ভিতরে এস—"

আরও বিস্মিত হইল কার্তিক। আরও ঘাবড়াইয়া গেল সে।

আন্টা বলিল—"আমি তাহলে চানটা সেরে আসি। ঘেমে একেবারে আচার হয়ে গেছি।

তুমি আলাপ কর ওনার সঙ্গে। লর্ড আয়, তোকে একটু খাবার খাওয়াই, অনেক নেচেছি—আঃ আঃ—হুই হুই—হুই—"

লর্ডকে লইয়া আন্‌টা চলিয়া গেল।

তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া গেল কার্তিক। সেখানে একটা বড় চাদরের উপর রং-ওঠা পুরোনো একটা কার্পেট পাতা, গোটা দুই তাকিয়া, একটু দূরে পাশে একটা দড়ির খাটিয়া, এক বালতি জল আর চকচকে কাঁসার ঘটি। আর এক কোণে একটি কুঁজোর মুখে ঢাকাদেওয়া একটি কাচের গ্লাস। তাহার পাশে তিন চারটি বোতল—বোধহয় মদের বোতল।

"তুমি খেজুরি বিবি! চপলাদি, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না—"

"চপলাদি অনেকদিন আগে মরে গেছে। তোমার শালা কালীকিঙ্করই মেরে ফেলেছে তাকে। যাক সে কথা। তুমি এখানে রং মেখে সং সেজে কি করছ। আমি এতক্ষণ বসে বসে অবাক হয়ে তোমার কাণ্ড দেখছিলাম—! মদ খেয়েছ না কি।"

"না—"

"মদ না খেয়েই মাতালের অভিনয় করছিলে?"

"পেটের দায়ে করছিলাম—"

"কি রকম।"

"কালীকিঙ্কর আমাকেও জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—"

"তাই না কি। নিমুকেও?"

"নিমুকে এখনও তাড়ায়নি। ওকে সহজে তাড়াবে না, কারণ ও যে বিনা মাইনের রাঁধুনী—চাকরানী।—"

খেজুরি বিবি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

"তারপর?"

"তারপর আর কি। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি একটা ঝুলি নিয়ে, জুতোটা বিক্রি করে দিন দুই চলেছে। তারপর জুটেছে ওই আন্‌টা—সার্কাস-পালানো ওই বামনটা—ওরই সাহায্যে চলছে এখনও—ও নানারকম খেলা জানে—ও যা বলছে তাই করছি— কোন রকমে কিছু রোজগার করতে হবে তো।"

"কি রকম রোজগার করছ?"

"কোন রকমে খাওয়া চলছে। আজ গোটা ছয়েক টাকা হয়েছে—"

"ও কুকুরটা কি তোমার?"

"হ্যাঁ। ওটাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। কিছুদূর এসে দেখি পিছু পিছু আসছে। নবীন দিয়েছিল আমাকে বাচ্চাটা। বড় ভালো কুকুর—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, ওটাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি—"

"তুমি কি করবে ঠিক করেছ কিছু? সারাজীবন রাস্তাতেই ঘুরে বেড়াবে?"

"সিংরা বলে একটা গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে পড়ে আছে, সেইখানে যাব ঠিক করেছি—"

"জায়গাটা কোথা—"

"হুগলী জেলায় শুনেছি।"

"হুগলী জেলার সিঙুর বলে একটা জায়গা আছে জানি। সিংরায় তুমি গেছ কখনও?"

"না—"

"তোমার ভিটে কোনটা তাহলে চিনবে কি করে? কোনও কাগজপত্তর আছে?"

"না—"

খেজুরি বিবি হাসিয়া ফেলিল।

"কোন ভরসায় যাচ্ছ তাহলে!"

কার্তিকেরও মনে হইল সত্যই নির্ভরযোগ্য কিছুই নাই। গ্রামের নামটাও হয়তো সে ঠিক জানে না। হয়তো সিঙুরকেই সিংরা ভাবিয়াছে সে।

খেজুরি বিবি বলিল—"তুমি এখনও ঠিক তেমনি আছ—"

"তেমনি মানে?"

"সরল। সংসারের ঘোরপ্যাঁচ কিচ্ছু বোঝ না।"

খেজুরি বিবি মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কার্তিকের রাগ হইল হঠাৎ। নাকটা ফুলিয়া উঠিল।

"তার মানে ভদ্রভাবে বোকা বলছ আমাকে। আমি অবশ্য বোকাই। তার উপর অদৃষ্ট খারাপ, পূর্বজন্মের অনেক পাপ ছিল, তা না হলে কেউ ঘরজামাই হয়—"

খেজুরি বিবি ভ্রূলতা উত্তোলন করিয়া বলিল—"কথার অমন বেঁকিয়ে মানে করছ কেন! সরল মানে বোকা নয়। সরল মানে যার মন শুদ্ধ, নিষ্পাপ যে সবাইকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে, যার মহৎ আদর্শে আস্থা আছে— সেই সরল। সরলতায় পৃথিবী জয় করা যায়। সরল লোক বিরল। রাগ করছ কেন তুমি—! আচ্ছা, সুরং তোমার মনে কোনও স্বপ্ন নেই?"

সুরং খেজুরি বিবির মুখের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—"আছে বই কি। আমার মন স্বপ্নের বাগান। নানারকম স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকে ফুলের মতো ফুটেছে আর ঝরে গেছে। ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল বড় স্কলার হব একজন, আশু মুখুজ্যের মতো। ম্যাট্রিকুলেশন আই-এ-তে ভালো রেজাল্টও করেছিলাম। বাবা ছেলেবেলা থেকে আমাকে কলকাতার ভালো স্কুলে ভালো কলেজে পড়িয়েছিলেন, ভালো লাইব্রেরি থেকে অনেক বই পড়েছিলুম, অনেক বই কিনেছিলুম—বাবা সব টাকা জোগাতেন ধার করে করে। সেই ধারের আগুনেই শেষে সব পুড়ে গেল। বাবার পক্ষাঘাত হল, মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, আমাকেই বাবার সব সেবা করতে হত। সেবার আমার বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার বছর, পরীক্ষা দিলুম, কিন্তু থার্ড ক্লাস অনার্স পেলুম। বাবাও মারা গেলেন। আমাদের যা কিছু ছিল তা সুদখোর মহাজন দখল করে নিলে। স্বপ্নটা ঝরে গেল।"

কার্তিক চুপ করিল।

"তারপর—?"

ম্লান হাসিয়া কার্তিক উত্তর দিল—"কি হবে আমার মতো হতভাগার কথা শুনে—"

"নিজেকে অত ছোট ভেবো না সুরং। ছোট ভাবতে ভাবতে আরও ছোট হয়ে যাবে। বল, আর কি কি স্বপ্ন জেগেছিল তোমার মনে—"

কার্তিক চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর তাহার চোখে মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল একটা।

"পরের স্বপ্নটা অবশ্য নিমুকে ঘিরে। সেটা এখনও একেবারে নিঃশেষ হয়নি। তারপরেও আর একটা স্বপ্ন জেগেছিল— "

একটু ইতস্তত করিয়া আবার থামিয়া গেল কার্তিক।

"কি সেটা শুনি—"

"সেটা তোমাকে ঘিরে। তখন আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো আর একবার করে পড়েছিলাম। তখন তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি শ্রী। যদিও কিচ্ছু মিল ছিল না, তবু মনে হয়েছিল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অনেক অমিল থাকে, কিন্তু মিলও থাকে আবার। তোমার সঙ্গে মিলটা ছিল— সেটা কি অবশ্য তা বলতে পারব না। আমার কেবলই মনে হত কোনও অদৃশ্য সীতারামের জন্য তুমি যেন প্রস্তুত করছ নিজেকে।......"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল খেজুরি বিবি।

"তোমার কল্পনার দৌড় তো কম নয়! আসল কথাটা কি বলব? আমাকে তোমার ভালো লেগেছিল। যাকে ভালো লাগে তাকে নিয়ে অনেক কবিত্ব জাগে মনে। তার মুখকে মনে হয় চাঁদ, চোখকে মনে হয় চকোর, হাতকে মনে হয় বাহুলতা। এ স্বপ্ন কি এখনও বেঁচে আছে তোমার মনে?"

"না—। তোমাকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মনের উপর একটা যবনিকা পড়ে গিয়েছিল। সেই যবনিকার সামনে বসে আমি এতদিন জগু ভট্চাজের সঙ্গে দাবা খেলেছি, কোনান্ ডয়েলের উপন্যাস পড়েছি, ঘোষেদের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করেছি, চণ্ডীমণ্ডপে বসে পর-চর্চায় যোগ দিয়েছি—অর্থাৎ টিপিকাল ঘরজামাইয়ের যা যা করা উচিত তাই করেছি, তোমার কথা একবারও ভাবিনি। রাস্তায় বেরিয়ে আবার নতুন স্বপ্নের একটা কুঁড়ি দেখা দিয়েছে আমার মনের বাগানে। তার আবির্ভাব দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি।"

"কি রকম সেটা—?"

"শুনলে তুমি হয়তো হাসবে। আমার মুখের রং-টং দেখে এমনিতেই তোমার সন্দেহ হয়েছে যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ কথা শুনলে আর সন্দেহ থাকবে না।"

"বলই না শুনি—"

"রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই জুতো জোড়া বেচে দিলাম একটা মুচিকে। তাতে দিন দুই চলল। তৃতীয় দিনে কি করি ভাবছি— এমন সময় একটা বড় ডাস্টবিন্ চোখে পড়ল। ডাস্টবিনে অনেক সময় খাবারের টুকরো পাওয়া যায়। হাঁটরাতে লাগলাম ডাস্টবিন্টা। খাবার তেমন পেলাম না। পেলাম একটা জাবদা পাণ্ডুলিপি। রাজা গোপালদেবকে নিয়ে লেখা—"

"যিনি অষ্টম শতাব্দীতে গণতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের যুগে সেটা তিনি করেছিলেন, যে যুগে সবাই খেয়ো-খেয়ি করছে, সেই যুগে সবাই তাঁকে নেতা বলে মেনেছিল। কেন মেনেছিল? শুধু যে সাময়িকভাবে মেনেছিল তা নয়, গোপালদেব পাল বংশ স্থাপন করেছিলেন, যে পাল বংশ বাংলার ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়—"

খেজুরি বিবির চোখে আলো চকচক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কোনও কথা বলিল না, হাসি মুখে চাহিয়া রহিল।

কার্তিক বলিতে লাগিল—"এটাও তো মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এ যুগে কোনও গোপালদেব হওয়া কি সম্ভব নয়?"

"তোমার স্বপ্নটা কি তাই শুনি না—"

কার্তিক একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সে-ই যে গোপালদেব হইতে চায় এত বড় হাস্যকর কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিল সে।

"ধর আমিই যদি গোপালদেব হবার চেষ্টা করি। সেটা কি হাস্যকর হবে খুব?"

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল খেজুর বিবি। তাহার পর বলিল—"হাস্যকর কেন হবে। ইতিহাসের এ রকম ঘটনা তো ঘটেছে। সামান্য একটা ক্রীতদাস স্লেভ ডাইনাস্টি স্থাপন করেছিল। স্বয়ং গোপালদেবও তো সাধারণ লোক ছিলেন। তাছাড়া আজকাল কি হচ্ছে—যত সব হোমরাচোমরা মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট, এরা সবাই তো সাধারণ পর্যায়ের লোক। পৃথিবীর বৃহত্তম যে বিদ্রোহ ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন মূর্ত হয়েছিল তা করেছিল তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ। রাশিয়াতেও তাই—"

কার্তিক অবাক হইয়া গেল।

"তুমি এখনও ইতিহাসের বই পড় চপলাদি?"

"ওই তো আমার একটি মাত্র নেশা। আমার লাইব্রেরিটা তোমাকে দেখাতে পারলে তুমি খুশি হতে—"

"কোথায় সেটা?"

"পাশের গাঁয়ে খেজুরেতে। ওইখানেই খান দুই ঘর নিয়ে থাকি আমি—"

"সেই জন্যেই বুঝি তোমায় খেজুরি বিবি বলে সবাই?"

চপলা মুচকি হাসিল। হঠাৎ কার্তিক সেই জিনিসটা দেখিতে পাইল যাহা এতক্ষণ তাহার দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল এবং যাহা পূর্বে সে বহুবার দেখিয়াছে। পুনরাবিষ্কার করিল যেন ওটাকে। চপলার গালে টোল পড়ে।

"তাহলে তোমার মতে আমার গোপালদেব হওয়ার স্বপ্নটা হাস্যকর নয়?"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাকে। যদি নিখুঁত হতে চাও তাহলে গোপালদেব হতে চেও না। কারণ গোপালদেব হতে হলে জনতার কৃপা-ভিক্ষা করতে হবে, নিখুঁত লোকেরা কারও কাছে কখনও ভিক্ষা করে না কিছু। এই জন্যে তারা প্রায় অজ্ঞাত অখ্যাত থেকে যায়। জনতার হাতে পুরস্কার পেতে হলে তদ্বির করতে হয়, তোষামোদ করতে হয়, অনেক সময় ঘুষ দিতে হয়, মুখোশ পরতে হয়— নিখুঁত লোকেরা তা পারে না। পৃথিবীর বড় বড় জননায়কদের ইতিহাস যদি পড় তাহলে তুমিও সেটা বুঝতে পারবে। তা বলে জননায়কেরা যে খেলো লোক তা বলছি না—রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাবান অভিনেতাদের মতো ওঁরা মানুষের মনে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে যুগকে যুগান্তরে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে নিখুঁত লোকেরা নমস্য। ম্যারাট (Marat), ড্যান্টন (Danton) নেপোলিয়ন, হিটলারের চেয়ে নির্দোষ নিখুঁত মানুষ সুরং আমার কাছে ঢের বড়। এখন বল তুমি কি হবে?"

এমনভাবে খেজুরি কথাগুলি বলিল যে কার্তিকের ভবিষ্যৎ তাহার হাতের মুঠোর মধ্যে। সে যাহা চাহিবে তাহাই দিবে তাহাকে।

কার্তিক বলিল—"আমি নিখুঁতও থাকতে চাই গোপালদেবও হতে চাই।"

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সেই বোবা চাকরটা উঁকি দিয়া হাততালি দিল।

"সুরং, তুমি ওঠ এবার। আমার খদ্দের এসেছে—"

"কিসের খদ্দের!"

"ব্যবসার, আবার কিসের?"

"কি ব্যবসা কর তুমি—"

যদিও সে ইহা আন্দাজ করিয়াছিল তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু খেজুরি বিবি ইহার উত্তর দিল না। বলিল, "কাছেই আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি সেখানেই তুমি যাও এই পিছনের দরজাটা দিয়ে। এদিকেও একটা দরজা আছে। সেখানে স্নানের ব্যবস্থা আছে, শোওয়ার ব্যবস্থাও আছে। রাখাল—"

একটি বিরাটকায় লোক পিছনের পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

"রাখাল এই বাবুকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ইনি আর ওঁর এক বন্ধু ওখানে থাকবেন রাত্রে। সব ব্যবস্থা করে দিও। ওঁদের একটা কুকুরও আছে —"

"আসুন।"

রাখাল কার্তিকের রং-মাখা মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। কার্তিক কিন্তু নড়িল না। রাখালকে বলিল, "তুমি বাইরে দাঁড়াও একটু, যাচ্ছি—"

রাখাল চলিয়া যাইতেই কার্তিক প্রশ্ন করিল আবার।

"তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাওনি। কিসের ব্যবসা কর তুমি—"

"দেহ বিক্রি করি—"

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কার্তিক।

খেজুরি বিবি মুখ টিপিয়া হাসিল আবার। আবার তাহার গালে টোল পড়িল।

"ঘেন্না হচ্ছে?—"

নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কার্তিক।

"ঘেন্না হওয়া স্বাভাবিক। কারণ ক'টা লোক সংস্কারমুক্ত। যারা প্রতিভা বিক্রি করে, যারা কর্মদক্ষতা বিক্রি করে, যারা অভিনয়-কৌশল বিক্রি করে, যারা গলার গান বিক্রি করে তাদের তোমরা সম্মান কর। কিন্তু যারা দেহ বিক্রি করে, এমন কি ওই শ্রমিকরা যারা নিজেদের দেহের পেশী নিংড়ে দিয়ে তোমাদের কামনার খোরাক সরবরাহ করে তাদের তোমরা ঘৃণা কর। এইটেই রেওয়াজ। সংসারে সবাই কামোন্মত্ত, অথচ যারা কামের উপকরণ—তারা তোমাদের কাছে অস্পৃশ্য। এটা আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু এই রেওয়াজ। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না—আমাকে যদি ঘৃণ্য মনে কর, জোর করে তোমাকে কাছে টানতে চাই না—"

বোবাটা দ্বারপ্রান্তে ঘন ঘন আবার হাততালি দিতে লাগিল। কার্তিক পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া ভাবিল খেজুরি বিবির বাসায় আর যাইবে না। রূঢ় সত্যটা শুনিয়া তাহার কেমন যেন গা-ঘিন-ঘিন করিতেছিল। কেনা-বেচা লইয়াই সংসারের হাটে নানা ব্যবসায় নানরূপে জমিয়া উঠিয়াছে তাহা ঠিক, কসাইয়ের দোকান বা মেছুনীর দোকান আমাদের জীবনযাত্রার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহাও ঠিক—তবু একটা কসাই বা মেছুনীর সহিত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করিতে মন কেন বিমুখ হইয়া ওঠে এই চুলচেরা তর্ক করিতেও তাহার

যেন প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল— কেবলই মনে হইতেছিল—মস্ত বড় একটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। যেন একটা বহুমূল্য রত্ন পাঁকের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে—যেন একটা চমৎকার ছবির গায়ে কে কালি ছিটকাইয়া দিয়াছে—যেন একটা চমৎকার ফুলকে— ।

"ওদিকে নয়, বাবু এদিকে—"

রাখালের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কার্তিক অবাস্তব স্বপ্নলোক হইতে রূঢ় বাস্তব লোকে নামিয়া আসিল।

"আমি ওখানে আর যাব না ভাবছি। আমাকে অন্য কোনও একটা জায়গা দেখিয়ে দিতে পার যেখানে রাতটা কাটাতে পারি?"

"এখন তাতো আর হয় না বাবু। মাকে সে কথা বললেই পারতেন। এখন আপনি ওই বাসাতেই চলুন। তিনি যে হুকুম আমাকে দিলেন তা আমাকে তামিল করতেই হবে। আসুন, আমার সঙ্গে—"

"আমি যদি না যাই কি করবে তুমি—"

"পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাব। একটা চীৎকার চেঁচামেচি হাঙ্গামা হবে। তা হোক, রাখাল তাতে ভয় পাবে না—"

রাখালের বিরাট বলিষ্ঠ চেহারার দিকে চাহিয়া এবং তাহার স্থির গম্ভীর উত্তেজনাহীন্ কথাগুলি শুনিয়া কার্তিক অনুভব করিল তাহাকে যাইতেই হইবে। এই মেলার মাঝখানে এই অসুরের সহিত ধস্তাধস্তি করাটা নিষ্ফল। অশোভনও বটে।

"বেশ চল তাহলে—। কিন্তু আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যখন জেদ করছ, চল।"

রাখাল এ কথার কোনও উত্তর দিল না। কার্তিক তাহার অনুসরণ করিল, কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যাইতে লাগিল তাহার। ক্ষোভে ধিক্কারে সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। দ্বিতল বাসাটিতে রাখাল যে ঘরে তাহাকে লইয়া গেল সেটি সুসজ্জিত। খাট বিছানা কাপড়ের আলনা আয়না গামছা তোয়ালে সব আছে।

"পাশেই চানের ঘর। টবে জল ভরা আছে।"

"আমার বন্ধু আন্টা পুকুরে স্নান করতে গেছে, তার সঙ্গে আমার কুকুরটাও আছে—"

"দেখছি তাদের। আপনি চান টান সেরে পরিষ্কার হয়ে নিন। খাবারও আনছি।"

রাখাল চলিয়া গেল।

কার্তিক স্নানাহারের পর বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আন্টা এবং লর্ডও নীচের একটা ঘরে ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কার্তিকের ঘুম ভাঙিয়া গেল হঠাৎ। বিছানায় উঠিয়া বসিল সে। দেখিল মাথার শিয়রে টেবিলের উপর একটা বাতি কমানো আছে। চপলা ফিরিয়াছে কি? কাহারও সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাইতেছে না। হঠাৎ একটা হাওয়া উঠিল। একটা জানলার পরদা সেই স্বল্পান্ধকারে ধীরে ধীরে নড়িতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল একটা প্রেত যেন। তাহারই অতীত জীবনের প্রেত। অনেকক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল সেদিকে। তাহার পর টেবিলের আলোটা বাড়াইয়া দিল। প্রেত একটা রঙীন ছিটে রূপান্তরিত হইল, আবার একবার

শুইয়া পড়িল সে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল। ঘুম কিন্তু আর আসিল না। চোখের সম্মুখে চপলার মুখটাই বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চপলাদি মেছুনীদের দলে? হঠাৎ ডিকেন্সের 'এ টেল অব্ টু সিটিজ্' (A tale of Two Cities) পুস্তকের মাদাম ডিফারজ্ (Madam Defarge) চরিত্রটি তাহার মনে পড়িল। সে-ও মেছুনী ছিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িল ডাস্টবিন হইতে কুড়াইয়া পাওয়া সেই উপন্যাসটার কথা। উঠিয়া ঝুলি হইতে সেটা বাহির করিয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

।। ২।।

"পাগলা-গারদে বন্দী গোপালদেব দিবা-স্বপ্নে মগ্ন হইয়াছিলেন। বস্তুত এই স্বপ্নলোকেই যেন মুক্তি পাইয়াছিলেন তিনি।

সূত্রধার পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"ওই দেখুন সেই পাহাড়টি, ওই দেখুন সেই বাণীমন্দির যার উদ্দেশ্যে অনলস আর অরূপ যাত্রা করেছিলেন, যার উদ্দেশ্যে নিত্যকালের অনলস আর অরূপরা যাত্রা করেছেন যুগ যুগ ধরে, যেখান থেকে বারংবার নানারূপে রূপান্তরিত হয়ে তাঁরা সত্য-শিব-সুন্দরের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—।"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

গোপালদেব জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ওই আকাশপটেই তাঁহার স্বপ্ন মূর্ত হইয়া ওঠে। ইতিহাসের স্বপ্ন, তাঁহার বিক্ষত মর্মের স্বপ্ন।

সেই পাহাড়টি আবার দেখা গেল। সেই শুভ্র বাণীমন্দিরটিও। দেখিলেন সেই মন্দির হইতে একজন দিব্যকান্তি পুরুষ বাহির হইলেন, তাঁহার পিছু পিছু একটি তন্বী সুন্দরী যুবতী নারী। যুবতীর মুখে সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি। তাহাতে যেন একটু অপ্রতিভ ভাবও ফুটিয়াছে, একটু কৌতুকও।

পুরুষটির দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"মহারাণীর ইচ্ছায় অরূপ হয়ে গেল মোহিনী নারী, আর তুমি অনলস হয়ে গেলে অমিতবীর্য ক্ষত্রিয় রাজকুমার। হয়তো স্বপ্নের সঙ্গে কর্মের মিলন এবার অনিবার্য হয়ে উঠল। তুমি যদি ঝড়ের মতো ছুটে যেতে চাও আমি হব সে ঝড়ের বেগ।"

পুরুষ-বেশী অনলস হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তাই তো আমার কামনা। তবে একটা ভয় জাগছে মনে। তোমার মতো রূপসী মোহের মোহন শৃঙ্খলেও আমাকে বেঁধে ফেলতে পারে। অনুরোধ করছি, তা যেন কখনও কোরো না।"

"মোহ সব সময়ে শৃঙ্খল হয় না। মোহও মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। যশের মোহ, সাফল্যের মোহ, অসম্ভবকে সম্ভব করবার মোহ—এ সবও মোহ, কিন্তু এসব মোহ অনেক সময় কল্যাণকর। যে মোহ কল্যাণকর নয় তা দগ্ধ করবার ক্ষমতা মহারাণী আমাকে দিয়েছেন।..."

সহসা সেই তন্বী রূপসী অগ্নিশিখাবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দূরে বাজিয়া উঠিল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ঢোল। পাহাড় এবং মন্দির অন্তর্হিত হইল। দেখা গেল একটা বিরাট পথ বিসর্পিত রেখায় প্রান্তর ভেদ করিয়া দূরবর্তী একটা অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পথ ধরিয়া

শোভাযাত্রা চলিয়াছে একটা। নানাবর্ণের পতাকায় সে শোভাযাত্রা সুশোভিত। প্রতি পতাকায় ফুলের মালা দুলিতেছে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে একজন বিরাটকায় ব্যক্তি একটি বিশাল তাম্রকলস মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাম্রকলসের মুখে আম্রপল্লব। পাশাপাশি দুইটি তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ ও সেই তন্বী সুন্দরী মন্থরগতিতে চলিয়াছে। দিব্যকান্তি পুরুষের মস্তকে গৈরিক উষ্ণীষ, পরিধানে রাজোচিত বসন ভূষণ। কোমর হইতে কোষনিবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছে, বাম স্কন্ধ হইতে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে একটি তুরী। তিনি বাম হস্তে অশ্বের বল্গা ধরিয়া আছেন, দক্ষিণ হস্তে শোভা পাইতেছে গণ্ডার-চর্মনির্মিত পিত্তল-কারুকার্যময় একটি ঢাল। তাঁহার দৃষ্টি দূর অরণ্যে নিবদ্ধ। তাঁহার সঙ্গিনীও রণসজ্জায় সজ্জিতা। তাঁহারও কোমর হইতে একটি কোষনিবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছে, পৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে শরপূর্ণ তূণ ও ধেনু। মুখে অবগুণ্ঠন নাই। অঙ্গবস্ত্রেও কোন শিথিলতা নাই, রক্তবর্ণ অঙ্গচ্ছদ যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। তাঁহারও দৃষ্টি দূর অরণ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু সে দৃষ্টি স্বপ্নময়।

সূত্রধর প্রবেশ করিলেন।

নমস্কারান্তে বলিলেন—"সৃষ্টির চিরন্তন প্রেরণা বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন অনলস আর অরূপ যুগল মূর্তির অনবদ্য মহিমা বিকিরণ করে। ওই অরণ্য তাঁদের কর্মভূমি। ওই অরণ্য কেটে আদর্শ নগর বসাবেন তাঁরা। অরণ্যের প্রান্তভূমিতে যজ্ঞ হবে। মহাকাল স্বয়ং ওই তাম্রকলসে যজ্ঞের হবিঃ বহন করছেন। ওই অরণ্যে নররাক্ষসেরা বাস করে, আর বাস করে তাদের বাধ্য হিংস্র পশুর দল। ওদের অত্যাচারে সন্নিহিত সভ্য জনপদবাসীরা সন্ত্রস্ত, জর্জরিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন কর্মঠ বীরপুরুষ অনলস আর তাঁকে প্রেরণা যোগাচ্ছেন নারী-রূপিণী অরূপ। তিনিই অনলসের শক্তির উৎস। ইতিহাসে কি তাঁদের নাম আছে? জানি না। ইতিহাসের কথা ইতিহাসের কাছেই শুনুন।"

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন। অরণ্যও দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। শোভাযাত্রাও নিশ্চিহ্ন হইল। দেখা গেল এক প্রস্তর মঞ্চের উপর একজন সৌম্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার হস্তে এক গোছা ভূর্জপত্র। ভূর্জপত্র হইতে তিনি পড়িতে লাগিলেন—

"সব দেশের অতীত ইতিহাসের মতো বাংলা দেশের অতীত ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অরণ্যের সহিত ইহার তুলনা করা চলে, হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু মানুষের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বাংলাদেশে মনুষ্যদেরই বসবাস ছিল। তখন এদেশে যে মনুষ্যরা বাস করিত তাহাদের মধ্যে হয়তো পশু-প্রকৃতির অত্যাচারী লোকের অসদ্ভাব ছিল না, কিন্তু অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসে আমরা প্রমাণ পাই সে যুগে সভ্য মানুষও বাস করিত। সম্ভবত নানা দেশের সভ্যতার সংঘর্ষে নানাদেশের মানুষের সংস্পর্শে অতি প্রাচীন বাংলা দেশেও একটা সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে সভ্যতার যাহারা ধারক ও বাহক ছিল তাহারা অবশ্য আর্য নহে। আর্যরা বহুদিন পরে বহু কষ্টে বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এখন আমরা যাহাদের অন্ত্যজ জাতি বলি— কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, বাগদী, চামার, চণ্ডাল প্রভৃতি—ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বাংলা দেশের আদিবাসী। বৈজ্ঞানিকগণ এই মানবগোষ্ঠীকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক আখ্যা দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাদের নিষাদ জাতিও বলিয়াছেন। এই নিষাদরা প্রধানত কৃষিজীবী

ছিল। তাহারা নব্যপ্রস্তর যুগের লোক। কিন্তু তাহারা তাম্র ও লৌহের ব্যবহার জানিত। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে তাহারা ধান চাষ করিত। পান সুপারির ব্যবহার জানিত তাহারা। অনেকের মতে কলার চাষও তাহারা করিত। শুধু কলা নয়, তাহারা নানারকম সবজিও ফলাইত। তাহারা গরু চরাইত না, গরুর দুধও পান করিত না। কিন্তু মুরগী পুষিত, হাতীকে পোষ মানাইতে পারিত। কুড়ি হিসাবে হিসাব করিতেও তাহারা জানিত। তাহারাই সম্ভবত চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তিথি মাস এদেশে প্রচলিত করে। ইহাদের সহিত পরে দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী ও আলপাইন শ্রেণীভুক্ত এক জাতি আসিয়া মিলিত হয়। কেহ কহে বলেন খর্বাকৃতি নিগ্রোবটু জাতিও আসিয়া এদেশের আদিবাসীদের সহিত মিশিয়াছিল। মোট কথা বহু জাতির সম্মেলনেই বাঙালী জাতির সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই ইতিহাস এই। অবিমিশ্র কোন 'বিশুদ্ধ' জাতি ধরাপৃষ্ঠে নাই। এ কথা স্মরণযোগ্য যে এই বাঙালী জাতি অসভ্য ছিল না। আর্যধর্মের সহিত তাহাদের ধর্মের মিল ছিল না, কিন্তু তবু তাহাদের অধার্মিক বলিব না। তাহাদের একটা নিজস্ব ধর্ম ছিল। তাহারা শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর আরাধনা করিত। বৃক্ষ প্রস্তর পর্বত অরণ্যও তাহাদের আরাধ্য ছিল। অনেক পশু-পক্ষীকেও তাহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। তাহাদের পুরাণ ছিল, ব্রত-আচার ছিল। বিবাহ ক্রিয়ায় তাহারা হলুদ এবং সিন্দূর ব্যবহার করিত। শিল্প-প্রতিভাও ছিল তাহাদের। নৌকা-নির্মাণে নিপুণ ছিল তাহারা। তাহারাই যে ধুতি শাড়ি এবং অন্যান্য পরিচ্ছদের উদ্ভাবক একথাও অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আর্যরা বাংলা দেশে আসেন। বাংলা দেশ জয় করিয়া আর্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর্যদের সহিত তদানীন্তন বঙ্গদেশবাসীর যে সব সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কোথাও নাই। আর্যদের লিখিত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা আমরা পাঠ করি তাহা হইতে এইটুকু শুধু অনুমান করা যায় যে আর্যগণ আদিম বঙ্গ বাসীদের সুচক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যে পুরাণে বঙ্গবাসীদের বর্বর, পাপাশয়, রাক্ষস, পক্ষী প্রভৃতি নিন্দাসূচক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সভ্য ছিলেন, বর্বর বা রাক্ষস ছিলেন না। অবশ্য ইহাও সত্য তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আর্যদের নানাভাবে বিব্রতও করিতেন। আর্যগণ বঙ্গদেশে অবশেষে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয় যাহাদের তাঁহারা অনার্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় নাই। তাহাদের বৈশিষ্ট্য বারম্বার আর্যসভ্যতার উপর নিজেদের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যে পরিণতি সহজিয়া ধর্মে মূর্ত হইয়াছিল তাহা মনে হয় এইরূপ একটি ছাপ। বাগদী রাজা লুইপাদ, ডোম্বিনী প্রভৃতির প্রভাব সাহিত্যে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। হিন্দু দেবদেবী প্রতিমার ভিতর বাহন রূপে পশু-পক্ষীর পূজাও সম্ভবত 'অনার্য' প্রভাব। বিল্ব, বট, তমাল, অশোক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষও আর্য হিন্দুদের নিকট পবিত্র। তুলসী গাছ হিন্দুদের ঘরে ঘরে। 'মানত' করা মাদুলী পরা তুকতাকে বিশ্বাস করা—এ সবই সম্ভবত সেই আদিবাসীদের ধর্মের অঙ্গ। বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্বে গোপালদেব বিখ্যাত নাম। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি মাৎস্যন্যায়ের যুগে সর্বসম্মতিক্রমে গণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কি আর্য ছিলেন? তাঁহার পিতার নাম ছিল বপ্যট, স্ত্রীর নাম ছিল দেদ্দা। এই নাম দুইটি কিন্তু বিশুদ্ধ আর্য নাম বলিয়া মনে হয় না। গোপালদেব বৌদ্ধ ছিলেন। সে যুগে যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই অনার্য ছিলেন। এই বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপটা জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা তাহার 'সহজিয়া' রূপ। কেহ কেহ বলেন গোপালদেব ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিলেন। বৌদ্ধ ছিলেন অথচ ক্ষত্রিয় সৈনিক ছিলেন—কথাটা কেমন যেন গোলমেলে শোনায়। অথচ তিনি আবার এতটা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে সর্বসম্মতিক্রমে সকলে তাঁহাকে গণতন্ত্রের নেতারূপেও নির্বাচিত করিয়াছিল। এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কি? যদি মনে করা যায় যে যোদ্ধা হইলেও তিনি আদি বঙ্গবাসীদেরই বংশধর ছিলেন এবং সহজিয়া মতের বৌদ্ধ ছিলেন তাহা হইলে কিছুটা বোধগম্য হয়। ইহা হওয়া অসম্ভব নহে। ইতিহাসে ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। গোপালদেবের গোপাল নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বা রাখালের কোনও সম্পর্ক ছিল কি? ইতিহাসে বলে, আদি বঙ্গদেশ-বাসীরা গরু চরাইত না, গরুর দুধ খাইত না। হয়তো অতি প্রাচীনকালে ইহা সত্য ছিল, কিন্তু গরুর মতো একটি উপকারী জীবকে কৃষিজীবী বাঙালী আদিবাসীরা যে বেশী দিন উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল এ কথা অবিশ্বাস্য। সুতরাং, অনার্য হওয়া সত্ত্বেও গোপালদেবের 'গোপাল' নাম হয়তো অস্বাভাবিক নহে। অনার্যেরা বিষ্ণুর পূজা করিত (বিষ্ণু কৃষ্ণেরই নামান্তর) তাহা ইতিহাসে লেখা আছে। গোপালদেবের পিতামহের নাম ছিল 'দয়িতবিষ্ণু' তিনি সর্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ ছিলেন। বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহাদের আদিনিবাস ছিল, কিন্তু তাঁহারা আর্য ছিলেন, না অনার্য ছিলেন এ বিষয়ে ইতিহাস স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলে না। আর, একটা প্রশ্ন মনে জাগে। গোপালদেবের কৌলিক উপাধি কি? দেব? তাঁহার পিতা বা পিতামহের নামের শেষে দেব উপাধি দেখা যায় না। গোপালদেব যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে পালসাম্রাজ্য নামে খ্যাত। 'পাল' উপাধি দেখিয়াও সন্দেহ হয় গোপালদেব সম্ভবত অনার্যই ছিলেন। এ সমস্তই অবশ্য অনুমান। গোপালদেবের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নিঃসংশয়ে জানা যায় না, ইহাই সত্য কথা। আমি যে কথা বলিবার জন্য এই ভূমিকা করিলাম তাহা এই যে আদিম বঙ্গবাসীরা—যাহাদের আর্যগণ বর্বর পক্ষী রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন—তাহারা কখনই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নাই। নানাভাবে তাহারা ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হয়তো গোপালদেব যে পাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা রূপান্তরিত অনার্যদেরই সাম্রাজ্য। এরূপ ঘটনা ইতিহাসে বারংবার ঘটিয়াছে। অতি আধুনিক যুগের ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ আছে। 'আউল''বাউল' সম্প্রদায়, সুফীগণ, দাদু-কবীর-নানকপন্থীরা কেহই আর্য ধর্ম অনুসরণ করে না—তাহারা যে ধর্ম অনুসরণ করে তাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত 'মরমিয়ার' পথ, যে পথে গুরুই পথপ্রদর্শক—হয়তো তাহা সেই পথ যে পথে আদিম বঙ্গবাসীরা একদা চলিত—যাহা তন্ত্রে শাক্তপূজায়, বৈষ্ণব লীলায় নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া সমাজে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, জাতিভেদের মূলে তাহারা এখনও কুঠারঘাত করিয়া চলিয়াছে, যাহার বাহিরের চেহারা হয়তো আধুনিক কিন্তু আসলে যাহারা আদিম। ইংরেজের আমলেও এ ঘটনা ঘটিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে জাতিভেদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার যে উদ্যম দেখা গিয়াছিল তাহার মধ্যেই অবহেলিত ঘৃণিত 'একঘরে' অনার্যদের পুনরভ্যুদয় আভাস পাওয়া যায়। অসবর্ণ বিবাহ আইনত স্বীকৃত হইবার পর এবং ইংরেজী আমলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অর্থকৌলীন্যই সমাজে প্রাধান্য লাভ করিলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল। তথাকথিত নীচুবংশীয়া কন্যারা উচ্চ কুলীন বংশের কুলবধূরূপে স্বীকৃত হইতে

লাগিলেন। অর্থাৎ তথাকথিত অনার্যদের বন্যায় আবার চতুর্দিক ভাসিয়া গেল এবং অনেকের ঘরেই সে বানের জল ঢুকিল। এখনও ঢুকিতেছে । ইহা রোধ করিবার উপায় নাই। সম্ভবত রোধ করিবার চেষ্টা নিরর্থকও। কারণ হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ অতি উচ্চ। তাহা ক্ষুদ্র ভেদাভেদ লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহার সাধনা প্রেমের সাধনা, যে প্রেম মৃন্ময়ীর মধ্যেও চিন্ময়ীকে প্রত্যক্ষ করে, যে সাধনার সিদ্ধি ভগবান লাভে। ভগবান লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, যে কোনও ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়া ভগবান লাভ করা যায়। কেহই ছোট নয়, কারণ সকলেই ভগবানের অংশ, সকলেই অন্তরনিবাসী আত্মা নিষ্কলুষ—এই যদি হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয় তাহা হইলে আর্য অনার্য, নীচ উচ্চ এসব বিচার নিরর্থক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যদি এ যুগের অবতার বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে মানিতে হইবে যে তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্বকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়াছেন, কোন বিশেষ জাতি বা ধর্ম্মমতকে নহে। আমি অরণ্যের কথা লইয়া প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলাম, অরণ্যের কথা দিয়াই শেষ করি। অরণ্য আমাদের চতুর্দিকে এখনও আছে। সে অরণ্য তামসিকতার অরণ্য। সে অরণ্যের বিবরণ আপনারা কবির নিকট শুনিবেন। কবি আসিতেছেন। আমি চলিলাম—"

ইতিহাস অর্ন্তহিত হইলেন। তাঁহার প্রস্তর-আসনও মেঘের মতো মিলাইয়া গেল। গোপালদেব দেখিলেন শুভ্র একটি মেঘের নৌকায় কবি আসিতেছেন। গোপালদেবের মনে হইল অসম্ভব সম্ভব হইতেছে, স্বপ্ন বাস্তবের রূপ ধরিতেছে। আভিজাত্যের পর্বতশিখরে যে গজদন্ত-নির্মিত প্রাসাদে তিনি বাস করিয়াছেন সেই পর্বত এবং প্রাসাদও মেঘের মতো উড়িয়া যাইতেছে যেন।

আপাতদৃষ্টিতে কবি তরুণ নহেন, বৃদ্ধ। তাঁহার শুভ্র দাড়ি, শুভ্র চুল। মুখে কিন্তু জরার চিহ্ন নাই। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও স্বপ্নময়। মুখ-ভাবে তারুণ্যের দীপ্তির সহিত বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার একটা অপূর্ব মণি-কাঞ্চন সমন্বয় হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে কবির চারিদিকে মহীরুহ-সমাকীর্ণ এক বিশাল অরণ্য মূর্ত হইয়া উঠিল। মহীরুহ একরকম নহে। কোনটা শ্যামপত্রাচ্ছাদিত, কোনটা ফুল-ফল সমন্বিত, কোনটা অর্ধমৃত, কোনটা একেবারে মরিয়া গিয়াছে, কঙ্কালটা দাঁড়াইয়া আছে কেবল। মৃত কঙ্কালের সংখ্যাও কম নহে। ছোটবড় নানা আকারের প্রস্তরও রহিয়াছে নানা রকম। দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া শ্বাপদ পশুরা চীৎকার করিতেছে। তৃণভোজী ভীরু মেষমৃগেরা দলে দলে প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কীট পতঙ্গ, নানারূপ বিচিত্র-পক্ষ পক্ষীরও অভাব নাই সে অরণ্যে। তাহারাও পরস্পরকে শিকার করিতে ব্যগ্র। সকলেই সকলের শত্রু। অরণ্যে মনুষ্য নাই। সেই মনুষ্যশূন্য অরণ্যে একটা শঙ্কা যেন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। একটা অন্ধকার যেন চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

কবি কথা কহিলেন। মনে হইল বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

"আমি যা দেখছি, আমি যা অনুভব করছি, যে সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি আকুল হয়ে আছি তাই আমি শুধু বলব। চারিদিকে এই যে অরণ্য দেখেছেন, আপাতদৃষ্টিতে এরা অরণ্য মনে হলেও আসলে এটা অরণ্য নয়। এ বিরাট একটা মনুষ্যসমাজ। রূপকথায় শুনেছিলাম যক্ষিণীর প্রভাবে মানুষেরা নাকি পাথরে গাছে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে ছিল। এখানেও তেমনি এক যক্ষিণীর প্রভাব অনুভব করছি আমি। এক যক্ষিণীই বিরাট মনুষ্যসমাজকে বিরাট অরণ্যে পরিণত করেছে। অরণ্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও এই অরণ্যে নেই, কারণ এ অরণ্য স্বাভাবিক অরণ্য নয়। যক্ষিণীর

মায়া-কৌশলে এর রূপ স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারেনি। যক্ষিণীর নাম তামসিকতা। তারই প্রভাবে জীবন্ত মনুষ্যসমাজ ম্রিয়মাণ অরণ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে একদা এর অতীত উজ্জ্বল ছিল। সমস্ত জগৎ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন এইখানেই জ্ঞানের দীপ জ্বলেছিল একদিন। আবার সমস্ত জগতে অন্ধকার নামছে আবার জ্ঞানের জ্বলবে এখানে। আমি জানি এর ভবিষ্যতও সমুজ্জ্বল কিন্তু সে ভবিষ্যতকে সমুজ্জ্বল করবেন কে? যিনি করবেন তিনি আসবেন উর্ধ্বলোক থেকে। তিনি আবির্ভূত হবেন। পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে যে স্বচ্ছ নির্মল আকাশ আছে, যে আকাশে নক্ষত্রের আলো স্পন্দিত হয়, নীহারিকার স্বপ্ন দেখে, সেই আকাশেই তিনি আছেন, সেখান থেকেই তিনি আসবেন। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভই যুগে যুগে অবতরণ করেন সেখান থেকে নানা রূপে, সেই চিরন্তন স্বপ্নের বাস্তব মূর্তি ধারণ করে নিজেকে বিকশিত করেন মানবসমাজে, যে স্বপ্নের বাঙ্ময়রূপ 'সত্যমেব জয়তে'। সত্য-শিব-সুন্দরকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই তিনি আসেন। নানা চিত্র আছে তাঁর পুরাণে ইতিহাসে। কখনও শ্রীরামচন্দ্ররূপে তিনি রাক্ষসনিধন করছেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে উৎসাহিত করেছেন অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে অগ্রসর হবার জন্য, কখনও আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রীচৈতন্যরূপে, তিনিই শঙ্কররূপে অদ্বৈতবাদের শাণিত তরবারি হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অধঃপতিত বৌদ্ধদের সঙ্গে। কাব্যে ও ইতিহাসে তাঁর অনেক রূপ, অনেক ছবি। বাইরের দিক থেকে দেখলে সে ছবিগুলি বিভিন্ন, একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। রাজা গোপালদেবের জীবন-চরিতের সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিতের ঘটনাগত মিল নেই, অগ্নিযুগের যে বীরেরা স্বাধীনতার জন্য কারাগারে, ফাঁসিকাঠে, দ্বীপান্তরে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন তাদেরও বাইরের চরিত্র-চেহারা সব আলাদা আলাদা। কিন্তু তাদের স্তরের দিকে কান পেতে শুনুন—সকলেই সেই এক মন্ত্র জপ করছে, সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি জানি এই মহাঅরণ্যেও সত্য-শিব-সুন্দর আবার প্রতিষ্ঠিত হবেন। যে দেশের অতীত এত মহান যে দেশের মাটিতে যুগে যুগে মহাপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেছেন—এই সেদিনও যে দেশের মাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের উদ্ভব হয়েছিল, যে দেশে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছেন, শহীদরা প্রাণ দিয়েছেন সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। আলো আসবে। এই অরণ্য তখন সভ্য মানবসমাজে রূপান্তরিত হবে। এই অরণ্যের অন্তরালে মনুষ্যত্ব চাপা আছে, সে আচ্ছাদন একদিন সরে যাবে। এই যে পুষ্পসমন্বিত বিরাট মহীরূহ দেখছ, এ গাছ নয়, এ মানুষ। তামসিকতা-যক্ষিণীর প্রভাবে ওর এই দশা হয়েছে। কিছু ফুল ফোটাচ্ছে, কিছু ফলও ফলাচ্ছে, কিন্তু চিরকালই একরকম ফলাচ্ছে। বৈচিত্র্য নেই। বৈচিত্র্যহীনতা মৃত্যুর নামান্তর। তাছাড়া এরা এক স্থানেই প্রোথিত হয়ে আছে, নড়ছে না। তা-ও একরকম মৃত্যু। এদের শেষ পরিণতি ওই দেখ। অতীতের কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোনও গাছে আর প্রাণ নেই, আর ফুল ফুটছে না, ফল ফলছে না, পাতাও শুকিয়ে গেছে, ওদের ডালে ডালে নব কিশলয় উৎসব আর জাগে না। আলো যখন আসবে, যক্ষিণী যখন অপসারিত হবে তখন এরাও নবজীবন লাভ করবে। পূর্ণ মানুষ সৃষ্টিকর্তা, সে নিত্যনূতন সৃষ্টি করে, সে প্রগতিশীল, এক জায়গায় অনড় হয়ে থাকে না, সে চলে, এগিয়ে যায়। এরাও মানুষ হবে. এদের নব নব কীর্তি নিত্যনূতন বৈচিত্র্যে জগতকে আবার মুগ্ধ করবে। ওই যে ক্ষুদ্র বৃহৎ পাথরগুলি দেখছ, ওরাও পাথর নয়, ওরাও মানুষ,

তামসিকার চরম প্রভাব ওদের প্রস্তরে পরিণত করেছে। ওরা অনড়, অচল, মূক, বধির হয়ে গেছে। ওরা রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়, হিমানীপাতে শীতল হয়, ঝঞ্ঝার তাণ্ডব ওদের উপর দিয়ে বয়ে যায়, ওদের উপর ধুলো জমে, মরা পাতার শবস্তূপে ওরা ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু তবু ওরা বিচলিত হয় না, প্রতিবাদ করে না। ওরা নির্বিকার মহাপুরুষ নয়. ওরা সমাধিস্থ যোগীও নয়, ওরা মৃত, প্রাণস্পন্দনহীন। ওরা স্থানু কিন্তু শিব নয়। ওরাও মানুষ হবে একদিন, ওরাও জাগবে। কল্পনা কর, এতগুলি প্রস্তর যদি মানুষ হয়, আর তাদের দৃঢ়তা যদি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সে কি অপরূপ রূপান্তর হবে। ভবিষ্যতে অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের সঙ্গে সত্য শিব ও সুন্দরের যখন যুদ্ধ হবে—হবেই, যুগে যুগে হয়েছে,—তখন এরাই হবে সে যুদ্ধের দৃঢ়চিত্ত সৈনিক। আর ওই যে শ্বাপদেরা গর্জন করছে ওরা পাথরের চেয়ে উন্নত বটে, কিন্তু ওরাও তামসিকতার আর এক প্রকাশ। ওদের মধ্যে কেবল সামান্য কিছু রাজসিকতা জেগেছে, যে রাজসিকতার লক্ষ্য আত্মসুখভোগ। নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ, নিজের ক্ষুধা-পিপাসাই এখন ওদের জীবনের নিয়ামক। তার বাইরে ওরা আর সব কিছুকে নিরর্থক বলে মনে করে। ওরাও মানুষ হবে, ওরা মানুষ হলে ভোগী বীর হবে. বীর্যবলে বসুন্ধরাকে ভোগ করবে ওরা, আর ওরাই হবে সেই আদর্শ ক্ষেত্র যেখানে আধ্যাত্মিকতার বীজ পড়লে ভালো ফসল ফলবে। ওদের মধ্যেই জন্মাবে রাজা জনক। সবই হবে যক্ষিণী তামসিকতার প্রভাবমুক্ত হলে। যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে এই অনিবার্য ঘটনা ঘটবে তাঁর স্বরূপ কেমন হবে তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? কল্পনার ভাণ্ডারে অনেক রং, সে রং দিয়ে আমি অনেক রকম ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু সে ছবি যে ভবিষ্যৎ-যুগের ত্রাতার ছবি হবেই এমন ভরসা দিতে পারি না। নিখিল বিশ্বের কবি মহাস্রষ্টার চিত্রশালায় সে ছবি আঁকা হচ্ছে। তিনি নিজেকেই প্রকাশ করবেন একদিন অভিনব শিল্পশৈলীর মাধ্যমে। অবতীর্ণ হবেন যথাসময়ে। পুরাণে পড়েছি, দশ যুগে দশ অবতার হয়েছিলেন। কূর্ম বা বরাহ অবতারের সঙ্গে বুদ্ধ অবতারের কিছুমাত্র মিল নেই। কোনও অবতারের সঙ্গে কোনও অবতারের সাদৃশ্য থাকলেই সেটা বিস্ময়ের কারণ হত, মহাকবি পরমেশ্বরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের নিপুণতায় সন্দেহের ছায়া পড়ত। তাঁর বিশাল চিত্রশালায় প্রত্যেকটি ছবিই অনন্য, তাঁর বিরাট কাব্যে একরকম সুর দুবার বাজে নি। তাই এটা আশা করা অসঙ্গত নয়, ভবিষ্যতে যিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হবেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো হবেন না। আলাদা কিছু হবেন। তুমি গোপালদেবের কথা ভাবছিলে, কিন্তু এটা ঠিক, তিনি গোপালদেবের দ্বিতীয় সংস্করণ হবেন না। ভগবানের সৃষ্টিতে পুনরাবৃত্তি নেই। দুটি যমজের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় তিনি প্রাণবন্ত প্রেমিক হবেন। প্রেম দিয়েই অধঃপতিতকে উদ্ধার করা যায়। অবতাররা যুগে যুগে তাই করেছেন, ভবিষ্যতে যিনি আসবেন তাঁকেও তাই করতে হবে। তিনিও কোনও পাপকে ঘৃণা করবেন না, কোনও অন্যায়ের সঙ্গেও আপোষ করবেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারবেন সব কার্যেরই কারণ আছে, সব অন্যায়েরও কারণ আছে, সব পাপের জন্য পাপীরা দায়ী নয়, দায়ী পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং পরিবেশ। তাঁর স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিতে এসবই প্রতিভাত হবে, তাঁর বিচারের নিকষে আসল সোনা চেনা যাবে, তাঁর প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে অনেক লোহা সোনা হয়ে যাবে। সর্বযুগের নেতাদের চরিত্রের এসব গুণ ছিল ভবিষ্যৎ নেতার চরিত্রেও এসব গুণ থাকবে, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটবে অভিনব উপায়ে, সেইখানেই দেখা যাবে

সৃষ্টিকর্তার অনন্যতা। আরও গুণ থাকবে সে নেতার। তিনি তেজস্বী হবেন, বীর্যবান হবেন, বলবান হবেন, ওজস্বী হবেন, অন্যায়দ্রোহী হবেন, সহনশীল হবেন। বাজসনেয় সংহিতার প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা ভগবান পূর্ণ করবেন সেই অনাগত নেতার চরিত্রে, বিগত নেতাদের চরিত্রে যেমন করেছিলেন। বলাবাহুল্য এসবেতেই অনন্যতা থাকবে। একটি কথা কিন্তু বিশেষভাবে বলতে চাই। বাজসনেয় সংহিতার ঋষি যে প্রার্থনাটি ভগবানকে জানিয়েছিলেন তার শেষ কথা হচ্ছে, 'সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি'। তুমি সহ্যশক্তি স্বরূপ, আমাকেও সেই সহ্যশক্তির উপর স্থাপন কর। অবতারদের বা নেতাদের এই সহ্যশক্তি অফুরন্ত থাকা চাই। তরুর মতো সহিষ্ণু হতে হবে তাঁকে, তবেই সিদ্ধির পুষ্প ফুটবে তাঁর জীবনে। সে পুষ্পও হযতো লোকে ছিঁড়ে নেবে, তবু স্থির হয়ে থাকতে হবে, তবে আর একটি পুষ্প ফুটবে। স্থির হয়ে অপেক্ষা করলেই ফুল ফোটে। আমি কল্পনানেত্রে দেখতে পাচ্ছি, অবর্ণনীয় বর্ণসমারোহে আকাশগঙ্গার জ্যোতির্ময় সম্ভাবনা-স্রোতে আগামী যুগের নায়ককে রূপায়িত করছেন মহাশিল্পী সৃষ্টিকর্তা, তাঁর উপাদান সনাতন, কিন্তু প্রকাশ হবে অভিনব। চিরন্তন স্বপ্নই নূতন নায়কের চক্ষে লাগাবে নূতন অঞ্জন, নূতন সুর তাঁর কণ্ঠে বাজবে যা অতীতেও দুঃখীর দুঃখে কেঁদেছে আর উদাত্ত সুরে বলেছে উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত।...

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল।

কবি অন্তর্হিত হইলেন।

সিভিল সার্জন আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"কেমন আছ গোপাল?"

"ভালোই আছি। স্বপ্ন দেখছি নানারকম—"

"কিসের স্বপ্ন?"

"নানারকম স্বপ্ন। আমার বিদ্যা বুদ্ধি কল্পনা স্বপ্নরূপে দেখা দিচ্ছে এসে।

সারাজীবন ধরে যে ছবিটা এঁকেছিলাম বর্তমান যুগের ঝোড়ো হাওয়ায় সেটা ছিঁড়ে গেল। নতুন আর একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছি মনে মনে—"

তাহার পর সহসা থামিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, আমাকে তুমি কি পাগল মনে কর—"

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—"মানুষমাত্রেই একটু আধটু পাগল। কম বেশী ছিট সকলেরই আছে। আর আছে বলেই মানুষ এত সুন্দর। যাদের মধ্যে কোন পাগলামি নেই তাদের স্বাদগন্ধ বৈচিত্র্য কিছুই নেই, তারা পশুর মতো। তোমার পাগলামির জন্যে তোমাকে ভালোবাসি।"

"প্রমাণ তো পাচ্ছি না। পাগলা গারদে এনে আটকে রেখেছ।"

"তুমি রেগে মেগে যা কাণ্ড করেছিলে। আমি টেম্পরারী ইনস্যানিটি বলে একটা ভালো ঘরে এখানে তোমাকে রেখেছি, তা নাহলে তোমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে রাখত। মকোর্দমা হত, নানা কাণ্ড হত। তোমার স্ত্রী নালিশ করলে জটিল মকোর্দমা হতে পারত, কিন্তু তিনি নালিশ করবেন না। তুমি তাঁকে চিনতে পেরেছ কি না জানি না, কিন্তু আমি চিনেছি। খুব উঁচুদরের স্ত্রীলোক তিনি। তোমার উদ্যত তলোয়ারের মুখে ঘাড় পেতে দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন। অথচ তোমার প্রতিও তাঁর অগাধ ভক্তি দেখলাম, তোমাকে দেবতা মনে করেন—"

"কি করে বুঝলে সেটা—"

"খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ এসেছিল। উনি বললেন, আমার স্বামী দেবতা। ওর কোনও দোষ নেই। দোষ আমারই। নিজের দোষেই আমি আঘাত পেয়েছি। আমার কোন নালিশ নেই। এ শুনে পুলিশ চলে গেল।"

গোপালদেব নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"কেমন আছে সে।"

"ভালো আছে। হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ (discharge) করে দিয়েছি। স্কিন-ডীপ (skin-deep) উণ্ড (wound) হয়েছিল। সেরে গেছে একেবারে। ঘাড়ে একটা দাগ থাকবে অবশ্য। তোমার বীরত্বের কীর্তি—"

"বাড়িতেই আছে এখন?"

"তোমার বাড়িতে উনি যান নি। মগনলাল সস্তায় একটা ভালো বাড়ি দেখে দিয়েছে, সেইখানেই উনি প্রবাল, নীলা আর আলতাকে নিয়ে আছেন।"

"খরচ চলছে কি করে? আমি তো অনেকদিন চেক দিই নি।"

"প্রবাল আলতা দুজনেই রোজগার করে। নীলাও বোধহয় কিছু দেয়. নীলার সঙ্গে মগনলালের বিয়ে হয়ে গেছে। মগনলাল ধনী লোক। শুধু ধনী নয়, বিদ্বানও। সেদিন আলাপ হল, চমৎকার ছেলে।"

"আমার বাড়িতে কে আছে তাহলে—"

"মহান।"

"আমাকে আর কতদিন আটকে রাখবে এখানে—"

"আরও সাত দিন।"

"সাত দিন! সাত দিন কেন?"

"তাহলে সব খুলে বলি। তোমাব প্রপিতামহরা একান্নবর্তী ছিলেন তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাঁদেরই এক বংশধর তোমার নামে মোকর্দমা করেছেন। তাঁর দাবী, তোমার ওই তিনতলা বাড়িতে তাঁরও অধিকার আছে। তিনি এতদিন পূর্ববঙ্গে ছিলেন। সম্প্রতি রেফিউজি হয়ে ফিরে এসে এই করেছেন। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও বাড়ি এখন কোর্টের তত্ত্বাবধানে থাকবে। তোমাকে ও বাড়িতে থাকতে দেবে কি না সন্দেহ। তাই তোমার জন্যে একটা বাড়ি খুঁজেছিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরে কম্পাউণ্ডওলা চমৎকার একটা বাংলো বাড়ি সাতদিন পরে খালি হবে। সেটা আমি তোমার জন্য 'বুক' করে রেখেছি। খালি হলেই সেখানে নিয়ে যাব তোমাকে। এই নাও আদালতের কাগজপত্র—"

সিভিল সার্জন পকেট হইতে কয়েকটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন।

"মহানের কাছে তোমার অনেক চিঠি জমে আছে দেখলাম। তার ভিতর থেকে আদালতের চিঠিগুলো বেছে নিয়ে এসেছি আমি—"

"বাকি চিঠিগুলো?"

"সেগুলো পরে দেখো। আমিই চিঠিগুলো আনতে মানা করেছি। কোনও চিঠি দেখে হয়তো

আবার তুমি উত্তেজিত হয়ে কি কাণ্ড করে বসবে তা তো বলা যায় না। এখন দিনকতক ঠাণ্ডা হয়ে বিশ্রাম নাও। সাতদিন পরে যখন গঙ্গার ধারের বাড়িটাতে যাবে তখন দেখো সব। ওষুধটা খাচ্ছ তো? ঘুম কেমন হয়?"

গোপালদেব অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এসব কথার জবাব না দিয়া বলিলেন—"ওই গঙ্গার ধারের বাড়িতে আমি একা বাস করব?"

"তোমার মহান থাকবে। তোমার তেতলার ঘরে তুমি মহানকে নিয়ে একাই তো থাকতে। মহানই তোমার সব দেখাশোনা করত। এখানেও করবে—"

"কিন্তু তেতলার ঘরে ছিল আমার লাইব্রেরি—"

"সেটা এখানেও থাকবে। তোমার লাইব্রেরির আলমারিগুলো আনা অসম্ভব হবে না। তোমার ফার্নিচারগুলোও আনা যাবে। এ জন্যে আদালতের পারমিশন নিতে হবে হয়তো। জজ সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—সে হয়ে যাবে।"

"আমি এখানে কতদিন আছি বল তো?"

"তা প্রায় মাস দুই হবে। অবশ্য অধিকাংশ সময়েই তোমাকে ঘুমের ওষুধ বা ঘুমের ইন্‌জেকশন দিয়ে রাখা হত, তাই কতদিন এখানে আছ তা ঠাহর করতে পাচ্ছ না। কাল থেকে ঘুমের ওষুধ বন্ধ আছে—"

গোপালদেব আদালতের চিঠিগুলি দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে একটি কার্ড বাহির হইয়া পড়িল। নিমন্ত্রণপত্র।

"এটা কি?"

"ওটা তোমার চিঠিপত্রের মধ্যে ছিল। ভুলে চলে এসেছে সম্ভবত। কই দেখি? ও, ওটা প্রবালের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। হোটেলে সেদিন বেশ ভালো খাইয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম—"

"ভোজ হয়েছিল তাহলে? টাকা জুটল কোথা থেকে—"

সিভিল সার্জন হাসি মুখে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

"মগনলাল দিয়েছে নিশ্চয়! ছি, ছি, ছি, ছি—"

"মগনলাল দেয় নি। ও নিয়ে তুমি উত্তেজিত কোরো না নিজেকে, টাকাটা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়েছিল প্রবাল।"

"কি রকম?"

"তা এখন না-ই শুনলে। তবে এটা জেনে রাখ প্রবাল এমন কিছু করেনি যা আত্মসম্মানহানিকর। প্রবাল বেশ ভালো ছেলে—। হ্যাঁ আর একটা কথা, তোমার ওই বাড়িতে তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে একটি প্রাইভেট নার্স বাহাল করেছি। সে সকালে খানিকক্ষণ আর বিকেলে খানিকক্ষণ এসে থাকবে তোমার কাছে। দুপুরে সে একটা ক্লিনিকে চাকরি করে। ভালো নার্স—"

"আমার জন্যে আবার নার্স কেন।"

তোমাকে কিছুদিন চোখে চোখে রাখা দরকার। তোমার 'পাল্‌স্‌' কাউন্ট (count) করা, তোমার টেম্পারেচার দেখা, তোমার ব্লাডপ্রেসার মাপা—এখানে যে সব রোজ হচ্ছে,—সেখানেও তেমনি করতে হবে। মহান তো ওসব করতে পারবে না, তাছাড়া একজন কেউ কাছে-পিঠে থাকলে তোমার মনটাও ভালো থাকবে। ভালো মেয়েটি—"

"মাইনে কত লাগবে—"

"তার সঙ্গে কথা কই নি এখনও। তবে যতই লাগুক তোমার নাগালের বাইরে যাবে না তা—"

গোপালদেব হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। সহসা তাঁহার আবুহোসেনের গল্পটা মনে পড়িল। মনে হইল কোন অদৃশ্য হারুণ-অল-রশিদের খেয়ালের খেলনা হইয়াছেন তিনি!

"ভাবছ কি—"

সিভিল সার্জন হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কিছুই ভাবছি না। ভাবছি, তাসের ঘরটা ভেঙে গেল। এখন অপরের করুণা-ভাজন হয়ে আধ-পাগলের মতো কাটাতে হবে বাকি জীবনটা।"

"ওসব কথা ভাবছ কেন। তোমার ঘর তাসের ঘর কি পাথরের ঘর, কুটির না তাজমহল, তার বিচার করবে তোমার পরবর্তী কাল। তোমার মতো লোকও যদি বর্তমানের স্তুতি-নিন্দার দোলায় বিচলিত হও তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোক কোথায় দাঁড়াবে? তোমাদের উপর ভর করেই তো আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তোমার ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলো—ভালো কথা, গোপালদেব নিয়ে তুমি যে একটা গবেষণা করবে ভেবেছিলে তার কি হল—"

"কিছুই হয় নি। ভাবছি। মুশকিল হয়েছে—"

গোপালদেব থামিয়া গেলেন।

"কি মুশকিল—"

"আমার যে সব কথা মনে হয় তার কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। আর পাথুরে প্রমাণ দাখিল না করতে পারলে সুধীসমাজে তা ইতিহাস বলে গ্রাহ্য হয় না। লোকে বলবে কাব্য করেছি, ইতিহাস হয় নি।"

"কাব্যই কর না। ইতিহাস আর কটা লোকে পড়ে? ভালো ঐতিহাসিক-কাব্যই লিখে ফেল না একটা।"

"কাব্য লেখবার প্রতিভা আমার নেই। মাঝে মাঝে কেবল মেঘের মতো উদ্ভট কল্পনা ভেসে আসে মনে। একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, গোপালদেব বাংলার গৌরবময় যুগের তৃতীয় শিখর, ইংরেজিতে বললে বলতে হয়—থার্ড পিক (third peak)। প্রথম 'পিক' গঙ্গরিডই নন্দরাজা, দ্বিতীয় 'পিক' শশাঙ্ক, তৃতীয় 'পিক' গোপালদেব। বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের মহিমা-ভগ্নস্তূপের উপর গোপালদেবের কীর্তি-সৌধ স্থাপিত হয়েছিল—"

একটু থামিয়া হাসিয়া আবার বলিলেন—"সব মহিমার সৌধ ভগ্নস্তূপ হয়ে যায় শেষকালে। এইটেই ইতিহাসের শিক্ষা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট শশাঙ্কর নামে অনেক মিথ্যা কথা লিখেছেন তাঁর হর্ষচরিত কাব্যে, হর্ষবর্ধনের মিতে হুয়েনসাংও অনেক কলঙ্ক লেপন করেছেন শশাঙ্কের নামে। শশাঙ্কের এরকম সভাকবি বা বন্ধু ছিল না— মনে হয় তিনি চাটুকার পারিষদ পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন না। খাঁটি মানুষ ছিলেন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন— বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনিই প্রথম আর্যাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর সে স্বপ্ন কিছুটা সফলও হয়েছিল। পরাক্রান্ত মৌখরি রাজশক্তিকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধন

তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন নি। তিনি তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আমরণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। বাণভট্টের মতো চরিত-লেখক অথবা হুয়েনসাংয়ের মতো বন্ধু থাকলে হর্ষবর্ধনের মতো তাঁরও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তিনি স্বদেশে অখ্যাত, অজ্ঞাত, কোনও বাঙালী তার সম্বন্ধে কোন ইতিহাস লেখে নি, শত্রুর কলঙ্ককালিমাই জগতে তাঁর একমাত্র পরিচয়। তাঁর মৃত্যুর পরই সব শেষ হয়ে গেল, তারপর মাৎস্যন্যায়ের যুগ—"

ইতিহসের এই লম্বা বক্তৃতায় সিভিল সার্জন একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি রোগী দেখিতে বাকী ছিল তখনও। তাঁহাকে উসখুস করিত দেখিয়া গোপালদেব থামিয়া গেলেন।

"তোমার তাড়া আছে না কি—"

"হ্যাঁ কয়েক জায়গায় যেতে হবে।"

"তাহলে তোমাকে আর আটকে রাখব না। শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমার একটা রোম্যান্টিক থিওরি আছে। সেটা পরে শুনো না হয়—"

"হ্যাঁ পরে শুনব। আজ উঠি তাহলে, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না-তো।"

"তুমি স্বয়ং সিভিল সার্জন যখন আমার সহায় তখন আর অসুবিধা কি—"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

গোপালদেবের মনে কিন্তু সেই রোম্যান্টিক থিওরি মেঘের মতো সঞ্চারিত হইতে লাগিল, বিসর্পিত হইতে লাগিল নানাভাবে, অবশেষে বহুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া অপরূপ শোভার সৃষ্টি করিল।

সূত্রধর আবর্ভূত হইলেন।

বলিলেন—"কল্পনা মিথ্যা নয়। ইতিহাসের সত্য তর্ক-কণ্টকিত। মানুষের বুদ্ধিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের সত্যও তাই সীমিত। নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে সে সত্যের চেহারা বারবার বদলে যায়। তথাকথিত বিজ্ঞানেরও এই দশা। কোনও সত্যকে সে স্থায়ী রূপ দিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা যেন টর্চ ফেলে ফেলে অন্ধকারে সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁদেরও সম্বল কল্পনা। কল্পনাই তাঁদের পথ দেখাচ্ছে। সেই পথে চলেই তাঁরা অনেক সময় সত্যের খণ্ডরূপ দেখতে পাচ্ছেন। আপনার কল্পনাও হয়তো মিথ্যা নয়। হয়তো সত্যিই শশাঙ্ক আর মালবরাজ দেবগুপ্ত একই বংশোদ্ভূত ছিলেন বলেই বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। হয়তো এ কথাও সত্য শশাঙ্ক যখন মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন তখন প্রভাকরবর্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে ভালবেসেছিলেন। হয়তো তার পাণিপ্রার্থনা করে অপমানিতও হয়েছিলেন। হয়তো রাজ্যশ্রীই অপমান করেছিল, হয়তো বলেছিল—"তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও, সামান্য সামন্ত হয়ে বিয়ে করতে চাও স্থানীশ্বরের রাজকন্যাকে। মৌখরী-রাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। হয়তো এই জন্যই গ্রহবর্মার উপর শশাঙ্কের আক্রোশ, এই জন্যই হয়তো তিনি তাঁর বন্ধু মালবরাজ দেবগুপ্তের সাহায্য নিয়ে গ্রহবর্মাকে আক্রমণ করেছিলেন। গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন, রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। শেষে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে চিতায় আত্মবিসর্জন করতে উদ্যত হন, এমন সময় রাজ্যবর্ধন গিয়ে তাঁকে রক্ষা করে। কেউ আবার

বলেছেন শশাঙ্কের আদেশেই রাজশ্রী কারামুক্ত হয়েছিলেন। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা বা কিম্বদন্তী আপনার কল্পনায় যে রং লাগিয়েছে তা মিথ্যা নয়। ওই দেখুন আকাশ রঙ্গমঞ্চে তার মহোৎসব।''

গোপালদেব দেখিতে লাগিলেন সমস্ত আকাশটা যেন এক বিরাট রণাঙ্গনে রূপান্তরিত হইয়াছে। বহু রক্তাক্ত সৈন্য পড়িয়া রহিয়াছে চতুর্দিকে। সমস্ত আকাশটাই যেন রক্তাক্ত। দূর দিগন্তরেখায় আগুন জ্বলিতেছে। আর একটা স্থান ধূমাকীর্ণ। একটা হাহাকার যেন মূর্ত হইয়াছে সেখানে। আর এই রণাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন একটি তন্বী রক্তাম্বরা যুবতী। মাথার চুল হাওয়ায় উড়িতেছে, দুই বাহু উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, চোখের আকুল দৃষ্টি সেই রক্তাক্ত রণাঙ্গনে কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতেছে। গোপালদেবের মনে হইল—রাজ্যশ্রী শশাঙ্ককেই যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। রাজকন্যার গর্ব চূর্ণ হইযাছে, সে এখন সেই সামন্তেরই পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়। কিন্তু সে কোথায়, সে কোথায়.. । ধীরে ধীরে ধূসর মেঘমালা আসিয়া সেই রক্তাক্ত রণাঙ্গনকে ঢাকিয়া দিল। দিগন্তরেখার অগ্নি নিবিয়া গেল। রাজ্যশ্রী অন্তর্হিত হইলেন। ধূসর মেঘমালা ক্রমে ক্রমে যাহা রচনা করিল—তাহা বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ। গোপালদেবের সহসা মনে হইল শশাঙ্ক আর রাজ্যশ্রী কি এক জাতের ছিল?''

এইখানে আমি—গল্পের লেখক ফকিরচাঁদ সামন্ত—নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সেদিন আমার পথে-পাওয়া গুরু বুধ আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহার কিছুটা ফলিয়াছে মনে হইতেছে। গোপালদেব সম্বন্ধে বই লিখিতে আরম্ভ করার পর হইতেই আমার মনে উৎসাহ এবং দেহে বল সঞ্চারিত হইয়াছে। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়াছে, নিজেকে আর ক্ষুদ্র কেরানী বলিয়া মনে হইতেছে না। এমন কি মালিনী— আমার ছাত্রের বোন মালিনী, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মনে একটা রোমান্টিক স্বপ্ন পুষ্পিত হইয়াছিল, যে মালিনী আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না, সেই মালিনীও আজকাল আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। সেদিন আমার ছাত্রকে পড়াইতেছিলাম হঠাৎ মালিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'মাস্টারমশাই, আমি প্রাইভেটে এবার আই-এ দেব। বই কিনেছি, যেখানে বুঝতে পারব না, আপনার কাছে আসব? বুঝিয়ে দেবেন তো?'

বলা বাহুল্য, আপত্তি করি নাই, সানন্দে সম্মত হইয়াছিলাম। প্রায়ই তাহাকে পড়া বলিয়া দিতাম, অবশ্য তাহার দাদা রণধীরের ঘরেই সে আসিত। নির্জনে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। আর একটা লাভও হইয়াছে। মালিনী প্রত্যহ আমাকে একথালা জলখাবার পাঠাইয়া দেয়। রাবড়ি, হালুয়া, নানারকম ফল, সন্দেশ—প্রচুর খাবার। উহা খাইয়া পেট ভরিয়া যায়, দ্বিপ্রহরে আর খাইবার প্রয়োজন হয় না। সত্যই আমার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে, মনেও একটা প্রেরণা জাগিয়াছে, মনে হইতেছে জীবন বৃথায় যাইবে না, নেপথ্যে একটা বৃহৎ জীবন যেন আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে। সে জীবন গোপালদেবের জীবনের অনুরূপ হইবে কি না জানি না, কিন্তু অনুভব করিতেছি আমার জীবনের আঁস্তাকুড়ে নন্দনকাননের আবির্ভাব ঘটিবে। অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটি ঘটনাও ঘটিয়াছে। মালিনী ইতিহাসের বই পড়িতে খুব ভালোবাসে। হঠাৎ সেদিন আসিয়া বলিল, "মাস্টারমশাই, রাণী দুর্গাবতীর কাহিনী পড়ে খুব ভালো লাগল। আকবরের

সৈন্য যখন সিংহগড় আক্রমণ করে তখন তিনি নিজে হাতীর পিঠে চড়ে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হন। প্রথম দিনের যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বিপক্ষদলের দুটি শর এসে তাঁর চোখে মুখে বিঁধে যায়। এ দেখে সৈন্যরা পালাতে আরম্ভ করে। তিনি আর তাদের ফেরাতে পারেন নি। মাহুতের হাত থেকে ছোরা নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। এ যুগে কি ওরকম দুর্গাবতী হয় না?"

"হয় বই কি। অগ্নিযুগের অনেক বীর রমণীই ওরকম করেছেন, প্রীতি ওয়াদ্দেদারের কথাই ধর না—"

মালিনীর চোখে মুখে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা ঝলমল করিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি ঘোড়ায় চড়া শিখব। আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন?"

"ছেলেবেলায় চড়েছি দু'একবার মাঝে মাঝে। গরীব মানুষ ঘোড়া কোথায় পাব?"

"বেশ, আমি দাদাকে বলব। আমাদের সহিসটাকে নিয়ে মাঠে যাব দু'জনে—আমাদের সহিস ধনপৎ খুব ভালো ঘোড়সোয়ার।"

মনে হইল কপাট ধীরে ধীরে খুলিতেছে।

কার্তিক তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল খেজুরি বিবি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। গালে টোল পড়িয়াছে। কপাট খোলা ছিল, সে কখন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছে কার্তিক টের পায় নাই।

"সুরং, তুমি এই পাপীয়সীর বাড়িতে এমন শান্তভাবে থাকবে তা প্রত্যাশা করি নি। আমার ভয় হচ্ছিল এসে হয়তো দেখব রাখাল তোমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে আর তুমি মুখের বাঁধা কাপড়টা খুলতে চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না। তোমার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু এসে দেখছি তুমি লক্ষ্মীটি হয়ে বসে আছ। ভারি আনন্দ হচ্ছে—"

খেজুরি বিবি আগাইয়া আসিল।

"বসব বিছানায়? রাগ করবে না তো।"

"না রাগ করব কেন—"

কার্তিক উঠিয়া পড়িল। বেশ একটু দূরে প্রায় দেওয়াল ঘেঁষিয়া সরিয়া বসিল, যাহাতে খেজুরি বিবির গায়ে গা না ঠেকিয়া যায়। ইহা দেখিয়া খেজুরি বিবি আবার হাসিল, আবার তাহার গালে টোল পড়িল।

"তোমার যে এমন ছুঁচিবাই আছে তাতো জানতাম না। আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে?"

সোৎসুকে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল সে।

"বিশ্বাসযোগ্য হলেই করব।"

"তোমার এই ছুঁচিবাই দেখে তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল।"

"তার মানে?"

"আমি দেহবিক্রি করি এ খবর জানবার পর সাধারণ যে কোনও পুরুষ একটু উস্‌খুস্‌ করত, তার চোখের দৃষ্টিতে রিরংসা লোভ প্রভৃতি ফুটে উঠত, ঘৃণা ফুটে উঠত না। তোমার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা ফুটে উঠেছে দেখে খুশি হলাম।"

কার্তিকের গলার কাছটায় কেমন যেন ব্যথা করিতে লাগিল। তাহার চপলাদি—তাহার কল্পনার শ্রী—যাহার চোখে মুখে পবিত্রতার ছাপ এখনো সুস্পষ্ট— সে দেহ-বিক্রয় করে? একি সত্য?

"যদি ফুটে থাকে তাহলে আমি লজ্জিত সে জন্য। কাউকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। কিন্তু মনের সংস্কার কাটতে চায় না; বরাবর সবাই যেটাকে ঘৃণ্য মনে করেছে, ঘৃণ্য মনে করতে শিখিয়েছে সেটার প্রতি ঘৃণাই আছে আমার, যদিও একথা স্বীকার করছি—যুক্তির নিকষে যাচাই করলে আমার এ সংস্কার অর্থহীন বা হাস্যকর বলে মনে হবে। রাসায়নিকের কাছে যেমন বিষ্ঠা আর চন্দন কতকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমষ্টি মাত্র, তাদের নিয়ে ঘৃণা বা উল্লাস প্রকাশ করা যেমন—"

"আর বলতে হবে না, বুঝেছি আমি। কিন্তু যদিও আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ নির্বিকার হওয়া কিন্তু আমার মনে হয় ভাগ্যে সবাই নির্বিকার হতে পারে না তাই জীবনে কিছু স্বাদ আছে—"

এই সময় বাহিরে কয়েকটা লোকের পদশব্দ শোনা গেল।

"এটা কোথায় রাখব মা—"

"এখানেই নিয়ে এস আপাতত। নিবারণবাবু এলে সকালে যা হয় ব্যবস্থা কববেন তিনি—"

একটা প্রকাণ্ড বস্তা লইয়া চারজন লোক প্রবেশ করিল।

"ওই কোণের দিকে রাখ—"

ধপাস করিয়া বস্তাটা কোণের দিকে রাখিয়া লোকগুলি চলিয়া যাইতেছিল।

"তোমাদের মজুরি পেয়েছ?"

"নিবারণবাবু আট আনা করে দিয়েছে জন পিছু।"

"আচ্ছা, আরও কিছু নিয়ে যাও।"

খেজুরি বিবি একটি সুদৃশ্য ব্যাগ খুলিয়া আরও দুইটি টাকা তাহাদের দিল। তাহারা তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

"বস্তায় কি আছে?"—কার্তিক প্রশ্ন করিল।

"চাল।"

"কিছু কিনে রাখলে বুঝি। কিছু 'স্টক' করা ভালো, যা দাম বাড়ছে।"

"স্টক করবার জন্যে কিনি নি! বিতরণ করবার জন্যে যোগাড় করেছি!"

"বিতরণ করবে? কাদের?"

"ঠিক বিতরণ করব না। সামান্য কিছু দাম নেব। বিতরণ করতে পারলেই ভালো হত, কিন্তু যাদের দেব তারা ভিক্ষা নেবে না। তারা ভদ্রলোক—অথচ খুব গরীব—"

"বুঝতে পারছি না ঠিক—"

"আমাদের দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরা খুব গরীব, তারা আধপেটা খেয়ে থাকে, কখনও উপবাস করে তবু ভিক্ষা করতে পারে না। তাদের কাছেই এই চাল চার আনা সের দরে বিক্রি করব—"

"চার আনা সের? কত করে কিনেছ তুমি?"

"আড়াই টাকা। আড়াই টাকারও বেশী। আজ দু'মণ চালের দাম দু'শো দশ টাকা নিয়েছে।"

"এ চাল তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?"

"চোরাবাজার থেকে।"

কার্তিক স্তম্ভিত হইয়া খেজুরি বিবির দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

"চোরাবাজার থেকে চড়া দামে চাল কিনে—"

খেজুরি বিবি তাহার কথা শেষ করিতে দিল না। হাসিয়া বলিল—"যারা দেহ বিক্রি করে তারা সব পারে!"

সত্যটা হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো প্রতিভাত হইল কার্তিকের মনে, কিন্তু বিদ্যুতের মতো মিলাইয়া গেল না। সে নিঃসংশয়ে বুঝিল চপলাদি দেহ-বিক্রয় করে না। ওই কুৎসিত যবনিকাটার অন্তরালে যে চপলাদি আত্মগোপন করিয়া আছে সে পাপীয়সী নয় মহিয়সী।

"চপলাদি তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছ। তুমি দেহ-বিক্রি কর না—"

খেজুরি বিবি এবার কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"আচ্ছা অবুঝ তুমি তো। মেলায় মেলায় ওই সব তাঁবু যারা ভাড়া নেয় তারা দেহ-বিক্রি করবার জন্যেই নেয়। গর্ভণমেন্টের কাছে তাদের লাইসেন্স নিতে হয়। এ ব্যবসাকে গর্ভমেণ্ট ন্যায়সঙ্গত মনে করে। আমারও লাইসেন্স আছে—"

"তা থাক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম না তুমি সাধারণ বারবনিতা। বাজে কথা বলেছ তুমি আমাকে—"

"বিশ্বাস না করবার কারণ?"

"তোমার চোখ-মুখ দেখে সেটা বুঝেছি। সাধারণ বেশ্যাদের চোখ-মুখে ওরকম পবিত্রতার ছটা থাকে না। তারা গরীব মধ্যবিত্তদের জন্যে চাল সংগ্রহ করে বেড়ায় এ কথাও কখনও শুনিনি—"

খেজুরি বিবি আর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল না, স্মিতমুখে কার্তিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার গালে টোল দেখিয়া কার্তিক সহসা যেন আর একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি একটুও বদলাওনি চপলাদি। তুমি এখনও সীতারামের শ্রীই আছ। কেন আমার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছ বল দিকি—"

খেজুরি বিবি এক কথারও উত্তর দিল না, নীরবে হাসিতেই লাগিল।

দৈত্যাকৃতি রাখাল দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"আপনার স্নানের গরম জল তৈরি হয়ে গেছে মা। আপনি আসুন—"

"এঁর বন্ধু আর কুকুরকে কোথায় রেখেছ?"

"নীচের ঘরে রেখেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েও ছিলেন তিনি। কুকুরটাকেও খাইয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ঘরের কপাট খোলা। ওঁরা কেউ নেই। আমি তো তাঁবুতে পাহারা দিচ্ছিলাম—"

"কোথাও বেরিয়েছেন বোধহয়। চল—"

খেজুরি বিবি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে সে কুলিদের টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিল সেটি কার্তিকের বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। ভ্যানিটি ব্যাগটি সত্যই মনোরম। দেখিলেই স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে। কার্তিকের সহসা মনে হইল ওই ভ্যানিটি ব্যাগটি

খুলিয়া দেখিলে হয়তো খেজুরি বিবির সত্য পরিচয়ের আভাস মিলিবে। কোনও চিঠি, কোনও কার্ড বা ওই রকম একটা কিছু হইতেই হয়তো বোঝা যাইবে সব। ব্যাগটা খুলিয়াই চমকাইয়া উঠিল কার্তিক। এক তাড়া নোট রহিয়াছে, প্রত্যেকটা হাজার টাকার! গণিয়া দেখিবার সাহস হইল না। তাছাড়া অনেক খুচরা নোট। সহসা একটা ছবি বাহির হইয়া পড়িল। অর্ধস্ফুট পদ্মকলির ছবি। চমৎকার ছবি। মনে হয় পদ্মকলিটি যেন জীবন্ত। চপলা পরমুহূর্তেই ফিরিয়া আসিল।

"ব্যাগটা এখানে ফেলে গেছি। ও কি, তুমি খুলে দেখছ না কি—"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল কার্তিক।

"দেখছিলাম ওতে তোমার আসল পরিচয়ের কোন সন্ধান পাই কি না। অন্যায় হয়ে গেছে আমার—"

ব্যাগটি বন্ধ করিয়া সে চপলার হাতে দিল। ব্যাগটি হাতে করিয়া চপলা দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে মৃদু হাসি, গালে টোল।

"রাগ করলে আমার উপর চপলাদি?"

"অবাক হয়েছি, রাগ করিনি; হয়তো আমিই নিজেই তোমাকে সব খুলে বলতাম। পদ্মকলি এখনই হয়তো আসবে। তবে এর ভিতর যা দেখেছ তা যেন প্রকাশ কোরো না কারও কাছে। যদি কর তাহলেই রাগ করব—বিপদেও পড়ব—"

তাহার পর হঠাৎ সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার উপর রাগ করা যাবে না জানি; যাবে? তুমি সুরং, এতদিন পরে ফিরে এসেছ, তোমার উপর রাগ করতে পারব না কিছুতে। একটা কথা শুধু জেনে রাখ একথা যদি প্রকাশ পায়, আমার কঠিন শাস্তি হবে, হয়তো যাবজ্জীবন জেলে পুরে দেবে আমাকে। শুধু আমি নয়, পদ্মকলি বেচারাও বিপদে পড়ে যাবে। এইটে মনে রেখো—"

"না, একথা প্রকাশ পাবে না আমার কাছ থেকে। কিন্তু চপলাদি, তোমার সম্বন্ধে বিস্ময় যে ক্রমেই অন্তহীন হয়ে উঠছে। কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ছি।"

"কবিরা নারীদের বলেছেন প্রহেলিকা, ধার্মিকেরা বলেছেন শয়তানি। সাধারণ পুরুষরা তাদের দেখে দিশাহারা হবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাকে আমি অসাধারণ মনে করি সুরং, তুমি দিশাহারা হবে একথা ভাবতেই পারি না। অনেকদিন তো তোমার শালার বাড়িতে একসঙ্গে ছিলাম, তখন তো দিশাহারা হওনি। তোমার শালা বরং হয়েছিল, সে সাধারণ পশু একটা—"

"মা জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—"

রাখাল আবার দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলে।

"আমি স্নান করে এখন ঘুমুব। তুমিও ঘুমিয়ে নাও না একটু। সকাল হতে এখনও অনেক দেরি—এখন তিনটে বেজেছে—"

খেজুরি বিবি চলিয়া গেল। কার্তিক বসিয়া রহিল আরও খানিকক্ষণ। তাহার পর উপন্যাসটাই খুলিল।

"গোপালদেব অস্থির চিত্তে কেবলি ভাবিতে লাগিল শশাঙ্ক আর রাজ্যশ্রী কি এক জাতের ছিল? সহসা সেই সৌম্য প্রাজ্ঞ গম্ভীর ইতিহাস প্রস্তরবেদী 'পরে আবার মূর্ত হইলেন।

বলিলেন—"সামাজিক নিয়মে গণ্ডীবদ্ধ কোন জাতিরই শাশ্বত মূল্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি বহুজাতির সংমিশ্রণ সর্বত্র ঘটিয়াছে। কোনও একটা জাতি নিজের বৈশিষ্ট্যকে বেশীদিন স্থায়ী করিতে পারে নাই। আর একটা জাতি আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার পর আর একটা। নিত্য নূতন জাতি, নূতন ধর্ম, নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। বহু নদীর ধারায় বাহিত হইয়া বহু ঘাটের জল এক জলাশয়ের ভিতর জমা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে কত উদ্ভিদের খণ্ডাংশ, কত জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কত বিভিন্ন মাটির বৈচিত্র্য-বৈভব। কিন্তু এখন সব একাকার, এখন সব পঙ্ক। সকলের বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে ওই বিরাট পঙ্ককুণ্ডে। তবে একটা কথা বলিব। ওই পঙ্ককুণ্ডেই আবার নূতন রকম জাতিভেদের নিদর্শন পাওয়া যায়। ওই পঙ্ককুণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া গুগ্‌লি, শামুক, ব্যাং, সাপ, শ্যাওলা প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে, ওই পঙ্ককুণ্ডে পদ্মও ফোটে। পদ্ম এবং শামুক এক জাতের নহে। তাদের বিশেষ গুণাবলীর সমষ্টিই তাহাদের পদ্ম বা শামুক করিয়াছে। ভ্রমর যখন পদ্মের নিকট আসিয়া মুগ্ধ গুঞ্জন তোলে তখন সে পদ্মের জন্ম-ঐতিহ্য লইয়া মাথা ঘামায় না, সে পদ্মের রূপ-গুণেই মুগ্ধ। পদ্ম নিজের রূপ-গুণ লইয়া নিজেরই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। সব জাতিরই মূল কথা ইহাই। গুণ ও কর্ম একটি জাতিকে অপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের বংশে যদি চণ্ডালের জন্ম হয় সে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদা পায় না। নীচ বংশে মহাপুরুষদের জন্ম হইয়াছে এরূপ উদাহরণও ইতিহাসে বিরল নহে। তাঁহারা সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। একট পঙ্ক হইতে কি করিয়া পদ্ম ও শামুকের উদ্ভব হয় এ রহস্য চিরকালের রহস্যই থাকিয়া যাইবে। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে পদ্ম নিজগুণেই, নিজের মহিমার জোরেই চিরকাল আধিপত্য বিস্তার করিবে গুণী ও রসিকদের কাছে। সরস্বতী চিরকাল আসিয়া তাহার উপরই নিজের আসন পাতিবেন। রাজ্যশ্রী ও শশাঙ্ক এক জাতের ছিল কি না এ চিন্তা সুতরাং নিরর্থক। তোমার কল্পনা যদি শশাঙ্ককে রাজ্যশ্রীর প্রণয়ীরূপে কল্পনা করিয়া তৃপ্ত হয় তাহা হইলে তোমাকে একথা মানিতেই হইবে উহারা একজাতের পক্ষীই ছিল। কারণ ভিন্নজাতীয় পক্ষী কখনও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দেহের দিক দিয়া বিচার করিলে সব মানুষকেই একজাতের মনে হয় বটে, জড়বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বর্বর ও সভ্য, নির্বোধ ও প্রতিভাবান সকলেই হোমোস্যাপিয়েনস্ (Homosapiens) — কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা একজাতের নহে। যে কুলেই তাহারা জন্মগ্রহণ করুক, বিভিন্ন প্রবৃত্তি, কর্ম ও গুণ অনুসারে তাহারা বিভিন্ন জাতীয় হয়। আর্যগণ গুণ কর্ম অনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে-কোন কুলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং শশাঙ্ক ও রাজ্যশ্রী যে একটা জাতের নরনারী ইহা কল্পনা করিলে অসঙ্গত হইবে না—"

পড়িতে পড়িতে কার্তিকের চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিল। ঘুমাইয়া পড়িল সে।

যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, দেখিল অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘরে কেহ নাই। চারিদিকে স্বর্ণকিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল আলোর দেশে তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে। আর অন্ধকার আসিবে না। যদিও বা আসে তাহা হইলে তাহা সন্ধ্যার বর্ণসমুদ্রে অবগাহন করিয়া নক্ষত্রমালায় সাজিয়া জ্যোৎস্নার উত্তরীয় গায়ে দিয়া আসিবে। যে শোভাহীন কুৎসিত অন্ধকার সে

এতদিন ভোগ করিয়াছে এ অন্ধকার সে রকম হইবে না। বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর চোখে পড়িল পাশেই তে-পায়ার উপর একটি চিঠি রহিয়াছে। খামের চিঠি। খামের উপরে লেখা—সুরং। চিঠিটা খুলিয়া পড়িল।

সুরং,

তুমি অগাধে ঘুমোচ্ছ দেখে তোমাকে আর ওঠালাম না। আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, বারোটা নাগাদ ফিরব। রাখাল এখানে রইল সে তোমার দেখাশোনা করবে। তোমার বন্ধু আন্টা আর কুকুর লর্ডের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। খুব ভালো লেগেছে ওদের। আন্টার নূতন নামকরণ করেছি অবতার। স্বয়ং ভগবানই তো একদিন বামন অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কশ্যপের সন্তানরূপে। চূর্ণ করেছিলেন বলির দর্প। আন্টা অনির্বাণ প্রাণস্ফুলিঙ্গ। ওকে আমি কাজে লাগাব। ওকে আর তোমার কুকুরকে খেজুরিতে পাঠিয়ে দিলাম। সেইখানেই ওরা আরামে থাকবে। আমি ফিরে এসে তোমাকেও খেজুরিতে নিয়ে যাব। সেখানেই ভালো লাগবে তোমার। ইতি চ

চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া কার্তিক দেখিল নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্তিবৎ বলিষ্ঠকায় বিশালদেহ রাখাল দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই সে আগাইয়া আসিল।

"আপনি কি আগে স্নান করবেন, না জলখাবার খাবেন?"

"স্নানটা করলেই ভালো হত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমার সঙ্গে কাপড় নেই—"

"সেজন্যে ভাববেন না। মা সে ব্যবস্থা করে গেছেন।"

"তবে চল স্নানটাই সেরে ফেলি আগে।"

স্নানের ঘরে গিয়া কার্তিক দেখিল তেল, সাবান, গরমজল, ঠাণ্ডা জল এ সব তো আছেই তাছাড়া আছে একটি ভালো শান্তিপুরে কাপড়, একটি তোয়ালে এবং একটি সিল্কের চাদর। সিল্কের চাদরে একটি কাগজের টুকরা 'পিন' দিয়া আটকানো আছে। তাহাতে লেখা রহিয়াছে—'সুরং', তোমার গায়ের মাপ জানি না, তাই তোমার পাঞ্জাবি গেঞ্জি কিনতে পারলাম না। আপাতত এই সিল্কের চাদরটা গায়ে দিয়ে থাকো খানিকক্ষণ। ফিরে এসে তোমার পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির ব্যবস্থা করব। ইতি চ—

কার্তিক বাহিরে আসিয়া রাখালকে প্রশ্ন করিল—"আমার থলিটা কোথা?"

"সেটা মা ভাঁড়ার ঘরে বন্ধ করে রেখে গেছেন। আপনার কাপড় জামা কিছু আছে কি না দেখবার জন্যেই থলিটা দেখছিলেন উনি। কিন্তু একটা কড়াই আর খুন্তি আর একটা মোটা খাতা ছাড়া আর তো কিছু ছিল না তাতে।"

"না, আর কিছুই ছিল না। আচ্ছা, স্নানটা সেরে ফেলি—"

স্নানান্তে জলযোগ করিতে বসিয়া কার্তিক অবাক হইয়া গেল। দেখিল, সে একদা যাহা ভালোবাসিত তাহাই যেন আজ সংগৃহীত হইয়াছে। ওভালটিন, মাখনদেওয়া গরম টোস্ট, ডিম-ভাজা আর সন্দেশ। আপেলও রহিয়াছে একটি। প্রথম প্রথম সে যখন ঘরজামাই হইয়া আসিয়াছিল তখন এসব খাদ্য সে নিয়মিত পাইত। কিন্তু কালীকিঙ্করের আমলে মুড়িও জুটিত না তাহার। মনে পড়িল চপলাদিকে মনের দুঃখে এ সব সে বলিয়াছিল একদিন। দেখিল চপলা

তাহা মনে করিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ চপলার টোল-খাওয়া গালের মৃদু হাসিটা তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। আর একবার সে মনে মনে বলিল—'হতেই পারে না। চপলা দেহ-বিক্রয় করে টাকা রোজগার করে না। কিছুতেই না।' —বলিয়া ভারি তৃপ্তি পাইল।

ঠিক বেলা বারোটার সময় ঘর্মাক্তকলেবরে খেজুরি বিবি ফিরিল। বাহিরে প্রখর রৌদ্র এবং উত্তপ্ত হাওয়া। খেজুরি বিবির মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। চুল শাড়ি ধূলি-ধূসরিত। কিন্তু তবু তাহার মুখের হাসি নিবিয়া যায় নাই, চোখের দীপ্তিও ম্লান হয় নাই।

"আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছি। জানি আমি না ফিরলে তুমি খাবে না। আব একজনও আমাদের সঙ্গে খাবে।"

"সে কে—"

"আমার প্রণয়ী!"

"তোমার প্রণয়ী!"

"হ্যাঁ। সে পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে। রাখাল, ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এস আর আমাদের খাবার দাও—"

একটি মোটাসোটা ভালোমানুষ গোছের ভদ্রলোক মুচকি হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।

"আসুন এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার আত্মীয় সুরং, অনেকদিন পরে কাল মেলায় দেখা হল এর সঙ্গে। আর সুরং ইনি আমার একজন বন্ধু। খুব ভালো লোক, চমৎকার গান করেন, চমৎকার বাঁশী বাজান। এঁর পরিচয় পেলে তুমি খুশি হবে—"

রাখাল দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল আবার।

"খাবার দেওয়া হচ্ছে।"

"চলুন খাওয়াটা শেষ করে ফেলা যাক—"

কার্তিক ক্রমশই যেন একটা জটিল ধাঁধার জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল। এই মোটা লোকটা চপলাদির প্রণয়ী? বিশ্বাস হয় না। প্রণয়ীটি কিন্তু একটি কথাও বলিল না। নীরবে খাইয়া যাইতে লাগিল। মাছ, মাংস, পায়েস সবই প্রচুর খাইল কিন্তু নীরবে।

"দারোগা সাহেব এসেছেন—" রাখাল আসিয়া খবর দিল।

"ও। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এস। চেয়ার দাও একটা।"

ইউনিফর্ম-পরা দারোগা সাহেব প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিলেন।

"আমি একটা অপ্রীতিকর কাজ করতে এসেছি কিন্তু। আপনার বাড়িটা সার্চ করতে হবে। ওপর থেকে হুকুম এসেছে—"

"বেশ করুন। আমরা তো বেওয়ারিশ মাল, যে কেউ যখন তখন আমাদের নেড়েচেড়ে দেখতে পারে। আপনারা পুলিশের লোক, আপনারা তো পারেনই, এর জন্যে আপনাদের কোন খরচও নেই কিন্তু যারা পুলিশ নয় তারাও আমাদের ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে অবশ্য তার জন্যে তাদের অর্থমূল্য দিতে হয়—এই ইনি যেমন দিয়েছেন—"

খেজুরি বিবি তাহার প্রণয়ীটির দিকে চাহিয়া হাসিল। প্রণয়ীটিও হাসিলেন। দেখা গেল তাঁহার সামনের দাঁত দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত।

দারোগা সাহেব বলিলেন—"আমি নীচের ঘরগুলো দেখেছি। সবই তা খালি দেখলাম। উপরে যে ঘরটায় তালাবন্ধ আছে সেইটে একবার দেখব। আর দেখব আপনার বাক্স—"

খেজুরি বিবি চাবির গোছাটা কোমর হইতে খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন—"আমার বাক্স নেই—একটি কিন্তু অনুরোধ আছে—। খাওয়ার সময় এসেছেন কিছু খেয়ে যেতে হবে। গরম গরম কাটলেট আর—"

"না, আর কিছু নয়। কাটলেটই দিন তাহলে খান দুই—"

"ওটা কি—"

"ওটা আমার ব্যাগ। যা রোজগার করি ওতেই থাকে—"

"দিন তো ওটা। কাল কত রোজগার করেছেন—"

"তা আমার প্রণয়ীটিকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি যা দিয়েছে তাই আছে ওতে—"

"কত দিয়েছেন আপনি—"

প্রণয়ীটির দিকে চাহিয়া দারোগাবাবু প্রশ্ন করিলেন।

"বেশী নয়। মাত্র পঁচিশ টাকা—" কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিলেন প্রণয়ীটি।

দারোগা সাহেব ব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন পঁচিশ টাকাই রহিয়াছে।

কার্তিক সবিস্ময়ে দেখিল হাজার টাকার নোট একটিও নাই। পদ্মকলির ছবিটাও দেখা গেল না।

"আমি ওই ঘরটা দেখে আসি তাহলে—"

"রাখাল ঘরটা খুলে দাও আর উনি যা যা দেখতে চান দেখাও—"

একটু পরেই দারোগা সাহেব ফিরিয়া আসিলেন।

"ও ঘরেও তো কিছু নেই। অথচ ওঁরা খবর দিয়েছেন, কিছু চোরাই চাল এখানে এসেছে —"

"চোরাই চাল নিয়ে আমি কি করব? যা কিনি খোলা বাজার থেকে কিনি—"

"আচ্ছা চলি—"

দারোগা সাহেব চলিয়া গেলেন।

হতভম্ব কার্তিক বলিল—"আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না চপলাদি—"

"পৃথিবীতে অধিকাংশ জিনিসই দুর্বোধ্য। আমরা ভান করি যেন বুঝতে পেরেছি। তুমিও তাই কর।"

হঠাৎ আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ছুটিতে ছুটিতে লর্ড আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার গলায় একটা দড়ি বাঁধা। সে আসিয়াই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া কার্তিককে জড়াইয়া ধরিল।

"পাছে এদিকে ওদিকে চলে যায় তাই একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম ওকে। শিকল তো নেই—" রাখাল অপ্রস্তুত মুখে জবাবদিহি করিতেই লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহাকে বকিয়া দিল।

"চমৎকার কুকুরটি তোমার সুরং—একে ভালো করে যত্ন করতে হবে। আমরা এবার খেজুরিতে যাব। সেইখানেই বিশ্রাম করা যাবে। রাখাল আমাদের যাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছ—"

"দুটো পালকি আনিয়েছি—"

প্রণয়ীটি বলিল—"আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। পরে আবার দেখা করব।"

প্রণয়ী চলিয়া গেল। তাহার পরই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এ দুটো এখন থাক আপনার কাছে" তাহার পর হাসিল। কার্তিক দেখিল তাহার সামনের দাঁত দুইটি ফাঁক ফাঁক, সে দুইটিতে আর সোনা নাই। খেজুরি বিবি তাহার নিকট হইতে সোনার টুকরাগুলি লইয়া ব্যাগে পুরিল। সে চলিয়া গেলে হাসিয়া বলিল—"ওর ওই ফাঁক ফাঁক দাঁত দুইটিতে মাঝে মাঝে সোনার টোপর পরিয়ে রাখতে ভালোবাসে ও। কলকাতায় গিয়ে করিয়ে এনেছে ও দুটি—"

সোনার টুকরো দুইটি ভ্যানিটি ব্যাগে পুরিয়া খেজুরি বিবি তাহার সেই টোল খাওয়া হাসিটি হাসিয়া কার্তিকের দিকে চাহিয়া রহিল।

কার্তিক চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল সহসা।

"চপলাদি আমি চললুম। খেজুরিতে আর যাব না—"

"কোথায় যাবে?"

"যেদিকে দু'চক্ষু যায়। এত রকম রহস্যের জট ছাড়ানো আমার কর্ম নয়। আমি সহজ সরল জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত, এত রকম ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে আমি শান্তি পাব না। চললুম। একটা কথা কিন্তু বলে যাচ্ছি—তুমি আমার কাছে এখনও সীতারামের শ্রীই আছ। তোমার বাইরের ছদ্মবেশ আমাকে একটুও ভোলাতে পারেনি।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও সৃষ্টির সঙ্গে আমার তুলনা না দিলে তোমার যদি তৃপ্তি না হয় তাহলে আমাকে বরং দেবীচৌধুরাণী বলতে পার। অবশ্য দেবীচৌধুরাণীর পায়ের নখের সঙ্গেও আমার তুলনা চলে না। আমি সত্যিই অতি সাধারণ মেয়েমানুষ—"

"আচ্ছা আমি চললুম—"

"তোমাকে যেতে আমি দেব না সুরং। তুমি কাল আমাকে বলেছিলে, তুমি এ যুগের গোপালদেব হতে চাও। সে সুযোগ তোমাকে আমি করে দেব। শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে, এ যুগের গোপালদেব রাজা হবে না। সে সিংহাসনে আরোহণ করবে না, নিজের খ্যাতির ঢাক পেটাবে না, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবে না, সে কেবল সেবা করবে। আমাদের দেশ, বিশেষত নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, নানা দুঃখে কাতর। যারা রাস্তায় হাত পেতে ভিক্ষা করতে পারে তারা দুঃখী নয়, যারা গুণ্ডা জোর জবরদস্তি করে লুটপাট করে তারাও দুঃখী নয়, যারা গণতন্ত্রের কল্যাণে দেশের শাসনকর্তা তারা দুঃখী নয়, যারা ধনী তারা নো নয়ই—দুঃখী শুধু ওই ভদ্র নিম্নমধ্যবিত্তের দল যারা ভিক্ষে করতে পারে না, লুটপাট করতে পারে না, ভোট সংগ্রহ করে মন্ত্রী হতে পারে না, যারা সমাজের সব রকম দায়িত্ব বহন করে, অথচ যারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, শিক্ষা পায় না, দারিদ্র্যের জন্যই যাদের বারবার পদস্খলন হচ্ছে। ওদেরই বাঁচাতে হবে, ওদেরই সেবা করতে হবে। বর্তমান যুগের গোপালদেব ওদেরই সেবা করবে, ওদেরই বাঁচাবে, দরকার হলে ওদের জন্যে প্রাণবিসর্জন দেবে। কিন্তু সে রকম লোক কোথাও পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে আমার আশা হয়েছে—"

"দেশসেবকের তো অভাব নেই, কাগজে দেখি—"

"কাগজের দেশসেবক অনেক আছে। তাঁদের ছবি ছাপা হয়, তাঁরা রেডিওতে 'টক' দেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে প্লেনে উড়ে উড়ে বেড়ান, কিন্তু আমি যে ধরনের সেবক চাইছি ওঁরা ঠিক সে জাতের নন। কাগজের দেশসেবকদের সেবা করার চেয়ে আত্মপ্রচারের দিকেই লক্ষ্য বেশী। সেবা করা বড় শক্ত কাজ। যার সেবা করবে তার আত্মসম্মানে আঘাত না করে তার আপন জন না হয়ে যেতে পারলে তাকে সেবা করা যায় না। সেবা করতে হলে ভালোবাসতে হবে। একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে পাইকারি রীতিতে ভালো ভালো বক্তৃতা করা সহজ কিন্তু পাইকারি হিসাবে ভালোবেসে সেবা করে আগে আপন কর, তারপর দ্বিতীয় পরিবারের সঙ্গে আলাপ কোরো। আলাপ অবশ্য আপনিই হবে, প্রেমের আলো সূর্যের আলোর চেয়ে দ্রুতগামী। তোমাকে আমার চাই সুরং—"

লর্ড মুখ তুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে খেজুরি বিবির কথাগুলি শুনিতেছিল। রাখাল বাহিরে গিয়াছিল পালকিতে বিছানা পাতিবার জন্য। কার্তিকও অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল খেজুরি বিবির মুখের দিকে। 'তোমাকে আমার চাই সুরং'—এই কথাগুলি একটা দমকা হাওয়ায় মতো আসিয়া রহস্যের কুয়াশাটাকে যেন উড়াইয়া লইয়া গেল। সহসা সে যেন চপলাদির সত্য রূপটা দেখিতে পাইল। তবু তাহার মনের সংশয় ঘুচিল না। তবু সে বলিল,''চপলাদি, সব কথা পরিষ্কারভাবে না জেনে তোমার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারব না। আমাকে অকপটে সব খুলে বল। আভাসে ইঙ্গিতে এতক্ষণ তোমার যে পরিচয় পেয়েছি তা আলো-আঁধারির মতো রহস্যময়। তাছাড়া আর একটা কথা আছে। নিমুকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। বুঝতে পারছি দেশে আমার বাস্তুভিটেতে আমি যেতে পারব না। কোথাও একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে নতুন বাসা করে সেখানেই নিমুকে নিয়ে আসতে হবে—আমি সেই চেষ্টাই করতে চাই—''

''আমিও সেই ব্যবস্থাই করতে চাইছি তোমার জন্যে। নিমুকে আমারও চাই। খেজুরিতে আমার অনেক ধানের জমি আছে। যদিও গভর্ণমেন্ট সে ধানের অনেকখানি নিয়ে নেয়, তবু যা বাঁচে তাতে আমাদের খাওয়া-পরা স্বচ্ছন্দে চলবে। তরিতরকারিও অনেক হয়, পুকুরে মাছ আছে, হাঁস মুর্গিও পুষেছি, গরু আছে। খাওয়ার অভাব হবে না তোমাদের। তোমাকে থাকার জন্যে আলাদা বাড়িও দিতে পারব একটা। তাছাড়া তুমি মাসে মাসে দুশো টাকা করে হাতখরচ যদি পাও—তাহলে তোমার কি চলবে না?''

''মাসে মাসে দু'শ টাকা আমাকে দেবে কে—''

''কে দেবে তা এখন নাই শুনলে। কিন্তু আমি যখন বলছি পাবে, তখন পাবেই।''

''কি কাজ করতে হবে আমাকে?''

''ওই তো বললুম। কাজটা বাইরে থেকে দেখতে সহজ। তোমাকে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অভিযোগের খবর নিতে হবে আর সেগুলি মোচন করতে হবে। সস্তায় চাল ডাল গম দিতে হবে তাদের। আর খেজুরি গ্রামের একটি দরিদ্র ভদ্রপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। তাদের ভালোবেসে তাদের শত দোষ ক্ষমা করে তাদের সেবা করতে হবে। তাদের মানুষ করে তুলতে হবে। পরিবার বড় নয়, একটি ছেলে দুটি মেয়ে, আর তাদের বাবা মা। বাবা সামান্য চাকরি করেন। কাজটা বাইরে থেকে দেখতে সহজ। কিন্তু আসলে খুব কঠিন কাজ। নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, চরিত্রবান, প্রেমিক না হলে এ কাজ করতে পারবে না। দু'জন লোক রেখেছিলাম পর পর। তারা কেউ মনোমত হলো না। কাল হঠাৎ তোমাকে পেয়ে গেছি সুরং, তোমাকে আমি ছাড়ব না, এ কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে—''

''এসব কাজে তো অনেক টাকা দরকার। সে টাকা পাচ্ছ কোথায় তুমি।''

''সবই জানতে পারবে। তোমার কাছে কিছুই লুকোব না। কিন্তু তোমাকে একটি মাত্র অনুরোধ করব—কারো কাছে কিছু প্রকাশ কোরো না। করলে আমি মহাবিপদে পড়ব—''

''এতে এত লুকোছাপার কি থাকতে পারে তাতো আমার মাথায় ঢুকছে না।''

''ঢুকবে। খেজুরিতে চল সব বলব। যেতেই হবে তোমাকে।''

লর্ড হঠাৎ কার্তিকের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া উন্মুখ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর 'কুঁই' 'কুঁই' করিতে লাগিল।

"ওই দেখ তোমার কুকুরও তোমাকে অনুরোধ করছে।"

"অনুরোধ করছে, না মানা করছে কি করে বুঝলে—"

"ওর মুখ দেখে। শুনলাম রাখাল ওকে আজ মাংস খাইয়েছে—"

"তাহলে পালিয়ে এল কেন?"

"তোমাকে ডাকতে এসেছে।"

রাখাল প্রবেশ করিয়া বলিল—"মা, পালকি তৈরী হয়েছে। কুকুরটাকে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব?"

"না, ওটা আমার সঙ্গে পালকিতেই যাবে—"

লর্ড হঠাৎ মুখ তুলিয়া একটানা ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ শব্দ করিল, মনে হইল যেন আবদার করিতেছে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে ফেলে যাব না, সঙ্গেই নিয়ে যাব, চল না—"

কার্তিক উঠিয়া দাঁড়াইল।

সহসা খেজুরি বিবি তাহার হাত দুইটি ধরিয়া একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করিয়া বসিল।

"তুমি আমাকে কথা দাও সুরং, তুমি আমাকে ফেলে পালাবে না। তুমি জান না, আমি সত্যিই বড় অসহায়।"

।। ৩ ।।

"গঙ্গার ধারের বাংলোটি গোপালদেবের খুব পছন্দ হইয়াছিল। উত্তরদিকে গঙ্গা এবং দক্ষিণে বিস্তৃত 'লন'। ঘরে অনেক জানলা। প্রত্যেক জানলা দিয়াই আকাশ দেখা যায়। তাঁহার সমস্ত ঘরটাই যেন আকাশময়। বাহিরের ঘরটাতে দেওয়াল ঘেঁষিয়া তাঁহার লাইব্রেরির আলমারিগুলি দাঁড়াইয়া আছে। আলমারিগুলির মধ্যেও অনেক আকাশ, অনেক মনের অনেক কবির, অনেক মনীষির, অনেক প্রতিভার আকাশ। এখানে গোপালদেব ভালোই ছিলেন। তাঁহার যে আত্মীয়টি বাড়ি এবং বিষয়ের উপর দাবী করিয়াছেন, গোপালদেবের ব্যারিস্টার তাহার সহিত পাঞ্জা কষিতেছেন এবং গোপালদেবকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যদিও কিছু সময় লাগিবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি জিতিবেন। গোপালদেব বৈষয়িক লোক নন, সুতরাং বৈষয়িক ব্যাপার তাঁহার মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। তিনি এখন যে পরিবেশে আছেন তাহা তাঁহার অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছে, ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাঁহার পুরাতন বাড়ির ত্রিতলের ঘরটার কথা এখন স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে পড়ে এবং স্বপ্নের মতোই ভালো লাগে। সেখানে হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে কোনও ক্ষোভ নাই, স্বপ্নকে স্বপ্নের মাধুর্য দিয়াই তিনি মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাকে বাস্তবে পান নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হন নাই। তবে তাঁহার চিত্ত যে একেবারে ক্ষোভ-হীন তাহা নহে। গঙ্গার ধারে যে চমৎকার বাংলোটিতে তিনি আছেন তাহার মালিক রামগম্ভীর সিং। খুব বড়লোক। এককালে সে তাঁহার ছাত্র ছিল। তাঁহারই সাহায্যে সে এম-এ পাশ করিয়াচে, ইতিহাসে ডক্টরেটও হইয়াছে। সে যখন তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই সে অত বড়লোকের ছেলে। গোপালদেব টিউশনি করিতেন না। যখন যে ছাত্র আসিত এমনিই তাহাদের পড়াইয়া দিতেন। অনেক বাঙালী ছাত্রকেও তিনি পড়াইয়াছেন। কিন্তু কার্যসিদ্ধি হওয়ায় পর অর্থাৎ পাশ করিবার পর কোনও বাঙালী ছেলের টিকি তিনি আর দেখিতে পান নাই। বিহারী ছাত্র রামগম্ভীর কিন্তু মাঝে মাঝে আসিত এবং তাঁহার খবর লইয়া

যাইত। তাঁহার বাত হইয়াছিল, সাধারণ ঔষধে কোনও ফল হইতেছিল না একজন কবিরাজের পরামর্শ করিয়া সে এক হাঁড়ি শুশুকের তেল তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিল এবং তাহাতে তিনি উপকারও পাইয়াছিলেন। তিনি দাম দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রামগম্ভীর দাম লয় নাই, বলিয়াছিল—আপনার সেবায় এই সামান্য জিনিস দিলাম এর দাম কি নেব। আমার দাম লাগে নি, আমার জেলে প্রজারা দিয়েছে। সেইদিনই গোপালদেব জানিতে পারেন রামগম্ভীর জমিদারের ছেলে। তখনও জমিদারপ্রথা লোপ পায় নাই। একদিন আসিয়া বলিল সে নিজেদের গ্রামে একটা স্কুল করিয়াছে, সেই স্কুলের উদ্বোধন দিবসে গোপালদেব যদি যান সে কৃতার্থ হইবে। গোপালদেব বিশেষ কোথাও যান না। তাহার স্কুল উদ্বোধন করিতেও যান নাই। তাহার পর অনেকদিন কাটিয়াছে, আমরা স্বাধীন হইয়াছি, দেশে অনেক রকম রাজনৈতিক ওলটপালট হইয়াছে। হঠাৎ রামগম্ভীর একদিন আসিয়া বলিয়াছিল—সার, আপনি এম-পি হইবার জন্য প্রার্থী হোন। যাহাতে আপনি জেতেন তাহার সব বন্দোবস্ত আমি করিয়া দিব। গোপালদেব রাজি হন নাই। কিন্তু তখনই তিনি শুনিয়াছিলেন, এ-অঞ্চলের ভোটদাতারা রামগম্ভীরের কথায় উঠবোস করে। রামগম্ভীর নিজে কখনও মিনিস্টার বা এম-পি হইবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সাহায্যে অনেক লোক মিনিস্টার হইয়াছে। সে নিজে চাষী। দেহাতে তাহার অনেক জমি আছে। জমি লইয়াই সে থাকে। তাহার 'কামতে' একটি ভালো লাইব্রেরিও সে করিয়াছে। এজন্য গোপালদেবের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একাধিকবার সে আসিয়াছে তাঁহার কাছে। তখনও গোপালদেব জানিতে পারেন নাই যে শহরেই গঙ্গার ধারে তাহার এমন সুন্দর একটি বাড়ি রহিয়াছে। জানিলে এইখানেই তাহাকে লাইব্রেরী করিবার পরামর্শ দিতেন। রামগম্ভীর বাড়িটি করিয়াছিল ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য লইয়াই। তাহার ইচ্ছা ছিল এখানে ঐতিহাসিক মিউজিয়ম করিবে এবং গোপালদেবের তত্ত্বাবধানে সেটি থাকিবে। কিন্তু সিভিল সার্জনের মুখে যখন সে গোপালদেবের মানসিক এবং বৈষয়িক বিপর্যয়ের কথা শুনিল এবং সিভিল সার্জন যখন বলিলেন যে কোনও নির্জন স্থানে কিছুদিন থাকা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দরকার তখন সে ওই বাড়িটি গোপালদেবের সেবায় উৎসর্গ করিল। গোপালদেবকে সত্যই সে ভক্তি করিত। সুতরাং 'উৎসর্গ' কথাটা কেবল আলঙ্কারিক শোভা হিসাবেই ব্যবহার করিতেছি না, রামগম্ভীরের আন্তরিকতার প্রকাশ করিতে হইলে ওই কথাটাই ব্যবহার করিতে হয়। রামগম্ভীর সিভিল সার্জনকে বলিল, বাড়িটা যে আমার একথা মাস্টার মশাইকে বলিবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখা গেল না। গোপালদেব প্রায়ই সিভিল সার্জনকে প্রশ্ন করিতেন, বাড়ির ভাড়া কত, বাড়ির মালিক কে, কোথায় ভাড়া পাঠাইব, এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকে রাখিয়াছ কেন। তখন সিভিল সার্জন একদিন বলিলেন—বাড়ির মালিককে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। দিন দুই পরে রামগম্ভীর সসংকোচে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"কি খবর রাম। ভালো আছে তো। আমি মহাবিপদে পড়েছি। মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল দিন কয়েকের জন্য। সুরেশের চিকিৎসায় এখন অনেকটা ভালো আছি। এর উপরে আর এক মুশকিল হয়েছে, আমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে মকোর্দমা করে আমাকে আমার বাড়ি থেকে উৎখাত করেছে। এখন পরের বাড়িতে এসে থাকতে হচ্ছে—"

রামগম্ভীর সবিনয়ে বলিল—"এটাও পরের বাড়ি নয়। আপনারই বাড়ি—"

"না, না এটা—"

"আপনার ছেলের বাড়ি—"

"আরে না না আমার ছেলে তো—"

"আমি কি আপনার ছেলে নই?"

গোপালদেব বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রামগম্ভীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"এটা তোমার বাড়ি?"

"আপনারই বাড়ি। যতদিন ইচ্ছে থাকুন—"

গোপালদেব নির্বাক হইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কিন্তু তোমাকে এর ভাড়া নিতে হবে রাম।"

"এ কথা কেন বলছেন, কি অপরাধ করেছি আপনার কাছে!"

"অপরাধ কিছু কর নি। তুমি খুব ভালো ছেলে। কিন্তু আমারও একটা আত্মসম্মানবোধ আছে—ইংরেজিতে যাকে 'প্রেস্টিজ' বলে—আমি তোমার মহত্ত্বের সুযোগ নিয়ে তোমার বাড়িতে বিনা পয়সায় থাকব, এটা কি ভালো—এটা ভাড়া দিলে তুমি মাসে অন্তত পাঁচশ টাকা পাবে—"

"এ বাড়ি ভাড়া দেবার জন্যে আমি করি নি মাস্টার মশাই। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যেই এটা করেছি আমি। ইচ্ছে আছে এখানে একটা হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়াম (historical meseum) করব—আপনিই সে মিউজিয়ামের কর্তা হবেন। আপনার আশীর্বাদে আমার সংসারে অসচ্ছলতা নেই, আপনার কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমাকে সংসার চালাতে হবে না—আপনি আমার বাড়িতে আছেন এতেই আমি কৃতার্থ। আপনি মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না। আপনার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তা অমূল্য—তার দাম কখনও দিতে পারব না। আমার বাড়িতে কিছু দিন বাস করলে—"

গোপালদেব বজ্রকণ্ঠে তাহাকে থামাইয়া দিলেন—"তা হয় না রাম। আমি সেকেলে লোক—আই বিলিভ ইন ওলড্ ভ্যালুজ (I believe in old Values). আমি ছাত্রের কাছে কখনও পয়সা নিইনি, কখনও নেব না। তুমি বাঁকা পথে আমাকে টাকা দেবার চেষ্টা কোরো না। যদি ভাড়া না নাও, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!"

রামগম্ভীর হেঁটমুখে কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বলিল—"আচ্ছা ভেবে দেখি, পরে জানাব আপনাকে।" প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে এখনও রামগম্ভীরের কোনও খবর আসে নাই। গোপালদেবের মনে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে, কেবলই মনে হইতেছে সকলেই আমাকে অনুগ্রহ করিতেছে। যে নার্সটি সুরেশ এখানে বাহাল করিয়াছে সে-ও বেতন সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে না। গোপালদেব একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে বলিল—সুরেশবাবু আমাকে মাইনের কথা কিছু বলেন নি। তিনি যা ঠিক করবেন তাই হবে। সুরেশকে (সিভিল সার্জন) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"নার্সটির মাইনে কত? এতদিন কাজ করছে এখনও তো দিইনি কিছু। চায় না, কাল জিগ্যেস করাতে বললে তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে।"

"কেমন লাগছে মেয়েটিকে—"

"চমৎকার!"

"কি হিসেবে চমৎকার?"

"নিজেকে কখনও থ্রাস্ট (thrust) করে না। অকারণে কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করতে দেখিনি কখনও। নেপথ্যেই থাকে, অথচ মনে হয় বাড়িটা পূর্ণ করে আছে।"

"তুমি যা যা করতে বলেছ তা ভালোভাবে করে তো?"

"হ্যাঁ। কোন খুঁত ধরতে পারি নি। ওর মাইনে একশ টাকা করে দেব ভেবে রেখেছি—"

"বেশ। টাকাটা নিয়ে যাও তাহলে আমার কাছ থেকে!"

"দাঁড়াও দাঁড়াও অত ব্যস্ত হয়ো না। একটা কথা আছে—"

"কি—"

"নার্সের মাইনে প্রবাল দেবে বলেছে। বলেছে বাবার সেবা করবার সুযোগ পাইনি জীবনে। আমাদের তিনি কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। এই সুযোগটা অন্তত আমাকে দিন। নার্সের মাইনেটা আমি দেব। আমি তাকে বলেছি বেশ দিও। তাই তোমার কাছে চাইনি—"

সুরেশবাবু আড়চোখে একবার গোপালদেবের দিকে চাহিলেন। গোপালদেব খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া পা নাচাইলেন। তাহার পর বলিলেন—"দেখ, যে লোকটা নিজের গায়ের জোরে স্বচ্ছন্দে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারে তার প্রতি অনুগ্রহ করে কেউ যদি তাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যেতে চায় তা যেমন হাস্যকর হয় তোমরা তেমনি করছ। কারো অনুগ্রহের কিছুমাত্র দরকার নেই আমার, অথচ তোমরা সবাই আমাকে অনুগ্রহ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ। রামগম্ভীর বাড়ির ভাড়া নিতে চাইছে না, ভেবে দেখি বলে সেই যে চলে গেছে আর কোনও খবর দেয়নি। আমার উপর এতো অনুগ্রহ বর্ষণের মানে কি। আমি কারও অনুগ্রহভাজন হতে চাই না—"

"তুমি ভুল করছ গোপাল। প্রশ্নটা অনুগ্রহের নয়, কর্তব্যের। তোমার ছেলে, তোমার শিষ্য তাদের কর্তব্য পালন করছে তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?'

"আমার শিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধটা আধ্যাত্মিক থাকুক এইটেই আমি বরাবর চেয়ে এসেছি, সেটাকে আর্থিক নোংরামির মধ্যে নামিয়ে আনতে চাই না। দরকার হলে হয়তো নামিয়ে আনতে হত কিন্তু আমার সে দরকার নেই। আর ছেলের কথা বলছ? যে ছেলে আমার আদর্শের মুখে লাথি মেরে চোং প্যাণ্ট পরে বেলেল্লাগিরি করে বেড়াচ্ছে, যে নীচ বংশের মেয়েকে বিয়ে করে আমাদের বংশে কালি দিয়েছে তার কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেব একথা যদি তুমি ভেবে থাক তাহলে বলব এতদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তুমি আমাকে চেননি। তার মা তাকে 'নাই' দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে কারণ—"

সুরেশবাবু বাক্যটি সম্পূর্ণ করিয়া বলিলেন—"কারণ তিনি মা, সর্বংসহা বসুমতীর মতো মা-ও সর্বংসহা। যে ছেলে মাকে রোজ মারে সে ছেলেকেও মা ছেড়ে যেতে পারে না। কিন্তু তোমার ছেলে অত খারাপ নয়। সে ভালো ছেলে। সে-ও আদর্শবাদী, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তার আদর্শের সঙ্গে তোমার আদর্শের মিল নেই। তুমি যদি চেষ্টা করতে হয়তো মিল হত। কিন্তু তুমি চেষ্টা করনি—"

"তার মানে?"

"তুমি নিজেকে নিয়েই সব সময় কাটিয়েছ। ওদের আদর্শ গঠন করবার দিকে মন দাওনি। ওরা পরিবেশ অনুসারে নিজেদের আদর্শ নিজেরাই গড়েছে—"

গোপালদেব কোন উত্তর দিলেন না। নির্বাক বিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেশবাবু বলিয়া চলিলেন—"একথাটা ভুললে চলবে না যে আমাদের মধ্যে পশুত্ব এবং মনুষ্যত্ব দুটো জিনিসই পাশাপাশি স্ফুরিত হয়। এদের নিজের মনোমত করতে হলে অনেক খাটতে হয়, নিম্নস্তরের প্রাণীদের 'ট্রেন' করতে খুব বেশী খাটতে হয় না। একটা লতাকে অতি সহজে নিজের ইচ্ছামতো যে কোনও দেওয়ালে বা যে কোনও বেড়ায় ওঠানো যায়, কিন্তু কুকুরটাকে 'ট্রেন' করতে আরও পরিশ্রম করতে হবে, কারণ তার মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তিত্বটা যাকে ইংরেজিতে বলে individuality আরও প্রবল, তা সহজ কারো কাছে নতিস্বীকার করতে চায় না। মানুষকে 'ট্রেন' করা আরও কঠিন। কারণ তার মনুষ্যত্ব আরও স্বাধীন আরও পরিস্ফুট। তাকে নিজের আদর্শের অনুরূপ করতে হলে অহরহ তাকে নিজের কাছে রেখে সেই আদর্শের মন্ত্র তার কানের কাছে জপ করতে হবে, তাকে বাইরের প্রভাব থেকে বাঁচাতে হবে, নিজের চারিত্রিক আদর্শ তার কাছে অম্লান রাখতে হবে এবং সর্বোপরি তাকে ভালবাসতে হবে। ভেবে দেখ, তুমি এর কতটুকু করেছ?"

গোপালদেব মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু মুখে বলিলেন—"যতটা করা সম্ভব ততটা করেছি বইকি। ভালো ভালো মাস্টার রেখেছি ওদের জন্য, ভালো ভালো স্কুলে কলেজে ভরতি করে দিয়েছি, বাপের পক্ষে ছেলেমেয়েদের যতটা ভালোবাসা স্বাভাবিক এবং সম্ভব ততটা ভালোওবেসেছি। তার ফল যে এই হবে—"

"ফল কিছু খারাপ হয়নি। প্রবাল ভালো ছেলে। তবে সে তোমার আদর্শের অনুরূপ হয়নি। তার কারণ সেজন্য তোমার একাগ্র চেষ্টা ছিল না। ছেলে-মেয়ে মানুষ করা অনেকটা ছবি আঁকার মতো। তোমার ছবি তোমাকেই আঁকতে হবে, অপরের সাহায্য নিয়ে আঁকলে সে ছবি তোমার ছবি হবে না, তাদের ছবি হবে। তবে এটা জেনে রেখো প্রবাল খারাপ ছেলে নয়। তার পোষাক-পরিচ্ছদ হাব-ভাব মতামত হয়তো তোমার সঙ্গে মেলে না কিন্তু তবু বলব সে খারাপ ছেলে নয়। আর এটাও বলব তার সঙ্গে তোমার অমিলের চেয়ে মিলই বেশী আছে, যদিও বাইরেটা অন্য রকম। তুমিও কি তোমার পূর্বপুরুষদের হুবহু নকলমাত্র? তাঁরা গোঁফ দাড়ি রাখতেন, তুমি ক্লীন শেভ্ড্। তারা বহুবিবাহে বিশ্বাসী ছিলেন, তুমি একটি মাত্র বিবাহ করেই হাঁপিয়ে পড়েছ, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো তান্ত্রিক ছিলেন, মা কালীর সামনে নরবলি দেওয়া অন্যায় মনে করতেন না, তুমি নিশ্চয় সেটা সমর্থন কর না, তাঁদের পণপ্রথা, তাঁদের কৌলিক আচার-বিচার, তাঁদের দশবিধ সংস্কার—এর অধিকাংশই তুমি মান না। তাতে কিছু ক্ষতিও হয়নি, তুমি ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজি আদর্শে নিজেকে গড়েছ। পূর্বপুরুষের নকল নও বলে মানুষ হিসাবে তুমি খারাপ হওনি। তুমি চরিত্রবান, বিদ্বান, সত্যনিষ্ঠ, ভণ্ডামিকে ঘৃণা কর,— তোমার ছেলে প্রবালও তাই। সে যদি বাজে দুশ্চরিত্র ছেলে হত তাহলে আলতাকে সে বিয়ে করত না, ফেলে পালাতো। সে-ও ভণ্ডামিকে ঘৃণা করে বলে তোমার কাছে বা তার মায়ের কাছে ছদ্মবেশের মুখোস পরে ঘুরে বেড়ায় নি। সে যা ভালো মনে করে তা প্রকাশ্যেই করেছে, প্রকাশ্যেই বলেছে। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে তার অমিলের চেয়ে মিলই বেশী। তোমার মতো সে-ও গোঁয়ার-গোবিন্দ। সে—"

গোপালদেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সে কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করেছে না কি!"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন সুরেশ ডাক্তার।

"সে আমাকে কিছু বলেনি।"

"তুমি বলেছিলে তার ভোজের খরচ সে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছে। লটারির টাকা পেয়েছে না কি!"

সুরেশবাবু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'টাকাটা আমিই দিয়েছিলাম তাকে। আলতাকে একখানা বেনারসী শাড়ি আর আড়াই হাজার টাকার চেক দিয়েছিলাম আমি—"

"তুমি একাজ করতে গেলে কেন?"

"দেখ ভাই, আমি ব্যাচিলার মানুষ। তুমি আমার বাল্যবন্ধু। প্রবালকে আমিও ছেলের মতো ভালোবাসি। তাছাড়া তোমার উপর টেক্কা দেবার ইচ্ছা হল—ছেলেবেলায় তোমার ঘুড়ি কেটে দিতাম— সে প্রবৃত্তিটা আমার যায়নি এখনও।"

সুরেশবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমার এই গণ্ডমূর্খ অসভ্য ছেলেটাকে তোমার ভালো লাগে? তোমার সম্বন্ধে ধারণাই বদলে গেল আমার!"

"তোমার ছেলে গণ্ডমূর্খও নয়, অসভ্যও নয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়েব পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি, কিন্তু সে গণ্ডমূর্খ নয়। পরীক্ষায় পাশ করার দিকে বাঙালী ছেলের আর উৎসাহ নেই। তোমাদের সময় তোমরা জানতে যে পরীক্ষা পাশ করলেই তোমরা একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারবে, হতেও, কিন্তু এখন আর সে আশা নেই। এখন আমাদের দেশের অধিকাংশ ভালো ছেলেরা বেকারের দলে। কম্‌পিটিটিভ্ (competitive) পরীক্ষাতে পক্ষপাতের বিষ ঢুকেছে। তাই পরীক্ষায় পাশ করার দিকে বাঙালী ছেলের আর তেমন উৎসাহ নেই। উৎসাহ না থাকার আর একটা কারণ তোমাদের সময় স্কুল কলেজে যে রকম শিক্ষক ছিলেন আজকাল আর সে রকম নেই। আজকাল অধিকাংশ মাস্টার প্রফেসারই অর্থলোলুপ দোকানদার। হয়তো বাধ্য হয়েই তারা দোকানদার হয়েছে, কিন্তু হয়েছে বলে ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ করতে পারছে না তারা। আগে আমরা আমাদের শিক্ষকদের নিয়ে আড়ালে আবডালে একটু আধটু ঠাট্টা মশকরা করতুম—যেমন হেরম্ব মৈত্র, মনমোহন ঘোষ, আমাদের মেডিকেল কলেজের গ্রীন আরমিটেজ, অ্যানাটমির শিক্ষক নগেন চাটুজ্যে, বসাক—কিন্তু এদের আমরা শ্রদ্ধাও করতুম খুব। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোনও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করতে পারে না। সকলেরই উপর তাদের ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা তাদের চরিত্রকে বিষময় করে তুলেছে। শুধু শিক্ষকদের উপর নয়, গভর্ণমেণ্টের উপর, নেতাদের উপর, লেখকদের উপর, ব্যবসায়ীদের উপর—কারো উপরই এ যুগের ছাত্ররা সশ্রদ্ধ হতে পারছে না, তাদের মনে হচ্ছে সবাই চোর, সবাই মতলববাজ। এই অশ্রদ্ধারই নানাবিধ প্রকাশ দেখেছি ছাত্র-আন্দোলনে। ওরা খারাপ নয়, ওরা ডিস্‌অ্যাপয়েনটেড্ (disappointed)—দু'চারজন গুণ্ডাপ্রকৃতির খারাপ ছেলে ওদের মধ্যে নেই তা বলছি না, কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই ভালো, তারা আরও ভালো হতে চায়—কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই বিদ্রোহ করছে। যা কিছু পুরাতন তাই ভেঙ্গে ফেলবার জন্য তারা উদ্যত— যে মনোভাব হলে লোকে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করে না, ওদের সেই রকম মনোভাব। লেখাপড়াতেও এ যুগের ছেলেরা যে সবই খারাপ তা নয়, ওদের মধ্যে অনেক ভালো ছেলে আছে। তোমার প্রবালও খুব ভালো ছেলে। সে মূর্খ নয়। তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি তার বিদ্যে 'রীডার্স ডাইজেস্ট' বা

বিলিতী-বিজ্ঞাপন-গান্ধী-খবরের-কাগজ পড়া পল্লবগ্রাহিতা নয়। অনেক ভালো বই পড়েছে সে। শেকস্‌পীয়র শেলী রবীন্দ্রনাথ তার কণ্ঠস্থ, তোমার সব লেখাও তন্ন তন্ন করে পড়েছে, সেদিন দেখলাম শেল-উল-মুতাক্ষরিণের অনুবাদ পড়ছে। খুব পড়ে—"

"তার সঙ্গে তোমার এত আলাপ হল কি করে?"

"সে আমার বন্ধু যে। আমার বাড়িতে রোজ 'ব্রীজ' খেলতে আসে। ব্রীজও খুব ভালো খেলে—"

হঠাৎ গোপালদেব বলিলেন—"একটা কথা তুমি জেনে রাখ সুরেশ, তোমার চক্ষে প্রবাল যত ভালোই হোক আমার আত্মসম্মানকে সে ক্ষুণ্ণ করেছে। তার সঙ্গে আপোস আমি করতে পারব না। করবার দরকারও নেই। নীলা আর মগনলাল শুনলাম বিলেত চলে গেছে। যাক। যে যেখানে গিয়ে সুখে থাকে থাকুক, কিন্তু আমি কারও সঙ্গে আপোস করব না। আমার মহান আছে, আর ওই নার্স মেয়েটিও খুব ভালো, ওরা যদি টিকে থাকে, আমার চলে যাবে—মহান—"

মহাদেব দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন—"আমার চেক বুকটা দিয়ে যাও তো—"

মহাদেব চলিয়া গেলে সিভিল সার্জন জিজ্ঞাসা করিলেন,"নীলারা বিলেত চলে গেছে এ খবর তোমাকে কে দিলে?"

"আমার পাবলিশার। যাবার আগে সে নাকি আমার এক সেট বই তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেছে। আমার নামে একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছে। মগন আমারই ছাত্র। লিখেছে ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যেই সে বিলেত যাচ্ছে। যে থীসিস সে লিখবে তাতে সে আমার লেখা থেকে কিছু কিছু 'কোটেশন' দিতে চায়, তাই আমার অনুমতি চেয়েছে।"

"তুমি অনুমতি দিয়েছ?"

"আমি নিজে কোনও চিঠি লিখি নি। আমার হয়ে আমার পাবলিশারই অনুমতি দিয়েছেন। আপত্তি করিনি। ছাপা বই থেকে যে কেউ 'কোটেশন' করতে পারে—"

মহাদেব 'চেক বুক' লইয়া হাজির হইল।

"সুরেশ তোমাকে ওই নার্সটির এক বছরের মাইনে এই চেকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে দিয়ে দিও—"

"আহা ওর জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তুমি। পরে দিলেও চলবে—"

"যদি না নাও, তাহলে কাল থেকে ওর আসবার দরকার নেই—"

"বেশ দাও তাহলে। সত্যি কি জেদী তুমি! মেয়েটিকে তোমার ভালো লেগেছে তো?"

"খুব ভালো লেগেছে—"

গোপালদেব আড়াই হাজার টাকার একটা চেক লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"একশ' টাকা মাসে খুব কম হয়। আমি দু'শো টাকা দিতে চাই। আর একশ টাকা বেশী দিলাম, ওকে একখানা ভালো শাড়ি কিনে দিও—"

"হঠাৎ এরকম বদান্যতা!"

গোপালদেব কয়েক মুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"মেয়েটি সত্যিই ভালো। এখানে বাথরুমে 'ফ্লাশ্‌' নেই, খারাপ হয়ে গেছে। আমি একটা আলাদা কমোড কিনে সেইটেই ব্যবহার করি, একটা মেথর এসে রোজ পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। দু'দিন মেথর আসেনি।

মহানের কাছ থেকে শুনলাম ওই মেয়েটিই কমোড পরিষ্কার করেছে, অথচ আমাকে কিছুই জানতে দেয়নি। আমি ভেবেছিলাম মেথরই এসে বুঝি পরিষ্কার করে গেছে। তারপর ব্যাপারটা মহানের কাছে শুনলাম। ও আমাকে কিছু বলেনি কিন্তু। এইটেই আমার খুব ভালো লেগেছে। ওকে ভালো একটা শাড়ি কিনে দিও। যদি একশ টাকার বেশীও লাগে তা-ও দেব আমি—"

"চেকটা যখন আমার নামে লিখেছ তখন আমার ব্যাংকেই জমা করব। আমিই ওকে মাসে মাসে মাইনে দেব। শাড়িটা এখন দেব না।"

"কেন?"

"হঠাৎ একটা দামী শাড়ি দিলে সেটা একটু দৃষ্টিকটু দেখাবে। কয়েক মাস পরেই তো পুজো, তখন দিলেই হবে। এখন হঠাৎ শাড়ি দিলে লোকে কানাঘুষো করবে ভাববে, ওর সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা হয়েছে—"

"লোকের কানাঘুষোকে আমি গ্রাহ্য করি না। আর মেয়েটির সম্বন্ধে সত্যিই তো আমার দুর্বলতা হয়েছে। ওকে ভালো লেগেছে। ভাবছি ও যেন আমার নীলা—ছেলেবেলায় যে আমার 'পীসপট' পরিষ্কার করত—"

হঠাৎ থামিয়া গেলেন গোপালদেব।

তারপর বলিলেন—"কালই কিনে দিও ওকে শাড়িটা—"

"দেব, দেব, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"না, কালই দিও।"

ছেলেমানুষের মতো জিদ করিতে লাগিলেন গোপালদেব।

"বেশ তাই দেব। তুমি এখনও বড্ড ছেলেমানুষ আছ গোপাল। ভালো কথা, এখনও তেমনি ভিশন (vision) টিশন দেখ—"

"দেখি বই কি। ওই নিয়েই তো আছি। আগে ইতিহাসের কথা কাগজে লিখতাম, বইয়ে পড়তাম, এখন তা চোখের সামনে আকাশে মূর্ত হয়ে ওঠে। ভারি ভালো লাগে। সত্যের সঙ্গে কল্পনা, কল্পনার সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষার নানা ছবি দেখি।"

"কি ছবি দেখছ আজকাল—"

"কেন জানি না, গোপালদেবই যেন আজকাল আমার উপর ভর করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কিছু লেখা নেই, সেই জন্যে তাঁকে নিজের মতো করে গড়ছি। ভাবতে ভালো লাগছে যে সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে তিনি তাঁর চরিত্রবলে ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শকে — ওল্ড্ ইটারনাল ভ্যালুজকে (old eternal values) সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলেই সবাই তাঁকে নেতারূপে বরণ করেছিলেন। বিরাট আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে মহীরুহের মতো উঠেছিলেন তিনি নিজের চরিত্রবলে এবং সেই চরিত্রবলের উৎস ওল্ড ইটারনাল ভ্যালুজ। বিশুদ্ধ এবং দৃঢ়চরিত্র মানুষই সূর্যের মতো সব অন্ধকার দূর করে। এ যুগে তার একটিমাত্র নমুনা স্বামী বিবেকানন্দ। খাঁটি সোনার মূল্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। গোপালদেব খাঁটি সোনা ছিলেন। শশাঙ্কও সোনা ছিলেন, কিন্তু খুব খাঁটি নয়। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় রাজ্যশ্রীর সঙ্গে তাঁর একটা অবৈধ প্রণয় ছিল। সে প্রণয়কে তিনি সাবলিমেট (sublimate)

করতে পারেননি। তিনি ওই নিয়ে রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে, মৌখরিদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এই জন্যেই সম্ভবত অনেকে তাঁর শত্রু হয়েছিল। তিনি যদিও বাহুবলে আমরণ রাজত্ব করে গিয়েছিলেন, কিন্তু গোপালদেবের মতো কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল সব। তার পরই অনৈক্য, আত্মকলহ, বহিঃশত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণ এবং এর ফলে মাৎস্যন্যায়। এরপরে গোপালদেবের আবির্ভাব। আমার মনে হয়, এ আবির্ভাবের মূলে আছে 'ওলড্ ভ্যালুজ' (old values)—আর্য ঋষিরা একদিন যেমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ... গোপালদেবও তেমনি বলেছিলেন—"জাগো, ওঠ। পাঁকে ডুবে আর কতদিন থাকবে— পাঁক ধুয়ে ফেল, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াও আকাশের দিকে চেয়ে।"

সুরেশবাবু জানিতেন গোপালদেবের ইতিহাস ম্যানিয়া (mania) একবার মাথা চাগাড় দিলে সহজে থামিবে না। তিনি তাঁহার সামনে থাকিলে অনবরত বকবক করিবেন।

বলিলেন—"এখন চলি আমি। দু'একটা রোগী দেখতে হবে। বাকিটা পরে এসে একদিন শুনে যাব। তোমার এ বাড়িটা ভালো লাগছে তো?"

"খুব। কিন্তু তুমি রামগম্ভীরকে একটা খবর দিও। তাকে ভাড়া নিতে হবে। তা না নিলে আমি এখানে থাকব না।"

"সে তো এখানে থাকে না। আমি সুখলালকে বলে যাচ্ছি।"

"সুখলাল কে—"

"তার এ অঞ্চলে যত বাড়ি আছে তার ম্যানেজার। খান দশেক বাড়ি আছে ওর এ শহরে।"

"ও যে এত বড়লোক তা তো জানতাম না।"

"শুধু টাকার দিক দিয়ে বড়লোক নয়, মনের দিক দিয়েও রাম বড়লোক। সুখলাল তো ওর প্রশংসায় গদ্‌গদ। বলে, দেওতা। আচ্ছা, আসি এখন। বলব সুখলালকে।"

সিভিল সার্জন চলিয়া গেলেন।

আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন গোপালদেব। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে সূত্রধার ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন আবার। তাঁহার অঙ্গে রঙ্গন ফুলের অলঙ্কার, কণ্ঠে পলাশের মালা। মাথায় গৈরিক শিরস্ত্রাণ, তাহাতে কৃষ্ণচূড়ার একটি পুষ্পিত পল্লব অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। পরিধানে গৈরিক বসন গৈরিক উত্তরীয়।

সূত্রধার বলিলেন—"সভ্য মানুষ শবদেহকে পুড়িয়ে ফেলে কিংবা পুঁতে ফেলে। কেউ কেউ তাদের শকুনিদের মুখে সমর্পণ করে দেয়। একটা সাধারণ মানুষের শবদেহ নিঃশেষ হতে সময় লাগে না। দেখতে দেখতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা বৃহৎ, যাঁরা কীর্তি রেখে যান, তাঁদের বৃহত্ত্ব, তাঁদের কীর্তি পেতে কিছু সময় লাগে। বৃহৎ জন্তুও যখন মরে— যেমন হাতী বা গণ্ডার—তাদের শেষকৃত্য মানুষে যদি না করে তাহলে তাদের শবদেহও পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ চট্ করে শেষ করতে পারে না। বৃহৎ কীর্তি শেষ হতে অনেক সময় শতাধিক বৎসর লাগে। ওই দেখুন শশাঙ্কের কীর্তির ধ্বংসস্তূপের উপর শকুনি গৃধিনীর দল এসেছেন। ওই যে মঙ্গোলিয়ান মুখ দেখেছেন উনি তিব্বতের রাজা আর তাঁর পিছু পিছু আসছেন গুপ্তবংশের সম্রাটরা, ওই দেখুন আগুন জ্বলছে—ওঁরা টিকতে পারলেন না—জনমতের আগুনে আর ধোঁয়ায় সরে পড়ছেন সব। তারপর ধোঁয়া ধোঁয়া—ধোঁয়া—কেবল ধোঁয়া—"

গোপালদেব বিস্ফারিত নয়নে দেখিতে লাগিলেন আকাশপটে কৃষ্ণবর্ণ ধূমকুণ্ডলী বিসর্পিত হইতেছে, তাহার মাঝে মাঝে ক্কচিৎ অগ্নিশিখা। দেখিতে দেখিতে এ ছবিও ক্রমশ অপসৃত হইল। শস্যশ্যামল একটি ছবি আকাশপটে মূর্ত হইল আবার। আকাশচুম্বি মন্দিরচূড়া, কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে।

সূত্রধার বলিলেন—"অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সমৃদ্ধ পুণ্ড্রদেশের চিত্র ওই দেখুন আকাশপটে আভাসিত হয়েছে। কিন্তু এ সমৃদ্ধিও বেশী দিন থাকে নি। ওই দেখুন শৈলবংশীয় একজন রাজা এসে পুণ্ড্রদেশ জয় করেছেন। হাহাকার উঠেছে চতুর্দিকে—"

হাহাকারে চীৎকার গর্জনে আর্তনাদে বিলাপে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। একজন তন্বী শ্যামা সুন্দরীকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সূত্রধার বলিলেন—"উনি পুণ্ড্রদেশের রাজলক্ষ্মী, বেশী দিন শৈলবংশীয় রাজার কবলে থাকেন নি। ওই দেখুন কনৌজের রাজা। যশোবর্মা সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছেন—"

আবার রণাঙ্গনের চিত্র ফুটিয়া উঠিল আকাশে। কিন্তু তাহাও মিলাইয়া গেল দেখিতে দেখিতে। ইহার একটু পরেই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল কে যেন। সূত্রধর বলিলেন, "কনৌজের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাঁর 'গৌড়বহো' কাব্য পাঠ করেছেন। এ কাব্যে তিনি বঙ্গরাজ্যের রণ-হস্তিবাহিনীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ওই দেখুন যশোবর্মার রাজ্যও টিকল না। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটল। ওই দেখুন ওই কাশ্মীরের রাজকবি কল্‌হন্ আসছেন। তাঁর হাতে 'রাজতরঙ্গিণী'।"

কল্‌হন্ রাজতরঙ্গিণী খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। বহুকাল পূর্বে গোপালদেব রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছিলেন, তাহা বাংলা ভাষায় লেখা নয়, কিন্তু তাহার মনে হইল কল্‌হন্ যেন চলতি বাংলা ভাষাতেই বলিতেছেন—"ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিষ্ণুমূর্তি স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন যে কাশ্মীরে তাঁর কোন বিপদ ঘটবে না। কিন্তু কাশ্মীরেই তাঁকে হত্যা করেন ললিতাদিত্য। এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাংলা থেকে গৌড়রাজের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর কাশ্মীরে যান তীর্থযাত্রার ছলে। তাঁরা উক্ত বিষ্ণুমূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভুলক্রমে তাঁরা ভাঙতে আরম্ভ করেন আর একটি মূর্তি। ইতিমধ্যে কাশ্মীররাজার সৈন্যরা এসে তাঁদের বধ করে। ওই বাঙালী বীরগণের প্রভুভক্তি ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা আমি উচ্চকণ্ঠে করছি। উক্ত মন্দিরটি আজ শূন্য, কিন্তু গৌড়বীরগণের প্রশংসায় আজ পৃথিবী পূর্ণ। তাঁদের মহিমার জয় হোক।" কল্‌হন্ বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু মনে হয় পুণ্ড্ররাজ্য বেশী দিন ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেনি, কারণ, তাঁর পৌত্র জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বার হন আবার এবং সেই সুযোগে তাঁর মন্ত্রী জজ্জ তাঁর রাজ্য দখল করে। তাঁর সৈন্যরাও তাঁকে ত্যাগ করে পালায়। জয়াপীড় ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনে হাজির হয়ে দেখেন যে সেখানে জয়ন্ত নামে একজন সামন্ত রাজা রাজত্ব করছেন। ছদ্মবেশী জয়াপীড় জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর নিজের শ্বশুরকে অর্থাৎ জয়ন্তকে তাঁদের অধীশ্বর করেন।' সূত্রধার বলিতে লাগিলেন, "পট বারংবার পরিবর্তন হয়েছে। ভগদত্ত বংশীয় রাজা হর্ষও গৌড়ে রাজত্ব করেছেন। খড়গবংশীয় রাজারাও— খড়্গোদ্যম, জাত-খড়্গ এবং দেব-খড়্গ। তারপর দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ (কারও মতে

রাজরাজভট) বাংলা দেশের রাজা ছিলেন। অনেক মনে করেন গোপালদেব এই রাজরাজভট বংশ থেকে উদ্ভূত। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।"

গোপালদেবের অন্তরতম সত্তা কিন্তু অনুভব করিল মতান্তরে থাকুক তবু ইহাই সত্য কথা। তিনিও বোধহয় ওই খড়্গবংশের সন্তান। তাঁহার পূর্বপুরুষ জীমূতবাহন এবং তাঁহার তরবারিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল। ওই তরবারির প্রতি, ওই খড়্গের প্রতি জীমূতবাহনের অসীম ভক্তি ছিল। প্রতি কালীপূজায় রাত্রে তিনি ওই খড়্গকে পূজা করিতেন। গোপালদেব তরবারিটি এখানেও আনিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই টাঙানো ছিল সেটা। সহসা সেই তরবারির ভিতর হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বাহির হইয়া গোপালদেবকে বলিলেন—"দেখ গোপাল, অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরকে ছিন্নভিন্ন করে সত্য শিব সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার কাজ। কিন্তু সে কাজ আমি করি শক্তিধর, নিঃস্বার্থপর আদর্শবাদী বীরের সাহায্যে। আমি মহাকালীর হস্তে বিরাজ করি, যিনি শবারূঢ়া, মহাভীমা, ঘোরদংষ্ট্রা, বরপ্রদা, যিনি মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, যিনি মুহুর্মুহুঃ পাপীদের রক্ত পান করেন—তাঁরই হস্তের অমোঘ আয়ুধ আমি। পাপের অন্ধকারে যখন পুণ্যের আলো নিবে যায়, যখন পাপীদের পাপের কালিমাই অমাবস্যা-রূপ ধারণ করে, তখনই গৌরি কালীরূপে আবির্ভূতা হন। সরমস্নিগ্ধা বধূরূপিণী উমাই তখন হন উলঙ্গিনী করালবদনা—সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃখড়্গ-বামাধোর্ধ্ব-করাম্বুজা কালী—আমারই সাহায্যে তিনি তখন বিনাশ করেন পাপকে, ধ্বংস করেন পাপীদের—"

জ্যোতির্ময় পুরুষ সহসা থামিয়া গেলেন। তাহার পর মুদিতনয়নে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"ঘনকৃষ্ণ অত্যাচার ধরে যবে অমাবস্যা রূপ
আর্তদের হাহাকার অন্ধকারে যবে পুঞ্জীভূত
নিরুপায় মনুষ্যত্ব ধূলিতলে যবে বিলুণ্ঠিত
তমিস্রায় অবলুপ্ত পর্বত-সাগর-নদী-কূপ,
নিদারুণ সে সঙ্কটে তোমার ভীষণা মূর্তি ভায়,
অত্যাচারে অবিচারে গৌরী হন উলঙ্গিনী কালী,
খল খল অট্টহাস্যে কাঁপে ধরা, দেয় করতালি
ভূত প্রেত পিশাচেরা ভয়ঙ্কর শ্মশান-সভায়।
সে সভার সভানেত্রী তুমি কালী অমাবস্যার
সে সভয় বজ্রকণ্ঠে তব তীক্ষ্ণ তুরীয় ভাষণ
শূন্য-গর্ভ বাক্য নহে—পাতকীর অন্তিম শাসন,
খড়্গ-মুখে সমাধান করে দাও সব সমস্যার।
লোল-জিহ্বা, এলোকেশী, নেত্রী তুমি সকল ক্রান্তির
উৎখাত করিছ নিত্য যুগে যুগে সকল ভ্রান্তির।"

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন তিনি। তাহার পর বলিলেন, "আমি সেই খড়্গ। এইমাত্র সূত্রধারের জাদুমন্ত্রবলে আকাশপটে বাংলাদেশে অনেক রাজ্যের উত্থান পতন তুমি ছবির মতো দেখলে, কাহিনীর মতো শুনলে। তোমারই অন্তর্নিহিত জ্ঞান সূত্রধার-রূপে মূর্ত হয়ে পুরাতন কথা তোমাকে শুনিয়ে গেল। আর একটা কথাও তুমি জান, কিন্তু সেটা তবু আবার মনে করিয়ে

দিচ্ছি তোমাকে। আমাদের দেশে বাইরে থেকে এত শত্রু কেন এসেছে জান? বিশ্বাসঘাতকদের জন্য। এই বিশ্বাসঘাতকরা সব যুগেই আছে। অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসে তাদের কি নাম ছিল তা আমার জানা নেই, কিন্তু আমি জানি তারা ছিল । তারাই খাল কেটে কুমীরকে ডেকে এনেছিল। আধুনিক ইতিহাসের উমিচাঁদ মীরজাফরকে তোমরা সবাই চেন। তারও পরে যে সব বিশ্বাসঘাতকের দল স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশের বিদ্রোহী তরণ-তরুণীদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে, জেলে পুরে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেশের উন্মুখ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্পিষ্ট বিদলিত করে ইংরেজের দরবারে খেতাব ও পুরস্কার পেয়েছিল— তাদের কথাও আশা করি মনে আছে তোমার। অতি আধুনিক যুগে আর একদল বিশ্বাসঘাতক আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে তাদেরও আশা করি তুমি চিনতে পেরেছ। এরা সব ইন্‌টেলেকচুয়ালিজম্ (intellectualism) অথবা আর্টের মুখোশ পরে থাকে। বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এদের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের যা কিছু খারাপ (অবশ্য তাদের মতে খারাপ) তাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা বিদেশের দরবারে প্রদর্শনী খোলে আর ভারি বাহবা পায়, অনেকে পুরস্কারও পায়। মনে রেখো ওরা ভারতবর্ষের মহাশত্রু। ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে ওদের যোগ নেই, এদেশের কিছুই ওদের চোখে ভালো নয়, ওরা বিদেশের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের দল। ভয় হয় ওরাই হয়তো আবার শত্রু ডেকে আনবে এদেশে। কারণ আমাদের স্বাধীনতার পর এদেশেও আবার মাৎস্যন্যায় প্রচলিত হয়েছে। যারা শক্তিমান তারাই আবার দুর্বলকে গ্রাস করেছে। দেশে একটা অসন্তোষের ভাব জেগেছে। এরই সুযোগ নেবে ঐ বিশ্বাসঘাতকরা। কিন্তু আমার আশা আছে এই নব-মাৎস্যন্যায়ের যুগে আবার নতুন গোপালদেব আবির্ভূত হবেন। হয়তো তোমাকেই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তখন আমাকে ভুলো না। অতীতে অনেক বিশ্বাসঘাতকের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি, এখনও দরকার হলে করব।"

জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর্ধান করিলেন।

টক্ করিয়া একটা শব্দ হইল। গোপালদেব ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন সেই নার্সটি ব্লাড-প্রেসার মাপিবার যন্ত্রটি আনিয়াছেন। মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। সন্নত দৃষ্টি, ধীর, স্থির, কোনরূপ প্রগল্‌ভতা নাই। শাড়িটি ভদ্রভাবে পরা, গলায় একটি ষ্টেথোস্কোপ ঝুলিতেছে।

মৃদুকণ্ঠে বলিল—"ব্লাড-প্রেসারটা নি?"

"নাও।"

নিপুণতার সহিত ব্লাড-প্রেসার মাপিয়া নার্সটি চলিয়া যাইতেছিল।

গোপালদেব তাহাকে ডাকিলেন।

"কত প্রেসার দেখলে?"

"নর্মালই আছে। ইউরিনও দেখেছি, শুগার অ্যালবুমেন নেই—"

বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল।

"আজকাল আমার পাল্‌স্ (pulse) কাউন্ট (count) কর না?"

"ডাক্তারবাবু বলেছেন, আর দরকার নেই।"

বলিয়াই আবার চলিয়া যাইতেছিল।

"শোন—"

দাঁড়াইয়া পড়িল আবার।

"তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমার নামটাই জেনে নেওয়া হয়নি। কি নাম তোমার?"

"আমার নাম অরুণা মণ্ডল।"

"নার্সগিরি ছাড়া আর কি জানো তুমি? কোনও 'হবি' (hobby) টবি আছে?"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল কয়েক সেকেণ্ড। তাহার পর বলিল, "আছে। আমি ওয়াটার কালারে (water colour) ছবি আঁকি। রাঁধবারও শখ আছে।"

"তুমি ছবি আঁক কখন? সমস্ত দিন তো নার্সগিরি করে বেড়াতে হয়—"

খানিকক্ষণ আবার নতমস্তকে থাকিয়া অরুণা উত্তর দিল, "আমার স্কেচবুক আর রংয়ের বাক্স আমার সঙ্গেই থাকে আমার ব্যাগে। নার্সদের তো সব সময় কাজ করতে হয় না, যখনই একটু অবসর পাই আঁকি—"

"এখানেও তো তোমার বিশেষ কোন কাজ নেই। এখানেও আঁকলে পারো—"

"আঁকি তো—"

"তাই নাকি। নিয়ে এসো তো, দেখি তোমার ছবি কেমন—"

কোন উত্তর না দিয়া অরুণ চলিয়া গেল।

একটু পরে মহান আসিয়া একটি খাতা দিয়া গেল। অরুণা আর আসিল না।

ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন গোপালদেব। প্রথম ছবিটা একটা পদ্মের পঙ্ক ভেদ করিয়া অপরূপ একটি পদ্ম সগৌরবে আকাশের দিকে মাথা তুলিয়াছে। সহসা মনে পড়িল, কয়েকদিন আগে তাঁহার মনেও এরূপ একটি কল্পনা পুষ্পিত হইয়াছিল। আকাশপটে প্রস্তরবেদীর উপর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সৌম্যমূর্তি ইতিহাস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'ভ্রমর যখন পদ্মের নিকট আসিয়া মুগ্ধ গুঞ্জন তোলে তখন সে পদ্মের জন্ম-ঐতিহ্য লইয়া মাথা ঘামায় না। পদ্ম নিজের রূপগুণ লইয়া নিজেরই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। অনেকক্ষণ তিনি মুগ্ধনেত্রে ছবিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় ছবিটি একটি প্রকাণ্ড পাখির—বিরাট ডানা মেলিয়া প্রবল ঝড়ের সম্মুখীন হইয়াছে। সম্মুখে কালো মেঘে অশনির সংকেত, ঝড়ের বেগে বড় বড় বনস্পতি মাথা নত করিয়াছে, পাখিটা কিন্তু নির্ভয়. সে ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়াই যেন তাহার আকাশ-বিহার সমাপ্ত করিবে। কোন বাধাকেই সে মানিবে না। এ ছবিটি দেখিয়াও মুগ্ধ হইলেন গোপালদেব। তৃতীয় ছবিটি একটি ক্যাক্টাসের। নিষ্করুণ মরুভূমির সমস্ত রুক্ষতা সত্ত্বেও গাছটি প্রাণের প্রাচুর্যে যেন দম্ভভরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শাখায় শাখায় অদ্ভুত ধরনের ফুলও ফুটিয়াছে। এ ছবিটিও ভালো লাগিল তাঁহার। চতুর্থ ছবিটি একটি অশ্বারোহীর। দক্ষিণ হস্তে তরবারি তুলিয়া বাম হস্তে অশ্বের বলগা ধরিয়া তেজোদৃপ্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। যেন মূর্ত বিদ্রোহের প্রতীক। অশ্বারোহীর মুখটা দেখিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, এ যে তাঁহারই মুখ।

"মহান, মহান—"

মহান আসিয়া উপস্থিত হইল।

"অরুণাকে ডাক তো—"

"অরুণা কে?"

"ওই নার্সটি। ওর নাম অরুণা।"

"তিনি তো একটু আগে চলে গেলেন। উনি রোজ এগারোটার সময়ে চলে যান। এখন সওয়া এগারোটা বেজেছে। এইবার স্নানটান কর—"

মহান গোপালদেবের সহিত প্রভুর মতো ব্যবহার করে না, বন্ধুর মতো করে।

"হ্যাঁ, চল। আচ্ছা ও মেয়েটি সকাল থেকে বসে বসে কি করে বল তো? খালি আঁকে?"

"ছবি আঁকে মাঝে মাঝে। কিন্তু আরও অনেক কাজ করে। আমার অর্ধেক কাজ তো ওই করে। তোমার জামাকাপড় কেচে ইস্তিরি করে ওই সব তোমার আলমারিতে রাখে। তুমি জিগ্যেস করলে তাই বলে ফেললাম, কিন্তু উনি মানা করেছিলেন তোমাকে বলতে। ঠাকুরকে বলে তোমার জন্যে নতুন রকম তরকারিও করায়। এই যে আজকাল ষ্ট্যু খাচ্ছ, কাল যে মাছের দমপোক্ত খেয়েছিলে, পরশু চায়ের সঙ্গে মুগের ডালের যে ওমলেট খেলে—এ সবই ওই নার্সটি ঠাকুরকে বলে বলে করিয়েছেন। খুব ভালো মেয়েটি। আমি বলেছিলাম, আপনি নিজেই রাঁধুন না। উনি বললেন— আমার ছোঁয়া রান্না হয়তো উনি খাবেন না। কি জাত কে জানে। জাত যা-ই হোক, মেয়েটি ভালো। তুমি ওঠ আর দেরি কোরো না।"

ওঠা কিন্তু হইল না। দ্বারপ্রান্তে রামগম্ভীরের ম্যানেজার সুখলাল দর্শন দিল। তাহার বগলে একটি কাঠের সুদৃশ্য বাক্স এবং হাতে একটি চিঠি। সে আগাইয়া আসিয়া গোপালদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, "মালিক অনেক আগেই আমাকে এ চিঠিটা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাক্সটা তৈরি করতে বড় দেরি করে ফেললে গুলাব মিস্ত্রি। কাল সন্ধ্যের সময় দিয়ে গেছে। একটু আগে সিভিল সার্জনও খবর পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি এখনই চলে এলাম।"

গোপাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রটি পড়িলেন।

শ্রীচরণেষু,

মাস্টার মশাই, আপনার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে আমি চাই না। আপনার কাছে হাত পেতে ভাড়া নেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই একটি ছোট বাক্স আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি ভাড়া বাবদ যা দেওয়া সঙ্গত মনে করবেন তা ওই বাক্সতেই রেখে দেবেন। আমি পরে কোন সময়ে আপনার কাছে গিয়ে পরামর্শ করব টাকাটার কিভাবে সদগতি করা যায়। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রণত

রামগম্ভীর

সুখলাল সুদৃশ্য বাক্সটি গোপালদেবের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। গোপাল কোনও মন্তব্য করিলেন না। তাঁহার মন রামগম্ভীরের প্রস্তাব বা বাক্সকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিল না। তাঁহার মন অরুণাকেই লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিল। তাঁহার সহসা মনে হইল, মেয়েটি যে কয়টি ছবি আঁকিয়াছে সবই তো বিদ্রোহের ছবি। পাঁককে তুচ্ছ করিয়া পদ্ম স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ঝড়কে তুচ্ছ করিয়া পাখিটা নির্ভয়ে আকাশে পাড়ি জমাইয়াছে, মরুভূমিকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণবন্ত ক্যাক্‌টাস (cactus) স্বমর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সকলেরই ভঙ্গীতে বিদ্রোহের বাণী। ওই অশ্বারোহী তরবারি উৎক্ষিপ্ত করিয়া কি বাণী বলিতে চায়? অরুণা তাহার মুখের মতো করিয়া অশ্বারোহীর মুখ আঁকিয়াছে কেন? আমার মধ্যে সে বিদ্রোহের কোন বাণী-মূর্তি দেখিয়াছে কি?

"আমি, গল্পের লেখক ফটিকচাঁদ সামন্ত, এখানে নিজের কথা কিছু বলিতে চাই। আমি একটু মুশকিলে পড়িয়াছি। আমার মনটা যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। বুধের নির্দেশে গোপালদেবের

চিন্তাই অহরহ করিতেছি। গোপালদেবকে শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ আদর্শবাদী পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া আধুনিক যুগের আর এক অধ্যাপক গোপালদেবের মর্মে তাঁহাকে চিত্রিত করিতেছি। অধ্যাপক গোপালদেব অনমনীয় চরিত্রের লোক, তিনি আদর্শের জন্য সমাজ সংসার সব ত্যাগ করিয়াছেন। নীচবংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া নিজের পুত্রকে হত্যা পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে হয়তো আমি আরও কঠোর আরও উগ্ররূপে আঁকিতাম, কিন্তু মালিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছি। কারণ অধ্যাপক গোপালদেবের পুত্র প্রবালের যে সমস্যা, আমার সমস্যাও অনেকটা সেইরূপ। মালিনীরা অবাঙালী, যদিও কলিকাতা শহরে তিন পুরুষ বাস করিয়া তাহারা বাঙালীই হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায় করিয়া তাহার অর্থও উপার্জন করিয়াছে প্রচুর। কিন্তু জাতিতে তাহারা 'ছত্রি'। আমি শূদ্রবংশীয়। আমার আশংকা হইতেছে, প্রবাল-আলতা নীলা-মগনের জীবনে যে ট্র্যাজেডি ঘটিয়াছে, গোপালদেবের যে অনমনীয় রক্ষণশীল চরিত্র আমার বর্ণনায় ফুটিয়াছে আমার নিজের জীবনেও তাহা সত্য হইয়া উঠিবে না কি? আমার বাবা নফর সামন্ত সুদূর পল্লীগ্রামে চাষবাস করেন। আমাকে উচ্চশিক্ষা দিতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। আমি প্রতি মাসে তাঁহাকে টাকা পাঠাই। আমি মাতৃহীন। ভাই বোনও কেহ নাই। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসী আমাদের বাড়িতে থাকিয়া বাবার দেখাশোনা করেন। বাবা তাঁহার এক বন্ধুর মেয়ের সহিত আমার বিবাহের কথাবার্তা প্রায় ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমি উত্তর দিয়াছি, আয় কিছু না বাড়িলে বিবাহ করিব না। ইহা কিন্তু আমার সত্য মনোভাব নয়। আমি মালিনীকে ভালোবাসিয়াছি। মালিনীও আমাকে প্রশ্রয় দিতেছে। মালিনীর দাদা রণধীরও এ মেলামেশায় তেমন অশোভন কিছু দেখে না। তাহারা বড়লোক, তাহারা বিলাসের খরস্রোতে ভাসিতেছে, নানারকম আমোদ-প্রমোদ, হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা তাহাদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, ইহাও তাহাদের বিলাসেরই একটা অঙ্গ। রণধীর এখন আর আমার ছাত্র নহে, আমি তাহার বয়স্য হইয়া পড়িয়াছি, সে মাঝে মাঝে আমার কাছে ইতিহাসের পাঠ লইয়া আমাকেই অনুগ্রহ করে যেন। তাহার শখ, নামের পিছনে এম-এ ডিগ্রী লাগাইবে। তাহার বয়স পঁচিশ বছর, এখন সে প্রাইভেটে আই-এ দিতেছে। একটি সুন্দরী ইহুদী তরুণী আসিয়া তাহাকে ইংরেজি পড়ায়। আমি জানি ওই ইহুদী মেয়েটি রণধীরের প্রণয়িনী। হয়তো ইহাকেই সে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিবে। তাহার ভগ্নী মালিনীর সম্বন্ধেও তাহার কোন কড়াকড়ি নাই। মালিনী স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে মিশিতেছে। আপিসের পর আমরা দুজনেই দুইটি ঘোড়া লইয়া গড়ের মাঠে যাই। মালিনীর আদর্শ সে বীরাঙ্গনা হইবে। ইতিহাস হইতে নানা বীরাঙ্গনার কাহিনী বাছিয়া তাহাকে পড়িতে দিই। আমার উপর সে প্রসন্ন, কিন্তু সে ঠিক আমার প্রেমে পড়িয়াছে কি না জানি না। আমি কিন্তু হাবুডুবু খাইতেছি। এজন্য গোপালদেবের চরিত্রে যতটা দৃঢ়তা আমি সঞ্চার করিব ভাবিয়াছিলাম ততটা দৃঢ়তার উপকরণ আমি নিজের কল্পনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে তাঁহাকেও আমার মতো প্রেমিকরূপে চিত্রিত করি। ইতিহাসে লেখা আছে, তাঁহার পত্নীর নাম ছিল দেদ্দা। দেদ্দাকে মালিনীরূপে আঁকিবার প্রলোভন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন রাজবংশোদ্ভবা ছিলেন। সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে সকলেই তো রাজা ছিল। শক্তিমান মাত্রেই নিজের গণ্ডীতে রাজমহিমায় বাস করিত। দেদ্দাকে সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শূদ্র—যে কোনও জাতের মেয়ে বলিয়া কল্পনা করিতে বাধা নাই। গোপালদেবকে সহজিয়া পন্থী করিতেও আমার লোভ হইতেছে—যে সহজপন্থীর শাস্ত্রে স্পষ্ট

করিয়া লেখা আছে যে যদি বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর। তবে সে উপভোগ সাধারণ মানুষের মতো করিও না, করিলে পাপপুণ্যে লিপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যদি কোন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন যে সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই তখনই পঞ্চকাম উপভোগ ধর্ম হইবে, তাহাতে পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন থাকিবে না। দারিকপাদ বলিয়াছেন, তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ কর। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। আর যত রাজা আছেন তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরম সুখ লাভ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধে ইহা পাঠ করিয়াছি। গোপালদেবকে বিষয়ে নিরাসক্ত প্রেমোন্মত্ত সহজিয়া যোগীরূপে চিত্রিত করিবার বাসনা হইতেছে। হয়তো তিনি বিষয়ে নিরাসক্ত প্রেমিক ছিলেন বলিয়াই অতি সহজে সকলের হৃদয় হরণ করিতে পারিতেছিলেন, তাই সকলেই তাঁহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের নেতারূপে অভিবাদন করিতে ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু গোপালদেবের যে কোনও বজ্রগুরু ছিল ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়ত এ পর্যন্ত অধ্যাপক গোপালদেবকে যতটা অনমনীয় রক্ষণশীল বিদ্বান ব্যক্তিরূপে আঁকিয়াছি তাহাতে তাহার মনে এখন পঞ্চকামোপভোগজারিত সহজিয়া মত সঞ্চারিত করা কি শোভন হইবে? আর একটা মুশকিল হইয়াছে মালিনীর প্রণয় যদিও, আমাকে এইদিকে প্রবৃত্ত করিতেছে কিন্তু আমার মনের ভিতর যে অদৃশ্য লেখক বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিতেছে সে ইহাতে রাজি নয়, কে যেন তাহার লেখনীকে দৃঢ়হস্তে অতীতের সেই সনাতনলোকে চালিত করিতেছে যে লোকে গোপালদেবেরা সনাতন সত্যে বিশ্বাসী—'ওলড্ ভ্যালুজ' (old values) প্রস্তরভিত্তির উপর যাঁহারা আজও মহিমান্বিত।

মুশকিলে পড়িয়াছি, কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না, মনটা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।"

কার্তিক তন্ময় হইয়া উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা পড়িতেছিল। এতদিন সে ওটা খুঁজিয়া পায় নাই। রাখাল তাঁহার ছেঁড়া থলিটা গুদামঘরে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুকের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছিল। চপলাই তাহাকে কি একটা জরুরি কাজে মাদ্রাজে পাঠাইয়াছিল। মাস তিনেক পরে কাল সে ফিরিয়াছে। চপলা এখনও ফেরে নাই। সে কার্তিককে খেজুরি গ্রামের বাড়িতে বসাইয়া জরুরী দরকারে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। কেন গিয়াছে, কবে আসিবে রাখালও জানে না। ইহাদের অবর্তমানে কিন্তু কার্তিকের কোনও অসুবিধা হয় নাই। সে রাজার হালে একটি চমৎকার বাড়ি অধিকার করিয়া আছে। চাকর ঠাকুর তাহার সেবা করিতেছে। তাছাড়া আছেন বোসবাবু। এই বোসবাবুরা তাহার প্রতিবেশী। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার, ইহাদের সেবা করিবার ভার চপলা তাহার উপর দিয়াছে। বলিয়াছে ইহাদের ভালোবাসিয়া আপন করিয়া লইতে হইবে। দূর হইতে টাকা ছুঁড়িয়া সাহায্য করিলে দরিদ্রের মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয় মাত্র, তাহাদের সেবা করা হয় না। খুবই ঠিক কথা, কিন্তু কার্তিক ইহাও অনুভব করিতেছিল ইহাদের ভালোবাসিয়া আপন করাও সহজ কাজ নয়। ইহাদের অসংখ্য অভাব সে গোপনে প্রকাশ্যে পূরণ করিয়া চলিয়াছে বটে কিন্তু ইহাদের মন এখনও পায় নাই। বাড়ির কর্তা বোসবাবু—কৃষ্ণধন বসু—একটু খেঁকী প্রকৃতির লোক। স্থানীয় একটি মাড়োয়ারির তেলকলে কাজ করে। মাড়োয়ারি বণিক জগৎরাম শহর হইতে বহুদূরে অনেকখানি জায়গা কিনিয়া এই

তেলকলটি বসাইয়া প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। কৃষ্ণধনবাবু সেইখানেই কেরানী। মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বেতন পান। আগে পঁয়ত্রিশ টাকা পাইতেন চপলাদির অনুরোধেই তিনি এখন বেতন বাড়াইয়া পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিয়াছেন। চপলাদিকে জপৎরাম খুব খাতির করেন, "দেবীজি" বলিয়া ডাকেন। খাতির করিবার হেতুটা কি তাহা কার্তিক এখনও বুঝিতে পারে নাই। প্রথম আসিয়া কৃষ্ণধনবাবুর সহিত কার্তিকের কয়েকদিন দেখাই হয় নাই। তিনি ভোরে বাহির হইয়া যান, ফেরেন রাত্রি দশটার পর। একদিন রবিবার সকালে তাঁহার সহিত কৃষ্ণবাবুর দেখা হইয়া গেল। নমস্কার করিয়া বলিলেন, "নমস্কার। আমি আপনার নতুন প্রতিবেশী। এতদিন দেখাই হয়নি আপনার সঙ্গে।"

কৃষ্ণধন প্রতি-নমস্কার করিলেন না। মুখ গোমড়া করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ মালতী, আরতির কাছে আপনার কথা শুনেছি। ওদের কিন্তু বেশ না-ই দেবেন না মশায়, গরীবের মেয়ে গরীবের মতো থাকাই উচিত। আপনার দেওয়া চকোলেট বিস্কুট রোজ রোজ খেলে মাথা বিগড়ে যাবে। গরীবের ঘরের পান্তাভাত মুড়ি তখন মুখে রুচবে না—"

কৃষ্ণধনবাবুর চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন উষ্মার ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি চোখ উলটাইয়া নিজের ভুরু দুইটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কার্তিক লক্ষ্য করিল তাঁহার চোখের সাদা অংশটি পীত বর্ণের। ইহাও লক্ষ্য করিল তাঁহার কপিশবর্ণের গোঁফগুলি খোঁচা খোঁচা। বেঁটে লোক। সমস্ত দেহটাই যেন একটু মোচড়ানো। এই ব্যক্তিকে কি করিয়া সে প্রেমাস্পদ করিবে ভাবিয়া মনে মনে একটু বিপন্ন বোধ করিল।

হাসিয়া বলিল—"আমার নিজেরই চকোলেট বিস্কুট নেই তো ওদের দেব কোথা থেকে রোজ রোজ। সেদিন শখ করে কিনে এনেছিলাম নিধিরামের দোকান থেকে—"

"ওটা তো একটা চোর—।" 'চোর' কথাটা 'ছোর' মতো শুনাইল।

"কিছুদিন আগে একটা পেন্সিল কিনেছিলাম মশাই ওর দোকান থেকে। সাধারণ পেন্সিল। দাম নিলে ছ'আনা। দরকার ছিল কিনে ফেললাম। পরে শুনলাম কলকাতায় ও পেন্সিলের দাম দু'আনা। ছোর, ছোর ব্যাটা—"

ইহার উপর কার্তিক অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছিল।

"আপনি জপৎরামবাবুর তেলকলে কাজ করেন বুঝি। কাজকর্ম কেমন চলছে—"

'পূর্ব জন্মে অনেক পাপ করেছিলাম তাই ওই মেড়ো ব্যাটার পায়ে তেল দিতে হচ্ছে। কাজকর্ম মানে দিনগত পাপক্ষয় —হ্যাঁ—"

কোন পথে আলাপ করিলে যে কৃষ্ণধনবাবুর একটা প্রসন্ন ভদ্ররূপ দেখা যাইবে তাহা কার্তিক সেদিন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মনে হইয়াছিল কখনও পারিবে না। কথা কহিলেই লোকটার একটা অসভ্য বর্বর পরশ্রীকাতর মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে। তাহার মেয়ে দুইটির সহিত এবং ছেলেটির সহিত কিন্তু সহজেই কার্তিকের ভাব হইয়া গিয়াছিল। বড় মেয়েটির নাম মালতী—তেরো চোদ্দ বছর বয়স—সুশ্রী সদা-সপ্রতিভ হাস্যময়ী কিশোরী একটি। তাহার ছোট আরতি—দশ বছরের মেয়ে। কিন্তু মালতীর মতো চঞ্চলা নয়, সে একটু স্থির ধীর গিন্নী-প্রকৃতির। প্রথম দিনই কার্তিককে উপদেশ দিয়াছিল—'তুমি অমন আদুড় গায়ে থেকো না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে'। মুখে যদিও কিছু প্রকাশ করে না, কিন্তু কিছু দিলে টপ করিয়া সেটা লইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকে। কার্তিক ইহাদের জন্য ওই নিধিরামের দোকান হইতেই নানারকম ছেলে-

ভুলানো জিনিসপত্র কেনে। জলছবি, পুঁতি, লজেন্স, চকোলেট, বিস্কুটও। লজেনস্ চকোলেট বিস্কুট কিন্তু তাহারা আর বাড়িতে লইয়া যায় না, পাছে বাবা রাগ করে। কার্তিকের বাসাতেই সেগুলি নিঃশেষ করিয়া তবে বাড়ি যায়।

একদিন মালতী মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে বলিল "আপনার কাছে আর চকোলেট আছে?"

"এখন তো নেই। তোমার বাবা তোমাদের বেশী চকোলেট দিতে মানা করেছেন। জানতে পারলে আবার আমার উপর রাগ করবেন। যে কটা চকোলেট ছিল পরশু দিনই তো তোমরা খেয়ে গেলে!"

মালতী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তাহার পর চুপি চুপি বলিল—"মা খেতে চেয়েছে। আমাদের আপনি চকোলেট দিয়েছেন শুনে মা বললে, 'আহা আমার জন্যে যদি একটা আনতিস। ছেলেবেলায় আমিও চকোলেট খুব ভালোবাসতুম। বাবা প্রায়ই কিনে এনে দিতেন। বিয়ের পর তো আর ও জিনিস চোখেও দেখিনি।' মায়ের জন্যে দেবেন একটা?"

কার্তিক চকোলেট কিনিয়া দিয়াছিল আবার। বলিয়া দিয়াছিল—"দেখো তোমার বাবা যেন না জানতে পারেন।"

কার্তিক একদিন মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা পড়াশোনা কর না?"

আরতি হাসিয়া বলিল—"না। বাবা বলেছে পড়াশোনা করে কি হবে, কিছুদিন পরে ঘানিতে জুড়ে দেব—"

"তার মানে —"

মালতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"মানে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে। আমরা গিয়ে সংসারের ঘানি টানব।"

"তোমার ভাই পদুকেও পড়াবেন না নাকি। ওর কত বয়স হল।"

"সাত বছর। এইবার হাতে খড়ি হবে। তারপর পাঠশালায় যাবে।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্তিক শেষে একটা বুদ্ধি বাহির করিয়াছিল। মরীয়া হইয়া একদিন সে কৃষ্ণধনবাবুর কাছে প্রস্তাব করিয়া ফেলিল—"আপনি আমার উপর একটু দয়া করবেন?"

"আমি সামান্য লোক, গরীব মানুষ, আমি কিভাবে আপনাকে দয়া করতে পারি তা তো আমার মাথায় আসছে না। কি করতে হবে বলুন।"

"আমার স্ত্রী এখনও এসে পৌছয় নি। কবে পৌছবেন তার স্থিরতাও নেই। কিন্তু আমি ওই মৈথিল ঠাকুরের রান্না আর হজম করতে পারছি না। রোজই বিকেলে বুক জ্বালা করে। আপনি আমার প্রতিবেশী, আপনি যদি আমাকে পেইং গেষ্ট (paying guest) হিসাবে রাখেন, মা লক্ষ্মীর হাতের বাঙালী রান্না খেয়ে আমি বর্তে যাই। আমার আর আমার কুকুর লর্ডের জন্য আমি চাল ডাল নুন তেল মাছ মাংস তরিতরকারি সব কিনে দেব, তাছাড়াও মাসে মাসে টাকাও দেব—"

"আমরা গরীব গৃহস্থ লোক। আমার বাড়ি তো হোটেল নয় মশাই।"

"হোটেল হলে কি আমি যেতে চাইতুম, হোটেল হলে কি আপনাকে বলতুম আমার উপর দয়া করুন। আপনার গৃহস্থলী মা-লক্ষ্মীর স্পর্শে পবিত্র, ভাগ্যে না থাকলে ওখানে আশ্রয় পাওয়া যায় না।"

"মা-লক্ষ্মী মা-লক্ষ্মী করছেন, কিন্তু আমার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তো জানেন?

মোটেই লক্ষ্মী নয়, উড়ুনচণ্ডে। কাল ফট্ করে একটা লাল গামছা কিনে বসল পাঁচসিকে দিয়ে—কিছুই দরকার ছিল না—"

"আপনি বিজ্ঞ লোক আপনার সঙ্গে তর্ক করবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আমি জানি দারিদ্র্যের মধ্যেও লক্ষ্মী রাজরাণীর মতো থাকেন। অনেক সময় দারিদ্র্যটাও তাঁর বিলাস, তাঁর বাইরের ছদ্মবেশ, অন্তরে তিনি সর্বদা ঐশ্বর্যময়ী। আমি বলছি আপনার দুঃখের দিন থাকবে না।—"

কৃষ্ণধন কার্তিকের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই শব্দ করিয়া উঠিলেন, "হ্যাঃ—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি বলিলেন—"কত টাকা দেবেন আপনি? একটা বাইরের লোকের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা পোয়ানো তো সহজ কথা নয়—আমার গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পারব না মশায়। কত টাকা দেবেন আপনি?"

"আপনি যা বলবেন তাই দেব—"

"আপনি চাল ডাল নুন তেল ঘি তরিতরকারি মাছ মাংস সব দেবেন বলছেন?"

"দেব—"

কৃষ্ণধনবাবু তাঁহার কপিশবর্ণ খোঁচা গোঁফের উপর কয়েক সেকেণ্ড বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সঞ্চালন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"এর উপর আরও টাকা পঞ্চাশেক দিতে পারবেন?"

"তাই দেব।"

কার্তিক কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া আর একটা কাজ করিয়াছে। পদুর হাতে খড়ি দিয়া তাহার পড়ার ব্যবস্থাও করিয়াছে। তাহাকে সে রোজ 'বর্ণপরিচয়' পড়ায়। পড়ার অপেক্ষা অবশ্য খেলার দিকেই পদুর (ভালো নাম প্রদ্যুম্ন) বেশী মন। কার্তিক তাহার খেলার সাথীও হইয়াছে। বাড়ির উঠানেই দুইজনে মার্বেল খেলে। ভোমরা (কৃষ্ণধনের স্ত্রী) রান্নাঘর হইতে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক কার্তিকের আর ওঁর কচি ছেলে পদুর গুলি খেলা প্রত্যহ স-কৌতুকে উপভোগ করেন। কার্তিকের উপর তাঁহার যে স্নেহ-সঞ্চার হইয়াছে তাহা এই কারণে আরও অকপট যে, বহুকাল পূর্বে তাহার যে ভাইটি অকালে মারা যায় কার্তিকের সহিত তাহার নাকি অনেক সাদৃশ্য আছে। কার্তিক তাহাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে এবং প্রত্যহ তাহার রান্নার অজস্র প্রশংসার অত্যুক্তিতে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণধনবাবু কার্তিককে টাকার লোভেই নিজের পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর একটা সন্দেহ ছিলই। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইতেছিল, হয়তো ওই মালতী মেয়েটার জন্যই লোকটা তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহিতেছে। কিন্তু কয়েক দিন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সে ভুলটা ভাঙিয়া গেল। তবু কিন্তু তিনি কার্তিকের উপর ঠিক প্রসন্ন হইতে পারিতেছিলেন না। অন্তর-নিহিত একটা হিনম্মন্যতাই বোধহয় তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। উপকারী কার্তিকের খুঁত বাহির করিবার জন্য তাঁহার মন সর্বদা গোপনে গোপনে যেন উৎসুক হইয়া থাকিত। একদিন কিন্তু এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যে তিনি কার্তিকের প্রতি বিরূপতা আর বজায় রাখিতে পারিলেন না। তাহার উপর তাঁহার ভক্তিই হইয়া গেল।

কৃষ্ণধনবাবুর বাড়ির লাগাও একটা ছোট ঘর ছিল। একদিন সকালে দারোগাবাবু দুইজন পুলিশ লইয়া সেখানে হাজির হইলেন এবং কৃষ্ণধনবাবুকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কার্তিক আগে বাহির হইয়া আসিল। কৃষ্ণধনবাবু কিছুক্ষণ পরে আসিলেন। কার্তিক লক্ষ্য করিল

তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই দারোগাবাবু বলিলেন—"মিলের ম্যানেজার থানায় একটা খবর পাঠিয়েছিলেন যে মিল থেকে তেলের টিন প্রায়ই নাকি গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কাল নাকি তাঁকে একজন খবর দিয়ে গেছে যে দুটো লোক দুটিন তেল নিয়ে আপনার এই বাড়িতে রেখে গেছে। ম্যানেজার সাহেবের ইচ্ছে আমরা আপনার বাড়িটা সার্চ করে দেখি—"

কার্তিক সহসা সপ্রতিভভাবে আগাইয়া গিয়া কৃষ্ণধনবাবুকে বলিল—"আমি কাল আপনাকে যে দু'টিন তেল আনতে বলেছিলাম তা এনেছেন নাকি। দাম তো নিয়ে যান নি।"

"দাম আজ নেব। ছোট ঘরটাতে আছে টিন দুটো। আজ দাম দিয়ে ক্যাশ মেমো দিয়ে যাব আপনাকে।"

অকম্পিত কণ্ঠে মিথ্যাভাষণ করিয়া গেলেন কৃষ্ণধনবাবু। তাহার পর দারোগাবাবুর দিকে চাহিয়া দেঁতো হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ম্যানেজারবাবু ঠিকই খবর পেয়েছেন। কার্তিকবাবুর জন্যে দু'টিন তেল এনেছি আমি, ওই ছোট ঘরটাতে আছে—চলুন আপনাকে দেখিয়ে দি। ম্যানেজারবাবুর হুকুম নিতে পারেনি, কারণ তখন তিনি বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, অথচ তেলটা ওঁর আজই দরকার—খেলাতপুরে কার জন্যে যেন পাঠাতে হবে, না কার্তিকবাবু?"

কার্তিক মাথা নাড়িয়া বলিল —"হ্যাঁ—"

দারোগা সাহেব টিন দুইটি দেখিয়া এবং কার্তিকের নিকট হইতে একটি স্টেট্‌মেণ্ট (statement) লইয়া থানায় চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পর কার্তিক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে কৃষ্ণধনবাবুর দিকে চাইতেই কৃষ্ণধনবাবুর চোখ দুইটি আবার উলটাইয়া ভ্রু-মুখী হইল।

বলিলেন, "চলুন, আপনার বাসায়। সব বলছি—"

কার্তিকের বাসায় এক লর্ড ছাড়া আর কেহ থাকে না। তাহারা আসিবামাত্র কৃষ্ণধনবাবুকে দেখিয়া লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া বকিয়া দিল। লর্ডের সঙ্গে মালতী, আরতী, পদু সকলেরই খুব ভাব, কৃষ্ণধনবাবুকে সে সহ্য করিতে পারে না। দেখিলেই ভর্ৎসনা করে।

"লর্ড তুমি ও ঘরে যাও—"

লর্ডের স্বভাবটি কিন্তু ঢ্যাঁটা, সে বাধ্য কুকুর নয়, সমানে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল।

"যাও—"

তবু লর্ড যাইতে চাহিল না।

কৃষ্ণধনবাবু মন্তব্য করিলেন, "কুকুর জানোয়ারটা অতি ব্যাদড়া—"

কার্তিক লর্ডের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে দুই থাপ্পড় মারিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। লর্ড আর চীৎকার করিল না, বুঝিল মনিব সত্যই চটিয়াছে।

কৃষ্ণধনবাবু বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিলেন, "যখন ধরা পড়ে গেছি তখন সব কথাই খুলে বলছি আপনাকে। ও দুটিন তেল আমি চুরিই করেছিলাম এবং সুবিধে পেলেই করি—"

"কেন করেন!"

প্রশ্নটা সোজাই করিয়া বসিল কার্তিক।

"করি, কারণ না করে উপায় নেই। মালতী আরতীর বিয়ে দিতে হবে। মালতীটার তো এখনই দিলে হয়। কম করে করলেও তিন চার হাজার টাকা খরচ করতে হবে। সমাজ আমাকে

রেহাই দেবে না। মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাই তার থেকে কত জমবে বলুন এ বাজারে। তবু আপনি এসেছেন বলে আমার মাইনের টাকাটা জমাতে পারছি—''

''তা বলে চুরি করবেন!''

''সবাই যেখানে ছোর—মালিক, নফর, সমাজ, রাষ্ট্র, সবাই যেখানে ছোর—সেখানে আমি সাধু থাকি কি করে বলুন। আমাদের দেশ আলকাতরা-কারখানা, সবারই গায়ে আলকাতরা লাগবেই। আপনার ওই ছপলাদি—না থাক ওঁর কথা আর বলব না—উনি যাই হোন আমার অনেক উপকার করেছেন। শুধু আমার নয় এ অঞ্চলের অনেকেরই উপকার করেছেন। আপনার গায়েও আলকাতরা লেগেছে নিশ্চয়, কিন্তু কোথায় লেগেছে তা আমার চোখে পড়েনি এখনও। ছপলাদির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি তা-ও আমি জানি না, শুধু জানি আপনার উপর তাঁর অসীম অনুগ্রহ, হয়তো কোনও কারণে আছে, কিন্তু আমি আলকাতরা-ঘাঁটা মানুষ নানারকম সন্দেহ হয়—মাপ করবেন—অকপটে সবই বলে ফেললাম।''

এই বলিয়া তিনি সামনের এবড়ো-থেবড়ো হলদে দাঁতগুলি বাহির করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

কার্তিক বলিল—''না না মাপ করবার কিছু নেই। আপনার অকপট কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। চপলাদি আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। হঠাৎ মেলায় সেদিন দেখা হয়ে গেল—আমিও বেকার হয়ে ঘুরছিলাম—উনি আমাকে এখানে একটা কাজ দিলেন। উনি এ অঞ্চলে যে কো-অপারেটিভ করেছেন তারই ম্যানেজার করে নিয়ে এলেন আমাকে। কিন্তু আমার কথা থাক, আপনি মেয়েদের বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন। ওদের পড়ান। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিক—''

''পড়াবে কে। প্রাইভেট টিউটর রাখবার সামর্থ্য আমার নেই—তাছাড়া এ অঞ্চলে মেয়ে প্রাইভেট টিউটার নেইও—''

''আমি যদি সে ভার নিই—''

কৃষ্ণধন চুপ করিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিলেন—''মাপ করবেন, আমার যা মনে হচ্ছে তা বলছি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প। এই অল্প পরিচয়ের উপর নির্ভর করে আমার মেয়ের সঙ্গে আপনাকে মাখামাখি করতে দিতে ভরসা পাচ্ছি না। এটাও বলব, আপনার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে দূষ্য কিছু দেখতে পাইনি, কিন্তু তবু ভরসা পাচ্ছি না। আমরা গরীব মানুষ, কেলেঙ্কারী কিছু হয়ে গেলে সেটা সামলাবার মতো টাকা নেই আমার। তাছাড়া আর একটা কথা, লেখাপড়া শেখালেই কি বিয়ের সমস্যাটা মিটবে? আমার পিসতুতো বোনরা গাদা গাদা টাকা খরচ করে বি-এ, এম-এ পাশ করেছে, তা সত্ত্বেও তাদের বিয়েও দিতে হয়েছে গাদা গাদা টাকা খরচ করে। একটা বোন তো কুলে কালি দিয়ে বোর্ডিং থেকেই পালিয়েছে—সেই জন্যে ওসব রাস্তায় চলবার সাহস নেই আমার। ঠিক করেছি, যত শিগ্‌গির পারি ওদের ঘানিতে জুড়ে দেব। তাই ছুরি করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।''

কার্তিক সহসা হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল কৃষ্ণধনকে। হাঁ-হাঁ করিয়া পিছাইয়া গেলেন কৃষ্ণধন। কার্তিক বলিল, ''আপনি মহাপুরুষ। মহাপুরুষরাই সরল সত্য কথা এমন নির্ভয়ে বলতে পারেন। আপনি যা বললেন তা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। আপনি আমার উপর বিশ্বাস

স্থাপন করতে পারছেন না, না পারবারই কথা, কিন্তু তবু আমি বলব লেখাপড়া শেখানো ছাড়া মেয়েদের এ যুগে বাঁচবার কোনও উপায় নেই। আপনার মেয়ে লেখাপড়া শিখে বিয়ে করবে কেন, আপনার ছেলের স্থান অধিকার করবে, অন্য সব দেশে তো এই হচ্ছে, আমাদের দেশেই হবে না কেন—"

কৃষ্ণধন বলিলেন, "মেয়ের রোজগারে খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। ও দেশে মেয়েরা যে কিভাবে রোজগার করে তার কিছু কিছু খবর জানা আছে আমার। তেলের দামটা কি এখনি দিয়ে দেবেন?"

"হ্যাঁ। তেলটা বাড়িতেই থাক—"

"বাড়িতে অনেক তেল আছে। ওটা বিক্রি করে দেব। অনেক চোরাবাজারী হাঁ করে বসে আছে—। টাকাটা আপনাকেই দিয়ে যাব কি!"

"না, ওটা তো আপনারই প্রাপ্য—।"

কার্তিক বাক্স খুলিয়া দুইখানি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া কৃষ্ণধনকে দিল।

"তেলের দাম নিয়ে বাকিটা আমাকে দিয়ে যাবেন—"

কৃষ্ণধন নোট দুইটি হাতে লইয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটা কথা জিগ্যেস করব। সদুত্তর দেবেন?"

"নিশ্চয়, কি কথা—"

"আপনি এত টাকা পান কোথা থেকে—"

"চপলাদি যে কো-অপারেটিভ দোকান সব করেছেন, আমি তার ম্যানেজার। মাসে দু'শ টাকা করে আমার বেতন। সে টাকা আমার খরচ হয় না। কারণ আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা চপলাদি করেছেন। কলকাতা যাবার আগে তিনি আমাকে পাঁচ মাসের মাইনে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে গিয়েছিলেন—"

"আপনার ছপলাদিই বা এত টাকা পান কোথায়।"

"তাতো জানি না। আমাকে সব কথা খুলে বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু এসেই তাঁকে কলকাতা চলে যেতে হয়েছে। এখনও ফেরেন নি। ফিরলে সব জানতে পারব আশা করি।"

"উনি দশটা কো অপারেটিভ দোকান করেছেন। কিন্তু নামেই সে সব কো-অপারেটিভ, কেউ কে-অপারেশন (co-operation) করে নি, শুনেছি সব ওঁরই টাকা। আপনার সেই বামন বন্ধুটি তো একটা দোকানের ইনচার্জ (in-charge)—সে তো ওখানে খুব জমিয়েছে মশাই। সার্কাসের খেলা দেখায়। একটা বাঁদরও পুষেছে। সে যদি আসে তাকে একটা কথা বলে দেবেন মশাই। পাশের গাঁটা মুসলমানদের। অনেকগুলো মুসলমান ছোঁড়া আসে ওর কাছে। আমার মতে ওদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করাটা ভালো নয়। আমার বাড়ির পাশেও একটা মুসলমান ছোঁড়া ঘুরঘুর করে—মাঝে মাঝে সিটি মারে—"

"কেন—"

"কেন আবার, এই মালতীর জন্য। আমি গরীব মানুষ, সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় মশাই। ওই বামনটা কি আসে আপনার কাছে?"

"না, অনেকদিন আসে নি।"

"এলে একটু বলে দেবেন। মুসলমান ছোঁড়াগুলোকে যেন একটু সামলে রাখে—"

"না, না, সে সব ভয় কিছু নেই—"

কৃষ্ণধন চলিয়া গেলেন।

এই তিন মাসে বসু-পরিবারের সহিত তাহার বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বটে, কৃষ্ণধনবাবুর উগ্রতা ও বিরূপতাও অনেকটা কমিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও কার্তিক অনুভব করিতেছে এখনও সে উহাদের আপন করিতে পারে নাই, উহাদের ভালোওবাসিতে পারে নাই, যতটুকু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তাহা টাকার জোরে হইয়াছে, প্রেমের জোরে হয় নাই। ব্যাপারটাকে সে এখনও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে লইয়া যাইতে পারে নাই, এখনও তাহা আর্থিক স্তরেই নিবদ্ধ আছে। এজন্য তাহার লজ্জার আর কুণ্ঠার সীমা নাই। তাহার মনে হইতেছে, চপলাদির কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া সে কাজে নামিয়াছিল সে প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এক হিসাবে চপলাদির সহিত সে প্রতারণাই করিতেছে। আর একটা কারণেও তাহার মনে একটা উৎকণ্ঠা সদাজাগরূক হইয়া আছে—নিমু কবে আসিবে। চপলাদি বলিয়াছিল নিমুকে এখানে লইয়া আসিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কিন্তু চপলাদি আসিয়াই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করিয়াই। কার্তিক অবশ্য নিমুকে পত্র লিখিয়াছে, নিমুর উত্তরও আসিয়াছে, কিন্তু নিমু না আসা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাইতেছে না। চপলাদি না ফিরিলে যে নিমুর এখানে আসা হইবে না তাহা কার্তিক বুঝিয়াছিল। রাখাল বলিল, "মা শীগগিরই ফিরবেন। চালের আর গমের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। মৃণালবাবু কাল রাত্রে এসেছেন, তিনি বললেন সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজই বোধহয় মা ফিরবেন।"

"মৃণালবাবু কে?"

"তিনি ঠিক কে তা তো আমার জানা নেই। তবে তিনি মায়ের ডান হাত। কোলকাতার লোক—"

"আমার ছোট থলিটা তুমি কোথায় রেখেছ বল তো? তাতে একটা বই ছিল।"

"থলিটা আপনার দরকার হবে তা ভাবিনি তো। ঘরে বন্ধ করে রেখেছি—"

রাখাল থলিটা বাহির করিয়া আনিল।

"কড়া আর খুন্তিটা দিয়ে দাও কাউকে। এই বইটা আমার কাছে থাক। ও থলিটা দিয়ে দাও কাউকে—"

"যে আজ্ঞে—"

পাণ্ডুলিপিটা বাহির করিয়া কার্তিক তাহাতেই মনঃসংযোগ করিল। অরুণার কথা পড়িতে পড়িতে সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, মালতীর কথা মনে পড়িল তাহার। যদিও সে কাহাকেও এখনও কিছু বলে নাই কিন্তু মালতী মেয়েটি ক্রমশ যেন একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহার পক্ষে। মেয়েটা যখন তখন তাহার ঘরে আসিয়া ঘুরঘুর করে। ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চায় আর মুচকি মুচকি হাসে, মাঝে মাঝে গায়ের কাপড়চোপড় যেন ইচ্ছা করিয়া অসম্বৃত করিয়া ফেলে। সেদিন সে দুপুরে শুইয়াছিল, হঠাৎ পাশ ফিরিয়া দেখে মালতী তাহার বিছানায় বসিয়া আছে, আর মুচকি মুচকি হাসিতেছে। বকিয়া দিয়াছিল তাহাকে।

"তুমি বারবার আমার ঘরে আস কেন বল তো। বিছানায় বসেছ কেন? তুমি বড় হয়েছ, একটু সামলে চলতে শেখ, তা না হলে সবাই যে নিন্দে করবে। একা আমার ঘরে আর এসো না।"

লজ্জায় সেদিন মালতী মাথা হেঁট করিয়াছিল। তাহার আনত চোখের কম্পনে মুখের শঙ্কিত মৃদু হাসিতে রক্তিম গণ্ডে যাহা সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অনির্বচনীয়। মালতী চলিয়া যাইবার পর কার্তিকের মনটা বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর হইতে যদিও মালতী একা আর কখনও তাহার ঘরে আসে নাই, কিন্তু কার্তিক অনুভব করে সে সর্বদাই যেন লুকাইয়া তাহাকে দেখিতেছে। এদিক ওদিক চাহিলেই তাহার সহিত চোখাচোখি হইয়া যায় এবং তাহার চোখে যে ভাষা ফুটিয়া ওঠে তাহা অস্বস্তিকর। তাই সে ইদানীং বাড়িতেও বড় একটা থাকে না। যে দশটি কো-অপারেটিভ দোকান খোলা হইয়াছে তাহারই তদারক করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। কো-অপারেটিভ দোকানগুলির প্রধান কাজ গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত পবিবারদের খুব কম মূল্যে চাল গম বিক্রয় করা। কাজটা কিন্তু গোপনে করিতে হয়। চাল প্রতি দোকানে গোপনে সংগৃহীত হইয়া গোপনেই বিক্রীত হয়। কাহারা চাল যোগাড় করে, কে চালের দাম দেয় তাহা কার্তিক জানে না। মাঝে মাঝে এক একটা লোক (কখনও বা স্ত্রীলোক) প্রতি দোকানে চাল লুকাইয়া দিয়া যায়। কেন দিয়া যায়, কে তাহাদের চালের দাম দেয তাহা কার্তিকের অজ্ঞাত। কার্তিককে শুধু দেখিতে হয় চালগুলি যেন প্রকৃত গরীব লোকেরা কম মূল্যে পায়। আশাপাশের গ্রামগুলি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। তাহাদের মধ্যেও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার অনেকে আছে। তাহারাও চাল পায়। আন্‌টা যে গ্রামে থাকে সেটা মুসলমানপ্রধান গ্রাম। আন্‌টা সেখানে খুব জমাইয়াছে। সার্কাসের আখড়া খুলিয়াছে একটা।

কার্তিক উপন্যাসটায় ক্রমশ তন্ময় হইয়া গেল। গোপালদেবের চরিত্রটি লেখক শেষ পর্যন্ত কিভাবে কোন রঙে আঁকিবেন তাহা জানিবার জন্য সে কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিল।

"সুরং নিশ্চয় রাগ করে বসে আছ।"

কার্তিক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চপলাদি স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক।

"এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার একজন বন্ধু। অনেকে বলে আমার ডান হাত। কিন্তু আমি জানি মস্তবড় শত্রু আমার উনি একজন—"

"শত্রু?"—কার্তিক সবিস্ময়ে প্রশ্নটা না করিয়া পারিল না।

"হ্যাঁ পয়লা নম্বরের শত্রু। আমার সঙ্গ ছাড়বেন না। তাই আমার হিতৈষীরা—হিতৈষীদের তো অভাব নেই এদেশে—নানা রঙের উপদেশ এবং কুৎসা ছড়িয়ে বেড়ান আমাকে কেন্দ্র করে। নানা রঙের মধ্যে আলকাতরার রংও থাকে—"

কার্তিক নমস্কার করিল।

"এঁর নাম মৃণাল, আমি কিন্তু এঁকে পদ্মকলি বলে ডাকি। সুরং-এর সঙ্গে পদ্মকলি আশা করি বেমানান হবে না।"

পদ্মকলির দিকে চাহিয়া কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করেন?"

পদ্মকলি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"আমি অকর্মণ্য। আমি সেই দলভুক্ত যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও গদিতে বসতে পায় না—অর্থাৎ আমি বেকার। ইনি আমার ভরণপোষণ করেন তাই আমি বেঁচে আছি এখনও।"

চপলাদি স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। দুটি টোল পড়িয়াছিল তাহার গালে।

"পদ্মকলি খুব বিনয়ী লোক। সে বেকার ঠিক, কিন্তু সেইটেই যে তার গৌরব তা ও মানতে চায় না। সর্বদেশে সর্বকালে মহৎ লেখকরা, মহৎ শিল্পীরা, মহৎ জননায়করা বেকার জীবন যাপন করেছেন। কিছুদিন আগে দেশনেতাদের পদস্পর্শে জেল তীর্থ হয়ে উঠেছিল। বহু অখ্যাত অজ্ঞাত প্রতিভাবান কবি শিল্পীরাও তেমনি বেকারসম্প্রদায়কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সম্প্রদায়ের চেয়েও বড় মর্যাদা দিয়েছেন। ওই একদা—বেকার মানুষেরাই যে মানব সমাজের ভূষণস্বরূপ—ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ আছে। পদ্মকলি একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। ওর আঁকা ভিসুবিয়সের (Vesuvius) ছবি যদি দেখ মুগ্ধ হয়ে যাবে। ও ভিসুবিয়স কখনও দেখে নি, তবু ওর ভিসুবিয়স অপূর্ব। আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে যেন কাঁদছে। আর একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি ওর মধ্যে। ও ভিসুবিয়সের ছবি এঁকেছে বটে কিন্তু ওর বুকের ভিতর যা তোলপাড় করছে তার ছবি ও এখনও আঁকতে পারেনি—সেটা একটা সাগর, অশ্রুর সাগর—"

"কি যে বলছ তুমি, থামো থামো। আমি চললুম—"

মৃণাল সত্য সত্যই বাহিরে চলিয়া গেল।

কার্তিক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। চপলার ভ্যানিটি ব্যাগে একতাড়া নোটের সহিত পদ্মকলির একটি ছবি দেখিয়াছিল।

"চপলাদি, আমাকে সব খুলে বলবে বলেছিলে। কবে বলবে? এই কুয়াশার মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে ভালো লাগছে না। তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে একটা পদ্মকলির ছবি দেখেছিলাম—"

"সেটা ওরই আঁকা। ওইটে ওর সই। ও যখন চিঠি লেখে তখন নাম লেখে না তার তলায় একটা পদ্মকলি আঁকা থাকে শুধু। ও যখন কোন জিনিস পাঠায় তার সঙ্গে পদ্মকলির ছবি থাকলেই বুঝতে পারি কে পাঠিয়েছে। ওর আঁকা অনেক পদ্মকলি আছে আমার কাছে।"

"ওর সঙ্গে আলাপ হল কি করে? আত্মীয়তা আছে নাকি কোনও—"

"আলাপ হয়েছিল এক মেলায় তাঁবুর মধ্যে। যদি বলি উনি একদিন আমার খদ্দের হয়ে এসেছিলেন তাহলে—"

"তাহলে আমি অবিশ্বাস করব। আমি তোমাকে চিনেছি চপলাদি, হেঁয়ালি দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না!"

চপলা স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে লাগিল। তাহার পর চুপিচুপি বলিল, "উনি একজন টেরোরিষ্ট। ওর দাদা আই-এন-এতে (I.N.A) সৈনিক ছিল। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে। মৃণালের মতে দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি, স্বাধীনতার নামে কতগুলি বিশেষ ধরনের বাজে লোক টাকা আর প্রোপাগ্যাণ্ডার জোরে নবাবী করছে।"

"তুমি ওর নাগাল পেলে কি করে।"

"একদিন ট্রেনে যাচ্ছিলাম। কামরাটা প্যাসেঞ্জার ভরতি ছিল। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে সবাই নেবে গেল। দেখলাম এক কোণে একটি ছেলে বসে খাতায় কি লিখছে। একটু পরে উঠে এসে নমস্কার করে খাতার পাতাটা ছিঁড়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—"অচেনা লোকের সামান্য উপহার গ্রহণ করুন!" দেখলাম আমারই একটা ছবি এঁকেছে। সেই থেকে আলাপ শুরু। হ্যাঁ, আর একটা কথা। একটা 'লরি' ভাড়া করেছি। নিমুকে আনবার জন্যে। তুমি নিমুকে আর

তোমার শালা শ্রদ্ধেয় কালীকিঙ্করবাবুকে একটা চিঠি লিখে দাও যে তুমি এখানে আলাদা একটা বাসা করেছ, নিমু যেন এই লরিতে চলে আসে।''

''নিমু কি একলা আসতে সাহস করবে?''

''রাখাল যাচ্ছে। তুমি লিখে দাও রাখালকে তুমিই পাঠাচ্ছ, চিন্তার কোনও কারণ নেই।''

কার্তিক গুম্ হইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—''দেখো চপলাদি, তোমার সব কথা খোলসা করে না জানা পর্যন্ত আমি ঠিক করতে পারছি না, তোমার সঙ্গে আমার জীবন জড়াব কি না।''

''তুমি বলেছিলে তুমি এ যুগের গোপালদেব হতে চাও। তার সুযোগ কি তুমি পাওনি?''

''পেয়েছি। এখানে আমার খুব ভালো লাগছে। এখানে অনেকের সঙ্গে ভাব হয়েছে। বোসবাবুদের সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়েছে খানিকটা। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার মনে যে সংশয় আছে তা না ঘুচলে আমার পক্ষে এখানে থাকা শক্ত।''

''আজই সব বলব তোমায়। তুমি চিঠি দুটো লিখে ফেলো। ও হ্যাঁ, আব একটা কথা। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মেম্বার করে দিয়েছি তোমাকে। তুমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে পছন্দসই বই নিয়ে আসতে পার। কলকাতা তো এখান থেকে বেশী দূর নয়। একটা কার্ড এনেছি সেটা সই করে পাঠিয়ে দাও। চাঁদা আমি জমা করে দিয়েছি—''

এই সংবাদে খুব খুশী হইয়া উঠিল কার্তিক। তাহার মনের মেঘ সহসা কাটিয়া গেল যেন।

''খুব ভালো করেছ' তুমি তোমার চারিদিকে যে রহস্য ঘনিয়ে রেখেছ সেটা সরিয়ে ফেল চপলাদি। স্বচ্ছ পরিষ্কার আলোতে তোমাকে দেখতে পেলে আমাব মনে আর কোন দ্বিধা থাকবে না। তোমার সব কথা জানতে চাই।''

''সব কথা বলা যায় না সুরং। সব কথা বলা উচিতও নয়। তবে যতটা পারি ততটা তোমাকে বলব। তুমি চিঠি দুটো লিখে ফেল। 'লরি'টা এখনি এসে পড়বে। রাখাল তৈরী হয়ে বসে আছে।—''

''হঠাৎ 'লরি' ভাড়া করতে গেলে কেন?''

''লরিটা ভাড়া করেছি আমাদের কাজের জন্য। হয়তো ওটা শেষ পর্যন্ত কিনেই নেব। 'লরি' পাঠালে জিনিসপত্র নিয়ে আসতে সুবিধে হবে নিমুর। তাছাড়া তাড়াতাড়ি হবে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমর শ্বশুরবাড়ি এখান থেকে মোটে বিশ মাইল। তুমি চিঠি দুটো তাড়াতাড়ি লিখে ও ঘরে এসো।''

খেজুরি বিবি নিজের আত্মকথা বলিতেছিলেন। ঘরে কার্তিক ছাড়া আর কেহ ছিল না।

''তোমার শালা কালীকিঙ্কর যেদিন আমার উপর বলাৎকার করেন সেদিন আমি তার মুখে লাথি মেরে চলে আসি। সেইদিনই আমার নূতন জীবন শুরু। আমার বাবা এ অঞ্চলের একজন বড় গৃহস্থ ছিলেন। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন, তারপর বাবাও যখন অনেকদিন পক্ষাঘাতে ভুগে মারা গেলেন তখন আমি একলা হয়ে পড়লুম। একা এখানে থাকতে ভয় করত। তাই ঠিক করলুম পড়া তো শেষ হয়েছে এবার কোথাও মাস্টারি জুটিয়ে নিই একটা। আর কিছু না হোক পাঁচ জন ভদ্রলোকের মধ্যে থাকতে পারব। আর দেশের মেয়েদের মানুষ

করে তুলব। কালীকিঙ্করদের স্কুলে যখন চাকরি পেলাম তখন বড় আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। কলকাতায় ফিরে গেলাম। কলকাতায় আমার কলেজের এক বান্ধবী ছিল তার নামটা আমি গোপন রাখব। সে চাকরি করত। আমি যখন কলকাতায় যেতাম তারই বাসায় উঠতাম। সে আমাকে বলল দেশের কাজে নেমে পড়। বললাম দেশের তো অনেক কাজ, কোন কাজে নামতে বলছিস তুই? সে বলল মধ্যবিত্ত পরিবারদের সেবা কর। তারা খেতে পাচ্ছে না। তাদের জন্যে খাবার যোগাড় কর। মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই বাংলাদেশে বড় বড় লোক জন্মেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এখনও জন্মাবে যদি ওদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিস। আমি নিজের সাধ্যমত সেই চেষ্টা করি। তোর তো শুনেছি জমিজমা আছে, তুই যদি এ কাজে লাগিস অনেকের উপকার হয়। আমার সামর্থ্য কম। আমি তো বেশী কিছু করতে পারি না, কিন্তু আমি জানি অনেকের বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। প্রশ্ন করে জানলুম সে যা মাইনে পায় তার অর্ধেক সে দান করে। চোরাবাজার থেকে চাল কিনে দান করে অনেক পরিবারকে। তারপর সে নিজেই বললে—ও রকম দান করে কিন্তু তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই বেশী হচ্ছে আমার। ওরা গরীব, কিন্তু ওরা তো ভিখিরি নয়, এভাবে চাল নিয়ে অনেকে অপমানিত বোধ করে, অনেকে নিতে চায় না, অনেকে আবার লজ্জার মাথা খেয়ে পেটের দায়ে নেয়ও। আমার নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করে। যদি কেউ এমন একটা দোকান করত যেখান থেকে ওরা নিজেদের সামর্থ্যমতো কম দামে চাল কিনে নিতে পারত তাহলে ভালো হত খুব। আমি তাকে বললাম তুই এখানে একটা ষ্টেশনারি দোকান কর। আমি তোকে ক্যাপিটাল দিচ্ছি। সেই দোকানে আমার জমি থেকে কিছু কিছু চালও আমি পাঠাব মাঝে মাঝে। সেটা তুই লুকিয়ে বিক্রি করিস কম দামে। ওইটেই আমার প্রথম দোকান। আমার সেই বান্ধবী এখনও সেটা চালাচ্ছে! কিন্তু ওই দোকান করতে গিয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। বান্ধবীকে বললাম—রোজগার না কবলে তো আর চালাতে পারব না। কি করি বল তো? সে বললে ভগবান তোকে এমন দুটো জিনিস দিয়েছেন যাতে মানুষ ভোলে—রূপ, আর গানের গলা। ইচ্ছে করলে ও দুটো ভাঙিয়ে তুই হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারবি। তুই রাজি থাকিস তো বল্ আমি দালালি করি। সেই সময় অনেক জলসায় গান গেয়েছিলাম অনেক শখের থিয়েটারে অভিনয়ও করেছি। প্রণয়ীও জুটেছিল দু'চারজন। তার মধ্যে এখনও একজন টিকে আছে, তার নাম দিয়েছি আমি 'স্বর্ণদন্ত'। তাকে তুমিও দেখেছ একদিন। ও এখন আমার প্রধান একজন সহকারী। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এ কখনও দাঁতের উপর সোনার ওয়াড় লাগায় আবার কখনও খুলে ফেলে। ভারী কাজের লোক। ও না থাকলে আমি অনেক কিছুই করতে পারতাম না। আর একটা কথা—"

কার্তিক তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—"আমি কিন্তু যে কথাটা শুনব বলে কান পেতে আছি তার—"

"কোন্ কথা শুনবে বলে তুমি কান পেতে আছ তা আমি জানি। তা আমি বলবার চেষ্টা করব, কিন্তু তা বলা যাবে না—"

"আমি এই কথাটা সর্বাগ্রে জানতে চাই তুমি দেহ বিক্রী করে টাকা রোজগার কর কি না।"

খেজুরি বিবির মুখে হাসি ফুটিল, গালে টোল পড়িল।

"দেহ বিক্রী করেছি বই কি। আমার হাসি, আমার রূপ, আমার গান, আমার অভিনয়-ক্ষমতা সবই তো আমার দেহকে কেন্দ্র করে। সেগুলো বিক্রী করিনি বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু—"

হঠাৎ নিজের শাড়ির ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটা টকটকে-লাল-খাপে-মোড়া ছোরা বাহির করিয়া সে বলিল—"কিন্তু এটাও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে। এর থেকে তুমি যা বোঝবার বোঝ। আর একটা কথাও শোন। ভালোবাসবার মতো লোক যে পাইনি তা নয়, কিন্তু পেয়েও তাকে পাইনি, সে বাহুবন্ধনে ধরা দেবার লোক নয়। আর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি তাকে আমি নষ্ট করেছি। নষ্ট করেছি নিজের স্বার্থের জন্য নয়, ওই ভাগ্যহত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারদের স্বার্থের জন্য। মনে মনে নিজেকে স্তোক দিচ্ছি একটা মহৎ কাজের জন্য নীতির পথ থেকে একটু আধটু সরে গেলে ক্ষতি কি। সবাই তো চোর, আমি সাধু থাকব কি করে। এ স্তোকবাক্যে কিন্তু মন ভুলছে না। সে বারবার বলছে, ওর মোহের সুযোগ নিয়ে ওকে তুমি নষ্ট করছ। ওর মোহ যদি না থাকত তাহলে আমি—"

কার্তিক আবার বাধা দিল।

"মেলায় মেলায় তাঁবুতে তাঁবুতে বাইজী সেজে ঘোরবার অর্থটা কি সেইটে খুলে বল আগে—"

"ওখানে আমার খদ্দের আসে। তারা আমার গান শোনে। টাকাও দেয় অনেক—"

"মনে হচ্ছে তুমি বলেছিলে তোমার লাইসেন্স আছে। কিসের লাইসেন্স—"

"আগে ছিল। এখন গভর্নমেণ্ট সুনীতিপরায়ণ হয়েছেন। পতিতাদের এখন কোন লাইসেন্স লাগে না। পতিতা-পল্লী উঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এখন আইনের চক্ষে পতিতা আর উত্থিতার কোন তফাত নেই। পতিতারা ভদ্রপল্লীতে গিয়ে বসবাস করছেন। এখন লাইসেন্স নেই, গোড়ার দিকে ছিল—"

"তোমার তাঁবুতে কি ধরনের খদ্দের আসে—"

মুচকি হাসিয়া খেজুরি বিবি বলিল—"রূপ এবং রূপিয়া দু'য়েরই খদ্দের আছে!"

"রূপিয়ার খদ্দের কি রকম?"

"আমি তাদের অনেক টাকা দিই যে—"

"কি রকম?"

"সেদিনই তো আমার ভ্যানিটি ব্যাগে দেখলে এক তাড়া হাজার টাকার নোট আছে। তুমি চমকে গিয়েছিল, গুণে দেখলে আরও চমকে যেতে—ওতে এক লক্ষ টাকা ছিল!"

"বল কি! অত টাকা তুমি পেলে কোথা?"

"প্রায়ই পাই। তা না হলে এত বড় কাণ্ড চালাচ্ছি কি করে!"

"টাকা পাচ্ছ কোথায়!"

গম্ভীর হইয়া গেল খেজুরি বিবি। তারপর বলিল—"সেটা শোনবার আগে শপথ করতে হবে তোমাকে যে এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। এমন কি নিমুর কাছেও নয়—"

"না, তা করব কেন, তুমি যখন মানা করছ—"

"আর একটা কথাও তোমাকে বলা উচিত। এ কথা যদি প্রকাশ কবে ফেল তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।"

"কে মারবে আমাকে—"

খেজুরি বিবির চোখের দৃষ্টি চকচক করিয়া উঠিল।

"আমি! এ কথা গোপন রাখতে না পারলে যে লোকের প্রাণসংশয় হবে সে লোকের নিরাপত্তার ভার শপথ নিয়ে আমি গ্রহণ করেছি। যদি কেউ বিশ্বাঘাতকতা করে তাহলে তাকে প্রাণ দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। তাই আমি বলছি একথা তুমি শুনতে চেও না। অথচ তোমাকেও আমার চাই, তোমার মতো লোক আমি আর পাব না—"

"একথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না?"

"না। আমার তাঁবুর সামনে যে লোকটা পাহারা দেয় সে হয়তো কিছু জানে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, কারণ সে বোবা। বোবা বলেই তাকে ও কাজে বাহাল করেছি।"

"রাখাল?"

"রাখাল কিছু জানে না। ও হচ্ছে মস্ত পালোয়ান, গায়ে খুব জোর, ইচ্ছে করলে ও একটা মানুষকে শূন্যে তুলে মট্ করে ভেঙে ফেলতে পারে আখের মতো। ও আমার অন্ধ ভক্ত। হয়তো রূপে মুগ্ধ। ও আমার বডিগার্ড, আর্মড ফোর্সও (armed force) বলতে পার। ও কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। আমার কাছে থাকতে পেলেই ও খুশী, তোমার মতো ওর কোনও কৌতূহল নেই, আমার আদেশ পালন করেই ওর তৃপ্তি—"

"ওর বাড়ি কোথা—"

"উত্তর প্রদেশে। ডাকাতি করে জেল খেটেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে চলে আসে কলকাতা। ওর আসল নাম ভীম তেওয়ারী। পদ্মকলির কাছে অনেকদিন ছিল। চমৎকার বাংলা শিখেছে। অবাঙালী বলে বোঝা যায় না। পদ্মকলিই ওর নাম দিয়েছে রাখাল। পদ্মকলির কাছ থেকেই ওকে পেয়েছি। ওর একটি মাত্র ছেলে, আর কেউ নেই। ছেলেটিকে মিলিটারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে পদ্মকলি। রাখাল এখন আমাদের পরিবারের লোক। তোমাকেও আমাদের পরিবারভুক্ত হতে হবে। নিমু হবে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি—"

"কিন্তু ওই লক্ষ টাকার কথাটা তো বললে না—"

"ওটা না-ই শুনলে। শোনার অনেক রিস্‌ক (risk) আছে। সেটা না-ই নিলে।"

"না আমাকে শুনতেই হবে। তোমার সমস্ত পরিচয় সম্পূর্ণভাবে না পেলে তোমার কাছে থাকা যাবে না। তুমি সব খুলে বল—"

"বেশ শোন তবে। আমি নোট জাল করি। ঠিক আমি করি না। আমার জন্যে পদ্মকলি করে। সে চিত্রকর, নোট ছাপাবার যন্ত্রও তার কাছে আছে—"

"নোট জাল কর!"

কার্তিক বিস্ফারিত নয়নে খেজুরি বিবির দিকে চাহিয়া রহিল।

"হ্যাঁ করি। যেখানে সমস্ত ব্যাপারই জাল-জুয়াচুরি পৈরবী, তদ্বির, খোশামোদ আর মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে জাল না করলে এতগুলি গরীব লোককে আমি খেতে দিতে পারব না।"

কার্তিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর দাঁড়াইয়া উঠিল।

"আমি চললুম। জাল-জুয়াচুরির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারব না। তুমি ওই জাল নোটের জালে নিজেই একদিন জড়িয়ে পড়বে। আমি দূরে চলে যেতে চাই, কারণ প্রথমত ওসব

জিনিসকে আমি ঘৃণা করি আর দ্বিতীয়ত জেল খাটবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি চললুম। নিমুকে আনতে গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই—"

"কি অবুঝের মতো কথা বলছ সুরং। তোমাকে এখন আমি কিছুতেই যেতে দেব না। নিমু আসুক, তারপর যা হয় ঠিক কোরো। বস না। পদ্মকলির সঙ্গে আলাপ কর একটু—"

কার্তিক কিন্তু বসিল না। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা বগলদাবা করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল সে। খেজুরিবিবি তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছোট খুকীর মতো তাহার নীচের ঠোঁটটি বারবার কাঁপিতে লাগিল। এ কান্না সে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে। তাঁহার বিবেক জানে কাজটি অন্যায়, তাহার অন্তরতম সত্তা অনুভব করে তাহার প্রেমাস্পদকে দিয়া সে অতি ঘৃণ্য কাজ করাইতেছে। এ সবই সে বারবার অনুভব করিয়াছে। কার্তিকের মুখেও সে যখন শুনিল—'আমি ওসব জিনিসকে ঘৃণা করি' তখন তাহার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মর্মটা কে যেন মাড়াইয়া দিল। কিন্তু চপলা আর একটা জিনিসও ভুলিতে পারে না। তাহার মায়ের বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখটা। সেই কোটরগত চক্ষু, সেই ঈষৎ-ব্যায়ত আনন, কালো রঙের সেই দাঁতগুলা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তাহার মা কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার পক্ষাঘাত হইয়াছিল। অনাহারে মারা গিয়াছিলেন তিনি। এক ছটাক চালও তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারা যায় নাই। সমস্ত চাল তখন লীগ গভর্নমেণ্টের হাতে। তাহাদেব জমির সমস্ত ধান ইস্পাহানিরা কিনিয়া লইয়াছিল। চপলার বয়স তখন আট নয় বৎসর। সে তখন তাহার দিদিমার কাছে ছিল কুমিল্লায়। খবর পাইয়া যখন আসিল তখন মা মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় রাস্তাঘাটে মড়া পড়িয়া আছে। বাবাও তখন খেজুরিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তিনিও মাকে দেখিতে পান নাই। তাঁহাকে কোন সাহায্য করিবারও সামর্থ্য ছিল না তাঁহার। চপলা অনুভব করিতেছে—ওই রকম আর একটা মন্বন্তর আসন্ন। তাই সে—

লরিটা আসিয়া পড়িল।

চপলা নিজেই চিঠি লিখিয়া দিল একটা।

ভাই নিমু, তোমার জন্যে লরি পাঠালাম। জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে এস তুমি। সুরং বাইরে গেছে, তাই আমিই চিঠি লিখলাম। আমরা ভালো আছি। আশীর্বাদ নাও। ইতি

চপলাদি

চিঠি লইয়া 'লরি' চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল খেজুরি বিবি। ক্রমশ তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল, মুখের ভাব প্রশান্ত হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে আবার সেই প্রশ্নটাই তাহার মনে জাগিল যাহা বহুবার জাগিয়াছে। মা বাবাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন কেন? তাহাকেই বা সুদূর কুমিল্লায় মামার বাড়িতে পাঠাইয়া দেওয়ার হেতু কি? হেতুটা ঠিক কি তাহা চপলা জানে না। শুধু জানে একদিন সকালে উঠিয়া মা বলিলেন, চল আজ আমরা কলকাতা যাব। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠিয়াছিলেন এবং সেখানে বাপের বাড়ির একজন লোককে পাইয়া তাহার সহিতই চপলাকে কুমিল্লা পাঠাইয়া দেন। এসব করিবার কি কারণ ছিল? চপলা ঠিক জানে না। কিন্তু নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল একটা। একটা জনশ্রুতি অবশ্য সে শুনিয়াছে। কৃষ্ণধনবাবুর মায়ের

সহিত তাঁহার বাবার নাকি একটা অবৈধ সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণধনবাবুর বাবা এখানে জমিদারি স্টেটে সামান্য বেতনের মুহুরি ছিলেন। মা যেদিন সে কথা টের পান সেইদিনই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। বাড়ির পুরাতন দাসী মুনুর মায়ের কাছে এ কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া ধমকাইয়া দিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু মানুষের মন এমন বিচিত্র যে মুনুর মাকে ধমকাইয়া দিলেও কথাটাকে সে অবিশ্বাস করে নাই। নিজে সে এখন বুঝিয়াছে পুরুষ-জাতের স্বভাবটা কি। যুবতী নারীর সংস্পর্শে প্রায়ই তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। অনেকটা পতঙ্গের মতো, আলো দেখিলেই ছুটিয়া আসে। এই সাধারণত সব পুরুষেরই স্বভাব, কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন। এ জন্য বাবার উপর তাহার রাগ নাই। বরং এই জন্যই সে কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের সহিত নিজের কেমন যেন একটা আত্মীয়তা অনুভব করে। বাবা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন হয়তো ইহাদের এতো অভাব থাকিত না। কৃষ্ণধনবাবুর মাকে সে ছেলেবেলায় দেখিয়াছিল। তিনি কালো ছিলেন, কিন্তু কি অপরূপ শ্রী যে ছিল তাঁহার। চপলাকে তিনি খুব আদর করিতেন। কৃষ্ণধনবাবুর বাবা রূপবান ছিলেন না... হঠাৎ তাহার মায়ের মুখটা আবার তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। কঠিন হইয়া উঠিল তাহার মুখের ভাব। সে মনে মনে বলিল—না, আমি ঠিক করছি। অনাহারে কাউকে আমি মরতে দেব না। এর জন্যে যদি আমাকে নরকেও নামতে হয় নামব।

"এখন কি করছ আলো—কার্তিকবাবু কোথা" ––পদ্মকলি আসিয়া প্রবেশ করিল। চপলা মৃণাল নামটাকে বদলাইয়া পদ্মকলি করিয়াছিল, মৃণাল তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিল—আলো।

"বেরিয়ে গেল। আমি ওকে সব কথা বলেছি, পদ্মকলি। তুমি রাগ করবে না তো? ও এমন না-ছোড়, বলতেই হল—"

"একটা কথা তুমি মনে রেখো। পদ্ম কখনও আলোর উপর রাগ করে না। তার স্পর্শে সে সর্বদাই আনন্দিত। তুমি আমার আনন্দের উৎস। তুমি যা খুশি কর আমার আপত্তি নেই, আমার ভয় নেই, ভাবনাও নেই—"

চপলা স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। তাহার পর বলিল—"কিন্তু উৎসে অবগাহন করবার প্রবৃত্তি তো হয় না তোমার কোনও দিন—"

"না। উৎসকে আমি অপবিত্র করতে চাই না। আমি জানি প্লেটোনিক ভালোবাসা অসম্পূর্ণ, কিন্তু ওই অসম্পূর্ণতারই আনন্দে আমি ভরপুর। ওর সীমাবদ্ধতার সীমানায় দাঁড়িয়ে আমি অসীমকে দেখতে পাই। তা যখন পাব না তখনই সীমা লঙ্ঘন করবার কথা ভাবব। চল কার্তিকবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক—"

"সে বেরিয়েছে। দেখি কোথায় গেল—"

বাহির হইয়া তাহারা কার্তিককে দেখিতে পাইল না।

।। ৪ ।।

বাহির হইয়া কার্তিক একটা খালি রিকশা পাইয়া গেল। তাহাতেই চড়িয়া বসিল।

"কোথা যাবেন বাবু—"

"চল না কিছু দূর এগিয়ে। কোনও ফাঁকা জায়গায় নেমে পড়ব।"

"কোন ফাঁকা জায়গায়—"

"আরে তুমি চল না আমি ঠিক জায়গায় নেমে পড়ব।"

কার্তিককে এ অঞ্চলে সকলেই চিনিত, সকলেই জানিত যে দশটি কো-অপারেটিভ দোকান এ অঞ্চলে গরীবদের সহায় কার্তিকই তাহার সর্বেসর্বা। রিকশাওয়ালা আর আপত্তি করিল না। মাইল দুই দূরে একটা ফাঁকা মাঠে সে নামিয়া পড়িল। মাঠের ওপারে বৃক্ষবেষ্টিত একটা স্থান ছিল। রিকশাওলার ভাড়া মিটাইয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইল কার্তিক। গিয়া দেখিল মস্তবড় একটা পুষ্করিণী। একটা গাছের নীচে বসিয়া সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে মনোনিবেশ করিল। চপলার নিদারুণ স্বীকারোক্তি তাহার মনে যে ঝড় তুলিয়াছিল, যে অনিশ্চিত জীবনের ছবি আবার তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আকস্মিকতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই সে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এই নির্জন স্থানটিতে এবং চেষ্টা করিতেছিল এই অখ্যাত লেখকের অদ্ভুত লেখাটার সাহায্যে নিজেকে খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে।

"সূত্রধাব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনে হইতেছিল তিনি যেন সর্ব-শুক্লা সরস্বতীর পুরুষ-সংস্করণ। হস্তে শ্বেতপদ্ম, পরিধানে শ্বেত বসন, শ্বেত উত্তরীয়, কণ্ঠে শ্বেতপুষ্পের মালা, ললাটে শ্বেতচন্দনের তিলক। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ও মুখের হাসিতেও যেন শুভ্রতা ক্ষরিত হইতেছিল।

তিনি বলিতেছিলেন, "মানুষ যে জঘন্যতম পশু এর অনেক উদাহরণ ইতিহাসে আছে। সমস্ত পশুরাই মাৎস্যন্যায়ের অনুবর্তী। পশুশক্তিই তাদের কাছে ন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি। মানুষ-পশুরাও অন্য ন্যায় জানে না। এই পশু-দানবদের দলন করতে হলে তাই পশু-শক্তিই প্রয়োগ করতে হয়। যেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে অহিংসার বাণী যত জোরেই এবং যত রকমেই বলা হোক আগুন নিববে না। আগুনে জল ঢালতে হবে, আগুন নেবাবার জন্য দমকল ডাকতে হবে। গীতার অর্জুন থেকে আরম্ভ করে আপনাদের যুগের নেতাজী পর্যন্ত ওই এক কথা বলে গেছেন। গোপালদেবও যে সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগে গণতন্ত্র স্থাপন করে তার নেতারূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারও মূলে ছিল তাঁর বাহুবল। এর কোনও ঐতিহাসিক তথ্যই তো পাওয়া যায় না। কিন্তু ফল থেকে কারণ অনুমান অসঙ্গত নয়। তিনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশে অত বড় একটা অভিনব রাজত্ব স্থাপন কারতে পেরেছিলেন শুধু অহিংসার বচন আউড়ে বা প্রেমের বাণী বিতরণ করে—এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি সৈনিক ছিলেন, হয়তো নানা সদ্‌গুণের জন্য তিনি জনপ্রিয়ও ছিলেন—কিন্তু শুধু সদ্‌গুণের জন্যই তিনি একটা রাজ্যের নেতা হয়েছিলেন, কোনরকম বলপ্রয়োগ বা কৌশল প্রয়োগ করেন নি একথা মন মানতে চায় না। আমি বলব মাৎস্যন্যায়ের বিশৃঙ্খলা তিনি বীর্যবলেই সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। তারপরও আমাদের দেশে অনেকবার মাৎস্যন্যায়ের বীভৎসতা দেখা গেছে, যদিও ইতিহাসে সে কথা মাৎস্যন্যায়ের নামে চিহ্নিত হয়ে নেই। আজকালকার কথাই ভাবুন না। আজকাল ন্যায়ের মুখোশ পরে মাৎস্যন্যায়ই কি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে নেই? ওই যে ইতিহাস আসছেন, তাঁর মুখেই ইতিহাসের কথা শুনুন।......."

সূত্রধার অন্তর্হিত হইলেন।

গোপালদেব সবিস্ময়ে দেখিলেন আকাশপটে এক বিরাট বাদক স্কন্ধে এক বিরাট দামামা ঝুলাইয়া সেটি বাজাইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার মাথায় সুরঞ্জিত শিরস্ত্রাণ, পরিধানের বস্ত্রটিও বর্ণ-শোভায় মনোহর। গায়ে কিন্তু কোন জামা নাই। সর্বাঙ্গ সুগঠিত পেশীতে সমৃদ্ধ। সেই দুন্দুভি-নিনাদে গোপালদেব যেন শুনিতে লাগিলেন সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক, সতের জয় হোক। সর্বশেষে বাদ্য থামাইয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—ইতিহাস আসিতেছেন।

ঘোষক অন্তর্ধান করিলেন। আকাশপটে পুনরায় সেই শিলাবেদি মূর্ত হইল। তাহার পর সৌম্যকান্তি ইতিহাসে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া ভূর্জপত্র হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন ঃ—

"আমাদের দেশে প্রত্যেক রাজত্বের অবসান সময়েই মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়াছিল। পাল রাজগণ যখন দুর্বল হইয়া পড়িলেন তখন বর্মারাজবংশের উদ্ভব হইল। এই বংশের বজ্রবর্মা একাধারে বীর কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্মার অনেক কীর্তিকথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ইঁহারাও বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ভোজবর্মাই এ বংশের শেষ রাজা। তাহার পর আসিলেন সেন রাজগণ কর্ণাটক হইতে। কোনও রাজ্যের প্রজাগণ যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহা হইলে বহিরাগত কোন শত্রু আসিয়া সহসা সেখানে রাজ্য স্থাপন করিতে পারে না। পাল রাজাগণ সকলেই প্রায় বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের বাড়াবাড়ি বঙ্গদেশ বোধহয় আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বর্ম বংশীয় রাজারা বৈদিক ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেই জন্যই সম্ভবত তাঁহারা বঙ্গদেশে প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্মরাজবংশ বেশীদিন নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে কর্ণাটদেশীয় বিজয় সেন এই বর্মরাজবংশকে উৎখাত করেন। সেন রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন না। পাল রাজত্বের শেষ যুগে বাংলায় রাজনৈতিক একতা আর ছিল না, বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা পরস্পর কলহে মত্ত হইয়াছিলেন। বিজয় সেন দ্বিতীয় গোপালদেবের মতো আবির্ভূত হইয়া দেশে দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বত্র সুখ ও শান্তি আনয়ন করিলেন। বিজয় সেনের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসে গৌরবের যুগ। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন দেশকে গৌরবের শিখরে লইয়া গিয়াছিলেন। শস্ত্রচালনা ও শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া রাজর্ষিতুল্য বল্লাল সেন বৃদ্ধবয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং তাঁহাকে সাম্রাজ্যরক্ষারূপে দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের পুস্তক হইতে ঐটুকু উদ্ধৃত করিলাম। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ দুইখানি বল্লাল সেনের অমর কীর্তি। লক্ষ্মণ সেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময়ই তুরস্ক সেনারা গৌড় জয় করিল। বাংলার মাটিতে মুসলমান মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী পদার্পণ করিলেন। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেন খুব খারাপ রাজা ছিলেন না, তবু তাঁহাকে রাজ্য হারাইতে হইল খুব সম্ভবত বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে। সপ্তদশ অশ্বারোহীর ভয়ে লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করিয়াছিলেন মীনহাজুদ্দিন লিখিত এই অদ্ভুত গাল-গল্প নিতান্তই অবিশ্বাস্য। ইহার কোন দলিল বা বিবরণ নাই। লোকমুখে শোনা কথা। আধুনিক কালে ইংরেজরাও আমাদের নামে এরূপ মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের নামে অনেক বিরাট মিথ্যা কুৎসাও তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হলওয়েল মনুমেন্ট একটা বিরাট মিথ্যার প্রতীক ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কলঙ্কের স্তম্ভটাকে অপসারিত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসে যাহা লেখা

হয় সব সময়ে তাহা সত্য নয়। তবে এটা সত্য কথা যে যখন কোন রাজ্যের পতন হয় তখন সে রাজ্যের ভিতরই অনেক গলদ থাকে। সেই গলদের সুযোগ লইয়া বিশ্বাসঘাতকরা শত্রুপক্ষের সুবিধা করিয়া দেয়। প্রত্যেক রাজত্বের পতনের পূর্বে রাজা আর রাজ্যের সম্বন্ধে সমনস্ক থাকেন না। তাঁহার অনুগ্রহ-পুষ্ট রাজকর্মচারীরা তখন যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, মাৎস্যন্যায়ের মতোই একটা অন্যায় কাণ্ড সর্বত্র চলিতে থাকে, প্রজারা অসন্তুষ্ট হয় এবং বিশ্বাসঘাতকরা সেই সুযোগে শত্রুদের ডাকিয়া আনে। ইতিহাসে বারংবার ইহা ঘটিয়াছে। আর একটা জিনিসও ঘটিয়াছে। দেশ যখন বিশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হইয়া যায় তখন দেশের ভিতর হইতেই ইহার প্রতিকার ইহার প্রতিবাদ কোনও নেতা বা রাজার ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করে। সেকালে রাজা গোপালদেব ইহার উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ রাজা গণেশ। তিনিই একমাত্র স্মরণীয় পুরুষ যিনি পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলমান শাসনের মধ্যে হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময় এইরূপ আরও দুইটি অবিস্মরণীয় পুরুষ শিবাজী এবং রানা প্রতাপ সিংহ। মুসলমান শাসন-কালে আর একজন বিদ্রোহী পুরুষও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্য। ইনি অসিহস্তে যুদ্ধ করেন নাই, দুই বাহু বাড়াইয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিনব বিদ্রোহ শুধু ধর্মজগতেই নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতেও যে পরিবর্তন আনিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। শ্রীচৈতন্য তপস্বী ছিলেন, তপস্যা কখনও নিষ্ফল হয় না। ইতিহাসে এইরূপ আর একটি তপস্যার প্রভাব ভারতের ভাগ্যে নিদারুণ অভিশাপই বহন করিয়া আনিয়াছিল। এ তপস্যা করিয়াছিলেন পর্তুগালের ইতিহাসবিখ্যাত রাজকুমার হেনরি। তিনি চিরকুমার থাকিয়া সেন্ট্ ভিনসেণ্ট (St. Vincent) নামক অন্তরীপে পুরোহিতগণের পবিত্র সাধনক্ষেত্রে বসিয়া স্বপ্ন দেখিতেন—কি করিয়া নৌকাযোগে সমুদ্রপথে নূতন দেশে যাওয়া যায়। তাঁহার অপূর্ব অধ্যবসায় বলে তিনি বায়ুবলে পোত-চালনা করিবার শিক্ষালাভ করিয়া বড় বড় সমুদ্রপোত নির্মাণের উদ্যম করিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্যম সফল হইয়াছিল। বায়ুচালিত অর্ণবপোতে সুশিক্ষিত নাবিকরা সমুদ্রপথে বহুদূর অগ্রসর হইতেও পারিয়াছিল। এই তপস্যার ফলেই ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকার্ক প্রভৃতি দস্যুরা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের মালাবার উপকূলে কেরলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহা সভ্যমানুষের কীর্তি নয়, অসভ্য বর্বর নর-পশুদের লোভোন্মত্ত পাশবিক অত্যাচার। এমন লোককে সাহায্য করিবার জন্যও ভারতবর্ষে বিশ্বাসঘাতক জুটিয়াছিল—কোচিনরাজ সাহায্য না করিলে তাঁহারা কালিকটরাজ সামরীকে বিধ্বস্ত করিতে পারিতেন না। আলবুকার্ক যখন ভারতের উপকূলে রাজধানী স্থাপন করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন তখন গোয়া স্থানটির সন্ধান তাঁহাকে একজন ভারতীয় জলদস্যুই দিয়াছিল—লোকটার নাম টিমোজা। এরূপ টিমোজা ও কোচিনরাজের অস্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র আছে। নেতাজী আই-এন-এ হইতেও ইহাদের সম্পূর্ণ দূর করিতে পারেন নাই। আমি এসব কথা বলিতেছি তাহার কারণ যেখানে ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণ নাই যেখানে সবরকম সম্ভবপর কথাই ঐতিহাসিকের মনে রাখা উচিত। ইতিহাস কেবল মহৎ লোকদের কাহিনীমালাই নহে, তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে অনেক নীচ স্বার্থপর লোকেরও কুকীর্তি। গোপালদেব সম্বন্ধে কিছু জানা নাই, ঐতিহাসিক তাঁহাকে মহামানব বলিতেও যেমন ইতস্তত করিবে মহাদানব বলিতেও তেমনি ইতস্তত করিবে। ইতিহাসের আলোকে এক যুগের বীর অন্য যুগে দস্যু বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে।

ইহাও স্মরণযোগ্য আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, ফ্রেডারিক দি গ্রেট, হিটলার এখন আর বীর বলিয়া লোকের সম্ভ্রম উদ্রেক করিতে পারেন না। গোপালদেব সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক মনোভাব সেজন্য নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। হয়ত তিনি মহাকৌশলী ছিলেন—ও বাবা, কবি আসিতেছেন। আমি চলিলাম। তাঁহার কল্পনার ফেনায়িত সমুদ্রে সাঁতার কাটিবার সাধ্য আমার নাই।"

ইতিহাস সহসা আকাশপট হইতে বিলীন হইয়া গেলেন। কবির আবির্ভাব হইল। এবার কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ-রূপ নহে তরুণী-রূপ। গায়ত্রীর ধ্যানে মধ্যাহ্নকাশে তাঁহাকে যে রূপে ঋষিরা কল্পনা করিয়াছেন—এ যেন সেই রূপ। রক্তিম স্বর্ণাভায় সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত, বিরাট গড়ুরপক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পীতবাসা যুবতী দুই হস্তে বৃহৎ একটি স্বর্ণ প্রদীপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সে প্রদীপের অকম্পিত শিখা জবাকুসুমসঙ্কাশ। তাহার আকাশমুখী সমুজ্জ্বল বার্তা নীরব অথচ বাঙ্ময়। তাহা যেন বলিতেছে—'আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আমিই তোমাদের ভবিষ্যৎ। সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরে আমার জন্ম হইয়াছিল সুদূর অতীতে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরে আমি এখনও দেদীপ্যমান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্তরেই ভবিষ্যতেও আমার জ্যোতি অম্লান থাকিবে। যাঁহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া আমি প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি, তিনি সাগ্নিক কবি। তিনি সরস্বতীর কৃপায় ধন্য। তিনি নারীরূপেই শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন, কারণ গরুড়ই একদা বিবদমান গজকচ্ছপকে ভক্ষণ করেন, গরুড়ই জননীর জন্য অমৃত উদ্ধার মানসে স্বর্গে গমন করিয়া অগ্নিবেষ্টিত চক্রকুণ্ডে প্রবেশ করতঃ অমৃতরক্ষাকারী ভীষণ সর্পকে বধ করিয়া অমৃত উদ্ধার করেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিয়াও এই গরুড়কে বধ করিতে পারেন নাই। এই গরুড় সর্পকুলের শত্রু। এই গরুড় পালনকর্তা বিষ্ণুর বাহন। তাই কবি আজ গরুড়ে আরোহণ করিয়া শক্তিরূপিণী নারীর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বাণী শ্রবণ করুন।

কবি কথা কহিলেন।

"গোপালদেব কি রকম ছিলেন তা নিয়ে চিন্তা করা আমি পণ্ডশ্রম মনে করি। গোপালদেব সত্যিই যেদিন আসবেন সেদিনও তাঁকে জনতা চিনতে পারবে না কিছুদিন। যেদিন পারবে সেদিন কেউ ফুলের মালা নিয়ে ছুটে আসবে, কেউ কাদা ছুঁড়বে। এই কিছুদিন আগেই তোমাদের মধ্যেই মহান নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি দেশের জন্য সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যা করেছিলেন তার তুলনা পৃথিবীতে নেই। এক সভায় সেই নেতাজীর গলায় ফুলের মালা পরাতে গিয়ে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, বৃটিশ সরকার আপনার স্বদেশ-প্রীতির জন্য আপনাকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন— আমরা আপনার দেশবাসীরা আপনার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছি। নেতাজী এখন নেই। তাঁর দেশ এখন খণ্ডিত স্বাধীনতা পেয়েছে। সেই স্বাধীন সরকারও তাকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অনেক নেতারই এ দুর্দশা ঘটেছে। তাই আমি এমন নেতার রূপ কল্পনা করছি, এমন একজন গোপালদেবের কথা ভাবছি, যিনি এখনও মূর্ত হননি, যাঁর মাথার কেউ এখনও কাঁটার মালা পরিয়ে দেয়নি, যিনি এখনও অকলঙ্কিত চন্দ্রের মতো আমার মানসলোকে জ্যোৎস্না বিকিরণ করছেন, যাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাবে আমার মনের আকাশ পুলকিত হয়ে উঠেছে। যাঁর অভ্যর্থনায় শত শত শঙ্খ বাজছে, যাঁর মাথায় পুষ্প বৃষ্টি করছেন স্বর্গের দেবতারা। এই অজাত নেতাকে আমি প্রতিদিন নানা অলঙ্কারে সাজাই, নানা বর্ণে রঞ্জিত করি, অর্চনা করি নানা বন্দনায়, চর্চিত করি যে গন্ধ-প্রসাধনে তা মর্ত্যলোকে সুলভ নয়। সে নেতার আগমনী গান ধ্বনিত হচ্ছে দুঃখীর

ক্রন্দনে, আর্তনাদের হাহাকারে, অত্যাচারের অট্টহাস্যে, সে নেতার পথে আলোর দীপাবলী সাজিয়েছেন আশাবাদী বিশ্বাসীরা, সে আবির্ভাবের পটভূমিকা তৈরি করছে বর্তমান যুগের শহীদদের আত্মোৎসর্গ, তাঁর বন্দনা-গান রচনা করছি আমি, শাশ্বত কালের কবি। কিন্তু তিনি এখনও আসেন নি, তবে এও জানি তিনি আসন্ন। তিনি আসবেন। অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, মহামান্য টিলক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, ইনিও সেই বাণী উচ্চারণ করবেন। কারণ বাণী চিরকাল একই থাকে, প্রকাশ করবার ভঙ্গীতেই তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। বন্দেমাতরম্ আর জয় হিন্দ—মূলত একই ভাবের প্রকাশ। দেশের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যা বলেছেন সেই ভাবই প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে। তবু কত বিভিন্ন ওঁদের আবির্ভাব। সত্য শিব সুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেই বহু প্রচীন কালে উপনিষদের কবি গেয়েছিলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। তারপর লক্ষ লক্ষ কবি লক্ষ লক্ষ নেতা ওই একই ভাবে ডাক দিয়েছেন নিদ্রিত জনতাকে—কিন্তু ভিন্ন ভাষায়; ভিন্ন ভঙ্গীতে। অনাগত যুগের অজাত নেতার মুখে কোন্ ভাষায় কোন্ ভঙ্গিতে এই সনাতন বাণী ফুটবে তা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি, কিন্তু এখনও শুনতে পাইনি। আপনি গোপালদেবের কথা ভাবছেন, গোপালদেবই আবার আবির্ভূত হবেন, কিন্তু নব রূপে। কোনও লোভ, কোনও মোহ, কোনও স্বার্থ তাঁকে বিচলিত করতে পারবে না, অতন্দ্রিত তপস্যায় নিজেকে তিনি পবিত্র করছেন, প্রস্তুত করছেন নিজেকে স্বদেশপ্রেমযজ্ঞাগ্নির আহুতি রূপে। দেশের জন্য আত্মবিসর্জন করবেন তিনি । গরুড়ের মতো ধ্বংস করবেন সর্পকুলকে, অমৃত এনে দেবেন দেশমাতার হস্তে, বহন করবেন পালনকর্তা বিষ্ণুকে, দহন করবেন সর্ববিধ পাপ ও অশান্তি। তারপর দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি আত্মবিসর্জন করবেন, তাঁর দেহটা হয়তো ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু তিনি মরবেন না, তাঁর অমর কীর্তির অমরাবতীতে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকবেন ভবিষ্য যুগের আদর্শ হয়ে চিরকাল। ইতিহাসের নজীর নিয়ে গোপালদেবের কল্পনা করবেন না, কারণ তিনি হবেন অনন্য, অভূতপূর্ব। তিনি কি বললে বন কি করবেন তা আমরা জানি অথচ জানি না। কোন্ অভিনবত্ব নিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন তার নানারকম কল্পনা করে চিত্তবিনোদন করতে পারি, কিন্তু বার বার স্বীকার করতে হবে—জানি না জানি না তুমি কেমন হবে।—"

মহান আসিয়া প্রবেশ করিতেই স্বপ্নজাল ছিন্ন হইয়া গেল। মহান ডাক লইয়া আসিয়াছিল। ডাকটি রাখিয়া সে বলিল—"একটা ঘোড়া এসেছে। খুব ভালো ঘোড়া।"

"ঘোড়া?"

"হ্যাঁ। যিনি এনেছেন তিনি এই চিঠিটাও দিলেন।"

শিলমোহর-করা একটি পত্র সে গোপালদেবের হাতে দিল। পত্রটি পড়িয়া গোপালদেব বিস্মিত হইয়া গেলেন। বহুকাল পূর্বে তিনি যে অশ্বব্যবসায়ীকে পত্র লিখিয়াছিলেন তিনিই ঘোড়াটি পাঠাইয়াছেন। লিখিয়াছেন—"অধ্যাপক মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি এই পত্রবাহকের সহিত একটি ভালো ঘোড়া পাঠাইতেছি। এটি আমার উপহারস্বরূপ যদি গ্রহণ করেন কৃতার্থ হইব। একজন প্রকৃত গুণীকে সেবা করিবার সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না। সে সুযোগ যখন আসিয়াছে তখন আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন না।.....'

গোপালদেব মহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটি কোথা?"

"বাইরের ঘরে রয়েছে। তার একটি কথাও বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত কাবুলী—"

"তাঁকে ডেকে আন—"

একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসা, সূচ্যগ্র দাড়ি। মাথার কাবুলী টুপি পরিধান করিয়া আছে। সে আসিয়াই গোপালদেবকে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করিল। যে ভাষায় কথা কহিল তাহা গোপালদেব বুঝিতে পারিলেন না, মনে হইল পস্তু ভাষা। গোপালদেব তখন মহানকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলমারি থেকে একটা একশ টাকার নোট নিয়ে এস।"

কাবুলী কিন্তু নোট রইল না। আর একবার স্যালুট করিয়া পকেট হইতে একটি ছোট চামড়ার থলি বাহির করিল। থলিটি খুলিয়া সে দুইখানি একশত টাকার নোট গোপালদেবকে দেখাইল। এবং বার কয়েক মাথা নাড়িল। গোপালদেব তখন বাহিরে গিয়া ঘোড়াটি দেখিলেন। অপূর্ব ঘোড়া। মনে হইল আরব দেশের ঘোড়া এটি। ঘোড়াটির গ্রীবা-ভঙ্গী, গড়ন, উচ্চতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দেখিলেন ঘোড়াটি সুসজ্জিত করিয়াই পাঠাইয়াছেন ভদ্রলোক। নূতন জিন, লাগাম, রেকাবে ঘোড়াটি সুসজ্জিত। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি পত্র লিখিয়া কাবুলীকে দিলেন। লিখিলেন—'আপনার বদান্যতায় আমি মুগ্ধ। অনেকদিন ঘোড়ায় চড়ি নাই, এবার চড়িবার চেষ্টা করিব। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

পত্র লইয়া কাবুলী পুনরায় স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

কার্তিক তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল—হঠাৎ ঘেউ ঘেউ ঘেউ শব্দে চমকাইয়া উঠিল। কুকুরটা যে কখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে টের পায় নাই। দেখিল ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে লর্ড তাহাকে বকিতেছে। ভাবটা—এমন ভাবে পালিয়ে আসার মানেটা কি।

"তুই কি করে এলি এখানে!"

লর্ড তাহার কাঁধের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া আবদারের সুরে বলল— "গোঁ-ও-ও-ও-।"

"সর। পড়ছি, এখন বিরক্ত করিস না—"

লর্ড পুনরায় বলিল—"গো-ও-ও-ও—।"

তাহার পরই সোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। পুকুরের পাড়ে গিরগিটি দেখিতে পাইয়াছিল সে। গিরগিটিকে ধরিতে পারিল না। একটা গাছের ডালে কয়েকটা শালিক বসিয়াছিল, পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া তাহাদেরই বকিতে লাগিল। শালিকরা উড়িয়া গেল। তখন সে মাথা নীচু করিয়া মাটি শুঁকিতে শুঁকিতে পুকুরের পাড়ের ঝোপঝাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কার্তিক আবার পাণ্ডুলিপিতে মন দিল।

"গোপালদেব ডাকের চিঠিপত্র দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা খাম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। খামের উপর পরিচিত হস্তাক্ষর, যে হস্তাক্ষরের আশায় প্রথম যৌবনে একদা তিনি পিয়নের পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। দময়ন্তীর চিঠি। খামের ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। দয়মন্তী লিখিয়াছিলেন—

শ্রীচরণেষু,

অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখছি। কাল আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি। মগনলাল সেখানে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নীলার ছেলে-পেলে হবে। ওর টাকা দিয়ে যদিও নার্স হাসপাতাল ডাক্তার সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু নীলা, আমাদের সেই নীলা, যার তুমি অনেক নাম দিয়েছিলে—নীলটু, নাইল, নীল পাখি, নীলম—আমাদের সেই নীলা বিদেশে গিয়ে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। আমাকে চিঠি লিখেছে—'মা, এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না। টাকা দিয়ে সব কেনা যায়, ভালোবাসা কেনা যায় না। এখানে কোনও জিনিসেরই অভাব নেই, তবু মনে হচ্ছে আমি নিতান্ত অসহায়। জলের মাছকে কে যেন ডাঙায় তুলে এনেছে। কাল রাত্রে একটা ভারী বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মগন যেন মারা গেছে, আর সে 'নিগার' বলে তার মড়া যেন কেউ ছুঁচ্ছে না। আমি যেন পাগলের মতো নোটের তাড়া নিয়ে সকলের খোশামোদ করে বেড়াচ্ছি, তবু কেউ আসছে না। বড্ড খারাপ লাগছে আমার। এখানে স্নেহ ভালোবাসা সেবা যত্নও সব নিক্তির ওজনে, ডলারের মাপে। তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে। তুমি কাছে থাকলে আমি নির্ভয় হবো। এখানে এই অচেনা জায়গায় সর্বদাই ভয় ভয় করে আমার। মা তুমি এস। আমি এই সঙ্গে একটা ড্রাফ্‌ট পাঠালুম। প্লেনে চলে এস। দাদাকে বললেই সে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেবে। বাবাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু ভয়ে লিখতে পারি না। তাঁর চক্ষে আমরা দোষী। যদিও আমরা যা করেছি তা নিজেদের বিবেক অনুসারেই করেছি, কিন্তু তাঁর বিবেকের সঙ্গে আমাদের বিবেকের মিল নেই। আমরা সাধারণ মানুষ, তিনি অসাধারণ। তাঁর নাগাল পেলুম না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সেই দুর্ভাগ্যটাকে নতশিরে মেনে নিয়েছি। সত্যি, জীবন জিনিসটা কি আশ্চর্য—কত রকমই যে হয়—আমাদের বাবা অত দূরে চলে যাবেন এ যে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তুমি কিন্তু মা এসো। বুঝলে? কোন ওজর আমি শুনব না।"

প্রবাল সব ঠিক করে দিয়েছে। কাল আমি যাচ্ছি। তুমি তো জানো, আগে আমার নানারকম সংস্কার ছিল, ছুঁচিবাই ছিল, গঙ্গাজল ছেটানো আর বারবার কাপড় ছাড়া নিয়ে তুমিও একদিন কত ঠাট্টা করেছ। এখন ছেলেমেয়েদের জন্য সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। এখন মনে হয়, স্বামীকে আর ছেলেমেয়েদের সেবা করাই আমার একমাত্র কর্তব্য। তুমি তো তরোয়াল চালিয়ে আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছ, ইচ্ছে থাকলেও তোমার কাছে তাই আর যেতে পারি না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধ এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই যতদিন বাঁচি তাদেরই সেবা করব, তাদেরই জীবনকে মধুময় করে তুলব। তাদেরই অনুরোধে তাই পেটকাটা ব্লাউজ পরি, তাদেরই অনুরোধে জুতা পায়ে দিই, সিনেমায় হোটেলে যাই, তারাই নানারকম ফ্যাশানে আমাকে সাজিয়ে তৃপ্তি পায়। তাদের সে তৃপ্তিতে আমি বাধা দিতে চাই না, বাধা দিতে পারি না। ওরাই এখন আমার ধর্মকর্ম, ঈশ্বর ভগবান—সব। নীলা চিরকালই ভীতু, রাতে আমাদের বাড়ির বড় দালান পেরিয়ে একা যেতে ভয় করত তার, তাকে তার শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হত আমাকে! সে ওই বিদেশ বিভুঁই থেকে ডাক দিয়েছে, মাগো তুমি এস। আমি কি না গিয়ে পারি? প্রবাল একটা মেসে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। মেসটি ভালো। আমি দেখে এসেছি। আমাদের পুরানো ঠাকুর অর্জুনই সেখানে রান্না করে। প্রবাল এখন আনন্দের সপ্তম স্বর্গে চড়ে

বসে আছে। সুরেশ ঠাকুরপো বললেন—তার বউকে তোমার না কি খুব ভালো লেগেছে। অরুণা—প্রবালের বউ। সুরেশ ঠাকুরপো ওকে নার্স সাজিয়ে নিয়ে গেছে তোমার কাছে। অনেকদিন আগে ও নার্সের কাজ করেও ছিল অবশ্য কিছুদিন। এখন করে না। ও যে তোমাকে খুশী করতে পেরেছে এতে আমিও খুব সুখী। বউ সত্যিই ভালো হয়েছে আমাদের।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো। কবে ফিরব—ফিরব কি না—তা মা মঙ্গলচণ্ডীই জানেন। সাবধানে থেকো। এখনও কি বেশী লঙ্কা খাও? খেও না, লক্ষ্মীটি।

প্রণতা
দময়ন্তী

পত্রটি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন গোপালদেব। তাঁহার রগের শিরাগুলি দপদপ করিতে লাগিল।

"মহান—"

মহান আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন—"ওই নার্সটিকে ডেকে দাও তো—"

একটু পরেই অরুণা আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ কেন।"

অরুণার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে আনতনয়নে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গোপালদেব বলিতে লাগিলেন—"তুমি প্রবালের বউ এ কথা তো প্রকাশ করনি একদিনও।"

"ডাক্তার কাকা মানা করেছিলেন, তাছাড়া নিজের মুখে ও কথা বলব কেমন করে!"

গোপালদেব নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত, তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। গাঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"তোমাকে যদি পুত্রবধূরূপে স্বীকার করতে পারতাম তাহলে খুব সুখী হতাম। তুমি সত্যিই খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু স্বীকার করতে পারব না। আমার অতীত বংশগৌরব তোমার আমার মধ্যে বিরাট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভূশায়ী করে তোমার কাছে আমি যেতে পারব না। আমরা সেকেলে লোক। প্রাচীন মত প্রাচীন পথ আমরা ত্যাগ করতে পারি না। ত্যাগ করবার ইচ্ছাও নেই। তুমি ভালো মেয়ে, কিন্তু প্রবালের মা, আমার মা, আমার ঠাকুমা, আমার প্রপিতামহী যে আসনে বসেছিলেন, সে আসনে তোমাকে আমি বসাতে পারব না। সে আসনে অন্য জাতের মেয়েকে বসাবার অধিকার আমার নেই। আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।"

অরুণা ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চলিয়া গেল।

"মহান—"

মহান আসিয়া দাঁড়াইল।

"ঘোড়াটাকে নিয়ে এস। এখুনি চড়ব—"

"কোথায় যাবে এখন—"

"তুমি নিয়ে এস না, আমার যেখানে খুশী যাব—"

"ও ঘোড়া আমি আনতে পারব না। ও তো পাহাড় একটা। সহিসটহিস বাহাল কর আগে, দু'দিন থাকুক এখানে, একটু পোষ মানুক।"

"না, আমি এখনি চড়ব—"

গোপালদেব উঠিয়া পড়িলেন। সম্মুখের দেওয়ালেই তরবারিটি টাঙানো ছিল, সেটি কোষমুক্ত করিয়া তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে সেটি ধরিয়া রহিলেন চক্ষুর সম্মুখে। দময়ন্তীর চিঠিটা পড়িয়া তাঁহার অন্তর্লোকে ভূমিকম্পের মতো একটা বিপর্যয় হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে বিংশ শতাব্দীর লোক একথা সহসা যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি সেই অষ্টম শতাব্দীর গোপালদেব, তাঁহাকে ঘিরিয়া বিশ্বাসঘাতকদের একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুরাই প্রতারক হইয়াছে, কিন্তু তিনি গোপালদেব, তাঁহাকে অত সহজে বিধ্বস্ত করা যাইবে না, তিনি তাঁহার সমস্ত সত্তা দিয়া ইহার প্রতিরোধ করিবেন। যে প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর আমাদের দেশের সত্য-শিব-সুন্দর প্রতিষ্ঠিত, যে সামাজিক বনিয়াদের উপর আমাদের গৌরব মান-মর্যাদা অধিষ্ঠিত, তাহাদের যেমন করিয়া হোক রক্ষা করিব। পরিবর্তন যদি স্বাভাবিক সভ্য পথে আসে তাহা মানিয়া লইতে আপত্তি নাই, কিন্তু কাম, লোভ ও অসংযমের ন্যক্কারজক যে ঔদ্ধত্য সমাজকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে, যথেচ্ছাচারের অসংযত লীলাকেই পরিবর্তন বলিয়া যাহারা আস্ফালন করিতেছে, তাহাদের তিনি মানিবেন না, কিছুতেই মানিবেন না। প্রয়োজন হইলে অসি-হস্তেই আবার তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। মাৎস্যন্যায়কে গোপালদেব অসি-শক্তিতেই দেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন—যদিও ইতিহাসে সেকথা স্পষ্টভাবে লেখা নাই। ইতিহাসে—বিশেষত প্রাচীন ইতিহাসে কয়টা সত্য কথাই স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে? দেদ্দা? দেদ্দা যে তাঁহার স্বজাতীয় ছিলেন না এমন কথা তো কোথাও লেখা নাই।.....গোপালদেবের সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল বাংলোর আশেপাশেই বুঝি শত্রুরা হানা দিয়েছে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অসিহস্তে একাই তিনি হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"কি কাণ্ড করছ তুমি—"

মহান একবার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু গোপালদেব তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। বাংলোর বাহিরে মাঠের উপরই ঘোড়াটা দাঁড়াইয়াছিল। তখনও তাহার পিঠ হইতে জিন নামানো হয় নাই। মুখে লাগাম লাগানই ছিল, একটা খুঁটিতে সেটা আটকানো ছিল কেবল। গোপালদেব এককালে সত্যই ভালো ঘোড়সওয়ার ছিলেন। সোজা গিয়া ঘোড়াটার পিঠে চাপড় দিলেন বার দুই, তাহার পর লাগামটা খুঁটা হইতে তুলিয়া এক লম্ফে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বাম হস্তে লাগামটা বাগাইয়া ধরিলেন—দক্ষিণ হস্তে উৎক্ষিপ্ত উন্মুক্ত তরবারি ঝকমক করিয়া উঠিল। তীরবেগে অশ্ব বাহির হইয়া গেল। শহরের রাস্তা পার হইয়া অবশেষে প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন গোপালদেব। দিগন্তবিস্তৃত বিরাট প্রান্তর। তাঁহার মনে হইল, ওই প্রান্তরের অপর পারে শত্রু সেনারা সমবেত হইয়া আছে। বীরবিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। গোপালদেব আরও বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। আরবী অশ্ব বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনা ঘটিল একটা। মাঠের মাঝে বিরাট একটা গহ্বর ছিল, সে গহ্বরের ভিতর হইতে অনেক কুশ, গুল্ম, আগাছা গজাইয়াছিল বলিয়া সেটাকে সমতল মনে হইতেছিল। গোপালদেব অশ্ব সহিত সেই গহ্বরের ভিতর পড়িয়া গেলেন। ঘোড়াটার কোমর ভাঙিয়া গেল, সে ছটফট করিতে লাগিল, গোপালদেবও গুরুতর আঘাত পাইলেন, কারণ তাঁহার হাতের তরবারি তাঁহারই কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। একটু পরে সেই নির্জন প্রান্তরে নিজের আদর্শ ও স্বপ্ন পরিবেষ্টিত হইয়া উন্মাদ প্রাচীনপন্থী মহাপুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই পর্যন্ত পড়িয়া কার্তিক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। গোপালদেবের জন্য দুঃখ হইতে লাগিল তাহার। পাতা উল্টাইয়া দেখিল গ্রন্থকার ফকিরচাঁদ আরও খানিকটা লিখিয়াছেন।

"গল্পটা এইভাবে এইখানেই শেষ করিয়া দিলাম। এভাবে শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল না। মালিনীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া আমি যাহা হইয়াছি তাহারই আলেখ্য গোপালদেবের চরিত্রে প্রতিফলিত করিব ভাবিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল অরুণা ও প্রবালের প্রেমকে, মগনলাল ও নীলার বিবাহকে তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া আবার তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন এবং বাকী জীবনটা প্রেমই যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এই উপলব্ধির মহিমা প্রচার করিবেন। কিন্তু তাহা পারিলাম না। গতরাত্রে সেই প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যাম বুধ—আমার গুরুদেব—স্বপ্নে আবার আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চক্ষু হইতে রোষ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। বলিলেন—'তুমি যে গোপালদেবের তপস্যা করিতেছিলে তিনি শক্ত সমর্থ অবিচল বীরপুরুষ। তাঁহার মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহা নির্ণয় করা তোমার কাজ নহে। তুমি যে ছবি আঁকিতে বসিযাছ সে ছবিটি যাহাতে নিখুঁত হয় শিল্পী হিসাবে তাহাই তোমার একমাত্র বিবেচ্য। তাহাকে সহজিয়া পন্থী, কামুক, বা প্রেম-ঢুলু-ঢুলু প্রণয়বিলাসী করিলে তোমার কাব্যে ছন্দপতন ঘটিবে। গোপালদেব শক্তিশালী পুরুষ বলিয়াই তাহার তপস্যা তুমি শুরু করিয়াছিলে. এখন যদি অন্য রকম ভাবে তাঁহার মূর্তি কল্পনা কর তোমার তপস্যা দ্বিমুখী দ্বিধাগ্রস্ত হইবে। শক্তিমানের তপস্যা করিতেছিলে বলিয়াই তোমার দেহে মনে ভাষায় দৃষ্টিতে শক্তির দ্যোতনা পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই জন্যই মালিনী তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখিও, মালিনী কুহকিনী। সে তোমর তপস্যা ভঙ্গ করিতে আসিয়াছে। কুহকিনীর কুহকে না ভুলিয়া তুমি শক্ত সমর্থ প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গোপালদেবের তপস্যা কর। পর্বতের চিত্র পর্বতের মতো করিয়া আঁক, তাহার কানে দুল পরাইতে যাইও না। সেটা অশোভন হইবে। তোমার তপস্যা নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি একাগ্র হইয়া বুধের তপস্যা করিয়াছিলাম বলিয়াই বুধ হইতে পারিয়াছি, বুধের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি যদি বৃহস্পতি বা শুক্রের সৌন্দর্যে অভিভূত হইতাম তাহা হইলে আর বুধ হইতে পারিতাম না। একাগ্র হও, সাধনাকে একমুখী কর—।' এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। গোপালদেবকে শক্ত সমর্থ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষরূপেই আঁকিলাম।

বইটা শেষ করিবার পর রণধীরের চাকর ঝমকু আর একটা খবর আমাকে চুপি চুপি দিয়া গেল। রণধীরের জ্যাঠা রাজপুতানা হইতে আজ আসিয়াছেন। লোকটি ভীষণদর্শন এবং অত্যন্ত সেকেলে। আজ এক নজর তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রকাণ্ড জুলপি, প্রকাণ্ড ঊর্ধ্বমুখী গোঁফ, প্রকাণ্ড নাক, প্রকাণ্ড পাগড়ী। কিংখাবের কোট প্যাণ্টলুন পরা. যাত্রাদলের রাজার মতো। আমার সহিত মালিনীর প্রণয়-লীলার কথা কে নাকি তাঁহার কানে তুলিয়া দিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া অবশেষে না কি হিন্দীতে বলিয়াছেন—শালা কুত্তাকে পিটতে পিটতে রাস্তে মে নিকাল দেও। উসকা সামান ভি রাস্তে মে ফেক দো। (শালা কুকুরকে মারতে মারতে রাস্তায় বের করে দাও। ওর জিনিসপত্রও রাস্তায় ফেলে দাও)। মালিনী একথা শুনিয়া নাকি খিলখিল করিয়া হাসিয়াছে। জ্যাঠামশাই বিষয়ের মালিক। তাই ভয়ে ভয়ে আছি, কি জানি কি হয়। মালিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়াছে? কথাটা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আর একটা কথাও এখানে

লিখিয়া রাখি—আমি খুব ভালো ঘোড়-সওয়ার হইয়াছি। মালিনীদের ঘোড়াটার সহিত আমার খুব ভাবও হইয়াছে। যদি বেগতিক দেখি ঘোড়ায় চড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিব। প্রচার করিব সেই গোপালদেবকে, যিনি আমার মতে প্রেমময়, যিনি প্রেমের বলেই সে যুগে গণতন্ত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এইখানেই শেষ হইল। যদিও শেষে দুই একটা অবান্তর ব্যক্তিগত কথা লিখিয়া ফেলিলাম।"

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা শেষ করিয়া কার্তিক অসহায় বোধ করিতে লাগিল। যে অবলম্বনটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার মন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল, আশা-আশঙ্কার অলীক দোলায় দুলিতেছিল তাহা সহসা ফুরাইয়া গেল। মন অবলম্বনহীন হইয়া নূতন স্বপ্নের উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। চপলাদিকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে স্বপ্ন রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আর মনোরম নাই, তাহা বীভৎস বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। যে কোনও প্রতারণাকে সে চিরকাল মনে মনে ঘৃণা করিয়াছে। এণ্ড জাস্টিফাইজ দি মীন্স (End justifies the means)—এ নীতিতে সে কোনকালেই বিশ্বাস করে নাই। সহজ সরল নীতির পথে চলিয়া সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে চায় সে। মনে পড়িল কলেজ জীবনে এই জন্যই তাহার এক পরম বন্ধুর সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল। সে গোপনে ডাকাতি ও নরহত্যা করিয়া টাকা যোগাড় করিয়াছিল, সে টাকায় বোমা পিস্তল কিনিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিবে বলিয়া। স্বদেশের জন্য ইংরেজের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিতে কার্তিকের আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিরীহ স্বদেশবাসীর ধনসম্পত্তি লুঠ করিয়া—নির্দোষ লোককে হত্যা করিয়া বোমা পিস্তল সংগ্রহ ব্যাপারে তাহার মন সায় দেয় নাই। তাছাড়া ওই পদ্মকলির সঙ্গে চপলাদির সম্পর্কটাও যেন কেমন কেমন। হয়তো তাহারা পরস্পরকে ভালোবাসে, ভালোবাসা খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু সমাজে বাস করিতে গেলে ভালোবাসাকে সমাজের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে, না বাঁধিলে সে একদিন সর্বনাশ আনিবেই। নদীর ঘাট যেখানে মজবুত শানবাঁধানো নাই সেখানে নদী যে কোনও মুহূর্তে প্রলয়ংকরী হইয়া উঠিতে পারে। তা-ও না হয় সে সহ্য করিত, কিন্তু নোট জাল করিয়া পরোপকার সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না। কিছুতেই পারিবে না। কিন্তু....এখানেই তাহার চিন্তাধারা যেন একটা বিরাট গহ্বরের সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ইহার পর কি করিবে সে। থলি হাতে করিয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িবে? দ্বারে দ্বারে আপিসে আপিসে কড়া নাড়িয়া বেড়াইবে—চাকরি দাও, আমাকে বাঁচাও? হঠাৎ মনে হইল বাঙালীদের সহিত 'জু'-দের (jew) অনেক মিল আছে। কত শতাব্দী ধরিয়া তাহারা দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত দেশে কত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে। এই কিছুদিন আগে হিটলার তো তাহাদের নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। 'জু'-বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত অস্ত্রই হিটলারকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। জার্মানীর যাহা কিছু গৌরবজনক তাহার অধিকাংশই প্রতিভাবান 'জু' মনীষীদের কীর্তি—সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে সর্বত্রই তাহাদের জ্যোতির্ময় দীপ্তি। হিংসার বশে হিটলার (নিজেকে তিনি খাঁটি আর্য বলিয়া জাহির করিতেন!) তাহাদের বর্বরের মতো পিষিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। হিটলার আজ নাই—কিন্তু 'জু'-প্রতিভাবানেরা আজও অম্লান। সহসা তাহার মনে হইল—প্রতিভাবানেরা প্রতিভার জোরে চিরকাল অম্লান থাকে। কিন্তু সাধারণ

'জু'দের জীবন-সমস্যার সমাধান হইয়াছে কি? আর্নলড্ ওয়েসকারের (Arnold Wesker) লেখা তিনখানা নাটকের কথা সহসা মনে পড়িল। নিম্নমধ্যবিত্ত গরীব শ্রমিক 'জু'দের কি অপরূপ চিত্রই না আঁকিয়াছেন তিনি। চিত্র চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান নাই। আমাদের অবস্থাও তাই। উত্তর ভারতের তথাকথিত আর্যগণ চিরকাল বাংলা দেশকে দাবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, এখনও চাহিতেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালীর কৃতিত্বটা যথাসম্ভব চাপা দিয়া মিথ্যা ইতিহাস লিখাইতেছেন—ইতিহাসের সত্যকে জুয়াচুরির কুয়াশা দিয়া আবৃত করিতেছেন- -কিন্তু কুয়াশা বেশী দিন টিকিবে না। সহসা তাহার কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের কথা মনে পড়িল —মনে পড়িল তাহার সন্দেহ-সংশয়-কণ্টকিত শজারুর মতো ব্যবহার—মনে পড়িল তাঁহার স্ত্রী ভোমরাকে, তাহার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি, তাহার সলজ্জ হাসি, তাহার নিখুঁত ভদ্রতা, তাহার চমৎকার রান্না, মনে পড়িল আসন্ন যৌবনা মালতীকে, মনে পড়িল তাহার উন্মুখ যৌবনের স্বাভাবিক যৌন-প্রবণতা, মনে পড়িল তাহার ছোট বোন চাপাস্বভাব লোভী আরতীকে, মনে পড়িল পড়ায়-অন্যমনস্ক খেলুড়ে পদুকে—কয়দিনের বা আলাপ—তবু তাহারা কেমন আপন হইয়া গিয়াছিল—সে যদি চপলাদিকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, যাইতেই হইবে, তাহা হইলে আর কি উহাদের সহিত দেখা হইবে জীবনে—সে যেমন উহাদের আপন করিয়া লইয়াছিল তাহার পরবর্তী ম্যানেজার কি তাহাদের তেমনভাবে আপন করিয়া লইতে পারিবে—জীবনটা কি বিচিত্র—অদৃশ্য একটা স্রোতে নানাঘাটে ভাসিয়া বেড়ানো। হঠাৎ দেখিতে পাইল লর্ড মাটি খুঁড়িতেছে একটা ঝোপের ধারে। বোধহয় ছুঁচা বা ইঁদুরের সন্ধান পাইয়াছে। জমিটা কার, ও জমি খুঁড়িবার অধিকার তাহার আছে কি না, নিরীহ ছুঁচা বা ইঁদুরকে হত্যা করা উচিত কি না—এ সব নীতির ঝামেলায় তাহার জীবন জড়িত-বিজড়িত নয়—কে মুখ্যমন্ত্রী হইল, র‍্যাশানের বরাদ্দ কমিল না বাড়িল, পাকিস্তান বা চীনের সহিত আমাদের কূটনৈতিক সম্বন্ধ কিরূপ হইলে দুশ্চিন্তা থাকিবে না- -এসব লইয়া লর্ড মাথা ঘামায় না—চাকুরির জন্যও সে লালায়িত নয়, কোনও মনিব যদি না জোটে, পথ আছে। লর্ড সুখী, অথচ আমরা তাহাকে পশু বলি—অথচ আমরা নিজেরা কি পশুত্বের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছি? আর একটা দৃশ্যও তাহার চোখে পড়িল—একটা গাছে একটা লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়া অজস্র ফুল ফুটাইয়াছে—রৌদ্রকিরণে আত্মহারা হইয়া জীবনটাকে উপভোগ করিতেছে। আমরা নিজেদের ঢাক নিজেরা পিটাইয়া সর্বত্র জাহির করিয়া বেড়াইতেছি যে আমরাই সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব—অথচ অশান্তির দাবানলে মানব সমাজ বারবার পুড়িয়া যাইতেছে, হানাহানির রক্তস্রোতে সভ্যতা ভাসিয়া যাইতেছে—ইহাই আমাদের ইতিহাস। কার্তিক মুগ্ধনেত্রে ফুলগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

চপলা কথাটা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।

"কি বললে! দরকার হলে আমাকে তুমি মুছে ফেলতে পার? এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পার পদ্মকলি, সত্যি পার?"

"পারি। শিল্পীরা নিষ্ঠুরই হয়। সে নিজের শিল্প ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। ভগবান নিজের শিল্পকেও ভালোবাসেন না, তাই তিনি মহাশিল্পী। অহরহ কত সুন্দর সুন্দর জিনিস তিনি গড়ছেন আবার ভাঙছেন। কোন কিছুর উপরই তাঁর মায়া নেই!"

চপলার মুখে হাসি ফুটিল, গালে টোল পড়িল।

"কিন্তু আমি তো তোমার আঁকা ছবি নেই। আমিও ভগবানের সৃষ্টি—"

"ওইখানেই ভুল করছ তুমি। ভগবান চপলা নামে যে মেয়েটিকে সৃষ্টি করেছিলেন সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো, কিন্তু শিল্পী পদ্মকলি যাকে সৃষ্টি করেছে সে আলো, সে অনন্য। তাকে আমিই সৃষ্টি করেছি। এ ছবি পৃথিবীর কোন আর্ট-গ্যালারিতে নেই, আছে আমার মনে। আমি সেই ছবিটার কথাই বলছিলাম। রক্তমাংসের তৈরি তোমার ওই দেহটার কথা আমি বলিনি। তোমার ওই রক্তমাংসের তৈরি দেহটাকে অবলম্বন করে যে আলো আমি জ্বেলেছি সেইটেই আমার ছবি। সেটা যতক্ষণ আমার ভালো লাগবে ততক্ষণ আমি সেটাকে জ্বালিয়ে রাখব, ভালো না লাগলেই নিবিয়ে দেব এক ফুঁয়ে। তুমি বারবার আমাকে বলছ, তোমার দুঃখ তুমি আমাকে নষ্ট করছ। কিন্তু আমাকে নষ্ট করবার ক্ষমতা তোমার নেই আলো। আমি শিল্পী। আমি যা করছি, নিজের খুশীতে নিজের খেয়ালে করছি। আমার জাল-করা নোট দিয়ে তুমি অনেক লোকের উপকার করছ, এটা আমার কাছে বড় কথা নয়, আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা, ওই নোটগুলো পেয়ে তুমি উৎফুল্ল, তুমি আনন্দিত হয়ে ওঠ— সেই তুমি যাকে আমি সৃষ্টি করেছি, সে চপলা নয়, সে আলো। সেবার তুমি বলেছিলে, তোমার মেলার তাঁবুতে তাঁবুতে যে সব খদ্দেররা জাল নোটের বদলে আসল নোট দিয়ে যায় তারা তোমার পুরো দাম দেয় না। হাজার টাকার নোট কোথাও পাঁচশ টাকাতেও বিক্রি করতে হয়েছে তোমাকে। প্রতিবার তোমাকে এক লাখ টাকা দিয়ে যাই—এবার দু'লাখ টাকা এনেছি—এতে আশা করি তোমার কুলিয়ে যাবে। দাঁড়াও তোমাকে দিয়ে দি—"

পদ্মকলি ঝুঁকিয়া খাটের নীচে হইতে একটা ছোট স্যুটকেস বাহির করিল। স্যুটকেসের ভিতর হইতে বাহির করিল ছেঁড়া-গেঞ্জিতে জড়ানো নোটের তাড়াটা।

"এতে দু'শোটা নোট আছে। প্রত্যেকটি হাজার টাকার। যদি প্রত্যেক নোটটা পাঁচশ টাকাতেও বিক্রি কর তাহলেও তোমার 'নেট' এক লাখ টাকা থাকবে। এই নাও—"

অবহেলাভরে সে পুলিন্দাটা বিছানার উপর ছুঁড়িয়া দিল।

"খুশী তো? কই এবার তোমার চোখে সেই দীপ্তি তো ঝলমল করে উঠল না যা দেখবার জন্যে আমি জাল-জুয়োচুরির আশ্রয় নিয়েছি—"

সত্যিই চপলার মুখটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার চোখের কোণে এক ঝলক রোষ-বহ্নি চকমক করিয়া উঠিল।

"তোমার আলোর জন্য তুমি যা এনেছ তাতে আমার আনন্দিত হবার কি আছে। তোমার আলো তো তোমার মনের ভিতর আছে, তাকেই একথা জিগ্যেস কর। আমার এই রক্তমাংসের দেহটা তো তোমার কাছে কিছুই নয়।"

পদ্মকলি হাসিমুখে উত্তর দিল—"সত্যিই কিছু নয়। ওটা বরং বাধা। মল মূত্র ব্রণক্ষত কৃমিকীটদের লীলাভূমি ওই দেহটা খুব একটা লোভনীয় জিনিস নয়। তোমাদের দেহের মধ্যে যা লোভনীয় তার সম্বন্ধেও শঙ্করাচার্য সাবধান করে দিয়ে গেছেন—নারীস্তন ভরণাভিনিবেশং, মিথ্যে-মায়ামোহাবেশং। এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্!"

"শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী ছিলেন—তুমিও কি সন্ন্যাসী?"

"বড় শিল্পী, বড় বিজ্ঞানী, বড় সন্ন্যাসী এক জাতের লোক। তাঁরা নানা পথ দিয়ে সত্য সন্ধান করেন। আমার পথ সৌন্দর্যের পথ, শিল্পের পথ—আমি হয়তো খুব বড় শিল্পী নই, কিন্তু পথ নিয়েই আমি মেতে থাকতে চাই না, পথ অতিক্রম করে আমি সেই মন্দিরে পৌঁছতে চাই যেখানে আলো জ্বলছে। তোমার দেহ নিয়ে একবার যদি উন্মত্ত হয়ে পড়ি তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।...."

"কিন্তু পদ্মকলি তুমি আমাকে এত দিচ্ছি, আমি তোমাকে কি দেব বল, দেহ ছাড়া তো আমার কিছু নেই—"

"তোমার দেহকেই তো গ্রহণ করেছি আমি, কিন্তু স্থূলভাবে নয়, তোমারই সূক্ষ্ম সুষমা দিয়ে তো আমি জ্বেলেছি আলো—"

"আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বল আমায় পদ্মকলি। আমি নানা জায়গায় বাইজী সেজে গান গাইতে যাই, তোমার কোনও সন্দেহ হয় না তো, একদিন তুমি বলেছিলে যে, আমি যদি রূপজীবাও হতাম তাহলেও তুমি আসতে আমার কাছে। কিন্তু বিশ্বাস কর পদ্মকলি আমি অপাপবিদ্ধা, আমি কুমারী এখনও—আমি—"

সহসা চপলা মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং পদ্মকলির দুই পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বিশ্বাস কর আমি সতী, বিশ্বাস কর আমি দেহ-বিক্রি করি না। আমাকে নাও তুমি, যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি—"

পদ্মকলি আস্তে আস্তে তাহাকে ধরিয়া তুলিল।

"আলো, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি! ছিঃ, অমন কোরো না।"

চপলার চোখে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"তুমি নিশ্চয় আর কাউকে ভালোবাস। দেখি তোমার ওই স্যুটকেসে কি আছে।"

পাগলিনীর মতো সে পদ্মকলির স্যুটকেসটা হাঁটকাইতে লাগিল। স্যুটকেসে আরও কয়েক হাজার টাকা ছিল আর ছিল একটা 'পাসপোর্ট'!

"এটা কি—"

"আমি কাল প্যারিস যাচ্ছি। সেখানকার বিশ্ববিখ্যাত আর্ট-গ্যালারিটা দেখে তারপর যাব রোমে—"

"তুমি চলে যাবে! আমি যে ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে আর একটা সেণ্টার খুলব—"

"দেখ আলো, ওসবে আমার তেমন উৎসাহ নেই। আমি জানি কোনও কিছু করেই শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না। মানুষ চিরকালই এমনি আছে, চিরকালই এমনি থাকবে। আগে কলেরায় মরত, এখন গুলিতে, কিম্বা অ্যাটম-বমে মরবে। আগে চণ্ডীমণ্ডপে গুলতানি করত, এখন কাগজে, লোকসভায় গুলতানি করে। মন্বন্তর আগেও হয়েছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর, এখন কনট্রোলের মন্বন্তর চলছে। আবার নতুন রকম কিছু হবে ভবিষ্যতে। মানুষ বদলাবে না, ওকে বদলানো যাবে না। মানুষের একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র শিল্পে, যেখানে সে সৃষ্টিকর্তা, যেখানে সে স্বাধীন, যেখানে সে—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া চপলা বলিল—"মানুষের দুঃখের দিনে তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? তুমি কি মানুষের সমাজে বাস কর না?"

"মানুষের সমাজে বাস করি বাধ্য হয়ে। মানুষের সমাজে জন্মগ্রহণ করবার আগে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি তুমি এই সমাজে জন্মাতে চাও কি না। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন আমাকে এই হুল্লোড়ের গোলক-ধাঁধায় ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই গোলকধাঁধায় ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি করে চলেছি জন্মে থেকে। তবে যিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে থাকুন, একটা বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি—তিনি আমাকে বেনে করেন নি, দেশহিতৈষী করেন নি, গুণ্ডা করেন নি, সৈনিক করেন নি, শিল্পী করে পাঠিয়েছেন—শিল্পের ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন। কোনও বিশেষ একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখতেন যদি আমাকে, আর সেই বাঁধা খুঁটিতেই যদি ঘুরতে হত আমাকে সারাজীবন, তাহলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যেতাম। আর একটা বিষয়েরও জন্য কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। আমাকে তিনি ধনীর সন্তান করে পাঠিয়েছেন, কারও কাছে হাত পাততে হয় না আমাকে। স্যুটকেসে যে বাকি টাকাগুলো আছে ওগুলো জাল নয়—"

এমন সময় বাহিরে একটা রিকশার টুনটুন শুনিয়া পদ্মকলি বাহিরের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল এবং হাত তুলিয়া থামাইল রিকশাটাকে।

"আমি এই রিকশাতেই চলে যাই আলো। কাল আমার প্লেন ছাড়বে। মাস দুই পরে ফিরব।"

স্যুটকেসটা বন্ধ করিয়া নির্বিকারভাবে সে রিকশায় গিয়া উঠিয়া বসিল।

"তোমার টাকাও নিয়ে যাও। চাই না এ টাকা—"

নোটের পুলিন্দা বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়া চপলা কপাট বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল খানিকক্ষণ। ক্রন্দনাবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

"মা—মা।"

কৃষ্ণধনবাবুর কণ্ঠস্বর।

চপলা উঠিয়া বসিয়া সম্বৃত করিয়া লইল নিজেকে। তাহার পর কপাট খুলিল। খুলিয়া প্রথমেই দেখিতে পাইল ছেঁড়া-গেঞ্জিতে-মোড়া নোটের পুলিন্দাটা গেটের একধারে একটা ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছে। পদ্মকলি সেটি লইয়া যায় নাই।

কৃষ্ণধনবাবু আকুল কণ্ঠে বলিলেন —"মা সর্বনাশ হয়ে গেছে। মালতী সকালে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। গিয়ে দেখলাম কলসীটা পুকুরপাড়ে পড়ে আছে, মালতী নেই। শুনলাম রাউতপুরের কয়েকটা গুণ্ডা নাকি ধরে নিয়ে গেছে তাকে—। বিজনবাবুর ভাইপো দুটো গুণ্ডা মুসলমান ছেলের সঙ্গে তাকে রাউতপুরের দিকে যেতে দেখেছে। কার্তিকবাবুও নেই দেখছি। আমি এখন কি করব ভেবে পাচ্ছি না—"

স্তম্ভিত হইয়া গেল চপলা।

মনে পড়িল, সুরং এবং পদ্মকলি তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একটা দৈবী শক্তি যেন তাহার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া গেল। মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' করিতাটি — 'আমাকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার'। মনে পড়িল 'মুক্তি' কবিতাটির সেই লাইন দুইটি, 'আমি নারী আমি মহীয়সী আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী'।

কৃষ্ণধনবাবুকে বলিল, "আপনি থানায় এক্ষুনি খবর দিয়ে দিন। ভয় নেই, আমি আছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কৃষ্ণধনবাবু চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পরই নোটের পুলিন্দাটা সে ঝোপের ভিতর হইতে কুড়াইয়া আনিল। সেটাকে নিজের ব্যাগে রাখিল না। আলমারিতে বড় ফাঁক-মুখ একটা থার্মোফ্লাস্ক ছিল। সেইটার ভিতর পুলিন্দাটা পুরিয়া রাখিল। আলমারিতে নানারকম কাচের বাসনের মধ্যেই রাখিয়া দিল 'ফ্লাস্কটা'।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল গেটের সামনে। ট্যাক্সি হইতে নামিলেন চপলার সেই মোটা-সোটা স্বর্ণ-দন্ত প্রণয়ীটি। ইনিও দুঃসংবাদ আনিয়াছিলেন।

"সর্বনাশ হয়ে গেছে। পুলিশ জাল নোটের খবর পেয়েছে। ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে না কি আমাদের দুজনের নামে। তাই আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম। চলুন পালাই!"

"কি করে প্রকাশ পেল জাল নোটের কথা—"

"যে বোবা চাকরটাকে আপনি বহাল করেছিলেন, সে বোবা সেজে থাকত। সে পুলিশের চর। পুলিশ অনেকদিন আগে থাকতেই আপনাকে সন্দেহ করত তাই ওই লোকটাকে লাগিয়ে রেখেছিল আপনার পিছুতে—। চলুন পালাই, আর দেরি করা ঠিক হবে না—"

"আপনি যান, আমি যাব না—"

"যাবেন না?"

"এদের ফেলে আমি যেতে পারব না। যদি মরতে হয় ওদের মধ্যেই মরব। আপনি যান—"

স্বর্ণ-দন্ত কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"ব্যাপারটা ভেবে দেখুন ভালো করে।"

"ভেবে দেখেছি। আপনি যান—"

স্বর্ণদন্তকে লইয়া ট্যাক্সি চলিয়া যাইতেই চপলা ত্বরিতপদে বারান্দার ওপারে চলিয়া গেল। দেখিল কোথাও কেহ নাই। বারান্দার কোণে শাবলটা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি শাবলটা লইয়া বাড়ির পিছন দিকে চলিয়া গেল সে। সেখানটা ঘেঁটুর জঙ্গল, তাহারই মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়িতে লাগিল সে। বেশ গভীর গর্ত খুঁড়িল একটা। তাহার পর সেই ফ্লাস্কটা আনিয়া পুঁতিয়া ফেলিল। মাটি ঢাকা দিয়া কিছু আবর্জনাও ছড়াইয়া দিল সেখানে। কয়েকটা ঘেঁটু ফুলের চারাও পুঁতিয়া দিল তাহার উপর। তাহার পর বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল। কাপড়চোপড়ে মাটি লাগিয়া নোংরা হইয়া গিয়াছিল। বাথরুম হইতে একটি টকটকে লাল শাড়ি পরিয়া বাহির হইল সে। মনে হইতে লাগিল সে যেন মানবী নয়— মূর্তিমান অগ্নিশিখা। তাহার পর আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুলটা ঠিক করিয়া আলমারি হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া কোমরে গুঁজিয়া লইল। একটা ছোট রিভলবারও বাহির করিল, তাহাতে গুলি পুরিল এবং সেটিও কোমরে গুঁজিয়া লইল। তাহার পর মাথার বেণীতে বাঁধিল সাঁচ্চা জরির প্রকাণ্ড ফুল একটা। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিল। চোখের দৃষ্টিতে যাহা ঝলমল করিতে লাগিল তাহা অনির্বচনীয়। বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রিকশার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল তাহার পর। রিকশা পাইতে বেশী দেরি হইল না। তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠিয়া বলিল—'চল রাউতপুর'। রিকশা চলিতে আরম্ভ করিলে নিজের ব্যাগটা খুলিয়া গণিতে লাগিল কত টাকা আছে। দেখিল দশখানা হাজার টাকার নোট ছাড়া আরও কয়েক শত টাকা আছে। খুচরাও আছে কিছু।

"জোরে চল।"
"দুটাকা ভাড়া নেব মাইজি।"
"তোকে পাঁচ টাকা দেব। জোরে চল—"

কার্তিক পুকুরের ধারে ফুলের দিকেই তন্ময় হইয়া চাহিয়াছিল। হঠাৎ লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। পর মুহূর্তেই রাস্তার দিকে ছুটিয়া গেল সে।

"আরে হুই—হুই—হুই—তুই এখানে কি করছিস রে—"

আন্‌টার গলা না? কার্তিক উঠিয়া পড়িল। হ্যাঁ, আন্‌টার তো। একটা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে।

"এ কি তুমি এখানে! মাছ ধরছ না কি—"

"না। অমনি এসেছি। ঘোড়া পেলে কোথা।"

"আমি যে সার্কাসটায় চাকরি করতাম— সেটা আসানসোলে এসেছে। আমি সেখানে গিয়েছিলাম কাল মোহিনীকে দেখত। আমার মাইনেও বাকি ছিল তিন মাসের। মোহিনীকে দেখতে পেলাম না, শুনলাম সে হারামজাদী পালিয়েছে রিং মাস্টারের সঙ্গে। ম্যানেজার বললে, সার্কাস ভালো চলছে না, মাইনে দিতে পারবে না। অনেক খেলোয়াড় ভেগেছে। সার্কাসের জিনিস-পত্র জানোয়ার-টানোয়ার বিক্রি করে সে সার্কাস উঠিয়ে দিচ্ছে। আমি এই ঘোড়াটায় চড়লুম। বললাম আমাকে বাকি মাইনের বদলে তাহলে এই ঘোড়াটাই দাও। প্রথমে দিতে চায় না, শেষে আরও একশ টাকা দিয়ে নিলাম ঘোড়াটা। ভালো করি নি?"

"ঘোড়া নিয়ে কি হবে!"

"চড়ব আমরা! তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান না?"

"তা জানি। কিন্তু—"

"তোমাকে দশটা গাঁয়ে ঘুরতে হয়, সাইকেল চড়ে ঘোরা সহজ না কি। তার চেয়ে খটবটিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবে, ম্যানেজার সাহেবকে মানাবে। আর এ কি যে সে ঘোড়া। হেট্— হেট্— হেট্।"

হঠাৎ ঘোড়াটা পিছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং পিছনের দুই পায়ের উপরই ভর করিয়া আগাইয়া গেল কার্তিকের দিকে। লর্ড ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ঘোড়াটাকে।

"সাবাস বাচ্চা সাবাস!—"

আন্‌টা ঘোড়ার পিঠে চাপড় মারিয়া আদর করিল।

"একশ টাকা তুমি পেলে কোথায়?"

"দোকান থেকে শ' দুই টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মোহিনী যদি আসতে চায় আমার সঙ্গে তাকে কিছু গয়না কাপড় কিনে দেব। কিন্তু সে তো সটকান দিয়েছে। একশ টাকা দিয়ে ঘোড়াটাই কিনে ফেললাম। ভালো করিনি?"

"আমাকে না জিজ্ঞেস করে দোকান থেকে টাকা নিয়ে তুমি অন্যায় করেছ আন্‌টা—"

"তুমি এবার মঞ্জুর করে দাও। সার্কাসটা কাছে এসেছ শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না। বাঁই করে চলে গেলাম। তোমার কাছে আসবার সময় পেলাম কই—"

"অন্যায় করেছ—"

"আমার মাইনে বাকি নেই? হিঁ হিঁ সেটি মনে রেখো। এমনি লাচুনি ঘোড়া তুমি একশ টাকায় কোথা পাবে—"

কার্তিক গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার কিছুই যেন ভালো লাগিতেছিল না।

"ওই, সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলে যে! আমার পিছন দিকে চেপে পড়—"

"রেকাব নেই চড়ব কি করে—"

"এ পিঠ পেতে তোমাকে তুলে নেবে—। বৈঠ্—বৈঠ্—"

ঘোড়াটা পিছনের পা দুইটি মুড়িয়া পিঠ নীচু করিয়া দিল।

"এইবার চেপে পড়, চেপে পড়—চেপে আমাকে জাপটে ধরে থাক।"

কার্তিক অবশেষে না চড়িয়া পারিল না। ঘোড়া কদম চালে চলিতে শুরু করিল। আর তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল লর্ড। দেখা গেল, তাহার একটা কান উলটাইয়া গিয়াছে। তীরবেগে ছুটিতেছে সে।

আন্টা বলিল—"খেজুরিতে রমেশ সিঙ্গীর বাড়িতে একটা পুরানো ঘোড়ার সাজ আছে। জিন লাগাম—সব। সেটা কিনতে হবে বুঝলে—আরে তুমি রা কাড়ছ না কেন।"

কার্তিক তবু কিছু বলিল না।

রাউতপুরের মাঠে গ্রামবাসী সমবেত হইয়াছিল। সে মাঠের ধারে প্রকাণ্ড একটা আম গাছ ছিল। আম গাছের দুইটি শাখা খুব নীচু হইয়া প্রায় সমান্তরাল রেখায় কিছুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। তাহারই একটি শাখার উপর বসিয়াছিল চপলা। শ্যামপত্রপল্লবের পটভূমিকায় রক্তাম্বরধারিণী চপলাকে দেবীমূর্তি বলিয়া মনে হইতেছিল। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে এই ধরনের একটি মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন—"মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লবরাশিমণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি।" সে মূর্তি। সীতারামপত্নী শ্রীর। সে মূর্তিও অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সকলে দেখিয়াছিল "অতুলনীয় এক রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া শ্যামল পত্ররাশির মধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার টাটের মতো, চারিদিকে বৃক্ষশাখা বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে, চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে—"।

সেদিন সেই জনতাকে সম্বোধন করিয়া শ্রী যাহা বলিয়াছিল চপলা কিন্তু তাহা বলিল না। তাহার ভাষা অন্যরূপ। আবেদনও ভিন্ন।

চপলা বলিল—"আমি তোমাদের মা। এই দুর্দিনে তোমরা সসম্মানে যাতে খেতে পাও তার ব্যবস্থা আমি করেছি। সে ব্যবস্থা করবার জন্যে আমাকে সর্বস্ব পণ করতে হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম তোমরা সুখে শান্তিতে ভদ্র জীবন যাপন করবে। কিন্তু আজ শুনলাম আমার প্রতিবেশী কৃষ্ণধনবাবুর মেয়ে মালতীকে নিয়ে দুটি গুণ্ডা না কি রাউতপুরে এসেছে। সে গুণ্ডা বাঙালী কি বিহারী হিন্দু কি মুসলমান তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। তারা গুণ্ডা তারা অভদ্র এই তাদের একমাত্র পরিচয়। তোমাদের সকলকে তাই আমি অনুরোধ করছি সেই গুণ্ডাদের ধরে তোমরাই শাস্তি দাও আর মালতীকে ফিরিয়ে দাও তার বাবা মায়ের কাছে।...."

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল—"মেয়েটি নিজে চলে এসেছে। কেউ তাকে জোর করে আনে নি। সে বিয়ে করতে চ ইছে ওই ছেলেটিকে। এতে জোর জবরদস্তি কিছু নেই—"

চপলা সে দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল—"নাবালিকা মেয়ে নিজের মতে চলতে পারে না। তার বাবা মায়ের মতেই তাকে চলতে হবে—"

"ওইখানেই আমাদের আপত্তি। ছেলেমেয়েদের উপরও তার বাবা মার অন্যায় অত্যাচার আমরা বরদাস্ত করব না। তাছাড়া বয়স হিসাবেই হয়তো নাবালিকা, কিন্তু তার দেহ ও মন সাবালিকার। তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার কোনও অধিকার নেই তার বাবার—"

"ভীড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কে কথা বলছেন, সামনে এসে দাঁড়ান।"

কেহ সামনে আসিয়া দাঁড়াইল না। জনতার ভিতর উত্তেজনা দেখা দিল।

"মালতী সত্যিই যদি নিজের ইচ্ছায় চলে এসে থাকে, নিজের মতে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে কথাও সে সকলের সামনে এসে বলুক—"

"যদি দরকার হয় সে কথা সে আদালতে বলবে। এখানে বলবে কেন!"

চপলা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার পর শান্ত কণ্ঠে বলিল—"আমি আমার সর্বস্ব পণ করে এই দুর্দিনে তোমাদের খাওয়াবার ভার নিয়েছি। আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু তোমরা মানবে না?"

জনতার ভিতর হইতে কোনও উত্তর আসিল না। উত্তেজিত কলরব উঠিল চতুর্দিকে। জনতার ভিতর হইতে একজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মা আপনি শুধু একবার হুকুম দিন। আমরা মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে আসি ওদের হাত থেকে—।"

নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল চপলা।

"জয় মা অন্নপূর্ণার জয়, জয় মা অন্নপূর্ণার, জয় মা অন্নপূর্ণার জয়—"

তাহার পর হঠাৎ শোনা গেল—"আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে—"

চপলা দেখিল কুণ্ডলীকৃত ধূম ও লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিতেছে।

"অন্নপূর্ণ, না রাক্ষসী? দেবী না দানবী? আমাদের ঘরে ঘরে আগুন লাগাবার বন্দোবস্ত করে ভালো মানুষের মতো এখানে বক্তৃতা দিচ্ছেন—হারামজাদী, শয়তানী—"

একদল গুণ্ডা তাহার দিকে ছুটিয়া গেল।

চপলার কাছে রিভলভার ছিল, কিন্তু সে গুলি ছুড়িল না, ছোরা ছিল কিন্তু ছোরা বাহির করিল না। প্রস্তরমূর্তিবৎ সে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেবল। একটা প্রকাণ্ড থান ইঁট আসিয়া তাহার কপালে লাগিল। মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল সে। আর উঠিল না।

।। ৫ ।।

ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে, অনেক নারী ধর্ষিতা হইয়াছে। চপলার কো-অপারেটিভ দোকানগুলি লুঠ করিয়াছে গুণ্ডারা। পুলিশের গুলি চলিয়াছে, কারফিউ জারি

হইয়াছে। তবু কিন্তু শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। শক্তিমানেরা সুবিধা পাইলেই দুর্বলদের পীড়ন করিতেছে। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট একটি শান্তি-সমিতি গঠন করিয়াছেন। সে সমিতির কাজ গ্রামের লোকদের একত্রিত করিয়া শান্তির বাণী শোনানো এবং হিতোপদেশ বিতরণ করা। কার্তিক এইরূপ একটি সমিতির নেতা। তাহার কাজ বন্দুকধারী পুলিশ পরিবৃত হইয়া সভায় সভায় বক্তৃতা করা। চপলা বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো সে চপলাকে ছাড়িয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু চপলা মরিয়া যাওয়াতে তাহা আর হইল না। চপলার অনুপস্থিতিই যেন তাহার পায়ে একটা অদৃশ্য শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। বার বার মনে পড়িতে লাগিল—"অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালদেব যা করেছিলেন এ যুগে তোমাকেও তাই করতে হবে। কারণ এ যুগটাও মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এ যুগের গণতন্ত্রও মাৎস্যন্যায়ের গণতন্ত্র। তোমাকে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করতে হবে সুরং। আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

চপলা ঠিক এই কথাগুলিই হয়তো বলে নাই, কিন্তু যাহা বলিয়াছিল তাহার ভাবার্থ উহাই। কার্তিক ঠিক করিয়াছে চপলার এই আদর্শকে সে মূর্ত করিবে। এ স্থান ত্যাগ না করিবার আর একটা কারণ নিমু। নিমু বলিয়াছে সে আর কোথাও যাইবে না। এইখানেই থাকিবে। চপলাদির আদর্শ অনুসরণ করিয়া সে নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের সেবা করিবে। কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারের সহিত সে মিশিয়া গিয়াছে। ভোমরা এখন তাহার সখী। ভোমরার ছেলেমেয়েরা তাহারই ছেলেমেয়ে। মালতী মাথায় সিঁদুর পরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বিবাহ করিয়াছে একটি অবাঙালী নীচজাতীয় যুবককে। কৃষ্ণধনবাবু এ বিবাহ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। নবজামাতাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভুরিভোজন করাইয়াছে নিমু। মালতীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। একটি দুঃখজনক ঘটনায় কার্তিকের অর্থসমস্যারও সমাধান হইয়া গিয়াছে। করোনারি হইয়া কালীকিঙ্কর মারা গিয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। নিমুই এখন সমস্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

সেদিন একটি জনসমাবেশে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া কার্তিক উপস্থিত হইল। আন্টার ঘোড়াটা সে-ই আজকাল ব্যবহার করে। আন্টা ঘোড়াটারই সেবা করে আজকাল কেবল। আর কিছু করে না। নিমুর স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে। তাহার ফাই-ফরমাস খাটে এবং মাঝে মাঝে সার্কাসের নানা রকম বাজি দেখায় তাহাকে।

সেদিন জনতাকে সম্বোধন করিয়া কার্তিক বলিতে লাগিল—এখনও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যাচ্ছে সবলরা দুর্বলকে পীড়ন করছেন। আপনাদের সেবক আমি। আপনাদের কাছে করজোড়ে নিবেদন করছি, জোর যার মুলুক তার—এ নীতি ভুল নীতি। সংস্কৃতে এর নাম মাৎস্যন্যায়। দেশে অষ্টম শতাব্দীতে এই মাৎস্যন্যায় আমাদের দেশকে যখন ছারখার করছিল তখন দেশের লোকেরা গোপালদেব নামক একজন লোককে নির্বাচিত করে এ দেশে গণতন্ত্র স্থাপন করেন। দেশে আবার সুখ শান্তি ফিরে আসে। কেন এই গোপালদেবকে নির্বাচন করেছিলেন দেশের লোকেরা? ইতিহাসে এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই। ইতিহাসে এর সদুত্তর না থাকলেও আমাদের মনের ভিতর এর সদুত্তর আছে। গোপালদেব সকলকেই সমান মনুষ্যত্ব মর্যাদার আশ্বাস দিয়েছিলেন, যে আশ্বাস আমরা এই সেদিনও শুনেছি কবি সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে, তাঁর 'আখেরী' কবিতায়—

কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বলব জোরে
মিথ্যা দলিল তাদের যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ করে'।
দলিল তাদের বাতিল যারা মানুষকে চায় করতে খাটো।
হামবড়াইয়ের সংহিতা কোড, বেবাক কাটো বেবাক কাটো।
সবাই সমান এই জগতে —কেউ ছোট নয় কারোই চেয়ে
কার কাছে তুই নোয়াস মাথা ত্রস্ত চোখে কম্পদেহে?
সবাই সামনে আঁতুর ঘরে, বলের দেমাক মিছাই করা
সবাই সমান শ্মশান-ধূলে, বড়াই-ধুয়া মিছাই ধরা।
মিথ্যা গরব গোত্র-কুলের মিথ্যা গরব রঙ বা ঢঙের
ভেদের তিলক-তক্‌মাতে লোকসংখ্যা বাড়ায় কেবল সঙের।
মরদ বলেই গরব যাদের, চায় নারীদের দলতে পায়ে
তৈমুরও যার স্তন্যে মানুষ, মরদ সে কি? আয় সুধায়ে।
চেঙ্গিসও যার পীযূষ-কাঙাল পুরুষ সেকি? জিজ্ঞাসা কর
মাংসপেশীর পেষণ বলে হয় না মহৎ হয় না ডাগর।

প্রতিটি মানুষ যেদিন প্রতিটি মানুষকে এই মর্যাদা দিতে পারবে, শুধু বাহ্যিক লোক দেখানো আর্থিক সাম্য নয়, যেদিন শ্রদ্ধা-পূত আন্তরিক সাম্য জাগবে সকলের মনে, সেই দিনই আবার সুখ শান্তি ফিরে আসবে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য আমাদের হীন করে, দুর্বল করে এবং তারই পঙ্কে আমরা শেষে তলিয়ে যাই নিজেরাও। অষ্টম শতাব্দীর গোপালদেব যা করতে পেরেছিলেন আমরাই বা তা পারব না কেন? যে গণতন্ত্রে টাকা দিয়ে বলপ্রয়োগ করে লোভ দেখিয়ে ভোট যোগাড় করতে হয় সে গণতন্ত্র গণতন্ত্র নয়—গণতন্ত্রের নামে তাও ধনতন্ত্র তা-ও জবরদস্তিতন্ত্র। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা পশুত্বের পথ ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে উন্মুখ হোন, স্থাপন করুন সেই গণতন্ত্র যা স্বাধীন বিচার-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা লোভ বা মোহ দ্বারা প্রভাবিত নয়—"

আর একজন অশ্বারোহী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি কার্তিকের পাশে আসিয়া অশ্বের বল্‌গা সংযত করিলেন। বলিলেন, "আপনার বক্তৃতা শুনলাম। যদি অনুমতি করেন এ বিষয়ে আমার মতামতও ব্যক্ত করি।"

"কে আপনি।"

"আমার নাম ফকির চাঁদ সামন্ত।"

নামটা শুনিয়া কার্তিকের ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। নামটা যেন শোনা-শোনা।

"আপনিই কি গোপালদেব সম্বন্ধে একটা বই লিখেছিলেন? ডাস্টবিন থেকে আপনার বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমি সংগ্রহ করেছিলাম—"

"ও। মালিনীর জ্যাঠা আমাকে দূর করে দিয়েছিলেন। আমার সমস্ত জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে, দিয়েছিলেন তিনি। আমি পালিয়ে এসেছি। আমি কিছু বলতে চাই—"

"বেশ তো, বলুন—"

"আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই বলছি। সবাই জানেন, গোপালদেব অষ্টম শতাব্দীতে অসাধ্যসাধন

করেছিলেন। আমার মনে হয় তা তিনি করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি প্রেমিক ছিলেন। তিনি শুধু যে বৌদ্ধ ছিলেন তা নয়, আমার মতে তিনি সহজিয়াপন্থী সাধকও ছিলেন। দেদ্দা ছিলেন তাঁর সাধনসহচরী। তাঁদের অনাবিল প্রেমই জনপ্রিয় করেছিল তাঁদের। প্রেমের জোরেই তাঁরা জাতিভেদের বৈষম্য দূর করে স্থাপন করেছিলেন আদর্শ গণতন্ত্র—"

ফকির চাঁদের পিছনে আর একটি ছায়া অশ্বারোহী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শাণিত তরবারি, চোখের দৃষ্টিতে প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখা।

তিনি বলিলেন—"আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে শক্তির জোরে। সত্য শিব সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করবার আগে, বিনাশ করতে হবে অসত্য অশিব ও অসুন্দরকে! তা প্রেম অহিংসার বা সাম্যের বুলি আউড়ে হবে না— তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করতে হবে!"

তাঁহার কথা কিন্তু কেহ শুনিতে পাইল না। তাঁহার আবির্ভাবও কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। সেই মহাপ্রেত মহাশূন্যে অসি আস্ফালন করিতে করিতে ক্রমশ বিলীন হইয়া গেলেন।

নির্মোক
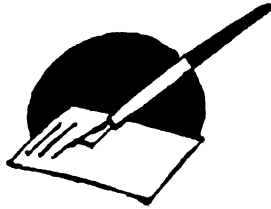
প্রথম পরিচ্ছেদ

[এক]

যেদিন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলাম সেদিনকার কথাটা এখনও আমার আবছা-ভাবে মনে আছে। মনে হইয়াছিল কি অদ্ভুত কৃতিত্বই না অর্জন করিলাম, একটা দুর্জয় দুর্গ যেন জয় করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের কালে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়াটা খুব সহজসাধ্য ছিল না, দুর্ভেদ্য দুর্গজয়ের মতই কঠিন ব্যাপার ছিল। যদিও মনে মনে জানিতাম যে এই দুর্গজয় ব্যাপারে আমার বীরত্ব অপেক্ষা আমার পিতৃবন্ধু কর্ণেল-এর পৃষ্ঠপোষকতাটাই সমধিক কার্যকরী হইয়াছিল, তথাপি কিন্তু আনন্দটা কিছু কম হয় নাই। আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র—এ যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার! জাঁদরেল কর্ণেলের জোরালো সুপারিশ সত্ত্বেও কিন্তু খানিকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। কর্ণেল সাহেব বলিয়াছেন যে পত্রটি লইয়া আমি যেন স্বয়ং বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। বড়সাহেবই ভর্তি করিবার মালিক। পিতামাতার পদধূলি এবং দেবতার নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া কম্পিত বক্ষে বড়সাহেবের আপিসের দ্বারস্থ হইলাম। দ্বারে কিন্তু দারোয়ান ছিল। পেটি পাগড়ি লাগানো বেশ কায়দা-দুরস্ত দারোয়ান, অগ্রাহ্য করা চলে না। তাহাকে বলিলাম যে আমি বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। সে বারকয়েক আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বলিল যে, সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন অপেক্ষা করিতে হইবে। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সময় কিন্তু কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, দেখিতে দেখিতে একটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পা ব্যথা করিতে লাগিল এবং অবশেষে নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ বেঞ্চিটাতে সসঙ্কোচে উপবেশন করিলাম। শহুরে ছেলে হইলে আমার হয়ত এ সঙ্কোচটুকু হইত না, কিন্তু আমি পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছিলাম, কোথায় কি প্রকার আচরণ শোভনীয় হইবে ঠিক জানা ছিল না। কাঠের বেঞ্চিটাতে বসিলে হয়ত বে-আইনী কিছু হইবে, এই ভয় ছিল। দারোয়ান কিন্তু কিছু বলিল না, বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইত বলা যায় না, এমন সময় হঠাৎ অনাদিবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অনাদিবাবু আমাদের পূর্বপরিচিত লোক, এক কালে আমাদের পরিবারের সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—আরে, তুমি হঠাৎ এখানে যে?

উঠিয়া গিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনিও বারকয়েক আপদামস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করিলেন ও বলিলেন।—এস আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ি কাছেই।

—আমাকে যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—সেই জন্যেই তো বলছি এস আমার সঙ্গে, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ভাবিলাম হয়তো অনাদিবাবুর সঙ্গে আপিসের কাহারও আলাপ আছে এবং তিনিও হয়ত একটি সুপারিশ-পত্র দিবেন। তাঁহার অনুগমন করিলাম। কিছু দূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—উঠেছ কোথায়?

—একটা হোটেলে।

হোটেলের নাম ঠিকানা বলিলাম।

—আমাদের বাড়ি উঠলেই পারতে!

—আপনি যে এখানে আছেন তা জানতাম না।

আমার দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া অনাদিবাবু বলিলেন—তুমি এই বেশে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলে, মাথা খারাপ না কি তোমার! এই আধময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর তালিলাগানো জুতো—মাই গড!

অত্যন্ত দমিয়া গেলাম!

অনাদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—ভাগ্যিস আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল, তা না হলে হয়েছিল আর কি— ! এস এই গলিটার ভেতর—

গলির ভিতর ঢুকিয়া অনাদিবাবুর বাসায় উপনীত হইলাম।

অনাদিবাবু প্রথমেই বাড়িতে ঢুকিয়ে চাকরকে একটা নাপিত ডাকিতে বলিলেন এবং আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহার বৈঠকখানা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোকের রুচি যে বেশ সুমার্জিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঘরখানি ছোট কিন্তু চমৎকার সাজান। প্রতিটি জিনিসে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। টেবিলের উপরে কাগজচাপা দিবার ছোট প্রস্তরখণ্ডটি, দেওয়ালে টাঙানো ছবিখানি, কোণের শেল্‌ফে চমৎকার করিয়া বাঁধান বইগুলি, তাকের উপর ছোট টাইমপিসটি—সমস্তই সুন্দর।

এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া অনাদিবাবু প্রবেশ করিলেন। যদিও এখন ঠিক চা খাবার সময় নয়, তবু তৈরী হচ্ছিল যখন— । মৃদু হাসিয়া তিনি চায়ের পেয়ালাটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—চা-টা খেয়ে তুমি মাথার চুলগুলো কেটে ফেল দিকি আগে! ওই যে নাপিতও এসে গেছে! ওরে, বাবুর চুলটা বেশ ভাল করে কেটে দে দিকি, বেশ দশ-আনা ছ-আনা করে! নাও চা-টা খেয়ে নাও তুমি—

বাল্যকাল হইতে যে আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলাম, সে আবহাওয়ায় দশ আনা ছ-আনা চুলকাটা চলিত না। অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে দশ-আনা ছ-আনা চুলকাটা লোককে মেথর কিংবা গাড়োয়ান পর্যায়ে ফেলিতাম। অনাদিবাবুর কথায় একটু বিচলিত হইলাম। হঠাৎ চুল কাটিবার প্রস্তাবে বিস্মিতও কম হই নাই। আমার মুখ-ভাবে অনাদিবাবু মনের কথাটা বুঝিতে পারিলেন বোধ হয়, বলিলেন—অমন নোংরা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে কোট-প্যাণ্ট আছে?

—না।

—আচ্ছা, আমি সে-সব ঠিক করে দিচ্ছি। অনিলের স্যুটটা তোমার গায়ে ফিট করবে হয়ত— দেখি।

আবার তিনি ত্বরিতপদে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন। আমি চা পান করিয়া দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ভাবিতেছিলাম ঐ টেড়িকাটা টিনের বাক্স-হাতে ছোকরা নাপিতটার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব কি না, এমন সময় অনাদিবাবু একটি পত্র হস্তে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, এই দেখ তোমার বাবারও চিঠি এসেছে।

দেখিলাম বাবা লিখিতেছেন যে, অনাদিবাবু যেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আমি মফস্বলের কলেজ হইতে পাস করিয়াছি, বড় শহর সম্বন্ধে আমার তেমন ধারণা নাই। ছুটি পাইলে তিনি নিজেই সঙ্গে আসিতেন, কিন্তু কিছুতেই ছুটি পাওয়া গেল না, এদিকে ভর্তি হওয়ার শেষ দিন আসন্ন হইয়া আসিতেছে, সেজন্য একাই পাঠাইতে হইল। অনাদিবাবু যে এখানে আছেন তাহা বাবা জানিতেন না, জানিলে আমার সঙ্গেই তিনি পত্র দিয়া অনাদিবাবুর শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিতেন। নরেনবাবুর মুখে অনাদিবাবুর খবর পাইয়া এই পত্র লিখিতেছেন। অনাদিবাবু যেন—ইত্যাদি।

অনাদিবাবু বলিলেন—চুলটা কেটে ফেল, দেরি করো না—

উঠিয়া গিয়া নাপিতের হস্তে মুণ্ডটি বাড়াইয়া দিলাম।

অনাদিবাবুর ভাই অনিলবাবুর স্যুটটা আমাকে ঠিক ফিট করে নাই। অপরের জন্য যাহা প্রস্তুত তাহা আমাকে ঠিক ফিট করিবেই বা কেন, জামাটা একটু ঢিলা এবং প্যাণ্টালুনটা একটু আঁট হইল। অনাদিবাবু তাহাতে কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। আমার কলার এবং 'টাই'টা স্বহস্তে বাঁধিয়া দিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এবং সোৎসাহে বলিলেন—বাঃ চমৎকার হয়েছে—বিউটিফুল!

সবচেয়ে মুশকিল হইল জুতা লইয়া। অনাদিবাবুর আগ্রহাতিশয্যে অনিলবাবুর জুতাজোড়াতেই পা ঢুকাইতে হইল।

—ফস্ ফস্ করছে নাকি?

ঠিক উল্‌টা—ভয়ানক আঁট হইয়াছে—তাহাই বলিলাম। অনাদিবাবু বলিলেন—ফিতেগুলো একটু আলাগা করে দাও, হাঁটতে যদি লাগে একটা গাড়ি করেই যাই না হয় চল, পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপার, দেখাটা হয়ে গেলেই সব চুকে গেল!

সত্য সত্যই গাড়ি করিয়া যাইতে হইল। অত আঁট জুতা পায়ে দিয়া বেশী দূর হাঁটা সম্ভবপর ছিল না। স্যুটের সঙ্গে আমার তালি-দেওয়া জুতা পরিয়া যাওয়া আরও অসম্ভব ছিল। সুতরাং গাড়িই একটি ডাকিতে হইল।

আপিসে গিয়া শুনিলাম, সাহেব টিফিন খাইতেছেন, আধ ঘণ্টা পরে দেখা হইবে। অনাদিবাবু চাপরাসীকে আড়ালে ডাকিয়া প্রায় প্রকাশ্যভাবেই একটা টাকা বকশিশ দিলেন এবং সাহেবের সহিত দেখা হইয়া গেলে আর এক টাকা দিবেন আশ্বাস দিলেন।

দেখা হইয়া গেল। বড়সাহেব তাঁহার বাল্যবন্ধু কর্ণেল-এর চিঠিখানি পড়িয়া আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে, আমি দরখাস্ত করিয়াছি কি না। বলিলাম—করিয়াছি।

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। হেড ক্লার্ক সসম্ভ্রমে আসিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব হুকুম করিলেন যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য যতগুলি দরখাস্ত আসিয়াছে আনিয়া হাজির কর। হেড ক্লার্ক চকিতে একবার আমার দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেলেন ও ক্ষণপরেই এক বোঝা দরখাস্ত আনিয়া হাজির করিলেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, তোমার দরখাস্ত খুঁজিয়া বাহির কর। দরখাস্ত খুঁজিয়ে বাহির করিলাম এবং সভয়ে লক্ষ্য করিলাম যে, আমার কলেজের প্রিন্সিপাল (অর্থাৎ যে কলেজ হইতে আমি আই. এস.-সি. পাস করিয়াছি তিনি) আমার দরখাস্তের পাশে

ছোট ছোট অক্ষরে অনেকখানি কি যেন লিখিয়াছেন। নিয়ম অনুসারে প্রিন্সিপালের থ্রু দিয়াই দরখাস্ত করিয়াছিলাম। বাইবেল ক্লাসে কামাই করিতাম বলিয়া পাদ্রী প্রিন্সিপাল আমার উপর একটু চটা ছিলেন, ভয় হইতে লাগিল তিনি যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়া থাকেন। সে ভয় শীঘ্রই কিন্তু অপনোদিত হইল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে, প্রিন্সিপাল আমার খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। পাদ্রী প্রিন্সিপালের বিচিত্র মতিগতি কোন দিনই বুঝিতে পারি নাই, আজও পারিলাম না। সাহেব লাল পেন্সিলটা লইয়া আমার দরখাস্তের উপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখিলেন—সিলেক্‌টেড। ধন্যবাদ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আসিয়াই শুনিতে পাইলাম অনাদিবাবুর সহিত হেড ক্লার্ক মহাশয় আলাপ করিতেছেন। ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়াতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন মনে হইল। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না, বড়সাহেবের বাল্যবন্ধু কর্ণেল আমার পৃষ্ঠপোষক সুতরাং নির্বিঘ্নে আমি ভর্তি হইয়া গেলাম।

দীর্ঘ ছয় বৎসরে অনেক কিছুই শিখিলাম।

অ্যামিবা হইতে শুরু করিয়া কেঁচো, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ, মাছ, খরগোস, গিনিপিগ এবং সর্বশেষে মানুষ—মৃত এবং জীবন্ত মানুষ চিরিয়া জীবজগতে নানা বৈচিত্র্যের আভাস পাইলাম। সুস্থ ও অসুস্থ প্রাণীর দেহে নানা প্রকার ঔষধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ব্যাধির নানা মূর্তি, প্রসব করানো, অস্ত্র-চিকিৎসা, জীবাণু-বিদ্যা, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, জুরিস-প্রুডেন্স শিখিবার আর বাকি কিছু রহিল না। সৎ এবং অসৎ উপায়ে পরীক্ষার গাঁটগুলিও একে একে পার হইলাম। অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম বইকি! সে কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ডিগ্রি লাভই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে নিখুঁত নীতি-পথে চলিলে সব সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেন তেন প্রকারেণ নিজের কোলের দিকে ঝোলটা টানিয়া রাখ—ইহাই ছিল সকলের সত্য মনোভাব। সুনীতির একটা মুখোস অবশ্যই ছিল, কিন্তু আজ এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না যে তাহা মুখোসই ছিল, আর কিছু ছিল না।

বিগত ছাত্র জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া কয়েকটি ছবি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। অনেক ছবি মুছিয়া গিয়াছে, এই কয়টি কিন্তু এখনও বেশ উজ্জ্বল হইয়া আছে, হয়ত মনে বিশেষভাবে দাগ কাটিয়াছিল বলিয়া এখনও অবলুপ্ত হয় নাই।

নগেন বলিয়া একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। আমরা সংক্ষেপে তাহাকে 'নগা' বলিতাম। ছোটখাট মানুষটি, গলার স্বর কিন্তু ছিল বাজখাঁই। শুনিতাম সে গাঁজা খায়। ইহাই অবশ্য তাহার পূর্ণ পরিচয় নয়, সে রেস খেলিত এবং আরও অনেক কিছু করিত। সুতরাং পড়িবার সময় পাইত না। একদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম দুইজন কাবুলিওয়ালা মেসে আসিয়া তাহার বাক্স-পেঁটরা টানাটানি করিতেছে। নগেনের পক্ষ লইয়া আমরা কাবুলিওয়ালাদ্বয়কে হাঁকাইয়া দিবার জন্য দল বাঁধিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলাম। নগেন কিন্তু আমাদের নিবৃত্ত করিল। সে হাসিয়া বলিল যে, সুদে আসলে ধারের পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে বাক্স-পেঁটরা বেচিয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশও বেচারারা উশুল করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কাবুলিওয়ালারা বাক্স-পেঁটরা লইয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় নগাও কোথায় অদৃশ্য হইল। শুনিলাম সে বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন নগেনের দেখা নাই!

তাহার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় দর্শন দিলেন। আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়াছি, সার্জিক্যাল আউট-ডোরে আমাদের ডিউটি। হঠাৎ নজরে পড়িল, আউট-ডোরের বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়া নগা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। বলা বাহুল্য, বিস্মিত হইলাম।

—কি রে, নগা যে, এত দিন পরে হঠাৎ কোথা থেকে?

বাজখাঁই কণ্ঠকে যতটা মৃদু করা সম্ভব ততটা মৃদু করিয়া নগা বলিল—ভাই, বগলে একটা মাছের কাঁটা ফুটেছে, বার করে দে, বড় কষ্ট হচ্ছে।

—বগলে মাছের কাঁটা ফুটল কি করে? সাধারণত লোকের গলাতেই মাছের কাঁটা ফুটে থাকে?

—আমি যে আবার পরীক্ষা দিচ্ছি, জানিস না? আজ জুলজি প্র্যাকটিক্যাল ছিল।

নগা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তবু আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বগলে কাঁটা ফুটল কি করে?

—আচ্ছা বোকা তো তুই দেখছি! কাল সন্ধ্যের সময় ডোমটাকে আনা-আষ্টেক বকশিশ দিয়ে জেনে গেলাম যে আজ কি পড়বে। ওই ব্যাটারাই তো সব জোগাড় করে। ব্যাটা আমাকে বললে আজ ভেটকি মাছ পড়বে। আমি বাজার থেকে একটা ছোট ভেটকি কিনে আমাদের মেসের হরিচরণকে দিয়ে সেটা ডিসেক্ট্ করিয়ে কামিজের তলায় বগলদাবা করে নিয়ে গেলাম। ভেটকি যদি দেয় ওই ডিসেক্ট্ করা মাছটা তাক-মাফিক বের করব। কিন্তু ভাই গিয়ে দেখি মাছ নয়, ব্যাঙ! কি করি, সেই ডিসেক্টেড ভেটকি বগলে করে খানিকক্ষণ ঠায় বসে। তারপর আস্তে আস্তে সেটা পাচার করে ব্যাঙটাই চিরলাম। কি হয়েছে ভগবানই জানেন। ডোমটার আক্কেল দেখ দিকি! কি করবে বেচারা, ওর দোষ নেই, ওই যে নতুন একজামিনারটা হয়েছে ও-ই লাস্ট মোমেণ্টে ভেটকির বদলে ব্যাঙ দিতে বললে। ডোম ব্যাটা তো তাই বলেছে। তুই এখন কাঁটাটা বের কর দিকি—

কাঁটা বাহির করিয়া দিলাম, নগা চলিয়া গেল।

নগার কথা শুনিয়া আপনারা যেন মনে করিবেন না যে সব ছেলেই নগার মত। ভাল ছেলে ঢের ছিল, কিন্তু নগাও ছিল! সত্যিকার ভাল ছেলে ছিল, আবার নকল ভাল ছেলেও ছিল! অধ্যয়ন করিয়া এক দল ছেলে ভাল হয়, পরীক্ষকের মনোরঞ্জন করিয়া আর এক দল ছেলে ভাল হয়। পরীক্ষকদের 'হুইম্' ও 'হবি'র খবর রাখা আমাদের ছাত্রজীবনের মস্ত বড় একটা কর্তব্য ছিল, এবং ভালমন্দ সকল ছেলেরই লক্ষ্য ছিল ডিগ্রী—বিদ্যা নয়।

আমাদের সময় একজন সিনিয়র হাউস-সার্জন ছিলেন। প্রাচীন লোক, বিচক্ষণ চিকিৎসক, সদয় ব্যবহার। অমন লোক দেখা যায় না। আমাদের কিসে ভাল হইবে, ভদ্রলোক অহরহ সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষা ঢের বয়স কম ছোকরা এক আই. এম. এস. অফিসার হঠাৎ তাঁহার মনিব হইয়া আসিলেন। মিলিটারি সার্ভিসের লোক, মেজাজও মিলিটারি। কারণে-অকারণে সে মেজাজ দেখাইতেও তিনি কার্পণ্য করিতেন না। প্রাচীন হাউস-সার্জেনটিকে এক দিন অকারণে সকলের সামনে তিনি অপমান করিয়া বসিলেন! আমি আজও তাঁহার সেই আর্ত অপমানিত অসহায় মুখচ্ছবি ভুলিতে পারি নাই। তাঁহাকে একা পাইয়া বলিয়াছিলাম—স্যার চাকরি ছেড়ে দিন আপনি।

—তিন ফিগারের চাকরি, ভাই, ছাড়া কি সহজ!

একটু হাসিলেন। হৃদয়বিদারক সেই হাসিটুকু আজও মনে আছে।

আর একটা ছবিও মনে পড়িতেছে। তখন ইডেন হাসপাতালের আউটডোরে আমাদের ডিউটি। আমাদের কাজ ছিল আউটডোরে যে-সব রোগিণী আসে তাহাদের ব্যাধির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া রাখা। অর্থাৎ তাহাদের কষ্ট কি, কতদিন হইতে ভুগিতেছে, এই সকল বিবরণ জানিয়া এবং সম্ভবপর হইলে আন্দাজি একটা রোগ নির্ণয় করিয়া আমরা আউটডোর টিকিট লিখিয়া রাখিতাম। অধ্যাপক মহাশয় আসিলে তিনি প্রত্যেক টিকিটখানি লইয়া রোগিণীকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া এবং টিকিট-লেখক ছাত্রটিকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিয়া রোগ ও রোগিণীর সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন। একদিন এই ইডেন আউটডোরে আমার চতুর্থ রোগিণীকে প্রশ্ন করিলাম—আপনার কি হয়েছে?

—জানি না।

—কোন কষ্ট নেই আপনার?

—না।

—এখানে এসেছেন কেন তাহলে?

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, পেটে একটা কি যেন হয়েছে তাই দেখাতে এনেছি।

আউটডোর-টিকিটে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। একটু পরে আমাদের অধ্যাপক আসিয়া পড়িলেন এবং যথানিয়মে একের পর একে রোগিণীদের পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এই রোগিণীটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তিনি সন্তানসম্ভবা। ইঁহার লক্ষণাদি লইয়া অধ্যাপক মহাশয় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দিলেন। তাহার পর আবার নূতন একটা রোগিণী আসিল, তাহার পর আবার একটা। বারোটা পর্যন্ত এই ভাবেই চলিল, রোজ যেমন চলে।

আউটডোর শেষ করিয়া বাহির হইয়াছি হঠাৎ নজরে পড়িল সেই মেয়েটি গেটের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। চারিদিকে চাহিয়া সেই ভদ্রলোকটির চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ আগেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, এইবার লক্ষ্য করিলাম মেয়েটির মাথায় সিঁদুর নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, হিন্দু ঘরের বিধবা।

—এখানে কোন্ ঠিকানায় আপনি থাকেন?

মেয়েটি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—হ্যারিসন রোডের ওধারে কোথায় যেন—

—নম্বর জানেন?

—না।

একটা ক্লাস ছিল, সুতরাং বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার অবসর ছিল না। তাহাকে বলিলাম—আপনি এইখানে বসে থাকুন, আমি আসছি একটু পরেই আবার।

—আচ্ছা।

ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটিকে কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। তাহার বড় বড় সজল চোখ দুইটি কিন্তু মনের ভিতর আঁকা আছে।

আর একটা ছবিও আঁকা আছে।

ইমারজেন্সি-রুমে ডিউটি সেদিন। গভীর রাত্রি, টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেদিন যিনি ও. ডি. অর্থাৎ অফিসার-অন-ডিউটি ছিলেন, তিনি বসিয়া ছিলেন না, শুইয়া ছিলেন। বর্ষার রাত্রি, একটু মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। আমাদের বলিয়াছিলেন যে, খুব জরুরি কাজ না আসিলে যেন তাঁহাকে না উঠানো হয়। আমি এবং আর একজন ছাত্র জাগিয়া বসিয়া ছিলাম। সেই সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছি, ক্রমাগত সিগারেট খাইতেছিলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে দুই জন পুলিশ একটি আহত গুণ্ডাকে লইয়া ইমারজেন্সি-রুমে প্রবেশ করিল। গুণ্ডার মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। বাম চোখের ভ্রূর উপর হইতে শুরু করিয়া প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ একটা কাটা, রক্তে সর্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে। ও. ডি. মহাশয়কে উঠাইতেই হইল—পুলিশ-কেস। আমরা দুই জনে মিলিয়াই কিন্তু চিকিৎসাটা করিলাম, তিনি অবশ্য বলিয়া দিলেন। প্রচুর আইওডিন দিয়া প্যাট প্যাট করিয়া সেলাই করিয়া দিলাম। লোকটা ঠায় বসিয়া রহিল—হুঁ হাঁ কিছুই করিল না। রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া ও. ডি. মহাশয় আবার শুইতে গেলেন। আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

—মারামারি করতে গেছলে কেন?

সে পরিষ্কার উর্দুতে যাহা বলিল তাহার বাংলা এই যে, প্রাণ থাকিতে সে তাহার স্ত্রীর অপমান সহ্য করিবে কি করিয়া! সূচ্যগ্র-দাড়ি, বলিষ্ঠ, দীপ্তচক্ষু সেই গুণ্ডার মুখখানা এখনও ভুলি নাই। তাহার উক্তি সত্য কি মিথ্যা, আচরণ সঙ্গত কি অসঙ্গত, সেসব বিচার করিবার অবসর ছিল না। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা উন্নত-মস্তক গুণ্ডাটার মুখে সেদিন রাত্রে যে দুর্লভ মহিমা দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

আর একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের ওয়ার্ডে বুড়াগোছের একটি রোগী আসিয়া একদিন ভর্তি হইল। তাহার লিভারের কাছটায় উঁচু, চক্ষু দুইটি হলুদ। সকলে ভাবিলাম, লোকটার নিশ্চয়ই কোনকালে রক্তদুষ্টি ঘটিয়াছিল তাহার ফলেই এই দুর্গতি। বুড়া তারস্বরে অস্বীকার করিতে লাগিল, তাহার ওসব কিছুই কোনকালে হয় নাই। আমরা কেহই সেকথা বিশ্বাস করিলাম না; তাহার রক্ত পরীক্ষা করানো হইল। রক্তেও কোন দোষ পাওয়া গেল না। তখনও কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হইল না, রক্তদুষ্টির চিকিৎসাই কিছু দিন ধরিয়া চলিল। অনেক দিন চিকিৎসার পর যখন কোন ফল পাওয়া গেল না, তখন মনে হইল লিভারে বোধ হয় ক্যানসার হইয়াছে। অবশেষে কিছু দিন পরে বুড়ার মৃত্যু হইল। তাহার তিনি কুলে কেহ ছিল না, তাহাকে পোস্টমর্টেম করিবার সুযোগ আমরা পাইলাম। পেট চিরিয়া দেখা গেল লিভার ঠিক আছে, লিভারের ঠিক নিচেই একটা টিউমার হইয়াছে। চিকিৎসার দোষে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা নয়, সে মরিতই, পেটের ভিতর সারকোমা হইলে কেহ বাঁচে না।

কিন্তু আমাদের কত ভুল হয়!

আর মনে পড়িতেছে সেই মড়াগুলির কথা।

সেই মড়াগুলি, যাহারা স্বেচ্ছায় নয়, অসহায় বলিয়া আমাদের ছুরির তলায় আসিয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের চিরিয়া চিরিয়া আমরা জ্ঞান অর্জন করিয়াছি, যাহারা ডাক্তারিবিদ্যারূপ

মহাবজ্র-নির্মাণে সহায়তা করিয়াও দধীচির গৌরব লাভ করিতে পারে নাই, যাহাদের সংসর্গে আমাদের দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিয়াছে অথচ যাহাদের আমরা চিনি নাই, সেই সব অখ্যাত বিকৃত বীভৎস মড়াগুলির কথা এখনও ভুলি নাই। সেই প্রথম দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে—সেই যেদিন অ্যানাটমি হলে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল সামনের টেবিলটার উপর রহিয়াছে মড়া নয়, একখানা কাটা হাত।

ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায় এম. বি. বসিয়া আত্মজীবনচরিত লিখিতেছিল। ডাক্তারের পক্ষে কাজটা অদ্ভুতই। ডাক্তার বিমল চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী লেখার কোন সার্থকতা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। বিমলের নিজের কাছে কিন্তু উহার একটা সঙ্গত অজুহাত ছিল। সময় কাটানো চাই তো! হাসপাতালে ছয় মাস হাউস-সার্জানি করার পর হইতে সে একরূপ বেকার অবস্থাতেই বাড়িতে চুপচাপ বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে একটা বৎসর কাটিয়া গেল, সুবিধামত কিছুই জুটিতেছে না। পিতামাতা মারা গিয়াছেন, বোনগুলির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নাবালক ভাই নাই তথাপি কিন্তু বিমল নির্ঝঞ্ঝাট নয়। পিতা তাহার স্কন্ধে কিছু ঋণ এবং একটি বধূ চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বধূ মণিমালা আপাতত বাপের বাড়িতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে বটে এবং এম. বি. ডাক্তারের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও হয়ত নিজের এম. বি. স্বামীর সম্বন্ধে মনে মনে কিঞ্চিৎ মোহ পোষণ করিতেছে, কিন্তু উপার্জন করিতে না পারিলে এ মোহ কতদিন টিকিবে? কেবল মাত্র ডিগ্রিটা আস্ফালন করিয়া বেশী দিন তাহাকে মুগ্ধ রাখা যাইবে না। কিন্তু উপায় তো তেমন কিছু—

বিমল পুনরায় ঝুঁকিয়া আত্মজীবনচরিত শুরু করিতে যাইতেছিল এমন সময় পিয়ন আসিয়া হাজির হইল এবং একটি খামের চিঠি দিয়া গেল। বিমল উল্টাইয়া দেখিল, মণির চিঠি নয়—অত্যন্ত অপরিচিত হস্তাক্ষরে এ কাহার চিঠি! চিঠিখানা পড়িয়া কিন্তু তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লাগিয়া গিয়াছে তাহা হইলে! মাহিনা মাত্র পঁচাত্তর টাকা—তা হোক! ফ্রি কোয়ার্টার্স আছে, হাতে একটা হাসপাতাল আছে। আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটা মুড়িয়া রাখিয়া সে উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

[দুই]

ট্রেন আধঘণ্টা লেট ছিল। পৌঁছিবার কথা সাড়ে ন-টায়, দশটা বাজিয়া গেল। উদ্‌গ্রীব বিমল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ছিল, স্টেশনের চেহারাটা দেখিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইল না। অতি ছোট স্টেশন, এখানে ওখানে দুই-তিনটা কেরাসিনের আলো টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে, জাঁকজমক দূরের কথা, একটা উঁচু প্লাটফর্ম পর্যন্ত নাই। বিমল মনে মনে দমিয়া গেল। কুলির সাহায্যে নিজে স্যুটকেস, বিছানা এবং মাইক্রোস্‌কোপের বাক্সটা লইয়া সে নামিয়া পড়িল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল যদি সেক্রেটারি মহাশয় কোন লোক পাঠাইয়া থাকেন। নজরে পড়িল ওদিকের থার্ড ক্লাস গাড়ির সম্মুখে ভয়ানক ভিড়, একটা কলরব উঠিয়াছে। এমনই গাড়িতে যথেষ্ট ভিড়, ইহার উপর আবার এতগুলি লোক চড়িবে! বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

—কোথা যাবেন বাবু আপনি? কুলিটা প্রশ্ন করিল।

—হাসপাতালটা কত দূরে জানিস? মিউনিসিপাল হাসপাতাল?

—কাছেই।

থার্ড ক্লাস গাড়ির সম্মুখের কলরবটা বাড়িয়া উঠিল।

—ওখানে কি হল?

—কি জানি বাবু।

একটি লোক ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, প্রশ্নটা শুনিয়া বলিল—ও কিছু নয়, একটা বুড়ি পড়ে গেছে! এমন সব হুড়মুড়িয়ে উঠতে যায়!

গার্ডসাহেব হুইস্‌ল দিয়া নীল বাতি নাড়িতে লাগিলেন। স্টেশন মাস্টার ভিড়ের কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকর করিতেছিলেন—এই উঠে পড়ে সব, উঠে পড় সব, ট্রেন ছাড়ছে!

যে যেমন পারিল উঠিয়া পড়িল, বিমল একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল, আহত বুড়িটা তালগোল পাকাইয়া একটা পুঁটুলির মত স্টেশনের প্লাটফর্মে পড়িয়া আছে। ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে। বিমলের কৌতূহল হইল, একটু আগাইয়া গিয়া ঝুঁকিয়া সে বুড়িটাকে দেখিবার চেষ্টা করিল। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

—আরে মোলো এ মাগী এখানে পড়ে রইল যে।

এক চক্ষু লণ্ঠনহস্তে বিব্রত স্টেশনমাস্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিমল বলিল—ওর লেগেছে। আপনার আলোটা দিন তো একটু দেখি—

দেখা গেল বুড়ির আঘাত সত্যই গুরুতর, তাহার শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়চোপড় রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। বিমল একটু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিল, রক্তপাতের ফলে বেশ দ্রুত হইয়াছে। স্টেশনমাস্টার চীৎকার করিতে লাগিলেন—ভাগিয়া ভাগিয়া, এ ব্যাটা আবার কোথা গেল—চন্দু চন্দু—স্ট্রেচার নিকালকে এই বুড়িয়া কো হাসপাতাল মে লে যাও! যত ফ্যাসাদ জুটবে মশাই আমারই ডিউটির সময়! কাল হল কি—

বিমল বলিল—কোন হাসপাতালে পাঠাবেন?

—আমাদের রেলওয়ে হাসপাতালে, জগুবাবুর কাছে, আর কোথা—

—কতদূর এখান থেকে?

—তা বেশ দূর আছে, মাইল-দুই হবে—

বিমল হাসিয়া বলিল—এখুনি কিন্তু এর ব্যবস্থা করা দরকার। মিউনিসিপাল হাসপাতাল কত দূর?—

—সে তো কাছেই—ঐ তো দেখা যাচ্ছে! কিন্তু ও হাসপাতালের বিলিব্যবস্থাই আজব রকম। ডাক্তার থাকে তো ওষুধ থাকে না, ওষুধ থাকে তো ডাক্তার থাকে না! এক পাগলা ডাক্তার আছে—তারও শুনছি চাকরি গেছে—এই চন্দু—চন্দু—

—আমিই মিউনিসিপাল হাসপাতালের নতুন ডাক্তার, এই ট্রেনে এলাম—

—ও তাই নাকি—তা বেশ বেশ—পরেশ বাবুর কাছে শুনছিলাম বটে— বেশ বেশ! চন্দু—এই চন্দু—

চন্দু দুধ দুইতে গেছে।

ঘরের ভিতর হইতে কে যেন বলিল।

—ও-তাই নাকি,—ভাগিয়াটা গেল কোথা?

একটু ইতস্তত করিয়া স্টেশনমাস্টার মহাশয় বলিলেন—আপনার কাছেই পাঠিয়ে দি তাহলে বুড়িটাকে—ভালই হল!

—আমি এখনও হাসপাতালে পা-ই দিই নি, আচ্ছা বেশ দিন। আমি তাহলে এগিয়ে যাই, হাসপাতালটা কোন্ দিকে বলুন তো?

—আমি জানি বাবু, চলুন—কাছেই।

যে-কুলিটা বিমলের জিনিসপত্র নামাইয়াছিল, সে-ই বলিল।

—পাঠিয়ে দিন তাহলে, আমি চললাম—নমস্কার! বেশী দেরি করবেন না যেন, বুড়ির অবস্থা সুবিধের নয়।

—এখুনি দিচ্ছি, আপনি এগোন!

কুলির পিছনে পিছনে বিমল স্টেশনের প্লাটফর্মটা পার হইয়া কিছু দূর গিয়াছে এমন সময় একটা টর্চের তীব্র আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল!

—আরে, বিমল যে, এসে পড়েছ দেখছি—বাঃ!

—পরেশ-দা! আপনি কোথা থেকে?

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—আমি আজকাল এখানেই পোস্টমাস্টার—সম্প্রতি এসেছি। বদিবাবু সেদিন যখন বললেন যে এবার যে নতুন ডাক্তার আসছে তার নাম বিমল চাটুজ্যে, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে এ আর কেউ নয় আমাদের সেই বিমল—ওরে ওদিকে কোথা যাচ্ছিস?

কুলি বলিল—বাবু বললেন যে হাসপাতালে যেতে।

বিমল বলিল—আমার কোয়ার্টার্সটা কোন দিকে বলুন তো?

চলিতে চলিতে পরেশ-দা বলিতে লাগিলেন—তোমার কোয়ার্টার্স এখন খালি নেই, আগেকার ডাক্তারবাবু এখনও আছেন, চার্জ দিয়ে তবে ছাড়বেন। তুমি ক-দিন আমার বাসাতেই থাকবে আপাতত, বদিবাবু তাই বলেছিলেন আমাকে। আমারই ওপর ভার ছিল তোমাকে সম্বর্ধনা করবার! আমার ক্যাশ মেলাতে মেলাতে দেরি হয়ে গেল, ঠিক সময়ে আসতে পারলাম না। একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—ক্যাশও মিললো না—অথচ—যাক তুমি ঘরের লোক তোমার কাছে নো ফরম্যালিটি—

পরেশ-দা স্মিতমুখে বিমলের পানে চাহিলেন।

বিমল বলিল— আমাকে কিন্তু হাসপাতালে একবার যেতে হবে।

—এত রাত্রে কেন?

—একটা রুগী জুটেছে স্টেশনে।

—তাই নাকি!

পরেশ-দা কুলিটাকে বলিলেন—আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি, তুই জিনিসগুলো আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আয়—

—আচ্ছা বাবু।

কুলি চলিয়া গেল। পরেশ-দা তখন বিমলকে বলিলেন—চল এইবার তোমার হাসপাতালে যাওয়া যাক। কি রুগী?

—একটা বুড়ি স্টেশনে পড়ে গেছে, তাকেই নিয়ে আসবে।

—ও!

ক্ষণকাল থামিয়া পরেশ-দা বলিলেন—গুপিবাবু আছেন কি না সন্দেহ, চল দেখা যাক।

—গুপিবাবু কে?

—কম্পাউণ্ডার।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—হাসপাতাল কম্পাউণ্ডেই তার কোয়ার্টার্স, কিন্তু তিনি প্রায় এ সময়টা থাকেন না, পাশা খেলতে যান চৌধুরীদের বৈঠকখানায়।

কথাটা বিমলের ভাল লাগিল না। পাশা খেলিতে যান! জিজ্ঞাসা করিল—হাসপাতালে ইনডোর রুগী তো থাকে?

কুড়িটা বেড আছে বটে, তবে থাকে না বিশেষ কেউ! হয়ত দুই-এক জন আছে, ঠিক জানি না আমি— এই এসে পড়েছি এবার—এই তোমার হাসপাতাল—

বিমল অন্ধকারে আবছাভাবে যতটুকু দেখিতে পাইল তাহাতেই তাহার বেশ ভাল লাগিল—নিতান্ত ছোট তো নয়। চতুর্দিকে কিন্তু অন্ধকার, জনপ্রাণীর সাড়া নাই।

পরেশ-দা হাঁকিতে লাগিলেন—জান্‌কী, জান্‌কী—

গেটের পাশের ঘরটা হইতে একটি মনুষ্যমূর্তি বাহির হইল! পরেশ-দা বলিলেন—এই হচ্ছে হাসপাতালের মেথর। তাহার পর জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—ইনি হচ্ছেন নতুন ডাক্তারবাবু।

জান্‌কী ঝুঁকিয়া সেলাম করিল!

পরেশ-দা প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুর কোথা, ভৈরব কোথা?

ঠাকুর হাসপাতালের পাচক এবং ভৈরব চাকর! বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতে লাগিল পরেশ-দা অনেক খবর রাখেন তো হাসপাতালের! জান্‌কী বলিল, তাহারা বাহিরে গিয়াছে।

—গুপিবাবু?

নিকটেই গুপিবাবুর বাসা, জান্‌কী খোঁজ লইয়া আসিল, গুপিবাবু এখনও ফেরেন নাই।

পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—বললাম তিনি চৌধুরীর ওখানে আছেন। ওরে, তুই বসবার ঘরটা খুলে দিয়ে একটা লণ্ঠন জ্বেলে দে, আর গুপিবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়, বলগে যা নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন ডাকছেন। এক কাজ কর, তোর রুক্‌মিকে না-হয় পাঠা কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে আনুক, তুই ঘরটরগুলো খোল—

হাসপাতালের ভিতর হইতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কে যেন কাতরাইতেছে।

বিমল প্রশ্ন করিল—ও কিসের শব্দ!

জান্‌কী বলিল—ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী আছে।

বিমল না ভাবিয়া পারিল না, ইনডোরে একটা কালাজ্বর রোগী গোঙাইতেছে অথচ আলো নাই, কম্পাউণ্ডার নাই, চাকর-ঠাকুর কেহ নাই এ তো বড় অদ্ভুত অবস্থা।

স্ট্রেচার-বাহিত হইয়া স্টেশনের রোগীটিও আসিয়া পড়িল। বিমল জান্‌কীকে বলিল—একটা আলো চাই।

—রুক্‌মি, রুক্‌মি, বাত্‌তি লেআ—

মেথরের বউ রুক্‌মি শশব্যস্ত হইয়া একটা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইল এবং বিমলকে একবার আড়চোখে দেখিয়া বাতিটা হাসপাতালের বারান্দার উপর নামাইয়া রাখিল।

পরেশ-দা রুক্‌মিকে বলিলেন—তুই কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় চট করে—বল্ নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কম্পাউণ্ডারবাবু সন্ধ্যার সময় কোথায় থাকেন তাহা সকলেই জানে, সুতরাং রুক্‌মি কোন প্রশ্ন করিল না, চৌধুরীবাড়ির দিকে রওনা হইয়া গেল। যে-বাতিটা রুক্‌মি রাখিয়া গেল। সেটা হাসপাতালেরই বাতি, ঐ কালাজ্বর রোগীটার কাছেই থাকিবার কথা, কিন্তু রুক্‌মিরাই ওটা রোজ ব্যবহার করে। রুক্‌মির রান্না তখনও সমাপ্ত হয় নাই, অসময়ে এই সব উপদ্রব তাহার ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু নতুন ডাক্তারবাবু কি রকম মেজাজের লোক তাহা ঠিক জানা নাই। লক্ষ্য করিলে বিমল রুক্‌মির মুখের অপ্রসন্নতাটুকু দেখিতে পাইত। একটা জিনিস কিন্তু বিমল লক্ষ্য করিল—জান্‌কীটি বেশ কাজের লোক, ইংরেজীতে যাহাকে বলে এক্‌স্‌পার্ট! সে অল্প সময়ের মধ্যে কপাট খুলিল, আর একটা আলো জ্বালিল। স্টেশন হইতে আগত বুড়িটাকে টেবিলের উপর শোয়াইল, একটি ক্ষুদ্র ধমক দিয়া কালাজ্বর রোগীর গোঙানি বন্ধ করিল, টিঞ্চার আইওডিন, তুলা ব্যাণ্ডেজ বাহির করিল এবং সাবানের কৌটাটা বিমলের হস্তে দিয়া জলপূর্ণ মগ হস্তে বারান্দার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

বিমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল বুড়ির আঘাত গুরুতর।

হাতের কনুইয়ের কাছে একটা শিরা কাটিয়া গিয়াছে এবং অবিরাম রক্ত পড়িতেছে। আইওডিন তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলে এ রক্তপাত বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরও খানিকটা চিরিয়া আর্টারিকে বাঁধিয়া দিলে যদি কিছু হয়।

জান্‌কীর দিকে ফিরিয়া বিমল প্রশ্ন করিল,—ছুরি-টুরি কোথায় আছে?

—আলমারিতে।

—চাবি কোথা?

—এখানেই আছে বাবু।

জান্‌কী চট্ করিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবির একটা থোলো আনিয়া বিমলের হস্তে দিল এবং সার্জিকাল আলমারির চাবি কোনটা তাহাও দেখাইয়া দিল। ভাবিয়া সময় নষ্ট করিবার মত সময় নাই, অবিলম্বে প্রতিকার না করিলে বুড়ির শরীরে যতটুকু রক্ত আছে বাহির হইয়া যাইবে। বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া ছুরি, আর্টারি-ফরসেপ্‌স, কাঁচি প্রভৃতি জিনিসপত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিল।

পরেশ-দা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—অপারেশন করবে নাকি?

বিমল একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—ও ছাড়া উপায় নেই—

বিধি অনুযায়ী ছুরি প্রভৃতি স্টেরিলাইজ করা উচিত কিন্তু তাহা করিবার সময় নাই, খানিকটা লাইজল থাকিলেও হইত, কিন্তু তাহাও হাতের কাছে পাওয়া গেল না। টিঞ্চার আইওডিন দিয়া যতটা হয়।

জান্‌কী লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিল, বিমল অপারেশন শুরু করিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে বেশী বেগ পাইতে হইল না, ছিন্ন শিরার মুখটা চট্ করিয়াই পাওয়া গেল।...অপারেশন শেষ

করিয়া বিমল যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছে তখন পরেশ-দা বলিলেন—এই যে গুপিবাবুও এসে গেছেন।

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, প্রৌঢ় একটি লোক ঘাড়টি ঈষৎ নামাইয়া চশমার কাচের উপর দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কাঁচাপাকা গোঁফ, গলদেশে একটি পাকানো চাদর। বিমলের সহিত চোখাচোখি হইতেই গুপিবাবু মুখে একটু হাসির ভাব টানিয়া আনিয়া নমস্কার করিবার মত একটা ভঙ্গী করিলেন।

বিমল প্রশ্ন করিল—অ্যাণ্টিটিটেনাস সিরাম আছে?

গুপিবাবু মুখটা ফিরাইয়া মুচকি হাসিটুকু ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—ওসব কোথা পাবেন এখানে—

—হাসপাতালে নেই?

—না।

—বাজারে পাওয়া যাবে?

—জগদীশবাবুর দোকানে পাওয়া যেতে পারে বোধ হয়, উনি একটু আপ্টুডেট্।

—তাই একটা কিনে আনুন, কিনে এনে দিয়ে দিন এক্ষুনি।

গুপিবাবু দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। সাবান দিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বিমল বলিল—যান চট্ করে নিয়ে আসুন, আমি লিখে দিচ্ছি—কাগজ-কলম কোথা? হাত ধুইয়া তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে বিমল পুনরায় বলিল—কই কাগজ-কলম দিন।

গুপিবাবু একটা তটস্থ ভাব দেখাইয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় জান্‌কী কাগজ-কলম আনিয়া হাজির করিল। বিমল প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিতেই গুপিবাবু সেটা লইলেন এবং চশমার কাচের উপর দিয়া মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন—জগদীশবাবুর দোকানে নগদ দাম না দিলে—

—ও!

বিমল ক্ষণকাল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ভাবিল, তাহার পর পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া দশ টাকার একখানা নোট গুপিবাবুর হাতে দিয়া বলিল,—এই নিন, যান।

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন।

হঠাৎ বিমলের নজরে পড়িল সেই কালাজ্বর রোগীটাও উঠিয়া আসিয়াছে, জরাজীর্ণ দেহ, পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যাইতেছে। হঠাৎ এই রাতদুপুরে অপারেশনের অস্বাভাবিকতা তাহাকেও বিচলিত করিয়াছে। বিস্মিতভাবে সে বিমলকে দেখিতেছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

—আমি? কই না।

তাহার পর জান্‌কীর দিকে একবার মিনতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া পুনরায় বিমলের দিকে ফিরিয়া সকরুণ কণ্ঠে বলিল—আমি কেন চেঁচাতে যাব বাবু, দয়া করে এখানে থাকতে দিয়েছেন সেই আমার ঢের—আমি মুখটি বুজে পড়ে আছি। মন্থর পদক্ষেপে সে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া বেচারা যেন অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে।

জান্‌কী বুড়িটাকে বিছানায় শোওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। বিমল উঠিয়া গিয়া তাহার

নাড়ীটা একবার দেখিল। দেখিল খুব দুর্বল। ব্র্যাণ্ডি দিয়া একটি ঔষধের প্রেসক্রিপশান লিখিয়া সে জান্‌কীকে বলিল যে কম্পাউণ্ডারবাবু আসিলে এই ঔষধটা যেন খাওয়াইয়া দেন।

—আচ্ছা হুজুর।

—চল বিমল, এবার যাওয়া যাক, পরেশ-দা বলিলেন।

—হ্যাঁ চলুন।

—তোমার বৌদি নেই, নিজেদেরই গিয়ে রান্নাবাড়া করতে হবে। ক্যাশটাও মেলাতে হবে আমাকে—

বিমল অন্যমনস্ক ছিল। বলিল, চলুন।

রুক্‌মি বারান্দার থামের কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল।

পরেশ-দা ও বিমল গেট হইতে বাহির হইতে না হইতে সে ছোঁ মারিয়া লণ্ঠনটা লইয়া চলিয়া গেল।

[তিন]

পরদিন সকালে উঠিয়াই বিমল নিজের বাসাটা দেখিতে গেল। গঙ্গার ধারে ছোটখাট বাসাটি বেশ চমৎকার—একটু দূর হইতে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বিমল দেখিতে লাগিল। পরেশ-দা সঙ্গে ছিলেন, বলিলেন—পাগলা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে না কি এখুনি।

বিমল একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিতেছিল মণির এ বাসাটা পছন্দ হইবে কিনা। মণি আবার একটু খুঁতখুঁতে ধরনের। এই মফস্বল জায়গায় হয়তো তাহার—

পরেশ-দা পুনরায় বলিলেন—দেখা করবে নাকি ? এখনও হয়ত ওঠেই নি পাগলা।

বিমল বলিল—বেশ তো চলুন না,—সত্যিই পাগল নাকি?

—ছিট আছে।

কাছে আসিয়া দেখা গেল, বাড়ির দরজাটা খোলা রহিয়াছে।

—প্রকাশবাবু, ও প্রকাশবাবু।

শব্দ শুনিয়া লোম-ওটা একটা কুকুর বাড়ির ভিতর হইতে সুট করিয়া বাহির হইয়া গেল। পরেশ-দা একটু হাসিলেন।

—প্রকাশবাবু!

—কে?

রক্তচক্ষু বিরাট্‌বপু প্রকাশবাবু অসম্বৃত বসনটা সামলাইতে সামলাইতে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। কুচকুচে কালো রং, প্রকাণ্ড ভারি মুখ, সদ্যনিদ্রোত্থিত বলিয়া চোখ দুটি লাল লাল।

—কি চান?

—ইনিই নতুন ডাক্তার বিমলবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন,—কাল রাত্তিরে এসেছেন।

প্রকাশবাবু ক্ষণকাল বিমলের মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিলেন ও তৎপরে বলিলেন—ও আসুন, নমস্কার।

—নমস্কার।

বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল তুমি তাহলে আলাপ-টালাপ করে এস আমার ওখানে। আমি যাই, ডাকগুলো কাট্‌তে হবে—

আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। ভিতরে ঢুকিয়াই বিমলের চোখে পড়িল উঠানের উপর একটা দড়ির খাটিয়ায় বাঁখারিসহযোগে একটি মশারি টাঙানো আছে ঠিক বলা চলে না, কোনক্রমে ঝুলিয়া আছে। খাটের এক ধারে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন বসান রহিয়াছে এবং তাহার পাশেই বিখ্যাত ডাক্তারি কাগজ 'ল্যান্‌সেট' একখানা। উঠানের মাঝামাঝি একটা তার খাটানো, তাহাতে একখানি গামছা শুকাইতেছে।

বিমল বলিল—-আপনার বুঝি বাইরে শোয়া অভ্যেস?

চকিতে একবার খাটিয়ার পানে চাহিয়া প্রকাশবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, কি শীত কি গ্রীষ্ম! আসুন ভেতরে বসা যাক।

ঘরের ভিতর গিয়াও বিমল দেখিল প্রকাশবাবুর আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই। ঘরের ভিতর একটি চৌকি, একটি টেবিল আর একখানি চেয়ার রহিয়াছে!

—একাই ছিলেন নাকি এত দিন এখানে?

—না, ফ্যামিলি জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি, এবার আপনার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে আমিও রওনা হয়ে পড়ব—হা-হা-হা—বসুন, বসুন।

প্রকাশবাবু চৌকিটাতে উপবেশন করিলেন, বিমল চেয়ারে বসিল। বিমল একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিল—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন এখান থেকে?

—আপনি ঐ কথা জিজ্ঞেস করছেন আর আমি ক'দিন থেকে ভাবছি আমি ছিলাম কেন এখানে এতদিন? নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই তো নেই—হা-হা-হা-হা—

—কতদিন ছিলেন আপনি এখানে?

—ছ-মাস, তার আগে ছিলাম চা বাগানে, কিছু দিন জাহাজে জাহাজেও ঘুরেছি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেও ছিলাম কিছু দিন। কিন্তু এখন দেখছি নষ্ট করবার মত সময় সত্যিই আর বেশী নেই, এইবার ডিসেন্‌টলি যা হোক একটা কিছু করতে হবে।

—কোথাও ঠিক করেছেন না কি কিছু?

—ঠিক? ঠিক কি কখনও কিছু হয় মশাই! জনসমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোথাও-না-কোথাও ভিড়ে পড়ব আবার! তবে এবার ডিসেন্‌ট্‌ কিছু না দেখলে আর সহজে ভিড়ছি না। গান শুনব অক্রূর-সংবাদ, পয়সা দেব একটি—ওর মধ্যে আর নেই আমি— হা-হা-হা-হা—

বিমল অনুভব করিল এই বিকট হাসির জন্যই বোধ হয় সকলে ইহাকে পাগল আখ্যা দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে ভদ্রলোকের চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বারপ্রান্তে ভৃত্য-জাতীয় এক ব্যক্তি দর্শন দিল।

—বাবু, কাল আবার আপনি কপাট খুলে রেখে শুয়েছিলেন কুকুরে সব খেয়ে গেছে—

—আবার!

চকিতের মধ্যে প্রকাশবাবুর মুখের হাসি নিবিয়া গেল, দারুণ ক্রোধে সমস্ত মুখখানা ভীষণ

হইয়া উঠিল। বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দেখুন, কতকগুলো লোম-ওঠা খেঁকি কুকুর আছে এ পাড়ায়, এ পাড়ায় কেন সর্বত্রই—মিউনিসিপ্যালিটিকে বলে বলে আমি হার মেনে গেলুম মশাই, এক ধার্মিক চেয়ারম্যান জুটেছে সে কিছুতেই কুকুর মারতে দেবে না। অথচ প্রতি বছরই পাগলা কুকুরে লোককে কামড়াচ্ছে! আর আমি তো নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম—দিজ্ ডগ্স্ আর প্লেইং হেল্ উইথ্ মি—জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে! ব্যাটাচ্ছেলে ভণ্ড কোথাকার!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

ভৃত্যটি ইতস্তত করিতেছিল—প্রকাশবাবু বলিলেন, ভৈরব, ইনিই নতুন ডাক্তারবাবু, চা-টা খাওয়াও এঁকে, কিছু খাবারও নিয়ে এস!

ভৈরব ঝুঁকিয়া বিমলকে প্রণাম করিল।

প্রকাশবাবু বলিলেন—ও ঘরের তাকে একটা খালি সিগারেটের টিনে কিছু পয়সা আছে দেখো—

ভৈরব চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরই খালি সিগারেট-টিনটি লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল।

—কই, একটি পয়সাও তো নেই এতে বাবু!

—নেই? সে কি, এই তো পরশুদিন একটা টাকা ভাঙিয়ে রেখেছিলাম।

নিরীহের মত মুখ করিয়া ভৈরব বলিল—খরচও তো হয়েছে, কাল তেল আনালেন, সিগারেট আনলাম, আরও সব যেন কি কি—

প্রকাশবাবু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

—ভাল কথা মনে পড়েছে, সিগারেট খান আপনি, ওরে আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আয়।

ভৈরব চলিয়া গেলে একটা স্যুটকেস তিনি চৌকিটার তলা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। বিমল দেখিল স্যুটকেসে চাবির বালাই নাই। ডালাটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রকাশবাবু বিমলের দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন—আর একটি মাত্র বাকি রইল। তার পর স্যুটকেসটা পুনরায় চৌকির তলায় ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—একেবারে নিঃস্ব হবার আগে সরে পড়তে চাই—হা-হা-হা-হা—চলুন আজই আপনাকে চার্জটা দিয়ে দিই।

ভৈরব সিগারেট ও দিয়াশলাই লইয়া আসিতেই প্রকাশবাবু তাহার হাতে দশ টাকার নোটটি দিয়া বলিলেন—এইটে ভাঙিয়ে চট্ করে কিছু খাবার আনো গিয়ে।

বিমল বলিল—কেন ও-সব হাঙ্গামা করছেন।

প্রকাশবাবু বিমলের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া পুনরায় ভৈরবকে বলিলেন—ওই চণ্ডীর দোকান থেকে নিও না যেন, একের নম্বর স্কাউন্ড্রেল ব্যাটা, দেরি করো না, চা করতে হবে, যাও।

বিমল পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রকাশবাবু সে অবসর দিলেন না, কাপড়ের কসিটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন—এই জায়গাটার কুকুর বিড়াল মানুষ বাঁদর সব পাজি, আপাদমস্তক পাজি—

—তাই নাকি?

—উফ্!

একটু পরে বিমল যখন পরেশ-দার বাসায় ফিরিয়া গেল তখন তাহার প্রকাশবাবুর সম্বন্ধে ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। লোকটার পড়াশোনা অদ্ভুত, এ-রকম স্থানে তাঁহার বিদ্যাবত্তা বুঝিবার লোক না থাকাই সম্ভব। বায়োকেমিস্ট্রি সম্বন্ধে যেরূপ বক্তৃতা দিলেন ভদ্রলোক, বিমলই সব কথা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ রকম লোকের কোথাও অধ্যাপক হওয়া উচিত। কিন্তু—। ঐ 'কিন্তু'তেই আমাদের দেশে সব কিছু আটকাইয়া যায়। ঐ 'কিন্তু'টা যে কি জটিল বস্তু তাহা বোঝানো শক্ত। সমস্ত শুনিয়া পরেশদা বলিলেন—হ্যাঁ এদিকে বেশ লেখাপড়া জানেন ভদ্রলোক, এম. এস-সি, এম. বি.—কিন্তু ঐ এক দোষ। ঠিক সময়ে হাসপাতালে যেত না, বকছে তো বকছেই, হাসছে তো হাসছেই, চটলে তা রক্ষে নেই খুনই করে ফেলবে। বিমল কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—চল তোমাকে এইবার বদিবাবুর সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই, কাছেই বাড়ি। ওহে হরেন, তুমি ততক্ষণ থেকো একটু এখানে, আমি আসছি একটু বদিবাবুর বাসা থেকে—আমি এলে তারপর বেরিও—

হরেন বলিল—আজ্ঞে আচ্ছা!

হরেন পিওন। পরেশ-দা এখানে পোস্টমাস্টার হইয়া আসাতে হরেন বেচারারই বিপদ হইয়াছে। পরেশদার চিরকালকার স্বভাব নিজের চরকাটি ছাড়া সকলের চরকায় তৈল প্রদান করা। আশেপাশের সকলের সব খুঁটিনাটি খবরটি তাঁহার রাখা চাই, সমস্ত লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশা চাই, প্রত্যেক ব্যাপারেই সুযোগ পাইলে মুরুব্বিয়ানা করা চাই। পরেশ-দা এখানকার ফুটবল ক্লাবের রেফারি, সারস্বত মন্দির অর্থাৎ বাংলা লাইব্রেরীর সেক্রেটারি, কংগ্রেসী বদিবাবুর সহচর, স্থানীয় যুবক-সমিতির পৃষ্ঠপোষক, আঢ্যিদের টেনিস ক্লবের কর্ণধার। সুতরাং যেরূপ অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাঁহার নিজ কর্তব্য করা উচিত তাহা তিনি করিতে পারেন না; হরেনকেই অর্ধেক কাজ করিয়া দিতে হয়। রোজই রাত্রে ক্যাশ লইয়া দুর্ভাবনা হয়, কিছুতেই মেলে না। অথচ পরেশ-দার উপর সকলেই খুশি। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এখানে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছেন।

পথে যাইতে যাইতে পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—এই বদিবাবু লোকটির ভয়ানক ইনফ্লুয়েন্স এখানে, মাড়োয়ারিমহল ওঁর কথাতেই ওঠে বসে। বদিবাবুকে যদি খুশি করতে পার মাড়োয়ারি-মহলে তোমার একচেটে প্র্যাক্‌টিস হয়ে যাবে।

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া পরেশ-দা বলিলেন—তোমাকে না দেখেই তুমি চাটুজ্যে শুনেই তোমার উপর একটা টান হয়েছে। এদিকে বদিবাবুর একটু, যাই বল তুমি, ইয়ে আছে। উনিই তো হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারি, তুমি চাটুজ্যে বলে উনি কি কম লড়েছেন তোমার জন্যে! তোমাদের কমিটিতে হরেন বোস বলে এক ভদ্রলোক আছেন তাঁরও একজন নিজের লোক ছিল ক্যাণ্ডিডেট, কিন্তু বদিবাবুর সঙ্গে হরেন বোস পারবে কেন, ভোটে হেরে গেল! বদ্যিনাথ চাটুজ্যের সঙ্গে পারা বড় চাট্টিখানি কথা নয়!

বিমল বলিল—তাই নাকি!

—নিশ্চয়! পুরুষসিংহ যাকে বলে! গিয়েই প্রণাম করো, খুশী হবেন। ভারি অমায়িক লোক এদিকে।

—কি করেন?

—ওকালতি, বেশ ভাল প্র্যাকটিস ক্রিমিনাল সাইডে—

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঁর বাড়িতে অসুখবিসুখ হলে কে চিকিৎসা করে?

—জগদীশবাবুর সঙ্গে ওঁর ভাব আছে যথেষ্ট, কিন্তু উনি ডাক্তারি ওষুধ বিশেষ পছন্দ করেন না, উনি কবরেজি কিংবা হাকিমি ওষুধের পক্ষপাতী—

—ও, তাই নাকি?

বিমল ভাবিয়া পাইতেছিল না কি উপায়ে এই পুরুষসিংহটিকে খুশি করিতে পারিবে। ডাক্তারি ঔষধই যে ব্যক্তি পছন্দ করে না তাহাকে খুশি করা তো সহজ হইবে না! নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিয়া বিমল বলিল—পরেশ-দা, বেশী দেরি করা চলবে না, প্রায় সাতটা বাজে, হাসপাতালে যেতে হবে। প্রকাশবাবু সাড়ে সাতটায় যাবেন বলেছেন, তাছাড়া কালকের সেই রুগীটা কেমন রইলো জানবার জন্যে মনটা ছটফট করছে—

পরেশ-দা বলিলেন—না বেশী দেরি হবে না।

তারপর হাসিয়া বলিলেন—আঁটঘাট বেঁধে নিয়ে তার পর কাজ শুরু করে দাও না তুমি! এ-বেলা বদিবাবু তো হয়ে গেল, ও-বেলা চেয়ারম্যান আর জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই আপাতত নিশ্চিন্দি! বাকী মেম্বারদের সঙ্গে তারপর ধীরেসুস্থে দেখা করলেই চলবে—

—চেয়ারম্যান কে?

—রাখাল নন্দী, ধর্ম-ধর্ম বাই, কিন্তু টাকার কুমীর। তোমাদের হাসপাতালের ইন্‌ডোর রুগীদের খাওয়ার খরচ ওই একা দেয়।

একটু থামিয়া বিমল বলিল—জগদীশবাবু ডাক্তারও কি হাসপাতাল কমিটির মেম্বার না কি?

—নিশ্চয়ই, বেশ শাঁসালো মেম্বার। ও লোকটিকেও হাতে রাখতে হবে, বড় গভীর জলের মাছ—

বিমল মনে মনে একটু চিন্তিতই হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগুলিকে সে একা কি করিয়া খুশি করিয়া রাখিবে। ইহা তো রীতিমত সমস্যার আকার ধারণ করিতেছে! আরও কিছুক্ষণ চলিবার পর পরেশ-দা বলিলেন—ঐ যে বদিবাবু বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন।

বিমল দেখিল একটা বড় বাড়ির গেটের সম্মুখে দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ে একটি খদ্দরের ফতুয়া, খদ্দরের একটি কাপড় লুঙ্গির মত করিয়া পরা, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, হস্তে একটি নিমের দাঁতন।

—পরেশবাবু যে, আসুন আসুন! সঙ্গে ওটি কে?

বিমল অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইল।

পরেশ-দা বলিলেন—বিমল চাটুজ্যে, আপনাদের নতুন ডাক্তার—

—আরে, তাই নাকি! বাঃ বাঃ বাঃ—আসুন, ভেতরে আসুন।

তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—সব খবর পেয়ে গেছি ভোরেই।

বিমল বুঝিতে পারিল না কিসের খবর। বদিবাবু সামনের দাঁতে দাঁতনটাকে বার-দুই ঘষিয়া বলিলেন—আপনার রুগীকে দেখেও এসেছি, ভাল আছে বুড়ি।

তার পর বিমলের পিঠটা চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ, এই তো চাই। চাটুজ্যে না হলে কি এ আর কারও দ্বারা সম্ভব হত? কি বলেন পরেশবাবু, আসুন ভেতরে, আমি ততক্ষণ মুখটা ধুয়ে আসি।

বদিবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। পরেশ-দার সহিত বিমল ভিতরে ঢুকিয়া একখানি চেয়ারে বসিল! একটু পরেই বদিবাবুর দুই জন মক্কেল, তিন জন কংগ্রেসকর্মী, সাহায্যপ্রার্থী একটি যুবক, মিউনিসিপ্যালিটির কেরাণী মহেশবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেরই বদিবাবুর সহিত প্রয়োজন।

প্রকাশবাবু সেইদিনই চার্জ দিলেন। সমস্তই এমন এলোমেলো ও অগোছালো অবস্থায় ছিল যে, আইনত চার্জ লইতে গেলে অন্তত পাঁচ-ছয় দিন লাগিত, প্রকাশবাবুও বিপন্ন হইতেন। খাতাপত্রের কিছুই ঠিক ছিল না। বে-আইনী ভাবে কোনক্রমে গোঁজামিল দিয়া বিমল প্রকাশবাবুকে রেহাই দিয়া দিল। প্রকাশবাবু সেই দিনই দুপুরের ট্রেনে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় বিমলকে বলিয়া গেলেন—আমার ঐ নড়বড়ে চৌকিটা আর হাতল-ভাঙা চেয়ার দুটো আপনাকে দান করে গেলাম বিমলবাবু। ওগুলো ভাল কাঁঠাল-কাঠে তৈরী, কব্জাগুলো ঠিক নেই খালি—অর্থাৎ আমার মতো অবস্থা—হা-হা-হা-হা—

বৈকালে চেয়ারম্যান রাখাল নন্দীর সঙ্গেও দেখা হইল। নন্দী মহাশয় নিজের বাগানের একটি ছায়া-শীতল স্থানে শ্বেতপাথরের চৌতারার উপর বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন—অম্বরি তামাকের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। নগ্নগাত্র, ক্ষৌরিকৃত মুখমণ্ডল, ভাষা-ভাষা আরক্ত নয়ন, মাংসল নাকের উপর সূক্ষ্ম একটি তিলক, গলায় কণ্ঠি, দক্ষিণ বাহুমূলে মাদুলি, মেদবহুল অতিপুষ্টদেহ নন্দী মহাশয় গরমে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন! পিছনে দুইজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছিল। বিমলের সঙ্গে পরেশ-দাও গিয়াছিলেন। পরিচয় দিতেই অর্থাৎ বিমল চাটুজ্যে ব্রাহ্মণ-সন্তান এই বোধ মনে স্পষ্টভাবে জাগরূক হইতেই নন্দী মহাশয় শরীরের গুরুভার সত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন এবং বেশ একটু ঝুঁকিয়া বিমলকে নমস্কার করিলেন। পরেশ-দা বলিলেন—বসুন, বসুন, আপনি বসুন!

—ওরে দুখানা চেয়ার নিয়ে আয় শীগ্‌গির—ব্রাহ্মণ-সন্তান দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনারা আর আমি বসব, সে কি একটা কথা হল!

নন্দী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বেশীক্ষণ অবশ্য তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইল না,—দুইখানি চেয়ার শীঘ্রই আসিয়া পড়িল এবং সকলে উপবেশন করিলেন।

নন্দী মহাশয় পুনরায় আদেশ করিলেন—ডাব নিয়ে আয়, বরফ দিয়ে আনিস।

পরেশ-দা বলিলেন—আপনার বাড়িতে বরফ!

নন্দী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আপনাদের জন্যে রাখতে হয়, আমার মত সকলেই তো আর বাতুল নয়!

পরেশ-দা বলিলেন—আপনি খান না তা শুনেছি।

গড়গড়ার নলে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়া ধূম উদগীরণ করিতে করিতে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আমার কেমন যেন প্রবৃত্তি হয় না। সংস্কার বলে তো একটা জিনিস আছে—

কিছুক্ষণ তামাকে টান দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—খাব, আগে আমরা ইলেকট্রিসিটিটা এনে ফেলি, নিজের বাড়িতে রেফরিজেরেটারে বরফ বানিয়ে তার পর খাব। দাঁড়ান না,—

পরেশ-দা বলিলেন—ইলেকট্রিসিটি হবে না কি টাউনে?

—চেষ্টা তো করছি, একটা স্কীমও খাড়া করেছি, বাগড়া দিচ্ছেন আমাদের মথুরবাবু—লোকটিকে তো জানেন—অরগুণ নেই বরগুণ আছে—

পুনরায় গড়গড়ায় টান দিতে লাগিলেন।

আবার সহসা বলিলেন—ইলেকট্রিসিটি না হলে এই দারুণ গ্রীষ্মে কি কষ্ট বলুন তো—এই চাকর দুটো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছ, তবু দেহ শীতল হচ্ছে না! ওদেরও তো কষ্ট হয়।

আবার কিছুক্ষণ গড়গড়ায় টান দিলেন। তাহার পর সহসা বিমলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আপনাদের হাসপাতালেও তো ইলেক্ট্রিক হলে সুবিধে হয়।

বিমল বলিল—তা হয় বইকি!

নন্দী মহাশয় পুনরায় তাম্রকুটে মন দিলেন। সেদিন রাত্রে ডিট্জ্ লণ্ঠন ধরিয়া অপারেশনের কথাটা বিমলের মনে পড়াতে সে পুনরায় বলিল—ইলেকট্রিসিটি হলে খুব সুবিধে হয়। রাত্রে ইমারজেন্সি অপারেশন ইলেকট্রিসিটি না থাকলে হওয়া অসম্ভব।

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতেছিলেন। তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন—ঐ পয়েণ্টটা টুকে দেবেন তো আমাকে—

হঠাৎ এই পয়েণ্টটা টুকিয়া লইয়া কি হইবে বিমল ঠিক বুঝিল না, তথাপি বলিল—আচ্ছা।

ডাব আসিল। দুই চারি কথার পর পরেশ ও বিমল গাত্রোত্থান করিলেন। আসিবার প্রাক্কালে নন্দী মহাশয় বলিলেন—হাসপাতালটার বড় বদনাম হয়ে গেছে মশাই আগের ডাক্তারের আমলে। আপনি একটু সামলেসুমলে নিন আবার!

—আচ্ছা।

জগদীশবাবু ডাক্তারের সহিতও আলাপ হইল।

লোকটি অতিশয় মিষ্টভাষী। দেখিয়া মনে হয় তিনি কখনও কাহারও মনে ব্যথা দিতে পারেন না। কাহারও কথার প্রতিবাদ করা, এমন কি ইঙ্গিতেও কাহারও মনে আঘাত দেওয়া যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মুখে হাসি সর্বদা লাগিয়াই আছে। সামনের দিকে নীচে গোটা দুই দাঁত নাই, হাসির ফাঁকে ফাঁকে ফোকলা দাঁতের ভিতর দিয়া লাল টুকটুকে জিবের ডগাটি প্রায়ই দেখা যাইতেছে। বিমলের পরিচয় পাইয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন—আসুন আসুন—আপনার কথাই হচ্ছিল একটু আগে! থামুন এই কটা সেরে নিই, তার পর কথা কইছি আপনার সঙ্গে—সমবেত কয়েকজন রোগী-রোগিণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—আসুন আপনারা ঘরের ভেতর—

পরেশ-দা বিমলকে বলিলেন—আমার ডাকের সময় হল, আমি চললাম, হরেন বেচারা একা সামলাতে পারবে না। তুমি আলাপ-টালাপ করে এস—বুঝলে?

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল একা বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে জগদীশবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোকরা বলিতে বলিতে বাহির হইল—তেতো ওষুধ আমার বউ খেতে পারে না ডাক্তারবাবু, এ ওষুধটা মিষ্টি হবে তো?

জগদীশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে তাহার পানে এক বার চাহিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জীবের ডগাটুকু বারদুই উঁকি দিয়া গেল। বলিলেন, আমি তোমার বউকে চিনি না? ঠিক ওষুধ দিয়েছি। আজ দেখো, ঠিক খাবে—

ছোকরা পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল। জগদীশবাবু সস্মিত মুখে বিমলের দিকে চাহিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—এলাম আপনাদের আশ্রয়ে—

জগদীশবাবু কিছু না বলিয়া তেমনই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

বিমল একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল—দেখছেন কি অমন করে?

জগদীশবাবু বলিলেন—আশ্চর্য চওড়া তো আপনার কপাল! তাহার পরই তাঁহার মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিব উঁকি মারিতে লাগিল!

এ পর্যন্ত বিমলকে কপাল লইয়া কেহ প্রশংসা করে নাই। সে হাসিয়া বলিল—এ-কথা আর তো কখনো শুনি নি!

জগদীশবাবু বলিলেন—আমি বলছি, খুব চওড়া কপাল আপনার—

বিমল কি বলিবে চুপ করিয়া রহিল। জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন লাগছে জায়গাটা?

—মন্দ কি!

—হাসপাতাল কেমন দেখলেন?

—এখনও দেখবার সময় পাইনি, চার্জ নিতেই আজ সমস্ত সকালটা গেল। কাল থেকে দেখা যাবে ভাল করে। আজ বিকালটা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতেই কাটল—

—বেশ, বেশ—ভূধরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না, কে তিনি?

—তিনি আমাদেরই এক জন—এখানেই প্র্যাকটিস্ করেন। বাজারের ভেতর তাঁর ডিস্‌পেনসারি।

বিমল প্রশ্ন করিল—এখানে ফিল্‌ড্ কেমন?

—ঐ কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায় আর কি আমাদের কজনের! এবার উঠতে হবে আমাকে, তিনটে কল বাকি আছে এখনও—

জগদীশবাবু উঠিতেছিলেন, বিমলও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন সময় একটি যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্পশু, সাবান দেওয়ার জন্য মাথার চুল উসকোখুসকো, হাতের আঙুলে দামী পাথর বসানো আংটি। বেশ সভ্য সুন্দর চেহারা।

—আসুন, আসুন অমরবাবু, তার পর খবর কি, কেমন আছেন--

বিমল অমরকে এখানে দেখিবে প্রত্যাশা করে নাই। সে সবিস্ময়ে বলিল—অমর তুই এখানে!

অমর বলিল—বিমল যে, আরে তুই কোথা থেকে?

—আমি যে এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে এসেছি!

—তাই না কি?—যাক বাঁচা গেল। তোরই কথা ভাবছিলাম আজ কদিন থেকে।

তাহার পর জগদীশবাবুর দিকে ফিরিয়া অমর বলিল—এ আমার অনেক দিনের বন্ধু, ম্যাট্রিক, আই. এস্-সি সব একসঙ্গে পড়েছি। ও মেডিকেল কলেজে ঢুকল, আমি জেনারেল লাইনেই থেকে গেলাম। তুই এখানে এসেছিস?

বিমল বলিল—তুই এখানে এলি কোথা থেকে?

—কি মুশ্‌কিল, এইখানেই যে আমাদের বাড়ি— ওপারে।

বিমল জানিত অমর কোন বড়লোক জমিদারের পুত্র কিন্তু এইখানেই যে তাহার বাড়ি তাহা সে এই প্রথম শুনিল। জগদীশবাবু প্রশ্ন করিলেন—মথুরবাবু আছেন কেমন?

অমর হাসিয়া বলিল—বাবার কথা আর বলবেন না, আমেরিকা থেকে কি এক ওষুধ আনিয়েছেন তাই খাচ্ছেন। আমার ওষুধটা না কি?

জগদীশবাবু বলিলেন—কেমন আছেন আপনি?

—সামান্য একটু ভাল।

—ওই তবে চলুক।

—চল্ গঙ্গার ধারে একটু বসা যাক কোথাও—

জগদীশবাবুকে নমস্কার করিতে গিয়া বিমল সহসা লক্ষ্য করিল তাঁহার মুখের হাসিটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটা নড়িতেছে না।

বাহির হইয়া বিমল প্রশ্ন করিল—হয়েছে কি তোর?

কথাটা শুনিয়া কেমন অপ্রতিভ হইয়া অমর বলিল—চল সব বলছি—তুই এসেছিস ভালই হয়েছে।

নিকটেই গঙ্গার ধারে একটা নির্জন জায়গা বাছিয়া উভয়ে উপবেশন করিল। দামী সিগারেট কেশ হইতে বাহির করিয়া বিমলকে একটি দিয়া নিজে একটি ধরাইতে ধরাইতে অমর বলিল—সব কথা খুলে বলছি তোকে, কিন্তু ভাই কিছুতেই যেন প্রকাশ না হয়। এক ফোকলা ছাড়া আর কেউ জানে না—

বিমল একটু হাসিল, অমর বলিতে লাগিল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, বিমল এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। বড়লোকের ছেলেদের পদস্খলনের সেই সনাতনী কাহিনী। সঙ্গদোষে পড়িয়া পদস্খলন, সংক্রামক ব্যাধি, মুহূর্তের ভুলের জন্য আজীবন মনস্তাপ এবং জলের মত অর্থব্যয়। ডাক্তারি পড়িতে পড়িতে এরূপ অনেক কাহিনীই সে শুনিয়াছে। কাহিনী শেষ করিয়া অমর বলিল—মুশ্‌কিল হয়েছে ভাই এখন বিনুকে নিয়ে।

—বিনু কে?

—সব ভুলে গেছিস দেখছি। লরেটোর বিনুকে ভুলে গেলি?

—তাকে বিয়ে করেছিস নাকি?

—হ্যাঁ।

—শুনেছিলাম তোর বাবা-মার অমত আছে, বিয়ে হবে না—

—তাঁদের অমতেই লুকিয়ে বিয়ে করেছিলুম, সে অনেক কাণ্ড, তার পর বাবা-মা সব ক্ষমা করেছেন; মিনু এখন আইডিয়াল হিন্দু বধূ, টিপিক্যাল গৃহলক্ষ্মী যাকে বলে, ব্রত, উপোস,

পুজো-মানত, ধূপ-ধুনো গঙ্গাজল গোবরজল নিয়ে বিনু সকলের উপরে টেক্কা দিয়েছে! মা-বাবা বউমা বলতে অজ্ঞান! কিন্তু আমি ভাই মহামুস্কিলে পড়েছি। বিনু ঘুণাক্ষরে একথা জানে না এখনও!

বিমল বলিল—তার মানে?

—মানে, ভণ্ডামি করছি। বিনুর কাছে 'পোজ' করেছি আমি কোন সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়েছি এবং গুরুর আদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য পালন করছি। তুই ভাই একটা উপায় বলে দে আমাকে—অনেস্ট ওপিনিয়ন চাই।

বিমল বলিল—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

অমর প্রশ্ন করিল—তুই বিয়ে করিস নি এখনও?

—করেছি বইকি।

—বউ কোথা?

—পড়ছে—এবার তার আই-এ পরীক্ষা!

—তার মানে, কি নাগাদ আসবে এখানে?

—পরীক্ষা হয়ে গেলেই—হচ্ছে পরীক্ষা—

—বিনুর সঙ্গে তাহলে জমবে ভাল। এ অঞ্চলে কলেজেপড়া মেয়ে আর একটিও নেই—

বিমল হাসিয়া বলিল—ভালই হবে। কত দূর তোর বাড়ি এখান থেকে?

—ওপারে, যাস একদিন—কালই আয় না। ফেরি ঘাট পেরিয়ে মথুরবাবুর বাড়ি কোন্‌দিকে বললেই দেখিয়ে দেবে সবাই। কোন্ সময় আসবি?

—কাল বিকেলের দিকে চেষ্টা করব। চল্ এখন ওঠা যাক্। তুই সকালে হাসপাতালে আসিস না?

—আচ্ছা।

সেদিন রাত্রে বিমল মণিমালাকে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিল। মনের আবেগ ভবিষ্যৎ জীবনের মনোরম একটি চিত্র আঁকিয়া দিল। হাসপাতালের বর্ণনা, তাহার প্রথম রোগী সেই বুড়িটার বর্ণনা, পরেশদার অতিথি-পরায়ণতা, অমর ও অমরের স্ত্রীর কথা, নন্দী মহাশয়, জগদীশবাবু, বদিবাবু, গুপি কম্পাউণ্ডার, হাসপাতালের অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসার দুলু, ভৈরব চাকর, শিবু ঠাকুর, জান্‌কী মেথর, এমন কি রুক্‌মি মেথরাণীর কথা পর্যন্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া অবশেষে বিমল লিখিল—আমার জীবনের পথে তুমিই সঙ্গিনী, তুমি না এলে কিছুই ভাল লাগছে না।

পরেশ-দা আসিয়া বলিলেন—আর একটা কাগজ দেবো? উঃ একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের চার পিঠ ভরিয়ে ফেললে যে তুমি!

বিমল হাসিয়া বলল—ক্যাশ মিলল আপনার?

—মিলেছে, যোগে ভুল হচ্ছিল।

—চলুন আমার হয়ে গেছে।

উভয়ে গিয়া খাইতে বসিল। পিওন হরেনই রাঁধিয়াছে আজ।

[চার]

তাহার পরদিন সকাল হইতে-না-হইতেই বিমল হাসপাতালে গিয়া হাজির হইল। সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে, সাতটা হইতে হাসপাতালের কাজকর্ম আরম্ভ হওয়ার কথা। বিমল গিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল জান্‌কী ঘর ঝাড়ু দিতেছে। বিমল প্রথমেই গিয়া বুড়িটাকে দেখিল, বুড়ি ভাল আছে। তাহার পর কালাজ্বর রোগীটাকে সে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, ইহার রক্ত, মলমূত্র সমস্তই পরীক্ষা করা দরকার, তাহার তো নিজেরই মাইক্রোসকোপ আছে, সহজেই করিতে পারিবে। জান্‌কীকে ইহার মলমূত্র রাখিতে আদেশ করিল।

—তোমার কি কষ্ট হয়?

—আমার পেটটা বড্ড ব্যথা করে বাবু, পিলেটা কামড়ায় বড্ড।

—সেইজন্যে বুঝি সন্ধ্যের সময় চেঁচাচ্ছিলে সেদিন।

—না, চেঁচাই না তো কোন দিন আমি, জান্‌কীকে জিজ্ঞেস করুন আপনি। পিলেটা বড্ড কামড়ায় থেকে থেকে, তাই একটু উঁ আঁ করি।

—আচ্ছা, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমার, ভাল হয়ে যাবে।

—আমার পেটের ব্যথার একটুকু ভাল ওষুধ দিন বাবু।

—আচ্ছা।

দ্বারপ্রান্তে অ্যাপ্রেন্টিস্ ড্রেসার—দুলু আসিয়া দর্শন দিল এবং বিমলকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুলু আঠার-উনিশ বছরের ছোকরা, শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে বেশ একটা বিনীত অথচ সপ্রতিভ ভাব। প্রথম দিন দেখিয়াই বিমলের ইহাকে ভাল লাগিয়াছিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—কম্পাউণ্ডারবাবু কোথায়?

—গঙ্গা নাইতে গেছেন।

—তাঁকে খবর পাঠাও, সাতটা তো বাজে! ঠিক সময় কাজ আরম্ভ করতে হবে!

দুলু বলিল—আচ্ছা।

সে বাহিরে চলিয়া গেল এবং সম্ভবত কম্পাউণ্ডারবাবুর বাসাতেই গেল।

বিমল হাসপাতালটা আর একবার ভাল করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। ছোটখাট হাসপাতালটি বেশ সুন্দর।

সাতটার সময় কাজ আরম্ভ হইল না। গুপিবাবু ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছাইতে পারিলেন না। তিনি গঙ্গাস্নানাদি সারিয়া টিকিতে ফুল বাঁধিয়া ও কপালে চন্দনের তিলক কাটিয়া যখন হাজির হইলেন তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে।

বিমল মনে মনে চটিয়াছিল, তথাপি ভদ্রভাবেই বলিল—বড্ড দেরি হয়ে গেল আপনার। কাল থেকে কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে হবে।

গুপিবাবু তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চশমার কাচের উপর দিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর দিলেন না, হাসপাতালের রেজিস্টারখানা লইয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া রুল টানিতে লাগিলেন। বারান্দায় দুলু জান্‌কীর সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ পাকাইতেছিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—এখানে ন-টার আগে কোন রুগীই আসে না।

বিমল দৃঢ়স্বরে বলিল—রুগী আসুক না আসুক, সকালে সাতটা থেকে এগারটা পর্যন্ত, আর বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হাসপাতাল খুলে রাখতে হবে।

গুপিবাবু রুল টানিতে টানিতে চশমার ফাঁক দিয়া আর একবার বিমলের মুখের পানে চাহিলেন, কিছু বলিলেন না।

বিমল নীরবে বসিয়া একটি সিগারেট ধ্বংস করিল এবং তারপর উঠিয়া নিজেই বুড়ির ঘা-টা ড্রেস করিল। সত্যই ন-টার আগে কোন রোগী আসিল না। যাহারা আসিল, তাহারাও অতিশয় বাজে রোগী। দাদ, খোস, কানে পুঁজ, কয়েকটা ম্যালেরিয়া—অতিশয় সাধারণ রকম জন পনের দীন দরিদ্র রোগী। বিমল তাহাদেরই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রেসকৃপশন দেখিয়া গুপিবাবু অবাক হইলেন। এসব ঔষধ হাসপাতালে থাকে নাকি! বিমলকে কয়েক বারই প্রেসকৃপশন পরিবর্তন করিতে হইল। সে মনে মনে দমিয়া গেল। ঔষধ না থাকিলে চিকিৎসা করিবে কিরূপে! সে হাসপাতালের ঔষধের স্টক-বহিটা লইয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল, কিছুই ঔষধ নাই। অসাধারণ ঔষধের কথা দূরে থাক, অতি সাধারণ ঔষধই নাই, কুইনাইনই যৎসামান্য আছে। প্রকাশবাবুর একটা কথা মনে পড়িল—থাকুন এখানে কিছুদিন সব বুঝতে পারবেন ক্রমশ। আপনি অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছেন, আপনাকে হতাশ করে দিতে চাই না।

একটু পরে কিন্তু আরও হতাশ হইতে হইল। হাসপাতালের সেক্রেটারির নামে বি. কে. পালের এক চিঠি আসিল। চিঠির মর্ম এই যে, হাসপাতালের নিকট বি. কে. পালের এখনও পাঁচ শত টাকা পাওনা আছে, তাহা যেন অবিলম্বে শোধ করিয়া দেওয়া হয়। বিমল সত্যই অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। যে-হাসপাতালের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয়, যেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ পর্যন্ত নাই, সেখানে সে ডাক্তারি করিবে কি লইয়া? টং টং করিয়া এগারটা বাজিল। বিমল প্রত্যাশা করিয়াছিল অমর আসিবে, কিন্তু আসিল না। সে উঠিতে যাইবে, এমন সময় উর্ধ্বশ্বাসে একটি লোক আসিয়া বলিল—ডাক্তারবাবু নন্দী মশায় ডাকছেন আপনাকে একবার।

—কেন?

—তাঁর বাড়িতে ডেলিভারী কেস্ আছে, লেডী ডাক্তার এসেছেন, ভূধরবাবু এসেছেন, জগদীশবাবুকে পেলাম না, আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।

—চলুন।

বিমল গিয়া দেখিল নন্দী মহাশয়কে দুই জন ভৃত্য পূর্ববৎ বাতাস করিয়া চলিয়াছে। তিনি ঘরের মধ্যে চৌকিতে একটি শীতলপাটির উপর উপবেশন করিয়া ক্রমাগত ঘামিতেছেন। নিকটে ভূধরবাবুও বসিয়াছিলেন। ভূধরবাবুকে বিমল ইতিপূর্বে দেখে নাই, নন্দী মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন। বিমল দেখিল, ভূধরবাবুর বয়স খুব বেশী নয়, খুব ফরসা রং, বেঁটে খাটো মানুষটি, দেখিলেই কেমন যেন দাম্ভিক বলিয়া মনে হয়। নাসারন্ধ্র সর্বদাই যেন স্ফীত, ভ্রূযুগল সর্বদাই যেন ঈষৎ উত্তোলিত, অধরে কেমন যেন একটা ব্যঙ্গ-তিক্ত হাস্য। অদূরে আর একটি চেয়ারে প্রৌঢ়া লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিকও বসিয়া আছেন। বিমল তাঁহাকেও নমস্কার করিয়া আর একটি চেয়ারে বসিল।

নন্দী মহাশয় বলিলেন—জগদীশবাবু এসে পড়লেও বেশ হত।

—জগদীশবাবুকে পাওয়াই মুস্কিল, তাঁর নাইবার-খাবার অবসর নেই।

ভূধরবাবু বলিলেন—নাইবার-খাবার আমারও অবসর নেই। কিন্তু আপনার বাড়িতে অসুখের খবর পেয়ে আসতেই হল। ওপারে দু-দুটো আর্জেন্ট কেস বসে আছে আমার জন্যে, তাছাড়া এই দেখুন না—

ভূধরবাবু পকেট হইতে একটা ফর্দ বাহির করিয়া গণিতে লাগিলেন, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—এটা না হয় ও-বেলা গেলেও চলবে, ছয়, সাত; আট—এটা তো এ-বেলা যেতেই হবে—নয়—দশ—

বিমলের কেমন অস্বস্তি হইতে লাগিল, বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিত ইহা আর কিছু নয় হিংসা।

বিমল নির্বিকার হইবার ভান করিয়া বলিল—পেনটা হচ্ছে কতক্ষণ থেকে—

নন্দী মহাশয় বলিলেন—ঘিনঘিনে ব্যথা কাল সকাল থেকে হচ্ছে, মেয়েরা বলছে জিরেন ব্যথা, আপনারা দেখুন।

ভূধরবাবু বলিলেন—ফরসেপ্‌স্ দিয়ে টেনে বের করে দিলেই চুকে যায়, অনর্থক কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

বিমল আশ্চর্য হইয়া গেল। বলে কি! তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী ফরসেপ্‌স তো শেষ উপায়। ফরসেপ্‌স্ দেওয়ার হাঙ্গামা তো আছেই, বিপদও কম নয়।

সে বলিল—আমার মনে হয় ঘুমের একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক প্রথমে। এইটেই কি প্রথম বার?

নন্দী মহাশয় বলিলেন—না এটি তৃতীয়।

—এর আগের দু-বার তো কোন গোলমাল হয় নি?

—না।

ভূধরবাবুর দিকে চাহিয়া বিমল বলিল—একটা ব্রোমাইড মিকশ্চার দিয়ে দেখা হয়েছে কি?

ভূধরবাবু একটু বিচিত্র রকমের হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমি সেকথা ভাবিনি ভাবছেন? এসেই এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়েছি আমি। এদের আবার বৈষ্ণবী ধাত কি না?

বিমল হাসিয়া কহিল—ও তাই নাকি, —কিন্তু ব্রোমাইডে তো কোন আমিষ নেই—

লেডী ডাক্তার মিসেস্ মল্লিক এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—ব্রোমাইড দিয়ে দেখতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় ফরসেপ্‌স্ দিতে হবে শেষ পর্যন্ত!

বিমল বলিল—দেখা যাক্ না, ডাইলেটেশন কত দূর হয়েছে?

মিসেস্ মল্লিক বলিলেন—তা প্রায় পুরো হয়ে গেছে।

নন্দী মহাশয় চুপ করিয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন—জীবনের কোন আশঙ্কা নেই তো?

মিসেস্ মল্লিকই রোগী পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বলিলেন—না সে রকম কোন ভয় নেই!

—তাহলে আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু যা বলেছেন তাই দিয়েই দেখা যাক না, ফরসেপ্-

মরসেফ আসুরিক ব্যাপার পরেই হবে না হয়, অবশ্য যদি দরকার বোধ করেন। আপনি বিমলবাবু যান একবার দেখে আসুন নাড়ীটা। ভূধরবাবু আপনিও আর একবার যান—ভূধরবাবুর সহিত বিমল ভিতরে প্রবেশ করিল। রোগী দেখিয়া তাহার মত আরও দৃঢ় হইল, ফরসেপ্‌স্ দেওয়া উচিত নয়। বাহিরে আসিয়া সে ব্রোমাইডেরই ব্যবস্থা করিল এবং নন্দী মহাশয়ও সেদিকে ঝুঁকিয়াছেন দেখিয়া ভূধরবাবুও তাহা সমর্থন করিলেন। লেডী ডাক্তার যদিও মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ফরসেপ্‌স্ লাগানো হইলে অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা তাঁহার প্রাপ্য হইত। পঞ্চাশ টাকার বদলে মাত্র চারটি টাকা লইয়া তাঁহাকে আপাতত উঠিতে হইল। লেডী ডাক্তার চলিয়া গেলে ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল লক্ষ্য করিল ভূধরবাবু ফী'র সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তুলিলেন না। বিমল যখন উঠিতে যাইতেছে, নন্দী মহাশয় মুখে একটা বিনীত ভাব ফুটাইয়া বলিলেন—আপনার দক্ষিণেটা কত বলুন, আনিয়ে দি—

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক সে পরে হবে এখন—

এক মুখ হাসিয়া নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিলেন।

বিমল চলিয়া যাইবার একটু পরেই ব্যস্তসমস্তভাবে জগদীশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—শুনলাম নাকি রমেনের স্ত্রীর কাল থেকে বড় কষ্ট হচ্ছে?

নন্দী মহাশয় বলিলেন—হাঁ কষ্ট হচ্ছে বৌমার, আপনি এলেন বাঁচলাম। দুবার লোক পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে। লেডী ডাক্তার আর ভূধরবাবু ফরসেপ্ লাগাতে চাইছিলেন, নতুন ডাক্তারবাবু বললেন আগে একটা ওষুধ দিয়ে দেখা যাক, এই লিখে দিয়ে গেছেন তিনি দেখুন—

নন্দী মহাশয় বিমলের প্রেস্‌কৃপশনটি জগদীশবাবুকে দিলেন।

জগদীশবাবু প্রেস্‌কৃপশনটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেখিলেন ও গম্ভীর ভাবেই ফেরত দিলেন।

নন্দী মহাশয় পিছনের ভৃত্যদ্বয়কে ধমক দিলেন—ঢুলছিস নাকি ব্যাটারা, জোরে বাতাস কর—জগদীশবাবু এই এইখানায় বসুন আপনি হাওয়া পাবেন, তার পর কি রকম দেখলেন প্রেস্‌কৃপশনটা—

—আমাদের কেতাব-কোরাণ অনুসারে ঠিকই। তবে বউমার ধাত আমি চিনি কি না, তাই এই ওষুধটার ডোজটা একটু কমিয়ে দিতে চাই।

—দিন।

জগদীশবাবু ব্রোমাইডের ডোজটা একটু কমাইয়া দিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটা উঁকি মারিতে লাগিল।—বুড়ো মানুষের একটা কথা শুনবেন?

—কি বলুন।

—চণ্ডীতলা থেকে একটু মাটি নিয়ে এসে পানাপুকুরের জলে গুলে পেটে বেশ করে একটি প্রলেপ দিইয়ে দিন। বড় বড় লেবার কেস যেখানে কিছুতে হালে পানি মেলে না, সেখানে ঐ চণ্ডীতলার মাটি মুখ রক্ষে করেছে। ওষুধটা চলুক, কিন্তু প্রলেপটাও দিন।

চণ্ডীতলার মাটি আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিল।

কয়েক দিন হইল বিমল নিজের বাসায় আসিয়াছে। নিজের আলাদা একটি চাকরও রাখিয়াছে, কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড, রান্নাবান্না হইতে শুরু করিয়া সব কাজকর্ম সে নিপুণভাবে করে। পরেশ-দাই চাকরটি জোগাড় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পিওন হরেনের ভাই যোগেন। সনাতন রীতি, হাসপাতালের চাকরই ডাক্তারবাবুর বাসায় কাজ করিয়া থাকে। এই সনাতন রীতির ব্যতিক্রম হওয়াতে হাসপাতালের চাকর ভৈরব মনে মনে যৎপরোনাস্তি চটিয়াছিল। এত দিন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কাজ করার ওজুহাতে সে হাসপাতালের কাজে ফাঁকি দিত, ডাক্তারবাবুর বাজার-হাট করিয়া দিয়া দুই পয়সা উপরি রোজগার করিত, ডাক্তারবাবুর নিকট কিছু বেতনও পাইত। এই অদ্ভুত ধরনের নতুন ছোকরা ডাক্তারবাবুটি আসাতে সমস্তই ওলট-পালট হইয়া গেল। সে বিমলের নামে সুযোগ পাইলেই গোপনে একটু-আধটু নিন্দা করিতে লাগিল। কম্পাউণ্ডার গুপিবাবুও চটিয়াছিলেন। বিমলের কড়া হুকুম অনুসারে তাঁহাকে ঠিক ঠিক সময়ে হাসপাতালে হাজির হইতে হইতেছিল। এ তো বিপদ কম নয়! হাসপাতালের রোগী ঔষধ কিছু নাই, শুধু সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করা। সকালবেলায় গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা-আহ্নিকটা কোনক্রমে নমোনমো করিয়া সারিয়া ফেলিতে হয়, বৈকালে ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাগ্দী-পাড়ায়, কুলি-পাড়ায়, মুসলমান-পাড়ায় ঘুরিয়া চার আনা আট আনা দক্ষিণা লইয়া একটু-আধটু প্র্যাকটিস তিনি করিতেন—তাঁহাকে দুই-চারি আনা পয়সা দিলে হাসপাতাল হইতে দামী ঔষধ ভাল করিয়া 'মন দিয়া' তিনি প্রস্তুত করিয়া দিবেন এই ভরসায় অনেক গরীব লোকই তাঁহাকে ডাকিত! 'সেদিনকার ছোঁড়া' এই ডাক্তারটা আসিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়কে বলিয়া ইহার একটা বিহিত করার প্রয়োজন গুপিবাবু অনুভব করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় হাসপাতাল-কমিটির একজন মেম্বার তো বটেনই, অন্যান্য মেম্বারদের উপরও তাঁহার আধিপত্য আছে। ধনী মহাজন তিনি অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখেন। বদিবাবুর মতন 'দুঁদে' লোকও চৌধুরীকে চটাইতে সাহস করেন না। নানাকারণে চৌধুরী মহাশয় গুপিবাবুর উপর প্রসন্ন। গুপিবাবু তাঁহার বাড়ির পুরোহিত, অসুখ-বিসুখ করিলে নার্স, প্রতি সন্ধ্যায় পাশাখেলার সহচর এই সর্বোপরি সুদক্ষ মোসাহেব। সুতরাং কম্পাউডার হইলেও গুপিবাবু নিতান্ত অক্ষম লোক নহেন, ইচ্ছা করিলে অনেক কিছুই তিনি করিতে পারেন। অনেক ডাক্তার তিনি চরাইয়াছেন।

বিমল যদিও মনে মনে গুপিবাবুর বিরুদ্ধভাবটা অনুভব করিতেছিল, কিন্তু সেজন্য তাহার বিশেষ চিন্তা ছিল না। সে সেদিন সন্ধ্যায় শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল কি করিয়া হাসপাতালে কিছু ঔষধ যোগাড় করা যায়। ঔষধ না থাকিলে সে চিকিৎসা করিবে কি দিয়া। নন্দী মহাশয়ের বাড়িতে সেদিন যে প্রেসকৃপশন লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিল তাহাতেই কাজ হইয়াছে, ফরসেপ্‌স্‌ লাগাইতে হয় নাই। জগদীশবাবুর চণ্ডীতলার মাটি এবং ভূধরবাবুর হোমিওপ্যাথির ফোঁটা যে তাহার কৃতিত্বের খানিকটা হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। চণ্ডীতলার কথা সে শোনে নাই। তাহার মনে হইল নন্দী মহাশয়ের নিকট গিয়া হাসপাতালের দুরবস্থার কথা খুলিয়া বলিলে হয়তো তিনি কোন ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। সে উঠিয়া পড়িল। পরেশ-দাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এখনই একবার গেলে হয়। কাল সমস্ত দিন হাসপাতালের কাজেকর্মে অবসর পাওয়া যাইবে না। পোস্টাফিসে গিয়া

দেখিল পরেশ-দা নাই, তিনি সারস্বত মন্দিরের মাসিক অধিবেশনে গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন ঠিক নাই। বিমল একাই নন্দী মহাশয়ের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

—আসুন আসুন ডাক্তারবাবু!

নন্দী মহাশয় ঝুঁকিয়া নমস্কার করিয়া বিমলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বিমল উপবেশন করিয়া বলিল—রমেনবাবুর স্ত্রী ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আর কোন গোলমাল হয় নি, বেশ ভাল আছে।

ইহার পরই বিমল মনে মনে প্রত্যাশা করিতেছিল যে নন্দী মহাশয় তাহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—চা আনতে বলব, না সরবত?

—চা-ই আনতে বলুন।

চায়ের ফরমাস দিয়া নন্দী মহাশয় বলিলেন—এই নিদারুণ গ্রীষ্মে কি করে যে আপনারা চা খান তাই আমি ভাবি। আমার রমেনেরও ঐ সকাল-বিকাল চা চাই—

চা-পানান্তে বিমল আসল কথাটা খুলিয়া বলিল। সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া নন্দী মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

—তাই নাকি? এই রকম অবস্থা হাসপাতালের?

—একটুও বাড়িয়ে বলছি না আমি।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নন্দী মহাশয় বলিলেন—আপনার আগে যে ডাক্তারটি ছিলেন অত্যন্ত চণ্ডাল লোক ছিলেন তিনি মশাই, শুনতাম ঘরে বসে বসে ব্যাঙ-খরগোস চিরতেন, জ্যান্ত ধরে ধরে চিরতেন—এদিকে হাসপাতাল একেবারে দেখতেন না, তিনিই ডুবিয়ে গেছেন হাসপাতালটাকে সম্পূর্ণরূপে—

বিমল বলিল—কিন্তু তিনি বিদ্বান লোক ছিলেন।

—যে বিদ্যেতে জীবে দয়া করার প্রবৃত্তি লোপ পায় তেমন বিদ্যে শেখার প্রয়োজনটা কি তাই আমাকে বুঝিয়ে বলুন?

বিমল বুঝিল, নন্দী মহাশয়কে বুঝানো অসম্ভব। সে চেষ্টা করিল না, মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। নন্দী মহাশয় গড়গড়ার নলে চক্ষু বুজিয়া টান দিতে দিতে বলিলেন—জীবে দয়াটাই হল গিয়ে পরম ধর্ম, সব শিক্ষার মূল কথা।

বিমল বলিল—তা তো ঠিকই! হাসপাতালের গরিব রোগীদের দেখলে কষ্ট হয়, বিশেষত তাদের যখন একটু ভাল ওষুধ দিতে পারি না, তখন সত্যি বলছি বড় খারাপ লাগে! আপনার দয়ায় হাসপাতালের ইন্‌ডোর রুগীগুলো তবু খেতে পায়—

নন্দী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

বিমল বলিতে লাগিল—কিন্তু ওষুধটা না থাকলে চিকিৎসা করব কি, এমন কি কুইনিন পর্যন্ত নেই—

নন্দী মহাশয় চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—ওটা তো শুনেছি ভয়ানক পয়জন, ওটা যত কম খায় লোকে ততই ভাল। ঐ কুইনিন খেয়েই দেশের লোকগুলো আরও জরাজীর্ণ হয়ে গেল মশাই যাই বলুন আপনারা!

বিমল নন্দী মহাশয়ের ধাত বুঝিয়াছিল, কিছু বলিল না।

কানে-কলম-গোঁজা প্রৌঢ় এক ব্যক্তি একটি খেরোর খাতা হস্তে প্রবেশ করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন—চরণ ঘোষের খাজনাটার সুদটা কি—

নন্দী মহাশয় অধীর ভাবে উত্তর দিলেন—কত বার বলব এক কথা! বাপ-পিতামহের বিষয়টা কি উড়িয়ে দিতে বল আমাকে দানছত্তর করে?

কানে-কলম-গোঁজা ব্যক্তি নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যেন কিছুই হয় নাই, নন্দী মহাশয় পুনরায় প্রশান্তভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। ক্ষণকার পরে বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বেশ মাথায় রইল আপনার কথাটা, এবারকার মিটিঙে দেখব চেষ্টা করে যদি কিছু করতে পারি। আসল কথা কি জানেন, ট্যাক্স আদায় হয় না। আমাদের যে ঐ ট্যাক্স-কালেক্টারটি আছে অতি হারামজাদা ব্যক্তি সে। লোকের কাছ থেকে দু চার পয়সা ঘুষ-টুস খায়—একটি পয়সা আদায় করে না। অথচ ওর গায়ে হাত দেবার জো নেই—বদিবাবুর মক্কেলের দালাল উনি।

নন্দী মহাশয় এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন—বদিবাবুর কানে আবার কথাটা যেন না ওঠে দেখবেন. পার্টির লোক, ওঁকে চটানো মুস্কিল!

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল—আমি কাউকে কিছু বলব না।

নন্দী মহাশয় আরও কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন তাহার পর বলিলেন—কত ডিফিকালটি যে মশাই তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। যাক্ আপনি ভাল লোক যখন এসেছেন ওষুধ-বিষুধের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

আরও দুই-চারি কথার পর বিমল বিদায় লইল। অন্ধকার একটা সরু গলি দিয়া বিমল আসিতেছিল। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল। হাসপাতালকে সে যদি ঠিক মত খাড়া করিয়া তুলিতে পারে পসার জমাইতে দেরি হইবে না। ভূধরবাবু এবং জগদীশবাবুর যেরূপ কলের বহর দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'ফিল্ড্' তো নিতান্ত ছোট বলিয়া মনে হয় না। হঠাৎ একটা উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে কয়েকটি কথা ভাসিয়া আসিয়া বিমলের কানে প্রবেশ করিল। উৎকর্ণ বিমল দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। অচেনা দুই জন লোক ঘরের ভিতর কথা বলিতেছিল।

হাসপাতালের নূতন ডাক্তারটি ছোক্‌রা হলে কি হয়, ডাক্তার ভাল।

—একের নম্বর ধড়িবাজ।

—না না, হরেনবাবু ওকথা বলবেন না। স্টেশন থেকে একটা বুড়িকে কুড়িয়ে এনে নিজের পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করে ভাল তো করেছে। আপনাদের হাসপাতালে তো ওষুধপত্তর কিছু নেই!

—ওসব চাল মশাই! এক চালে বাজি মাৎ করবে ভেবেছে, অত সহজে ভোলবার ছেলে হরেন বোস নয়।

—আমার সঙ্গে অবশ্য এখনও বিশেষ পরিচয় হয় নি, কিন্তু আমার চাকরটা তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে দেখাতে গিছল, খুব যত্ন করে দেখেছে নাকি, খুব সুখ্যাতি করছিল সে।

হরেনবাবু বলিলেন—অতিশয় চালিয়াৎ লোক মশাই, গুপিবাবুর কাছে শুনলাম এমন সব

প্রেসকৃপশন করে যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। চাল দেখাবার জন্যে নানারকম বিদ্‌ঘুটে প্রেসকৃপশন লেখে। সব বুঝি মশাই।

বিমল আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। এই হরেন বোসই কি তাহাদের হাসপাতাল-কমিটির মেম্বার? ইহার কথাই কি পরেশ-দা বলিয়াছিলেন! ভয়ানক লোক তো!

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল স্বয়ং বদিবাবু তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। প্রকাশবাবুর হাতল-ভাঙা চেয়ারটি ভৃত্য যোগেন বারান্দায় বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহারই উপর বদিবাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

—ডাক্তারবাবু নাকি, বেড়িয়ে ফিরলেন বুঝি?

—নন্দী মহাশয়ের কাছে গি২লাম।

—তাঁর পুত্রবধূটির খবর ভাল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারই ওষুধে দেখলাম উপকার হয়েছে!

—আপনি কি করে দেখলেন?

স্মিতহাস্য করিয়া বদিবাবু বলিলেন—রাজা কর্ণেন পশ্যতি! চার দিকে চোখকান খুলে রাখতে হয়।

বিমল চুপ করিয়া রহিল। বদিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন—আপনি কি খুব ক্লান্ত?

—না, কেন বলুন তো?

—এক জায়গায় যেতে হবে, একটু দূর আছে।

—বেশ চলুন।

—এখুনি তৈরী?

—তা নয় তো কি?

—বাঃ এই তো চাই, চলুন।

—কতক্ষণ দেরি হবে?

—ঘণ্টা দুই-আড়াই, ওপারে গিয়ে মোটরে করে মাইল চারেক। ওপারে সতীশবাবু জমিদার আছেন তাঁদেরই বাড়িতে।

—কারও অসুখ নাকি?

—অসুখ আছে এক জনের, সতীশবাবুর ভায়ের, এ অঞ্চলের ডাক্তারই দেখেছেন কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না! প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। তাছাড়া আরও একটা কাজ আছে।

—কি?

—ওঁদের জমিদারীতে একটা ফৌজদারী হয়ে গেছে; একটা লোক মারাও গেছে, তারই পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আজ নাকি পেয়েছেন ওঁরা, তাই আমাকে যেতে লিখেছেন একবার। মোটর পাঠিয়েছেন, আপনাকে দিয়ে রিপোর্টটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই, কি ভাবে জেরা করলে সুবিধে হবে।

—বেশ চলুন। দাঁড়ান, আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে নি।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বদিবাবুকে বলিল—আমাদের হাসপাতালে ওষুধ কিচ্ছু নেই, তার একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনি। এই কথা বলতেই নন্দী মহাশয়ের কাছে গেছলাম আমি।

—কি বললেন তিনি?

—তিনি বললেন, আগামী মিটিঙে কথাটা পাড়বেন।

—মিটিঙে পেড়ে তো সবই হবে, টাকা কই, ওষুধের দোকানের ধারই এখনও শোধ হয় নি।

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর বদিবাবু প্রশ্ন করিলেন—কত টাকার ওষুধ হলে চলে আপনার আপাতত?

—কিছুই তো নেই, শ-পাঁচেকের কম হলে কি করে চলবে?

—পাঁচশ টাকা! বলেন কি মশাই?

—কিছুই ওষুধ নেই যে?

—দেখি।

সতীশবাবুর ভাইকে পরীক্ষা করিয়া তাহার কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হইল।

সতীশবাবু শুনিয়া বলিলেন—সে কি মশাই, কালাজ্বর শুনেছি আসাম অঞ্চলে হয়, কুলিদের।

বিমল হাসিয়া বলিল—আজকাল সর্বত্রই হয়।

—ভদ্রলোকদেরও?

—হ্যাঁ।

সতীশবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—তাহলে উপায়?

—রক্তটা আজ নিয়ে যাই, পরীক্ষা করে তার পরে ঠিক জানাব।

—রক্ত কি আপনিই পরীক্ষা করবেন? আপনার কি সব যন্ত্রপাতি—

—এর জন্যে যা দরকার তা আমার আছে।

বদিবাবু সস্মিত দৃষ্টিতে সতীশবাবুর দিকে চাহিলেন। বিমলের রক্ত পরীক্ষা করিবার সমস্ত সরঞ্জাম আছে এ কৃতিত্ব যেন তাঁহারই।

সতীশবাবু বলিলেন—সিভিল সার্জন একবার দেখেছিলেন, তিনিও রক্ত পরীক্ষার কথা বলেছিলেন, কিন্তু জগদীশবাবু মানা করলেন বলে আর হয় নি। বললেন, এমনই শরীরে রক্ত নেই, পরীক্ষা করে আবার খানিকটা রক্ত নষ্ট করে লাভ কি? রক্ত নিলে আবার কোন অনিষ্ট-টনিষ্ট হবে না তো? দেখছেন তো কি রকম দুর্বল!

—না কোন অনিষ্ট হবে না।

বিমলের কথায় যতটা না হউক বদিবাবুর আগ্রহে সতীশবাবু অবশেষে রক্তপরীক্ষা করাইতে রাজি হইলেন।

রক্ত লইবার সময় সমারোহ ব্যাপার পড়িয়া গেল। একজন মাথায় হাওয়া করিতে

লাগিল, সতীশবাবু ও বদিবাবু দুইজনে দুই পাশে দাঁড়াইয়া রোগীকে ভরসা দিতে লাগিলেন, সতীশবাবুর মা পূজার ঘরে গিয়া সভয়ে ঠাকুরদেবতার শরণাপন্ন হইলেন, বাড়ির কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা উৎসুক হইয়া দ্বারপ্রান্তে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বাড়ির চাকর-দাসীদের মুখেও একটা সশঙ্ক ভাব ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিমলও একটু ঘাবড়াইয়া গেল। রোগীর তো কথাই নাই, তিনি চোখ বুজিয়া নির্জীবের মত পড়িয়া রহিলেন। ভগবানের কৃপায় নির্বিঘ্নেই সমস্ত হইয়া গেল, কোনরূপ অঘটন ঘটিল না। বিমল রক্ত লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

সতীশবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—একটু দুধ খাইয়ে দেওয়া যাক্, কি বলেন?

—দিন।

—একটু ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দেব তার সঙ্গে?

—ব্র্যাণ্ডি আছে বাড়িতে?

সতীশবাবু ও বদিবাবুর একটা দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল।

সতীশবাবু বলিলেন—আছে।

—দিন তাহলে এক চামচে।

এ ব্যাপার চুকিয়া গেলে বিমল পোস্টমর্টেম রিপোর্টখানা আদ্যোপ্রান্ত পড়িল এবং কি ভাবে জেরা করিলে বদিবাবুর সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া দিল।

সব চুকিয়া গেলে সতীশবাবুর আগ্রহাতিশয্যে বিমলকে আহারটাও তাঁহারই বাড়িতে সমাধা করিতে হইল। সতীশবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, বদিবাবুও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আহার শেষ করিয়া ফিরিতে বিমলের বেশ দেরি হইয়া গেল। বিমল যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। এত রাত্রে বাড়ি আসিয়াও কিন্তু বেচারা ঘুমাইতে পারিল না। আসিয়াই শুনিল হাসপাতালে শক্ত একটা রোগী আসিয়াছে। ভৃত্য যোগেন খবরটি দিল। বিমলকে তখনই আবার হাসপাতালে ছুটিতে হইল।

বাউরিদের একটি বউ আপিং খাইয়াছে।

অল্পবয়সী এই মেয়েটির মনে কি এমন গভীর ধিক্কার হইল যে সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! বিমল যথারীতি সমস্ত ব্যবস্থাই করিল, গলার ভিতর দিয়া রবারের নল চালাইয়া ঔষধ দিয়া সমস্ত পেটটা বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া দিল, একটি ইনজেকশন দিল এবং গুপিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কফি কোথাও পাওয়া যাবে?

—কফি? আজ্ঞে, না।

—কারও বাড়িতে নেই? ঠিক ঠিক, পরেশ-দার কাছে আছে। এই জান্‌কী, যা তো নিয়ে আয় চেয়ে আমার নাম করে।

জান্‌কী চলিয়া গেল।

বিমল তখন বাউরি-বউয়ের আত্মীয়স্বজনকে (অনেকেই আসিয়াছিল) আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে কেহই কিছু বলিতে চায় না। অনেক জিজ্ঞাসা করার পর একটি বৃদ্ধা চুপি চুপি বলিল যে, দুখীরাম অর্থাৎ ঐ মেয়েটির স্বামীই ইহার জন্য দায়ী। বিবাহ হইবার পর

হইতে সে সুন্‌রিকে অর্থাৎ ঐ বউটিকে কিছু তো কিনিয়া দেয়ই নাই, উপরন্তু উহার গহনাগুলি সব বিক্রয় করিয়া সেদিন জমিদারের খাজনা এবং কাবুলিওলার ধার শোধ করিয়াছে। বেচারি সুন্‌রি লুকাইয়া লুকাইয়া সংসার-খরচের টাকা হইতে জমাইয়া দুই টাকা অতিকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল একটি রঙীন শাড়ি কিনিবে কিন্তু আজ সন্ধ্যায় দুখীয়া তাহাও ছিনাইয়া লইয়া গিয়া তাড়ি-মদে সে টাকা দুইটি নিঃশেষ করিয়াছে। সুতরাং সুংরি আপিং না খাইয়া করিবে কি? সত্যই তো, শাড়ি কেনার টাকা দিয়া তাড়ি কেনা ভয়ানক অন্যায় কার্য। বিমল সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং বলিল যে, কাল দুখীরামকে ডাকাইয়া সে উহার প্রতিবিধান করাইবার চেষ্টা করিবে।

জান্‌কী কফি আনিয়া হাজির করিল। সুন্‌রিকে খানিকটা কড়া কফি পান করাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার আদেশ দিয়া বিমল বাসায় ফিরিয়া গেল।

বাসায় গিয়া দেখিল পরেশ-দা বসিয়া আছেন! হাসিমুখে বলিলেন,—তোমার জ্বালায় তো অস্থির দেখছি, শখ করে এক টিন কফি কিনে রেখেছিলাম, সব শেষ করে দিলে তো?

—না, আছে এখনো খানিকটা।

—এই নাও আজ সন্ধ্যার ডাকে এসেছে—সম্ভবত 'হার ম্যাজেস্টিজ' চিঠি—ভাবলাম দিয়ে যাই।

বিমল দেখিল সত্যই মণিমালার চিঠি।

—সন্ধ্যাবেলা কোথায় গিছলে? সারস্বত মন্দিরের ফেরত এসেছিলাম একবার।

—একটা কলে গেছলাম, ওপারে।

—জমিয়েছ বল! উঠি এবার, ঘুমোও তুমি।

পরেশ-দা চলিয়া গেলে বিমল মণির চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। অন্যান্য নানা কথার পর মণি লিখিয়াছে, "তুমি অমন একটা বিচ্ছিরি কাগজে চিঠি লিখেছ কেন? ভাল দেখে প্যাড কিনো একটা। সবাই আমাকে ঠাট্টা করছিল এমন!" বিমল একটু হাসিল, নিশ্চিন্তও হইল, মণি ভালভাবেই পরীক্ষা দিয়াছে।

মানুষের কপাল যখন খোলে তখন সবদিকেই সবরকম সুবিধা হয়। সতীশবাবুর ভায়ের শেষ পর্যন্ত কালাজ্বরই সাব্যস্ত হইল এবং সতীশবাবুর পরিচিত মহলের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ও অঞ্চল হইতে দুই-একটি দুরারোগ্য রোগীও আসিয়া হাজির হইল। বদিবাবু চাটুয্যে-মহিমায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। হাসপাতালের ঔষধের কিন্তু সুরাহা হইল না। নন্দী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার পর হাসপাতাল-কমিটির একটা মিটিং হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই। তাঁহারা এ-সম্পর্কে যে দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন আপাত-দৃষ্টিতে সেগুলি আশাপ্রদ হইলেও আসলে কিছুই নয়। একটি প্রস্তাব এই, হাসপাতাল-কমিটি মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাহারা যেন অবিলম্বে ঔষধ বাবদ কিছু টাকা হাসপাতালে দেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই যে, সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হউক তিনি যেন সদর হাসপাতাল হইতে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ এই হাসপাতালে ঋণ স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে টাকা নাই, সুতরাং প্রথম প্রস্তাবটিতে যে অনুরোধ করা হইয়াছে তাহা পালন করিতে মিউনিসিপ্যালিটি অসমর্থ।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হয়তো কার্যকরী হইতে পারিত কিন্তু বিমল শুনিল যে বর্তমানে যিনি সিভিল সার্জন তিনি নানা কারণে জগদীশবাবুর করায়ত্ত। প্রথমত স্বজাতি, দ্বিতীয়ত এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন, তৃতীয়ত প্রায়ই তাঁহাকে মোটা টাকার 'কল' পাওয়াইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি এমন কিছুই করিবেন না যাহা জগদীশবাবুর স্বার্থহানিকর। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বিমলের যেরূপ নামডাক শোনা যাইতেছে তাহাতে জগদীশবাবু মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন বই কি। মুখে অবশ্য তিনি বিমলকে সহাস্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে যাহাতে সদর হাসপাতাল হইতে ঔষধ পাওয়া যায় তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন। পরেশদা বলিলেন—চেষ্টা উনি অবশ্যই করবেন, কিন্তু তাহা অন্যপ্রকার। পরেশ-দার কথাই ফলিল; কয়েক দিন পরে সিভিল সার্জন উত্তর দিলেন যে, ঋণ দিবার মত বাড়তি ঔষধ সদর হাসপাতালে অথবা তাঁহার নিজের ভাণ্ডারে নাই।

কোন দিকেই যখন আশার আলোক দেখা যাইতেছে না তখন অপ্রত্যাশিত রকম একটা সম্ভাবনার সচনা লইয়া অমর আসিয়া হাজির। সেদিনের পর অমরের সহিত আর দেখা হয় নাই। বিমল ভাবিতেছিল নিজেই আর একদিন অমরের কাছে যাইবে। যেদিন দেখা হইয়াছিল তাহার পর দিন অমরের নিজেরই আসিবার কথা ছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া বিমল বলিল—এর নাম বুঝি কাল?

—আমি এখানে ছিলাম না ভাই, কলকাতা গেছলাম।

—কেন, অসুখের জন্যে?

—অনেক টাকা খরচ করেছি সেখানে, কিচ্ছু হয় নি, এখন তোমরা যা কর, কলকাতার উপর আমার আর বিশ্বাস নেই, অসুখের জন্যে যাই নি সেখানে।

—হঠাৎ আমাদের ওপর এত বেশী বিশ্বাস হবার মানে?

অমর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—কলকাতার ডাক্তারদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কি জান?

—কি?

—তোমরা খালি প্রাণে মার, আর কলকাতার ডাক্তাররা ধনে প্রাণে মারেন। অনেক রকম করে দেখেছি ভাই, কিছু হয় নি। আচ্ছা, অনেস্টলি বল তো ভাই সারবে কি না?

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—সারবে না!

—কখনও না!

—আমার তো মনে হয় না। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, গোড়ায় চিকিৎসা করালেও বা কিছু আশা ছিল। তুই কিছু দিন লুকিয়ে রেখেছিলি সেইটেই বড় অন্যায় হয়ে গেছে।

অমর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বসিয়া সিগারেটের ধোঁয়ায় 'রিং' বানাইতে লাগিল। বিমলও চুপ করিয়া রহিল। যোগেন দুই পেয়ালা চা সম্মুখে নামাইয়া দিয়া গেল।

একচুমুক চা পান করিয়া অমর বলিল—যাক্ গে, সে যা হবার হবে, এখন আমি যে জন্যে তোর কাছে এসেছি শোন।

—কি?

—আমরা 'বিসর্জন' প্লে করছি। তোকে রঘুপতির পার্ট নিতে হবে। সেবার কলেজে তুই রঘুপতির পার্ট যা করেছিলি চমৎকার!

বিমল ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্লে করিতে হইবে!

—সে কি! কোথায় প্লে হবে!

—ওপারে আমাদের ক্লাবে আমাদের বাঁধা স্টেজ আছে। বাবার এককালে খুব শখ ছিল কিনা—বাবাই স্টেজ করিয়ে দিয়েছিলেন।

—আমার কি ভাই রোজ রোজ রিহার্সাল দেওয়া পোষাবে? একটা হাসপাতালের ভার রয়েছে, কখন কি রোগী এসে পড়ে—

অমর কিন্তু দমিবার পাত্র নয়। সে বলিল—বেশ তোমার বাড়িতেই রিহার্সাল দেব আমরা, এখানেই এসে জোটা যাবে সন্ধ্যের পর—ক-টাই বা পার্ট।

—ফিমেল পার্ট করবার লোক আছে? অপর্ণা কে হবে?

—চমৎকার লোক আছে।

বিমলের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল। বলিল—এক কাজ যদি কর ভাই রাজি আছি!

—কি?

—এখানে থিয়েটার দেখবার উৎসাহ কি রকম সকলের?

—খুব।

—পয়সা খরচ করেও দেখতে আসবে? যদি আমরা টিকিট করি?

—আসতে পারে, একবার আমরা করেছিলাম, আড়াই-শ টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল, টিকিট অবশ্য ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রী করে আসতে হয়েছিল—

বিমল উৎসাহিত হইয়া উঠিল

—আমি রাজী আছি, এবারও যদি তাই কর। টাকাটা কিন্তু আমার হাসপাতালে দিতে হবে, কিচ্ছু ওষুধ নেই ভাই, মহাবিপদে পড়েছি, এদিকে মিউনিসিপ্যালিটির টাকা নেই, ওদিকে ওষুধের দোকানে ধার জমে আছে—

অমরও সোৎসাহে রাজী হইয়া গেল।

বিমল বলিল—আচ্ছা আমিই তোর ওখানে যাব না হয়। আমার বাড়িতে রিহার্সালের গুলতানি করা ঠিক নয়। ঠিক পাশের বাড়িতেই একটা শক্ত টাইফয়েড রোগী আছে।

—কালই তাহলে এস, দিন পনেরোর মধ্যে নামাতে হবে বইখানা; আমিও কাল থেকে তাহলে টিকিট বিক্রী করতে লেগে যাই।

—বেশ।

অমর চলিয়া গেল, বিমল একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যদিও আজ অমর বিনুর কথাটা তোলে নাই, তবু বিনুর কথাটা তাহার বার-বার মনে হইতে লাগিল। অমর এ কি নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে!

—ডাক্তারবাবু?

—ভিতরে আসুন।

যাঁহার বাড়িতে 'টাইফয়েড' তিনিই আসিলেন।

—ভূধরবাবু এসেছেন, চলুন আপনি একবার।

—চলুন, যাচ্ছি।

ভূধরবাবুর সহিত এক যোগে বিমল টাইফয়েড রোগীটির চিকিৎসা করিতেছিল। টাইফয়েডের চিকিৎসা করিবার বিশেষ কিছুই নাই। জল গ্লুকোজ আর ডিজিটালিস। তবু একটা চিকিৎসার ভড়ং করিতে হয়, ভূধরবাবু লম্বা প্রেসকৃপশন লেখেন, বিমল আপত্তি করে না। মাঝে মাঝে বিমলের ইচ্ছা করে সমস্ত ঔষধপত্র বন্ধ করিয়া দিতে; কিন্তু তাহা করিলে গৃহস্থ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে! ডাক্তারিতে রোগীর অপেক্ষা রোগীর আত্মীয়স্বজনের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। পশার জমাইবার ইহাই মূলমন্ত্র।

ভূধরবাবু নাড়ীটি টিপিয়া বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বিমলকে বলিলেন—আপনি দেখুন তো একবার পাল্‌স্‌টা।

বিমলও দেখিল, সকালে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল সেই রকমই আছে, বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। জ্বর একটু বাড়িয়াছে, সন্ধ্যার দিকে রোজই বাড়ে, তাই একটু বেশী দ্রুত।

ভূধরবাবু বলিলেন—মকরধ্বজ দেওয়া যাক, কি বলেন!

মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় মকরধ্বজের বিষয় কিছুই পড়িতে হয় নাই, মকরধ্বজ সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না। তবে মকরধ্বজের কথা বাল্যকাল হইতে সে শুনিয়াছে, নিশ্চয় ভাল ঔষধ হইবে। এই যে রোজ এত পেটেণ্ট ঔষধের প্রেসকৃপশন লিখিতেছে, ইহাদের সম্বন্ধেই বা কি এমন বিশেষ জ্ঞান আছে তাহার। তবু লিখিতেছে, অনেক সময় ফলও হইতেছে।

—কি বলেন বিমলবাবু, মকরধ্বজটা দেওয়া যাক।

—বেশ তো, দিন।

—তাহলে দেখুন, খানিকটা আলোচাল জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিন, তারপর সকাল বেলা সেই জলটা ছেঁকে তার সঙ্গে মকরধ্বজটা বেশ করে মেড়ে, অনেকক্ষণ ধরে মাড়বেন, মাড়াটাই আসল, বেশ করে মেড়ে তারপর চাটিয়ে চাটিয়ে খাইয়ে দেবেন।

রোগীর পিতা শ্রীহর্ষবাবু শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কোন ভয়ের কারণ দেখেছেন কি?

—টাইফয়েড রুগীর ভয়ের কারণ সর্বদাই, আঁটঘাট বেঁধে রাখছি আমরা, কি বলেন বিমলবাবু?

—তা তো বটেই।

ভূধরবাবু উঠিয়া পড়িলেন এবং পকেট হইতে তাঁহার কলের ফর্দ বাহির করিয়া বলিলেন—এখনও তিন জায়গায় বাকী, আর পেরে উঠছি না মশাই।

শ্রীহর্ষবাবু ভূধরবাবুর দক্ষিণা আনিয়া দিলেন। ঠিক পাশের বাড়ি বলিয়া বিমল কিছু লইতেছিল না। শ্রীহর্ষবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বিমল হাসপাতালের দিকে গেল। হাসপাতালে আরও দুই-তিনটি রোগী ভর্তি হইয়াছে। পুরাতন সেই কালাজ্বর রোগীটি অনেক ভাল আছে—তাহার পেটে কৃমি ছিল 'হুক ওয়ার্ম'। কৃমির চিকিৎসা করাতে তাহার পেটের ব্যথাটা কমিয়াছে। বিমল রোজ রাত্রে হাসপাতালের রোগীগুলিকে একবার দেখিয়া তবে শুইতে যায়। পরেশ-দার পরামর্শ অনুযায়ী সে গুপিবাবুর পাশা খেলাটা একেবারে বন্ধ করে

নাই—চৌধুরী মহাশয়কে বেশী চটাইয়া ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। যতক্ষণ গুপিবাবু চৌধুরী মহাশয়ের বাসা হইতে না ফিরিয়া আসেন ততক্ষণ দুলু, সেই অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসার ছোকরাটি, ইনডোর রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার লইয়াছে। এ ব্যবস্থায় বিমল আপত্তি করে নাই, রোগীদের দেখিবার একজন কেহ থাকিলেই হইল। বিমল হাসপাতালে গিয়া দেখিল দুলু বসিয়া পড়িতেছে। তাহাকে ড্রেসারি পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহারই পড়া পড়িতেছে। এ সময়ে বিমল তাহার পড়ার একটু সাহায্যও করে আজকাল, যে-জায়গাটা বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া দেয়। দুলু এজন্য খুব কৃতজ্ঞ। বিমল আসিতেই দুলু উঠিয়া দাঁড়াইল ও বিমলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া রোগীগুলির আর একবার খবর লইল। বাউরি-বউটি ভাল হইয়াছে। বিমলকে দেখিয়া সে মাথায় ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া বসিল।

বিমল বলিল—তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, তুমি কাল বাড়ি চলে যাও। আবার যেন আপিং-টাপিং খেও না! দুখীয়াকে ডেকে আমি ধমকে দিয়েছি, সে তোমাকে কালই শাড়ি কিনে দেবে।

বধূটি ফিক করিয়া হাসিয়া লজ্জায় মাথা নত করিল। শাড়ি কিনিবার দামটা বিমলই দুখীয়াকে দিয়াছে সে কথাটা সে আর বলিল না। দুখীয়াকেও সে মানা করিয়া দিয়াছিল, কথাটা যেন প্রকাশ না পায়। এই গরিব বধূটির তুচ্ছ একটা শাড়ির শখ মিটাইয়া সে যেন মনে মনে বেশ একটা প্রসন্নতা অনুভব করিতেছিল।

অন্যান্য রোগীদের দেখিয়া বিমল যখন হাসপাতাল হইতে নামিতেছে তখন বারান্দার অন্ধকার কোণ হইতে একটি দীর্ঘাকৃতি লোক ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া খুব ঝুঁকিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরিধানে সামান্য একটি কৌপীন, মাথায় রুক্ষ চুল, লোলচর্ম মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খুব লম্বা ও খুব রোগা। চক্ষু দুইটি কোটরাগত। অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়।

—আমার অসুখ করেছে বাবু, আমায় ভরতি করে লেন।

অতি কাতর দৃষ্টি মেলিয়া সে বিমলের দিকে চাহিল।

—কি হয়েছে তোমার?

—জ্বর হয় বাবু রোজ।

—সকালে আসনি কেন! আচ্ছা এস দেখি।

বিমল ভিতরে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কালরোগে ধরিয়াছে—যক্ষ্মা। ইহাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়া কি হইবে। ভর্তি করা অনুচিতও, অন্যান্য রোগীদের অনিষ্ট হইতে পারে। তাহাকে সে কথা বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, সে হাসপাতালের বিছানায় শুইতে চায় না, সে ঐ গাছতলাটায় শুইয়া থাকিবে, তাহাকে যেন দুই বেলা দুটি দুটি খাইতে দেওয়া হয়, আর একটু ওষুধ।

—খেতে পাই না বাবু, খেতে পাই না, খিদের জ্বালায় মরে গেলাম। অভিভূত বিমল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। পা ধরিয়া কিছুতে ছাড়ে না। নিরুপায় বিমলকে শেষে ঐ ব্যবস্থাই করিতে হইল। আর কিছুই না হোক লোকটা দুই বেলা খাইতে পাইবে তো। কিন্তু কত দিন ধরিয়া সে এমন ভাবে তাহাকে রাখিতে পারিবে, তাছাড়া কয় জনকেই বা সে এমন ভাবে

আশ্রয় দিতে পারে? দেশসুদ্ধ সকলেই যে প্রায় ঐ রকম! রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল ভাবিতে লাগিল যক্ষ্মারোগের শাস্ত্রসঙ্গত যে-সব বিধান আছে স্যানাটোরিয়াম, ভাল খাবার, স্বাস্থ্যকর স্থান—আমাদের দেশের কয়টা যক্ষ্মারোগী তদনুযায়ী চলিতে পারে। যে হতভাগা দেশের অধিকাংশ লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে সেখানে—

—বিমল না কি?

টর্চ প্রদীপ্ত করিয়া পরেশ-দা আগাইয়া আসিলেন।

—তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—কেন বলুন তো?

—নন্দী মহাশয়ের ওখানে গেছলাম, তিনি বললেন, যে তোমাকে দিয়ে ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখিয়ে তাঁকে দিয়ে আসতে।

—ইলেকট্রিসিটির সম্বন্ধে ছোট প্রবন্ধ! কেন?

—উনি বলছেন মিউনিসিপ্যাল মিটিঙে যদি পাস হয় ওঁর প্রস্তাবটা, তাহলে ওঁরা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার চাইবেন।

—কিসের জন্যে?

—যাতে মিউনিসিপ্যালিটিতে ইলেকট্রিসিটি হয়! গভর্ণমেণ্ট কিছু টাকা যদি দেয় ওঁরাও সকলে কিছু কিছু দেবেন।

—যে দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, হাসপাতালের ওষুধ নেই, সেখানে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কি হবে? হাসপাতালের ওষুধের বেলায় টাকা নেই অথচ—

—আহা বড়লোকের খেয়াল তুমি বোঝ না।

বিমল কিছু বলিল না, নীরবে পথ চলিতে লাগিল। পরেশ-দাও অকারণে টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালিয়া এদিক-ওদিক আলো ফেলিতে লাগিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

বিমল বলিল—প্রবন্ধ নিয়ে কি হবে?

নন্দী মশায় বক্তৃতা করবেন।

—কোথায়?

—মিউনিসিপ্যাল মিটিঙে! বুঝছ না, মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে পাস না হলে তো গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করা যাবে না। নন্দী মশায় তোমার প্রবন্ধটা নিয়ে বোর্ডের মেম্বারদের ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা বোঝাতে চান।

একটু থামিয়া পরেশ-দা হাসিয়া বলিলেন—ভবী কিন্তু ভোলবার নয়। মথুরবাবুর দলকে কায়দা করা শক্ত।

—মথুরবাবু কি ইলেকট্রিসিটির বিরোধী?

—ইলেকট্রিসিটির বিরোধী ঠিক নন, নন্দী মশায়ের বিরোধী। নন্দী মশায় যা করবেন মথুরবাবু এবং তাঁর দল ঠিক তাঁর উলটোটি করবে।

—মথুরবাবু মানে অমরের বাবা তো?

—হ্যাঁ।

—অমরবাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে তো?

—একসঙ্গে পড়তাম আমরা।

—মথুরবাবুর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করলে নন্দীমশায় আবার না চটে যান।

বিমল বলিল—তা বলে তো অভদ্রতা করতে পারি না। তাছাড়া আমি ডাক্তার, কোন বিশেষ দলে আমার নাম না থাকাই ভাল। আমি—

নমস্কার ডাক্তারবাবু, সঙ্গে উটি কে, ও পরেশবাবু, নমস্কার নমস্কার।

একচক্ষু লণ্ঠনটি তুলিয়া স্টেশন-মাস্টার মহাশয় পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বর্তুলাকার ভদ্রলোক, মোটা অথচ বেঁটে। বিমলকে বলিলেন—আর একবার একটু কষ্ট করতে হবে ডাক্তারবাবু, আমার মেজো ছেলেটার গা-ময় আমবাত না কি যেন বেরিয়েছে, যদি একটু দেখতেন। আমাদের রেলের ডাক্তার জগুবাবুর যা ব্যবসা-সারা দেখা! একটি রোগ সারতে তো দেখলাম না জগুবাবুর হাতে এ পর্যন্ত। ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন তাই আমার মেয়ের পেটের অসুখটা সারল।

—চলুন।

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি রুগী দেখে এস তাহলে। আজ কালীবাড়ি থেকে একটু প্রসাদ দিয়ে গেছল, হরেন শুনছি রেঁধেছে বেশ করে, তুমি আমার ওখানেই খেয়ো আজ রাত্তিরে। যোগেনকে মানা করে দিয়েছি রাঁধতে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন। বিমল স্টেশন-মাস্টারের অনুবর্তী হইল। এ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিমলের কয়েকটি ব্যাগারি রুগী জুটিয়াছিল। স্টেশন-মাস্টার মহাশয় তো প্রায়ই ডাকিতেছেন। যাইতে যাইতে সমস্ত পথটাই জগুবাবুর নিন্দা করিতে করিতে গেলেন— "মিথ্যে সার্টিফিকেট লিখে লিখে চিকিৎসার ব্যাপার প্রায় ভুলেই গেছে আমাদের জগমোহন। সার্টিফিকেট নইলেও আবার আমাদের চলে না, জগুকে চটানও মুস্কিল। ইদিকে ভয়ানক কান-পাতলা লোক আবার।"

বিমল বলিল—আপনাদের জগুবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে হবে একদিন।

—সেদিকে জগু ঠিক আছে, আলাপে মোহিত করে দেবে একেবারে। কেউ একবার গেলেই হল চা রে, জলখাবার রে, জগমোহন মিস্তিরের সেদিকে কোন ত্রুটিটি ধরবার উপায় নেই।

জগু প্রসঙ্গ পরিবর্তনমানসে বিমল বলিল—আপনি কত দিন থেকে আছেন এখানে?

—তা হয়ে গেল বছর-দুই মশাই, এসে থেকে ভুগছি মশাই ছেলেপিলে নিয়ে, এটা ওঠে তো ওটা পড়ে, আর আমার পরিবার তো রোগের একটি ডিপো বললেই হয়, কি যে ওর হয় নি তাই আমি ভাবি!

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কেবল ক্যান্সারটাই হতে বাকি আছে বোধহয়, আর সব হয়ে গেছে। জগু তো টি, বি, বলে ডিক্লেয়ারই করেছে, ভূধরবাবু বললেন ফ্যারিনজাইটিস্, জগদীশবাবু বললেন টন্‌সিল খারাপ, আপনি যদি দেখতে চান দেখুন—হয়রান হয়ে উঠেছি মশায়, পারি না আর।

স্টেশন-মাস্টারের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বিমল ভাবিল বদিবাবুর খবরটা একবার

নেওয়া যাক। সতীশবাবুর ভাইয়ের চিকিৎসা সে করিতেছে বটে কিন্তু এখনও এক পয়সা পায় নাই। তাঁহারাও দেয় নাই, বিমলও চাহে নাই। এ সম্বন্ধে কি করা উচিত সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বদিবাবু যাহা বলেন তাহাই করা যাইবে। থিয়েটারের কথাটাও বদিবাবুর কানে তোলা উচিত। মথুরবাবুদের সঙ্গে হৃদ্যতার জন্য নয়, হাসপাতালের ঔষধের জন্যই সে এ কার্য করিতে রাজী হইয়াছে, তাহা বদিবাবুকে অন্তত জানাইয়া রাখা ভাল। জায়গাটায় যেরূপ দলাদলি তাহাতে বুঝিয়া সুঝিয়া চলাই ভাল। বুঝিয়া চলিলে এ স্থানে বেশ রোজগার হইবে, বেশ বড়লোকের জায়গা। ভূধরবাবুর কথাগুলো তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল, এখনও তিনটে বাকি, আর পারি না মশাই। এই অল্প কয়েক দিনে সে-ও তো এদিকে-ওদিকে দুই-চারিটা রুগী পাইয়াছে এবং সকলেই বিনাপয়সার নয়। হাসপাতালটাকে দাঁড় করাইয়া ফেলিতে পারিলে তাহার পশার জমাইতে দেরি হইবে না। ঔষধ কিছু অবিলম্বে চাই। বদিবাবুর বাড়ি গিয়া বিমল শুনিল যে বদিবাবু এখানে নাই। কংগ্রেসের কাজে বাহিরে গিয়াছেন, তিন-চার দিন পরে ফিরিবেন।

শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বনিয়াদি বংশের সন্তান। পূর্ব-পুরুষগণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে অক্লেশে মুর্শিদকুলি খাঁর আমল পর্যন্ত তাঁহাদের গৌরবময় ইতিবৃত্তি সংগ্রহ করা যায়। নানারূপ দলিল, পাঞ্জা, সনন্দ, তরবারি, উষ্ণীষ, ছবি তাঁহাদের গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিয়া এখনও মথুরাবাবুর গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছে। মথুরামোহনের পিতামহই সম্ভবত এ বংশের শেষ মহিমা। তাঁহার বজরা, ঘোড়া, রোশনচৌকি, তাঁহার অমিত বিক্রম, তাঁহার অহেতুক দয়া, তাঁহার আকস্মিক ক্রোধের কাহিনী এখনও এ অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত রহিয়াছে। মথুরামোহনের পিতার সময় এ অঞ্চলে প্রথম রেল-লাইন আসে, সিগারেট আসে, ক্যামেরা আসে। সুতরাং কোট-প্যান্তলুন পরিয়া সাহেবী কায়দায় চলা-বলা, আহার-বিহার—এইটাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি নাকি পুরা সাহেব ছিলেন। তাঁহার যে প্রতিকৃতিখানি রহিয়াছে সেটিও সাহেবী—পোশাকে। তাঁহার পরিচ্ছদ, আসবাব, এমন কি অনেক খাদ্যদ্রব্যাদিও নাকি সাহেব-বাড়ি হইতে আসিত। তিনিই নাকি এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম বিস্কুট ও পাউরুটি আহার করেন। জনৈক সিভিলিয়ান বন্ধুর সহিত বিলাতেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সাহেবীয়ানা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহার বাড়িতে বাইনাচ, যাত্রা, দোল, দুর্গোৎসব হইত, বড় বড় তানপুরা লইয়া দিল্লী লক্ষ্ণৌ হইতে ওস্তাদেরা আসিয়া আসর জমাইতেন। সম্ভবত উভয় প্রকার শালীনতা বজায় রাখিতে গিয়াই তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়েই পৃথিবীর নশ্বরতা সম্বন্ধেও তাঁহার চৈতন্য হয় এবং তিনি সপরিবারে তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিতে থাকেন। এতকাল তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না, পশ্চিমে থাকিতে থাকিতে সন্তান—সম্ভাবনা হইল এবং মথুরা শহরে মথুরামোহন জন্মগ্রহণ করিলেন।

বিমলের সহিত মথুরামোহনের একদিন আলাপ হইয়া গেল। থিয়াটারে রিহার্সাল দিবার জন্য যেদিন সে ওপারে গেল, সেই দিনই অমরের বাড়ি যাইতে হইল। বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল কল্পনায় সে মথুরামোহনকে যাহা ভাবিয়াছিল আসলে তিনি মোটেই সেরূপ দেখিতে নহেন। বিমল আশা করিয়াছিল দাম্ভিক পরাক্রান্ত ক্ষমতাপ্রিয় একজন উদ্যতনাসা উগ্রগুম্ফ ব্যক্তিকে দেখিবে, কিন্তু দেখিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ব্যক্তিকে। মথুরামোহন দেখিতে অতিশয়

নিরীহ প্রকৃতির। পরিধানে থান, গায়ে একটি অতি সাধারণ ধরনের ফতুয়া, পায়ে চটি, কেশবিরল মস্তক, চোখেমুখে একটি স্নেহ কোমল মৃদু হাসি, দেখিয়া মনে হয় না যে ইনি কোন নিষ্ঠুর কার্য করিতে পারেন। অথচ ইহারই ভয়ে ওপারের অধিকাংশ লোক সন্ত্রস্ত—বিশেষত মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারেরা। আপাতদৃষ্টিতে লোকটির মধ্যে ভয়ঙ্কর তো কিছুই বিমল দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ আলাপের পর মথুরবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন—তুমি অমরের বন্ধু এ-কথা আগে জানলে তোমাকে এখানে আসতে মানা করতাম আমি।

—কেন?

সহসা তাঁহার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনেয় কোন ভদ্র সন্তান ভালভাবে থাকতে পারে না, ঐ মাইনেতে যারা টিকে থাকবে তারা ভাল হলেও দিন-কতক পরে খারাপ হয়ে যাবে। মাইনে ভাল না দিলে কাজ ভাল হয় না, হতে পারে না!

বিমল বলিল—সে তো ঠিকই। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির যা অবস্থা তাতে বেশী মাইনে দেবে কি করে! হাসপাতালে ওষুধ পর্যন্ত নেই!

—তা তো জানি! আমার মতে হাসপাতাল তুলে দেওয়া উচিত। ওরকম একটা প্রহসন রাখার চেয়ে না রাখা ভাল!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

অমর বলিল—আমরা ক্লাবে এবার টিকিট করে বিসর্জন প্লে করছি। টাকা যা হবে সব হাসপাতালে দেব আমরা!

—ভাল।

মথুরামোহন মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বিমলের দিয়ে চাহিয়া সহসা বলিলেন—একটা কথা কিন্তু জেনে রেখো আমি তোমার শত্রুপক্ষ। তোমার কোন ত্রুটি পেলে ছেড়ে কথা কইব না আমি!

বিমল বলিল—ত্রুটি হতে দেব কেন।

—পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাবে, ত্রুটি হতে দেব না বলছ কোন সাহসে!

মথুরবাবু কান হইতে রূপার খড়কেটি নামাইয়া লইয়া হাসিমুখে দাঁত খুঁটিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—আচ্ছা সে দেখা যাবে।

অমর হাসিয়া বলিল—চল ক্লাবে যাওয়া যাক্, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিমল উঠিয়া মথুরবাবুকে প্রণাম করিয়া পুনরায় পদধূলি লইতে গেলে মথুরবাবু বলিলেন—এই তো এখুনি একবার প্রণাম করলে আবার কেন! ও-সব পায়ের ধুলোটুলো নিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বি অন ইওর গার্ড—

একটু হাসিয়া বিমল ও অমর বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে বিমল বলিল— তোর বাবার সম্বন্ধে যেরকম ভয়াবহ সব গুজব শুনেছিলাম, ভয় হয়ে গিয়েছিল আমার। এত ভাল লোক অথচ সবাই এত ভয় করে কেন বল্ দিকি।

—ভাল লোক বলেই!

—মানে?

—মানে মিউনিসিপ্যালিটিতে উনিই একমাত্র লোক যিনি ঠিক নিয়ম মেনে চলতে চান আর ঘুষ নেন না।

—বাকী সবাই?

—বাকী সবাই মিউনিসিপ্যালিটিকে নানাভাবে দোহন করছে!

—বদিবাবুও?

—নিশ্চয়। ওপারে ওঁর অতগুলো বাড়ি, মিউনিসিপ্যালিটিকে হাতে না রাখলে ওঁর চলবে কি করে? নিজের ইচ্ছেমত প্ল্যান, নিজের ইচ্ছেমত কল, যখন যা খুশি করিয়ে নিচ্ছেন। নিজে তো যা খুশি করিয়ে নিচ্ছেন, নিজের অনুগৃহীত লোকদের করিয়েও দিচ্ছেন! খুব তুখোড় লোক।

বদিবাবুর নিন্দা শুনিতে বিমলের ভাল লাগিতেছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

বিমলেরা চলিয়া গেলে মথুরবাবু অন্দরে গেলেন। গিয়াই শেফালির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। শেফালি মথুরবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা, বড় আদরিণী। ষোল-সতের বছর বয়স।

—বাবা, বারান্দায় বসে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, বিমলবাবু, নয়?

—তুই কি করে দেখলি!

—বাঃ, দোতলার জানালা থেকে দেখা যায় না বুঝি বারান্দাটা!

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মথুরবাবুর স্ত্রী বলিলেন—বারান্দাটা দেখা যায় বলেই উঁকি মেরে দেখতে হবে, ধন্য বাবা আজকালকার মেয়ে তোমরা! ভদ্রলোক যদি দেখতে পেতেন!

—দেখতে পেলেই হল! আমি তো কেবল খড়খড়িটা একটুখানি ফাঁক করে দেখেছি।

—কি দরকার তোমার দেখবার মা?

—আমার খুড়শ্বশুরের অসুখ তো উনিই ভাল করেছেন, সেই জন্যে দেখছিলাম কেমন দেখতে লোকটি!

শেফালি হাসিতে লাগিল, মথুরবাবুও তাহার পানে সস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

—তুমিই আদর দিয়ে মেয়েটার সর্বনাশ করবে দেখছি।

এক খিলি পান ও কিছু দোক্তা মুখে ফেলিয়া দিয়া সকোপ কটাক্ষে মথুরাগৃহিণী মথুরবাবুর পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন—কালই দাঁড়াও বেয়াইকে খবর দিচ্চি, নিয়ে যান তোমাকে!

—ইস্, আমি যাচ্ছি কি না এখন!

ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে শেফালি বৌদির ঘরে গিয়া ঢুকিল।

মথুরবাবুও উঠিয়া ধীরে ধীরে বাথরুমে গিয়া খিল দিলেন। মথুরবাবুর বাথরুম একটি দেখিবার মত জিনিস, বলিয়া না দিলে বাথরুম বলিয়া বোঝা শক্ত। দুই তিন রকমের গদি-আঁটা চেয়ার, একটি সোফা, দেয়ালে নানা রকমের ছবি, এক কোণে একটি আলমারিতে নানা বই, একটি ছোট টেবিলের উপর সব রকমের খবরের কাগজ, নিকটে একটি ছোট মিটসেফের

ভিতর চকোলেট, লজেন্‌স প্রভৃতি মুখরোচক টুকিটাকি খাবার, দেয়ালের গায়ে কাঠের একটি সুদৃশ্য শেল্‌ফ্ তাহাতে তাঁহার প্রিয় কয়েক রকম পেটেন্ট ঔষধ, আর একটি দেওয়ালে চমৎকার একটি ঘড়ি। ঘরের ভিতর হইতেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়, জানালাটি খুলিয়া দিলেই হইল। মথুরবাবু বাথরুম তাঁহার বৈঠকখানা অপেক্ষা বেশী আরামজনক। এই ঘরখানির ঠিক পাশেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট একটি স্নানের ঘরও অবশ্য আছে। মথুরবাবু নির্জনতা ভালবাসেন এবং স্নান করিবার অছিলায় বাথরুমে ঢুকিয়া জনতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করেন। একবার বাথরুমে ঢুকিলে দুই-তিন ঘণ্টা তিনি বাহির হন না এবং দুই বেলা তাঁহার বাথরুমে ঢোকা চাই-ই। মথুরবাবু বাথরুমে ঢুকিয়া খিল দিলেন। মথুরবাবুর গৃহিণী মন্দাকিনী বাথরুমের রুদ্ধ দ্বারের পানে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া আর এক খিলি পান ও আর একটু দোক্তা আলগোছে মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। চশমার খাপ ও মহাভারতখানি বাহির করিয়া আনিয়া কি ভাবিলেন, তাহার পর আপন মনেই বলিলেন—নিজে আর পড়তে পারি না বাপু, বৌমা, ও বৌমা, কোথা তুমি—

বিনোদিনী পাশের ঘরেই ছিল, বাহির হইয়া আসিল।

—কি মা?

—কি করছ তুমি?

—কিছুই না।

—আচ্ছা, তাহলে মহাভারতের এইটুকু আমাকে পড়ে শোনাও তো মা! ঐটুকু হলেই কর্ণপর্বটা শেষ হয়ে যায়। আমি আর পারছি না পড়তে—

বিনোদিনী বসিল ও মহাভারত লইয়া পড়িতে শুরু করিল—

হে মহারাজ! এদিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অর্জুন, দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ-বৃত্তান্ত ধর্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তুমি বহুদিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলেন, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্মরাজকে বিজ্ঞপ্তি করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্বে পুরুষ-প্রধান যুধিষ্ঠির—

অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সহসা মন্দাকিনী বলিলেন—আচ্ছা বৌমা, তোমার চুলের এ কি ছিরি! চুলে তেলটেল দাও না, আজকাল তোমাদের কি যে ফেসিয়ান হয়েছে মা, চুল ভেজাবে না কিছুতেই! চুল-বাঁধুনী এসেছিল তো আজ, চুলটা ভাল করে বেঁধে নিলেই পারতে!

বিনোদিনী কিছু বলিল না, লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেও যে ব্রহ্মচর্যের চর্চা করিতেছে এ কথা তো শাশুড়ীকে বলা যায় না।

শাশুড়ী বলিলেন—চল আমিই তোমার চুলটা বেঁধে দি, মহাভারত কাল শুনিয়ো! চল, ওঠ।

বিনোদিনীকে লইয়া মন্দাকিনী উঠিয়া গেলেন।

বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র তিন মাস পূর্বে যখন মন্দাকিনী প্রথম শুনিলেন যে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপনে একটি কলেজেপড়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাঁহার

মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল! কলেজে-পড়া মেয়ে; না জানি সে কি জাতীয় জীবই হইবে। কি জাতীয় জীব যে হইবে, সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব অস্পষ্ট ছিল না। হাই-হীল জুতা-পরা, ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে অবগুণ্ঠনহীনা শিক্ষিতা মহিলা মন্দাকিনী ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলেন এবং দুর্ভাবনাটা সেই জন্যই বেশী হইয়াছিল। কিন্তু বিনোদিনী তাঁহার সে দুর্ভাবনা ঘুচাইয়াছে। অল্প দিনেই মন্দাকিনী বুঝিলেন যে এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে দুর্লভ। ব্রত-আচার, পূজা-পার্বণ সব বিষয়ে নিখুঁত। যেমন লজ্জা, তেমনি ধীরস্থির। মুখে লক্ষ্মীশ্রী আছে। কিছুমাত্র বিলাসিতা নাই, বরং তাহার প্রসাধন সম্বন্ধে উদাসীনতাই ইদানীং মন্দাকিনীকে পীড়িত করিতেছে।

গঙ্গার ধারেই বিমলের বাসা। ঘাট হইতে বাসা বেশী দূর নয়। গভীর রাত্রি, চতুর্দিকে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। একটি ছোট পানসি আসিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে ভিড়িল এবং পানসি ভিড়িতে অমর ও বিনোদিনী নামিয়া পড়িল।

অমর বলিল—চল বিমলকে জাগানো যাক।

—না, না, কি দরকার, মা যদি জানতে পারেন, ভয়ানক কাণ্ড করবেন।

—কিছু করবেন না, চল না! অনেক দিন পরে বিমল তোমাকে দেখে ভারী খুসী হবে!, বলছিল আজ তোমার কথা।

—কি বলছিল?

—বলছিল বিনুকে নিয়ে এস একদিন আমার বাড়িতে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বিমলবাবুকে বিনোদিনীর মনে পড়িল। অমরের সহিত বিমল কয়েকবার বিনোদিনীর বাড়িতে গিয়াছিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিল বিমলবাবু কি এখনও তেমনি লাজুক-প্রকৃতির আছেন নাকি? তখন তো কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পর্যন্ত পারিতেন না।

বিমল স্বপ্ন দেখিতেছিল, মণিকে। পরীক্ষা দিয়া মণি যেন বড় রোগা হইয়া গিয়াছে। বিমল এক বোতল কডলিভার অয়েল লইয়া তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে, সে কিছুতেই খাইবে না। বড় দুর্গন্ধ, দুধও খাইবে না, খাইতে ভাল লাগে না।

—ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারবাবু—

বিমল বিছানায় উঠিয়া বসিল, তবুও স্বপ্নের ঘোর যেন কাটিতে চায় না। ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিল জানালা দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া নীরব মাধুর্যে সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে।

—ডাক্তারবাবু—

কপাট খুলিয়া বিমল দেখিল অমর ও বিনোদিনী দাঁড়াইয়া আছে। এও কি স্বপ্ন নাকি!

[পাঁচ]

যদিও হাসপাতালে ঔষধ নাই তথাপি বিমলের সদয় ব্যবহারের গুণে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিমল লক্ষ্য করিল এখানে গরিব লোকদের ভিতর কালাজ্বর খুব

বেশী, অথচ হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসা করিবার মত ইন্‌জেকশনের ঔষধ প্রচুর নাই। অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা কম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে নিজের প্রথম মাসের বেতনটা ব্যয় করিয়া কালাজ্বরের ইন্‌জেকশন আনাইয়া ফেলিল। লেখালেখি করাতেও দরও কিছু সস্তা হইল! কালাজ্বর-রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া এবং চিকিৎসা করিয়া বিমলের সময় ভালই কাটিতে লাগিল। বিমল ভাবিয়া দেখিল যে চাকরি না পাইলে কোথাও না কোথাও তাহাকে ডিসপেনসারি খুলিয়া তো বসিতে হইত এবং অনিবার্যভাবে কিছু অর্থব্যয় হইতই। প্র্যাকটিস জমাইবার জন্য প্রথম প্রথম কিছু খরচ করিতেই হয়, সুতরাং এই খরচটা করা এমন কিছু অবিবেচনার কার্য হয় নাই। হাসপাতালের এই দরিদ্র রোগীরা মুক্তকণ্ঠে তাহার নাম চতুর্দিকে বিজ্ঞাপিত করিবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের জন্যও তো একটি প্রয়োজনীয় খরচ আছে। ব্যবসায়ের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাতে নিঃস্বার্থপরতা অপেক্ষা স্বার্থপরতার আমেজই বেশী ছিল, কিন্তু চতুর্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ইন্‌জেকশন দিয়া অনেক রোগী ভালও হইতে লাগিল।

একদিন হাসপাতালের কাজ সারিয়া বিমল বাহির হইতেছে এমন সময় এক বুড়ি আসিয়া তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। বুড়ি বিমলের অচেনা নয়, এখানে আসিয়া অবধি বুড়িকে সে প্রত্যহই দেখিতেছে, রোজ তাহার হাসপাতালে আসা চাই। সে আসিবার আগেও নাকি বুড়ি রোজ আসিত। তাহার অসুখ মাথাধরা, কিছুতেই সারিতেছে না।

—কি চাই তোমার, ওঠ, ওঠ।

—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।

—কিসের ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে?

—মাথাধরার! কত লোক ইন্‌জেকশন নিয়ে সেরে গেল আমার চোখের সামনে, আমারই কিছু হচ্ছে না—

—ওষুধ খাও, সারবে।

—লাল, নীল, সাদা কত রকম ওষুধই খেলাম। ওষুধ খেয়ে কিছু হবে না বাবু—আমাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিন, দোহাই আপনার ডাক্তারবাবু!

—কি মুস্কিল, তোমার তো আর কালাজ্বর হয়নি, কি ইন্‌জেকশন দেব তোমাকে?

—সব অসুখেরই ইন্‌জেকশন আছে, সেদিন ঐ রক্ত-আমাশয় রুগীটা এল, একটা ইন্‌জেকশন দিতেই সেরে গেল!

বুড়ি রোজ হাসপাতালে আসে এবং কোথায় কি হয় লক্ষ্য করে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বিমল তথাপি বলিল—মাথাধরার ইন্‌জেকশন নেই কোন।

বুড়ি কিন্তু মানিল না, বিমলের পিছু লইল। বহুকাল পূর্বে মৃত তাহার স্বামীর উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল— সে মরে ইস্তক আমার এত হেনস্তা ডাক্তারবাবু। নিজের পেটের ছেলে এত করে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলাম, সেই এখন দেখে না, বউ নিয়ে উন্মত্ত। বউও জুটেছে একটা ডাইনী, নিজের পেটের ছেলেগুলোকেই টপটপ করে খেয়ে ফেললে, ঘরদোর শ্মশান হয়ে গেল আমার! এত লোকের মরণ হয় আমারই কেবল হয় না? যমেরও অরুচি আমি—

বিলাপ করিতে করিতে বুড়ি বিমলের বাসা পর্যন্ত আসিয়া হাজির হইল। বিমল তাহাকে আরও দুই-একবার বলিল যে, তাহাকে দিবার মত ইন্‌জেকশন তাহার নাই। বুড়ি কিন্তু কিছুতেই শোনে না। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—নিজের পেটের ছেলেই যাকে দেখে না তাকে অপরে দেখবে কেন, কিন্তু আপনি শুনেছিলাম ভাল লোক, দয়াধর্ম আছে, তাই সাহস করে—

বুড়ি ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল! নিরুপায় বিমল শেষটায় ঠিক করিল খানিকটা জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহারই দুই-চারি ফোঁটা বুড়িকে ইন্‌জেকশন করিয়া দেওয়া যাক। নাছোড়বান্দা বুড়ি কিছুতেই ছাড়িবে না! বলিল—আচ্ছা বস, দিচ্ছি ইন্‌জেকশন!

টেস্ট-টিউবে জল গরম করিতে করিতে বিমলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। মাইক্রসকোপের কাজের জন্য তাহার কাছে 'মেথিলিন ব্লু'র কতগুলি বড়ি ছিল। ময়দার গুলির ভিতর 'মেথিলিন ব্লু'র কয়েকটি গুলি লুকাইয়া বিমল সেগুলি বুড়িকে দিল এবং জলের ইনজেকশন দিয়া অবশেষে বলিল—এই বড়িগুলোও খেও। বড় কড়া ইন্‌জেকশন, শরীরের সমস্ত বিষ বেরিয়ে যাবে।

বুড়ি আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বুড়ির সহিত এই প্রবঞ্চনাটুকু করিয়া বিমলের ভারি আনন্দ হইল। ডাক্তারি করিতে কত প্রবঞ্চনাই যে করিতে হয়! দুস্থ লোককে সান্ত্বনা দেওয়াই যখন পেশা তখন প্রবঞ্চনা করিতে হইবে বইকি! কয়টা লোককে সত্য কথা বলিয়া আশ্বস্ত করা যায়!

আহারাদি শেষ করিয়া বিমল আবার হাসপাতালের দিকে রওনা হইল। সাধারণত এ সময়টা সে একটু বিশ্রাম করে, কিন্তু আজ ফিমেল ওয়ার্ডে একটি নিউমোনিয়া রোগিণীকে সে ভর্তি করিয়াছে, তাহার রক্তটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। হাসপাতালের গেটে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় তাহার নজরে পড়িল একটি আধ-বয়সী মেয়ে আধঘোমটা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার হাতে একটি গামলায় কলাপাতা দিয়া কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে।

—কে তুমি?

মেয়েটি মাথার ঘোমটা আর একটু টানিয়া দিয়া মাথা নিচু করিয়া বলিল—আমি বাবু ঠাকুরের পরিবার।

—হাসপাতালের শিবু ঠাকুরের?

—হাঁ।

—গামলাতে ও কি?

মেয়েটি একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

বিমল বলিল— কি আছে ওতে, দেখি ঢাকা খোল তো।

অতিশয় সঙ্কোচভরে মেয়েটি কলাপাতার ঢাকাটা খুলিয়া বলিল—হাসপাতালের রুগীদের দিয়ে যা ভাত বেঁচেছিল তাই নিয়ে যাচ্ছি—

বিমল দেখিল অন্তত চার-পাঁচ জনের ভাত ডাল তরকারি গামলাতে রহিয়াছে।

—এত ভাত বেঁচেছিল? বল কি। মোটে তো দশ-বারো জন রুগী আছে। এস আমার সঙ্গে।

হাসপাতালে ঢুকিয়া অনুসন্ধান করিয়া বিমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিবুঠাকুরের ভয়ে কোন রুগী প্রথমে কোন কথা বলিতেই চায় না। বিমল অভয় দেওয়াতে অবশেষে সকলে বলিল যে তাহারা কোনদিনই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের এক-আধ মুঠা দিয়াই সমস্তই শিবুঠাকুর প্রত্যহ লইয়া যায়। ভৈরব চাকরও প্রত্যহ তাহাদের অন্নে ভাগ বসায়।

বিমল বলিল—আচ্ছা ব্যবস্থা করছি।

তৎক্ষণাৎ ভৈরব ও শিবুকে ডাকিয়া বিমল তাহাদের বেতন চুকাইয়া দিল এবং গুপিবাবুকে ডাকিয়া বলিল যে, একজন নূতন ঠাকুর নূতন চাকর অবিলম্বে চাই। ইহাদের আর রাখা চলিবে না। গুপিবাবু সহজে কোন কথা বলেন না, বলিলেও খুব কম বলেন। চশমার কাচের উপর দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তিনি সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিলেন ও সংক্ষেপে বলিলেন—আচ্ছা, দেখি। চট করে পাওয়া মুস্কিল।

রুক্‌মি আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল—মুস্কিল কিসের, নরু ঠাকুর তো বসে আছে, কেষ্টাও বসে আছে, ডাকলেই আসবে।

—তুই সব কথার মাঝখানে ফোড়ন দিস কেন বল তো ? আ গেল যা!

জান্‌কীও তাহাকে ধমকাইয়া দিল—তুই বাড়ি যা না!

রাগে গর গর করিতে করিতে রুক্‌মি চলিয়া গেল।

বিমল জান্‌কীকে আদেশ করিল নরু ঠাকুর ও কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া আনিতে, আজই সে তাহাদের বাহাল করিবে।

ফিমেল ওয়ার্ডে নূতন রোগিণীর রক্ত আনিতে গিয়া বিমল দেখিল সেদিনকার সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারীটা তাহার বিছানার পাশে মাটিতে বসিয়া একদৃষ্টে মেয়েটার মুখের পানে চাহিয়া আছে।

—তুমি এখানে বসে আছ কেন?

গুপিবাবু বলিলেন—এই নিয়ে চার বার হল! এর আগে তিন বার মানা করেছি আমি। সেই থেকে কেবল এইখানে ঘুরঘুর করছে।

বিমল বলিল—যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং বটতলায় গিয়া বসিল। একটু পরে বিমল রক্ত পরীক্ষা করিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছে, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল এবং একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—বাবু!

—কি?

—ও মেয়েটা কি বাঁচবে?

—তুমি ওখানে গেছলে কেন? আর যেও না।

—আচ্ছা বাবু।

বিমল চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—ও কি বাঁচবে বাবু?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—আমার অমন একটি মেয়ে ছিল, বিনা ওষুধে বেঘোরে জ্বরে ছটফট করতে করতে মরে গেছে সে বাবু!

বিমল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল তাহার কোটরাগত চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। বিমল দাঁড়াইয়া পড়িল।

—ও কি বাঁচবে বাবু? একটুকুও তো জ্ঞান নেই।

—শক্ত ব্যারাম, নিউমোনিয়া হয়েছে।

—আহা, শুনলাম ওর বাপ-মা কেউ নেই!

সত্যই মেয়েটি অনাথা, ওপারের অনাথ-আশ্রম হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। বিমল চলিয়া যাইতেছিল, আবার সে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল—আমি ওর কাছে বসে যদি হাওয়া-টাওয়া করি তাতে ক্ষেতি কি বাবু?

—না, তুমি যেও না। ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যাওয়া মানা।

সে আর কিছু বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল বাড়িতে পদার্পণ করিতে-না-করিতেই শ্রীহর্ষবাবু—পাশের বাড়ির সেই ভদ্রলোক যাঁহার ছেলের টাইফয়েড হইয়াছে—তিনি হন্তদন্ত হইয়া হাজির হইলেন।

—পাইখানার সঙ্গে খানিকটা রক্ত বেরিয়েছে যেন মনে হচ্ছে।

বিমলের মুখ শুকাইয়া গেল।

—তাই নাকি? চলুন তো দেখি।

গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুখ আরও শুকাইয়া গেল। সত্যই 'হেমারেজ' আরম্ভ হইয়াছে।

—ভূধরবাবুকে খবর দিন।

শ্রীহর্ষবাবু বলিলেন—লোক পাঠিয়েছিলাম, তিনি বাড়িতে নেই।

—জগদীশবাবুকে খবর দিন তাহলে, আর এই ইন্‌জেকশনটি তাড়াতাড়ি আনিয়ে নিন।

লোক ছুটিল।

বিমল রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিল, নাড়ীর গতি ক্রমশঃই দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। পেটের ভিতর আরও রক্তক্ষয় নিশ্চয়। অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার।

জগদীশবাবুকে যে লোক ডাকিতে গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিল—জগদীশবাবুও বাড়িতে নেই। বিমল ইন্‌জেকশনের জন্য যে 'সিরাম'টি আনিতে দিয়াছিল তাহাও এখানে পাওয়া গেল না। বিমল শেষে নিজের ব্যাগ হইতে মর্ফিয়া বাহির করিয়া আনিল। মর্ফিয়া ইহার একটা ঔষধ।

শ্রীহর্ষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ওটা কি ইন্‌জেকশন দেবেন?

—হাঁ।

—কি ওটা?

—মর্ফিয়া।

শ্রীহর্ষবাবু বাক্যটা সম্পূর্ণ করিলেন না বটে, কিন্তু অর্থ বুঝিতে বিমলের কষ্ট হইল না। মর্ফিয়া দেওয়াটা বিপজ্জনক কি না তাহাই শ্রীহর্ষবাবু জানিতে চাহিতেছেন। মর্ফিয়া ঔষধটি শক্তিমান ঔষধ, শক্তিমান জিনিস মাত্রেই নিরাপদ নয়। কিন্তু সেকথা শ্রীহর্ষবাবুকে বলিলে তিনি আরও ঘাবড়াইয়া যাইবেন। হেমারেজে মর্ফিয়া বহুকালের সনাতন ঔষধ, বিমল নূতন কিছু

করিতেছে না; তা ছাড়া অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার। বিমল বলিল—ও ওষুধটা যখন পাওয়া গেল না এইটেই দেওয়া যাক, এটাও হেমারেজের একটা ওষুধ। ক্যালসিয়ামও একটা দিচ্ছি।

বিমল মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়া দিল। ক্যালসিয়ামও দিল। একটু পরেই ছেলেটি ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম আর ভাঙ্গিল না।

রাত্রি আটটা নাগাদ ভূধরবাবু আসিলেন এবং নাড়ী টিপিয়া মুখ বিকৃতি করিলেন, কিছু বলিলেন না, চলিয়া গেলেন। আর একটু পরে জগদীশবাবু আসিলেন ও মর্ফিয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া এমন একটা মুখভাব করিলেন যাহা অবর্ণনীয়। সে মুখভাবে রোগীর জন্য আপসোস, বিমলের অজ্ঞতার জন্য অনুকম্পা, রোগীর পিতার জন্য সহানুভূতি এবং তাঁহাকে ইতিপূর্বে না ডাকাতে কি কাণ্ডটা হইল এই ধরনের একটা গর্ব একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিল।

অপ্রস্তুত বিমল বলিল—হেমারেজে মর্ফিয়া দিতে কেতাবে তো লেখে।

—কেতাবে অনেক কথাই লেখে!

জগদীশবাবুর মুখটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি বিমলকে যেন ব্যঙ্গ কবিতে লাগিল। কেতাবাতীত অভিজ্ঞতার মহিমা লইয়া জগদীশবাবু চলিয়ে গেলেন।

বিমূঢ় বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

একটু পরেই ক্রন্দনের রোল উঠিল—নারীকণ্ঠের আর্ত হাহাকার—ওরে বাবা রে আমার ছেলেকে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরে ফেললে রে।

সেদিন রাত্রে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় দুলু আসিয়া বিমলের ঘুম ভাঙ্গাইল—হাসপাতালের সেই নিমোনিয়া রোগীটার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গরমের জন্য দুলু রোজ আসিয়া হাসপাতালের বারান্দায় একটি ক্যাম্পখাট বিছাইয়া শয়ন করে, আজও শুইয়াছিল। হঠাৎ ফিমেল ওয়ার্ড হইতে একটা দারুণ চীৎকার শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে গিয়া দেখে অল্প অন্ধকারে সেই লম্বা ভিখারী বুড়াটা ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভয়ে চীৎকার করিতেছে। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়িতেছে দেখিয়া দুলু গুপিবাবুকেও উঠাইয়াছিল।

গুপিবাবু বিমলকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

বিমল গিয়া দেখিল মেয়েটি মারা গিয়াছে। খুব সম্ভবত ভয়েই হার্ট ফেল করিয়াছে।

ভিখারী বুড়াটা বারান্দার এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

বিমলের ভয়ানক রাগ হইল, তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া বলিল—বেরিয়ে যাও তুমি হাসপাতাল থেকে—

টাল সামলাইতে না পারিয়া লোকটা পড়িয়া গেল। তাহার পর হইতে আর কেহ তাহাকে হাসপাতালের ত্রিসীমানায় দেখে নাই।

[ছয়]

অতি প্রত্যূষে দাঁতন-হস্তে বদিবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

—ডাক্তারবাবু, আপনি একটা ভারি অ-রাজনৈতিক কাজ করে ফেলেছেন!

—কি বলুন তো?

—শুনলাম, মথুর মুখুজ্যেদের ক্লাবে গিয়ে আপনি মিশেছেন!

—মিশলেই বা।

বদিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন, তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, চালে একটু ভুল হয়েছে! আমাদের সমস্ত জীবনটাই তো একটা দাবাখেলা, চালে ভুল হলেই মাৎ হয়ে যেতে হবে! ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি—

বিমল ব্যাপার সমস্ত খুলিয়া বলিল এবং উপসংহারে বলিল—অমর আমার অনেক দিনের বন্ধু, তার অনুরোধ এড়ানো একটু শক্ত কিন্তু বন্ধুত্বের জন্যে এ-কাজ আমি করিনি, আমি করেছি হাসপাতালের জন্যে। থিয়েটার থেকে শ-দুই আড়াই হতে পারে! হাসপাতালে একেবারে ওষুধ নেই। আমি আমার নিজের মাইনে দিয়ে ওষুধ কিনে চালাচ্ছি—সবই তো জানেন আপনি!

বদিবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, এইবার ফতুয়ার পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া বিমলের হস্তে দিয়া বলিলেন—এই নিন।

বিমল সবিস্ময়ে দেখিল পাঁচ শত টাকার একখানি চেক।

—এ কোথা পেলেন?

বদিবাবু কিছু না বলিয়া স্মিতহাস্যে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন।

—আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—টাকাটা পেলেন কি করে?

—বিমল চাটুয্যের পক্ষে যদি এক মাসের মাইনেটা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, বদি চাটুযোর পক্ষে পাঁচশ টাকা যোগাড় করা কিছু অসম্ভব নয়!

বিমল হাসিতে লাগিল।

বদিবাবু বলিলেন—ওটা খুব দামী চাল দিয়েছিলেন আপনি, একটা ভেরি গুড্ স্ট্রোক—কিচ্ছু বেগ পেতে হয় নি আমাকে, যার কাছে চেয়েছি সে-ই দিয়েছে—

—চাঁদা করে তুললেন নাকি?

—ভিক্ষে! বামুনের ছেলের ভিক্ষে করতে তো লজ্জা নেই, তবে বেশী লোকের কাছে যেতে হয় নি। ওপারের সৌরীনবাবু, জমিরুদ্দিন, হীরালালবাবু, এ-পারের নন্দীমশায় আর বদি চাটুজ্যে, এক-শ টাকা করে দিয়ে দিলাম প্রত্যেকে, মিটে গেল। আপনি একটা রসিদ দিয়ে দিন আমাকে, আর আজই ওষুধের অর্ডার দিয়ে দিন।

—নিশ্চয়ই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—পাশের বাড়ির টাইফয়েডটা কি আপনার চিকিৎসাতেই ছিল?

—ভূধরবাবুও দেখছিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বদিবাবু বলিলেন—মর্ফিয়াটা খুব ডেন্‌জারাস্ ওষুধ না কি?

আমাদের সব ওষুধই ডেন্‌জারাস! কিন্তু কি করা যায় বলুন? সিরামটা পাওয়া গেল না, একটা কিছু তো করতে হবে, তাছাড়া মর্ফিয়া তো এর ওষুধই!

বদিবাবু কিছু বলিলেন না, গম্ভীরভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিলেন। ভাবটা যেন আমি তর্ক করিতে চাহি না, কিন্তু মর্ফিয়াটা না দিলেই যেন ভাল করিতেন!

—ওরা কান্নাকাটি করছে না, সব চুপচাপ যে?

—ভোরের ট্রেনে সবাই দেশে চলে গেছে।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—ক'টা রুগী মরল আপনার হাতে?

বিমল হাসিয়া উত্তর দিল—বেশী নয়, গোটা তিনেক।

—সহস্রমারী হতে এখনও দেরি আছে তাহলে! আচ্ছা চলি এখন আমি। ভাল কথা, ও ব্যাপারটার কি করবেন ঠিক করলেন?

—কোন্ ব্যাপারটা?

—থিয়েটারের?

—থিয়েটার করতেই হবে।

—করতেই হবে? না করলে কি হয়?

—এখন পিছানো অসম্ভব।

—ওষুধের বখেড়া মিটে গেল, আবার ওসব কেন! আপনাকে নিজের দলে টেনে রাখবার জন্যেই নন্দী টাকাটা দিয়েছে।

বিমল হাসিয়া বলিল—আমি তো আপনাদের দলেরই।

—তবু কি দরকার ওঁর মনে একটু ধোঁকা ধরিয়ে দেবার?

বিমল চুপ করিয়' রহিল।

বদিবাবু বলিলেন—তাহলে বলি গে নন্দীকে যে থিয়েটার আর আপনি করতে যাবেন না, কি বলেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—মাপ করুন আমাকে, অমরকে কথা দিয়ে ফেলেছি; বিমল চাটুয্যের কথার আজ পর্যন্ত কখনও নড়চড় হয়নি।

বদিবাবু কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—এ চালটা মন্দ দিলেন না তো, অল রাইট—

মৃদু হাসিয়া বদিবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে এক পেয়ালা চা পান করিয়া বিমল বাহির হইল। একটু দূরে গিয়াই নজরে পড়িল পাড়ার রমেশ মোক্তার ও প্রতাপ ডাক্তার তাঁহাদের সনাতন চৌকিটিতে বসিয়া প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। রমেশবাবুও আর মোক্তারি করেন না, প্রতাপবাবুও আর ডাক্তারি করেন না। প্র্যাকটিসের চূড়ান্ত করিয়া প্রায় পনর বৎসর পূর্বে উভয়েই এক দিন একযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এইরূপ জনশ্রুতি। উভয়েই প্র্যাকটিস-জীবনে সত্য-মিথ্যা, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বিচার করিয়া অকারণ সময় নষ্ট করেন নাই—অবহিতচিত্তে উপার্জনই করিয়াছিলেন এবং সেই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ লাখের কোঠায়। চরিত্র দুইটি কিন্তু অদ্ভুত। ইঁহাদের যে বিদ্যাবুদ্ধি অথবা অর্থ আছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে বোঝা অসম্ভব। আধ-ময়লা কাপড় পরিয়া নগ্নগাত্র বৃদ্ধ দুটি সকাল-সন্ধ্যা অতিশয় উষ্মাভরে অতিশয় বাজে বিষয়ে প্রতিদিন কেবলই তর্ক করেন।

প্রতাপবাবু গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, পাকা গোঁফ-দাড়ি আছে; রমেশবাবু ঠিক উল্টা, কুচকুচে কালো, বেঁটে এবং মাকুন্দ। গলার স্বরও দুই জনের দুই রকম! প্রতাপবাবু উদারায় এবং রমেশবাবু তারায় বাঁধা। তর্কের পদ্ধতি এবং বিষয় বিচিত্র। অথচ দুই জনে পরম বন্ধু।

প্রতাপবাবু হয়ত তাঁহার বাজখাঁই গলায় বলিলেন—পটলের দরটা কমছে ক্রমশ, কাল দশ পয়সা হয়েছিল।

মিহি অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রমেশবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিলেন—বাজে কথা, কাল তিন আনা দর ছিল।

—বিশু কি তাহলে মিছে কথা বল্‌লে বলতে চাও, বিশু, বিশু—

ভৃত্য বিশু আসিয়া দাঁড়াইল।

—কাল পটলের সের কত করে ছিল?

—আজ্ঞে দশ পয়সা।

—শুনলে তো, আচ্ছা যা। বিশু চলিয়া গেল।

রমেশবাবু বলিলেন—বাজে কথা, বিশ্বাস করি না। হয়ত পচা বা ছোট জিনিস এনেছে।

—বিশু, বিশু—

বিশু পুনরায় আসিল।

—কাল যে পটল এনেছিস নিয়ে আয় তো।

বিশু পটল লইয়া আসিল, দেখা গেল পটল ভালই।

রমেশবাবু তখন অন্য পথ ধরিলেন। বলিলেন—বিপিনের কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। তোমার বিশু হয়ত অন্য জিনিসে দু-পয়সা মেরেছে, পটলের বেলায় মিথ্যে করে সস্তা দেখিয়ে ভাল-মানুষ সাজছে! আমার বিপিন—

—তোমার বিপিনটি একটি চোর, ওই ডোবাবে তোমায়।

অতঃপর তর্কের বিষয় আর পটল রহিল না, বিপিন চোর, না বিশু চোর ইহাতে পর্যবসিত হইল। তাহার পর ক্রমশ সাধুতা কি, অসাধুতা কি, তাহার পর রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণ, ক্রমশ বেদ-বেদান্ত—এই ভাবেই রোজ চলে। রোজই একটা তুচ্ছ বিষয় হইতে শুরু হইয়া বিষয়ান্তরে উপনীত হয় এবং ক্রমশ তুমুল হইতে তুমুলতর হইতে থাকে। রমেশবাবু এবং প্রতাপবাবু বাল্যবন্ধু, শৈশবে একসঙ্গে খেলা করিয়াছেন, পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াছেন, একসঙ্গেই এক জন ডাক্তারি এবং এক জন মোক্তারি পাস করিয়াছেন, একসঙ্গে একদা গঙ্গাস্নান করিয়া প্র্যাকটিস ত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্তমানে প্রত্যহ একসঙ্গে বসিয়া তর্ক করেন। কাহারও সঙ্গে কাহারও মতের বিন্দুমাত্র মিল নাই, তথাপি কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকিতে পারেন না। ঐ পুরাতন কাঠের চৌকিটিতে উপবেশন করিয়া একটা-না একটা কিছু লইয়া উভয়ে দিনের পর দিন কলহ করিয়া চলিয়াছেন। লোকে ইঁহাদের নাম দিয়াছে 'মাণিকজোড়'।

বিমলের সহিত প্রতিবেশী হিসাবে ইঁহাদের মৌখিক আলাপ মাত্র হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু নয়।

আজ সহসা প্রতাপবাবু বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু রমেশের বগলের এই ফোড়াটা দেখুন তো পেকেছে কি না?

রমেশবাবু তীব্র প্রতিবাদ করিলেন—কি মুশকিল, আমার ফোড়া আমি বুঝতে পারছি না, বলছি পাকে নি।

—আহা, ডাক্তারবাবুকে দেখতেই দাও না।

—দেখুন, বেশী টিপবেন না যেন।

বিমল দেখিয়া বলিল—প্রায় পেকেছে।

প্রতাপবাবু বলিলেন—ওই দেখ।

রমেশবাবু বলিলেন—প্রায় পেকেছে, আর পেকেছে, এক কথা নয়, দেখব আবার কি?

—আমি বলছি তুমি তোকমারি দাও।

তোকমারি দেওয়ার অবস্থা এখনও হয় নি, পুঁই পাতায় গরম ঘি লাগিয়ে আরও দু-একদিন বেঁধে রাখতে হবে।

বিমল বলিল—কেটে দিলেই চুকে যায়।

রমেশবাবু বলিলেন—আপনি সরে যান তো মশায়।

বিমল একটু হাসিয়া পরেশ-দার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। বেশ আছে এই বৃদ্ধ দুইটি। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে সংসার চলে এবং সময় কাটাইবার জন্য তর্ক আছে, নাই বা থাকিল সে তর্কের মাথামুণ্ড, সময় তো কাটে!

পোস্টাফিসে যাইবা মাত্র পরেশ-দা বলিলেন—এই নাও মণিমালার চিঠি!

পরেশ-দা পুনরায় বলিলেন—খুব যদি উত্তেজিত না হয়ে ওঠ তাহলে ঐ কোণের টুলটায় বসে পড়তে পার, হরেন ততক্ষণ চা করুক।

বিমল হাসিয়া বলিল—উত্তেজিত হলেই বা কি?

—টুলটা মজবুত নয়, তাছাড়া কাছেই কালির বোতলটা রয়েছে।

বিমল হাসিয়া টুলটিতে উপবেশন করিয়া পত্রখানি খুলিল।

—তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তুমি কিন্তু আমার চিঠির একটি কথারও উত্তর দাও নি, ভাল প্যাডও কেন নি! একটুও ভালবাস না তুমি আমায়। ওখানকার বাড়িটা কেমন, কিছু লেখনি, 'বাথরুম' আছে তো? গঙ্গার ঘাট থেকে কত দূর, পাড়াপড়শীরা কেমন লোক, সব লিখো এবার। তোমাদের সিভিল সার্জনের মেয়ে তরঙ্গিণী আমাদের সঙ্গেই 'পড়ত' একসঙ্গেই পরীক্ষা দিলাম এবার। সে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি গেছে এখন ঐখানেই থাকবে। আমি গেলে এবার তার সঙ্গে দেখা করব, কেমন? আমি কিন্তু এ মাসটা এখানে থাকতে চাই। এ ক'মাস তো পরীক্ষা পরীক্ষা করেই কেটেছে, সিনেমা-টিনেমা কিছুই দেখা হয় নি। এবার তো কলকাতা থেকে নির্বাসন হবে, তার আগে একটু ফুর্তি করে নেওয়া যাক। তুমি আসতে পারবে কি? এলে বেশ হত। না যদি আসতে পার অন্তত গোটা-কুড়ি টাকা আমাকে পাঠিও, মা বাবার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করে। এতদিন তো ওঁরাই সব খরচ দিয়েছেন, বিয়ে হবার পরও কত টাকা দিয়েছেন, আর কিন্তু নেব না। টাকা তুমি নিশ্চয় পাঠিও। আমার মাকে চিঠি লেখ না কেন তুমি? আমার চিঠি পাওয়া মাত্র তাঁকে ভাল করে একখানা চিঠি দেবে, নইলে তোমার চিঠি আমি চাই না। মা অবশ্য মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হন তা বুঝতে পারি। আমাকে খালি খালি চিঠি দাও অথচ আর কাউকে দাও না, এমন লজ্জা করে আমার, মাকে নিশ্চয় চিঠি দিও।

তোমার প্র্যাকটিস ওখানে একটু একটু বাড়ছে শুনে সুখী হলাম। কত টাকা জমালে? আমার কিন্তু একটা জিনিসের শখ আছে, তাবিজ এক জোড়া, সেটা বুড়ো হবার আগে চাই। দেবে তো?

তোমার বন্ধু অমরবাবুর স্ত্রী বিনোদিনীকে চিনি আমি। লরেটোর মেয়ে, খুব সুন্দরী। ওদের তো 'লভ্ ম্যারেজ'—মেয়েদের মধ্যে ওদের দু-জনকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। রাগ করো না, কিন্তু তোমার বন্ধুটি লোক মোটেই ভাল নন। বেশী মিশো না তুমি ওঁর সঙ্গে। বিনোদিনী এসেছিলো নাকি তোমার বাসায় একদিন? বেশ চমৎকার দেখতে, নয়? আমার চেয়ে ঢের ভালো। কি কি গল্প করলে তার সঙ্গে লিখো। মেয়েটি লেখাপড়াতেও খুব ভালো। অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছে।

অনেক বাজে কথা লিখে কাগজ ভরালাম। এইবার উঠি, সন্ধ্যের 'শো'তে 'ওয়ে অব অল ফ্রেশ' দেখতে যাব। শুনেছি খুব ভাল হয়েছে নাকি বইখানা। পপি আমার টেবিলের নীচে বসে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে। পপিকে মনে আছে তো? আমার সেই ছোট্ট লোমওলা কুকুরটা এমন সুন্দর হয়েছে আজকাল। আমি কিন্তু পপিকে নিয়ে যাব, ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।...

পরেশ-দা বলিলেন—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে যে ভায়া।

বিমল চিঠিটা মুড়িয়া পকেটে রাখিল এবং গম্ভীরভাবে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া একটা চুমুক দিল।

পরেশ-দা বলিলেন—কি হে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? দুঃসংবাদ নাকি কিছু?

—না।

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল চা পান করিতে লাগিল। যোগেন বসিয়া চিঠি শর্ট করিতেছিল, সে বিমলের হাতে আর একখানি চিঠি দিল। এখানি একটি পোস্টকার্ড। পিতৃবন্ধু নিবারণ বাবু লিখিয়াছেন, 'তোমার পৈতৃক জমির খাজনা প্রায় চল্লিশ টাকা বাকী পড়িয়াছে। টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া খাজনাটা শোধ করিয়া দিও। ভাল ভাল জমি, বাকী খাজনার দায়ে যেন নিলাম না হইয়া যায়।' মণিমালার জন্য অবিলম্বে কুড়ি টাকার এবং বাজুর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জমির খাজনার জন্যও চল্লিশ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুইটি চিঠিরই মর্ম—টাকা চাই। বিমল উঠিয়া পড়িল।

পরেশ-দা বলিলেন—এর মধ্যেই উঠছ যে?

—বাঃ, হাসপাতাল যেতে হবে না, সাতটা তো বাজে।

হাসপাতালে ওষুধের কিছু হল?

—এই যে।

বিমল পাঁচ শত টাকার চেকটা পরেশ-দাকে দেখাইল। সমস্ত শুনিয়া উল্লসিত পরেশ-দা বলিলেন—বলেছিলাম তো তোমাকে আগেই, বদিবাবু ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। থিয়েটার আর করছ না তা হলে?

বিমল একটু হাসিয়া বলিল—করছি। বদিবাবুকে বলেছি সব।

—তার মানে?

—পরে বলব, আপনি কাজ করুন।

—না, না, বলে যাও ভাই—পরেশ-দা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। অগত্যা বিমলকে সংক্ষেপে সব কথা বলিতে হইল। সমস্ত শুনিয়া পরেশ-দা বলিলেন—নন্দী কিন্তু চটবে।

—দেখা যাক।

বিমল হাসপাতালে পৌঁছিয়া দেখিল একমুখ হাসি লইয়া সেই বুড়ি বসিয়া আছে। ইন্‌জেকশন লইয়া তাহার মাথাধরা সারিয়া গিয়াছে। শরীরের সমস্ত বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে—উঃ কি ভীষণ নীল বিষ!

ইলেকট্রিসিটির উপকারিতা সম্বন্ধে ভাল একটি প্রবন্ধ বিমলকে লিখিয়া দিতেই হইল—নন্দী মহাশয়কে তুষ্ট করিবার আর কোন উপায় সে ভাবিয়া পাইল না—নন্দী মহাশয় খানিকটা তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু মথুরবাবুর দলকে কিছুতেই বাগাইতে পারিলেন না। শহরে ইলেকট্রিসিটি আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা কর্জ লওয়া হউক—এ প্রস্তাব কিছুতেই পাস হইল না। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে ইলেকট্রিসিটি বর্তমান অবস্থায় যে কিরূপ ব্যয়সাপেক্ষ তাহা মথুরবাবু প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন—এদেশে এখনও অভাব অন্নের, শিক্ষার, চিকিৎসার। এদেশের প্রতি ঘরে ঘরে ক্ষুধিত, পীড়িত, অশিক্ষিত অসহায় লোক যে-অন্ধকারে বাস করিতেছে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়া সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে না। ইলেকট্রিসিটি আসিলে বিলাসপরায়ণ দুই-দশ জন ধনীর হয়ত সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই ইহা অসুবিধা ও অশান্তির কারণ হইবে। দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করিয়া বর্তমানে ইলেকট্রিসিটি আনিবার প্রস্তাব সুতরাং অন্যায় এবং হাস্যকর।

নন্দী ভোটে হারিয়া গেলেন। তিনি আরও ক্লিষ্ট হইলেন যখন তিনি শুনিলেন যে মথুরবাবু নিজব্যয়ে বাড়িতে 'ডাইনামো' বসাইতেছেন। নন্দী-মহাশয়ও যে নিজব্যয়ে বাড়িতে একটা ডাইনামো বসাইতে পারেন না তাহা নয়, কিন্তু এখন বসাইতে গেলে সকলে বলিবে যে তিনি মথুরবাবুর নকল করিতেছেন। প্রাণ থাকিতে তিনি এ অপবাদ সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি যেমন করিয়াই হউক মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যেই শহরে ইলেকট্রিসিটি আনাইবেন। নিজে বাড়িতে বসিয়া বসিয়া একা বৈদ্যুতিক আলো হাওয়া ভোগ করিব এবং বাকী সকলে দারিদ্র্য-নিবন্ধন কষ্ট পাইবে, মথুরবাবুর মত এত বড় স্বার্থপর নন্দী মহাশয় নহেন। মুখে না বলিলেও বিমলের উপর নন্দীমহাশয় মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। নতুন ডাক্তারবাবুটি রোজই নাকি ওপারে গিয়া থিয়েটারের মহড়া দিতেছেন। বদিবাবু তাঁহার চাটুয্যেপ্রীতির বশবর্তী হইয়া এই লোকটিকে আনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছে যে খাল কাটিয়া কুমীরই বোধ হয় আনা হইয়াছে। আসিতে না আসিতে ছোকরা সোজা গিয়া মথুরবাবুর দলে ভিড়িয়া পড়িল। লোকটি এদিকে কথায়-বার্তায় দেখিতে শুনিতে ভালই, চিকিৎসাও মন্দ করে না, হাসপাতালের কাজকর্মের সুখ্যাতি সকলেই করিতেছে, রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে—কিন্তু ছোকরা যদি বিভীষণ হয় তাহা হইলে তো বড় মুশকিলের কথা। মথুর মুখুজ্যেদের সঙ্গে এতটা মাখামাখি মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। বিমলের প্রতি নন্দী-মহাশয়ের মনোভাব ক্রমশই হয়ত আরও বিরূপ হইয়া উঠিত, কিন্তু দুইটি কারণে তাহা আর হইল না। মিউনিসিপ্যালিটির ও হাসপাতাল কমিটির মেম্বার হরেন বোসের উপর নন্দী-মহাশয় চটা। লোকটা কনট্র্যাকটারি

করিয়া হঠাৎ বড়লোক হইয়াছে এবং বড়লোক হইলে যাহা হয় হরেন বোসের ঠিক তাহাই হইয়াছে; আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইলে আঙুল ও কলাগাছ উভয়েরই মর্যাদা নষ্ট হয়। গরিবের ছেলে স্বল্প-শিক্ষিত হরেন বোস টাকার জোরে হঠাৎ সবজান্তা হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি আর্ট, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য সমস্তই তিনি বুঝিতেছেন এবং সব বিষয়েই অসঙ্কোচে মোসাহেব-মহলে মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। যে বস্তুটি থাকিলে মানুষের সঙ্কোচ হয়, সে বস্তুটি তাঁহার নাই। তাঁহার অভিমত শিক্ষিত-সমাজে হয়ত গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু শিক্ষিত সমাজকেই কি তিনি গ্রাহ্য করেন? তিনি যাঁহাদের এবং যাঁহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করেন, সেই সমাজে বাহবা পাইলেই যথেষ্ট। বাহবা পানও। লোকচরিত্র সম্বন্ধেও তাঁহার বিচার দ্বিধা-বিহীন। নন্দী-মহাশয় ভণ্ড, বদিবাবু চতুর, মথুরবাবু ঘুঘু, ডাক্তারটা চালিয়াৎ, পোস্টমাস্টার খোসামুদে, জগদীশবাবু অর্থপিশাচ, ভূধরবাবু তুখোড়—সকলের সম্বন্ধেই হরেনবাবুর অভিমত পাকা। তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভাবলে তিনি সকলেরই আদি-অন্ত নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। একটি মাত্র লোককে তিনি একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তিনি চৌধুরী মহাশয়। কনট্রাকটারির জন্য মাঝে মাঝে টাকার দরকার হইয়া পড়ে এবং ঐ চৌধুরীই তাঁহাকে সে সময় সাহায্য করেন। অনেক সময়, সুদও গ্রহণ করেন না, বিনা হ্যাণ্ডনোটেও দুই-এক বার টাকা দিয়াছেন। এ বাজারে এ রকম লোক বিরল—ইহাই হরেন বোসের ধারণা। হরেন বোসের সহিত বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর সুতরাং বন্ধুত্ব আছে এবং এই দুই জনকে কেন্দ্র করিয়া একটি নাতিক্ষুদ্র দলও মিউনিসিপ্যালিটিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলটি নন্দী-মহাশয় অথবা মথুরবাবুর দলের সহিত একমত নহে, যে-দলে নিজেদের সুবিধা হইবে সেই দলেই ইঁহারা সাধারণত যোগদান করেন। কখনো নন্দী-মহাশয়ের দলে, কখনও মথুরবাবুর দলে, যেখানে যখন সুবিধা। ভোটের লোভে নন্দী-মহাশয় এবং মথুরবাবুও উভয়েই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তাই এ দলটিকে প্রশ্রয় দেন। যুদ্ধে ভোটই যেখানে প্রধান অস্ত্র, সেখানে এতগুলি ভোটের আনুকূল্য পাওয়া কম কথা নহে। বোস-চৌধুরীর দলে কিন্তু কয়েকজন দুর্বল প্রকৃতির লোক আছেন, নানা ভাবে তাঁহারা নাকি সহজে প্রলুব্ধ হন। নন্দী-মহাশয়ের দলের প্রধান পাণ্ডা বদিবাবু সে খবরটি রাখেন এবং বেগতিক দেখিলে ঐ দুর্বল প্রকৃতির লোকগুলির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বল-বৃদ্ধি করেন। কি ভাবে তাঁহারা প্রলুব্ধ হন তা সকলেই জানে, অথচ কেহ কিছু বলে না। আমরাও তাহা ব্যক্ত করিয়া অকারণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে রাজী না। তবে এটা ঠিক কথা, এই দুর্বল প্রকৃতির লোকগুলি না থাকিলে বিমলের এখানে আসা সম্ভবপর হইত না। এই বোস-চৌধুরীর দলেরই কতকগুলি লোককে গোপনে ভাঙাইয়া বদিবাবু জয় লাভ করিয়াছিলেন। এই ইলেকট্রিক ব্যাপারেও বদিবাবু যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেন কি হইত বলা যায় না, কিন্তু বদিবাবুর নিজেরই ইহাতে অমত ছিল। ভোট দিবার বেলায় যদিও নন্দী-মহাশয়ের দিকে ভোট দিয়াছিলেন, কিন্তু বোস-চৌধুরীর দল ভাঙাইবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি যে এ কার্য করিতে পারেন তাহা এক তিনি এবং ঐ দুর্বল প্রকৃতির লোক কয়টি ছাড়া আর কেহ জানে না। এই লোকগুলি যদিও বোস-চৌধুরীর দলের সহিত সংশ্লিষ্ট কিন্তু নিজেদের তাঁহারা কোন দলের সহিত একীভূত করিতে চান না, নিজেদের তাঁহারা স্বাধীনচেতা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বোস-চৌধুরীর দলই অধিকাংশ সময়ে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দেন বলিয়া

সাধারণত এই দলে যোগদান করেন। স্বাধীনচিত্ততার ব্যতিক্রম দেখিলে অন্য দলে যাইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। মিউনিসিপ্যালিটির দলাদলির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হরেন বোস এবং তাঁহার দল ইলেকট্রিক স্কীমের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, তাহার কারণ হরেন বোস নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি এই ইলেকট্রিক কনট্র্যাক্ট্ পাইবেন না। পাইবেন রমেন নন্দী, নন্দী-মশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই অকর্মণ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কোন একটা রোজগারের পন্থায় চালু করিয়া দিবার জন্য নন্দী-মহাশয় বহু কাল হইতে সচেষ্ট আছেন। এ কার্যে তাঁহাকে আর যে-ই সহায়তা করুক, হরেন বোস করিবেন না তাহা ঠিক।

নন্দী সুতরাং হরেন বোসের উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিলেন সেই জন্য তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন যখন সেই হরেন বোসই বিমলবাবু ডাক্তারের নামে এই অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইলেন যে, অতি সামান্য দোষে ঐ ডাক্তারটি হাসপাতালের এতকালের পুরাতন পাচক শিবু ঠাকুর এবং পুরাতন ভৃত্য ভৈরবকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ভৃত্য ভৈরবের জন্য যতটা না হউক, শিবু ঠাকুরের পদচ্যুতিতে হরেন বোসের মর্মাহত হইবার সঙ্গত কারণ আছে বইকি। কারণটি প্রকাশ করিয়া বলিবার মত নহে। কিন্তু কে না এ কথা জানে। সেই শিবু ঠাকুরের চাকরি গিয়াছে, বিমলবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে—নন্দী-মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বিমলের প্রতি তাঁহার অপ্রসন্নতা সহসা যেন খানিকটা কমিয়া গেল। মুখে অবশ্য তিনি হরেনবাবুকে বলিলেন—তাই নাকি? ছেলেমানুষ কি না, মাথা একটুতেই গরম হয়ে যায়, আচ্ছা আমি বলব ওঁকে। বসুন—ওরে ডাব নিয়ে আয়।

হরেনবাবু কিন্তু বসিলেন না, চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই বদিবাবু আসিলেন। তিনি কোর্টে যাইবার বেশে সজ্জিত ছিলেন, আসিয়াই বলিলেন—দেখুন, আমাদের মিটিঙের দিনটা পেছিয়ে দিন, বাজেট মিটিং, ওটাতে আমার থাকা দরকার—

—আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

—আমি আজ বেরিয়ে যাচ্ছি, থার্ডের আগে ফিরতে পারব না! সদরে দুটো কেসও আছে, তাছাড়া ঐ অঞ্চলে আমার কিছু কিছু জমি আছে তা নিয়ে কি সব গোলমাল হয়েছে প্রজাদের সঙ্গে, সেটা মিটিয়ে ফেলতে চাই!

নন্দী-মহাশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বাজেট-মিটিঙে বদিবাবু না থাকিলে তিনি একেবারে নিঃসহায়, অথচ মিটিঙের তারিখও বদলানো অসম্ভব, নোটিশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। শেষ মুহূর্তে বদিবাবু এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ও ঠোঁটের উপর তর্জনীটি স্থাপন করিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

—তারিখ বদলানো অসম্ভব তাহলে?

—কি করে হয় বলুন?

—আচ্ছা বেশ, যাতে সেদিন 'কোরাম' না হয় সে ব্যবস্থা আমি করে যাচ্ছি। আপনি চেয়ারম্যান, আপনি না গেলে ভাল দেখায় না, কিন্তু কেবল আপনি যাবেন আমাদের দলের আর কেউ যাবে না। ও-পারের সতীশ, জমিরুদ্দীন, হীরালাল ওদের মানা করে যাচ্ছি, কেউ আসবে না।

—মথুরবাবুর দলটি তো আসবে?

—ওদেরও দু-চার জনকে আটকাবার ব্যবস্থা করছি। ঠিক হয়েছে, মথুরবাবুর দলের জন-চারেক থিয়েটার নিয়ে মেতেছে, আমাদের ডাক্তারও তো আছে ওর ভেতর, ওকেই টিপে দিয়ে যাই রিহার্সাল-ফিয়ার্সালের কোন একটা ছুতোয় আটকে রাখবে এখন ওদের সেদিন সন্ধ্যাবেলায়! ডাক্তার ওদের মধ্যে গিয়ে বেশ জমিয়েছে শুনছি।

নন্দী-মহাশয় ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেটা কিন্তু আমি খুব সুসংবাদ বলে মনে করি না।

বদিবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িলেন—মনে করেন না মানে?

—মথুরবাবুর সঙ্গে অত ঢলাঢলি ভাল লাগে না মশাই!

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না, ডাক্তার ওখানে গিয়ে এক হিসেবে আমাদের কত সুবিধে হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না? আমি তো এ যোগাযোগটাকে খুব ভাল বলে মনে করি, বিমলবাবু বলেই পেরেছেন।

—কি রকম বলুন তো?

—বিপক্ষের শিবিরে নিজেদের একটা স্পাই থাকা মন্দ কি?

নন্দী-মহাশয় জিনিসটাকে এভাবে একবারও ভাবেন নাই। চক্ষু বিস্ফারিয়া নন্দী-মহাশয় রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন—তাহলে কি বলতে চান—

ঘাড় নাড়িয়া বদিবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ওই। কথাটা কাউকে বলি নি, আপনিও যেন ঘুণাক্ষরে কাউকে বলবেন না, পাঁচ কান হলে আবার—। বিমলবাবুকেও বলবেন না যেন—

—না না, পাগল।

—আচ্ছা এবার উঠি তাহলে আমি।

বদিবাবু চলিয়া গেলেন। সামান্য একটি ক্ষুদ্র মিথ্যার প্রভাবে নন্দী-মহাশয়ের মন নির্মেঘ হইয়া গেল, বিমলের উপর তাঁহার যে অপ্রসন্নতাটুকু ছিল তাহা আর রহিল না। বরং তিনি ভাবিতে লাগিলেন—অতিশয় চতুর ছোকরা তো। থিয়েটারের অজুহাতে বেশ সুড়ঙ্গ কাটিয়া ঢুকিয়াছে! অনির্বাচনীয় স্নেহরসে নন্দী-মহাশয়ের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ইহারই প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আকস্মিকভাবে একটা ঘটনা ঘটিল। বৈকালে বিমল হাসপাতালে কাজ করিতেছিল। গত রাত্রে ভারি সুন্দর একটা রুগী আসিয়াছিল, তাহারই রক্তের স্লাইডগুলি বিমল আর এক বার দেখিতেছিল। কাল রাত্রে স্টেশন-মাস্টার মহাশয় এই সাঁওতাল রুগীটিকে পাঠাইয়াছিলেন। লোকটা থার্ডক্লাস একটা গাড়িতে রক্ত-মাখামাখি হইয়া পড়িয়া ছিল। গাড়িতে আর কেহ ছিল না। নিশ্চয়ই কেহ ইহাকে খুন করিয়া গিয়াছে, সকলেরই এই ধারণা হইয়াছিল। বিমলও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার গায়ে কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই, রক্ত পড়িয়াছে নাক হইতে। সমস্ত গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। রাত্রেই রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—ম্যালেরিয়া। সহজ ম্যালেরিয়া নয়, ম্যালিগন্যান্ট্ ম্যালেরিয়া, সাংঘাতিক জিনিস। রাত্রেই সে একটি কুইনাইন ইন্জেকশন দিয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রুগী উঠিয়া বসিয়াছে। বলিতেছে যে গাড়িতেই তাহার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হইয়া যায়, তাহার পর কি

হইয়াছে সে জানে না। সম্ভবত জ্বরের ঘোরে সে বেঞ্চি হইতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলেই রক্তপাত ঘটিয়াছে। বিমল উত্তর দিকের বারান্দায় বসিয়া রক্তের স্লাইডগুলি আর একবার দেখিতেছিল, এমন সময় গুপিবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ডাক্তারবাবু, সিভিল সার্জন আসছেন—

বিমল সিভিল সার্জনকে ইতিপূর্বে দেখে নাই।

উঠিয়া আসিয়া দেখল খাকি হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা একটি বাঙালী সাহেব একটি চামড়া দিয়া বাঁধানো সরু বেত আস্ফালন করিতে করিতে জগদীশবাবুর সহিত এই দিকেই আসিতেছেন—তাঁহার গোঁফ দুই দিকে কামানো, কিন্তু পাকা, কানের পাশের চুলেও পাক ধরিয়াছে, চোখে-মুখেও বার্ধক্যের স্পষ্ট ছাপ, কিন্তু চলনে বলনে বেশ একটা চটুলতা আছে। বার্ধক্যটাকে অস্বীকার করিয়া একটু যেন বেশী জোরে হাঁটিতেছেন, বেশী জোরে হাসিতেছেন, বেতের সরু ছড়িটাকে একটু বেশী জোরে ঘুরাইতেছেন। বিমল নমস্কার করিতেই জগদীশবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন—ইনিই আমাদের নতুন ডাক্তার, আর ইনি আপনাদের সিভিল সার্জন।

সিভিল সার্জন রিস্টওয়াচটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—চলুন আপনার হাসপাতাল দেখি।

ইন্‌ডোরে ঢুকিয়া বলিলেন—ইন্‌ডোর তো আপনার ভর্তি দেখছি, দ্যাট্‌স্ গুড্—

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুই-একটা টিকিট দেখিলেন।

—অধিকাংশই কালাজ্বর দেখছি, এ-সব রক্ত পরীক্ষা আপনি নিজেই করেন নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজেরই মাইক্রোসকোপ আছে।

—দ্যাট্‌স্ গুড্।

—ম্যালেরিয়া এ-অঞ্চলে কেমন পান? খুব নয়?

—কালকেই তো একটা পেয়েছি।

বিমল সাঁওতাল রুগীর ইতিহাস বলিল এবং স্লাইড দেখাইল, দেখিয়া শুনিয়া সিভিল সার্জন খুশি না হইয়া পারিলেন না। খুশি ভাবটা লক্ষ্য করিয়া জগদীশবাবু বলিলেন—যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন উনি হাসপাতালের জন্যে, আমরা ওঁকে ওষুধ দিতে পারছি না এই হয়েছে এক মুশকিল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—এতগুলো কালাজ্বর কেসের ইন্‌জেকশন কোথায় পাচ্ছেন?

একটু ইতস্তত করিয়া বিমল বলিল—নিজেদের পয়সা দিয়ে কিনে দিচ্ছি, কি আর করব! বদিবাবু কিছু টাকা চাঁদা করে তুলে দিয়েছেন, ওষুধ আনতে দিয়েছি কিছু—

সিভিল সার্জন ও জগদীশবাবুর একটা দৃষ্টি বিনিময় হইল।

সিভিল সার্জন বলিলেন—ভেরি গুড, চলুন আপনার আউটডোর রেজিস্টারটা দেখি।

রেজিস্টারে দেখা গেল রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

সিভিল সার্জন তাহার পর বাহির হইতেই একবার সার্জিক্যাল আলমারিটাতে উঁকি দিলেন।

—ছুরি-কাঁচিগুলিতে ঠিকমত ভ্যাসিলিন দেওয়া হয় তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দ্যাট্‌স্ গুড্। রবার টিউবগুলো অমন করে না রেখে কেরোসিন ভেপারে রেখে দেবেন।

একটি টিনের বাক্স করিয়ে নেবেন, তার মাঝে একটা ফুটোফুটোওয়ালা পার্টিশন থাকবে—নীচে খানিকটা কেরোসিন তেল রেখে দেবেন আর উপরে ঐ টিউবগুলো। আচ্ছা, কোকেন কতটা আছে দেখি—

কোকেন দেখা ও ওজন করা হইল—ঠিক আছে।

সিভিল সার্জন গুপিবাবুকে একটা ধমক দিলেন—তোমার নিক্তি এত ময়লা কেন, আজই পরিষ্কার করবে।

—যে আজ্ঞে।

সিভিল সার্জন বাহির হইয়া আসিয়া বিমলকে প্রশ্ন করিলেন—আপনার ইন্‌ডোরে কি ফিমেল কেস সম্প্রতি মারা গেছে?

—হ্যাঁ, নিমোনিয়া হয়েছিল।

—হার্টটা ফেল করল শেষকালে বুঝি?

—হ্যাঁ, ভয়ও পেয়েছিলো হঠাৎ।

বিমল ভিখারীর ঘটনাটা আনুপূর্বিক বলিল।

সিভিল সার্জন জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তাহলে বেনামী চিঠিতে যা লিখেছে তা একেবারে মিছে কথা নয়। ওরকম ভিকিরি-টিকিরিকে আর আশ্রয় দেবেন না, আর হাসপাতালে নার্স যখন নেই, তখন রুগীর শুশ্রূষা করবার মত আত্মীয়স্বজন না থাকে ভর্তিও করবেন না। অনর্থক বদনাম হয়। আপনার নামে এক বেনামী চিঠি গিয়ে হাজির এক দিন আমার কাছে, আচ্ছা আপনার ভিজিটার্স বুকটা বার করুন।

বিমলের কথায়-বার্তায় কার্যে সিভিল সার্জন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—বেনামী চিঠি সত্ত্বেও বিমলের প্রশংসাসূচক মন্তব্যই করিলেন। তাহার পর হাত-ঘড়িটা আর এক বার দেখিয়া বলিলেন—জগদীশ চল তোমার কেসটা এবার দেখা যাক।

জগদীশ কেমন যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন—চল।

উভয়ে চলিয়া গেলেন।

সেদিন রাত্রে গুপিবাবুর বাসায় বসিয়া হরেন বোস সাগ্রহে সিভিল সার্জনের আগমন-বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু খুব খুশি হইলেন না। বেনামী চিঠি লিখিয়া লোকটাকে জব্দ করা গেল না তো!

হরেন বোসের সহিত বিমলের শত্রুতা তো ছিলই, আরও একটি শত্রু বৃদ্ধি হইল। স্টেশন মাস্টার ঘোষালবাবুর সহিতও সদ্ভাব রক্ষা করা বিমলের পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না। বেঁটে ভুঁড়ি-সর্বস্ব এই লোকটির উপর বিমলের তাদৃশ শ্রদ্ধা গোড়া হইতেই ছিল না। রেলের ডাক্তার জগুবাবুর সহিত আলাপ হইবার পর হইতে বিমল ঘোষালবাবুর উপরে চটিয়াছে। ডাক্তার জগমোহন অতি অমায়িক প্রকৃতির ভদ্রলোক, গোলগাল মুখখানিতে সরলতা যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে, সর্বদাই সকলের উপকার করিবার জন্য ব্যস্ত। অত্যন্ত বেশী ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হয় জগুবাবু তাঁহার ন্যায্য মূল্য কাহারও নিকট হইতে পান না। অতিশয় সুলভ হইয়া তিনি সকলেরই নিকট যেন খেলো হইয়া রহিয়াছেন। জগুবাবুর সহিত দুই-একটি রোগীও বিমল ইতিমধ্যে দেখিয়াছে, ডাক্তার হিসেবে লোকটি মোটেই নিন্দনীয় নহেন, বরং নিরহঙ্কার এবং জগদীশবাবু ভূধরবাবুর অপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক। অথচ এই জগুবাবুর নিন্দায় ঘোষাল

শতমুখ। রেলের আইন-অনুসারে ঘোষাল বিনামূল্যে জগুবাবুর দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারেন কিন্তু সে চিকিৎসা পাইবার জন্য তাঁহাকে তো দুই মাইল দূরে যাইতে হইবে। হাতের কাছে যখন বিনামূল্যেই বিমলবাবুকে পাওয়া যাইতেছে তখন আর অত কষ্ট করিয়া লাভ কি। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তারের নিন্দা করিলে বিমলবাবু হয়ত খুশি হইবেন এই আশায় ঘোষাল সম্ভবত জগুবাবুর নিন্দা করিয়া থাকেন। বিমল সবই বুঝিত, কিছুই বলিত না। ঘোষালবাবুর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি, সুতরাং প্রায়ই বিমলকে তাঁহার বাড়িতে যাইতে হয়। ঘোষাল-গৃহিণীর যক্ষ্মা হয় নাই—হইয়াছিল কোলাই জ্বর (বি কোলাই ইন্‌ফেকশন), ইনজেকশন্ লইয়া ও ঔষধ পান করিয়া তিনি বিজ্বর হইয়াছেন। সুতরাং বিমলের প্রতি ঘোষালের বিশ্বাস আরও অগাধ হইয়াছে এবং কাহারও সামান্য সর্দিজ্বর হইলেও বিমলের ডাক পড়িতেছে। প্রায়ই বিমলকে হাসপাতালের ফেরৎ কিংবা হাসপাতাল যাইবার মুখে ঘোষালবাবুর বাড়ি যাইতে হইতেছে। ইহাতে এত দিন বিমল কিছুই মনে করে নাই, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। বৃষ্টিও বেশ অসাধারণ রকমের। এখানে আসিয়া অবধি এত জোরে বৃষ্টি বিমল এক দিনও দেখে নাই। মেঘের যেমন গর্জন তেমন বর্ষণ। এই বর্ষা-সন্ধ্যায় বিমল একা চুপচাপ বসিয়া ছিল। এই বৃষ্টিতে ওপারে রিহার্সাল দিতে যাওয়া অসম্ভব, হয়ত কেহই আসে নাই। সহসা তাহার নজরে পড়িল ঘরের একটা কোণ হইতে জল পড়িতেছে। তোরঙ্গটা ছিল সরাইয়া আনিল এবং যোগেনকে ডাকিয়া একটা বালতি কিংবা গামলা ঐ জায়গাটায় রাখিতে বলিল, সমস্ত ঘরটা তাহা না হইলে জলময় হইয়া যাইবে। যোগেন বলিল যে পাশের ঘরে এবং রান্নাঘরেও নাকি জল পড়িতেছে। ক্রমশ দেখা গেল দালানেরও উত্তর দিকটার ছাতে ফাটল, সেখান দিয়া বেশ প্রবলভাবেই জল পড়িতেছে। বাড়িটা অবিলম্বে সারানো দরকার। কিন্তু হাসপাতালের ফাণ্ডের কথা চিন্তা করিয়া সে একটু দমিয়া গেল। নিরুৎসাহ ভাবটা কাটাইয়া ফেলিবার জন্য সে বলিল—স্টোভে তেল আছে?

—আজ্ঞে আছে।

একটু জল গরম করে আন দিকি, পরেশ-দার কফি একটু খাওয়া যাক, দুধও গরম কর এক পেয়ালা, চিনি আছে তো?

—আছে।

—কফি খেয়েছিস কখনো তুই?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা খাওয়াচ্ছি তোকে, জল গরম কর তাড়াতাড়ি।

যোগেন মহা উৎসাহে জল গরমের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। মেডিকেল গেজেটখানা খুলিতে গিয়া সহসা তাহার ভিতর হইতে মণিমালার একখানা পুরাতন চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। পুরাতন চিঠি পড়িতে এত ভাল লাগে! মণিমালার চিঠিতে বিশেষ কোন কবিত্ব থাকে না, সাদাসিধা আমি-ভাল-আছি-তুমি-কেমন-আছ গোছ চিঠি, তবু পড়িতে ভাল লাগে। বিমল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রখানি পাঠ করিতেছে এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া হুড়মুড় করিয়া স্টেশনের পয়েন্টসম্যান চন্দু আসিয়া উপস্থিত। এক পা কাদা, সর্বাঙ্গ ভিজা, দুই হাতে দুইটি সিক্ত ছাতা!

—বড়বাবু আপনাকে ডেকেছেন হুজুর, জলদি।

—কেন?

—খোকা খাট থেকে গিরে গিয়ে বেহোঁস হয়ে গেছে।

—তাই নাকি, ঝড় বৃষ্টি পড়ছে যাব কি করে?

—বাবু ছাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন,—চন্দু ছাতা দেখাইল।

এই বৃষ্টিতে বিমলের বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু খোকা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, না গেলেও নয়। যোগেনকে জল গরম করিতে বারণ করিয়া দিয়া অবশেষে বিমল হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া খালি পায়ে বাহির হইয়া পড়িল। একজোড়া মাত্র জুতা আছে, সেটাকে ভিজানো ঠিক হইবে না। চন্দু স্টেশনের একচক্ষু আলোটি আনিয়াছিল তাহারই আলোকে কোনক্রমে বিমল মাস্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া হাজির হইল। সেখানে গিয়া কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক হইয়া গেল। কোথায় কি, কেহই তো অজ্ঞান হয় নাই! মাস্টারমহাশয়ও বাড়িতে নাই, তিনি ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে পাঠাইয়া স্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রটি খাটের উপর হইতে মারামারি করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিল এবং মাস্টারমহাশয়ের গৃহিণীর বর্ণনানুযায়ী পড়িয়া যাইবার পর একটু যেন "কেমন কেমন" করিতেছিল। এখন অবশ্য সব ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তবু যদি ডাক্তারবাবু একবার উহার নাড়িটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখেন! বিমল গম্ভীরভাবে তাহার নাড়ীটা ও বুকটা পরীক্ষা করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল। তাহার যত দূর মনে পড়িল এই মাসেই সে ঘোষালবাবুর ওখানে অন্তত দশ বার গিয়াছে। সে পরদিন চল্লিশ টাকার একখানি বিল ঘোষালবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল। টাকা অবশ্য ঘোষালবাবু দিলেন না, পরেশ-দার অনুরোধে ইহা লইয়া বিমলও আর বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। ঘোষালবাবুর মধ্যে দুইটি পরিবর্তন কিন্তু দেখা দিল, প্রথম তিনি বিমলকে পরিত্যাগ করিলেন, দ্বিতীয় তিনি ভূধরবাবুর ডিস্‌পেন্‌সারিতে মাঝে মাঝে যাতায়াত শুরু করিলেন। তাঁহার মেয়ের জ্বর হওয়াতে ভূধরবাবুই এক দিন আসিয়া দেখিয়া গেলেন এবং বিমল লোক পরম্পরায় শুনিল, ঘোষাল না কি বলিয়াছেন যে পয়সা দিয়া ডাকিতে হইলে ভাল ডাক্তারই তিনি ডাকিবেন, বাজে ডাক্তারকে ডাকিতে যাইবেন কেন! ভূধরবাবু অবশ্য একবারই আসিয়াছিলেন। তাহার পর সাবেক জগমোহনই পুনরায় আসিয়া ঘোষালবাড়ির চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিলেন। বিমল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

দেখিতে দেখিতে আরও মাসখানেক কাটিল। এক দিন মহাসমারোহে 'বিসর্জন' নাটক অভিনীত হইয়া গেল। প্রত্যেকের ভূমিকাই চমৎকার হইয়াছিল। অপর্ণার ভূমিকায় আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে অদ্ভুত অভিনয় করিল। পুরুষ মানুষে মেয়ের ভূমিকা এত সুন্দর করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে বিমল আশাই করিতে পারে নাই। বিমলের নিজের ভূমিকাও চমৎকার হইয়াছিল। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় এ অঞ্চলে আর না কি হয় নাই। মথুরবাবু অভিনয়রসিক, বিমলের অভিনয়ে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একটা সোনার পদক তাহাকে উপহার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ও অঞ্চলের গণ্যমান্য ধনী সকলেরই নিকট অমর টিকিট বিক্রয় করিয়াছিল, সকলেই আসিয়া ছিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটির পরিচয় লাভ করিয়া সকলেই খুশি হইলেন। মহিলাদের জন্য চিকের আলাদা বন্দোবস্ত ছিল; বিনোদিনী, শেফালি

এবং মথুরবাবুর বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা চিকের অন্তরালেই বসিয়া ছিলেন। পর্দা বিষয়ে মথুরবাবু, বিশেষ করিয়া মথুরবাবুর গৃহিণী রীতিমত সনাতনপন্থী। অসূর্যম্পশ্যা না হইলেও আলোকম্পশ্যা যে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পালকি ছাড়া কখনও বাড়ির বাহির হন না। মোটর আছে কিন্তু তাহা খোলা মোটর বলিয়া তাহাতে মেয়েরা চড়ে না। মথুরবাবু একটি ঢাকা মোটর কিনিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মথুরবাবুর স্ত্রীর তাহাতে নাকি ঘোর আপত্তি। তিনি নাকি বলিয়াছেন "আমাদের পালকিই ভাল। পালকি আছে বলে তবু কয়েকটা লোক প্রতিপালিত হচ্চে, মোটর হলে ও বেয়ারাগুলোকে তোমরা তো আর রাখবে না! তাছাড়া ও মোটর-ফোটরের চেয়ে পালকিই আমার বেশী পছন্দ।" মহিলা-দর্শকগণের মধ্যে অধিকাংশই পর্দানশীন ছিলেন। বাহিরে চেয়ারে আসিয়া যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিন জন মেমসাহেব ছিলেন, তাঁহারা সদর হইতে মোটরযোগে অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন—পুলিশসাহেবের স্ত্রী, জজ-সাহেবের স্ত্রী এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী। তাঁহারা অবশ্য বেশীক্ষণ বসেন নাই, খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বাহিরে চেয়ারে একটি বাঙালী মহিলাও বসিয়াছিলেন, তিনি একাই ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ছিলেন। বিমল শুনিল তিনি নাকি সৌরীনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী, কলেজের পাস না হইলেও খুব শিক্ষিতা এবং মার্জিত-রুচি। একটু অতি-আধুনিকতার শুচিবায়ু আছে এবং সেজন্য নাকি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারেন না; যখনই যেখানে যান নিজের একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলেন। এসব সত্ত্বেও নাকি সুপ্রিয়া সরকার মেয়েটি "কোয়াইট্ টলারেবল্"—জয়সিংহ-বেশে সজ্জিত অমর অন্তত সেই কথাই বিমলকে বলিল। সিভিল সার্জন আসনে নাই, কিন্তু তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী নাকি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাবা চিকের অন্তরালে বসিয়াছেন বলিয়া মণিমালার বান্ধবী তরঙ্গিণীকে বিমল দেখিতে পাইল না। মথুরবাবুর বাড়ির কাছেই ক্লাব, সুতরাং তাঁহার সদ্য বসানো 'ডায়নেমো'র সহায়তায় রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম অভিনয়। এই জন্যই সকলের উৎসাহ আরও বেশী হইয়াছিল;—সুবিধা কত! কিন্তু অসুবিধাটাও খানিকক্ষণ অভিনয় হওয়ার পর বোঝা গেল—হঠাৎ সব আলো একসঙ্গে নিবিয়া গেল। অগত্যা অভিনয় কিছুক্ষণ বন্ধ রহিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মেজাজ ও যোগাযোগ ঠিক হইতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল। এমন একটা কলরব উঠিল যে, মনে হইল সব বুঝি পণ্ড হইয়া যায়! নানা রকমের নানা মন্তব্য, নানা গ্রামে নানা রকম শিস চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলেই যখন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ দপ করিয়া আবার সব আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং অভিনয় পুনরায় শুরু হইল। মাঝখানে খানিকটা গোলমাল হওয়াতে একটু রসভঙ্গ অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু অভিনেতাদের অভিনয়গুণে আবার বেশ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না।

অভিনয়ান্তে অমর বলিল—খরচখরচা বাদে ৩১১॥/১০ বেঁচেছে, এর সবটাই কি তুই চাস?

—নিশ্চই!

—কেন, তোমার বদিবাবু তো পাঁচ-শ টাকা জোগাড়ই করেছে।

—না, আমার অনেক দরকার টাকার, আমার বাসাটার চার দিক দিয়ে জল পড়ছে, সারাতে হবে।

—সব টাকা দিচ্ছি না, আড়াই-শ তুমি নাও, বাকিটা নিয়ে আমরা সবাই স্ফূর্তি করি এক দিন। কি বল হে, শরৎ।

শরৎ ছোকরাটি অপর্ণা সাজিয়াছিল। চিরন্তন বখাটে ছোকরা ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারে নাই, থিয়েটার করিতে পারে বলিয়া অমরই তাহাকে এখানকার কো-অপরেটিভের একটা চাকরি জুটাইয়া দিয়াছে। সে একটু বিনীত অথচ অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে হাঁ স্যার্।

—অত টাকা নিয়ে কি স্ফূর্তিটা করবি শুনি?

অমর হাসিয়া বলিল—অত টাকা আর কই, ও কটা টাকাতে কি-ই বা হবে, মাঝ থেকে আমার পকেট থেকে গচ্ছা লাগবে আর কি! এক কাজ করলে হয়, সতীশখুড়োকেও দলে টানলে মন্দ হয় না; তাঁরই বাগানবাড়িতে জোটা যেতে পারে।

বিমল এ-সবের নিগূঢ় অর্থ কিছুই বুঝিতেছিল না। সতীশবাবু নামটা কিন্তু তাহার পরিচিত, সতীশবাবুর ভায়ের সে কালাজ্বর চিকিৎসা করিয়াছে, সেই সতীশবাবু না কি! জিজ্ঞাসা করিতেই অমর বলিল—হ্যাঁ সেই।

—তোর খুড়ো হয়?

—হয় বইকি এক সম্পর্কে, আমার বোন শেফালির খুড়শ্বশুর। জ্যোতিষবাবুর ছেলের সঙ্গে শেফালির বিয়ে হয়েছে কি না! ওরা তিন ভাই—জ্যোতিষ, সতীশ, অতীশ। তুই অতীশের চিকিৎসা করেছিলি।

একটু থামিয়া অমর পুনরায় হাসিয়া বলিল—শেফালির বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই সতীশবাবু আমাদের খুড়ো, উনিই তো প্রথমে হাতেখড়ি দেন আমাদের! এক হিসেবে গুরুদেবও।

শরৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসি গোপন করিতে করিতে মুখের পেণ্ট তুলিতেছিল।

অমর গম্ভীরভাবে বলিল—খুব মজলিসি লোক আমাদের সতীশখুড়ো, আলাপ করে দেখিস, খুড়োরই বাগানবাড়িতে গিয়ে জমায়েৎ হওয়া যাবে একদিন!

এতক্ষণ বিমল লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু এইবার অমর প্রকাশ্য ভাবে আলমারির পিছন হইতে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বাহির করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিল। বিমলেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

—ছি ছি, অমর এ কি!

অমর একটু থিয়েটারি ভঙ্গী করিয়া বলিল—কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু, কিছু নয়!

তাহার পর বলিল—তুই এখন বাড়ি যা, তিনটে চারটে নাগাদ আমি টাকা নিয়ে তোর ওখানে যাবে। তুই যা এখন—

ভোরবেলা নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইতে বিমলের কেবল অমরের কথাই মনে হইতে লাগিল। ছেলেটা সত্য সত্যই একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। অমন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি শরীরে, তাহার উপর মদ ধরিয়াছে! বেচারী বিনোদিনী! সেদিন গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে বিনোদিনী ও অমর তাহার বাসায় আসিয়াছিল। বিনোদিনীর জ্যোৎস্নালোকিত মুখচ্ছবিটি বিমলের বার-বার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিনোদিনী কি এখনও অমরকে তেমনই ভালবাসে যাহার প্রেরণায় এক দিন সে তাহাকে লুকাইয়া বিবাহ

করিয়াছিল? অমরের অধঃপতনের কিছু মাত্র ইঙ্গিত কি তাহার অন্তর্যামী মন পায় নাই! সব জিনিসই কি কথায় প্রকাশ করিতে হয়, অকথিত কত জিনিসই তো আমরা এমনিই বুঝিতে পারি। কোথায় যেন সে পড়িয়াছিল ভগবান আমাদের ভাষা দিয়াছিলেন মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য নয়, গোপন করিবার জন্য। উক্তিটা হয়ত অত্যুক্তি, কিন্তু খানিকটা সত্য আছে বইকি উহার মধ্যে। অমর কেমন স্বচ্ছন্দে বিনোদিনীকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। সত্যই ভুলাইতে পারিয়াছে কি? বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হয়। পারঘাটে নামিয়া বিনোদিনীর কথাই ভাবিতে ভাবিতে বিমল অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতেছিল এবং অন্যমনস্ক ভাবেই কখন নিজের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল খেয়াল ছিল না. হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল যখন তাহার মেজশালা শুভেন্দু তাহাকে সম্বোধন করিল।

—জামাইবাবু, আমরা এসে গেছি! দিদি, জামাইবাবু এসেছেন! বিস্মিত বিমল বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিল হাতলভাঙ্গা সেই চেয়ারটার উপর মণিমালা স্মিতমুখে বসিয়া আছে। বিমল ঢুকিতেই মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তোমাকে আশ্চর্য করে দেব বলে কোন খবর না দিয়েই আমরা এলুম—এসে নিজেরাই বেকুব! মা কিন্তু বলেছিলেন—নয় রে খোকা— যে ডাক্তার মানুষ কলে-টলে কোথাও বেরিয়ে গেলে মুশকিলে পড়বি তোরা! ওকি, তোমার মুখে ও-সব কি!

বিমল হাসিয়া বলিল--পেন্টগুলো ওঠেনি ভাল করে!

—কিসের পেন্ট?

—কাল রাত্রে থিয়েটার করতে গেছলাম ওপারে।

—কি থিয়েটার?

—'বিসর্জন'।

—হঠাৎ থিয়েটার! ওপারে কোথায়?

—অমরদের ওখানে।

মণিমালার মুখে নিমেষের জন্য একটা ছায়াপাত হইল।

—কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ থিয়েটার?

বিমল অকারণে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, যেন কি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়া সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। হাসিয়া বলিল—আমাদের হাসপাতালে কিছু টাকার দরকার পড়েছিল, তাই থিয়েটার করে সেই টাকাটা তোলা গেল!

—টিকিট করে হয়েছিল বুঝি?

—হাঁ, দাঁড়াও আমি আগে মুখটা পরিষ্কার করে ফেলি।

বিমল তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল।

একটু পরে বিমল বাথরুম হইতে বাহির হইতেই মণিমালা আসিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি কি!

—কি?

—ওই চেয়ারে তুমি বসতে, ওই চৌকিতে ওই বিছানায় শুতে!

—স্বচ্ছন্দে!

—ছি, ছি তোমরা সব পারো। এই ময়লা গেঞ্জি পরে রোজ তুমি হাসপাতালে যাও! চাকরটাকে বলতে পার না একটু সাবান দিয়ে দিতে!

চাকরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিমল মিথ্যাভাষণ করিল।

—সাবান তো প্রায়ই দেয়।

—দেয় না আরও কিছু ! ছি ছি ঘরদোর কি করে রেখেছ, আজই থামো পরিষ্কার করাচ্ছি! পরিষ্কার করাবই বা কি করে যা বিচ্ছিরি তোমার ঘরের মেঝে, সিমেণ্ট উঠে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে ফাটলে ফাটলে সব যত রাজ্যের ময়লা!

বিমল বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজে যে-সব বিষয়ে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে না, সেই সব বিষয় লইয়া এই তরুণীটি তো মহা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তরুণীটি অপর কেহ নহে তাহারই সহধর্মিণী! বারান্দার এক প্রান্তে স্তূপীকৃত জিনিসগুলির প্রতি সে চাহিয়া দেখিল। অনেক জিনিস আনিয়াছে তো। একটা বড় তোরঙ্গ, একটা চামড়ার সুটকেস, একটা ছোট হাতবাক্স, তাছাড়াও আর একটা অ্যাটাচি-কেস—প্রত্যেকটিতেই বেশ পরিচ্ছন্ন খাকির ওয়াড় পরানো। হোল্ড-অলে চামড়ার স্ট্যাপ দিয়া বাঁধা বিছানার ফাঁকে যে বালিশটি উঁকি দিতেছে তাহাও বেশ ঝালর-দেওয়া ওয়াড়-পরানো এবং ঝালরের ওধারেও লাল সুতা দিয়া কি একটা কারুকার্য করা আছে যেন! ইহা ছাড়া প্রকাণ্ড একটা মাটির হাঁড়িতে কি যেন রহিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড পুঁটুলি, কাপড় দিয়া বাঁধা চৌকোণা ও বস্তুটা কি! ওদিকে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ভিতরই বা কি রহিয়াছে! মণিমালার সঙ্গে যে এতগুলো জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহা তো বিমল একবারও ভাবে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—কুকুরটা কই দেখছি না।

—সেটা মিনু কিছুতেই ছাড়লে না, এমন আবদারে মেয়ে জন্মে দেখি নি কখনো, এমন কাঁদতে লাগলো—

বিমল মনে মনে মিনুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইল।

—ওরে খোকা, খোকা কোথা গেল—

শুভেন্দু সোজা গঙ্গার ধারে চলিয়া গিয়াছিল। গঙ্গায় সার বাঁধিয়া পাল তুলিয়া নৌকা যাইতেছে, অবাক হইয়া সে তাহাই দেখিতেছিল। কলিকাতায় জন্ম। কলিকাতাতেই মানুষ, এই ফাঁকা গঙ্গার ধারটি তাহার ভারি ভাল লাগিতেছিল। যোগেন তাহাকে ডাকিতে গেল।

বিমল বলিল—একটু চা খেয়ে এইবার হাসপাতালে যাওয়া যাক! ওই হাঁড়িটাতে কি আছে?

—সন্দেশ, ভীম নাগের ওখানকার ভাল সন্দেশ। খাও না।

—ওই চৌকোণা জিনিসটা কি বল দিকি?

—ওই আয়না।

—কেরোসিন কাঠের বাক্সে ওটা কি?

—ওটা একটা সেলায়ের কল, নতুন কিনে এনেছি। তোমাকে কিন্তু মাসে মাসে ওর ইন্স্টলমেণ্ট দিতে হবে, বেশী নয় পাঁচ টাকা করে—

—বেশ।

হাসপাতালে গিয়া কিন্তু বিমল একটি দুঃসংবাদ পাইল। কাল রাত্রে সে যখন থিয়েটার

করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন একটি কলেরা রুগী হাসপাতালে আসিয়াছিল এবং একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই মারা গিয়াছে। চশমার কাচের উপর দিয়া তাকাইতে তাকাইতে গুপিবাবু ভালমানুষের মত বলিলেন—আমি ভাবলাম বুঝি সাধারণ ভেদবমি, কলেরা বলে অতটা ধরতে পারি নি, পারলে জগদীশবাবু কি ভূধরবাবু কাউকে খবর দিতাম!

অযৌক্তিকভাবে বিমল বলিল—আমাকে খবর দিলেই পারতেন!

—চশমার কাচের উপর দিয়া গুপিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ বিমলের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বলিলেন—তা কি হয়, আপনি একটা 'মেন' পার্টে ছিলেন।

—একটা দুটো কলেরা ফাজ্ খাইয়ে দিলেও তো পারতেন!

—চাবি যে আপনার কাছে।

বিমল চুপ করিয়া রহিল, সত্যই তাহার বলিবার কিছু নাই।

গুপিবাবুর প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করিবার জন্য সে নিজেই কিছুদিন হইতে আলমারির চাবি নিজের কাছে রাখিয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া যন্ত্রচালিত দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। ঘুমও পাইতেছিল, কাল সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই। বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তাহার প্রথম রুগী সেই বুড়িটা—যাহাকে সে স্টেশন হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল তাহার জন্য কয়েকটি হাঁসের ডিম লইয়া সসঙ্কোচে বসিয়া আছে। বিমলকে ডিমগুলি দিয়া সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

বিমলের বার বার কলেরা রুগীটার কথা মনে হইতে লাগিল। আহা, বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে।

বৈকালে অমর আসিল। বিমলের হাতে সে ৩১১।।/১০ দিয়া বলিল—তখন ঠাট্টা করছিলাম, এ টাকা কি অন্য কিছুতে খরচ করতে পারি!

তাহার পর হাসিয়া বলিল—বাবা তোর জন্যে আজ একটা সোনার মেডেল গড়াতে দিলেন! আর একটা কাজও তিনি করেছেন আজ।

—কি?

—হাসপাতালে কাল রাত্রে একটা কলেরা রুগী নাকি বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, সে-কথা তিনি রিপোর্ট করেছেন সিভিল সার্জন আর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে!

বিস্মিত বিমল চুপ রহিল।

এই বিপদেও বদিবাবু বিমলকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারই পরামর্শ-অনুযায়ী সে কর্তৃপক্ষগণের নিকট জবাবদিহি করিল যে হাসপাতাল-কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে সে থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল এবং ঐ থিয়েটার হাসপাতালেরই সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, শখের জন্য নয়। আরও লিখিল যে, তাহার অনুপস্থিতিকালে হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার ছিলেন রুগীকে কিছু ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, একেবারে বিনা চিকিৎসাতেই মরিয়াছে একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বদিবাবু নন্দী-মহাশয়ের স্বাক্ষরিত অনুমতি-পত্র আনিয়া দিলেন এবং বিমল সেটি তাহার জবাবদিহির সহিত গাঁথিয়া পাঠাইয়া দিল। আরও শোনা গেল স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী নাকি বদিবাবুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে

ইহা লইয়া ঘাঁটা-ঘাঁটি না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী খানিকক্ষণ বসিয়া থিয়েটার দেখিয়াছিলেন, অভিনয় তাহার নাকি ভাল লাগিয়াছিল, তা ছাড়া একটা সৎকার্যের জন্য যখন হইতেছে মোট কথা ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল, বিমলের কিছুই হইল না।

এই প্রসঙ্গে হরেন বোস সক্ষোভে চৌধুরীকে বলিলেন—এই ডাক্তার ছোকরার কেন্দ্রে বোধহয় বৃহস্পতি আছে, বুঝলেন!

চৌধুরী বলিলেন—সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে নন্দী-মহাশয় সহাস্য মুখে বিমলকে বলিলেন—কি রকম ডাক্তারবাবু; পরিচয় পেলেন তো কি রকম কেউটেটি!

বিমল স্মিতমুখে বলিল—আশ্চর্য লোক, অথচ ওঁর ছেলেরই অনুরোধে আমি রাজি হয়েছিলাম—

আশ্চর্য লোক নয়, পাজি লোক।

একটু থ'মিয়া পুনরায় বলিলেন—অত্যন্ত হারামজাদা ব্যক্তি!

বিমল কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বদিবাবুর সঙ্গেও এক দিন দেখা হইয়াছিল। তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—ওষুধপত্তর তো সব এসে গেল, আর কি, এইবার পাড়ি জমিয়ে ফেলুন! ভূধর আর জগদীশকে চটাবেন্ না, ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করুন।

—আচ্ছা।

মণিমালা ইতিমধ্যে সংসার গুছাইয়া ফেলিয়াছে। ঠিক মনোমত ভাবে নয়, মোটামুটি। প্রথমেই সে ঐ হাতলভাঙ্গা চেয়ার ও লড়বড়ে চৌকিটাকে সংস্করণ করাইয়াছে, সামান্য একটু সারাইয়া বার্নিশ করিয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে। ঘরে ঘরে ঝুল ছিল, দালানে পাখির বাসা ছিল, উঠানের কোণটা একটা আঁস্তাকুড় হইয়াছিল যেন! চায়ের পাতা, ছেঁড়া কাগজ, সিগারেটের খালি বাক্স, কনডেনস্ড্ মিল্কের খালি টিন, এঁটোকাঁটা কি না ছিল ওখানে! যোগেনকে দিয়া মণিমালা সব পরিষ্কার করাইয়াছে, পরিষ্কার করাইবার সময় কত বড় প্রকাণ্ড একটা বিছা বাহির হইল! অনায়াসে সাপও থাকিতে পারিত। ওদিককার ঘরটাও কি কম নোংরা হইয়াছিল! যত রাজ্যের পুরাতন খবরের কাগজ, একটা ছেঁড়া বালিশ, কালিহীন একটা শুকনো দোয়াত, আর যোগেনের একটা ময়লা বিছানা! ওইটুকু ছোঁড়া বিড়ি খায় কত, বিড়ির টুকরায় সমস্ত ঘরটা যেন পরিপূর্ণ! যেমন প্রভু, তেমনি ভৃত্য! ও-ঘরটা পরিষ্কার করিয়া মণিমালা যোগেনের শুইবার ব্যবস্থা বাহিরের ঘরটাতে করিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে বিছানাপত্র যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আর বিড়ি খাইয়া যেন ঘরে না ফেলে। নিজের কলটি, আয়নাটি, বাক্সগুলি বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইবার পর মণিমালা আবিষ্কার করিয়াছে দুইখানি টেবিল, খানচারেক ছোট ছোট 'ডিসেন্ট' চেয়ার, একটি আলনা, একটি ছোট ঘড়ি না হইলে চলিবে না। ওগুলি অবিলম্বে চাই। ছোট ছোট গোটা-দুয়েক তেপায়া, একটি আরামকেদারা, একটি 'হোয়াট নট' পরে কিনিলেও চলিবে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস অবিলম্বে চাই—একটা মিট-সেফ্। এ-সব তো গেল আসবাবপত্র। ঘরের দেওয়াগুলি চুনকাম করানোর দরকার, জানালা-কপাটগুলিও রং

করাইতে হইবে, মেঝেটা আর একবার সিমেন্ট করাইয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। ঘরের তালাগুলোও কি বিশ্রী। উহারই উপর খবরের কাগজ পাতিয়া মণিমালা আপাতত চালাইতেছে বটে কিন্তু গোটা দুই ভাল কাচের আলমারি তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে।

হঠাৎ কলেরা এপিডেমিক শুরু হইয়া গেল।

হাসপাতালে প্রতি দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অন্তর রুগী আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে হাসপাতাল ভর্তি হইয়া গেল। শেষে বিমল হাসপাতালের সামনের মাঠটায় খড়ের চালা তুলিয়া রুগী রাখিতে শুরু করিল। থিয়েটারের টাকাটা হাতেই ছিল, টাকার জন্য কাহারও কাছে হাত পাতিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে চালাগুলিও ভরিয়া গেল, সেখানেও স্থানাভাব। যাহাদের হাসপাতালে স্থান দিতে পারিল না তাহাদের বাড়ি গিয়াই বিমল তাহাদের চিকিৎসা করিতে লাগিল। তাহার স্নানাহারে অবসর নাই—কেবল স্যালাইন, 'ফাজ' আর ভ্যাকসিন! দুলু এবং গুপিবাবুও খুব খাটিতে লাগিলেন,—দুলু প্রাণ দিয়া, গুপিবাবু প্রাণের দায়ে। ঘরে ঘরে মাছির মত লোক মরিতেছে! যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—অসহায় দীন-দরিদ্রের দল!

মণিমালা ভয় পাইয়া গেল! তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার স্বামী এ কি করিতেছে! নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখা তো উচিত, একাই সকলকে দেখিতে হইবে তাহারই বা মানে কি। রোজগার হইলেও বা না হয় কথা ছিল, অনর্থক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এ সব কি কাণ্ড! একটুও ভাল লাগে না তাহাব! বিমলকে বলিলে সে কথা শোনে না। সে দিনরাত পাগলের মত ঘুরিতেছে! সবাই যে বাঁচিল তা নয়, অনেক মরিল অনেক বাঁচিল। এই কলেরা রুগী লইয়াই বিমলের বদনাম হইয়াছিল, ইহাতেই তাহার আবার সুনামও হইল। হাসপাতালের নতুন ডাক্তার বাবুটির সুখ্যাতিতে দেশ ছাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এক]

ছয় মাসের মধ্যে দেখিতে দেখিতে বিমলের প্র্যাকটিস্ জমিয়া উঠিল। সব দিক্ দিয়াই সুবিধা হইয়া গেল। হাসপাতালে ঔষধের অভাব নাই, রুগী অনেক আসিতেছে এবং তাহাদের মুখে মুখে বিমলের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নন্দী-মহাশয় এবং বদিবাবু তো বিমলের পক্ষে আছেনই, হাসপাতাল-কমিটির অন্যান্য সদস্যগণও তাহার উপর প্রসন্ন হইতেছেন। এমন কি হরেন বোস এবং চৌধুরী মহাশয়েরও উগ্রভাবটা যেন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। আর কিছু নয়, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'ট্যাক্ট'' অর্থাৎ লোক পটাইবার ক্ষমতা তাহা যে বিমলের যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর অবকাশ নাই। কোন রকমে চৌধুরী মহাশয়কে আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে হরেনবাবুও তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িবেন, তাহা বিমল বুঝিয়াছিল। একদিন সুযোগও ঘটিয়া গেল। চৌধুরী মহাশয়ের ছোট নাতিটি পীড়িত হইয়া পড়িল। বছর-দেড়েক বয়স, ভয়ানক জ্বর। সাধারণত জগদীশবাবু চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে অসুখ হইলে দেখেন, এবারও তিনি দেখিতেছিলেন। কিন্তু বিমলের সৌভাগ্যক্রমে শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। জগদীশবাবু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—বিমলবাবুর মাইক্রোসকোপ আছে, ওঁকে ডেকে রক্তটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নিন। সুবিধে রয়েছে—সিভিল সার্জনের সহিত জগদীশবাবুর গোপনে কি কথাবার্তা হইয়াছে তাহা অজ্ঞাত, কিন্তু আজকাল জগদীশবাবু প্রায়ই বিমলের মাইক্রোসকোপের সাহায্য লইতেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক জগদীশবাবু আর একটা কথাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বোধ হয়। চিকিৎসা-ব্যাপারে দায়িত্বটা যত ভাগাভাগি হইয়া যায় ততই মঙ্গল। তিনি রক্তপরীক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় হরেন বোসের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে করিতে বড় দেরি করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাও বিমলের পক্ষে ভারি সুবিধাজনক হইল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকিলে বিমল হয়ত আসিয়াই রক্তই পরীক্ষা করিত এবং কিছুই পাইত না। কিন্তু দেরি করিয়া ডাকার ফলে ডিপথিরিয়ার লক্ষণসমূহ বেশ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, বিমল রক্ত পরীক্ষা না করিয়া গলা পরীক্ষা করিল এবং গলা হইতে একটা 'সোয়াব' লইয়া দেখিতেই ডিপথিরিয়া ধরা পড়িল। গ্রহ যখন প্রসন্ন হন এমনই হয়। সৌভাগ্যক্রমে ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক 'সিরাম'ও সে সম্প্রতি ডাক্তারখানায় আনাইয়াছিল। এত দামী ঔষধ এসব হাসপাতালে সাধারণত থাকে না, তবু যদি কখনও দরকার পড়ে এই জন্য বিমল দুইটা টিউব আনাইয়া রাখিয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সেগুলি কাজে লাগিয়া গেল। চৌধুরীর নাতি যখন ভাল হইয়া গেল তখন গদ্গদ চৌধুরী বিমলকে বলিলেন—এ ঋণ আমি কখনও শুধতে পারব না ডাক্তারবাবু, তবু আপনার পারিশ্রমিক কত দিতে হবে, সেটা অনুগ্রহ করে বলুন।

বিমল হাসিয়া বলিল—আপনার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেব কি! কিছু দিতে হবে না আপনাকে।

—না, না, এত মেহনত করলেন আপনি—

—কিছু না, এটা তো আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। সবার কাছেই কি আর পয়সা নেওয়া চলে, আপনারা হলেন ঘরের লোক—

—না, না, সেটা—

বিমল কিন্তু এক পয়সা লইল না। চৌধুরী-বিজয় সম্পূর্ণ হইল।

জগদীশবাবু সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ভারি পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমি তো বললুম চৌধুরী মশায়, মাইক্রোসকোপের সাহায্য নইলে আপনার নাতির ব্যায়রামটি ধরা পড়বে না! কেমন, বলি নি আমি?

তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি কাঁপিতে লাগিল।

বিমল স্মিতমুখে জগদীশবাবুর মুখের পানে চাহিল এবং বলিল—আমি তো মাইক্রোসকোপে দেখে তবে ধরলুম, আপনি তো না দেখেই অনেকটা বুঝতে পেরেছিলেন, আপনাদের চোখই আলাদা, আপনাদের মত এক্স্‌পীরিয়েন্স্‌ হতে ঢের দেরি এখন আমাদের—

তাহার পরদিনই জগদীশবাবু বিমলকে আর একটি রক্ত পরীক্ষা করিতে দিলেন এবং বিমলও একটি টাইফয়েড কেসে এক রকম অকারণেই তাঁহাকে "কনসালটেসান" অর্থাৎ পরামর্শ করিবার অজুহাতে ডাকিল। একেবারে অকারণে নয়, রুগীটি শাঁসালো, একটু ধুমধাম করিয়া চিকিৎসা না করিলে হাতছাড়া হইয়া যাইত। জগদীশবাবু আসিয়া সিভিল সার্জনকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

সিভিল সার্জনের সহিতও বিমলের বেশ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। প্রথমত এই উদ্যমশীল যুবক ডাক্তারটিকে প্রথম দিন হইতে তাঁহার বেশ ভাল লাগিয়াছে—এই মৃতপ্রায় হাসপাতালটিকে ছোকরা নিজ চেষ্টায় পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে তো! দ্বিতীয়ত, তাঁহার কন্যা তরঙ্গিণীর সখী ইহার স্ত্রী। মণিমালাকে লইয়া বিমল একদিন তরঙ্গিণীর সহিত দেখাও করিয়া আসিয়াছে। বিমলকে দেখিয়া তরঙ্গিণীর মা এবং সকলেই খুব খুশি। সিভিল সার্জনের মনেও কেমন যেন একটা বাৎসল্যভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। তৃতীয়ত সুবিধা পাইলেই বিমল তাঁহাকে 'কল' দিতেছে। সেদিনে তো একটা অপারেশনের জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহাকে প্রায় দুই শত টাকা পাওয়াইয়া দিল। সুতরাং অনিবার্যভাবে সিভিল সার্জন মহাশয় বিমলকে সুচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

মনিবরা সকলেই যখন সুপ্রসন্ন তখন আর ভাবনা কি! হাসপাতাল-কমিটির মেম্বারদের বাড়িতে বিনা-পয়সায় দেখিলেই তাঁহারা খুব খুশি থাকেন। তা ছাড়া বিমল ইঁহাদের নিকট পয়সা লইবেই বা কিরূপে, জগদীশবাবু, ভূধরবাবু কেহই ইহাদের নিকট পয়সা গ্রহণ করেন না। যদিও ইহারা সকলেই বড়লোক, ফী দিয়া ডাক্তার ডাকিতে সক্ষম, কিন্তু এখানকার রেওয়াজ এমনই দাঁড়াইয়া গিয়াছে! বিমল কেন শুধু শুধু সেই চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিতে যাইবে! মোট কথা বিমলের প্র্যাকটিসের পথ মোটেই দুর্গম রহিল না। পুষ্পাকীর্ণ না হইলেও কণ্টাককীর্ণ রহিল না তাহা ঠিক!

পারঘাটায় নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বিমল সেদিন বেশ একটু উত্তেজনাভরেই গিয়া ওপারে দামী মোটরটিতে আরোহণ করিল। বাঘমারির জমিদারবাবু সৌরীন্দ্রমোহন বসুর বাড়ি হইতে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। সৌরীনবাবু এ অঞ্চলের এক জন বর্ধিষ্ণু জমিদার, বেশ শিক্ষিত এবং ধনী। সৌরীনবাবুর বাড়িতে বিমল এই প্রথম যাইতেছে। কি অসুখ এবং কাহার অসুখ কিছুই জানা নাই, সৌরীনবাবু কেবল একবার যাইতে লিখিয়াছেন। বাঘমারি গ্রামটি প্রায়

বারো মাইল দূরে। মোটরে চড়িয়া বসিতেই কেতাদুরস্ত ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। নিঃশব্দ গতিতে গাড়ি ছুটিতে লাগিল। বারো মাইল পথ অতিক্রম করিতে অবশ্য বেশী সময় লাগিল না। মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরেই গাড়ি প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা এক অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া গাড়ি-বারান্দার নীচে থামিল। বিমল গাড়ি হইতে নামিয়া দেখিল দূরে ডিম্বাকৃতি তৃণাস্তৃত 'লনে' একটি ছোট টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি মহিলা এবং দুই জন পুরুষ আরামকেদারায় বসিয়া রহিয়াছেন। ড্রাইভার বলিল—আপনি হুজুর ঐখানেই যান, বাবুসাহেব ঐখানেই রয়েছেন।

বিমল অগ্রসর হইল! বিমলকে আসিতে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া একজন ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বিমলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। এ ভদ্রলোকটিকে বিমল ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই। খুব ফরসা চেহারা, গালের দুই দিকে বেশ বড় জুলফি, সুলালিত এক জোড়া কালো কুচকুচে গোঁফ, আরক্ত চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত।

—আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু বসুন।

প্রৌঢ় সৌরীনবাবুকে বিমল চিনিত, তিনিও সেখানে বসিয়াছিলেন। বিমল তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি মোটা সিগারটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন—আসুন, ঐ আপনার রুগী—সিগার দিয়াই তিনি উপবিষ্টা একটি মহিলাকে দেখাইয়া দিলেন। সুপ্রিয়া সরকারকে বিমল আগেই চিনিতে পারিয়াছিল।

—কি হয়েছে ওঁর?

সুপ্রিয়া বলিলেন—কিছুই হয় নি। অসুখ আমার নয়—অসুখ এঁদের—

অপর যে মহিলাটি বসিয়াছিলেন তিনি সুপ্রিয়ার জননী ভগবতী দেবী। তিনি বলিলেন—ঐটেই ওর প্রধান অসুখ, ওর ধারণা ওর কিছু হয় নি, অথচ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে!'

জুলফিদার যুবকটি বলিলেন—এক মিনিট বসুন ডাক্তারবাবু, আমি এখনি আসছি—

তিনি চলিয়া গেলেন। সৌরীনবাবু সিগারে এক টান দিয়া ঠোট দুইটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার কালো দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। তিনি সহসা সমস্ত ধোঁয়াটা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—আবার আপনাদের থিয়েটার হচ্ছে কবে, পুজোর সময় হবে না কি?

বিমল হাসিয়া বলিল—কি জানি আমার সময় হবে না বোধ হয়, আর—

—অমরও তো দেশোদ্ধারে মেতেছে, সকলেই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে মুশকিল!

সুপ্রিয়ার মা কি যেন একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। সৌরীনবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং চুরুটে মৃদু একটা টান দিয়া সুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বউদিদি চটছে, বুঝলি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়ার মা কিছু না বলিয়া টেবিলের উপর হইতে তাঁহার অসমাপ্ত উলের সোয়েটারটা তুলিয়া লইয়া বুনিতে শুরু করিয়া দিলেন।

সৌরীনবাবু তাঁহার পূর্ব উক্তির সমর্থন করিয়া পুনরায় বলিলেন—সবাই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে পৃথিবীতে টেকা মুশকিল। অকেজো লোকদের আলসেমির দৌলতেই পৃথিবীটা বাসযোগ্য—এ কথা সবাই ভুলতে বসেছে এই ইউটিলিটির যুগে, আমরা ক্রমাগতই ভুলে যাচ্ছি যে মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার পথে এই ইউটিলিটি-বাদ প্রধান অন্তরায়, এ-কথা তুমি স্বীকার কর না বউদি?

বউদিদি সোয়েটারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন—বুঝতেই পারছি না তোমার কথা, বাংলা করে বল।

সৌরীনবাবু বলিলেন—ইউটিলিটির বাংলা কি সুপ্রিয়া?

—উপযোগিতা।

—ও ভারি খটমট হল; কেজোমি বললে কেমন হয়? সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—ওটাও শ্রুতিমধুর হল না।

—তা হল না বটে, কিন্তু কেজোমির সঙ্গে পেজোমি কথাটার চমৎকার মিল আছে। আর আমার বিশ্বাস আমরা যতই ইউটিলিটির দিকে ঝুঁকছি ততই পাজি হয়ে উঠছি!

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন—তাহলে তোমার মতে কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক, তোমার মতন ইজি-চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে সিগার-ফোঁকাটাই ভাল লোকের লক্ষণ!

সুপ্রিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যাহাকে 'ডেকোরাম' অর্থাৎ শোভনতা জ্ঞান বলে, তাহা যদি মায়ের একটু আছে! চটিয়া গেলে তিনি অবলীলাক্রমে স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া যাহা মুখে আসে বলিয়া বসেন! আর কাকাবাবুটিও কুটুস কুটুস করিয়া কথা বলিয়া মাকে চটাইতে পারিলে আর কিছু চান না। মা যেদিন হইতে সোয়েটারে হাত দিয়াছেন, সেই দিন হইতে কাকাবাবু কেজোমির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মন্তব্য করিতেছেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—কাজের মানুষ মাত্রেই পাজি লোক এ কথা আমি বলছি না, কিন্তু যে-সব মানুষ কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না এবং না জানাটাকে গৌরবের বলে মনে করে, তাদের সম্বন্ধে আমার কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়!

—কি সন্দেহ হয়?

—সন্দেহ হয় যে তারা ছদ্মবেশী মশা, মাছি, ছারপোকা, শকুনি, বাঘ, ভাল্লুক অর্থাৎ নিছক একটা প্রাণী, বেঁচে থাকবার জন্যেই কেবল ছটফট করছে—ঠিক মানুষ নয়!

—অর্থাৎ অকেজো লোকই ঠিক মানুষ তোমার মতে!

সৌরীনবাবু সিগারে একটা টান দিয়া বলিলেন—ঠিক তা নয়, নিছক প্রাণী হিসেবে টিকে থাকবার জন্যে যে বাঁধা পথ আছে, সেই পথ ছেড়ে যে যতটা বিপথে যেতে পারে সে-ই ততটা মনুষ্যধর্মী। মানুষ ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার বিপথে যেতে পারে না। মানুষই গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, থিয়েটার করে। মনের আনন্দে সে এত কাল এই সব বাজে কাজ করে এসেছে। কিন্তু ইদানীং নিছক এই আনন্দটুকুর জন্যই আর সে এ সব করতে প্রস্তুত নয় দেখা যাচ্ছে। আজকাল আমরা গান গাই, ছবি আঁকি, কবিতা লিখি, থিয়েটার করি আনন্দের জন্যে নয়—পয়সার জন্যে, সব কিছুকেই কাজে লাগাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি আমরা। তুমি ঐ যে সোয়েটর বুনছ ওটা নিছক শিল্পচর্চা নয়, তুমি বুনছ শীতনিবারণের জন্যে—

সুপ্রিয়ার মা বলিলেন—তাতে ক্ষতি কি!

—সব কিছুই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠলে কেমন যেন লাগে। প্রত্যেক কাজের পেছনে একটা মতলব আছে মনে হলে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয়, জীবন ধারণ করা মানে একদল মতলববাজ লোকের সঙ্গে ক্রমাগত মোকদ্দমা করা! ব্যাপারটা হয় তো তাই-ই, কিন্তু অবস্থাটা সুখের নয়—

এই বলিয়া তিনি সিগারের ছাইটি ঝাড়িয়া আর একটি টান দিলেন। সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ আগেই তাহার হাতের বইখানি খুলিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন, সুপ্রিয়ার মা-ও এ কথার কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না। বিমল চুপ করিয়া ভাবিতেছিল অদ্ভুত লোক তো ইঁহারা। যাঁহার অসুখের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন তাঁহার অসুখই নাই এবং এতক্ষণ ধরিয়া যে-সব কথাবার্তা চলিতেছে তাহার সহিত অসুখের কোন সম্পর্কও নাই। আশ্চর্য ব্যাপার! নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলে—অথচ মজা এই যে আমরা সেই সব মানুষের সঙ্গই পছন্দ করি যারা এই সব বাজে কাজে মজবুত। এই যে বিমলবাবুকে আজ ডাকা হয়েছে এটা তাঁর ডাক্তারি নৈপুণ্যের জন্যে ততটা নয় যতটা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য। সুপ্রিয়া এঁর অভিনয় দেখে খুশি হয়েছিল, সম্ভবত সেই জন্যই ইন্‌জেকশন দেবার জন্যে এত লোক থাকতে এঁকেই ডেকে আনা হল।

সুপ্রিয়া বই হইতে মুখ তুলিলেন এবং ভ্রূলতা ঈষৎ আকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—এত বাজে কথাও বলতে পারেন কাকাবাবু।

সৌরীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—হীরালাল আমার নাম দিয়েছে বৈজিক-সম্রাট্, অবশ্য বাজে কথার জন্যে নয়, আমি ভাল বেজিক খেলতে পারি বলে!

জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকটি কতকগুলি কাগজ হস্তে আর একজন ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া হাজির হইলেন। পিছনে দুইজন চাকর চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতিও আনিয়া সাজাইতে লাগিল। জুলফি-সমন্বিত ভদ্রলোকের নাম সুধীর এবং তাঁহার সঙ্গে যিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম সুব্রত। সুধীর সুপ্রিয়ার দাদা এবং সুব্রত সুপ্রিয়ার স্বামী—বিমল পরিচয় পাইয়া সুব্রতবাবুকে নমস্কার করিল। মনে মনে বিস্মিত হইল—অতিশয় জীর্ণশীর্ণ ভদ্রলোক তো। চোখের জ্যোতি তীব্র, গালের হাড়-দুইটা উঁচু হইয়া আছে, নাকটা খড়্গের মত। পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও পাঞ্জাবি, পায়ে সুদৃশ্য একজোড়া চটি। তিনি কলিকাতার নামজাদা দুই-তিন জন ডাক্তারের নাম করিয়া বলিলেন—ওঁদের সবাইকে একসঙ্গে ডেকে দেখিয়েছিলাম, ওঁরা দেখে শুনে এই ব্যবস্থা করেছেন। রিপোর্টগুলো দাও তো সুধীর—

বিমল রিপোর্টগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিল, বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। সব রকম পরীক্ষাই হইয়াছে কিন্তু কোনটাতে তেমন কিছু পাওয়া যায় নাই। বিমল সুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল—এ সব থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, আপনার কষ্টটা কি?

বই হইতে মুখ তুলিয়া সুপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন—বললাম তো, কিছুই না!

সুব্রতবাবু বলিলেন—মাঝে মাঝে যে প্যালপিটেশন হয় সেটা কি তাহলে 'মিথ্'?

সৌরীনবাবু তাঁহার কাঁচাপাকা বাবরিটি এবং ধূম্র-পক্ক গুম্ফটি গুছাইয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিযা বলিলেন—ইংরেজীতে 'মিথ' এবং বাংলার মিথ্যার মধ্যে যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, আশা করি সুব্রত তুমি সে অলীক সাদৃশ্যের সুযোগ নিচ্ছ না। যদি নিয়ে থাকো তা হলে দুঃখিত হও। তোমরা বস, আমি একটু টেনিস কোর্টটা তদারক করে আসি। হীরালালরা হয়ত এসে পড়বে এখনি, কালকে নেটটা যা করে টাঙিয়েছিল! আমাদের হরিচরণকে এবার পেন্সন দেওয়া দরকার হয়েছে—

সৌরীনবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

ভগবতী দেবী সোয়েটার হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—চা-টা খেয়ে যাও।

—একটু ঠাণ্ডা হোক, গরম চা খাবার বয়স গেছে।

একটু দূরে টেনিস-কোর্ট, সেখানে চাকরেরা নেট টাঙাইতেছিল—সৌরীনবাবু সেই দিকে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য টেবিলে চা পরিবেশন করিতে লাগিল।

বিমল প্রশ্ন করিল—আপনার প্যালপিটেশন হয় বুঝি?

সুধীরবাবু এতক্ষণ কথা বলেন নাই, তিনি বলিলেন—হজমও হয় না ভাল, ডাক্তার রায় হজমের জন্যে এই সব পেস্‌ক্রাইব করেছেন।

বিমল বলিল—দেখেছি। বেশ ভাল ওষুধ, ওগুলো খাচ্ছেন?

ভগবতী দেবী বলিলেন—তাহলে আর ভাবনা কি! কি ভাগ্যি যে ইন্‌জেকশন নিতে রাজি হয়েছে!

বিমল বুঝিল তাহার বিশেষ কিছু করিবার নাই। কলিকাতার ডাক্তারের ফরমায়েস অনুযায়ী জার্মানির একটা পেটেণ্ট ঔষধ তাহাকে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ইন্‌জেকশন করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। তাহার ডাক্তারি বুদ্ধির সাহায্য ইহারা চান না।

বিমল বলিল, চলুন তাহলে ইন্‌জেকশন শেষ করে ফেলা যাক—

সুপ্রিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনার ভাল ছুঁচ আছে তো, জগদীশ ডাক্তারের ভোঁতা মরচে-পড়া ছুঁচ, সেই ভয়ে তাঁকে আর ডাকি নি।

বিমল হাসিমুখে মিথ্যা কথা বলিল— আপনি জানতেও পারবেন না।

সুব্রতবাবু বোধ হয় সুপ্রিয়ার উত্তরে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে চা পান করিতে লাগিলেন। গেট দিয়া আর একটি মোটর প্রবেশ করিল। সুধীরবাবু উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার চা পান শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিমল ও সুব্রতের দিকে চাহিয়া বলিলেন— আমার আর কোন দরকার নেই তো?

—না।

—আমি তা হলে একটু টেনিস খেলি গিয়ে, হীরালালবাবুরা এলেন।

ভগবতী দেবী বলিলেন—ঠাকুরপোও তা হলে আর এল না চা খেতে! বিয়ে না করলে পুরুষমানুষগুলো কি এক রকম হয়ে যায়।

বিমলের দিকে চাহিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন—আপনার বিয়ে হয়েছে তো?

—অনেক দিন।

ইন্‌জেকশন-পর্ব নির্বিঘ্নেই হইয়া গেল।

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বলিলেন—চমৎকার আপনার হাত তো!

বিমল গম্ভীর ভাবে বলিল—হাত নয় কপাল!

একটু থামিয়া আবার বলিল, কি বই পড়ছিলেন ওটা তখন?

—আলডুস হাক্‌সলির 'ক্রম ইয়েলো'।

— চমৎকার বই।

— নয়? এঁরাই আমার সঙ্গী, ওই দেখুন না।

বিমল দেখিল আধুনিক, অতি-আধুনিক নানাবিধ পুস্তক-রাজি সুপ্রিয়া সরকারের

আলমারির শোভা বর্ধন করিতেছে। অধিকাংশই উপন্যাস এবং অধিকাংশেরই নাম পর্যন্ত বিমলের জানা নেই।

সুব্রতবাবুর অসন্তোষ ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। তিনি বলিলেন—ক্রমাগত পড়ে চোখটাও নষ্ট করবে তুমি।

সুপ্রিয়া বলিলেন—আচ্ছা তোমরা সবই আমার স্বাস্থ্যের উপরই বিশেষ করে এত নজর দিচ্ছ কেন বল দেখি! দেখুন তো ডাক্তারবাবু, স্বাস্থ্যটা কার বেশী খারাপ, আমার, না ওঁর?

বিমল স্মিতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—আপনি কি বরাবরই এই রকম রোগা?

—হ্যাঁ।

—মোটা অবশ্য তুমি কোন কালে ছিলে না কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে তুমি দিন-দিন আরও রোগা হয়ে যাচ্ছ!

—না, না, পাগল! উঠছেন নাকি ডাক্তারবাবু?

বিমল বলিল—হ্যাঁ চলি এবার, নমস্কার!

সুপ্রিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—তিন দিন পরে আবার দেখা হবে, এ ইন্‌জেকশনগুলো না দিলে তো আপনাদের শান্তি নেই!

বিমল হাসিয়া বাহির হইয়া আসিল। সুব্রতবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। খানিকক্ষণ নীরবতার পর সুব্রত প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা আমার স্ত্রীর অসুখটা কি বলুন তো?

— বিশেষ কিছু নয়, হার্টটা একটু দুর্বল বোধ হয়।

—এ ইন্‌জেকশনগুলো দিলে উপকার হবে?

— ইন্‌জেকশনটার নাম তো খুব বাজারে। আমি এর আগে কখনও ব্যবহার করিনি।

সুব্রতবাবু আর কিছু বলিলেন না।

চলতে চলতে টেনিস-কোর্টের কাছাকাছি আসিতে সৌরীনবাবু হীরালালবাবুর সহিত বিমলের পরিচয় করাইয়া বলিলেন— ইনিও অদূর ভবিষ্যতে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছেন!

বিমল নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সৌরীনবাবু পুনরায় বলিলেন—এমন মধুর রুগী আর পাবেন না আপনি। আজকাল কত পার্সেন্ট হে?

হীরালালবাবু হাসিয়া বলিলেন— দশ।

মোটাসোটা গোলগাল হীরালালবাবু চিবুকের নীচে চর্বির বাহুল্য একটা দেখবার মত জিনিস। দশ পার্সেন্ট সুগার!

হীরালালবাবু বলিলেন—আসুন এক দিন আমার ওখানে বিমলবাবু।

—আচ্ছা।

বাড়ি ফিরিয়া বিমল দেখিল মণিমালা প্রায় প্রয়োপবেশন করিবার উপক্রম করিয়াছে! এরূপটা যে ঘটিতে পারে বিমলও তাহা প্রত্যাশা করে নাই; হারু স্যাঁকরার তো নামডাক খুব! এখানকার সকলে তো উহাকে দিয়াই গহনা গড়ায়।

ঠোঁট ফুলাইয়া মণিমালা বলিল—তোমার কথায় এখানে গড়াতে দিলাম, একেবারে ছাই হয়েছে তাবিজ!

—কই দেখি?

মণিমালা তাবিজ-জোড়া আনিয়া তাচ্ছিল্যভরে বিমলের হাতে দিয়া বলিল—এই দেখ তোমার হারু স্যাঁকরার কীর্তি!

—কেন, এ তো বেশ হয়েছে।

—বেশ না ছাই! এর নাম কি পালিশ?

—খারাপটা কোন্‌খানে তা তো বুঝতে পারছি না।

সত্যই বিমল বুঝিতে পারিতেছিল না।

— না, খারাপ নয়! ম্যাট্‌ম্যাট্‌ করছে,—তরঙ্গিণী গড়িয়েছে কলকাতা থেকে কেমন চমৎকার।

—এও তো বেশ হয়েছে, দেখি পর তো?

বিমল স্বয়ং পরাইয়া দিতে গিয়া একটু বিপন্ন হইল। কোথায় কি ক্লিপ আঁটিতে হয় তাহা তাহার জানা নাই।

—তুমি ছাড় আমি পরছি!

তাবিজ পরিয়া হাত দুটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মণিমালা দেখিতে লাগিল।

বিমল বলিল—সুন্দর হয়েছে তো।

—ছাই!

তাহার পর তাবিজ খুলিতে খুলিতে মণিমালা বলিল—তোমার কেমন একটা জিদ চড়ে গেল ওই হারু স্যাঁকরাকে দিয়েই করাবে।

—আচ্ছা, কাল ওকে ডাকিয়ে বলে দিচ্ছি আমি, ভাল করে দেবে। ও বলেছে পছন্দ না হলে ফেরত নেবে—

—ডাক্তারবাবু—। বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে।

—কে!

বিমল বাহিরে গিয়া দেখিল দুলু।

—কি খবর?

—হাসপাতালে একটা শূয়োরে-চেরা লোক এসেছে। বুড়ো শূয়োরে তার পেটটা চিরে দিয়েছে একেবারে।

—চল যাচ্ছি।

বিমল গিয়া দেখিল একটা আঠার-উনিশ বছরের যুবক বন্যবরাহের দন্তঘাতে মৃতপ্রায়। পেটের অন্ত্রগুলো সব বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। এই মফঃস্বলের হাসপাতালে ইহার সুচিকিৎসা হওয়া অসম্ভব। সদরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই মরিবে। অপটু হস্তে এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা লইয়াই বিমল যতটা পারিল করিল। অন্ত্রগুলোকে ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া শাস্ত্র অনুযায়ী যতটা পারিল পরতে পরতে পেটটা সেলাই করিয়া দিল। এমনিই তো মরিত—যদি বাঁচে।

গঙ্গাবক্ষে নৌকা সজ্জিতই ছিল, ভূধরবাবু তাহাতে বসিয়া ছিলেন, বিমলও গিয়া আরোহণ করিল। কামারখালির অখিল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে ডাক পড়িয়াছে। অখিল

চৌধুরী আমাদের পূর্বপরিচিত চৌধুরী মহাশয়েরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্রয়োজন হইলে বরাবর ভূধরবাবুকেই ডাকিয়া থাকেন, এবার জ্যেষ্ঠের নির্দেশ অনুসারে বিমলকেও ডাকিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ব্যগ্র।

বিমল নৌকায় আসিয়া উঠিতেই ভূধরবাবু বলিলেন—টিফিন কেরিয়ারে ও-সব কি মশাই?

—লুচি মাংস!

—আপনি খাদ্য-রসিক আছেন তো মশাই, বাইরে থেকে আপনাকে দেখে নিরামিষ বলে বোধ হয়!

বিমল হাসিয়া বলিল—বাইরে থেকে দেখে লোকের সম্বন্ধে বিচার করেন এত কাঁচা লোক তো আপনি নন! অন্তত আমার তাই ধারণা!

—না, তা বটে,—মানে ভূধরবাবু হাসিয়া নিজের ছোট বেতের বাক্সটি খুলিতে খুলিতে বলিলেন—আমিও আমিষ ব্যাপার এনেছি কিছু, জানি না আপনার এ সব চলে কি না।

ছোট বোতলটি বাহির করিয়া তিনি বলিলেন—কঁইয়্যাক? অর্থাৎ ইংরাজীতে যার বানান কগ্‌ন্যাক! চলে নাকি?

বিমল বলিল—না।

—তাহলে আর কি আমিষ আপনি! নিরীহ পাঁটা কেটে সবাই খেতে পারে।

বিমল হাসিল, তাহার পর সহসা কি মনে করিয়া বলিল—বেশ দু-এক ঢোক খাওয়াই যাবে না হয়, তাতে আর কি হয়েছে!

ভূধরবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন—সোডায় না কম পড়ে যায়। আনিয়ে নেব নাকি আরও দু-বোতল।

—ক-বোতল আছে?

—দু-বোতল।

—ওতেই হবে, না হয় শেষে গঙ্গোদক তো আছেই, শোধন হয়ে যাবে।

—যা বলেছেন! আমাদের চক্রবর্তীকে চেনেন? আরে ঐ যে মশাই ওপারের উকিল হাবাধন চক্রবর্তী, চেনেন না তাঁকে?

—নাম শুনেছি, আলাপ নেই তেমন!

—আমি ওর নাম দিয়েছি চৌকোস চক্রবর্তী! একেবারে চৌকোস লোক। মদ রোজ খাওয়া চাই, কিন্তু আঁটঘাট বেঁধে—

—মানে গ্লাসে প্রথমে ব্র্যাণ্ডিটি ঢালবেন, তা প্রায় আউন্স-ছয়েক, তারপর তাতে গোটা-চারেক কার্টার্স লিভার পিল ফেলে দেবেন, তারপর তাতে চামচটাক সোডা, তারপর হাতে আংটি-বাঁধা পৈতেটি জড়িয়ে চোখ বুঝে গ্লাসের উপর পৈতেসুদ্ধ হাতটি নিয়ে গিয়ে মিনিট দুই মন্ত্রপাঠ করেন, তারপর আংটিটা মদে একবার ডুবিয়ে চোঁ চোঁ করে মদটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলবেন! রোজ এই ব্যাপার?

—আংটিটা ডোবাবার মানে?

—যে সে আংটি নয়, আংটিতে মীনে-করা কালীমূর্তি রয়েছে, মদ আর মদ রইল না, কারণ হয়ে গেল! চৌকোস—রিয়েলি চৌকোস!

—চমৎকার লোক তো!

—চমৎকার !

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

অগণিত তরঙ্গশীর্ষে মাণিক জ্বলিতেছে। ভূধরবাবু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, বিমলও চাহিয়া আছে। তাহার কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, রগের শিরাগুলা দপ্‌দপ্ করিতেছে। বিবেকও দংশন করিতেছে। জীবনে এই প্রথম মদ্যপান। কেন সে মদ খাইতে গেল! লোভে পড়িয়া? তাহা তো ঠিক নয়। মদ দেখিয়া লোভ তাহার কোনকালে হয় নাই। তবে? ভূধরবাবুকে খুশি করিবার জন্য, ভূধরবাবুর লজ্জা নিবারণের জন্যই সে মদ খাইয়াছে। ভূধরবাবু যাহাতে তাহার নিকট অকারণ সঙ্কোচ বোধ না করেন, তাহাকে একটা পীর-পয়গম্বর মনে না করেন, মনে মনে নাক সিঁট্‌কাইয়া যেন না ভাবে—ইস্ ভারি আমার সাধু রে! ভূধরবাবুর বন্ধুত্ব কামনায় যদি সে দুই-এক ঢোঁক মদ্যপান করিয়াই থাকে, কি এমন ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে! মন হইতে সে চিন্তাটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা তাহার অমরের কথাটা মনে পড়িল। তাহাকে দেখিয়া সেদিন সে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিল কেন। সে হয়ত এমনি কোন বন্ধুত্বের দাবি মিটাইতে গিয়া—

ভূধরবাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—হ্যাঁ, যে-কথাটা বলছিলাম, বিজনেস ইজ বিজনেস! পৃথিবীর চারদিকে টাকা ছড়ানো রয়েছে, কোন ফন্দি-ফিকিরে সেগুলোকে কুড়িয়ে ঘরে তোলার নামই ব্যবসা! কোন ফন্দি-ফিকির করব না অথচ টাকাগুলো আপনা আপনি এসে ট্যাঁকে ঢুকে পড়বে তা কি কখনও হয়। এই যে দেখুন না, আমি ঐ যে আখ মাড়িয়ে গুড় তৈরী করবার কলটা বসিয়েছি, ওর তদ্বির করতে হচ্ছে কত রকম! যেখানে যা ঘুষঘাস সিন্নি-পৈরবি সবই দিতে হচ্ছে, না দিলে আমার গুড় নেবে না কেউ! দেখুন আমার মাথায় আর একটা প্ল্যান এসেছে—

—কি?

—আচ্ছা এই গুড়কেই একটু পরিষ্কার করে বোতলে পুরে ভিটামিন-ফিটামিন পাঁচ রকম ভাঁওতা জুড়ে বাজারে বের করলে কি রকম হয়! বিজ্ঞাপন দিলে ঠিক চলে!

বিমল হাসিয়া ফেলিল—আপনার মাথায় খেলেও তো নানা রকম।

ভূধরবাবু হাসিতে লাগিলেন—না খেললে উপায় কি, যা ভীষণ সময় পড়েছে মশাই, আজকাল রোজগারের নতুন নতুন পন্থা বার করতে না পারলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। যে যাই বলুক মশাই, পয়সাই হল আসল! ঐ যে আপনাদের চেয়ারম্যান রাখাল নন্দী, কি আর ওর এমন গুণ আছে বলুন, না আছে বিদ্যে না আছে বংশমর্যাদা, তবু আমরা লেখাপড়া-জানা ভদ্রসন্তানরা ওর দুয়ারে দু-বেলা সেলাম ঠুকছি তো! কেন? ও তাকমাফিক পাটের ব্যবসা করে লাখ কয়েক টাকা রোজগার করেছে এই তার একমাত্র কারণ। তাই ও মান্য, তাই ও গণ্য, তাই ও চেয়ারম্যান, তাই ও সব!

ভূধরবাবু তাকিয়াটার উপর কনুই দিয়া একটু আরাম করিয়া বসিলেন ও গঙ্গার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন—ইটের ভাটাও করব ভাবছি একটা, করতে পারলে খুব লাভ হয় ওতে, এ অঞ্চলে এক ঐ আঢ্যিদের ছাড়া আর কারও নেই।

বিমল বলিল—একা মানুষ আপনি ক-দিক সামলাবেন?

—সামলাতে হবে! শুধু ডাক্তারি করে আর পেট ভরবে না মশাই, সেদিন গেছে! আজকাল কমপিটিশন কত, চারদিকে ডাক্তার তো গিজগিজ করছেই, তার ওপর কবরেজ আছে, হোমিওপ্যাথ আছে, হাকিম আছে, হাতুড়ে আছে, মাদুলি আছে, জলপড়া আছে। ঐ যে আমাদের জগদীশবাবু, এদ্দিনের সিনিয়ার লোক, কত রোজগার করেন উনি বলুন তো?

ভূধরবাবু চক্ষু দুটিটি ছোট করিয়া বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ভাবটা, দেখি আপনার আন্দাজের দৌড়টা!

বিমল বলিল—কত পাঁচ-সাত-শ?

—তিন-শ'র এক ছিদাম বেশী নয়। হবে কোথা থেকে মশাই, ডাক্তারদের রোজগার বাইরে থেকে খুব বেশী মনে হয়, কারও বাড়ির সামনে দিয়ে বার-দুই যাতায়াত করলেই সে মনে করে উঃ খুব কামাচ্ছে, কিন্তু যে কামাচ্ছে সেই জানে পকেটে কটা টাকা ঢুকল—তাও আবার সবগুলো সচল থাকে না।

—অ্যাঁ বলেন কি!

ভূধরবাবু হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে বিমলের পানে চাহিলেন। তাহার পর আবার শুরু করিলেন—এই কম্‌পিটিশনের জন্যেই তো মশাই আমি হোমিওপ্যাথি, কবরেজি সব করি, যখন যা সুবিধে। রুগী হাতছাড়া করি কেন! যখন দেখি আমাদের ওষুধে বিশেষ বাগ মানছে না রুগীর বাড়ির লোকেরাও একটু দোনা-মোনা করছে তখন তাক বুঝে তাদের মনোমত ব্যবস্থা করে ফেলি। হোমিওপ্যাথি চাও, চলে এস আমিই দিয়ে দিচ্ছি—এক ফোঁটা কবরেজি চাও তা-ও দিচ্ছি—অপরের কাছে যাবার দরকার কি! হোমিওপ্যাথির একটা মস্ত সুবিধে খেতে খারাপ নয়, সস্তা, রুগীর ইষ্ট না হোক অনিষ্ট হয় না, আর যখন লেগে যায় অদ্ভুত ফল! অদ্ভুত ফল মশাই, একটা নশিয়া সেদিন কিছুতে কমে না, কমলো শেষে ইপিকাক থার্টিতে!

বিমল বলিল—কবরেজিটা কিন্তু একটু—

তাহার কথা সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া ভূধরবাবু বলিলেন—ঐ কয়েকটা ওদের বাঁধি গৎ আছে, মকরধ্বজ, স্বর্ণপটপটি, চ্যবনপ্রাশ, ঐ আমাদেরই মত ব্যাপার! আর্সেনিক, আয়রন, ক্যালসিয়াম আর তার সঙ্গে বায়ুপিত্তকফঘটিত কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোক! কবরেজরাই কি জোচ্চুরি করে না মনে করেন! অধিকাংশ কবরেজই আজকাল কুইনিন ব্যবহার করে, অ্যালকহল ব্যবহার করে। পয়সা রোজগার করতে হলে এ-সব না করে উপায় কি! সেদিন তো দেখলাম এক কবরেজ এমিটিন ইন্‌জেকশন দিচ্ছে—

—তাই না কি?

—না তো কি! নিও-সালভারশনের মতন ওষুধ যে কোন হাতুড়ে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিচ্ছে! এই কবরেজগুলো আমাদের পরম শত্রু, ক্রমাগত আমাদের নামে প্রোপাগাণ্ডা করে বেড়ায়। আমিও বাগে পেলে ছাড়ি না। এই সেদিন আমি সঞ্জয় কবরেজকে বেশ নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিয়েছি! ওর কম্পাউণ্ডার এসে আমারই দোকান থেকে কুইনাইন কিনছিল, এক-দোকান লোকের সামনে দিলুম এক্‌সপোজ করে বাছাধনকে!

বিমল মাঝিকে প্রশ্ন করিল, আর কত দূর মাঝি?

—ঐ যে আলোটা হুজুর, ঐ যে দূরে একটুকুন টিপকাছে—

ভূধরবাবু বলিলেন—এখনও মাইল-দুই তার মানে, এটুকু আর বাকি থাকে কেন, শেষ করে ফেলি আসুন।

—আপনি খান, আমি আর খাব না।

—আরে খান খান, ঐ তাগড়া শরীর আপনার, কিছু হবে না।

—না থাক, প্রথম দিনেই অত ভাল নয়।

ভূধরবাবু অগত্যা বাকিটুকু একাই ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিলেন। মুখটি মুছিয়া বলিলেন—এই যেখানে আমরা যাচ্ছি, কামারখালিতে, দেখবেন একজন ডাক্তার আছেন, পাক্কা ব্যবসাদার যাকে বলে! এম. বি. নন, সাব-এসিস্টেণ্ট সার্জন, কিন্তু পাকা লোক। জমি-জারৎ খেত-খামার বিস্তর করেছেন, প্র্যাকটিসও খুব! কিন্তু ডাক্তারি ব্যবসা কি করে করতে হয় জানেন ভদ্রলোক।

—কি রকম?

—এই ধরুন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁর ডিসপেনসারিতে প্রকাণ্ড একটা কড়া করে রোজ বার্লি তৈরী হয়, আর গরীব রুগীদের সেটা তিনি বিতরণ করেন। খরচ বিশেষ কিছুই নয়, দু-আনা বার্লিতে ভেসে যাবে কামারখালি, কিন্তু এর জৌলুসটা ভীষণ, সবাই ধন্য ধন্য করছে। ডাক্তারের এত দয়া যে নিজের ওখান থেকে বার্লি পর্যন্ত তৈরী করে গরীবদের দেয়। মহাদেববাবুর আর একটি ভয়ানক অস্ত্র আছে—সহজে কথা বলেন না। আপনি আপনার বিদ্যে ফলিয়ে যতই বকে মরুন মহাদেববাবু চুপচাপ, বড়জোর চোখ দুটো হয়ত ওপর দিকে তুললেন, কিংবা একটু ভুরু কোঁচকালেন, কিংবা হয়ত একটু মুচকি হাসলেন—ব্যস! আপনার সামনে সাধ্যপক্ষে কিছু বলবেন না, যা বলবার আপনি চলে গেলে বলবেন! এবং যেটি বলবেন সেটি কামারহাটির সকলের কাছে বেদবাক্য। বিশেষত মেয়েমহলে। একবার এই গ্রামের একটি মেয়ের জ্বর হয়েছিল, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাই শুনে একেবারে এক সায়েব সিবিল সার্জন নিয়ে এসে হাজির। মহাদেববাবু কিছু বলবেন না। সায়েব দেখে শুনে সেই সনাতন কুইনাইন মিকশ্চার লিখে দিয়ে গেলেন, কুইনিন আর অ্যাসিড এন, এম. ডিল.। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াতে মহাদেববাবু চটেছিলেন। তিনি মেয়ের মাকে ডেকে বললেন—দেখ বাছা, তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে সায়েব-ডাক্তার এসে দেখে গেল খুবই আনন্দের কথা এটা । কিন্তু সায়েব যা ওষুধ দিয়ে গেলেন তা সায়েবি ধাতে সইতে পারে কিন্তু তোমার ঐটুকু মেয়ে তা সইতে পারবে কি না সন্দেহ—এই দেখ—বলে তিনি ফোঁটা দু-চার অ্যাসিড শানের উপর ফেললেন। বুঝতেই পারছেন সঙ্গে সঙ্গে বজবজ করে উঠল, শানের খানিকটা ক্ষয়েও গেল। মহাদেববাবু চিন্তিত মুখে সেইদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—যে ওষুধে শান গলে যাচ্ছে, সে ওষুধ ওই কচি মেয়েকে দিতে বাপু আমার কেমন যেন—। আর বলতে হল না সাহেবের ওষুধ চলল না। তারপর দিন আমি এলুম, মিকশ্চার দিলুম না, দিলুম কুইনিন পাউডার।

একটু থামিয়া পুনরায় ভূধরবাবু বলিলেন—লোকটার রুগী দেখবার ধরনও অদ্ভুত। আপনি যা দেখবার দেখলেন—বুক, পেট, জিব, চোখ, আপনার দেখা হয়ে গেলে মহাদেব

হয়ত খুব নিরীক্ষণ করে করে মাথার চুলগুলো দেখতে লাগলেন। আপনি যদি জিগ্যেস করেন কি দেখছেন, কোন উত্তর দেবেন না, একটু মুচকি হাসবেন! অদ্ভুত লোক!

বিমল বলিল—আপনার উপর খুব বিশ্বাস বুঝি।

ভূধর হাসিয়া বলিলেন—বিশ্বাসের কারণ আছে, শতকরা পঁচিশ টাকা হিসেবে কমিশন দি।

—বলেন কি?

—একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়।

বিমল নির্বাক্ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল জ্যোৎস্নালোকে নদীর তরঙ্গটি যেন মুচ্‌কি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিতেছে।

অখিল চৌধুরীর বাড়ির রুগীটির জিহ্বায় ক্যানসার হইয়াছে। ক্যানসার দুরারোগ্য ব্যাধি, বিমল সে কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ভূধরবাবুর মুখের পানে চাহিয়া কিছু বলিল না। ভূধরবাবুর চোখের পাতায় সে যেন একটা নিষেধের ইঙ্গিত পাইল। মহাদেববাবুও তাঁহার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী নীরব রহিলেন। অখিল চৌধুরী মহাশয় বিমলকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কেমন বুঝছেন, ডাক্তারবাবু?

বিমল একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল—কঠিন ব্যাপার।

ভূধরবাবু সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন—তা তো বটেই। কিন্তু কঠিন বলে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। চেষ্টা করতে হবে যথাসাধ্য!

মহাদেববাবু একটু মুচকি হাসিলেন।

ভূধরবাবু কাগজে কলমে নানা রকম ভাবে যথাসাধ্য করিলেন। ব্যথার জন্য, ঘুমের জন্য, ঘায়ের জন্য, রক্তপড়া বন্ধ হওয়ার জন্য এবং জীবনীশক্তি বাড়াইবার জন্য নানাবিধ ঔষধের ফর্দ লিখিয়া যখন উভয়ে উঠিতে যাইবেন তখন মহাদেববাবু বলিলেন—এঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া কি উচিত মনে করেন?

ভূধরবাবু বলিলেন—পারলে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু এখন যে রকম দুর্বল রয়েছেন, আর যাওয়াও তো সোজা নয়—

অখিলবাবু বলিলেন—দেখুন আপনারা যা ভাল মনে করেন—

ভূধরবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—দিন-পনর দেখুন, যদি একটু উন্নতি হয়, গায়ে একটু জোর-টোর যদি পান, ব্লাডপ্রেসারটা যদি একটু কমে—তখন দেখা যাবে।

মহাদেববাবু নির্বিকার ভাবে গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

নৌকায় ফিরিয়া গিয়া ভূধরবাবু বিমলকে বলিলেন—আপনি আর একটু হলে সব মাটি করেছিলেন তো মশাই। ক্যানসার যে ওর সারবে না সে কথা বলে আমাদের লাভ কি! ওরা তো চিকিৎসা করাতে ছাড়বে না। আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর এক জন এসে হাল ধরবে। ওরকম কথা কখনো বলতে আছে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ও যতক্ষণ খরচ করতে পারে করুক, আমরা যতক্ষণ নিয়ে নিতে পারি নিয়ে নি।

নৌকা ছাড়িয়া দিলে ভূধরবাবু বলিলেন—মহাদেববাবুকে ও-কটা টাকা দিয়ে ভালই করলেন, ভবিষ্যতে ফের ডাকবে দেখবেন।

বিমলের কিন্তু কেমন যেন লাগিতেছিল সে একটু হাসিল মাত্র।

পাশে মণিমালা শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে, বিমল জাগিয়া আছে! এপাশ-ওপাশ করিয়া কিছুতেই ঘুম আসিতেছে না। অনেকদিন আকাশের নীচে শোওয়া অভ্যাস নাই, তাই বোধ হয়। বহুকাল পরে আজ ছাতে শুইয়াছে। মণিমালা তো ছাতে শুইতে কিছুতেই রাজি ছিল না, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই শেষে আসিয়াছে। ঘরে তাহার একা শুইতে ভয় করে। বিমল নিদ্রিত মণিমালার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বেচারা এখানে যেন কেমন—ঠিক খাপ খাইতেছে না! তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচির সহিত এখানকার কোন কিছুরই যেন ঠিক মিল নাই। এই বাড়িটা লইয়া তাহার অসন্তোষের সীমা নাই। মেজেটা খারাপ, জানালা-কপাটগুলো খোলা, দেওয়ালের এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে চটা উঠিয়া গিয়াছে, ছাতটা শ্যাওলাপড়া, ছাত হইতে জল পরিবার নলগুলো বিশ্রী, বাড়ির পিছন দিকটা কেমন যেন জঙ্গলের মত কচুগাছ-ঘেঁটুগাছে ভরা, উঠানটা বাঁধানো নয়, এক পশলা বৃষ্টি হইলে কাদা হইয়া যায়, উঠানের ওদিকের দেওয়ালটা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো ইঁট বাহির হইয়া আছে, বাড়ির উত্তর দিকে অশ্বত্থ গাছটায় যত কাক ও বকের আড্ডা। বাড়িটা মোটে ভাল নয়! ইহার উপর শহরের একটেরে হাওয়াতে সন্ধ্যার পর কেমন যেন নির্জন হইয়া পড়ে, এমন কি ঐ দিকের মাঠটা হইতে শেয়ালের ডাক পর্যন্ত শোনা যায়, দুই-একটা শেয়াল সে স্বচক্ষে দেখিয়াছেও একদিন। তাহার উপর সঙ্গী নাই। পাড়ায় যে মেয়ে নাই তাহা নয়, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। লেখাপড়া করিয়া এ যেন অন্য জাতের হইয়া গিয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া বিমলের সঙ্গেও যে মতের খুব মিল হয় তাহাও নয়। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া প্রায়ই তো ঝগড়া হইতেছে। আজই তো দুপুরে সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া রাগারাগি হইয়া গেল। ক্লান্ত বিমল দুপুর বেলায় বিশ্রামের জন্য একটু শুইয়াছে, মণিমালা কল লইয়া বসিল। ব্লাউস না বালিশের ওয়াড় ভগবান জানেন কি হইতেছে, কিন্তু শব্দের চোটে অস্থির। বাড়িটা দর্জির দোকান হইয়া উঠিয়াছে। এই আপদটার জন্য মাসে মাসে টাকা গুনিতে হইতেছে। বিমল বলিল—ও খচখচানি বন্ধ কর এখন।

এই কল প্রসঙ্গে আরও দুই-এক বার বচসা হইয়া গিয়াছিল, মণিমালা দুম্ করিয়া কলের ঢাকাটা কলের উপর চাপাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া আসিয়া ক্যাম্পচেয়ারটার উপর বসিল এবং সমস্ত বিকালটা মুখ ভার করিয়াই রহিল। সন্ধ্যাবেলাতেও বিমলের সহিত ভাল করিয়া কথা বলে নাই।—ম্লান জ্যোৎস্নালোকে মণিমালার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিমলের সমস্ত বুকখানা অপূর্ব মমতায় ভরিয়া উঠিল। বেচারীর দোষ কি। যেমনভাবে বাল্যকাল হইতে মানুষ হইয়াছে, ঠিক তেমনটি তো এখানে পাইতেছে না। প্রতাপবাবুর কোন্দলপরায়ণা নাতিনী অথবা পরেশ-দার স্ত্রীর সহিত ইহার কি করিয়া মিল হইবে। প্রতাপবাবুর নাতিনীটি কেবল কলহের ছুতা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং পরেশ-দার স্ত্রীর অতি-ঔৎসুক্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়! মণিমালার কত গহনা আছে, কোনটা কত ভরির, জড়োয়া

গহনাগুলোর দাম কত, ঝুমকোর বানি কত লাগিয়াছে, ঐ বেনারসীখান কবে কিনিয়াছে, ঐ ঢাকাই শাড়িখানা ডাক্তারবাবু নূতন কিনিয়া দিয়াছেন বুঝি, সকালে কি রান্না হইয়াছিল, রাত্রে কি রান্না হইবে, ডাক্তারবাবু কি খাইতে ভালবাসেন পরেশ-দার স্ত্রীর ঔৎসুক্যের সীমা নাই। লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া মণিমালার যে এ-সব ঔৎসুক্য একেবারে নাই তাহা নয়, সেও পরেশ-দার স্ত্রীর নিকট হইতে অনুরূপ অনেক খবর সংগ্রহ করে কিন্তু এ-সব ছাড়াও সে আরও কিছু চায়। সে চায় শরৎবাবুর লেখা লইয়া একটু আলোচনা করিতে, রবীন্দ্রনাথের দুই-একখানা গান গাহিতে, সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যে সব গল্প বাহির হইয়া থাকে তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে, ছিমছাম হইয়া বেড়াইতে। কেবল রান্না আর খাওয়া, রান্না আর খাওয়া—এ ছাড়া আর তো কোন কাজ নাই এখানে। বিমল বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার সহিত দুই দণ্ড বসিয়া যে গল্প করিবে তাহারও অবসর নাই। দুপুরে অথবা সন্ধ্যার পর যদি কোনদিন অবসর হয় তাহাও যে সে ঠিক কি ভাবে কাটাইবে তাহা বিমল বুঝিতে পারে না। মণিমালার সহিত বসিয়া কি বিষয়ে গল্প করিবে সে। দুই-এক দিন সে চেষ্টা করিয়াছে, ঠিক যেন জমে না। এখানে সিনেমা-টিনেমা কিছুই নাই যে মাঝে মাঝে যাওয়া যায়। কলিকাতার শহুরে আবহাওয়ায় মানুষ মণিমালার যেন নির্বাসন হইয়াছে। এখানে বিমলই তাহার একমাত্র আকর্ষণ। কিন্তু বিমলকে সে কতটুকু পায় এবং যখন পায় তখন নাগাল পায় না। বিমল যে-জগতে বাস করে সে-জগতে মণিমালার প্রবেশাধিকার নাই।

[দুই]

হঠাৎ গভীর রাত্রে বিমলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মণিমালা তাহাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আবেগে নয়, ভয়ে।

—ওগো শুনছ, নীচে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে!

বিমল কান পাতিয়া শুনিল একটা শব্দ হইতেছে বটে। বলিল—দেখে আসি দাঁড়াও।

—আমি একা থাকতে পারব না এখানে।

—বেশ চল সঙ্গে।

ছাতের এক কোণে লণ্ঠনটা কমানো ছিল, তাহার শিখাটা বাড়াইয়া লইয়া উভয়ে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। নামিয়া আসিয়া প্রথমে কিছুই নজরে পড়িল না। তাহার পর সহসা দেখিতে পাইল মাঝের ঘরের তালাটা ভাঙ্গা, কপাট খোলা। চোরটা বাক্স ভাঙ্গিতে এত ব্যস্ত ছিল যে ইহাদের পদশব্দ এতক্ষণ তাহার কানেই যায় নাই। ইহারা কাছাকাছি আসিতে তবে সে সচকিত হইয়া উঠিল এবং ছুটিয়া বাহির হইতে গেল। পলাইতে পারিল না, নিমেষের মধ্যে বিমল তাহাকে ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ফেলিল, ডাকাডাকি করিয়া যোগেনকে তুলিল। যোগেন তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা কাছে আনিতেই দেখা গেল চোর আর কেহ নয় হাসপাতালের পুরাতন চাকর ভৈরব। ইহাকেই কিছু দিন আগে বিমল দূর করিয়া দিয়াছিল। ভৈরবেরই কাপড় দিয়া যখন তাহার হাত-পা বাঁধিতে বিমল ব্যস্ত, তখন সহসা যোগেন বলিল—বাবু, মা মূর্ছা গেছেন।

বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল সত্যই মণিমালা মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়াছে।

—তুই ভাল করে বাঁধ একে, পারবি তো?

—খুব পারব।

যোগেনের হাতে ভৈরবকে ছাড়িয়া দিয়া বিমল মণিমালার কাছে আসিল। সত্যই সে মূর্ছা গিয়াছে, ঠোঁট দুইটা নীল হইয়া গিয়াছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হিম। মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে তাহার মূর্ছা ভাঙ্গিল, বিমল তাহাকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মণিমালা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—এখানে থাকলে ঠিক মরে যাব আমি, কিছুতে বাঁচব না।

বিমল স্নেহভরে তাহার সিক্ত অলকগুলি গুছাইতে গুছাইতে বলিল—ছি অমন করতে নেই। ভয় কি!

কিন্তু সে লক্ষ্য করিল মণিমালা তখনও একটু একটু কাঁপিতেছে।

[তিন]

ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চোর ঢুকিয়াছে শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক উঠিয়া পড়িল এবং ভৈরবকে টানিতে টানিতে থানায় লইয়া চলিয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাহাকে যে মারটা মারিল তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর কেমন যেন একটা হিংস্র নিষ্ঠুরতা আছে, সুযোগ পাইলেই কারণে-অকারণে তাহা প্রকট হইয়া উঠে। সকলে থানায় চলিয়া গেলে বিমল সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া শুইতে যাইতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে শঙ্কিত মৃদু কণ্ঠে কে যেন ডাকিল ডাক্তারবাবু!

—কে?

বিমল কপাট খুলিয়া দেখিল শতছিন্ন ময়লা কাপড়পরা একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে, তৈলবিহীন এক মাথা রুক্ষ চুল, অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারা! বিমলকে দেখিয়াই সে বিমলের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল—আর কক্‌খনো করবে না বাবু, ওকে ছেড়ে দিন এবারটি—

—কে তুমি, তুমি?

মেয়েটি উত্তর দিল না।

যোগেন বলিল—ভৈরবের স্ত্রী।

বিমল তাড়াতাড়ি পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা কাল দারোগাবাবুকে বলব আমি।

মেয়েটি চোখ মুছিতে মুছিতে অন্ধকারে একা চলিয়া গেল।

তাহার প্রস্থান-পথের দিয়ে চাহিয়া বিমল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা তাহার মনে হইল স্ত্রী-হিসাবে ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা অশিক্ষিত কুৎসিত মেয়েটি মণিমালার অপেক্ষা বেশী মহিমময়ী। এই অন্ধকার রাত্রে সে একা তাহার চোর স্বামীর উদ্ধারের জন স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়াছে। অন্ধকার বলিয়া ভয় করে নাই, ছেঁড়া কাপড় বলিয়া লজ্জা করে নাই, স্বামী চোর বলিয়া ঘৃণা করে নাই, পায়ে ধরিতে সঙ্কোচ করে নাই। স্বামীই উহার সব, তাহার উদ্ধারের জন্য ও সব করিতে প্রস্তুত। ঘরে ফিরিয়া দেখিল মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আলো লইয়া নিজের বাক্সগুলি পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

ভাগ্যে আমরা এসে পড়েছিলুম, গয়নার বাক্সটা তো ঠিক ওপরেই ছিল। ওকি তুমি জামা গায়ে দিচ্ছ কেন?

—বেরব একটু।

—কোথায়?

—হাসপাতালে একটা রুগী এসেছে। এক্ষুনি আসছি—

—না, আমার ভারি ভয় করবে তুমি যেও না।

—ভয় কি, যোগেন তো রইল, টর্চটা দাও তো।

—কি বিচ্ছিরি চাকরি বাপু ভাল লাগে না আমার।

—এখুনি আসছি আমি—

বিমল বাহির হইয়া সোজা থানায় চলিয়া গেল।

থানার দারোগা বিমলের প্রস্তাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন—ছেড়ে দেবো? বলেন কি?

—আমার বিশেষ অনুরোধ।

ভৈরবের স্ত্রী বারান্দার এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া আবার বলিল—ওর ঢের শাস্তি হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন এবার।

দারোগাবাবু আড়চোখে একবার ভৈরবের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আপনার কথা ঠেলা তো মুশকিল, আচ্ছা দেখি—

বিমল হাসপাতালের ডাক্তার, দারোগাবাবুর বাড়ি বিনা পয়সায় দেখে সুতরাং বিমলের কথা তিনি ঠেলিতে পারিলেন না ভৈরব ছাড়া পাইয়া গেল।

পরদিন সকালে একটা সুসংবাদ পাওয়া গেল, মণি পাস করিয়াছে।

[চার]

শ্রীযুক্ত হীরালাল মৌলিক তাঁহার দশ পার্সেন্ট শুগার সত্ত্বেও আহার কমাইতে প্রস্তুত নহেন। বিনা চিনিতে চা খাওয়া যায় না কি! দুই বেলা আহারের পর মধুরেণ সমাপয়েৎ করাটাও তাঁহার চিরকালের অভ্যাস, রাবড়ি-সন্দেশ রোজ তাঁহার চাই-ই। তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষা করিতে হইলে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ অনিবার্য এবং নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া নিক্তির ওজনে চলাও অসম্ভব। এবম্প্রকার নানাবিধ মুশকিলের কথা বিবৃত করিয়া হীরালালবাবু আসল কথাটি পরিশেষে বলিলেন—আসল কথা জানেন কি ডাক্তারবাবু, ভয়ানক লোভী লোক আমি, কিছুতেই লোভ সামলাতে পারি না। বাঙালীর ছেলে ভাত না খেয়ে থাকতে পারি না, আলুটা আমার অতি প্রিয় খাদ্য, মিষ্টির তো কথাই নেই! আর সব রকম খাওয়া যদি আপনারা বন্ধই করে দেবেন তাহলে বেঁচেই বা লাভ কি বলুন পৃথিবীতে? মরে গেলেই হয়।

হীরালালবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিলে তাঁহার খুত্ খুত্ খুত্ খুত্ করিয়া একটা শব্দ হয়, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া যায়, চিবুকের তলায় চর্বি আন্দোলিত হইতে থাকে।

বিমল বুঝিল হীরালালবাবুকে আহার-সংযমের উপদেশ দেওয়ার মানে অরণ্যে রোদন করা। 'ইনসুলিন' ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। তাহাই করিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—রোজ নিতে হবে?

—রোজ।

—লাগবে না কি?

সকলেই এ-কথা জিজ্ঞাসা করে, সকলকেই বলিতে হয় 'কিছু না', সকলেই সে কথা অবিশ্বাস করে, তবু সকলেই ইন্‌জেকশন লয়।

হীরালালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—ইন্‌জেকশন নিলে তো আর খাওয়ার বাধা থাকবে না?

—না, বরফ বেশী করে খাবেন।

—বেশ, লাগান তাহলে।

বিমল হীরালালবাবুকে চিকিৎসা শুরু করিয়া দিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আর একটি রুগীর ভার আপনাকে নিতে হবে, আমার মেজদা'র।

—কি হয়েছে তাঁর?

—তাঁর হয়েছে.... মানে, চলুন নিজের চোখেই দেখবেন। তিনি ঐ পেয়ারা-বাগে আছেন। কলকাতার ডাক্তাররা ওঁকে আলাদা থাকতে বলেছেন, চলুন।

মোটরে করিয়াই যাইতে হইল। পেয়ারা-বাগ নিতান্ত কাছে নয়। হীরালালবাবুদের প্রকাণ্ড একটা পেয়ারাবাগান আছে, তাহারই মধ্যে ছোট বাঙ্‌লোটির নাম পেয়ারা-বাগ। পেয়ারা-বাগে মতিলালবাবু একটি চাকর মাত্র সম্বল করিয়া একাই বাস করিতেছেন।

ঘরে ঢুকিয়াই বিমল বুঝিল মতিলালবাবুর কি হইয়াছে। ফোলা নাক, ফোলা কান, ভুরুর উপরও ফোলা, ফোলা ভুরুতে চুল নাই, সিংহের মত মুখভাব—কুষ্ঠ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় নাই। নমস্কার-বিনিময়াদির পর মতিলালবাবু বলিলেন—আমার ব্যায়রাম কি তা দেখেই বুঝতে পারছেন আশা করি। কলকাতা গিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলাম, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁরা একটা ওষুধ খেতে, একটা লাগাতে আর একটা ইন্‌জেকশন করতে দিয়েছেন। জগদীশবাবুকে ডেকেছিলাম তিনি আপনার কথাই বললেন। বললেন বুড়ো হয়ে গেছি ওসব ইনট্রাডারমল ইন্‌জেকশন আমার দ্বারা ভাল হবে না, বিমলবাবুকে ডাকুন আপনারা।

বিমল বলিল—কতগুলো ইন্‌জেকশন দিতে বলেছেন ওঁরা?

—অন্তত একশোটা।

বিমল এখানে আসিলে সাধারণত দশ টাকা করিয়া 'ফি' লয়। একশোটা ইন্‌জেকশন দিতে হইবে শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানস-চক্ষে এক হাজার টাকার অঙ্কটা ভাসিয়া উঠিল। এক হাজার টাকা তুচ্ছ করিবার মত জিনিস নয়। বলিল—ইন্‌জেকশন দেবার পিচকিরি টিচকিরি কিন্তু আপনাকে কিনতে হবে, এখানেই থাকবে সেগুলো।

—সব এনেছি আমি।

মতিলালবাবু একটি চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া দেখাইলেন, সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। মতিলালবাবুর চিকিৎসার ভারও বিমল লইল। সেই দিনই একটা ইন্‌জেকশন দিয়া দিল।

মতিবাবুর ওখান হইতে ফিরিবার মুখে বিমল হিরালালবাবুকে সাবধান করিয়া দিল।

—আপনি যেন ওখানে যাবেন না বার-বার, আপনার ডায়াবিটিস রয়েছে, আমার উচিত আপনাকে সাবধান করে দেওয়া, ছোঁয়াচে রোগ তো।

হীরালালবাবু বলিলেন—তা জানি সব, কিন্তু নিজের দাদা, তাঁকে তো ত্যাগ করতে পারি না। একবার অন্তত যেতেই হবে রোজ খোঁজখবর করতে, উনি আবার ভারী অভিমানী লোক।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

হীরালালবাবু বলিলেন—আরে ছেড়ে দিন মশাই আপনাদের ও-সব থিয়োরি-ফিয়োরি। যিনি যতই সাবধান হন সব মিঞাকেই এক দিন মরতে হবে, মাঝ থেকে ছোটলোক হয়ে মরি কেন?

খুত্ খুত্ করিয়া হীরালাল হাসিয়া উঠিলেন, চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া গেল এবং চিবুকের নীচে চর্বি থল্‌থল্ করিতে লাগিল। মোটর থামিলে হীরালাল বলিলেন—আপনাকে আর একটি রুগী দেখাব ডাক্তারবাবু, ঠিক রুগী অবশ্য নয়, আসুন—ওরে কম্‌লিকে ডাক—

উভয়ে আবার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। একটু পরেই কমলি আসিল। সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে।

—দেখুন তো একে, মুখময় ব্রণ হয়েছে মশাই, কিছুতে সারছে না। গেলে গেলে মুখময় দাগ করে ফেলেছে। বিয়ের বাজার, বুঝতেই পারছেন মুখময় দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেলে বিশ্রী দেখতে হবে, কেউ তখন পছন্দ করবে না।

বিবাহপ্রসঙ্গে কমলি লজ্জিত হইয়া একটু মাথা নীচু করিল।

বিমল ব্রণগুলি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি যাও—

কমলি চলিয়া গেল।

—কি উপায় করা যায় বলুন তো? ইন্‌জেকশন, মলম, লোশন সব রকম হয়ে গেছে।

বিমল নূতন একটা পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিল, সেইটাই লিখিয়া দিল।

—দেখুন এটাতে যদি সারে।

বিমল বাড়ি ফিরিবার মুখে একখানি খামের চিঠি পাইল। মেয়েলি হাতের ঠিকানা লেখা; সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষর। পথেই দাঁড়াইয়া সে হাতের চিঠিখানি খুলিল, খুলিয়া বিস্মিত হইল। বিনোদিনীর চিঠি! লিখিয়াছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটি বিশেষ কথা জানবার জন্যেই আপনাকে গোপনে এ চিঠিখানি লিখছি, আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনার বন্ধু আজ-কাল দিনরাত্রি দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্যে চারিদিকে অন্ন-বস্ত্র-চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন, নাইবার খাবার অবসর নেই, বাড়িতে অধিকাংশ দিনই রাত্রে আসেন না। দূরের সব গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়, প্রায়ই ফিরতে পারেন না। আমি যে তাঁর একটু সাহায্য করব তা তো হবার উপায় নেই জানেন, তিনি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান সব সময় আমি তা জানতেও পারি না। কোথায় খান, কি খান, শোন কিছুই জানি না, সুতরাং ওঁর সম্বন্ধে আমার একটা দুর্ভাবনা হয়েছে। তার ওপর সেদিন একটা জিনিস দেখতে পেয়ে ভয়ানক চিন্তিত হয়েছি আমি। সেদিন বাড়ি এসেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কি একটা ওষুধ খাচ্ছেন, আমাকে দেখতে পেয়ে লুকিয়ে ফেললেন সেটা। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে তোমার, ওষুধ খাচ্ছ কেন—হেসে বললেন কিছু হয় নি। অনেক

ধরাধরি করাতে বললেন ভাল হজম হয় না বলে বিমল একটা হজমের ওষুধ দিয়েছে। বলেই বেরিয়ে গেলেন, আজ তিন দিন হল এখনও ফেরেন নি। আমার মনের অবস্থাটা আপনি বুঝতেই পারছেন। ওঁর কি হয়েছে? দয়া করে আমাকে সব খুলে লিখবেন, কিছু লুকোবেন না। ওঁকে তো চেনেনই, খামখেয়ালী মানুষ, একটা-না-একটা কিছু সর্বদাই নিয়ে মেতে থাকেন। ধর্ম নিয়ে দিনকতক মেতে কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, থিয়েটার নিয়ে দিনকতক কাটালেন, এইবার দুর্ভিক্ষ নিয়ে পড়েছেন। এর পরই কলকাতায় খেলার হিড়িক লাগবে তখন নিশ্চয়ই কলকাতায় চলে যাবেন। চারদিকে এত হৈ হৈ করে বেড়ালে শরীর ভাল থাকবে কি করে বলুন তো! আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভাল করে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আপনার কথা খুব মানেন। আর আমাকে একটু জানাবেন দয়া করে সত্যি ওঁর কোন অসুখ হয়েছে কিনা। নিশ্চয়ই হয়েছে, তা না হলে ওষুধ খাবেন কেন শুধু শুধু। অসুখটা কি সেটা আমি জানতে চাই। আশা করি অবিলম্বে আপনি আমার চিন্তা দূর করবেন। মণিমালাকে নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ি। মণি ও আপনি আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানবেন। ইতি—

বিনোদিনী

হঠাৎ বিমলের মনে হইল পিছনদিকে কে দাঁড়াইয়া আছে। ঘাড়া ফিরাইয়া দেখিল গুপিবাবু কম্‌পাউণ্ডার, চশমার কাচের উপর দিয়া পত্রটার পানেই চাহিয়া আছেন। বলিলেন—হাসপাতালে একটা 'ফ্র্যাক্‌চার কেস্' এসেছে।

—কোথায় ভেঙেছে?

—বাঁ হাতটা।

—চলুন যাচ্ছি, আপনি সব ঠিক করুন গে।

—যে আজ্ঞে!

গুপিবাবু চলিয়া গেলেন। বিমল চিন্তিত মুখে চিঠিখানি পকেটস্থ করিয়া হাসপাতালের দিকে নয়, বাড়ির দিকেই অগ্রসর হইল। বড় ক্লান্ত লাগিতেছে। সর্বাগ্রে এক কাপ চা খাওয়া প্রয়োজন। বিনোদিনীকে সে কি উত্তর দিবে? মিথ্যা কথাই কিছু একটা লিখিতে হইবে। রুগীর গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহার স্ত্রীর কাছেও না।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন অমর আসিয়া পড়িল।

ফ্র্যাক্‌চারটা বাঁধিয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় মহাসমারোহে হার্মোনিয়াম বাজাইয়া, পতাকা উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে অমরের দল ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইল। দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা চাই। বিমলের সহসা মনে হইল ইহাই বাঙালীর চিরন্তন রূপ, যে কোন একটা জিনিসকে উপলক্ষ করিয়া সে উৎসব করিবে। হুজুগে না মাতিলে বাঙালী কিছুই করিতে পারে না। দেশের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে একথা প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, কিন্তু ঠিক এই ভাবে দ্বারে দ্বারে চাঁদা চাহিয়া না বেড়াইলে কেহই চাঁদা দিবে না। অনাহারক্লিষ্ট দেশবাসীর দুঃখে বিগলিত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা পাঠাইয়া দিবে এরূপ লোকের সংখ্যা কম। চাঁদা আদায় করিতে হইবে; এই আদায় করা ব্যাপারটাকে বাঙালী তাহার স্বকীয় প্রতিভাবলে একটু মনোরম করিয়া লইয়াছে মাত্র।

চাঁদা দিয়া বিমল অমরকে বলিল—তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, তুই কি ঐ দলের সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরবি না কি এখন?

—আমি না ঘুরলেও চলে, ওরাই যথেষ্ট।

তাহলে ওদের যেতে বলে দে, চল্ আমরা একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

—চল্।

বিমল অমরকে বিনোদিনীর পত্রখানি দেখাইয়া বলিল—এই খানিকক্ষণ আগে পেয়েছি। কি ওষুধ খাচ্ছিলি তুই?

অমর একটা কবিরাজি পেটেণ্ট ওষুধের নাম করিল। বলিল—খেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

—বিনুকে তোর এখন কি লিখি বল?

—সত্যি কথাটা ছাড়া আর যা খুশি লিখতে পারিস।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—এমন হৈ হৈ করে ঘুরিস কেন? বিনুর কাছাকাছি থাকলে অন্তত সে বেচারা একটু সন্তুষ্ট থাকে। তোদের ওই হারেমের মধ্যে একা একা সে বেচারির কি কষ্ট বল্ তো!

—কি করব বল, উপায় কি? তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখতে পাই না।

—তা বলে দিনরাত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবি, বেশ তো!

ম্লান হাসিয়া অমর বলিল—মর্ফিয়া দিয়ে তোরা যেমন শরীরের যন্ত্রণাটা ভুলিয়ে দিস, কাজ নিয়ে তেমনি আমি মনের যন্ত্রণাটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। কিন্তু মনে হচ্ছে আর যেন পারছি না। আমার দোষ হয়েছে তা এক-শ' বার স্বীকার করছি, কিন্তু একবার পা ফস্কালেই সারাজীবন ধরে তার শাস্তি চলবে এ যে বড় দুঃসহ ব্যাপার ভাই। এর ওষুধও নেই, ক্ষমাও নেই!

—ক্ষমা আছে কি নেই তা তো তুমি যাচাই করে দেখ নি এখনও, বিনু তো কিছুই জানে না।

অমর নিস্তব্ধ হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বিমল অমরকে বলিল—আমার মনে হয় বিনুকে সব কথা খুলে বলা উচিত। যার সঙ্গে আজীবন বাস করতে হবে তার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা করে চিরকাল চলা শক্ত। তাকে বলাই ভাল।

অমর হাসিয়া বলল—এখন সে হয় না ভাই, আমি যে এত দিন ভণ্ডামী করে এসেছি, তার কাছে অকলঙ্কিত ধার্মিক বলে নিজেকে দেখিয়েছি, হঠাৎ এখনি কি করে তাকে বলব যে আমি একটা চরিত্রহীন ব্যাধিগ্রস্ত লোক—

বিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—শান্তি পাবার ঐ একমাত্র উপায়। পাপকে চেপে রাখতে নেই। আমরা যেমন শরীরের কোথাও পুঁজ হলে সেটাকে বের করে দি, তেমনি মনের গ্লানিও বের করে দেওয়া উচিত। তাতে শান্তি পাওয়া যায়।

অমর কিছু বলিল না—দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। অস্তমান সূর্যকিরণে জল-স্থল-আকাশ সুরঞ্জিত। পাল তুলিয়া দুইখানা নৌকা কেমন চমৎকার ভাসিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ একটা নৌকার পাল যদি ছিঁড়িয়া যায়, হঠাৎ যদি ঐ সুরঞ্জিত আকাশপটে কেহ

খানিকটা আলকাতরা লাগাইয়া দেয়, হঠাৎ যদি এই গলিত স্বর্ণবৎ নদীজল পঙ্কিল দুর্গন্ধ হইয়া উঠে—

দূরে হার্মোনিয়াম ও গানের আওয়াজ শোনা গেল।

অমর বলিল—এইবার ওঠা যাক্।

—কোথা যাবি এখন?

—কুবেরগঞ্জে।

—সে তো দশ মাইল এখানে থেকে—

অমর একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

[পাঁচ]

বিমলের ইচ্ছা করিতে লাগিল জমিরুদ্দিন সাহেবের মুখের উপর শুনাইয়া দেয় যে আপনার ঐ টাঙানো কম্বলটা তো ঠিক আছে, ওটা তো দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে না, আমি তো ওইটাই রোজ দেখিতেছি! রোগিণীকে দেখিতেই পাই না, তাঁহার ভাল-মন্দের দায়িত্ব কি করিয়া লইব? ইচ্ছা করিল, কিন্তু সত্য সত্যই সে কথা বলিতে পারিল না। আমাদের অধিকাংশ সদিচ্ছাই মনে মনে থাকিয়া যায়—বাঙ্ময় হইতে পায় না। যদিও বা সেটাকে প্রকাশ করিতে পারি, কার্যে পরিণত করিতে পারি না। আমরা চিন্তাবীর, কর্মবীর নই।

বনিয়াদি মুসলমান পরিবার; পর্দার খুব বাড়াবাড়ি। রুগী তো বোর্কা পরিয়া আছেই, তাহার বিছানার সামনে প্রকাণ্ড একটা কম্বলও টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রুগী কম্বলের ভিতর দিয়া হাতটা একটু বাহির করিয়া দেয়, বিমল দুটি আঙুল দিয়া নাড়ীটা দেখিবার একটু সুযোগ পায়। ঐ নাড়ী দেখিয়াই যতটুকু হয়। আজ জমিরুদ্দিন সাহেব বলিলেন যে রোগের অবস্থা ভাল নয়, দিন দিন যেন খারাপই হইতেছে।

বিমলের শুনিয়া রাগ হইল, কিন্তু রাগ সে প্রকাশ করিল না। ভূধরবাবুর কথাটা তাহার মনে পড়িল, আপনি হাল ছেড়ে দিলে আর একজন এসে হালে বসবে।

অসুখ সারুক আর না সারুক তাহার প্রত্যহ কয়েকটা করিয়া টাকা হইতেছে। অপ্রিয় কয়েকটা সত্য কথা ইহাদের শুনাইয়া দিয়া লাভ নাই। সে যদি রাগ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, আর এক জন আসিয়া ঐ অদৃশ্য রুগীরই চিকিৎসা করিতে বসিবে, এই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারের প্রতিবাদ করিবে না, তাহার স্পষ্টবাদিতার সুযোগ লইয়া স্বচ্ছন্দে তাহার স্থানটি দখল করিয়া বসিবে।

বিমল চিন্তিত মুখে বলিল—সিভিল সার্জন আর লেডী ডাক্তারকে ডাকা দরকার।

—বেশ।

রুগীটিকে যে ভাল করিয়া সর্বাগ্রে দেখা দরকার তাহা বলিয়া লাভ নাই। সেকালের কবিরাজ এবং হাকিমরা নাড়ী দেখিয়াই সব কিছু করিতেন, রুগীর হাতে সূতা বাঁধিয়া সেই সূতাটি মাত্র অবলম্বন করিয়া আগেকার অসাধারণ চিকিৎসকগণ অলৌকিক সব কাণ্ড করিয়াছেন, একালেই বা সমগ্র রুগীটাকে দেখিবার জন্য এ আগ্রহ কেন? একাল-সেকালের

তুলনায় একালকেই চিরকাল হার মানিতে হয়। হার মানিয়া চুপ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য। বিমল টাকা কয়টি পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া গেল।

[ছয়]

একদিন সকালে দাঁতন হস্তে বদিবাবু আসিয়া দেখা দিলেন।

—ডাক্তার, এবার নন্দী-মহাশয়কে একটু সন্তুষ্ট না করলে চলছে না। সে-বার হেরে গিয়ে উনি বড্ড মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন।

বিমল ইদানীং মিউনিসিপ্যালিটির কোন খবরই রাখিত না। সুতরাং সে ভাল বুঝিতে পারিল না।

—কিসের ব্যাপারে?

বদিবাবু হাসিয়া বলিলেন—আহা ঐ যে ইলেকট্রিক স্কীম!

বিমল শঙ্কিত হইয়া বলিল—আবার প্রবন্ধ লিখতে হবে না কি?

—না, তার চেয়েও বেশী, ক্যানভাস করতে হবে।

—বলেন কি?

বদিবাবু বলিলেন—আপনার তো আজকাল সর্বত্র অবারিত দ্বার।—মথুরবাবু, সৌরীনবাবু, হীরালালবাবু, জমিরুদ্দিন, চৌধুরিমশাই এমন কি হরেন বোস অবধি আপনার করায়ত্ত হয়ে গেছেন, সবাইকে একবার করে বলে দেবেন যেন নন্দীকেই ভোট দেন। এবার হেরে গেলে নন্দী ক্ষেপে যাবে।

বিমল বলিল—আচ্ছা, এই শহরে ইলেকট্রিসিটি নেবার মতন কি মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা? গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টাকা ধার করে! আপনি কি মনে করেন?

বদিবাবু নীরবে কিছুক্ষণ দাঁতন ঘষিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—আমরা উন্মাদ হতে পারি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তো আর উন্মাদ নয়! আমরা অনুরোধ করলেও গবর্ণমেণ্ট টাকা দেবে না। খালি নন্দী মশায়ের মুখরক্ষের জন্যেই এ-সব করা, আর কিছু নয়। আপনি একটু চেষ্টা করবেন।

—আচ্ছা। মথুরবাবু কিন্তু শুনবেন না আমার কথা।

—একজন না শুনলে আর কি হবে!

নন্দী-প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বদিবাবু অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা বলিলেন—অনেকেরই তো চিকিৎসা করেছেন, এবার আমারও একটু চিকিৎসা করুন।

—কি হয়েছে আপনার?

—আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার কোন অসুখ করেছে? অবশ্য টাকটাকে যদি অসুখের মধ্যে গণ্য করেন তাহলে—

বদিবাবু অকৃত্রিম আনন্দভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

—বেশ বলেছেন এটা।

তাহার পর আরও খানিকক্ষণ দাঁতন ঘষিয়া বলিলেন—না, শরীরের কিছু গড়বড় হয়েছে, সেদিন পাটনায় সেটা বুঝলাম।

—পাটনায় গিছলেন না কি?

—হ্যাঁ, পাটনা হাইকোর্টে একটা কাজ ছিল। সেদিন পাটনার রাস্তায় দাঁড়িয়ে মশাই গল্প করছি হঠাৎ এক টমটমওয়ালা একটা ছোট ছেলেকে চাপা দিয়ে ছুট! বদি চাটুজ্যের কাছে এ চালাকিটি চলবার উপায় নেই! আমি ছুটলাম তার পিছনে, ধরলাম কিছু দূর গিয়ে, খুব উত্তম-মধ্যম দিলাম বেটাকে। চাপা না হয় দিয়ে ফেলেছিস, টমটমটা থামিয়ে ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দে, তা নয় পালাচ্ছিস্। বদি চাটুজ্যের সামনে এ চালাকি চলবে কেন?

বদিবাবু বিমলের মুখের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন।

—ঠিক করি নি?

—ঠিক করেছেন।

—ও ব্যাপার তো মিটে গেল, কিন্তু আমার হাঁপানি আর কিছুতে থামে না মশাই, প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে হাঁপালাম। আমাদের কলেজের ফুটবল টিমে লেফট্ উইঙে খেলতাম আমি, আমার নাম ছিল ঝড়! ভীষণ ছুটতে পারতাম, কই সেকালে কখনও এত হাঁপিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

বিমল হাসিয়া বলল—বয়স বাড়ছে। চলুন আপনার হার্টটা দেখি—আসুন ঐ বাইরের ঘরটায়—

বাহিরের ঘরটায় ঢুকিবার মুখে কয়েকটা পেঁয়াজের খোসা লক্ষ্য করিয়া বদিবাবু বলিলেন—আপনি খুব মাংস খান শুনেছি—

—প্রত্যহ।

—বলেন কি! শাকসব্জী খান না একেবারে?

বিমল হাসিয়া বলিল—না।

—শুনেছি শাকসব্জীতে খুব ভিটামিন আছে।

—থাকতে পারে কিন্তু আমি ও-সবের ধার ধারি না।

বদিবাবুর হার্টটা দেখিয়া বিমল বলিল—না বিশেষ কিছু নয়; আপনি কিছু দিন বিশ্রাম নিন।

—তা তো আপাতত অসম্ভব। আচ্ছা খবরের কাগজে কিছু দিন আগে হার্ট নিয়ে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল—

—ওগুলো পড়বেন না। খবরের কাগজের ঐ সস্তা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো সবাইকে সবজান্তা করে দিয়ে মহা মুশকিলে ফেলেছে আমাদের।

—কেন ওগুলোতে কি ভুল খবর থাকে না কি?

—ভুল ঠিক নয়, কিন্তু পুরো খবর থাকে না। আর ঐ স্বল্প আহরণ করে ভয়ঙ্কর মুশকিল হচ্ছে, আপনাদেরও আমাদেরও।

বদিবাবু কিছুক্ষণ বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—আমার কোন ওষুধ-টষুধ ব্যবস্থা করবেন না কি?

—বিশ্রামই আপনার ওষুধ, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন কিছু দিন।

—সে তো অসম্ভব। আচ্ছা চলি তাহলে।

বদিবাবু চলিয়া গেলে পরেশ-দা আসিলেন।

—তোমার যে আজকাল টিকিই দেখা যায় না হে!

—না থাকলে দেখবেন কি করে! কোথা যাচ্ছেন?

—আমি যাচ্ছি 'হরিমোহন মেমোরিয়াল' কাপের টাইগুলো সব ঠিক করতে। তুমি কমিটিতে আছ জান তো?

—শুনেছি। আমাকে কেন ওর মধ্যে ঢোকালেন শুধু শুধু?

কেন ঢুকাইয়াছেন তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ না দেখাইয়া পরেশ-দা হাসিমুখে বলিলেন—বাঃ, সে কি হয়? হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার বউদির ঐ ওষুধটাই চলবে না কি?

—জ্বর ছেড়ে গেছে তো?

—কালই।

—আরও চলুক এক দিন।

পরেশ-দা চলিয়া গেলেন, বিমল বাড়ির ভিতর ঢুকিতে যাইতেছে এমন সময় মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স-কালেক্টার ভুবনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

—ওহে ডাক্তার, আমার সর্বাঙ্গ যে খোসে ভরে গেল, একটা কিছু ব্যবস্থা কর ভাই। রক্তটাকে যদি পরীক্ষা করতে চাও তাই না হয় কর, আর তো পেরে উঠছি না।

বিমল দেখিয়া বলিল—কি ওষুধ লাগাচ্ছেন?

—সব রকম লাগিয়েছি, গাঁজার তেল, গন্ধক, শেয়ালকাঁটা গাছের শেকড়, আলকাতরা, তুঁত—

বিমল হাসিয়া ফেলিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—তুমি তো এ অঞ্চলের ইন্‌জেকশন-সম্রাট হয়ে উঠেছ, তাই তোমার কাছে এলাম, যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার।

বিমল বলিল—বেশ, আজ হাসপাতালে যাবেন, একটা ইন্‌জেকশন দেব আপনাকে। কিন্তু আমার হাসপাতালের ওষুধ যে আবার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, এইবার আপনি কিছু ট্যাক্স আদায় করে দিন। হয়েছে কিছু ট্যাক্স আদায়? এত দিন তো আমি ভিক্ষে করে চালালাম—

ভুবনবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন—ট্যাক্স কাদের বাকী জান?

—কাদের?

ঐ সব হোমরা-চোমরাদের। মথুরবাবু ছাড়া আর সকলের কাছে ট্যাক্স পাওনা রয়েছে। কিন্তু ওঁরা মালিক, ওঁদেব কাছে তো আর বার-বার তাগাদা করতে পারি না। নন্দী-মশায়কে একটু তাগাদা করেছিলাম, তিনি এমন ভাবে চোখ গরম করে চাইলেন আমার দিকে যে আমার পিত্তি শুকিয়ে যাবার জোগাড়!

বিমল এ-কথা জানিত না, চুপ করিয়া রহিল।

ভুবনবাবু বলিলেন—যত তম্বি গরীবদের উপর, তারা ট্যাক্স না দিলে তাদের ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি বিক্রী কর অথচ ওঁদের যে প্রত্যেকেরই এক কাঁড়ি করে বাকি রয়েছে সেদিকে কারও দৃকপাত নেই।

বিমল বলিল—আচ্ছা হাসপাতালে চলুন আপনি, আমি যাচ্ছি একটু পরে। ভুবনবাবু বৃদ্ধ লোক। বিমলকে খুব স্নেহ করেন। তাই বোধ হয় এই গোপন কথাগুলি বলিলেন। গমনোন্মুখ বিমলকে ডাকিয়া আবার বলিলেন—এ-সব কথা' যেন প্রকাশ না পায়, দেখো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি—চাকরিটা গেলে খেতে পাব না।

—না, না, আমি কাউকে কিছু বলব না।

[সাত]

সুপ্রিয়া সরকারকে ইন্‌জেকশন দিতে গিয়া বিমল দেখিল বাহিরের ঘরটাতে এক সুব্রতবাবু ছাড়া আর কেহ নাই। এই শীর্ণকায় উন্নতনাসা লোকটাকে দেখিলে বিমলের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। সুব্রতবাবু পড়িতেছিলেন বিমলকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া আসিলেন,—ও আপনি এসে গেছেন। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন, আজ সেটা আমরা আন্দাজই করতে পারি নি। বসুন, খবর পাঠাই একটা—

বিমল উপবেশন করিল, সুব্রতবাবু বাহির হইয়া গেলেন। ভদ্রলোকের কথায় বার্তায় ব্যবহারে বেশ সুমার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, লেখাপড়াও জানেন, প্রথম শ্রেণীর এম. এ. যখন নিশ্চয়ই জানেন, অথচ কেমন যেন একটা শ্রীহীন ভাব ভদ্রলোকের। দেখিলেই মন বিমুখ হইয়া যায়। একটি চাকরকে বাইসিকেলপৃষ্ঠে রওনা করিয়া দিয়া সুব্রতবাবু আসিয়া বসিলেন।

—আচ্ছা, সুপ্রিয়াকে কি রকম দেখছেন বলুন তো ? কাল আবার প্যালপিটেশন হয়েছিল খুব।

—তাই না কি?

বিমল চিন্তিত হইয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

সুব্রতবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ওর অসুখটা কি বলুন তো ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমল বলিল—একটা কথা বলব যদি কিছু না মনে করেন।

—কি বলুন।

—আপনার সন্তান না হলে অসুখ সারবে না।

সুব্রতবাবু খানিকক্ষণ বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—কিন্তু মুশকিল এই যে সুপ্রিয়া ছেলে চায় না!

—কেন?

সুব্রতবাবু ইহার উত্তরে অনেকক্ষণ কিছু বলিলেন না, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা একটু হাসিয়া বলিলেন—আমার বিয়ে করাই ভুল হয়েছিল।

বিমল মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অজ্ঞাতসারে হয়ত কোন বেদনার স্থানে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে। তবু সে প্রশ্ন করিতে ছাড়িল না।

—কি হিসেবে ভুল বলছেন?

—সে আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি ঘর-জামাই নন!

সুব্রতবাবু যে ঘর-জামাই বিমল তাহা জানিত না, মনে মনে বিস্মিত হইয়া গেল। বাহিরে কিন্তু হাসিয়া বলিল—তাতে কি হয়েছে?

—অনেক কিছু হয়েছে। তার জন্যেই সুপ্রিয়া ছেলে চায় না, বলে শঙ্করাকে ডেকে আর দরকার নেই, নিজেদের ঠাঁই হয়েছে তাই যথেষ্ট!

বিমল বলিল—বেশ তো আলাদা থাকুন আপনারা, এখানে থাকবার দরকার কি?

সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া সুব্রতবাবু বলিলেন—চেষ্টা করছি না ভাবছেন, কিন্তু হচ্ছে না—কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পারছি না। এম. এ.তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে কিছু সুবিধে হয় নি।

একটা কলেজে চাকরি খালি হয়েছে, দরখাস্ত তো করেছি, দেখি যদি হয়। ভরসা কিছু নেই, জীবনে অনেক দরখাস্তই করেছি অনেক জায়গায়।

সুব্রতবাবু হাসিলেন। করুণ হাসি।

—কোন্ কলেজে?

সুব্রতবাবু কলেজের নাম বলিলেন। কি আশ্চর্য বিমলের শ্বশুরই যে সে কলেজের প্রিন্সিপাল! সে কথা বলিতেই সুব্রতবাবুর চোখে মুখে যেন আলো জ্বলিয়া উঠিল। অবিন্যস্ত কেশভার বাঁ-হাত দিয়া কপালের উপর হইতে সরাইয়া তিনি বলিলেন—একটু চেষ্টা করবেন দয়া করে?

—নিশ্চয়ই! কলেজ-কমিটির দু-এক জনের সঙ্গে আলাপ আছে আমার, কালই চিঠি লিখব আমি।

—চলুন না যাই এক দিন। চিঠিপত্তর লিখে এসব ব্যাপারে তেমন ঠিক হয় না। সুপ্রিয়াকে আর একবার কলকাতা নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল, চলুন না সব যাই একসঙ্গে।

—যাওয়া মুশকিল!

—না না, চলুন ডাক্তারবাবু প্লীজ—

দুই হাত দিয়া সুব্রতবাবু বিমলের হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন। শীর্ণ শিরাবহুল হাত দুইখানির দিকে চাহিয়া বিমল 'না' বলিতে পারিল না। বলিল—চেষ্টা করব। ছুটি না পেলে তো যেতে পারি না। আমারও তো চাকরি—

—আপনার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবার ভার আমি নিচ্ছি। কাকাবাবু ঐ ওধারের বারান্দায় আছেন, চলুন তাঁকে গিয়ে এখুনি বলি, তিনি চেষ্টা করলে হয়ে যাবে।

—সৌরীনবাবু আছেন না কি বাড়িতে?

—আছেন, আসুন।

সুব্রতবাবুর পিছনে পিছনে বিমল বারান্দায় গিয়া হাজির হইল। বারান্দার এক প্রান্তে একটি সুদৃশ্য চেয়ারের উপর সিগারহস্তে সৌরীনবাবু বসিয়াছিলেন, সম্মুখে একটি মিস্ত্রি বসিয়া কি যেন প্রস্তুত করিতেছিল। পদশব্দ শুনিয়া সৌরীনবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইলেন এবং বিমলকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আসুন আসুন, কতক্ষণ এসেছেন, ওরে ফকির চেয়ার বার কর।

বিমল দেখিল প্রকাণ্ড একটা খাঁচার মতন কি যেন প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু ছোটবড় নানা মাপের এতগুলো আয়না কেন! গোল, তিনকোণা, চৌকোণা নানা রকম আয়না।

—এ-সব কি?

সৌরীনবাবু সিগারে মৃদুগোছের একটা টান দিয়া বলিলেন—আর কিছু নয়, আমাদের হীরেমোহনটার মাথা খাবার চেষ্টা করছি।

—তার মানে?

—তার মানে ওর একটা বড়গোছের খাঁচা তৈরি করিয়ে তাতে নানা রকম আয়না 'ফিট' করে দিচ্ছি। মানুষের সঙ্গে যখন বাস করছে তখন অতটা নিশ্চিন্তে ওকে থাকতে দেব কেন? কি বল সুব্রত! নিজেরই ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া ভাব যা হোক একটা কিছু করুক, আমরা দেখি। পাখির মুখে কেষ্ট নাম শুনে কি আর চারটে হাত বেরুবে? তার চেয়ে ও যদি আয়নায় নিজের ছায়াটার সঙ্গে ঝাপটাঝাপটি করে, দেখে সুখ হবে খানিকটা। কি বলেন ডাক্তারবাবু!

ভদ্রলোকের উদ্ভাবনীশক্তি দেখিয়া বিমল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সৌরীনবাবু বলিলেন—শুধু নিজের ছায়াই নয়, বাইরের অনেক কিছু দেখেও অকারণে ভয় পাবে কিংবা খুশি হবে। বেরালের ছায়া দেখে ভাববে, ওই রে বুঝি বেরাল খাঁচার ভেতরে ঢুকেছে—প্রাণপণে চেঁচাবে! অন্য একটা পাখির ছায়া পড়লে আশ্চর্য হয়ে ভাববে, এ আবার কোথা থেকে এল! কিংবা হয়ত কিছুই করবে না, মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে—দেখাই যাক্। নানা রকম আয়না তো এনে জোটানো গেছে। ও যদি একদম কিছুই না করে তাহলে আপনাকে একদিন 'কল' দিতে হবে!

—আমাকে? কেন?

—ওকে তাহলে একটু মদ খাওয়াব, মাত্রাটা ঠিক করে দেবেন আপনি। সুস্থমস্তিষ্কে যদি ও কিছু না করে মাতাল হলে করতে পারে।

—পাখিটাকে শুধু শুধু ব্যতিব্যস্ত করছেন কেন?

—কারণ আমি মানুষ।

সৌরীনবাবুর সমস্যা এবং সুব্রতবাবুর সমস্যা এতই বিভিন্ন রকমের যে সুব্রতবাবুর কথাটা চট করিয়া পাড়া গেল না। বদিবাবুর কথাটাও বিমলের মনে পড়িল। পাঁচ রকম কথায় পাছে কথাটা ভুলিয়া যায় সেই জন্য বলিল—আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

—কি বলুন।

—এবার মিউনিসিপ্যাল মিটিঙে আপনার ভোটটা নন্দীমশায়কেই দেবেন।

—বেশ. ফকির আমার ডায়েরিটা নিয়ে এস তো। কবে মিটিং?

—২৭শে।

ফকির নামক ভৃত্যটি ডায়েরি আনিল, সৌরীনবাবু লিখিয়া লইলেন।

বিমল হাসিযা জিজ্ঞাসা করিল—কি বিষয়ে ভোট, কিসের মিটিং কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না যে বড়?

—আজ পর্যন্ত জীবনে কোন জিনিসের ভাল মন্দ বিচার করে ভোট দিই নি। বরাবর অনুরোধে পড়ে দিয়েছি। যে প্রথমে অনুরোধ করে তাকেই ভোট দিই, যদি কেউ অনুরোধ না করে কোন পক্ষেই দিই না। কি বিষয় কি বৃত্তান্ত তা নিয়ে মাথা-ঘামানো সুতরাং বৃথা। সবারই বোধহয় আমার মত দশা, এ যুগে স্নেহের বরং চোখ আছে, ভোট একেবারে অন্ধ!

মোটর থামিবার শব্দ পাওয়া গেল এবং ক্ষণপরেই সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়ার মা ও সুধীন আসিয়া হাজির হইলেন। সুপ্রিয়ার মায়ের হাতে অসমাপ্ত সোয়েটারটা রহিয়াছে, এখনও শেষ হয় নাই। সেটার দিকে চাহিয়া সৌরীনবাবু মন্তব্য করিলেন, ওটা শেষ হলে কি করবে বৌদি ভেবে রাখ এখন থেকে। আমার মোজা, কমফর্টার, সোয়েটার, সুপ্রিয়ার ব্লাউস, মাফলার সব তো হল, সুব্রতরও তো কি একটা হয়েছে!

ভগবতী দেবী দেবরের এ-সব মন্তব্যের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না, তিনি একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন এবং আপন মনে বুনিতে লাগিলেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—আমার যদি বুদ্ধি নাও একটা নতুন জিনিস বাতলাতে পারি। এই সোয়েটারটা হয়ে গেলে উল-টুলের ভেতর আর যেও না তুমি। আমাদের যে ঐ গ্রামোফোনটা

আছে, নিছক গান শোনান ছাড়া ওটার আর কোনই কাজ নেই, ঐ মেশিনটাকে যদি কোন কাজে লাগাতে পার মন্দ হয় না। ধর যদি ওতে আরও কিছু জুড়ে-টুড়ে এমন করা যায় যে দম দিয়ে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে গানও হবে, সঙ্গে ঘোল মওয়াও হবে, কিংবা ঐ রকম একটা কিছু—

ভগবতী দেবী উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রিয়া বলিলেন—কি যে আপনি কাকাবাবু, খালি খালি মাকে রাগাবেন।

সৌরীনবাবু বলিলেন—তোরা বুঝিস না, ওতে তোর মা খুশি হয়। না করলেই চটে যাবে। বাল্যকাল থেকে এ-কাজ করছি. আমাদের দু-জনের পরিচয় প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী যে, সে-কথা ভুলে যাস কেন?

বিমল বলিল—চলুন আপনার ইন্‌জেকশনটা সেরে ফেলি।

—আপনাদের জ্বালায় আর পারি না আমি।

সৌরীনবাবু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চক্ষু বুজিয়া সিগারে একটি মৃদু টান দিলেন।

ইন্‌জেকশন শেষ করিয়া বিমল বাহিরে আসিতেই সৌরীনবাবু বলিলেন—সুব্রত কাজের লোক হয়ে উঠতে চাইছে, শুনেছেন?

—শুনেছি।

—এটা অহমিকার লক্ষণ, সুতরাং দুর্লক্ষণ, কি বলেন?

বিমল কিছু বলিল না, একটু হাসিল মাত্র।

—শুধু হাসলে চলবে না; হাঁ-না কিছু একটা বলুন, তর্ক অন্তত একটা জমে উঠুক। বসুন।

বিমল বলিল—না আর বসব না, কাজ আছে আমার।

—কাজের লোক হওয়ার এই একটা প্রধান দোষ; সুব্রতও দিনকতক পরে ওই হয়ে পড়বে!

বিমল বলিল—সুপ্রিয়ার অসুখ সারাবার জন্যেই সুব্রতবাবুর চাকরি নেওয়া উচিৎ।

—মানে ইন্‌জেকশনে কিছু হবে না?

—আমার তো মনে হয় না।

সৌরীনবাবু হতাশভাবে বলিলেন—ডাক্তারের প্রেসকৃপশনের উপর তো হাত নাই!

সুপ্রিয়া সরকারকে ইন্‌জেকশন দিয়া বিমল হীরালালবাবুর ওখানে গিয়াছিল। সেখানে হীরালালবাবু এবং মতিলালবাবুর ইন্‌জেকশন দেওয়ার কথা ছিল। ইন্‌জেকশনেরই যুগ পড়িয়াছে! ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইন্‌জেকশন দিতে হয়। হীরালালবাবু ইন্‌জেকশন লইয়া অনেকটা ভাল আছেন. কিন্তু মতিবাবুর তো কোন উন্নতিই হইতেছে না। ভদ্রলোকের ওখানে বেশীক্ষণ বসিতে ইচ্ছা করে না, অথচ ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়িতে চান না। এই কুষ্ঠরুগীদের অপরের সহিত মাখামাখি করিবার দিকে কেমন যেন একটা ঝোঁক আছে। কত রকম লোকের সহিতই ডাক্তারদের রোজ সাক্ষাৎ করিতে হয়, কত রকম লোকের সমস্যা! সুপ্রিয়া, সুব্রত, সৌরীনবাবু, ভগবতী দেবী, নন্দীমহাশয়, অমর, বিনোদিনী প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সমস্যা।

রাস্তার ধূলা উড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে, নিদাঘ দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বাতাস হু

হু করিয়া বহিতেছে, বিমল একা বসিয়া ভাবিতেছে, বুক-পকেটটা টাকার ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সহসা বিমলের নজর পড়িল ডান দিকের মাঠে গাছতলায় একটা লোক পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটা যে আরাম করিয়া এই দুপুরে ওখানে শুইয়া আছে তাহা তো মনে হয় না। শুইবার ভঙ্গীটাও যেন অস্বাভাবিক, যেন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে। বিমল মোটর থামাইতে বলিল। কাছে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে নির্বাক হইয়া গেল। প্রচুর রক্ত জমিয়া শুকাইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই উপর মুখ গুঁজিয়া জরাজীর্ণ অস্থিপঞ্জরসার একটা লোক উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত, এই উত্তপ্ত নিষ্করুণ ধরণীকেই সে দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বিমল একটু ঝুঁকিয়া তাহার নাড়ীটা দেখিল— কোন স্পন্দন নাই। আর একটু ঝুঁকিয়া বাঁ-হাত দিয়া তাহার মাথাটা সরাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এ কি, এ যে সেই যক্ষ্মাগ্রস্ত ভিখারী বুড়োটা যাহাকে সে এক দিন চড় মারিয়া হাসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ভিখারীর সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিবে, কি করিবে কিছুই তাহার মাথায় আসিল না। সহসা তাহার চমক ভাঙিল। ড্রাইভারটা বলিতেছে—ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে ওর?

—মরে গেছে।

ড্রাইভার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাহলে আর কি হবে? চলুন। আমাকে আবার চারটের সময় সোয়ারি দিতে হবে। দিদিরা সতীশবাবুর ওখানে যাবেন, সেখানে জলসা আছে।

ঠিক তো! তাহারও সেখানে নিমন্ত্রণ আছে। কলিকাতার এক বিখ্যাত নর্তকী মাত্র এক রাত্রির জন্য আসিয়াছেন।

মোটরে উঠিয়া বিমল বলিল—জোরে চালাও।

আইনত তাহার থানায় খবর দেওয়া উচিত, থানার দারোগার উচিত মৃতদেহটাকে সদরে পাঠানো, সদরের ডাক্তারের উচিত মৃতদেহটাকে চিরিয়া ফাড়িয়া সন্তোষজনক বিবৃতি প্রকাশ করা। শেয়াল-কুকুর-শকুনিতে ছেঁড়াছিঁড়ি না করিয়া একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার সেটা করিবে, হয়ত কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তবু বিমল মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারটার হাতে দশ টাকার একখানি নোট দিয়া বলল—এই টাকা দশটা দিয়ে তুমি ঐ লোকটা যাতে গঙ্গা পায় তার একটা ব্যবস্থা করে দিও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হইয়া গেল।

বিমল বলিল—হীরালালবাবুকে আমার নাম করে বলো, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। খরচটা আমিই দিচ্ছি। ওতে কুলুবে তো?

ড্রাইভার একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—টাকাটা আপনি রাখুন ডাক্তারবাবু, আমি টাকা নিয়েছি শুনলে ছোটবাবু আমার উপর রাগ করবেন।

—না, না, কিছু না, আমার নাম করে বলো তুমি।

বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া পারঘাটার নৌকায় চড়িল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল আর এক সমস্যা। মণিমালার পা পুড়িয়া গিয়াছে। ফুটন্ত দুধের কড়াটা নামাইতে গিয়া হাত ফসকাইয়া এই কাণ্ড। আরও এক মুশকিল হইয়াছিল, ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। জগদীশবাবু, ভূধরবাবু সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছেন, অবশেষে রেলের

ডাক্তার জগুবাবু আসিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, দুলু নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাঁহাকেই ডাকিয়া আনিয়াছিল। বিমল দেখিল জগুবাবু সুব্যবস্থাই করিয়াছেন, এমন কি ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক একটা সিরাম পর্যন্ত দিয়া গিয়াছেন। সবই হইয়াছে কিন্তু বিমল মনে মনে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। রাঁধুনী বামুন রাখা লইয়া মণির সহিত তাহার গোড়ায় গোড়ায় বেশ ঝগড়া হইয়া গিয়াছিল, বিমল ইচ্ছা করিয়াই রাঁধুনি রাখে নাই, দুই জনের মাত্র রান্না তার জন্যেও রাঁধুনী! তাহার চেয়ে হোটেল হইতে আনাইয়া খাইলেই হয়। মণি যে হঠাৎ পুড়িয়া যাইতে পারে এ সম্ভাবনাটার কথা তাহার মনেই হয় নাই। তাহার উপর সে অন্তঃসত্ত্বা। বিমল বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। যদিও জ্বালা অনেক কমিয়াছে, তবু নানা রকম উপসর্গ হইতে পারে। মণির দিকে বিমল চাহিয়া দেখিল মণির চোখে একটা দুষ্টামিভরা হাসি উঁকি দিতেছে, ভাবটা যেন রাঁধুনী রাখতে চাও নি যে, কেমন হয়েছে এবার।

[আট]

মণিমালা ভাল হইয়া গেল।

মণিমালা ভাল হইয়া গেল বটে, কিন্তু ঘোষেদের বাড়ির যে-মেয়েটি পুড়িয়া গিয়াছিল সে আর ভাল হইল না। সে বাঁচিতে চাহেও নাই, চাহিলে সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া তাহা কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিয়া নিজ হাতে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিত না। সতর-আঠারো বছরের অবিবাহিতা মেয়ে, নানা কারণে জীবন তাহার দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার করুণ কথাগুলি বিমলের কানে বাজিতেছিল,—আমি বাঁচতে চাই না ডাক্তারবাবু, আমাকে তুমি যেন বাঁচিয়ে দিও না গো!

এই ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়, প্রায়ই শোনা যায়। তবু বিমলের মনটা কেমন যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। নন্দীমহাশয়ের পুত্র রমেনের নাম মেয়েটার সহিত যুক্ত করিয়া যে-সব কুৎসা রটিয়াছে তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি বিমলের ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল আমরা কোথায় চলিয়াছি! আমাদের এত শিক্ষা-দীক্ষা, বক্তৃতা-আড়ম্বর কোন কিছুই তো মনের গুহাবাসী পশুটার নখ-দন্তের তীক্ষ্ণতা এতটুকু কমাইতে পারিতেছে না। বরং নানা ছুতায় আমরা সেই নখদন্তকে শাণিততর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি! আজকাল ওই যে ঘরে ঘরে মেরি স্টোপ্‌স, ফ্রয়েড এবং হ্যাভেলক এলিস পড়ার ধুম—তাহা কি কেবল নিছক জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য? এই যে আজকাল পথে ঘাটে অশ্লীল গল্প-কবিতার ছড়াছড়ি এ কি নিছক সাহিত্য-প্রীতির জন্যই? এই যে দলে দলে লোক সিনেমায়, নাচে যায়, এই যে রাশি রাশি অশ্লীল ছবি গোপনে ও প্রকাশ্যে ক্রীত-বিক্রীত হয় ইহা কি নির্জলা আর্ট-প্রীতি ছাড়া আর কিছুই নহে? আমরা নানা উপায় পশুটাকে লোলুপ করিয়া তুলিতেছি, অথচ তাহার আহার জুটাইবার সঙ্গতি ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না, অভদ্রভাবে অসদুপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নানা ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ছদ্মবেশটা ধরা পড়িয়া গেলে অনেক সময় লজ্জিত হই বটে, কিন্তু সেটা চক্ষুলজ্জা, সামাজিক লজ্জা, আন্তরিক নৈতিক লজ্জা নহে। নীতি আবার কি? বাঁচিয়া থাকা এবং যত দূর সম্ভব জাঁকজমক করিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই তো শ্রেষ্ঠ

নীতি! সকলেই বুদ্ধিমান, সকলেই বুদ্ধির আলোক দিয়া সব জিনিস যাচাই করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে এবং তাহারই জোরে ভগবান, ধর্ম প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কারগুলিকে অনায়াসে বাতিল করিয়া দিয়াছে। যে অন্ধবিশ্বাসের বলে আমাদের পূর্বপুরুষগণ পাপকর্ম হইতে বিরত এবং পুণ্যকর্মে নিরত থাকিতে চেষ্টা করিতেন, সে অন্ধবিশ্বাস তো আর নাই। আজকাল সকলেই চক্ষুষ্মান—সকলেই প্রত্যেক জিনিসটার লাভ-ক্ষতি খতাইয়া দেখিতে জানে, প্রাচীন ধাপ্পায় আজকাল আর কেহ ভোলে না! বিবাহ আজকাল অবশ্যকরণীয় সামাজিক কর্তব্য নহে, বিবাহ আজকাল ইচ্ছাধীন ব্যাপার। নানা দিক দিয়া অঙ্ক কষিয়া যদি সুবিধাজনক মনে হয় তবেই লোক বিবাহ করে, সাধ করিয়া এত বড় দায়িত্ব কে লইতে যাইবে, কেহই লইতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে হয়ত বাড়তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলাও কাটিয়া ফেলিয়া মানুষ নিজেকে আরও হাল্‌কা করিয়া ফেলিবে, দেহরক্ষার জন্য এখন যতটা খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন ততটা হইবে না। সব জিনিসই লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে ওজন করাই বৈজ্ঞানিক রেওয়াজ। ঘরে ঘরে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার অনিবার্য ফলও ফলিতেছে। নারীরা জননী বলিয়াই তাহাদের শাস্তি বেশী। আমরা জননীর হইয়া কবিতা লিখি, উচ্ছ্বসিত হই, কিন্তু জননীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাই না, বরং মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দিই। ব্যভিচারি পুরুষ দরিদ্র হইলে তাহার নিন্দা করি, হয়ত শাস্তিও দিই, কিন্তু ধনী হইলে চুপ করিয়া থাকি এবং প্রয়োজন হইলে পূজাও করি। অর্থাৎ আজকাল সমাজে টাকাই ভগবান, কুবেরেরই জয়-জয়কার! বিমল ভাবিতে লাগিল সে নিজেই বা কি করিতেছে! সে-ও কি কুবেরেরই উপাসনা করিতেছে না? কই আজকাল তো সে আর আগেকার মত ঠিক সময়ে হাসপাতালে যায় না। এ-পারের 'কল'গুলা সারিয়া হাসপাতালে পৌঁছিতে প্রায়ই তাহার ন-টা সাড়ে ন-টা বাজিয়া যায়। গুপিবাবুকে সে বলিয়া দিয়াছে যে, পুরাতন রুগীগুলার ঔষধ যেন তিনি 'রিপিট' করিয়া দেন অর্থাৎ পুরাতন ঔষধই যেন আবার দিয়া দেন। প্রথম যেদিন সে গুপিবাবুকে এ-কথা বলিয়াছিল এবং এ-কথা শুনিয়া গুপিবাবু তাঁহার চশমার কাচের উপর দিয়া যে-ভাবে বিমলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া ছিলেন, তাহা বিমলকে লজ্জিত করিয়াছিল। গুপিবাবুর সে নীরব দৃষ্টি যেন ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিতেছে—এই যে এইবার মুখোসটা খুলিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি! প্রথম-প্রথম সকলেই অমন ভালগিরি ফলায়, বাহাদুরিটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু টিকে না। এই বয়সে অনেক দেখিলাম। মুখে কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন—যে আজ্ঞে, তাই করব। সেদিন ওপারে একটা 'কল' ছিল, অনেকগুলো কালাজ্বর রুগীর ইন্‌জেকশনও বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে দিতে গিয়া দুইজন রুগীর শিরার বাহিরে পড়িয়া গেল। ভীষণ যন্ত্রণা। গুপিবাবু এবং জানকীর ধমকের চোটে বেচারারা স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেও পারিল না। সেদিন একটা টিউমার কাটিয়াছে, সেপ্‌টিক হইবার কথা নয় কিন্তু সেটা সেপ্‌টিক হইয়া গিয়াছে, পূঁজ দেখা দিয়াছে, জ্বর হইতেছে। কই, আগে তো এমন সেপটিক হইত না। আগে সে নিজে যত্ন করিয়া ড্রেস করিত, এখন যা করে দুলু। ঐ শুয়ারে চেরা রুগীটার কিন্তু ভাগ্য ভাল, সে ভাল হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য তাহার পেটের মাঝামাঝি একটা হার্ণিয়ার মত হইয়া থাকিবে তা থাকুক, প্রাণে তা বাঁচিয়াছে! ছেলেটির নাম কাঙালী! সে বলিতেছে যে বিমলকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইবে না, বিমলই তাহার জীবন বাঁচাইয়াছে, বিমলের সেবাতেই সে জীবনটা নিয়োজিত

করিবে। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, সচ্ছন্দে থাকিবে। বেতন চাই না, শুধু দুটি খাইতে পাইলেই যথেষ্ট।

—ডাক্তারবাবু!

—কে?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল নন্দী-মহাশয়ের এক জন কর্মচারী।

—কি?

—গুরুঠাকুরের জ্বর হয়েছে কাল থেকে, আপনি একবার চলুন, ভূধরবাবু-জগদীশবাবু বসে আছেন।

—চল।

ভৈরবের স্ত্রীও এক পাশে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কোলে ছোট একটি শিশু। সে বলিল যে ছেলেটির দুইদিন হইতে জ্বর হইয়াছে, সে কম্পাউণ্ডার বাবুর নিকট হইতে অবস্থা বলিয়া দুই দিন ঔষধ লইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবস্থা যেন ক্রমেই খারাপ হইতেছে, ডাক্তারবাবু যদি একটু দয়া করিয়া দেখেন—

নন্দী-মহাশয়ের কর্মচারিটি বলিলেন—এখন ডাক্তারবাবু আমাদের ওখানে যাচ্ছেন, পরে আসিস।

বিমল তাহাকে বলিল—তুমি হাসপাতালে যাও, নন্দী-মশায়ের ওখান থেকে ঘুরে এখুনি যাচ্ছি আমি।

নন্দী-মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া বিমল দেখিল আবহাওয়া বেশ গুরুগম্ভীর। নন্দী-মহাশয়ের গুরুদেব এই প্রথম তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন এবং আসিয়াই জ্বরে পড়িয়া গিয়াছেন। নন্দী-মহাশয়ের মাথায় যেন বজ্রপাত হইয়াছে। বিমল আসিতেই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া পশ্চাতে বীজননিরত ভৃত্য দুইটিকে আরও জোরে বাতাস করিবার ইঙ্গিত করিলেন এবং তাহার পর ডাক্তার তিন জনের দিকে বাষ্পাকুল নয়নে চাহিয়া বলিলেন—এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন আপনারা।

—গুরুদেব এ কি পরীক্ষায় ফেললেন আমাকে!

জগদীশবাবু বলিলেন—কাতর হয়ে লাভ নেই, ব্যায়রাম তার নিজের রাস্তায় ঠিক যতক্ষণ চলবার তা চলবে।

বিমল বলিল—ক-দিনের জ্বর?

নন্দী-মশায় বলিলেন—প্রকাশ পেয়েছে কাল থেকে, উনি তো সহজে কিছু বলেন না, আমার বিশ্বাস কয়েক দিন আগে থেকেই হয়েছে।

ভূধরবাবু বলিলেন—ইনফ্লুয়েঞ্জা-গোছের মনে হচ্ছে।

জগদীশবাবু ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া কপালের চামড়া কুঁচকাইয়া ছাতের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা হাসিয়া বলিলেন—তা কি বলা যায় চট করে!

কথাটা বলিলেন ভূধরবাবুকে, কিন্তু চাহিলেন বিমলের দিকে। বিমল দেখিল তাঁহার ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবের ডগাটি সন্তর্পণে উঁকি মারিতেছে। অদ্ভুত তাঁহার এই জিবটি!

ভূধরবাবু বিমলকে বলিল—যান আপনি দেখে আসুন, তারপর সবাই মিলে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে।

মূল্যবান পালঙ্কে মহার্ঘ শয্যায় শায়িত এই বলিষ্ঠ বিপুলকায় ব্যক্তিটিকে খুব পীড়িত বলিয়া তো বিমলের বোধ হইল না। জ্বর হইয়াছে বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। বিমলকে দেখিয়া গুরুঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও সশব্দে বার-দুই হাঁচিয়া বিমলের দিকে আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন—আপনিও কি ডাক্তার নাকি?

নন্দী-মহাশয়ের প্রৌঢ়া পত্নী শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন, মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া ছিল, তিনি ফিসফিস করিয়া বিমলের পরিচয় দিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন—ও, আসুন, বসুন। এই তো দু-জন দেখে গেলেন। রাখাল বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেখছি।

প্রথামত বিমল গুরুঠাকুরের বুক পিঠ পেট জিব চোখ সবই দেখিল, বিশেষ কিছুই পাইল না। তাহারও ধারণা হইল ইনফ্লুয়েঞ্জাই হইয়াছে। তাহার দেখা হইয়া গেলে গুরুঠাকুর সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন—কি রকম দেখলেন খাঁচাখানা?

—ভালই।

—আদা দিয়ে এক কাপ চা খেতে পারি?

—বেশ তো খান না।

নীচে যাইতেই ভূধরবাবু বলিলেন—কি রকম, ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়?

—তাই তো মনে হচ্ছে, তবে—

বিমল কথাটাকে ইচ্ছা করিয়াই সম্পূর্ণ করিল না। জগদীশবাবু বলিলেন—পিঠের নীচের দিকটায় দেখেছেন ডান দিকে। খুব ফাইন ক্রিপিটিশনের মত রয়েছে—

বিমল শুনিতে পায় নাই তবু বলিল—হ্যাঁ তা তো আছে। তা থাকা আর অসম্ভব কি, ইনফ্লুয়েঞ্জাল নিমোনিয়া হতে পারে, তা যদি হয় বড় সঙীন ব্যাপার!

—নয় কি?

জগদীশবাবু হাসিয়া ভূধরবাবুর দিকে চাহিলেন।

নন্দী-মহাশয় বলিলেন—দেখুন, ওসব ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই আমি। উনি আমার গুরুদেব, ওঁর চিকিৎসা-বিষয়ে আমি কোন প্রকার খেদ রাখতে চাই না, দরকার মনে করেন কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান আপনারা। ওপারের মথুরবাবুর ভায়রাভাই দুর্লভবাবুও এঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। একবার সেই দুর্লভবাবুর বাড়িতে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, তিনি একটা ডাক্তার ডাকেন নি। নিজে বই দেখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছিলেন! নারায়ণের কৃপায় বাড়াবাড়ি কিছু হল না তাই, যদি হত কি করতিস তুই? দুঃখ রাখবার জীবনে জায়গা পেতিস?

জগদীশবাবু অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিয়া বলিলেন—দেখুন নন্দী-মশায়, কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে অল্পই আছে। ভাল জিনিস পৃথিবীতে বেশী থাকে না, থাকতে নেই।

পুলকিত নন্দী-মহাশয় লাল গামছাটি দিয়া বগলের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—অত প্রশংসার যোগ্য অবশ্য আমি নই, আমার গুরুদেবটি ভাল হলে বাঁচি আমি। আপনারা সকলে সুচিকিৎসকও বটেন, সুহৃদও বটেন, আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম, যা ভাল মনে করেন করুন। টাকা খরচ করতে আমি পিছপাও হব না, এইটুকু জানিয়ে দিয়েই আমি খালাস।

জগদীশবাবু বলিলেন—বেশ একটা দিন যাক। বিমলবাবু রক্তটাও পরীক্ষা করে দেখুন।

ভূধরবাবু বলিলেন—আমি কিন্তু আগে মশাই এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি দিয়ে দেখতে চাই।

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—বেশ তো, দিন এক ফোঁটা, ক্ষতি কি?

নন্দী মহাশয়ের গুরুদেবের ব্যবস্থা করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। বিমল হাসপাতালে ফিরিয়া দেখিল ভৈরবের স্ত্রী তাহার অপেক্ষায় তখনও বসিয়া রহিয়াছে। বিমল ছেলেটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল বেশ জ্বর আছে, কেমন যেন নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও যেন কষ্ট। বিমলের কেমন যেন সন্দেহ হইল, গলাটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। ঠিকই তো, এই যে প্যাচ রহিয়াছে। ডিপথিরিয়া! গুপিবাবু দুই দিন পুরাদমে কুইনাইন মিক্শ্চার দিয়া ছেলেটিকে আরও কাহিল করিয়া ফেলিয়াছেন!

—গুপিবাবু, ডিপথিরিয়া অ্যানটিটক্সিন্ একটা দিন তো।

—গুপিবাবু খানিকক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—ও তো আর নেই, সেবারে চৌধুরী মহাশয়ের নাতির অসুখে সব খরচ হয়ে গেছে।'

বিমল স্তম্ভিত হইয়া গুপিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। বলিল—এখানে দেখুন তো জগদীশবাবুর দোকানে—

জানকী বিমলের চিঠি লইয়া ছুটিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পাওয়া গেল না এখানে।

অর্থাৎ শিশুটি মরিবে!

ধনী চৌধুরী-মহাশয়কে খুশি করিবার জন্য বিমল হাসপাতালের এমন একটা মূল্যবান ঔষধ স্বচ্ছন্দে দান করিয়াছে এবং প্র্যাকটিসের তাড়ায় পুনরায় আনাইয়া রাখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

বিমল তখনই ঔষধের জন্য কলিকাতায় একটা টেলিগ্রাম করিল বটে, কিন্তু ইহাও মনে মনে বুঝিল যে ঔষধ আসিবার পূর্বেই শিশুটি মরিয়া যাইবে।

গরীবদের জন্যই হাসপাতাল, কিন্তু গরীবদের সেখানে স্থান কোথায়? হাসপাতালের ভাল ভাল ঔষধ ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট রুগীদের জন্য খরচ হয় এবং তাহাদের অধিকাংশই ধনী। গরীবরা সেখানে দুই বেলা ভিড় করে এবং কাঙালী বিদায় করার মত তাহাদের রোজ বিদায় করিয়া দেওয়া হয়, আর কিছু হয় না!

বিমলের কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল।

ভৈরবের স্ত্রী করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—ডাক্তারবাবু, ছেলে কি বাঁচবে না?

—শক্ত অসুখ করেছে, এখানে তো ওষুধ পাওয়া গেল না, তার করে দিচ্ছি যদি কলকাতা থেকে এসে পড়ে তবে দিয়ে দেব।

ভৈরবের স্ত্রীর সমস্ত অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। তাহার ছেলের ঔষধের জন্য ডাক্তারবাবু নিজের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় তার করিতেছেন! মানুষ না দেবতা!

বিমল হাসপাতালে একা চুপচাপ বসিয়া ছিল।

সেই টিউমার-কেসটা জ্বরের ঘোরে ছটফট করিতেছে, খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। রীতিমত সেপ্টিক হইয়া গিয়াছে। বিমল ধীরে ধীরে তাহার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—বড় কষ্ট, বড় শীত।

—এখুনি কম হয়ে যাবে, জানকী আর একটা কম্বল আন তো—

জানকী আর একটা কম্বল আনিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিমল চুপ করিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সে চাবিটা লইয়া ঔষধের আলমারিটা খুলিয়া ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বাহির করিল। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গ্লাসে ঢালিয়া নির্জলাই সেটুকু পান করিয়া ফেলিল। আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই তাহাকে ব্র্যাণ্ডি খাইতে হইতেছে। হাসপাতালের বোতলটা তো ফুরাইয়া আসিল। আর এক বোতল আনাইয়া রাখিতে হইবে।

গঙ্গার ধারে গিয়া বিমল বসিয়াছিল। নিজের স্বরূপ দেখিতে পাইয়া আজ হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভৈরবের ছেলের মুখটা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া অসহায় পশুর মত মারা যাইবে! বিমল বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল, আর একবার দেখিয়া আসা যাক। যদি দরকার হয় সে শ্বাসনালীতে ফুটা করিয়া তাহাকে আজ রাতটা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, কাল সকালে 'সিরাম' নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িবে। গিয়া দেখিল অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপই হইয়া আসিতেছে, শ্বাসনলীতে ফুটা করিবার আপাতত কোন প্রয়োজন নাই, নলী ঠিক আছে। তবু সে ভৈরবের স্ত্রীকে বলিয়া আসিল যে রাত্রে যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়ে তাহাকে যেন খবর দেওযা হয়। অন্ধকারে একা একা এক গলির ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কানে গেল—আমাদের বিমল ডাক্তার ভৈরবের ছেলেকে নিয়ে তাহলে একেবারে হামলে পড়েছে বল! হরেন বোসের কণ্ঠস্বর। গুপিবাবুর কণ্ঠস্বরও শোনা গেল।

—হ্যাঁ, আজ নিজের পয়সা খরচ করে কলকাতায় তার করলেন।

—ভাল, ভাল, মাগির কপাল ভাল!

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন—অমন জুতোমোজা-পরা শিক্ষিতা বউ ঘরে থাকতে এত নীচু নজর কেন ভদ্দরলোকের? আমাদের দারোগাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা।

ইহার উত্তরে গুপিবাবু কি বলেন তাহা আর শুনিবার ধৈর্য বিমলের রহিল না। সে বারান্দায় উঠিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িল।

—গুপিবাবু, গুপিবাবু আছেন এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ত্রস্ত গুপিবাবু বাহির হইয়া আসিল।

—আপনি তিন ডোজ্ স্টিমুল্যাণ্ট মিকশ্চাব নিয়ে ভৈরবের বাড়ি যান, এক ঘণ্টা অন্তর তার ছেলেটাকে দেবেন, পাল্স্ রেসপিরেশন প্রতি ঘণ্টায় গুণে আমাকে খবর দেবেন।

গুপিবাবু নীরবে বিমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হরেন বোস বলিলেন—এটা ডাক্তারবাবু আপনার জুলুম করা হচ্ছে গুপিবাবুর উপর। উনি হাসপাতালের চাকর, আপনার তো চাকর নন।

—আপনি চুপ করে থাকুন।

তাহার পর গুপিবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—আপনি যদি না যান, আপনাকে সাস্পেণ্ড

করব আমি, আপনি সেদিন আমার প্রেসকৃপশনে কুইনিন দেন নি, সে শিশিটা আমার কাছে আছে এখনও, সেটা নিয়ে যদি রিপোর্ট করি চাকরি থাকবে না আপনার।

গুপিবাবু বলিলেন—আজ্ঞে আমি যাচ্ছি এখুনি।

হরেনবাবুর দিকে একবার তাকাইয়া গুপিবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

গুপিবাবু চলিয়া গেলে বিমল হরেনবাবুকে বলিল—দেখুন আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সম্বন্ধে এ রকম আলোচনা যদি ভবিষ্যতে আপনি করেন, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আপনার।

হরেন বোস প্রস্তমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিমল চলিয়া গেল।

রাত্রে বিমল নিজের বাসার বাহিরের ঘরটায় বসিয়া নন্দীমহাশয়ের গুরুঠাকুরের রক্তটা পরীক্ষা করিতেছিল। অনেক খুঁজিয়াও ম্যালেরিয়া পাওয়া যাইতেছিল না, তবু সে খুঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার কানে গেল, দরাজ গলায় কে যেন বলিতেছে একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি, চৌষট্টি। মিহি গলায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল—ও কি, অতটা সরিয়ে মাপলে চলবে কেন?

বিমল বাহির হইয়া দেখিল প্রতাপবাবু ও রমেশবাবু।

প্রতাপবাবু একটি কাঠি দিয়া জমি মাপিতেছেন এবং রমেশবাবু লণ্ঠন ধরিয়া আছেন। প্রতাপবাবুর বাড়ি হইতে গঙ্গার ঘাট কত দূর ইহাই তর্কের বিষয় এবং হাতে কলমে তাহা তাঁহারা নির্ধারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বিমলের এই বৃদ্ধ দুইটির প্রতি সহসা কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা হইল। কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না, নিজেদের লইয়া মশগুল আছেন।

একটু পরে আসিয়া গুপিবাবু খবর দিলেন ভৈরবের ছেলেটি মারা গিয়াছে।

[নয়]

সেদিন একটি চিঠি পাইয়া বিমলের ভারি ভাল লাগিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমির মধ্যে এই ছোটখাট ঘটনাগুলি ভারি একটা মাধুর্য সঞ্চার করে। চিঠিখানি লিখিয়াছেন শম্ভুকাকা! বিমলের রক্তসম্পর্কের খুল্লতাত নয়, সম্পর্কটা স্নেহের। শম্ভুকাকা জাতিতে গন্ধবণিক। এই শম্ভুকাকাই বিমলের প্রথম শিক্ষক, ইঁহারই নিকট বিমল বর্ণপরিচয় আরম্ভ করে। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস, শম্ভুকাকা অর্থাভাব-প্রযুক্ত আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি উদ্যমশীল লোক, গ্রামের কয়েকটি ছেলে পড়াইয়া ছোটখাট একটি দোকান করিয়া, সুদে টাকা খাটাইয়া কিছু অর্থ তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারই জোরে, নিজের অধ্যবসায়ের গুণে এবং বিমলের পিতার সাহায্যে তিনি জোগাড়যন্ত্র করিয়া কম্পাউণ্ডারিটা পাস করিয়া ফেলেন। কিছুদিন চাকরি করিয়াছিলেন, এখন চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বিমলদেরই গ্রামে প্র্যাকটিস করিতেছেন। বিমলের বাল্যকালে তিনি শম্ভুমাস্টার নামে পরিচিত ছিলেন, এখন সকলে তাঁহাকে শম্ভু ডাক্তার বলিয়াই জানে। বিমল বাল্যকালে তাঁহাকে শম্ভুকাকা বলিয়া ডাকিত। শম্ভুকাকার সহিত বহুকাল দেখা নাই, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বোধ হয় একবারও শম্ভুকাকার কথা তাহার মনে পড়ে নাই। সেই শম্ভুকাকাই এত দিন পরে সহসা চিঠি লিখিয়াছেন।

প্রিয় বিমল,

অনেক দিন তোমার কুশল-সংবাদাদি পাই নাই। আশা করি সপরিবারে ভাল আছ। তুমি স্বর্গীয় সুরেনদাদার একমাত্র বংশধর, কৃতবিদ্য হইয়াছ এবং বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছ, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি দিন দিন তোমার শ্রীবৃদ্ধি হউক। তুমি অনেক দিন গ্রামে আস নাই, তোমার পৈত্রিক বাড়িটি মেরামতের অভাবে প্রায় পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে। নিবারণদার মুখে শুনিলাম তুমি জমির বাকী খাজনা এবং সুরেনদার ঋণগুলি শোধ করিয়াছ। শুনিয়া যে কি পর্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তোমার পৈত্রিক বাড়িটি নিজব্যয়ে সারাইয়া তাহাতে আমি আমার ডিস্‌পেনসারি করি। বাড়িটা গ্রামের মধ্যস্থলে, আমার সুবিধা হইবে। তুমি যে কখনো আসিয়া উহা সারাইয়া বসবাস করিবে তাহার আশা দেখি না। যদি অবশ্য কখনও তুমি আইস, আমি তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিব, একথা বলাই বাহুল্য। আমার হাতে একটি পুরাতন হাঁপানি রুগী আছে, কিছুতেই সারিতেছে না। তুমি যদি একবার এ অঞ্চলে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করিয়া দাও, বড়ই ভাল হয়। লোকটির অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়, কিছু কৃপণও বটে, পঞ্চাশ টাকার বেশী দিতে পারিবে না। তাহাকে তোমার কথা বলিয়াছি, রাজি হইয়াছে। যদি আসিতে চাও, কবে আসিবে জানাইবে। আমি স্টেশনে হাজির থাকিব। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। গ্রামের অনেকেই তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক। যদি একবার এক দিনের জন্য আসিতে পার বড়ই আনন্দিত হই। আসিলে সাক্ষাতে সমস্ত কথাবার্তা হইবে। নিতান্তই যদি না আসিতে পার ঐ বাড়িটি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি তাহা পত্রযোগে জানাইবে। ভগবানের চরণে সততই তোমার কুশল কামনা করি। ইতি— তোমার শম্ভুকাকা।

বহুকাল পূর্বে দেখা শম্ভুকাকার মুখখানি বিমলের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। এখনও কি তাঁহার তেমনি গোঁফদাড়ি আছে? মনে পড়িল বাল্যকালে ঐ গোঁফদাড়িসমন্বিত ব্যক্তিটি মনে বড়ই ত্রাশ সঞ্চার করিত। বিমল তখনই শম্ভুকাকার পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। লিখিয়া দিল যে তিনি স্বচ্ছন্দে বাড়িটি সারাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। তাহার এখন যাইবার সুবিধা নাই। সুবিধা পাইলেই সে গিয়া হাঁপানি রুগীটিকে দেখিয়া আসিবে। যাইবার পূর্বে জানাইবে।

—কাকে চিঠি লিখছ? পিছনে মণিমালা আসিয়া দাঁড়াইল।

—শম্ভুকাকাকে।

—কে তিনি?

—তুমি চেন না, আমাদের গ্রামের লোক। আমাদের বাড়িটাকে নিজের খরচে সারিয়ে ডিসপেন্‌সারি করতে চান। লিখে দিলাম তাই করতে, কি বল?

—যা তোমার ইচ্ছে, আমি আর কি বলব?

—বাঃ তুমি হলে সহধর্মিণী, তুমি বলবে না তো কে বলবে?

—আহা!

বিমল চিঠির ঠিকানাটা লিখিয়া উঠিয়া পড়িল।

—এই তো এলে, আবার যাচ্ছ কোথায়?

—নন্দী-মশায়ের ওখানে যেতে হবে, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আসছে, হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার।

—তুমি তাহলে একটু খেয়ে যাও।

—কি?

চোখমুখ রহস্যময় করিয়া ভুরু নাচাইয়া মণিমালা বলিল—একটা জিনিস করেছি আজ।

—কি?

—পেয়ারার জেলি।

—ফের তুমি উনুন-গোড়ায় গেছ?

—আহা চুপ করে বসে থাকা যায় না কি? আর যা তোমার ঠাকুর!

মণিমালা বাহির হইয়া গেল এবং একটা প্লেটে করিয়া খানিকটা পেয়ারার জেলি আনিয়া বলিল—দেখ কেমন সুন্দর রং হয়েছে।

—চমৎকার হয়েছে, বাঃ খেতেও সুন্দর।

জেলিটুকু খাইতে খাইতে বিমল পুনরায় বলিল—তুমি কিন্তু আর উনুন-গোড়ায় যেও না, ফের কি কাণ্ড করে বসবে!

—ভাল লাগে না চুপ করে বসে বসে।

তাহার পর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—একটা গ্রামোফোন কিনে দাও তাহলে বসে বসে বাজাই।

বিমল হাসিয়া বলিল—পাড়ার লোকে বিরক্ত হবে তাহলে।

মণি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—ভারি বয়ে গেছে।

বিমল আর বেশীক্ষণ বসিল না, নন্দী-মহাশয়ের ওখানে এখনই যাওয়া দরকার। গুরুঠাকুরের জ্বরটা ছাড়ে নাই।

নন্দী-মহাশয় একাই বসিয়া ছিলেন। বিমলকে দেখিয়া বলিলেন—কাল থেকে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছি, ফাঁক আর পাচ্ছি না।

—কি বলুন তো ?

—ঘোষেদের ঐ যে হতভাগী মেয়েটা পুড়ে মোলো তা নিয়ে আবার কিছু গোলমাল হবে না তো মশাই, শুনেছেন তো সব ঘটনা?

—শুনেছি। গোলমাল আর কি হবে, সে তো যা হবার চুকে বুকে গেছে।

—কিছু বলা যায় না তো, শত্রুর তো অভাব নেই!

তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চক্ষু দুইটি পাকাইয়া নন্দী-মহাশয় বলিলেন—একমাত্র পুত্র না হলে গুলি করে মেরে ফেলতাম আমি ওকে। নচ্ছার কুলাঙ্গার কোথাকার!

বিমল বুঝিল রমেনের কথাটা নন্দী-মহাশয়ের কানে গিয়াছে, পুত্রের উপর খুবই চটিয়াছেন তিনি। কিন্তু ক্ষণপরেই বিমলের সে ধারণা অপনোদিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রমেন প্রবেশ করিল এবং নন্দী-মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বাবা রমেন, গুরুদেবের জন্যে কলকাতা থেকে ফলটা এল কি না ইষ্টিশানে একবার খোঁজ কর তো বাবা! গাড়িটা নিয়েই না হয় যাও।

অতি মোলায়েম কণ্ঠস্বর, কিছুমাত্র উত্তাপ নাই।

রমেন চলিয়া গেলে নন্দী-মহাশয় বলিলেন—আমাদের ঘোষালবাবু খাসা লোক ছিলেন, জিনিসপত্র এলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। এ লোকটা জুটেছে ব্যাদড়া! ঘোষালবাবু সম্প্রতি বদলি হয়ে গেছেন।

ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, নন্দী-মহাশয় আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া বলিলেন—ওরে হাওয়া কর।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল—গুরুদেব কেমন আছেন?

—এ বেলা জ্বরটা যেন কিছু কম। তবে শ্লেষ্মা এখনও বেশ রয়েছে। কলকাতা থেকে তো উনি আসছেনই আজ রাত্রে, তার কি সব ব্যবস্থা করতে হবে আপনারা তিন জনে বসে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলুন। কেসের হিস্ট্রিটা ভূধরবাবু টাইপ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ভূধরবাবু ইদিকে বেশ ইয়ে আছেন। ডাকতে পাঠিয়েছি, সব এলেন বলে।

ভূধরবাবু ও জগদীশবাবুর প্রত্যাশায় বিমল বসিয়া রহিল।

[দশ]

চালতাপুর নামক একটি দূর গ্রামে বিমল রুগী দেখিতে গিয়াছিল। গ্রামটি বেশ দূর আছে। নদী পার হইয়া কিছু দূর মোটরে গিয়া তাহার পর হস্তিপৃষ্ঠে যাইতে হইয়াছিল। গ্রামটি নিতান্ত ছোট নয়। দুই তিন জন পাস-করা ডাক্তারই আছেন। রুগীর টাইফয়েড হইয়াছে, বিশেষ কিছু করিবার নাই, যাহা কর্তব্য ওখানকার ডাক্তারই করিতেছিলেন। কিছু করিবার থাকিলেও এত দূর হইতে গিয়া আধ ঘণ্টা বড়জোর ঘণ্টাখানেক রুগীর নিকট বসিয়া তাহা করা যায় না। কিন্তু যেহেতু শ্রীমান দুলুর উক্ত গ্রামে মামার বাড়ি এবং যেহেতু উক্ত রুগীর বাড়ির কর্তৃপক্ষ দুলুর মামাদের বাধ্য সেই হেতু বিমলকে যাইতে হইয়াছিল। বেশ মোটা টাকাই পাওয়া গিয়াছে। বিমল চালতাপুর হইতে মোটরযোগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিতেছিল, মথুরবাবুর বাড়িতে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছিতে হইবে। কলিকাতা হইতে আগত বিখ্যাত চিকিৎসকটি আসিবার ঘণ্টা দুই পরেই নন্দী-মহাশয়ের গুরুঠাকুরের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার ডাক্তারের একদাগ মাত্র ঔষধ পেটে পড়িয়াছিল। রুগী সারাইতে হইলে ভাগ্য থাকা চাই। মথুরবাবুও কলিকাতার ডাক্তারবাবুকে আজ বৈকালে 'কল' দিয়াছেন, তাঁহার কন্যা শেফালির মাঝে মাঝে হাঁপানির মত হইতেছে, তাহাকে দেখাইবেন। পাঁচটার সময় তাঁহার আসিবার কথা, বিমলকে তাহার মধ্যে পৌঁছিতে হইবে। বিমল হাত-ঘড়িটা একবার দেখিল, পৌনে চারটে। পাঁচটার মধ্যে ঠিক পৌঁছিতে পারিবে, দশ মাইল যাইতে আর কতক্ষণ লাগিবে।

মোটরে বসিয়া বিমল চালতাপুরের ডাক্তার গাঙ্গুলী-মহাশয়ের কথা ভাবিতে লাগিল। গাঙ্গুলী-মহাশয়ের কায়দাকরণ একেবারে অন্য প্রকার। অন্য ডাক্তার রুগী আসিলে খুশি হয়, গাঙ্গুলী-মহাশয় চটিয়া যান। সহজে দেখাই করিতে চান না, বেশী পীড়া-পীড়ি করিলে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া যান। দেখিতেও প্রিয়দর্শন নহেন, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, রোগা চেহারা।

কেহ অসুখের কথা বলিলে বলেন—তোমার অসুখ হয়েছে তাতে আমার কি?

—একটু ওষুধ।

—ওষুধ-ফসুদ আমার কাছে নেই, বিরক্ত করো না।

লোকে তবু ছাড়ে না, ঐ কটুভাষ কুদর্শন লোকটির দ্বারে ধরণা দেয়। কাতারে কাতারে রুগী বসিয়া আছে, বিমল স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাই বলিয়া গাঙ্গুলী-মহাশয় যে একেবারেই চিকিৎসা করেন না তাহা নয়। অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে অনেক পীড়াপীড়ির ফলে কটুকাটব্য করিতে করিতে দুই-চারিটি রুগী তিনি বেশ মোটা দক্ষিণা লইয়া তবে চিকিৎসা করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি স্পর্শই করেন না। লোকের তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস, বাড়ির সামনে সবর্দা ভিড়।

মথুরবাবুর বাড়ি পৌঁছিয়া বিমল দেখিল কেহ তখনও আসে নাই। মথুরবাবু একা বাহিরে বসিয়া রহিয়াছেন। বিমল জিজ্ঞাসা করিল—অমর কই?

—দুর্ভিক্ষ সমস্যা সমাধান করে তিনি কলকাতা গেছেন। এবার কোন খেলোয়াড়ের ফর্ম কি রকম, রেফারি চরিত্রবান লোক কি না, যে দল জিতবে তার জেতবার ন্যায্য দাবি আছে কি না—এই সব নানা মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতে সময় লাগবে তো কিছু দিন! ফিরতে দেরি আছে।

বিমল হাসিয়া একটি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে বিমলের দিকে চাহিয়া মথুরবাবু বলিলেন—বড়লোকের ছেলে, করবেনই না বা কেন? এদেশে বড়লোকের ছেলেরা আগে বেরালের বিয়ে, বুলবুলির লড়াই, এই জিনিস্ নিয়ে থাকত, ওই সবেই হাজার হাজার টাকা খরচ করত। আজকাল রুচিটা বদলেছে।

বিমল বলিল—শেফালির হাঁপানিটা কি বেড়েছে নাকি আজকাল?

—বাড়া-কমা তো কিছু বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে যখন হয় খুবই কষ্ট পায়। দেখি তোমাদের বড় ডাক্তার কি বলেন।

বিমল একটু হাসিল।

মথুরবাবু বলিলেন—হ্যাঁ আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তোমার নামে দরখাস্ত গেছে কাল সিভিল-সার্জনের কাছে; আমিও তাতে সই করেছি। হরেন বোস এনেছিল দরখাস্তটা।

—কি লেখা ছিল তাতে?

—সত্যি কথাই লেখা ছিল। লেখা ছিল যে তুমি আজকাল ক্রমাগত প্র্যাকটিস করে বেড়াচ্ছ, হাসপাতাল মোটেই দেখছো না। গুপিই এখন হাসপাতালের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুপি হাসপাতালে বসেই রীতিমত পয়সা নিতে আরম্ভ করেছে। সেদিন এপারেই একটি গরীব লোক বলছিল যে পয়সা না দিলে ঘায়ে খোঁচা লাগিয়ে দেয়। তুমি তো অপারেশন করে খালাস, ড্রেস করে তো ওই!

—দু-জনে মিলে করে, গুপিবাবু আর দুলু।

—গুপিবাবুকে পয়সা না দিলে গুপিবাবু ঘায়ে খোঁচা দিয়ে ঘা আরও বাড়িয়ে দেয় শুনেছি।

বিমল বলিল—বাজে কথা।

—না, না, একটুও বাজে কথা নয়। জগদীশবাবু নিজে আমাকে একথা বলেছেন। মোট কথা, আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে কি না! পঁচাত্তর টাকাতে একটা ভাল লোক থাকবে কি করে? এই যে আমরা আমাদের আমলাদের কারো মাইনে পাঁচ টাকা, কারো দশ

টাকা করে দিই, তার মানে আমরা তাদের চুরি করতে বলি। আমি এবার আমলাদের মাইনে সব বাড়িয়ে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু সকলের তাতে আপত্তি, এমন কি তোমার বন্ধু অমরের পর্যন্ত। বলে, যা চলেচে চলুক! বেশ চলুক, আমি আর ক'দিন আছি। দিন-পনর পরেই সরে পড়ছি এ-দেশ থেকে।

—কোথায় যাবেন?

—মথুরা।

—মথুরা! হঠাৎ মথুরা কেন?

—আর এ-দেশ ভাল লাগে না। কাঁহাতক সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে 'বাথরুমে' বসে থাকি, বল? কারো সঙ্গে মতে মেলে না। এ-দেশে চিন্তায় আর কার্যে এত আকাশ-পাতাল তফাৎ যে কোন কিছুই হবার উপায় নেই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব সমান। বরং শিক্ষিতগুলো বেশী পাজি। সবাই জানে পণপ্রথা খারাপ তবু সবাই দিচ্ছে নিচ্ছে, জানে ঘুষ দেওয়া খারাপ, সবাই ঘুষ দিচ্ছে নিচ্ছে! কোন্ উচিত কার্যটা আমরা করি? একটাও না! এই যে তুমি একটা শিক্ষিত ডাক্তার পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে জুটে গেলে, তুমি কি জানতে না যে পঁচাত্তর টাকায় তোমার চলা অসম্ভব, তোমাকে প্রাইভেটে প্র্যাকটিস্ করতেই হবে এবং তা করলেই হাসপাতালের ক্ষতি হবে?

—কি করি বলুন, কিছু তো একটা করতে হবে?

—আরে এ-কথা তো একটা অশিক্ষিত কুলিও বলে। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, বড় আদর্শের জন্যে তোমরাই তো লড়বে, তোমরা যদি 'কিছু তো একটা করতে হবে' বলে অন্ত্যজের দলে ভিড়ে যাও তাহলে চলে কি করে?

বিমল বলিল—কটা লোক বড় আদর্শ অনুসারে চলতে পারে বলুন?

মথুরবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—বড় আদর্শের কথা ছেড়ে দাও, কোন আদর্শটা মানি আমরা? জানালা খুলে শোওয়া খুব একটা বড় আদর্শ? যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা খুব একটা বড় আদর্শ? আসল কথা কি জান, আমাদের আদর্শ-ফাদর্শের বালাই নেই, আদর্শ সুবিধাবাদী, যখন যা সুবিধা তাই করি। ছেলেরা লেখাপড়া শেখে মানে কতকগুলো বই মুখস্থ করে পরীক্ষার সময় সেগুলো উগ্‌রে দিয়ে আসে একটি ডিগ্রীর লোভে। চাকরি যদি পায় ভালই, যদি না পায় রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়! শিক্ষিত হলে এ দুর্দশা হত না।

বিমল বলিল—তাহলে এদেশে উপায় কি?

—উপায় বাথরুমে লুকিয়ে বসে থাকা, আর তা অসহ্য হয়ে উঠলে মথুরায় পালান।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

মথুরবাবু বলিলেন—মথুরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, মথুরাতেই দেহত্যাগ করব। আর ফিরছি না এ-দেশে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মথুরবাবু আবার বলিলেন— তোমার নামে কিন্তু খুব সঙীন দরখাস্ত গেছে কাল! তোমার সে পেটোয়া সিভিল সার্জনও বদলি হয়ে গেছে, এসেছে সায়েব, সুতরাং সাবধান!

বিমল হাসিয়া বলিল—যা হবার হবে, আমারও আর ভাল লাগছে না চাকরি।

মথুরবাবু হাসিয়া বলিলেন—চাকরি ছাড়া বড় সোজা কথা নয়। একবার যে ও-স্বাদ পেয়েছে

তার পক্ষে ছাড়া কঠিন, অনেকটা আপিঙের নেশার মত। চাকরিতে অনেক কষ্ট, কিন্তু মাসের শেষে মাইনের করকরে টাকাগুলো হাতে এলে সব কষ্টের অবসান হয়ে যায়। জননীর সন্তান-দর্শনের মত; ছেলের মুখটি দেখলেই দশ মাসের এত দুঃখকষ্ট আর কিছু মনে থাকে না।

মথুরবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। মথুরবাবু বলিলেন—ঐ বোধ হয় কলকাতার ডাক্তারবাবুকে নিয়ে জগদীশবাবু এলেন। চল, অভ্যর্থনা করা যাক।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কলিকাতার ডাক্তারবাবু বলিলেন—আমি একটা ইনজেকশন লিখে দিচ্ছি, ওটা আনিয়ে ওকে অন্তত দুটো কোর্স দেবেন, অর্থাৎ সবশুদ্ধ চব্বিশটা।

একটা কাগজে তিনি ইন্‌জেকশনের নামটা লিখিয়া মথুরবাবুর হাতে দিলেন।

মথুরবাবু জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওটা আর আমি নিয়ে কি করব, আপনি ওষুধটা পাঠিয়ে দেবেন, কিংবা আপনি একেবারে এনে ইন্‌জেকশন শুরুই করে দিন কাল থেকে।

—কাল তো আমার অবসর নেই বোধ হয়, বিমলবাবুই না হয় এসে দিয়ে যাবেন।

—না, বিমলকে আমি ডাকি না, কারণ ও ফি নিতে চায় না। বেশ আপনি ইন্‌জেকশনটা পাঠিয়ে দিন, আমি না হয় ভূধরকে ডাকতে পাঠাব।

জগদীশবাবু এতক্ষণ ইন্‌জেকশনটা কি তাহা পড়িয়া দেখেন নাই। পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পড়িয়া বলিলেন—এই ইন্‌জেকশন তো আমার কাছে নেই।

কলিকাতার ডাক্তারবাবু তখন বলিলেন—এ কলকাতায় হয়ত পেতে পারেন, হয়ত বলছি এই জন্যে যে সেদিন এক জন পায় নি। বম্বেতে অবশ্য পাবেন ঠিক।

মথুরবাবু বলিলেন—এই ইন্‌জেকশন কি খুব বেশী ব্যবহার করেন নি আপনি? এত দুষ্প্রাপ্য যখন—

এরূপ প্রশ্নের জন্যে ডাক্তারবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—মানে খুব নতুন বেরিয়েছে এটা, জার্মেনীতে অবশ্য অনেক—

মথুরবাবু বলিলেন—আপনি নিজে বেশী ব্যবহার করেন নি?

নিজে অবশ্য বেশী করি নি, তবে জিনিসটা ভাল।

মথুরবাবু জগদীশবাবুর হাত হইতে প্রেসকৃপশনখানি লইয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁহার প্রাপ্য দক্ষিণা দিয়া দিলেন। এক-আধ টাকা নয়, অনেকগুলি টাকা।

ডাক্তারবাবু তাঁহার ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন—ছ'টা বাহান্নতে ট্রেন বললেন বুঝি নন্দীমশায়?

—হ্যাঁ।

—তা হলে তো এবার উঠতে হয়। আচ্ছা চলি তবে, নমস্কার, অনেক ধন্যবাদ। আপনার মেয়ে কেমন থাকেন জানাবেন আমাকে।

মথুরবাবু ডাক্তারবাবুকে গাড়িতে চড়াইয়া প্রায় তাঁহার সামনেই একটু ঘুরিয়া প্রেসকৃপশনখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ডাক্তারবাবু দেখিতে পাইলেন কি না ভগবান জানেন। তিনি আবার গলা বাড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা নমস্কার!

মথুরবাবু স্মিতমুখে হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

বিমল বলিল—এ কি করিলেন?

মথুরবাবু বলিলেন—আমার মেয়ের শরীর এক্সপেরিমেণ্ট করবার জায়গা নয়।

জগদীশবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। ফোকলা দাঁতের ফাঁকে তাহার জিহ্বা সকৌতুকে উঁকি দিতে লাগিল।

[এগারো]

সুব্রতবাবুর অনুরোধ এড়ানো গেল না। ছুটি লইয়া কলিকাতা যাইতে হইল। সুপ্রিয়া সঙ্গে গেলেন, মণিমালাও ছাড়িল না। বিমল ব্যবস্থা করিয়াছিল যে দুই দিন সে থাকিবে না পরেশ-দা'র স্ত্রী রাত্রে আসিয়া শুইবেন, বাহিরের ঘরটায় দুলুও আসিয়া শুইবে। এতৎসত্ত্বেও মণি বলিল, সে একা থাকিতে পারিবে না। তা ছাড়া বাবা মাকে সে কত দিন দেখে নাই, মন কেমন করে না বুঝি! এখানে ঘরে একা একা বসিয়া বসিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, বিমল তো সমস্ত দিন মজা করিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় মোটরে, নৌকায়, পাল্‌কিতে, হাতীতে। তাহার যে কি কবিয়া দিন কাটে তাহা সে-ই জানে। এখানকার লাইব্রেবীর সমস্ত বই তাহার পড়া, দুই-চারিখানা অপঠিত ছিল তাহাও সে পড়িয়া শেষ করিয়াছে। এমন হতভাগা লাইব্রেরী যে কিছুতেই নূতন বই আনাইবে না। না, সে কোন কথা শুনিবে না, সে যাইবে! ঠোঁট ফুলাইয়া যখন সে এই কথাগুলি বলিল তখন তাহা অগ্রাহ্য করা বিমলের পক্ষে শক্ত হইল। সুতরাং বাক্স-প্যাঁটরা গুছাইয়া মণিও সঙ্গ লইল। তোরঙ্গ এবং গহনার বাক্স এখানে রাখিয়া যাইবে কাহার ভরসায়! যা চোরের উপদ্রব। তাহার জিনিসপত্র সবই সে সঙ্গে লইল। কলিকাতা পৌঁছিয়া সে মণিকে লইয়া শ্বশুরবাড়িতে গিয়া উঠিল। সুব্রতবাবু এবং সুপ্রিয়া হোটেলে গেলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া মণির বাবা মা খুবই সুখী হইলেন। হঠাৎ আগমনের কারণ শুনিয়া মণির বাবা বলিলেন—বেশ আমি খুব চেষ্টা করব। ভদ্রলোক ফার্স্ট ক্লাস যদি হন, হয়ে যাবে বোধ হয়। তোমাব সঙ্গে তো চেনা আছে আমাদের কমিটির দু-চার জনের। তাঁদেরও গিয়ে ধর। এ-সব ছাড়া আর একটা সুপারিশ যদি জোগাড় করতে পার তা হলে তো নির্ঘাত হয়ে যায়।

তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম করিলেন।

বিমল বলিল—আমার সঙ্গে ঠিক চেনা নেই, তবে ওঁর ছেলের সঙ্গে পড়তাম। আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে—

বিমল চা জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সুব্রতবাবুর কপাল ভাল, বেশী বেগ পাইতে হইল না! সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটিও ভাগ্যক্রমে বাড়িতে ছিলেন এবং তিনি পুত্রের অনুরোধে একটা সুপারিশ-পত্রও দিয়া দিলেন। যোগাযোগ যখন ঘটে তখন এমনই ভাবেই ঘটিয়া যায়। সাধে মানুষ অদৃষ্টে বিশ্বাস করে!

কলিকাতায় গেলে সিনেমা-দেখা একটা অবশ্যকর্তব্য। প্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়ি, আলোয় আলোয় চতুর্দিক যেন দিনের মত হইয়া রহিয়াছে! প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল অপূর্ব শিল্পকলা চিত্রপটে ফুটাইয়া তুলিবেন, তাহার তুলনায় প্রবেশ-মূল্য কিছুই নয়।

এমন একটা প্রাসাদের সুশীতল আবেষ্টনীতে অমন সুন্দর আরাম-দায়ক একখানা আসনে দুই ঘণ্টা নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পাওয়ারই কি মূল্য কম! বিমল, মণিমালা, সুব্রত, সুপ্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক একটু আগে গিয়া উপস্থিত হইল। বসিতে না বসিতে আলো নিবিয়া গেল, সাদা পরদা বিচিত্র হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘর, রুদ্ধশ্বাসে সকলেই দেখিতেছে। একটি আসন খালি নাই, সমস্ত পরিপূর্ণ। সব বয়সের, সব অবস্থারই লোক রহিয়াছে। থাকিবে না কেন, না থাকাটাই অস্বাভাবিক। যাহা স্বপ্ন তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ছায়া-লোকে মূর্ত দেখিতে সকলে চায়। অপূর্ণ সাধ, অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থ কামনার ক্ষোভে ক্ষুব্ধ মন অল্পক্ষণের জন্যও এই মায়ালোকে বসিয়া সেই ছবি দেখে যাহা সে জীবনে পায় নাই, পাইবে না। ছবিতে দেখিয়াও তবু খানিকটা তৃপ্তি আছে। ছবি দেখিয়াই সে খানিকক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে চায়। খানিকক্ষণের জন্য নিজেকে ভুলিয়া থাকাটাই কি কম লাভ? চতুর্দিকের নানা প্রলোভনে সকলেই অহরহ পীড়িত, চেতন ও অবচেতন মনের নানা অসম্ভব তাগিদে সকলেরই অন্তর পরিশ্রান্ত, দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর কদর্যতায় সকলেরই সমস্ত সত্তা যেন কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে বাহিরে শান্তি কোথাও নাই, শান্তির আশা নাই, শান্তি অর্জন করিবার মত মানসিক সম্পদ নাই। দুর্বল, বিলাস-লোলুপ আর্ত নরনারীর দল তাহাদের ব্যর্থ জীবনযাত্রার ক্ষোভ দুঃখ জ্বালা দ্বন্দ্বের উপর খানিকক্ষণের জন্য ঐ সুরঞ্জিত পরদাখানা টাঙাইয়া ধরে, উহারই আড়ালে আত্মগোপন করিয়া খানিকক্ষণের জন্যও নিজেকে ভুলাইয়া রাখে। বিমলের দুখীরামকে মনে পড়িল, সে বেচারা তাড়ি খায়। উদ্দেশ্য একই—আত্মবিস্মৃতি। তাড়ি খাইয়া রাস্তায় গড়াগড়ি দেওয়াটা বর্তমান সভ্য-জগতে অচল, তাই দুখীরাম ঘৃণ্য। সভ্যজগতে সিনেমার এখনও জাত মারা যায় নাই তাই ফরসা-কাপড়-জামা-পরা শিক্ষিত দুখীরামের দল এখানে আসিয়া রোজ ভিড় করে। আর্ট? কয় জন লোক আর্ট বোঝে? রসোত্তীর্ণ ভাল ছবিতে কই এত ভিড় হয় না তো? মদও তো পরিমিত মাত্রায় পান করিলে উপকার হয়। কিন্তু শরীরের উপকারের জন্যই কি দুখীরাম তাড়ি খায়? ও-সব কিছু নয়, আসল কথা নেশা। এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রলোভনময় বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় নেশা না হইলে কাহারও চলে না। মানুষ কোন রকমে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়, না হইলে অন্তরের হাহাকার শুনিতে শুনিতে সে পাগল হইয়া যাইবে। এই অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে যাহারা ঐ সকল ছায়া-ছবির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, তাহারা সকলেই অর্ধ-উন্মাদ, যাহাতে একেবারে উন্মাদ না হইয়া যায় তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বিমলের সহসা সেই ভিখারীটার কথা মনে পড়িল, তাহার মৃত দেহটার ছবি মুহূর্তের জন্য মানসপটে ফুটিয়া উঠিল, রক্তের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! সে কি কখনও সিনেমা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল? ঐ যে মোহিনী নায়িকাটি ক্ষণে ক্ষণে নানা ছুতায় নিজের দেহের মাধুরী অনাবৃত করিতেছে, তাহার খবর পাইবার সুযোগ তাহার হইয়াছিল কি? হয়ত হয় নাই, মফঃস্বলে ভিক্ষা করিয়া এবং রোগে ভুগিয়াই তাহার জীবনটা কাটিয়াছে। কলিকাতা শহরে থাকিলে হয়ত সে সুযোগ পাইলেও পাইতে পারিত। মাত্র কয় গণ্ডা পয়সা তো! হয়ত এই দলের মধ্যে ভিখারীও অনেক আছে – কে জানে!

রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আহার করিবার সময় শাশুড়ীঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া বসিলেন।

একথা-সেকথার পর বলিলেন—আমি মনে করেছি বাবা, মণিকে না হয় রেখেই দিই এ ক-মাস। ছেলে টেলে হলে একেবারে যাবে, কি বল?

বিমল বলিল—তার তো এখন অনেক দেরি।

—ছ-মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এটা প্রথম বার কিনা তাই ভয়, এখানে কলকাতা শহরে সব রকম সুবিধা আছে। তোমাদের মফঃস্বল জায়গা, তুমি হয়ত বাড়িতে থাকবে না—তার চেয়ে ও থাকুক এ ক-মাস!

বিমল কিছু না বলিয়া আহার করিতে লাগিল।

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী পুনরায় বলিলেন—ওর যে পা পুড়ে গেছল সে কথা তো আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাও নি কিছু তোমরা! ভাগ্যিস বেশী কিছু হয় নি। ঠাকুর না হলে কি চলে বাবা, ও কি পারে রাঁধতে, রান্নার জানেই বা কি।

একটা অপ্রিয় কথা বিমলের জিহ্বাগ্রে আসিয়া থামিয়া গেল। নীরবেই আহার সমাধা করিল। শাশুড়ী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—তাহলে মণি থাক, কি বল?

—দেখি মণিকে জিজ্ঞেস করি।

—ও তো থাকতে পেলে আর কিছু চায় না। তোমাদের ঐ মফঃস্বল জায়গায় না আছে সিনেমা, না আছে রেডিও, মেয়ে তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে।

বিমল কিছু না বলিয়া একটু হাসিল।

সেদিন রাত্রে মণিমালাও বিমলকে ওই কথাই বলিল।

—মায়ের কাছে থাকি, কেমন?

—বেশ।

—না, তুমি ভাল মুখে বল।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিমল বলিল—বেশ তো থাক না।

—রাগ করছ তুমি?

—রাগ করব কেন, থাক।

—মন কেমন করলে চলে যাবো, কেমন?

—বেশ।

পরদিন বিমল একাই ফিরিয়া আসিল। মণি, সুব্রত, সুপ্রিয়া কেহ আসিল না।

[বারো]

দেখিতে দেখিতে আরও দুই মাস কাটিয়া গেল।

ডাক্তারের দৈনন্দিন জীবন যেমন ভাবে চলে তেমনি ভাবে চলিতে লাগিল। রুগী আসে যায়, বাঁচে মরে, মাঝে মাঝে এক-আধটা রুগী বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কেহ হয় তো অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁচিয়া যায়, কেহ অপ্রত্যাশিত ভাবে মরে, অপ্রত্যাশিত উপায়ে মাঝে মাঝে দুই-একটা রোগ-নির্ণয়ও হইয়া যায়। যাহাকে কালাজ্বর বলিয়া মনে হইতেছিল হঠাৎ দেখা যায় তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে, যে অসহ্য মাথা ধরার যন্ত্রণায় চশমার পর চশমা বদলাইয়া, খাদ্য সংযম করিয়া, কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না, হঠাৎ রক্ত পরীক্ষা করিয়া

জানা যায় পিতার পাপের শাস্তি সে ভোগ করিতেছে। পিটুইটারি গ্লাণ্ডের গোলমাল লইয়া বিকটাকার কোন রুগী হয়ত হাজির হয়, তাহাকে লইয়া খানিকক্ষণ বেশ কাটে। এই ভাবেই চলিতেছিল। হরেন বোসের দল দরখাস্ত করিয়া বিমলের কিছু করিতে পারে নাই, কারণ সাহেব সিভিল সার্জন বিমলের নিকট সমস্ত সত্য কথা শুনিয়া কাগজে কলমে কিছু করিলেন না, মুখে বিমলকে আর একটু ট্যাক্‌ট্‌ফুল অর্থাৎ কৌশলী হইতে উপদেশ দিলেন, বলিলেন যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করিলে চলে না তাহা ঠিক, কিন্তু সব দিক বাঁচাইয়া তাহা করিতে হইবে। ইউ মাস্‌ট্‌ বি ট্যাক্‌ট্‌ফুল।

মথুরবাবু সত্য সত্যই সস্ত্রীক মথুরা চলিয়া গিয়াছেন। নন্দী-মহাশয় নিরঙ্কুশভাবে চেয়ারম্যানগিরি করিতেছেন। তাঁহার ইলেকট্রিক-স্কীম সর্ববাদিসম্মতভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। মথুরবাবু মিটিঙে ছিলেন না, সুতরাং একটি লোকও বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বদিবাবু সম্প্রতি একটি মন্দিরসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত আছেন। কোথায় একটা পাহাড়ের উপর না কি একটা মন্দির আছে, জৈনেরা সেটাকে নিজেদের মন্দির বলিয়া দাবি করিতেছে এবং হিন্দুদের সেখানে ঢুকিতে দিতেছে না; বদিবাবু হিন্দুদের পক্ষ লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজকাল তিনি এখানে নাই, বম্বেতে এই উপলক্ষেই গিয়াছেন। তাঁহার তিলমাত্র অবসর নাই। ইনসিউলিন লইয়া হীরালালবাবু অনেকটা সুস্থ আছেন, মতিলালবাবুর ইন্‌জেকশন এখনও চলিতেছে। সুব্রতবাবুর চাকুরি হইয়াছে এবং তিনি সুপ্রিয়াকে লইয়া কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। সৌরিনবাবু ঠিক তেমনই আছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার নিজের এলাকার সমস্ত গরুর পায়ে ঘুঙুর পরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। বলিতেছেন এটা ব্যাপকভাবে করিতে পারিলে গোধূলিটা সত্যই মনোরম হইয়া উঠিবে। বর্তমানে গোধূলিতে ধূলি ছাড়া আর কিছু নাই। পরেশ-দা বদলি হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে যিনি আসিয়াছেন তিনি মুসলমান। বিমলের সহিত এখনও তেমন আলাপ হয় নাই। বিনোদিনীকে লইয়া অমর প্রকাশ্য দিবালোকেই একদিন তাহার বাসায় আসিয়াছিল। অমর বিনোদিনীকে এখনও তাহার পাপের কথা বলিতে পারে নাই। এ-অঞ্চলে যাহাতে 'নাইট স্কুল' হয় তাহারই চেষ্টায় সে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিনোদিনীর সহিত বিমলও প্রকাশ্যভাবে নানা স্থানে ঘুরিতেছে। মথুরবাবু নাই, সুতরাং পরদা ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া হরেন বোস গুপিবাবুর দলে কানাঘুষাও চলিতেছে। প্রতাপবাবু ডাক্তার এবং রমেশবাবু মোক্তার ভাঙা চৌকিতে বসিয়া এখনও ঠিক তেমন ভাবেই তর্ক করিয়া চলিয়াছেন। সেদিনই হাসপাতালে যাইতে যাইতে বিমল শুনিতে পাইল রমেশবাবু বলিতেছেন যে আজকাল যে এত অনাবৃষ্টি তাহার কারণ পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপবাবুর মত ভিন্ন প্রকার, তাঁহার মতে ইংরেজ রাজত্বই কারণ ঃ উভয়ের তর্ক চলিতে লাগিল, বিমল সবটা শুনিতে পাইল না।

মণিমালা ভাল আছে, প্রায়ই চিঠি লেখে। প্রায়ই চিঠি লেখে বটে, চিঠিতে বিমলের জন্য উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করে, কিন্তু কেমন যেন মন ভরে না। বিমলের মনে হয় সে রেডিও, সিনেমা, ভাই-বোন, মা-বাবা, শাড়ি-ব্লাউজ এই সকল লইয়াই বেশী মাতিয়া আছে, লৌকিকতা রক্ষা করিবার জন্যই মাঝে মাঝে তাহাকে চিঠি লেখে। চিঠিতে নানা রকম কথা থাকে, কিন্তু কিসের যেন একটা অভাবও থাকে, ঠিক যে সেটা কি তাহা বিমল বুঝিতে পারে

না। তাহার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় মণিমালা বোধ হয় তাহাকে পছন্দ করে না, তাহার স্বামীর আদর্শের অনুরূপ হয়ত সে নয়। সে তো প্রায়ই গল্প করিত তাহার কোন বান্ধবী আই. সি. এস.কে বিবাহ করিয়াছে, কাহার খুব বড় জমিদারের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, এক জনের স্বামী নাকি ব্যারিস্টার, তাহাদের নাকি তিনখানা মোটর, আর এক জনের নাকি কোন এক দালালের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, সে নাকি অসম্ভব বড়লোক। ইহাদের কাহারও সহিত বিমল পাল্লা দিতে পারে না। মানুষ হিসাবে সে হয়ত ইহাদের সমকক্ষ, কিন্তু মানুষটাকে মণিমালা চিনিয়াছে কি? বিমল ঠিক বুঝিতে পারে না। হয়ত এ-সব কিছুই নয়, সমস্তই তাহার কল্পনাপ্রবণ মনের সৃষ্টি, হয়ত মণিমালা সত্যই তাহাকে ভালবাসে!

আর একটা বিষয়েও বিমলের মনে অশান্তি ছিল। তাহার বিবেকের সহিত তাহার আচরণের কিছুতেই মিল হইতেছিল না। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের খরস্রোতে সে ভাসিয়া চলিয়াছিল, ইচ্ছা করিলেও সে আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না, হাসপাতালের দীন দরিদ্র রুগীর দল গুপিবাবুর কবলেই পড়িতেছিল, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও বিমলের কিছু উপায় ছিল না। ডাক আসিলে যাইতেই হয়, অর্থের জন্য না হইলেও খাতিরে পড়িয়া যাইতে হয়। কাহাকে ফিরাইবে সে! দুই-চারি বার কনসলটেশনে আসিয়া সাহেব সিভিল-সার্জনের উগ্রতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। হরেন বোস তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও আর কিছু করিতে পারিবে না। হরেন বোস ইদানিং আর বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহেও না, বরং তাহার সহিত ভাব করিবার জন্যই ব্যগ্র। এমনি করিয়াই দিনের পর দিন কাটিতেছিল এবং আরও কিছু দিন হয়ত কাটিত কিন্তু সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সহসা এক দিন সকালে আয়নায় মুখ দেখিতে গিয়া বিমল লক্ষ্য করিল তাহার মুখময় লাল চাকা চাকা কি যেন বাহির হইয়াছে। মতিবাবুর সিংহের মত মুখখানা তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল! সে সভয়ে বিস্ফারিত চক্ষে আয়নাটার দিকে চাহিয়া রহিল।

[তেরো]

অন্য কোথাও নয়, মুখে—সুতরাং খবরটা চাপা রহিল না। নানা ছুতায় অনেকেই আসিয়া বিমল ডাক্তারের সহিত আলাপ করিয়া গেল এবং খবরটা প্রত্যক্ষ করিয়া রং চড়াইয়া রাষ্ট্র করিতে লাগিল। হরেন বোস বিমলকে কোন প্রকারে কায়দায় আনিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। এইবার কে কাহার পিঠের চামড়া তোলে দেখা যাক। হুঁ হুঁ বাবা ভগবানের কাছে চালাকি নয়! লোকটা যে অতিশয় ইতর তাহা তিনি গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন কিন্তু একা কি করিবেন, সকলেই উহার পক্ষে। এমন কি চৌধুরী মহাশয়কেও পর্যন্ত ছোকরা হাত করিয়া ফেলিয়াছে। এইবার! আগুন এবং পাপ বেশীদিন চাপা দিয়া রাখা যায় না, একদিন না একদিন ফুটিয়া বাহির হইবেই। একেবারে মুখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। হইবে না? ভৈরবের স্ত্রীকে লইয়া যা ঢলাঢলি, আজকাল আবার মথুরবাবুর পুত্রবধূটার সঙ্গে জুটিয়াছে। একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া মোটরে হাওয়া খাইতে যাওয়া হয়। মথুরবাবুর ছেলেটাও যেমন বখাটে, পুত্রবধূটাও কি ঠিক তেমনি জুটিয়াছে। শ্বশুর-শাশুড়ী যাইতে না যাইতেই দিগ্বিজয় শুরু

করিয়া দিয়াছে। নমস্কার বাবা আজকালকার মেয়েদের চরণে! আমাদের বউ-ঝি মুখ্যু-সুখ্যু আছে, মুখ্যু-সুখ্যুই ভাল।—গুপিবাবুর সহিত এইরূপ নানা প্রকার আলোচনা করিয়া হরেন বোধ দুইটি অস্ত্র চালনা করিলেন। প্রথম, সিভিল সার্জনের কাছে আর একটি দরখাস্ত দিলেন, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে যেন অবিলম্বে হাসপাতাল হইতে অপসারিত করা হয়। দ্বিতীয় যে-কাজটি তিনি করিলেন তাহা তাঁহারই মত প্রতিভাবান লোকের পক্ষে সম্ভব। তিনি যে কবিতা লিখিতে পারেন তাহা কে জানিত। তিনি বিমল, ভৈরবের স্ত্রী, বিনোদিনী এবং কুষ্ঠ, এই চারিটি বিষয়কে জড়াইয়া একটি পয়ার রচনা করিলেন এবং সেটি অপরের দ্বারায় কার্বন কাগজ সহযোগে নকল করাইয়া এক দিন রাত্রে চতুর্দিকে সাঁটিয়া দিলেন।

বিমলের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাহার চোখের সামনে যেন তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দাউ দাউ করিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, সে অসহায়ের মত বসিয়া দেখিতেছে। তাহার বারম্বার মনে হইতেছে আর কিছু নয়, পাপের শাস্তি। নিদারুণ অর্থগৃধ্নুতার নিদারুণ পরিণাম! হাসপাতালের গরীব অসহায় রুগীদের প্রাণ লইয়া সে যে এতদিন ছিনিমিনি খেলিয়াছে, চিকিৎসার নামে প্রতারণা করিয়াছে—এ তাহারই সাজা। সেই অসহায় ভিখারীটার কথা, ভৈরবের ছেলেটার কথা, যে টিউমার কেসটা সেপটিক হইয়া মারা গিয়াছিল তাহার কথা—সব তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আরও সে কত মরিয়াছে তাহার ঠিক কি! গুপিবাবুর হাতেই তো সে আজকাল সকলের চিকিৎসার ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে তো নিজে কিছুই দেখিত না, দেখিবার অবসরই ছিল না। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, এই কয়েক দিন আগে পর্যন্ত তাহার অবসর ছিল না, এখন কিন্তু তাহার অনেক অবসর। কথাটা রাষ্ট্র হইয়া যাইবার পর হইতে তাহার ডাক কমিয়া গিয়াছে। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ডাক্তারকে কে ডাকিবে? দুই দিন হইল সে হাসপাতাল যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। এই মুখ লইয়া সকলের সামনে বাহির হইতে কেমন যেন লজ্জা করে। তাহার কাছে আসিতেও সকলে কেমন সঙ্কুচিত হয়। যোগেন চাকরটা পর্যন্ত কাল হইতে আসিতেছে না। ঠাকুরটা আগেই পলাইয়াছে। কেবল যায় নাই কাঙালী—সেই শূয়ারে-চেরা ছেলেটা। সে ভাল হইয়া গিয়াছে এবং বিমলের কাছেই আছে। আজ বিমল জগদীশবাবু ও ভূধরবাবুকে ডাকিয়াছে, তাঁহাদের মত এবং পরামর্শ লইবার জন্য।

জগদীশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—সারা মুখটাতেই বেরিয়েছে দেখছি যে। ছুঁলে বেশ বুঝতে পারেন তো, কোন অ্যানিস্-থেসিয়া নেই?

—না।

—জ্বালাটালা করে?

—না।

জগদীশবাবু চশমাটি খুলিয়া বলিলেন—একবার কলকাতা গিয়ে দেখিয়ে আসুন মশায়।

জগদীশবাবু হাসিলেন, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে জিবটি বার-দুই উঁকি মারিয়া গেল। কিছুক্ষণ হাসিমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন—আপনি নিজে ডাক্তার, আপনাকে আর কি বলব আমি।

জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন।

একটু পরে ভূধরবাবু আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিমলকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বলিলেন—স-সব একদম বাজে কথা। মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন আপনি! আপনি অত্যধিক মাংসটাংস খান, এই গরমে লিভার-টিভার খারাপ হয়ে কিছু হয়েছে একটা। একটা কোর্স ক্যালসিয়াম নিন আর ম্যাগসালফ খেয়ে ফেলুন খানিকটা—ও কিছু নয়, দু-দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিমল বলিল—তা না হয় যাবে, কিন্তু এখন সে সবাই একঘরে করেছে তার উপায় কি? কেস টেস একেবারে আসছে না।

—কুছ পরোয়া নেই, আমি আপনাকে ব্যাক করব। আপনার বাইরে যাবার দরকার নেই, ঘরে বসেই আপনার মাইক্রোসকোপের কাজ করুন আপনি, আমি আপনাকে কেস পাঠাবো। ভয় কি?

—বামুনটা পর্যন্ত পালিয়েছে।

—তাই নাকি? আচ্ছা, আমার বাড়ি থেকে আপনার খাবার আসবে রোজ। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না আপনি।

হরেন বোস আমার নামে আবার দরখাস্ত করিয়েছে তা শুনেছেন তো?

—শুনেছি। ও কিচ্ছু হবে না। আপনি সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে, এ যে লেপ্রসি নয় তা যে কোন ডাক্তার বুঝতে পারবে। আপনি হরেন বোসের নামে ডিফারমেশান কেস করে দিন একটা। ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া! ওই পদ্যটা যে ওই লিখেছে তার প্রমাণ আমার হাতে আছে, যে ছোকরা কপি করেছিল সে আমার চেনা লোক, তার কাছেই শুনলাম সব। দিন কেস্ করে, প্রুফ আছে।

বিমল হাসিয়া বলিল- -ভারি দমে গেছি, কিছু ভাল লাগছে না।

—স্ট্রাগল ফর এগ্‌জিস্টেন্স—জীবন-যুদ্ধে দমে গেলে কি চলে মশাই? যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। ওই যে যেখানে ইটের ভাটা করেছি সেই জমিটার 'লিজ' নিয়ে নবীনবাবুর সঙ্গে কি কম ফাইটটা করতে হয়েছে আমাকে। শেষকালে মিথ্যে দুটো ফৌজদারী কেসই করে দিলাম আমি ওর নামে, বাছাধন দেখলেন আমার সঙ্গে ট্যাঁ ফোঁ করে বিশেষ সুবিধে হবে না, সুড়সুড় করে রাজি হয়ে গেলেন শেষকালে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। এই যে দেখুন না, আগে মদ নইলে চলত না আমার, আজকাল আর খাই না। দেখলুম লিভার কিডনি-ফিডনিগুলো গোলমাল করছে, পয়সাও বেশ খরচ হচ্ছে, দিলাম ছেড়ে। যখন যেমন তখন তেমন ব্যবস্থা করতে হয়। দমবেন কেন, কি হয়েছে আপনার? হরেন বোস? ওকে জব্দ করতে কতক্ষণ? দিন আপনি ওর নামে একটা কেস করে, আর এবার চেষ্টা করুন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে যেন এক পয়সার না কন্‌ট্রাক্ট পায়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনের তো সবাই আপনার হাতে। কন্‌ট্রাক্ট না পেলে দেখবেন বাছাধন মুষড়ে যাবে!

বিমল কিছু বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভূধরবাবু পকেট হইতে কাগজের ফর্দটা বাহির করিয়া বলিলেন—এক, দুই, তিন, চার,

পাঁচ—এখনও পাঁচ জায়গাতে যেতে বাকী। ওঃ আর পারা যায় না! কিছু ঘাবড়াবেন না আপনি। আমাদের বাড়ি থেকে ভাত পাঠিয়ে দেব আমি। আচ্ছা চলি এবার।

ভূধরবাবু চলিয়া গেলেন।

বিপদে না পড়িলে লোক চেনা যায় না। ভূধরবাবুকে বিমল এতদিন চিনিতে পারে নাই।

সিভিল সার্জন বিমলকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ঠিক কুষ্ঠ কিনা তাহা বলা শক্ত। মাস ছয়েক ছুটি লইয়া কিছু কাল অন্যত্র যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত, ট্রপিক্যাল স্কুলেও একবার দেখাইয়া আসা উচিত। লেপ্রসি যদি হয় ছয় মাসের মধ্যে বোঝা যাইবে। সাহেব তাহার যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিলেন। তাহাকে অবিলম্বে ছয় মাসের ছুটির জন্য সুপারিশ করিয়া একখানা সার্টিফিকেটও দিলেন।

ট্রপিক্যাল স্কুলে গিয়াও কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল না। তাঁহারা রক্ত লইয়া, চামড়া কাটিয়া, নাকের রস লইয়া নানা রকম পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। কুষ্ঠ যে নয় তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। একটা লাগাইবার ঔষধ দিয়া বলিলেন, আবার কিছু দিন পরে আসিতে। বিমল কলিকাতায় গিয়া গোপনে একটা হোটেলে উঠিয়াছিল, গোপনেই ফিরিয়া আসিল। এই চেহারা লইয়া মণির সহিত সে দেখা করিতে পারিল না। কাহারও সহিতই সে দেখা করিল না। কাহারও সহিত দেখা করিবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না, এই জনতা হইতে দূরে যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। সে তাহার চাকুরিস্থলেও আর ফিরিয়া গেল না। কলিকাতায় বসিয়াই সে ছুটির জন্য দরখাস্ত করিল এবং সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট-সুদ্ধ নন্দী-মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। দুলুকেও একখানি চিঠি লিখিল সে যেন তাহার জিনিস-পত্র তাহার দেশের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। সে সোজা দেশে ফিরিয়া যাইবে, এই ছয় মাস অন্য কোথাও নয়, শম্ভুকাকার আশ্রয়েই কাটাইয়া দিতে হইবে। দেশে গিয়া সে মণিকে জানাইয়া দিবে যে বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য তাহাকে ছুটি লইয়া দেশে আসিতে হইয়াছে, কিছুদিন দেশেই থাকিবে।

একটা জংশন স্টেশনে ট্রেন বদলি করিতে হইবে।

বিমল ট্রেনের প্রতীক্ষায় প্লাটফর্মের একটা অন্ধকার অংশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আজকাল সে যথাসম্ভব আলোক পরিহার করিয়া চলিতেছে। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল প্লাটফর্মের ওধারে যে মহিলাটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তিনি যেন অনেকটা বিনোদিনীর মত। আশ্চর্য সাদৃশ্য তো! বিমল আর একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। এ কি, এ যে বিনোদিনীই। অমরও তাহা হইলে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। ভালই হইল ইহাদের সহিত দেখাটা হইয়া গেল।

বিমল আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—কোথা যাচ্ছেন আপনারা, অমর কই?

বিনোদিনী অবাক হইয়া গেল। বিমলকে এখানে দেখিবে সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিমল পুনরায় প্রশ্ন করিল—অমর কই, যাচ্ছেন কোথা?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী বলিল—আমি একাই যাচ্ছি।

—তাই নাকি, হঠাৎ একা কেন?

আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিনোদিনী একটা তিক্ত হাসি হাসিয়া বলিল—এবার একাই চলতে হবে।

—মানে?

—মানে তো আপনি জানেন। আমি এত দিন জানতাম না, কাল জেনেছি? ও কথা জানার পর আপনার বন্ধুর সঙ্গে থাকার আমার আর প্রবৃত্তি নেই।

বিমল নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

—কোথায় যাচ্ছেন এখন?

—যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর বাড়ি।

—তার পর?

—তার পর কোথাও একটা চাকরি টাকরি জুটিয়ে নেব।

বিনোদিনী এ-বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে চাহিল না, অন্য দিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। বিমলও কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। একটু পরেই বিনোদিনীর গাড়ি আসিল, সে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ট্রেন চলিয়া গেল। বিমল বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল মণিও কি আমাকে এমনি করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবে যদি সে জানিতে পারে আমার কুষ্ঠ হইয়াছে? অমরের ব্যাধির কারণ কাম, আমার এটা যদি কুষ্ঠই হয় তাহা হইলে ইহার কারণ লোভ। তফাৎ তো খুব বেশী নয়। অসুখ হইলে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? সহসা তাহার ভৈরবের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। সে চোর জানিয়াও তাহার স্বামীকে ত্যাগ করে নাই। তাহাকে গালি দিয়াছে, গঞ্জনা দিয়াছে, এমন কি মারিয়াছে পর্যন্ত, কিন্তু ত্যাগ তো করে নাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিমল তাহার আত্মজীবনী লিখিতেছিল—

এখানে এক বৎসর কাটিয়া গেল। সময় কত শীঘ্র কাটিয়া যায়! মনে হইতেছে এই তো সেদিন মাত্র আসিলাম। এই এক বৎসরে জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে, জীবনের নূতন স্বাদ পাইয়াছি। দুঃখের অন্ধকারে নিজের উপর নয়, ভগবানের উপর একান্তমনে নির্ভর করিয়াছিলাম। তাঁহার মঙ্গলময় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এখানে যে দিন প্রথম আসি সেদিন শম্ভুকাকা বাড়িতে ছিলেন না, গ্রামান্তরে রুগী দেখিতে গিয়াছিলেন। আমার মনে শঙ্কা ছিল আমার চেহারা দেখিয়া শম্ভুকাকাও ভয় পাইবেন, হয়ত তিনিও কোন ছুতায় আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন। তখন শম্ভুকাকাকে চিনিতাম না। শম্ভুকাকা ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে অকপটে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম, কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত শুনিয়া তিনি আমার দিকে এমন করিয়া চাহিয়া রহিলেন যেন তিনি একটা দেবতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বলিলাম—শম্ভুকাকা, আপনিও ত্যাগ করবেন না তো?

—ত্যাগ করব! এ-ধারণা তোমার মাথায় কি করে ঢুকল? নিজের সন্তানকে কেউ কখনও ত্যাগ করে?

তাহার পর সহসা তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—ত্যাগ করব? তোমাকে পুজো করা উচিত! একটা কুষ্ঠ-রুগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে জেনে-শুনে তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করেছ। আহত সৈনিককে কেউ কখনও ত্যাগ করে? বলছ কি তুমি!

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—কোন ভয় নেই তোমার। তুমি চুপচাপ বসে থাক, আমিই তোমার চিকিৎসা করব। আজকাল এর তো খুব ভাল ইন্‌জেকশন বেরিয়েছে। আজই আনিয়ে দাও—ভয় কি, ঠিক হয়ে যাবে সব। আমিই তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি, দেখ না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

শম্ভুকাকা এমন একটা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন যেন সমস্ত সমস্যার তিনি সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। এ-রোগের যখন ইন্‌জেকশন করিবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন আর ভাবনা কি? শম্ভুকাকার ইন্‌জেকশনের উপর অগাধ বিশ্বাস। শুধু ইন্‌জেকশন নয় সমস্ত জিনিসেরই উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। প্রত্যেক ঔষধটির যে-সকল গুণাবলী ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে শম্ভুকাকা সমস্ত বিশ্বাস করেন। মেটিরিয়া মেডিকা তাঁহার কণ্ঠস্থ এবং তাহাতে যে-সকল কথা লেখা আছে তাহা তিনি অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মনে করেন। যদি কোন ঔষধের মনোমত ফল না হয় তিনি ঔষধের দোষ দেন না, নিজের বুদ্ধির দোষ দেন। তাঁহার ধারণা ঠিকমত বাছিয়া ঠিক ঔষধটি দিতে পারিলে নিশ্চয়ই রোগ সারিবে—সারিতে বাধ্য। শম্ভুকাকার এই বিশ্বাস দেখিয়া হিংসা হয়। আমাদের এ বিশ্বাস নাই। আমরা ঔষধ দিই দ্বিধাভরে; যদি ফল হয় ভালই, না যদি হয় কি করিব! শম্ভুকাকা ঔষধ দেন নিষ্ঠাভরে যেরূপ নিষ্ঠাভরে ভক্ত দেবতার সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করে। শম্ভুকাকার নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হই। শম্ভুকাকার চিকিৎসা-প্রণালীও অদ্ভুত। তিনি কেবল ঔষধ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, শক্ত রুগী হইলে তাহার সেবার ভারও তিনি গ্রহণ করেন। শক্ত রুগী হইলে এবং পয়সা খরচ

করিতে সক্ষম হইলে শম্ভুকাকা সাধারণত ফুরণ করিয়া চিকিৎসা করেন। অর্ধেক টাকা প্রথমে দিতে হয় এবং বাকী অর্ধেক রোগ ভাল হইলে দিতে হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি থাকে। শম্ভুকাকা ঔষধের বাক্সটি লইয়া রুগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসেন। নিজহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়ান, পথ্যও নিজ হাতে প্রস্তুত করেন এবং নিজেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্রি সেবা করেন। রুগী যদি ভাল হয় তাহা হইলে শম্ভুকাকা সানন্দে তাঁহার বাকী অর্ধেক টাকা লইয়া আসেন। রুগী মরিয়া গেলে তাহার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বসিয়া শোক করেন, শ্মশানে যান, তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাবর্তন করেন। রুগীর জন্য এতটা করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। শম্ভুকাকার ডাক্তারি বিদ্যা হয়ত তেমন গভীর নয়, কিন্তু বিদ্যার গভীরতা লইয়া কি হইবে যদি প্রাণ না থাকে? আমি যদি কখনও শক্ত অসুখে পড়ি, শম্ভুকাকার চিকিৎসাতেই থাকিব। আমার কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসাও হয়ত তাঁহাকে দিয়াই করাইতাম কিন্তু তাহার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার কুষ্ঠ হয় নাই, হইয়াছিল ডারমাল্ লিশ্ম্যানিয়াসিস! যে জীবাণু কালাজ্বর রোগের কারণ, সেই জীবাণুই ইহারও কারণ। মানুষের ত্বক আশ্রয় করিয়া অনেক সময় ইহা বিভীষিকার সৃষ্টি করে। আমার বিভীষিকাটা বেশী হইয়াছিল কারণ আমার বিবেকও সুস্থ ছিল না। নিজে অসুখে পড়িয়ে একটা জিনিস মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি—আমাদের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও আমাদের বিদ্যা অতিশয় অল্প। এই অল্প বিদ্যার সহিত যদি সহৃদয়তা না থাকে তবে ইহা লইয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা জুয়াচুরির নামান্তর মাত্র।

বর্তমানে আমার সমস্যা রোগ কিংবা রুগী নহে, বস্তুত কোন উৎকণ্ঠাজনক সমস্যাই আর আমার নাই, জীবনকে সহজ করিয়া ফেলিয়াছি। পৈতৃক জমি সামান্য যাহা ছিল তাহাই চাষ করিয়া দিন কাটাইতেছি। বিলাসের উপরকণ জুটাইতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু সুখে আছি। উন্মুক্ত বাতাসে, উদার মাঠে, খোলা আকাশের নীচে স্বচ্ছন্দ সুন্দর গতিতে জীবন বহিয়া চলিয়াছে! সিনেমা, রেডিও অথবা বৈদ্যুতিক আলোর অভাবে মোটেই কষ্ট পাইতেছি না। প্রকৃতির বিরাট নাট্যশালায় বহু সিনেমা, বহু আলো, বহু রেডিও আছে—দেখিবার চোখ এবং শুনিবাব কান থাকিলেই তাহাদের পরিচয় মেলে। বিরাট আকাশ কখনও ঘনঘটাচ্ছন্ন, কখনও জ্যোৎস্নাকুল, কখনও রৌদ্রতপ্ত, কখনও মেঘ-বিচিত্র, কখনও নক্ষত্রখচিত। উদার মাঠ কখনও শ্যামল শোভায় হাসিতেছে, কখনও স্বর্ণবর্ণ পক্বশস্যভারে মহিমময় হইয়া উঠিতেছে, কখনও ধূসর ঊষর মূর্তি। নদীর জলে ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, পাখির গানে ক্ষণে ক্ষণে কত সুর—সমস্ত প্রকৃতির কত রূপ, কত ঐশ্বর্য! আমরাও প্রকৃতির সন্তান, কিন্তু ইহাদের সহিত সহজভাবে কণ্ঠ মিলাইয়া জীবনের স্বাভাবিক ঐক্যসঙ্গীতে যোগদান করিতে পারি না। আমরা কেমন যেন অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি। স্বল্প জ্ঞানের অহমিকায় জীবনকে অকারণে জটিল করিয়া সভ্যতার গর্ব করিতেছি। আমার এই যে বর্তমান জীবন ইহাও যে কম জটিল তাহা নহে, ইহাতে জটিলতা আছে। কিন্তু তাহা স্বাভাবিক জটিলতা, জটিলতার মধ্যেও খানিকটা সরলতা আছে। অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি বিচলিত করে, উইপোকা, শূকর অথবা সজারুর দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া পড়ি, দারুণ বর্ষায় অথবা দারুণ রৌদ্রে ঘরের মধ্যে আরাম করিয়া বসিয়া থাকা চলে না—মাঠে যাইতে হয়, জনমজুররা সকলেই শান্তশিষ্ট

কর্তব্যপরায়ণ নহে, তাহারাও মাঝে মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। কিন্তু এ সব জিনিস জীবনের মূল শান্তিকে বিঘ্নিত করে না—বিবেককে বিষাক্ত করিয়া তোলে না। এসব জটিলতার মধ্যে কুচক্রীর কৌশল অথবা কুটিলতা নাই, এসব জটিলতা জীবনের সহজ জটিলতা, সুস্থ সবল জীবনী-শক্তির দ্বারা ইহাদের দমন করাও অসম্ভব নহে।

চাষ করি বলিয়া যে চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা নয়, চিকিৎসাও করি, কিন্তু চিকিৎসা লইয়া ব্যবসা আর করি না। কোন বিদ্যা লইয়া ব্যবসা করা চলে না। বিদ্যায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ব্যবসায়ী হইলে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যা-ব্যবসায়ী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের এত প্রভাব বলিয়াই আমাদের এত দুর্দশা। বিদ্যা সমস্ত জীবন ধরিয়া অনুশীলন করিতে হয় এবং তাহার শেষ নাই—ইহা লইয়া ব্যবসায় চলিবে কিরূপে? সম্পূর্ণ জিনিসটা তো আমি কখনই ক্রেতাকে দিতে পারিব না, অথচ ভাণ করিতে হইবে যে সম্পূর্ণটাই দিতেছি। শব্দের ঝঙ্কারে ভাণ্ডের শূন্যতাকে ঢাকিতে হইবে! অনেক দিন উহা করিয়াছি, আর ভাল লাগিতেছে ন.। বলা বাহুল্য বড়লোকেরা আমাকে ডাকে না। কারণ বড়লোকেরা ডাক্তার ডাকে ঠিক সেই মনোবৃত্তি লইয়া যে মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা মোটর কেনে, বাড়ি করে। মোটর এবং বাড়ি যেমন পছন্দসই হওয়া দরকার, ডাক্তারও তেমনই পছন্দসই হওয়া চাই। শুধু চিকিৎসা করিলেই চলিবে না, বাড়ির লোকেদের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নানা ডাক্তার নানা কৌশলে ইহা করিয়া থাকে। জগদীশবাবু, ভূধরবাবু, গাঙ্গুলী মহাশয়, মহাদেববাবু সকলেই ইহা করিতেছেন, প্রত্যেকের ধরন শুধু আলাদা রকমের। আজকাল ডাক্তারির মত গুরুগিরিও একটা পেশা হইয়াছে এবং গুরুরাও শিষ্যদের মনোরঞ্জন করিয়াই নিজেদের গুরুত্ব বজায় রাখিতেছেন—প্রত্যেক ব্যবসায়েই ক্রেতার মনোরঞ্জন না করিলে চলে না।

যাহারা পয়সা দিয়া ডাকে তাহাদের চিকিৎসা করার আর একটা মুশকিল তাহারা রোগ না সারিলে ডাক্তারকেই দায়ী করে। তাহারা পয়সাটাকেই মানে এবং অর্থের বিনিময়ে সব কিছুই সম্ভবপর বলিয়া মনে করে। মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য পরিণাম তাহা তাহারা জানে হয়ত, কিন্তু মানে না। তাহারা মনে করে কিছু অর্থব্যয় করিলে বুঝি নিয়তির হাত এড়াইতে পারিবে এবং ডাক্তার তাহা এড়াইতে সাহায্য করে, সে জন্যই তাহাকে পয়সা দেওয়া, সে যদি ঠিক মত তাহা করিতে না পারে তাহা হইলে সে আবার কিসের ডাক্তার!

গরীবেরা অসুখে পড়িলে ডাক্তারকে ডাকে, ভগবানকেও ডাকে। ঝড়ে বাড়ি উড়িয়া গেলে তাহারা দড়ি, খুঁটি, চাল অথবা ঘরামিকেই পুরাপুরি দায়ী করে না, ঝড়কে এবং ঝড়ের প্রাবল্যকেও স্বীকার করে। তাহারা প্রকৃতির সহিত পরিচিত, প্রকৃতির রুদ্র, মোহন, শান্ত নানা রূপের সহিত তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ, তাহারা নিয়তিকে মানে, ভগবানে বিশ্বাস করে। এই সব অশিক্ষিত গরীব লোকেদের চিকিৎসা করিয়া সুখ আছে, তাহাদের চিকিৎসা করিলেই তাহারা খুশি, বাঁচা-মরা ভগবানের হাত। ডাক্তারবাবু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, পরমায়ু ছিল না তাই মরিয়া গেল, থাকিলে নিশ্চয়ই বাঁচিত। অর্ধশিক্ষিত সভ্য-নামধেয় জীবদের এমন সরল বিশ্বাস নাই, বিশেষ করিয়া যাহারা ধনী তাহাদের নাস্তিকতা আরও প্রখর। তাহারা মুখে, কাগজে-কলমে, বক্তৃতায় ভগবানের অস্তিত্ব হয়ত স্বীকার করে কিন্তু মনে মনে সকলেই নাস্তিক। নাস্তিক বলিয়াই এত অশান্তি। এই দীনদরিদ্র পল্লীবাসীরা অশিক্ষিত, অধিকাংশ

লোকেরই অক্ষরপরিচয় পর্যন্ত নাই! তবু কিন্তু তাহাদের জীবনের একটা আদর্শ আছে, দার্শনিকের মত একটা দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলিবার মত বলিষ্ঠতা আছে। ইহারা মূর্খ কিন্তু অমানুষ নয়। ইহারা জীবনকে পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া নয়, জীবনের ভিতরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জীবনের সহিত সত্য পরিচয় আছে বলিয়াই ইহারা জীবন্ত।

ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া সত্যই সুখী হইয়াছি। ইহারা আমাকে টাকা দিতে পারে না বটে, কিন্তু যাহা দেয় তাহা অমূল্য—সমস্ত প্রাণটাই হাতে তুলিয়া দেয়! তাছাড়া গাছের ফল, ঘরের দুধ, উৎসবের মিষ্টান্ন,—যখন যেটুকু পারে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আনিয়া দেয়। সর্বদাই যেন কৃতজ্ঞতায় অবনমিত হইয়া আছে, অথচ আমি ইহাদের কতটুকু করি, কতটুকু করিবার সাধ্য আছে আমার? অধিকাংশ অসুখেরই তো ঔষধ জানা নাই। তবে এটা ঠিক, ইহাদের অসুখ সহজে সারে, ইহারা অসহায় বলিয়া প্রকৃতিও করুণা করেন। আরও একটা কথা, বড়লোকদের মত ইহাদের অসুখ অর্থজনিত নহে। ইহারা সাদাসিধা সোজ অসুখেই ভোগে এবং অল্প-স্বল্প চিকিৎসাতেই সারিয়া ওঠে। কুইনিন, টিঞ্চার আওডিন, ম্যাগসাল্‌ফ এবং ক্যাস্টরঅয়েল দিয়াই শতকরা পঞ্চাশ জনের অসুখ সারিয়া যায়। অথচ এই সব অসুখই বড়লোকেদের বাড়িতে হইলে কি কাণ্ডটাই না হয়! বড়লোকের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছি। মনে পড়িতেছে, প্রথম যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইতে যাই তখন অনাদিবাবু অনিলের স্যুটটা আমাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এত দিন যেন সেই স্যুটটাই পরিয়া অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলাম। ঢিলা জামা, ছোট প্যাণ্টালুন এবং আঁট জুতা পরিয়া কিছুতেই যেন শান্তি পাইতে ছিলুম না। ধার করা সেই স্যুটটা খুলিয়া ফেলিয়া যেন বাঁচিয়াছি।

পদশব্দ শুনিয়া বিমল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পরেশ-দা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

—পরেশ-দা, হঠাৎ যে!

—বেড়াতে এলাম, ছুটিতে আছি এখন।

—বাঃ, বেশ হয়েছে—বসুন।

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার অসুখ-টসুখ তো সব বাজে, তুমি আবার জয়েন করছ কবে?

—আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। জয়েন করব না।

—সে কি।

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—বদিবাবু মারা গেছেন জান তো?

—তাই নাকি! কি হয়েছিল?

—তিনি গোঁয়ার্তুমি করে সেই জৈনদের মন্দিরে তালা ভাঙবার জন্যে পাহাড়ে উঠেছিলেন এক দল ভলেণ্টিয়ার নিয়ে, উঠতে উঠতেই হার্ট ফেল করে মারা যান। বড় ভাল লোক ছিলেন!

বিমল নীরব হইয়া রহিল, বদিবাবুর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তাহার মনের ভিতর জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

পরেশ-দা আর একটা খবর দিলেন।

—তোমার সেই সুপ্রিয়া সরকার আর সুব্রতবাবুকে দেখলাম সেদিন। সুপ্রিয়া সরকারের হাতে এখন আর ইংরেজী নভেল নেই, কোলে খোকা! প্যালপিটেশন্ সেরে গেছে শুনলাম। সুব্রতবাবুরও চেহারা ফিরে গেছে।

বিমল শুনিয়া একটু হাসিল।

—অমরের কোন খবর জানেন?

—জানি। ভয়ানক মাতাল আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। জমিদারি তো দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে শুনেছি।

—তার স্ত্রী আর ফেরে নি?

—না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরেশ-দা বলিলেন—তুমি আর জয়েন করবে না, মানে? এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে? এখানে প্র্যাকটিস্ শুরু করেছ বুঝি!

বিমল মৃদু হাসিয়া বলিল—করি কিছু কিছু।

—এখানে কি ওখানকার মত হবে? ওখানে ফিলড্ কত বড়!

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ-দা বলিলেন—তোমার মণিমালার কি এ-জায়গা পছন্দ হবে—এ যে ঘোর পাঁড়াগাঁ?

বিমল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—আপনি শোনেন নি বুঝি?

—কি?

—মণি মারা গেছে!

—সে কি, কি করে?

—ছেলে হতে গিয়ে!

পরেশ-দা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিমল হাসিয়া বলিল—যেদিন খবরটা পেলাম, সেদিনই ঠিক এখানে একটা খুব শক্ত লেবার কেস করলাম আমি, গরীব চাষার মেয়ে, বেঁচে গেল সে।

পরেশ-দা বলিলেন—তুমি নিজের কাছে রাখলেই পারতে।

বিমল একটু হাসিল।
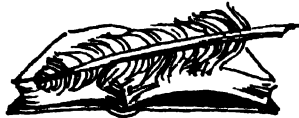
স্বপ্ন-সম্ভব

যতীন কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন খবরের কাগজ আর সে পড়িতে পারিতেছিল না। সেদিনকার কাগজটা নামাইয়া রাখিল। মনে হইল, মনুষ্যত্ব অবলুপ্ত হইয়া গেল নাকি! এই বিংশ শতাব্দীতে সমস্ত দেশ জুড়িয়া মানুষেরা যাহা করিতেছে, তাহাতে পিশাচেরাও লজ্জা পায়! হিন্দু আর মুসলমান.....অনেক কথাই মনে হইতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই হিন্দু-মুসলমান এক ছিল। নানাসাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন আজিমুল্লা খান। বেরেলির বাহাদুর খান ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমরা কোরবানি বন্ধ করিয়া দিব। দিল্লীর সম্রাট গো-হত্যা বন্ধ করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছিল। প্রত্যেক বিদ্রোহী বাহিনীতে মৌলভী ছিলেন, পুরোহিতও ছিলেন। মুসলমানের মহরমে হিন্দুরা যোগ দিতেন, হিন্দুর হোলিতে মুসলমানের অংশ গ্রহণ করিতে বাধিত না। দেখিতে দেখিতে কি হইয়া গেল! ইংরেজশাসনের মহিমায় মুসলমান সহসা আজ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা পৃথক 'নেশন'। সব মুসলমানেরা হয় নাই, নিরক্ষর অসহায় কৃষকের দল বোঝেও না, 'নেশন' বলিতে কি বুঝায়। যতীনের কয়েকটা ছবি মনে পড়িল। পলাশীর প্রান্তর, ক্লাইভ ও মীরজাফর। উভয়ের উভয়ে পরম বন্ধু। তাহার ঠিক এক শত বৎসর পরে সিপাহীবিদ্রোহের অবসানে ক্যাপ্টেন রবার্টস্ লিখিতেছেন, পাজি মুসলমানদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, ইংরেজরাই এ দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। নবাবেরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিতেছেন। শাহাজাদাদের সারি সারি দাঁড় করাইয়া গুলি করা হইতেছে। ফতেপুরের পাঠান-বস্তি আক্রান্ত, ব্রিটিশ সৈন্য দুই হাতে মুসলমানের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে। নির্বাসনে দিল্লীর বাদশাহ ভাঙা খাটিয়ায় শুইয়া অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন।....তাহার পর এক শত বৎসর এখনও অতীত হয় নাই, ইংরেজের সঙ্গে মুসলমানের বন্ধুত্ব আবার জমিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ এখন মুসলমান মাইনরিটির স্বার্থরক্ষা করিতে ব্যাকুল। মুসলমানের দুঃখে চার্চিলের চক্ষে নিদ্রা নাই! কিন্তু দেশের সকলে এ কথা জানে না, এক কথার তাৎপর্য কে তাহাদের বুঝাইয়া বলিবে? এখানেও নাকি দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। বাতাসে বিষ সঞ্চারিত হইতেছে। সাধারণ মানুষ এ সবের প্রকৃত অর্থ জানে না। একটু আগে মেজদি আসিয়াছিলেন, দেশের কথা ভাবিবার সামর্থ্যই তাঁহার নাই। নিজের অতি-তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছতম খুঁটিনাটিই তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য। নিজের কথাই সাতকাহন বলিলেন। তাঁহার অনেক দুঃখ। যতীনের মনে হইল, আমার দুঃখও কিছু কম নয়। মেজদি নিজের দুঃখের কথা পাঁচজনকে বলিয়া মনের ভার হালকা করিতে পারেন, আমি তাহা পারি না। আমার দুঃখের স্বরূপ কেহ বুঝিবে না। আমি যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তাহা বার বার ভাঙিয়া যাইতেছে বলিয়া কষ্ট পাইতেছি, তাহা কে বুঝিবে, কাহাকে বুঝাইব? মেজদির কথাগুলাই যতীনের মনে পড়িতে লাগিল। শুধু মেজদির নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের গ্লানিকর ছবির টুকরোগুলা আবর্জনার মত তাহার স্বপ্নলোককে ম্লান করিয়া তুলিতেছে। সে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই সৃজন করিতে পারে না, কিন্তু বাস্তবের আঘাতে সে স্বপ্নও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পাইতেছে না। হঠাৎ মনে পড়িল, সমর নোয়াখালি চলিয়া গিয়াছে। রুমিকে আজ দেখিতে আসিবে। রুমির এখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া সেজদার চিন্তার অন্ত নাই। বহু চেষ্টা করিয়া

তিনি একটা পাত্র জুটাইয়া আনিয়াছেন। এখানেও দাঙ্গা বাধিবে নাকি? সহসা তাহার বাল্যবন্ধু মহীউদ্দিনের কথা মনে পড়িল। সেও কি বিশ্বাস করে, সে আলাদা 'নেশন'? মেজদি বলিতেছিলেন, মহীউদ্দিনের বউটি নাকি ভারি লক্ষ্মী। মেজদি সকলের খবর রাখেন। নিজের পাড়ার তো বটেই, অপর পাড়ারও। কাহার বউ কবে পলাইয়া গিয়াছে, কোন্ মেয়ে বুড়া বাপকে আলুভাতে ভাত খাওয়াইয়া আপিসে বিদায় করিয়া দুপুরে বন্ধু-বান্ধব ডাকিয়া বাড়িতে আড্ডা জমায়, কাহার ছেলে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে, কে কাহার গরুকে খোঁয়াড়ে পাঠাইয়াছে, কুকর-কামড়ানোর ভাল দৈব ঔষধ কাহার জানা আছে...যতীনের স্বপ্নলোকে আবার মেজদি ঢুকিয়া পড়িলেন। যতীন প্রাণপণে তবু মনটাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

ভাবিতে লাগিল, আমি এখন যে জগতে আছি, যে জগতে থাকিতে চাই, সেখানে মেজদির এই সব কথা অতিশয় বেমানান। অথচ সকলের চক্ষে মেজদিই বাস্তব, আমার চক্ষেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন মনে হইতেছে ঠিক উল্টা, মেজদিই অবাস্তব অস্বাভাবিক। ওই সদ্য-ফোটা অপরাজিতার পাপড়িতে বসিয়া যে নীল পরীটা দোল খাইতেছিল, যাহার অতি সূক্ষ্ম ওড়নাখানা প্রচ্ছন্ন কম্পনে নীল পরীর মনের ইঙ্গিতময় ভাব প্রকাশ করিতেছিল, আমার চোখে এখন ওই নীল পরীটাই বাস্তব, মেজদি নয়। নীল পরীর অতি-সূক্ষ্ম ওড়নাখানাকে বাস্তববাদীরা মাকড়সার জাল বলিয়া ভুল করিবে। পরীরা যে ওড়না কাঁপাইয়া মনের কথা প্রকাশ করে, এ কথাও কেহ বিশ্বাস করিবে না জানি; কিন্তু ইহা সত্য। যে সোনার নৌকায় চড়িয়া নীল পরী অপরাজিতার সবুজ কুঞ্জে ভিড়িয়াছে, সেই সোনার নৌকাটাই এ জগতে মানায় ভাল; মেজদির নাকী সুরের কান্নাটা নয়। নৌকাখানাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিলাম। সোনার অথচ স্বচ্ছ, ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি পরিবর্তন করে। একটু আগেই ঠিক নৌকার মত ছিল, কিন্তু যেই আমি লক্ষ্য করিতে শুরু করিয়াছি অমনই টের পাইয়া গিয়াছে, আত্মগোপন করিতে চায়, দেখিতে দেখিতে লম্বা রেখার মত হইয়া গেল। আমার কাছে এখন কিন্তু লুকানো শক্ত। অপরাজিতার পাপড়িতে দোল খাইতে খাইতে ওড়না কাঁপাইয়া নীল পরী ইঙ্গিতে সব কথা আমার কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এখন আর আমাকে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না। নীল পরী এখন আমার পক্ষে। আগে যখন বাস্তববাদী ছিলাম, তখন আমিও ওটাকে এক টুকরো রোদ বলিয়া জানিতাম। এখন বুঝিয়াছি, সেটা ভুল। আসলে ওটা সোনার তরী, নীল পরী উহাতে চড়িয়া পাড়ি দেয় অরূপলোক হইতে রূপলোকে, সত্য হইতে স্বপ্নে, অসীম আকাশে অদৃশ্য তরঙ্গের শিখরে শিখরে। আর আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশ্বাসজনক ঘটনা—নীল পরী ইঙ্গিতে আমাকে জানাইয়াছে, অপ্রত্যাশিত পথে সে একদিন আসিবে, আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, লইয়া যাইবে সেই রহস্যলোকে— যেখানে জ্যোৎস্না ফুল হইয়া ফোটে, ফুলেরা প্রজাপতির মত উড়িয়া বেড়ায়, যেখানে সমস্ত সৌন্দর্যের উৎসমুখে চাপা আছে একটি রহস্যময় মণি—যে মণি কেহ খুলিতে পারে না, যাহা আপনি মাঝে মাঝে একটু একটু করিয়া খোলে আর নব নব সৌন্দর্যের প্লাবনে নিখিল বিশ্ব ভরিয়া যায়। ঠিক তাহার পাশেই পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ আছে, অদ্ভুত অন্ধকার সুড়ঙ্গ, কোথায় কতদূরে চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না—অতল অশেষ। এই সব কথা নীল পরী আমাকে বলিয়াছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার—নীল পরী নীলও নয়, পরীও নয়। আজ নীল পরী সাজিয়া আসিয়াছে, কাল আসিয়াছিল কাঠ-ঠোকরার বেশে—মাথায় ঝুঁটি, লম্বা সরু ঠোঁট, গলার কাছটা বাদামী রঙের, পিঠে ডানায় সাদা-কালো ডোরা ডোরা, ক্ষণে ক্ষণে মাথার ঝুঁটিটা

ফর্‌র্‌ করিয়া খুলিয়া যায়। ওই যে ভ্রমর, ওই যে টিকটিকি—উহারাও হয়তো নীল পরীর ছদ্মরূপ। যে বেশেই আসুক, আমি উহাকে চিনি, উহাকে ঘিরিয়াই নূতন জগৎ গড়িয়াছি, সেই জগৎটাই আমার কাছে সত্য, মেজদি নয়।....আবার মেজদি আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্তিটা আবার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে, তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছি।

আজ একটু চলতে গেলেই হাঁপ ধরছে বড্ড, বুকের ভেতরটা ধকধক করছে, হাতুড়ি দিয়ে পিটছে যেন কেউ। আর এই বাঁ দিকের শিরটা এমন টেনে ধরেছে, যেন বঁড়শিতে গেঁথেছে। লোকের কাছে না বলেও পারি না, সবার কাছে বলতে আবার লজ্জাও করে, সবাই বিশ্বাস করবে কেন, নিজের ঘরের লোকই করে না।.....

মেজদি নাকটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ। চশমা ঠিক করিয়া আবার শুরু করিলেন—

উনি মনে করেন, বুড়ো মাগীর হিস্টিরিয়া হয়েছে। হয়তো হিস্টিরিয়াই।—একটু হাসিলেন, তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, যে নামই দাও তোমরা, কষ্ট তো হয়। এই দেখ না, বাঁ দিকের রগটা সমানে দপদপ করে চলেছে, অথচ হাত দিয়ে দেখ ঠাণ্ডা হিম, সমস্ত বাঁ অঙ্গটাই ঠাণ্ডা। আশ্চর্য নয়? যখন যেদিকটার দপদপানি বাড়ে, অমনই সেদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।.....

মেজদির ফোকলা দাঁতের হাসি বড় মিষ্ট। কিন্তু এই মিষ্টতা এখন মনে আর সে মাধুর্য সঞ্চার করিতে পারে না, আগে যেমন করিত। এই মেজদির সঙ্গে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নাই। উনি পাড়ার সকলেরই মেজদি। ছেলেবেলায় এই মেজদির কাছে কত আগ্রহে কত রূপকথাই না শুনিয়াছি! কিরণমালার গল্পটা কত রঙে রাঙাইয়াই না বলিয়াছিলেন, এখনও একটু একটু মনে পড়ে। এখন মেজদিকে একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। সবুজ ক্ষেতের মাঝখানে কিম্ভূতকিমাকার কি একটা যেন! খড়ের তৈয়ারি দেহ, লম্বা হাত পা, গায়ে বেমানান একটা জামা, মাথায় কালো হাঁড়ি, তাহার উপর চুন দিয়া চোখ মুখ নাক আঁকা। পাখিরা দেখিয়া ভয় পায়। শুধু মেজদি নয়, সকলেরই এই অবস্থা। হাসি পায়, দুঃখও হয়। আর একটা কথা ভাবিয়া আশ্চর্যও লাগে। বাড়ির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আমি—আমার চেয়েও ছোট অবশ্য আছে একজন, আমাদের একমাত্র ছোট বোন রুমি—কিন্তু আমিই কেবল দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছি। আমিই কেবল বুঝিয়াছি, বাহিরের এই এত বাহ্যাড়ম্বর, এই দেশব্যাপী দাঙ্গা কলহ, রুমির রোমান্স, বড়দার আভিজাত্য, মেজদার অহঙ্কার, সেজদার ঠাকুর-ঘর, পাড়ার শৈলেনদার কমিউনিজম প্রতিটি লোকের নানা আজগুবি আচরণ, যাহা বাস্তববাদীদের বিচারে বাস্তবিক, বস্তুত তাহার প্রত্যেকটিই অলীক। বাস্তবিক কেবল নীল পরী—যে নীল নয়, পরী নয়, যে যখন-যেমন-খুশী বেশে দেখা দিতে পারে এবং দেয়।

কিন্তু মেজদিরা থামিবেন না.....আবার মেজদির কথাগুলা শুনিতে পাইতেছি।

পাশের ঘরে ভোর থেকে লুচি ভাজা হচ্ছে, পেঁয়াজ ভাজা হচ্ছে, চা হচ্ছে, গন্ধ পাচ্ছি; কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি বল, আমি আমার ঘুঁটের উনুন ধরিয়ে চাটুকু করে নিলাম। চা করতে গিয়ে দেখি, চিনি নেই। তোমার বউদি কাল যে লক্ষ্মীপুজোর বাতাসা প্রসাদ দিয়েছিল, তাই ছিল দুখানা—তাই দিয়েই করলাম, বেশ লাগল।.....

মেজদি আবার হাসিলেন। আবার নাক কুঁচকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া লইলেন। ভাবিয়াছিলাম, প্রত্যুত্তর না করিলে মেজদি বুঝি চলিয়া যাইবেন। কিন্তু মেজদি প্রত্যাশাভরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিতে হইল, চিনির অভাবে বাতাসা দিয়ে চা খেতে হল? চিনি আনিয়ে রাখেন নি কেন? কন্‌ট্রোলে তো চিনি দিচ্ছে আজকাল।

তা তো দিচ্ছে। আমাকে কে আর এনে দেবে, বল? নিজেকে গিয়েই তো আনতে হবে দোকান থেকে। যা ভিড়, দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে এলাম কাল।

কেন আপনার নাতিরা?

নাতিরা? তবেই হয়েছে। কি বললে জান আমার বড় নাতি? আমাদের কল থেকে জল নিও না, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে বুড়ি ডাইনী—এই সব কথা ভদ্দরলোকের ছেলেরা বলে কখনও তার ঠাকুমাকে? শুনেছ কখনও? ঘরের কথা কত আর বলি! ছেলে এই সব বলছে, আর তার মা ফিকফিক করে হাসছে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। দেখেছ কখনও এমন কাণ্ড?

মেজদির কথায় বিস্ময় খেদ ব্যঙ্গ যুগপৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঘোষাল মশায়ের উচিত নাতিদের শাসন করা।

তা করলে ভাবনা কি ছিল, উনি কিছু বলবেন না।

ইহার পরই মেজদির সুর বদলাইয়া গেল। ঘোষাল মশায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি ওকালতি শুরু করিলেন।

কি করেই বা বলবেন বল ভাই। শোকাতাপা মানুষ। বুড়ো বয়সে অত বড় ঘা খাবার পর কি আর শাসন করতে ইচ্ছে হয় কাউকে.....

মেজদি ঘাড় ফিরাইয়া বোধ হয় উদগত অশ্রুটাই গোপন করিতে চাহিলেন। পুত্রশোকে অশ্রুপাত করা এমন কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার নয়, কিন্তু মেজদি কিছুদিন হইতে অশ্রুটা গোপন করিতেছেন, কেন জানি না। বোধ হয় লোকের সহানুভূতি এড়াইবার জন্য। লোকের সহানুভূতি অনেক সময় বড় কষ্টদায়ক। কিছুদিন পূর্বে মেজদির উপযুক্ত পুত্রটি মারা গিয়াছে। বড় চাকরি করিত। বিধবা পুত্রবধূ এবং তাহার একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া প্রদ্যোত ঘোষাল বৃদ্ধ বয়সে সত্যই বড় বিপন্ন। তিনি নাতি-নাতনীদের শাসন করিতে পারেন না। পুত্রবধূকে কিছু বলা তাঁহার পক্ষে নাকি আরও কঠিন। তাহার বিধবা-মূর্তি দেখিলেই তিনি এমন অবসন্ন হইয়া পড়েন যে, তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। তাহার সমস্ত আবদার সহ্য করিতে হয়। সে শাশুড়ীকে অপমান করে, ডাইনী বলে, তাঁহাকে আলাদা হেঁসেল করিতে হইয়াছে, তাহার বাক্যের জ্বালায় মেজদির বাড়িতে টেঁকাও দুষ্কর, পথে পথে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, পাড়ার লোকে বলে—বউটা বিধবা হইয়া যেন সকলের মাথা কিনিয়াছে। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু চুপ করিয়া থাকেন। প্রাণ ধরিয়া কিছু বলিতে পারেন না। শুধু তাই নয়, যাহা কিছু উপার্জন করেন সব ওই পুত্রবধূকেই আনিয়া দেন। মেজদিকে বলেন, পয়সা নেড়ে-চেড়ে তবু যদি ভুলে থাকে থাক্—আহা!

ইহার পর মেজদি যে প্রসঙ্গটি তুলিয়াছিলেন, তাহা প্রবলভাবে যতীনের আবার মনে পড়িয়া গেল। যাইবার পূর্বে মেজদি বলিয়া গেলেন, যাই নীলিদের বাড়ি, দেখি সেখানে কতদূর কি হল, আত্মীয়-স্বজনরা তো কেউ আসবে না শুনছি। তুমি যাবে তো?......

আজ নীলার বিয়ে। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নীলা পাড়ার একটি বয়াটে ছোকরা প্রবালকে বিবাহ করিতেছে। আত্মীয়-স্বজনরা এতদিন নীলার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, কেহ তাহার সুশিক্ষার বা বিবাহের ব্যবস্থা করেন নাই, সকলের সঙ্গে যথেচ্ছ মিশিবার অবারিত সুযোগও দিয়াছিলেন। এখন সকলের মনে ধর্মভাব জাগিয়াছে। সগোত্রে বিবাহ তাঁহার কিছুতেই

হইতে দিবেন না। অতি-দূর-সম্পর্কে বিনয়বাবু বর্মা হইতে প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়া ভাগ্যে কিছুদিন পূর্বে ফিরিয়াছেন, তিনিই দাঁড়াইয়া বিবাহ দেওয়াইবেন। তাঁহার মতে ভ্রূণ-হত্যা করাটা বোকামি। বাঙালী হিন্দুরা যে জীবন-যুদ্ধে হটিয়া যাইতেছে, তাহার একটা কারণ—তাঁহার মতে—ভদ্র হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে। সংখ্যা বাড়িবে কি করিয়া? অধিকাংশ ভদ্র হিন্দু-নারীর জীবনই নিষ্ফল। যে সব শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজকে জীবনযুদ্ধের উপযোগী সমর্থ সন্তান দিতে পারেন, বিলাস ও স্বার্থপরতার কবলে পড়িয়া তাঁহারা বিলাতী উপায়ে জন্মনিরোধ করিতেছেন, কুমারীদের বিবাহ হইতেছে না, বিধবারা তো আছেই। ইহাদের মধ্যে দুই-একটা যদি জীবনের প্রাবল্যে সমাজের বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া ফলবতী হইতে চায়, মন্দ কি? বিনয়বাবুর ইহাই মত। নীলাকে তিনি সাহায্য করিবেন। আজই বিবাহ। যতীন নীলার কথাই ভাবিতে লাগিল—মনের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কত দিনের ঘটনা দুই মিনিটে ভাবিয়া ফেলিতে পারে। নীলা! নীলার রাজরাণী হইবার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু কাঙালিনীর মত সে সবার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে। আমার কাছেও আসিয়াছিল, আমিও তাহাকে লইয়া কবিতা লিখিয়াছি। শুধু আমি নয়, অনেকেই লিখিয়াছে। হয়তো বিনয়বাবুও। আমি শুধু কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, তাহাকে বিবাহ করিতেও চাহিয়াছিলাম। যদিও সে অন্য জাত, তবু বউদিদিদের দিয়া বাবার মত করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বড় বউদিদি বাবাকে কাশীতে পত্র লিখিয়াছিলেন। বাবা মত দিলেন না। তবু আমি নীলাকে চাহিয়াছিলাম...যাক সে কথা...একটা কথাই কেবল মনে হইতেছে, শেষ পর্যন্ত প্রবালের মত ছেলেকে ফাঁদে ফেলিয়া নীলাকে মাতৃত্ব অর্জন করিতে হইল! জীবনের প্রবাহকে তো কেহ রোধ করিতে পারে না। তুমি যদি অস্বাভাবিক আইনের বাঁধ তুলিয়া তাহাকে আটকাইতে যাও, বারম্বার সে ভাঙিয়া যাইবে। মানুষ নিজেকে ভুলাইতে গিয়া একটা কথা ভুলিয়া যায়—প্রকৃতি কোন বঞ্চনাকেই কখনও প্রশ্রয় দেয় না। তাহার নিয়ম অমোঘ, পরিণাম অব্যর্থ। আত্মবঞ্চনা শেষ পর্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে।...আত্মবঞ্চনার কথায় নিভাননীর কথা মনে পড়িতেছে। বিধবা নিভাননী। বছর দশেকের একটি ছেলে লইয়া সে খুড়ার আশ্রয়ে থাকিত। কিছুদিন পরে কানাঘুষা শোনা গেল, সে নাকি সন্তানসম্ভবা। সমস্ত চিহ্নও সর্বাঙ্গে ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। খুড়া মহাশয় বিচলিত হইলেন। খুড়ীমার মারফৎ সকলের সন্দেহটা নিভাননীর গোচর করিলেন। নিভাননী সোজা অস্বীকার করিল। বলিল, আমার পেটে মাংস বাড়িতেছে। কেন বাড়িতেছে, বলিতে পারি না। ডাক্তার ডাকা হইল। নিভাননী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ডাক্তার ডাকাইল। ডাক্তার যখন সত্য কথা বলিলেন, তখন নিভাননী হাসিয়া উঠিল। ডাক্তারে মুখের উপরই বলিল, আপনি কিছু জানেন না। খুড়া মহাশয় বিপন্ন হইলেন। তিনি ছাপোষা গৃহস্থ লোক। ঘরে কয়েকটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। একটা কেলেঙ্কারি হইয়া গেলে তিনি অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যাইবেন। তিনি নিভাননীকে দূর করিয়া দিলেন। নিভাননী আমাদের বাড়ির পাশের গোয়াল-ঘরটাতে আসিয়া আশ্রয় লইল। কাঁদিতে কাঁদিতে নয়, হাসিতে হাসিতে। অবুঝ শিশুর অসঙ্গত আচরণে বয়স্ক ব্যক্তি যে হাসি হাসে, নিভাননীর হাসিটা সেইরূপ। প্রথম হইতেই নিভাননী ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কোন সমালোচনা, কোন গালাগালি গায়ে মাখে নাই। কেন সে এরূপ করিয়াছিল, জানি না। নিজেই সে সম্ভবত ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার দশ বৎসরের ছেলে বিশুর পক্ষে ব্যাপারটা মর্মান্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মোটরে

চড়িয়া বড় ডাক্তার আসিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া মাকে যখন পরীক্ষা করিয়া গেল, তখন সে অবাক হইল। মায়ের কি হইয়াছে? সকলে বলিল, মায়ের অসুখ করিয়াছে। তাহার পর দাদু যখন মাকে দূর করিয়া দিলেন, মাকে একটা স্যাঁতস্যাঁতে পড়ো গোয়ালে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল, তখন বিশু কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ করেছে, তবু তোমায় দাদু তাড়িয়ে দিলে কেন মা? নিভাননী উত্তর দিল তোমার দাদুর মাথা খারাপ। তাহার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহাতেই দিন চলিতে লাগিল। বিশু যেমন স্কুলে যাইতেছিল, যাইতে লাগিল। স্কুলেরই একটি ছেলে আসল কারণটা একদিন তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। বলিল, তোর মাকে কেন তাড়িয়ে দিয়েছে জানিস? তোর মায়ের ছেলে হবে। বিস্মিত বিশু স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিভাননীকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা মা, অবুদা আজ বলছিল যে, তোমার নাকি ছেলে হবে। তাই দাদু তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ মা সত্যি? নিভাননী ছেলেকে ধমক দিল, না, মিছে কথা। ওসব ফাজিল ছেলের সঙ্গে মিশতে যাস কেন তুই?...যথাসময়ে নিভাননী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। পাড়ার লোকে দেখিতে আসিল। নিভাননীর লজ্জা নাই। সে যেন নিজেই সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্মিত হইয়াছে। সকলের সমক্ষেই সে দুই হাত জোড় করিয়া সদ্যোজাত শিশুটাকে প্রণাম করিল। তাহার পর সকলকে বলিল, এঁকে তোমরাও প্রণাম কর, ইনি যীশুখ্রীষ্ট। পাড়ার লোকেরা মুচকি হাসিয়া গা-টেপাটেপি করিতে করিতে চলিয়া গেল। নিভাননী আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া হয়তো আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু বিশু পারে নাই। একটা চিত্র মনে পড়িতেছে। স্কুলের সমস্ত ছেলেরা হাততালি দিতে দিতে সমস্বরে বলিতেছে, বিশুর মায়ের ছেলে হয়েছে—দুয়ো, দুয়ো...। বিপন্ন বিশু কোথায় যে মুখ লুকাইবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। নিভাননী পাগল নয়, পাগল হয়ও নাই। কাশীতে গিয়া সে সুখেই বাস করিতেছে শুনিয়াছি।....

এই পর্যন্ত ভাবিয়া যতীনের সহসা মনে হইল, এমনভাবে একটানা ভাবিয়া চলিয়াছি কেন? যাহা ভাবিতেছি, কাগজ কলম লইয়া তাহা লিখিয়া ফেলিলেই তো হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল, কত লিখিব? জীবনের প্রতি মুহূর্তে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, তাহার আলেখ্য আঁকিতে পারি, এত রঙ তো আমার নাই। এ নাটক যে মহা-নাটক! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ নাটকের দৃশ্যপট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত সমস্ত কিছুই ইহার পাত্র-পাত্রী। ইহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়?.....

বিস্ফারিত নয়নে সে খোলা জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বিস্তৃত নীলাকাশে সাদা মেঘের অপরূপ আস্তরণ। ওখানে কি অভিনয় হইতেছে? কে উহারা!....একটা অদৃশ্য নাটকের অদ্ভুত অভিনয় তাহার চোখের সম্মুখে মূর্ত হইতে লাগিল। এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই যে, সে নিজেও একজন অভিনেতা—অজ্ঞাতসারে অভিনয় করিতেছিল। এইবার সচেতনভাবে করিতে লাগিল।

গুনগুন করিয়া একটি ভ্রমর ঘরে ঢুকিল।

যতীন। এস নীল পরী।

ভ্রমর। [বিস্মিত] নীল পরী! সে আবার কি? এতকাল আমাকে ভ্রমর, অলি এই সব নামে ডাকতে, হঠাৎ আজ নূতন নাম কেন?

যতীন। পুরানো জিনিস বড় একঘেয়ে। নূতন নাম দিয়ে পুরাতনকে আধুনিক করবার চেষ্টা করেছি।

ভ্রমর। নাম বদলালেই আধুনিক হয় নাকি? আমার নাম বদলাবার দরকার নেই, আমি এমনিই আধুনিক, কতই বা আমার বয়স, একটিমাত্র বসন্ত তো উপভোগ করেছি।

বাহিরে কুড়ুরুক কুড়ুরুক শব্দে একটা পাখি ডাকিয়া উঠিল।

ভ্রমর। ওই শোন, আমাকে ডাকছে, আমি চললাম।

যতীন। প্রায়ই ওর ডাক শোনা যায়, কে বল তো?

ভ্রমর। পাখি।

যতীন। তা তো জানি। কি পাখি?

ভ্রমর। ওর বেশি আমিও জানি না। তোমরাই তো সবাইকে নাম দাও। তুমিই বল না, কি ওর নাম?

যতীন। ওর সঙ্গে তোমার খুব বন্ধুত্ব নাকি?

ভ্রমর। বন্ধুত্ব কাকে বলে? ও কথারও মানে বুঝি না। তবে ওঁকে ভাল লাগে—ছোট্ট সবুজ পাখিটি, কিন্তু গলায় কেমন সুর!

যতীন। আলাপও নেই?

ভ্রমর। না।

যতীন। তবে যে বললে, ডাকছে তোমাকে।

ভ্রমর। যা আমার ভাল লাগে, তাই আমাকে ডাকে, তার কাছেই আমি যাই। আলাপ থাকবার দরকার কি! তোমরা কথা বলে বড় সময় নষ্ট কর।

ইলেক্‌ট্রিক সুইচের ব্র্যাকেটের আড়ালে হইতে একটি টিকটিকি বাহির হইয়া আসিল এবং উদ্‌গ্রীব হইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ভ্রমরটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

যতীন। আমরা কথা কই, তোমরা গুনগুন কর। হঠাৎ এলে কেন বল দেখি?

ভ্রমর। তোমাদের খবর নিতে।

যতীন। কি খবর?

ভ্রমর। তোমাকে দেখতে পেলাম, এইতো একটা খবর।

চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল।

টিকটিকি। [নীরব ভাষায়, যতীনকে] ভোমরাটাকে কথায়-বার্তায় অন্যমনস্ক করে আমার দিকটায় আনতে পার একটু যদি—

যতীন। কেন, কি করবে?

টিকটিকি। খপ করে ধরব, তারপর চিবিয়ে খাব।

তাহার টুকটুকে লাল জিবটা বার দুই বাহির করিল।

যতীন। [স্বগত] কি ভয়ানক! [প্রকাশ্যে] ও আমার অতিথি, ওকে নাই বা খেলে।

টিকটিকি। আমিও তো তোমার অতিথি, আমার খাবার ব্যবস্থা কর তাহলে।

যতীন। আমার ঘরে এত জিনিস আছে, খাও না।

টিকটিকি। আমি পাঁউরুটিও খাই না, সিগারেটও খাই না, পোকা খাই। তোমার ঘরে কদিন থেকে আলো জ্বলছে না, পোকাও আসছে না, অনাহারে আছি।

ভ্রমর তাহার কথা শুনিতে পাইল কি না, বোঝা গেল না। অন্তত তদনুসারে সে কিছু করিল না। ঘরের চতুর্দিকে গুনগুন করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তাকের উপর একটা 'টাইম্‌পিস' ছিল, সেইটাই সম্ভবত তাহার কৌতূহল বেশি উদ্রিক্ত করিয়াছিল, সেইটাকে সে বারম্বার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

টিকটিকি। ভোমরার প্রতি তোমার যে বেশি পক্ষপাতিত্ব, তা আমি আগে থেকেই জানি। অতিথি-সৎকারের বড়াই করলে কিনা, তাই বাজিয়ে দেখলাম একবার।

যতীন। হ্যাঁ, সত্যই তাই, কেন বল তো?

টিকটিকি। তোমাদের মতে ও যে সুন্দর, [সশ্লেষে] মানুষের বিশেষত্বই তো ওই। পক্ষপাতিত্ব। তারা সাম্যের ভান করে, কিন্তু কিছুতেই সম-দৃষ্টি হতে পারে না।

যতীন। তোমাদের কাছে সুন্দর কুৎসিত বলে কিছু নেই নাকি?

টিকটিকি। আমাদের কাছে যা প্রয়োজনীয়, তাই সুন্দর। ওই ভোমরাটা আমার চোখেও সুন্দর, কিন্তু খাদ্য-হিসাবে। আমার সঙ্গিনী—কোথায় গেল সে—তাকে দেখলে তুমি ঘৃণায় আঁতকে উঠবে। আমার চোখে কিন্তু সে রমণীয়। তোমার এই কাঠের ব্র্যাকেটটিও বেশ সুন্দর, এর ফাঁকে বেশ নিরাপদে ঘুমুতে পারি। প্রয়োজনের বাইরে তোমরা কেন যে আর এক দল সুন্দর কুৎসিত সৃষ্টি করে অকারণে পক্ষপাতিত্ব কর, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

অশরীরী ফ্রয়েড প্রবেশ করিলেন।

অশরীরী ফ্রয়েড। মানুষের সৌন্দর্যবোধের মূলেও প্রজন্ম-স্পৃহা বর্তমান।

টিকটিকি। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি?

যতীন। তাহলে টিকটিকির আমাদের মত সৌন্দর্যবোধ নেই কেন?

অশরীরী ফ্রয়েড। ওর প্রজনন-স্পৃহা লুকিয়ে রাখবার দরকার হয় না। সভ্য মানুষই তা লুকিয়ে রাখে এবং রূপান্তরিত করে প্রকাশ করে সেটা বহু বাসনায়, বহু ভঙ্গীতে, বহু বৈচিত্র্যে—কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে।

যতীনের তর্ক করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই অশরীরী ফ্রয়েড অন্তর্হিত হইলেন। লোকটাকে কাঠখোট্টা বলিয়া মনে হইল। ভ্রমর উড়িয়া টিকটিকির সামনে আসিল এবং তাহার লোলুপ চোখের সামনে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতে লাগিল। ভাবটা যেন—ধর না দেখি, ধর না দেখি! মনে হইতে লাগিল, সে যেন যতীনের সহিত টিকটিকির কথাবার্তা সব শুনিয়াছে।

ভ্রমর। [যতীনকে] ভারি ভীতু লোক তো তুমি। কি বলে ওই ঘৃণা টিকটিকিটাকে আমার জন্যে অনুরোধ করলে! ওদের কি আমরা গ্রাহ্য করি নাকি?

যতীন। কর না?

ভ্রমর। বাঃ দেখছ না, আমাদের ডানা আছে যে।

বাহিরের আবার কুড়ুরুক কুড়ুরুক শব্দ হইল।

ভ্রমর। আমি চললাম।

বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। যতীনের মনে হইল টিকটিকির দেহ হইতে একটা রক্তবর্ণ দন্তুর ছায়া ডানা মেলিয়া ভ্রমরের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যতীন দেখিল, কায়াবান টিকটিকি বেশ হাসিমুখে বসিয়া আছে।

টিকটিকি। ডানার গুমরে কিন্তু একটা কথা ভুলে গেল বেচারী। ওই ডানা-ওয়ালাদেরই রোজ আমরা খাই।

যতীন। সেটা ওরা আলো দেখে তন্ময় হয়ে পড়ে বলে। ওতে তোমাদের কৃতিত্ব তেমন নেই।

টিকটিকি। তোমরা যখন আলো জ্বালতে শেখ নি, তখনও আমরা পোকা ধরেই খেতাম। অনাহারে থাকি নি কখনও। তবে তোমাদের আলোতে আমাদের সুবিধে হয়েছে, তা অস্বীকার করছি না। আলো জ্বাললেই ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে ওরা। আচ্ছা, আলো জ্বালছ না কেন আজকাল?

যতীন। ডাক্তারের মানা। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, তাই তিনি আলো জ্বালতে বারণ করেছেন।

টিকটিকি। এ আবার কি বেয়াড়া চিকিৎসা! আলো না জ্বেলে ঘুম হচ্ছে?

যতীন। না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে যতীন চমকাইয়া উঠিল। ইলেকট্রিক টেবিল-ল্যাম্পটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত নগ্না তরুণীটির দিকে যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। উত্থিত বাহুর উপর ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বটা দীপ্তিহীন ম্রিয়মাণ। তরুণীটির চোখের দৃষ্টিও বেদনাময়, কিন্তু অগ্নি-গর্ভ।

যতীন। তুমি দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেললে?

প্রস্তর-তরুণী। হ্যাঁ।

যতীন। কেন?

প্রস্তর-তরুণী। বাইরে থেকে মনে হয়, আমি তোমার রাতের অন্ধকারকে আলোকিত করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমার ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুতে যে প্রদীপ দিয়েছ, তা তোমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জ্বলে নেবে। সুইচ তোমাদের হাতে। আমি সামান্য জড়, [সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে] জড় করে রেখেছ আমাকে।

যতীন। কে বললে, তুমি জড়? আমি জানি, তোমার দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে বহ্নিকণা আবর্তমান, তুমি নিজেকে জড় বলে ভাবছ কেন?

প্রস্তর-তরুণী। তোমার ভাষার ছটায় বহ্নিদীপ্তি আছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সম্বন্ধে যখন কথা বল তখন সেটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাও জানি। আমাদের মধ্যে যে বহ্নি আছে তা তোমাদেরই প্রদীপ্ত বর্ণনায় শুনেছি, নিজের মধ্যে তা অনুভব করবার সুযোগ দাও নি কখনও। রক্ষা করেছ, বন্দনা করেছ, দলিত করেছ, সত্যিকার স্বাধীনতা দাও নি।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক ঠিক।

চতুর্দিকে কেমন যেন ঝাপসা হইয়া আসিল। সেই স্বল্পান্ধকারে অশরীরী সীতা, অহল্যা, দ্রৌপদী ও জোয়ান অব আর্ক প্রবেশ করিলেন।

সীতা। আমি আজও পাতালে আছি।

অহল্যা। আমারও পাষাণত্ব ঘোচে নি এখনও। গৌতমের দাসী ইন্দ্রের অনুগৃহিতা পৌরাণিক কল্পনাটাই রামচন্দ্রের পদস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছিল, আমি নয়।

দ্রৌপদী। কৌরবের রাজসভায় দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করে উলঙ্গ করবার চেষ্টা করেছিল, দুর্যোধন উরু দেখিয়েছিল, খলখল করে হেসে উঠেছিল কর্ণ, তবু আমি আত্মরক্ষা করতে পারি নি। আমি যে অপমানিতা, তা প্রমাণ করবার জন্যে ধর্মরাজের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছে। প্রতিশোধকামনায় কাঁদতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কাছে, শরণাপন্ন হতে হয়েছে অর্জুনের, উত্তেজিত করতে হয়েছে ভীমকে। কুরুক্ষেত্রের সমরানলে যা প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, তা পৌরুষের অহঙ্কৃত বহ্নি। তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন জেনেছি, আসলে তা নারীর আত্মসম্মানের চিতা। দুঃশাসনের তপ্ত-শোণিতে বেণী বন্ধন করেছিলাম, কিন্তু দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন ভীম, আমি নয়। আমার অন্তরের জ্বালা প্রদীপ্ত করেছে পুরুষকে, আমি শুধু হাহাকার করেছি।

জোয়ান অব আর্ক। তা ছাড়া আমরা আর কিছু পারি না বোধ হয়। আমি যুদ্ধে নেবেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় পুড়িয়ে মেরে ফেললে। এখন মনে হয়, ওদেরই আগুন আছে, আমাদের আছে বোধ হয় শুধু দেহটা। পুরুষ সৈনিকদের মনে আমার জীবন্ত যৌবনের স্পর্শ যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তা আমার আগুন নয়, আমার প্রভাব। আমার শীতল প্রস্তরমূর্তিটা আজও সে প্রভাব বিকীর্ণ করছে ক্ষীণভাবে। আমরা কেউ নই। আমরা পুরুষদের মনে যে ভাব জাগাই, তাই আমাদের পরিচয়।

পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে স্খলিত-চরণা গান্ধারী প্রবেশ করিলেন।

গান্ধারী। অন্ধকার, চতুর্দিক অন্ধকার...চোখের কাপড়টা সরাতে পারছি না.....মনের সামনেও অন্ধকার যবনিকা দুলছে......

যতীন। কিন্তু আপনারা যে স্বাতন্ত্র্য কামনা করছেন, তা পেলেই কি সুখী হতেন? বলুন না, কি চান আপনারা?

কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সকলে চলিয়া গেলেন। এতক্ষণ যে পাখির করুণ কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে উক্ত দৃশ্যের পটভূমিকা রচনা করিতেছিল তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ফটিক জল—ফটিক জল—ফটিক জল। মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহা বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল।

যতীন। ফটিক জল কি জিনিস বল তো? দেখেছ কখনও?

পাখির সুর। চোখে দেখি নি, স্বপ্নে দেখেছি।

যতীন। কি রকম শুনি?

পাখির সুর। স্বচ্ছ কঠিন পাথরের বুকের ভিতর টলমল করছে তরল জ্যোতির বিন্দু।

যতীন। তাই চাও তুমি?

পাখির সুর। অন্য কিছুতেই তৃপ্তি নেই।

টিকটিকি। ওসব কবিত্ব অনেক শুনেছি দাদা। আমি নিজে তোমায় পুকুরের জল খেতে দেখেছি। সত্যি কথা হচ্ছে, পিপাসার সময় যে কোনও জলই ফটিক জল, ক্ষুধার সময় যে কোনও খাদ্যই সুখাদ্য।

পাখির সুর। সুখাদ্য নয়, খাদ্য। ওই সুর-ই তো স্বপ্ন সৃজন করে। তাই তো মাটি ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে উড়েছি।

টিকটিকি। [সশ্লেষে] ঠিক ঠিক।

প্রস্তর-তরুণীর দীর্ঘনিঃশ্বাস আবার শোনা গেল। যতীন তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল এবং নির্নিমেষ হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, প্রস্তর ভেদ করিয়া অশরীরী নীলা বাহির হইয়া আসিতেছে। যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। পাখির সুর ধীরে ধীরে বাতায়ন-পথে বাহির হইয়া গেল।

নীলা। যতীনদা, আমি এসেছি।

যতীন। নীলা!

নীলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের দৃষ্টিটা শুধু বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। তাহা যেন নীরবে বলিল, হ্যাঁ, ভাল করে চেয়ে দেখ, আমি নীলাই।

যতীন. তোমার আজ বিয়ে না?

নীলা। হ্যাঁ।

যতীন। তবে এলে যে এখন?

নীলা। ক্ষমা চাইতে এসেছি।

যতীন। [সবিস্ময়ে] কিসের ক্ষমা!

নীলা। এতদিন তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি বলে।

যতীন অধীর হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু নীলা তাহাকে থামাইয়া দিল।

নীলা। প্রতিবাদ করো না, তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি, আমাকে বলতে দাও। হ্যাঁ, প্রলুব্ধ করেছি,—ইচ্ছে করে নানা ছলে তোমাকে আমি প্রলুব্ধ করেছি এতদিন। কিন্তু এইবার সব শেষ। হাসি কথা রূপ যৌবনের মায়ালোক সৃষ্টি করে তোমাকে আকুল করে তুলেছিল যে নীলা, তার মরণ ঘনিয়ে এসেছে এবার। মৃত্যুর নিবিড় অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যাবার আগে তাই যে ক্ষমা চাইতে এসেছে। তোমাকে ঠকিয়েছিলাম। তোমার মুগ্ধ কল্পনায় যে লোলুপ আশা মূর্ত করে তুলেছিলাম, তা পূর্ণ করবার সামর্থ্য আমার নেই। কোনদিনই ছিল না। রাঙতা-মোড়া যে জিনিসটা দেখে তুমি প্রলুব্ধ হয়েছিলে, তা মাটির ঢেলা, সন্দেশ নয়। আমি আলো নয়, আলেয়া। [হাসিয়া] অদ্ভুত মনে হচ্ছে না? মরীচিকা ক্ষমা চাইছে পথ-ভ্রান্ত পথিকের কাছে! কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি মরীচিকাই—এই আমার স্বরূপ—আমি অন্যরকম হতে পারতাম না। ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার আছে, কারণ আমি নিজেকে জেনেছি এবং অপকটে স্বীকার করেছি সব। আমি যা করেছি, তা অনিবার্য ছিল আমার পক্ষে। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

যতীন। ক্ষমা করবার কোনও প্রশ্ন তো ওঠে না নীলা। আমিও তো তোমাকে ভোলাতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, দুজনে মিলে এক অপূর্ব স্বর্গলোক সৃষ্টি করব এই মাটির পৃথিবীতে। কল্পনা করেছিলাম, আমাদের নন্দনকাননে যে পারিজাত ফুটবে তার পাপড়িতে থাকবে তোমার রূপ, পরাগে থাকবে আমার সৌরভ—যে সঙ্গীত মূর্ত হয়ে উঠবে আমি হব তার কথা, তুমি হবে তার সুর। তুমি যদি আসতে, এ স্বর্গ সম্ভব করে তুলতে পারতাম। তুমিই তো এলে না। তুমি যদি আসতে, সকলের অমতেও আমি বিয়ে করতাম তোমায়।

নীলা। আসি নি তার কারণ নিজেকে আমি চিনি। আমাকে বিয়ে করলে তোমার বাবা তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করতেন। আমি জানি, আমাকে নিয়ে দারিদ্র্য বরণ করতেও আপত্তি ছিল না তোমার, কিন্তু নিজের নিঃস্বতায় ভয় পেয়ে গেলাম। আমার কি আছে যে তোমাকে দেব, তোমার স্বর্গসৃষ্টির কণামাত্র উপকরণও যে আমার মধ্যে নেই। যৌবনের জোয়ার যখন নেবে যাবে তখন শিথিল-পেশী এই দেহপিণ্ডটার মধ্যে কাদা আবর্জনা ছাড়া যে আর কিছুই থাকবে না। দারিদ্র্যের মধ্যে সেই ক্লিন্ন গ্লানি নিয়ে তুমি যে স্বর্গসৃষ্টি করতে পারবে না তা আমি জানতাম, তাই আসি নি।

যতীন। কিন্তু প্রবালের কাছে তো গেছ, সেও তো দরিদ্র?

নীলা। প্রবাল স্বর্গসৃষ্টি করতে চায় না, আমাকে চায়—মানে, আমার এই দেহটার বেশি আর কিছু কাম্য নেই তার। আমিও আমার দেহটার বেশি আর কিছুই নই। সে যা চেয়েছে তাই পাবে, ঠকবে না।

যতীন। কিন্তু নীলা সত্যিই কি তুমি দেহটা ছাড়া আর কিছু নও? তুমি যা এতক্ষণ বললে, তা কি একটা মাংসপিণ্ড উক্তি?

নীলার ঠোঁট দুইটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। যতীনের ভয় হইল, চোখের কোণে এইবার জল দেখা দিবে বুঝি। কিন্তু জলের বদলে আগুন দেখা দিল।

নীলা। মাংসপিণ্ডের একটা বক্তব্য থাকতে পারে বইকি। তোমর মুখেই একদিন শুনেছিলাম যে জড়ের মধ্যেও বিদ্যুৎ আছে, তারও প্রতি পরমাণুতে সৌরজগতের বহ্ন্যুৎসব বর্তমান। মাংসপিণ্ডও বিদ্যুৎ-পিণ্ড, তার বক্তব্যও চমকপ্রদ হওয়া অসম্ভব নয়। আমি কিন্তু চমকপ্রদ কিছু করতে আসি নি, ক্ষমা চাইতে এসেছি। তুমি ক্ষমা করেছ, এইটুকু জানতে পারলেই চলে যাব।

যতীন। ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠছে কি করে, তাই আমি বুঝতে পারছি না। তোমাকে আমি চেয়েছিলাম, পাই নি। তুমি যাকে বেছে নিয়েছ, সে যে কিসে তোমার যোগ্য, তাও আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি একটা প্রহেলিকার মধ্যে দিশাহারা হয়ে আছি, ক্ষমা করার কোনও সঙ্গতি তো আবিষ্কার করতে পারছি না। তুমি সহজ ভাষায় আমাকে বল, কেন তুমি আমাকে চাও নি, কেন তুমি সকলের দ্বারে দ্বারে রূপ-যৌবনের পণ্যপসরা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে, কেনই বা অবশেষে আত্মসমর্পণ করলে প্রবালের কাছে?

টিকটিকি। [জনান্তিকে, ফিসফিস করিয়া] এস এস, এইবার এস। ভেঙে দাও হাঁড়িটা হাটের মাঝখানে।

বিরাট একটা মুণ্ডু বাতায়ন পথে প্রবেশ করিল। আকর্ণবিস্তৃত মুখ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণ দাঁত, লালায়িত রসনা, দুই কশ বাহিয়া লালা ঝরিতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি লোলুপ। নীলা তাহাকে দেখিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল।

যতীন। [চমকাইয়া] কে তুমি?

আগন্তুক মুণ্ড। আমি লোভ, [নীলাকে দেখাইয়া] ওর লোভ। আমিই ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছি। হি-হি-হি-হি...শাড়ি গাড়ি গয়না.....হি-হি-হি...বড় চাকরি, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা...রুই কাতলা গাঁথবার চেষ্টায় ছিল....হি-হি....পারলে না, টোপ গিললে না কেউ.....তুমি গিলেছিলে, কিন্তু তোমার বাবা ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলাতে ভেস্তে গেল সব....বঁড়শি খুলে নিয়ে অন্য ঘাটে ছিপ ফেলতে হল আবার....হি-হি-হি....

যতীন। প্রবাল তো রুইও নয়, কাতলাও নয়!

লোভ। মাছই নয়—কাদা। সেখানে গিয়েছিলেন নাচতে—হি-হি...পিছলে গেলেন, এঁটেল মাটির চটচটে কাদা মাখামাখি হয়ে গেল সর্বাঙ্গে, লুকোবার আর উপায় রইল না ধরা পড়ে গেল। আহা! বড় সাধ ছিল—শাড়ি গাড়ি গয়না—তিন সেট গয়না—ব্যাঙ্কে মোটা টাকা—প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি— গেটে দারোয়ান থাকবে...হি-হি—

লালায়িত রসনা বাহির করিয়া উপরের ও নীচের ঠোঁট বীভৎসভাবে চাটিতে লাগিল। মুখে অদ্ভুত হাসি। যতীন নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। লোভ ধীরে ধীরে বাতায়ন-পথে বাহির হইয়া গেল। যতীন নীলার দিকে ফিরিয়া দেখিল, তাহার চোখে মুখে আগুন জ্বলিতেছে।

নীলা। শুনলে তো, তোমার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারি নি বলে তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম।

যতীন। বুঝতে পারলাম না।

নীলা। জীবনে আমার যা কাম্য, তা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল তোমার বাবার টাকায়। পিতৃধনবঞ্চিত তোমার উপর আমার কোন ভরসা ছিল না।

যতীন। কেন, তুমি কি মনে কর, আমি কিছু রোজগার করতে পারব না?

নীলা। পারতে, যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মাতে। তখন তোমার এম.এ ডিগ্রীর বাজার-দর ছিল, এখন কিছুই নেই। ক্ষুদিরাম যেদিন মজঃফরপুরে বোমা ফেললে, সেইদিন থেকেই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর কপালে ফাটল ধরল—এ কথা তো তোমার মুখেই শুনেছি। সুতরাং তোমার উপর নির্ভর করব কোন্ আশায়?

যতীন। চাকরি পাব না তা ঠিক, করবারও ইচ্ছে নেই, কিন্তু এমন অনেক স্বাধীন ব্যবসা আছে, যা ঠিকমত করতে পারলে অনেক উপার্জন করা যায়।

নীলা। সেটা অনিশ্চিত । অত সবুর আমার সইত না।

যতীন। শাড়ি-গয়নাটাই তোমার কাছে বড় হল নীলা? ভালবাসাটা তোমার কাছে কিছু নয়?

নীলা। [সবিস্ময়ে] কে বললে, আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম? আমি তো তোমায় ভালবাসি নি, আমি তোমায় ভুলিয়েছিলাম।

যতীন। কিন্তু বেশ মনে পড়ছে, তুমি নিজের মুখে একদিন বলেছিলে যে, আমায় ভালবাস।

নীলা। তখনই তোমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলে না কেউ কখনও।

যতীন। কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবেসেছিলাম, সেটা তো তোমার অজ্ঞাত ছিল না, তার কি কোনও মূল্য নেই?

নীলা। মূল্য আছে, কিন্তু নিছক ভালবাসাকে মূল্য দিতে হলে অন্তত ডজন খানেক ভালবাসাকে মূল্য দিতে হয়। ঘেয়ো কুকুরের পিছু পিছু একপাল মাছি যেমন ভনভন করে ওড়ে, রূপসী যুবতীর পিছু পিছু উড়ে বেড়ায় তেমনই একপাল ভালবাসা। তার মধ্যে কোন্টা স্বর্গীয় কোন্টা পার্থিব তা বিচার করবার প্রবৃত্তিও থাকে না, সামর্থ্যও থাকে না। আর্থিক মাপকাঠি দিয়েই মাপতে হয় তাদের।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক। ঘেয়ো কুকরের উপমাটা কিন্তু ঠিক হল না। বলা উচিত ছিল, কার্তিক মাসে কুক্কুরী যেমন বলিষ্ঠতম প্রণয়ীর কাছেই আত্মসমর্পণ করে, আমিও তেমনই মালা দিতে চেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠ ধনীর গলায়, কারণ বর্তমান যুগে অর্থই শক্তি। ভাল করে গুছিয়ে বল।

যতীন। [নীলাকে] ছি ছি, তোমারও ওই মত নাকি?

নীলা। [নির্বিকারভাবে] সন্দেহ করছ কেন?

যতীন। ভালবাসার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ঐশ্বর্যই একমাত্র কাম্য তোমার জীবনে? উচ্চতর আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই?

নীলা। আছে কি না জানি না। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মনের ভিতর কোন উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আছে কি না তা অনুসন্ধান করবার অবসর পাই নি এখনও।

যতীন। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ঐশ্বর্যই চাই? সাধারণ খাদ্য-পানীয়ে তা মিটবে না?

নীলা। না। আমি যে অসাধারণ। তুমিই তো একদিন বলেছিলে, আমি কোহিনূর। যেখানে সেখানে কি কোহিনূর মানায়? তার স্থান স্বর্ণমুকুটের মাঝখানে, পচা আঁস্তাকুড়ে নয়।

যতীন। আঁস্তাকুড়ের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করতে এসেছ কেন তবে?

নীলা। আমরা যে মায়ের জাত, আঘাত পেয়ে কেউ যখন 'উহুহু' করে ওঠে, তখন আমরা থাকতে পারি না, ছুটে যাই। এ ক্ষেত্রে আরও বিশেষ করে এসেছি, কারণ আঘাতের হেতু আমিই। তাই ক্ষমা চাইছি। তোমার গলায় মালা দিতে পারি নি বলে তোমার ব্যথাতেও হাত বুলিয়ে দিতে পারব না? সে অধিকার যে সব মেয়েরই জন্মগত অধিকার।

যতীন। [হাসিয়া] আঁস্তাকুড়ে এসে কেন অপবিত্র করছ নিজেকে। আমার কোনও আঘাত লাগে নি, যাও তুমি।

নীলা। সত্যি লাগে নি? [হাসিয়া] তোমাদের শিশুত্ব কোনকালে ঘোচে না, আশ্চর্য! একটা অদ্ভুতরকম অবাস্তব লোকে বাস কর তোমরা। কাব্যের ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে তোমরা উন্মত্ত, কিন্তু বাস্তবজীবনে তার সামান্য ছোঁয়াচটুকু পর্যন্ত সইতে পার না।

যতীন। পারি কি না, তা জানবার সুযোগ তো তোমার হল না। সাহস করে যদি আসতে, আসল পরিচয় পেতে পারতে হয়তো।

নীলা। বরাবর অমনই ভদ্র পোশাকী ভাষায় আহ্বান করেছ বলেই আরও যেতে পারি নি। ভয় হয়েছে, বাইরের ওই রঙিন লেফাফাটার ভিতরে হয়তো শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

সহসা সমস্ত অবলুপ্ত হইয়া গেল। অপূর্ব দিব্য আলোকে চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বাতায়ন-পথে যতীন দেখিতে পাইল, অদূরে মহাগিরি রৈবতক। দেবার্চনা সমাপন করিয়া বাসুদেব-দুহিতা সুভদ্রা গিরি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তিনি সচকিত হইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন...দূরাগত অশ্বক্ষুরধ্বনি পার্বত্য শান্তি বিঘ্নিত করিতেছে...এক অশ্ববাহিত রথ প্রচণ্ড বেগে রৈবতক অভিমুখে আসিতেছে...দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল...সুবর্ণ কিঙ্কিণী-জালালঙ্কৃত প্রজ্বলিত হুতাশনকল্প দিব্যরথ....রথে বসিয়া আছেন মহাবীর অর্জুন....ক্ষাত্রবীর্যের মূর্ত প্রতীক...চোখের দৃষ্টি নির্ভয় একাগ্র...পরিধানে কবচ, বর্ম, অঙ্গুলিত্রাণ। আশায় আশঙ্কায় আনন্দে উত্তেজনায় সুভদ্রা শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু চীৎকার করিলেন না, পলায়নও করিলেন না....মুহূর্তমধ্যে নিকটবর্তী হইল....অর্জুন রথ হইতে নামিয়া সুভদ্রাকে রথে তুলিয়া বায়ুবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন....অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিজালের দিকে যতীন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল....তাহার পর একটা কোলাহলও শোনা গেল......ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ আস্ফালন করিতেছেন....তাহাও ক্রমশ থামিয়া গেল.....দিব্য আলোক অন্তর্হিত হইল....। যতীন দেখিল, নীলা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

নীলা। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] যদি আমাকে সবলে অধিকার করে অভিমন্যুজননীর মর্যাদা দিতে পারতে, তাহলে এ দুর্দশা হত না আমার। বীরভোগ্য আমরা, তোমাদের অক্ষমতায় আজ বর্বরভোগ্যা হয়েছি। আমার উপর রাগ করো না যতীনদা, আমার ব্যথাটা বোঝবার চেষ্টা কর। চললাম।....

অশরীরী নীলা অন্তর্হিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্যক্তিটি প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মূর্তি ভয়ঙ্কর। আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ কৃষ্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল কৃষ্ণ কুঞ্চিত রোমে সমাচ্ছন্ন। চক্ষু দুইটি অতিশয় প্রদীপ্ত। মনে হইতেছে, দুইটি হীরকখণ্ড যেন কালো মখমলের আবেষ্টনীতে জ্বলিতেছে। আগন্তুকই প্রথমে কথা কহিলেন।

আগন্তুক। আমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। পাছে ভুল বোঝ, তাই আমাকে আসতে হল। অর্জুন যা করেছিল, তা সেকালে নিন্দনীয় ছিল না। শোলার টোপর পরে বিয়ে করা এখন যেমন তোমাদের বর-ধর্ম, নারী হরণ করে বিয়ে করাটা তেমনই সেকালের বীর-ধর্ম ছিল। সুভদ্রা-হরণের প্রলুব্ধ হবার আগে অর্জুন হতে হবে, এই কথাটা মনে করিয়ে দিতেই আমি এসেছিলাম।

অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

টিকটিকি। [হাসিয়া] লোকটা ভারি বেরসিক তো, সব ভেস্তে দিয়ে গেল!
যতীন। তুমি কি ভেবেছিলে, আমি নারীহরণ করতে চাই!
টিকটিকি। লুণ্ঠনের সপক্ষে একটা যুক্তি পেয়ে মনে মনে একটু খুশি হয়ে উঠেছিলে বইকি। তোমাদের ওই যে এক মহদ্দোষ, পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ।
যতীন। ওটা দোষ নয়, গুণ। মনুষ্যত্বের লক্ষণ। নিছক পশুর মৌখিক লজ্জা থাকে না।
টিকটিকি। থাকবার দরকার কি, তাও তো বুঝি না।

অশরীরী ডারবিন আবির্ভূত হইলেন।

ডারবিন। মনুষ্যনামধেয় পশুর জীবনযুদ্ধে ওইগুলোই দামী উপকরণ। লজ্জা, ক্ষমা, অহিংসা অর্থহীন মানস-বিলাস নয়, নিপুণ যোদ্ধার উৎকৃষ্ট অস্ত্র ওগুলো। নখদন্তেরই বিবর্তিত রূপ।

এ বিষয়ে যতীনের মন বহু দিন হইতেই প্রশ্নাকুল ছিল। সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না।

যতীন। আমার একটা কথার জবাব দেবেন?
ডারবিন। কি বল?
টিকটিকি। [অর্ধস্বগত] ক্রমাগত দেড়ে লোকের আমদানি হতে লাগল। সরে পড়া যাক।

টিকটিকি ধীরে ধীরে ব্র্যাকেটের অন্তরালে আত্মগোপন করিল।
যতীন। লজ্জা, ক্ষমা, অহিংসা এই সব বির্বতিত অস্ত্র নিয়ে কি মানুষ শেষ পর্যন্ত জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে?
ডারবিন। [হাসিয়া] তা ঠিক জানি না। মানে, জীবনটা যে কতদূর বিস্তৃত দেহের সীমা ছাড়িয়েও তার অস্তিত্ব আছে কি না, থাকলেও কতদূর আছে, তা এখনও ঠিক করতে পারি নি আমি। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, সব মানুষ একজাতের নয়, সব অস্ত্রও সকলের জন্য নয়। মনুষ্যত্বেরও নানা স্তর আছে, প্রত্যেক স্তরের আকাঙ্ক্ষা-আদর্শও ভিন্ন, অস্ত্র-শস্ত্রও ভিন্ন হতে বাধ্য। তা ছাড়া অস্ত্র পেলেই তো ব্যবহার করা যায় না। তার জন্যে শিক্ষা চাই, সাধনা চাই,

স্বাভাবিক প্রবণতাও চাই। বোলতা তার হুলকে কাজে লাগায়, তুমি সে হুল হাতে পেলেও তেমন ভাবে ব্যবহার করতে পার না, তোমার বন্দুকও বোলতার কাছে অর্থহীন। মানুষদের মধ্যেও ঠিক তেমনই। অহিংসা একজনের কাছে শক্তি, আর একজনের কাছে অক্ষমতা।

বাতায়ন-পথে একটা দমকা হাওয়া ঢুকিল। ডারবিন চলিয়া গেলেন। খবরের কাগজটা টেবিলে হইতে উড়িয়া গেল। ফুলের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরিয়া উঠিল। যতীন খবরের কাগজটা তুলিয়া দেখিল, বলিষ্ঠ ঝাঁকড়া-চুল-ওয়ালা একটি দৈত্য ফুটফুটে সুন্দরী একটি মেয়েকে কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটিকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দৈত্যটা মাথা নাড়িয়া এক ঝটকায় চুলগুলো চোখমুখ হইতে সরাইয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত, তাহা হইতে শিশুসুলভ সরলতা যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। আকৃতিতে দৈত্য হইলেও; প্রকৃতিতে সে যেন ওই ছোট মেয়েটির সঙ্গী।

দৈত্য। যাঃ চলে—এ কোথায় এসে পড়লে: বললাম, চল্ মাঠের মাঝখান দিয়ে হু হু করে ছুটে গঙ্গার চর পেরিয়ে, ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, সাত তেরো নদীব ওধারে গিয়ে খবর নিয়ে আসি। ঘরের কোণে ঢুকলি কেন?

মেয়েটি। দাঁড়াও না, খুঁজে নিই এখানটা। শুনলে তো, এই ঘরেই ঢুকেছিল।

দৈত্য। নে তাহলে চটপট। উফ্—দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে।

হাত দিয়ে নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল।

মেয়েটি। [যতীনকে] ভোমরা এসেছিল এখানে?

যতীন। এসেছিল একটু আগে। এখন তো নেই।

মেয়েটি। কোথা গেল বলতে পার?

যতীন। ওই জানলা দিয়ে তো বেরিয়ে গেল। ভোমরা খুঁজছ কেন?

মেয়েটি। ফুল ডেকেছে তাকে। অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি। জামগাছের কোটরে তার বাসা, সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, বেরিয়ে গেছে। মাঠের মাঝে বাবলা-বুড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে, এই দিকে উড়ে এসেছে। তারপর দেখা হল গঙ্গাফড়িঙের সঙ্গে, তোমার বাগানে রঙ্গনগাছের উপর বসে আছে, সে বললে, ঢুকেছে তোমাব ঘরে। তুমি বলছ, জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। [সন্দিগ্ধভাবে] কোথাও লুকিয়ে রাখ নি তো?

যতীন। না।

মেয়েটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটির দিকে চকিতে একবার চাহিয়া দৈত্যটাও ঘাড় ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিল।

দৈত্য। [মেয়েটিকে] চেয়ার টেবিল খাট বিছানা উলটে দিই? দেখবি খুঁজে? জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করবার দরকার কি? দেব?

মেয়েটি। [ধমক দিয়া] না। ভদ্রলোকের বাড়িতে গুণ্ডামি করতে হবে না। তা ছাড়া ওলটপালট করে দিলেই কি খোঁজা হয়?

দৈত্য সঙ্গে সঙ্গে ভালমানুষের মত মুখ ফিরাইয়া হাত দিয়া নিজেকে আবার বাতাস করিতে লাগিল।

মেয়েটি। [যতীনকে] কিছু মনে করো না তুমি, ওর স্বভাবই ওই রকম দুরন্তপনা করা।
যতীন। ও কে?
মেয়েটি। ও? ও আমার বাহন। [হাসিয়া] ওর অনেক নাম।

যতীন সবিস্ময়ে দৈত্যটার দিকে চাহিয়া রহিল। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও তাহার মনের কথা চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দৈত্যও তাহার দিকে চাহিয়াছিল। দৈত্যের মনের ভাবও তাহার চোখের দৃষ্টিতে মূর্তি পরিগ্রহ করিল। টিকটিকি সন্তর্পণে ব্র্যাকেটের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

যতীনের মনের ভাব। কি আশ্চর্য, তোমার মত একটা লোক এমন সুন্দরী মেয়ের বাহন!
দৈত্যের মনের ভাব। ওকে বহন করবার একমাত্র অধিকার আমারই আছে।
যতীনের মনের ভাব। কেন?
দৈত্যের মনের ভাব। কারণ আমার শক্তি আছে। শক্তিমানই সৌন্দর্যকে বহন করবার অধিকারী। আমি ওকে বহন করি, রক্ষা করি, প্রচার করি। আমি পবন, ও সুরভি।
টিকটিকি। ঠিক ঠিক ঠিক। পবনদেব, আমার প্রতি একটু দয়া করবে? ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি, দাও না কিছু খাবার যোগাড় করে—তুমি ইচ্ছে করলেই পার।

টিকটিকির উক্তিটা ভিখারী আবেদনের মত শুনাইল। ধনী যেমন দরিদ্রকে পয়সা ছুঁড়িয়া দেয়, পবন ঠিক তেমনই ঔদাসীন্যভরে বাহির হইতে একটা ছোট কীট উড়াইয়া আনিয়া টিকটিকির মুখে ফেলিয়া দিল। টিকটিকি লুব্ধ আগ্রহে সেটা চিবাইয়া খাইতে লাগিল।।

সুরভি। এখানে যখন ভোমরা নেই, তখন চল আমরা যাই। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে তাড়াতাড়ি। বেলা তো শেষ হয়ে এল, ফুল বেচারী কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবে, সন্ধে পর্যন্ত তো তার মেয়াদ।
পবন। চল।

উভয়ে চলিয়া গেল। যতীনের মনও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গেল অতীতলোকে।...জতুগৃহে আগুন লাগিয়াছে। সুড়ঙ্গপথে জননীসহ পঞ্চপাণ্ডব চলিয়াছেন। সুড়ঙ্গপথ অন্ধকার উপলাকীর্ণ। ভীম ব্যতীত আর কেহই সে বন্ধুর পথে চলিতে পারিতেছে না, মুহুর্মুহু আর সকলেরই পদস্খলন হইতেছে। রাত্রি-জাগরণে সকলেই অবসন্ন। কিন্তু দুর্যোধনের চরেরা চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, বিলম্বে সর্বনাশ ঘটিবে। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম তখন মাতাকে স্কন্ধদেশে এবং নকুল-সহদেবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।...যতীন মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ইনিই পবননন্দন ভীম, যে পবন সুরভিকে বহন করিবার অধিকারী.... যে সুরভি.....হঠাৎ ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজিয়া উঠিল। যতীনের মন মুহূর্তে বর্তমানের পটভূমিকায় ফিরিয়া আসিল।

অ্যালার্ম। চল চল চল চল চল চল .....

যতীন উঠিয়া অ্যালার্মটা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘড়িকে প্রশ্ন করিল।

যতীন। কি বলছ, কোথায় যাব?
ঘড়ি। কোথা যাবে, তা তুমিই জান। আমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছিলে, মনে করিয়ে দিলাম।

যতীন। আমার তো কোথাও যাওয়ার কথা ছিল না, লিখতে বসার কথা ছিল।

ঘড়ি। কোন কিছু করা মানেই—চলা।

যতীন। তোমার এ ভাষা তো শুনি নি কোনদিন এর আগে!

ঘড়ি। নতুন কান পেয়েছ আজ। শুধু কান নয়, চোখও।

ধীরে ধীরে ঘড়িটা একটা মানুষের মুখের মত হইয়া গেল। অদ্ভুত সে মুখ! সীমাবদ্ধ, কিন্তু অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ। ললাটে যেন অনন্ত মহাকাশের ইঙ্গিত, দৃষ্টিতে অসংখ্য সূর্যের আভাস,ওষ্ঠাধরে অভাবনীয় ভাবের আকৃতি, রসনাতে অগণিত বাণীর আগ্রহ। তাঁহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি যতীনের মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই যতীন বুঝিতে পারিল, দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

যতীন। [সসম্ভ্রমে] কে আপনি?

দেবতা। আমি মহাকাল। অভিনব শ্রবণশক্তি পেয়েছ, একটা কথা শোন। আদর্শকে স্বপ্নে নিবদ্ধ না রেখে বাস্তবে মূর্ত কর। যে স্বপ্নলোকে স্বার্থপরের মত তুমি একা বিচরণ কবছ, তার দ্বার খুলে দাও। সকলে সেখানে প্রবেশ করুক, তোমার আদর্শ সকলের আদর্শ হোক, চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান ঘুচে যাক। তবেই তোমার বিদ্রোহ সার্থক।

যতীন। আমি কি বিদ্রোহী? জানতাম না তো।

দেবতা। নিশ্চয়ই, বিদ্রোহী বইকি। বিদ্রোহী নানা জাতের হয়। বস্তুত প্রত্যেক মানুষই বিদ্রোহী, প্রত্যেক মানুষই নিজের পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। ওই দেখ.....

যতীন প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাইল না। চোখের সম্মুখে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নাই। সূচীভেদ্য অন্ধকার। একটু পরে মনে হইল, খানিকটা অন্ধকার যেন নড়িতেছে। সচল একটা অন্ধকার-পিণ্ড যেন গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। একটু পরে কিন্তু বুঝিতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইল। যাহাকে ইনি বিদ্রোহী বলিয়া দেখাইয়া দিলেন, সে একটা চোর। অন্ধকারে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া সিঁধ কাটিতেছে। অন্ধকার একটু স্বচ্ছ হইল। যতীন শিহরিয়া উঠিল.....অসংখ্য বিদ্রোহী....কিলবিল করিতেছে.....। কেহ কাহারও বুকে ছুরি বসাইয়াছে, কেহ নারী-ধর্ষণ করিতেছে, কেহ লুণ্ঠনরত। একটি মেয়ে হাসিমুখে স্বামীর খাদ্যে বিষ মিশাইতেছে.....

যতীন। এরা বিদ্রোহী?

দেবতা। হ্যাঁ, এরা বিদ্রোহী। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থায় এরা কেউ সুখী নয়, প্রচলিত আইন অমান্য করে তাই এরা প্রত্যেকে সুখের সন্ধান করছে আপন আপন রুচি অনুসারে। আর এরাও—

অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা সন্ধানী আলোর রেখা আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল। যতীন দেখিল, সেই আলোকরেখা ধরিয়া বিরাট মিছিল চলিয়াছে। কয়েকজনকে সে চিনিতে পারিল। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, লেনিন, মহাত্মাজী, সুভাষ বসু, অ্যাব্রাহাম লিংকন...আরও অনেকে.....

দেবতা। সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থায় এঁরাও কেউ সন্তুষ্ট নন। এঁরাও সব উলটে দিতে চান, উলটে দিয়ে আনন্দ পেতে চান। কিন্তু একা একা আনন্দ ভোগ করে তৃপ্তি হয় না এঁদের। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের আদর্শ অনুযায়ী সমগ্র সমাজটাকে ভেঙে গড়তে চান, সকলেই যাতে সুখী হয়। তাই করবার জন্যে সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছেন। এই দেখ, আর এক জাতের বিদ্রোহী.....

সন্ধানী আলোর রেখা মিলাইয়া গেল। যতীন দেখিল, দিব্য আলোকে এক অপূর্ব দৃশ্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নির্মল আকাশে যেন নীলকান্ত মণির দ্যুতি....দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর যেন সবুজের স্বপ্ন দেখিতেছে....দূরে পাহাড়ের শ্রেণী অদ্ভুত রহস্যময়.....আঁকিয়া বাঁকিয়া একটা নদী বহিয়া চলিয়াছে কোন্ সাগরের উদ্দেশ্যে কে জানে...নদীর তীরে ছোট ছোট পল্লী, শান্তির ছোট ছোট নীড় যেন...পাখি ডাকিতেছে—পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা......ফটিক জল—ফটিক জল.....বহু কবি বৈজ্ঞানিক ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন....যতীন কয়েকজনকে চিনিল.....প্লেটো, টল্স্টয়, রুসো, ভল্টেয়ার, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ড্যাল্টন,.....ফ্যারাডে...হান্স্.....

দেবতা। এঁরাও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করতে পেরে নির্জন মানসলোকে সংহরণ করেছেন নিজেদের। কিন্তু এঁরা পলাতক নন। এঁরা তপস্বী। এঁরাই যুগান্তরকারী অবতার। তপস্য বলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যুগান্তকারী যন্ত্র, কবি আবিষ্কার করেন যুগান্তকারী মন্ত্র।

যতীন চুপ করিয়া রহিল। দৃশ্যপট ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

দেবতা। সব তো দেখলে, এইবার মিলিয়ে দেখ নিজের সঙ্গে! ঝড়ো হাওয়া, অনুর্বর জমি, আলোর অভাব সত্ত্বেও যে স্বপ্নের কুঁড়িটি ধরেছে তোমার মনে, তাকে বাঁচিয়ে রাখ। বাস্তবের পুষ্পে তা মূর্ত হোক—রূপ নিক।

অদৃশ্য হইয়া গেলেন। টাইম্‌পিসের পুরাতন ডায়ালটা আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার টিকটিক শব্দে যতীন শুনিতে লাগিল—রূপ নিক, রূপ নিক। দ্রুতপদে সশরীরে রুমি আসিয়া প্রবেশ করিল। বাইশ বছরের তরুণী। রূপসী। শুধু দেহের রূপ নয়, মনের রূপও তাহার চোখে মুখে ঝলমল করিতেছে।

রুমি। আমি বিদেয় করে দিয়ে এলাম লোকটাকে ছোটদা। তুমি কি করছ একা একা এই তেতলার ঘরে বসে?

যতীন। কোন্ লোকটাকে?

রুমি। যিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। [হাসিয়া] কোন অভদ্র করি নি, কেবল বললাম, যতদূর মনে হচ্ছে, আপনি রাঁধুনী কিংবা চাকরাণী খুঁজতে বেরিয়েছেন। আমাদের বাড়িতে সে রকম তো কেউ নেই আপাতত।

যতীন। [সবিস্ময়ে] এই কথা বললি তুই। কি বললে তারা?

রুমি। কি আবার বলবে, মুখ কালো করে বসে সন্দেশ গিলতেলাগল, আমি উঠে চলে এলাম।

যতীন। সেজদা ছিল না?

রুমি। হ্যাঁ, বড়দা, মেজদা, সেজদা সবাই ছিল।

যতীন। সেজদা কিছু বলে নি?

রুমি। বড়দা আর মেজদার ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি থেকে যা ফুটে বেরুচ্ছিল, তা মনুর পঞ্চম অধ্যায়। মেজদা কিন্তু বেশ মজার কথা বলেছে একটি, যদিও বড়দার কাছ থেকে ধমক খেলে বেচারী সে জন্যে।

যতীন। কি কথা?

রুমি। মেজদা প্রথমে একটি কথা বলেন নি, কিন্তু আমি ওই কথা বলে উঠে আসবার পরই একজন বললেন, আমাদের বাড়িতে গিয়ে আপনাদের মেয়েকে অবশ্য রাঁধতে হবে না, বাসনও মাজতে হবে না। কিন্তু মানুষের অবস্থা বলা তো যায় না, কার কখন কি হবে বলতে পারে? আপনাদের মেয়ে ইতিহাসে এম. এ. পাস, সে কথা তো জানিই আমরা, কিন্তু ভগবান না করুক, যদি দুঃখের দিন আসে, তখন হাতা বেড়ি ধরতে পারবে কি না, তা জানতে চাওয়াটা কি অন্যায়? মেজদা তখন বললেন, না, কিছুমাত্র অন্যায় নয়। আপনারাও আপনাদের ছেলেকে আশা করি মসলা-পেশা কাঠ-চ্যালানো কুয়ো থেকে জল তোলা প্রভৃতিতে দক্ষ করেছেন। সত্যিই তো, কখন কি হয় কে বলতে পারে? মেজদার চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলছিল। আমি পাশের ঘরে জানলা দিয়ে দেখছিলাম তো সব।

যতীন। বড়দা কি বললেন?

রুমি। বড়দা মেজদার দিকে ফিরে বললেন, ও-রকম কথা বলছ কেন তুমি? তোমাদের অভদ্র ব্যবহারে মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার। তারপর ওঁদের দিকে ফিরে বললেন, খুবই লজ্জিত আমি, আমাদের ক্ষমা করুন। আচ্ছা নমস্কার। ওঁদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন গিয়ে। বাড়িতে এসে সেজদার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, তোমার পছন্দর প্রশংসা করতে পারলাম না। রুমির বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি তোমার ঠাকুরঘর নিয়েই থাক।

যতীন। [হাসিয়া] যাক, এ যাত্রা নিস্তার পেয়ে গেলি।

টিকটিকির কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল। সে আগাইয়া আসিল এবং রুমিকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

রুমি। [আবদার করিয়া] আমার একটা উপকার করবে ছোটদা?

যতীন। কি?

রুমি। বেশ ভাল করে একটা অ্যাপীল লিখে দেবে? অ্যাপীলের বাংলা কি—আবেদন? লিখে দাও না, তুমি তো বেশ লিখতে পার।

যতীন। কিসের আবেদন?

রুমি। বাংলা দেশের সমস্ত কুমারী মেয়েদের একটা সমিতি গঠন করতে চাই আমি—অনেকটা ট্রেড ইউনিয়ন গোছের। তার উদ্দেশ্য হবে—কুমারী মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা। বাংলা দেশের পুরুষদেরই তা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা যখন তাঁরা করেন নি, করবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না, তখন আমাদের নিজেদেরই তা করতে হবে। বাংলা দেশের সমস্ত কুমারী মেয়ে যদি সত্যিই আমার দলে যোগ দেয়, তাহলে বাংলা দেশের পুরুষদের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি। কোনও মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কোনও রকম অসম্মানজনক প্রস্তাব করে যদি কেউ, তাকে বয়কট করব আমরা। বাংলা দেশের কোনও মেয়ে তাকে বিয়ে করবে না। আমরা নিজেদের অত্যন্ত সস্তা করে ফেলেছি বলেই ওরা ভুলে গেছে যে, বিয়ে করাটা শুধু আমাদের প্রয়োজন নয়, ওদেরও প্রয়োজন। এ দেশের মেথর, মুচি, ধোবা, নাপিত, কুলি, কেরানী সবাই নিজেদের দর বাড়িয়ে নিয়েছে ধর্মঘট করে, কেবল আমরাই পড়ে আছি, মূল্যহীন, অবহেলিত, অপমানিত। অথচ আমরাই গার্হস্থ্যের ভিত্তি, ভবিষ্যৎ সমাজের জননী, আমাদেরই অসম্মানের পঙ্ককুণ্ডে ডুবিয়ে রেখেছ তোমরা, আর ভণ্ডামির মুখোশ পরে সতীলক্ষ্মী-মহিমার বাঁধা বুলি

আউড়ে চলেছ শতাব্দীর পর শতাব্দী। এ আর সহ্য করব না আমরা, সহ্য করা উচিত নয়। এই কাজেই আত্মনিয়োগ করব ঠিক করেছি। তুমি আমাদের সমিতির উদ্দেশ্যটা বেশ ভাল করে গুছিয়ে লিখে দাও ছোটদা—দেবে?

যতীন। তা না হয় দেব। কিন্তু জিনিসটা ভাল করে ভেবে দেখা উচিত কিছু করবার আগে।

রুমি অধীরতাসূচক একটা ভঙ্গী করিল।

রুমি। ও ভাবাই আছে।

যতীন। ধর, যে সব মেয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাদের ভরণ-পোষণের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?

রুমি। নিশ্চয়। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, উপার্জনের ব্যবস্থা থাকবে, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে, তাদের প্রত্যেকের বিয়ের ব্যবস্থা করবে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী। ছেলের বিয়ে দিতে হলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই হুড়মুড় করে মেয়ের বাপেরা ফোটোগ্রাফের বোঝা নিয়ে গিয়ে হাজির হবে না তখন, হলেও কোনও ফল হবে না। সকলকে ছেলের বিয়ের জন্য যেতে হবে ওই প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে। সেখানে কোনও রকম অসম্মানজনক প্রস্তাব করেন যদি কেউ, তাহলে মেয়ে স্ট্রাইক করবে—সে ছেলের বিয়ে হবে না যতক্ষণ না সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

টিকটিকি। ঠিক, ঠিক, সবই ঠিক। কেবল ওই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগছে। ও বিষয়ে বেশি কড়াক্কড়ি করতে গেলে অনেক মেয়ে পালাবে, আর ঢিলে দিলে অনেক মেয়ে কেলেঙ্কারি করবে। জানি তো সব.....

টিকটিকির কথা রুমি শুনিতে পাইল না। যতীন পাইল।

যতীন। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাটা কি রকম হবে?

রুমি। [হাসিয়া] কারাগারে বন্দী করে রেখে 'ফিডিং বট্‌লে' উপদেশ পান করিয়ে কতদিন বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের? অন্ধকূপে হত্যা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না? বাইরের আলো-বাতাসের অভাবে ভেপসে পচে মলুম যে আমরা! তালাটা খুলে দিলে ক্ষতি কি?—দু-চারজন পথ হারিয়ে মরবে হয়তো—তা মরুক, অধিকাংশ কিন্তু বাঁচবে।

যতীন। তাহলে রক্ষণাবেক্ষণের কোনও প্রয়োজন নেই বলছ?

রুমি। বাইরে থেকে কেউ কি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পেরেছে কখনও কাউকে? সিন্দুকের ভিতর বন্ধ করে রেখেও পারে নি।

টিকটিকি। ঠিক ঠিক।

রুমি শুনিতে পাইল না, বলিয়া চলিল—

রুমি। সেই দৈত্যের গল্পটা ভুলে গেছ—সেই যে, একটা দৈত্য সিন্দুকের ভিতর একটা মেয়েকে পুরে মাথায় করে নিয়ে বেড়াত?

যতীন। ও গল্প জানি, তোমার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধও নেই—তোমার 'স্কীমটা কি, তাই শুধু জানতে চাইছি। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে বলছ, সেটা কি রকম হবে?

রুমি। মেয়েরা তাদের বাপ-মায়ের কাছেই থাকবে যেমন আছে, কেবল তাদের আমাদের

সমিতিতে যোগ দিতে হবে এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, বিয়ের ব্যাপারে অসম্মানজনক কোন কিছু তারা সহ্য করবে না। সমিতি তাদের সে বিদ্রোহ সমর্থন করবে। আমরা যেখানে যেমন দরকার শিক্ষার ব্যবস্থা করব, উপার্জনেরও ব্যবস্থা করব, কিন্তু ওই একটি শর্তে। বিয়ের ব্যাপারে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে কর্তৃত্ব করবে আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলী। মেয়েদের বাপ-মাকে নিয়েই প্রতিনিধিমণ্ডলী হবে অবশ্য।

যতীন। কিন্তু যাদের মেয়ে আছে, তাদের ছেলেও আছে। মেয়ের স্বার্থের কাছে ছেলের স্বার্থ বলি দিতে রাজি হবে কি সবাই?

রুমি। আমার বিশ্বাস অনেকে হবে। ছেলেদের স্বার্থকে বলি দেব কেন আমরা? তাদের স্বার্থে তো আমাদেরই স্বার্থ। সমাজ মেয়েদের উপর যে অত্যাচারটা করছে, সেইটে নিবারণ করাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য।

যতীন। ধর, যদি বাপ-মায়েরা রাজি না হয়?

রুমি। তখন তাদের নিয়ে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা করতে হবে।

যতীন। তাতে কি পরিমাণ টাকার দরকার, তা ধারণা আছে তোর?

রুমি। আছে, অনেক টাকার দরকার। কিন্তু সেই ভয়ে থামলে চলবে না। আরম্ভ করতে হবে।

যতীন। আমার বিশ্বাস, রাজশক্তি সাহায্য না করলে এক-আধ-জনের চেষ্টায় এ হওয়া অসম্ভব। বিদেশী রাজার কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না, আমাদের পঙ্গুতাই তার কাম্য। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে সকলের আগে। দেশ স্বাধীন না হলে কিছুই হবে না।

রুমি। সে চেষ্টা তো চলছে, এটাও চলুক। না ছোটদা, তুমি ঝগড়া লাগাবার চেষ্টা করছ খালি। কোনও বাধা আমি মানব না।

যতীন। [হাসিয়া] কোনও বাধাই না? ধর, যদি—

কথাটা বলিতে গিয়া যতীন থামিয়া গেল। সমরের সম্বন্ধে রুমির মন যে ব্যাঘ্রিনীর মত সজাগ, তাহা যতীনের জানা ছিল। সমরকে লইয়া কোনও রসিকতাও সে সহ্য করিবে না। কিন্তু যতীনের মনের ভাব তাহার চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া উঠিল। রুমির মনের ভাবও মূর্ত হইল রুমির চোখের দৃষ্টিতে।

যতীনের মনের ভাব। ধর, যদি সমর এতে আপত্তি করে?

রুমির মনের ভাব। সমর আপত্তি করবে? সমরকে চেন না তোমরা। সোনায় মরচে ধরতে শুনেছ কখনও?

যতীনের মনের ভাব। শুনি নি, কল্পনা করছি। যদি আপত্তি করে, কি করবি তখন তুই?

রুমির মনের ভাব। সমরের মুখদর্শন করব না কখনও তাহলে।

মূর্ত মনোভাব দুইটি অদৃশ্য হইল। যতীন দেখিল, রুমি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে বহ্নি-দীপ্তি।

রুমি। কোনও বাধাই আমি মানব না ছোটদা। প্রাণ দিয়েও আত্মসম্মান রক্ষা করব।

যতীনের মনে হইল, রুমির সমস্ত দেহটা যেন স্বর্ণ-শিখার মত জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে শিখা আকাশবিসর্পী হইল—দিগ্‌-দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল অপূর্ব জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে।

সেই দীপ্তি ভেদ করিয়া ঝঞ্ঝার বেগে একটি অশ্ব যেন ছুটিয়া আসিতেছে....কাছে আসিয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া অশ্বটি দাঁড়াইয়া পড়িল.....যতীন সবিস্ময়ে দেখিল, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে মূর্তিমতী তেজঃস্বরূপিণী এক নারী...তাহার উত্তোলিত হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি...সে বলিতেছে, মেরি ঝান্সি নেহি দেউঙ্গি, নেহি দেউঙ্গি, নেহি দেউঙ্গি....। দৃশ্য মিলাইয়া গেল।

রুমি। আমি চললাম ছোটদা—লিখে রেখো, বুঝলে? আমি আসব আবার।
যতীন। আচ্ছা।

রুমি চলিয়া গেল।

টিকটিকি। নানা গোলমালে একটা কথা চাপা পড়ে গেছে।
যতীন। কি কথা?
টিকটিকি। নীলার কথাটা। সে যে তোমাকে অক্ষম বলে অত বড় একটা বিদ্রূপ করে গেল, সহ্য করে থাকবে সেটা? তুমি কি একটা কেউ-কেটা নাকি! আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, তোমার শক্তি কত!....

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর চোখ বুজিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল, সত্যই কি তাহার কোন শক্তি আছে? থাকিলে তাহা কিরূপ?....চোখ খুলিয়া দেখিল, একটি কঙ্কাল সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

কঙ্কাল। আমিই তোমার শক্তি।
যতীন। তুমি!
কঙ্কাল। খেতে পাই না।
যতীন। কেন, আমি খাই তো। জীবনে কখনও খাওয়ার কষ্ট পেয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।
কঙ্কাল। ওইখানেই তোমার ভুল। তুমিই তোমার শক্তি নও, সে রকম তপস্যা তোমার নেই। দেশের সম্মিলিত শক্তিই তোমার শক্তি.... তোমার শক্তি.....

কঙ্কালের দাঁতগুলো সহসা কড়মড় করিয়া উঠিল। অক্ষিকোটর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল.....

কঙ্কাল। তোমার শক্তি? লজ্জা করে না বলতে? এর মধ্যেই কি করে ভুলে গেলে যে, তোমার শক্তি একমুঠো উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য মাথা কুটে মরেছে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে, 'ফ্যান দাও' 'ফ্যান দাও' বলে হাহাকার করে বেড়িয়েছে শহরের গলিতে গলিতে, পুলিশের গুলিতে মরেছে হাজারে হাজারে, ঝড়ে উড়ে গেছে, আগুনে পুড়ে গেছে, বানে ডুবে গেছে?....[করুণ কণ্ঠে] কিছু নেই—অন্ন নেই, শিক্ষা নেই, আদর্শ নেই। সমস্ত নিয়ে গেছে। চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে, মাংস কেটে নিয়েছে, চোখ উপড়ে ফেলেছে। বাকি আছে শুধু হাড় কখানা...বাঁচাও এগুলোকে...এখনও এ দিয়ে বজ্র তৈরি হতে পারে।
যতীন। [সাগ্রহে] বল, কি উপায় তার?
টিকটিকি। কি ভণ্ড, কিছু জানে না যেন!
কঙ্কাল। উপায়—ত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, ভালবাসা। শুধু নীলাকে ভালবাসা নয়,

সকলকে ভালবাসা। সকলকে ভালবাসতে না পারলে নীলার ভালবাসাও টিকবে না। বিশাল হৃদয়ের বলিষ্ঠতাই নীলাকে নির্ভর করতে পারে, বিশাল গাছের শাখাতেই পাখি নীড় বাঁধে, মাটির উপরই গৃহ নির্মিত হয়। তোমার উদারতার অভাব ঘটেছে বলেই দেশজোড়া এই অশান্তি, এই হানাহানি, তোমার সঙ্কীর্ণ প্রেমের ভিত্তিও নড়ে উঠেছে তাই। বাঁচাও আমাকে—এখনও বাঁচাতে পার....বাঁচাও...বাঁচাও....

কঙ্কাল ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। দূর হইতে কেবল শোনা যাইতে লাগিল, বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—

টিকটিকি। এই মরেছে!

যতীন। কি হল?

টিকটিকি। [সানুনয়ে] আমাকে চট করে একটা গিলে-করা আদ্ধির পাঞ্জাবি, এক জোড়া বাটারফ্লাই গোঁফ, আর এক জোড়া গ্লেজ্‌ড কিড্‌সের পাম্পশু দিতে পার? দাও ভাই চট করে।

যতীন। [সবিস্ময়ে] কেন?

টিকটিকি। ওই দেখ, টিকটিকিনীর কাণ্ড!

যতীন সবিস্ময়ে দেখিল, পাশের দেওয়ালে টিকটিকিনী সত্যই অদ্ভুতবেশে সাজিয়া আসিয়াছে। ঠোঁটে রঙ, মুখে পাউডার, পরনে চটকদার হাওয়াই শাড়ি। আঁকিয়া বাঁকিয়া ওরিয়েণ্টাল নাচ নাচিতেছে।

টিকিটিকি। দাও চট করে—আদ্ধির পাঞ্জাবি, বাটারফ্লাই গোঁফ আর ভাল একজোড়া পাম্পশু; না হলে তো ওকে ভোলানো যাবে না। দাও না।

যতীন। আমার কাছে নেই।

টিকটিকি। আঃ, বিপদে ফেললে দেখছি। পাশের বাড়িতে থিয়েটারের আখড়া আছে না? সেখানে পাওয়া যেতে পারে, দেখি চেষ্টা করে।

ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল। টিকটিকিনীও নাচিতে নাচিতে তাহার অনুসরণ করিল। যতীন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 'বাঁচাও''বাঁচাও' শব্দটা আবার শোনা গেল। স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ সেটা নিদারুণ হাহাকারে পরিণত হইল। সহসা খবরের কাগজের পাতা হইতে নোয়াখালি ও কলিকাতার অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের দল পিলপিল করিয়া বাহির হইয়া আসিল। মনে হইল, চতুর্দিক যেন ভরিয়া গেল। আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে.....ঘর পুড়িতেছে.....গ্রাম পুড়িতেছে। বাঁচাও—বাঁচাও—কে কোথায় আছ, বাঁচাও...চীৎকার-ক্রন্দন-হাহাকারের মধ্যে কে যেন অট্টহাসি হাসিতেছে। যতীন এতক্ষণ প্রাণপণে যে বিভীষিকাকে নিজের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা অতিশয় নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। কাগজে পড়িয়া তাহার মনে যে কৌতূহলটুকু জাগিয়াছিল, তাহা এই বিরাট জনতায় দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার ভয় করিতেছিল না, সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্দিকে জনতা, চীৎকার, হাহাকার, অট্টহাসি, আগুনের হলকা, শবদাহের গন্ধ আর ধোঁয়া। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, এক বিরাট পুরুষ ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন...যতীনের একটা ছবি মনে পড়িয়া গেল....যেন লিলিপুট-জনতার

মধ্যে গালিভার আবির্ভূত হইয়াছেন। বিরাট পুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিরাট পুরুষ। বিভ্রান্ত হয়ো না, এর স্বরূপ বাইরে থেকে অমন এলোমেলো করে দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। ঠিক করে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

যতীন। আপনি কে?

বিরাট পুরুষ। আমি ইতিহাস।

ইতিহাস জনতার মধ্যে কি যে করিলেন, যতীন ঠিক বুঝিতে পারিল না; কিন্তু অদ্ভুত একটা রূপান্তর ঘটিল। জনতার বিশৃঙ্খলা আর রহিল না। ....এক ধারে কতকগুলি বন্দিনী নারী সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে....মানুষ নয়, যেন প্রাণহীন নিস্পন্দ পুতুলের সারি—চোখের দৃষ্টিতে ভাষা নেই, সজীব আতঙ্কও নাই, সমস্ত জমিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে, আর এক ধারে বন্দী পুরুষের দল.... মৌন ঘৃণা আর ভয় তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে মূর্ত হইয়া আছে...দুই দলের মধ্যে কয়েকটি শিশু....কিছু দূরে নরমুণ্ড ও কবন্ধের স্তূপ...তাহারই পাশে একটা অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাতে পুড়িতেছে একটা জীবন্ত মানুষ...আর এই সমস্তটা, স্পর্ধিত নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে একটা অদ্ভুত পশু। পশুটার আকৃতি ভয়াবহ। মুণ্ডটা হায়েনার, বীভৎস দাঁতগুলা রক্তাক্ত। হাত দুইটা হাত নয়, সাপ। আঙুল নাই, আঙুলের মধ্যে অসংখ্য শুঁয়া-পোকা সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। পা দুইটাও মানুষের নয়, শ্বাপদের। মাথায় একটা লোহার হেলমেট। কোমরে একটা ছোরা গোঁজা। অস্পষ্ট দুইটি মূর্তি নেপথ্যে বন্দুক কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে....মনে হইতেছে, তাহারা যেন এই পশুটার দেহরক্ষী। ইতিহাস কখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন যতীন বুঝিতে পারে নাই।....পশুটা আগাইয়া বন্দী নর-নারীদের মধ্যস্থলে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল। দুইটা সাপের ফণা দুই দিকে উদ্যত হইয়া রহিল।

পশু। তোরা মানবি কি না এখনও বল....যদি মানিস জিন্দা থাকবি, আর যদি না মানিস—

শ্বদন্ত নিষ্কাশিত করিয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করিল একটা। সর্পরূপী বাহু-যুগল কুঞ্চিত প্রসারিত হইতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি হইতে আগুন নয়, খানিকটা পুঁজ যেন গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিল।.....

পশু। [সগর্জনে] মানবি কি না বল্, জলদি বল্, (পুরুষদের দিকে চাহিয়া) জলদি।

একজন পুরুষ। না, মানব না।

পশুটা হাসিয়া উঠিল। অদ্ভুত সে হাসি! কোন শব্দ হইল না। মুখ-গহ্বরটা কান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল কেবল।

পশু। [সহসা উচ্চৈঃস্বরে] এই, আয় তোরা।

সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা পশু ছুটিয়া আসিল। কাহারও মুণ্ডু শৃগালের মত, কাহারও কুকুরের মত, কাহারও শকুনির মত....।

পশু। নিয়ে আয় মাংস আর রক্ত।

একজন গিয়া মাংস ও রক্ত লইয়া আসিল।

পশু। খাওয়া এই ব্যাটাকে.....শালা, হারামির বাচ্চা....

যে পুরুষটি আপত্তি করিয়াছিল, তাহাকে সকলে মিলিয়া জোর করিয়া মাটিতে ফেলিল এবং মাংস ও রক্ত মুখে করিয়া দিল।

পশু। এইবার মার্ জুতো শালার মুখে।

মুখে জুতা মারা হইল।

পশু। কাট্ এবার

কাটিল। তাহার মাথাটা পিছন দিকে ঝুলিয়া পড়িতেই ছিন্ন শিরামুখ হইতে ফিনকি দিয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইল। ওঃ—ওঃ—ওঃ—ওঃ—ভগবান—বন্দিনী মেয়েদের মধ্যে একজন হাহাকার করিয়া উঠিল। নিহত ব্যক্তি তাহারই স্বামী। মেয়েটির চীৎকারে যতীন আত্মস্থ হইল, এতক্ষণ তাহার চিত্ত যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল—সেও চীৎকার করিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বারণ করিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। পশুরা তাহাদের কাজ ঠিক করিয়া যাইতে লাগিল। জননীদের আর্তনাদ অগ্রাহ্য কবিয়া তাহারা শিশুদেব মধ্যে কাহাকেও অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়িয়া দিল, কাহাকেও আছড়াইয়া মারিল, কাহারও দুই পা ধরিয়া চিরিয়া ফেলিল। যতীন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না—সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। পশুরা নির্বিকার। যে বন্দিনী হাহাকার কবিয়া উঠিয়াছিল, একটা পশু তাহার দিকে চাহিয়া একটা পৈশাচিক হাসি হাসিল। এ হাসি নিঃশব্দ নয়— মনে হইল, গলাব ভিতব খলবল করিয়া জল ফুটিতেছে।

বন্দিনী। আমাকেও মেরে ফেল তোমরা. আমাকেও মার....তোমাদের পায়ে পড়ছি, দয়া করে আমাকে মার.....আমার ছেলেকে মেরেছ, স্বামীকে মেরেছ.....আমাকেও মার ...

পশু। তোমাকে মারব না সুন্দরী, অঙ্কশায়িনী করব ....

বন্দিনী। না—না—না—

পশু। না বললে শুনেছ কে! ওরে, ধর্—

কয়েকজন পশু আসিয়া মেয়েটিকে চিত করিয়া মাটিতে ফেলিল। একজন আগাইয়া গিয়া পা দিয়া তাহাব মাথায় আঘাত করিল, হাত ভাঙিয়া দিল। তাহাব পর তাহার ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ক্ষণপরেই ধর্ষিতা নারীর হাহাকারে চতুর্দিকে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। নেপথ্যে যে দুইটি অস্পষ্ট মূর্তি বন্দুক কাঁধে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা নির্বিকারভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।. যতীনের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র স্ফীত, চক্ষু রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া তারস্বরে আবার সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু পশুদের কার্যকলাপে এতটুকুও ছেদ পড়িল না। বরং তৎক্ষণাৎ তাহারা আর একটি মেয়ের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। যতীন আব দেখিতে পারিতেছিল না, বুকফাটা হাহাকাব শোনাও আর সম্ভব ছিল না তাহার পক্ষে। নিরুপায় হইয়া সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিল....কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার চোখ খুলিল। দেখিল, ইতিহাস তাহার সম্মুখে পুনরায় মূর্ত হইয়াছেন।

ইতিহাসে। কেন বৃথা চীৎকার করছ?

যতীন। মেয়েদের এই নির্যাতন চুপ করে দেখব? কি বলছেন আপনি!

ইতিহাস। [হাসিয়া] মেয়েদের নির্যাতন চুপ করে দেখাই তো তোমাদের অভ্যাস।

যতীনের চোখের সম্মুখে নূতন দৃশ্য উদঘাটিত হইল। চিতা জ্বলিতেছে। চিতায় পুড়িতেছে একটি মৃত পুরুষের সহিত একটি জীবন্ত নারী। মেয়েটি হাত জোড় করিয়া মৃত স্বামীর পা দুইটা মনে মনে জড়াইয়া ধরিযা নিদারুণ যন্ত্রণাটা ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; চেষ্টা সত্ত্বেও মুখ দিয়া আর্তনাদ বাহির হইয়া পড়িতেছে। সে আর্তনাদকে চাপা দিয়া গর্জন করিয়া উঠিতেছে ঢাক ঢোল দামামা রামশিঙার তুমুল নির্ঘোষ। এ দৃশ্য অবলুপ্ত হইয়া গেল, আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল....একসঙ্গে শত শত নারী সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া হাতের শাঁখা ভাঙিয়া বৈধব্য-বেশ ধারণ করিতেছে—একটিমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে এতগুলি মেয়ে পতিহীনা হইয়াছে, অদূরে নিষ্ঠুর-মূর্তি একটা পাণ্ডা দাঁড়াইয়া আছে, সকলের টুঁটি টিপিয়া জোর করিয়া নির্জলা একাদশী করাইবে।..এ দৃশ্য মিলাইয়া গেল, আর একটা মূর্ত হইল। পর্তুগীজ বণিকের জাহাজে সারি সারি মেয়ের দল উঠিতেছে, প্রত্যেকের কোমরে দড়ি। পর্তুগীজ বণিকেরা উহাদের কাহাকেও লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে, কাহাকেও কিনিয়াছে।....জাহাজ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইল একটি নৌকায়। নৌকার গুলুইয়ের উপর ম্লানমুখী একটি কিশোরী বসিয়া আছে—ভরার মেয়ে....ভরার মেয়ে দেখিতে দেখিতে রূপান্তরিত হইল স্নেহলতায়...স্নেহলতার সর্বাঙ্গে আগুনের শিখা...স্নেহলতাকে দগ্ধ করিয়া আগুনের শিখা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিল.....সেই স্তিমিত আলোকে যতীন দেখিতে পাইল, প্রেতিনীর মত সারি সারি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন পণ্য-রমণীর দল...তাহাদের নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ....এ দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল.....যতীন দেখিল, ইতিহাস তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন।

যতীন। অতীতে কিছু করি নি বলে বর্তমানেও চুপ করে থাকব, এ আপনার কেমন যুক্তি?
ইতিহাস। বর্তমানেও তোমরা চুপ করে আছ। ওই দেখ।

অশরীরী নিভাননী ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। চোখের দৃষ্টিতে সপ্রতিভ ছদ্ম হাসি।

নিভাননী। [হাসিয়া] আমার উপর করুণা প্রকাশ করে কেন যে সময় নষ্ট করছ, বুঝি না। আমার কোন দুঃখ নেই, তোমরা আমার দুঃখটা বুঝলে না, কিন্তু স্বয়ং বাবা বিশ্বেশ্বর আমাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন। বরং তোমাদের কথা ভেবেই দুঃখ হয় আমার...ঠিক আমার বিশুর মতই অবুঝ তোমরা....ওই যে আসছে—আর পারি না ওকে নিয়ে।

অশরীরী বিশু আসিয়া প্রবেশ করিল। মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরিধানে ময়লা হাফপ্যাণ্ট, ছেঁড়া কামিজ। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। গালের উপর অশ্রুর ধারা শুকাইয়া রহিয়াছে। নিভাননীকে দেখিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু বলিল না, কেবল নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

নিভাননী। আচ্ছা, তুই অমন করছিস কেন বল্ দিকি?
বিশু। [অস্ফুটকণ্ঠে] মা!

তাহার দুই চোখ আবার জলে ভবিয়া উঠিল।

নিভাননী। কতবার বোঝাব তোকে! একি আমার নতুন হয়েছে, এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড কতবারই তো হয়েছে পৃথিবীতে। মহাভারত খুলে দেখ্ না! বিনতার দুই ছেলে অরুণ আর গরুড় জন্মেছিল ডিম থেকে, গান্ধারী প্রসব করেছিলেন একটা মাংসপিণ্ড, সেটা ঘৃতকুণ্ডে রাখবার পর তবে তার থেকে শত পুত্র জন্মাল, দ্রোণও জন্মেছিল কলসী থেকে, শরস্তম্ভ থেকে কৃপ কৃপী,

আগুন থেকে অগ্নিবেশ, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন.....রামায়ণ পড়েছিস তো—সীতা মাটি থেকে জন্মায় নি? কি অবুঝ ছেলে বাবা, কিছুতেই বুঝবে না—চল্—

বিশুকে নিভাননী টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়া গেল।

অশরীরী মেজদি প্রবেশ করিলেন।

মেজদি। কাণ্ডকারখানা দেখে এস একবার। তোমার মেজদা পা ছড়িয়ে বসে আছেন, আর ওই বিধবা বউ তাঁর উরুতে গরম তেল মালিশ করছে। আচ্ছা, এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড শুনেছ কখনও? পুত্রবধূ অবশ্য মেয়ের মত তা মানি, কিন্তু সোমত্ত মেয়েকে দিয়েও কেউ উরুতে তেল মালিশ করায় নাকি? আমি মালিশ করে দিতে গেলুম, তোমর মেজদা বললেন, তোমার হাতে জোর নেই, তুমি পারবে না। মানে মানে সরে এলুম—নিজের মান নিজের কাছে—অ্যাঁ, কি বল? কিন্তু এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপের জন্মে শুনি নি কখনও বাপু!

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। একবার অসহায়ভাবে ওদিকে চাহিলেন। তাহার পর নাক কুঁচাকাইয়া চশমাটা ঠিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

মেজদি। আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, কতটুকুই বা বুঝি, কি-ই বা জানি! [একটু হাসিয়া] আর এটাও ঠিক, হাতে কিছু জোর নেই আমার—কিচ্ছু না। সর্বাঙ্গ কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে দিন দিন—একটু জোরে মালিশ করে না দিলে কামড়ানি কমবেই বা কেন? [পুনরায় দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেলিয়া] যাই, তেলটুকু নিয়ে আসি, জীবু দোকান বন্ধ করে দেবে আবার— তেলের শিশিটা সকাল থেকে তার দোকানে পড়ে আছে—অন্ধকারও হয়ে এল....যাই।

চলিয়া গেলেন। একটি সিনেমা-অভিনেত্রী ধীরে ধীরে ছায়ালোক হইতে নামিয়া আসিলেন। অদ্ভুত রূপসী। অভিনয়ের সময়ে যতীন ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। চোখে-মুখে-কথা চটপটে চটুলা—যতীনের ইহাই ধারণা ছিল। এখন দেখিল, তাহার চোখের দৃষ্টি বড় করুণ।

সিনেমা-অভিনেত্রী। আমার শিল্প-চর্চার অন্তরালে কি শোচনীয় অপমান—কি নিদারুণ বেদনা যে প্রচ্ছন্ন আছে, তা যদি দেখতে পেতে!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাশে একটি লোলুপদৃষ্টি বৃদ্ধ মূর্ত হইল। গায়ের শাল এবং হাতের আংটি দেখিয়া মনে হয়, লোকটির আর কিছু না থাক্, টাকা আছে।

বৃদ্ধ। কি করছ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

অভিনেত্রী। [অনুযোগভরা আবদারমাখা কণ্ঠে] তোমার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি কতক্ষণ থেকে!

বৃদ্ধ। ও। চল তাহলে—এই ভূপৎ সিং....

নিঃশব্দে প্রকাণ্ড একখানা মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রীকে লইয়া বৃদ্ধ তাহাতে প্রবেশ করিলেন। মোটর অন্তর্নিহিত হইল।...ধীরে ধীরে এবং অনিবার্যভাবে আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। ছোট একখানি ঘর। দেখিলে মনে হয়, কিছুক্ষণ আগেই তাহাতে লক্ষ্মী-শ্রী ছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাব এখনও আছে, কিন্তু ঘরের চতুর্দিকে জিনিসপত্র ছড়ানো। ঘরের এক কোণে একটা তোলা উনুনে ভাত ফুটিতেছে। ঘরের মেঝেতে হাত-পা বাঁধা একটা নারী, তাহার

পাশেই হাত-পা-বাঁধা একটি পুরুষ। পুরুষটির গায়ে মাথায় তেল দেখিয়া মনে হয়, সে বোধ হয় স্নান করিতে যাইতেছিল। সেই পশুটা আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পশু। কি ঠিক করলি?

নারী। [করুণ কণ্ঠে] ও জ্বরে ভুগছিল, তিন দিন খায় নি কিছু। আজ পথ্য করবে চারটি। ভাত হয়ে গেছে, আগে ওকে খেতে দাও তোমরা, তারপর সব হবে।

পশু। [পুরুষকে] আমার কথা মানবি কি না?

পুরুষ। না।

পশুটা তাহার মুখে থুতু দিল, লাথি মারিল। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শেষে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটা তুলিয়া সমস্তটা তাহার মুখের উপরে উপুড় করিয়া দিল।

যতীন। এই—এই—এই—কি করছ তুমি?

পশুটা যতীনের কথায় কর্ণপাত করিল না। মেয়েটার চুলের ঝুটি ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেল।

ইতিহাস। তুমি বৃথা চীৎকার করে মরছ। ও তোমার একটি কথা শুনতে পাচ্ছে না।

যতীন। শুনতে পাচ্ছে না!

ইতিহাস। না।

যতীন। শুনতে না পাবার কারণ?

ইতিহাস। কারণ ও মানুষ নয়, যন্ত্র। তুমি মাথা খুঁড়ে মরলেও ও থামবে না, থামবার শক্তিই নেই ওর। তোমার ঘড়িতে এখন পাঁচটা বেজেছে, ধর কেউ কাঁটা সরিয়ে দুটো করে দিত, আর তুমি যদি ঘড়ির দিকে চেয়ে ক্রমাগত চীৎকার করে যেতে—এখন দুটো নয়, পাঁচটা বেজেছে, কি করছ তুমি? তাহলে তা যেমন হাস্যকর হত, তোমার এ চীৎকারওতেমনই হাস্যকর।

যতীন। কিছু করা যাবে না তাহলে?

ইতিহাস। যাবে, যে হাতটা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়েছে. সেই হাতটাকে যদি প্রভাবিত করতে পার, কিংবা ঘড়িটা নিজের আয়ত্তে এনে নিজেই যদি কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে দাও, তাহলে যাবে।

যতীন। তার উপায় কী?

ইতিহাস। উপায় বার করবে তোমরা। [হাসিয়া] আমি শুধু তার বিবরণটা সংগ্রহ করে রেখে দেব, যেমন রেখে আসছি বরাবর। আমার প্রাচীন অভিজ্ঞতার ছবি দেখাতে পারি খানিকটা, দেখ তার থেকে যদি বার করতে পার কিছু।

যতীনের চোখের সম্মুখে পর পর ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শতদ্রু নদীর তীর, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য সমাবিষ্ট হইয়াছে.......মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবিরে সমর-কৌশল শিখিতেছেন.....বাংলা দেশে গঙ্গারাঢ়ীদের বিরাট হস্তি-বাহিনী সজ্জিত হইতেছে....বৈদিক সভ্যতা তখনও অবলুপ্ত হয় নাই....গঙ্গার তীরে তীরে মহাসমারোহে তখনও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে.....যজ্ঞাগ্নি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইল.....রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গোপনে গৃহত্যাগ করিতেছেন.....বোধিদ্রুমমূলে অমিতাভ বুদ্ধ....পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সারা ভারতবর্ষ যেন স্বপ

দেখিতেছে.....বৌদ্ধ শ্রমণ, বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ রাজা....অশোকের সাম্রাজ্য....আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী ...গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, সত্যনিষ্ঠ হও, অহিংস হও—সর্বত্র এই বাণী প্রচারিত হইতেছে—সুদূর দাক্ষিণাত্যে তাম্রপর্ণী নদীর তীরেও....সিংহলে, গ্রীসে, ঈজিপ্টে, সিরিয়ায়....ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিতেছে...অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়িতেছে...উত্তরাধিকারীরা অযোগ্য.....চারিদিকে বিশৃঙ্খলা....বিরাট সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল.....বৃহদ্রথকে তাহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী পুষ্যামিত্র হত্যা করিয়া সুঙ্গ সাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছে.....তাহার পর কাম্ব, তাহার পর অন্ধ্র...বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিল.....গ্রীক, তাহার পর শক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তক্ষশিলায় পার্থিয়ান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। শকেরা উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছে....সমস্ত ভাসিয়া গেল কুশান-আক্রমণের বন্যা-বিপ্লবে...হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে। কুশান অশ্বারোহীরা....গান্ধার, তক্ষশীলা, পাঞ্জাব, ক্রমে ক্রমে সব গেল...নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল কুশান সাম্রাজ্য...তৃতীয় কুশান সম্রাট কণিষ্ক কিন্তু আর অশ্বারোহী দস্যু নন....তিনি ভারতবর্ষীয় সম্রাট...সর্বধর্মসমন্বয় করিতে ব্যস্ত......জরথুস্ত্র, হিন্দু, গ্রীক, পারস্য সকলের দেবতাই তাঁহার আরাধ্য....কিন্তু শেষ বয়সে তিনি বুদ্ধের শরণ লইতেছেন...রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধমন্দিরে অলঙ্কৃত হইতেছে...কাশ্মীরের কুণ্ডলবনে মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ তাম্রলিপিতে খোদিত হইয়া স্তূপ-মধ্যে রক্ষিত হইতেছে...বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের যুদ্ধপিপাসা কিন্তু মেটে নাই....সারাজীবন ধরিয়া তিনি যুদ্ধই করিতেছেন...কাশগড়, খোটান, ইয়ারখণ্ড, চীন....কণিষ্কের সৈন্যরা সর্বত্র বিজয়পতাকা হস্তে বিরাজমান...যুদ্ধের জ্বালায় পাগল হইয়া শেষে তাঁহার সেনাপতিরা কণিষ্ককে গলা টিপিয়া হত্যা করিল....কোলাহল, অর্ন্তদ্বন্দ্ব, অন্ধকার...এক শতাব্দীব্যাপী অন্ধকার...ধীরে ধীরে অন্ধকার আবার স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে.....চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছেন....লিচ্ছবি-রাজকুমারী কুমারা দেবীর যোগ্য সন্তান সমুদ্রগুপ্তের কিরণে সমস্ত ভারতবর্ষে উদ্ভাসিত...তিনি শুধু সম্রাট নন, তিনি কবি, পণ্ডিত, সুরশিল্পী....দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত....কুমারগুপ্ত....স্কন্দগুপ্ত....ফাহিয়ান ভারত ভ্রমণ করিতেছেন.....অজন্তার গুহায় শিল্পীরা প্রাচীর-চিত্রণে রত...হুন দস্যুরা ভারত আক্রমণ করিল.....গুপ্তসাম্রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে...দস্যু তোরমানা মহারাজাধিরাজ হইলেন.....তাহার পর মিহিরগুলা....মালবের অধিপতি যশোধর্মণ মগধের অধিপতি বালাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া মিহিরগুলাকে পরাজিত করিলেন....তাহাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু হত্যা করিলেন না.....মিহিরগুলা কাশ্মীররাজের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে....বিশ্বাসঘাতক মিহিরগুলা...কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করিল.....হাহাকারে চতুর্দিক পূর্ণ...মিহিরগুলার অত্যাচারে বুদ্ধ-শ্রমণ-শ্রমণীরা সন্ত্রস্ত....বৌদ্ধ স্তূপ, বৌদ্ধ মন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে....হুন-প্রতাপ নির্বাপিত হইয়া আসিল...দস্যু হুন অবলুপ্ত হইয়া রূপান্তরিত হইল ভারতবর্ষের রাজপুত জাতিতে...হর্ষবর্ধন...গৌড়াধিপতি শৈব রাজপুত্র শশাঙ্ক থানীশ্বররাজ বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন....হিউয়েন সাং...তাহার পর অন্ধকার.....আবার যুদ্ধ.....যুদ্ধ...গৃহবিবাদ..... চীৎকার.....হাহাকার.....আবার আলো.....বিরাট জনতা এক বিরাট সিংহাসন মাথায় করিয়া বহিয়া আনিতেছে....সিংহাসনের উপর প্রজানির্বাচিত রাজা গোপালদেব.....ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন....দেবপাল.....তাহার পর আবার অন্ধকার....কাবুলে শাহী-বংশীয় জয়পাল মাথা তুলিতেছে.....সবুক্তগীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল...চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে.....কাণ্যকুব্জ চৌহান চন্দেল্ল সকলে ছুটিয়া আসিতেছেন......সবুক্তগীনকে কিন্তু রোধ করা গেল না...সিন্ধুনদের

তীরে তীরে সবুক্তগীনের বিজয়-পতাকা উড়িতেছে...গজনী হইতে ছুটিয়া আসিল আর এক দস্যু...সুলতান মামুদ.....আবার জয়পাল তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন...পারিলেন না....ক্ষোভে অপমানে তিনি স্থির করিতেছেন—প্রাণ দিব, কিন্তু মান দিব না....জীবন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন.....সুলতান মামুদের লুণ্ঠন-লিপ্সা মিটিল না...বারম্বার আসিতেছে...বারম্বার আক্রমণ করিয়া হত্যায় লুণ্ঠনে ধ্বংস বিচূর্ণিত দেব-মন্দিরে ভারতবর্ষে মুসলমান-বিদ্বেষ বপন করিয়া যাইতেছে...মুলতান, থানেশ্বর, সোমনাথ সব গেল...সুলতান মামুদের সৈন্যবাহিনী হইতে সহসা একটি লোক বাহির হইয়া আসিলেন। যোদ্ধা নয়, পণ্ডিত। যতীনের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন......

যতীন। কে আপনি?

লোকটি। আমার নাম আলবেরুনি। একটিমাত্র খবর দিতে চাই কেবল। সে সময় তোমাদের দেশে সাহিত্য-দর্শন খুব উঁচুদরের ছিল...কিন্তু কি জিনিস দেখেছিলাম জান? তোমরা মানুষের মধ্যে 'ম্লেচ্ছ' আবিষ্কার করেছ। বিদেশী ছুঁলে জল তো বটেই, আগুনও অপবিত্র হয়ে যেত। কি ভয়ানক!

আলবেরুনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আবার ছবির মিছিল শুরু হইল।...বৃদ্ধ দীপঙ্কর অতীশ হিমালয় লঙঘন করিয়া তিব্বতে চলিয়াছেন...বঙ্গদেশে সেন-বংশ রাজত্ব করিতেছে....কর্ণাটের সেন-বংশ বাংলায় আসিয়া বৌদ্ধ-দলনে নিযুক্ত....বিজয় সেন....বল্লাল সেন... কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়া কৌলিন্য স্থাপন করিলেন......অন্ধকার....লক্ষ্মণ সেন....বাংলায় পাঠান সৈন্য প্রবেশ করিতেছে....সপ্তদশ অশ্বারোহীর পুরোভাগে বক্তিয়ার খিলিজি....খিলিজিবংশের রাজত্ব শুরু হইয়া গেল....পিতৃব্যরক্তরঞ্জিত হস্তে আলাউদ্দিন খিলিজি সিংহাসনে আরোহণ করিল....গুজরাটের রাণী কমলা দেবী বন্দিনী হইয়া আলাউদ্দিনের হারেম-কারাগারে প্রবেশ করিতেছেন.....রূপসী হিন্দুনারীর লোভে পাঠান পাগল হইয়া উঠিয়াছে... মেবার আক্রমণ করিল...চিতোরে দলে দলে মেবারী সৈন্য প্রাণ দিতেছে...একজন পুরুষ বাঁচিয়া থাকিতে তাহারা চিতোরে পাঠানকে প্রবেশ করিতে দিবে না...গোর কিশোর বাদলও সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিল.... কিন্তু চিতোর রাখিতে পারিল না...পাঠান সৈন্য অগণিত—চিতোরে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দিন দেখিল, পদ্মিনী নাই....দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে...জহর-ব্রতের জহর খিলিজি-বংশকে ছারখার করিয়া দিল...পদ্মিনীর চিতার আগুনই যেন লেলিহান শিখায় মূর্ত হইল তৈমুরলঙ্গে....চতুর্দিক শবাকীর্ণ....নরমুণ্ডের পাহাড়....রক্ত-কর্দমে দিল্লীর সুলতান-বংশ ধরাশায়ী....রাজ গণেশ মাথা তুলিয়াছেন.....খ্রীষ্টান ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল....পর্তুগীজ জলদস্যুরা অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে....লোদী-বংশ....তাহাও বেশি দিন টিকিল না...পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী বাবরের নিকট পরাজিত হইল....মোগল সাম্রাজ্য.....হুমায়ুন....শের শাহ...হুমায়ুন নিজ ভ্রাতা কামরানের চক্ষু উৎপাটন করিতেছেন....আকবর....আকবরের রাজ্য-বিস্তার....বাংলার পাঠান-নায়ক হিমু পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবরের নিকটে পরাজিত হইলেন....বৈরামের হস্তে তাঁহার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হইতেছে....গুজরাট, খাণ্ডোয়ানা, আহমদনগর, অম্বর, সব গেল...অম্বরপতি ভগবানদাস সম্রাট আকবরের শ্যালক হইলেন....তাঁহার পুত্র মানসিংহ হইলেন যুবরাজ সেলিমের শ্যালক.....পাহাড়ের মত মাথা উঁচু করিয়া রহিলেন কেবল উদয়পুরেব রাণা প্রতাপসিংহ....আকবরের খুশরোজ....সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পুরনারীরা আকবরের উদ্যান-উৎসবে সমবেত হইতেছেন....সেলিম

জাহাঙ্গীর হইল....বর্ধমানের শের আফগান....স্বামী-হন্তা জাহাঙ্গীরের পাশে নূরজাহান শোভা পাইতেছেন.....ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের দূত সার্‌ টমাস রো জাহাঙ্গীরের সভায় আসিয়াছেন....শাহজাহান....নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুর চক্ষু উৎপাটন করিয়া পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন....কনিষ্ঠ ভ্রাতা শারিয়রও রক্ষা পাইলেন না....ইংরেজ বণিক হুগলিতে কুঠি স্পাপন করিতেছে....ময়ূর সিংহাসন...তাজমহল...ভ্রাতৃরক্তে স্নান করিয়া বন্দী পিতার চোখের সামনে ঔরঙ্গজেব ময়ূর-সিংহাসন দখল করিতেছেন....এক হাতে কোরাণ আর-এক হাতে কৃপাণ....জিজিয়া কর পুনরায় প্রবর্তিত হইতেছে....পর্বতের শিখরে শিখরে গৈরিক পতাকা উড়িতেছে... মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী মাথা তুলিয়াছেন....অশ্বারোহণে চতুর্দিক ছুটিয়া বেড়াইতেছেন....ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে গেলেন.....দাক্ষিণাত্যেই তাঁহাকে শেষ-শয্যা পাতিতে হইল... মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতেছে.....নাদির শাহ...দিল্লীর লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড....সারি সারি মৃতদেহ....সারি সারি উট চলিয়াছে....বহু অশ্ব.....কাতারে কাতারে গাড়ি....ময়ূর-সিংহাসন, কোহিনূর, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা—ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য নাদির শাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে....মারাঠার অভ্যুদয়....পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ...সারি সারি তিন শত তোপ, দ্বাদশ সহস্র তোপরক্ষক.....তাহার পিছনে চল্লিশ সহস্র ভোঁসলে, বিংশ সহস্র আরব, ত্রিশ সহস্র হাবসি, চল্লিশ সহস্র পাঠান, জাঠ, রোহিলা, সিন্ধি, জাদব, বহু রাজপুত, জপ্‌কোজি সিন্ধিয়া এবং মহ্লর রাও হোলকারের নেতৃত্বে আহমাদ শাহ দুরানির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান.....মধ্যস্থলে সেনাপতি ভাউসাহেব.....ঈর্ষাদগ্ধ বিশ্বাসঘাতক বলবন্ত রাও সেঁচলের চোখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে......মহারাষ্টশক্তির পরাজয় ঘটিল.....আবার অন্ধকার..... ইংরেজ বণিকের দল.....ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি.....ফরাসী বীর ডুপ্লে.....প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ....দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ.....রবার্ট ক্লাইভ....সিরাজদ্দৌলা.....মীরজাফর.....পলাশীর যুদ্ধ....ওয়ারেন হেস্টিংস.....নন্দকুমারের ফাঁসি.....লর্ড ডালহৌসি.....দেখিতে দেখিতে সব লাল হইয়া গেল.....সিপাহী-বিদ্রোহ.....রুটি ও লালপদ্ম.....সিপাহী-বিদ্রোহের অবসান ঘটিল.....ইংরেজের ভীষণ প্রতিশোধ.....বিশেষ করিয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার .....দিল্লীর হত্যাকাণ্ড নির্মমতায় নাদির শাহকে অতিক্রম করিল.....সুরেন বাঁড়ুজ্জে.....কংগ্রেস.....বঙ্গবিচ্ছেদ.....সাগ্নিক বিপ্লবীর দল.....এক হাতে গীতা, আর-এক হাতে বোমা.....সারি সারি ফাঁসিকাঠে অসংখ্য মড়া ঝুলিতেছে.....অরবিন্দ, সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন.....জালিয়ানওয়ালাবাগ.....বুকে হাঁটিয়া সকলকে পথ অতিক্রম করিতে বাধ্য করা হইতেছে.....চাবুকের চোটে সকলের পিঠের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল.....চতুর্দিকে হত্যা আর হাহাকার.....যতীন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

যতীন। আর তো দেখা যায় না..... এ ছাড়া আর কিছু নেই?

ইতিহাস। না, এরাও আছে—

এক জ্যোতির্ময় পটভূমিকায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—বাল্মীকি, ব্যাস, কপিল, কণাদ, গৌতম, পাতঞ্জল জৈমিনি, চরক, নাগার্জুন অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, হরিসেন, কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, শঙ্করাচার্য রামানুজ, বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভারবী, শ্রীহর্ষ, মাঘ, কহ্লন, বিহ্লন, নন্দী, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, খনা, লীলাবতী, রঘুনন্দন, মাধবাচার্য, রামানন্দ, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিং, চৈতন্য, ফৈজি, আবুল ফজল, টোডরমল, তানসেন, বীরবল.....তাহার পর কিছুক্ষণ

অন্ধকার.....পটভূমিকা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল.....দেখা গেল রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ.....তাহার পর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল মহাত্মা গান্ধীর ছবি.....অসহযোগ আন্দোলন.....চম্পারণ সত্যাগ্রহ.....দাণ্ডি অভিযান:....শীর্ণকান্তি খর্ব ব্যক্তিটি লাঠির উপর ভর দিয়ে হাঁটিয়া চলিয়াছেন.....নগ্নগাত্র, পরিধানে শুভ্র খদ্দরের কটিবাস.....পশ্চাতে বিরাট জনতা.....আব্রাহ্মণ চণ্ডাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব চলিয়াছে.....জনতার ভিতর হইতে গুঞ্জন উঠিতেছে.....জনতার দৃশ্য মিলাইয়া গেল। ইতিহাসও অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু গুঞ্জনটা থামিল না। ঘাড় ফিরাইয়া যতীন দেখিল ভ্রমরটা ঘরের ভিতরে গুনগুন করিয়া বেড়াইতেছে। কখন ঢুকিয়াছে, সে টের পায় নাই।

যতীন। তুমি আবার এলে যে?
ভ্রমর। আমি খুঁজছি।
যতীন। কাকে?
ভ্রমর। তাকে।
যতীন। কে সে?
ভ্রমর। তা তো জানি না।
যতীন। যাকে জান না, তাকে খুঁজছ!
ভ্রমর। জানি, কিন্তু তোমাকে বোঝাতে পারব না।

বাহিরে পাখির সুর শোনা গেল—ফটিক জল, ফটি—ক জল। আর একটা দৃশ্য চকিতে ফুটিয়া মিলাইয়া গেল। নোয়াখালির জঙ্গলে মহাত্মাজী অন্ধকারে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—সঙ্কীর্ণ সাঁকো পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

যতীন। আমি কিন্তু যা জানি, তা তোমাকে বোঝাতে পারি।
ভ্রমর। তার মানেই, ঠিক জান না।
যতীন। জানি না? বল কি?
ভ্রমর। অন্তরের গভীর অনুভূতি কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

সহসা এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিল। ভ্রমর দেখিতে দেখিতে উপনিষদের ঋষি-মূর্তি পরিগ্রহ করিল। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ, পিঙ্গল কেশ, নীল নয়ন, ঋজু সমুন্নত দেহ, জ্যোতির্ময়।

উপনিষদের ঋষি। যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ—যে ভাবে, আমি জানিয়াছি, সে জানে নাই; যে মনে করে, আমি জানি না, সে-ই জানিয়াছে। ঋষি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইলেন। ভ্রমর আবার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যতীন। আজকে খুঁজবে তাহলে কোন্ পথে?
ভ্রমর। অজানা পথে।
যতীন। কিন্তু তুমি তো ঘুরে বেড়াচ্ছ আমার ঘরের মধ্যে, এর সমস্তই তো জানা তোমার!
ভ্রমর। জানার মধ্যেই অজানা থাকে। আপাত-তৃপ্তির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে যে পিপাসা, সে-ই অজানা পথের সন্ধান দেয়।

বাহিরে শোনা গেল—ফটিক জল—ফটিক জল.....

ভ্রমর। আমি চললাম। তোমাকে বলা রইল, একটু খোঁজ রেখো।
যতীন। কিসের খোঁজ রাখব, তাই তো বুঝতে পারলাম না!
ভ্রমর। খোঁজ পেলেই বুঝতে পারবে। চললাম।

ভ্রমর চলিয়া গেল। অশরীরী মেজদি প্রবেশ করিলেন।

মেজদি। ও মিছে কথা বলে নি। আমারও মনে হচ্ছে, এই যে আমার মাথার দপদপানি, হাতের কনকনানি, বুকের ভেতর হু-হু করছে, এর আসল কারণ, তাকে খুঁজে পাইনি। দেখি—

অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। সশরীরে রুমি প্রবেশ করিল। মুখ অতিশয় গম্ভীর, মনে হইতেছে, যেন চোখে মুখে ঝঞ্ঝা স্তব্ধ হইয়া আছে।

রুমি। আজকের পত্রিকাটা কি এখানে?
যতীন। হ্যাঁ।
রুমি। নোয়াখালির খবর পড়েছ?
যতীন। পড়েছি।
রুমি। আমি নীচে বাংলা কাগজটায় পড়লাম। কি ভয়ানক!

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল।

রুমি। এখানেও দাঙ্গা লেগেছে। নীচে বৈঠকখানায় প্রকাণ্ড মীটিং। বড়দা মেজদা দুজনেই ক্ষেপে গেছেন। সেজবউদির ঘন ঘন ফিট হচ্ছে—নীলু-বিলুর কোনও খবর আসেনি।

যতীন। নীলু-বিলু নোয়াখালি থেকে ঢাকায় চলে এসেছে হয়তো, ওদের সকলেরই তো ঢাকা আসার কথা।

রুমি। কেন যে সেজবউদি ওদের মামার বাড়ি পাঠাতে গেল এখন!
যতীন। ছুটিতে বেড়াতে গেছে, এমন হবে কে জানত?
রুমি। তুমি ওটা কি লিখেছ?
যতীন। না, এখনই চাই নাকি?

রুমি। না, থাক্, এখন দরকার নেই। ও পরে হলেও চলবে। এখন (একটু ইতস্তত করিয়া) আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে ছোটদা? হাতে টাকা আছে তোমার?

যতীন। কেন?
রুমি। আমি নোয়াখালি যাব।
যতীন। নোয়াখালি! একা?

রুমি। হ্যাঁ, একাই। সেখানে নীলুবিলু আছে, তা ছাড়া মেয়েদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার হয়েছে, তা শুনে এখানে স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব আমার পক্ষে। আমাকে যেতেই হবে।

যতীন। চল্, আমিও না হয় যাই তোর সঙ্গে।

রুমি। তা গেলে তো ভালই হত, কিন্তু এখন তোমার যাওয়া হবে না। বড়দা মেজদা ঠিক করেছেন এখনই বেরিয়ে যাবেন, সেজদা ঠাকুরঘরে গিয়ে খিল দিয়েছেন। কেউ বাড়িতে থাকবে না, বড়দা ঠিক করেছেন, তোমাকেই বাড়ি আগলাতে হবে। পাড়ায় কোথায় কোন্ ভলান্টিয়ার

থাকবে, তাই ঠিক হচ্ছে। এই ফাঁকে আমি চুপিচুপি চলে যেতে চাই স্টেশনের দিকে খিড়কি দিয়ে। ট্রেন ছাড়বার আগে ওঁরা যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারেন, দেখো—তাহলে কিছুতেই যেতে দেবেন না আমাকে। আমি কিন্তু যাবই—টাকা আছে তোমার কাছে তো? আমার স্কলারশিপের টাকাগুলো তো তোমাকে রাখতে দিয়েছিলাম, কোথা রেখেছ সেগুলো?

যতীন। টাকা আছে। কিন্তু তোকে ওই বিপদের মধ্যে যেতে দিতে আমারও ইচ্ছে করছে না রুমি।

রুমি। (দৃঢ়স্বরে) আমি কিন্তু যাব।

যতীন। (হাসিয়া) টাকা যদি না দিই?

রুমি। হেঁটে যাব। কি করে বলছ তুমি এ কথা ছোটদা! মেয়েদের এত বড় অপমান সহ্য করব ঘরে বসে বসে?

যতীন। গিয়েই বা কি করবি তুই?

রুমি। সমস্ত প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ব তাদের মাঝখানে, সমস্ত বুক দিয়ে আগলাব, সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করব।

যতীন। কিন্তু—

রুমি। দাও, টাকা দাও। না দিলে এই দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরব আমি। উঃ, কি অসহায় করে রেখেছ তোমরা আমাদের!

যতীন। পুরুষের কর্তব্য নারীদের রক্ষা করা, তাই বলছি।

রুমি। তোমরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পার না, আমাদের রক্ষা করবে কি করে? রক্ষা করবার অজুহাতে পঙ্গু করে রেখেছ শুধু। দাও, (প্রায় চীৎকার করিয়া) দাও না—

যতীন। দিচ্ছি, দিচ্ছি। দাদারা বেরিয়ে গেলে তবে তো যাবি, ব্যস্ত কি?

রুমি। ট্রেনের বেশি দেরি নেই। আমি খিড়কি-দরজা দিয়ে এখনই বেরিয়ে যেতে চাই।

যতীন। তোর ভয় করছে না?

রুমি। ভারতবর্ষের মেয়েরা আবার ভয় করেছে কবে! গার্গী, মৈত্রেয়ী থেকে শুরু করে অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, কস্তুরবা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, কমলা নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বীণা দাস, প্রীতি ওয়াৰ্দার, সুচেতা কৃপালিনীর যা ইতিহাস, তা কি ভয়ের ইতিহাস?

রুমির চোখ মুখ হইতে এক অপরূপ আলো বিকীর্ণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত দেহটাই জ্যোতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সেই জ্যোতি ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইলেন রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা—

রাণী দুর্গাবতী। তোমরা এর মধ্যেই কি করে ভুলে গেলে যে, এই সেদিনই সম্রাট আকবরের বিপুল বাহিনীকে তুচ্ছ করে সামান্য রাজপুতানী আমি সম্মুখ-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, প্রাণ দিয়েছিলাম, কিন্তু মান দিইনি?

চাঁদ সুলতানা। মান দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না ভারতবর্ষের নারীরা। তারা জানে, নারীদের অপমান করে যে শয়তানরা, আসলে তারা দুর্বল ভীরু। তাদের হুমকিতে ভয় পায়নি কখনও আত্মসম্মানবতী ভারতরমণী। তাই শয়তান মোরাদের বিরুদ্ধে ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারে দাঁড়িয়ে অসিহস্তে যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিলাম নির্ভয়ে। কারণ মুসলমানী হলেও আমি ভারতরমণী। প্রাণ দিয়েছিলাম, কিন্তু মরি নি, আজও আমরা বেঁচে আছি এদের মধ্যে—

হস্ত প্রসারিত করিলেন। জ্যোতির্ময় দৃশ্য মুছিয়া গেল। যতীন দেখিল, রুমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—প্রদীপ্তনয়না, স্ফুরিতাধরা, বিস্রস্তকুন্তলা।

রুমি। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না ছোটদা, দেবে তো দাও।

যতীন। এই যে দিচ্ছি। আজ ডাক আসে নি?

রুমি। আমার একখানা চিঠি এসেছিল শুধু।

যতীন। কার চিঠি?

রুমি। ঊষা লিখেছে।

যতীন। সমরের বোন ঊষা?

রুমি। হ্যাঁ।

যতীন। সমরের খবর কি?

রুমি। সমর নোয়াখালিতে গুণ্ডার হাতে মারা গেছে।

যতীন। সে কি!

যতীন নির্নিমেষে রুমির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রুমির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইতেছে না.....চোখের দৃষ্টি কঠোর প্রদীপ্ত। শাণিত অসির মত।

রুমি। কতক্ষণ আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে ছোটদা?

যতীন। এই যে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। রুমি চলিয়া গেল। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যতীন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সকলে, এমন কি রুমিও, কর্তব্যে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই কেবল অলসের মত বসিয়া স্বপ্নের জাল বুনিতেছে। পাড়ার শৈলেনবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শৈলেন তথাকথিত কমিউনিস্ট।

শৈলেন। তুমি কি করছ হে যতীন, তেতলার ঘরে বসে? যুদ্ধে যাবে না?

যতীন। সম্মুখ সমরের জন্যে! তাই নাকি?

শৈলেন। হ্যাঁ, ওদের বস্তিটা আক্রমণ করবার আয়োজন হচ্ছে।

যতীন। আপনিও যাবেন?

শৈলেন। আমি? [হাসিলেন] না, আমি যাব না। [গম্ভীর হইয়া গেলেন। পুনরায় হাসিয়া] যেতাম, যদি তোমার বড়দার মতের সঙ্গে সায় দিতে পারতাম। কিন্তু পারলাম না। আমি মনে করি, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিটা সঙ্গত দাবি। সেটা মেনে নিলে আর ঝগড়া থাকে না। হাজার মারপিট করেও কোন ফল হবে না, যতক্ষণ না আসল সমস্যাটার সমাধান হচ্ছে। তোমার কি মত?

যতীন। আমার তো মনে হয়, আপাতত আমাদের আসল সমস্যা পরাধীনতা। আমাদের সকলেরই আগে চেষ্টা করা উচিত তার থেকে মুক্তি পাবার। স্বাধীনতা-অর্জনের-চেষ্টায় যারা বাধা দেবে, তারাই আমাদের শত্রু—তা সে হিন্দু-মুসলমান যে-ই হোক।

শৈলেন। পাকিস্তান যারা চায়, তারাও ঠিক ওই কথা বলছে। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার আগে তারা জানতে চায়, ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে তাদের অবস্থাটা কি হবে অর্থাৎ তাদের ধর্ম সংস্কৃতি

অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না! যে দেশে শতকরা পঁচাত্তর জন হিন্দু সেখানে তাদের এ দাবিটা কি অগ্রাহ্য করবার মত?

যতীন। দাবিটা গ্রাহ্য করবার মত হলে কেউ তা অগ্রাহ্য করত না, করতে পারত না। ইতিহাসের দিক দিয়ে পাকিস্তানের কোন ভিত্তি নেই। ভৌগোলিক ঐক্য যে নেই, তা আশা করি আপনিও মানবেন। পূর্ব-পাকিস্তান আর পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে সহস্র মাইলের ব্যবধান, দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুপ্রধান হায়দ্রাবাদ ওসমানিস্তান হবে নাকি শুনছি! সংস্কৃতির দিক থেকেই বা ঐক্য কোথায়? পেশোয়ারী মুসলমান আর নোয়াখালির মুসলমানের সংস্কৃতি কি এক? ষষ্ঠ শতাব্দীর ইসলাম-সংস্কৃতি কি কোন দেশে আছে এখন আর? বর্তমান ইসলাম-জগৎ অনেক দিন তার থেকে বহুদূরে সরে গেছে, প্রত্যেক ইসলাম-দেশের এখন আলাদা চেহারা, আলাদা আদর্শ। মিশরে অর্ধরাজতন্ত্র, প্যালেস্টাইনে গোলযোগতন্ত্র, সিরিয়াতে প্রজাতন্ত্র, আরবে ইবন সাউদের ইচ্ছাতন্ত্র, ট্রান্সজর্ডনে আমিরতন্ত্র। ইরাকের শিশুরাজাকে কেন্দ্র করে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তা কি ইসলাম-রাষ্ট্র? আফগানিস্তান কার ইঙ্গিতে চলেছে? সুতরাং পাকিস্তানের দাবির যুক্তি কোথায়? রাষ্ট্রগঠনের পটভূমিকায় যে সব জিনিস থাকা দরকার—ভৌগোলিক ঐক্য, সংস্কৃতির ঐক্য, আদর্শ নিষ্ঠা, আদর্শের সার্বভৌমিকতা—পাকিস্তানের তা আছে কি? যাঁরা আজ পাকিস্তানের পরিকল্পনা করছেন, তাঁরাই কি আচারে ব্যবহারে কর্মে চিন্তায় ইসলাম-আদর্শকে অনুসরণ করেন? তা ছাড়া আরও একটা কথা। রাশিয়াতে মুসলমান আছে, চীনে মুসলমান আছে, কই, সে সব দেশে তো পাকিস্তান হয় নি, আর হয়নি বলে যে সে দেশে মুসলমান-সংস্কৃতি লোপ পেয়েছে তাও নয়।

শৈলেন। সবচেয়ে বড় যুক্তি—ওরা ভয় পাচ্ছে যে স্বাধীন ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য হলে ওদের অবলুপ্ত হয়ে যেতে হবে।

যতীন। [হাসিয়া] ভয়টা ওদের নয়, ভয়টা আসলে ইংরেজদের। মুখোশটা তো খুলেই গেছে এখন। ওদের মাইনরিটির জন্যে চমৎকার চিন্তা আসলে যে ওদের অন্নচিন্তাচমৎকারা, তা আর বুঝতে কারও বাকি নেই। মজ্জমান ইম্পীরিয়ালিজম পাকিস্তান-খড় আঁকড়ে বাঁচতে চাইছে।

শৈলেন। সেটা তোমরা বলছ বটে, কিন্তু হিন্দু মেজরিটির হাতে ওরা যে নিরাপদ নয়, সে কথা মানতেই হবে।

যতীন। ইতিহাসের নজির কিন্তু অন্য রকম। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনেও কোনও মুসলমান কি সংস্কৃতিলোপের ভয়ে হিন্দুরাজ্য ত্যাগ করেছে? মানসিংহ রাজমহলে মুসলমানদের জন্য মসজিদ করিয়েছিলেন, রাজা জয়সিংহ করেছিলেন জয়পুরে। মালবের হিন্দু রাজারা মুসলমান প্রজাদের জন্য মক্তব করিয়েছিলেন, মুসলমান মৌলভীদের বৃত্তি দিতে দ্বিধা করেন নি। ঔরংজেবের অত্যাচারেই বরং শিয়া মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। হিন্দুরাজ্যে যৌথভাবে মুসলমান-নারী-নির্যাতনের কটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন আপনি? ঔরংজেব-মহিষী শিবাজীর হাতে বন্দিনী হয়েও সসম্মানে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। খোঁজ করে দেখুন, প্রত্যেক হিন্দু রাজার অধীনে সব সময়েই মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় সৈন্য-বিভাগে চাকরি করত। মারহাট্টারাই বিজাপুর-গোলকুণ্ডা-পতনের পর আশ্রয় দিয়েছিল মুসলমানদের। বার-ভূঁইঞার মধ্যে মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন। চান্দ রায়ের ভগ্নী সোনামণিকে হরণ করেই তো ইসা খাঁ মুসা খাঁর রাজ্য ধ্বংস হল। মুসলমান রাজত্বের অবসানে মুসলিম অত্যাচারের ভয়ে

মধ্যভারত থেকে মুসলমানরা দলে দলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—হিন্দুরাজ্যে। বিচার করে দেখলেও এটা বোঝা শক্ত নয় যে, হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম যা শুধু ইসলামকে কেন, যে কোন ধর্মকেই প্রসন্নচিত্তে আশ্রয় দিতে পারে। কারণ সনাতন হিন্দুধর্মের কোনও গণ্ডি নেই, কোনও বেড়া নেই, অসীম উদারতাই এর বিশেষত্ব। মুসলমানদের ভয়টা অমূলক, অখণ্ড ভারতে ওরা আনন্দেই থাকবে।

শৈলেন। [হাসিয়া] দেখ ভায়া, যা আওড়ালে তো কেতাবের মুখস্থ বুলি। হিন্দুধর্মের উদারতার নজির দেখতে পাবে পাড়াগাঁয়ের পুকুরঘাটে গেলে। হিন্দুর ঘাটে মুসলমান জল নিতে পায় না, হিন্দুর গ্রামে মুসলমানের কোরবানি করবার উপায় নেই। হিন্দুধর্মের উদারতার ঠেলায় আর একটা নতুন জাতই তৈরি হয়ে উঠেছে—শিডিউলড কাস্ট্।

যতীন। সেটা হিন্দুধর্মের দোষ নয়, অশিক্ষার দোষ। বহুদিন পরাধীন থেকে আত্মবিস্মৃত হয়েছি। শিডিউল্ড কাস্ট্—এখানকার বুলি। ভারতের সনাতন ধর্ম যে অস্পৃশ্যকে ঘৃণা করেনি, তার প্রমাণ—কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব, কত নাম করব? না, স্বাধীন ভারতে ভারতধর্মই প্রতিষ্ঠিত হবে, অস্পৃশ্যতা বলে কিছু থাকবে না। এখন থেকেই তা দূর করবার চেষ্টা চলেছে। সফলও হবে সে চেষ্টা। ওর জন্যে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার দরকার নেই। অখণ্ড ভারতই আমাদের কাম্য।

শৈলেন। আচ্ছা, হঠাৎ আজ তোমরা অখণ্ড ভারতের ধুয়ো তুলেছ কেন, বুঝি না। অখণ্ড ভারত কি ছিল কোনকালে? রামায়ণ-মহাভারতের আমল থেকেই দেখ না, পঞ্চাশটা দেশের পঞ্চাশটা রাজা পরস্পরের মধ্যে মারামারি করছে। আরও এগিয়ে এস, থানীশ্বরের সঙ্গে মৌখরী, গৌড়ের সঙ্গে থানীশ্বর, পৌণ্ড্রের সঙ্গে বঙ্গ, বঙ্গের সঙ্গে সমতট— কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আর সকলের মূলে ওই সেলফ্-ডিটারমিনেশন—প্রত্যেকেই নিজের সংস্কৃতি বাঁচাতে চায় এবং প্রচার করতে চায়। কারও দেবতা বিষ্ণু, কারও শিব, কেউ বৌদ্ধ, কেউ শাক্ত। এ ছাড়া আর কি আছে? ক্রমাগত দেখে যাও, এই পাবে। এই যাদের ইতিহাস—মানে, দেশের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—হঠাৎ তাদের আজ অখণ্ড ভারত বলে চীৎকার করবার মানে?

যতীন। কারণ ওইটেই আদর্শ। ইতিহাসেই দেখা গেছে যখনই ভারত অখণ্ড হয়েছে কিংবা অখণ্ডতার কাছাকাছি এসেছে, তখনই তার সমৃদ্ধি। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল, আকবর প্রভৃতি তার উদাহরণ, এমন কি ইংরেজ-রাজত্বের নিষ্ঠুর শোষণ সত্ত্বেও আমাদের যা কিছু উন্নতি তা ভারতের অখণ্ডতার জন্যে—ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে তাই আমরা অখণ্ডতা চাই।

শৈলেন। কিন্তু এই ছত্রিশ জাতের মধ্যে অখণ্ডতা রাখতে হলে যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, তা কি ওই হিন্দু-মেজরিটি স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে থাকবে? বিদেশী ইংরেজের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল তবু কতকটা। সুতরাং মুসলমানদের ভয়টা অমূলক নয়।

মেজদা প্রবেশ করিলেন এবং শৈলেনবাবুর কথার খানিকটা শুনিতে পাইলেন।

মেজদা। মুসলমানের ভয়? কে মুসলমানদের ভয় করছে?

ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া এমনভাবে চাহিলেন, যেন মুসলমান-ভীত কোনও লোকের সান্নিধ্য তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নন।

শৈলেন। [হাসিয়া] না, মুসলমানকে ভয় করছে না কেউ। আমি যতীনকে শুধু বোঝাচ্ছিলাম যে, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিটা অসঙ্গত নয় নিতান্ত।

মেজদা। [অপ্রত্যাশিত রুক্ষকণ্ঠে] দেখ শৈলেন, তোমার ওই কমিউনিস্টিক বুজরুকি নিয়ে সরে পড় মানে মানে বলছি। তা না হলে অপমানিত হবে।

শৈলেন। [সবিস্ময়ে] হঠাৎ আমার উপর রাগের কারণ! [হাসিয়া] যাঃ বাবা!

মেজদা। কারণ তোমাদেরও আমি মুসলমান বলে মনে করি। মেটিয়াবুরুজে তোমরা যা করেছ, তা কাগজে পড়ে অবধি আপাদমস্তক জ্বলছে। তুমি পাড়ার ছেলে, অনেকদিনের আলাপ, [তিক্ত হাসি হাসিয়া] হিন্দু কিনা, তাই এ দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারিনি এখনও, কিন্তু ব্যারোমিটার যে রকম নাবছে তরতর করে, কি হয় বলা যায় না সরে পড়।

শৈলেন। মেটিয়াবুরুজে কোথায় কে কি করেছে তার জন্যে আমার উপর ঝাল ঝাড়বে! আশ্চর্য বিচারবুদ্ধি তোমার!

মেজদা। সেদিন গোখরো সাপটা মারবার বেলায় তোমার বিচারবুদ্ধিও এই রকম ছিল। সে তো তোমায় কামড়ায় নি কিংবা কাউকে কামড়াতেও যায় নি, খড়ের গাদায় লুকিয়ে ছিল। মারলে কেন তাকে?

শৈলেন। উপামগুলো একটু ভদ্রলোকের মত দিলেই ভাল হয়। মানুষের সঙ্গে সাপের তুলনা যে চলে না, সে বুদ্ধিটুকু তোমার কাছে প্রত্যাশা করি অন্তত মেজদা।

অনুকম্পাভরে একটি সবজান্তাগোছ হাসি হাসিল।

মেজদা। (সহসা সপ্তমে চড়িয়া) বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিলেন। শৈলেনবাবু পড়িয়া যাইতেছিলেন, যতীন ধরিয়া ফেলিল এবং চেয়ারটায় বসাইয়া দিল।

যতীন। ছি ছি, মেজদা, কি করলে তুমি?

মেজদা। বেশ করেছি। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দূর করে দে। সাপের জাত। তোকে যা বলতে এসেছিলাম শোন। বড়দা আর আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এখানেও গোলমাল শুরু হয়েছে, তোমার সেজদা পুজোর ঘরে, কখন বেরুবেন ঠিক নেই। তোমার উপরই বাড়ির ভার রইল, কোথাও বেরিও না যেন।

যতীন। আচ্ছা।

মেজদা চলিয়া গেলেন। কিন্তু অশরীরী বেশে তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন। যতীন শৈলেনবাবুর দিকে চাহিল, দেখিল, তিনি আশ্চর্যরকম সামলাইয়া লইয়াছেন। এমনভাবে জানালার দিকে চাহিয়া বহির্দৃশ্য দেখিতেছেন, যেন কিছুই হয় নাই। অশরীরী মেজদার অস্তিত্ব তিনি অনুভবই করিতে পারিলেন না। যতীনের মনের ভাবও অশরীরী বেশে মূর্ত হইল এবং অশরীরী মেজদার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। শৈলেনবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অশরীরী মেজদা। দেখ যতীন, আমার ওই শৈলেনের কাছে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছি না।

যতীনের মনের ভাব। খামাখা কেন তুমি ওঁকে অপমান করতে গেলে মিছিমিছি!

অশরীরী মেজদা। কারণ ওকে ঘৃণা করি। [একটু থামিয়া] শুধু ওকে নয় সকলকে—হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বাঙালী বিহারী সাহেব মাড়োয়ারী আত্মীয় অনাত্মীয়—সকলকে। নিদারুণ ঘৃণার উত্তপ্ত ঘূর্ণাবর্তে সারাজীবনটা নাকানি-চোবানি খাচ্ছি, সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কিন্তু কি করব— নিজের যুক্তিকে অতিক্রম করতে পারি নি।

যতীনের মনের ভাব। যুক্তি মানে?

অশরীরী মেজদা। যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখেছি, কোথাও এতটুকু ভাল দেখতে পাই নি। ধার্মিকের মধ্যে ভণ্ডকে, স্বদেশসেবীর মধ্যে স্বার্থপরকে, সাহিত্যিকের মধ্যে যশাকাঙ্ক্ষীকে, বীরের মধ্যে গোঁয়ারকে দেখেছি, মাতৃস্নেহেও প্রত্যক্ষ করেছি পাশবিক ক্ষুধা, পত্নীপ্রেমে যৌন-লালসা, নিপুণ অতিথিপরায়ণাতার মধ্যে দেখেছি বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টা, উপকারীর মধ্যে দেখেছি মতলববাজকে— কোথাও একবিন্দু আলো দেখতে পাই নি—কোথাও না। এখন যা করতে যাচ্ছি তা ভাল বলে নয়, বড়দাকে ভয় করি বলে।

যতীন। কিন্তু আলো তো অনেক আছে মেজদা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেন?

বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ হইতেই যতীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, একটি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র বামনমূর্তি দাঁড়াইয়া আছে—তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া স্পর্ধার লাল আভা বিকীর্ণ হইতেছে। বিস্ফোরণের শব্দটা বোধ হয় বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইল। চোখের দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য মূর্ত।

বামন। আমি দেখতে দিই নি।

যতীন। কে আপনি?

বামন। আমি ওর অহঙ্কার।

যতীন। মেজদার অহঙ্কার—বামন!

বামন। বাপের সম্পত্তি ছাড়া আর কি আছে ওর? সারাজীবন উদ্বাহু হয়ে আছে চাঁদ ধরবে বলে, কিন্তু নাগাল পায়নি, চাঁদের কলঙ্কটাকে নিয়েই মাতামাতি করছে তাই। তোমাদের মধ্যেও আমি আছি, কিন্তু ভিন্ন রূপে। [হাসিয়া] চিনতে পারছ না তোমার নীল পরীকে? তোমার চোখে আমিই পরিয়েছি স্বপ্নের অঞ্জন, আমিই সুবর্ণখচিত পুষ্পকরথে চড়িয়ে তোমার বড়দাকে নিয়ে গেছি আভিজাত্যের অলকাপুরীতে, তোমার সেজদাকে বেঁধেছি স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্র সাধনে। [আবার চোখে মুখে স্পর্ধা মূর্ত হইল।] আমিই অসম্ভবকে সম্ভব করি, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টি-প্রেরণার মূলেও আমি বর্তমান।

সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। যতীনের চোখে চকিতের মধ্যে আর একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। অন্ধকার গভীর অরণ্য... একটা জটিল শাখাপত্র-বহুল গাছে একটা ঘড়ি টাঙানো আছে....তাহাতে দুইটা বাজিয়াছে....পাঁচটা বাজা উচিত .... অরণ্য ভেদ করিয়া অতি কষ্টে মহাত্মাজী অগ্রসর হইতেছেন, ঘড়িটাকে ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি থামিবেন না। ....এ দৃশ্যও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।... যতীন দেখিল, অশরীরী মেজদা তখনও দাঁড়াইয়া আছেন।

অশরীরী মেজদা। না, কোথাও আলো দেখতে পাই না। সূর্যের স্পট্‌গুলোর কথাই আগে মনে পড়ে, মেঘের মধ্যে ধূলিকণার অস্তিত্ব কল্পনা করি। বুঝতে পারি যে, আমার মধ্যেও গলদ আছে, কিন্তু স্বীকার করতে পারি না। শৈলেনের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, কিন্তু পারছি না। চললাম।

অশরীরী মেজদা চলিয়া গেলেন। যতীন দেখিল, শৈলেনবাবু ঠিক তেমনিভাবে জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন।

যতীন। [অতিশয় সঙ্কোচভরে] কিছু মনে করবেন না শৈলেনদা। মেজদা একটু—

শৈলেন। [এক মুখ হাসিয়া] আরে, ওতে মনে করবার কি আছে! তোমার মেজদাকে চিনি না? ছেলেবেলা থেকে দেখছি, চিরকালের গোঁয়ারগোবিন্দ লোক। রাস্তায় একটা ষাঁড়ে যদি গুঁতিয়ে দিত, কি আর করতাম!

বড়দা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে দুইটি বন্দুক।

বড়দা। যতীন, দুটো বন্দুক রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে। বাড়ি থেকে এক পা নড়বে না। আমার দুটো বন্দুক নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কাছে দুটো থাক্, একটা তোমার জন্যে, আর একটা তোমার সেজদার জন্যে। তোমার সেজদা পুজোর ঘরে, তাই তার হাতে দিয়ে যেতে পারলাম না, তোমার কাছেই থাক্, যদি চায় দিও। ইদানীং পুজো নিয়ে মেতেছে, কিন্তু ও-ই আগে সবচেয়ে ভাল বন্দুক চালাত। আচ্ছা, যাই তাহলে। খুব সাবধানে থেকো।

বড়দা শৈলেনবাবুর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। শৈলেনবাবু কিন্তু এ তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে পারিলেন না, গায়ে পড়িয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

শৈলেন। আপনারা চললেন তাহলে?

বড়দা। [অভিজাতসুলভ নম্রতাসহকারে] যেতেই হবে, না গিয়ে উপায় নেই। তুমি কি এখানেই থাকবে? মেয়েদেরও নিয়ে এস না হয় এখানে। তোমাদের অঞ্চলটায় ওরা আছে দু-এক ঘর—

শৈলেন। না, আমি বাড়ি যাব। [হাসিয়া] আমার সে সব ভয় নেই।

বড়দা। ও, তাহলে সেই ভাল। চা খেয়ে যাও তাহলে, চা কি এখানে পাঠিয়ে দিতে বলব?

শৈলেন। সে হবে এখন । কিন্তু একটা কথা—

বড়দা চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কথাটা শুনিবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শৈলেন। আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে যে, আপনার মত লোকও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছেন। কেন যাচ্ছেন ভেবে দেখছেন কি একবারও?

বড়দা। আমার ব্যক্তিগত ভাবনার স্থান এতে নেই। ডাক এসেছে, যেতেই হবে। [হাসিলেন।]

শৈলেন। আপনাদের এই উৎসাহ যদি দেশের প্রোলিটারিয়েদের উন্নতিসাধনে লাগাতে পারতেন, তাহলে একটা কাজের মত কাজ হত। অ্যারিস্টক্র্যাটদের চাপে মরে গেল যে বেচারারা!

বড়দার চোখের কোণে একটা আলোর দীপ্তি ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসির আভায় তাহার জ্বালা নিবিয়া গেল। শৈলেনের সঙ্গে তর্ক করিয়া তিনি নিজেকে অবনত করিতে চাহিলেন না, একটু মুচকি হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

যতীন। একটু চা খেয়ে যান।

শৈলেন। তা খেতে পারি, কাল থেকে চা খাই নি। আমাদের বাড়িতে চা ফুরিয়েছে কাল থেকে। [হাসিয়া] দোকান-পাট বন্ধ, কিনতেই পারি নি। একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হত, বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি, মেয়েরা ভাবছে হয়তো।

যতীন। হ্যাঁ, এই যে—ছটু ছটু—এই বেহারী—ওরে, কে আছিস? সব পালিয়েছে বোধ হয়। ওরে ছটু—

সহসা দ্বারপ্রান্তে অশরীরী বড়দা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে রূপার ট্রে, ট্রের উপর অতিশয় মূল্যবান টী-সেট। ট্রেটি সামনের তেপায়ার উপর রাখিয়া নিজহস্তে তিনি চা ছাঁকিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চায়ের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। এক কাপ চা ছাঁকিয়া তিনি শৈলেনের দিকে আগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, শৈলেনবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যতীনের অশরীরী মনোভাবের সহিত বড়দার নীরব আলাপ শুরু হইল।

যতীনের মনোভাব। বড়দা, তুমি কেন চা আনতে গেলে?

অশরীরী বড়দা। কেন, তাতে ক্ষতি কি? অতিথিকে সেবা করলে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় না। তা ছাড়া আর একটা কারণে এলাম, শৈলেন প্রোলিটারিয়েটদের কথা তুলেছিল। ওর মুখের ওপর জবাবটা দিলে অশোভন হত তাই দিই নি; তোকে বলে যাচ্ছি, তুই যদি পারিস আভাসে ইঙ্গিতে বলে দিস, [হাসিয়া] অভদ্রতা করো না যেন। আভিজাত্যের সঙ্গে অভদ্রতা মানায় না। আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায়, কর্মে যা নিখুঁত, তাই আভিজাত্যের ভিত্তি। আভিজাত্য আদর্শবাদী, কোন কারণেই তার সুর নেবে যায় না। এরা ইংলণ্ডের চার্লস, ফ্রান্সের লুই, রুশিয়ার নিকোলাস আর পরাধীন ভারতবর্ষের জনকতক হঠাৎ-বড়লোক ডাকাত রাজা-জমিদারদের দশ-হাত-ফেরতা ইতিহাস মুখস্থ করে আসল আভিজাত্যের স্বরূপ ভুলে গেছে। রাজর্ষি জনক বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম এদের ক্বচিৎ মনে পড়ে, আর যখন পড়ে তখন এদের কাণ্ড দেখে দুঃখ হয়। আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে রচিত জনপ্রিয় নাটকে আজকাল রামের চরিত্র যে ভাবে আঁকা হয় এবং তা দেখে লোকে যে রকম হাততালি দেয়, তাতে জনতার রুচিবোধের প্রশংসা করতে পারি না। সীতাকে বনে পাঠিয়ে রামচন্দ্র কুলগুরু বশিষ্ঠের সামনে অশিষ্টের মত দাপাদাপি করছে আর সামান্য কেরানীর মত হাউহাউ করে কাঁদছে, এই দেখে সবাই মহাখুশি। এর থেকে মনে হয়, আভিজাত্যের স্বরূপ এরা ভুলে গেছে। অর্থলোলুপ ইহালোকসর্বস্ব বণিকসভ্যতার আওতায় বহুকাল বাস করার ফলে এদের ধারণা হয়েছে যে, নিছক পশুত্বের চর্চা করাটাই পরমার্থ, আর যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা জমাতে পারলেই বুঝি আভিজাত্য হয়। ইংরেজী 'অ্যারিস্টক্র্যাসি' শব্দটারও ব্যাকরণ যদি এরা অনুধাবন করত, তাহলে বুঝতে পারত যে, যে প্রাচীন আর্য গ্রীকজাতি থেকে সমস্ত ইয়োরপীয় সভ্যতার জন্ম, সেই গ্রীক ভাষার 'অ্যারিস্টস' শব্দ থেকে অ্যারিস্টক্র্যাসি কথাটা উৎপন্ন হয়েছে; 'অ্যারিস্টস'-এর অর্থ—যা সর্বোৎকৃষ্ট। অসভ্য কোটিপতিরা নয়, যারা সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে সর্বোৎকৃষ্টপন্থী তারাই 'অ্যারিস্টক্র্যাট'। বিদুর অ্যারিস্টক্র্যাট, ধৃতরাষ্ট্র নয়। কিন্তু আজকাল কেউ ব্যাকরণ পড়তে চায় না, নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে। ব্যাকরণের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির যে ইতিহাস লেখা আছে, তা জানতে চায় না কেউ আজকাল—কষ্ট করে কার্ল মার্কস পড়ে, পাণিনি পড়ে না। তাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা জানে না কেউ, আভিজাত্যের স্বরূপও অজ্ঞাত তাই অনেকের

কাছে। এরা মনে করে, পৃথিবীতে দুটি মাত্র জাত আছে—ধনী এবং দরিদ্র, এবং এই ধনী-দরিদ্রদের কোন রকমে একটা কটাহে চড়িয়ে বিদ্রোহের আগুনে গালিয়ে, বিজ্ঞানের ফ্যাক্টরিতে অর্থনৈতিক ছাঁচে ঢালাই করে ফেলতে পারলে পিলপিল করে বাজারে যে মানুষ বেরুবে, তাদের মধ্যে আর কোন বৈষম্য থাকবে না, ছাঁচে-ঢালাই করা পুতুলের মত সব সমান হয়ে যাবে, জগতে সাম্য স্থাপিত হবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে সূর্য-চন্দ্রের মত সব সমাজে চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, তা এরা বোঝে না; মনে করে, কোনও একটা বিশেষ ফরম্যুলায় ফেলে দিলেই সব বুঝি একাকার হয়ে যাবে। ওদের সোভিয়েট রাশিয়ার দিকেও ভাল করে চেয়ে দেখে না ওরা, দেখলে দেখতে পেত, সেখানেও এই চতুর্বর্ণ বিরাজমান। সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে তাকালে আমার আনন্দ হয়, নবজাগ্রত জাতির জীবন্ত শক্তির মহিমায় ওরা ভরপুর, ওরা জেগেছে, ওরা বাড়ছে। ওরা ভাঙবে গড়বে বদলাবে, কত কি করবে! ওদের নকল করে আমাদের দেশে এই যে অদ্ভুত একটা খিচুড়ি হয়েছে, এদের দেখলে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। আমাদের বেচু খানসামার কথা মনে পড়ে, গত যুদ্ধের সময় খবরের কাগজ দেখে সে কাইজারের মত গোঁফ রেখেছিল। এরাও শ্রমিকের দুঃখে বিগলিত হয়েছে। দুঃখীর দুঃখে বিচলিত হয়ে যাঁরা আত্মবিসর্জন করেন, তাঁরাই তো প্রকৃত আভিজাত্যমণ্ডিত মহাত্মা, মহাত্মা গান্ধীই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত ব্যক্তি। কিন্তু এরকম মহাত্মা যুগযুগান্তরে দু-একজন আবির্ভূত হন,—বুদ্ধ চৈতন্য অলিতে গলিতে ক্লাবে থিয়েটারে কিলবিল করে বেড়ায় না কখনও! সর্বহারা শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিতচিত্ত এদের দেখলে মনে হয়, এদের চিত্ত যে বিগলিত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শ্রমিকের দুঃখ নয়, ফ্যাশনের মোহে এবং ভোগের লোভে। সত্যিই যদি এরা শ্রমিকদের দুঃখে বিচলিত হত, তাহলে এদের ব্যবহার মনকে ক্ষুব্ধ করত না, মুগ্ধ করত। মতের সঙ্গে না মিললেও মুগ্ধ করত। আমি এদের শ্রদ্ধা করবার চেষ্টা করেছি, পারি নি। বার বার মনে হয়েছে, তাহলে এরা এত বিলাসী, এত উচ্ছৃঙ্খল হত না। ইঁটের উপর বসে মাটির গ্লাশে বাজে চা খায় যারা, তাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে এরা যখন গদিআঁটা চেয়ারে বসে দামী কাপে উৎকৃষ্ট দার্জিলিং চা অনর্গল পান করে, তখন, সত্যি বলছি, সন্দেহ হয়। অতীত গৌরব, জাতীয় সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদা সমস্তই মূল্যহীন এদের কাছে—তাই শৈলেন অনায়াসে প্রশ্ন করলে, আপনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব করতে যাচ্ছেন কেন? না গেলেই যে অন্যায় হত, সে বোঝাবার বুদ্ধি ওর নেই—আত্মসম্মানের কোনও ধার ও ধারে না। বার বার কপচে প্রোলিটারিয়েট কথাটা মুখস্থ করেছে কেবল। এংগেল্‌সের কথা বেদবাক্য বলে মনে করে, গীতা ওর কাছে মূল্যহীন। 'হত্যাকাণ্ড' 'হত্যাকাণ্ড' বলে চীৎকার করছে তাই। যুদ্ধে চিরকালই নিরীহ লোক মারা যায়। আমরা যুদ্ধ করতে চাইও না, কিন্তু বাড়ি চড়াও হয়ে নিরীহ ছেলেমেয়েদের মারবে, আমরা আত্মরক্ষাও করব না? বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডীতে আমরা আস্থাবান, কাউকে মারতে বা বাঁচাতে পারি এ অহঙ্কার আমাদের নেই, কর্তব্যপথে নির্ভয়ে নিরাসক্তচিত্তে অগ্রসর হওয়াটাই পৌরুষ বলে মনে করি, এবং তাই আমরা শক্তির উপাসক। মহাত্মাজীর অহিংস শক্তি যদি ব্যবহার করতে পারতাম, তাহলে করতাম; কিন্তু দেখলাম, তা পারব না। তাই যা পারব তাই করতে যাচ্ছি—কারণ মহাত্মাজীই বলেছেন—Where there is only a choice between cowardice and violence I would advise violence.......এখন চুপ করে বসে থাকাটা ভীরুতা হবে—পারিস তো বুঝিয়ে দিস ওকে এসব।

অশরীরী বড়দা অন্তর্হিত হইলেন। ছট্টু চা লইয়া প্রবেশ করিল।

যতীন। বড়দা-মেজদা চলে গেলেন?
ছট্টু। হাঁ হুজুর।
যতীন। রুমি কোথা?
ছট্টু। তিনি আগেই বেরিয়ে গেছেন।

ছট্টু দুইজনকে চা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শৈলেন চায়ে একটা বড়গোছের চুমুক দিয়া যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। যতীন অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে চা খাইতে লাগিল।

শৈলেন। দেখ যতীন, তোমার মেজদা যে আমাকে অপমান করলেন তাতে আমার দুঃখ নেই, কারণ কমিউনিস্ট হয়েছি যখন, তখন অপমানই আমাদের অঙ্গভূষণ। [হাসিলেন] তা ছাড়া মেজদাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি তো, চিরকালই ওই রকম। কিন্তু চড়ের চেয়ে বেশি লাগল কি জান?

যতীন। কি?

শৈলেন। তোমার বড়দার মুচকি হাসিটা। ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণ। মেজদার সঙ্গে ঘুষোঘুষি করে কোনদিন হয়তো তাঁকে আমাদের দলে টানলেও টানতে পারি, কিন্তু তোমার বড়দা সাংঘাতিক। ঘাড় ফিরিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছে অতীতের দিকে, কিছুতেই সে ঘাড় ফেরানো যাবে না। বেশি জোর করলে ভেঙে যাবে, তবু নুইবে না। পাথরের তৈরি বিরাট একটা 'ফসিল' যেন। আচ্ছা যতীন, তুমি তো এ যুগের ছেলে, তুমিও কি বিশ্বাস কর না যে, সামাজিক বৈষম্য দূর করাই আমাদের সর্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত? সাম্য না হলে স্বরাজের কোনও মানে হয়?

যতীন। বৈষম্য কোনও দিন দূর হবে বলে মনে করি না। তবে যে স্বরাজ আমি কামনা করি, তাতে সাম্য না থাকলেও প্রতিটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। খাওয়া, পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের অভাবে কেউ কষ্ট পাবে না, সকলেই সমান সুযোগ পাবে বড় হওয়ার। আর সবচেয়ে বেশি কি চাই জানেন—প্রত্যেকটি ভারতবাসী ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবে। লোভে লালায়িত হবে না, হিংসায় জর্জরিত হবে না। ঐশ্বর্য নয়, শান্তিই হবে তার কাম্য।

শৈলেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি কোনও সমাজের উন্নতি হয়?

যতীন। ভারতবর্ষের শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা থাকবে। তা আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক; ভোগে নয়, ত্যাগে।

শৈলেন। তুমি দেশসুদ্ধ সবাইকে তাহলে লেংটি পরিয়ে সন্ন্যাসী বানাতে চাও নাকি?

যতীন। [হাসিয়া] আমি বানাতে চাইলেও হবে না, সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ নয়। তবে ত্যাগের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে যদি মেনে নেয় সকলে, তাহলে সন্ন্যাসী না হতে পারলেও অনেক ভদ্রলোক হবে, সমাজে শান্তি থাকবে। ঐশ্বর্য লোটবার জন্যে পৃথিবীব্যাপী এই যে কদর্য হুড়োহুড়ি মারামারি রক্তারক্তি চলেছে, এর থেকে রক্ষা পাবে সমাজ।

শৈলেন। তোমার ত্যাগের আদর্শ অন্য দেশকে যদি উদ্বুদ্ধ না করতে পারে? তারা যদি এসে আক্রমণ করে?

যতীন। ত্যাগের আদর্শ থাকবে বলে যে দেশরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না, তা তো নয়। আদর্শ ক্ষত্রিয়সমাজ গড়ে তুলতে হবে। তারা যুদ্ধ করবে নিজের দেশ রক্ষা করবার জন্যে, অপর দেশ লুণ্ঠন করবার জন্যে নয়।

শৈলেনবাবু কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

শৈলেন। তোমার এই স্বপ্ন সফল হবে বলে মনে কর?
যতীন। আশা করি।
শৈলেন। কি করে হবে, শুনি?
যতীন। শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার করে। তা করবার আগে অবশ্য দেশের স্বাধীনতা চাই।
শৈলেন। কি উপায়ে পাবে সে স্বাধীনতা?
যতীন। স-হিংস অ-হিংস যে কোনও উপায়ে।
শৈলেন। এর মধ্যে কোন্‌টা ভাল মনে কর তুমি?
যতীন। ভারতবর্ষের আদর্শই হচ্ছে প্রেম। সুতরাং অহিংস উপায়টাই ভাল বলে মনে করি। কিন্তু সকলের পক্ষে সে পথে চলা সম্ভব না-ও হতে পারে। না যদি হয়, তাহলে স-হিংস উপায় অবলম্বন করেও স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। মোট কথা, স্বাধীনতা চাই-ই—স্বাধীনতা না পেলে কিছুই হবে না।

ছট্টু প্রবেশ করিল।

ছট্টু। শৈলেনবাবু, আপনাকে বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে। মাইজীরা ভয় পেয়েছে বড়।
শৈলেন। ও, আচ্ছা, উঠি তাহলে ভাই।
উঠিলেন। যতীনও উঠিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেন। তোমরা সব মহৎ লোক, আকাশচুম্বী তোমাদের আদর্শ। আমরা মাটির মানুষ, আমাদের কারবার ছোটলোক নিয়ে। আমাদের তোমরা ঘৃণা করতে চাও, কর—
যতীন। কি যে বলেন শৈলেনদা!

তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

যতীন। আপনাকে ঘৃণা করতে পারি কখনও? আমাদের সঙ্গে মতে না মিললেও সারাজীবন আপনি যে দেশের কাজই করেছেন, তা কি ভুলতে পারি কখনও? তা ছাড়া ঘৃণার কোনও স্থানই নেই আমার আদর্শে, আমি কাউকে ঘৃণা করি না।
শৈলেন। তুমি কাউকে ঘৃণা কর না?
যতীন। না।
শৈলেন। কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু—আচ্ছা, চলি।
যতীন। রাগ করে যাচ্ছেন না তো শৈলেনদা? [পুনরায় জড়াইয়া ধরিয়া] বলুন, আপনি বলে যান—
শৈলেন। না না, রাগ করব কেন? আহা, ছাড়্ না। কি যে অবুঝ তুই—

নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া হাত দিয়া চোখটা মুছিয়া ফেলিলেন। যতীনের ব্যবহারে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। যতীন দেখিল, টিকটিকি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

টিকটিকি। আচ্ছা, তোমার ওই শৈলেনবাবু আমার কিছু উপকার করতে পারবেন?

যতীন। কেন, কি হল তোমার?

টিকটিকি। আমার টিকটিকিনী পালিয়ে গেল।

যতীন। কোথায়?

টিকটিকি। আর একটা টিকটিকির সঙ্গে। [সক্ষোভে] তোমরা কেন যে জানলার ওপরে টিনের 'সান-শেড' লাগাতে গেছ, বুঝি না। একটা গুণ্ডা এসে আশ্রয় নিয়েছে।

যতীন। গুণ্ডা!

টিকটিকি। হ্যাঁ গো। ইয়া কেঁদো মোটা গুণ্ডা একটা। ওদিকের সমস্ত দেওয়ালটা জুড়ে রাহাজানি করে বেড়াচ্ছে, কারও ঘেঁষবার উপায় নেই। টিকটিকি তো নয়, যেন কুমীর একটা।

যতীন। কই, দেখি নি তো!

টিকটিকি। [সশ্লেষে, তাহার কথার অনুকরণ করিয়া] কই, দেখিনি তো! তুমি আবার আমার দুঃখ কবে দেখতে পাও? নিজের দিকেই তো সারা দৃষ্টি ফিরিয়ে বসে আছ সর্বক্ষণ। স্বার্থপর কোথাকার! একটু আলো জ্বেলেও তো উপকার করতে পার না। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গেলাম। খেতে পেলে আমিও অমনই কেঁদো মোটা হতাম। তাহলে কি আমার টিকটিকিনী পালায়! আমার এ দুর্দশার জন্যে দায়ী তুমি।

যতীন। আমি! বল কি?

টিকটিকি। হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আবার কে?

যতীন। আমার আলোর উপর ভরসা করে বসে আছ কেন? বাইরের পৃথিবীতে চরে বেড়াও না, যেমন আর সবাই করছে।

টিকটিকি। তা পারলে আর ভাবনা ছিল না। ঘরে বাইরে সব জায়গায় আমাদের এলাকা ঠিক করা আছে, একজনের এলাকায় আর একজনের প্রবেশ নিষেধ। বাইরে যাব কি, তোমার ওই জানলার চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত ঘেঁষবার জো নেই, ওত পেতে বসে আছে গুণ্ডাটা। একমাত্র উপায়—গায়ের জোর বাড়ানো, কিন্তু খেতে পাচ্ছি না, জোর বাড়বে কি করে? তোমার উপর আর ভরসা নেই, দেখি শৈলেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে—শুনেছি উনি অনেক অত্যাচারীকে জব্দ করেছেন।

যতীন। মানুষ-অত্যাচারীকে জব্দ করেছেন। টিকটিকি-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কিছু করেছেন বলে তো শুনিনি।

টিকটিকি। মানুষ-অত্যাচারীর বিরুদ্ধেই আমি নালিশ করব। ওঁকে বলে তোমাকে বাধ্য করব আমি আলো জ্বেলে রাখতে। হেঁ-হেঁ, আজকাল আর সেদিন নেই যে, যা খুশি তাই করবে। তুমি কিনেছ বলে ও আলো যে একলা তোমারই, সে আইন নেই আজকাল—হেঁ-হেঁ—শৈলেনবাবুকে ধরে দেখ না—

যতীন। [হাসিয়া] শৈলেনবাবুকে ধরবার দরকার নেই, আমি আলো জ্বেলে রাখব।

টিকটিকি। [গদগদ] রাখবে? সত্যি? সত্যি বলছ?

যতীন। রাখব।

টিকটিকির মনের আনন্দ পুচ্ছে প্রকট হইল।

টিকটিকি। [সানুনয়ে] আর একটি উপকারও কর না তাহলে।

যতীন। আবার কি?

টিকটিকি। ওই গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দাও না। তোমার ওই জানালার টিনটার পাশে বসে আছে। তুমি উঠে এক তাড়া দিলেই পালাবে। তোমার ওই লাঠিটা তুলে যদি খোঁচা দাও একটা, তাহলে তো বাছাধন একেবারে—

যতীনের মনে হইল, টিকটিকিটার উপর্যুপরি রূপান্তর ঘটিতেছে। প্রথমে সে হইল জয়চন্দ্র, তাহার পর বলবন্ত রাও, তাহার পর মানসিংহ, তাহার পর উঁমিচাঁদ, তাহার পর মীরজাফর.... যতীনের সমস্ত চিত্ত গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, চোখ বুজিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন নীরব ভাষায় বলিতে লাগিল, হে সুন্দর, কোথায় তুমি, এস, আর কত বিলম্ব? বাহিরে অনেক দূরে শোনা গেল—ফটিক জল—ফটি— ক জল। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়াই বসিয়া রহিল। তাহার পর যখন চোখ খুলিল, তখন অস্তায়মান সূর্যের আরক্তিম কিরণে সমস্ত ঘর উদ্ভাসিত...এবং সেই স্বর্ণালোক পরিবেষ্টনীতে দাঁড়াইয়া আছে পুরুষবেশিনী একটি নারী। অপরূপ রূপসী। নয়নে বহ্নি, পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশদামে ঝঞ্ঝার মেঘ, মস্তকে মুকুট, হস্তে কৃপাণ, অঙ্গে বর্ম, এবং সমস্ত মণ্ডিত করিয়া এক অপূর্ব পবিত্রতা—নির্মল, অপাপবিদ্ধ।

যতীন। কে আপনি?

রূপসী। আমাকে চেন না?

যতীন। মনে হচ্ছে চিনি চিনি, কিন্তু মনে করতে পারছি না ঠিক।

রূপসী। [ঈষৎ হাসিয়া] ছেলেবেলায় চিনতে খুব, দক্ষিণাবাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে? আমি রূপকথার কিরণমালা। অরুণ-বরুণের বোন। অরুণের তলোয়ারে মরচে ধরেছে, বরুণের ধনুকের ছিলে ছিঁড়ে গেছে। মায়ার মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তারা সব হয়ে গেছে এখন পাথর। আমি চলেছি তাদের উদ্ধার করতে। তোমার জয়চন্দ্র উমিচাঁদ মীরজাফররাও পাথর হয়ে পড়ে আছে সেখানে। সবাইকে উদ্ধার করে আনব।

যতীন। কোথায় সে জায়গা?

রূপসী। সব ভুলে গেছ দেখছি। মায়া-পাহাড়, যেখানে রুপোর গাছে সোনার ফল ফলে, মুক্তা-গলা জল ঝরে মুক্তি-ঝরনা থেকে, হীরের গাছে সোনার পাখি গান গায়, যেখানকার রাস্তায় কাঁকর নেই, তার বদলে ছড়িয়ে আছে চুনি পান্না মণি-মাণিক্যের দানা। এই সবের লোভে সবাই ছুটে গিয়েছিল সেখানে, কিন্তু মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, প্রাণহীন পাথরে পরিণত হয়ে গেছে সব। আমি চলেছি তাদের উদ্ধার করতে। মুক্তি-ঝরনার মুক্তা-গলা জল ছিটিয়ে তাদের বাঁচাব—তারপর ডঙ্কায় দেব ঘা। চললাম। ভেবো না, সবাই বাঁচবে আবার।

ঘড়ি। রূপ নিক, রূপ নিক, রূপ নিক....

কিরণমালা চলিয়া গেল। যতীনের মনে হইল, ওই যে আকাশের গায়ে বহুদূরে দেখা যাইতেছে—মেঘের স্তূপ নয়, মায়া-পাহাড়। দুর্গম, দুরারোহ। অন্ধকার নামিতেছে....অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আছে ঝঞ্ঝা মেঘ, বিদ্যুৎ বজ্র, সরীসৃপ শ্বাপদ, পিশাচ প্রেতিনীর বিভীষিকা। কিরণমালা চলিয়াছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, নিষ্কম্প অগ্নিশিখার মত আঁধার ভেদ করিয়া চলিয়াছে সে.....। দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। যতীন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বড় বউদি প্রবেশ

করিতেছেন। বড় বউদি ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী। ধপধপে ফরসা রঙ। কপালের মাঝখানে মাতৃত্ব যেন মূর্ত। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা বা ক্ষোভ নাই, অধীরতাও নাই। বরং একটা শান্ত অথচ সকৌতুক ঔৎসুক্য চোখের কোণে উঁকি দিতেছে। ভাবটা যেন—সাড়ম্বরে তোমরা অনেক আয়োজনই তো করিলে, শেষ পর্যন্ত কি কর দেখি! তিনি নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত যতীনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু হাসিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা চাপা গোপন ভাব। যেন প্রয়োজন হইলে তিনি যাহা করিবেন, ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সেই জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন—কিন্তু সে কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চান না।

বড় বউদি। ছোট বীরপুরুষটির খবর নিতে এলাম।

যতীন। [হাসিয়া] আমি ঠিক আছি।

বড় বউদি। আমরাও বেঠিক নেই। আচ্ছা, রুমি কোথা গেল, তাকে দেখতে পাচ্ছি না!

যতীন। [একটু ইতস্তত করিয়া] সে নোয়াখালি চলে গেছে।

বড় বউদি। ওমা, সে কি! কখন?

যতীন। এই একটু আগে।

বড় বউদি। তোমাকে বলে গেল?

যতীন। হ্যাঁ।

বড় বউদি। মানা করলে না?

যতীন। করলাম, শুনলে না।

একটু সূক্ষ্ম গর্বের আভা বড় বউদির সারামুখে ছড়াইয়া পড়িল। ভাষায় কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা অন্যরকম।

বড় বউদি। একলা এমন ভাবে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। তোমার দাদারা শুনলে রাগ করবেন।

যতীন। কি করব, জোর করে চলে গেল। চেন তো তাকে।

বড় বউদি। চিনি না আবার, ডাকাত একটা।

যতীন। অমল বিমল কোথা?

বড় বউদি। তোমার দাদা তাদের রেখে গেছেন নাকি! তারাও পা বাড়িয়েছিল, বলামাত্রই দু-ভাই বল্লম নিয়ে তৈরি। [হাসিলেন] বাবা ভাগ্যে এ সময় কাশীতে, তিনি থাকলে কক্ষনো যেতে দিতেন না ওদের। আর তাই নিয়ে এক কাণ্ড হত বাড়িতে। তোমাকেও যেতে হত, কেবল আমাদের আগলাবার জন্যে তোমাকে রেখে গেলেন। আমাদের নিয়েই বিপদ তোমাদের, আমরা হয়েছি, তোমাদের পায়ের বেড়ি। বেড়ি না পরলে চলেও না যে তোমাদের, [হাসিয়া] তোমার জন্যেও বেড়ির যোগাড় করতে হবে এবার একটা। বংশ রাখতে হবে তো। আমার ছেলে দুটি তো যুদ্ধে গেল, ফিরবে কি না ভগবানই জানেন। তোমার মেজ বউদির যা ভাবগতিক, মনে হচ্ছে, দশ বছরেও হল না যখন, তখন আর হবে না বোধ হয় কিছু। আর সেজ বউয়ের ছেলে দুটি তো নোয়াখালিতে মামার বাড়ি গেছে। যা খবর এসেছে, তাতে—

যতীন। খবর এসেছে নাকি?

বড় বউদি। এখনই পেলাম। তোমার সেজদা সেজ বউদি শোনে নি এখনও। [চুপিচুপি]

পরেশবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন এখনই, তাঁর মুখেই শুনলাম। পরেশবাবু নিজের বোনের খবর আনতে ছুটেছিলেন কলকাতায়, সেখানে নোয়াখালির কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের একজন নাকি বলেছে যে, সেজ বউয়ের বাপের বাড়ির একটি প্রাণীও বাঁচে নি, পুড়ে মরেছে সবাই।

নির্নিমেষে গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু হাসিলেন, কিন্তু নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

যতীন। বউদি, তুমি নীচে গিয়ে বেহারী কিংবা ছটু—কাউকে দিয়ে খিড়কির দিকে বৈঠকখানার ছাতটায় বাঁশের সিঁড়িটা লাগিয়ে দিতে বল।

বড় বউদি। কেন, কি হবে?

যতীন। আমার ঘর থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বৈঠকখানার ছাতে নামা যায়, সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে খিড়কি-দরজায় যাওয়া যাবে।

বড় বউদি। তা না হয় যাবে, কিন্তু কেন?

যতীন। যদি বাড়ি ঘিরে ফেলে, তাহলে খিড়কি দিয়ে আমরা সরকারদের বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারব।

বড় বউদি। ও, পালাবার বন্দোবস্ত! আমি তো প্রাণ থাকতে পালাব না। অনেকদিন বেঁচেছি, কি হবে আর বেঁচে? সবাই যদি মরে যায়, আমি একা বেঁচে করবই বা কি? [হাসিয়া] আমার ভয় নেই।

যতীন। আসল ভয় প্রাণের নয়, মানের।

বড় বউদি। [হাসিয়া] সে ভয়ও নেই। মান রাখতে জানলে কেউ নিতে পারে না। [ডিবা খুলিয়া এক খিলি পান মুখে পুরিলেন] তুমি নেবে নাকি এক খিলি? বীণা কি যে ছাই করে সেজেছে পানগুলো, দেখি, ভাল করে নিজেই সাজি গিয়ে। তুমি তো কাব্য নিয়ে থাকবে! আমরা পান চিবুই বসে বসে, কি আর করব! রান্নাঘরেও যেতে হবে একবার। সকালে তো জানি না, এত কাণ্ড হবে, মাংস আনিয়েছিলাম—[হাসিয়া] তোমার দাদা পোলাও মাংসের ফরমাশ দিয়ে গেছেন। ফিরে এসে খাবেন। ফিরে এসে নোয়াখালির খবর শুনলে খাওয়া অবশ্য মাথায় উঠবে জানি, কিন্তু রেঁধে রাখতে হবে। [মুচকি হাসিয়া] চেন তো মানুষটিকে, হুকুমের নড়চড় হবার উপায় নেই। যাই। আর একটু চা পাঠিয়ে দেব নাকি?

যতীন। না, এখন থাক, এই তো খেলাম। তুমি সিঁড়িটা লাগিয়ে দিতে বলো। সাবধানে থাকাই ভাল।

বড় বউদি। আচ্ছা। কী বীরপুরুষের উপরই ভার দিয়ে গেছেন কর্তারা!

আর একবার মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যতীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল সেজদার দুই ছেলে—নীলু ও বিলু। অনিন্দ্যকান্তি কিশোর দুইটি। জীবন্ত প্রাণের উন্মুখ আগ্রহ তাহাদের সর্ব অঙ্গে পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করিতেছে। তাহারা কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সহসা আগুনের শিখা আসিয়া তাহাদের ঘেরিয়া ফেলিল। তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—হঠাৎ আগুন কেন! তাহারা যতীনের দিকে চাহিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহাদের চারিদিকে আগুন, অথচ ছোটকাকা নির্বিকার হইয়া বসিয়া আছেন!

নীলু। উঃ—উঃ—এ কি! চারদিক বন্ধ যে—কোথা যাই? ছোট কাকা, কপাটটা খুলে দাও, কপাটটা খুলে দাও।

বিলু। ছোটকাকা, ও ছোটকাকা, উঃ, কি করি আমরা?

নীলু। কাপড়ে আগুন ধরে গেল—বাঁচাও—পুড়ে যাচ্ছি—

বিলু। বাঁচাও ছোটকাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—শুনতে পাচ্ছ না? বাঁচাও আমাদের, বাঁচাও—বাঁচাও—

আগুনের লেলিহান শিখা লকলক করিয়া তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিল। শিখা ভেদ করিয়া চীৎকার উঠিতে লাগিল—বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও। মনে হইল, স্বয়ং অগ্নিই যেন তারস্বরে আর্তনাদ করিতেছেন। যতীন উত্তেজনাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরমুহূর্তে লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নিরুপায় ক্ষোভে তাহার সমস্ত চিত্ত মথিত হইতে লাগিল। চোখের সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যটা ফুটিয়া উঠিতেছে, অথচ কিছু করিবার উপায় নাই। বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও—চীৎকার এখনও থামে নাই। বাঁচাও—বাঁচাও— চীৎকার তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। আকাশে বাতাসে, নদীতে প্রান্তরে, ঊর্ধ্বে নিম্নে, অন্তরে বাহিরে কেবল—বাঁচাও—বাঁচাও—বাঁচাও। আগুন নিবিল, কিন্তু চীৎকার থামিল না। অবশেষে চীৎকারটা যেন মূর্তি ধরিয়া অগ্নিস্তূপ হইতে বাহির হইয়া আসিল.. .সমস্ত দেহ জ্বলন্ত-অঙ্গারময়। সেই জ্বলন্ত-অঙ্গারময় মূর্তি যতীনের দিকে আগাইয়া আসিল।

অঙ্গারমূর্তি। এখনও বসে আছ? বাঁচাও আমাদের,—সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল যে, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। মরে গেছি, কিন্তু জ্বালা কমছে না। জ্বালা কমিয়ে দাও, শিগ্‌গির জ্বালা কমিয়ে দাও।

যতীন। [অসহায়ভাবে] কি করলে কমবে, তা তো জানি না।

অঙ্গারমূর্তি। [সশ্লেষে] এখনও জান না?

যতীন। না।

হাহাকার করিতে করিতে অঙ্গারমূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। অগ্নিকাণ্ডও ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইল। যতীন বুঝিতে পারিল, যাহা সে এতক্ষণ লেলিহান অগ্নিশিখা বলিয়া মনে করিতেছিল, আসলে তাহা রক্ত-কিরণরঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘ—খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাইতেছিল। সূর্য অস্ত গিয়াছে....চতুর্দিকে অন্ধকার নামিতেছে। সমস্ত ঘর অন্ধকারে ভরিয়া গেল। নিবিড় অন্ধকারে আত্মনিমগ্ন হইয়া যতীন কি যেন খুঁজিতেছিল। সহসা শুনিতে পাইল—আলো জ্বাল। হাত বাড়াইয়া 'সুইচ' টিপিতেই প্রস্তর-তরুণীর ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুর উপর 'বালব'টা জ্বলিয়া উঠিল। যতীন দেখিতে পাইল, আলোকিত দেওয়ালে টিকটিকি লোলুপ আগ্রহে বসিয়া আছে।

টিকটিকি। কতক্ষণ থেকে বলছি, আলো জ্বাল, আলো জ্বাল—শুনতেই পাচ্ছ না। আশ্চর্য! ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে, পোকাগুলো সব চলে গেল বোধ হয় এদিকে ওদিকে।

একটা মানসিক অবসাদ যতীনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। কিছুই করিতে না পারিয়া এবং করিবার আশা নাই অনুভব করিয়া তাহার পৌরুষ যেন ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। নিজের পৌরুষকে মর্যাদা দান করিবার জন্যই সে টিকটিকির উপকারে প্রবৃত্ত হইল।

যতীন। ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অনেক পোকা আসবে এখনই। গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি আমি। কোন্‌খানে আছে বললে?

টিকটিকি। [সাগ্রহে] দেবে? দেবে? ওই 'সান-শেড'টার ঠিক নীচেই আছে, লাঠিটা নিয়ে যাও।

যতীন উঠিয়া জানালার কাছে গেল এবং 'সান-শেড'এর নীচের বলিষ্ঠ টিকটিকিটাকে দেখিতে পাইল। অদূরে টিকটিকিনীও রহিয়াছে।

যতীন। তোমার টিকটিকিনীও রয়েছে। দুজনকেই তাড়িয়ে দেব?

টিকটিকি। আরে না না, টিকটিকিনীকে তাড়াবে কেন, গুণ্ডাটাকে তাড়িয়ে দাও।

যতীন ঘরের কোণ হইতে ছড়িটা তুলিয়া লইল এবং বলিষ্ঠ টিকটিকিটাকে নীচে ফেলিয়া দিল।

প্রস্তর-তরুণী। অন্যায় করলে।

যতীন চমকাইয়া তাহার দিকে চাহিল।

টিকটিকি। হি-হি হি-হি—

অদ্ভুত একটা হাসি হাসিতে লাগিল।

যতীন। [প্রস্তর-তরুণীকে] অন্যায় করলাম নাকি?

প্রস্তর-তরুণী। অন্যায় করলে না? এই একই অপরাধে গুণ্ডাদের 'পিশাচ' বলেছ তোমরা— তারাও তেতলার ছাদ থেকে মানুষ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে নীচে।

টিকটিকি। [প্রস্তর-তরুণীকে] তোমার আস্পর্ধা বড্ড বেড়েছে দেখছি। নির্জীব পাথর হয়ে বেশ তো জীবন্ত প্রাণীদের সমালোচনা করে যাচ্ছ! তোমার পাথুরে বুদ্ধিতে যা অন্যায়, আমাদের জীবন্ত বুদ্ধিতে তা অন্যায় নয়। [যতীনের দিকে চাহিয়া] কি বল!

যতীন কোন উত্তর দিল না। তাহার চোখের সামনে পর পর দুইটা ছবি কেবল মূর্ত হইয়া মিলাইয়া গেল—মিস্টার চার্চিল এবং জেনারেল স্মাট্‌স্‌। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। যতীনের মনে হইল, সব যেন ক্রমশ ঘন হইয়া আসিতেছে....আকাশ বাতাস সব পাথর হইয়া গেল বুঝি....একটা নিরুদ্ধ নির্বাক আকুলতা আত্মপ্রকাশের বেদনায় যেন টনটন করিতেছে...এইবার ফাটিয়া যাইবে বুঝি....প্রস্তর-তরুণী কথা কহিয়া উঠিতেই যতীন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

প্রস্তর-তরুণী। [সানুনয়ে] জীবন্ত করে তোল আমাকে। কিরণমালাকে ডাক, মুক্তি-ঝরনার জল ছিটিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলুক।

যতীন। সে কি আর আসবে?

প্রস্তর-তরুণী। তুমি ডাকলেই আসবে। এই উপকারটি কর আমার, এত লোকের এত উপকার কর তুমি—

টিকটিকি। ঠিক ঠিক,—ভারি উপকারী লোক। সভ্য মানুষের লক্ষণই ওই। হ্যাঁ, ভুলে যাবার আগে কথাটা বলে ফেলি তোমাকে। উপকারের ঋণটাও কিছু শোধ হয়ে যাক। [চুপিচুপি] তোমার বড় বউদিকে লক্ষ্য করেছিলে ভাল করে?

যতীন। লক্ষ্য করবার মত কিছু ছিল নাকি?

টিকটিকি। ছিল বইকি। পেট-কাপড়ের তলায় চকচকে ছোরা ছিল একটা।

যতীন। কই, দেখিনি তো!

টিকটিকি। [সশ্লেষে] তা দেখবে কেন, ওই পাথরের মূর্তিটার দিকেই হাঁ করে চেয়ে আছ কেবল সর্বক্ষণ, আর বেফয়দা বকরবকর করছ ওর সঙ্গে....থাম, থাম, পোকা এসেছে একটা।

দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট কালো পোকা আসিয়া বসিয়াছিল। টিকটিকি সন্তর্পণে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রস্তর-তরুণী। কিরণমালাকে ডাক। তুমি ডাকলে ঠিক আসবে। তোমাদের ডাকে উর্বশী উঠে আসে সিন্ধু থেকে, গঙ্গা নেমে আসে স্বর্গ থেকে ধরণীর ধূলিতে। কিরণমালাও আসবে, তুমি ডাকলেই আসবে। [সানুনয়ে] ওগো, আমাকে সঞ্জীবিত কর, লোভে, মোহে, অশিক্ষায় পাথর হয়ে গেছি কতকাল থেকে, উদ্ধার কর আমায়, দয়া কর, ডাক, কিরণমালার সোনার ঝারিতে করে নিয়ে আসুক সে মুক্তি-ঝরনার জল, ছিটিয়ে দিক আমার সর্বাঙ্গে। চুপ করে আছ কেন? [অধীরভাবে] ডাকছ না কেন? ডাক।

যতীন। ডাকলে আসবে না, সময় হলে আসবে। পরিবেশ অনুকূল হলে নিজেই আসবে সে।

সহসা চতুর্দিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যতীনের মনে হইল, কিরণমালা বুঝি আসিতেছে, তাহারই বুঝি এ অভিনন্দন....সে সাগ্রহে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল...কেহ আসিল না...,শঙ্খঘণ্টারব উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিল....অভিনন্দন নয়, একটা ভীত আর্ত হাহাকার যেন মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারকে চিরিয়া তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল কয়েকবার। 'জয় হিন্দ্,' 'বন্দে মাতরম্', 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে মাতরম্', 'জয় হিন্দ্', 'বন্দে মাতরম্',—শতকণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইয়া মুখরিত করিয়া তুলিল আকাশ-বাতাস-অন্ধকারকে। আলুথালু বেশে মেজ বউদি ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বন্ধ্যা নারী। দেখিলে মনে হয়, বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। আঁটসাট গড়ন। সুশ্রী। নিপুণ প্রসাধনের জন্য আরও সুশ্রী দেখাইতেছে। তাঁহার বিস্ফারিত বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

মেজ বউদি। শুনছ ঠাকুরপো, ছট্টু বলছে, গুণ্ডার দল ঢুকে পড়েছে আমাদের পাড়ায়।

যতীন। ভয় কি, ঢুকুক না।

মেজ বউদি। আমার বড় ভয় করছে।

যতীন। পাগল নাকি, ভয় কি? বড় বউদি কোথা?

মেজ বউদি। তিনি পোলাও চড়িয়েছেন, তাঁর ভয়-ডর নেই, রান্নাঘরে বেশ নিশ্চিন্ত মনে মাংসের আলু কুটছেন বসে বসে। আর সেজ বউ আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে মড়ার মত শুয়ে আছে তোমার সেজদা ঠাকুর-ঘরে। আমার একলা বড্ড ভয় করছে।

যতীন। চাকরগুলো কোথা?

মেজ বউদি। তারা গেটের কাছে বর্শা বল্লম নিয়ে বসে আছে লুকিয়ে।

যতীন। তবে আর ভয় কি, আমার কাছেও বন্দুক আছে, একটা নয়, দু-দুটো। ভয় কি?

বাহিরে শঙ্খ, ঘণ্টা, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্ আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল....মেজ বউ যতীনের

বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন...হঠাৎ বাহিরের উদ্দাম শব্দটা থামিয়া গেল...একটা মোটরকারের শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল...যতীন তাড়াতাড়ি স্মেলিং-সল্টের শিশিটা আলমারি হইতে বাহির করিয়া মেজ বউদির নাকের কাছে ধরিতেই তিনি উঠিয়া বসিলেন...কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যতীন। উঠলেন কেন, শুয়ে থাকুন না।

মেজ বউদি। না, আমি যাই [উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] আর তো কিছু শোনা যাচ্ছে না। সব থেমে গেল, নয়? ও কিছু নয় বোধ হয় তাহলে, নয়? [ভীত হাসি হাসিয়া] আমাদের পাড়ায় কিছু হবে না বোধ হয়, নয়? আমি যাই, দিদি একলা আছেন নীচে।

যতীন। ভয় করে তো এইখানেই থাকুন না।

মেজ বউদি। না, আমি যাই।

মেজ বউদি চলিয়া গেলেন, কিন্তু অশরীরী বেশে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

অশরীরী মেজ বউদি। আমার ভয় দেখে হেসো না ঠাকুরপো। আমার ছেলে মেয়ে নেই, বিদ্যা বুদ্ধি নেই, দেহটা ছাড়া আর আমার কিছু নেই। এই দেহটাকেই ঘষে মেজে, সাজিয়ে গুছিয়ে তোমার মেজদার মত অসুরকে বশ করে রেখেছি। এই দেহটাই আমার যথাসর্বস্ব, সামান্য ফোড়া হলেও তাই আমি ভয়ে মরি। এই দেহটাকে নিয়ে গুণ্ডারা ছেঁড়াছেঁড়ি করবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না....এ ছাড়া যে আমার আর কিছু নেই ঠাকুরপো! হেসো না, দয়া কর আমাকে....

মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টি তুলিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন...তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যতীন গুণ্ডাদের কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহারা মানুষ নয়? মানুষ কি করিয়া এত নৃশংস হইতে পারে?...ঠিক সামনের দেওয়ালেই যতীনের পুস্তকের আলমারি ছিল। আলমারির কপাট খুলিয়া এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ। পরিধানে মূল্যবান মখমলের জরিদার পোশাক, মাথায় মুসলমানী টুপি। চোখের দৃষ্টি আভিজাত্যমণ্ডিত।

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। ওরা মুসলমান নয়, ওরা মেওয়াটি। আমার রাজত্বকালে ওরা একবার মাথা চাড়া দিয়েছিল, চাবুকের চোটে শায়েস্তা করে দিয়েছিলাম সবাইকে। দিল্লীর তখতে কে আছে এখন? ঘুমুচ্ছে নাকি লোকটা? তারই উচিত এদের শাসন করে দেওয়া। মুসলমানের বদনাম দিচ্ছ কেন,—এরা মুসলমান নয়, হতে পারে না,—মুসলমান ইমানদার জাত।

যতীন। কে আপনি?

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। আমি দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন বলবন্। আমার শাসনকালে বাংলাদেশে বিদ্রোহ করেছিল তুঘ্রিল। আমার তখন সত্তর বছর বয়স, তবু আমি নিজে গিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেছিলাম। গৌড়ের বাজারে দু'ধারি ফাঁসিকাঠ পুঁতে দিয়েছিলাম বদমাশ তুঘ্রিলের চরদের। বদমাশকে কখনও খাতির করি নি, কখনও না। এরা মুসলমান নয়, এরা কাফের। বাদাউনের এক আমীর একবার চাবুকের চোটে তার এক গরিব চাকরকে মেরে ফেলে। চাকরের

বিধবা আমার দরবারে নালিশ জানাতে আমি কি করেছিলাম জান? ওই বিধবার সামনে সেই আমীরকে চাবকে হত্যা করেছিলাম। মুসলমান বলে খাতির করি নি। সে মুসলমান নয়, সে কাফের। [চীৎকার করিয়া] দিল্লীর সুলতান পাঠান ঘিয়াসুদ্দিন বলবন্ আমি—আমি বলছি, ওরা মুসলমান নয়, ওরা বদমাশ, কাফের,—বেতমিজ, বেইমান। চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল যে মুসলমান, তারা কাপুরুষ নয়, তারা বীর, তারা খোদার খিদমৎগার, আজাদীর উপাসক.....

তাঁহার বাহুর ঊর্ধ্বোৎক্ষেপে যতীন নিমেষে যেন সুদূর অতীতে ইসলামধর্মের মর্মমূলে নীত হইল।.....আরবের মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। কাছে দূরে ছোট বড় অসংখ্য বালির পাহাড়। আর কিছু নাই, কেবল মরুভূমি আর মরীচিকা। দূর চক্রবালরেখায় আকাশ নামিয়া আসিয়াছে। নীল নির্মল মহাকাশ। সেই মহাকাশের পটভূমিকায় কণ্টকসমাকীর্ণ একটি গোলাপগাছ...তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তরাঙা গোলাপ ফুটিয়া আছে....দূরে একটি উট চলিয়াছে....উটের পিঠে বসিয়া আছেন ইসলাম-জগতের হর্তাকর্তা-বিধাতা খলিফা ওমর। তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু অসমর্থ নন। সোজা বসিয়া আছেন, দৃষ্টি সুদূর আকাশে নিবদ্ধ। সঙ্গে একটিমাত্র চাকর, এক বোরা যব, কিছু খেজুর, এক মশক জল এবং একটি কাঠের থালা। আর কিছু নাই।....আরব-সৈন্য জেরুজালেম অবরোধ করিয়াছে। জেরুজালেমের পেট্রিয়ার্ক একটি শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছে—তিনি খলিফা ওমরের কাছে আত্মসমর্পণ করিবেন, আর কাহারও কাছে নয়। খলিফা ওমর তাই চলিয়াছেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তা হোক, কর্তব্য সর্বাগ্রে।.....জেরুজালেমের বাহিরে আরব সেনাপতিরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। উট আসিয়া থামিল। খলিফা ওমর সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—ইহারা কাহারা! বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত অশ্বের সারি, সেনাপতিদের পরিচ্ছদে মখমল রেশম, তাহাতে হীরা মুক্তা জ্বলিতেছে। বৃদ্ধ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সড়াক করিয়া উটের পিঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং মাটি হইতে ঢেলা তুলিয়া তাহাদের দিকে ছুঁড়িতে লাগিলেন। তাঁহাকে এত বড় অপমান? এইসব জরি-জড়োয়ার অর্থ কি? তাঁহার যোদ্ধার কোথায়? কোথায় সেই মরুচারী বেদুঈনরা? তিনি এই সঙের দল লইয়া জেরুজালেমে প্রবেশ করিবেন না। ইহাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া পেট্রিয়ার্ক ঠিকই করিয়াছেন। ঢিল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুসজ্জিত সেনাপতিবৃন্দ দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। নিজের ভৃত্যটিকে মাত্র সঙ্গে লইয়া খলিফা ওমর একাই নগর-প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ কবিবার পূর্বে যতীনের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—ইসলামধর্ম ভোগী গুণ্ডার ধর্ম নয়, ত্যাগী শহীদের ধর্ম। তাহা দুর্বলকে পীড়ন করে না, তাহা অসত্যের কবল হইতে জান কবুল করিয়াও সত্যকে মুক্ত করে। ধীরে ধীরে আর একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল—হুগলির হাজি মহম্মদ মহসিন...অতিশয় নিষ্ঠাভরে স্বহস্তে কোরাণ নকল করিতেছেন.....অগাধ সম্পত্তির মধ্যে বাস করিয়াও তিনি ফকির...স্বজাতির উন্নতির জন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গেলেন।....এ দৃশ্যও মিলাইয়া গেল।....পর পর কয়েকটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। মীর মশার্‌রফ হোসেনের ছবি—'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করিতেছেন....'অগ্নিবীণা' হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম,....আবিদ মিঞা—চমৎকার রামায়ণ গান করিত.....

প্রস্তর-তরুণী। আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর, মুক্ত কর.....

যতীন ফিরিয়া দেখিল, উন্মুখ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে প্রস্তর-তরুণী নয়, বন্দিনী সীতা। এ তো তাহার ঘর নয়, এ যে অশোক বন। রাবণ স্মিতমুখে অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রাবণ। [সীতাকে] যাদের উপর নির্ভর করে এতদিন তুমি আমার দিকে ফিরে চাও নি, এবার সেই রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধেছি, ওই দেখ—

লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্র ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিল। অসংখ্য শবাকীর্ণ বিরাট প্রান্তর। বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। নাগপাশ-বদ্ধ হত-চেতন রাম-লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া বহু বীর বিলাপ করিতেছেন। রাম-লক্ষ্মণের বর্ম বিধ্বস্ত, শরাসন বিক্ষিপ্ত, সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ, মনে হইতেছে, যেন তাঁহারা শরস্তম্ভময়। অসংখ্য নাজ শররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অদূরে রাবণ দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, তাহার দশ মুণ্ডে কামনালব্ধ লক্ষ চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে.....ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিতে লাগিল...রাবণের রূপটা প্রথমে ক্লাইব, পরে লর্ড ডাল্‌হাউসিতে পরিণত হইল.....বঙ্গ বিহার উড়িষ্য অযোধ্যা বেরার পাঞ্জাব সব একে একে নাগপাশে বাঁধা পড়িতেছে....রাম-লক্ষ্মণ হিন্দু-মুসলমানে রূপান্তরিত হইল। তাহার পর অন্ধকার। অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। দূরে ওটা কিসের শব্দ? রাবণের হাসি, না ইংরেজের কামান? সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল আবার। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। তাহার পর ঝড় উঠিল, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল কালো কালো বিশাল মেঘ, মেঘের বুকে জ্বলিয়া উঠিল বিদ্যুৎবহ্নি। চরাচর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল, যেন ভূমিকম্পে বসুধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; আকাশেও আলোড়ন, সপ্ত-সমুদ্র গর্জন করিতেছে... বিরাট পক্ষ সঞ্চালন করিয়া উড়িয়া আসিলেন বিনতা-নন্দন গরুড়.....গরুড়কে দেখিয়া সর্পকুল পলায়ন করিতেছে নাগপাশমুক্ত রাম-লক্ষ্মণ পুনরায় ভীম-পরাক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।.....গরুড় দেখিতে দেখিতে রূপান্তরিত হইল সিপাহী-বিদ্রোহে....পরাধীনতার নাগপাশ খুলিয়া গেল....হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি যুদ্ধ করিতেছে ....নানাসাহেব, আজিমুল্লা খান। সিপাহী-বিদ্রোহ রূপান্তরিত হইল কংগ্রেসে.....সেখানেও হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরুদ্দিন তায়েবজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ রহিমতুল্লা সয়ানী, আর. এন. মুধলকর, নবাব সৈয়দ মামুদ, হাকিম আজমল খান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা মহম্মদ আলি, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।...সহসা একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল.....কংগ্রেস মিলাইয়া গেল....লঙ্কার প্রান্তরে রাম হাহাকার করিতেছেন...রাবণ লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল হানিয়াছে। রামের হাহাকার ক্রমশ যেন শঙ্খধ্বনিতে পরিণত হইল....চারিদিকে আবার শাঁখ বাজিয়া উঠিয়াছে....আবার হাহাকার...জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্....গুড়ুম গুড়ুম....বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল....জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্....আবার সব স্তব্ধ...একটা মোটর আসিবার শব্দ শোনা গেল।

প্রস্তর-তরুণী। আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর, মুক্ত কর....

যতীনের মনে হইল, তাহাদেরই বাড়ির গেটের সামনে কলরব উঠিয়াছে। সে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। বড়দা যে বন্দুক দুইটা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই একটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে গিয়া সে এক কাণ্ড করিয়া ফেলিল। বন্দুকের নলের ধাক্কায় প্রস্তর-তরুণী মেঝেতে পড়িয়া গিয়া সশব্দে চুরমার হইয়া গেল। অন্ধকার।

.....যতীন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেওয়ালের কাছে গিয়া আর একটা সুইচ টিপিতেই আলোটা জ্বলিয়া উঠিল। আলোর ঠিক নীচেই এক সারি ছবি ছিল—মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই যেন তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গান্ধীজীই প্রথমে হাসিমুখে সম্বর্ধনা করিলেন, তাঁহার ফোকলা দাঁতের হাসিতে শিশুর সরলতা ফুটিয়া উঠিল।

মহাত্মা গান্ধী। তুমি একটু আগেই যা দেখলে তা স্বপ্ন নয়, সত্য; দেশজোড়া এই যে বিক্ষোভ, সত্যিই তা লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ। কিন্তু রাম আজ আত্মবিস্মৃত। লক্ষ্মণের বুকে রাবণ আজ যে শক্তিশেল হেনেছে, তা যে হিন্দুবিদ্বেষ তা সে বুঝতে পারছে না। সেই বিদ্বেষের বিষে আজ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে সৌমিত্রি। তাকে বাঁচাতে হবে। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তখন রাম তো তার বুকে গুলি করতে যায় নি। তোমার হাতে তবে বন্দুক কেন?

যতীন লজ্জিত হইয়া পড়িল।

মহাত্মা গান্ধী। [হাসিয়া] মহর্ষি বাল্মীকি বলে গেছেন, গন্ধমাদনেই এর ওষুধ আছে। গন্ধমাদন পাহাড় নয়—গন্ধে যা চতুর্দিক আমোদিত করে অথচ যা পর্বতের মত দৃঢ়, সেই বিশুদ্ধ মানব-চরিত্রের নামই—গন্ধমাদন। বিশল্যকরণীও গাছের শিকড় নয়—ওসব রূপক—যা সত্যিই মানুষকে বিশল্য অর্থাৎ বেদনামুক্ত করে, তার নাম—ভালবাসা, প্রেম। এই গন্ধমাদনের ভার যিনি বহন করতে পারবেন, তিনি শাস্ত্রবিৎ মহাশক্তিশালী আত্মত্যাগী মহাবীর। বন্দুক নয়, তাঁরই এখন প্রয়োজন। তিনি না এলে সীতা উদ্ধার হবে না।

গান্ধীজীর পাশেই বিবেকানন্দের ছবি। যতীন দেখিল, বিবেকানন্দের আয়তনয়ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নীচে কলরবটা বাড়িয়া উঠিল।....কিন্তু সমস্ত ছাপাইয়া গমগম করিয়া উঠিল বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। যতীন নড়িতে পারিল না, মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিল।

বিবেকানন্দ।

শোন বন্ধু, শোন শোন, কহিতেছি অন্তরের কথা
আমার জীবনে আমি বুঝিয়াছি এই সত্য সার।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এ সমুদ্রে চারিদিকে তরঙ্গ ভীষণ,
একটি তরণী আছে, যা শুধু করিতে পারে পারে।

নহে তন্ত্র, নহে মন্ত্র, নহে জপ, নহে প্রাণায়াম,
বিজ্ঞান দর্শন নহে, নহে কোন বিধান বা বিধি,
নহে ত্যাগ, নহে ভোগ, মায়া ওরা ছদ্মবেশী কাম।
ভালবাসা ভালবাসা একমাত্র ওই শ্রেষ্ঠ নিধি।

অমৃতের পুত্র তুমি, অনন্দের প্রতীক মহান
অফুরন্ত প্রেমসিন্ধু তোমারই অন্তরে উথলায়।

দাও—দাও—দাও শুধু—চাহিও না কোন প্রতিদান,
প্রতিদান চাহিলেই মহাসিন্ধু বিন্দু হয়ে যায়।

মহাত্তম ব্রাহ্মণ বা ক্ষুদ্রতম কীট পরমাণু
সকলেরই মাঝে তিনি প্রেমের ঠাকুর নারায়ণ।
দেহ প্রাণ মন আত্মা দাও, বন্ধু, সর্বস্ব তোমার
তাঁহারই চরণে সব ভক্তিভরে কর সমর্পণ।

নিখিল বিশ্বের মাঝে হের তাঁর বিচিত্র প্রকাশ
এঁরে অবহেলা করি মুক্তি কোথা করিছ সন্ধান?
উচ্চনীচনির্বিশেষে ভালবাস—শুধু ভালবাস
ওই মুক্তি, ওই মন্ত্র, ওই পূজা, ওই ভগবান।

বিবেকানন্দ থামিতে না থামিতেই দেশবন্ধুর কণ্ঠ শোনা গেল।

দেশবন্ধু। ওই যে বাঙালী কৃষক সমস্ত দিন বাঙলার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মাক্ত-কলেবরে বাঙলার কুটিরে কুটিরে গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক শূদ্র হউক চণ্ডাল হউক উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহঙ্কারী, মাথা নোয়াও। অবিশ্বাসী, তোমার প্রাণে বিশ্বাস জাগাও, জাগাও—তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। আততায়ী, তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও, জন্মের মত ফেলিয়া দাও—তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। ডাক ডাক, সবাইকে ডাক। প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া পারে? ওঠ, জাগ, আপনার কল্যাণকে জাগাও.....

রবীন্দ্রনাথের চক্ষু হইতে বহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। শাণিত ছুরিকার মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথ।

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান-ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে
সবারে না যদি ডাকো এখনও সরিয়া থাকো
আপনার বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতা-ভস্মে সবার সমান।

বঙ্কিমচন্দ্র। [স্মিতহাস্যসহকারে] বন্দে মাতরম্।

আলোর নীচেই একটা টেবিল ছিল। তাহার উপর একখানা বই ছিল—ব্রাদার্স কারামাজোভ। সেই পুস্তকের ভিতর হইতে একটি মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। রুশদেশীয় কৃষকের মূর্তি। অন্তর এবং বাহিরের বহুবিধ উৎপীড়নের কাহিনী তাহার চোখের দৃষ্টিতে লেখা রহিয়াছে। যতীনের দিকে চাহিয়া সে দৃষ্টি ঈষৎ হাস্যদীপ্ত হইল।

মূর্তি। অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে জীবন কেটেছে আমার, সাইবেরিয়ায়, জেলে, গরিবের কুঁড়েতে, চোরের আড্ডায়, ধনীর প্রাসাদে—বহু জায়গায় ঘুরেছি। বইও পড়েছি অনেক রকম; কিন্তু জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি লাভ করেছি জান—যার চেয়ে বড় সত্যের সাক্ষাৎ জীবনে আর পাই নি, কি তা জান?

যতীন। না।

মূর্তি। কথাটি বাইবেলে আছে—লাভ দাই নেবার। প্রতিবেশীকে ভালবাস।

যতীন। আপনি কে?

মূর্তি। ফিয়ডর ডস্টয়েভ্‌স্‌কি।

ডস্টয়েভ্‌স্‌কি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। দ্রুতপদে মেজ বউদি প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিশয় উত্তেজিত।

মেজ বউদি। শুনেছ, কি কাণ্ড হয়েছে! উঃ!

যতীন। কি?

মেজ বউদি। নীলার আজ বিয়ে ছিল, জান তো? বিয়ে হচ্ছিল, এমন সময়, হৈ-হৈ করে একদল গুণ্ডা তাদের বাড়িতে ঢুকে প্রবালকে মেরে ফেলেছে, যোগেন পুরুতকেও মেরে ফেলেছে—নীলাকে পিঁড়ে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের ভলাণ্টিয়াররা রীতিমত লড়াই করে কেড়ে নিয়ে এসেছে তাকে। দুজন ভলান্টিয়ার—ছকু বীরেন লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

যতীন। সে কি! নীলা কোথায় এখন?

মেজ বউদি। মোটরে করে আমাদের বাড়িতেই তাকে দিয়ে গেল যে। মোটরের শব্দ শুনতে পেলে না? নীচে শুইয়ে দিয়েছি তাকে। একটি কথা কইছে না, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে খালি।

যতীন কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

যতীন। বড়দা-মেজদার কোনও খবর এসেছে?

মেজ বউদি। হ্যাঁ, ওই ভলাণ্টিয়াররাই বলে গেল। তাঁদের কোনও বিপদ এখনও হয় নি, তবে তাঁরা এখনও ওই ভিড়ের মধ্যেই আছেন। ওঁরা কখন যে ফিরবেন! ভাল লাগে না বাপু আমার এ সব।

যতীন। বড় বউদি কি করছেন?

মেজ বউদি। তিনি রান্নাঘর থেকে এই তো বেরুলেন। নীলাকে একটু গরম দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছেন।

যতীন। চলুন, দেখি গিয়ে।

মেজ বউদি। না, তুমি যেও না। বড়দি তোমাকে যেতে মানা করলেন এখন।

এত দুঃখের মধ্যেও মেজ বউদির মুখে বউদি-সুলভ ব্যঙ্গের মৃদু হাসির ঝিলিক একবার দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

মেজ বউদি। বড়দি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খাবে এখন? রান্না হয়ে গেছে।

যতীন। না, খাব না। সেজদা পুজোর ঘর থেকে বেরোন নি এখনও?

মেজ বউদি। না। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম একটু আগে। চোখ বুজে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে—মনে হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

যতীন। সেজ বউদি?

মেজ বউদি। বীণাও তেমনই আপাদমস্তক মুড়ে শুয়ে আছে। ওঠাতেও সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পেরে গেছে বোধ হয়। মায়ের প্রাণ তো!....ভাল লাগে না বাপু এ সব। [কেমন যেন অন্যমনস্ক অস্থির হইয়া পড়িলেন] তুমি তাহলে খাবে না? আমি যাই তাহলে।

চলিয়া গেলেন। যতীন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল রহিল। আলমারির অন্ধকার কোণ হইতে অশরীরী একটি মূর্তি বাহির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিলে মনে হয় রাজপুত।

যতীন। কে আপনি?

অশরীরী মূর্তি। আমি একজন মুসলমান নেতা।

যতীন। মুসলমান নেতা?

অশরীরী মূর্তি। হ্যাঁ। তুমি যা ভাবছ, তার জবাব দিতে এসেছি। [দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিরুদ্ধ আক্রোশে] মুষ্টিমেয় বলে ভয় পাবার লোক নই আমরা। মনে নেই, গজনীর মামুদ মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে এসে কি কাণ্ড করেছিল?

যতীন। [হাসিল] এখন আর সেদিন নেই জনাব। এখন ভারতবর্ষে এক প্রান্তের খবর আর এক প্রান্তে নিমেষে পৌঁছয়। দরকার হলে এক প্রান্ত থেকে হাজার হাজার লোক উড়ে চলে যাবে আর এক-প্রান্তে এক ঘণ্টার মধ্যে। তা ছাড়া গজনীর মামুদের নজির দেখিয়ে তুমি আস্ফালন করছ কেন মিঞা সাহেব? তার সঙ্গে তোমার রক্তের তো সম্পর্ক নেই কোনও, রক্তের সম্পর্ক আছে বরং আমাদেরই সঙ্গে। নোয়াখালিতে আজ তোমরা যেমন অসহায় লোকদের জোর করে মুসলমান করছ, ওই গজনীর মামুদরা তেমনই এককালে ভয় কিংবা লোভ দেখিয়ে তোমাদের বাপ-দাদাদের মুসলমান করেছিল। তোমরাও তো এ দেশেরই লোক ভাই। তোমাদের সঙ্গে আমাদের এইটুকু মাত্র তফাৎ, গজনীর মামুদেরা তোমাদের মুসলমান করতে পেরেছিল, আমাদের পারে নি। তোমরা যদি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসতে চাও, আমরা রাজি আছি। না যদি আসতে চাও, তাতেও আপত্তি নেই—যেমন আছ তেমনই থাক—মুসলমান ধর্মও ভাল ধর্ম, কোনও ধর্মই খারাপ নয়। তবে আস্ফালন করো না। ওটা হাস্যকর....

হঠাৎ হা-হা করিয়া কে যেন হাসিয়া উঠিল। তাহার পর আলমারির আর এক দিকে হইতে বাহির হইয়া আসিল পাগল নজরুল ইসলাম।

নজরুল। "হিন্দু না ওরা মুসলিম?"—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার!
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

ইহারা দুইজন অদৃশ্য হইবার পর আর একটি তৃতীয় মূর্তি আবির্ভূত হইল। কুড়ি বৎসরের ছেলে একটি। চোখে নির্ভীক দৃষ্টি।

যতীন। আপনি কে?

ছেলেটি। আমার নাম বিভূতিভূষণ সরকার। আমি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোমা দিয়ে ছোট লাটের গাড়ি ওড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কেন জান? তার কিছুদিন আগে জামালপুরের মেলায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। সে দাঙ্গায় রাজপুরুষরা মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। এই ইংরেজদের তাড়াতে না পারলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হবে না।

বিভূতি সরকার অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একট দৃশ্য মূর্ত হইল,—একটা সাপুড়ে সাপ খেলাইতেছে। সাপুড়ের মুখটা মিস্টার চার্চিলের মুখের মত।...এ দৃশ্যও অন্তর্হিত হইল। যতীন দেখিল, দেওয়ালে অসংখ্য পোকা আসিয়াছে, টিকটিকি উন্মাদের মত পোকা শিকার করিতেছে। টিকটিকিনী সন্তর্পণে ওদিকের কোণ হইতে মুখ বাড়াইল, কিন্তু টিকটিকির সে দিকে চাহিবার অবসর নাই...সে ক্রমাগত খাইয়া চলিয়াছে। সহসা একটা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি শূন্যে ভাসিয়া আসিল।

কেমন ভুলিলে

হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে।
হে রাঘব-কুল-চূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলাস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীর-বীর্যে সর্বভুক সম
দুর্বার সংগ্রামে তুমি—উঠ ভীমবাহু......

আবৃত্তি করিতে করিতে মাইকেল মধুসূদন প্রবেশ করিলেন। পিছনের দিকে দুই হস্ত নিবদ্ধ। আপনমনে আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন, কোনদিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।...সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। পাড়ার একজন ভলান্টিয়ার—অশোক, দ্রুতপদে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। কপালটা কাটিয়া গিয়াছে। মুখের হাসি কিন্তু ম্লান হয় নাই, চোখের দৃষ্টি নির্ভীক। বয়স বেশি নয়, কিশোর।

অশোক। আপনার কাছে টিঞ্চার আইডিন আছে যতীনদা?

যতীন। ইস, কি হল?

অশোক। অন্ধকারে বোঁ করে একটা ঢিল এসে লেগে গেল। হয়তো আমাদেরই কেউ ছুঁড়েছে। [হাসিল]

যতীন আলমারি হইতে তুলা ও টিঞ্চার আইয়োডিন বাহির করিয়া অশোকের কপালে লাগাইয়া দিতে লাগিল। অশোক অবিচলিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। বড়দা-মেজদার খবর জান?

অশোক। বড়দার ডান হাতে চোট লেগেছে। মেজদা তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। উঃ, বড়দা মেজদা দুজনেই কি লড়াটাই লড়েছেন! ওঁরা না থাকলে নীলাদিকে ঠিক নিয়ে চলে যেত।

যতীন। বড়দার হাতের চোট খুব বেশি নাকি?

অশোক। না, খুব বেশি নয়। বড় জোর ফ্র্যাকচার হতে পারে, আবার কি হবে!

বড়দার হাতের আঘাতটা যে কিছুই নয়, এই ভাব প্রকাশ করিয়া ভুরু নামাইয়া অশোক তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। যতীন তুলা ও একটা রুমাল দিয়া তাহার মাথাটা বাঁধিয়া দিল।

যতীন। এইবার শুয়ে পড় গিয়ে।

অশোক। [বিস্মিত] শোব কি! ওই মোড়ে আমার ডিউটি রয়েছে এখন। আর একটা খবর শুনেছেন যতীনদা, ভারি মজার খবর। শৈলেনবাবুকেও ওরা খুন করেছে। আমি চলি যতীনদা, মোড়ে কেউ নেই।

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যতীন যেন কিরণমালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল....বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে।

কিরণমালা। [বহুদূর হইতে] মায়াপাহাড়ের রহস্য ভেদ করেছি। আসছি আমি— আসছি—

যতীন উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিল। কিরণমালা আসিল না, বড় বউদি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটা থালা। থালার উপর একটা বাটি।

বড় বউদি। তোমর খাবার দিয়ে গেলাম। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।

যতীন। হাসপাতালে কেন?

বড় বউদি। তোমার দাদাদের খাইয়ে আসি। তোমার বড়দাকে খাইয়েই দিতে হবে বোধ হয়। ডান হাত ভেঙেছে শুনছি। [হাসিলেন]

যতীন। ওঁরা আসবেন না হাসপাতাল থেকে?

বড় বউদি। রামদীন এসে বললে, ডাক্তারেরা রাতটা ওইখানেই থাকতে বলেছে!

যতীন। মোটর তো খারাপ, তুমি যাবে কি করে? ভাড়া-গাড়িও তো পাওয়া যাবে না এখন।

বড় বউদি। রামদীনকে সঙ্গে করে হেঁটেই চলে যাব। কতটুকুই বা!

যতীন। চল, আমিই না হয় যাই তোমার সঙ্গে!

বড় বউদি। না না, তুমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেও না। তোমাকে এখান থেকে এক পা নড়তে মানা করে গেছেন। তোমাকে যদি হাসপাতালে দেখেন, বাঁ হাত দিয়েই হয়তো গুলি করে বসবেন। [হাসিয়া] চেন তো মানুষটিকে! দরকার নেই তোমার গিয়ে। দু-চারটে গুণ্ডা শুনছি নীলার সন্ধানে ঘুরছে এখনও। তুমি থাকো বাড়িতে। রামদীন আমার সঙ্গে থাকবে, কিছু ভয় নেই। বুমি নোয়াখালি দৌড়তে পারল, আর আমি এটুকু যেতে পারব না! নীলা ঘুমুচ্ছে—তুমি এখন নীচে যেও না যেন, মেজ বউ রইল তার কাছে। বৈঠকখানার ছাতে বাঁশের সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছি। খাবারটা এই টেবিলে রইল। গরম গরম খেয়ে নাও না বাপু, তুমি মাংসের যে যে পীস ভালবাস, তাই দিয়েছি বেছে বেছে। আচ্ছা, চললুম আমি।

চলিয়া গেলেন। যতীন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইতে লগিল, বড় বউদি যেন তাহার মা। মেজ বউদির সঙ্গে ঠিক এই সম্পর্ক তাহার নয়। তাহাকে সে এখনও 'আপনি' বলে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ তাহার খেয়াল ছিল না। একটা শব্দ হইতে সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—পাশের ঘরের খোলা দরজা দিয়া ছাতটা দেখা যাইতেছে—বৈঠকখানার ছাত হইতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া কে সন্তর্পণে উপরে উঠিতেছে।

যতীন। কে?

কোনও সাড়া নাই। মূর্তিটা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের খোলা দরজাটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন ত্বরিত হস্তে বন্দুকটা তুলিয়া লইল।

যতীন। কে—জবাব দাও, তা না হলে গুলি করব।

মূর্তি। ভাই যতীন, আমি মহীউদ্দিন।

যতীন। মহীউদ্দিন!

মহীউদ্দিন। আমায় তুমি বাঁচাও ভাই, আমার বাল্যবন্ধু তুমি।

যতীন পাশের ঘরে গিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিল। মহীউদ্দিন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। ভয়ে তাহার চোখ মুখ বিবর্ণ।

যতীন। মহীউদ্দিন? তুমি! ভেতরে এস।

যতীনের বন্দুকটার দিকে মহীউদ্দিন বার বার চাহিতে লাগিল।

যতীন। ভেতরে এস।

মহীউদ্দিন। তোমার হাতে—

সে আর কথা শেষ করিতে পারিল না, বিস্ফারিত চক্ষে বন্দুকটার দিকে চাহিয়া বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। বাইরে কেন, ভেতরে এস না!

মহীউদ্দিন। ভাই—।

সহসা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

যতীন। [আগাইয়া গিয়া হাত ধরিয়া] এস—এস—

মহীউদ্দিন। সভয়ে পিছাইয়া গেল না—না—না—

যতীন। ও, তুমি বুঝি ভয় পাচ্ছ, আমি তোমায় ঘরে পুরে মেরে ফেলব! সে ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণ ফেলতাম। আশ্রিতকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম যে ভাই। শুধু আমাদের ধর্ম নয়, তোমাদেরও ধর্ম। আমাদের যুদ্ধ গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, ভুল করো না। এস, ভেতরে এস, বস।

মহীউদ্দিন তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীন। আচ্ছা, তোমার ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি।

দ্বিতীয় বন্দুকটি বাহির করিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিল।

যতীন। এই নাও, এইবার হল তো? আমি যদি তোমাকে আক্রমণ করি, তুমি আত্মরক্ষা করতে পারবে। এস—বস।

মহীউদ্দিন ভিতরে আসিয়া বসিল।

মহীউদ্দিন। আমি খেতে বসেছিলাম, এমন সময় শুরু হয়ে গেল। উঃ—উঃ—

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতীন। খাবে কিছু? খাবার আছে।

পোলাও মাংস আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া দিল।

যতীন। খাও, খেয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি। কেউ যদি এসে দেখে ফেলে তোমাকে, তাহলে একটু মুশকিলে পড়ে যাবে—বুঝতেই পারছ। আমি বিছানা দিচ্ছি—বেশ করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাক, কোন ভয় নাই। বিছানাটা পাতি থাম।

যতীন বিছানা পাতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহীউদ্দিন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া কেবল জল পড়িতেছিল। সহসা উঠিয়া সে আবেগভরে যতীনকে আলিঙ্গন করিল। তাহার মুখ হইতে অস্ফুটকণ্ঠে বাহির হইল—ভাই!

...অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। মহীউদ্দিন পাশের ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যতীন একটা ঈজি-চেয়ারে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। তাহার মন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে—যে ভারতে দারিদ্র্য নাই, নীচতা নাই, হিংসা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, যাহা বহু শতাব্দীর পঙ্ককে অতিক্রম করিয়া রূপে রসে গন্ধে শতদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে....যে ভারতে মানুষ কামনা করে, ধন নয়, মান নয়—আনন্দ...আনন্দ আর শান্তি।...দ্বারপথে একটা শব্দ হইতেই যতীন চোখ খুলিয়া দেখিল, নীলা দাঁড়াইয়া আছে। কপালে কনে-চন্দন, পরনে চেলী।

নীলা। আমি আবার ফিরে এলুম যতীনদা। ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং যতীনের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জনরবে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। যতীন দেখিল, অশরীরী ভ্রমরটা মনের আনন্দে গুনগুন করিয়া বেড়াইতেছে।

অশরীরী ভ্রমর। একটা সুখবর তোমায় দিতে এলাম—আমি তার দেখা পেয়েছি।

যতীন কোন উত্তর দিল না। নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল শুধু।

কষ্ঠিপাথর
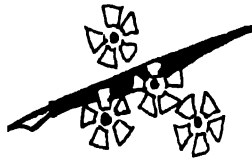
অসিতের পত্রাবলী

১

রাত্রি প্রায় বারোটা। চারিদিক নিস্তব্ধতন্দ্রায় আচ্ছন্ন। বাইরে অবিরাম ঝিল্লিধ্বনি। জোনাকিদের ফুলঝুরি উৎসব দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। আকাশে মেঘ। চারিদিকের অবস্থা তোমাকে চিঠি লেখবার মতোই স্বপ্নময়। কিন্তু কি লিখি? কথা তো অনেক আছে, কিন্তু তারা এত বিচলিত যে লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ করা যায় না। কারও চোখে অশ্রু, কেউ লজ্জায় সঙ্কুচিত, কেউ বিষণ্ণ, কেউ গম্ভীর। কাগজের বুকে সারি বেঁধে দাঁড়াবার মতো সুবিন্যস্ত পরিচ্ছদ কারও গায়ে নাই। জোর করে তাদের প্রকাশ করতে গেলে অসম্বন্ধ প্রলাপের মতো শোনাবে।

তোমাকে আমার এই প্রথম চিঠি। কত কি লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত "প্রথম" জিনিসের মতো আমার এই চিঠিখানিও প্রকাশের অফুরন্ত আকুলতা নিয়ে অস্ফুট অসমাপ্তিতেই শেষ হবে বোধ হয়। এর জন্য তোমার দুঃখ হবে কি না জানি না, কিন্তু আমার দুঃখের আর শেষ নাই। তবে আশা করি, আমার প্রাণের সুস্পষ্ট বাণী একদিন শুনতে পাবেই তুমি। আর একজনও শুনবে বলে আশা করে আছে।

...হরিটা পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানে না যে, দাদা রাতদুপুরে উঠে বৌদিকে চিঠি লিখছে। আচ্ছা, তুমি যে বার বার বললে তোমার রূপ নেই, গুণ নেই, আমি তোমাকে দয়া করে বিয়ে করেছি (সত্যি না কি?) কিন্তু তোমার সঙ্কোচভাব কিছু দেখছি না তো। উপরন্তু তোমার সাহস ও স্পর্ধা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। রূপ-গুণহীনা দয়ার পাত্রী তুমি, কোথায় সসঙ্কোচে সরে থাকবে, তা নয়, অবলীলাক্রমে সহজে ও সপ্রতিভভাবে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এমন অপূর্ব তালে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে দোলা দিয়েছ যে আমার বিগত অতীত, এমন কি, বিস্মৃত পূর্ব-জন্ম পর্যন্ত সেই দোলায় আন্দোলিত হচ্ছে। এই কি রূপগুণহীনা দয়ার পাত্রীর শোভন ব্যবহার? এত সাহস এত স্পর্ধা কোথায় পেলে তুমি? আমার মতো গম্ভীর লোককে ভয় হয় না? বিয়েই না হয় করেছি, তাই বলে আমার সমস্ত দিনরাত্রি সমস্তক্ষণ সবটা অধিকার করে থাকবে! বেশ আব্দার তো।

...ট্রেনে তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে কেবলই এসেছ। হঠাৎ উঠে বসেছি, পাশে দেখি সেই ফয়জাবাদ-যাত্রী মুসলমান ভদ্রলোকটি প্রচুর গোঁফদাড়ি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। ট্রেনটা একটা পুলের উপর উঠেছে—আবার শুলাম—আবার একটু ঘুমের ঘোর, আবার তুমি, "না, পাখাটা আমায় দাও, আমি বাতাস করব, আমার হাত কিছু ব্যথা করছে না, আঃ ছাড় না—লাগছে বড্ড", সেই দুষ্টু হাসি। আবার ঘুম ভাঙল, আবার সেই লোমশ মুসলমান ভদ্রলোক। ট্রেন স্টেশনে এল। সমস্ত ব্যাপারটার উপর বীতরাগ হয়ে কেলনারে গিয়ে চা খেলাম। উপর্যুপরি দু'কাপ। বাকি রাস্তাটা আর ঘুম হল না। এমনি করে জ্বালাতন করবে নাকি?

মা তোমাকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন। মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। টাকার জন্য কিছু ভেবো না। টাকার জন্য পৃথিবীতে কখনও কিছু আটকায় না যদি মনের জোর থাকে। আমার

চাবি পাঠাও অবিলম্বে। কাপড়-জামা সব বন্ধ যে—এই শ্লথ-স্মৃতি স্বামীটিকে নিয়ে মুশকিল হবে তোমার।

উষা কেমন আছে?

তোমার যা-কিছু দরকার হবে আমাকে জানিও। লজ্জা কোরো না লক্ষ্মীটি।

অনেক রাত হোলো। তুমি নিশ্চয়ই এখন সুখে ঘুমোচ্ছো। বিরক্ত করবার কেউ নেই তো। আমিও এবার শুই। আসবে নাকি স্বপ্নে করি ভর? ইতি—

তোমারই অসিত

২

শ্রীমতী হাসি দেবীর খবর কি?

সেদিন হাসিকে একটা চিঠি লিখেছি, আজও তার জবাব পেলাম না। জবাব না পাওয়ার হেতু নানারকম হতে পারে, কিন্তু আমার উপর তার ফল হয় মাত্র একটি—চিন্তা। হাসির জন্য চিন্তিত আছে। সেদিন অত রাত্রে ঘুমের ঘোরে কি যে লিখেছিলাম মনেও নেই ভালো। নিশ্চয়ই এমন কিছু কর্কশ লিখিনি যার জন্য হাসির মনোকষ্ট হতে পারে। কি জানি। যে মন এখনও পাইনি তার কিসে কষ্ট হয়, কিসে হয় না, তা তো এখনও অজানা। সুতরাং সে গবেষণা করে লাভ নেই কোনও।

হাসি এখন কোথায় আছে এবং কেমন আছে এইটুকু খবর পেলেই আপাতত সন্তুষ্ট থাকব। হাসি যেন এ খবরটুকু জানাতে দেরি না করে। শুধু শুধু একজনকে উৎকণ্ঠিত করে কি লাভ তার।

মা হাসিকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন এ খবর তো সে আগেই পেয়েছে। সে অনুমতি যে আন্তরিক এ খবরটাও তার জানা দরকার। তা না হলে হয়তো সে স্বস্তি পাবে না। অস্বস্তির কোনও কারণ নেই। পিতামাতার আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও শুভকার্যও যে শ্রীমণ্ডিত হয় না এ সহজ জ্ঞান আমার আছে। অতএব হাসির কোন প্রকার দুশ্চিন্তা অনাবশ্যক।

মা খেতে ডেকেছেন, খেয়ে আসি। খেয়ে এসে শেষ করব চিঠিটা। হাসির খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণ। কি করছে সে?

...খাওয়াটা প্রচুরই হল। মায়ের খাওয়ানো। পরশু থেকে আবার চলবে মেসের সেই সনাতন ঠাকুর-সেবা। কাল লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। একথাও হাসির জানা ভাল। কি জানি, হঠাৎ যদি দরকার হয় কিছু। ঠিকানাটা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম।

খেতে খেতে একটা জিনিস মনে হচ্ছিল। প্রণয়-ব্যাপারের সঙ্গে যদি কোনও খাদ্যদ্রব্যের তুলনা রীতিবিরুদ্ধ না হয় তা হলে তুলনাটা মাছের সঙ্গে, বিশেষত ইলিশ মাছের সঙ্গে, দিলে বেশ খাপ খায়। হাসি না কি ইলিশ মাছ পছন্দ করে? বেশ মুখরোচক মাছ—ভারী সুস্বাদু। ইলিশ মাছ ধরা কিন্তু ভারী শক্ত। তা ছাড়া এত কাঁটা-বহুল যে প্রতি গ্রাসেই কণ্ঠ-কণ্টক হবার আশঙ্কা। কণ্ঠ-কণ্টক অর্থাৎ গলায় কাঁটা বিঁধে থাকলে যে কি অস্বস্তি তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মাছের সুস্বাদ রসনায় নেই অথচ তার বেদনাময় স্মৃতিটি কণ্ঠে বর্তমান। মিলন-

অবসানে বিরহের মতো। হাসি হয়তো পাতলা ঠোঁটটি উলটে বলবে—আহা, উপমার কি শ্রী! হাসি যেমন খুশি ঠোঁট উলটে যা খুশি বলুক কিন্তু আমার মনে হয় যদি কোনও বিরহী বলে—"আমার মনের গলায় বিরহের কাঁটা লেগেছে—উঠতে বসতে সর্বদাই খচখচ করছে—ঢোঁক গিলতে পারছি না—কাউকে দেখাতেও পারছি না," তাহলে তার বর্ণানাটা মেঘদূতের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও নিতান্ত বাজে হবে না। আমার মতে—কিন্তু না, নিজের মত নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে হাতাহাতি হবে হয়তো শেষটা। কারণ হাসি ক্রমশ চটে যাচ্ছে সে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু মুচকি হাসি উঁকি মারছে, তাও দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু থাক, দরকার কি?

...এই নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে হাসিকে কাছে পেলে এখন ভালই লাগত। মনে হচ্ছে ঘুমুলে বোধ হয় সে আশা সফল হতে পারে।...

জাগরণের সূর্য যখন অস্ত যায় তখন তন্দ্রার সন্ধ্যায় স্বপ্নের মেঘগুলি কল্পনার রঙীন আকাশে লীলায়িত হয়ে ওঠে। কি সুন্দর স্বপ্নলোকের সেই ক্ষণিক দেখা-শোনা!

হাসির বাবা-মা কি দেশে ফিরে গেলেন? আশা করি, সে রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" পড়েছে। ইতি—

তোমারই অসিত

৩

আজ তোমার এই প্রথম চিঠি পেলাম।

সত্যি হাতের লেখা এতই বিশ্রী যে চিঠিখানি পড়তে প্রায় পুরোপুরি তিন মিনিট সময় খরচ হয়ে গেল। তা ছাড়া, ভাব ও ভাষা এত লঘু যে চিঠিটা একবার পড়ে তৃপ্তি হয় না, বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। অতএব লজ্জা করাটা তোমার পক্ষে ভারী সুসঙ্গত হয়েছে। তা বলে যা লিখেছ তা যেন করে ফেল না—লজ্জায় মরে যেও না—তাহলে একটু নিদারুণ রকম বাড়াবাড়ি হবে।

দেখ, আলঙ্কারিকেরা বিনয় ও লজ্জাকে মানুষের ভূষণ বলেছেন। অস্ত্র বললে আরও ঠিক হত। অতি-বিনীত ও অতি-লাজুক লোকের কাছে সকলেই হার মানতে বাধ্য। তোমার এই সরমস্নিগ্ধ নম্রনত সংগ্রামে আমি সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করছি বিনা শর্তে (বিনা শর্তে করব কিনা ভাবছি)—তুমি বিনয়বাণ নিক্ষেপ করে আর আমাকে ক্ষতবিক্ষত কোরো না।

সমস্ত চিঠিখানি যেন তোমার একখানি 'ফটোগ্রাফ'। ভাষাময়ী হাসি, বিনয়-অভিমান-লজ্জা-অনুনয়-আশা-আকাঙ্ক্ষা-খচিত শ্রীমতী হাসি দেবীর জীবন্ত মানস যেন। মাঝে মাঝে এমন বিশ্রী চিঠি দুএকখানা লিখো।

আমার প্রথম চিঠিতে যার কথা লিখেছিলাম— যে আমার বাণী শোনবার আশায় কান পেতে আছে— সে কে, মেয়ে না পুরুষ, তুমি জানতে চেয়েছ। অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা লিখে ফেলেছিলাম। সত্যি কথা বলব? রাগ করবে না তো? সে মেয়ে। কেমন দেখতে? খুব চমৎকার। কিন্তু, না থাক, এর বেশি আর বলব না এখন।

আপাতত কোলকাতা যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। বিনা দরকারে যাই কি করে বল।

তুমি থাকতে কোলকাতাটা লোভনীয় কিন্তু দুর্গম হয়ে উঠল। তোমারই লজ্জা আছে আমাদের বুঝি সে সব থাকতে নেই?

এখানকার খবর ভালই। নিশ্চিন্ত ঘুমের কথা লিখেছ না? তুমি যখন কাছে থাকতে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে জেগে থাকা যেত। এখন তুমি কাছে নেই, ঘুম যদি বা আসে নিশ্চিন্ত হতে পারি কই!

কলমটা খুব খারাপ। খুব উদার লোকও এটাকে চলন-সই বলতে কুণ্ঠিত হবে। অক্ষরগুলো কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে।

শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখ। তোমার টনসিল খুব খারাপ। সুযোগ পেলেই ওর একটা বন্দোবস্ত করব। 'কডলিভার অয়েল' খেও। এবং....।

নাঃ, এ কলমে আর লেখা যায় না। থামলাম। চাবি পেয়েছি। ফটো পাবে।

অসিত

৪

এ তো আচ্ছা জবরদস্তি তোমার! তুমি ছাড়া আর কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ থাকতে পারে না আমার? এ যুগে? কোনও যুগে কি সম্ভব ছিল? নূতন আলাপ করবার বেলায় না হয় তোমার কথা ভেবে সংযত হতে চেষ্টা করব কিন্তু যাদের সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই আলাপ আছে তাদের কি করে বিদায় করে দিই! ভারী হিংসুটে তো! না, বলব না তার নাম। নাম ঠিকানা বলে দিই আর তুমি তার সঙ্গে গিয়ে চুলোচুলি কর! কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা ভাল, তার সঙ্গে চুলোচুলি করা যায় না। অতুল এসেছিল নাকি তোমার খোঁজে? আসতে বলেছিলাম তাকে আমিই। দরকার হলে তোমার টনসিল আর দাঁতের জন্য তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ভিজিটার্স লিস্টে ওর নাম আমিই দিয়েছি। ওর চেহারাই অমনি রোগা-রোগা। বুভুক্ষু চোখের দৃষ্টি আর উঁচু উঁচু গালের হাড় দুটো দেখে ভয় করবারই কথা। কিন্তু আসলে ও ভীতিকর নয়। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরা যেমন তেমনি, চলতি বাংলায় ছুং ছুং করা যাকে বলে—তাই করে বেড়ায়। এদিকে পণ্ডিত লোক। সাহিত্য নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয় যদি কখনও বুঝতে পারবে। আমার আর একটি বন্ধু মহেন্দ্রও হয়তো আসবে মাঝে মাঝে। ভিজিটার্স লিস্টে তারও নাম দিয়েছি।

নির্জন একটা কোণের ঘরে বসে তোমায় চিঠি লিখছি। তুমি নিশ্চয় ঘুমুচ্ছ এখন। আমার কিন্তু ঘুম হবে না কিছুতে। চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেলে কি যে করব এখন সেইটেই সমস্যা। বই পড়তে ভাল লাগবে না। নিজের মনের সঙ্গে আলাপ করব তার উপায় নেই। মনের দুয়ারে শ্রীমতী হাসি টক্‌টকে লালপাড় শাড়ি পরে পাহারা দিচ্ছেন, হাসি চাহনি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। মনের মধ্যে কারও প্রবেশ নিষেধ, এমন কি আমারও। কিন্তু—না, থাক এরপর যে কথাটা মনে হচ্ছে লিখব না।

খিল বন্ধ করে দিয়েছি। খিল খুলে রাখার দরকার তো নেই আর। ঠাণ্ডা কনকনে হাত-পা নিয়ে কেউ আমার লেপের মধ্যে আজ তো আর ঢুকে পড়বে না। যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি যে হাসি আমার পাশটিতে শুয়ে আছে! আর ঠিক তেমনি করে বলছে—"উঁ—ভারি ঘুম

পেয়েছে সত্যি"—কি মজাই হয় তাহলে... বালিশে চুলের গন্ধ রয়েছে এখনও। মনে পড়ছে কবি করুণানিধানের কবিতার লাইন ক'টা —

তারই চুলের গোলাপ ফুলের
শুষ্ক ধূসর পাঁপড়ি এই
সেই উপাধান শয়ন শিথান
শূন্য আধেক সে আজ নেই—

কি করছ তুমি এখন? উঃ, এত দেখতে ইচ্ছে করছে। সত্যি বল না কেন এত খরাপ লাগে?

ক্রমাগত লিখে গেলে সময়-সমস্যার সমাধান হয় বটে কিন্তু মনের অবস্থা এত বিশৃঙ্খল যে বেশি কিছু লেখা অসম্ভব।

অনেক আদর জানাচ্ছি.....

শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখো লক্ষ্মীটি। উত্তর দিতে দেরি করো না। ইতি—

তোমার অসিত।

৫

১০।২।৪৯

দেহটাকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছেছি কোনক্রমে, মনটা কিন্তু এখনও পৌঁছয়নি। সে কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি কোথাও ঘুরছে এখনও। তাকে ধরে বেঁধে পাঠিয়ে দাও লক্ষ্মীটি। সে না এলে পড়াশোনা করব কি করে?

বুঝলে, ধরা পড়িনি কিন্তু। বাইরের কারও কাছে ধরা না পড়লেও নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছি। তুমি যখন লিখেছিলে 'এসো', আমি তখন ভেবেছিলাম 'যাব না'। নানাবিধ নৈতিক যুক্তি চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, খবরদার। কিন্তু হঠাৎ চলে গেলাম এবং তখন (মানে, যাবার অব্যবহিত পূর্বে) মনকে বোঝালাম যে, বোর্ডিংয়ে 'সীট' পেয়েছে কি না, কোথায় আছে, কেমন আছে, ইত্যাদি বিষয়ে স্বামী হিসেবে আমার একটু খোঁজ-খবর করা উচিত। নিজের কাছে চুরি ধরা পড়ে গিয়ে বেশ মজা লাগছে এখন। খুব খারাপও লাগছে কিন্তু, আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যে নয়, চলে এসেছি বলে। মনে পড়ছে মেঘদূতের শ্লোক—

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্‌বিয়োগঃ শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।

রাত্রে আমার জন্য মন কেমন করবে না কি তোমার? বিরহী যক্ষ এ বিষয়ে যতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ততটা হবার সাহস হয়নি আমার এখনও।... দিনের কোলাহল থেমে গেছে। একা ঘরে পুরাতন সঙ্গী দুটিকে নিয়ে শুয়ে আছি—কম্বল আর বালিশ। এরা যেন আমার উপর অভিমান করেছে বলে মনে হচ্ছে। এদের মনের ভাবটা যেন, আজ আমাদের ভাল লাগছে না, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন—ইত্যাদি। বেচারারা নিতান্তই জড়পদার্থ কি-না, জীবন্ত প্রাণের মনস্তত্ত্ব তাই বুঝতে পারছে না। কিংবা হয়তো পারছে (আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথা মানলে) কিন্তু বলছে না কিছু। হিংসেয় জ্বলে মরছে নীরবে। তা যদি হয় তা হলে সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু। যাদের ওপর মাথা রেখেছি, অঙ্গ প্রসারিত করেছি, তারা যদি নীরবে নেপথ্যে ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে তা হলে— তা হলে কি হতে পারে বল তো? ওদের দাঁত কিম্বা নখ নেই যে আঁচড়ে কামড়ে দেবে, বড় জোর, গরম হয়ে উঠতে

পারে। তাতে খারাপ না হয়ে ভালই হবে এই শীতকালে। কিন্তু ওরা আমার মনের কথাটা বুঝবে না এই বা আমি ধরে নিচ্ছি কেন? হয়তো সব বুঝছে এবং নিজেদের ভাষায় সমবেদনা প্রকাশ করছে, আমি বুঝতে পারছি না। সবই সম্ভব, মানে কল্পনায়।

....পৃথিবীর গোলমাল থেমেছে। মুখের এবং মনের উপর লৌকিকতার যে ছদ্ম আবরণটুকু ছিল তা সরে গেছে। নির্জন নিশীথে মনের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একাধিক স্তর আছে। এক স্তরে সে নিতান্তই সাধারণ মানুষ। খায়, বেড়ায়, ঘুমায়, সংসারধর্ম প্রতিপালন করে। অত্যন্ত বাস্তব। অন্য স্তরে সে কিন্তু খুবই অসাধারণ। সেখানে সে স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। তার কল্পনা, তার স্বপ্ন একান্তভাবে তার নিজস্ব! সেখানে কারও সঙ্গে তার মিল নেই। সেই অসাধারণ বেখাপ্পা কল্পনাকে সে মূর্তও দেখতে চায় বাস্তব জীবনে এবং সেইখানেই বাধে বিরোধ। বিরোধ বাধলেই সে কিন্তু থেমে যায় না, কারণ তার স্বপ্নজীবনকে বাস্তবে রূপ দেওয়াটাই তার মনুষ্যত্ব, বৈশিষ্ট্য। তাই কখন চুপিচুপি, কখন সোরগোল করে প্রত্যেক মানুষই ওকাজ করেছে। স্বপ্নকে বাস্তবে যারা রূপ দিতে পেরেছে জীবনে তারাই সুখী, তারাই কৃতী। যারা পারেনি, তারা দুঃখী, জীবন তাদের অধন্য। অধিকাংশ লোকই কিন্তু পারে না। টাকা রোজগার করতে পারে, খ্যাতির শিখরে উঠতে পারে, কিন্তু স্বপ্নকে রূপ দিতে পারে না। তাই বোধ হয় অধিকাংশ লোকই অসুখী।

সেদিন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল—সে ভদ্রকন্যার কাল্পনিক জগতের স্বামী ছিলেন সুশ্রী, সুধী, সুগায়ক। বাস্তব জীবনে হয়েছে কিন্তু তার বিপরীত। বাস্তব স্বামীর না আছে শ্রী, না আছে ধী, না আছে গান। ভদ্রমহিলার মনোকষ্টের অবধি নেই। কষ্ট তো হবেই। নিজের কল্পনা অপরের মধ্যে ষোল আনা সফল হবে এটা আশা করা অন্যায়, কারণ উক্ত 'অপর' ব্যক্তিরও নিজস্ব একটা সত্তা আছে তো!

জীবনে অহরহই এরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি চিরকালই কাল্পনিক। কত কল্পনাই করি। অধিকাংশ কল্পনাই সফল হয় না। হঠাৎ একটা কল্পনা মূর্তিমতী হয়েছে মনে হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে, পাছে উবে যায়! এ পৃথিবীতে যা-কিছু সুন্দর তাই নাকি ক্ষণভঙ্গুর। ভারী ভয় হয় তাই। তুমি 'কডলিভার' কিনেছো তো? যা বলে এসেছি কোরো ঠিক ঠিক। অতুল গলায় লাগাবার ওষুধটা দিয়ে গেছে আশা করি। লাগিও ঠিক মত। এতে লজ্জার কি আছে? অসুখ হয়েছে ওষুধ দিচ্ছ, শখ তো আর নয়।

এখন এত ইচ্ছে করছে তোমায় কাছে পেতে। কোলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ কি আর এমন দূর? এস না চলে, মনোরথে চড়ে স্বপ্নকে সারথি করে। রূপকথায় যা সম্ভব, বাস্তব জীবনে তা অসম্ভব কেন? সত্যি, কি মজাই হয় হঠাৎ যদি এসে শুয়ে পড় পাশটিতে, কম্বলে কুট কুট করবে যদিও তোমার, তবু ভাল লাগবে।

কত কি লিখতে ইচ্ছে করছে। সেই মেয়েটি জানালার ছোট্ট ফুটোতে চোখ রেখে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে আর হাসছে মুচকি মুচকি। সেই মেয়েটি যার কথা বলব না বলেছি।... এবার আসি। রাত্রি একটা বাজে। হাসি ঘুমুচ্ছে নিশ্চয় এখন! তার শুকনো বিষণ্ণ মুখখানি দেখতে পাচ্ছি। বোর্ডিংয়ে যাওয়ার কতদূর কি হোলো জানিও। উঃ, অনেক রাত হল—আসি এবার। ডট ডট ডট। অর্থাৎ....

অসিত

৬

২৫।২।৪৯

কাল তোমার পোস্টকার্ড এবং আজ তোমার খাম পেলাম। পোস্টকার্ড পেয়ে হতাশ হয়েছিলাম, খাম পেয়ে তবু খানিকটা খুশি হলাম, অবশ্য অতি অল্পই। চার পৃষ্ঠায় আর কত কি লেখা যায় বল। কবিতায় চিঠি লিখতে মানা করেছ কেন? সময় নষ্ট হবে? সময় তো নষ্ট করার জন্যেই, পয়সা যেমন খরচ করার জন্যেই। বাঁচিয়ে রেখে কোনও লাভ নেই, শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়ও না।

বোর্ডিং-এ স্থান পেয়েছ জেনে আশ্বস্ত হলাম। মন দিয়ে লেখাপড়া কর এবার। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের উপদেশগুলো ঝালিয়ে নাও আর একবার। এত কাণ্ড করার পর ফেল হলে সে ভারী বিশ্রী হবে। আমি ফেল করতে পারি এবং আমার ফেল করবার সঙ্গত কারণও আছে একাধিক। প্রথম কবিতা, দ্বিতীয় তুমি, তৃতীয় ড্যাশ, চতুর্থ ডট্ ডট্ এবং ইত্যাদি এট্‌সেটরা অনেক আছে। আমি তোমায় ফেল করাব? সে রকম ভাগ্য আমার নয়। তুমি পাশ করবেই জানি, তবু স্বামী হিসেবে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য তাই একটু দিলাম। মেয়েরা কখনও ফেল করে না। পরীক্ষায় নম্বর পাবার নানা কৌশল তাদের আয়ত্তাধীন। নানাদিক বাঁচিয়ে সংসার-সমুদ্রে পানসিটুকু মাত্র সম্বল করে যারা পাড়ি জমাতে পারে তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। যে সব মেয়ে ফেল করে তারা মেয়ে নয়, তাদের মধ্যে পুরুষ উহ্য হয়ে আছে জানবে।

তুমি আমাকে যে পরিমাণ বিরক্ত করছ তার সিকিও আমি তোমাকে করি না নিশ্চয়। কাল কি কাণ্ড করেছ জান? কাল যখন পড়ছিলাম (খুব বীভৎস জিনিসই পড়ছিলাম। একটা মড়া কেমন করে পচে পচে অবশেষে কদাকার দুর্গন্ধ গলিত পিণ্ডে পরিণত হয় তারই বিশদ বর্ণনা) তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কবিতার মিল খুঁজছি। যে কবিতা কাল তোমায় লিখে পাঠাব সেই কবিতার! গলিত মাংসপিণ্ডের উপর ভেসে উঠছে হাসিভরা তোমার চোখ দুটি। বারম্বার এই কাণ্ড। কতবার ঠিক গুণিনি কিন্তু অনেকবার।

বিরক্ত হয়ে শেষে প্যাথোলজি নিয়ে বসলাম, সেখানেও দেখি তুমি হানা দিয়েছ। এবং বেশ একটু বিচিত্র রকমে। একরকম পোকার কথা পড়ছিলাম, নাম তাদের সিস্‌টোশোমাম্ (Schistossomum), এরা যতদিন বড় না হয় ততদিন আলাদা থাকে। কিন্তু যখন সাবালক হয় অমনি পুরুষদের পেটের তলায় খাঁজ হয় আর মেয়ে পোকাটি সেই খাঁজে ঢুকে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং এই ভাবেই বরাবর থাকে। এরা দেখতে খুব ছোট ছোট কেঁচোর মতো। সেই প্রেমিক পোকাদের বাস মানুষের রক্তে, কখনও বা শামুকের পেটে। যে মানুষের রক্তে এরা সঞ্চরণ করে, রক্তস্রাব করতে করতে ইহলীলা সম্বরণ করতে হয় সে বেচারাকে। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, আহা আমরা মানুষ না হয়ে যদি ওই রকম পোকা হতুম, বেশ হত তা হলে! মন-কেমন-করা প্রভৃতির কোন উৎপাত থাকত না। বোঝ! পোকা হতে ইচ্ছে করছিল।...এমন করে বিরক্ত করবে নাকি তুমি আমাকে! কি কাণ্ড! সামনে 'ফোটো'তে বসে বসে সমানে যে হেসে যাচ্ছ মুচকি মুচকি।...অবিলম্বে চিঠির উত্তর যদি না দাও ফের চলে যাব বলছি! তোমার মন খারাপ লাগে, আর আমিই বুঝি পাষাণ?

অতুল একশিশি লজেনজ্ দিয়ে গেছে তোমাকে? বেশ তো খেয়ে ফেল। চুষে চুষে খেও, লজেনজ গিলে খেতে নেই, গলায় আটকে যেতে পারে।

অতুলের জন্য দুঃখ হয় বড়। রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, কোটরগত চক্ষু, মাথায় নানাবিধ 'ইজমে'র আগুন, পেটে খিদে।

বিবিধ সমস্যায় আকুল বেচারা। অথচ, একটাও সমাধান করবার সামর্থ্য নেই। অথচ গান গাইতে পারে, ভালো ছবি তুলতে পারে, লিখতেও পারে, পেটে বিদ্যেও আছে, তবু কিছু করতে পারছে না। কেন জান? চরিত্র নেই। তাজমহল গড়বার সমস্ত উপকরণ হাতের কাছে আছে, নেই কেবল সিমেণ্টজাতীয় জিনিস যা সমস্ত জিনিসটাকে গড়ে তোলে, ধরে রাখে। কথার ঠিক নেই, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য হরদম করে চলেছে, সংযম নেই, মাত্রা বোধ নেই। সুতরাং কষ্ট পাচ্ছে। সত্যি বড় দুঃখ হয় ওর জন্য।... কিন্তু এ আমি করছি কি! দুটো বাজে! সুতরাং ইতি। এবং—

অসিত

৭

২৮.২.৮৯

পদ্য করে পত্র লেখা নয়কো তত মন্দ কাজ
ভদ্রভাবে ভাষার গায়ে পরিয়ে দিলে ছন্দ সাজ
একটু যেন ভালই লাগে, করছি নাকো অহঙ্কার,
দেখায় না কি তোমায় ভালো পরলে কিছু অলঙ্কার?
ছন্দধারা তৃপ্ত করে নন্দনিয়া কর্ণমূল
যেমন আঁখি তৃপ্ত করে তোমার দুটি স্বর্ণ-দুল।
বল্‌তো পারো—'পরীক্ষা যে'— সত্যি কথা, জানছি সব
সময় কিছু নষ্ট হবে—হবেই হবে—মানছি সব।
যুগের শেষে কিন্তু সখি আসবে জেনো যুগান্তর
নষ্ট কিছু হয় কি কভু? হয়তো শুধু রূপান্তর।
মনের মাঝে পাগল আছে খেয়াল হল আজকে তার
হঠাৎ মোরে বলছে এসে, কেতাব রাখ বাঁধ সেতার।
ছন্দ-ভরে মেলছে পাখা আজকে মন-পক্ষী মোর।
রাগ কোরো না, রাগ কোরো না, রাগ কোরো না লক্ষ্মী মোর।
এতটা কাল বাস করেছি গহন বনে পুস্তকের
কল্পলোকে ছিলাম নিয়ে অসুস্থ ও সুস্থদের,
মধ্যে মাঝে সময় পেলে নানা রকম পত্রিকায়
খেয়াল খুশি যেতাম নিয়ে ছন্দ-ভরা ছত্রিকায়।
খুশির করতালের সাথে বাজিয়ে নিজ ছন্দ বীণ
স্বপ্ন-মেঘ-মালার দেশে যেতাম ভেসে বন্ধহীন।
হৃদয়-নিয়ে চর্চা কত করেছিলাম কল্পনায়

অলস-নিশি স্বপ্নঘোরে জ্যোৎস্নাময়ী জল্পনায়।
এসেও ছিল বস্তু কিছু ওজন দরে কয়েক মণ।
গয়না-টাকা-রূপের-বোঝা-সমন্বিতা কয়েকজন
সেমিজ-শাড়ী-ব্লাউজ-পরা পায়ে রঙীন অলক্তক,
(রঙীন জুতা কিম্বা কারও) নখের থেকে অলক তক্
সবই ছিল যেমন থাকে মুখোশ-পরা নকল মুখ।
চোলাই করা মিষ্টি হাসি ঢালাই করা পাষাণ বুক।
রুগ্ন মোটা শুকনো তাজা উর্বশী ও রম্ভাগণ
এসেছিলেন হেসে হেসে করেছিলেন সম্ভাষণ।
ভেবেছিলাম এ সব নিয়ে বীণার তারে তুলবো তান
এমন সময় হঠাৎ তুমি মাল্য দিলে মূল্যবান।
আচম্বিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফাল্গুনেরি লগ্ন মোর
মূর্ত হল, সফল হল এতকালের স্বপ্ন মোর!
শেষকালেতে বিয়েই হল (উলু দেওয়া হিন্দু মত!)
লজ্জাভরে সবান্ধবে হয়ে গেলাম বিন্দুবৎ।
লক্ষ্ণৌ তো নিঝুম এখন চতুর্দিকে অন্ধকার—
আকাশ-ভরা কাজল মেঘে সবার ঘরে বন্ধদ্বার।
ভাবছি বসে একলা ঘরে (ভাবলে সময় নষ্ট হয়?)
ভাবছি বসে অনেক যা-তা নিজের কাছেই পষ্ট নয়।
ভাবছি অনেক ভাববো আরো—স্বপ্নভরা চিন্তা জাল
(সকাল সকাল ভোরে আবার উঠতে হবে কিন্তু কাল)
রঙিন কথা সঙীন কথা অনেক কথা অবান্তর
লিখতে পাবি, লিখবো নাকো ঘটবে শেষে মনান্তর?
ছন্দে যাহা মিলছে নাকো গদ্যে সেটা করছি পেশ
মিল মিলিয়ে লিখতে গেলে আজকে হবে রাত্রি শেষ।

অর্থাৎ—রোজ কডলিভার অয়েল খেও।
রোজ ডিম খেও।
রোজ টন্‌সিলে ওষুধ দিও।
নিয়মিত চিঠি লিখো।

অসিত

৮

৩।৩।৪৯

তোমার চিঠি পেলাম। মানে, পেয়েই উত্তর দিতে বসেছি। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো কে বেশি চিঠি লিখেছে। আমি তো আজ পর্যন্ত মাত্র পাঁচখানি চিঠি পেয়েছি তোমার। গুণে

দেখো। অনেক বেশি লিখেছি। নিশ্চয়ই। তুমি যখন নিজে চিঠি না লিখে চুপচাপ বসে থাক তখন বুঝি এসব কথা মনে থাকে না। নিজের বেলায় আঁটিসাটি। আমার চিঠি লিখতে একদিন দেরি হয়েছে অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে অস্থির। বেশ তোমরা।

তোমায় বিয়ে করে আমি অনুতপ্ত কি না জানতে চেয়েছ। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কোরো ঠিক জবাব পেয়ে যাবে। এত দুষ্টু কেন তুমি? আমার মনে কষ্ট দিলে বেশ একটু তৃপ্তি পাও বোধ হয়, তা না হলে এরকম কটু কথা লিখতে না।

তোমার গলার ঘা সারছে না কেন? হোস্টেলের ডাক্তারকে দেখাও। গরম জলে নুন বা ফটকিরি দিয়ে গার্গল কোরো রোজ। লিস্টারিন ব্যবহার করতে পার। আশা করি, 'কড়লিভার অয়েল' খাচ্ছ। পারগেটিভও নিও মাঝে মাঝে। সকাল বেলা ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেলো রোজ খালি পেটে।

ডাক্তারি কথা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছ, নয়? কিন্তু গলায় ঘা থাকলে কত রকম বিপদ হতে পারে এ কথা তোমার যদি জানা থাকত এবং তোমার একমাত্র বউটির যদি গলায় ঘা থাকত এবং তিনি যদি বোর্ডিং-বাসিনী হতেন তা হলে তুমিও এই করতে। এব চেয়ে অনেক বেশি করতে। দুদিন চিঠি না পেয়েই মেজাজ যা গরম হয়েছে তার থেকেই বুঝতে পারছি। চিঠি তো নয় যেন এক টুকরো 'লু'!

আজ তোমার ঝুনু মাসীর চিঠি পেলাম। অনেক ঠাট্টা করেছে। আমার সব চিঠিগুলো তাকে দেখিয়েছ? স—ব? আচ্ছা, কি ভাবলে সে? তোমার কলেজের বান্ধবীরা চিঠি দেখেন না কি? আমার কোন আপত্তি নেই যদি তোমার লজ্জা না করে, পুরুষরাই নির্লজ্জ শুনেছি। আমি কিন্তু তোমার চিঠি দেখাতে পারব না কাউকে। এমন কি, অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না।

আমাকে এইবার উঠতে হবে। তুমি হপ্তায় ক'খানা চিঠি পেলে খুশি থাকবে জানিও আমায়। তুমিও উত্তর দেবে তো? মুচকি মুচকি হাসছ দেখতে পাচ্ছি। না, তুমি না লিখলে আমি লিখব না।

হঠাৎ সত্যেন দত্তর একটা কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে গেল। কবিতাটার নাম 'সাড়ে চুয়াত্তর'। "একটি তোমার চুমার লাগি পরান কাঁদে হায়।" ইতি—

অসিত

৯

৪-৩-৪৯

ভাই অসিত,

কাল তোমার স্ত্রী শ্রীমতী হাসির সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি হোস্টেলে গিয়ে। সিনেমায় ভাল একটা বই হচ্ছে, নিয়ে যেতে চাইলাম, রাজী হল না। এর আগের দিনেও ডাক্তার বসুর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম গলাটা দেখাবার জন্যে, যেতে চায়নি। কেন যেতে চাইছে না জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না, চোখ নীচু করে মুচকি মুচকি হাসে খালি। অথচ দেখ—না থাক—তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কত ঘনিষ্ঠ তা নিয়ে তোমার কাছে অন্তত বক্তৃতা করতে চাই না। উইল ইউ প্লীজ ডু ওয়ান থিং? তোমার তো লেখবার শক্তি আছে জানি। (যদিও তা কারো মত পরিবর্তন করতে পারে কি না এ প্রমাণ এখনও পাইনি), সে শক্তিটা তোমার

বিবাহিতা পত্নীর উপর প্রয়োগ করে দেখতে পার? আমি যে বাঘ-ভাল্লুক গণ্ডার জাতীয় কোনও হিংস্র প্রাণী নই, আমি যে বিংশ-শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত যুবক একজন এবং সর্বোপরি তোমার বন্ধু, এ কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবে কি? অবশ্য যে পারিপার্শ্বিকে তুমি তাকে ফেলেছ সেখানে যদি শান্তি রক্ষা করে চলতে হয়, তা হলে হাসি যে রাস্তা ধরেছে তা-ই একমাত্র রাস্তা। ও ইয়েস! ওই শ্লেট-মাসীমা-দারোয়ান—হেল! ওরকম পরিস্থিতিতে মনে যাই থাক, বাইরে চোখ নীচু করে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে 'না' বলা ছাড়া উপায় নেই। এর প্রতিকার একমাত্র তুমিই করতে পার, কারণ তুমি তার স্বামী—লিগাল হাস্‌ব্যাণ্ড। উইল উই প্লীজ ট্রাই? তোমাদের ফোটো এখনও হয় নি। হলেই পাবে। ইতি—

অতুল

১০

অতুল ডাক-যোগে তোমার কাছেও হানা দিয়েছে নাকি? আমিও তার চিঠি পেয়েছি এক-টা। উত্তরও দিয়ে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। সে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে একটু আধটু বেরোতে চায়। যাওয়া না-যাওয়া অবশ্য তোমার ইচ্ছা। আমি কোন আপত্তি বা অনুরোধ করছি না। কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর শ্রদ্ধাটা আমার আন্তরিক। মৌখিক নয়। কার সঙ্গে তুমি কথা বলবে, কার সঙ্গে বেড়াবে, কি পাড়ের শাড়ি বা কোন ছিটের জামা পরবে তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। চিঠির উত্তর দিও তাকে। যা লিখবে ভেবে-চিন্তে সাবধানে লিখ। কারণ লোকটি একটু বাঁকা ধরনের, সহজ কথা সহজ ভাবে নিতে পারে না। মহেন্দ্র ঠিক একেবারে উলটো। মহেন্দ্র কি এসেছিল তোমার কাছে? আসবে ঠিক একদিন। মহেন্দ্রের বউ চিত্রা সেদিন চিঠি লিখেছিল একটা। লিখেছিল, "উনি অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে হাসির খোঁজ নিতে পারেন নি। সময় পেলেই যাবেন।" আসবে একদিন ঠিক। মহেন্দ্র অতুলের ঠিক উল্‌টো। অতুলের নিন্দা করছি না আমি, ও কিরকম তাই শুধু বলছি। তা বলে তুমি যেন ওর সঙ্গে অভদ্রতা করো না। সুসঙ্গত শিষ্টাচার সকলেরই প্রাপ্য।

কাল আমার শরীরটা ভাল ছিল না। সারা দিন-রাত শুয়েই কেটেছে। একবার তোমাকে চিঠি লিখব ভাবলাম। কিন্তু তোমার চিঠি এল না বলে লিখলাম না। গত বৃহস্পতিবার চিঠি পেয়েছি তোমার। আজ রবিবার। এ অবস্থায় শ্রীমতী হাসি একদা যা লিখেছিল তাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—"এখনও কোন চিঠি লিখলে না কেন? ইচ্ছে করে না বুঝি! এর মধ্যেই ভুলে গেলে?.... চিঠি না পেলে ভয়ানক মন খারাপ লাগে, পড়াশোনা মোটেই হবে না তা হলে বলে দিচ্ছি। যদি লিখতে ভাল না লাগে তবে লেখবার দরকার নেই। মিছি-মিছি একজনকে বিরক্ত করতে চাই না। তুমি যাতে শান্তিতে থাক আমার তাই করা উচিত। দুঃখ তো দিতে চাই না। কেমন আছ? শরীর ভাল আছে তো? খাওয়ার কোনও অযত্ন কোরো না, তা হলে আমি দুঃখিত হব। চিঠি লিখ লক্ষ্মীটি। বিয়ে যখন করেছ আমার মতো বিশ্রী লোককে, দুঃখ করে আর কি করবে বল। গতস্য শোচনা নাস্তি। ... সত্যি করে লিখো তো আমাকে পেয়ে তোমার অনুতাপ হয়েছে কি-না। ...ভয়ানক খারাপ লাগে।"

অসিত

১১

৫।৩।৪৯

এইমাত্র লাইব্রেরি থেকে ফিরে তোমার চিঠি পেলাম। তোমার কাশি সারছে না কেন? বড় চিন্তার কারণ হলো তো। তুমি অতুলের সঙ্গে যাও না হয় একবার ডাক্তারবাবুর কাছে। গলাটা দেখিয়ে এস। আমি রোজ রাতে জেগে পড়ি এ খবর কে দিলে তোমাকে? ঠাকুরপোরা? তা পড়ি। না পড়লে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। দিনের বেলায় পরীক্ষার পড়া পড়ি। রাত্রে পড়ি নিজের পড়া। কিন্তু তোমার কাশি সারছে না কেন বল ত? কডলিভার অয়েল খাচ্ছ কি-না?

কলেজের ঘণ্টা পড়ে গেল, চললুম ক্লাসে। বেশি কিছু লেখা হল না আজ

অসিত

১২

১০-৩-৪৯

উপর্যুপরি তোমার দুটো চিঠি পেলাম। ভারী বদান্য যে। কাশি সেরেছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম না কিন্তু। মনে হচ্ছে, আমাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যেই তুমি ও-কথা লিখেছ বোধ হয়। টনসিল অত সহজে সারে না। অতুলের সঙ্গে ডাক্তার বসুর ওখানে যাওয়াটা এড়াবার জন্যেই এ কৌশল করলে না কি? অতুল ফোটো দিয়ে গেছে জেনে সুখী হলাম। ফোটো সম্বন্ধে মেয়েদের মতামত ওরকম তো হবেই। মেয়েরা পুরুষদের সুন্দর দেখে আর পুরুষেরা মেয়েদের সুন্দর দেখে—এই তো চিরন্তন নিয়ম। অন্যরকম হলেই আশ্চর্য হতুম। আশ্চর্য হয়েছি কিন্তু আর একটা ব্যাপারে। আমার এই কড়া-পড়া লম্বা পায়ে এমন কি 'শ্রী' হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে একেবারে শ্রীযুক্ত করে গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ করে বসেছ! বরং তোমাদের পায়ের শ্রী আছে। আল্‌তাপরা নূপুর-বাজা নাগরা-ঢাকা সুশ্রী সুন্দর সুকোমল, জয়দেবের ভাষায় 'পদপল্লব-মুদারম্'। আমাদের শ্রীহীন পাকে শ্রীচরণ বললে উপহাসের মতো শুনতে হয়। নিজেদেব পা দু'টি না চরণারবিন্দ, তা বলে আমাদের পা নিয়ে ঠাট্টা করবে? অত অহঙ্কার ভাল নয়।

আচ্ছা, অতুলের ব্যাপারে অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? তোমাকে সাবধানে চিঠি লিখতে বলেছি বলে এমন কিছু ইঙ্গিত করিনি যে তুমি ইতিপূর্বে তাকে অসাবধানে চিঠি লিখেছ। চিঠি লিখেছ কি না তাও তো জানি না। তুমি লিখেছ—'আমি তোমার কোনও বন্ধুদের মাঝখানে থাকতে চাই না', কিন্তু আমাব কোন বন্ধু যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের মাঝখানে এসে পড়তে চায় তা হলে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। তাকে যদি প্রশ্রয় দিতে না চাও তা হলেও তো ভদ্রভাবে সেটাকে দাঁড় করাতে হবে। একেবারে জিভ কেটে ঘোম্‌টা টেনে দাঁড়াও যদি তা হলে ভারী হাস্যকর হবে যে। দু-চারটে কথার পর একটি ছোট্ট নমস্কার করে বলতে হবে—"আপনি আসাতে খুউ-ব খুশি হয়েছি! কিন্তু এখন তো বসতে পাচ্ছি না বেশিক্ষণ। কাজ আছে একটু। আচ্ছা নমস্কার"—এই হল কায়দা। আমিই বা অতুলকে কি বলে বলি, হাসি তোমাকে পছন্দ করছে না, অতএব তফাৎ যাও। সে আমি পারব না। এখন

সাতটা বাজতে কুড়ি মিনিট। আমার সাতটার সময় একজনের সঙ্গে পড়তে যাবার কথা। উঠছি এখন। আজ রাত্রে এসে শেষ করব চিঠিখানা।

* * * * *

...পড়া শেষ করে ফিরে এলাম। সাড়ে ন'টা বেজেছে। এখুনি খেতে হবে। অতুলের কথা হচ্ছিল তো? সেইটে শেষ করে দি। অর্থাৎ বক্তৃতা দেব। প্রস্তুত হও। আগের একটা চিঠিতে দিয়েওছি কিঞ্চিৎ। মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাকে ভুল বুঝো না। যার সঙ্গে খুশি তোমার আলাপ করতে পার (সে আমার বন্ধু শত্রু যাই হোক), আমি আপত্তি করব না একটুও। আমি তো কত লোকের সঙ্গে আলাপ করি, তুমি তো আপত্তি কর না। তুমিও যেমন আমাকে বিশ্বাস কর, আমিও তেমনি তোমাকে বিশ্বাস করি। কোন রকম জবরদস্তি চালাবার ইচ্ছে নেই তোমার উপর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার রুচি শোভন হবে বলেই আশা করি। শিক্ষাব দরকার তো ঐখানেই। পৃথিবীতে বাস করতে গেলে সব রকম জীবের সংস্পর্শে আসতেই হবে। তার মধ্যে ভালো মন্দ, কিছুভাল, কিছুমন্দ প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে। মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করি শিক্ষার সাহায্যে। তুমি যখন শিক্ষাবর্মাবৃত (বৃতা?) তখন রণস্থলে যেতে ভয় পাও কেন? নেহাৎই যদি ভয় হয়, সঙ্গে তো আমি আছিই, কেউ বলাৎকাব করলে রক্ষা করব। আমার তূণে বাণও আছে, বাহুতে শক্তিও আছে। সুতরাং মা ভৈঃ ।

১৩

কলিকাতা

১১ই মার্চ, ১৯৪৯

ভাই অসিতবরণ,

গতকল্য তোমার স্ত্রীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গে চিত্রাকে লইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপিস হইতেই পাড়ি দিয়াছিলাম বলিযা তাহা আর হইয়া উঠে নাই। একটা কাণ্ড করিয়াছি। চিত্রা আপিসে আমার খাওয়ার জন্য গোটা দুই মুড়ির লাড়ু ও কয়েকটা পিঠা দিয়াছিল। সেগুলি তোমার বউকে দিয়া আসিয়াছি। শুধু হাতে যাইতে মন সরিল না। তোমার স্ত্রীকে একটু রোগা দেখিলাম, খুস খুস কাশিও আছে। এ সব খবর তুমি নিশ্চয় জান। ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিয়াছ। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তোমার স্ত্রীটি একটু বেশি লাজুক দেখিলাম। কলেজে-পড়া মেয়ে আর একটু 'ডাঁটো' হইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে লজ্জাবতী লতাকেও হার মানাইয়া দেয়। আমাদের বাড়িতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। যদি যায় চিত্রা নিজে আসিয়া লইয়া যাইবে। তোমার আশা করি আপত্তি নাই। তোমার যে আপত্তি নাই এই মর্মে তুমি হাসিকে এবং হোস্টেলের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র দিও। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। ইতি—

মহেন্দ্র

১৪

১২।৩।৪৯

তুমি হয়তো ভাবছ আমি রাগ করি নি। তবে তোমার চিঠির কয়েকটা কথায় একটু ব্যথা পেয়েছি বই-কি। রাগ আর ব্যথা ঠিক এক জিনিস নয়।

তুমি লিখেছিলে—"মহেন্দ্রের বাড়ি আমি যাব না এ কথা বলার যদিও আমার 'রাইট' নেই কিন্তু এটা বোধ হয় বলতে পারি, তার বাড়িতে আমার যেতে বিশেষ ইচ্ছে নেই।"

উপরোক্ত বাক্যটি লিখে তুমি আমাকে এবং নিজেকে উভয়কেই অবনত করেছ। নিজেকে করেছ এই হিসাবে যে, যা করবার ইচ্ছে নেই তা জোর করে বলবার 'রাইট'ও নেই যেন তোমার। অর্থাৎ তুমি যেন সর্বতোভাবে দাসী। আর আমাকে ছোট করেছ, এই হিসেবে, যেন আমি তোমাকে বিয়ে করে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করবার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত হরণ করে বসে আছি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই কি তাই?

মহেন্দ্র নানা দিক দিয়ে হয়তো সভ্য সমাজের অনুপযুক্ত। তার না আছে রূপ, না আছে অর্থ, না আছে বিদ্যা। ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ কেরানী মাত্র সে। কিন্তু তার যে জিনিসটার পরিচয় আমি পেয়েছি তা তার হৃদয়। অতবড় হৃদয়বান লোক বড়-একটা দেখিনি। অনেক দুঃখের দিনে অনেক বেদনাময় সন্ধ্যা-প্রভাতে তার যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা তুমি করনি। তোমার যদি করবার ইচ্ছে না থাকে কোরো না। এতে আমার রাগ বা দুঃখ হবে কেন? তুমি যে পরিবারে মানুষ এবং তদনুসারে তোমার মানসিক গঠন যে প্রকার হয়েছে তাতে মহেন্দ্রদের সঙ্গে তোমার হয়তো খাপ খাবে না। চিত্রার খাচ্ছে না। সে বড়লোকেব মেয়ে। মহেন্দ্রদের বাড়ির দারিদ্র্যজনিত অনিবার্য নোংরামি সে সইতে পারছে না এবং এই নিতান্ত বাহ্যিক কারণে তার অসহিষ্ণুতা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, আসল মহেন্দ্রকে ও চিনতেই পারবে না হয়তো কখনও। জ্বলন্ত ঘুঁটের ভিতরও যে খাঁটি আগুন আছে এ খবর হয়তো কোন দিনই পৌঁছাবে না ওর কাছে। ধোঁয়াকে গাল পাড়তে পাড়তেই ওর জীবন কাটবে।

আমার কি মনে হয় জান? পৃথিবীতে যত খাপ খাইয়ে চলতে পার ততই সুবিধা। ইচ্ছা এবং উদারতা থাকলে সর্বস্থানেই নিজের একটা আসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। এমন কি, মহেন্দ্রর বাড়িতেও। অবশ্য ইচ্ছা থাকা চাই। তোমার যখন সেইটেরই অভাব তখন আর কথা কি।

'ফিলজফি' তুমি বুঝতে পারছ না? লতিকার দাদা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চান? বেশ তো, আমার কোন আপত্তি নেই। লতিকা আর তুমি এক ঘরেই থাক? তাহলে তো তিনি আমার সতীন। লতিকার দাদার চরিত্র কতটা বিশুদ্ধ তা নিয়ে অত লম্বা বক্তৃতা করার কোন দরকার ছিল না। তাঁর কাছে পড়তে যদি তোমার নিজের আপত্তি না থাকে, আমার আপত্তি নেই। আমি তোমাদের মাসীমাকে চিঠি দিয়ে দিলাম এই সঙ্গে, তিনি যেন তোমাকে বিজয়বাবুর কাছে পড়তে দেন।

দেখ, বাইরে তুমি যত লোকের সঙ্গেই মেশ না কেন আমার কিচ্ছু ভয় নেই কেন জান? আমি নিশ্চিন্ত আছি যে। যে অন্তরের অমরাবতী তুমি আলো করে আছ সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে তুমি অসূর্যম্পশ্যা। সেখানে একাকিনী অন্তঃপুরিকা তুমি। আর কেউ নেই, কেবল তুমি আর আমি। তাই আমার কোন ভাবনা নেই। এত সাহস আছে তোমার?

এর পর 'চুমু নাও'টা বড় খেলো শোনাবে তাই আর লিখলাম না। ইতি—অসিত

১৫

১৪-৩-৪৯

ভাই অসিত,

তুমি খবরের কাগজের যে 'কাটিং'টা পাঠিয়েছিলে তা দেখে দরখাস্ত করেছিলাম একটা তোমার অনুরোধে। ফল কি হয়েছে শোন। সে যুগে কুলীন ব্রাহ্মণরা যেমন পৈতেকে আস্ফালন করতেন এ যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা তেমনি ডিগ্রীটা আস্ফালন করি। আমার মনের কথা যদি শুনতে চাও, আমার লজ্জা করেছিল ওগুলো পাঠাতে। তবু তোমার অনুরোধেই পাঠিয়েছিলাম। 'ইণ্টারভিউ' করবার আহ্বান এল। গেলাম। কি জিজ্ঞাসা করল জান? আমার বংশ-পরিচয়। অর্থাৎ শুধু ডিগ্রী থাকলেই চলবে না, পেডিগ্রীও চাই। আমরা পেডিগ্রী দেখে জামাই করব, কুকুর পুষব, কেরানীও রাখব। আমার পেডিগ্রী নেই, সুতরাং আমার হল না। আমাকে এই অপমানজনক অবস্থায় ফেলেছিলে বলে আই কার্স ইউ। প্রাইভেট ট্যুশনি করে দোকানের বিজ্ঞাপন লিখে বেশ তো চলছিল আমার। একটা পেট চালিয়ে নিতাম এবং নেবও কোনক্রমে। একাধিক উদরের চিন্তা ইহজীবনে করবার আর সম্ভাবনা নেই। যখন অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণ ছিলাম, যখন নব-বধূর কল্পনা-বিলাসে সমস্ত মন মেতে উঠত, তখন বহু নির্বাচনের পর যে মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছিল তাকে আমি পাইনি। বাদ সেধেছিল কুষ্ঠি। অর্থাৎ সে-ও এক রকম পেডিগ্রী, অদৃশ্য পেডিগ্রী, যার উপর আমার কোন হাত নেই, আমার পুরুষকার বিচলিত করতে পারে না যাকে, অথচ যা আমার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে! উঃ কি দেশেই জন্মেছি। কবির কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি।'

আর একটা কথা। তোমার বউ কিছুতে ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে যেতে রাজী নয়। তুমি যে তাকে যেতে বলেছ এ কথাও তার মুখে শুনলাম। এর পর আর কি করা যায় বল! ডাক্তার বোসের সঙ্গে অবশ্য আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি হোস্টেলে গিয়েই হাসির গলাটা দেখে আসবেন—ও ইয়েস, বললে নিশ্চয়ই আসবেন—কিন্তু তাঁকে অনুরোধ করব কি না ভাবছি। তোমার বউ আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে তার সিকির সিকিও যদি ডাক্তার বোসের সঙ্গে করে, মর্মান্তিক হবে সেটা আমার পক্ষে। তোমার চিঠিতে যদি ভরসা পাই যে, হাসি ভদ্রভাবে ডাক্তার বসুকে তার গলাটা দেখাবে, তা হলে হোস্টেলেই নিয়ে যেতে চেষ্টা করব তাঁকে। চিঠির উত্তর দিতে দেরি কোরো না, অবশ্য যদি উত্তর দেওয়ার মতো কিছু থাকে তোমার। হোয়াট আই মীন ইজ দিস্—এটা মনে কোরো না যেন আমি তোমাকে উত্তর দিতে বাধ্য করছি। তোমার যদি নিজের উত্তর দেওয়ার তাগিদ না থাকে দিও না। ইতি—

অতু

১৬

১৬।৩।৪৯

তোমাকে গত চিঠিতে অনেক বাজে কথা লিখেছি বলে আমি লজ্জিত, নির্জন ঘরে বসে যা মনে এল লিখে গেলাম অনর্গল। কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি। তুমিও তো কম বাজে কথা লেখনি। আচ্ছা, তুমি বার বার লেখ কেন বল তো যে, তোমার রূপগুণ কিছু নেই।

তোমার রূপ যে কত তা তোমাকে বোঝাব কি করে। মৈমনসিংয়ের এক গ্রাম্য কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—আমার চক্ষু নিয়্যা তুমি নয়ন ভইর‍্যা দেখ। পণের টাকা দাওনি বলে তোমার লজ্জা হয়েছে? তোমার বাবার টাকা নিয়ে বিলেত গেলে আমার গৌরব বাড়ত এই তোমার বিশ্বাস? ছি, ছি, আমাকে তুমি এত ছোট ভাব?

কাল রাত্রে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। দেখলাম, তুমি যেন কাঁদছ সেই চিঠিটা পড়ে। সত্যি কেঁদেছ না কি।...ইচ্ছে করছে এ সময় তোমাকে কাছে পেতে। কবে পাব জানি না। পুজোর সময়ে সত্যিই এবার যাওয়া হবে না। এই সময় এই নির্জন ঘরে এস না একবার। সত্যি যদি চোখে জল থাকে মুছিয়ে দি।

আমার হাসি—আমার নয় তো কার? আমার—আমার—নিশ্চয় আমার—কারও নয়। সন্দেহ আছে নাকি? তুমিই ভাল করে বলতে পার তুমি আমার কি না? আমার না? আমারই? নয় বই-কি!

মনের ভিতর এত অজস্র কথা রঙীন হয়ে ফুটে উঠছে যে লেখনীর সাধ্য নেই তাদের বর্ণনা করে। লেখনীর মুখে তাদের আনতেও ভয় করে। সস্তা কথাব সাজ পরে মানাবে না তাদের। সত্যিই তারা অবর্ণনীয়।

তুমি বর্ষার কথা জিজ্ঞাসা করেছ। এখানেও বর্ষা নেমেছে বই-কি। তুমি 'মেঘদূত' পড়েছ? "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘমেদুর অম্বর পরিব্যাপ্ত করে, বিরহী কবির যে মর্মবেদনা বাণীমূর্তিতে সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল আজ তা আমাকেও পীড়িত করছে। আজ সত্যিই অনুভব করছি মেঘদূত কেন রচিত হয়েছিল।

নাঃ—চিঠিতে এসব কথা লিখতে ভাল লাগছে না। কেন বর্ষার কথা তুলেছ তুমি? নিজে দূরে সরে থেকে বর্ষার বিষয়ে খোঁজ করা হচ্ছে। দুষ্টু! দেখি, মুখ দেখি। হাতটা সরাও না....।

অসিত

পুনশ্চ। আবার তুমি 'শ্রীচরণেষু' লিখেছ? 'প্রাণেশ্বর' বা 'জীবনবল্লভ' লেখার দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে একেবারে শ্রীচরণেষু! আমার পদযুগলকে পদে পদে এমনভাবে অপদস্থ করবার মানে? সে বেচারারা তো কোন পদবীর প্রত্যাশা করে না। ফের যদি শ্রীচরণেষু লেখ তা হলে সত্যি বলছি, আমি মাথা কামিয়ে টিকি রেখে দেব, পাঞ্জাবির বদলে নামাবলী গায়ে দেব এবং প্যাথলজি পড়া ছেড়ে পুরোহিত-দর্পণে মন দেব। ইতি—

অসিত

১৭

২৪-৩-৪৯

কালকের চিঠিতে তোমায় একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। অতুল লিখেছে, সে তার একজন বন্ধু ডাক্তার বসুকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে হোস্টেলে। ডাক্তার বসু একজন থ্রোট স্পেশালিস্ট। যদি নিয়ে যান গলাটা দেখিও তাঁকে। অভদ্রতা কোরো না যেন। তোমার মাসীমাকেও এই মর্মে চিঠি দিচ্ছি। আচ্ছা হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে তোমরা মাসীমা বল কি করে? লজ্জা করে না? আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে মেসোমশায় বলে ডাকবার কথা ভাবতেই পারি না আমরা।

.... হাসি এখন কি করছে? আমার হাসি? এখন সাড়ে দশটা রাত। হোস্টেলের আলো নিবে গেছে নিশ্চয়। গল্প করা হচ্ছে, না ঘুম? এখানে এখন কি কাণ্ড হচ্ছে জান? তুমুল কাণ্ড। বৃষ্টি হচ্ছে। খুব আকাশ ডেকে মুষলধারা তা নয়, তবু কিন্তু তুমুল। অবিশ্রান্ত রিম ঝিম শব্দ, ভিজে হাওয়ার ঝাপটায় ছিটকিনিহীন জানলার, কপাটটা খুলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে আর তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তিমির-অবগুণ্ঠনে ঢাকা বিরহিণীর রূপ, অবলুপ্ত হয়ে গেছে গ্রহ-নক্ষত্র সব, অন্ধকারের বুকে গুমরে উঠছে কান্না। একা ঘরে বসে আছি....।

একটা মশা এসে ভারি বিরক্ত করে তুলেছে। বার বার তাড়িয়ে দিচ্ছি, তবু বার বার কানের কাছে এসে তান তুলছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটের উপরও বসতে চাইছে। 'মশকদূত' পাঠিয়েছ না কি? তোমার ঠোঁট থেকে কিছু চুরি করে এনেছে, আমার ঠোঁটে সেটা রেখে যেতে যায়? যদিও পড়েছি যে মশা এক মাইলের বেশি উড়ে যেতে পারে না, কোলকাতার মশার পক্ষে লক্ষ্ণৌ উড়ে আসা অসম্ভব, তবু এই অসম্ভবটা বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে করছে। ইতি ডট ডট ডট। পুনশ্চ ড্যাশ।—

অসিত

১৮

আজ কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি। আশা করেছিলাম, তোমার চিঠি পাব। বিস্কুটের টিনটি খালি দেখে হতাশ হলাম, একেবারে খালি অবশ্য ছিল না, তোমার বান্ধবী পাখি স্বতঃপ্রবৃত্তা হয়ে চিঠি লিখেছেন একটি। বিস্কুটের টিন বুঝতে পারছ না নিশ্চয়। একটি তোবড়ানো বিস্কুটের টিন আমাদের লেটার বক্স। তাতেই পিয়ন তোমাদের চিঠি দিয়ে যায়। পাখির সঙ্গে তুমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে সেবার, সেই জোরেই চিঠি লিখেছেন তিনি। স্বল্প পরিচয়ে ঠিক বুঝতে পারিনি ইনি কোন্ জাতের পাখি। পাখি অনেক রকম হয় তো। যথা--শিকারী পাখি (বাজ), বাহারে পাখি (হীরামন), বাচাল পাখি (কাকাতুয়া), গায়ক পাখি (শ্যামা, দোয়েল), দুষ্টু পাখি (বউ কথা কও), উপকারী পাখি (শকুনি), গৃহস্থ পাখি (শালিক), ডাকাত পাখি (কাক), নোংরা পাখি (কাদাখোঁচা), সুখের পাখি (পায়রা) ইত্যাদি, ইত্যাদি। তোমার বন্ধুটি কোন্ জাতের পাখি? এখনও ছাড়া আছেন, না কোন পিঞ্জর আলো করেছেন? বিশেষ কিছুই জানি না তাঁর সম্বন্ধে, তবে একটা জিনিস আন্দাজ করছি, তিনি আমার হিতৈষিণী একজন। লিখেছেন, লতিকার দাদা বিজয়বাবুর সহায়তায় তোমার ফিলজফি জ্ঞান বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করে আমি নাকি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। কারণ লতিকাগ্রজটি একটু নাকি বাতিকাতুর। প্রেমে পড়ার বাতিক আছে। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে একটা উত্তর দিয়ে দিলাম যে বিজয়বাবু হাসিকে ফিলজফি পড়াবেন কি না তা হাসি নিজেই ঠিক করবে। এ বিষয়ে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে হাসিকেই বলবেন। এ ছাড়া আর কি লিখতে পারি বল।

অনন্ত ভালবাসার নিদর্শন অসংখ্য চুম্বন পাঠাবার অদম্য ইচ্ছা অকুতোভয়ে ব্যক্ত করছি। এর বেশি আর কিছু করবার উপায়ও নেই আপাতত।

অসিত

১৯

৬-৪-৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশা করি ভাল আছেন। কাল হাসি আমাদের বাড়ি এসেছিল। আমরা তো অপ্রস্তুতের এক শেষ। একে তো আমরা গরীব মানুষ, আপনার বউকে যথাযোগ্য খাতির করবার অবস্থাই তো আমাদের নয়, তাও যদি আগে থাকতে জানা থাকত, যা-হোক কিছু ব্যবস্থা করে রাখতাম। উনি যেদিন আনতে গেলেন সেদিন হাসি এল না। গলায় ব্যথা না কি হয়েছিল। আজ বিকেলে তিনটার সময় হঠাৎ লতিকার সঙ্গে এসে হাজির। সঙ্গে লতিকার দাদা বিজয়। লতিকা যদিও পড়ার জন্য হোস্টেলে থাকে কিন্তু ওদের বাড়ি আমাদের পাড়ায়। বাড়িতে পড়ার অসুবিধা বলে লতিকার স্বামী তাকে খরচ দিয়ে হোস্টেলে রেখেছে। লতিকার বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল নয়, আমাদেরই মতো। দেখুন, বকর বকর করে কি যা-তা বাজে কথা লিখে যাচ্ছি। হাঁ, যে কথা বলছিলাম। হাসি আসাতে আমরা তো অপ্রস্তুত। উনি তখনও অফিস থেকে ফেরেন নি। আমি ময়লা চিরকুট একটা কাপড় পরে কলতলায় বসে বাসন মাজছি। ঠিকে ঝিটা ক'দিন থেকে কামাই করছে। কলে জল আবার বেশিক্ষণ থাকে না, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে না নিলে মহা আতান্তরে পড়তে হয়। কি করি, হাসিকে খালি বারান্দার উপরেই ভাঙা মোড়াটার উপর কম্বলের আসন পেতে দিলাম এবং বাসন মাজতে মাজতেই গল্প করতে লাগলাম তার সঙ্গে। আমরা মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়ার ধার তো কখনও ধারিনি, হাসির সঙ্গে ঘর-কন্নার গল্পই করলাম। লতিকাদের গল্পই করলাম অনেক। লতিকা আর বিজয়বাবু হাসিকে আমাদের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ি চলে গেল। লতিকার দাদা বিজয়বাবু ছেলেটি পড়াশোনায় ভাল শুনেছি। তার বিয়ে নিয়ে কিছু গোল হয়েছে। বিজয়ের মনোগত ইচ্ছে লেখাপড়া জানা একটি সুন্দরী বউ হোক। কিন্তু লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়েদের বাপেরা ওরকম ঘরে মেয়ে দেবে কেন, আপনিই বলুন। বিজয় ছেলে ভালো হতে পারে কিন্তু অবস্থা যে খুব খারাপ। ভাগ্যে লতিকা মেয়েটি দেখতে ভালো, ম্যাট্রিক পাশ, তাই প্রায় বিনা পণে একটি বড়লোকের বিদ্বান ছেলে তাকে বিয়ে করেছে। বিজয়ের অবস্থা খারাপ, তাই ভাল মেয়ে পাচ্ছে না। তা ছাড়া, বিজয়ের বাপের ভিরকুটিও আছে কিন্তু। তাঁর মনোগত ইচ্ছে, বেশ মোটা পণ নেওয়া, তা সে মেয়ে যেমনই হোক। কালো কুচ্ছিৎ একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ অনেকটা ঠিক হয়েছে শুনলাম। বিজয় কিন্তু খুব আপত্তি করছে নাকি। আপনার হাসির সঙ্গে এইসব গল্পই করলাম অনেকক্ষণ ধরে। খুব ভালো লাগল হাসিকে। চমৎকার মেয়ে। মুচকি হেসে হেসে অনেক গল্প করলে আমার সঙ্গে। লেখাপড়া জানে বলে লতিকার হাবে ভাবে যেমন একটু অহঙ্কারের ভাব আছে, হাসির তা মোটে নেই দেখলুম। বাড়িতে মুড়ি আর শসা ছিল। তাই দিলাম। একটি জামবাটি মুড়ি পার করলাম দুজনে মিলে শসা আর আচারের চাক্‌না দিয়ে। গলাটা এখনও সারেনি তেমন। খুক্‌খুকে কাশি রয়েছে একটু। গরম গরম ঘি আর গোলমরিচ খেতে বলেছি। আমার ইচ্ছে ছিল রাত্তিরটা আমাদের এখানে থেকে চারটি মাছ ভাত খেয়ে যায়। কিন্তু হোস্টেলে ছুটি নিয়ে আসেনি। একটু পরেই বিজয় এসে নিয়ে গেল। ওঁর সঙ্গে আর দেখা হল না। খুব ভাল লেগেছে হাসিকে আমার।

ওঁকে বলব আর একদিন সময় করে নিয়ে আসতে। আপনি হোস্টেলে ছুটির বন্দোবস্ত করে দেবেন। আমার প্রণাম নিন।

চিত্রা

২০

৮।৪।৪৯

যে-মেয়েটির নাম কিছুতে বলব না বলেছি, তার নাম জানবার এত আগ্রহ কেন? তার নাম না বললে ওষুধ খাবে না? ডাক্তার দেখাবে না? এ তো মহা আবদার দেখছি তোমার। না গো না, তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়। চিত্রা আমার সম্বন্ধে যত উচ্ছ্বসিতই হোক, তুমি যা আন্দাজ করছ তা ভুল। চিত্রা সত্যিই পতিব্রতা নারী। তুমি যা ভাবছ তা যদি হত তা হলে সে অত উচ্ছ্বসিত হত না, চুপটি করে থাকত? যাক, তোমার সন্দেহ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। শেষকালে কি একটা করে বসবে! যা বোকা তুমি। আচ্ছা, শোন তবে।

কল্পনা মেয়েটির নাম। শুধু আমি নয়, পৃথিবীর সমস্ত কবিরা এর প্রেমে পড়েছে। একে সম্বোধন করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।' কি দুষ্টু দেখ। রবীন্দ্রনাথের মতো লোককেও ভুলিয়ে ভালিয়ে নৌকোয় তুলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। আমারও আনাচে আনাচে ঘুরে বেড়ায় প্রায়ই। সেদিন রাত্রে শোবার আগে জানলা খুলে দেখতে গেলাম আকাশের কি অবস্থা। দেখলাম, সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। হঠাৎ সরে গেল খানিকটা মেঘ, পরদা সরে গলে যেন, জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল দুটো তারা, দুটো চোখ যেন। তার চোখ। মিট মিট করে আমার দিকে চেয়ে বললে, আসবে এখানে? এস না, বেশ মজা হয় তা হলে। চলে গেলাম নিমেষে। মেঘের পিছনে রহস্যময় যে নক্ষত্রলোক আছে, সেইখানে ঘুরে বেড়ালাম ছায়া-পথে-পথে, সাঁতার কাটলাম আকাশ-গঙ্গায়, জ্যোতির্ময় হাঁসের পিঠে চড়ে বীণা-মণ্ডলের কাছাকাছি হয়েছি, এমন সময় হঠাৎ দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল জানলার কপাট দুটো! ফিরে এলাম মর্ত্যলোকে, আবার লক্ষ্ণৌ শহরের মেসে।....

তোমরা আমাকে 'অসিত' বলেই জান, ও কিন্তু আর একটা নাম দিয়েছে আমার। বিন্দুসাগর গুপ্ত। বিন্দুসাগর গুপ্তর লেখা 'জনয়িত্রী' গল্পটা তোমার ভাল লেগেছিল শুনেছিলাম।

এইবার হল তো? উঃ কি হিংসুটে তুমি। আচ্ছা, তুমি কি করে ভাবতে পারলে যে, আমি তোমাকে ছেড়ে এখন অন্য মেয়েকে ভালবাসছি।

তোমাকে কোন সম্বোধন করি না বলে তোমার বান্ধবীরা হতাশ হয়েছেন না কি! তোমার বান্ধবীদের হতাশা নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে নেই তত। তবে তুমিও যদি হতাশ হয়ে থাক তা হলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে বই-কি। সত্যি তুমি চাও না কি যে আমি তোমাকে সম্বোধন করি কিছু একটা? নিরামিষ 'কল্যাণীয়াসু' নিশ্চয়ই চাও না, যদি তোমার 'শ্রীচরণেষু'র পালটা জবাবই হচ্ছে ওই। কিন্তু তুমি কিম্বা তোমার বান্ধবীর দল এতে খুব খুশি হবেন মনে হয় না; 'আমার প্রাণের হাসি', 'আমার দুষ্টু হাসি', 'আমার সফল স্বপ্ন', 'ওগো আমার মনের কথা', 'ওগো আমার সই'—এসব চলবে কি? কিম্বা আরও থিয়েটারি ধরনের যদি চাও, 'প্রাণেশ্বরী', 'প্রিয়তমে', 'প্রাণাধিকে', 'জীবিতেশ্বরী'—তাও লেখা যেতে পারে যদিও বানানগুলো একটু

কটমট। অনেকে দেখেছি শরীরের মোক্ষম মোক্ষম অংশগুলির সঙ্গে প্রেয়সীর উপমা দিয়ে সুখ পান। 'আমার হৃদয়-রানী', 'আমার নয়ন-মণি' ইত্যাদি। কিন্তু হৃদয় ও নয়ন ছাড়া শরীরের মোক্ষম (অর্থাৎ vital) স্থান আরও তো অনেক আছে। তাদের আশ্রয় নিলে নূতনত্বও হবে কিছুটা। দেখা যাক কেমন শোনায়। 'ওগো আমার লিভার', 'হে আমার লাংস্', 'অয়ি থাইরয়েড'—নাঃ তেমন শ্রুতিমধুর শোনাচ্ছে না তো। ইংরেজি বলে কি? আচ্ছা বাংলা তর্জমা করে দেখা যাক, মোলায়েম হয় কি না। ধর যদি বলা যায়, 'ওগো আমার ফুসফুস-রানী', কিম্বা 'ওগো আমার যকৃৎ-মণি'— কেমন লাগবে? রাগ করছ না কি। হুঁ, নিশ্চয় করছ। বেশ দেখতে পাচ্ছি হাসির ঠোঁট দুটি ফুলে উঠেছে। তোমার উপযুক্ত কোন সম্বোধন আমার মাথায় এখন পর্যন্ত আসেনি, এইটেই হল আসল কথা। আমার হাসিকে একটা সম্বোধনের কারাগারে বন্দিনী করে ফেলতেও মন সরে না। তার যে অনেক রূপ বিচিত্র বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে মনের উপর। দু-একটা কথা দিয়ে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আর যারই থাক, আমার নেই। ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। তুমি অসম্বোধিতাই থাক।

তোমার চিঠি আমার কেমন লাগে বার বার একথা জিজ্ঞাসা কর কেন? বলেছি তো অনেক বার—খুব, খু-উ-ব ভাল লাগে। সত্যি বলছি, ভারি মিষ্টি। একেবারে সহজ সুন্দর স্বচ্ছ। তোমার চিঠির ভিতর তোমাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ভাষার আয়নায় যেন তোমার ছবিখানি। চিঠিতে বাজে কথা লিখবে না তো কি লিখবে আর? বাজে কথা বলেই তো অত সুন্দর লাগে। বুটের ডালের দর কত, কার্পাস তুলোর চাষ কখন করা উচিত, লংক্লথ বেশি মজবুত, না টুইল বেশি মজবুত—এই ধরনের কাজের কথা তোমাকে লিখতে হবে না। বাজে কথার রঙীন বুদ্‌বুদই ফুটিয়ে তোল তুমি অনর্গল।

কাজের কথার কচকচিতে
কাজিয়া লড়াই চলছে অনুক্ষণ
তুমি ওতে আর মেতো না
বাজে কথায় বাজুক তোমার মন।

অনেক 'আদর' পাঠিয়েছ দেখছি। কতগুলো? কাছে যখন ছিলে তখন তো একটুও দিতে না। কত খোশামোদ করতে হয়েছে। দুষ্টু!

আমি কিন্তু যা পাঠাতে চাই তা পাঠানো যাবে না, এমন কি 'ইন্‌সিওর্‌ড্' পার্শেলেও না। কাছে না থাকলে তা দেওয়া যায় না।

রাত দুটো এখন। এবার শোয়া উচিত! কি বল? তুমি পাশ করতে পারবে না এ ভয় হচ্ছে কেন তোমার? নিশ্চয়ই পাশ করবে, নিশ্চয়ই। ঠিক দেখো।

কিছু 'আদর' আমিও পাঠাচ্ছি। আদর মানে কি জানো তো? 'দর পর্যন্ত'। তার বেশি নয়।

অসিত

২১

৯-৪-৪৯

এবার তোমার চিঠি পেয়ে চমকে গেছি।

"তোমার চিঠি আমার খুব ভাল লাগে"—আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস করনি লিখেছ।

লিখেছ ওটা হয় আমার অতিশয়োক্তি, না হয় ভদ্রতা। কিন্তু এ ছাড়াও আর যে সব কথা লিখেছ তাতে রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। তুমি লিখেছ, "আমি হয়তো কোনও দিনই তোমাকে সুখী করতে পারব না কোন দিক দিয়েই। এমন কি, চিঠি লিখেও যে তোমাকে আনন্দ দিতে পারব সে ভরসা নেই। যদিও তোমার সুরে সুর মিলিয়ে চিঠি লিখতে চেষ্টা করি, চিঠি না পেলে রাগ করি, অভিমানও করি কিন্তু সত্যি বলছি সমস্তটাই মেকি মনে হয়। মনে হয় যেন কর্তব্য করে যাচ্ছি। চিঠি পেলে উত্তর দিতে হয়, তাই উত্তর দিই, ঠিক আন্তরিক প্রেরণা যেন পাই না। শুধু তোমার বেলাতেই নয়, সকলের বেলাতেই এই ব্যাপার। বাবা-মা ভাই-বোন সকলের সঙ্গেই আমি চিরকাল আইনসঙ্গত নিখুঁত আচর করে এসেছি। জন্মাবধি একটা অদৃশ্য লেফাপার ভিতর যেন মোড়া আছি। সেই লেফাপাটাই সকলের কাছে পরিচিত। লেফাপার ভিতর যে 'আমি'টা আছে তাকে কেউ খোঁজেনি কোন দিন। ভেবেছিলাম তুমি খুঁজবে কিন্তু তুমিও খুঁজলে না। তুমি নিতান্ত মামুলি রঙীন কথার ফুলঝুরি কেটে বাইরের লেফাপাটাকেই মুগ্ধ করতে চাইলে চিরাচরিত প্রথায়। আর আমিও তার উত্তরে নিতান্ত 'মেকি' সে সব ফুলঝুরি কাটছি তাও নাকি তোমার খুব ভাল লাগছে। বিশ্বাস করলাম না একথা। 'মেকি' জিনিসকে 'মেকি' বলে সত্যি যদি না ধরতে পেরে থাক তাহলে বুঝবো তোমার ভালবাসাটাও ভান মাত্র।"

তোমার এই নিদারুণ উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারছি না একটুও। ঠাট্টা করছ, না, ভয় দেখাচ্ছ, না, সত্যিসত্যিই আত্ম-আবিষ্কার করেছ বুঝতে পারছি না ঠিক। তোমার লেফাপার ভিতর যে "তুমি" বাস করছে তার সন্ধান তোমার বাবা-মা পর্যন্ত যখন পাননি তখন আমার পেতে একটু দেরি হবে বই-কি। সবে মাত্র তো আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে। তা ছাড়া, তোমার লেফাপাটাই বা কি কম সুন্দর? সেইটের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে যদি কিছুদিন কেটে যায় তাতেই বা ক্ষতি কি! কিন্তু তোমার হঠাৎ কি হল বল দিকি। এমন একটা খাপছাড়া সুর ধরলে কেন?

আচ্ছা, তুমি কি করে ভাবলে বল দেখি যে, এমন একদিন আসতে পারে যেদিন আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাব, তোমাকে আর মনে পড়বে না। এসব কথা কেন মনে হচ্ছে তোমার? কি হয়েছে খুলে লিখো সব, লিখো লক্ষ্মীটি। সামনে পরীক্ষা, এসব কি যা-তা কথা ভাবছ এখন?

কাল সমস্ত দিন কবিতা লিখেছি বসে বসে। বলা বাহুল্য কবিতার বিষয় 'হাসি'। এই সঙ্গেই পাঠাতাম কবিতাগুলো, কিন্তু তুমি রঙীন কথার ফুলঝুরি পছন্দ কর না লিখেছ, তাই সে বাসনা পরিত্যাগ করলাম। একজন বন্ধু বলেছে কবিতাগুলো ভালো হয়েছে, মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতে। পাঠিয়ে দিলেই যে ছাপা হবে তার কোন স্থিরতা নেই; যদিই বা হয়, তা হলেও আর একটা পরিণাম ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি। ধর, যদি দেখি যে আমার কবিতা ছাপান হবার এক বৎসর পরে সেই মাসিক পত্রগুলো কোন মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হয়েছে, আর সেই মুদি আমার কবিতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মশলা বিক্রি করছে, তা হলে? তার চেয়ে কবিতাগুলো আমার বাক্সেই বন্ধ থাক আপাতত। এমন দিনও তো আসতে পারে যখন রঙীন কথার ফুলঝুরিই তোমার ভালো লাগবে। তখন তোমাকে দেওয়া যাবে সেগুলো।

...অনেক রাত হয়ে গেছে। শুই এবার। লেফাপার কাছেই আদর পাঠাচ্ছি অনেক। ভাল কথা, লেফাপাটার অন্তরালে যে 'আমি'টি আছেন কি প্রমাণ পেলে বুঝবে যে আমি তাঁরও

নাগাল পেয়েছি একটু আধটু? সত্যিই কি কোনও প্রমাণই পাওনি? আশ্চর্য লাগছে কিন্তু! প্রমাণ দেবার জন্যে বিশেষ কোনও চেষ্টা যদিও করিনি আমি তবু আমার বিশ্বাস, নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেক প্রমাণ তোমাকে দিয়েছি। দিইনি?

সত্যি খুব খারাপ লাগছে আমার। কেন এসব লিখেছ, কেন তোমার হঠাৎ মনে হচ্ছে সব মেকি, সব মিথ্যে! আমি খুবই চিন্তিত শুধু নয়, অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছি। উত্তর দিতে দেরি কোরো না। তোমার চিঠি না আসা পর্যন্ত পড়াশুনা কিচ্ছু হবে না। কেন এমন একটা ভুল ধারণার কুয়াশা তোমার মনকে আচ্ছন্ন করেছে তা জানাতে দ্বিধা কোরো না একটুও, যত রূঢ় তা হোক না কেন, আমি শুনতে প্রস্তুত আছি। ইতি—

তোমারই
অসিত

২২

১৪-৪-৪৯

ভাই অসিতবরণ,

গতকাল আমি চিত্রাকে সঙ্গে লইয়া তোমার স্ত্রীর হোস্টেলে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি তোমাব স্ত্রী তখনও হোস্টেলে ফেরেন নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম—প্রায় ঘণ্টাখানেক—তখনও তিনি ফিরিলেন না। তখন হোস্টেলের সুপাণ্টিণ্ডেণ্টকে আবার খবর পাঠাইলাম। তিনি বলিলেন যে, হাসি তাঁহার নিকট হইতে ছুটি লইয়া তাহার বাবার সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। হয়তো ফিরিতে দেরি হইবে। তাহার বাবার ঠিকানাটা জানিয়া লইলাম। শুনিলাম তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। তোমার শ্বশুরের ঠিকানাটা জানিয়া লওয়ার উদ্দেশ্য।—হাসিকে গিয়া সেখানেই ধরিব এবং একটা দিন ঠিক করিয়া পুনরায় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইব। এই ফাঁকে তোমার শ্বশুরের সহিতও আলাপটা হইয়া যাইবে। তাঁহাকে তো দেখি নাই কোনও দিন। তোমার শ্বশুরের ঠিকানায় গিয়া তোমার শ্বশুরের দেখা পাইলাম কিন্তু হাসিকে ধরিতে পারিলাম না। তোমার শ্বশুর বলিলেন তোমার হুকুম অনুসারেই সে নাকি তোমার কোন বন্ধুর সহিত ডাক্তারের নিকট গলা দেখাইতে গিয়াছে। গলা দেখাইয়া হোস্টেলে ফিরিয়া যাইবে। ঠিক করিয়াছি আগামী শনিবার দিন আবার যাইব। তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়া চিত্রার মনে খুবই ক্ষোভ হইয়াছে। রবিবার দ্বিপ্রহরে হাসিকে খাওয়াইব মনস্থ করিয়াছি। তুমি যদি ইতিমধ্যে চিঠি লেখ, কথাটা তাহাকে জানাইয়া দিও। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও লিখিও। তোমার শ্বশুর মহাশয় ভারী চমৎকার লোক দেখিলাম। কথা কহিতে কহিতে আর একটা কাজের কথা বাহির হইয়া পড়িল। আমাদের অফিসের বড়বাবু সদানন্দ চক্রবর্তী নাকি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। আমার সুবিধাই হইয়া গেল। তোমার শ্বশুর নিজে হইতেই বলিলেন যে বড়বাবুকে আমার কথা বলিয়া দিবেন। বড়বাবু আমার উপর যদি একটু নেকনজর করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমার প্রমোশন হইয়া যাইবে। মাহিনাটা কিছু বাড়িলে সর্বাগ্রে একটা ভদ্রগোছের বাসা ভাড়া লইব। এই বাসাটাতে চিত্রা বেচারীর সত্যিই বড় কষ্ট হয়। বড়লোকের মেয়ে তো!

কপালগুণে না হয় আমার হাতে পড়িয়াছে, কিন্তু আমার তো দেখা উচিত তাহাকে যতটা সুখে রাখিতে পারি। তুমি আমার কথাটা যেন চিত্রার কানে তুলিয়া দিও না—যা মুখ-আলগা লোক তুমি। চিত্রাকে সুখে রাখিবার জন্য যে আমি প্রাণপণ করিতেছি এ খবর শুনিলে সে আবার অত্যন্ত চটিয়া যাইবে। এমন কাজটি করিও না। আশা করি তোমার পড়াশোনা বেশ ভাল মতো হইতেছে। এইবার ফাইনাল তো? আর ভাবনা কি। ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। চিঠির উত্তর যেন পাই।

ইতি—

মহেন্দ্র

২৩

১৫-৪-৪৯

আজও তোমার কোন চিঠি এল না। মনে হচ্ছে যেন আট-দশ বছর তোমার কোন খবর পাই নি। তুমি যেন অত্যন্ত দূরে চলে গেছ। বিশেষত, তোমার শেষের চিঠির সুরটা যেন একটা অসুরের মত তচনচ করে দিয়ে গেছে। কি হয়েছে যদি জানাতে তা হলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতাম। সামনে পরীক্ষা না থাকলে সোজা চলে যেতাম ঠিক। কিন্তু তুমি চিঠি লিখছ না কেন? হয়েছে কি! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সবটাই তোমার দুষ্টুমি, আমাকে নাকাল করে মজা দেখছ দূর থেকে। আবার মনে হচ্ছে তোমার চিঠির সুরে যে আন্তরিকতা বেজে উঠেছে তা যদি অভিনয়ই হয় তা হলে তোমাকে প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টের সম্মান দেওয়া উচিত। সম্মান দিতে আপত্তি নেই (বরং আমি খুশিই হব খুব) কিন্তু ব্যাপারটা আগে জানা চাই। দোহাই তোমার, এমনভাবে চুপ করে থেক না। মহেন্দ্রের চিঠি পেয়েছি একখানা। তার চিঠিতে খবর পেলাম তুমি ডাক্তার বোসের কাছে গিয়েছিলে গলা দেখাতে। অতুলের সঙ্গে গিয়েছিলে? মহেন্দ্র লিখেছে, তোমার বাবাও কোলকাতাতে এসেছেন নাকি! তিনিই মহেন্দ্রকে বলেছেন যে তুমি নাকি আমার হুকুমে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গেছ। মহেন্দ্রর চিঠি পড়ে মনে হল যে তোমার গলার ঘায়ের সম্বন্ধে তোমার বাবার যেন কোনও দুশ্চিন্তা নেই, আমার হুকুমে বাধ্য হয়ে তুমি যেন একটা বাজে কাজ করতে গেছ! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না দূর থেকে। তোমার বাবা এখন এলেনই বা কেন হঠাৎ? তোমার মাও এসেছেন কি? সব খবর দিয়ে চিঠি লিখো। তোমার চিঠি না পেয়ে খুবই চিন্তিত আছি আমি।

কল্পনা, মানে সেই মেয়েটি, আমার কানে কানে বলছে, "তুমি রূপকথা-লোকের মানুষ, যদি অসম্ভব কিছু ঘটেই যায় তা হলে চমকে উঠবে কেন? এইটেই তো রূপকথা-লোকের বৈশিষ্ট্য। সেখানকার ফুল হঠাৎ যদি পরীতে রূপান্তরিত হয়ে পাখা মেলে আকাশে উড়ে যায় তাতে বিস্মিত হবার কি আছে, সেখানকার রানী তো হরদম রাক্ষসী হয়ে যায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তোমার হাসি যদি এক ফোঁটা অশ্রুই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত তাতেই বা কি! ভাবছ কি অত? দেখ না মজাটা।"

মজাটা উপভোগ করবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। তার কারণ বোধ হয়, যে-দূরত্ব থাকলে মজা উপভোগ করা যায়, তোমার সম্পর্কে সে দূরত্বটা হারিয়েছি। বস্তুত, মনের দিক থেকে আমার সঙ্গে তোমার কোনও দূরত্ব যেন নেই। আমার নিজের কোন আকস্মিক আমূল

পরিবর্তন কল্পনা করতে আমি যেমন ভয় পাই, তোমার সম্বন্ধেও তেমনি ভয় পাচ্ছি। আমার ভয়টা যে ভিত্তিহীন তা অবিলম্বে প্রমাণ কর। খুব খারাপ লাগছে। ডাক্তার বোস কি বললেন তাও লিখো। অনেক অনেক আদর জানাচ্ছি এবং প্রত্যাশাও করছি। ইতি —তোমারই

অসিত

২৪

২-৫-৪৯

ভাই অসিত,

বন্ধু-কৃত্যটা যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছি, কিন্তু তা করে খুব যে একটা আনন্দ পেয়েছি তা বলতে পারি না। তোমার স্ত্রীকে ডাক্তার বসুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শি হ্যাজ মেড মি ফীল যেন আমি কোনও অন্যায় কাজ করেছি। যতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল একটিও কথা বলেনি, নট্ এ সিঙ্গল ওয়ার্ড, একেবারে যাকে বলে 'মাম্'। কিন্তু নীরব ছিল বলেই যে তার মনোভাব অপ্রকাশিত ছিল তা মোটেই নয়। তার মৃদু হাসি, আনত দৃষ্টি, ভব্য মুখভাবের অন্তরালে মেঘান্তরালবর্তী বিদ্যুতের মতো এমন একটা বিদ্রোহ প্রচ্ছন্ন ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত, যা ভাষায় প্রকাশ করলেই অভদ্র হয়ে যাবে। "তোমরা আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন, প্লীজ লেট মি অ্যালোন, আমাকে বিরক্ত করো না, দয়া করে তোমরা কেবল তফাতে সরে থাক, ইউ মেডলিং সোয়াইন"—এই হল তার বাচনিক রূপ, ভাষায় এর চেয়ে ভদ্ররূপ তাকে আর দেওয়া যায় না। কিন্তু এটাই তার সম্পূর্ণ রূপ নয়, তাও বলে দিচ্ছি। তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করছি। হ্যাভ ইউ আণ্ডারস্টুড হার? আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার স্ত্রীকে বুঝতেই পারনি এখনও। এত অল্প দিনের মধ্যে বুঝতে পারার কথাও নয়। ক'দিনই বা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছ ওর সঙ্গে। বেশি দিন মিশলেও যে পারবে, সে ভরসাও আমি করি না। আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু শুধু বলতে পারি, ওর নাম হাসি না হয়ে অসি হলে বেশি মানাত। অধিকাংশ সময়ই খাপের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকবে হয়তো কিন্তু আত্মপ্রকাশ যখন করবে তখন সাবধান! ওর খাপছাড়া মূর্তির একটু আভাস সেদিন পেয়েছিলাম! আমি যখন হোস্টেলে ওকে আনতে গেলাম, শুনলাম ও বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এটা প্রত্যাশা করিনি। ওর বাবা যে কোলকাতায় আছেন তাই জানা ছিল না আমার। সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের কাছে ঠিকানাটা ছিল, হাসিই ঠিকানাটা দিয়ে গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল যে আমি এলে এই ঠিকানায় যেন যাই। আমি যে আসব তা ও জানত, কারণ আমি সকালেই সেই কথা ফোনে জানিয়েছিলাম। ওর বাবা যে কোলকাতায় আছেন, তাঁর কাছে ওর যে বিকেলে যাওয়ার কথা আছে এ সব কথা কিন্তু কিছু বলেনি আমাকে ফোনে। সেই জন্যে মনে হচ্ছে, তোমার শ্বশুর মশায় হঠাৎই এসেছেন কোলকাতায়। যাই হোক, আমি যখন গেলাম তখন গলার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলাম, বাইরের ঘরের হাসি কার সঙ্গে যেন কথা কইছে। বারান্দায় উঠলাম, পায়ে কেডস থাকাতে শব্দ হল না কোনও। উঠেই শুনতে পেলেম হাসি বলছে, "তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? সারাজীবন আমার সঙ্গে এত বড় একটা ভণ্ডামি করেছ একথা ভাবতেই পারছি না আমি!" বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ক্ষণিকের জন্য আমি খাপ-খোলা তলোয়ারটাকে দেখতে পেলাম। পরমুহূর্তেই আবার

খাপে ঢুকে পড়ল সে। আমার দিকে চেয়ে ভদ্রভাবে নমস্কার করে বললে, "ও, আপনি এসেছেন, চলুন যাই।"

নীলাম্বরবাবু মানে, তোমার শ্বশুরও বেরিয়ে এলেন। "কোথা যাচ্ছ," জিগ্যেস করলেন তিনি।

"ডাক্তারের কাছে"—এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে হাসি নেমে পড়ল রাস্তায়, একটিও কথা হয়নি তার সঙ্গে। আমি কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম দু-একবার। কিন্তু উত্তর না পেয়ে আমাকেও শেষটা চুপ করে যেতে হল। সে আমার প্রত্যেক কথার উত্তরে মুচকি হেসেছিল বটে কিন্তু তার চোখের চাহনিতে প্রতি মুচকি হাসির সঙ্গে যে জিনিসটা চকচক করে উঠেছিল—মাই গড—তা রীতিমত 'রিপেলিং' তার অর্থ "কেন বাজে বক বক করছেন!"

ডাক্তার বসু তোমার স্ত্রীর গলা দেখে বললেন, রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। রক্ত নিজেই নিয়ে নিয়েছেন তিনি ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে দেবেন বলে। রক্ত পরীক্ষার ষোল টাকা ফী আমি দিয়ে দিয়েছি তাঁকে। রক্তের রিপোর্ট তিনি হাসির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। এ সব সম্বন্ধে হাসির সঙ্গেই তাঁর 'কন্‌ফিডেনশ্যাল' কথাবার্তা হয়েছে, হাসি তোমাকে জানিয়েছে নিশ্চয়। ডাক্তার বসু যদিও আমার বন্ধুলোক, তবু আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলেন না। কেবল বললেন, কেবল গলার নয়, জিবে এবং তালুতেও (টাগরায়) ঘা হয়েছে না কি। হাসিকে তিনি একটা রিপোর্ট লিখে দিয়েছেন তা এতদিনে পেয়েছ তুমি নিশ্চয়।

তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে কথাটা আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, শি ইজ এ মডার্ন গার্ল। সত্যিকার আধুনিকা হবার উপাদান ওর মধ্যে আছে। সত্যি বলছি, প্রচলিত বিধিনিষেধ প্রাচীর-পরিখা লঙ্ঘন করে যাবার শক্তি তোমার তন্বী বউটির আছে বলে মনে হল এবং আমার এই ধারণা তোমাকে না জানালে 'এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড' তোমার কাছে অপরাধী হতে হবে বলেই তোমাকে এত কথা লিখলাম।

তুমি যদি জেরা কর, কেন আমার এসব কথা মনে হল, জবাব দিতে পারব না। আই কান্‌ট্‌। এইটুকু শুধু বলতে পারি, শি হ্যাজ ইনটারেস্টেড মি। না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়—নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল—তার বেশি নয় কিছু। আজকাল পথেঘাটে ট্রামেবাসে অজস্র মেয়ে দেখতে পাই, কিন্তু হাসির চোখে সেদিন যে দীপ্তি দেখেছি তেমনটি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। সুতরাং এখন থেকে হাসির হোস্টেলের আনাচেকানাচে যদি ঘোরাফেরা করি, রাগ করো না যেন। যদি কিছু আবিষ্কার করত পারি জানাব তোমাকেও। উই মে রিলাই অন্‌ মি।

চাকরি এখনও জোটেনি। ভ্যারেণ্ডাই ভেজে চলেছি। হেল্‌!

ভালবাসা নাও। ইতি—অতুল।

২৫

৪-৫-৪৯

দশ দিন কেটে গেল। আজও তোমার চিঠি পেলাম না। কি হল তোমার? চিঠির উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার শরীর কেমন আছে জানাবার জন্যে তোমাদের মাসীমাকে চিঠি লিখেছিলাম একখানা। তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, তোমার শরীর ভালই আছে। এমনভাবে চুপ করে থাকবার মানে কি তাহলে?

এখন অনেক রাত। কিছুক্ষণ আগে একটা বেজে গেছে। কিছুতেই ঘুম এল না, তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। মনে হচ্ছে, অভিমান করেছ তুমি, তোমার স্ফুরিত অধরের কম্পনটা দেখতে পাচ্ছি যেন। কি হয়েছে, বলবে না? অনেক দিন আগে তুমি আমাকে পাঞ্জাবির একটা মাপ পাঠাতে লিখেছিলে। পাঠানো হয় নি। তাই রাগ হয়েছে? আচ্ছা, এবার তোমার চিঠি পেলে ঠিক পাঠাব। দরজির কাছে গিয়ে পাঞ্জাবির মাপটাপ দেওয়া হ্যাঙ্গামের ব্যাপার, তাই হয়ে ওঠেনি। এবার ঠিক পাঠাব। এবার তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র পাঠাব।

মনের ভিতর কত কথা যে জমে আছে। কিন্তু তা প্রকাশ করা যাবে না। ঠিক যেন মেঘের মতো। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। কখনও স্তূপীকৃত, কখনও বিসর্পিত। সন্ধ্যার সোনা, উষার আবীর, জ্যোৎস্নার জরি, বর্ষার অশ্রু, বিদ্যুতের চমক—সব কিছুরই স্পর্শ লাগছে তাতে। দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি, কিন্তু প্রকাশ করা যাবে না ভাষায়। সত্যি কি তুমি বুঝতে পার না একটুও। আজ আবার চাঁদ উঠেছে, জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে—" হেমচন্দ্রের কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে। সেই সেদিনের কথাটাও মনে পড়েছে। সেই যে ছাতে! চাঁদের আলোয় কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। "দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে" সত্যিই যেন সেদিন এসেছিল তোমার মনে। ...একদল মেঘ এসে চাঁদটাকে অস্থির করে তুলেছে। বিশেষত দু-একটা কালো মেঘ একেবারে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যেতে চায় না! হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমি যেন ওই কালো মেঘ, জোর করে অধিকার করতে চাইছি নির্বিকার তোমাকে!

... তোমার পুরোনো চিঠিগুলো ওলটালাম। একটা চিঠিতে দেখছি তোমার বান্ধবীরা নাকি আমার তুলনায় তোমাকে তুচ্ছ মনে করেছেন। কেন, আমার কবিতা পড়ে? তাঁদের একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। এক রাজকন্যার এক ফুলের বাগান ছিল। একদিন তিনি সখী-সমভিব্যাহারে বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন, তাঁর চাঁপাগাছের ডালে কে যেন একটি সোনার জাল টাঙিয়ে রেখে গেছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, জালটা সোনার নয়, পশমের মতো সুতো দিয়ে বোনা, সূর্যের আলো পড়ে সোনালী দেখাচ্ছে। কারুকার্য দেখে রাজকুমারী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সখীকে বললেন, কে ভাই এমন নিপুণ শিল্পী! সখী উত্তর দিলেন, কে তা জানি না, কিন্তু তিনি যে-ই হোন তিনি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি উঁচুদরের লোক, তাঁর কাছে তুমি আমি তুচ্ছ। পরে খোঁজ করে জানা গেল শিল্পীটি মাকড়শা। তোমার বন্ধুদের রসবোধের প্রশংসা করতে পারলাম না। সত্যি, এত খারাপ লাগছে তোমার চিঠি না পেয়ে। কি হয়েছে তোমার? নিশ্চয়ই কিছু হয়নি। আমাকে ভাবাবার জন্যে দুষ্টুমি করে চিঠি লিখছ না। পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত আছ না কি? প্রিপারেশন কিছু হয়নি মনে হচ্ছে নিশ্চয়। আমারও হচ্ছে। কিন্তু ওটা, মানে ওই রকম মনে হওয়াটা, একটা ভাল লক্ষণ শুনেছি। নিউটন কি বলেছিলেন জানো তো? সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করেছি। সক্রেটিসও বলেছিলেন না কি যে, আমি জানি যে আমি অজ্ঞ, তাই আমাকে সবাই বিজ্ঞ বলে। সুতরাং কিছু জানি না মনে হওয়াটা আশাপ্রদ ব্যাপার।

.... তোমার চিঠি না পেয়ে একটুও ভাল লাগছে না সত্যি। লিখতেও ভাল লাগছে না, অথচ থামতেও পারছি না, নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি। বিরাট একটা দেশ যেন। এত বিরাট যে তার আদি অন্ত পাওয়া মুশকিল। তার স্বরূপ নির্ধারণ করা আরও শক্ত।

এই তার আকাশে রোদ হাসছিল, হঠাৎ সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার ঘিরে এল। আকাশে তারার ছড়াছড়ি। দেখতে দেখতে সেই নক্ষত্রখচিত আকাশে মেঘ ছেয়ে আসে আবার। তারা ঢেকে যায়। ঘনিয়ে আসে নিস্তব্ধতা। ভীষণ বজ্রপাত, সচকিত হয়ে ওঠে আবার চতুর্দিক। তাও আবার থাকে না। উষার অরুণিমা দেখা দেয় একটু পরেই। রামধনু ফুটে ওঠে কালো মেঘে। এই বিচিত্র পরিবেষ্টনীতে বসে তোমার কথা ভাবছি। কত বাসনা ফুলের মতো ফুটে ফুলের মতোই ঝরে যাচ্ছে। একটা খামখেয়ালী হাওয়া ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সব। মনে হচ্ছে তুমিই যেন সেই হাওয়া। আমার কাছে কি চাইছ এসে বুঝতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কাছেই বসে আছ। তোমার একটা হাত যেন আমার পিঠে ঠেকে আছে, তোমার চুড়ির ঠাণ্ডা যেন আমার গায়ে লাগছে। তোমার নিশ্বাসের বাতাসও যেন অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যেন তোমার চোখ দুটি ছল ছল করছে। কি হয়েছে তোমার, সত্যি বলবে না?

দিনের সমস্ত কর্ম কোলাহল নীরব হয়ে গেছে, সমস্ত দেহ পরিশ্রান্ত, মন কিন্তু উন্মুখ বিনিদ্র। সে বলছে অমৃত চাই। যখন তুমি ছিলে না তখন এই অমৃতের সন্ধানে বহু স্থানে ঘুরেছি। কবি, গ্রন্থকার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, খোলা মাঠ, উদার আকাশ, সিনেমা, থিয়েটার। এখন মনে হচ্ছে তুমিই এসেছ সুধাভাণ্ড নিয়ে। হয়তো আর এক হাতে বিষভাণ্ডও আছে। সেই বিষের জ্বালাতেই হয়তো জ্বলছি এখন, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে সুধাভাণ্ডও তোমারি অন্য হাতে আছে। বঞ্চিত করবে না তুমি আমাকে তার থেকে।

অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে একটা। মানুষ না হয়ে তুমি যদি গান হতে বেশ হত তা হলে। একেবারে কণ্ঠস্থ করে রেখে দিতাম। আর আজীবন সাধনা করে তাতে নানারকম ভাল সুর দিতাম। গাইতাম কখনও বেহাগে কখনও ভৈরবীতে, কখনও মুলতানে। একই গানে কখনও বর্ষার কাজরী, কখনও শরতের আগমনী বেজে উঠত। মেঘমল্লারে নিবিড় হয়ে আবার খেয়ালে ভেসে যেতে। ছাড়াছাড়ির দুঃখটা পেতে হত না তা হলে। সব সময় গলায় থাকতে গানের তানে তানে। যদিও তোমার মধ্যে সব সুরের মাধুর্যই আছে, কিন্তু হায়, তবু তুমি কেবলমাত্র গান নও, গান ছাড়াও তুমি আরও কিছু, তুমি মানুষ। সীমার মধ্যে অসীমা, ধরার মধ্যে অধরা। তাই তোমাকে সীমার মধ্যে পাওয়া যাবে না, হাতের মুঠোয় ধরা যাবে না। তবু তোমাকে পেতে চাই, কেন যে চাই জানি না। মনে হয়, এই যে বিরহ—এই যে না পাওয়া—এই তো মরণ....

ভালো লাগছে না এইসব লিখতে । অথচ এইসব কথাই মনে হচ্ছে খালি।...

...মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এই যে সর্বদা স্বপ্নে জাগরণে তার কথা ভাবছ, সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর চিঠি লিখতে বসেছ এ আগ্রহ কি এমনিই থাকবে তোমার চিরকাল?"

মন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল—"থাকবে।"

"কি করে! ছেলেবেলা থেকে তোমার তো অনেক জিনিসেই এমনি উৎসাহ দেখা গেছে। প্রজাপতির পিছনে ঘোরা থেকে শুরু করে সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চা পর্যন্ত কোনটাতেই তোমার আগ্রহের অভাব তো ছিল না। আজও কি সে আগ্রহ অটুট আছে? আজ তারা সব কই, তোমার সেই প্রজাপতি পাখি-কুকুর পোষার নেশা, বাগানে ফুলফোটানোর শখ, তোমার সেই প্রিয় কবির দল, কই সে সব আজ! এদের কথা তো তোমার মনে আর তেমন আকুলতা আনে না, আগে যেমন আনত। এদের চিন্তায় বিভোর হয়ে রাতের পর রাত জাগতে, এখন তো আর জাগ না। এতদিনকার পরিচিত এদের সম্বন্ধে যখন

তোমার এমন অনাগ্রহ জেগেছে তখন এই অপরিচতাটিকে যে চিরদিন সমান আগ্রহে ধরে রাখতে পারবে তার নিশ্চয়তা কি! তোমার কত বন্ধুবান্ধব তোমায় প্রাণভরে ভালবাসত, এখনও হয়তো বাসে, তুমিও একদিন তাদের কম ভালবাসনি, কিন্তু তবু তারা আর স্মৃতিমাত্র। তোমার হাসিরও যে সেই দশা হবে না তার প্রমাণ কি?"

মন আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর আবার ইতস্তত করে বলল—"প্রমাণ দিতে পারব না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, এর প্রতি আমার আগ্রহের শেষ হবে না, কারণ ও আমার একার, আর কারও নয়। আর যা কিছুকে ভালবেসেছি তা সকলের ছিল। ওরা আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে অপরকে ঠিক তেমনই আনন্দ দিয়েছে। আমার প্রতি ওদের এতটুকু পক্ষপাত নেই। প্রজাপতি, পাখি, কুকুর, বাগান, ছবি, কাব্য, বন্ধু-বান্ধব—এরা আজও আমার প্রিয় কিন্তু ওরা আমার অন্তরতম হতে পারেনি, কারণ ওরা সকলের। হাসিকে যদি এখনও ভাল করে চিনি না, তবু মনে হয় ও আমার নিজস্ব। ভাল মন্দ যা-ই হোক আমার একার। বিশ্বের হাটে ওর দাম যাচাই করারও প্রয়োজন নেই। ও আমার একার এই বোধটুকুই যথেষ্ট। এই মমত্বই অমরত্ব দেবে আমার আগ্রহকে। হাসি আমার, আমার, আমারই, আর কারও নয়—এই আনন্দে তাই পরিপূর্ণ হয়ে আছি আমি। তা ছাড়া ও মানুষ, ওর রহস্য শেষ হবার নয় সহজে। তাই মনে হয়, ওর সম্বন্ধে কৌতূহল শেষ হবে না কখনও।"

"হঠাৎ যদি কোনও দিন আবিষ্কার কর যে, ও তোমার একার নয়, তা হলে?"

"তা অসম্ভব।"

"কি করে বুঝলে?"

"বিশ্বাস করি।"

"কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে—"

মন হেসে বললে—"বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দরকার।"

গভীর রাত্রে একা নির্জন ঘরে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি তুমি কাছে নেই বলে। তুমি থাকলে তোমার সঙ্গেই বোঝাপড়া করতাম। এতকাল শোয়ার সময় ঘুম ছাড়া আর কিছু কাম্য ছিল না। এখন এ কি হয়েছে! আচ্ছা, সত্যি করে বল তো চিঠি লিখছ না কেন, কি হয়েছে তোমার! হঠাৎ মনে হল, শেষ চিঠিতে তুমি যা লিখেছিলে তার সুরটা ইবসেনী। Doll's House পড়েছ না কি ইদানীং?

"জন্মাবধি একটা অদৃশ্য লেফাপার ভিতর যেন মোড়া আছি। সেই লেফাপাটাই সকলের কাছে পরিচিত। লেফাপার ভিতর যে 'আমি'টা আছে তাকে কেউ খোঁজে না কোন দিন।..."

চিন্তাটা খুব আধুনিক নয়, নিতান্ত সেকেলে। উপনিষদেও এই ধরনের কথা আছে। অতুল লিখেছে, সে তোমার মধ্যে আধুনিকতার উপাদান দেখেছে নাকি। সে কি দেখেছে তা জানি না, আমি কিন্তু দেখেছি। আধুনিকতা কতকগুলো চমকপ্রদ বুলির কপচানিমাত্র নয়; দুর্জয়কে জয় করবার প্রয়াস এবং সাহসই আধুনিকতা। তোমার মধ্যে এ সাহস দেখেছি আমি। প্রমাণও পেয়েছি খানিকটা। আমাকে জয় করেছ তো! অনেক দিন আগে একটি আধুনিকার চিত্র এঁকেছিলাম আমি। পাঠাচ্ছি কবিতাটা এই সঙ্গে।

...কবিতাটা পড়ে কেমন লাগল জানিও। যদিও মেয়েটির আচরণ আমি সমর্থন করি না, ওর মতের সঙ্গে আমার মতের মিলও নেই, কিন্তু তবু ও যে আধুনিকা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেক রাত হয়েছে। রাত শেষই হয়ে গেল বোধ হয়; শুই একটু। চিঠি লিখো লক্ষ্মীটি।

অসিত

মেয়েটি সত্যই আধুনিকা।
ভাব-ভঙ্গিতে চাল-চলনেই নয় কেবল,
মনে প্রাণেও।
পোশাক-পরিচ্ছদে পছন্দ করে না
বিদেশী নকলের সস্তা চাকচিক্য,
অপরের মনে ঈর্ষা উদ্রেক করে
গয়না-কাপড় ঝকমকিয়ে বেড়ায় না কখনও,
যখন-তখন যেখানে-সেখানে
নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করে
আসর জমাবার প্রবৃত্তিও নেই।
চাল দিয়ে কথা বলে না।
এমন কি
ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে যে সে,
তা বোঝবার উপায় নেই,
ইংরেজী বুকনি মুখ দিয়ে বেরোয় না কখনও।
যেসব জিনিস থাকলে
অহঙ্কারে মটমট করা স্বাভাবিক,
সেসব জিনিস থাকা সত্ত্বেও
তার অহঙ্কার নেই।
বরং তাঁর সঙ্কোচ হয়,
মনে হয় এগুলো বাধা,
বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, ঐশ্বর্য,
চারটে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর যেন
আড়াল করে রেখেছে তাকে,
বঞ্চিত করেছে আর পাঁচজনের সঙ্গে থেকে।
সত্যিই লজ্জা করে তার।
এই লজ্জা জিনিসটা তার মজ্জাগত
বাইরে প্রকাশ নেই।
আপাতদৃষ্টিতে তাকে নির্লজ্জ বলেই মনে হয়।
জিব কেটে
ঘাড় হেঁট করে
মুচকি হেসে

লাল হয়ে
ঘোমটা টেনে
লজ্জা বস্তুটাকে নয়নলোভন দৃশ্য করে তুলতে
আরও বেশি লজ্জা করে তার।
সুতরাং তার জীবন
নীরব এবং নিঃসঙ্গ।
বেশি কথা বলতে পারে না,
মিশতে পারে না কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে।
তার সঙ্গে মেশবার সুযোগই দেয় না সে কাউকে।
দিলেও যে খুব বেশি লোক জুটত
মনে হয় না তা।
কারণ যে জিনিসটি থাকলে
পুরুষেরা মেয়েদের সঙ্গে মেশবাব উৎসাহ পায়,
সে জিনিসটির অভাব আছে তার।
রূপসী নয়।
স্বাস্থ্যবতী অবশ্য।
কেরিজ, পায়োরিয়া, চশমা কিচ্ছু নেই,
নিখুঁত টিউব,
নীরোগ অ্যাপেনডিক্স,
মজবুত কবজি,
পুষ্ট পেশী,
ফিট হয় না।
টেনিস খেলা
বাইক চড়া
ড্রাইভ করা
সমস্তই পারে অনায়াসে।
কিন্তু রূপ নেই,—
দুধে-আলতা রং
পটল-চেরা চোখ
তিল-ফুল নাসা
মেঘবরণ চুল
শুধু যে নেই তা নয়,
নেই বলে দুঃখও নেই।
যৌবন আছে।
কিন্তু সে যৌবনকে
শাড়ি-কাঁচুলির কৌশলে উদগ্র করে

লোক-লোচনবর্তী করবার প্রবৃত্তি
মোটেই নেই তার।
সুতরাং সে যৌবনও অপ্রকাশিত।
মাথার চুল 'বব' করে ছাঁটা,
ঢিলে পাজামা পরার শখ আছে,
বাইক চড়ার সময় ব্রিচেস পরে,
হঠাৎ দেখলে পুরুষ বলেই ভ্রম হয়।
প্রণয়ী জোটে নি সুতরাং—
সাহস নয়, প্রেরণাও পায় নি অনেকে।

প্রণয়ী না জুটলেও
বিবাহার্থী জুটেছিল একাধিক।
কালো, সাদা,
বেঁটে, লম্বা,
সুরূপ, কুরূপ,
ফোঁপরা, শাঁসালো,
বিদ্বান্, মূর্খ,
নানা রকম।
ভাল চাকরি-খালির বিজ্ঞাপন দেখলে
প্রার্থী আসে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে,
ঠিক তেমনি
একমাত্র কন্যা সে
বিপত্নীক ধনী পিতার।
বিশাল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী।
কিন্তু গোল বাধল।
এতগুলি ভদ্রসন্তানের
অরূপ-সাধনার অন্তরালে
যে সহজিয়া মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল,
তা সহজেই প্রকট হয়ে পড়ল।
পিতা দেখলেন,
তাঁর কন্যাটিকে সকলেই চাইছেন
সহধর্মিণী হিসাবে ততটা নয়,
তাঁর লোহার সিন্দুকের চাবি হিসাবে যতটা।
পুত্রী দেখলেন,
স্বামী হিসাবে লোভনীয় নয় একজনও।
মোটা, রোগা, বোকা, চালিয়াত,

ন্যাকা, হাঁদা, ধূর্ত, ধড়িবাজ,
উদ্ধত, মিনমিনে,
নানা জাতীয় আবর্জনা
টাকা-ঘূর্ণির টানে
নৃত্য করে বেড়চ্ছে তার চতুর্দিকে।
ভাল ছেলে জুটল না।

দেশে যে একেবারে ভাল ছেলে নেই তা নয়,
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়
বিবাহ-ক্ষেত্রে অধিকাংশ ভাল ছেলেরা
কিংবা তাদের অভিভাবকেরা
বেশি মর্যাদা দেন
সেই দুটো জিনিসকেই,
যা স্বকীয় সাধনায় অর্জন করা অসম্ভব,
যা ভাগ্যবলে দৈবাৎ মেলে—
রূপ এবং বংশ-গৌরব।
স্বোপার্জিত বিদ্যা অথবা অর্থ
লোভনীয় নয় মোটেই এঁদের কাছে।
সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী চান এঁরা।
বাবা মারা গেলেন হঠাৎ একদিন।
শোকে-তাপে
আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যাগমে
শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে
কাটল কিছুদিন।
আত্মীয়-স্বজনেরা চমকে গেলেন
শ্রাদ্ধের নূতনত্ব দেখে।
প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায়
এলেন বেদজ্ঞ পুরোহিত
কাশী থেকে;
ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এলেন
দ্বাদশজন ব্রাহ্মণও;
জাত-ব্রাহ্মণ নয়,
গুণ-ব্রাহ্মণ,
অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী।
তার মধ্যে ছিলেন।
দুইজন বৈদ্য এবং একজন কায়স্থও।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে
অভ্যর্থনা করলে সে গুণীদের,
শ্রাদ্ধান্তে দক্ষিণা দিলে
স্বর্ণমুদ্রা, পট্টবস্ত্র, মাল্য-চন্দন এবং গ্রন্থ।
স্থানীয় লোকেরাও বাদ গেলেন না,
আপামরভদ্র সবাই
যোগ দেবার সুযোগ পেলেন একদিন
বিরাট ভূরিভোজনের মহোৎসবে।

বছরখানেক কাটল।
কর্তব্যবোধেই সম্ভবত
আত্মীয়-স্বজনেরা আর একবার এলেন,
চেষ্টা করলেন বিয়ের।
সে সংক্ষেপে বললে,
বিয়ে করব না আমি।
কেন?
রুচি নেই।
রুচিবিকার-সংশোধনে অসমর্থ বলে নয়,
লক্ষাধিক টাকার মালিক
বি. এ-পাস এই মেয়েটা
তাঁদের শাসনসীমা-বর্তিনী হতে
রাজী হল না বলে
নিরস্ত হলেন তাঁরা।
আধুনিক শিক্ষাকে গাল পাড়তে পাড়তে
মুক্তকচ্ছ কম্পিতগুম্ফ হিতৈষীর দল
একে একে
অন্তর্ধান করলেন আপন আপন বিবরে।

কাটল আরও বছর দুই।
অন্য কেউ হলে
এম. এ. দেবার চেষ্টা করত হয়তো,
নিতান্ত পক্ষে কিংবা
সময় কাটাবার জন্যেও অন্তত
শিক্ষয়িত্রীগিরি যোগাড় করে নিত একটা।
এ কিন্তু করলে না কিছুই।
নোট-বই পড়ে

বাঁধা-ধরা নিয়মের পরীক্ষা পাস করাকে
চিরকালই সে
খোঁটায় বাঁধা গরুর
জাব খাওয়ার সঙ্গে উপমিত করেছে।
হাস্যকর নিয়মের খাঁচায় বন্দী হয়ে
মাস্টারি করার ছুতোয় তোতাগিরি করাটাও
চিরকাল অপছন্দ তার,
তাই ওসব করলে না কিছুই।
পড়া-শোনা অবশ্য বন্ধ রইল না।
তার 'মিন্টো' বুক-কেসগুলোতে
ওয়ালনাট-টেবিলে
মেহগিনি-আলমারির তাকে তাকে
জমতে লাগল নানা বই নানা ধরনের।

কিন্তু—
হ্যাঁ,
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ
মস্ত বড় একটা 'কিন্তু'।
মন ভরে না কেবল বই পড়ে
উপন্যাস যত ভালই হোক,
ক্লান্তিকর শেষ পর্যন্ত।
উপন্যাস ছেড়ে ধরল ইতিহাস—
ভারতের, চীনের, জাপানের,
রোমের, গ্রীসের, জার্মাণীর, ইংলণ্ডের,
রাশিয়ার।
নাঃ,
মরা মানুষের মরা কাহিনী সব—
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা
তাও অনিশ্চিত।
কিনলে সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই
কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, জুওলজি;
ভাল লাগল না।
কাণ্ট, হেগেল, এমার্সন,
রামায়ণ, মহাভারত, জাতক,
গীতা, উপনিষদ—
তাও বিস্বাদ।

পাঞ্চ, ষ্ট্রাণ্ড, নেচার,
লিটারারি ডিজেস্ট, প্যারেড,
ধর্মতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব,
অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি
কিছুই ভাল লাগে না আর,
এমন কি
হার মানলেন
হ্যাভ্‌লক এলিস, বাৎস্যায়ন পর্যন্ত।
নানা রকম ক্যাটলগ ওলটাতে ওলটাতে একদিন
উদ্দীপ্ত হল কল্পনা—
ফলে
হাজার কয়েক টাকা বেরিয়ে গেল।
ক্রোমিয়মের ডিনার-সেট,
অদ্ভুতাকৃতি চেয়ার টেবিল,
বাসন নানারকম দামী চিনেমাটির,
নতুন মডেলের
কার, ক্যামেরা,
রেফ্‌রিজারেটার, রেডিও,
অভিনব খাঁচায়
অভিনব বর্ণের ক্যানারি এক ঝাঁক,
অভিজাত বংশের
অ্যাল্‌সেশিয়ান, স্প্যানিয়েল, পুড্‌ল।
কাটল কিছুদিন।
মনে হল তারপর
কেন এসব? কার জন্য?
মনের ক্ষুধা তো মিটল না!

ছবি আঁকবার চেষ্টা করলে,
কিন্তু সার হল সরঞ্জাম কেনাই।
তুলি, রং, কাগজ পেলেই হয় না শুধু,
প্রতিভা চাই।
ছবি হল না।
ছেলেবেলায় একবার
কণ্ঠ এবং যন্ত্রযোগে রীতিমত
প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সে
সঙ্গীত-বিদ্যা আয়ত্ত করবার,

সফলকাম হয় নি।
সেদিক দিয়েও গেল না, সুতরাং।

মনে হল একদিন,
বাগান বানালে কেমন হয়?
ফুল নিয়ে কবিত্ব করার শখ
কোন দিনই তার ছিল না অবশ্য,
ফুল-চাঁদ-মলয়-মেঘ-মূলক কবি-বৃত্তিকে
প্রশ্রয় দেয় নি সে কোন দিনই।
আকাশের চাঁদ দেখে সে যতটা না মুগ্ধ হত,
তার চেয়ে ঢের বেশি মুগ্ধ হত
বৈদ্যুতিক টেবিল-বাতিটা দেখে।
কি উজ্জ্বল আলো তার,
গঠনে কি বর্ণ-বৈচিত্র্যশোভা!
বেশি আবিষ্ট করত তার মনকে
সিনেমার দৃশ্য
প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে,
গহন বনের সৌন্দর্যের চেয়ে
বেশি অভিভূত করত
বিরাট ফ্যাক্টরির সৌন্দর্য।
সেকেলে কবিদের নকল করে
যন্ত্রকে—
মানব-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে
দানব বলে উপহাস করতে
সঙ্কুচিত হত সে।
মনে হত
ওই জাতীয় উক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে
পলায়নী মনোবৃত্তি,
অক্ষমতার শূন্য আস্ফালন।
তাই তার বাগানের শখ
মূর্ত হল
নানা রকম সারে, যন্ত্রে,
নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়।
ফুল ফুটল নানা রকম দেশী-বিদেশী,
ফসলও ফলল বহুবিধ
শাক-সবজি তরি-তরকারির,

বামন গাছ
অর্কিড,
সিজন্-ফ্লাওয়ার হরেক রকমের
হরেক রকমের পরীক্ষা
গাছেদের বর্ণ-সঙ্করত্ব নিয়ে,
পরাগ-বিনিময়
কলম-তৈরি
বাকি রইল না কিছুই।
তবু কিন্তু মন ভরে না।
মনে হয় ক্ষুধিত আছি,
মনে হয় আসল জিনিস পাওয়া যায় নি,
যাবেও না কখনও বোধ হয়।
ক্ষতি কি হয়েছে তাতে?
মনকে জোর করে বোঝাতে হয়।
সুখেই ত আছ ;
জোর করে মানতে হয়,
হ্যাঁ সুখেই আছি।
কিছু ওই ছোট কুঁড়েঘরে
মালীর সদ্যোজাত শিশুটা যখন কেঁদে ওঠে,
তখন ঝন ঝন ঝনাৎ করে
আর্তনাদ করে ওঠে
মনের সমস্ত তারগুলো যেন।
এ কি অত্যাচার!
মাতৃত্ব কামনা করি বলে
ধরা দিতেই হবে পুরুষের বাহুপাশে?
ফুলকে তো ধরা দিতে হয় না,
সমীরণের তরঙ্গে তরঙ্গে
পতঙ্গের পাখায় পাখায় বাহির হয় সৃষ্টির বীজ।

মানুষ এখনও এত বর্বর?
জলের কুঁজোটাকে বিয়ে না করলে
পিপাসার জল পাব না?

নিঃশব্দে পাখা ঘুরছে।
নিঃশব্দে জ্বলছে সুদৃশ্য-ডোমে-ঢাকা বিদ্যুৎ-বাতিটা,
সামনের থাবা দুটোয় মুখ রেখে

নিঃশব্দে বসে আসে স্প্যানিয়েলটা,
সে পদচারণা করে চলেছে নিঃশব্দে।
ভাবছে, অশোভন হবে কি
ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করাটা?

সব শুনে বললেন ডাক্তার,
বিয়ে করতে আপনার আপত্তি কেন?
রুচি নেই।
রুচি বদলান।
বদলাবার ইচ্ছে নেই,
নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে চাই না
একদিনের জন্যেও;
কিন্তু ছেলে চাই,
উপায় নেই কোন?
উপায় আছে বই-কি,
টেস্ট টিউব বেবি—
বিজ্ঞানের যুগ এটা
সবই সম্ভব।

সম্ভব হলও!
প্রত্যক্ষ-ভাবে পুরুষ-সংস্রবে না এসেও
সন্তান-সম্ভবা হল সে।
গভীর রাত্রে হঠাৎ একদিন
ঘুম ভেঙে গেল তার।
ম্যুরিলোর আঁকা
ইম্‌ম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শন ছবিখানা
স্বপ্নে যেন দেখতে পেল স্পষ্ট সে।
অনন্ত আকাশের বুকে
দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী জননী
পদপ্রান্তে সরু একফালি চাঁদ,
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শিশুরা সব—
দেবশিশুরা
ভিড় করে আছে চারিদিকে
কেউ স্পষ্ট, কেউ অস্পষ্ট।
মনে পড়ল কুন্তীর কথা
জবালার

সীতার
দ্রোণের,
মনে পড়ল ইসাডোরা ডান্‌কান—
টং করে একটা বাজল।
অস্পষ্ট ঘর্ঘরধ্বনি ভেসে এল যেন কোথা থেকে—
বিমান-পোতে কে আসছে এত রাত্রে!

বার্তা চাপা রইল না বেশিদিন।
যথানিয়মে
হিতৈষী আত্মীয়েরা এলেন আবার অনাহূতভাবেই।
যথানিয়মেই
ফুসফুস-গুজগুজও হল,
ধাত্রী-বিদ্যা-পারঙ্গম মহাপুরুষও একজন সম্ভব হলেন
ধর্মসংস্থাপনার্থায়।
টলল না কিন্তু সে;
বললে স্থিরকণ্ঠে,
পাপ করি নি কিছু,
নারীজীবনের চরম-সার্থকতা যে মাতৃত্ব
তাই অর্জন করতে যাচ্ছি
আধুনিক পদ্ধতিতে
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ নিয়ে
আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে।
আপনারা আমাকে রেহাই দিন।

টাকা আছে প্রচুর,
রেহাই দিতে হল সুতরাং।

ছ' মাস কাটল।
ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন একদিন,
চমকে গেলেন :
আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা
আগে লক্ষ্য করেন নি তিনি,
পেল্‌ভিস ভয়ানক ছোট
স্বাভাবিক প্রসব অসম্ভব।
অপরিণত শাবকটিকে ধ্বংস না করলে
মায়ের জীবন-সংশয়!

মুখ শুকিয়ে গেল তার
অন্য কোন উপায় নেই?
আছে—সিজারিয়ান সেক্‌শন।
পেট কেটে ছেলে বার করা যেতে পারে,
কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা!
সে বিপদের সম্মুখীন হবে—
আত্মরক্ষা ও আত্মবিনোদনই আধুনিকতা নয়,
দুর্জয়কে জয় করবার সাহসই আধুনিকতা।

অবশেষে এল সেই দিন।
ঠিক করাই ছিল সব—
রবার-প্যাড দেওয়া অপারেশন-টেবিল,
আরও দুটো টেবিলে
তোয়ালে, ক্যাথিটার, কাঁচি, লোশন,
টাওয়েল, ফর্‌সেপ্‌স—সারি সারি ওষুধ
জল গরম করবার ইলেকট্রিক স্টোভ,
সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্নানের টব,
ইলেকট্রিক রেডিয়েটার একটা,
হাই-পাওয়ার বালব চারটে,
ত্রুটি ছিল না কিছু।
ফোন করবার সঙ্গে সঙ্গেই
এসে পড়লেন ডাক্তারেরা
একজন সার্জন—দুজন সহকারী
নার্স দুজন আগেই এসেছিল
প্রাক-অপারেশন ব্যবস্থা করবার জন্যে।
ডাক্তারদের সঙ্গে এল
গোটা চারেক বড় বড় ড্রাম
কোনটাতে যন্ত্রপাতি
কোনটাতে ব্যাণ্ডেজ, গজ, তুলো
কোনটাতে ডাক্তারদের পোশাক
স্টেরিলাইজড্ আধুনিক পদ্ধতিতে
স্পাইনাল অ্যানিস্‌থিসিয়া দেওয়া হল।
ডাক্তাররা হাত ধুলেন,
পরলেন তাঁদের অদ্ভুত অটোক্লেভ্‌ড পোশাক—
লম্বা গাউন পা পর্যন্ত,
নাক-মুখের আচ্ছাদন,

মাথায় টুপি,
হাতে রবারের দস্তানা।

চুপ করে শুয়ে রইল সে মুখ বুঝে,
মুখের একটি পেশীও বিচলিত হল না।

জ্বলে উঠল নিঃশব্দে
চারটে হাজার-ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের বাতি।
একটা আর্গট ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর।
শুরু হল অপরাশেন।

করকর করে ছুরি বসল পেটের চামড়ায়,
ইউটেরাস দেখা গেল একটু পরেই,
সেটাকে
ভল্‌সেলাম দিয়ে ধরলেন বাগিয়ে সহকারীরা,
ছুরি বসালেন তাতে সার্জন।
ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল,
সার্জেনের গাউনে এক পিচকিরি রং দিয়ে দিলে যেন কেউ,
কট কট কট—
আর্টারি ফরসেপ্‌স চেপে ধরল ছিন্ন শিরার মুখ
নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে কাজ চলতে লাগল।

বাইরেও তখন ফিনিক ফুটছিল জ্যোৎস্নায়।
চন্দ্রমল্লিকার স্তবকে স্তবকে
রজনীগন্ধার গুচ্ছে গুচ্ছে
চামেলী-কুঞ্জে
যূথিকা-বনে
ঝিল্লি অশ্রান্ত একটানা সঙ্গীতে
জ্যোৎস্না-ধবল মেঘমালায়
মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই চিরন্তর সত্য—
সৃষ্টি কি সুন্দর!

সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনে
সচকিত হয়ে উঠল চতুর্দিক।
সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক
সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে

প্রবেশ করল আধুনিক জগতে
চির-পুরাতন চিরনূতন শিশু।

২৬

ভাই অসিত,

তোমাব স্ত্রী কি তোমার কাছে বা তোমাদের বাড়িতে ফিরে গেছে? চিঠি লিখে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় চিঠি আমি লিখি না। হাসির হঠাৎ অন্তর্ধানে বিস্মিত (এবং একটু বিচলিতও) হয়েছি বলে লিখছি। হোস্টেলের মাসিমা বললেন, হাসি কাউকে কিছু না বলে হোস্টেল থেকে চলে গেছে। তোমার শ্বশুর মশায়ের ঠিকানাটা জানা ছিল। সেখানে গেলাম। খবরটা শুনে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। হাসির হঠাৎ হোস্টেল ত্যাগ করার কোনও সদর্থই করতে পারলেন না ভদ্রলোক। আম্‌তা আম্‌তা করলেন একটু, মুচকি মুচকি হাসলেন দু-একবার।—এ ফানি সর্ট অব জেন্‌টল্‌ম্যান হি সিমড্‌—এক্‌স্‌কিউজ মি —যা মনে হয়েছে সরলভাবে বলে ফেললাম। শেষকালে বললেন, "না, আমি তো কিছুই জানি না। হয়তো অসিতের কাছে গেছে, কিম্বা অসিতের বাপমায়ের কাছে, ঠিক জানি না—"

খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। বোর্ডিংয়ের দারোয়ানের কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে মনে হল—এক্‌স্‌কিউজ মি ইফ্‌ আই হার্ট ইওর ফীলিংস্‌—মনে হল হাসি আত্ম-আবিষ্কার করেছে। ও যে করবে তা ওকে একদিন দেখেই আমি বুঝেছিলাম। যে খাঁচার মোহ আমাদের সকলকে সম্মোহিত করে রেখেছে তা ওকে ভোলাতে পারে নি। অজানা আকাশ থেকে যে মুহূর্তে ও সত্য ডাকটি শুনেছে সেই মুহূর্তে ও ডানা মেলে উড়ে গেছে। বিয়ের মন্ত্র ওর পায়ের শিকল হয়ে উঠেনি। প্লীজ স্ট্রেচ ইওর ইম্যাজিনেশন—তুমি কবি, সত্যকার দ্রষ্টা হও, তাকে বোঝ, হা-হুতাশ কোরো না।

অন্ধকার 'সেলে' পচে মরছি, তিলে তিলে মরছি, হঠাৎ যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পেলাম অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে উল্কার মতো, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সমস্ত গণ্ডি লঙ্ঘন করে। দিস্‌ ইজ্‌ অ্যান ইভেন্ট, এ গ্লোরিয়াস ইভেন্ট...

এই পচা-ধসা সংস্কারের শ্যাওলা পড়া সমাজের মুখে লাথি মেরে হাসি চলে যেতে পেরেছে এর জন্য তাকে নমস্কার করি। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি অমন একটি মেয়েকে সহধর্মিণীরূপে পেয়েছিলে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সে তোমার মধ্যে সহধর্মীকে খুঁজে পেল না। পাবার কথাও নয়। তুমি ভদ্র, তুমি দয়ালু, তুমি ধনবান, তুমি তথাকথিত সভ্যসমাজের শোভন পুতুলটি। ঝড়ের রাতে যার অভিসার তার যোগ্য সঙ্গী হবার ক্ষমতা তোমার আছে কি? অনেক কথা লিখে ফেললুম। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। যা লিখতে যাচ্ছি তাতেই যেন উলটো সুর বেজে উঠছে। আমার সমস্ত কল্পনা জুড়ে যে উদ্দাম অর্কেস্ট্রা বাজছে এখন তার সঙ্গে তোমার মনের সুর মিলবে না। নেভার মাইণ্ড, চীয়ার আপ।

অতুল

২৭

ভাই অসিত,

তোমার পত্র পাইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। চিন্তার কথা তো বটেই। তোমাকে পূর্বপত্রে জানাইয়া ছিলাম যে, শনিবার দিন অফিস-ফেরত গিয়া হাসিকে লইয়া আসিব। দুইটা নাগাদ হোস্টেলে পৌঁছাইয়া খবর পাঠাইলাম। একটু পরে স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বাহির হইয়া আসিলেন। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে বেশ একটু রুক্ষ ভাব লক্ষ্য করিলাম। আমার দিকে একনজর চাহিয়া বলিলেন, "হাসি হোস্টেলে নাই।" তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, কোথায় গিয়াছে, কখন ফিরিবে? "জানি না', বলিয়া তিনি গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে কি বেশ একটু অপমানিতই বোধ করিয়াছিলাম। কাল তোমার চিঠি পাইয়া ভিতরের কথা বুঝিতে পারিলাম। চিত্রা তো আকাশ হইতে পড়িয়াছে, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িতে হইল। একটা খোঁজ তো করিতে হইবে। আবার হোস্টেলে গেলাম দারোয়ান বাবাজীকে একটি টাকা ঘুষ দিয়ে চেষ্টা করিলাম যদি গোপন কোনও খবর বাহির করিতে পারি। পারিলাম না। সে বলিল—একটি ছোট সুটকেস হাতে করিয়া হাসিদিদি একটা ট্যাক্সি চড়িয়া একাই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে সে তাহা জানে না। শতমুখে সে হাসির প্রশংসা করিল। কহিল—একদিনও তাহার কোনও বেচাল সে দেখে নাই। দেখিবার কথাও নয়। চিত্রা বলিল, হাসি হয়তো হোস্টেলের মাসীমার সহিত ঝগড়া করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। কথাটা মনে লাগিল। হাসির বাবা নীলাম্বরবাবুর সহিত কয়েকদিন পূর্বে দেখা হইয়াছিল তাহা তোমাকে পূর্বে জানাইয়াছি। তাঁহার বাসার ঠিকানাটা জানা ছিল। সোজা সেই ঠিকানাতেই চলিয়া গেলাম। আশা ছিল হাসিকে হয়তো সেইখানেই দেখিতে পাইব। কিন্তু ভাই, হতাশ হইতে হইল। হাসি তো সেখানে ছিলই না, নীলাম্বরবাবুও ছিলেন না। শুনিলাম—ঐ বাসার লোকেরাই বলিল—তিনি কয়েকদিন পূর্বে একাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন যে হাসি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই; তখন ভাবিলাম হাসি হয়তো একাই বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। আজকাল অনেক মেয়েই তো একা একা সর্বত্র যাতায়াত করে। ইহার পর কি করিব ভাবিয়া পাইতে ছিলাম না। চিত্রা বলিল, আমাদের সদানন্দবাবুকে (অফিসের বড়বাবু) সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি হয়তো কোনও সৎ পরামর্শ দিতে পারেন। বিশেষ করিয়া তিনি নীলাম্বরবাবুর বাল্যবন্ধু বলিয়া আমি আরও উৎসাহিত হইয়া সেখানে গেলাম। খবরটা শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—"এই রকম যে কিছু একটা হবে তা আমি আগেই জানতাম, নীলাম্বর শেষ রক্ষা করতে পারলে না তাহলে!" বুঝিতেই পারিতেছ এই ধরনের বাঁকাচোরা কথা শুনিয়া আমি বেশ একটু অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "ব্যাপারটা কি আমাকে যদি খুলে বলেন আমি অসিতকে জানিয়ে দিতে পারি। অসিত বেচারা বড়ই চিন্তিত হয়েছে।" আমার কথা শুনিয়া বড়বাবু উঠিয়া গেলেন এবং আলমারি হইতে একটা চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। বলিলেন—"এই চিঠির বাণ্ডিলটা তোমার বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দাও, তাহলেই সে সব বুঝতে পারবে"—তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন, "লিখে দাও চিঠিগুলো পড়ে যেন

পুড়িয়ে ফেলে। ও আমাকে ফেরত দিতে হবে না।" বড়বাবুর মুখটা কেমন যেন থম্ থম্ করিতে লাগিল। আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, বাণ্ডিলটি লইয়া চলিয়া আসিলাম বাণ্ডিলটি আজ তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। বড়বাবু যেমন সীলড্ দিয়াছেন তেমন পাঠাইয়াছি। বিশ্বাস কর, খুলিয়া দেখি নাই। সীল দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। খুবই কৌতূহল হইতেছিল কিন্তু ভাবিলাম গুরুতর কোনও বাধা যদি না থাকে তুমি নিজেই আমাকে জানাইবে। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম। ভয় করিও না, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি—

মহেন্দ্র

নীলাম্বরবাবুর পত্রাবলী

১

মুঙ্গের
১০-১-২৮

ভাই সদানন্দ,

লিলির সম্বন্ধে তুমি যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছ সামাজিক দিক হইতে তাহার মূল্য আছে স্বীকার করি। আমরা সামাজিক জীব, সামাজিক নিয়মাবলীও যতটা সম্ভব আমাদের মানিয়া চলা উচিত একথা অস্বীকার করিতেছি না। আমি কেবল একটি প্রশ্নই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। আমরা কি কেবল সামাজিক জীবই। এতদপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপকতর পরিচয় কি আমাদের নাই? উপনিষদ আমাদের যে সত্তার কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কি বিশেষ কোন সমাজের সত্তা? তাহা কি সর্বমানব সম্বন্ধেই সত্য নয়? উপনিষদের ঋষির বাণী—'আমি আমার মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের মধ্যে আমাকে উপলব্ধি করিব।' লিলির সম্বন্ধে এ-বাণীর অন্য অর্থ যদি করি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের উপনিষদ পাঠ ব্যর্থ হইয়াছে। তোমার অধরে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, মানস-নেত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি করিব বল, যাহা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছি তাহা তোমার নিকট অন্তত ব্যক্ত না করিয়া পারিতেছি না। উপনিষদের কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, নিছক বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি লইয়াই যদি বিচার করি, তাহা হইলেও লিলিকে অপাংক্তেয় মনে করিবার কোনও হেতু খুঁজিয়া পাই না। তুমি যে সমাজের দোহাই পাড়িতেছ দুইশত বৎসর পূর্বে সে সমাজের যে চেহারা ছিল আজ তাহা আর আছে? এখন কি আর সতীদাহ চলিবে? কিন্তু যে সকল তত্ত্ব ডারবিনের বিবর্তনবাদকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহার রূপ পরিবর্তিত হয় নাই। সামান্য ইতর-বিশেষ হয়তো হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক কাঠামোটা ঠিক আছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়াও যদি ভাব লিলিকে অযোগ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। কুলশীলের পরিচয় জানা না থাকিলেই কি তাহাকে কুলটা বা দুঃশীলা মনে করিতে হইবে? লিলির চোখে মুখে কি তাহার আভিজাত্য পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই? আমার বিশ্বাস সে যদি কথা কহিতে পারিত তাহার প্রকৃত পরিচয় শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাইতাম! কাগজে বারম্বার বিজ্ঞাপন দিয়াও যখন তাহার আত্মীয় স্বজনের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, থাকিলেও

তাহারা দায়িত্ব লইতে চায় না। এ অবস্থায় কি করা উচিত? আমার মনে হয় দায়িত্ব আমাদেরই। কুম্ভ মেলায় গুণ্ডাদের হাত হইতে আমরা যখন তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি তখন উহার ভার আমাদেরই লইতে হইবে। তুমি শেষে যে কথাটা লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া হাসি পাইতেছে। লিলি নামটাতে তোমার এত আপত্তি কেন? লিলির মতো সুন্দর দেখিতে বলিয়াই আমি লিলি নাম দিয়াছিলাম। তুমি বলিতেছ হিন্দু নাম রাখা উচিত, লিলি নামটাতে বিলাতী গন্ধ আছে। তোমার যে এ ধরনের শুচি-বায়ু আছে তাহা জানিতাম না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—উহার লিলি নাম পরিবর্তন করিয়া যদি কালী বা দুর্গা নাম রাখা যায় তাহা হইলে কি সমস্যার সমাধান হইবে? যদি হয় নাম পরিবর্তন করিতে আমার আপত্তি নাই। পরিশেষে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তোমার পত্র পড়িয়া সন্দেহ হইতেছে তুমি কি সেই সদানন্দ যে একদা সাহেবী হোটেলে বসিয়া মহানন্দে বীফস্টিক চর্বণ করিয়াছিলে? রাগ করিও না ভাই, যাহা মনে হইল লিখিলাম। লিলির সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করিলে তাহা জানাইবে। অদ্য মনিঅর্ডার যোগে তোমাকে পঞ্চাশ টাকাও পাঠাইলাম। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর। আশা করি কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

২

মুঙ্গের
১৭-১-২৮

ভাই সদানন্দ,

তুমি যে সব মরাল লেকচার দিয়াছ তাহাতে কোনও সার বস্তু নাই, কেবলই ফেনা। সোডা ওয়াটারের বোতল, অর্ধশিক্ষিতদের সভায় অথবা সস্তা প্রেমের উপন্যাসে ফেনা বেমানান নয় কিন্তু যে গুরুতর সমস্যা লইয়া তুমি আলোচনার ভান করিয়াছ তাহাতে উচ্ছ্বাসের স্থান নাই। যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমাইবার ভান করে তাহার ঘুম ভাঙান শক্ত। তুমি যদি মেয়েটির দায়িত্ব না লইতে চাও, লইও না। না লইবার বহুবিধ সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, দুই-একটা কারণ তুমি উল্লেখও করিয়াছ। তোমার বাড়ির লোক, বিশেষ করিয়া তোমার বাবা, মেয়েটিকে আর তোমার বাড়িতে রাখিতে চান না, আমি তো মনে করি এই একটা কারণই যথেষ্ট। তিনি যদি তাঁহার বাড়িতে কোন অজ্ঞাতকুলশীলাকে আশ্রয় না দিতে চান তাঁহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তুমি যদি এই কথাটাই কেবল লিখিতে আমার কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু তুমি এমন একটা ভাব দেখাইয়াছ যেন ব্যাপারটা যদি তোমারও বিবেকসঙ্গত হইত তাহা হইলে তোমার বাবার মত অগ্রাহ্য করিয়াও লিলিকে তুমি তোমাদের বাড়িতে রাখিতে। বিবেকের স্বপক্ষে নানারূপ শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া তুমি যে ধরনের ওকালতি করিয়াছ তাহা কোনও অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরোহিতের মর্ম হয়তো স্পর্শ করিতে পারে, গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপে তোমার পত্রটি পঠিত হইলে প্রবীণ সমাজপতিদের হাততালিও হয়তো তুমি লাভ করিবে, কিন্তু ওসব কথা বলিয়া আমাকে তুমি ভুলাইতে পারিবে না। আমাকে তুমি কি চেন না? তবে কেন বৃথা কালি, কাগজ, শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করিয়াছ? তোমার পত্র পড়িয়া একটা কথা আমার মনে

হইতেছে। মনে হইতেছে যে তোমার বিবেক আমারই পক্ষে আছে। কিন্তু তুমি ভীতু। তুমি পিতার বিরাগ, সামাজিক গোলমাল প্রভৃতি ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে ভয় পাও, শুধু তাহাই নয়, তুমি যে ভয় পাও একথা আমার নিকট অকপটে স্বীকার করিতে তোমার লজ্জাও হয়। তাই তুমি ওই সব রাবিশ-মরাল লেকচার দিয়াছ।

এইবার কাজের কথা পাড়ি। তুমি তো জান বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়িটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমার নিজের বলিতে আপাতত কেহ নাই, সে জন্য বাড়িরও দরকার নাই। কলিকাতায় গেলে মেসে থাকি, দেশে আসিলে মনু মাসী আমাকে আশ্রয় দেন। আমার নিজের বাড়ি থাকিলে লিলিকে নিশ্চয়ই সেখানে আশ্রয় দিতাম। মনু মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনিও আশ্রয় দিতে রাজী নন। তুমিও যখন অপারগ হইয়াছ তখন মেয়েটিকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া ছাড়া আর একটি মাত্র উপায় আছে। আমি নিজে তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়া অন্য কোথাও তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। সে রকম ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে সে চিন্তাও আমি করিয়াছি। প্রথম এবং প্রধান কথা টাকা, তাহা আমি ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি তাহাকে মূক-বধিরদের স্কুলে ভরতি করিয়া দাও। শুনিয়াছি, সেখানে থাকিবার বোর্ডিং আছে। সেই বোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষদের সহিত দেখা করিয়া লিলির সেখানে থাকিবার বন্দোবস্তটুকু আশা করি তুমি করিয়া দিতে পারিবে। ইহাতে আশা করি তোমার সনাতন হিন্দধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। লিলির কাপড় চোপড় এবং ট্রাঙ্ক কিনিবার জন্য ইতিপূর্বে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছি। অদ্য পুনরায় একশত টাকা পাঠাইলাম। যদি আরও লাগে পাঠাইয়া দিব। এই অজ্ঞাতকুলশীলার জন্য আমি কেন এত টাকা অনর্থক খরচ করিতেছি এ প্রশ্ন তোমার যদি জাগে তাহা হইলে তোমার সম্পর্কে আমার নিজের আচরণের কথা স্মরণ করিও, তাহা হইলেই উত্তর পাইবে। রেসের মাঠে তোমার হইয়া টিকিটা খরিদ করিবার কোনও সদর্থই কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি করিতে পারিবেন না। আমার কাছে কিন্তু ইহার একটি সহজ অর্থ তখনও ছিল, এখনও আছে। আমি সুখ পাইয়াছিলাম। আশা করি লিলির একটা সুব্যবস্থা তুমি করিয়া দিতে পারিবে। আমি জ্বরে শয্যাগত আছি, তাহা না হইলে আমি নিজেই চলিয়া যাইতাম। আমার ভালবাসা লও। আশা করি কুশলে আছ।

ইতি—
তোমারই
নীলাম্বর

৩

মুঙ্গের
২-২-২৮

ভাই সদানন্দ,

লিলিকে মূক-বধিরদের বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দিয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যে ফর্মগুলি তুমি সহি করিয়া পাঠাইতে লিখিয়াছ তাহা এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিলাম। তুমিই যদি উহার গার্জেন হইয়া ফর্মগুলিতে সহি করিয়া দিতে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হইয়া যাইত ? আমি যখন টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি নিশ্চয়ই দিব। আচ্ছা লোক তো তুমি! হঠাৎ এমন সাবধানী হইয়া উঠিলে কেন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি লিখিয়াছ, "লিলির সহিত যে আমার কোনও

সম্পর্ক আছে, বা কোনওকালে ছিল তাহার কোনও প্রমাণ কাগজে কলমে আমি রাখিতে চাই না। তুমিই যখন তাহার সমস্ত ভার লইতেছ, তখন তুমিই তাহার গার্জেন হও।" আইনত কথাটা ঠিকই, কিন্তু তোমার মতির এরূপ গতি হইল কেন ভাবিয়া পাইতেছি না। আমাদের বন্ধু যোগেন ডাক্তারকে দিয়া তোমার ব্লাড প্রেসারটা মাপাও। আর একটা কাজের কথাও তোমাকে লিখিতেছি। তুমি এখন হিসাবী লোক হইয়াছ, আশা করি ইহার একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। আমার ব্যাঙ্কে নগদ টাকা বিশেষ কিছু নাই। যাহা ছিল তাহা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। আমার ইচ্ছা আমার মায়ের ঠাকুমার দিদিমার এবং আরও অনেকের যে সব গহনা উত্তর-অধিকার-সূত্রে আসিয়া আমার সিন্দুকে জমিয়া আছে সেগুলিকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিই। সমস্ত বিক্রয় করিলে হাজার পঞ্চাশেক টাকা নিশ্চয় হইবে। তুমি যদি ব্যবস্থা করিতে পার ভাল হয়। আমি এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোথায় গিয়া কাহার সহিত কথাবার্তা কহিলে সুবিধা হইবে আমার জানা নাই। তোমারও জানা আছে কি-না জানি না, কিন্তু তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, তাই তোমাকে লিখিলাম। তোমার আজকাল মরাল লেক্‌চার দিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে জানিয়াও লিখিলাম। তুমি হয়তো লিখিবে মা, দিদিমা, ঠাকুমার স্মৃতিচিহ্নগুলি এমনভাবে নষ্ট করা বর্বরতা। হয়তো আমি বর্বর। আমার সহজ বুদ্ধি কিন্তু আমাকে বলিতেছে যে অতগুলি গহনা অকারণে বাক্সে পুরিয়া রাখার কোনই সার্থকতা নাই। ওগুলিকে যথোচিত সাবধানতা সহকারে রাখিবার সামর্থ্যও আমার নাই। মনু মাসীর বাড়িতে যদি ডাকাতি বা চুরি হয় (কিছুই বিচিত্র নয়) তাহা হইলে আমার কিছুই বলিবাব থাকিবে না। ওগুলি বিক্রয় করিয়া টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখাই নিরাপদ। তা ছাড়া, সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি আমার টাকার দরকার! আর এম. এ. পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা নাই। একটা এম. এ. ডিগ্রি তো আছে, ডবল এম. এ. হইয়া আর কি হইবে? চাকরি করিবার বাসনা নাই। কোনও ব্যবসায় করিব। কিন্তু কিসের ব্যবসায় কোথায় করিব তাহা এখনও অনিশ্চিত। মনু মাসী বলিতেছিলেন, মেসোমশায়ের কাশীতে যে জুয়েলারি দোকানটি আছে লোকাভাবে এবং দেখাশোনার অভাবে সেটি নাকি তেমন চলিতেছে না। আমি যদি সেটির ভার লই তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। মেসোমশাই যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন দোকানটির নাম ডাক ছিল। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন। মনু মাসীর জামাইটি সম্বল। মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে জামাই আপনজন হইত, হয়তো ঘর-জামাই হইতে পারিত, কিন্তু এখন তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া পর-জামাই হইয়া গিয়াছেন। মনু মাসী বলিতেছেন যে, দোকানটি আমি যদি চালাইতে পারি আমাকেই তিনি লেখা-পড়া করিয়া সমস্ত স্বত্ব দান করিয়া দিবেন। আমি যে জহুরী লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—অহেতুক বিনয় আমি করি না—কিন্তু মুশকিল হইয়াছে, আমার জহুরীত্ব যে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তাহার মধ্যে জুয়েলারী দোকানের স্থান নাই। শেক্‌স্‌পীয়র মিলটন গ্যেটে কালিদাস ভবভূতি রবীন্দ্রনাথ হইতে শুরু করিয়া উদীয়মান কবি কাজি নজরুলের পর্যন্ত স্থান সেখানে আছে, কিন্তু জুয়েলারী দোকানের নাই। কিন্তু মনু মাসীর কথা শুনিয়া লোভ হইতেছে। কি করি বল দেখি? নূতন ধরনের এই রেস খেলায় ঝাঁপাইয়া পড়িব নাকি! বাজে ঘোড়াকে ব্যাক করিয়া জীবনে অনেক রেসে হারিয়াছি, আর একবার হারিতেও লজ্জা নাই। মনু মাসীকে কিন্তু বাজে ঘোড়া বলিয়া মনে হয় না। তুমি নিশ্চয় চটিয়া এতক্ষণ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছ। আমি

ভাই অসহায় ব্যক্তি, আমার উপর রাগ করিয়া শক্তিক্ষয় করিও না। ভালবাসা লও। আশা করি কুশলে আছ। লিলির কাছে আর গিয়াছিলে কি? মাঝে মাঝে খবর লইও। ইতি

তোমারই
নীলাম্বর

৪

দিল্লী
৪-৩-২৮

ভাই সদানন্দ,

আমি কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিতে পারি নাই, কারণ একটি টেলিগ্রাম পাইয়া আমাকে পরের ট্রেনেই দিল্লী চলিয়া আসিতে হইয়াছে। টেলিগ্রাম কে করিয়াছিল জান? চুনী। চুনীকে মনে পড়িতেছে না? আমাদের সেই বেনেটোলার বেণী-দোলানো চুনী, যাহার বাবা চাকরির লোভে খৃস্টান হইয়াছিলেন। এইবার আশা করি মনে পড়িয়াছে। সেই চুনী হঠাৎ এতদিন পরে আমাকে বাড়ির ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিয়াছিল—অন ডেথ বেড, প্রে কাম ওয়ান্স। মনু মাসী সেই টেলিগ্রাম কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কি কাণ্ড দেখ! টেলিগ্রামের ওই অল্প কয়েকটি কথার মধ্যেই রোমান্সের গন্ধ আসে। রোমান্সই। চুনীকে ঘিরিয়া অনেকের মনেই একদা রোমান্স জাগিয়াছিল, আমারও জাগিয়াছিল। তোমার মনের সঠিক খবর জানি না, কিন্তু তুমি যে তাহাকে ভুল বাংলায় শেলী কীটস ব্রাউনিংয়ের কবিতার রসাস্বাদন করাইবার চেষ্টা করিতে এই খবরটি আমার অজ্ঞাত ছিল না। চুনী আমাকে একদিন বলিয়াছিল। তোমার অনুবাদ আমাকে দেখাইয়াও ছিল, সেই জন্য সন্দেহ হয় যে তুমিও হয়তো মজিয়াছিলে। একটা কথা কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান না। চুনী আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। এখন হইলে বোধ হয় তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতাম, কিন্তু তখন বাবা বাঁচিয়াছিলেন। বাবার চটিজুতা দুই-একবার পৃষ্ঠস্পর্শ করিয়াছিল, সে স্মৃতিও মনে জাগরূক ছিল। সুতরাং সাহস করি নাই। চুনীর আবেগময় উক্তির উত্তরে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার মনে আছে। বলিয়াছিলাম—"দেখ চুনী, ক্ষমতা থাকিলে আমরা দুইজনে প্রজাপতি হইয়া অনন্তের উদ্দেশে পাশাপাশি উড়িয়া যাইতাম। সে ক্ষমতা যখন নাই তখন এস আমরা মনে মনে উড়ি, বিবাহের লাগাম দিয়া প্রজাপতিকে অচল করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না। গুড বাঈ।" তাহার পর আর চুনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র অবশ্য চলিত। এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল এ খবরও পাইয়াছিলাম। তাহার পর অনেক দিন আর কোনও খবর পাই নাই। সহসা এই টেলিগ্রাম। তোমাকে বলিয়া আসিবার সময় ছিল না। দিল্লীতে আসিয়া দেখিলাম একটি জরা-জীর্ণ বৃদ্ধা মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চক্ষু কোটরাগত, মাথার সম্মুখ দিকটা টাক-পড়া, ক্রমাগত কাশিতেছে। যে ঘরে শুইয়া আছে সে ঘরটা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে।

আসবাবপত্র সাহেবী ধাঁচের, কিন্তু খুব ময়লা এবং জীর্ণ। তাহার ঘরে বৃদ্ধ বকাকৃত একটি সাহেব বসিয়াছিলেন, তিনি মিস্টার জোনস, চুনীর স্বামী। আমাকে দেখিয়া চুনী বলিল, "আপনি এসেছেন নীলাম্বরবাবু? আশা করিনি যে আপনি আসবেন। আপনাকে একবার শেষ দেখা

দেখবার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই ধার করেও এই টেলিগ্রামটা করেছিলাম। কিন্তু আশা করতে পারিনি যে আপনি আসবেন। আমার কি দশা হয়েছে দেখুন নীলাম্বরবাবু''— ছোট খুকীর মতো সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মিস্টার জোন্‌স্‌ বকের মতো নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটি কথা পর্যন্ত বলিলেন না। পরে জানিয়াছি লোকটি বদ্ধ কালা। কানের ভিতর ঘা হইয়া কালা হইয়া গিয়াছেন এবং এই জন্য চাকরিও গিয়াছে। চুনীর উপর্যুপরি চারটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচিয়া নাই। চুনির হইয়াছিল যক্ষ্মা। শুনিলাম অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না। আমাকে অবশ্য চুনী ডাক্তার ডাকিতে বলে নাই। মিস্টার জোন্‌স্‌ কেবল মধ্যে মধ্যে ধীর কণ্ঠে বলিতেছিলেন, ''দি সিচুয়েশন ইজ ভেরী ভেরী ডেসপারেট।'' আপন মনে বলিতেছিলেন, আমাকে কিছু বলেন নাই। আমি কিন্তু ভাই, নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারিলাম না, ডাক্তার ডাকিলাম। ভাল ডাক্তারই ডাকিলাম একজন। তিনি বলিলেন, ''বাঁচিবার কোনও আশা নাই। তবে যে কয়দিন বাঁচেন, কষ্টটষ্টগুলো কমাইবার জন্য ঔষধ দিতে পারি। এ রোগ সারিবে না!'' আমি আসিবার পর চুনী পাঁচদিন মাত্র বাঁচিয়াছিল। কাল সে মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে সে আমাকে বলিয়া গেল, ''জীবনের শেষ কটা দিন আপনি অমৃতে পরিপূর্ণ করে দিলেন নীলাম্বরবাবু। এই আনন্দের স্মৃতি যদি মৃত্যুর পরও থাকে তা হলে তারই জোরে আমি অনন্ত স্বর্গলাভ করব, আমার আর কোনও ক্ষোভ নেই। আমি জীবনে একমাত্র আপনাকেই চেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল অসম্ভবকে চেয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও সম্ভব হল। এখন আপনাকে যেমন করে পেলাম তেমন করে বোধ হয় কেউ পায়নি আপনাকে।'' ইহাই আমার সহিত তাহার শেষ কথা। চুনীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বকটি উড়িয়া গেল। তাহার শেষকৃত্যও আমাকেই করিতে হইয়াছে। মিস্টার জোন্‌স্‌ কোথায় যে উড়িয়া গেলেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি শবানুগমন পর্যন্ত করেন নাই। চুনীকে গোর দিবার সমস্ত ব্যবস্থা আমাকে করিতে হইয়াছে। মিস্টার জোন্‌সের যে দুই-একজন আত্মীয় পাশাপাশি ছিলেন তাঁহারা অবশ্য কায়িক সাহায্য যথেষ্ট করিয়াছেন, আর্থিক দিকটা আমাকেই সামলাইতে হইয়াছে। এমন কি, চুনীর যে সব ধার ছিল তাহাও শোধ করিয়াছি। ছয় মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি ছিল, বাড়িওয়ালা আসিয়া আমাকেই ধরিল। বলিল, মিস্টার জোন্‌স্‌ বলিয়া গিয়াছেন যে আমি নাকি তাঁহার দূর-সম্পর্কের বড়লোক আত্মীয়, আমিই সব মিটাইয়া দিব। বাক্যব্যয় না করিয়া সব মিটাইয়া দিলাম। জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছিলাম, অন্য উপায় ছিল না। সমস্ত ব্যাপার যখন মিটিয়া গিয়াছে তখন মিস্টার জোন্‌সের সহিত হঠাৎ একদিন দেখা হইল একটা চায়ের দোকানে। তিনি বকের মতো বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা আকৃতির নানা জনের একদল লোক দাঁড়াইয়াছিল। আমি কাছে গিয়া দেখিলাম তিনি লিখিয়া লিখিয়া সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। সকলে লিখিয়া লিখিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে এবং তিনি লিখিয়া লিখিয়া উত্তর দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে মাত্রা চানি আনা পয়সার বিনিময়ে তিনি সকলকে রেসের 'টিপ' দিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি নাকি খুবই পারদর্শী। আমার অন্তরে কৌতুক ও কৌতূহল যুগপৎ জাগরিত হইল। আমি আগাইয়া তাহার সম্মুখে গেলাম। টিপের চিন্তায় তিনি এত তন্ময় ছিলেন যে আমাকে প্রথমে দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইবামাত্র কিন্তু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করমর্দন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন একটি কাগজে লিখিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে আমিও একটি 'টিপ' চাই। মিস্টার জোন্‌স্‌

উত্তরে লিখিলেন, 'ওয়েট এ বিট।' আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম! সকলে যখন চলিয়া গেল তখন মিস্টার জোন্‌স্ একটি ঘোড়ার নাম লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই ঘোড়াটিতে তাঁহার নিজের খেলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে। আমি যদি খেলি, সিওর লাক্। আমি একটি সিকি বাহির করিয়া তাঁহাকে দিতে গেলাম, কিন্তু জিব কাটিয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মনে হইল, ডিকেন্সের উপন্যাস হইতে একটি চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়াছে। ডিকেন্সের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই একখানা চেয়ার টানিয়া মিস্টার জোন্‌সের পাশে বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা লিখিলে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে। সংক্ষেপে দরকারী কথাটুকু কেবল জানাইতেছি। মিস্টার জোন্‌সের পরামর্শ অনুযায়ী দুইদিন রেস খেলিয়াছিলাম। পাঁচশত টাকা হারিয়েছি। আমাকে কিছু টাকা, অন্তত হাজারখানেক টি. এম. ও. করিয়া অবিলম্বে পাঠাইয়া দাও। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, রেস খেলিয়াই ওই পাঁচশত টাকা উদ্ধার করিব। তোমার যাহা মনে হইতেছে এবং যাহা তুমি পত্রযোগে বলিবে তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। তোমার যাহা বক্তব্য তাহা তুমি বল, আমি আপত্তি করিব না। তোমার পত্র যত দীর্ঘই হোক, আদ্যন্ত পড়িব—এ প্রতিশ্রুতিও দিতেছি, কিন্তু টাকাটা অবিলম্বে পাঠাইবে। গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই আমি হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছিলাম, বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া আসিয়াছি। এই সঙ্গে একটা হাজার টাকার চেকও পাঠাইলাম তোমার নামে। টাকাটা অবিলম্বে পাঠাইয়া দিও। আমি কলিকাতায় আর এক কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় টেরও পাইয়া গিয়াছ। একটা ছোট বাসা ভাড়া করিয়া লিলিকে সেইখানেই রাখিয়া আসিয়াছি। বোর্ডিং হাউসে বেচারার বড় কষ্ট হইতেছে দেখিলাম। একটা ঠাকুর এবং হোলটাইম ঝি-ও বাহাল করিয়া দিয়াছি। যখন তাহার ভারই লইতে হইল তখন ভদ্রভাবেই তাহা লওয়া উচিত। আমি এখান হইতে দেশে ফিরিব। মনু মাসীর কাছে দিনকতক থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে। কাশীতে যাইতে পারি, মানে, সেই জুয়েলারি দোকানের সম্পর্কে। আমার ভালবাসা জানিবে। আশা করি কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

৫

দিল্লী
১৪-৩-২৮

প্রিয় সদানন্দ,

সানন্দে সুসংবাদটি জানাইতেছি। এবার ভগবান মিস্টার জোন্‌সের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। তাহার শেষের টিপ তিনটি ফলপ্রদ হইয়াছে। যাহা হারিয়াছিলাম তাহা পুনরুদ্ধার করিয়াছি। উপরন্তু কিছু লাভও হইয়াছে। কিছু টাকা লিলিকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি আর তাহাকে টাকা দিও না। মাঝে মাঝে খবর লইও। আমি কাশী চলিলাম। ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমার
নীলাম্বর

৬

মুঙ্গের
১৫-৪-২৮

ভাই সদানন্দ,

কাশী হইতে তোমাকে পত্র দিতে পারি নাই। হীরা জহরতের ব্যাপারে এতই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল যে সময় ছিল না। এতদিন দোকানটি যে লোকের হাতে ছিল তাঁহার নাম অভয় মিত্র। কিন্তু এমন ভয়ানক ও শক্রভাবাপন্ন লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। লোকটি একচক্ষু, কৃষ্ণকান্তি, মুখময় বসন্তের দাগ, মাথায় কদমছাঁট চুল। অতিশয় স্বল্প-ভাষী। একটিমাত্র বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া বার বার নির্গত হইতে শুনিলাম, তাহা এই—"আজ্ঞে, আমি তো কিছুই জানি না, আপনি যা করতে চান করুন।" মনু মাসী আমাকে যে সব জিনিসপত্রের লিস্ট দিয়াছিলেন, গণনায় এবং আকৃতিতে সবগুলি ঠিকই আছে। কিন্তু পরীক্ষা করাইয়া দেখিলাম একট পাথরও আসল নয়, সমস্তই নকল। অভয় মিত্র বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না" দোকান চালাইবার জন্য মাসে তিনি মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতন পান, কিন্তু একটি ত্রিতল বাড়ি হাঁকাইয়াছেন দেখিলাম। মোট কথা, দোকানে একটি মাত্র খাঁটি রত্নই দেখিতে পাইলাম— সেটি শ্রীযুক্ত অভয় মিত্র। অগাধ সমুদ্র হইতে পুলিশ এ বস্তুটি সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি না জানি না। কিন্তু আইনত তাহারাই ডুবুরি, সুতরাং তাহাদের হস্তেই সমস্ত ব্যাপার সমর্পণ করিয়াছি। মনু মাসী বলিলেন, প্রায় এক লক্ষ টাকার জিনিস দোকানে ছিল। যাহা পাইয়াছি তাহার মূল্য দুই-শত টাকার অধিক নয়। মনু মাসীর নির্দেশ অনুসারে ব্যাপারটা পুলিশের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। মাল যদি উদ্ধার হয় আমিই তার উত্তরাধিকারী হইব—মনু মাসী এই মর্মে একটি উইলও করিয়াছেন। উপস্থিত আমাকেই মোকদ্দমার খরচ চালাইতে হইবে, মনু মাসীর হাতে নগদ টাকা তেমন কিছু নাই। জমিজমা হইতে সংসার চলে। একটা বিধবার কতই বা খরচ। মোট কথা, আমি এখন গহ্বরস্থ হইয়াছি। শেষ পর্যন্ত তলাইয়া যাইব কি-না কে জানে। তুমি যদি কিছু বুদ্ধি দিতে পার দিও। এখানে আসিয়া লিলির একটি পত্র পাইলাম। অত অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পারিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। দুই-একটা বানান ভুল আছে, "কৃতজ্ঞ" কথাটা ঠিক লিখিতে পারে নাই, অক্ষরগুলিও বড় বড়, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পারিয়াছে এইটাই তো বড় কথা। তুমি তাহার নিকট অনেক দিন যাও নাই লিখিয়াছে। তোমার এ ঔদাসীন্য কি ইচ্ছাকৃত? লিলির সম্বন্ধে তুমি তোমার মতলবটা কোন দিনই খুলিয়া বল নাই। সম্মুখে গুঁই গাঁই কর, চিঠির মারফৎ মরাল লেকচার দাও। অথচ লিলির ব্যাপারে তোমার আমার দায়িত্ব সমানই হওয়া উচিত। আমরা উভয়েই তাহাকে গুণ্ডার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি না হয় তাহার আর্থিক দিকটার ভার লইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া নৈতিক দায়িত্বটা কি তুমি এড়াইতে পার? যদিও তোমার সহিত অনেক বিষয়ে আমার মতের অমিল আছে কিন্তু তুমি যে আমার একমাত্র বন্ধু তাহাতেও সন্দেহ নাই। অন্যান্য বহু বিষয়ে তোমার স্পষ্ট মতামত আমার জানা আছে এবং তদনুযায়ী আমি চলিয়া থাকি কিন্তু লিলির ব্যাপারটা তুমি ঠিক কি আলোকে প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার মরাল লেকচারগুলি যে ভাঁওতামাত্র তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?

ভালবাসা লইও। আশা করি সুস্থ শরীরে আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

৭

মুঙ্গের
১৩-৫-২৮

ভাই সদানন্দ,

প্রায় একমাস পূর্বে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার কোনও উত্তর এ পর্যন্ত পাইলাম না। লিলিরও কোন পত্র আসে নাই। তাহাকে তাহার খরচের টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। আমিও তোমাদের কোনও চিঠি লিখিতে পারি নাই, কারণ দারুণ গ্রীষ্মে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি। মনু মাসীর শরীরটাও ভাল নাই। পেটের অসুখে ক্রমাগত ভুগিতেছেন। এখানকার ডাক্তারেরা এখনও হাল ছাড়েন নাই। যদি ছাড়িয়া দেন তাহাকে লইয়া কলিকাতায় যাইব। লিলির কাছেই উঠিব। লিলির আলাদা বাসার কথা মনু মাসীকে বলিয়াছি। আশঙ্কা হইয়াছিল, মনু মাসী হয়তো রাগ করিবেন। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "তোমাকে আর কি বলব বাবা। বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, একটি কথা শুধু বলছি, দেখো মেয়েটির যেন কোনও অসম্মান না হয়। অনাথকে আশ্রয় দিয়েছ খুবই ভাল কথা, কিন্তু দেখো তার দারিদ্র্যের জন্য যেন তার মাথা হেঁট না হয়।" তুমি আমাকে যে সব মরাল লেকচার দিয়েছিলে মনু মাসীর কথাগুলি তদপেক্ষা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। মনে হইতেছে, কথাগুলি তাঁহার মর্ম হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার আর একটা কথা মনে হইল। স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা আমরা পাই তাহা আমাদের চরিত্রগত দোষ— দুর্বলতা কুসংস্কার স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে না, পুষ্ট করে। নিমগাছ সার পাইয়া পুষ্টতর নিম ফলই ফলায়। সার না পাইলেও আমের গাছ যে ফল ফলাইবে তাহা আমই হইবে, নিম হইবে না। মনে হইল মনু মাসী সেই আম গাছ। আমরা চতুর্দিকে সুপুষ্ট নিম গাছের বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহারা বিদ্বান, কিন্তু নিম।

হ্যাঁ, তোমাকে আর একটা সুসংবাদও দিবার আছে। কাশী হইতে পুলিশ সংবাদ দিয়াছেন যে, হয়তো তাঁহারা লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিতে পারিবেন। অভয় মিত্র নাকি বামাল সুদ্ধ ধরা পড়িয়াছেন। অভয় মিত্রের বাড়ি খানা-তল্লাসী করিয়া পুলিশ কতকগুলি পত্র ও রসিদ আবিষ্কার করিয়াছে। সেই পত্র ও রসিদগুলির সাহায্যে মিরাট, কলিকাতা ও বোম্বের কতকগুলি জহুরীরও সন্ধান মিলিয়াছে। পুলিশ আশা করিতেছে যে, তাহারা টাকা দিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া লইবে। আমার মন-মার্জার উচ্চক্ষু হইয়া আছে যদি শিকাটা ছিঁড়িয়া পড়ে। ছিঁড়িবে কি? যদি টাকাটা পাই কলিকাতাতেই আমি জুয়েলারির দোকান ফাঁদিব। ব্যবসায়ের পক্ষে কলিকাতাই সর্বোত্তম স্থান। যাঁহারা ব্যাক টু ভিলেজের লেকচার দেন তাঁহারাও দেখি সকলেই কলিকাতাবাসী। অর্থ উপার্জন করিতে হইবে, খরচও করিতে হইবে, ইহার কোনটি বাদ পড়িলে আমাদের মতো লোকের জীবন ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। উভয় ব্যাপারের পক্ষেই কলিকাতা শহর

প্রশস্ত স্থান। সাধু-সন্ন্যাসীরা পর্বতে গুহায় অরণ্যে বা পল্লীগ্রামে গিয়া থাকুন, তাঁহাদের সে শক্তি আছে। যাঁহারা খুব ধনবান তাঁহারাও পর্বতে গুহায় অরণ্যে বা পল্লীগ্রামে (মানে নিজেদের জমিদারিতে) গিয়া সুখে থাকিতে পারেন, কারণ অর্থের বিনিময়ে যে-কোন প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য যে-কোনও স্থানে মিলিতে পারে, সাহারা মরুভূমিতেও রেফ্রিজারেটার লইয়া গিয়া আইসক্রীম ভক্ষণ করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে কলিকাতাই ভাল। সুতরাং যদি টাকাটা পাই কলিকাতাতেই যাইব। তুমি একটু নজর রাখিও কোনও ভাল জায়গায় যদি দোকান করিবার মতো ঘর খালি থাকে। মনু মাসীকে লইয়া যদি কলিকাতা যাইতে হয় তোমাকে টেলিগ্রাম করিব। তুমি সত্যই শেষে চাকরির চেষ্টা করিতেছ না কি! এত লেখাপড়া করিয়া শেষ পর্যন্ত কেরানীগিরি করিবে? আহা, দুর্ভাগ্য! তুমি তোমার গত পত্রে ইহার আভাস মাত্র দিয়াছিলে, তাহার পর আর কোনও খবর দাও নাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, তুমি ইতিমধ্যে হয়তো কোনও অফিসে ঢুকিয়া পড়িয়াছ এবং খবরটা আমার নিকট গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেছ। যদি ঢুকিয়াই থাক গোপন করিবার প্রয়োজন কি? শেষ পর্যন্ত গোপন থাকিবেও না। এবার কিন্তু পত্রোত্তর দিতে দেরি করিও না। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর। আশা করি ভাল আছ। লিলির খবর একটু লইও। ইতি—

নীলাম্বর

৮

মুঙ্গের
২৩-৫-২৮

ভাই সদানন্দ,

একটু আগে তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। মনু মাসীকে লইয়া আমি পরশু সকালে লুপ এক্‌স্‌প্রেসে কলিকাতা পৌঁছিব। তুমি স্টেশনে একটা ইনভ্যালিড চেয়ার বা স্ট্রেচারের বন্দোবস্ত রাখিও। লিলিকে বলিও, দ্বিতলের বড় ঘরটি যেন পরিষ্কার করাইয়া রাখে, মনু মাসীকে সেই ঘরে রাখিব। যদি সম্ভব হয় একজন ভাল ডাক্তারের সহিত পূর্বেই এনগেজমেণ্ট করিয়া রাখিও। আমরা দশটা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছিব। তিনি যদি বারোটা নাগাদ আসিয়া পড়েন সেই-দিনই চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। লিলিকে আমি আলাদা পত্র দিয়াছি, তবে সে আমার টানা হাতের লেখা পড়িতে পারিবে কিনা জানি না। তুমি যদি এই পত্র যথাসময়ে পাও, লিলির সহিত দেখা করিও। অভয় মিত্রের আর কোন খবর পাই নাই। অধিক আর কি। ভালবাসা লও। ইতি—

নীলাম্বর

৯

মুঙ্গের
৪-৯-২৮

ভাই সদানন্দ,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যা লিখিয়াছ তাহা যে যদিচ্ছা প্রণোদিত সে সম্বন্ধে আমার

সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার প্রকৃত হিতৈষী একথাও আমি জানি। কিন্তু আমাকে এতদিন দেখিয়াও তুমি আমাকে চেন নাই? আমি যাহা করিব ঠিক করিয়াছি তাহা করিবই। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা খুবই যুক্তি-যুক্ত। মনু মাসীর শ্রাদ্ধে কলিকাতায় যখন একবার কাঙালী ভোজন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে তখন মুঙ্গেরে আবার ও ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দেখ, আমরা অহঙ্কারবশত একটা জিনিস প্রায়ই ভুলিয়া যাই এবং আমরা নিজেদের নিক্তিতেই সকলকে ওজন করি। যিনি নিজে চরিত্রহীন তিনি সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন, যিনি নিজে চরিত্রবান তিনি সকলকেই সাধু মনে করেন। যে দরিদ্র সে ভাবে মোটরের প্রয়োজন কি? যিনি মোটর-বিহারী তিনি বলেন অনর্থক হাঁটিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? নিজের মোটর কিনিবার যদি সামর্থ্য না থাকে ট্রামে চড়। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের শ্যামদা হাঁটিতেই ভালবাসিতেন। শ্যামবাজার হইতে বালিগঞ্জ পর্যন্ত তিনি হাঁটিয়াই যাইতেন অর্থাভাবে নয়, মনের আনন্দে। তুমি যেটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছ, আমার নিকট তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানকার দীন-দুঃখীদের খাওয়াইয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব। মনু মাসীর আত্মা যদি কোথাও বাঁচিয়া থাকেন তিনিও তৃপ্তিলাভ করিবেন। হাজার দুই তিন টাকা কি ইহার চেয়ে বেশি মূল্যবান? তা ছাড়া অতগুলি টাকা তো মনু মাসীর জন্যই পাইয়াছি একথা ভুলিয়া যাওয়া কি উচিত? তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া চেকটি ভাঙাইয়া যে সব জিনিস আমি কিনিয়া পাঠাইতে বলিয়াছি—বিশেষ করিয়া ভীম নাগের সন্দেশ ও নবীন ময়রার রসগোল্লা—প্রচুর পরিমাণে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। পাঁচশতের বেশি লোক হইবে না। পাঁচশত লোককে খাওয়াইতে (মানে, ভাল করিয়া খাওয়াইতে) যত লাগে ততই পাঠাইবে। আরও টাকার যদি প্রয়োজন মনে কর লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

আর একটি কথা, তুমি কলেজ স্ট্রীটের উপর সেই বাড়িটি যেন হাতছাড়া করিও না। বৌবাজারে যদি তেমন সুবিধা মতন বাড়ি না পাওয়া যায় ওইখানেই দোকান খুলিব। আর একটা অপব্যয় করিব ঠিক করিয়াছি। অভয় মিত্রের যাহাতে জেল না হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অমন একটি গুণী লোককে জেলে পুরিয়া বেরসিক অপবাদ লইতে চাই না! তাহার ছেলেকে আমি চিঠি লিখিয়াছি টাকা দিয়া যতটা সাহায্য করা সম্ভব আমি করিব। সে যেন ভাল উকিল নিযুক্ত করে।

লিলির সম্বন্ধে তুমি যে সন্দেহ করিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব। তোমার অফিসের কাজ কেমন চলিতেছে? তোমাকে আমি যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহা আর একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিও। আমি দোকানের অর্ধেক শেয়ার তোমাকে দিতে রাজী আছি তুমি যদি দোকানটির দেখা-শোনা কর। চাকরিতে যাহা পাইতেছ তদপেক্ষা বেশি পাইবে সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখিও। ভালবাসা লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১০

মুঙ্গের
২১-১০-২৮

ভাই সদানন্দ,

তোমার প্রেরিত মিষ্টান্নগুলি যথাসময়ে ভালভাবে পৌঁছিয়াছিল। ভোজও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তুমি কোনও পত্র লিখিতেছ না কেন? ক্রমাগত তোমার পত্রের অপেক্ষা করিয়া শেষে নিজেই লিখিতে বসিলাম। বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মনে বিবিধ রকম জিলিপী পাক খাইতেছে এবং তুমি দার্শনিক হাসি হাসিতে হাসিতে ভাবিতেছ, "আমি আগেই জানিতাম এই রকম একটা কিছু ঘটিবেই।"

সুতরাং তোমাকে সমস্ত কথা খুলিয়াই লিখিতেছি। তোমার নিকট আজ পর্যন্ত কিছুই গোপন করি নাই, ইহাও করিব না। মনু মাসীর মৃত্যুর মাস খানেক পরেই আমি লিলিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিলে সত্য কথাটা আরও স্পষ্ট হয়। হ্যাঁ বাধ্যই হইয়াছি।

তোমার চরিত্রের যে অংশটুকু মরাল লেকচার দিবার জন্য সদা সর্বদা উদ্যত হইয়া থাকে তাহার নিকট জবাবদিহি করিবার কোনও প্রয়োজন আমার দিকে হইতে নাই। তবুও আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি এই কারণে যে, যদি তাহা শুনিয়া সেই অংশটুকুর কোনও উপকার হয়, যদি তাহা অমানুষিক স্তর হইতে নামিয়া আসিয়া মানুষের দৃষ্টিতে মানবসুলভ দুর্বলতাগুলি বিচার করিবার মতো সহৃদয়তা লাভ করে।

একটা কথা ভুলিয়া যাইও না যে আমি স্বাভাবিক মানুষ। অমানুষ বা অতিমানুষের মাপকাঠি দিয়া যদি আমার আচরণ মাপিতে যাও তোমার অঙ্ক ভুল হইয়া যাইবে এবং সে ভুলের জন্য দায়ী তুমি, আমি নই। পুরাণকারেরা দেবতাদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে মানবীয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরদের বারম্বার তপোভঙ্গ হয়। তোমার নৈতিক আদর্শ শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নয়, তাহা হাস্যকর, তাহা অসম্ভব, তাহা অস্বাভাবিক। সে আদর্শ মানুষকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছে, জলকে লক্ষ্য করিয়া তাহা যদি বলিত তাহা হইলে এই রকম শুনাইত, "হে জল, তুমি গড়াইও না, তুমি যে পাত্রে থাকিবে সে পাত্রের আকার ধারণ করিও না, তোমার মধ্যে ভগবৎ প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন না প্রতিফলিত হয়। রৌদ্রে তুমি উত্তপ্ত হও কেন? বায়ু তোমাকে তরঙ্গাকুল করে কেন? তুমি স্থির, ধীর অচঞ্চল হও।" তোমাদের এই উপদেশ শুনিয়া জল বেচারা যদি জমিয়া বরফ হইয়া যায় তাহা হইলেও তোমরা খুশি হইবে না, কারণ বরফ অবস্থাতেও সে তোমাদের উপদেশ ষোল আনা মানিতে পারিবে না। তোমাদের উপদেশ কেহ ষোল আনা মানিতে পারে না বলিয়াই তোমাদেরও কেহ মানে না। কারণ তোমরা অকবি, তোমরা বেরসিক। প্লেটো তাঁহার কল্পরাজ্য হইতে কবিদের বাদ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কল্প, বাস্তব কোনও রাজ্য হইতেই কবিরা বাদ পড়েন নাই, বাদ পড়িয়া গিয়াছেন প্লেটো নিজে! পরীক্ষার্থী ছাড়া প্লেটো কেহ পড়ে না, অবশ্য দুই একজন বাতিকগ্রস্ত 'পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা সবই পড়েন। শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের চাহিদা কিন্তু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। তাঁহারা চিরকাল মানব-মানবীর হৃদয় লোকে বিরাজ করিবেন, প্লেটোরা বিরাজ করিবেন শেল্‌ফে। কবিরা কখনও মানুষকে দুমড়াইয়া কোনও একটা বিশেষ নীতি বা

ইজমের ছাঁচে পুরিতে চেষ্টা করেন না, কারণ তাঁহারা যে জীবন-রসিক। সন্ধ্যার মেঘে বর্ণ-লীলা দেখিবার সময় তাঁহারা যেমন চিন্তা করেন না যে বর্ণগুলি কোন্ জাতের, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাদের পরিচয় কি, তেমনি প্রণয়-ব্যাপারেও তাঁহারা মাথা ঘামান না যে উহা বৈধ না অবৈধ, বিশেষ একটি সমাজে বিশেষ নিয়মাবলীর মধ্যে উহা খাপ খাইবে কি না। তাঁহাদের কাছে সত্য-অসত্য শিব-অশিব সুন্দর-অসুন্দরের যে প্রভেদ তাহা কোন বিশেষ সমাজের বিশেষ নীতির নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট নয়। তাঁহারা তাহার নির্দেশ পান বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্য হইতেই। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অলঙ্কৃত মানব জীবনই তাঁহাদের দেবতা, তাঁহাদের নিয়ামক। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—একমাত্র কবিই একথা বলিতে পারেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাগীশদের মতো তাই তাঁহারা ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাক সিঁটকাইয়া বা নাকে কাপড় দিয়া পথ চলেন না। জীবন-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া জীবনকে তাঁহারা উপভোগ করেন। সমাজ বা সমাজের নিয়ম সীমাবদ্ধ, জীবন কিন্তু অনন্ত সম্ভাবনাময়। কবিরা সমাজে বাস করেন বটে, কিন্তু উপাসনা করেন জীবনের। আমি যদিও উল্লেখযোগ্য কোনও কাব্য রচনা করি নাই কিন্তু মনে-প্রাণে আমি কবি। তুমি অক্ষর গুনিয়া গুনিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছ (এখনও লেখ কি-না জানি না) কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া মনে হয় তুমি অকবি। অতিশয় বেরসিক লোক তুমি। কাটখোট্টা নও, কারণ কাটখোট্টাদেরও একটা জীবনাবেগ আছে, তাহা রুদ্র রুক্ষ, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। তুমি মোমবাতির মতো। কেহ যদি তোমাকে দয়া করিয়া জ্বালিয়া দেয়, আইনত যতটুকু জ্বলিবার ততটুকু জ্বলিয়া অবশেষে তুমি নিবিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র খদ্যোতেরও যে স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি আছে তোমার তাহা নাই। মরালিটির সঙ্কীর্ণ দাঁড়ে বসিয়া তুমি কতগুলি বাঁধা বুলি কপচাইতেছ মাত্র। সত্যই তোমার জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। ভাই সদানন্দ, এখনও সময় আছে, এখনও ত্রিশের কোঠায় বয়স আছে, এখন ফিরিতে পার।

লিলির সহিত আমার যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মানসিক দুর্বলতাবশতই ঘটিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিব, ওই দুর্বলতাটুকুর জন্যই মানব-জীবন সুন্দর, দুর্বলতাটুকু আমার মধ্যে ছিল বলিয়াই আমি লিলিকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

.. যেদিন ঘটনাটা ঘটিয়া গেল সেদিন সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অদ্ভুত ঘটনাও ঘটিল। মনে হইল, মনু মাসীর সেই কথাগুলি আবার যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "দেখো বাবা, মেয়েটির যেন কোন অসম্মান না হয়, দারিদ্র্যের জন্য যেন তার মাথা হেঁট না হয়।" আমার কানের কাছে মনু মাসী নিজে যেন কথাগুলি বলিয়া গেলেন।

...সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। লিলিকে একটা কাগজে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কিনা। লিলিও লিখিয়া উত্তর দিল, আপনার যাহা খুশি করুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। সেই মূক ও বধিরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিন্তু আমি আরও স্পষ্টতর উত্তর পাইলাম তাহা দ্ব্যর্থক নয়।

পরদিন আমি আইনত রেজেস্ট্রি করিয়া লিলিকে বিবাহ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, তোমাকেও এ বিবাহের সাক্ষী করি, কিন্তু তোমার মতিগতি দেখিয়া সে বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলাম। এ বিবাহে সাক্ষী হইয়াছে মহেশ, চুনীর দাদা। তাহার সহিত দিল্লিতে দেখা হইয়াছিল, আবার কলিকাতাতেও দেখা হইয়া গেল। তাঁহারই সাহায্যে শুভকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং এখন লিলিকে ঘৃণার বা কৃপার চক্ষে দেখিবার কোনও অজুহাতই তোমার থাকা উচিত নয়, কারণ আইনত সে এখন আমার বিবাহিতা পত্নী। লিলির আচরণে যাহা লক্ষ্য করিয়া তুমি সন্দিগ্ধচিত্তে শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলে তাহা আশা করি এখন তোমাকে আনন্দিত করিবে। আমিই আমার পত্নীকে গহনা, কাপড় এবং প্রসাধন সামগ্রী কিনিয়া দিয়া আসিয়াছি। উহা তাহার নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ নয়।

দোকান ঘরটির সম্বন্ধে কি স্থির করলে? মল্লিক মহাশয় বৌবাজারের যে ঘরটির কথা বলিয়াছিলেন সেটি সম্বন্ধে আর কিছু শুনিয়াছ কি? যদি না শুনিয়া থাক তাহা হইলে কলেজ স্ট্রীটের ঘরটাই ভাড়া করিয়া ফেল। কলিকাতাতে গিয়াই নব-জীবন আরম্ভ করা যাক! আমার ইচ্ছা তুমি চাকরিটা ছাড়িয়া দাও, আমার দোকানের অংশীদার হও। টাকা-পয়সা কিছুই তোমাকে দিতে হইবে না, তুমি দোকানটি চালাইবে এবং বিনিময়ে অর্ধেক লাভ পাইবে। রাজী হইয়া যাও। আমি এখানকার ব্যাপারটা মিটাইয়া যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতা যাইব। মনু মাসী এখানকার বাড়িটাও আমাকেই দিয়া গিয়াছেন। একজন খরিদ্দার জুটিয়াছে, বাড়িখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিব ঠিক করিয়াছি। হাজার কুড়ি টাকা ব্যাঙ্কে থাকিলে আমার ঢের বেশী সুবিধা হইবে, কি বল?

অবিলম্বে উত্তর দিও। ভালোবাসা লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

পুনশ্চ। অভয় মিত্র ছাড়া পাইয়াছে।

১১

মুঙ্গের
১৭-১১-২৮

ভাই সদানন্দ,

তুমি যাহা লিখিয়াছ সাধারণ যে কোনও লোক তাহাতে দমিয়া যাইত কিন্তু আমি দমিবার পাত্র নই। কলিকাতায় আমাদের পরিচিত সমাজ যদি লিলিকে সম্মানের আসন দিতে সম্মত না হয় তা হইলে সে সমাজ আমি ত্যাগ করিব। প্রয়োজন হইলে কলিকাতাই ত্যাগ করিব। পৃথিবীতে কলিকাতা ছাড়া আরও শহর আছে। কলিকাতা ত্যাগই করিতে হইবে। কারণ কোনও স্থানে পরিচিত ব্যক্তিদের উপহাস বা উপদেশের লক্ষ্যস্থল হইয়া বাস করা শক্ত; আমি হয়তো গা বাঁচাইয়া চলিতে পারিব, কিন্তু লিলি পারিবে না। লোকে বাড়ি বহিয়া আসিয়া তাহাকে অপমান করিয়া যাইবে। সুতরাং কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। মুঙ্গেরে হয়তো থাকিতে পারিতাম, কিন্তু বাড়িটি বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। তা ছাড়া, এখানেও উপহাসদক্ষ উপদেষ্টার অভাব নাই। এমন স্থানে বাস করিতে হইবে যেখানে কেহ আমাদের চেনে না। তুমি সুভাষিণী নাম্নী যে মেয়েটি আমার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলে লিলিকে বিবাহ না করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে আমি বিবাহ করিতাম। তুমি হয়তো মনে করিতেছ যে, মেয়েটির রং কালো এবং তাহার বাবা গরীব বলিয়া আমি এড়াইয়া গেলাম। বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে আমি সচেষ্ট হইয়া কিছুই করি না। আমাকে কেন্দ্র করিয়া যাহা ঘটিবার তাহা আপনিই ঘটিয়া যায়। কেন

ঘটে, ঘটা উচিত কি-না—এসব লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি অপারগ। রূপ ক্ষণিকের এবং বংশমর্যাদাই যে নির্ভরযোগ্য জিনিস ইহা লইয়া তুমি অনেক কথা লিখিয়াছ। আমি একটি কথারও প্রতিবাদ করিতেছি না, কারণ প্রত্যেকটি কথা সত্য। কিন্তু সত্যকে পাইতে হইলে যে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথের পথিক হইতে হয় সে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথে আমি চলিতে শিখি নাই। রূপ ক্ষণিকের, ইহা জানিয়াও আমি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই, বংশমর্যাদা নির্ভরযোগ্য জিনিস, ইহা মানিয়াও সব সময় তাহাকে মর্যাদা দিতে পারি না। তোমাকে শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, লিলির সহিত জড়াইয়া না পড়িলে নিশ্চয় আমি তোমার মনোনীতা পাত্রী সুভাষিণীকেই বিবাহ করিতাম। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের দীনতা বাধা সৃষ্টি করিতে পারিত না, তাহাদের বংশমর্যাদাই যে বিশেষভাবে আমাকে আকৃষ্ট করিত তাহাও নয়। তাহাকে বিবাহ করিতাম তোমার অনুরোধে। যাক, এখন ওসব লইয়া আর মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই।

চাক্‌রির স্বপক্ষে তুমি যে যুক্তিগুলি দিয়াছ, তাহা বেশ ভালই লাগিল। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ। চাকরিতে একটি বা বড় জোর, দুইটি মনিবকে খুশি রাখিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। ব্যবসায়ীকে বহু লোকের মনে রাখিতে হয়। চাকরিতে দশটা-পাঁচটা অফিস করিয়া বাকী সময়টুকুও যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। দোকান করিলে সব সময়ে দোকানে বসিয়া থাকিতে হইবে। ছুটিও নাই। ছুটি লইলে নিজেরই ক্ষতি। তুমি সাবধানী লোক, তোমার যুক্তিগুলি তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। খাঁচার পাখিরাও বোধ হয় ওই ভাবেই চিন্তা করে। তা ছাড়া, এখন তো সবই গোলমাল হইয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আমি যে এখন কোথায় যাইব তাহারও স্থিরতা নাই। সুতরাং জুয়েলারি দোকান করিয়া বড়লোক হইবার বাসনা আপাতত ত্যাগ করিলাম। তুমিও ত্যাগ কর। কোথাও একটা আস্তানা ঠিক করিতে পারিলে লিলিকে গিয়া লইয়া আসিব। আপাতত সে যেমন আছে থাক। তোমার দূরদর্শিতা ও সাবধানতা, তোমার নৈতিক নিক্তি এবং সারবান যুক্তি, হয়তো তোমার নৌকাটিকে সর্ববিধ ঝড়ঝাপটা হইতে বাঁচাইয়া একদিন কোনও নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, অদূরদর্শিতা অসাবধানতা যথেচ্ছ-নীতি এবং অসার যুক্তি জীবনকে যে বিচিত্র স্বাদ দান করে সে স্বাদ হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার জীবন জ্যামিতির ছবির ন্যায় প্রাণহীন, কিন্তু আমার জীবন নদীর মতো বেগবান। তাহাতে হয়তো আবিলতা আছে কিন্তু তাহা জীবন্ত। তুমি বন্দরে পৌঁছিবে, আমি পৌঁছিব সাগরে।

আর হয়তো তোমার সহিত দেখা হইবে না। তবে যেখানেই থাকি মাঝে মাঝে চিঠি লিখিব। ভালবাসা লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১২

পাটনা
৫-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

বহুদিন পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। লিলিকে লইয়া যেদিন কলিকাতা ত্যাগ করি সেদিন

ইচ্ছা করিয়াই তোমার সহিত দেখা করিয়া আসি নাই। দেখা হইলেই তর্ক হইত এবং তর্ক তিক্ততার সৃষ্টি করিত। তুমিও বদলাইতে না, আমিও পথ বদলাইতাম না। নূতন করিয়া সংসার পাতিবার মুখে বন্ধুর সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। আমি এখন কোথায় আছি জান? অভয় মিত্রের বাড়িতে। পাটনা শহরেও মিত্র মহাশয় একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমিই খরচ পত্র করিয়া তাঁহাকে জেল হইতে বাঁচাইয়াছিলাম। এ ধরনের কাজ আমার পক্ষে নূতন নয়। পরোপকার করিবার জন্য নয়, খেয়ালের বশবর্তী হইয়া অনেকবার আমি এবম্বিধ কার্য করিয়াছি। কিন্তু মিত্র মহাশয় যাহা করিলেন তাহা আরও অভিনব। তিনি বোধ হয় এ ধরনের কাজ জীবনে আর কখনও করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আমাকে কেন আপনি রক্ষা করলেন। আমি পাপী, আমি বিশ্বাসঘাতক, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত।" একটা নূতন ধরনের মুশকিলে পড়িয়া আমি বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। শেষে একটা কথা বলাতে ভদ্রলোক কতকটা যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলাম, "দেখুন পদস্খলন সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। ফলে কলকাতার বাস উঠিয়ে দিতে হচ্ছে। মুঙ্গেরেও থাকা যাবে না।" অভয় মিত্র বলিলেন, "আমার পাটনার বাড়িটা খালি পড়ে আছে, আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন না। ও তো আপনারই বাড়ি।"

তাহার পর হইতে মিত্র মহাশয়ের সহিত বেশ মাখামাখি হইয়াছে। লোকটিকে ক্রমশ ভাল লাগিতেছে। ফলে কাশীতেই পুনরায় জুয়েলারি দোকানটি স্থাপিত করিয়া ওই অভয় মিত্রকেই তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছি।

মোটামুটি এই আমার সংবাদ। তুমি আশা করি সুবোধ বালকের মতো কর্তব্যপথে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতেছ। ইতিমধ্যে কোনো বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছ কি? হ্যাঁ, তোমাকে আর একটি সুসংবাদ দিতেছি। তোমার কাছে ইহা দুঃসংবাদ বলিয়া মনে হইবে কি না জানি না। আমার একটি মেয়ে হইয়াছে। লিলি তাহার নাম রাখিয়াছে হাসি। লিলি এখনও কথা বলিতে পারে না। লিখিয়াই আমাদের কথাবার্তা হয়। বেশ একটা নূতন ধরনের দাম্পত্য-জীবন যাপন করিতেছি। আশা করি সব কুশল। তোমার বাবা কেমন আছেন? আমার ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৩

পাটনা
১১-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার কথা যে প্রায়ই তোমার মনে হয় এই সংবাদে সত্যই বলিতেছি আমার মনের একটি নীরব তন্ত্র যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তুমিও বিবাহ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার ঠিকানা জানা থাকিলে আমাকে যে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে একথা তোমার লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমি তাহা জানি। কিন্তু তুমি

নিমন্ত্রণ করিলেও আমি যাইতাম না। আমি সামাজিক জীব নই, সমাজের কোথাও আমি ঠিক খাপ খাই না, সেই জন্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম হইতে যথাসম্ভব দূরে সরিয়া থাকি। আমার মতো লোকের হোটেলে বাস করাই উচিত। যদিও বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার যোগ্যতা আমার নাই। লিলির সম্বন্ধে তুমি যেসব প্রশ্ন করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। লিলিকে আমি ভালবাসি কি না, তাহাও ঠিক জানি না। কারণ রোমান্টিক ভালবাসার স্বাদই আমি কখনও পাই নাই। কাব্যে তাহার যে সব লক্ষণ পড়িয়াছি তাহার সহিত আমার মনের অবস্থা একটুও মেলে না। এইটুকু শুধু বলিতে পারি, লিলিকে খারাপ লাগে না খুব! ও যদি কথা বলিতে পারিত তাহা হইলে হয়তো আর একটু ভাল লাগিত। অনেকদিন আগে আমি জিমি নামে একটি কুকুর পুষিয়াছিলাম। মনে আছে তোমার? জিমির সম্বন্ধেও আমার ঠিক এই কথাই মনে হইত। ভাবিতাম, আহা জিমি যদি কথা বলিতে পারিত, কি চমৎকারই না হইত! লিলির সহিত জিমির তুলনা করিলাম ইহাতে হয়তো তুমি চটিবে। কিন্তু সত্য বলিতেছি, লিলিকে দেখিয়া আমার জিমির কথা মনে পড়ে। জিমি যেমন আমাকে ভালবাসিত লিলিও তেমনি ভালবাসে। কিন্তু তাহা রোমান্টিক প্রণয় নয়, আদর্শ পতিভক্তিও নয়, তাহা কেমন যেন একটা অন্ধ কৃতজ্ঞতা। লিলিকে তাহার অতীত জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সে কোনও উত্তর দিতে চায় না। একদিন লিখিয়াছিল—যাহা আমি সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া যাইতে চাই তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এ অনুরোধ আমাকে করিও না। আমিও আর অনুরোধ করি নাই। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি। লিলি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, উঠিয়া দেখিলাম কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিল। তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলাম ক্রন্দনের হেতুটা কি, কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। তাহার হাঁটুটা ফুলিয়াছে, হয়তো তাহারই যন্ত্রণায় কাঁদিতেছিল একজন ডাক্তার ডাকাইয়া দেখাইয়াছি! লিলি ডাক্তারকে হাঁটু দেখাইতেও আপত্তি করিতেছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি আমি শুনি নাই। লিলির সম্পর্কে একটা জিনিস আমাকে বড়ই বিব্রত করিতেছে। সে আমাকে অত্যন্ত বেশি সমীহ করিয়া চলে। তাহার কুণ্ঠা আমি কিছুতেই ঘুচাইতে পারি না। সর্বদা সে যেন কৃতজ্ঞতার ভারে নুইয়া আছে। মনে হয়, আমাকেও ভয় করে। সুতরাং সে আমার গৃহিণী, সচিব বা সখি কোনটাই হইতে পারে নাই। তবে একটা জিনিস হইতে পারিয়াছে—জননী। হাসিকে লইয়া তাহার অধিকাংশ সময় কাটে, আমাকে লইয়া নয়। হাসি দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। চোখ দুইটি তো অবিকল মায়ের মতো। তুমি লিখিয়াছ, তোমার বউ গহনা-কাপড় সমন্বিতা জীবন্ত 'ডামি' বিশেষ। ওই 'ডামি' যখন mummy হইবে তখন দেখিবে তাহার আলাদা রূপ খুলিয়াছে! লিলির মাতৃমূর্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি! ম্যাডোনার সেই ছবিটা মনে পড়িয়া যায়। আড়ালে ছবিটা দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, আমাকে দেখিলেই লিলি কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কেন বল দেখি? তোমাব ভগিনীটি বিধবা হইয়া তোমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে লিখিয়াছ। ভাগিনেয়ীটি কি বিবাহযোগ্য? ভাগিনেয়টি কত বড়? কোন্ ক্লাসে পড়ে? তোমার আয় পরিমিত, ব্যয়ের মাত্রা যদি একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যায় মুশকিলে তো পড়িবেই। আমি তোমাকে এই সঙ্গে হাজার টাকার একটি চেক্ পাঠাইলাম। দিবার সঙ্গতি আছে বলিয়াই পাঠাইতেছি। ইহা লওয়া

না লওয়া তোমার ইচ্ছাধীন। সুদীর্ঘ মরাল লেক্‌চার দিয়া যদি ইহা ফেরত দাও বিস্মিত হইব না। শুধু অনিবার্য ভাবে একটি কথা মনে হইবে—আমি তোমার পর হইয়া গিয়াছি। আশা করি ভাল আছ। আমার ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৪

পাটনা
১৯-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

আমার এই পত্র পাইয়া তুমি হয়তো আবার একটি দার্শনিক হাসি হাসিবার সুযোগ পাইবে। মনে মনে হয়তো বলিবেও, অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করিবার ফল এইবার ফলিতেছে। লিলির হাঁটু ফুলিতেছে এ সংবাদ তোমাকে পূর্বেই দিয়াছি। সাধারণ ঔষধে ব্যাধির উপশম না হওয়াতে ডাক্তারবাবু তাহার রক্ত পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন আসিয়া খবর দিলেন যে রক্তে সিফিলিসের বিষ পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমারও রক্ত লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার রক্তে কিছু পাওয়া যায় নাই। ডাক্তারবাবুর সন্দেহ, লিলির পিতৃ বা মাতৃকুল হইতে হয়তো রক্তে এই বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে। ব্যাপারটা জটিল ঠেকিতেছে। তোমাকে এসব সংবাদ জানাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কেবল বন্ধু হিসাবে তোমাকে আনন্দের কিছু উপকরণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সব লিখিতেছি। আশা করিতেছি, সংবাদটা পাইয়া তুমি বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। বহুকাল পূর্বে একজন ডাক্তার-বন্ধুকে এই জাতীয় আনন্দে উল্লসিত হইতে দেখিয়াছিলাম। আমরা বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম, এমন সময় একটি মৃত্যুসংবাদ আসিল। ডাক্তারবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "মারা গেছে! সত্যি? আমার ডায়াগনোসিস ঠিক হয়েছে তা হলে! রমেশ ডাক্তার বলেছিল বেঁচে যাবে। মারা গেছে? সত্যি বলছ?" তোমার ডায়াগনোসিসও সফল হইয়াছে। ন্যায়ত তুমি আনন্দ করিতে পার তবে আনন্দের আতিশয্যে একথা যেন মনে করিও না যে, আমি দুঃখিত অন্তঃকরণে অনুতাপ করিতেছি। জীবনটা আমার নিকট খেলা মাত্র! একটানা একটা খেলাও নয়, বহু খেলার সমষ্টি। ক্রিকেট খেলায় অনেকবার আউট হইয়াছি, অনেকবার আউট করিয়াছিও, কোন্‌টা কতবার করিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই, সব মনেও নাই। লিলির ব্যাপারটাও অনুরূপ একটা খেলা মাত্র। তুমি বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, কিন্তু ভারী মজা লাগিতেছে। মনে হইতেছে যেন অদৃশ্য কোনও 'বোলার' আমাকে আউট করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে এবং আমি ক্রমাগত তাহাকে ঠেকাইয়া চলিয়াছি। 'রান'ও করিয়াছি মন্দ নয়। তোমার মত হিসাবী হইলে হয়তো সংখ্যাও বলিয়া দিতে পারিতাম।

ডাক্তারবাবু আগামী কল্য হইতে লিলির চিকিৎসা শুরু করিবেন। তিনি বলিলেন, ভবিষ্যতে হাসিরও রক্ত পরীক্ষা করিতে হইবে, আপাতত ভয়ের কোন কারণ নাই।

আমার শরীর ভাল আছে। অভয় মিত্র এবার সার্থকনামা হইয়া উঠিতেছেন মনে হইতেছে। দোকানে বেশ লাভ হইতেছে। বেশ একটা মোটা অঙ্কের চেক্ পাঠাইয়াছেন।

তুমি কেমন আছ? তোমার মতো হিসাবী লোক খারাপ থাকিতে পারে না, তোমার সম্বন্ধে এ ধারণা আমার নাই। কারণ তোমরা তোমাদের হিসাবের খাতা হইতে এমন অনেক জিনিস বাদ দাও যাহা আকস্মিক ধূমকেতুর মতো আসিয়া সমস্ত হিসাব ওলট পালট করিয়া দিতে পারে। সুতরাং জানাইও কেমন আছ। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৫

পাটনা
২৫-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

এবার সত্যই 'আউট' হইয়া গিয়াছি, আনন্দে হাততালি দিতে পার। লিলি পরশু হঠাৎ অন্তর্ধান করিয়াছে। দৈনন্দিন সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া দেখি হাসি বিছানায় একা ঘুমাইতেছে, লিলি কাছে নাই। এঘর ওঘর ঘুরিয়া দেখিলাম কোথাও নাই। ভাবিলাম হয়তো বাথরুমে গিয়া থাকিবে। ছোঁড়া চাকরটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। সে বলিল একজন কাবুলিওয়ালার সহিত মাঈজী বাহিরে গিয়াছেন। সে আরও বলিল, কাবুলিওলাকে দেখিয়া মাঈজী কেমন যেন অবাক হইয়া গিয়াছেন! ইহার বেশি সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। আমি অনেকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পরে হঠাৎ লিলির চিঠিটা দেখিতে পাইলাম। সে বড় বড় অক্ষরে যাহা লিখিয়া গিয়াছে তাহা এই। 'ট্রুকপি' পাঠাইতেছি।

শ্রীচরণেষু,

আমি চলিলাম। জীবনে আর কখনও দেখা হইবে না। আমি একটা কথা তোমার নিকট গোপন করিয়াছিলাম, বাধ্য হইয়াই করিয়াছিলাম। আমি যে বিবাহিতা সে কথা তোমাকে বলি নাই। আমার ধারণা ছিল আমার স্বামীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, কারণ একটি সাহেবকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন। আমার স্বামীর ভাই একটি দুরাত্মা। সে আমাকে বিক্রয় করিবার জন্য কুম্ভমেলায় লইয়া আসিয়াছিল। সেই সময় আমি কয়েকটি গুণ্ডার পাল্লায় পড়ি। তুমি ও সদানন্দবাবু আমাকে গুণ্ডাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলে। তাহার পর হইতে সমস্ত ঘটনা তুমি জান। আমার স্বামী অপ্রত্যাশিতভাবে ছাড়া পাইয়া গিয়াছেন এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়াছেন। কি করিয়া তিনি এখানে আমার সন্ধান পাইলেন তাহা জানি না। তিনি কেবল বলিলেন, গত ছয় মাস হইতে তিনি আমাকে প্রতি শহরে শহরে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। আমার সহিত যে তোমার বিবাহ হইয়াছে একথা তাঁহাকে বলি নাই। আমি তোমার নিকট তোমার স্ত্রীর চাকরানী হইয়া আছি এই কথাই তাঁহাকে বলিয়াছি। তোমার নিকট যেমন ভয়ে সত্য গোপন করিয়াছিলাম, রহমনের নিকটও তেমনি ভয়ে সত্য গোপন করিয়াছি। আমরা অসহায়, আমরা ভীতু, সত্যপথে চলিবার সাহস আমাদের নাই। আমাকে ক্ষমা করিও। রহমন যদি তোমার কাছে কখনও আসে আমাকে রক্ষা করিও। সে বড়

বদমেজাজী লোক, হয়তো আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে। হাসিকে ছাড়িয়া যাইতে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব উপায় নাই। ইতি—

লিলি

চিঠিখানি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। চমক ভাঙিল হাসির কান্নায়। উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, দমিলে চলিবে না। তৎক্ষণাৎ দুধ ও ফিডিং বট্‌ল কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়া গেলাম। কিছুতেই ফিডিং বট্‌ল্ ধরিতে চায় না, মহা মুশকিলে পড়িয়াছি। কি করি বল তো? মনে করিতেছি, কাল হইতে একটি ওয়েট নার্স নিযুক্ত করিব। কিন্তু 'ওয়েট' মানেই পিছল। আবার না পা হড়কাইয়া যায়!

হ্যাঁ, কাল সকালে রহমন আসিয়াছিল। বেশ বলিষ্ঠ কাবুলী একটি। আসিয়া কি বলিল জান? বলিল, তাহার বিবির তিন মাসের মাহিনা বাকী আছে, পাওনাটা আমি মিটাইয়া দিলে সে দেশে চলিয়া যাইতে পারে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমি তাহাকে একশত টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া দিলাম। বলিলাম, উহার মধ্যে বকশিশও আছে। রহমান সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আমি এখন কি করি বল তো? একটু পরেই ডাক্তার ইনজেক্‌শন দিতে আসিবে, তাহাকেই বা কি বলিব? তা ছাড়া, চাকর-চাকরানীর কাছেই বা মানসম্ভ্রম রক্ষা করিব কিরূপে? এ ধরনের মানসম্ভ্রমের যদিও বিশেষ কোনও মূল্য নাই কিন্তু চল্‌তি নোটের মতো এগুলির বাজার-দর আছে, পকেটে না থাকিলে জীবনযাত্রাই অচল হইয়া যায়।

যদি বেগতিক বুঝি, হাসিকে তোমাদের কাছে রাখিয়া আসিব। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে একবার কাশীও যাইতে হইবে। ভাবিতেছি কলিকাতা হইয়া হাসিকে তোমাদের কাছে রাখিয়া কাশী যাইব। তোমার ইহাতে যদি আপত্তি তাকে অবিলম্বে জানাইবে। তোমার নিকট হইতে নিষেধাত্মক কোন পত্র বা টেলিগ্রাম না আসিলে আমি হাসিকে লইয়া রওনা হইয়া যাইব। আশা করি তুমি ভাল আছে। আমার ভালবাস লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৬

কাশীধাম
৩০-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

শ্রীযুক্ত অভয় মিত্রের বাসায় বসিয়া তোমাকে পত্র লিখিতেছি। একটা অদ্ভুত প্রেরণার বশবর্তী হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম। হাসির জন্য মন কেমন করিতেছে। যদিও জানি, তুমি তোমার স্ত্রী, তোমার মা, তোমার বোন, তোমার ভাগনী সকলেই সর্বান্তঃকরণে হাসির যে যত্ন করিবে তাহা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তবু অস্থির হইতেছি। যদিও তাহাকে কোলে লইতে গিয়া প্রতিবারই একটা না একটা বিপদ হইয়াছে, তবু কি আশ্চর্য, তাহাকে বার বার কোলে লইতে ইচ্ছা করিতেছে। হাসির ভার তোমার উপরে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত-চিত্তে কাশীবাস করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু এখন দেখিতেছি বাবা বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। আমি আজই হয়তো

কলিকাতা রওনা হইয়া যাইতাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত অভয় মিত্রের অনুরোধে আমাকে আরও দিন তিনেক এখানে অবস্থান করিতে হইবে। তিন দিন পরে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে মন সরিতেছে না। ৪ঠা জানুয়ারি আমি এখান হইতে রওনা হইয়া ৫ই সকালে কলিকাতা পৌঁছিব। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যে কি করিব তাহা অবশ্য ঠিক করিতে পারি নাই। একটা জিনিস কেবল বুঝিতে পারিতেছি—হাসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তাহাকে আমার নিজের কাছেই রাখিতে হইবে। শুধু যে আমার মন কেমন করার জন্যই কথাটা বলিতেছি তাহা নয়, ইহার একটা অন্য দিকও আছে। হাসি যদি তোমার বাড়িতে মানুষ হয়, ভবিষ্যতে তাহার একটা মানসিক বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া আমি ভীত হইতেছি। একটু জ্ঞান হইলেই সে বুঝিতে পারিবে যে সে পরের ঘরে মানুষ হইতেছে। তোমরা যে তাহার রক্ত-সম্পর্কিত নও একথাও ক্রমশ তাহার নিকট প্রকট হইয়া পড়িবে। স্বভাবতই তাহার মনে তখন প্রশ্ন জাগিবে, আমার বাবা এমন করিয়া আমাকে বন্ধুর বাড়িতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন? আমার মা কোথা? এই দুইটি প্রশ্নের যে উত্তর সে পাইবে তাহা ঠিক মতো তাহার মনের সঙ্গে খাপ খাইবে কি না তাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিতেছে। সত্য উত্তর অথবা মিথ্যা উত্তর কোনটা সে এক্ষেত্রে খাটিবে তাহা বলাও শক্ত। তবে একটা জিনিস আমি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার মায়ের সত্য পরিচয় তাহাকে আমি দিব না। আমার বিশ্বাস, এ পরিচয় জানিলে তাহার চরিত্র সুস্থভাবে বিকশিত হইবে না। নিজেকে সে সর্বদাই হেয় মনে করিবে। এ অপমান হইতে যেমন করিয়া পারি তাহাকে আমি রক্ষা করিব। আমার নিজের খেয়াল বা বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহার সু বা কু ফল আমিই বহন করিব। হাসির গায়ে তাহার আঁচটি পর্যন্ত লাগিতে দিব না। আমার এই প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হইবে হাসিকে তোমাদের বাড়ি হইতে স্থানান্তরিত করা। শুধু তোমাদের বাড়ি হইতে নয়, আমার পরিচিত সমাজ হইতেই তাহাকে যথাসম্ভব দূরে রাখিতে হইবে। লিলির কাহিনী এক তুমি ছাড়া আর কেহ জানে না। তোমার বাবাও বোধ হয় ঠিক মতো জানেন না। তুমি তোমার স্ত্রীকে একথা বলিয়াছ কি? যদি বলিয়া থাক তাহা হইলে আরও অধিক লোকের জানিবার সম্ভাবনা। মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া কাহিনীটা শেষ পর্যন্ত কি আকৃতি ধারণ করিবে তা তো কল্পনাতীত। কাহিনী যদি হাসির কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে যাহা হইবে... আর ভাবিতে পারিতেছি না। হাসিকে স্থানান্তরিত করিতেই হইবে। কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে তুমি একটু ভাবিয়া রাখিও, এ সব বিষয়ে তোমার মাথা খেলে ভাল। সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা করিব। ভালবাসা জানিবে। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই নীলাম্বর

১৭

কাশীধাম

৭-১-৩০

ভাই সদানন্দ,

হাসিকে ছাড়িয়া আসিতে খুবই কষ্ট হইয়াছে। তাহার কচি কচি হাত-পা আমার সমস্ত হৃদয়

জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। অভয় মিত্রের টেলিগ্রাম না পাইলে হয়তো আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকিতাম! তিনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনখানি বাড়ির সন্ধান করিয়া ফেলিবেন তাহা আশা করিতে পারি নাই। ভদ্রলোক একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিৎকর্মা। আমি কলিকাতা যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি একটি বাড়ি কিনিতে চাই, একটু খোঁজ রাখিবেন। তিনি যে এত শীঘ্র তিনটি বাড়ির খবর লইয়া আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া বসিবেন তাহা কে জানিত। যে কারণে তিনি জরুরি তার করিয়াছিলেন সে কারণটি অবশ্য খুবই সঙ্গত। একটি বাড়ির সম্বন্ধে অবিলম্বে কথা পাকা করিয়া না ফেলিলে সেটি হাতছাড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। আর একটা খরিদ্দার নাকি ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। বাড়িটি কিনিয়া ফেলিয়াছি। শহর হইতে একটু দূরে... বেশ অনেকখানি হাতা-সুদ্ধ বাড়ি। দশ হাজার টাকায় ঠকা হয় নাই। বাড়িটি আসবাবপত্র দিয়া সাজাইতে আরও হাজার দুই টাকা ব্যয় হইবে। অভয় মিত্র সে সম্বন্ধেও তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন।

সুভাষিণী সম্পর্কে তুমি যে প্রস্তাবটি করিয়াছ তাহা নানা দিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখিলাম। হাসিকে যদি নিজের কাছে রাখিতে চাই তাহা হইলে বাড়িতে আর একটি স্ত্রীলোক না থাকিলে যে চলিবে না সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। আমার দূর সম্পর্কের যে দুই-একটি বিধবা আত্মীয়া আছেন তাঁহাদের আহ্বান করিলে তাঁহারা এখনই হয়তো আসিয়া হাজির হইবেন। কিন্তু তাঁহারা নিষ্ঠাবতী বিধবা, হাসির জন্ম-রহস্য তাঁহাদের নিকট গোপন রাখিয়া তাঁহাদের ধর্মচ্যুত করিতে মন সরিতেছে না। ইহাতে যে ধর্মচ্যুতি ঘটে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহা মনে করি না, কিন্তু তাঁহারা যখন তাহা মনে করেন তখন একথা তাঁহাদের নিকট হইতে গোপন করা অন্যায় হইবে মনে করি। সব কথা খুলিয়া বলিলে আরও অন্যায় হইবে। কারণ, কালক্রমে হাসি তাহা জানিতে পারিবেই। হাসি তাহার জন্ম-রহস্য জানুক ইহা আমি কিছুতেই চাহি না। তা ছাড়া, হাসির সত্য পরিচয় পাইলে উক্ত বিধবারা হয়তো কিছুতেই আসিতে সম্মত হইবেন না, এমন কি, জোর করিলে যে মাসোহারা আমি তাঁহাদের দিয়া থাবি তাহাও হয়তো তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিতে পারেন, এ সম্ভাবনাও আছে। তৃতীয় অসুবিধা একটা বিধবাকে বাড়িতে স্থান দেওয়ার নানা হাঙ্গামাও আছে। সমস্ত বাড়ি জুড়িয়া একটা নিরামিষ আবহাওয়া গজাইয়া উঠিবে। তাহা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত। সুতরাং ও চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। ওয়েট নার্স বা দাই রাখাও নিরাপদ নয়, বিবাহ করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। সুভাষিণীকে বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু—হাঁ, মস্ত বড় একটা "কিন্তু" আছে। সুভাষিণী দেখিতে ভাল নয়, তাহার বাবা অতি দরিদ্র, একটিমাত্র কন্যারও বিবাহ দিতে তিনি অপারগ—অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধে যাহা যাহা তুমি বলিয়াছ সে সব কিন্তু আমার আপত্তির কারণ নয়। সুভাষিণী স্ত্রীলোক বলিয়াই আমি ভীত হইতেছি। সে কি হাসির নিকট সত্য কথাটা গোপন রাখিতে পারিবে? লিলির মতো সুভাষিণীও যদি বোবা হইত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। লেখাপড়া যখন কিছুই শেখে নাই তখন লিখিয়াও কিছু জানাইতে পারিত না। মেয়েদের সর্বাপেক্ষা ভীতিকর অঙ্গ তাহাদের রসনা। কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো তাঁহার পুরুষ-চাকরেরও জিব কাটিয়া লইয়া তবে তাহাকে বাহাল করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার তো তাহা উপায় নাই, বিবাহ করিতে হইলে স-রসনা কোনও নারীকেই বিবাহ করিতে হইবে! সুতরাং কি করিব

এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। আমার দিক হইতে বিচার করিলে সুভাষিণীই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী, কারণ তাহার এক বাবা ছাড়া তিনকুলে আর কেহ নাই। সুভাষিণী এবং সুভাষিণীর বাবা যদি সত্য কথাটা গোপন করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে আমার ভাবনার বিশেষ কোনও কারণ থাকিবে না। সুভাষিণীর বাবা পুরুষ, তাঁহার কথার উপর তবু আস্থা স্থাপন করিতে পারি। কিন্তু সুভাষিণী স্ত্রীলোক, তাহাকে কি বিশ্বাস করা চলিবে? বৃদ্ধ চাণক্য অভিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাঁহার উপদেশ কি অগ্রাহ্য করা উচিত? বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছি ভাই, চিন্তা করিয়া কোনও কূলকিনারা পাইতেছি না। তুমিও আমার হইয়া একটু চিন্তা করিও। আমি এখানকার কাজ সারিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আবার তোমার কাছে যাইতেছি। আমার ভালবাসা নিও। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৮

কাশীধাম
১৭-১-৩০

ভাই সদানন্দ,

তুমি যে চিন্তাশীল লোক তাহা তোমার পত্র পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ যে হাসির জীবনে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন হয় সত্যকথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে কিম্বা একদিন ভদ্রসন্তানের উপর অবিচার করিতে হইবে। ওইটুকু কচি মেয়ে যে একদিন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিবে, তাহার জন্য যে বর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে একথা আমার মনে হয় নাই। তোমার সঙ্গে আমার এইখানেই মূলত প্রভেদ। তুমি দূরদর্শী লোক। তোমার পত্র পাইয়া আমি ব্যাপারটা আগাগোড়া আবার ভাবিয়া দেখিলাম। সুদূর ভবিষ্যতে হাসির শ্বশুরবাড়ির লোকদের কি বলিব তাহা এখন হইতেই ঠিক করিয়া রাখা উচিত বই-কি। হাসিকে যদি ভালভাবে মানুষ করিতে পারি, সত্যিই যদি সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কর্মে আচরণে ভদ্রঘরের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার সত্য পরিচয় গোপনই রাখিব। কারণ তাহার সত্য পরিচয় জানিয়াও তাহাকে ঘরে স্থান দিবে এরূপ আধুনিক মনোভাবাপন্ন ভদ্র গৃহস্থ আমাদের দেশে বিরল। আমাদের দেশে বিরল বলিয়াই যে হাসিকে জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে ইহাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। বরপক্ষীয়দের সহিত প্রতারণাই করিতে হইবে। প্রতারণা করিয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করাই অন্যায়। হাসিকে যদি সত্যিই বরবর্ণিনী করিয়া তুলিতেই পারি তাহা হইলে তাহাকে যিনি লাভ করিবেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, লাভবানই হইবেন। আর হাসি যদি মানুষ না হয় তাহা হইলে আমি সচেষ্ট হইয়া তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিব না। সে নিজে যাচিয়া যদি কাহারও সহিত প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চায় তাহাতেও আপত্তি করিব না। এই বিবিধ সম্ভাবনার কথা মনে রাখিয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু অগ্রসর হওয়া মানেই যে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করা এই দুরতিক্রমণীয় যুক্তি আমাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। নারী-জাতি সম্বন্ধে আমি যে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি তাহা মনে করিও না, সুভাষিণীর সম্বন্ধেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু ভয় হইতেছে তোমার সুভাষিণীর

রসনা নামক যন্ত্রটি আছে বলিয়া। তাহাকে বিবাহ করিলে সে যে নিশ্চয়ই হাসিকে একদিন সব কথা বলিয়া ফেলিবে এ আশঙ্কা আমার কিছুতেই দূর হইতেছে না। সে যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল লইয়া শপথ করে তাহা হইলেও হইবে না।

মহা সমস্যায় পড়িয়াছি। তুমি আমার হইয়া আর একটু ভাল করিয়া চিন্তা কর ভাই। কলেজ-জীবনে গণিতশাস্ত্রে তুমি পারদর্শী ছিলে, আমার অনেক অঙ্ক কষিয়া দিয়াছ, এ অঙ্কটাও করিয়া দাও। আমার সঙ্কোচটা যে কোথায় তাহা তোমাকে অকপটে বলিয়াছি, তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা রাস্তা আমাকেও বলিয়া দাও।

অভয় মিত্র আমার বাড়ির আসবাবপত্র সব কিনিয়া ফেলিয়াছেন। গৃহপ্রবেশের কয়েকটি শুভদিনও দেখিয়াছেন। আমি কিন্তু ভাই, মোটেই উৎসাহ পাইতেছি না। আশা করি ভাল আছ। বউ কেমন লাগিতেছে? প্রথম প্রথম কাহারও খারাপ লাগে না, আশা করি তোমারও লাগিতেছে না। ভালবাসা জানিবে এবং অবিলম্বে উত্তর দিবে। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৯

কাশীধাম
২৮-১-৩০

ভাই সদানন্দ,

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ হয় এত বিস্মিত হইতাম না। আমাদের দেশ যে এত অধঃপতিত হইয়াছে, নারীদের আত্মসম্মান যে এমন ভাবে ভূলণ্ঠিত তাহা সত্যই আমার ধারণা ছিল না। তোমারও ভাই একটু দোষ আছে। আমার চিঠিখানি তোমার সাবধান করিয়া রাখা উচিত ছিল, কারণ ওই চিঠিতে আমি যেসব কথা লিখিয়াছিলাম তাহা কেবল তোমারই জন্য অপর কাহাকেও আমি ওসকল কথা অমনভাবে লিখিতাম না। অবশ্য একথা তোমার পক্ষেও আন্দাজ করা অসম্ভব ছিল যে আমার ওই চিঠি পড়িয়া সুভাষিণী ক্ষুর দিয়া নিজের জিভটা কাটিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে মেয়েদের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে বল তো। তাহারা যে কোনও মূল্যে নিজেদের পুরুষদের হস্তে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত। লিলি এবং সুভাষিণী একই অবস্থার দুই রূপ। আমি অভিভূত হইয়াছি, বেশি কিছু লিখিতে পারিতেছি না। আজ তোমার নামে টি. এম. ও. করিয়া আমি পাঁচশত টাকা পাঠাইয়াছি। সুভাষিণীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা যেন হয়। প্রয়োজন হইলে আরও টাকা পাঠাইব, আর একথা লেখাই বাহুল্য যে, সুভাষিণী যদি বাঁচে তাহাকেই আমি বিবাহ করিব। সে যেদিন হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইবে সেই দিনই করিব, অবশ্য ইহাতে তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে। কারণ পঞ্জিকায় ঠিক সেই দিনটিতে বিবাহের শুভলগ্ন না-ও থাকিতে পারে। যেদিনই হোক, তাহাকে বিবাহ করিব। আপত্তি করিবার আমার আর পথ নাই। অবিলম্বে জানাইবে সুভাষিণী কেমন আছে। সম্ভব হইলে একটা টেলিগ্রাম করিও। ভালবাসা লও।

ইতি—
তোমার নীলাম্বর

অসিতের পত্রাবলী

১

লক্ষ্ণৌ
৬-৭-৪৯

ভাই মহেন্দ্র,

তোমার চিঠি পেয়েছি। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলি পড়লাম। চিঠিগুলি প্যাক করে আমার শ্বশুর মশায়ের নামে পাঠিয়ে দিয়েছি। হাসির কোনও চিঠি পাইনি। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তার উপর সামনেই পরীক্ষা। কি যে হবে জানি না। তুমি একটু খোঁজ কোরো। বিজয়বাবু নামে যে ছেলেটি ফিলসফি পড়াত তার খবর কি? বিজয়বাবু লতিকার ভাই, তোমাদের পাড়াতেই তার বাড়ি। তোমাকে একথা লিখতে সঙ্কোচ হচ্ছে, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন। কিন্তু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সত্য যদি কঠোরও হয়, তাকে মানতে হবে, চিনতে হবে। স্বল্প পরিচয়ে যে হাসিকে যতটুকু আমি চিনেছিলাম সে আমার কল্পলোকের অমরাবতীতে অমর হয়ে থাকবে, কিন্তু যে হাসিকে আমি চিনি না তার পরিচয় জানবার কৌতূহলও হচ্ছে। তুমি যদি একটু আলোকপাত করতে পার উপকৃত হব। যদি কিছু জেনে থাক জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমি আমার বাড়িতে এখনও কিছু জানাইনি। কি যে জানাব জানি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি। বিজয়বাবুর সব খবর চিত্রা অনায়াসেই যোগাড় করতে পারবে। খবরটা অবিলম্বে আমাকে জানিও। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলো পড়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। অবাক হবার অনেক উপকরণ আছে ওগুলোর মধ্যে, কিন্তু আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি আমার শ্বশুর মশায়ের সত্য পরিচয় পেয়ে। তাঁর সম্বন্ধে এতদিন আমার যা ধারণা ছিল তা একেবারে বদলে গেল। মনে হল, আমি যেন এতদিন কার্পেটের উলটো পিঠটাই দেখেছিলাম। তাঁকে একখানা চিঠিও লিখেছি, কোনও উত্তর পাই নি। তুমি উত্তর দিতে যেন দেরি কোরো না। ভালবাসা নাও। ইতি—

অসিত

২

৮-৭-৪৯

ভাই অতুল,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠিতে অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সান্ত্বনা নেই। তোমার চিঠির সুর থেকে মনে হল সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছাও যেন তোমার নেই। যদিও ভাষায় পরিষ্কার করে কোথাও তুমি লেখ নি, তবু আমার মনে হল তোমার চিঠিখানা যেন ভুরু নাচিয়ে বলছে—বেশ হয়েছে। আমার স্ত্রীর স্বপক্ষে ওকালতি করে যে সব যুক্তির তুমি অবতারণা করেছ সেগুলিই হাসির যুক্তি কি না তা তুমি জান না। তুমি ধরে নিয়েছ যে, হাসি আমাকে ত্যাগ করে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে পালিয়েছে, এবং এই পালানোটাকেই তুমি আধুনিকতার একটা মস্ত লক্ষণ বলে প্রমাণ করবার জন্যে অনেকটা সময় নষ্ট করেছ। প্রত্যেক কাজেরই একটা কারণ থাকে। তোমার এই প্রচেষ্টারও একটা কারণ আছে, আমি জানি সে কারণটা কি,

তাই তোমার উপর রাগ করতে পারছি না। তুমি অসুখী, সেই জন্যেই তোমার সকলেরই উপর রাগ। সমাজের উপর, গভর্ণমেন্টের উপর, অতীতের উপর, বর্তমানের উপর, কারো উপর তুমি খুশি নও। এদের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তুমি তাই সর্বান্তঃকরণে বাহবা দিয়ে ওঠ, অনেক সময় বিচার করতে ভুলে যাও যে বাহবাটা তার প্রাপ্য কি না, বাহবাটা দেওয়া শোভন হচ্ছে কি না। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীরা আদিমকাল থেকেই পালাচ্ছে, কেবল ওই পালানোর মধ্যেই কোন আধুনিকতা বা নূতনত্ব নেই। তাকে গালাগালি দেব, না, বাহবা দেব, তা নির্ভর করছে পালানোর হেতুটার উপর। নিজের স্বার্থের জন্য যদি সে পালিয়ে থাকে তাহলে আমি অন্তত তাকে বাহবা দেবার প্রেরণা পাব না, কিন্তু পরার্থে সে যদি স্বামী-বর্জন করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে বাহবা দিতে হবে। স্বার্থপর পশুমানব পরার্থপর হয়েই মনুষ্যত্ব লাভ করছে ক্রমশ। মনুষ্যত্বের দিকে তার প্রগতিও ওই একটিমাত্র মাপকাঠি দিয়েই মাপতে হবে। আত্মবিনোদন ও স্বার্থবিনোদনের যত আশ্চর্যজনক ব্যবস্থাই বর্তমান সভ্যতা করে থাকুক না কেন, আসল সভ্যতার বিচার হবে সেই সনাতন মানদণ্ডে অর্থাৎ আমরা কতটা পরার্থপর হতে পেরেছি তাই দিয়ে। তুমি হাসির অন্তর্ধানের ওই একটি কারণই ঠিক করেছ কেন তাও আমার মাথায় এল না। সত্য কারণটা যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি তখন কল্পনাকে অবাধে ছেড়ে দিতে আপত্তি কি? হাসি কোন অচিন্ত্যনীয় উপায়ে পাখি হয়ে উড়ে গেছে একথা মনে করতে তোমার বৈজ্ঞানিক মন যদি সঙ্কুচিত হয়, হাসি কোন অচিন্ত্যনীয় উপায়ে মারা গেছে একথাও তো ভাবতে পারতে। তার অন্তর্ধানের সহস্র রকম সম্ভাবনার মধ্যে ওই একটি সম্ভাবনাই তোমার মনকে অধিকার করে রেখেছে কেন বল তো? উত্তরে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। বলব? রাগ করবে না তো? যে ক্ষুধিত তাব কাছে অন্নের একটিমাত্র রূপই দেদীপ্যমান—যাকে চর্বণ করে সে গলাধঃকরণ করতে পারে। অন্নের যে অন্য সহস্রবিধ রূপ আছে তা দেখবার বা ভাববার মতো মানসিক স্থৈর্য তার নেই। হতে পারে আমার এ ধারণা ভুল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, পাশবিক ক্ষুধার জন্য সভ্য মানবমাত্রেই ঈষৎ বিব্রত (অনেক ক্ষেত্রে লজ্জিতও), সেই পাশবিক ক্ষুধার তাড়নায় তুমি এত কাতর যে তাকে কেন্দ্র করেই তোমার সমস্ত দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান বিকশিত হতে চাইছে, ওই একটি শিখাকেই অনবরত প্রদক্ষিণ করছে তোমার কল্পনা-পতঙ্গ, সেই শিখায় পুড়ে মরতেও তার আপত্তি নেই।

আমি যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ হয়েছি এবং ভবিষ্যতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকতে চাই হাসির পক্ষে সে পারিপার্শ্বিক শ্বাসরোধকর এবং সেইজন্যই সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে এই সিদ্ধান্তে তুমি যে কি করে উপনীত হলে তা আমার ধারণাতীত। হাসিকে তুমি আমার চেয়ে অনেক কম দেখেছ। একবার—একদিনের বেশি দেখনি বোধ হয়—এত স্বল্পপরিচয় সত্ত্বেও তার মনের এত খবর জানলে কি করে তুমি বল তো? ভবিষ্যতে যদি প্রমাণিত হয় যে তুমি যা ভেবেছিলে তা ঠিক, তাহলে তোমার ওই তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিশ্চয়ই প্রশংসা করব। আপাতত কিন্তু পারলাম না। তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু জেনেও পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে তুমি স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, আমার এই নিদারুণ দুঃখটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছ, তোমার দার্শনিক যুক্তিগুলো আমাকে যেন 'দুয়ো' দিচ্ছে।

তুমি এখনও উপার্জনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারনি জেনে দুঃখিত হলাম। বিশ্বাস কর, দুঃখটা আন্তরিক। তুমি লিখেছ, মেসের ম্যানেজার পাওনার জন্যে তোমাকে অস্থির করে

তুলেছেন, কিছু টাকা তোমার অবিলম্বে প্রয়োজন। আমি পঁচিশটি টাকা আজ তোমাকে পাঠালাম। ঋণ-স্বরূপ নয়, এমনই পাঠাচ্ছি। টাকাটা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছি। এক মাসিক পত্রের সহৃদয় সম্পাদক আমায় একটা লেখার জন্য পারিশ্রমিক পাঠিয়েছেন।

তোমাকে আরও অনেক কথা লেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মনের অবস্থা ভাল নয়, সময়ও হাতে নেই। রাত জেগে চিঠি লিখছি। এখন রাত প্রায় একটা। তা ছাড়া, আর একটা কারণেও থামছি। মনে হচ্ছে সমস্ত রাত্রি ধরেও যদি লিখে যাই আমার দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারব না। যে দুঃখ অবর্ণনীয় তাকে বর্ণনা করবার চেষ্টা না করাই ভাল। অবর্ণনীয় দুঃখ যে মন এমনিতেই বুঝতে পারে সে মনও তোমার নেই, সুতরাং থামলাম। ভালবাসা নাও। ইতি—

তোমারই

অসিত

৩

কলিকাতা

১৫-৭-৪৯

ভাই অসিতবরণ,

ইচ্ছা করিয়াই একটু বিলম্ব করিয়া উত্তর দিতেছি। অশুভস্য কাল হরণং—রাবণ রাজার এই উপদেশটি মানিতে ইচ্ছা হইল। মনে হইল অশুভ সংবাদটা তাড়াতাড়ি দিয়া লাভ কি। কিন্তু খুব বেশি দেরি করিতেও পারিলাম না। ভাবিলাম, খবরটা পাইলে তুমি হয়তো কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অফিসে যাইবার মুখে তোমার পত্রটি পাইয়াছিলাম। চিত্রা থাকিলে তখনই তাহাকে বিজয়বাবুর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগাইয়া দিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু চিত্রা বাপের বাড়ি গিয়াছে। আমিই একটা ছুতা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। বেচারী কাঁহাতক আর একনাগাড়ে দাসী বৃত্তি করে বল। প্রত্যহ বাসন মাজিয়া, ঘর মুছিয়া (এত কাজের মধ্যেও রোজ ঘর মোছা চাই, মানা করিলেও শোনে না) রান্না করিয়া, জামা কাপড়ে সাবান দিয়া বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বড়লোকের মেয়ে তো, এত হাড়ভাঙা খাটুনিতে অভ্যস্ত নয়। তাই যখন শুনিলাম যে তাহার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হইতেছে, তাহার বৌদিদি তাহাকে যাইতেও লিখিয়াছে তখন আমি আর আপত্তি করিলাম না, পাঠাইয়া দিলাম। আমার একটু কষ্ট হইবে, তা হোক। খরচও মন্দ হইল না, কিন্তু সে কথা ভাবিলে কি চলে? আমি নিজেই স্বপাক কোনরূপে চালাইতেছি। এইসব কারণে তোমার পত্র পাইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বাবুর খোঁজ লইতে পারি নাই। আপিস হইতে ফিরিয়াই তাহাদের বাসায় গিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম তাহারা সকলে সিনেমায় গিয়াছে, রাত্রি বারোটার আগে ফিরিবে না। পরদিন সকালে উঠিয়াই তাহাদের বাসায় গেলাম, বিজয়বাবুর দেখা পাইলাম না। শুনিলাম ভদ্রলোক দ্বিপ্রহরে বাড়িতে থাকিবেন। তাহাদের বাড়িতে যে ছেলেটির সহিত দেখা হইয়াছিল কথায় কথায় সে বলিল যে বিজয়বাবু না কি কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। কবে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন প্রশ্ন করাতে ছেলেটি হিসাব করিয়া যে তারিখটি বলিল তাহাতে আমি মনে মনে চমকাইয়া উঠিলাম। ঠিক ওই তারিখেই শ্রীমতী হাসিও হোস্টেল ছাড়িয়া গিয়াছে। স্থির করিয়াছিলাম যে, দ্বিপ্রহরে আপিস হইতে ছুটি লইয়া আসিয়া বিজয়বাবুর সহিত দেখা করিব।

কিন্তু বড়বাবু ছুটি দিলেন না। সন্ধ্যার সময়ে আসিয়াই বিজয়বাবুর বাড়িতে গেলাম। গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বিজয়বাবুর ভগ্নী লতিকা বলিল—বিজয়বাবু বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ট্যাক্সি করিয়া হাওড়া স্টেশনে গেলে হয়তো তাঁহার সহিত দেখা হইতে পারে। মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিল বলিয়া আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। আমি একটি ট্যাক্সি করিয়াই হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটিলাম। বিজয়বাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল, কিন্তু বেশি কথা বলিবার অবকাশ ছিল না। অবকাশ থাকিলেও বিজয়বাবু যাহা বলিলেন তাহার বেশি কিছু বলিতেন না। তিনি বলিলেন, হাসির সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানিতাম আপনাকে বলিব না, যদি প্রয়োজন বোধ করি অসিতবাবুকে জানাইতে পারি। তাঁহার ঠিকানাটা আমাকে দিয়া যান। ট্রেন ছাড়িতেছিল সুতরাং তাঁহার সহিত বেশি কথাও কহিতে পারিলাম না। বিজয়বাবু বলিলেন, যে তিনি বিলাত যাইতেছেন পড়াশুনা করিবার জন্য। ভাই, সত্যকথা বলিতে কি, বিজয়বাবুর হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগে নাই। আমি যতটুকু জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহা অকপটে তোমাকেই জানাইলাম। তোমার ঠিকানা বিজয়বাবুকে দিয়া আসিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে সুসংবাদই দেন। আমি বিজয়বাবুর ঠিকানাও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন যে তাহার ঠিকানা এখনও অনিশ্চিত। কিছুদিন পরে তাঁহার বাড়ি হইতে তাঁহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে। আমি খোঁজ রাখিব এবং ঠিকানা পাইলেই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আশা করি ভাল আছে। আমার ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। ইতি—

তোমারই মহেন্দ্র

৪

লক্ষ্ণৌ

২৫-৭-৪৯

ভাই মহেন্দ্র,

হাসির খবর পাইয়াছি। বাড়ি হইতে আজ মায়ের চিঠি পাইলাম। মা লিখিয়াছেন, "তুমি বোধ হয় জান যে বেয়াই মশাই বৌমাকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন।" লিখিয়াছেন, "হঠাৎ ঠিক হইয়া গেল, পত্র লিখিয়া আমাদের অনুমতি লওয়ার সময় ছিল না। আশা করি আমরা ইহাতে কিছু মনে করিব না। ইহাতে মনে করাকরির কিছু নাই, কিন্তু এটা বৌমার পরীক্ষার বছর, এ সময় কামাই করা কি ঠিক হইল? যাক যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে, এখন ভালয় ভালয় ফিরিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বেয়াই মশাই, তোমাকেও আশা করি জানাইয়াছেন"—ইত্যাদি।

শ্বশুরমশাই আমাকে কিন্তু কিছুই জানান নাই। হইতে পারে জানাইয়াছিলেন চিঠিটা মারা গিয়াছে। মারা যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। যাই হোক, হাসির একটা খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হইলেও চিন্তাধারা একটা বিশেষ পথ পাইয়াছে। এতদিন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছি না।—হাসি আমাকে কোনও পত্র লিখিল না কেন। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হইতেছে। বিজয়বাবুর আচরণও বেশ রহস্যময়। তিনিও এখন পর্যন্ত কোন চিঠি দেন নাই। আমার মনে হইতেছে,

তিনি তোমার সহিত একটু রসিকতা করিয়া গিয়াছেন। আসলে তিনি হাসির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, হাসি তাহার বাবার সহিত বেড়াইতেই গিয়াছে। পরীক্ষার সময় বেড়াইতে গেলে আমি পাছে রাগ করি সেইজন্য হয়তো আমাকে কিছুই জানায় নাই। যাই হোক, এখন অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া গত্যন্তরই বা কি আছে? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। একটা মজার কথা শুনিবে, বিপদে পড়িয়া আজকাল ভগবানের কথা মাঝে মাঝে মনে হইতেছে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই অসিত

৫

ভাই অসিত,

তোমার টাকাটা ফেরত পাঠালাম আজ। মেনি থ্যাঙ্কস্ ফর দি হেল্প্। টাকাটা এসে পড়াতে সত্যিই খুব উপকৃত হয়েছিলাম। সকলের পাওনা আজ শোধ করেছি, তোমারটাও করলাম। এখন আমি অঋণী। আমার যা-কিছু পার্থিব সম্পত্তি ছিল সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছি। একটি ছেঁড়া গেঞ্জি এবং ছেঁড়া লুংগি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। দুনিয়ার দিকে চেয়ে এবার বলতে পারি—নাউ, উই আর কুইট্স্! এবার সরে পড়তে চাই। এখানে কারও সঙ্গে খাপ খেল না আমার। এত তাড়াতাড়ি মরবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেখছি, আমার মতো লোকের বাঁচবার স্কোপ নেই এখানে। গলায় দড়িটা লাগিয়ে ঝুলে পড়তে ভয় করছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হচ্ছে যে, শীতকালে ঠাণ্ডা জলের বালতিটা গায়ে ঢালবার আগেও ঠিক এইরকম ভয় করে. কিন্তু সাহস করে ঢেলে ফেলতে পারলেই পরম আরাম। মৃত্যুর পরও হয়তো তাই। মনে পড়ছে হ্যামলেটের কথা— টু ডাই, টু শ্লীপ, পারচান্স টু ড্রীম—

সেই স্বপ্নলোকের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করছি। তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি আর থাকব না। তোমরা তোমাদের সনাতন মানদণ্ড দিয়ে নিজেদের জমিদারি জরিপ করতে থাক, আমি চললুম। যাবার আগে তোমার স্ত্রীর সঠিক খবরটা জেনে যাবার কৌতূহল ছিল। কিন্তু জীবনে অনেক কৌতূহলই মেটেনি, এটাও মিটল না। তবে মরবার আগে আশা করে যাচ্ছি শি উইল প্রুভ হার মেট্ল্। আই নো শি উইল। তোমার সনাতন মানদণ্ডকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সে একদিন তোমাকে বলবে—আমি মানুষ, আমিই আমার মানদণ্ড। তোমাদের সমাজে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই, হাসির প্রকৃত মূল্য তোমরা দেবে না, সনাতন মানদণ্ড নিয়েই মাথা ঘামিয়ে মরবে তোমরা, কিন্তু দ্যাট ডাজ্ নট্ অলটার দি ফ্যাক্ট দ্যাট শি ওয়াজ এ জেনুইন জেম। যাক্ চললুম। গুড বাঈ। ইতি—

তোমারই অতুল।

হাসির চিঠি

শ্রীচরণেষু,

তুমি নিশ্চয় আমার আশা এতদিনে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছ। আমাকে ভুলে গেছ এ কথা লিখে তোমার স্মৃতিশক্তির অপমান করতে চাই না। আমি যদিও এতদিন আত্মগোপন করে

ছিলাম কিন্তু তোমার সমস্ত খবর আমি রেখেছি। তুমি যে পাশ করে চাকরি নিয়েছ, সে খবরও আমি জানি, তুমি যে বিয়ে করনি তা-ও আমার অজানা নয়। তবে একটা কথা বিশ্বাস কর, তুমি যদি আবার বিয়েও করতে তা হলেও আমি তোমাকে এ চিঠি ঠিক এমনি ভাবেই লিখতাম। আর একটা অনুরোধও তোমাকে করছি, আমার এ চিঠি পড়ে আমার সম্বন্ধে আর যে ধারণাই তুমি কর, আমাকে উপযাচিকার পর্যায়ে ফেলো না।

নিজের স্বপক্ষে আমার বলবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের যে সব সুবিধা ছিল আমার সে সব কিছুই নেই। তোমাদের তরফের কোনও নির্যাতন আমাকে ঘর-ছাড়া করে নি। আমি পালিয়েছিলাম লজ্জায়!

যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই আমি অনুভব করেছি যেন আমার চারিদিকে অদৃশ্য একটা প্রাচীর রয়েছে। মনে হত, প্রাচীরের ওপারে যে জীবনযাত্রা চলছে তার সঙ্গে আমার যেন যোগ নেই। আমার বাবা, মা, দাদামশাইকে ঘিরে যেন একটা রহস্যকুহেলী আছে, তা যে কি আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হত সবাই যেন আমার সঙ্গে পোশাকী ভদ্র ব্যবহার করছে। তোমার সুন্দর চিঠিগুলি যখন পেতাম তখনও ঠিক ওই কথাই মনে হত। ভাবতাম, কেউ আমাকে কখনও একটাও কড়া কথা বলে না কেন? কখনও কারো কাছে একটাও বকুনি খেলাম না, আমি সত্যই কি এতটা ভাল? মনে হত সমস্ত মেকি এবং মনে হওয়া মাত্র ভয় হত কেমন একটা! একটা কাঁচের ঘরে বাস করছি মনে হত। বাইরের সবই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বাইরের সঙ্গে যেন যোগ নেই। যে অপরাধ করে আমার ভাই-বোনেরা মায়ের কাছে মার খেয়েছে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে, ঠিক সেই অপরাধ করে আমি বরাবর রেহাই পেয়েছি। মা হেসেছেন, বাবা বড় জোর বলেছেন—ছি, ওরকম করতে নেই। দাদামশাই তো আমার সব কিছুই ভালো দেখতেন। আমি যেন কোনও ধনী জমিদার এবং তিনি যেন আমার বেতনভোগী মোসায়েব।

একদিন কিন্তু কাচের ঘরটা ভেঙে পড়ল এক অভাবিত উপায়ে। আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপিকার সঙ্গে দাদামশায়ের শ্বশুরকুলের কি রকম যেন সম্পর্ক আছে একটা। দাদামশায়ের কাছ থেকে তিনি আমার জন্ম-রহস্যটা শুনেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমিও শুনলাম একদিন। অধ্যাপিকাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর ছিল না। কেন জানি না, তিনি আমাকে সু-নজরে দেখেন নি কোনও দিন। মেয়েরা বলত ওঁর স্বভাবই নাকি ওই রকম, রূপসী মেয়ে দেখলেই উনি তার উপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেন, কেউ ভাল শাড়ি পরলে সঙ্গে সঙ্গে চটে যান তার উপর। আমি রূপসী কি না জানি না, কিন্তু তোমাদের দৌলতে ভালো ভালো শাড়ির অভাব তো আমার ছিল না, সে সব পরতে কার্পণ্যও আমি করি নি কোনও দিন। মিস ঘোষ একদিন আমায় বললেন, "এমনভাবে সেজে আসতে লজ্জা করে না?" আমি বললাম, "লজ্জা পাওয়ার মতো সাজ করিনি তো। শাড়ি তো আমার মা আমাকে দিয়েছেন।" "তোমার মা?"—একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ফুটে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। তারপর বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।" আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার মাকে মনে পড়ে তোমার?" আমি তো অবাক তারপর তিনি যা বললেন.....

ঠিক তার পরদিনই বাবা এলেন কোলকাতায়। বাবাকে গিয়ে অদ্ভুত গল্পটা বললাম। শুনে তাঁর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "যা শুনেছ তা

সত্যি। কিন্তু ও নিয়ে এখন আর বেশি মাতামাতি করে লাভ নেই।" আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন। ঠিক সেই সময় তোমার বন্ধু অতুলবাবু এলেন আমাকে ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডাক্তার বোস আমার গলা দেখে সন্দেহ করলেন সিফিলিসের বিষ হয়তো আমার রক্তে আছে। পরীক্ষা করবার জন্যে রক্ত নিয়ে নিলেন তিনি এবং পরীক্ষা করে জানালেন যে বিষ আছে। আমাকে ইনজেকশন নিতে হবে।

প্রথমেই তোমার কথা মনে হল আমার। মনে হল, তোমাকে আমরা ঠকিয়েছি। তুমি আমাদের কথায় বিশ্বাস করে খাঁটি সোনা বলে যা নিয়েছ আসলে তা গিল্টি করা পিতল। আমার সমস্ত আত্মসম্মান ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল যেন। সব চেয়ে রাগ হল বাবার উপর। মনে হল, তিনিই প্রতারণা করে আমার ও তোমার জীবনের মধ্যে যে প্রাচীর তোলবার আয়োজন করেছিলেন সেই প্রাচীরই এবার দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল। ঠিক করলাম বাবার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখব না। সমস্ত কথা অকপটে তোমাকে জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবার কথ আমার মনে জেগেছিল একবার, কিন্তু তাতেও বাধল। মনে হল, এ কথা শুনে হয়তো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তুমি ছুটে আসবে কেবল ভদ্রতার খাতিরে। সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্য নানা রকম মিথ্যারও আশ্রয় নিতে হবে হয়তো তোমাকে বাধ্য হয়ে। তাই ঠিক করলাম তোমাকেও কিছু জানাব না। মানে চুপি চুপি সরে পড়াই ভাল। তোমার মধ্যে যে বাধা দুস্তর হয়ে উঠেছে তা সরিয়ে দেবার শক্তি যদি নিজে কোনদিন সংগ্রহ করতে পারি তবেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলে শুধু যে নিজেরই অপমান তা নয়, তোমারও অপমান। মনে হল তার চেয়ে মরণ ভাল।

তোমার আধুনিকা কবিতার সেই মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লাগে নি। সে দুর্জয়কে জয় করেছিল নিজের সুখের জন্য, নিজের একটা বিশেষ খেয়ালকে চরিতার্থ করবার জন্য। তবু কিন্তু সেই মেয়েটিই উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাকে। রাত্রে ডাক্তার বসুর চিঠি এবং রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টখানার দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলাম। গলাটা ব্যথা করছিল, মাথার ভিতর আগুন জ্বলছিল, দপ দপ করছিল রগের শিরাগুলো। হঠাৎ একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল মানসপটে। চুলগুলি বব-করা, চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি জ্বলছে, ময়লা ময়লা রং, ঘননিবদ্ধ যুগ্মভ্রূ, চোয়াল, চিবুক, অধর সবই সুপুষ্ট। আমার দিকে চেয়ে সে যেন বলল, "ভাবছ কি, বেরিয়ে পন। প্রমাণ করে দাও যে তোমার শক্তি আছে। অসুখের বিষ যদি শরীরে কোন রকমে ঢুকেই তাকে, তার প্রতিকার কর। এটা বিজ্ঞানের যুগ, প্রতিকার মিলবেই। ভেঙে পড়ছ কেন?" তোমার 'আধুনিকা' কবিতার সেই মেয়েটি আমার মনের মধ্যে যে এমন জীবন্ত হয়ে আবির্ভূত হবে তা ভাবতে পারি নি। তার কথাগুলো আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

... ঠিক করলাম অবিলম্বে কোলকাতা ছাড়তে হবে। আমার এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছিল সম্বলপুরে। সে অনেকদিন থেকে প্রায় প্রতি চিঠিতেই আমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিল যে আমি যদি তাদের নূতন সংসারে দিন কয়েক কাটিয়ে আসি তাহলে তারা খুশি হবে খুব। সম্বলপুরের উদ্দেশেই যাত্রা করলাম অবশেষে। আমার তোরঙ্গ বিছানা পড়ে রইল। আমি আমার ছোট ব্যাগে সামান্য দুই-একখানি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সম্বলপুরে আমি দিন চারেক মাত্র ছিলাম। সেখান থেকেই একটা চাকরির সন্ধান পেয়ে আমি দিল্লীতে চলে আসি। ...আমার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটির সুদীর্ঘ বর্ণনা করে তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার মানসিক

অবস্থার কথা বলেও কোন লাভ নেই। শুধু যে তা নিষ্প্রয়োজন তা নয়, তা বলার বিপদও আছে। মনে যা যা হয়েছে তার অকপট বর্ণনা শুনে তার সত্য মর্যাদা দিতে যদি তোমার দ্বিধা জন্মে তাহলে আমার নিজের কাছেই নিজের মুখ দেখতে লজ্জা করবে। সুতরাং ওসব কথা থাক। কেবল যে কথাগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তাই তোমায় জানাচ্ছি।

আমি এতদিন ধরে সুযোগ্য ডাক্তার দিয়ে নিজের চিকিৎসা করেছি, গলার ঘা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তিনবার রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি তিন জায়গায়। রক্তে আর কোন দোষ নেই। রিপোর্ট তিনটি পাঠালাম এই সঙ্গে। এখন আমার মনে হচ্ছে সেই বব্-করা আধুনিকাটি আমাকে যে প্রতিকারের সন্ধানে উৎসাহিত করেছিল সে বৈজ্ঞানিক প্রতিকার হয়তো মিলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, এ প্রতিকারের শেষ মূল্য যে সামাজিক সিন্দুকে বন্ধ আছে তার চাবি কোথায় সংগ্রহ করতে পারব?

তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেয়েছি আজ বাবার লেখা সেই চিঠিগুলো পড়ে। চিঠিগুলো সদানন্দবাবু তোমাকে দিয়েছিলেন এবং সেগুলো তুমি বাবার নামে ফেরত পাঠিয়েছিলে এ খবর পেলাম বাবাকে তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে সেইটে পড়ে। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলোর সঙ্গেই তোমার চিঠিটাও ছিল। বাবা বাড়িতে ছিলেন না, তিনি আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ভারতবর্ষের নানা শহরে। আমার বাক্সতে আমার বান্ধবীদের যত ঠিকানা ছিল প্রত্যেক জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন। শেষে সম্বলপুরে আমার সন্ধান পান। মাস দুই আগে আমি অফিস থেকে ফিরছি, হঠাৎ পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। বললেন, 'ফিরে চল।' কিন্তু অত সহজে ফিরে যাওয়ার পাত্রী আমি নই। বললাম তাঁকে সে কথা। আমার পিছু পিছু তবু আসতে লাগলেন তিনি। আমি ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি, ইক্‌মিক্ কুকারে নিজেই রেঁধে খাই। বাবা আমার বাসায় এসে অনেক সাধ্যসাধনা করলেন আমাকে। কিন্তু ফল হল না কিছু। উঠে চলে গেলেন শেষ। তার পরদিন সকালে দেখি আমার বাসার সামনে যে নোংরা হোটেলটা আছে তাতেই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। রোজই তাঁর সঙ্গে দেখা হত আমার, রোজই তিনি আমাকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করতেন। একদিনও কিন্তু তিনি নিজের দোষ স্খালন করবার চেষ্টা করেন নি, আমার প্রকৃত জন্ম-রহস্য যে কি তা-ও বলেন নি। মিস ঘোষ আমাকে আড়ালে ডেকে এনে যা বলেছিলেন তার সারমর্ম এই যে, আমার বাবা যৌবনকালে একজন মুসলমানীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার গর্ভেই আমার জন্ম হয়েছে। এর বেশি তিনিও বোধ হয় আর কিছু জানতেন না। বাবাও আমাকে এর বেশি জানতে দেন নি। তিনি বারম্বার একটি কথাই শুধু আমাকে বলেছেন—আমি দোষ করেছি, কিন্তু সে দোষের কি ক্ষমা নেই? বহুকাল পূর্বে সদানন্দবাবুকে তিনি যে সব কথা লিখেছিলেন তা যদি আমাকে বলতেন তাহলে আমি হয়তো অত নিষ্ঠুর হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতাম না। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নি। ঐ নোংরা হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন কেবল প্রত্যাশা করেছেন যে আমি তাঁকে ক্ষমা করে আবার ফিরে যাব। ফিরে গেলে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে যাতে কিছু বলতে না পারেন সেজন্যে তাঁদেরও তিনি একটা চিঠি লিখেছেন যে আমাকে নিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন। তোমাকে তিনি কোনও চিঠি লিখেছিলেন কি না জানি না, খুব সম্ভব লেখেন নি, কারণ তিনি বলতেন যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি একাই করব। রোজই সকালে উঠে দেখতাম তিনি সামনের

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বাসার দিকে চেয়ে। আমি যখন অফিস যেতাম আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়েই দেখতাম দাঁড়িয়ে আছেন। আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। অফিসের দারোয়ানটার মুখে একদিন শুনেছিলাম সারা দুপুরটা তিনি অফিসের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান রোদে রোদে। এমনিভাবেই চলছিল। পরশু দিন সকালে উঠে আমার বাসার জানালা খুলে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাবা যেখানে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতেন সেখানে নেই। একটু ঝুঁকে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না। অফিস থেকে ফিরবার সময় দেখলাম তিনি নেই। মনে হল আমার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি বোধ হয় চলে গেলেন। তবু বাসাব কাছাকাছি এসে ইচ্ছে হল হোটেলে খোঁজ করি একটু। চাকরটা বললে কাল রাত থেকে তিনি অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। আমি যখন গেলাম তখন তাঁব শেষ অবস্থা। তাড়াতাড়ি ডাক্তাব ডাকলাম একজন। তিনি এসে বললেন স্ট্রোক হয়েছে, বাঁচবার আশা নেই। একটু পরেই মারা গেলেন। তাঁর ওই ঘরেই সদানন্দবাবুকে লেখা চিঠিগুলো আমি পাই, তুমি যে চিঠিটা তাঁকে লিখেছিলেন সেটাও সেই সঙ্গে ছিল। চিঠিগুলো পড়ে আমার আশা হল। মনে হল, চিঠিগুলো তুমি যদি মন দিয়ে পড়ে থাক তাহলে আমাদের সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা হয়তো তুমি করনি। তুমি এ যুগের শিক্ষিত ছেলে, কুসংস্কারের কলুষে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়। কিম্বা ঠিক জানি না, হয়তো যেগুলোকে আমি কুসংস্কার মনে করছি সেগুলো তোমার চক্ষে কুসংস্কার নয়। সে যাই হোক, তুমি সদানন্দবাবুকে লেখা চিঠিগুলো পড়েছ এইতেই আমি কেন জানি না সাহস পেয়েছি এবং তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বাবার হয়ে প্রথমেই তোমাব কাছে ক্ষমা চাইছি। তিনি যদিও নিজের যুক্তি অনুসারেই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন কিন্তু সে যুক্তি আমার কাছে খুব জোরালো মনে হল না, তোমাব কাছেও হয়নি হযতো! তাই ক্ষমা চাইছি। বিশ্বাস কর, তোমার এ ক্ষতি পূরণ করবার যদি কোনও উপায় থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তা করতাম। কিন্তু যে ঘটনা একবার ঘটে গেছে তার ঘটনাত্ব লোপ করবাব উপায় আর নেই। ইচ্ছে করলে আমাকে এখন তোমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পার। যদি কর আমি নালিশ করব না। এটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলে মেনে নেব। ভাবব দুর্জয়কে জয় করার যে মন্ত্র সেই আধুনিক মেয়েটি আমাকে শিখিয়েছিল সে মন্ত্র আমার ক্ষেত্রে সফল হল না কারণ আমি যা চাইছি তা টেস্টটিউবের ভিতর বা সার্জিকাল টেবিলের উপর পাওয়া যাবে না কখনও। আমি কি চাইছি তা মুখ ফুটে বলব না কোনদিন। তবে একটি কথা আমাকে বলতেই হবে, তুমি যদি আবার আমাকে ফিরে যেতে বল আমি ফিরে যাব। আমাদের সমাজে যে আর্থিক কারণের জন্য বাধ্য হয়ে স্ত্রীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হয় সে কারণ যদিও আমার ক্ষেত্রে নেই, তবু যাব, কারণ তোমার মতো লোকের সহধর্মিণী হওয়া সৌভাগ্য বলে মনে করি আমি। আমার স্পর্শে পাছে তুমি কলঙ্কিত হও তাই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম। তোমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে নিজেকে বিশুদ্ধও করেছি এতদিন ধরে। ডাক্তাররাই আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে বলেছেন এবার তুমি নির্দোষ নীরোগ, এবার তুমি সমাজে ফিরে যেতে পার। তুমি আমাকে ফিরে নেবে কি? তোমার দিক থেকে যদি কোন কুণ্ঠা থাকে তাহলে আমি ফিরতে চাই না। দোহাই তোমার, অনুকম্পা ভরে আমাকে ফিরে যেতে বোলো না। কারণ, ঠিক যেখানটিতে গিয়ে আমি দাঁড়াতে চাই সেখানটি তোমার চক্ষে গ্লানিহীন না হলে আমি দাঁড়াতে পারব না।

বাইরের বহুলোক কুৎসার কর্দমে আমাকে নাইয়ে দেবে জানি কিন্তু সব আমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারব তুমি যদি আমার সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত হও। আর একটা কথা। গোড়াতেই সে কথা তোমাকে বলেওছি একবার! আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই বটে কিন্তু জোর করে তোমার ঘাড়ে চাপতে চাই না, ছলা কলা করে বা কান্নাকাটি করে তোমার মন ভোলাবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

আমার সম্বন্ধে তুমি কি কি শুনেছ তা জানতে কৌতূহল হয়। বিজয়বাবু তোমাকে কোনও খবর দিয়েছিলেন কি? আমি যে ট্রেনে সম্বলপুর রওনা হই বিজয়বাবুও সেই ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। বললেন একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে বিলেত যাওয়া তাঁর ইচ্ছে, সেই চেষ্টায় দিল্লী যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে কোন কারণে কিছুদিনের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ির লোকদের লুকিয়ে। তিনি যেন কথাটা কারও কাছে ফাঁস না করে দেন। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেবেন না। প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন কি না কে জানে। আমার এই দীর্ঘ বিদেশ বাসের সময় আর কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। সুতরাং আমার সম্বন্ধে সত্য খবর তোমাদের জানাবার সুযোগ কারো হওয়ার কথা নয়। তবে মিথ্যে খবর তৈরি করতে পারেন এরকম মাথাওলা লোক আমাদের দেশে অনেক আছেন। না জানি আমার সম্বন্ধে কি কি শুনেছ তুমি।

তোমার চিঠিগুলি এখনও আছে আমার কাছে। অনেকবার পড়েছি সেগুলো। প্রায়ই পড়ি। মনে হয়, তোমার চিঠিগুলির ভিতর তোমার যে সত্তা প্রকাশিত তাই যদি তোমার স্বরূপ হয় তাহলে আমার ভয় নেই। তোমার বিচারে যদি আমি বর্জনীয় হই তাহলেও আমার বলবার কিছু থাকবে না। মনে হবে, তুমি কবি, তুমি ঠিক বিচারই করেছ, ভুল হয়নি তোমার। এত বড় চিঠি তোমার কাছে আর কখনও লিখিনি। কে জানে এই হয়তো তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি। আমার প্রণাম নাও। উত্তর দিতে দেরি কোরো না। ইতি—

হাসি

অসিতের উত্তর

বোম্বে
১০-৬-৫০

কল্যাণীয়াসু,

হাসি, আমার টেলিগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ। আমি দুদিনের ছুটি পেয়ে গেলাম হঠাৎ। সুতরাং নিজেই যাচ্ছি তোমাকে আনতে। প্লেনে যাব। তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখ। এ চিঠি পৌঁছবার আগেই আমি গিয়ে হয়তো পৌঁছব, তবু দু' কলম না লিখে পারলাম না। ইতি—

তোমারই অসিত

লক্ষ্মীর আগমন

এক
অবনীশের কথা

অদ্ভুত রকম যোগাযোগ হয়েছিল সেদিন।

স্বপ্নলোক নেমে এসেছিল সেই পড়ো ডাকবাংলোর বারান্দায়। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল চতুর্দিকে, কোথায় যেন বাঁশী বাজছিল একটা। লণ্ঠনের আলোয় মৃদুলাব কালো বেণীটা ভাষাময় হয়ে উঠেছিল! নিরু আর ফুলুর সঙ্গে গল্প করতে করতে সে তরকাবি কুটছিল আমাদের দিকে পিছন ফিরে। রাজু ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল; মাঝে মাঝে নাক ডাকছিল তার, কিন্তু তাতে, ইংরেজিতে যাকে বলে জারিং নোট, তা ছিল না, মনে হচ্ছিল ঘুমন্তলোকের অস্পষ্ট কলরবের ঢেউ মাঝে মাঝে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ পরে পরে একটা পোকা ডাকছিল 'চিপ্' 'চিপ্' 'চিপ্'।

গল্প বলছিল সুখেন্দু। কিন্তু গল্প বলার চেয়ে রান্নার দিকেই বেশী মন ছিল তার। সে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে তদারক করে আসছিল মাংসের জলটা মরল কিনা। নামে রান্না করছিল শুকুল ঠাকুর, সুখেন্দুর নির্দেশ মতো সে কেবল খুনতি নাড়ছিল, মশলা গুলছিল, হাঁড়ি নাবাচ্ছিল-ওঠাচ্ছিল, আঁচ কমাচ্ছিল-বাড়াচ্ছিল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার রাশ ধরেছিল সুখেন্দু। সুখেন্দু চাটুজ্যে মুকুজ্যে বাড়ির ভাগনে, কিন্তু কর্তার মৃত্যুর পর সেই হয়ে উঠেছে সর্বময় কর্তা। অথচ সর্বময় কর্তা হবার মোটেই আকাঙ্ক্ষা নেই তার—নিজে বিয়ে করে নি, করবেও না—রাজু, বিজু আর দ্বিজুকে তাদের বিষয়টি ভাল করে বুঝিয়ে আর মৃদুলাকে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান করে সে তীর্থ বাস করবে ঠিক করেছে। কিন্তু সকলেই জানে সে করবে না, করতে পারবে না। প্রথমত তার তীর্থবাস করবার বয়সই হয় নি (আমারই সহপাঠী সে, ত্রিশ কিম্বা বড় জোর বত্রিশ বছর বয়স হবে তার) দ্বিতীয়ত, রাজু, বিজু আর দ্বিজুকে ছেড়ে থাকাই অসম্ভব তার পক্ষে। তৃতীয়ত, তীর্থবাস করতে হলে যে পরলোকমুখী দৃষ্টি থাকা দরকার তা সুখেন্দুর নেই। ইহলোকের নিতান্ত তুচ্ছ সব খুঁটিনাটি নিয়ে ভরপুর হয়ে থাকাই ওর স্বভাব। যখন বাইরের বৈষয়িক কোন ঝামেলা থাকত না অর্থাৎ যেদিন মকোদ্দমার জন্য সদরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না বা দ্বিজুর একটা ভাল চাকরির চেষ্টায় তদ্বির করবার জন্য ছুটোছুটি করবার সুযোগ থাকত না, কিম্বা নায়েব মশাইকে ডেকে নিয়ে এসে পলু পোকার চাষ বা মৌমাছি পালন বা কলেকটিভ ফারমিং বা মোটর ট্রাক্টার বা ওইরকম কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করবার বাই চাগত না, সেদিন সুখেন্দু বসে বসে হয় দড়ি পাকাত কিম্বা উল বুনত। সুখেন্দুর বোনা সোয়েটার, ব্লাউস এবাড়ির আত্মীয়-স্বজন সবাই পরেছে। রাজুকে একটা কার্ডিগান পর্যন্ত বুনে দিয়েছে। সরু মোটা বেঁটে লম্বা রঙীন সাদা নানারকম দড়িও পাকিয়েছে সে জীবনে অনেক। সেগুলো হাটে বিক্রি করেছে এবং সেই টাকা জমিয়ে রেখেছে পোস্টাফিসে। আমাকে বলছিল একদিন সেই টাকা দিয়ে ও মৃদুলার প্রথম সন্তানকে গয়না গড়িয়ে দেবে একটা।

সুতরাং তীর্থবাস করবার মনোভাব নয় ওর। নিতান্ত ইহলৌকিক এবং বৈষয়িক রসেই ওর চিত্ত নিষিক্ত। ওর মতে তাই বাজে কাজ যাতে সংসারের কোন সুবিধা হয় না।

এই যে পিকনিকটা এর মূলেও যে সুখেন্দুর একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা বুঝতে আমার খুব দেরি হয় নি। আমার মনে হয় যে গল্পটা ও আমাকে বলছিল সেটাও উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু এসব উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত তখন পাই নি, পাওয়া সম্ভবই ছিল না। সেই পোড়ো বাংলোয় সেই জ্যোৎস্নাকুল সন্ধ্যায় কোন কিছু বিশ্লেষণ করে দেখতেই ইচ্ছে করছিল না আমার। আমার মনে হয় সুখেন্দু যদি গল্পটা আমার আপিসে আমাকে বলত আমি বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু সেই রহস্যময় পরিবেশে মনে হচ্ছিল জীবনের নিগূঢ় সত্যকে যেন প্রত্যক্ষ করছি, আমার জ্ঞানের পরিধি যে কতটুকু এবং বিদ্যার দৌড় যে কত স্বল্প এই নিগূঢ় সত্যটা সেদিন যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নিজের কাছে, স্পষ্ট হয়ে উঠে অবিশ্বাসের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল "হতে পারে বই কি! কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বিনিদ্র ভক্তের সন্ধানে পৃথিবীতে সশরীরে নেমে আসেন এ কথা তো সুবিদিত। বিশ্বাসও করেন অনেকে। পুরোপুরি অবিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি আছে কি আমার।"

এই আচ্ছন্ন মনোভাবের উপর লাগছিল জ্যোৎস্নার ঢেউ, লাগছিল দূরাগত বাঁশীর সুর, মৃদুলার বাঁকা বেণীটার অদৃশ্য স্পর্শ। অনেকক্ষণ পরে পরে যে পোকাটা 'চিপ্ চিপ্' করে ডাকছিল সে-ও যেন সাবধান করছিল আমাকে। বলছিল যেন, 'সাবধান, অবিশ্বাসের শ্যাওলায় পা দিলেই পিছলে পড়ে যাবে। সাবধান।' অনেকক্ষণ পরে পরে বলছিল, কিন্তু বলছিল—।

সুখেন্দুর মন ছিল শুকুল ঠাকুরের দিকে, অথচ সে আমাকে গল্পটাও না শুনিয়ে ছাড়বে না। আমি আসতেই আমাকে বলছিল, "কি রকম জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছ? আজ তোমাকে জ্যোৎস্না রাত্রিরই গল্প শোনাব একটা। গল্প নয়, সত্য কাহিনী। তুমি একটু বাগিয়ে বস দেখি। ওই কোণটায়। মৃ অনুপমকে চা দে এক কাপ। চা খাবে, না কফি? ও শুকুল, মশলাটা খুব বেশী ভেজো না—এই মাটি করেছে"—সুখেন্দু ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। মৃদুলাকে সুখেন্দু 'মৃ' বলে ডাকে। মৃদুলার হাতের তৈরি চমৎকার এক পেয়ালা চা খেয়ে মৃদুলার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ওর সপ্রতিভতার কথা। বিদেশে ঘুরেছি অনেক। সপ্রতিভ মেয়ে অনেক দেখেছি। এদেশে, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে, লাজুক মেয়ে দেখব বলেই প্রত্যাশা করি, বিশেষ করে সে যদি নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা হয়। আশা করেছিলাম মৃ এক পেয়ালা চা হাতে করে বাঁ হাত দিয়ে গায়ের কাপড় সামলাতে সামলাতে আনত নয়নে আনত মস্তকে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির একটু আভা ফুটিয়ে আসবে এবং তেপায়ার উপর ঠক্ করে পেয়ালাটা নাবিয়ে দিয়ে চলে যাবে। আশা করিনি যে সে এসেই বলবে, "না, এখানে বসা চলবে না আপনার। ওই কোণের দিকটায় চলুন আপনি। তেপায়াটা নিয়েই চলুন। বড্ড সিগারেট খান আপনি। ফুলুব সিগারেটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য হয় না, কাশি আছে ওর—"

এ আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার নির্দেশ অনুসারে যে কোণটায় গিয়ে বসতে হল সেখান থেকে মৃদুলার শুধু বেণীটাই নয়, মুখের খানিকটাও চোখে পড়তে লাগল, আর তার ঠিক পাশাপাশি উনুনের আঁচের ঝলকানিটাও। মনে হতে লাগল, মৃদুলার

ভিতর থেকেই বুঝি প্রদীপ্ত ঝলকটা বেরুচ্ছে। মৃদুলার কথাই ভাবছিলাম, তার সপ্রতিভতার কথা, কিন্তু হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। চক্রবাল রেখায় ঘনকৃষ্ণ অরণ্যের মাথায় একটি রূপোর নৌকো ভাসছে যেন। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বুঝতে পারলাম, ওটা জ্যোৎস্না-মাখা একটা মেঘের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু বুঝতে পেরে কষ্ট হল, যেন হতাশ হলাম। মনে হল, আহা, ওটা সত্যিই যদি রূপোর ময়ূরপঙ্খী হত আর সত্যই যদি ওটা ভাসতে ভাসতে এসে আমাদের বারান্দার নীচে থামত, আর অর থেকে নেমে আসত—এর পর ছবিটাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে ছন্দপতন ঘটে গেল। মৃদুলা তো সর্বক্ষণ সামনেই বসে রয়েছে, ও কি করে নামবে ওই রূপোর ময়ূরপঙ্খী থেকে! কিন্তু ও ছাড়া আর কাউকে ওই ময়ূরপঙ্খী থেকে নামাতে ইচ্ছেও হল না। সুতরাং কল্পনাটা এলোমেলো হয়ে গেল। আরও হল সুখেন্দুকে দেখে। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে মৃদুলার মুখের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের খানিকটা অংশ এবং উনুনটা দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলাম শুকুল ঠাকুরকে সরিয়ে সুখেন্দু নিজেই খুনতি চালাচ্ছে। সিগারেট কেসের উপর অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ ঠুকে আমি অবশেষে চতুর্থ সিগারেটটি ধরালাম। অদৃশ্য কীটটি পুনরায় টিপ্পনি কাটলে—চিপ্ চিপ্ চিপ্।

পড়ো বাংলো, জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন রাত্রি, জ্বলন্ত চুল্লীর পটভূমিকায় মৃদুলার মুখের খানিকটা, মশলা ভাজার গন্ধ, সুখেন্দুর ব্যস্ততা, নিরু আর ফুলুর ফিস ফিস গল্পের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাসি, মেঘের ময়ূরপঙ্খী, এই সমস্তই আমার চেতনায় ছাপ ফেলছিল, সাড়া তুলছিল, কিন্তু সবটা মিলিয়ে যা হচ্ছিল তা এদের কোনটার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় যেন। শাদা রঙের শুভ্রতার মধ্যে সাতটা রঙের একটারও আভাস পাওয়া যায় না। আমি যে অবর্ণনীয় একটা বেদনা অনুভব করছিলাম, যা শুধু বেদনাই নয় যা আনন্দও তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের হয়তো সম্পর্ক ছিল, হয়তো ছিল না। কিন্তু আমি একা একা নিজের সেই অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম। সুখেন্দু যে কখন রান্নাঘার থেকে বেরিয়ে গেছে তা আমি টের পাই নি। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের 'রামধ—ন' ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম. কিছু দূরে, বেশ কিছু দূরে, একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে সুখেন্দু চীৎকার করছে। রামধন কে? রাজুর দিকে চেয়ে দেখলাম সে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। মৃদুলা রান্নাঘরে উঠে গেছে, ফুলু নিরুর কানে কানে কি যেন বলছে ফিস ফিস করে। নিরুর মুখে মুচকি হাসি ফুটেছে। আশ্চর্য মেয়ে ওই নিরু। যদিও আমার সহোদরা বোন, কিন্তু ওকে যত দেখি তত আশ্চর্য হয়ে যাই। বেশ বুঝতে পারছি ওর মুখে যে মুচকি হাসিটা ফুটেছে সেটা পোশাকী হাসি, আটপৌরে হাসি নয়, ফুলু যে কথাটা রহস্যময়ভাবে তার কানে কানে বলছে তার জবাবে যতটুকু হাসি যেমন ভাবে হাসা উচিত, ঠিক ততটুকু হাসি তেমনিভাবে হাসছে ও। আমরা যে গরীব, ওকে যে স্কুলে চাকরি করে গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে হয়, তা কি ওকে দেখে বোঝবার উপায় আছে? চমৎকার একখানি শাড়ি পরে, ছিমছাম হয়ে বসে আছে যেন রাজকন্যাটি। রুচির প্রশংসা করতে হয়। সুখেন্দুদের প্রতিবেশী শ্রীদাম সিংহির মেয়ে ফুলু যে ওর কড়ে আঙুলের যোগ্যও নয় তা ও জানে, ইনজিনিয়ার শ্রীদামবাবুকে তোয়াজ করবার জন্যই যে সুখেন্দু তার ওই একমাত্র কন্যাটির প্রশংসায় গদগদ হয়ে ওঠে, যখন তখন নিমন্ত্রণ করে, এসব কথা নিরুর অবিদিত নেই, কিন্তু ফুলুর সঙ্গে ও এমনভাবে কথাবার্তা কইছে, যেন ফুলু ওর কত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

'রাম ধ—ন,' 'রাম ধ— ন', 'রাম ধ—ন' সমানে চীৎকার করে চলেছে সুখেন্দু। রামধন ব্যক্তিটি কে এবং এখন এখানে তার প্রয়োজনই বা কি তা বোঝবার আমার উপায় ছিল না।

আমার যে সত্তাটা আমার মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিল সুখেন্দুই তাকে হ্যাঁচকা মেরে তুললে আচমকা এসে।

"রাজু কি রকম নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে দেখেছ। ও বাহাদুরি করে অনার্স নিয়েছে বটে কিন্তু ওর যা ঘুমের বহর দেখছি তাতে আমি অন্তত ভরসা পাচ্ছি না। ওরে রাজু ওঠ না, তুই কি এখানে ঘুমিয়ে কাটাবি বলেই এসেছিস্ নাকি। বাড়িতে ঘুমোলেই পারতিস—"

এর উত্তরে রাজু পাশ ফিরে, মানে আমাদের দিকে পিছন ফিরে শুল। ফুলু মেয়েটি ঘাড় হেঁট করে খিল খিল করে হাসল। মৃদুলার গম্ভীর মুখশ্রীতে ভাবান্তর ঘটল না কোনও। আমি যেন ছায়াচিত্র দেখছিলাম গ্রহান্তরে বসে বসে।

সুখেন্দু হঠাৎ গল্পের প্রসঙ্গে উপনীত হল।

"আমি যে গল্পটা বলব সেটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। কিন্তু এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি, যে কোনও ভাল গল্প হার মেনে যাবে এর কাছে। সত্যি কিনা! তবে একটা কথা শুনিয়ে রাখি গোড়াতেই। এ গল্পের মর্ম বুঝতে হলে বিশ্বাসী মন চাই। নাস্তিক হলে চলবে না। তোমাদের সায়ান্সের ছেলেমানুষী অচল এখানে। কোন্‌খানেই বা চলে, বল। নীলা পাথরের কাণ্ড শুনেছ কখনও? নীলা যার 'সুট' করে তাকে রাজা করে দেয়, আর যার করে না তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখেছি আমি। জগৎকে তুমি তো চেন। একবার চুড়ির ব্যবসাতে ফেল মেরে তার সংসার অসচ্ছল হয়ে গেল হঠাৎ। তারপর কে যেন তাকে বুদ্ধি দিলে তুমি নীলা পর, দেখতে দেখতে অবস্থা ফিরে যাবে। আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইলে। পরামর্শ চাইবার ছুতো করে এসেছিল অবশ্য, আসলে এসেছিল টাকা চাইতে। কোথায় যেন ভাল নীলার সন্ধান পেয়েছিল একটা—আসল রক্তমুখী নীলা—দাম আড়াই শ' টাকা। আমাকে বললে, টাকাটা ধার দাও আমাকে। আমার হাতে তখন টাকা কোথায়? মামা কিছুদিন আগেই মারা গেছেন, রাজুর পরীক্ষা সামনে, বিজুর পরীক্ষা সামনে, মামীর হার্টের অসুখ চলছে, মৃ-কে বোর্ডিংয়ে পাঠিয়েছি, আমি নিজেই তখন কই মাছের মতো ছটফট করে বেড়াচ্ছি টাকার জন্যে, কিন্তু জগু নাছোড়বন্দা। টাকা তার চাই-ই, নীলা তাকে পড়তেই হবে। আমি তখন তাকে নিয়ে গেলাম আমাদের জুয়েলার পীতম্বরমের কাছে। সে বললে, বাবুজি, ভাল নীলা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নীলা পরবার আগে একজন ভাল জ্যোতিষীর পরামর্শ নেওয়া দরকার। জগু বললে, পরামর্শ নিয়েছি। ভগবানই জানেন কার কাছে ও পরামর্শ নিয়েছিল। নীলার আংটিটি পরে বাড়ি ফিরে এলেন বাছাধন। নীলার কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। নীলা পরার পর এক ঘণ্টাও কাটল না, ছোট ছেলেটা ছাত থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে অজ্ঞান। তাকে সামলাতে না সামলাতেই আদালতে থেকে 'শমন' এসে হাজির, চুড়ির ব্যবসাতে যিনি ওর অংশীদার ছিলেন তিনি ওর নামে জুয়াচুরির নালিশ করেছেন। আদালতের সিপাহী বিদেয় হতে না হতেই সাইকেল চেপে টেলিগ্রাফ পিওন দর্শন দিলেন। দেশে বাপ মর-মর, আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ করেছেন যাবার জন্যে। জগৎ তখন আংটিটি খুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ফেলে দিয়ে বাঁচল। তোমার সায়ান্স এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে? অথচ ঘটনাগুলো সত্যি, স্বচক্ষে দেখেছি।...."

সুখেন্দু হঠাৎ গেঞ্জিটা খুলে ফেলে পৈতে দিয়ে পিঠ চুলকোতে লাগল। কিন্তু পিঠের অজস্র ঘামাচি ওর মনকে যে একটুও অধিকার করে ছিল না তার প্রমাণ পেলাম যখন ও বলে উঠল—"আমার মনে হয় কি জানিস? জ্যোৎস্না জিনিসটা শুধু চাঁদের আলো নয়, ওটা সামথিং এলস্। যদি বলি আমাদেরই মনের আলো তাহলেও ঠিক হয় না অবশ্য, কারণ ঠিক পূর্ণিমা তিথিতেই মনে এরকম আলো বেরুবার মানে কি? তুমি টপ করে চেপে ধরবে জানি— কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে আমাদের মনের সঙ্গে ওর ওই প্রকাশটার ভীষণ যোগাযোগ আছে। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তবে ওই পাথরটা ঠিক আমাদের মতো জ্যোৎস্না উপভোগ করছে না এটা নিশ্চিত। আমাদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে শুধু আলো নয়, অনেক কিছু জড়িয়ে আছে, যেমন ধর চকোর—চকোর দেখেছিস কখনও? আমি কিন্তু দেখেছি, চকোর পাখি নয়, প্রজাপতি এক রকম—"

এমন সময় ন'দশ বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল।

বলল "বাবা এখন বাড়ি নেই। মাঠ থেকে ফেরেনি এখনও।"

"ও, তাই সাড়া পেলাম না। ফিরলে বলে দিস্ আমরা এসেছি। সমস্ত রাত থাকব। তোরা এখানে সবাই খাবি আজ। তোর ভাইটা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।"

"তোর মা?"

"মায়ের আবার শরীর খারাপ হয়েছে।"

"তুই তাহলে বাবার সঙ্গে আসিস্। কেমন?"

"আচ্ছা।"

জ্যোৎস্না প্রসঙ্গে সুখেন্দু যে আবোল-তাবোল আরম্ভ করেছিল, মেয়েটি এসে পড়াতে তার রং বদলালো বটে, কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত রকমে যে আমি একটু অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম।

"এই জ্যোৎস্না রাত্রির সঙ্গে আমার ভাগ্য অদ্ভুতভাবে জড়িত। মা যেদিন মারা যান সেদিনও এমনি জ্যোৎস্না, বাবা যেদিন মারা যান সেদিনও। মামা যেদিন মারা যান সেদিন প্রথম রাত্রে চাঁদ ছিল না, কিন্তু ঠিক মারা যাবার সময়টিতে দশদিক আলো করে চাঁদ উঠল। আর মামী যেদিন মারা যান সেদিন তো তুইও ছিলি কোলকাতায়, মনে নেই? কোলকাতার ভিতর বলে তত বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু নিমতলা ঘাটে গিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। রাত দুটো হবে তখন, মনে আছে তোর? মেস থেকে তোকে ডেকে নিয়ে গেলাম, সেই যে—"

"মনে আছে। সেদিনও পূর্ণিমা রাত্রি ছিল।"

"আশ্চর্য কাণ্ড' পূর্ণিমা রাত্রিতেই বেছে বেছে আমার জীবনে অন্ধকার এসেছে। অবশ্য একটি পূর্ণিমা রাত্রি ছাড়া। সেই গল্পটাই তোমাকে বলব আজ। নাম-টাম বলব না কিন্তু, তুমি জানতেও চেও না। ও কি, শুকুল আবার আসছে কেন?"

শুকুল ঠাকুর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সসঙ্কোচে বললে, "কালিয়ার ঝোলটা কি আর একটু মারব? আপনি যদি একবার দেখে যেতেন—"

"হুড় হুড় করে যে রকম জল ঢাললে তুমি ও মারতে গেলে আলুগুলো গলে কাদা হয়ে যাবে! চল দেখি, আলু বেশ সেদ্ধ হয়েছে তো?"

"হয়েছে।"

সুখেন্দু উঠে গেল।

যখন ফিরল তখন দেখলাম সে একটা অঙ্ক কষছে।

"চুয়ান্ন মাইল আসতে ঘণ্টা চারেক লাগুক। পাঁচটায় যদি ছাড়ে নটা নাগাদ এসে পৌঁছে যাবে। কি বল?"

"কার কথা বলছ?"

"দ্বিজুর। সে বলেছিল আসবে। তার মোটর বাইক আছে। আসবে খুব সম্ভবত। বিশেষত তুমি আসবে যখন শুনেছে—"

"দ্বিজু আপিস করেছে বুঝি?"

"সে কি আর করেছে, আমি জোর করে করে দিয়েছি। নিজের কোলিয়ারি নিজেই দেখুক না, নিজের জিনিস নিজে না দেখলে চলে? দিনরাত খালি পলিটিক্স্ আর খবরের কাগজ নিয়ে কাটালে সব যে উচ্ছন্ন যাবে। তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো তো। এখনও মন বসেনি ওর ঠিক করে।"

আমি অনেক দিন এদের কাছছাড়া। বিলেতেই চার বছর ছিলাম। তাই এদের পারিবারিক অনেক খবর জানা ছিল না।

"বিজু চাকরি করছে?"

"হ্যাঁ, প্রফেসারি। মাইনে বড্ড কম। তবু বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজার চেয়ে তো ভালো। খাবার পরবার অবশ্য অভাব নেই এদের, কিন্তু এরা এতো কাছা-খোলা যে সামলে সুমলে দেবার মতো হুঁশিয়ার লোক যদি সংসারে না থাকে, তাহলে এদের বিষয় সম্পত্তি থাকবে কিনা সন্দেহ। তাই এদের প্রত্যেককেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। কাজে লেগে থাকলে খানিকটা হুঁশ হয় তবু। বিজুটা সবচেয়ে বেশী অন্যমনস্ক। সেদিন গিয়ে দেখি বিজু একটা মোমবাতি জ্বেলে পড়ছে। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। নিজে আমি বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন করিয়ে গেছি, মোমবাতি মানে! বিজুকে জিগ্যেস করতে সে কাচুমাচু হয়ে উত্তর দিলে, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয় নি বলে বোধ হয় কানেকশন কেটে দিয়েছে। টাকার অভাব নয়, হুঁশের অভাব। ইচ্ছে হল কান ধরে ঠাস করে একটা চড় মারি—"

ক্রুদ্ধ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল সুখেন্দু। যেন আমিই অপরাধী।

"কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান! চড় ওদের মারা যায় না। মারতে পারা যায় না। মারতে পারলে ওরা মানুষ হত। কিন্তু সেটি আর জীবনে পেরে উঠলাম না। আমিই তো ওদের মাটি করেছি। মামা তো সেই কবে মারা গেছেন আর মামী তো পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়েই রইলেন বরাবর। ভার তো ছিল আমার উপর। কিন্তু ওদের শাসন আমি কিছুতেই করতে পারলাম না।"

সুখেন্দু ঘন ঘন পা নাচাতে লাগল। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে বেশ খানিকক্ষণ পা নাচিয়ে টপ করে উঠে পড়ল আবার। বারান্দার অন্ধকার কোণটার দিকে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝুড়ি বার করলে টেনে।

"মৃ এই দ্যাখ এইখানে রেখেছে মাটির গ্লাসগুলো। আমি তখন থেকে ভাবছি গ্লাসগুলো গেল কোথায়, আসবার সময় গাড়িতে তুলতেই ভুল হয়ে গেল, না কি হল—"

"ওগুলো এখন টেনে বার করছ কেন। আমিই তো ওখানে সরিয়ে রেখেছি, খাবার সময় বার করলেই হবে—"

"ধুতে হবে না?"

"ধুয়েই রেখেছি।"

সুখেন্দু আমার দিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে একবার। তারপর ঝুড়িটা আবার গিয়ে কোণে রেখে এল।

"শুরু কর এবার তোমার গল্প—"

"হ্যাঁ করছি।"

এসে বসে আবার পা নাচাতে শুরু করলে। তারপর একটা রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "কোনখান থেকে শুরু করি তাই ভাবছি। আচ্ছা, প্যাঁচা দেখেছিস তুই?"

"দেখেছি। ছবিতে—"

"জ্যান্ত প্যাঁচা দেখিস নি কখনও?"

"কি করে দেখব। তবে চিড়িয়াখানায় মনে হচ্ছে দেখেছি—"

"কত বড় দেখেছিস?"

"ঠিক মনে নেই। তবে খুব বড় নয়।"

"রং কি রকম?"

একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। প্যাঁচা নিয়ে যে হঠাৎ সুখেন্দু জেরা শুরু করবে তা কে জানত!

বললাম, "যতদূর মনে হচ্ছে মেটে মেটে—"

"তাহলে কুটুরে প্যাঁচা দেখেছ।"

"তা হবে—"

"কিন্তু আমি সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে যা দেখেছিলাম তা ধবধবে শাদা। মনে হচ্ছিল, শাদা মখমল দিয়ে মোড়া তার গা। চোখ দুটি হীরের মতো জ্বলছে। বেরালের চোখও অন্ধকারে জ্বলে—দেখেছ নিশ্চয়—কিন্তু সে যা দেখেছিলাম তা অদ্ভুত। মনে হচ্ছিল চোখ দুটি হাসছে, আর তার থেকে যে আলো বেরুচ্ছে তা যেন জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাও যেন নয়, অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ একটা জ্যোতি, যা দেখে ভয় হয় না, ভরসা হয়। আমি তো প্রথম ওই চোখ দুটোই দেখেছিলাম—"

গল্পে বাধা পড়ল।

রামধন এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাকছিলেন?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার মনে আছে, আমরা এই বাড়ি আর আশপাশের এই জমিগুলো কোন্ সালে কিনেছিলাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক আঠারো বছর আগে—"

সুখেন্দু আমার দিকে চেয়ে বললে—"মনে রেখ কথাটা—"

তারপর রামধনের দিকে ফিরে বললে—"এই কথাটাই জানতে চাইছিলাম। একটু পরে তোমার মেয়েকে সঙ্গে করে এখানে এস। রাত্রে এখানেই খাবে।"

"যে আজ্ঞে।"

দণ্ডবৎ করে রামধন চলে গেল।

অপসৃয়মান রামধনের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সুখেন্দু বললে—"আমি যে জ্যোৎস্না রাত্রির গল্পটা বলতে যাচ্ছি তা এসেছিল ঠিক কুড়ি বছর আগে। মানে আমার বয়স তখন ন' কিম্বা দশ। তোর সঙ্গে আমার আলাপই হয়নি তখন। ক্লাশ প্রমোশন পাইনি সেবার, মামার দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াই, চোখোচোখি হয়ে গেলেই মামা কটমট করে তাকান আমার দিকে, আর আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা চলছে তখন..."

হঠাৎ চুপ করে গেল সুখেন্দু। তারপর বললে, "মামীর মুখটা মনে পড়ছে। আশ্চর্য, একরোখা লোক ছিলেন। আমি স্বকর্ণে শুনেছি মামাকে বলতে— দেখ, সুকুকে কিছু বোলো না। ফেল করে বেচারা মনমরা হয়ে আছে, তার ওপর আমাদের আশ্রিত, তুমি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না। এ বিষয়ে একটি কথাও বোলো না। মামা মুখ দিয়ে কিছু বলেন নি, বলেছিলেন চোখ দিয়ে। তাঁর সে কটমট চাউনি—বাপ্‌স্‌—জীবনে ভুলব না কখনও।"

সুখেন্দু জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে পা নাচাতে লাগল আবার।

তারপর আবার মুচকি হেসে বললে—"মামার ওই চাউনিটাই কিন্তু সারাজীবন *ঠেলে ঠেলে* ঠিক রাস্তায় নিয়ে গেছে আমাকে। এখনও নিয়ে যাচ্ছে। চাউনিটার কটমট ভাবটা কমেছে কিন্তু মনে হয়। মনে হয়, বুঝেছেন তিনি ব্যাপারটা এতদিনে। গেল বছরের ঘটনাটার পর বোঝা উচিত অন্তত। আহা, মামীও যদি থাকতেন তখন, ছিলেন নিশ্চয়ই কোথাও, আমি যদিও টের পাইনি সেটা। টের পেলে খুব ভালো লাগত। সারাজীবন মেয়েটাকে দাঁতে চিবিয়ে রেখেছিলেন তো—কিন্তু আসল কথা বুঝেছিলেন তিনি—"

পুনরায় চুপ করে গেল সে। আকাশের দিকে চেয়ে রইল চুপ করে। তার নীরবতা এমন একটা বিশেষ ধরনের নীরবতা বলে আমার মনে হল যে আমিও চুপ করে রইলাম। কথা বলে তা ভেঙে ফেলবার প্রশ্নও জাগল না আমার মনে, নিতান্ত প্রয়োজন হলেও একটা দামী কাচের ফুলদানী ভেঙে ফেলবার কল্পনা করে না যেমন কেউ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অবাক হয়ে গেলাম আমি। কিছুক্ষণ আগে দিগন্তরেখায় ঘনকৃষ্ণ অরণ্যশীর্ষে যে ছোট মেঘের ময়ূরপঙ্খীটি ভেসে উঠেছিল; মনে হল, সেটি যেন বেশ বড় হয়েছে, ময়ূরের গলাটি আরও স্পষ্ট, আরও বড় হয়ে উঠেছে যেন...

সুখেন্দুই নীরবতা ভঙ্গ করল শেষে।

"গেল বছরের ঘটনাটা এতই অদ্ভুত যে যখনই মনে হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ে হাত দিয়ে দেখ—"

সুখেন্দু আমার হাতটা টেনে তার গায়ের উপর রাখল। অনুভব করলাম, সত্যই সে রোমাঞ্চিত হয়ে বসে আছে।

"গেল বছরের ঘটনাটা কি—"

"সাংসারিক ঘটনাই, টাকাকড়ির ব্যাপার, কিন্তু অদ্ভুত—"

"কি রকম—"

"তুই তখন বিলেতে। কোথাও কিছু নেই মকোদ্দমা বেধে গেল একটা। মকোদ্দমা আমরা বাধাই নি, বাধালে আমাদের শত্রুপক্ষ মল্লিকরা। আমরা কিছুদিন আগে যে কোলিয়ারিটা কিনেছিলাম—যে কোলিয়ারির আপিসে দ্বিজু আছে এখন— সেই কোলিয়ারিটা মল্লিকেরই নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু টপ করে আমিই কিনে ফেললাম সেটা এদের নামে, সে-ও এক রোমাঞ্চকর ঘটনা, পরে বলব সেটা। মল্লিকের ছিল রাগ, সে এক দলিল বার করে কোলিয়ারিটা ক্লেম করে বসল। আমাদের উকিল ভজহরি সেন অভিজ্ঞ লোক। তিনি বললেন, মকোদ্দমা আমরা জিতবো, মকোদ্দমা লড়বার খরচ খরচাও উশুল হবে, লড়তে হবে কিন্তু। অর্থাৎ হাজার বিশ পঁচিশ টাকার দরকার। রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে গেলাম। তখন আমাদের হাতে শ' পাঁচেক টাকাও নেই। যাঁর কাছ থেকে কোলিয়ারি কিনেছিলাম, গেলাম তাঁর কাছে। তিনি সমস্ত শুনে হাসিমুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন শুধু। মিনিট দু'তিন কোনও কথাই বললেন না। তারপর বললেন, "মল্লিকের কাছ থেকে আমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা ধার নিয়েছি, একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু কোলিয়ারি বাঁধা রেখে ধার নিয়েছি এ কথাটা মিথ্যে। কিন্তু—"

আবার হাসিমুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন তিনি। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "মল্লিককে দিয়েই দিন না কোলিয়ারিটা, আপনারা যে টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, তা সুদসুদ্ধ ফেরৎ পাবেন। ওর যখন ঝোঁক হয়েছে, নিতে দিন ওকে, তা না হলে আমাকে ও বিপদে ফেলবে। বলচে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম ওই কোলিয়ারির আশায়, আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু ও বলছে ওই মর্মে আমি নাকি চিঠি দিয়েছিলাম ওকে, আমার ঠিক মনে নেই অবশ্য... মে বি"

আমি খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম শেষ পর্যন্ত। প্রথমত, আমার আশ্চর্য লাগছিল জ্যোৎস্না-রাত্রির কাহিনীর সঙ্গে কোলিয়ারি-মল্লিক-ভজহরি-মকোদ্দমা এসবের সম্পর্ক কোথায়—কিন্তু সুখেন্দুকে তা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হচ্ছিল না, বস্তুত ওর উৎসাহিত অনর্গল বক্তৃতায় বাধা দিতে মায়াই হচ্ছিল। ও এমনভাবে কথাগুলো বলছিল, ওর চোখে মুখে বলবার ভঙ্গিমায় এমন একটা তন্ময় ভাব ফুটে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল ও যেন গল্প বলছে না, স্তোত্র পাঠ করছে। আমি মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে বা মুচকি হেসে 'ও' 'ও' বলে সায় দেবার ভান করছিলাম বটে কিন্তু বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গল্পের খেইও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে মজার আর আশ্চর্যের বিষয় খেই হারিয়েও যেন হারাই নি! আমার অন্যমনস্ক মন আমার অজ্ঞাতসারেই যেন খেইটা ধরেছিল। কানে যেটা ঢুকছিল না সেটা আমি যেন মনে করে তৈরী করে নিচ্ছিলাম। কেন জানি না, মনে আর একটা জ্যোৎস্নারাত্রির ছবি জাগছিল। অদ্ভুত সে ছবিটা।

...নির্মেঘ আকাশে অনাবিল জ্যোৎস্না উঠেছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি নির্জন এক বিরাট প্রান্তরে। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। দিগ্বলয়ে যে তরুশ্রেণী সাধারণত তরঙ্গায়িত হয়ে দেখা দেয় স্থূল

সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ রেখায়, তাও যেন নেই। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ সোজা যেন মাঠে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে! মাঠের মাঝখানে—ঠিক মাঝখানে অদ্ভুত স্তুপের মতো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। মনে হচ্ছে ভুবনেশ্বরের মন্দির। এখানে কোথা থেকে এল? তারপর মনে হল সেটা কখনও ছোট, কখনও বড় হচ্ছে। আনন্দময় জীবনের মাঝখানে একটা সন্দেহের মতো যেন কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে! হঠাৎ কালো মন্দিরে আলো জ্বলে উঠল। আলোকিত হয়ে উঠল মন্দির-দ্বার। কালো মন্দিরের গায়ে আলোকের চতুর্ভুজ ফুটে উঠল—আর সেই চতুর্ভুজের বুকে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন রূপসী কিশোরী একটি....মনে হল লক্ষ্মী....

সুখেন্দুর একটা কথা কানের ভিতর ঢুকে হঠাৎ তীরের মত বসে গেল মনে।

"সেই মেয়েটি কেবল বললে কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"কোন্ মেয়েটি—"

"সেই যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেদিন রাত্রে—"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ—"

ভান করলাম আবার। কোন্ মেয়েকে কখন সে কিভাবে কুড়িয়ে পেয়েছিল তা আমি শুনিই নি মোটে, কিন্তু সে কথা সুখেন্দুকে বলতে পারলাম না।

সুখেন্দু বলতে লাগল—"আমি তার কথায় প্রথমে কানই দিইনি। এক অদৃশ্য হস্ত সেজন্য আমার কানটা মলে দিলে যখন ঘণ্টা দুই পরে পিওন চিঠি নিয়ে এল। আশ্চর্য হলাম, আমেরিকা থেকে কে চিঠি লিখতে পারে! চিঠিটা খুলে পড়লাম— যদিও তখন সেই অদৃশ্য হস্ত কান মলছিল আমার— তবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তে হল। মনে পড়ল আমার মামার এক দূর সম্পর্কের ভাই, আমেরিকা পালিয়েছিল বহুদিন আগে। সে ভিতরে ভিতরে কবে লক্ষপতি হয়েছে, কবে মারা গেছে, কিছুই জানতাম না। আমেরিকা থেকে তার উকিল আমাদের জানাচ্ছে যে, সে মৃত্যুকালে দশলক্ষ টাকা রাজু, বিজু ও দ্বিজুকে সমভাবে দিয়ে গেছে...। ঠুকে দিলাম মকোদ্দমা। জিতলামও। ভজহরি যা বলেছিল তাই হল।...."

"চিপ্ চিপ্ চিপ্" টিপ্পনি কাটলে সেই অদৃশ্য পোকাটা।

এই রহস্যময় কীটকে ঘিরে আমার মন নতুন একটা স্বপ্নলোক সৃজন করতে যাচ্ছিল কিন্তু পারল না। উপর্যুপরি বাধা পড়ল কয়েকটা। ফট্ ফট্ ফট্ ফট্ শব্দে নৈশ নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করে মোটর বাইকে চড়ে দ্বিজু হাজির হল এসে, আর তার সঙ্গে প্রফেসার বিজুও। হঠাৎ ভূমিকম্প হলে লোকে যেমন দাপাদাপি করে সুখেন্দু তাই করতে লাগল। রাজু ঘুমুচ্ছিল, উঠে বসল। এর সঙ্গে মিশল এসে একটা গন্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি মৃদুলা নেই। ফুলু নিরুও নেই। তারপর নজরে পড়ল বারান্দার কোণের দিকে তোলা উনুনে মৃদুলা কি যেন ভাজছে মোড়ায় বসে। কাটলেট সম্ভবত। গন্ধটা অন্তত সেইরকম ছেড়েছে।

"আরে বিজু, তুইও এসেছিস, ভালই হয়েছে। মানে, তোর ছুটি যদিও, তবু ভাবলাম পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছিস—তা বেশ হয়েছে। এ বাইকটা কার? তোরটাতে তো সাইডকার ছিল না—"

প্রশ্নটা দ্বিজুকেই করল সুখেন্দু। কিন্তু দ্বিজু এমন ভাব প্রকাশ করলে যেন সে বধির। নিপুণভাবে গাড়িটিকে বারান্দার একধারে তুললে, মালকোঁচা খুললে, তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে একবার। সুখেন্দুর দিকে চাইলেও না।

বিজু এগিয়ে এসে সম্বোধন করলে সুখেন্দুকেই।

"সুখেনদা, একটা ভারী মজার খবর আছে—"

"তুমি তো কেবল মজার খবর নিয়েই মশগুল আছ। কি খবর আনলে আবার!"

"সেদিন ইলেক্‌ট্রিক কানেকশন কে কেটেছিল জান? কোম্পানি নয়, ইঁদুর!"

"কি রকম—"

"আমি ওদের বিলটা আপিসে পাঠিয়ে দিয়ে লিখে পাঠালুম যে কানেকশনটা ওরা যেন তাড়াতাড়ি করে দেয়। কলেজ থেকে ফোন করলাম একবার। ওরা বললে—ওরা কানেকশন কাটেনি। মানে ওরাও কাটতে ভুলে গেছল। তারপর একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এনে দেখি—একটা ইঁদুর চিলেকোটার ঘরটায় একটা তার কাটতে গিয়ে নিজেও মরেছে, আর ফিউজও করে দিয়েছে সব—"

"এখন ঠিক হয়ে গেছে তো।"

"হ্যাঁ—"

"বিজু, সাইড্‌কার-ওলা মোটর বাইকটা তুই কোথা থেকে আনলি! চেয়ে আনলি কারো— ?"

সুখেন্দু ছাড়বার পাত্র নয়। দ্বিজু কিন্তু অন্যদিকেই চেয়ে রইল, যেন শুনতে পায়নি।

"চিপ্‌ চিপ্‌ চিপ্‌" মন্তব্য করলে পোকাটা আবার।

আমার স্বপ্নটা কিন্তু আর জমল না কিছুক্ষণের জন্য।

"বিজুটা যে আসবে তা আমি জানতাম। কাটলেটের আয়োজন আগে থেকেই করে রেখেছি তাই—"

অপ্রত্যাশিতভাবে আমার পিছন দিকে কথা কইল মৃদুলা। কথার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে তার চুলের গন্ধও মিশল খানিকটা এসে। অচেনা গন্ধ, তবু মনে হতে লাগল চেনা-চেনা। জবাকুসুম? কেশরঞ্জন? লক্ষ্মীবিলাস? ম্যাকেসার? না, একটাও না। চেনা, অথচ অচেনা! সুখেন্দু কিন্তু না-ছোড়।

"দ্বিজু এ বাইকটা কোথা পেলি তুই?"

দ্বিজু মুখটা উঁচু করে গলাটা চুলকোতে লাগল।

জবাব দিলে বিজু— "দাদা এটা নতুন কিনেছে।"

"নতুন কিনেছে? নতুন? মানে?"

দ্বিজু পিছন দিকের বারান্দায় চলে গেল।

"কি জানি। এটাতে সাইড্‌কার আছে বলে বোধ হয়।"

"সাইড্‌কার নিয়ে কি হবে?"

"কি জানি—"

"টাকা কি খোলামকুচি? পুরোনো বাইকটা কি করলে?"

"বেচে দিয়েছে।"

"কততে—"

"সাড়ে পাঁচশ।"

"কিনেছিল ন'শ টাকায়। সাড়ে তিনশ' টাকা এমনভাবে লোকশান করার মানে—? কোথায় গেল দ্বিজু?"

দ্বিজুর পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মৃদুলাও নিঃশব্দে চলে গেছে।

"এটার দাম কত—"

"সাড়ে বারোশ"—

"দ্বিজুই উচ্ছন্ন দেবে সংসারটা। এত টাকা ও পাচ্ছে কোথায়? ব্যাংকের একাউণ্ট তো আমার নামে। ধারে কিনেছে নিশ্চয়। দ্বিজু, দ্বিজু, কোথা গেলি তুই—"

সুখেন্দু ডাকতে ডাকতে পিছন দিকের বারান্দায় চলে গেল। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব। চেয়ে দেখি জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। একটা নীরব হাসিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যেন চারিদিক।

দুই
বিজেনের কথা

নিরু ঠিক ভাবছে আমি ওর জন্যেই এসেছি। অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যি ওর জন্যে আমি আসিনি। দাদার আপিসে যখন বিকেলে গেলাম তখনও জানি না যে এখানে আসব, সুখেনদা যে এখানে পিক্‌নিকের আয়োজন করেছেন, অবনদা যে নিরুকে নিয়ে এসেছেন, এসব কিছুই জানতাম না আমি। সুখেনদা আমাকে খবরটা কেন দেন নি কে জানে! অথচ দাদাকে দিয়েছেন। ভাগ্যে দাদার আপিসে গিয়েছিলাম, আর ভাগ্যে দাদা সাইড্‌কারওলা নতুন বাইকটা কিনেছে, তাই এখানে আসা হল। নিরু আসবে জানলে বইটা নিয়ে আসতাম। নিরু লিখেছিল ব্র্যাড্‌লের 'পোইট্রি ফর পোইট্রিজ সেক' প্রবন্ধটা ঠিক বুঝতে পারছে না সে। আমি যদি তাকে ব্যাপারটা সরলভাবে বুঝিয়ে দিই তা হলে উপকার হয় তার। অর্থাৎ সে আশা করেছিল চিঠি লিখে লিখে বুঝিয়ে দেব তাকে, কিন্তু আমার সময় কই চিঠি লেখবার। এখানে আসব জানলে বইটাই নিয়ে আসতাম। দাদার সাইড্‌কার-ওলা বাইকটাই নিয়ে এল আমাকে, আমি আসি নি। দাদা হঠাৎ সাইডকার-ওলা বাইক কিনে ফেললে কেন? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, তখন লক্ষ্য করিনি এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি আসব বলাতে দাদা সোজাসুজি 'না' বলতে পারলে না যদিও, কিন্তু খুব খুশীও হয় নি। আমাকে বললে, "তুই যেতে চাইছিস, কাল সকালেই তোর কলেজ না? আমার তো ফিরতে ন'টা দশটা বেজে যাবে। তুই কলেজ যাবি কি করে!" আমি হেসে উত্তর দিলাম, "যাব না, না হয়। একদিন কামাই করলে আর কি হয়।" দাদা ভুরু কুঁচকে রইল কোন উত্তর দিলে না। এখন মনে হচ্ছে, দাদা সাইড্‌কারটা কি মনে মনে আর কারও জন্যে রিজার্ভ করে রেখেছিল নাকি!...চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ। 'চমৎকার' বলছি কারণ ওর চেয়ে ভাল কথা জানা নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে-রোদ আজ দিনে পৃথিবী পুড়িয়ে দিচ্ছিল তাই চাঁদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে জ্যোৎস্নায় রূপায়িত হয়েছে। জিনিসটা একই কিন্তু প্রকাশ দু'রকম। একই বিষয় নিয়ে দুজন কবি যেন দুটো কবিতা লিখেছেন। নিরুকে এখন কাছে পেলে ভাল হত, 'কবিতার জন্যই কবিতা'—ব্র্যাড্‌লের এই প্রবন্ধের মর্ম ওকে বুঝিয়ে দিতাম। চাকরটা বলল 'টুনটুনি' নদীর ধারে ফুলুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে। খাবার কত দেরি কে জানে! সুখেনদা এত রাত্রে আমার

জন্যে পায়রা খুঁজতে বেরিয়েছে শুনলাম। পায়রার মাংস আমার খুব প্রিয় বটে, এ অঞ্চলে পাওয়াও যায় খুব শুনেছি, কিন্তু এতরাত্রে খোঁজাখুঁজির দরকার ছিল না। কিন্তু সুখেনদাকে মানা করবে কে! আমি টিলার উপর এসে বসেছি, ওরা আমাকে খুঁজে পাবে তো! চমৎকার টিলাটা কিন্তু। চারদিকেই ছোট বড় নানা রকম টিলা। এই টিলাটা সব চেয়ে চমৎকার। কে জানে এই সবের তলাতেই কোনও মহেঞ্জোদাড়ো আত্মগোপন করে আছে হয় তো। সুখেনদা জায়গাটা যখন কিনেছিল তখন কিন্তু অনেকে মানা করেছিল। বলেছিল এটা নাকি কোন পাঠান-সেনাপতির আমলে কবরস্থান ছিল। তাঁর হারেমের হাজার কয়েক বেগম নাকি সমাধিস্থ হয়েছিলেন এখানে। সুখেনদা অবশ্য শোনেন নি কিছু। সুখেনদা কারও কথা শোনেন না। জায়গাটা ভালই। এখানে যখনই এসেছি ভাল লেগেছে। ভয় করে নি কখনও। একটা মুক্তির আস্বাদ পেয়েছি যেন। হারেমের কবরখানা বলেই হয়তো মুক্তির আবহাওয়া চতুর্দিকে। নিরু যদি থাকত এখন বেশ হত। আকাশে কি উড়ছে ওগুলো? খুব ছোট পাখির মতো। চকোর? চকোর বলে সত্যি কোন পাখি আছে কি। আছে নিশ্চয়, তা না হলে কবিরা লিখেছেন কেন। কিন্তু পরী আছে কি? ডানা-ওলা পরী? কবিরা পরীর কথাও কম লেখেন নি। কবিদের কাব্যলোকে এমন সব খবর থাকে যার বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই, অস্তিত্ব থাকবার দরকারও নেই, কিন্তু তবু তারা আছে, চিরকাল থাকবে। বাস্তব জগতে টেরোড্যাক্‌টিল ছিল এককালে, এখন নেই। পরীরা কিন্তু বরাবর আছে, বরাবর থাকবে। নিরু যদি থাকত এখন বেশ হত। টুনটুনি নদী কতদূরে এখান থেকে! ওকি, বাইকে চড়ে দ্বিজুদা চলল কোথায় এখন। নিমাইবাবুর কাছে নাকি? নিশ্চয় নিমাইবাবুর কাছে। যাবে বলছিল..।

তিন
দ্বিজেনের কথা

মোটর বাইক জিনিসটার আর সবই ভালো, একটা দোষ ভয়ানক শব্দ করে। ওতে চড়ে গোপনে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। বেরুবার মুখেই সুখেনদা ধরে ফেললে। সুখেনদা শুকুল ঠাকুরকে নিয়ে একগাদা পায়রা ছাড়াতে ব্যস্ত ছিল। গরম জল, পেট্রোম্যাক্‌স নিয়ে হৈ হৈ করছিল দক্ষিণ দিকের মাঠটায়, আমি ভাবলাম এই সময়ে সরে পড়ি, নিমাই ডাক্তারকে নিয়ে আসি, তারই মারফত কথাটা পাড়ব আজ সুখেনদার কাছে। নিমাই সেনের কথা সুখেনদা ঠেলতে পারবে না। কিন্তু বাইকে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট আওয়াজ হল—ছি—ছি—ছি—ছি! সুখেনদা ছুটে এলো।

"কোথা বেরুচ্ছিস এখন?"

"নিমাইকে নিয়ে আসি—"

"নিমাইকে পাবি কি এখন! তাছাড়া আমাদের কুলুবে কিনা, বিজু একস্ট্রা হয়েছে, রামধন আর তার মেয়েকে খেতে বলেছি, ফুলুর আসবার কথা ছিল না সে-ও এসে গেছে। শুকুল, কুলুবে তো?"

"মাংস পাঁচ সের আছে। পায়রা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়—আটটা আছে। পায়রায় কম পড়বে। ঘি-ভাতেও কম হবে।"

সুখেনদা অকারণে ধমকে উঠলেন শুকুলকে।

"ঘি-ভাত চড়িয়ে দাও এখুনি। রামধন পায়রা আনছে আরও! সুখিয়াদের বাড়িতে গেছে সে—কম পড়লেই হল!"

"তাদের তো অনেক পায়রা—"

"তবে ভাবছ কেন?"

শুকুল জবাব না দিয়ে কর্তিত-কণ্ঠ পায়রাগুলোকে গরম জলে ডোবাতে লাগল।

সুখেনদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বেশী দেরি কোরো না যেন। পায়রার মাংস পনেরো মিনিটে হয়ে যাবে। যাবে আর আসবে?"

সাধারণত আমি মিছে কথা বলতে চাই না, তাই কোন উত্তর না দিয়ে বাইকে সোয়ার হলাম। নিমাইয়ের বাড়ি পৌঁছেই নিমাইকে টপ করে তুলে নিয়ে চলে আসবে এ রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে হয় কোনও! নিমাই কি একটা নির্জীব পদার্থ যে তাকে টপ করে তুলে বাইকের পিছনে বেঁধে নিয়ে আসব? সে ডাক্তার লোক, বাড়িতেই নেই হয়তো! টেলিগ্রাফ করবার কিম্বা ফোন করবার সুবিধে থাকলে আগে থাকতে তাই করতাম, কিন্তু সে সুবিধে যখন নেই, তখন কপালের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে আজ পূর্ণিমা রাত্রি। পূর্ণিমা রাত্রিতে নিমাই কোথাও বেরুতে চায় না সাধারণত। ছাতের উপর বসে থাকে চুপ করে। ঘুমোয় না শুনেছি। অথচ কবি নয়। আমার সঙ্গে এখানে আসতে চাইবে কি না কে জানে! তবে জ্যোৎস্না উপভোগ করাই যদি ছাতে বসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে, এই মাঠে, সেটা, আরও ভালভাবে করতে পারবে। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে কি একটা চাকরি নিয়ে গিয়েছিল ও কিছুদিন আগে, তারপর থেকেই এইরকম হয়েছে শুনেছি। নিমাই কবি নয়। বরং একটু কাঠ-খোট্টা ধরনের। বিয়ে করেনি। কলেজে শুনেছিলাম একটা উড়ো খবর, কিন্তু সেটা উড়ো খবরই সম্ভবত। প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাবার ছেলে ও নয়, নামটা যদিও নিমাই। আমার ভয়, নিমাই হয়তো আমার প্রস্তাবে রাজিই হবে না। হয়তো বলবে, সুখেন্দু চাটুজ্যে আমার কথায় ওঠে-বসে বলেই কি তাকে ওঠ-বোস করাতে হবে এর কোন মানে নেই। সে আমাকে ভালবাসে বলেই ওঠ-বোস করে, ভালবাসাটাকে নির্যাতনের অস্ত্র করা উচিত হবে কি? নিমাই যে ঠিক কি ভাবে জিনিসটা নেবে তা বুঝতেই পারছি না। হয়তো সোৎসাহে রাজি হয়ে যাবে, কিম্বা হয়তো বলবে, না ভাই, তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে আমাকে টেনো না, জাতি-ভেদের সার্থকতা নিয়ে লম্বা বক্তৃতাও দিয়ে দিতে পারে, কিছু বলা যায় না। কিন্তু তাকে আমি রাজি করাবই। না করলে চলবে না। আমি কিছুতেই সুখেনদাকে বলতে পারব না। আর এক সমস্যা হচ্ছে মৃ। মৃ-র অভিমতটা কি হবে তাও অনিশ্চিত। নিরুর মারফত জানতে হবে সেটা। নিরু ফুলুকে নিয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেল, একজনকেও ধরতে পারলাম না। এই সুযোগে, মানে আজ রাত্রেই, মৃ-কেও কথাটা বলতে পারলে ভাল হয়। তার যদি আপত্তি থাকে তাহলেই তো মুশকিল। তার আপত্তির সঙ্গে সুখেনদার আপত্তি মিলিত হলে বিপত্তি হয়ে দাঁড়াবে সেটা। কিন্তু আন্দাজে মনে হয় মৃ আমার দিকে। সাইড্‌কার-ওলা মোটর বাইক কেনবার টাকাটা তা না হলে দিত না। টাকাটা দেবার সময় যে মিষ্টি মুচকি হাসিটা হেসেছিল তা সিগ্‌নিফিকাণ্ট! আবার আশ্চর্য লাগে, মৃ টাকা পায় কোথা! সুখেনদা দেয় নিশ্চয়। কিন্তু

সুখেনদাকে যতদূর জানি বাজে খরচ করবার মতো অজস্র টাকা মৃকে দেবে তা-ও তো মনে হয় না। মৃ-র কাছে কিন্তু টাকা চাইলেই পাওয়া যায়। রাজুকে ছ'টা সিল্কের পাঞ্জাবী করিয়ে দিয়েছে, মানে প্রায় দু'শ টাকার ধাক্কা। সুখেনদা এ নিয়ে চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু মনে হল করতে হয় বলে করছিল, আসলে মৃ-র ওপর চটা সুখেনদার পক্ষে অসম্ভব।

চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ কিন্তু। মনে হচ্ছে পৃথিবীর ভিতর থেকেই একটা আলো ফুটে বেরুচ্ছে, জোনাকীর গা থেকে যেমন ফুটে বেরোয়। ছি ছি, কি ভীষণ শব্দ করছে আমার এই গাড়িটা। ফুলুকে সাইড্‌কারে বসিয়ে এক চক্কোর দিয়ে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু তা আর হবে না দেখছি। অন্যান্য বাধা তো আছেই, ফুলুও রাজি হবে না। এই মাঠটা যদি সমুদ্র হত আর এই বাইকটা হত যদি মোটর-বোট তাহলে.... টিলার ওপর বসে আছে একজন। ফুলু নয়, নির্জন মাঠে একা টিলার উপর বসে থাকার মতো সাহস নেই ওর। কে ও? বিজু এসেছে বোধ হয়। কবি লোক কবিতার মিল খুঁজছে বোধ হয়। জ্যোৎস্নার সঙ্গে কিসের মিল হতে পারে? আমার জানা তো কিছুই নেই। তবে 'চাঁদিনী' বলে একটা কথা আছে, তার সঙ্গে 'কাঁদিনি' 'বাঁধিনি' মেলান যায় অনায়াসে। কিন্তু সেটা কি সত্যি কথা হবে? সত্যি কথা হচ্ছে 'কেঁদেছি' 'বেঁধেছি'।

চার
নিরুর কথা

বিজুদা আসবে জানলে আমি অন্তত আসতাম না। উপর্যুপরি চারখানা চিঠি লিখেছি—দরকারী চিঠি—পড়া-শোনার ব্যাপারে—কিন্তু একটারও উত্তর দেয়নি। ইস্কুলে মাস্টারি করতে করতে প্রাইভেটে এম-এ দেওয়া যে কি ব্যাপার তা বিজুদার অন্তত বোঝা উচিত। একটারও উত্তর দিলে না কি বলে! 'আর্ট ফর আর্টস সেক্' 'পোইট্রি ফর পোইট্রিজ সেক্' সোজাসুজি সংক্ষেপে বোঝা যায়। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষককে আমার সেই সংক্ষেপে বোঝাটা বিস্তৃত করে বোঝাই কি করে! আর সেই বোঝানর উপরই নির্ভর করছে নম্বর, মানে ডিগ্রী। বেশ খানিকটা লিখতে হবে আর সে লেখাটা আবোল তাবোল হলে চলবে না। আসলে ওসব ব্যাপারে আবোল তাবোলই বকে সবাই কিন্তু সেটাকে এমন একটা ভদ্র চেহারা দিতে হয় যাতে লোকে মনে করে জ্ঞানগর্ভ কিছু বলা হল বুঝি। বিজুদাকে অত করে অত বার লিখলাম যে সোজা করে লিখে দাও কিছু, মুখস্থ করে ফেলি। উত্তর দিলে না। ওর সামনে বসে থাকা যায় কখনও? ফুলু আসাতে সুবিধে হয়েছে। অসুবিধেও হয়েছে। ও এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করেছে যা দুরূহ ঠিক নয়, কিন্তু এখানে—এই টুনটুনি নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাত্রে বেমানান। কিন্তু ও ছাড়বে না। ব্যাগে করে নিয়ে এসেছে সব, এমন কি টর্চ পর্যন্ত। এত লোক থাকতে আমাকেই বা এ বিষয়ে পারদর্শী ঠাওরালে কেন ও কে জানে! ফুলুকে চটাতেও চাই না, ওর দাদার কাছ থেকে বই আদায় করতে হবে কয়েকখানা। ব্র্যাডলের বইখানা ওর দাদাই দিয়েছে।

"দেখ না নিরুদি, তুমি কি ভাবছ বল দেখি জলের দিকে চেয়ে চেয়ে।"

ফুলু বই খুলে তার উপর টর্চের আলো ফেলেছে।

"আমি এই পানি-শঙ্খ প্যাটার্নটা করতে চাই। ভাল হবে না? গোট বরফিটা কিন্তু আরও ঠাস মনে হচ্ছে নয়?"

"কি করবে তুমি—"

"সোয়েটার। কাউকে বোলো না যেন।"

"তাহলে গোট-বরফি কর।"

"পানি-শঙ্খ নামটা কিন্তু বেশ। নামটার জন্যেই করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওটা। পানি-শঙ্খ বেশ নামটা, নয়?"

"হ্যাঁ, বেশ। পানি-শঙ্খও খারাপ হবে না—"

পানি-শঙ্খ খারাপ হবে কি হবে না তা আমার জানা নেই, কখনও করিনি, দেখিনিও। কিন্তু ফুলুকে চটাতে চাই না।

"আচ্ছা, কি রং মানাবে বলতো? ফিকে সোনালী, না, ফিকে সবুজ? না বাদামী—"

"কে পরবে, মেয়ে না পুরুষ?"

ফুলু চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, তার পরে বলল, "পুরুষ। বোলো না যেন কাউকে"—মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপলে একটু।

"পুরুষদের বাদামী বা ছাই ছাই রঙ মানাবে—"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। বাদামীই করি তাহলে। কি বল?"

"কর। উল কেনা হয়েছে?"

"হয়েছে, তিন রকমই কিনেছি। সঙ্গে এনেওছি।"

"ও—"

"পানি-শঙ্খই করি তাহলে, কি বল। আজই শুরু করি—"

"এখানে কোথা বুনবে?"

"রামধনদের ওখানে যাই চল। বেশ, নিরিবিলি ওখানটা। তাই চল নিরুদি।"

ফুলু আমাকে দিদি বলে কিন্তু ও আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়। প্রথম যখন বলেছিল গা জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু অমন অনেক গাত্রদাহ সহ্য করতে হয়েছে জীবনে। মধ্যবিত্তদের সহ্য করতে হয়। রোজ যখন স্কুলে যাই ডাইনে বামে পিছনে সামনে মোটরগাড়ির হর্ন আর পথচারী জনতার হ্যাংলা চাউনি—শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও। মেয়েরা মেয়েদের আরও খুঁটিয়ে দেখে, সে দেখার মধ্যে ঈর্ষাই থাকে না সব সময়ে, হ্যাংলামিও দেখেছি—এসব তো সহ্য করতেই হয় রোজ। করুনাদির কথাটা মনে পড়ে, করুণাদি বলত যার যত সয়, তার তত জয়। করুণাদি যদিও জয়লাভ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, সকলের জন্য সহ্য করতে করতে যক্ষ্মাই হল বেচারার। স্যানাটোরিয়মে যেদিন মারা যায় সেদিন কাছেও কেউ ছিল না। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ওই রকমই হয়। করুণাদি যদিও হেরে গেছে কিন্তু করুণাদির কথার দাম একটুও কমেনি সেজন্য। "যার যত সয়, তার তত জয়"—বহুমূল্য কথা এটা। নিজের জীবনেই বুঝতে পারছি। পিসীমার লাথি ঝাঁটা সহ্য না করলে কি পড়াশোনা হত কিছু? আজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে হত।

"জলের দিকে অমন করে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখছ তুমি নিরুদি—"

"দেখছি দিনের আলোয় যে টুনটুনিকে গরীবের মেয়ের মতো দেখায়, চাঁদের আলোয় সেই টুনটুনিকে রাজার মেয়ের মতো দেখাচ্ছে।"

"তা দেখাক, চল আমরা রামধনের বাড়িতে যাই। তোমার কাছেই শুরু করি সোয়েটারটা।"

"আমার তো রামধনের সঙ্গে আলাপ নেই মোটে। যাওয়া কি ঠিক হবে? তার স্ত্রীর শরীরও খারাপ শুনলাম—"

"তাতে কি হয়েছে। আমাকে খুব খাতির করে ওরা। আমার বাবার খুব অনুগত কিনা। বাবার আণ্ডারেই রামধন কাজ করে তো। গেলে খুব খুশি হবে।"

কি বলব, চুপ করে রইলাম। সোজাসুজি 'না' বলবার ক্ষমতা নেই, ফুলুর দাদার বইগুলো না পেলে পরীক্ষাই দেওয়া হবে না আমার। অথচ উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে, এই নদীর ধারে—ফুলুটাকে সঙ্গে না আনলেই হত। বড়লোকের মেয়ে তো, অত্যন্ত একগুঁয়ে। যেটা ধরবে সহজে ছাড়বে না। এখন এখানে এসে সোয়েটার বোনবার মানে হয় কোনও?

"রামধন কি কাজ করে তোমার বাবার আণ্ডারে—"

"কুলি-খাটায় সম্ভবত। এই কাছেই কোথায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বাবা সেটার কনট্রাক্ট্ নিয়েছেন কিনা, সুখেনবাবুরও শেয়ার আছে তাতে শুনেছি। সুখেনবাবুই রামধনকে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন।"

হঠাৎ ফুলু থেমে গেল।

"সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছ তুমি নিরুদি—?"

"সিগারেটের? হ্যাঁ, পাচ্ছি তো।"

সত্যিই একটা মিষ্টি সিগারেটের গন্ধ কখন যে ধীরে ধীরে এসে আমাদের ঘিরে ফেলেছিল, টেরই পাইনি আমরা। সিগারেটের এ গন্ধটা চেনা, অত্যন্ত চেনা, অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে গন্ধটার সঙ্গে, বিজুদা এসেছে নিশ্চয়। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, কাউকে দেখা গেল না। নদীর পাড়টা এক জায়াগায় হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে, ওর আড়ালে বসে আছে নাকি কেউ। বিজুদা কি? গন্ধটা বিজুদার সিগারেটের। অত্যন্ত চেনা গন্ধ। বিজুটা যদি এসে থাকে উঠতে হবে এখান থেকে। কথা বলব না ওর সঙ্গে।

ফুলু চুপিচুপি বললে—"একটা কথা কি জানো নিরুদি? এ জায়গাটা নাকি ভুতুড়ে। কবরস্থান ছিল নাকি এককালে। ভয় করছে আমার, চল উঠি এখান থেকে—"

উঠলাম কিন্তু যেতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। এদিক ওদিক চাইলাম আবার। কেউ নেই।

"চল, ওদিকে যাচ্ছ কোথা। রামধনের বাড়ি এদিকে—"

আমি কিন্তু যাচ্ছিলাম নদীর পাড়টা হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে যেখানে সেই দিকে। কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। উঁচুটার আড়ালে বসে আছে একজন।

"কে, বিজুদা নাকি—"

"না, আমি?"

"ও রাজু? তুমি এখানে বসে কেন?"

"এমনি। খাওয়ার দেরি আছে দেখে ভাবলাম বেড়িয়ে আসি একটু। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ, নয়?"

"হ্যাঁ।"

ফুলু বললে—"যদি কেউ খুঁজতে আসে বোলো আমরা রামধনের বাড়িতে গেছি।"

"আচ্ছা—"

পাঁচ

রাজেনের কথা

নিরুদি দেখতে পেয়েছে কি? কথাটা বিজুদার কানে যদি তুলে দেয় তাহলেই মুশকিল হবে। লোভ সামলাতে পারলাম না কিছুতে। নাইন নাইন নাইন আজকাল তো দেখাই যায় না বাজারে, বিজুদা পেলে কোথা থেকে! বিজুদা অনেক সন্ধান রাখে। আমার বিশ্বাস ওই যে অ্যামেরিকান সাহেবটা বিজুদার কাছে আসে সে-ই সন্ধান দিয়েছে। আমাদের হোস্টেলের কাছে যে দোকানটা আছে সেটা অতি বাজে। পছন্দমত জিনিস একটাও পাওয়া যায় না। কুইংক্ রাখে না। কোবরা পালিশ নেই। যা চাও তাই বলে নেই। বিজুদা কি টের পাবে? বেশী সরাই নি, গুটি চারেক মাত্র। নিরুদি যদি দেখতে পেয়ে থাকে ঠিক বিজুদাকে বলে দেবে। দু'জনে ভাব খুব। বলবে কি? বলুক গে। মৃ আছে সামলে দেবে ঠিক। মৃ জানে আমি স্মোক করি। কিন্তু চুরি করেছি শুনলে চটে যাবে হয়তো। কিন্তু মুশকিল, চটলে বোঝা যাবে না। হাসবে শুধু মুচকি মুচকি, তর্জনীটা তুলে শাসাবে হয়তো দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে, আর হাসবে, বোঝা যাবে না চটেছে। না বোঝা যাক সামলে দেবে তবু। আমাকে আজ খবরের কাগজটা পড়তে দিলে না কেন বুঝলাম না। হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে ফেললে। খেলার খবরটা দেখাই হয়নি আজ। মোসাদেকেরই বা কি হল কে জানে। কাশ্মীরের আবদাল্লা যে শেষ পর্যন্ত আলিবাবার আবদাল্লা হয়ে যাবে কে জানত। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ধরেছিলেন কিন্তু ঠিক। মৃ আমাকে কাগজটা পড়তে দিলে না কেন! নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে কিছু। ও, বুঝেছি! মৃ বাজিতে হেরেছে বোধ হয়। ঠিক হেরেছে। আমি বলেছিলাম ইস্টবেঙ্গল এবারও জিতবে, মৃ বলেছিল হারবে। চার পাঁচ দিন থেকে কোলকাতা ছাড়া, কোলকাতার কোন খবর পাইনি। কাল খেলাটা হয়ে গেছে। আজকের কাগজে খবরটা আছে বোধ হয়। সেইজন্যই মৃ দিলে না কাগজটা। নগদ দশটি টাকা গুণে দিতে হবে, আমি ছাড়ছি না দেখতে হবে কাগজটা। কে আসছে? ওরে বাবা, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়। বিজুদা!

"কে রাজু নাকি? এখানে কি করছিস?"

"এমনি বেড়াচ্ছি—"

"এদিকে নিরু এসেছিল, দেখেছিস তাকে?"

"নিরুদি আর ফুলুদি এইখানেই ছিল। রামধনের বাড়িতে গেল বোধ হয়।"

"রামধনের বাড়িতে? কেন?"

"জানি না তো।"

"তুই গিয়ে নিরুকে পাঠিয়ে দে একবার আমার কাছে। তার সঙ্গে দরকার আছে একটু।"

"এইখানেই পাঠিয়ে দেব?"

"আমি ওই টিলাটার উপর বসছি।"

"আচ্ছা—"

বাঁচা গেল! নিরুদির সঙ্গে কি দরকার বিজুদার। নিশ্চয়ই নিরুদি কিছু বুঝতে চেয়েছে বিজুদার কাছে। আর একদিনও এসেছিল আমাদের বাড়িতে। এসব বোঝাবুঝির আড়ালে আর কিছু নেই তো! ওরা সব বেরালের জাত, অন্যমনস্ক হলেই পাত থেকে মাছটি তুলে নেবে, একটু খাতির করবে না। আর বিজুদা যে রকম ভাবে-ভোলা লোক— !

ছয়
অবনীশের কথা

পায়রাগুলোর ব্যবস্থা করে সুখেন আবার এসে বসেছিল আমার কাছে। আবার শুরু করেছিল তার গল্প। খাপছাড়া ভাবে মাঝখান থেকেই শুরু করেছিল। মৃদুলার অনুরোধে গোটা দুই কাটলেট খেয়ে পুবদিকের বারান্দার কোণে ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে পড়েছিলাম, এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে আমার পায়ের উপর পড়েছিল। ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম একটু, মানে চোখ বুজে পড়ে ছিলাম, মনে হচ্ছিল একটু যেন নেশা হয়েছে, কিসের নেশা তা বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, উপভোগ করছিলাম সেটা। একটা সূক্ষ্ম জাল, সূতোর নয়, আলোর, নানা রঙের আলোর—আমার চারিদিকে যেন মূর্ত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। আমি অস্পষ্ট ভাবে ভাববার চেষ্টা করছিলাম ঊর্ণনাভটি আমি স্বয়ং না আর কেউ। এমন সময় সুখেন হাজির হল।

"অবন ঘুমুলি নাকি —"

"না। পারাবত পর্ব শেষ হল তোমার?"

"হয়েছে। জিরে গোলমরিচটা বাটা হলেই চড়িয়ে দেব এইবার। শুকুলই দেবে। আমি ততক্ষণ গল্পটা শোনাই তোকে। ছেলে-মেয়েগুলো বেরিয়ে গেছে, ভালই হয়েছে। কতদূর বলেছি বলতো—"

"সেই যে কোন মেয়েকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছিলে—"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু এইখানে একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমার কৃতিত্ব ওই কুড়িয়ে-পাওয়া পর্যন্ত। আর কিছু আমি করিনি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই কুড়িয়ে পাওয়াটাও আমার কৃতিত্ব কিনা সন্দেহ আছে। আমিই ওকে দেখতে পাব এইটে হয়তো আগে থাকতেই ঠিক হয়েছিল, আর সেই জন্যেই বোধ হয় রঘু ডোমের কাছে শূয়োরের দাঁত পেলাম না, যেতে হল আমাকে তেজপুরে শিবুর কাছে। ভাগ্যে সেবার পুজো ছিল দেরিতে, তাই শূয়োরের দাঁতের উপর ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়িটি বসাতে পেরেছিলেন মামী। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাগানের ভিতর দিয়ে শর্টকাট্ করছিলাম—আমাদের গ্রামের সেই বাগানটা দেখেছিস? সেই যে-বাগানটায় কহিতুর আমের গাছ ছিল একটা, তোকে খাইয়েছি তো সে আম, মনে নেই? এত ভুলে যাস্ তুই?"

হঠাৎ আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে সুখেন।

"আমের কথা মনে আছে। শূয়োরের দাঁতের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।"

"পারবে কি করে! শহরে শহরে কাটিয়েছ চিরটাকাল, লক্ষ্মীপুজোর ব্যাপার খুঁটিয়ে জান না। জানলে বুঝতে।"

"ও, লক্ষ্মীপুজোয় শূয়োরের দাঁত লাগে বুঝি—"

"হ্যাঁ। বেড়ের মাঝখানে দিতে হয়। তার উপর বসাতে হয় ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়ি। আমার কি মনে হয় জানিস? আমাদের পুজোগুলোর মধ্যে মানব-সভ্যতার, আজকালকার ভাষায় প্রগতির, ইতিহাস লুকোনো আছে। শূয়োরের দাঁতের উপর ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়ি বসানো মানে শত্রুকে জয় করে লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করা। ওটা ছেলেখেলাও নয়, ননসেন্সও নয়। লক্ষ্মীকে লাভ করতে হলে পশুকে জয় করা চাই, ওটা, মানে শূয়োরের দাঁতটা হল আমাদের সেই পশু-জয়ের প্রতীক। এটা আমার থিয়োরি অবশ্য, মানা না-মানা তোমার ইচ্ছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম বাগানের ভিতর দিয়ে যখন শর্টকাট্ করছিলাম, তখন প্রথম চোখ দুটো দেখতে পাই। ছোটছোট দুটো পূর্ণিমার চাদ, বা এক জোড়া দামী বৈদূর্যমণি, এখন নানারকম উপমা দিতে পারি, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল বন-বেরালের চোখ, অন্ধকারে জ্বলছে। লক্ষ্মীপ্যাঁচা বলে বুঝতেই পারি নি তখন, এক ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম তখন, ভয়ে। কিন্তু আমার স্বভাব তো জানিসই, কোন জিনিসকে তলিয়ে না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাই না। তলিয়ে দেখতে গিয়েই ব্যাপারটা ঘটে গেল। কিন্তু তারপর আমার আর কোন হাত নেই। মামা মামী দুজনেই কিন্তু সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। মামীর মতে আমি যদি ওই কুড়োনো মেয়েটাকে কুড়োনো মেয়েই বলতাম—নিজে বরাবর ওকে 'কুড়ুনী' বলেই ডাকতেন তিনি—তাহলে ব্যাপারটা এমন জট পাকাত না। জট পাকিয়ে গেছেন অবশ্য তিনিই বেশি, তিনি মুখে বলতেন, কুড়ুনী, কিন্তু মনে মনে জানতেন অন্যরকম। বাইরে বকতেন, মারতেন, মুখে চব্বিশ-ঘণ্টা দাঁতে চিবিয়ে রাখতেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয় করতেন, ভক্তি করতেন। আমি একদিন স্বচক্ষে যা দেখেছিলাম তা অদ্ভুত। অদ্ভুত—"

হঠাৎ থেমে গেল সুখেন্দু। আমার চারিদিকে, মানে আমার সমস্ত সত্তাকে ঘিরে, যে জালটা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল সেটাও যেন থেমে গেল। সেটাও যেন কথা কইছিল আমার কানে কানে সূক্ষ্ম বর্ণের ভাষায়। চেয়ে দেখলাম, সুখেন্দু দিগ্বলয়ের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। সেখানে ময়ূরপঙ্খী নেই, একটা ছোট শাদা মেঘ, খুব ছোট, একা ভেসে বেড়াচ্ছে। সে-ও যেন মহাশূন্যের জ্যোৎস্নালোকিত মহিমায় অদ্ভুত কিছুর সন্ধান করছে। বড় ছিল, ছোট হয়ে গেছে, ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

"কি দেখলুম জানিস্?"—সুখেন্দু অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু করল আবার—"দেখলুম সেই কুড়ুনী মেয়েটাকে, যাকে তিনি সমস্ত দিন খাটাতেন, বাসন মাজাতেন, ঘর ঝাড়ু দেওয়াতেন, কাপড় কাচাতেন, অষ্টপ্রহর যাকে দূর দূর করতেন, মর মর করতেন, সেই মেয়েটাকে প্রণাম করছেন গলবস্ত্র হয়ে। গভীর রাত, ছম ছম করছে চারিদিক, মিট মিট করছে ঘরের প্রদীপ, মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে তার গালে কপালে, আমি দাঁড়িয়ে আছি জানলার ধারে চোরের মতো। মামী বসে আছেন মেজেতে হাতজোড় করে, হাঁটু গেড়ে। প্রণাম করছেন বারবার। ঘুমন্ত মেয়েটার মুখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত একটা হাসি,

মেঘচাপা জ্যোৎস্নার মতো। আমি চোরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি নির্বাক হয়ে। অদ্ভুত. সত্যিই অদ্ভুত। অথচ ওই মানুষই দিনের বেলা কি কাণ্ডই করতেন, যেন ওই কুড়োনো মেয়েটা আপদ বালাই, দূর হয়ে গেলে যেন হাড় জুড়োয় ওঁর। আসল কথা জানিস? নজরে বিশ্বাস করতেন মামী। ধরতে পারলি কথাটা—"

পারলাম কিনা তা ব্যক্ত করবার মুখেই বাধা পড়ল। রামধন দাঁড়াল এসে।

"পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটা চাইলেন ফুলুদিদি।"

"ফুলুদিদি কোথা?"

"আমার বাড়িতে।"

"আর কে আছে?"

"নিরুদিদি।"

"পেট্রোম্যাক্স নিয়ে কি করবে এখন?"

"কি একটা বই পড়ছেন। আমার লণ্ঠনটায় তেল নেই।"

"ও, আচ্ছা নিয়ে যাও। দাঁড়াও জ্বেলেই দিই আমি। সেবার জ্বালতে গিয়ে ম্যানটেলটি ভেঙেছিল রাজু।"

উঠে গেল সুখেন। আবার তন্দ্রা এল। তন্দ্রায় মনের ভিতর ঝড় বইতে লাগল। আঁধি। ধুলো উড়তে লাগল, মনের ভিতর কত সিনের কত আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়েছিল, সব উড়তে লাগল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বরাহ শিকারীর দল কলরব করতে লাগল একযোগে। মনে হল, ঝড়ের ওপারে ডাইনীর দল বসে আছে বিষাক্ত দৃষ্টির ফাঁদ পেতে সত্য-শিব-সুন্দরকে ধরবে বলে, মারবে বলে। সত্য-শিব-সুন্দর কুৎসিতের বেশ ধরেছে, মুখোশ পরে পার হয়ে যাচ্ছে ফাঁদ, এড়িয়ে যাচ্ছে ডাইনিকে। ভণ্ডামির নৌকোয় পার হচ্ছে সত্য-শিব-সুন্দর.....ঝড়ে নৌকো ডুবে গেল... অপার সমুদ্রে ভাসছে সত্য-শিব-সুন্দর... ঝড় প্রবলতর হচ্ছে... ঢেউগুলো উত্তাল...তারপর কেবল ঝড় ঝড় ঝড়। হঠাৎ মনে হল পাশের ঘরেও ঝড় উঠেছে। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলাম। সুখেন পেট্রোম্যাক্স জ্বেলেছে। জানালা দিয়ে প্রখর আলো পড়েছে এক ঝলক বারান্দায়। জ্যোৎস্না পালিয়েছে।

মৃদুলার গলা পেলাম।

"কার গল্প শোনাচ্ছ তুমি অবনীশবাবুকে—"

"ও একটা ভুতুড়ে গল্প। কফি করতে বললাম যে, তার কি হল?"

"হয়ে গেছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

রামধন পেট্রোম্যাক্স নিয়ে চলে গেল। জ্যোৎস্না ফিরে এল আবার। তারপর একটা চাকর এসে তেপায়া রেখে গেল একটা আমার সামনে। তারপর কফি নিয়ে এল এক পেয়ালা। মৃদুলা নয়, চাকরটা। তারপর সুখেন এল আবার। হাতে কফির কাপ।

"কফিটা বড্ড কড়া হয়েছে।"

"কড়া কফিই ভাল লাগে আমার।"

"আশ্চয, মৃদুলাও ঠিক ওই কথা বললে। নিরুর কাছে খবর পেয়েছে বোধ হয়।"

নীরবে কফি পান শেষ করলাম দুজনে।

কাপটা সন্তর্পণে এককোণে রেখে সুখেন্দু জিগ্যেস করলে, "নজরে বিশ্বাস করিস তুই—"

"করি বোধ হয়। একবার ভাল একটা বুল টেরিয়ার পুষেছিলাম, সবাই নজর দিত কুকুরটার উপর, মরে গেল সেটা হঠাৎ একদিন।"

"মামীমাও করতেন, তাই ওই মেয়েটা যে কে, তা বুঝতে দিতে চাইতেন না কাউকে। এমন কি মেয়েটাকেও না। কিন্তু সেদিন ওর ঘুমন্ত মুখে হাসিটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটা জানে, তাকে মামী ফাঁকি দিতে পারেন নি।"

ঠিক এই সময় সেই গন্ধটা পেলাম আবার। চেনা অথচ অচেনা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মৃদুলা আমার পিছনদিকের সিঁড়িটা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। সোজা মাঠের মধ্যে নেমে গেল।

"তুই আবার কোথা চল্লি। রামধনের বাড়িতে নাকি?"

"না, আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

ঘাড় ফিরিয়ে কথাগুলি বলে মৃদুলা চলতেই লাগল কিন্তু। থামল গিয়ে, হাতাটা শেষ হয়েছে যেখানে সেইখানে। থেমে চেয়ে রইল রাস্তার দিকে। যেন কারো অপেক্ষা করছে। সুখেন বোধ হয় আবার গল্পটাই শুরু করতে যাচ্ছিল কিন্তু থামের আড়াল থেকে শুকুল ঠাকুর গলা খাঁকারি দিলে সন্তর্পণে।

"কি শুকুল? পায়রাটা চড়িয়ে দিয়েছ?"

"দিয়েছি। এখনি হয়ে যাবে। কিন্তু খাওয়া হবে কিসে?"

"কেন, অত কলাগাছ রয়েছে, পাতা কাটতে বল ভজুয়াকে।"

"ভজুয়া কাটতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিদি মানা করলে।"

"দিদি মানে মৃ?"

"হ্যাঁ—"

"ও, আচ্ছা থাক, কেটো না তাহলে। মৃ-কে জিগ্যেস করছি আমি—"

শুকুল চলে গেল। আমরা দুজনে মৃদুলার দিকে চাইলাম। আমার মনে হতে লাগল, জ্যোৎস্না, কুয়াশা, আর আমার চোখের ভুল মিলে যে জিনিসটা মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতার ওপারে, তা মৃদুলা নয়, তা আর ফিরবেও না। যে ফিরে এসে আমরা কিসে খাব তার সমাধান করবে সে মৃদুলা হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকে নিয়ে মন মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। সুখেনের কপালের চামড়া কুঁচকে ছিল কিনা তা আবছা আলোতে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু ওর চোখ দুটোতে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তা অবর্ণনীয়, মাদাম ক্যুরি প্রথম যখন তার আবিষ্কৃত রেডিয়মের দিকে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতেও এই রকম একটা ভাব ফুটেছিল সম্ভবত। কয়েক সেকেণ্ড নির্নিমেষে চেয়ে রইল সুখেন। তারপর আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে হাত দুটো ওলটালে।

"কিছু একটা মতলব আছে ওর। আমি আর মাথা ঘামাব না তাহলে, ও যখন ঘামাচ্ছে আমার ঘামিয়ে লাভ নেই। গল্পটাই আরম্ভ করা যাক বরং—"

"তাই কর।"

"সেই কুড়োনো-মেয়েটাকে কুড়োনো মেয়ে না ভেবে আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম এবং সেটা মামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলাম; এতেই মামী প্রকাশ্যে চটেছিলেন আমার উপর এবং

মেয়েটা যে সত্যিই একটা আপদ এসে জুটে গেল এ কথাটা দিবালোকে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করতেও ছাড়ে নি। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর কি ছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি একদিন। বললাম তোকে এক্ষুণি। মেয়েটির সম্বন্ধে মামীর বাইরের অশ্রদ্ধা এবং ভিতরের শ্রদ্ধা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তাতে সবচেয়ে বিপদে পড়েছিলেন মামা। তিনি মামীর শ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধা দুটোরই আভাস পেতেন, ঠিক করতে পারতেন না নিজে কি করবেন। ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে মামী বকতেন, খারাপ ব্যবহার করলেও বকতেন, নির্বিকার থাকলে বলতেন তুমি মানুষ না পাথর! ফলে মামা আমার উপর চটে গেলেন, ভাবলেন আমিই এই বিপদ জুটিয়েছি। তারপর ফেল করেছিলাম সেবার, তাই মামার চোখের দৃষ্টি কটমট থেকে কটমট-তর হয়ে উঠত মাঝে মাঝে। পরে অবশ্য তিনিও আসল ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, যখন ভালবেসে ফেললেন মেয়েটাকে, বুঝেছিলেন যে লক্ষ্মী যখন আসেন শোরগোল করে আসেন না, চুপি চুপি অলক্ষ্যে আসেন নারিকেল-ফলোম্বুবৎ, বুঝেছিলেন যে, আমি নিমিত্তমাত্র, ও আসতই। তাই শেষের দিকে তার চোখের দৃষ্টি আর কটমট তো ছিলই না, কোমল হয়ে এসেছিল রীতিমত, সে দৃষ্টি যেন বলত, বাবা সুখেন দীর্ঘজীবী হ' তুই। তিনি যে মেয়েটাকে ভালবেসেছিলেন তা বোঝা গেল যখন বছর চারেক পরে ওই কুড়োনো মেয়ের এক পিসেমশাই হাজির হল এসে। শূয়োরের মত দেখতে। এসে বললে শ্রীদামগঞ্জে লক্ষ্মী পুজোর মেলা দেখতে ওর পিসিমা ওকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে, মেলায় ও হারিয়ে যায়। লোক-মুখে শুনলাম আপনারা নাকি মেয়ে কুড়িয়ে পেয়েছেন একটি, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শুনে মামা বললেন, ও আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে গেছে, ও এখন আমরা ছেড়ে থাকতে পারব না। আপনি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবেন। পিসেমশায় বললেন, আমি ওকে নিয়েই যেতে চাই। ওর মা-বাবা মারা যাবার পর ওর পিসীই ওকে মানুষ করেছিল কিনা। এর উত্তরে মামা সংক্ষেপে বললেন, আমরা ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না, মাপ করবেন। লোকটা চলে গেল। কিন্তু গিয়ে মকোদ্দমা ঠুকে দিলে একটা মামার নামে। উকিল ভজহরি সেন সব শুনে মাথায় হাত বুলুলে কয়েকবার চোখ বুজে, তারপরে বললে, আমরা জিতব। কিন্তু লড়তে হবে, টাকা খরচ হবে। মামার তখন হাত খালি। দোকানটি ফেল মেরেছে। কুড়োনো মেয়েকে নিয়ে মোকদ্দমা বেধেছে শুনে মামী তো ক্ষেপে গেলেন। মেয়েটাকে দিনের বেলা এমনভাবে দাঁতে চিবোতেন যেন কাটোয়ার ডাঁটা চিবুচ্ছেন, আর রাতের বেলা, হাত জোড় করে প্রণাম করতেন। আমি মজা দেখতুম লুকিয়ে লুকিয়ে। ভজহরির মতি বদলে গেল হঠাৎ। বললে কুছ পরোয়া নেই, ফি দিতে হবে না আমাকে, আমি এমনিই খাটব! খাটতে লাগলেন। আমার বয়স তখন বছর চোদ্দ কি পনের। ভজহরি একটা ঠিকানা দিয়ে আমাকে বললেন, একটি কাজ করতে হবে বাবা তোমাকে। তুমি এই ঠিকানায় চলে যাও, চলে গিয়ে মেয়েটির মা বাপের নাম আর ওদের কুল-পরিচয় সংগ্রহ করে আন। পিসেমশায়ের খবরও যদি কিছু পাও নিয়ে এস সংগ্রহ করে। গেলাম। তখনই জানলাম যে মেয়েটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। মহাদেব মুকুজ্যে ওর বাপের নাম। মহাদেব মুকুজ্যে আর তার বউ শৈলবালা একদিনে একসঙ্গে কলেরায় মারা গেল যখন, পিসেমশায় বটুকেশ্বর গাঙ্গুলীর ঘাড়ে মেয়েটা তখন পড়ে গেল। বছরখানেক বয়স তখন ওর। বটুকেশ্বরের স্ত্রী ছিল না, ছিল একটি রক্ষিতা। শুনলাম দুজনে মিলে মদ খেত, আর

ঠ্যাঙাতো ওই কচি মেয়েটাকে। জুতো পেটা করত শুনলাম। শ্রীদামগঞ্জের মেলায় ওকে এনেছিল বিক্রি করবার জন্যে। তারিণী বাগদীর বাঁজা বউ (নবিগঞ্জে বাড়ি তাদের, মাইলখানেক দূরে) কিনতে চেয়েছিল মেয়েটাকে নগদ কুড়ি টাকা দিয়ে। পাড়ার লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে শ্রীদামগঞ্জের মেলায় বেচা-কেনা হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু মেলার ভিড়ে মেয়েটা গেল হারিয়ে। হঠাৎ উবে গেল যেন, আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। যে মেয়েকে বটুক অমন করে বাড়ি থেকে বিদেয় করতে চাইছিল, তাকেই ফিরে পাওয়ার জন্যে আবার মকোদ্দমা করছে কেন, এ রহস্যের সমাধান করে এলাম আমি। মেয়েটাকে বিদেয় করে দেওয়ার পর থেকে হাড়ির হাল শুরু হয়েছিল বটুকেশ্বর গাঙ্গুলীর। কাত্যায়নীর, মানে সেই রক্ষিতাটির কুষ্ঠ হল, দেনার দায়ে জমিগুলো নীলামে উঠল, লিবারে ব্যথা হতে লাগল বটুকের, ডাক্তাররা পয়সা লুটতে লাগল। এমন সময় এল পাঞ্জাবী গনৎকার। সে বটুকেশ্বরের হাত দেখে বললে— তোমার ঘরে লক্ষ্মী এসেছিলেন, তুমি জুতো মেরে তাঁকে বিদেয় করেছ, তাই তোমার এই দুর্দশা। তুমি আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তাহলেই লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসবে তোমার। বটুকেশ্বর তাই খুঁজে খুঁজে এসেছিল। সমস্ত শুনে উকিল ভজহরি সেন আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, সাবাস। পাঠালেন তখন নিজের মুহুরি সনাতন ভটচাজকে। সনাতন সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করে একেবারে পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা করে এল। ভজহরি খুঁজেপেতে মহাদেব মুকুজ্যের সঙ্গে আমার মামার এক সম্পর্ক বার করলেন, একটা জাল চিঠিও তৈরি করলেন। সে চিঠিতে লেখা ছিল যে, তাঁদের অবর্তমানে মামা যদি মেয়েটির ভার নেন তাহলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন, কারণ ডাক্তার বলছে যে তাঁদের আর বাঁচবার আশা নেই। চিঠিটা এমনভাবে লেখা ছিল যেন মহাদেব মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে শুয়ে চিঠিটা লিখিয়েছিলেন শ্যামলাল মিত্তিরকে দিয়ে। মাত্র পঁচিশ টাকা নিয়ে শ্যামলাল আদালতে এই মিথ্যে কথাটি বলে গেল। তারিণী বাগদির বাঁজা বউও এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়ে গেল। সত্য কথাটা বলবার জন্যে অবশ্য টাকা দিতে হল তাকে। মোকদ্দমায় জিতলেন ভজহরি। বটুকেশ্বর গলায় দড়ি দিলেন, কাত্যায়নী আশ্রয় নিলেন এক কুষ্ঠাশ্রমে। শুনেছি এখনও বেঁচে আছেন তিনি। শূয়োর বধ হল, তারপর তার দাঁতের উপর লক্ষ্মীও এসে বসলেন। শূয়োরের দাঁতের অনেক মানে রে ভাই, চট করে ওসব জিনিস উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুধু বটুকেশ্বর নয়, আর একটা শূয়োরও শায়েস্তা হল। আমাদের পূর্ণ পুরুত। আজকাল একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে, কোমর সোজা করতে পারে না আর। সে দিনরাত মামীর কানের কাছে এসে ঘ্যান ঘ্যান করত— কোথা থেকে একটা কুড়োনো মেয়েকে নিয়ে মাখামাখি করছেন আপনারা, কি জাত তার ঠিক নেই....। মামী তার কথায় সায় দিতেন ঝঙ্কার দিয়ে। বলতেন, বলুন গিয়ে সুখেনকে আর তার মামাকে। কোথা থেকে এক আপদ জুটিয়ে জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমার। পূর্ণ পুরুত আমাকে বলেছিলেন একদিন, তোমাদের এ অনাচার কিন্তু সমাজ সহ্য করবে না, তোমার মামাকে বোলো। আমি বললুম, আপনিই বলুন না মামাকে। সে সাহস কিন্তু পূর্ণ পুরুতের ছিল না। মামীর কাছে গিয়ে গুঁইগাই করত কেবল। মকোদ্দমায় মেয়েটার পিতৃ-পরিচয় যখন জানা গেল, তখন পূর্ণও শায়েস্তা হল। তারপর থেকেই ঘূণ ধরল ওর মেরুদণ্ডে। কুঁজো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।"

হঠাৎ থেমে গেল সুখেন্দু।

"তারপর?"

"চুপ কর। মৃ আসছে, ও চলে যাক, তারপর বলছি—"

দেখলাম মৃদুলা ফিরছে।

কাছে আসতেই সুখেন বলল, "পাতা কাটতে মানা করে গেছিস তুই—"

"হ্যাঁ, মর্তমান আর অগ্নীশ্বর ছাড়া অন্য কলার গাছ এখানে কোথায়। ওসব গাছের পাতা কেটে নিলে কি আর বাঁচবে ওরা—"

"খাব কিসে আমরা তাহলে।"

"সে ব্যবস্থা করেছি। বাসন আসছে—"

"এখানে বাসন পেলি কোথা—"

"সে পরে বলব।"

আমার দিকে চট করে একবার চেয়ে সুখেনের দিকে চাইলে মৃদুলা। মুখে হাসি, চোখেও হাসি।

"কই বাসন—"

"ওই যে আসছে।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, জনচারেক যণ্ডা লোক মাথায় করে কি বয়ে আনছে। মনে হল চারটে দৈত্য যেন।

"কি বাসন আনছে ওরা?"

"কাচের প্লেট। কার্পেটের আসনও আছে।"

মৃদুলা ভিতরের দিকে চলে গেল।

"কাণ্ড দেখ—"

সুখেনও অনুসরণ করল তার।

আমি বসে রইলাম চুপ করে। আমারও মনে হতে লাগল সুখেন্দু আমাকে জ্যোৎস্না রাত্রির গল্প বলবে বলেছিল। এতক্ষণ ধরে ও যা বলল তাতে জ্যোৎস্না রাত্রির কথা বিশেষ ছিল না, কিন্তু আমি জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছিলাম। খোলাখুলি মুক্ত আকাশে যে জ্যোৎস্না দিগদিগন্তকে উদ্ভাসিত করে তোলে সে জ্যোৎস্না নয়, যে জ্যোৎস্না গভীর অরণ্যে শাখাপল্লবের ফাঁক দিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো দেখা যায় সেই জ্যোৎস্না। একবার জ্যোৎস্না রাত্রিতে বিরাট একটা বটগাছের তলায় শুয়ে এই রকম জ্যোৎস্না দেখেছিলাম মনে পড়েছে। আকাশের বুকে আলো আর কালোর জাফরি টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল কে যেন, সুখেন্দুর এলোমেলো গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সেইরকম জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছিলাম। সুখেন্দু হয়তো জানে না যে আমি জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছি, জ্যোৎস্নার গল্পটা ফলাও করে বলবে হয়তো সে এইবার। কিম্বা কে জানে হয়তো বলবেই না। আমার মন কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রির গল্পই শুনছিল।

সাত

নিরুর কথা

রামধনের বউ শুয়ে আছে চুপ করে। অপরাধীর মতো শুয়ে আছে, তার চোখে মুখে কি কুণ্ঠিত সঙ্কোচ যে ফুটে উঠেছে আমরা বসে আছি অথচ তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে এর অপরিসীম

লজ্জা যেন ঢাকতে পারছে না বেচারা আর কিছুতে। উঠে বসেছিল আমরা আসাতে, উঠে বসেছিল এত জ্বর নিয়েও। কিছুতেই শুচ্ছিল না। ফুলু ধমক দেওয়াতে শেষকালে শুয়ে পড়ল। মনিবের ধমকে পোষা কুকুর শুয়ে পড়ে যেমন করে। ফুলুর বাবা ওদের অন্নদাতা, ফুলুর কথা কি অমান্য করতে পারে ও? লণ্ঠনে তেল ছিল না ত-ও যেন ওরই অপরাধ। রামধন এমন খেঁকিয়ে উঠল ওকে। তারপর ছুটে গেল, নিয়ে এল পেট্রোম্যাক্স। বড়লোকের মেয়ে, শখ হয়েছে পিকনিক করতে এসে রাতদুপুরে উলের সোয়েটার বুনবে, বিরুদ্ধে কি কথা বলা চলে কারও। মেয়েটা কিন্তু অত্যন্ত হাঁদা। নিজে হাতে করে দেখিয়ে দিলাম খানিকটা, বুঝিয়ে দিলাম, তবু বইটা খুলে ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে পাতার দিকে।

"নিরুদি. বই পড়ে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পড়ব?"

"পড়।"

"১ সোজা, ১ সোজা সামনে সুতা, ২ সোজা ৩ উল্টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্টা-জোড়া, ৩ উল্টা, ২ সোজা, সামনে সুতা, পুনরাবৃত্তি কর। সর্বশেষে ৩ সোজা। এ তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।"

"এখন ছেড়ে দাও। পরে কোরো—"

"না, আজ আমাকে খানিকটা করতেই হবে।"

একটা হাস্যকর জেদ ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। রামধনের বউ একবার আমার দিকে, একবার ফুলুর দিকে চাইল। জ্বর খুব বেড়েছে বোধ হয়। মুখের ফ্যাকাশে রংও লাল হয়ে উঠেছে সেটা। আমাদের দিকে চেয়ে ও যেন তৃপ্তি পাচ্ছে, মুখের ক্লান্তিকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে সেটা। একটা ছেলেমানুষি আনন্দও যেন জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটোতে। আমরা যে এসেছি, বসেছি ওর ঘরে, এতেই যেন ও কৃতার্থ। আমাদের এই উল বোনা নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রতি কথাটি ও যেন উপভোগ করছে, আমরা যেন থিয়েটার করছি আর ও যেন দেখছে সেটা, অনায়াসে, বিনা পয়সায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কিন্তু সঙ্কোচ ওর যেন ঘুচছে না, অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখছে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে।

"বুঝিয়ে দেবে না তো—"

কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

"দাও না লক্ষ্মীটি—"

রামধনের বউ আবার চাইলে আমার মুখের দিকে। এবার লক্ষ্য করলাম তার দৃষ্টিতে তিরস্কারও আভাসিত হয়েছে। উঠতে হল।

"আমি নিজেই করে দিই খানিকটা, তাড়াতাড়ি হবে।"

"না। আমি মিছে কথা বলতে পারব না। আমি নিজে করব।"

আশ্চর্য জেদী মেয়ে। কাকে মিছে কথা বলতে পারবে না? কেমন যেন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে কথাগুলো।

"বুঝিয়ে দেবে না তো—"

বোঝাতে শুরু করলাম। রামধনের বউয়ের চোখমুখ হৃষ্ট হয়ে উঠল।

"নিরুদিকি এখানে আছ?"

বাইরে থেকে কে ডাকছে। আমাকেই ডাকছে। না-শোনার ভান করলাম। ডাক আসবে জানতাম, কিন্তু এভাবে ডেকে পাঠাবার মানে কি। না-শোনার ভান করলাম।

"তোমার কাঁটাই তো ধরা হয়নি ঠিক করে। এই রকম করে ধর।"

"কিন্তু ছবিতে—"

"ছবিতে ঠিকই আছে এইরকম করে—"

"ও বুঝেছি!"

ফুলুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। শিশুর হাসি, অকৃত্রিম, সরল।

"ঠিক হচ্ছে না?"

"হচ্ছে। উলটা অমন করে ঝুলছে কেন। সব জড়িয়ে যাবে যে। বলটা সামনে রাখ, উলের টানটা বেশ সমান থাকা চাই এমন ভাবে ধরতে হবে। বেশী জোরে ধরলে বোনা শক্ত হয়ে যাবে, বেশী ঢিলে করে ধরলে বোনাও ঢিলে হবে। হ্যাঁ ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে একবার পাক খাইয়ে নাও, তারপর অনামিকা আর তর্জনীর নীচে দিয়ে এনে, ছবিটা দেখ না—"

"ছবি দেখে বোঝা যায় না। এই দেখ, এবার হয়েছে?"

"হয়েছে। কাঁটাটা আর একটু—হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে—"

ডাকটা থেমে গেল কেন? ঘাড় ফিরিয়ে দেখি রাজু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে চেয়ে।

কখন ঢুকেছে টের পাইনি। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো, চাপা হাসি ঝিক্‌মিক্ করছে ঠোঁটের কোণে।

"বিজুদা খুঁজছে তোমাকে।"

"আমাকে?"

ভান করতে হল বিস্ময়ের। রাজুর কাছে আত্মপ্রকাশ করার মানে হয় না কোনও। কিন্তু বিজুদার কি আক্কেল, রাজুকে পাঠিয়েছে ডাকতে।

"বিজুদা কোথায়?"

"মাঠে, টিলার উপর বসে আছে—"

ফুলু অপটু হস্তে বুনে চলেছে। সেই দিকেই চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

"আমি অপেক্ষা করছি না হয়।"

"অপেক্ষা করার দরকার কি?"

"মাঠের ভিতর দিয়ে একা যাওয়া ঠিক নয় এত রাত্রে।"

"কটা বেজেছে?"

"তা দশটা হবে।"

রাজু হাতঘড়িটা একবার কানে দিয়ে, তারপর দম দিতে লাগল।

"ফুলুদি, তোমার ঘড়িটায় ক'টা বেজেছে দেখতো। আমার ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গেছি।"

ফুলু নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

"আমারটাও বন্ধ—"

ফুলুকে কি করে বলা যায় ভাবছি এমন সময় ফুলু নিজেই বললে—"তুমি ঘুরে এস নিরুদি। মনে হচ্ছে, আমি এবার পারব নিজে নিজেই। দেখ তো, হচ্ছে না?"

"বেশ হচ্ছে—"

বাইরে বেরিয়েই রাজু চুপিচুপি বললে—"আসতে আসতে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম নিরুদি।"

"কি—"

"আমাদের বাংলোর হাতাটা অনেক দূর পর্যন্ত, ওই যেখানে ছোট টিলাটা রয়েছে ঠিক তার নীচেই তারের বেড়া। আসবার সময় দেখলুম, কে একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ধপধপে শাদা কাপড়-পরা, দূরে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হল স্ট্যাচু, পাথরের নয় কুয়াশার। তারপর দেখলাম চারটে দৈত্যের মতো লোক আসছে, মনে হল যেন শূন্য থেকে এল, মানে কাঠের মাঝখানে হঠাৎ দেখতে পেলাম তাদের। পাথরে-কোঁদা কালো-কালো চেহারা, প্রত্যেকের মাথায় বোঝা। কিসের বোঝা বুঝতে পারলাম না। তারপর খদে নাবতে হল আমায়—ওই যে খদটা আছে ওটাতে নাবলে শর্টকার্ট হয়—খদে নাবলে আর কিছু দেখা যায় না। খদ থেকে যখন উঠলাম, তখন দেখি কেউ নেই— কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে সব—"

"মৃদুলা দাঁড়িয়ে ছিল বোধ হয়। একটু আগে তো ট্রেন এল একটা। শহর থেকে জিনিসপত্র এল সম্ভবত কিছু—"

"মৃ নয়। মৃ-কে আমি চিনতে পারব না? সে কি রকম যেন অদ্ভুত। তাছাড়া তার গা থেকে আলো বেরুচ্ছিল যেন—"

চেয়ে দেখলাম তার দিকে। মনে হল ভয় পেয়েছে।

"ভয় করছে নাকি?"

"ভয় আমার করে না। তবে কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। এটা একটা কবরস্থান ছিল জান তো?"

"শুনেছি।"

মনে পড়ল, আমি আর ফুলু যখন টিলাটার উপর বসেছিলাম সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম একটা। অথচ কাছাকাছি কোনও লোক যে সিগারেট খাচ্ছিল তার প্রমাণ তো পাওয়া গেল না। রাজুকে বললাম সে কথা।

রাজু চোখ বড় বড় করে বললে—"ওই দেখ। আমি তো কাছেই ছিলাম, কাউকে সিগারেট খেতে দেখিনি তো।"

"তুমি খাচ্ছিলে না তো?"

"আমি? না।"

আট
দ্বিজেনের কথা

নিমাই ছাতের উপরই বসেছিল। কম্পাউণ্ডারের মুখে শুনলাম দুটো রোগীকে নাকি ফিরিয়ে

দিয়েছে। বিয়ে করেনি, আত্মীয়-স্বজনও নেই বিশেষ, যা রোজগার করে তার অধিকাংশই দান করে নাকি। টাকার খাঁকতি নেই।

"আপনাকে ওপরেই আসতে বললেন।"

চাকরটা এসে খবর দিলে নীচে। তার হাতে একটা ক্যাম্বিসের ফোল্ডিং ইজিচেয়ারও দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে ছাতে গেলাম, চাকরটাও এল আমার পিছু পিছু। এসে নীরবে চেয়ারটা পেতে দিয়ে চলে গেল। নিমাই চুপ করে বসেছিল। একটি কথা বললে না আমাকে দেখে। আকাশে একটা খুব বড় নক্ষত্র দপ দপ করে জ্বলছিল, তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসেই রইল সে। আমিই কথা বললাম প্রথমে।

"আমাদের সেই পোড়ো বাংলোয় পিকনিক হচ্ছে আজ। তোমাকে নিতে এসেছি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে নিমাই বলল, "বেশ যাব" বলেই আবার নক্ষত্রটার দিকে চাইলে, চেয়েই রইল। আমি কথাটা কিভাবে পাড়ব ভেবে না পেয়ে সিগারেট বার করলাম, নিমাইকে একটা দিলাম, নিজেও একটা নিলাম। সিগারেটটা নিলে কিন্তু চেয়ে রইল আকাশের দিকে। সিগারেট লাইটারের আওয়াজ হল খস করে। নিমাই তবু অন্যমনস্ক।

"নাও—"

নিমাই সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে।

"কি ভাবছিস তুই?"

"ভাবছি, তুই যদি রোগী হতিস বেশ হত। এক কথায় বিদেয় করে দিতাম।"

"তুই শুনেছি প্রায়ই রোগী বিদেয় করে দিস। কেন বলতো?"

"টাকার দরকার নেই।"

"তোমাকে রোগীর দরকার থাকতে পারে তো।"

"রোগীর মনে হতে পারে আমি তার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমার তো মনে হয় না। কোতলপুরের আশুও যা করে, আমিও তাই করি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।"

"আশু তো কোয়াক—"

"কিন্তু সেও পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এন. এ. বি. দেয় আমিও দিই। যেটা সারবার সারে, যেটা মরবার মরে। আমার ফি ষোল টাকা, আশুর দু টাকা। আমাকে নিয়ে টানাটানি করার মানে হয় না কোনও।"

"তুই আজকাল ষোল টাকা ফি করেছিস নাকি?"

"তাতেও ফুরসৎ নেই। একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তারকে ডেকে রোগীর আত্মীয়েরা নিজেদের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করতে চায়। আসলে চিকিৎসার চেয়ে ধুমধাম করার দিকেই অধিকাংশ লোকের বেশী ঝোঁক। আশুও খারাপ চিকিৎসা করে না। ইংরিজি মোটামুটি ভালই জানে। ইংরেজি ভাষায় লেখা যে বিজ্ঞাপনগুলো আসে তা পড়ে বুঝতে পারে। ওই বিজ্ঞাপনগুলোই তো আমাদের কাছে অভ্রান্ত বেদবাক্য এখন। সে বেদবাক্যের মর্মার্থ আশুও যখন বুঝতে পারে, তখন আমাকে নিয়ে টানাটানি করার মানে হয় না কোনও। একটি মাত্র মানে হয়—আমি বিলেতের ডিগ্রিধারী।"

দেখলাম, প্রসঙ্গটা যে রাস্তা ধরেছে সে রাস্তায় গেলে আমার উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যাবে।

ডাক্তারি নিয়ে তর্ক করতে আমি এতদূর আসি নি। সুখেনদার কথাটা এনে ফেলতে হবে কোনরকমে।

বললাম, "সুখেনদা কি তোমাকে ভালবাসে তোমার ডিগ্রির জন্যে?"

নিমাই চুপ করে রইল। আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে সোজা হয়ে উঠে বসল।

"সুখেন আমাকে ভালবাসে কারণ ও জানে আমি যে কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারি।"

"মারা যেতে পার! তার মানে?"

আবার শুয়ে পড়ল নিমাই। আকাশের দিকে চেয়ে রইল। মনে হল তার এই সাংঘাতিক উক্তির পর আমার ব্যক্তিগত কথা বলাটা এখন শোভন হবে কি? নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম তার চোখের দিকে, হঠাৎ একথা বলার মানে কি। ওর চালচলন দেখে অনেকেই আজকাল সন্দেহ করছে যে ও ক্রমশ পাগল হয়ে যাচ্ছে, আমারও সন্দেহ হল। চোখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম দৃষ্টি স্বাভাবিক কিনা।

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েই নিমাই বললে, "তার মানে তুমি বুঝবে না। সে শক্তি তোমার নেই।"

"সুখেনদা যা বুঝতে পেরেছে, তা আমিও বুঝতে পারব আশা করি।"

"আশা করতে পার কিন্তু আমি মনে করি সেটা দুরাশা। স্বল্পবিদ্যার ঠুলি যাবা পরেছে তারা নিজের নাক পর্যন্ত দেখতে পায় না।"

আত্মসম্মানে আঘাত লাগল।

বললাম, "দেখ নিমাই, হঠাৎ পণ্ডিতমশাই সেজে মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলা খুব সোজা। স্বল্পবিদ্যার ঠুলি প্রভৃতি কথাগুলো বড্ড একঘেয়ে হয়ে এসেছে। যদি গাল দিতেই চাও, নূতন ধরনে দাও।"

নিমাই সিগারেটটায় শেষ টান মেরে ফেলে দিলে। কোনও কথাই বললে না অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে বসল, "তুমি প্রেমে পড়েছ কখনও?"

শুয়ে শুয়েই বললে।

"তার সঙ্গে তোমার যে-কোনও মুহূর্তে মারা যাওয়াব কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"কোনও সম্পর্ক নেই। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, ভূতে বিশ্বাস কর তুমি? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেলে ঠিক করব সুখেনকে যা বলেছিলাম তা তোমাকেও বলা চলে কি না।"

চাকরটা দু পেয়ালা চা নিয়ে এল।

পুলকিত হয়ে উঠলাম, চা দেখে নয়, প্রসঙ্গটার মোড় ফিরেছে দেখে। আমার প্রেমের কথাই তো ওকে বলতে এসেছি। বোতলের ছিপিটা নিমাই খুলে দিলে দেখে সত্যিই আরাম পেলাম। তবু চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। নিমাইও চুপ করে রইল। নক্ষত্রের দিকে চেয়ে রইল।

"কি আশ্চর্য, চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

উঠে বসল নিমাই। চুমুক দিলে চায়ের পেয়ালায়। আমিও পেয়ালা তুলে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, "তুমি যখন প্রসঙ্গটা তুলেছ তখন তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। অদ্ভুত

যোগাযোগের কথাটা ভেবে কেবল আশ্চর্য হচ্ছি। যে কথা তুমি তুললে, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি আজ। শুধু বলতে নয়, চাইতে। যে অদৃশ্য অফুরন্ত ডিনামাইটের অধীশ্বর তুমি সেই ডিনামাইট ভিক্ষা করতেই এসেছি আজ বিশেষ করে। মনে হল, এমন পূর্ণিমা রাত্রে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা নেই, যে ভিক্ষা দেবে সে-ও এমন রাত্রে কৃপণ হতে পারবে না—" থেমে গেলাম। মনে হল কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। নিমাই চায়ের পেয়ালাটা তুলে ঢক ঢক করে সমস্ত চা-টা খেয়ে ফেললে, মনে হল কোনও পিপাসিত মাতাল যেন মদ খাচ্ছে। একটা অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখ দুটোতে হঠাৎ। মনে হল ওর বুকের ভিতর কে যেন সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলে, সেই আলো ফুটে বেরুল চোখের জানালা দিয়ে। আমার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ অবাক হয়ে, তারপর বললে, "এতদিনে তোমার উপর শ্রদ্ধা হল। যাকে কেউ ভালবাসে নি, কিম্বা যে কাউকে ভালবাসতে পারে নি, সে মানুষ নয় শয়তান। আমার ধারণা ছিল কলিয়ারির খাদে নেমে কয়লাই ঘেঁটে বেড়াচ্ছ বুঝি, হীরের সন্ধান পেয়েছ জানতাম না। কিন্তু ডিনামাইটের হেঁয়ালিটা বুঝতে পারছি না ঠিক। ডিনামাইট দিয়ে কি ওড়াবে?"

"বাধা। যে ডিনামাইটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তা তোমার কাছেই আছে, পৃথিবীতে আর কারও কাছে নেই, এমন কি নোবেলের উত্তরাধিকারীদের কাছেও না।"

"পরিষ্কার হচ্ছে না। আর এক পেয়ালা চা আনতে বলব? বাধাটা কিসের? ভাষাটা দুর্বোধ্য করছ কেন মিছিমিছি।"

"বাধাটা জাতিভেদের। না, ঠিক তা-ও নয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে সুখেনদার কুসংস্কারটাই আসল বাধা—"

"বেজাতের মেয়েকে ভালবেসেছ?"

"হ্যাঁ—"

"সুখেন কি বলছে।"

"সুখেনদাকে বলিনি এখনও কিছু। সাইড্‌কার-ওলা একটা মোটর বাইক কিনেছি খালি।"

নিমাই আবার শুয়ে পড়ল। চেয়ে রইল নক্ষত্রটার দিকে। মনে হল যেন নক্ষত্রটার কাছে পরামর্শ চাইছে। পরামর্শটা যাতে আমার স্বপক্ষে দেয় এই আশায় আমিও চাইলাম তার দিকে। করুণ দৃষ্টি মেলেই চাইলাম। মনে হল নক্ষত্রটা চোখ মিট মিট করে ভরসা দিলে আমাকে।

"বিয়ে করতে চাও?"

নিমাইয়ের প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাল যদিও, যদিও মনে হল এই নক্ষত্রচাঁদের পরিবেশে বিবাহটা নিতান্তই বেমানান, তবু সত্য কথাটাই বলতে হল। মনে পড়ল, বিয়ে করতে চাই বলেই সুখেনদার অনুমতি প্রয়োজন আর সুখেনদার অনুমতি নিমাইয়ের সাহায্য ছাড়া পাওয়া শক্ত বলেই নিমাইয়ের শরণাপন্ন হয়েছি।

বললাম, "বিয়ে করতে চাই নিশ্চয়। প্রিয়ার গায়ে পতিতার লেবেল লাগাবার আমার ইচ্ছে নেই।"

"প্রিয়াকে যদি দূর থেকে ভালবাসতে পার তাহলে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগবে কেন? বিয়ে করলে তাকে পতিতার দুর্নাম থেকে বাঁচাতে পার কিন্তু পতন থেকে বাঁচাতে পারবে না। বিয়ে করলেই প্রিয়ার পতন এবং মৃত্যু।"

"একটা বাজে কথা বললে তুমি। শারীরিক সান্নিধ্য না হলে প্রেম সার্থক হয় না। প্লেটনিক প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না। তাতে কেবল পুরুষের হয় "প্লে" আর নারীর হয় টনিক এবং 'পেনফুল' টনিক।"

"আমি করি।"

নিমাইয়ের চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলে উঠল—"আমি যাকে ভালবাসি সে কোথায় আছে জানো?"

"কোথায়?"

"হ্যাঁ, ওইখানে।"

নক্ষত্রটাকে দেখালে। আমি তারা উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহুর দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

"ওইখানে?"

"হ্যাঁ, ওইখানে।"

আবার তার চোখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু পাগলের কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। বরং মনে হল আকাশের নক্ষত্রটাই যেন ছোট ছোট হয়ে নেবে এসেছে তার চোখের তারা দুটিতে, মিট মিট করে হাসছে। বেশ অর্থপূর্ণ সে হাসি, পাগলের হাসি নয়। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছু।

"একটু খুলে বল, বুঝতে পাচ্ছি না—"

"খুলে বললেও বুঝবে না, যদি না বিশ্বাস কর। সুখেন বুঝেছে, কারণ তার বিশ্বাসী মন। সে জানে যে মুহূর্তে ঐ নক্ষত্র আমাকে ডাক দেবে আমি চলে যাব। এই বিশ্বাস তার হয়েছে বলে তাকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, সে আমাকে দুঃখ দিতে চায় না, পারে না, আমার কোনও অনুরোধ কখনও অগ্রাহ্য করে না। সে বুঝেছে, কিন্তু তুমি বুঝবে কিনা সন্দেহ আছে আমার। তোমরা যুক্তিবাদী কিনা।"

উঠে বসল নিমাই। আর একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে অনেকক্ষণ ধোঁয়াটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর খানিকক্ষণ জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে।

তারপর বলল, "আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের এখনও উত্তর দাওনি তুমি। ভূতে বিশ্বাস কর?"

"অবিশ্বাস করবার মতো যুক্তি আমার নেই। বিশ্বাস করবার মতোও নেই। তবে একটা কথা মনে হয়। বহুকাল থেকে বহুলোক ভূতে বিশ্বাস করেছে, তাই মনে হয় ওর মধ্যে সত্য কিছু আছে—"

"নিশ্চয়ই আছে। স্বচক্ষে দেখেছি—"

"কি রকম।"

"কটা বেজেছে আগে জানা দরকার। সুখেন হয়তো ছটফট করছে। তোমার হাতে ঘড়ি দেখছি না।"

"না, নেই।"

ঘড়িটা বাঁধা দিয়ে একখানা ভাল শাড়ি কিনেছি তা নিমাইকে বলা প্রয়োজন মনে করলাম না।

"জটু, জটু—"

ডাকবামাত্রই নিমাইয়ের চাকরটি হাজির হল। যেন ওৎ পেতে বসেছিল।

"আমার ব্যাগটা আন তো—"

প্রকাণ্ড ব্যাগ নিয়ে এল জটু। নিমাই তার ভেতর থেকে ছোট একটি 'টাইমপিস' বার করে দেখলে। নিমাই হাতঘড়ি বা পকেটঘড়ি ব্যবহার করে না।

"সাড়ে নটা বেজে গেছে। চল, ওখানে গিয়েই বলব। সুখেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এতক্ষণ।"

"আজই কিন্তু সুখেনদার কাছে কথাটা পেড়ো। বুঝলে।"

"নিশ্চয়ই পাড়ব। আমি যে কষ্টভোগ করছি, তা আর কেউ ভোগ করুক এ আমি চাই না। তোমাকে সাহায্য করব আমি। কিন্তু সাবধানও করে দিচ্ছি, যে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছ কোন ফায়ার-ব্রিগেড তা নেবাতে পারবে না। তুমি নেবাতে দেবে না। আর একটা কথাও মনে রেখ, আগুনের ধর্ম পোড়ানো, দাহ্যবস্তু মাত্রকেই সে পোড়ায়, তুমি যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন আর একজনকে পোড়াবে সে। তোমার ভস্ম যদি তখন আর্তনাদও করে তোমার দিকে সে ফিরে তাকাবে না আর।"

"অসতীদের কথা বলছ—?"

"সতী বা অসতীর প্রশ্ন নয়; আমি চিরন্তনী নারীর কথা বলছি। তারা সতী হতে পারে, অসতী হতে পারে, ধনী হতে পারে, গরীব হতে পারে, সধবা, বিধবা, কুমারী হতে পারে, সামাজিক যে-কোনও টিকিট তার গায়ে লাগানো থাকতে পারে—কিন্তু তার নারীত্ব কখনও ঘোচে না। একাধিক পুরুষের ডাকে সে সাড়া দেবেই কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষে, কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। পুরুষের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্যে সে সর্বদা উন্মুখ। কোথায় যেন পড়েছিলাম—The heart of a woman is never so full of affection that there does not remain a little corner for flattery and love-"

আবার শুয়ে পড়ল নিমাই, তারাটাকে দেখতে লাগল নির্নিমেষে।

"এই তোমার অভিজ্ঞতা?"

"আমার অভিজ্ঞতা আরও ভয়ঙ্কর। পরে শুন, এখন ওঠা যাক চল।"

"যাকে তুমি ভালবাসতে সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে?"

"গেছে। তবু তাকে ভালবাসি। তার জন্যে না করতে পারি এমন কাজ নেই।"

"কোথায় গেছে, কারও সঙ্গে গেছে?

"লম্বা কাহিনী, পরে বলব। তুমি যাকে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করেছ, সে মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী তো?"

"ফুলুকে তুমি তো দেখেছ?"

"ও, ফুলু। শ্রীদাম সিঙ্গির মেয়ে?"

"হ্যাঁ। স্বাস্থ্যের কথা জিগ্যেস করছ যে হঠাৎ।"

"আমি যাকে ভালবেসেছিলাম সে ছিল রুগ্ন। সে যদি রুগ্ন না হতো হয়তো তাকে আমি পেতাম—"

"ও।"

আর একবার নক্ষত্রটার দিকে চেয়ে নিমাই বললে—"চল। আর দেরি করা ঠিক নয়।"

ছাত থেকে নেবে পড়লাম দুজনে।

নয়
বিজেনের কথা

নিরু আসছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কি মেজাজে আসছে কে জানে। তবে যে মেজাজেই আসুক আমার কাছে লুকোতে পারবে না সেটা। নিরুর মুখের ভাব যেমনই থাকুক তার মনের ভাবটা আমি টের পেয়ে যাই। ও যখন খুব রাগের ভান করে মুখে মেঘ ঘনিয়ে তুলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, তখন আমি বুঝতে পারি ও ভান করছে। আমিও ভান করি ভয় পেয়েছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারি। ওর পিছু পিছু রাজু আসছে বোধহয়। রাজুটা সিগারেট খেতে শিখেছে আজকাল। আমার টিন থেকে চার পাঁচটা সিগারেট ও-ই সরিয়েছে সম্ভবত একটু আগে। মুখের ভাবটা তাই অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে, ও যদিও নিজে বুঝতে পারছে না সেটা। সিগারেট সরাক, আপত্তি নেই তাতে, খুশিই হয়েছি বরং। আমাকে শ্রদ্ধা করে বলেই লুকিয়ে নিয়েছে, আর ভাল জিনিসের সমঝদার বলেই এই সিগারেট নিয়েছে। এ সিগারেট আজকাল দুষ্প্রাপ্য। সুখেনদা ওকে যে পরিমাণ টাকা দেয় শুনেছি, তাতে সিগারেট কেনবার মতো পয়সা ওর পকেটে যথেষ্ট থাকা উচিত। আমার টিন থেকে সিগারেট সরিয়েছে, খুশিই হয়েছি তাতে, খুব খুশি হয়েছি। আজকালকার ছোকরাদের মতো গুরুজনদের প্রতি ওর অশ্রদ্ধা নেই, রুচিটাও ওর মার্জিত। খুব খুশি হয়েছি। অবাক করে দিয়েছিল সেদিন। ওর এ রকম অঙ্কে মাথা, জানতাম না। চট করে ক্যালকুলাসের দুরূহ অঙ্কটা কষে দিলে। নিরুর মুখে যেন একটা প্রসন্ন হাসির ঝলক দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ও চটেছে।

"আমাকে ডাকছ তুমি বিজুদা?"

"হ্যাঁ একটু দরকার আছে। মানে সেই দরকারটা, তুমি এখানে আসবে জানলে ব্র্যাডলের বইখানাই নিয়ে আসতাম—লাইব্রেরি থেকে এনেই রেখেছি আমি তোমার জন্যে।"

"ব্র্যাডলে পেয়েছি আমি ফুলুর দাদার কাছ থেকে।"

"ও—"

বুঝলাম রাজু থাকলে সুবিধে হবে না। নিরু ছদ্ম হাসির তলায় চটতে থাকবে ক্রমশ, জ্যোৎস্নাটা মাঠে মারা যাবে। আমি তো যাবই।

"রাজু, তুই একটা কাজ কর না ভাই। দক্ষিণ দিকে ঘরটায় জামা খুলতে গিয়ে আমার সিগারেটের টিনটা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আট দশটা সিগারেট বোধহয় পড়ে গেছে টিন থেকে। অন্ধকারে খুঁজে পেলাম না, টর্চ নিয়ে একটু খুঁজে দেখতো যদি পাস। দেখিস, সুখেনদা যেন টের না পায়।"

"খুঁজে পেলে নিয়ে আসব এখানে?"

"না, টিনটা ওই ঘরের আলমারির পিছনের তাকটায় আছে। তারই ভিতরে রেখে দিস। আমার কাছে সিগারেট আছে এখন।"

রাজুর মুখের প্রচ্ছন্ন আনন্দটা উপভোগ করলাম।

"যেতে ভয় করবে না তো—!"

নিরু জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তরে রাজু মুচকি হাসলে একটু।

"দাদা যদি আমার খোঁজ করে আমি এখানে আছি বলে দিও।"

"সুখেনদা তোমার দাদার কাছে যে রকম গল্প ফেঁদেছেন তাতে তাঁর অন্য দিকে মন দেওয়াই শক্ত এখন।"

"আচ্ছা, বলে দেব।"

যেতে যেতে রাজু ঘাড় ফিরিয়ে বলে গেল।

রাজু কিছুদূর যেতেই নিরুর মুখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূভঙ্গি করে বললে, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন—!"

ভ্রূভঙ্গি দেখেই বুঝলাম রাগটা কমে আসছে, খুশি হয়ে উঠেছে ক্রমশ।

"এই এমনি গল্প করতে। যদি ইচ্ছে কর, যে প্রসঙ্গ চিঠিতে লিখেছিলে তার সম্বন্ধে আলোচনাও করতে পারি। জ্যোৎস্না রাত্রে ফাঁকা মাঠে চমৎকার জমবে।"

"আমার আর বোঝবার দরকার নেই। ফুলুর দাদা আমাকে ভাল নোট দেবেন বলেছেন একটা।"

"ফুলুর দাদার সঙ্গে আলাপ হল কোথা?"

"ফুলুদের বাড়িতেই। চমৎকার মানুষ। সত্যি চমৎকার।" নিরুর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো যেন ফুলুর দাদাকে দেখে ও সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম মুগ্ধ হয় নি, আমাকে ঈর্ষাতুর করে তোলবার চেষ্টা করছে। ঈর্ষাই প্রকাশ করলাম সোজাসুজি।

বললাম, "তোমার রুচির উপর শ্রদ্ধা ছিল আমার। কিন্তু ফুলুর দাদাকে যদি তোমার চমৎকার লেগে থাকে তাহলে নিজের ভুল ধারণাটা সংশোধন করতে হবে।"

"করতে পার। চারখানা চিঠি সত্ত্বেও উত্তর দেয় না যে লোক, তার ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় নেই আমার।"

"আচ্ছা নিরু, তুমি এমন অবুঝের মতো কথা বল কেন বুঝি নি। চারখানা চিঠি লিখেও যখন জবাব পাওনি তখন তোমার বোঝা উচিত এর নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কারণ আছে। আমি হলে চটতাম না, চিন্তিত হতাম। ফুলুর দাদা চমৎকার লোক কিনা সে গবেষণা না করে চলে যেতাম—"

নিরু এইবার কাৎ হল। ভুরু কুঁচকে আছে যদিও। কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝেছি কাৎ হয়েছে।

"কেন, কি হয়েছিল?"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অভিমানের ভান করলাম। অন্য দিকে মুখ ফেরাতে হল, কারণ আমার নিজের চোখের উপর বিশ্বাস নেই। হয়তো হাসছে।

"চুপ করে আছ যে। কি হয়েছিল বল না।"

চুপ করেই রইলাম। মুখও ফিরিয়ে রইলাম।

"বলবে না।"

"বলে লাভ কি। ফুলুর দাদাকে যখন তোমার ভাল লেগেছে তখন কেন চিঠি লিখতে পারি নি তা জানবার সার্থকতাই বা কি?"

নিরু এবার বলপ্রয়োগ করলে। দুহাত দিয়ে আমার মাথাটা ধরে নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল।

"বল না, কি হয়েছিল। আঃ—"

'আঃ'টা ব্যর্থতা-সূচক আক্ষেপ। আমার ঘাড়ের পেশী খুব দুর্বল নয়।

"বল না—"

কণ্ঠস্বরে কান্নার রেশ। ঘাড় ফেরাতে হল সুতরাং।

"কলমটা হারিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া জ্বরও হয়েছিল—"

"মিথ্যুক কোথাকার।"

"বললাম তো বলা বৃথা। বিশ্বাস করবে না।"

"কলম হারিয়ে কলেজের কাজ চালাচ্ছ কি করে?"

"এর ওর কলম নিয়ে কিম্বা পেনসিল দিয়ে কিম্বা কলেজের দোয়াত কলমে—"

নিরুর চোখ দেখে বুঝলাম ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

"এক লাইনে এই খবরটাও আমাকে দিলে পারতে—"

"তোমাকে অমন ব্যাগার সারা চিঠি লিখতে পারি কখনও। তোমাকে পেনসিলে চিঠি লিখব। আন্‌থিঙ্কেব্‌ল!"

"তোমার জ্বর হয়েছিল, সত্যি?"

"হয়েছিল। তুমি অবশ্য মিথ্যে মনে করবে। কর।"

"না, না, মিথ্যে মনে করব কেন। চারখানা চিঠির জবাব না পেলে কার না রাগ হয়। তার ওপর পরীক্ষা সামনে—"

"ফুলুর দাদা সত্যিই যদি নোট দেবেন বলে থাকেন—"

নিরু হেসে ফেললে এবার। "ওটা মিছে কথা। তবে ফুলুর দাদার কাছ থেকে ব্রাডলেখানা জোগাড় করেছি ফুলুর মারফত। ওর দাদার সঙ্গে আমার আলাপই হয় নি। আরও বই এনে দেবে ফুলু বলেছে।"

"তাহলে "পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ সেক" আর দুর্বোধ্য নেই আশা করি।

"বুঝিয়ে দাও আমাকে—"

আবদারের সুর ধ্বনিত হল কণ্ঠে। আর একটু সরে এল আমার কাছে। উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। হঠাৎ বেসামাল হয়ে গেলাম।

"কি যে কর—"

নিরু সরে বসল। যেন কত রাগ করেছে। তারপর দু'জনেই জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। হঠাৎ নিরু বললে—"দাদাকে বলেছ?"

"বলেছি—"

"কি বললে দাদা?

"বললে নিরুর যদি মত থাকে আমার আপত্তি কি। তবে সুখেনের মতটা জানা দরকার—"

নিরু চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড।

"সুখেনবাবু যদি আপত্তি করেন? শুনেছি খুব এক বড়লোকের বাড়ি থেকে তোমার নাকি সম্বন্ধ এসেছে।"

বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। খবরটা আমিও শুনেছি, এও শুনেছি মেয়েটি নাকি সর্বগুণান্বিতা, তাকে বিয়ে করলে নাকি প্রকাণ্ড একটা জমিদারি যৌতুক পাব। চুপ করে রইলাম।

"চুপ করে আছ যে—"

"কি বলব। সুখেনদা আগে আপত্তি করুক, তারপর ভাবা যাবে। অবনদাই হয়তো আজ পাড়বেন কথাটা।"

"আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছি।"

"কি?"

"ভাবছি আমি তোমার ক্ষতি করছি না তো?"

"কি ক্ষতি?"

"শুনেছি মেয়েটি সত্যিই ভাল। তার বাবার একমাত্র মেয়ে। একটা গোটা জমিদারিই নাকি যৌতুক দেবে। আমি গরীব, আমার রূপও নেই, তোমার তুলনায় গুণও নেই—" থেমে গেল নিরু।

"থামছ কেন বলে যাও।"

"না, না, এটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ কথা নয়।"

"আমি কি তা বলছি—"

"আমার একটা কথা শোন।"

"বল—। একটা কেন, যত কথা বলবে সব শুনব।"

"সব দিক থেকে বিচার করে ওই মেয়েটিকে তোমার যদি সত্যিই ভাল বলে মনে হয়, আমার জন্যে তুমি বিয়ে ভেঙে দিয়ো না।"

"তারপর?"

"ওর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর আমাকে বিয়ে কোরো। তাতে আমার আপত্তি হবে না।"

"আর সে মেয়েটি যদি আপত্তি করে—"

"তার কাছে যাব না। দূরে দূরে থাকব। যেমন চাকরি করছি তেমনি করব। তুমি শুধু মাঝে মাঝে এসো আমার কাছে—তাহলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তোমার আর একটা বউ থাকলেও আমার আপত্তি হবে না।"

নিরু এক হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার পিঠে মুখ রাখলে।

বললাম, "ধার-ধোর করে কালই তাহলে গোটা দুই নৌকা কিনতে হয়ে।"

"নৌকো? কেন!"

"দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলাটা প্র্যাকটিস করে নিতে হয়। অভ্যাস তো নেই—"

নিরু ছোট্ট চড় মারলে আমাকে।

"খালি ইয়ার্কি। 'পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ সেক' কখন বোঝাবে। রাত তো অনেক হল—"

"আগে 'ম্যারেজ ফর ম্যারেজস্ সেক'টা বোঝা হয়ে যাক। আমি তোমাকে বরাবর 'মিডিয়কার' ভেবে এসেছি, এখন দেখছি তুমি জিনিয়াস!"

নিরুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। চুপ করে রইল। তারপর বলল, "এতক্ষণে ঠিক

চিনেছ। সব মেয়েরাই সেই জিনিয়াস যার মানে ভূত বা পেত্নী। আমরা একবার ঘাড়ে চড়লে আর নাবি না। ইহকালে তো বটেই, পরকালেও চড়ে থাকি। উঃ, কি অসহায় আমরা, লেখাপড়া, চাকরি কিছুই আমাদের কোন কাজে লাগে না—"

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ল নিরু। আমার কোলের উপর মুখে রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলাম।

দশ
ফুলুর কথা

দ্বিজেনবাবু সাইড্‌কার-ওলা বাইক কেন কিনেছেন তা আর কেউ না বুঝুন আমি বুঝেছি। মৃদুলাও বুঝেছে। অদ্ভুত মেয়ে ওই মৃদুলা। সব জানে, সব বোঝে, ঠিক বিপদের সময়টিতে গিয়ে সব সামলে দেয়, অথচ কথাটি বলে না। সুখেনদা আর অবনীশবাবু যখন ওদিকে বসে গল্প করছিলেন তখন শুকুল ঠাকুর যে কাণ্ডটি করেছিল মৃদুলা না থাকলে হয়েছিল আর কি। আমরাও তো বসেছিলাম কিন্তু আমরা কেউ টের পাই নি, এমন কি শুকুল ঠাকুরও পায় নি। হঠাৎ মৃদুলা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। শুনতে পেলাম বলছে—নাবাও নাবাও, শিগগির হাঁড়িটা নাবাও, তলা ধরে গেছে। অন্য একটা হাঁড়িতে ঢেলে ফেল, তলাটা চেঁচো না, যেমন আছে তেমনি থাক। কয়েকটা রসুন ঘিয়ে ভেজে দাও এবার, কিছু বোঝা যাবে না। তারপর দেখি বাটি করে নিয়ে এসেছে একটু। আমাকে বলে, চেখে দেখতো ফুলু, পোড়া গন্ধ পাচ্ছ কিনা। মাংসে পোড়া গন্ধ ছাড়লে শুকুল ঠাকুরকে আর আস্ত রাখবে না সুখেনদা। চেখে দেখলাম একটুও পোড়া গন্ধ নেই। শুনেই চলে গেল মৃদুলা। অন্য মেয়ে হলে এই নিয়ে কত বাহাদুরিই করতো। মৃদুলা চুপ একেবারে। পানিশঙ্খ প্যাটার্নের কথা মৃদুলাই তো বললে আমাকে। সুখেনদার নাকি খুব পছন্দ ওই প্যাটার্নটা। ভাগ্যে নিরুদিকে পেয়ে গেলাম, গোড়ার দিকটা দেখিয়ে না দিলে বই দেখে পারতুম না আমি।

"কি বুনছ দিদি—"

বাবা, চমকে উঠেছি। রামধনের বউটা ঘুমোয়নি এখনও? সেই থেকে ঠায় চেয়ে আছে আমার দিকে।

"সোয়েটার বুনছি—"

"কার জন্যে।"

"তুমি কাউকে বলে দেবে না তো?"

"না।"

"সুখেনবাবুর ভাইয়ের জন্যে।"

"দ্বিজুবাবু না বিজুবাবু।"

"দ্বিজুবাবু। কাউকে বোলো না যেন।"

"না বলব না—"

কি রকম চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আমার ঘরে ছবির পিছনে যে টিকটিকিগুলো আছে,

আলো জ্বাললে তারা বেরিয়ে আসে আর ঠিক ওই রকম করে, চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। দ্যুৎ, সব জড়িয়ে গেল আবার। অন্যমনস্ক হলে কি আর বোনা যায়। গোলমালের ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম, এখানে রামধনের বউ জ্বালাতে লাগল। অদ্ভুত ওর চাউনি, শান্ত অথচ অন্যমনস্ক করে দেয়। এমন করে চেয়ে থাকার মানেই বা কি।

"ঘুমোও না তুমি ঝুনুর মা। জ্বর হয়েছে তোমার।"

"ঘুম আসছে না।"

"ওপাশ ফিরে শোও, তাহলেই ঘুম আসবে। চোখ বুজে থাক।"

ভারি বাধ্য। বলার সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে শুল।

..বাইকে চড়ে দ্বিজুবাবু এসেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন এত রাত্রে। এত ছটফটে লোক, একদণ্ড কোথাও স্থির হয়ে বসবে না, আপিসেও এই কাণ্ড। একদিন গিয়ে দেখেছি তো। কখনও ওপরে, কখনও নীচে, চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ দেরাজ খুলে ঘাঁটতে লাগল কি সব, এক গাদা চিঠি বার করে কুচি কুচি করে ছিঁড়তে লাগল, পট করে ঘণ্টাটা টিপে চাপরাসীকে ডাকলে, তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—চায়ের সঙ্গে টোস্ট আর ওমলেট্ আনাই? 'ওমলেট্'! আমি তো মামলেট্ জানতাম—তবে আমি মুখ্যু মানুষ। বললাম, "বেশ তো, আনাও।" আমার লোভ কেকে, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলাম না সেটি। লুকিয়ে গেছি তো! বেশি বাড়াবাড়ি করা কি চলে! কেক আনতে গেল আবার দেরি হয়ে যেতো হয়তো। তাছাড়া বলতে লজ্জাও করল। পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েদের হ্যাংলামি প্রকাশ করাটা কি উচিত? মুখ ফুটে একবার বললেই ফেরাজিনি বা ফিরপোতে লোক দৌড়তো জানি, কিন্তু বলতে পারলাম না। কলেজ থেকে লুকিয়ে গেছি তো! বার বার তখন ঘড়ির দিকে চাইছি আর বলছি—আমাদের থার্ড পিরিয়ড দুটোর সময় আরম্ভ হবে কিন্তু। আমার দিকে না চেয়েই বললে—এক মিনিট, এইগুলো সই করে দিই; আজ ডাকে পাঠাতেই হবে। ঘস ঘস করে সই করতে লাগল। সেই সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম সোয়েটারটা; চমৎকার রং, চমৎকার ফিট্ করেছে। জিগ্যেস করলাম— সোয়েটারটা কিনেছ না কি, চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে। কোন উত্তর দিলে না, ঘস ঘস করে সইই করতে লাগল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ঘরটা দেখতে লাগলাম, মাকড়সার ঝুল হয়েছে দেখলাম কোণে কোণে। কেন হয়েছে বুঝতে কষ্ট হল না। চাকরের গাফিলতি নয়, নিশ্চয় সময়মতো ঘরই খোলা হয় না কোন দিন, ঝাড়বে কখন বেচারা। পালকের তৈরি একটা হাতঝাড়ুও একটা সেল্ফে রাখা আছে দেখতে পেলাম। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। উঠে নিজেই সেটা নিয়ে কাছে যে ঝুলগুলি ছিল ঝাড়তে লাগলাম, নাগালের মধ্যে যতটা পেলাম, সোয়েটারের কথা ভুলেই গেছি, হঠাৎ সই করতে করতেই ঘাড় না ফিরিয়েই বললে—

"সোয়েটার কিনি নি। সুখেনদা বুনে দিয়েছে—"

"সুখেনদা বুনতে পারেন না কি?"

সই করতে করতেই, ঘাড় না ফিরিয়েই উত্তর দিলে—"শুধু বুনতে পারেন না, যে বুনতে পারে তার সাত খুন মাপও করেন।"

সই শেষ হল, ঘাড় ফিরল।

"ও কি করছ তুমি—শাড়িতে মাকড়সা উঠেছে যে একটা—কি পাগলামি—"

তাড়াতাড়ি উঠে এসে রুমাল দিয়ে আমার শাড়িটা ঝাড়তে লাগল সেই সময় কেরানী, না কে এল একজন, লজ্জায় পড়ে গেলাম আমি। ওর কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত নেই। ঝেড়েই চলেছে, আমি যেন একটা আসবাব।

চা-ওমলেট্ শেষ হবার পর দেখলাম আর দশ মিনিটের মধ্যে যদি কলেজে না পৌঁছতে পারি, ক্লাসে যাওয়া হবে না। বললাম সে কথা। বললাম পারসেনটেজ থাকবে না।

"চল এক্ষুণি পৌঁছে দিচ্ছি তোমাকে—"

সেই সময় ফাইল হাতে করে আর একজন ঢুকল। ঠিক বোমায় আগুন দিলে কেউ যেন। যাচ্ছেতাই করলে লোকটাকে।

"এতক্ষণ কি করছিলেন? বলিনি আপনাকে যে, সাড়ে বারোটার ভিতর সব তৈরি রাখবেন।"

মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল বেচারী।

"অপেক্ষা করুন। আমি আসছি এখুনি ঘুরে—"

তড়তড় করে নীচে নেমে গিয়ে নিজের মোটর বাইকটা বার করলে।

"আমার পিঠের দিকে বসতে পারবে আমাকে ধরে?"

"না, সে আমার বড় লজ্জা করবে।"

"লজ্জা? কিসের লজ্জা—কি মুশকিল—"

ট্যাক্সি করে যেতে হল। ভাড়াটা আমি দিতে গেলাম, নিলে না কিছুতে। আজ দেখছি সাইড্‌কার-ওলা বাইক। খবরটা মৃদুলা আগেই দিয়েছিল আমাকে।

রামধনের বউ পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে মড়া যেন। ভয় করছে আমার।

"ঝুড়ুর মা, ঘুমুলে না কি?'

"না।"

"ঘুমোও।"

"ঘুম আসছে না।"

"চোখ বুজে থাক।"

"চোখ বুজেই আছি।"

পাশেই ওর ছোট ছেলেটা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ওর চোখে ঘুম নেই। ও চুপ করে জেগে আছে এতেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কথা কইলে এত অস্বস্তি লাগত না। কিন্তু ও শান্ত মানুষ, ও তো কথা কইবে না, তার ওর জ্বর হয়েছে। ঘুম হচ্ছে না কেন ওর, আশ্চর্য!

"মৃদুলা দিদি কি আসবে এখানে?"—হঠাৎ জিগ্যেস করলে।

"মৃদুলাদি? জানি না তো—আসবে না বোধহয়, ওখানে ব্যস্ত আছে নানা কাজে। এতগুলি লোক খাবে তো।"

চুপ করে রইল। ভারি চুপচাপ মেয়েটি, জ্বর হয়েছে বলে নয়, যখন ভাল থাকে তখনও। ব্রাহ্মণের মেয়ে কিনা, ভদ্র খুব। শুনেছিলাম রামধন সুখেনবাবুর আত্মীয় হয় দূর সম্পর্কের। হুগলি জেলার এক পাড়াগাঁয়ে কষ্ট পাচ্ছিল, সুখেনবাবুই এনে বসিয়েছেন এখানে। আহা, আমিও যদি ব্রাহ্মণ হতাম। বাইরে মুখে যতই আস্ফালন করি, ব্রাহ্মণত্বের দিকে লোভ আছে

বই কি। অব্রাহ্মণ গলায় পৈতে ঝোলালেই ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ সাজবার চেষ্টা করেন আজকাল অনেক অব্রাহ্মণ, চেষ্টা কিন্তু সফল হয় না। পৈতে নিয়ে, প্রবন্ধ লিখে তর্ক করে, যুক্তি দেখিয়ে অনেক রকম চেষ্টা অনেকে করছেন—কিন্তু সফল হচ্ছে না। বাইরে মুখে কিছু না বললেও অব্রাহ্মণকে মনে মনে সকলেই অব্রাহ্মণের শ্রেণীতেই বসিয়ে রেখেছে। অনেক অব্রাহ্মণ আজকাল দেখি ব্রাহ্মণের ছেলেমেয়ের প্রণাম কুড়োবার জন্যে ব্যগ্র, পা বাড়িয়ে দিতে আপত্তি করেন না। আমাদের বাগানে একটা ল্যাংড়া আমগাছের মাথার উপরে পরগাছা হয়েছিল একবার। সেটাকে পরগাছা বলে চিনতে কারও ভুল হয়নি। ল্যাংড়া গাছের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল বলে খাতিরও করে নি তাকে মালি। কেটে ফেলে দিয়েছিল। আহা, আমি যদি ব্রাহ্মণ হতাম, আর দ্বিজেনবাবুর পালটি ঘর হতাম যদি, কি সুবিধেই হত তাহলে। দ্বিজেনবাবু জানেও না যে তার সেদিনকার কথাগুলো আমার মনে কি রকম দাগ কেটে বসে গিয়েছিল—"সুখেনদা শুধু বুনতে পারেন না, যে বুনতে পারে তার সাতখুন মাপও করেন।" সেই দিনই উল-বোনার বই, কাঁটা, উল সব কিনেছি আমি। আঃ—আবার সব জড়িয়ে গেল, দূর ছাই!

"ঝুনুর মা, কেমন আছ—"

একি, মৃদুলা সত্যিই এসে হাজির হল যে! আরও জড়িয়ে গেল আমার সব। বলটা গড়িয়ে গেল মেঝেতে—দুত্তোর!

"ফুলু, চল খাবার দেওয়া হচ্ছে। নিমাইবাবুকে নিয়ে দ্বিজুদা এসে গেছেন। ঝুনুর মা, কেমন আছ তুমি—"

"ঘুম আসছে না কিছুতে।"

"আসবে এখুনি। পেট্রোম্যাক্সটার জন্যেই ঘুম আসছে না বোধ হয়। ওটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।"

মৃদুলা তার মাথার শিয়রে গিয়ে বসল। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"মৃদুলা, দেখনা বোনাটা কেমন হচ্ছে—"

নিয়ে গেলাম তার কাছে। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

"বাঃ চমৎকার হয়েছে তো, কি পরিষ্কার হাত তোমার—"

"পরিষ্কার না ছাই।"

"সত্যি, চমৎকার হয়েছে। সুখেনদাকে দেখিও, সুখেনদা এবিষয়ে অথরিটি—"

"তুমি দেখিও, আমার লজ্জা করবে। দেখাবে?"

"দেখাব। চল এবার। জায়গা হয়ে গেছে—। ঝুনুর মা ঘুমোক, ভজুয়া বসে থাক বাইরে—"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়েছে ঝুনুর মা। মৃদুলার স্পর্শটুকুর প্রত্যাশায় জেগেছিল যেন!

এগার
অবনীশের কথা

খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিজেন প্রস্তাব করলে, চেয়ারগুলো মাঠে নিয়ে গিয়ে বসা যাক। আমার

কিন্তু ইচ্ছে করছিল না বাইরে বসতে। একা থাকলে হয়ত গিয়ে বসতাম, কিন্তু দ্বিজেন আর নিমাইয়ের সঙ্গে বসে পলিটিক্স বা সমাজনীতি আলোচনা করবার উৎসাহ পাচ্ছিলাম না এই জ্যোৎস্নারাত্রে। সুখেনের অদ্ভুত গল্প আর ফাঁকা মাঠের জ্যোৎস্না, মৃদুলার নাতিস্পষ্ট অস্তিত্ব (মৃদুলার সম্বন্ধে কি বলব তা ঠিক ভেবে পাচ্ছি না—কারণ কথা দিয়ে বর্ণনা করা যায় এরকম কিছু যে লক্ষ্য করিনি তা নয়, কিন্তু আমার মনে যা জাগছে তা ওই পর্যবেক্ষণের ফল যে নয়, তা যে অসম্ভব রকম আরও অনেক বেশী কিছু, তা-ও অনুভব করছি—আর সেই অনুভূতিটাকে আরও রঙ চড়িয়ে আরও অসম্ভব করে তুলতেই ভাল লাগছে কেন জানি না)—এই সব মিলেমিশে মনের যে অবস্থা রয়েছে তাতে পলিটিক্সের কচকচি বা সমাজসংস্কারের গুরুগম্ভীর আলোচনা বরদাস্ত করা শক্ত এখন আমার পক্ষে। বারান্দার উপর ইজি চেয়ারটার উপরই শুয়ে আছি। বিজেন খেয়ে উঠেই বেরিয়ে গেল। নিরু আর ফুলুও চলে গেল রামধনের বাড়ি, সেখানেই নাকি ওরা শোবে, এখানে স্থানাভাব। সুখেন, দ্বিজেন আর নিমাই সামনের মাঠে তিনখানা চেয়ার নিয়ে বসেছে। জাতি-ভেদের সার্থকতা নিয়ে কি একটা তর্ক উঠেছে বুঝতে পারছি। ভাগ্যে চতুর্থ চেয়ার আর বাড়িতে নেই, থাকলে আমাকেও গিয়ে বসতে হত ওদের সঙ্গে। সুখেন বলেছিল একবার—"চল না, এই ইজি চেয়ারটাই ধরাধরি করে মাঠে নাবাই। দ্বিজু একাই পারবে হয়তো, ওই জগদ্দল মোটর-বাইকটা যেরকম ওঠাচ্ছে নাবাচ্ছে—"

বললাম, "থাক, এইখানেই বেশ আছি আমি। তোমরা গল্প কর, আমি ততক্ষণ এক চটকা ঘুম দিয়ে নি—"

"বেশ—"

যাবার সময় সুখেন আমার কানে কানে বলে গেল, "ওরা যাক, তারপর গল্পটা শুরু করা যাবে।"

ঘুম কিন্তু আসছে না। চোখ বুজে পড়ে আছি। চোখ দুটো পুরো বোজে নি। দুটো পাতার ফাঁক দিয়ে আবছাভাবে যা দেখতে পাচ্ছি, তা ঠিক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠ নয়, তা বিদ্যুতালোকিত ছোট ঘর একটি, ঘরের কোণে ফোন রয়েছে, মৃদুলা ঘরে ঢুকল, ফোনে কার সঙ্গে কথা কইতে লাগল—

"একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। আমাদের কিছু কাচের প্লেট, গ্লাস আর আসন চাই। লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন? তাহলে তো খুব ভাল হয়। তাদের ভাড়া দেব। না, না, ভাড়াটা নিতে হবে বই কি। মিছিমিছি আপনাদের খরচ করাবো কেন? হ্যাঁ, দু'ডজন করে হলেই হবে—আচ্ছা—আচ্ছা।"

স্পষ্ট শুনতে পেলাম মৃদুলার কথাগুলো। সুখেন যদিও বলে নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি মৃদুলা কে। ফুলু নিরু বেরিয়ে গেছে। মৃদুলা কিন্তু যায় নি। কি করছে ও? কোথায় আছে? নিরুর মুখখানা কেমন যেন মনে হল একটু বেশী গম্ভীর, নিরু একটু গম্ভীরই কিন্তু ওর গাম্ভীর্যের তলায় যে কৌতুকটা প্রচ্ছন্ন থাকে সেটা যেন নেই মনে হল, ঘরটা আছে কিন্তু ঘরের আলোটা যেন নিবে গেছে। ওর সঙ্গী দরকার একটি। বিজু ওকে বিয়ে করতে চায়। দুজনে একটু মাখামাখি হয়েছে মনে হচ্ছে। সুখেনের কাছে পাড়ব না কি কথাটা। ঝির ঝির করে হাওয়া এল একটু পিছন থেকে! এসেই চলে গেল। হাওয়া নয় যেন পিওন, চিঠি দিয়ে গেল,

সেই চেনা অথচ অচেনা গন্ধটার চিঠি। মৃদুলা কাছেই আছে তাহলে কোথাও। তাকে দেখবার প্রলোভনটা সম্বরণ করতেই অনেকখানি সময় এবং শক্তি খরচ হল। আধবোজা চোখের ফাঁকে ফাঁকে নূতন ছবি ফুটে উঠছে ইতিমধ্যে। সীমাহীন সমুদ্রে তিনটে লোক হাবুডুবু খাচ্ছে—প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে। তিনটে কালো কালো মাথা দেখতে পাচ্ছি—সুখেনের, নিমাইয়ের আর দ্বিজেনের। সমুদ্রটা জ্যোৎস্নার। হাওয়া-হরকরা আবার এল। দিয়ে গেল সুগন্ধি চিঠি। হেরে গেলাম। আত্মসম্মানবোধ আর পোশাকী বিবেককে পরাজয় মানতে হল কৌতূহলের কাছে। জুতো খুলে নিঃশব্দে উঠলাম। দেখলাম দ্বিজেন নেই, সুখেন আর নিমাই বসে আছে। তর্ক করছে। নিঃশব্দচরণে ঘরে ঢুকে দেখি ওদিকের কোণের ঘরে আলো জ্বলছে। পেট্রোম্যাক্‌স। কি করছে মৃদুলা ওখানে বসে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। দেখা পেলাম এবার। উল বুনছে বসে মৃদুলা। নিবিষ্টচিত্তে বুনছে। পেট্রোম্যাক্‌সের কড়া আলোয় মুখের একপাশটা দেখা যাচ্ছে শুধু। রং ধপধপে সাদা নয়, গোলাপীও নয়, সোনালী, হঠাৎ মৃদু হাসি, অতি মৃদু, ফুটে উঠল তার মুখে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—"দেশালাই খুঁজছেন বুঝি। দিচ্ছি, দাঁড়ান"—

—শুধু বিস্ময় নয়, আমার কেমন যেন আতঙ্ক হল। ঠিক ওই অজুহাতটাই মনে মনে খাড়া করেছিলাম আমিও, যদি ধরা পড়ে যাই বলব দেশালাই খুঁজছি।

বললাম, "ঠিক ধরেছ। দেশালাইটা ফুরিয়ে গেল। তুমি কি করে বুঝলে দেশালাই খুঁজছি।"

"যে রেটে সিগারেট খাচ্ছেন সন্ধে থেকে, দেশালাই ফুরোবে না? ক'টাই বা কাঠি থাকে একটা বাক্সে।"

উঠে এল। ঘরে ঢুকে নূতন এক বাক্স দেশালাই বার করে দিলে আমাকে। আমার জন্যেই রাখা ছিল যেন!

"এত রাত্রে সোয়েটার বুনছ যে। বাইরে এমন জ্যোৎস্না—"

"আমি বুনছি না। এটা ফুলু বুনেছে, আমি একটু ঠিক-ঠাক করে দিচ্ছি। ভোরে ও নিয়ে যাবে কিনা।"

"ও—"

চলে এলাম। এসেই কানে গেল সুখেন নিমাইকে বলছে, "জাতিভেদ আছে। প্রকৃতিই সৃষ্টি করেছে সেটা, আমরা শুধু সেটা মানছি—"

নিমাই হেসে উঠল জোরে। মনে হল হাসি নয় হ্রেষা।

"মানো তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ওই মানাটাকে নিয়ে আস্ফালন কোরো না। প্রকৃতির নিয়ম নির্বিচারে মানে পশু, মানুষ সে নিয়ম উল্‌টে দেয়। সেইখানেই তার মনুষ্যত্ব।"

সুখেন আমতা আমতা করে বললে—"হতে পারে মনুষ্যত্ব। কিন্তু সে মনুষ্যত্ব লাভ কি সবাই করতে পারে? এতগুলো বেড়া ডিঙোনো কি সোজা কথা!"

"তুমি তো হার্ডল রেসে ফার্স্ট হতে বরাবর। তোমার মুখে একথা মানাচ্ছে না।"

সুখেন চুপ করে রইল।

তারপর বললে—"দ্বিজু তর্কটি তুলে দিয়ে সরে পড়ল আর তুমি রাত দুপুরে কেন যে জাতিভেদ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করতে লাগলে সেইটে আমার মাথাতে ঢুকছে না কিছুতে।"

নিমাই গম্ভীরভাবে বললে—"সবগুলো না পার একটা বেড়া তোমাকে ডিঙোতেই হবে। তুমি নিজে না পার আমি পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাব—"

"কি যে উদ্দেশ্য তোদের বুঝতে পারছি না।—কিসের বেড়া? বেড়া মানে?"

"জাতিভেদের।"

"তার মানেটা কি—"

"তুমি অন্ধ না কি!"

"পাওয়ার একটু কমেছে, কিন্তু একেবারে, অন্ধ হইনি।"

ঠিক এই সময় নিমাই ডাক্তার লক্ষ্য করলে যে আমি ঘুমোচ্ছি না, সিগারেট ধরাচ্ছি। উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। বললে, "চল, দেখি দ্বিজু কোথা গেল। রাত্রেই ফিরতে হবে আমাকে।"

সুখেনকে নিয়ে নিমাই চেয়ার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। বুঝলাম গোপনীয় কথা। আমার কানের জন্য নয়। দেখলাম কিছুদূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কথা কইতে লাগল। নিমাই ডাক্তার মাঝে মাঝে আকাশের দিকে হাত তুলে কি একটা নক্ষত্র দেখাতে লাগল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। শুয়ে পড়লাম ইজি চেয়ারেই। আমার মনে হল আমি ঠিক বোধ হয় খাপ খাচ্ছি না এদের সঙ্গে। প্রথমত অনেকদিন বিদেশে ছিলাম, দ্বিতীয়ত লণ্ডনের ভাল ডিগ্রি পেয়েছি একটা, তৃতীয়ত এই তুচ্ছ ঘটনাটার উপর এদেশের কাগজওলারা দুচার পোঁচ রং চড়িয়েছে, আমার ছবি ছেপেছে, আমি যে কোথায় কত টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছি সে খবরটাও জানিয়েছে সবাইকে, ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা আমার পক্ষে মর্মান্তিক। শুধু পর নয়, শত্রু হয়ে পড়েছি অনেকের। আমি যে উন্নতি করেছি এইটেই আমার অপরাধ। বিলেত যাবার আগে যে স্থানটি ছেড়ে গিয়েছিলাম ফিরে এসে সে স্থানটি খুঁজে পাচ্ছি না আর। সবাই দেঁতো হাসি হেসে ভদ্রতা করছে, একমাত্র সুখেন ছাড়া। ও-ই কেবল বদলায়নি। সুখেনের টানেই এখানে আসা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সুখেন টানটার বাহক, অদৃশ্য কোন শক্তি আমার অজ্ঞাতসারেই সম্ভবত আমাকে টেনে এনেছে এখানে। গভীর অরণ্যেও ফুল ফুটলে মধুকরের দল তার উদ্দেশ্যে ছুটে আসে, তারা ফুলটাকে দেখে আসে না, এসে তবে দেখে। সুখেন আর নিমাই ওই বাঁকটার মোড়ে অন্তর্ধান করল দেখছি। নিমাই-ডাক্তারের মতলবটা কি তা বোঝা যাচ্ছে কিছু। কিছু একটা আছেই। সুখেন এলে বোঝা যাবে সেটা। সুখেন....আশ্চর্য হচ্ছি, একটা কথা ভেবে। ওদের গোপন পরামর্শে আমি যোগ দিতে পারিনি বলে, আমাকে ওরা বাদ দিয়েছে বলে, কেমন যেন একটু অপমানিত বোধ করছি। অথচ বাদ দেবার মত কারণ তো থাকতে পারে না।....দিগ্বলয়ে কোনও মেঘ নেই, সেই মেঘের ময়ূরপঙ্খী কোথায় ভেসে চলে গেছে, অজানা নদীর স্রোতে, অজানা সমুদ্রে। গাছগুলো কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে ঠিক। আকাশের গায়ে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দিয়ে যে ছবি এঁকেছে তারা সে ছবির একটি রেখাও পরিবর্তিত হয়নি, ওরা মাটিতে আঁকড়ে ধরে অচল হয়ে আছে। কিন্তু না, ওরাও অচল হয়ে নেই, ওরাও চলছে, পৃথিবীতে কিছুই স্থির নেই, সমস্ত পৃথিবীটাই ছুটে চলেছে, সেকেণ্ডে প্রায় আঠারো মাইল বেগে....তন্দ্রার ভিতর মোটর বাইকের শব্দটা শুনলাম, খুব জোরে বেরিয়ে গেল... মনে হল বিরাট এক মোটর-বাইকে চড়ে সবাই চলেছি, মহাশূন্য ভেদ করে...মোটর বাইকটা গোল.... সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটেছে....নক্ষত্রদের দল কাছে আসছে আবার সরে যাচ্ছে....নিমাই যেন সুখেনকে বলছে এখনও জাতিভেদের বেড়াটা পার হতে পারিনি?

"অবন, ঘুমুলি না কি—"

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সুখেনের জন্য মনে মনে অপেক্ষাও করছিলাম, মনের ভিতর জেগেই ছিলাম। উঠে বসলাম।

"দাঁড়া আসছি—"

বলেই সুখেন ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ বেরুল না।

"চিপ্ চিপ্ চিপ্", সেই পোকাটা ইঙ্গিতে কি যেন বলল আবার। সিগারেট বার করলাম। সেটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ধীরে ধীরে দেশালাই কাঠিটা বার করলাম, কিন্তু জ্বালতে সাহস হল না, মনে হল, বিস্ফোরণের যে অনিবার্য শব্দটা হবে তাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ঘুমন্ত শহরের বুকে অ্যাটম বম পড়লে যে সর্বনাশ হয়, তার চেয়েও ঢের বেশী সর্বনাশ, একটা সৃষ্টি বুঝি চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। "চিপ্ চিপ্ চিপ্" পোকাটাও মনে হল সাবধান করছে। বসে রইলাম চুপ করে। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, পিছনের ঘর থেকে গুঞ্জন হচ্ছে মনে হল। মনে হল, অনেক দূরে যেন নূপুর বাজছে। মৃদুলার সঙ্গে সুখেন কথা কইছে? কি কথা? কি কথা...! হঠাৎ সুখেন জোরে কথা কয়ে উঠল।

"ফুলু? ফুলু করেছে এটা! চমৎকার হয়েছে তো, এমন চমৎকার আমিও পারতাম না..."

তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল আবার। একটু পরে সুখেন বেরিয়ে এল। বগলে একটা মাদুর হাতে একটা তাকিয়া।

"চেয়ারে বসতে আর ভাল লাগছে না। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসা যাক একটু। মৃযে হোল্ডলের ভিতর আমার তাকিয়াটা এনেছিল তা জানতামই না—"

আমার চেয়ারের সামনে সড়াৎ করে মাদুরটা পেতে ধপাস করে তাকিয়াটা ফেলল তার উপর, আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সিগারেটটা অসঙ্কোচে ধরিয়ে ফেললাম। দোমড়ানো তাকিয়াটায় চাপড় মারতে মারতে অস্ফুটকণ্ঠে সুখেন যেন তাকিয়াটাকে সম্বোধন করেই বললে— "ধারণাই বদলে গেল। কত ধারণাই যে বদলাতে হবে জীবনে। যাক, ভালই হল। আমি বাধা দিতে যাব কেন শুধু শুধু। ওরা থিতু হয়ে বসুক এইতো আমি চাই, ওরা নিজেদের সংসার বুঝে নিলেই আমি সটান কাশী কিম্বা হরিদ্বার! এ সব ঝামেলার মধ্যে আর থাকছি না!...."

আবার তাকিয়া চাপড়াতে লাগল। তাকিয়ার দিকে চেয়েই বলল আবার—"আমার ধারণাটা অন্য রকম ছিল। একদম বদলে গেল। ধারণা জিনিসটা অদ্ভুত, কিছুতেই একরকম থাকে না, কি বলিস—"

এইবার আমার দিকে চাইলে সুখেন।

বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক মেঘের মতন। চেহারা তো বদলায়ই, অনেক সময়ে লোপও পেয়ে যায়।"

"ঠিক বলেছিস্"—বলেই আবার তাকিয়াটা নিয়ে পড়ল।

কাছেই যে থামটা ছিল তার গায়ে খাড়া করে রেখে ঠেস দিয়ে বসল তাতে। এইবার মনোমত হল। আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাইলে।

"কি ধারণা বদলাল তোমার?"

এ প্রশ্নের উত্তরে ও আর একটা প্রশ্ন করে বসল।

"জাতিভেদ মানিস তুই?"

"নানারকম জাতি আছে যখন, তখন সেটা মানতে হবে বই কি। কিন্তু সেটাকে দুর্লঙ্ঘ্য বলে মনে করি না।"

ভুরুকে যতদূর কোঁচকানো সম্ভব ততদূর কুঁচকে সুখেন আমার হাঁটুর দিকে চেয়ে রইল। আমার মনে হল ও এ সম্বন্ধে আরও কিছু শুনতে চাইছে আমার কাছে।

বললাম, "হিমালয় আছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সেই হিমালয়কে ডিঙিয়ে যাবার যখনই প্রয়োজন হয়েছে মানুষের, মানুষ ডিঙ্গিয়ে গেছে—"

"নিমাই এতক্ষণ বেড়া বেড়া করে চেঁচাচ্ছিল, তুমি সেটাকে একেবারে হিমালয় করে তুললে! বেড়াই বল, আর হিমালয়ই বল, আমি জানি জীবনে দুটি জিনিসই হল আসল, তা বেড়াও নয়, হিমালয়ও নয়—তা এই—"

এই বলে সুখেন একবার কপালে আর একবার বুকে হাত দিলে।

"এই দুটি জিনিসই চালাচ্ছে সকলকে, চালাবেও চিরকাল। ওরাই প্রেমিক, ওরাই ঘটক। তাছাড়া, এটা নিমাই ধরেই বা নিলে কেন যে আমি আপত্তি করব। নক্ষত্র-টক্ষত্র দেখিয়ে একেবারে ঘাবড়ে দিলে আমাকে! ও কি মনে করে আমি—"

বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আবার আমার হাঁটুর ওপর।

"ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপার কিছুই নয়। তুমিই বল না, যে মেয়েকে বরাবর বড়লোকের ভ্যাবাগঙ্গারাম আদুরে মেয়ে বলে ধারণা করে রেখেছিলাম, হঠাৎ যদি আবিষ্কার করি যে, সে ঠিক একেবারে উল্টোটি,—স্বচক্ষে আমি দেখে এলাম রামধনের বউকে ও হাওয়া করছে বসে, স্বচক্ষে এক্ষুণি দেখলাম এমন সোয়েটার বুনেছে যা আমার—প্লীজ নোট—আমার সুদ্ধ তাক লেগে গেল। মৃ বললে, আনারসের চাটনিটা ও-ই করেছে বিকেলে এসেই, আমি তখন ছিলাম না, রামধনের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে টুক করে কখন চাটনিটা করে রেখেছে। এসব জানবার পরও জাতিভেদের মানে হয় কোনও—"

আমার দিকে চেয়ে এমনভাবে প্রশ্নটা করলে যেন আমি জাতিভেদের প্রশ্ন তুলে বাধা সৃষ্টি করছি।

"কার কথা বলছ—"

"ফুলুর! দ্বিজু ওকে বিয়ে করতে চায়। নিমাই সুপারিশ করতে এসেছিল। মেয়েটি যখন সত্যিই লক্ষ্মী তখন আবার জাতের কথা কেন। লক্ষ্মীর কি জাত আছে?"

"কি বলিস্ তুই—"

"বেশ, ভালই তো।"

"তোর আপত্তি নেই?"

"কিছুমাত্র না। আমার আপত্তি থাকবে কেন?"

"ঠিক মন থেকে বলছিস—?"

"মন থেকেই বলছি। ফুলু মেয়েটি ভাল, নিরু তো উচ্ছ্বসিত। খুব সরল না কি।"

"যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, তুই পাছে আপত্তি করে বসিস।"

কথাটার তাৎপর্য তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুখেন হঠাৎ বলে উঠল—"আশা করি মামা মামীও খুশী হবেন। মামা তো নামজাদা লিবারল ছিলেন, মুসলমান বাবুর্চির হাতে প্রকাশ্যে মুরগীর মাংস খেয়েছেন কতবার। মামী বাইরে ছুঁই ছুঁই করতেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনিও কিছু কম উদার ছিলেন না। তোকে তো বলেছি—ওই কুড়োনী মেয়েটাকে প্রণাম করতে স্বচক্ষে দেখেছি আমি। তখন কেউ জানতই না যে, ও কি জাতের মেয়ে—"

"গল্পটা তুই ভাল করে বললিই না তো—"

"এইবার বলব, কফিটা খেয়ে নিয়ে জুৎ করে বলা যাবে।"

"এখন আবার কফি কেন—"

"মৃ করছে যে। ও স্পিরিট স্টোভ সঙ্গে করে এনেছে, না খাইয়ে ছাড়বে কি?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভজুয়া দু পেয়ালা কফি নিয়ে এল। সুখেন ধমকে উঠল—"আগে তেপায়াটা আন। রাখবি কিসের উপর?"

"এই যে আমি এনেছি—"

তেপায়াটা রেখেই মৃদুলা চলে গেল ঘরের ভিতর।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম। দেখলাম, আবার একটা মেঘ এসেছে দিগ্বলয়ের এক প্রান্তে। জ্যোৎস্নামণ্ডিত দুগ্ধধবল স্বপ্ন যেন একটা।

বারো
নিরুর কথা

ছি, ছি, কি কাণ্ড করে ফেললাম আমি তখন! আমি যে এতটা আত্মবিস্মৃত হতে পারি তা কল্পনাও করি নি কোনও দিনও। কেঁদে ফেললাম? ছি, ছি। বিজুদার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। মনে হচ্ছে আয়নাতে নিজেই নিজের মুখের দিকে আর চাইতে পারব না। রামধনের বাড়িতে তাদের দেওয়ালে-টাঙানো ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম একবার, সরে আসতে হল। লজ্জা করল। ভেবেছিলাম রামধনের বাড়িতেই একধারে কোথাও শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু মৃদুলা যে ফরমাসটি করেছে তা করতে হলে রাত্রে ঘুমোনো যাবে না। অত রাত্রে শুয়ে এত ভোরে আর ঘুম ভাঙবে না। তাছাড়া ওখানে শোওয়ার অসুবিধাও আছে। ঝুনুর মায়ের জ্বরটা বেড়েছে। ফুলু বসে হাওয়া করছে তাকে। আমি যতক্ষণ ছিলাম ফুলু কেবলই গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ফিস ফিস করে গল্প করছিল আমার সঙ্গে। এতে আমার তো ঘুম হতই না, মাঝ থেকে ঝুনুর মায়েরও ঘুম ভেঙে যেত। চলে এলাম ভাই। বিজেনদা কিন্তু গেল কোথায়। খেয়ে উঠেই কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে। ওই তো সেই টিলা, যার উপর আমরা বসেছিলাম একটু আগে। কেউ তো নেই ওখানে। কোথায় গেল তাহলে...। রাজুই বা গেল কোথায়? বাংলোতে ফিরে যাব না কি। কিন্তু সেখানে দাদা আর সুখেনদা হয়তো গল্প জমিয়েছেন। আমি গেলেই বাধা পড়বে। দ্বিজুবাবু তো নিমাই ডাক্তারকে পৌঁছুতে

গেল। সুখেনদা নিশ্চয় গল্প ফেঁদেছেন আবার। আর মৃদুলা ঘরের ভিতর ঘোরা-ফেরা করছে অলক্ষ্যে। আড়ালে একা একা থাকতেই ভালবাসে মেয়েটা। অদ্ভুত মেয়ে মৃদুলা। খুব ভাল, কিন্তু কেমন যেন আন্‌ক্যানি, ঠিক সহজ হওয়া যায় না ওর কাছে। রাজু যাকে দেখে ভূত মনে করেছিল একটু আগে, সে আর কেউ নয়, মৃদুলাই। একটু আগে অন্ধকার কোণের বারান্দায় বসে বসে ও যখন ডিশগুলো মুছে মুছে রাখছিল, তখন আমারও যেন মনে হচ্ছিল, ওর গা থেকে একটু একটু আলো বেরুচ্ছে। দূর থেকে দেখেছিলাম অবশ্য, কাছে গিয়ে আর বুঝতে পারলাম না, বরং মনে হল দক্ষিণ বারান্দায় যে পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলছে তারি ঝলক বুঝি। মেয়েটি কিন্তু আন্‌ক্যানি! অথচ ভাল খুব।... কে আসছে দূরে.... মেয়ে মনে হচ্ছে, ওড়না রয়েছে গায়ে। এই দিকেই আসছে। মৃদুলা কি? না, মৃদুলার মতো নয় তো। দেখা যাক একটু এগিয়ে। ওমা, এ যে একেবারে অন্ন লোক। ঘাগরা, ওড়না, পায়ে চুমকি-বসানো নাগরা। এ আবার কোথা থেকে এল।

"আদাব—"

"আদাব। আপনাকে চিনতে পারছি না তো। কোথায় থাকেন আপনি?"

"এইখানেই। বিজেনবাবুকে খুঁজছেন তো, তিনি ওই ওদিকের খদের ভিতর বসে আছেন।"

"খদের ভিতর? কি করছেন সেখানে?"

"টর্চ জ্বেলে কি যেন লিখছেন।"

অবাক হয়ে গেলাম শুনে। মেয়েটি মুচকি হেসে চলে গেল। কি অদ্ভুত পাতলা ওরা ঘাগরা আর ওড়নার কাপড়। একেই মসলিন বলে না কি! মনে হচ্ছে যেন কাপড় নয়, জ্যোৎস্না গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। খদের ভিতর টর্চ জ্বেলে কি লিখছে বিজেনদা? বিজেনদার খেয়ালের আর সীমা নেই। খদটা কোন্ দিকে? মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে হতো। ঘাড় ফিরিয়ে আর তাকে দেখতে পেলাম না। কোথা গেল মেয়েটি! এখানে তো চারিদিকেই উঁচু নীচু। বিজেনদা কোথায় বসে আছে কে জানে। রাজু একটা খদের কথা বলছিল সেটা চিনি। সেইদিকেই যাওয়া যাক। সত্যি অদ্ভুত জ্যোৎস্না আজ। উথলে উঠেছে যেন রূপের জোয়ার। চাঁদ শুনেছি মরা উপগ্রহ....

এই যে কর্তা এখানেই বসে আছেন দেখছি। মনে করে এসেছিলাম খুব ঝগড়া করব এমনভাবে লুকিয়ে চলে আসার জন্যে। কিন্তু পারছি না, কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে পাঞ্জাবী আর ঢিলা পায়জামায়, মাথার চুলগুলো এলোমেলো, বাতাসে উড়ছে, মনে হচ্ছে অদৃশ্য মুকুট পরানো আছে যেন মাথায়! টর্চ জ্বালা রয়েছে সত্যি, ঝুঁকে ঝুঁকে তারই আলোয় কি যেন লিখছে। কি কাণ্ড!

"আসতে পারি—?"

"হ্যাঁ, এইবার এস। আমার হয়ে গেছে—"

"কি লিখছ?"

"পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ্ সেকের পয়েন্টসগুলো। বইটা তো আনিনি। ভেবে ভেবে লিখলাম। হয়ে গেছে! চল একটা টিলার উপরে ওঠা যাক। লেখবার সুবিধে হবে বলে এখানে নেবেছিলাম।"

উঠে এসে এক হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমি এমন অভিভূত হয়ে

পড়লাম যে, সেই মেয়েটির কথা বলতেই ভুলে গেলাম। মনে পড়লেও দ্বিতীয় কোন মেয়ের কথা তুলতাম না। মিছে কথা বলেছিলাম তখন, বিজেনদার কাছে আর কোনও মেয়েকে সহ্য করতে পারব না আমি। কারও ছায়া পর্যন্ত নয়। আস্তে আস্তে একটা টিলার উপর উঠলাম আমরা। বিজেনদা আমার কোমর। ধরে রইলই, আমার হাতখান তুলে জড়িয়ে দিলে নিজের গলায়। তারপর টিলায় উঠে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল নির্নিমেষে, যেন আমাকে প্রথম দেখছে।

"কি দেখছ অমন করে?"

"তোমাকে। ভাবছি তোমাকে কেন্দ্র করেই আলোচনাটা শুরু করব—"

"চোখ অন্য দিকে ফেরাও, কি যে কর,—ভারি লজ্জা করছে আমার—"

"করুক। ফেরাব কি করে, তুমিই তো ধরে রেখেছ। যাক্, ও সব বাজে ব্যাপারে মাথা না ঘুমিয়ে ব্রাডলে সাহেবের বক্তব্যটা মন দিয়ে শোন। ব্র্যাডলে যা বলেছেন তাঁর এক কথায় মানে হচ্ছে, কবিতার প্রাণ কবিত্ব, আর কবিত্বের প্রাণ কবির অনুভূতি-ভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রকাশ-ভঙ্গী। এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় যেখানে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তাকেই কবিতা বলব, রসোত্তীর্ণ করে এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় সাধন ছাড়া কবিতার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কবিতা হচ্ছে সৃষ্টি, স্রষ্টার ছাপও তাতে থাকা চাই—"

"ব্র্যাডলে যে সাবজেক্ট্, সাব্‌স্টান্স আর ফর্ম নিয়ে কি সব বলেছে, তার মানে কি— "

"মানে খুব সরল। ব্র্যাডলে 'প্যারাডাইস লস্ট"-এর উপমা দিয়েছেন, কিন্তু আমি এখন সপ্তম সর্গে চড়ে আছি, স্বর্গ থেকে পতনের কথা ভাবতে রাজি নই। আমি তোমাকেই উপমা দেব। মিছে কথা হবে না, সত্যিই তুমি একটা কবিতা, মানুষ-কবির নয় বিধাতা-কবির—"

শুনতে কি যে চমৎকার লাগছে তবু রাগের ভান করে বললাম—" কি যা তা বলছ—"

"বাধা দিও না, শুনে যাও। বিধাতা-কবির এই যে কবিতাটি—এর সাবজেক্ট্ কি? নিরুপমা। সাবজেক্ট্ হচ্ছে কবিতার নাম। নিরুপমা নামে আরও অনেক মেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও তোমার মতো নয়। বিধাতা তোমার মধ্যে দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তার নাম নিরুপমা না হয়ে পারুল, বকুল, এমন কি খেঁদি পুঁটি হলেও সে কাব্যের মাধুর্য কমত না। সুতরাং নামটার সঙ্গে আসল কবিতাটির নিবিড় সম্পর্ক নেই, যতটুকু আছে তা আকস্মিক যোগাযোগ। মিলটন তাঁর কাব্যের নাম প্যারাডাইস লস্ট্ না দিয়ে ধর যদি দিতেন 'দি গ্রেট ফল' বা ওইরকম একটা কিছু, তাহলে তাঁর কাব্যের মর্যাদা কমত না। কিন্তু আর একটা মজা আছে, নামকরণ একবার হয়ে গেলে তখন কাব্যের সঙ্গে নাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় যে, কাব্যেরই একটা অঙ্গ বলে মনে হয় তাকে। নিরুপমা বললেই তোমার চিত্রটা ফুটে ওঠে তোমার পরিচিতদের মনে। নূরজাহান আরো অনেক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু নূরজাহান বললে অন্য আর কাউকে বুঝি না আমরা। নামের সঙ্গে কাব্যের এই সম্পর্কটির সুযোগ নেয় চোর লেখকরা। ভাল লেখকদের নামজাদা বইয়ের নামটা চুরি করে ছেপে দেয় নিজেদের বইয়ের উপর। ভাবে নামের জোরে বই কাটবে। কিছুদিন কাটেও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাটে পোকায়। আমি একজন মেথরাণীকে জানতাম, তার নাম ছিল নূরজাহান। প্রথম যখন নামটা শুনি একটু কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু একবার চোখে দেখার পর—" হো হো করে হেসে উঠল বিজেনদা।

আমি চমকে উঠলাম। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

"সুতরাং এবার বোধহয় বুঝেছ সাব্জেক্ট অর্থাৎ নামের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কটা কি—"

"বুঝেছি। আর ফর্ম?—"

"বলছি। ফর্মটা হচ্ছে বলবার কায়দা, প্রকাশভঙ্গী, বক্তব্যটাকে একটা বিশেষ ধরনে ব্যক্ত করা। কৃত্তিবাস রামায়ণের গল্পটা বলছেন সরল ভাষায় পয়ার ছন্দে। ওই ভাষা আর ওই ছন্দ মিলে যা হয়েছে তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের ফর্ম। মাইকেল মধুসূদন ওই রামায়ণের গল্পই লিখেছেন কিন্তু অমিত্রাক্ষণ ছন্দে শক্ত শক্ত গুরুগম্ভীর কথা দিয়ে—ওইটে হল মাইকেলের কাব্যের ফর্ম। আবার ওই রামায়ণের গল্পই ভবভূতি লিখেছেন আলাদা, ছাঁদে, আলাদা ভাষায়। তুলসীদাস লিখেছেন আর একরকম করে। বিধাতা-কবি এই নিরুপমা শীর্ষক কাব্যটিও প্রকাশ করেছেন একটি বিশেষ ফর্মের মাধ্যমে, সে ফর্মটি হচ্ছে তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। তার শ্যামল রং, পানের মতো মুখ, ছোট্ট নাক, পুষ্ট অধর, কুন্দ দন্ত, কম্বু গ্রীবা, পীবর বক্ষ—"

মুখ চেপে ধরতে হল।

"কি আরম্ভ করেছ তুমি! ওরকম কর তো উঠে যাব। ফর্ম বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এবার সাবস্টান্সের কথা বল—"

"তোমার সাবস্টান্স বিশ্লেষণ করলে কিছু মাংস, কিছু অস্থি, কিছু রক্ত, কিছু মেদ, কিছু মজ্জা—এই সব পাওয়া যাবে। যে কোন তরুণীর সাবস্টান্সও মোটামুটি এই। সেইজন্য শুধু সাবস্টান্স নিয়ে মাতামাতি করে যারা, তারা বেরসিক। পায়খানাও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়, প্রাসাদও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়। দেবমন্দিরও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়। চুন ইঁট সুরকি সিমেণ্টই বড় কথা নয়, তা দিয়ে কি তৈরি হয়েছে সেইটেই হল আসল কথা। সুতরাং কাব্যে—শুধু কাব্যে কেন, যে কোনও সৃষ্টিতে— সাবস্টান্সের সঙ্গে ফর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটা থেকে আর একটা আলাদা করা অসম্ভব। আলাদা করতে গেলেই কবিতা মারা যাবে। তোমাকে কেটে যদি তোমার অস্থি মাংস মেদ মজ্জা আলাদা করি তাহলে আর তুমি থাকবে না। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, ফর্ম আর সাবস্টান্সের সমন্বয়ই কবিতা নয়। নিরুপমার ফোটো বা স্ট্যাচু যেমন নিরুপমা নয়। তার মধ্যে প্রাণের লীলা থাকা চাই। নিরুপমার চলনে বলনে হাসিতে ভ্রূভঙ্গে অপাঙ্গে অধরে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, তার চরিত্রে বুদ্ধিতে মনুষ্যত্বে যা বিকশিত হচ্ছে নানা বর্ণে—তাই নিরুপমা কবিতার আসল রূপ। দেহকে অবলম্বন করে অন্তরের রূপটা ফুটেছে বলেই দেহের কদর। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে রূপটাই মুখ্য। দেহটা নয়। পঙ্ককে আমরা সহ্য করি পঙ্কজিনীর জন্য। ক্যানভাসকে খাতির করি ছবির জন্য...."

"খদের ভিতরে বসে বসে এই সব লিখছিলে এতক্ষণ ধরে!"

"হ্যাঁ। এই সব লিখছিলাম, কিন্তু তার ফর্ম আলাদা—"

"তার মানে?"

"কবিতা লিখছিলাম। গদ্য ছন্দে অবশ্য। শুনবে?"

"পড়—"

দপ্ করে জ্বলে উঠল প্রকাণ্ড টর্চটা। বিজেনদা পড়তে লাগল—

"নিরুপমার উপমা নেই বলে অনেকে,
মানিনা সে কথা।

নিরুপমার উপমা আছে,
সে উপমা নিরুপমাই।

নিরুপমাকে রূপসী বলেছে কেউ কেউ,
কিন্তু তারা সবটা বলে নি,
কারণ তারা পুরো সত্যটাকে দেখে নি।
নিরুপমা একান্ত ভাবেই নিরুপমা,
নিরুপমা ছাড়া ও আর কিছু নয়,
কিছু হতে পারত না,
একথা না বললে সবটা বলা হয় না।
রূপসী অনেক আছে
কিন্তু সবাই নিরুপমা নয়।

রংটা যদি আর একটু ফর্সা হত
নাকটা হত যদি আর একটু টিকোলো'
কম-পুরু ঠোঁট দুটো হত যদি,
চোখ দুটো আরও টানা-টানা হত,
তাহলে হয়তো আরও রূপসী হত সে
কিন্তু সে সেই নিরুপমা হত না
যে আমার কল্পনাকে করেছে স্বপ্নাতুর,
চোখে পরিয়েছে মোহাঞ্জন,
রঙের পরশ লাগিয়েছে
জন্মজন্মান্তরের প্রহেলিকা-রহস্যে,

যে নিরুপমা
মহাকালকে বিলীন করতে পারে মুহূর্তে,
মুহূর্তকে প্রসারিত করতে পারে মহাকালে,
সেই শ্যামলী, ঠোঁট-পুরু নাক-ছোট নিরুপমা
বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি;
সে অবিসংবাদিতা,
অদ্বিতীয়া।
ওকেই আমি চেয়েছি
চিরকাল চাইব।"

টর্চ নিবে গেল। পাশাপাশি বসে আছি দুজনে। গলার কাছটা ব্যথা করছে, মনে হচ্ছে চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়বে এখুনি, কিন্তু পড়ছে না।

হঠাৎ বিজেনদা বললে, "তুমি যখন খদের ওপার থেকে লুকিয়ে কথা কইছিলে তখন আমি এইটে লিখছিলাম।"

"আমি আবার কখন কথা কইলাম—"

"বাঃ, বললে না, আমি যদি বলি, শাহনশাহ্ আমি তোমার পূর্বজন্মের বেগম ফিরে এসেছি, চিনতে পারবে আমাকে—"

"না, আমি তো বলি নি।"

"মিথ্যুক কোথাকার—"

সেই ওড়না-পরা মেয়েটার ছবি ভেসে উঠল মনে। নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি। না, বিজেনদার ভুলটা ভাঙাব না। ও মনে করুক যে আমিই এসেছিলাম। মুখের দিকে চেয়ে আছি নির্নিমেষে—হতে পারে বই কি শাহনশাহ্ ছিল...কিন্তু না, আর এখানে বসে থাকা নয়।

"অনেক রাত হয়ে গেছে চল। মৃদুলা আমাকে আবার ফরমাস করেছ ভোরবেলা কিছু কুমুদ ফুল আনবার জন্যে—ওই দূরের পুকুরটা থেকে—"

"কুমুদ ফুল? কেন?"

"কি জানি—"

"এখনই চল না নিয়ে আসি গিয়ে। বেশী দূর তো নয়—"

"চল।"

তের
দ্বিজেনের কথা

"জোরে চালাও, আরো জোরে। ওই নক্ষত্রটা অস্ত যাবার আগে আমি আমার ছাতে গিয়ে বসতে চাই।"

মেঠো রাস্তায় প্রায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে নিমাই ডাক্তারের বাড়িতে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নিমাই গাড়ি থেকে নেমেই ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইলে।

"না, এখনও অস্ত যায়নি। চল, ওপরে চল।"

"কোন্ নক্ষত্রটা?"

"ওই যে বকুল গাছের মাথায় দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। এখনই অস্ত যাবে। চল—"

"কি নাম ওটার?"

"লুব্ধক। ইংরেজি নাম সিরিয়াস। চল ছাতে যাই—"

গাড়িটা নিমাইয়ের চাকরের জিম্মায় রেখে ছাতে উঠলাম দু'জনে। পথে একটিও কথা হয়নি। আমি একবার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম, নিমাই উত্তর দেয় নি। ছাতে চেয়ার পাতাই ছিল। চেয়ারে বসে প্রথমেই জিগ্যেস করলাম—"সুখেনদা কি বললে—"

নিমাই চুপ করে রইল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বাম তর্জনীটা দিয়ে বাঁদিকের গোঁফটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না, ওর গোঁফের দিকে

চেয়ে কতক্ষণই বা বসে থাকা সম্ভব। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করাও যুক্তিযুক্ত মনে হল না। নিমাইয়ের আকাশমুখী দৃষ্টির দিকে চেয়ে মনে হল নিমাই ছাতে নেই, আকাশেই চলে গেছে; যখন ফিরে আসবে তখন নিজেই উত্তর দেবে। লুব্ধক নক্ষত্রের দিকে আমিও মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। অদ্ভুত উজ্জ্বল নক্ষত্রটা সত্যি। পরে খবর নিয়ে জেনেছি, ওইটেই আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

নক্ষত্রটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমিও কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। নিমাইয়ের কথাতে আমার চমক ভাঙল, কতক্ষণ পরে জানি না। নিমাই অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল একটা।

"আর কি ফেরবার উপায় আছে?"

"কোথা থেকে?"

"ফুলুর কবল থেকে।"

"কবল মনে হলে ফেরবার উপায় নিশ্চয় বার করতাম, কিন্তু ওটা কবল বলে মনে হয় নি আমার একবারও।"

"কি মনে হয়েছে—"

"তা বলা যাবে না। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, তুমি আমাকে এমনভাবে জেরা করবে জানলে আমি তোমার কাছে আসতাম না। তোমাকে যতটুকু বলেছি ততটুকু থেকেই তোমার বোঝা উচিত আমার মনের অবস্থাটা কি। আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি, তোমার উপহাসের খোরাক জোগাতে আসিনি। আসল কথাটা বল না। সুখেনদার কাছে পেড়েছিলে কথাটা? জাতিভেদের তর্কটা কোথায় গিয়ে ঠেকল শেষ পর্যন্ত।"

তবু নিমাই সুখেনদা প্রসঙ্গে কোন কথাই বললে না।

একটু চুপ করে থেকে বললে—"তোমাকে নিয়ে উপহাস করবার সময় নেই আমার, আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তবে তোমার মধ্যেও একজন উপহাসরসিক ব্যক্তি আছেন সেটা মনে রেখ কিন্তু। নিজেই শেষ পর্যন্ত তার খোরাক না হয়ে পড়, সেই কথাই আমি ভাবছি। ফেরবার উপায় যদি থাকে প্লীজ ব্যাক আউট। আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা মনোহর কিন্তু ভয়ঙ্কর। তোমাকে আমি সাহায্য করতে রাজি হয়েছি কারণ, না-পাওয়ার যে কি দুঃখ তা আমি মর্মে মর্মে জানি কিন্তু এর আর একটা দিকও যে আছে তা যদি তোমাকে না বলি তাহলে বন্ধুকৃত্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

"বল। ফিরে যাওয়ার তাড়া নেই আমার।"

"সিগারেট ধরাও তাহলে—"

নক্ষত্রটার দিকে চট্ করে এক নজর চেয়ে নিমাই পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলে। আমাকে একটা সিগারেট দিলে, নিজে একটা নিলে। আমি সিগারেট ধরালাম, ও কিন্তু সিগারেটটার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে, তারপর ধরালে সেটা। ধরিয়েও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। আমি নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সকৌতুকে লক্ষ্য করছিলাম ওর অন্যমনস্কতা। লক্ষ্য করতে করতে আমিও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলাম, ফুলু এখন কি করছে। সে কখন কার সঙ্গে কোলকাতায় ফিরবে।

এখান থেকে ফিরে গিয়ে তাকে সাইডকারে বসিয়ে গোপনে একটা চক্কোর দিয়ে আসবার সময় হবে কি না।

হঠাৎ নিমাই বললে—"অরুণার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন আমি মেডিকেল কলেজে। থার্ড ইয়ারে পড়ি। কলেজের এক ডিমনস্ট্রেটারের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল, সেইখানেই আমি ওকে প্রথম দেখি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়েছিল। তখন ওর বয়স তের বা বড় জোর চৌদ্দ। বাঙালী মেয়ের মতো চেহারা নয়। নীল চোখ, লালচে রং, সোনালী চুল। শেলীর ছবি দেখেছিস্? অনেকটা সেই রকম। প্রথম দিন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, নিতান্ত পরিচিত লোককে অনেকদিন পরে অচেনা লোকের ভিড়ে দেখতে পেলে যেমন অবাক লাগে, আনন্দ হয়, আমার ঠিক তেমনি অবাক লেগেছিল, আনন্দ হয়েছিল। অরুণারও যে হয়েছিল তা তার চোখের দৃষ্টি থেকে বুঝেছিলাম। পরে অরুণা আমাকে বলেওছিল সে কথা। প্রথম প্রথম আমাদের কোনও কথাই হয় নি। আমি কোন না কোন একটা ছুতো করে রোজই ডিমনস্ট্রেটারের বাড়ি যেতাম, আর সে-ও নানা ছুতোয় আমার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করত। কথাবার্তা একটিও হত না, অথচ সে-ও সব বুঝত, আমিও সব বুঝতাম। আমি তখন মনে করেছিলাম, অরুণা বোধহয় ডিমনস্ট্রেটারের কোনও আত্মীয়া, কোলকাতায় পড়াশোনার জন্যে আছে। মেয়ে যে নয় তা বুঝেছিলাম। কারণ ডিমনস্ট্রেটার ভদ্রলোক বিয়েই করেন নি। চেহারার কিছুমাত্র মিল ছিল না, তাই বোন বলেও সন্দেহ হয় নি। ওসব নিয়ে মাথাই ঘামাই নি তখন। তাকে বিয়ে করতে হবে একথাও মনে হয় নি। তাকে রোজ কাছাকাছি পাচ্ছি এতেই আমি ভরপুর হয়ে ছিলাম। ডিমনস্ট্রেটার মশাই, কিম্বা তাঁর মা আমাদের মেলামেশাতে বাধাও দিতেন না তেমন। বোটানিকাল গার্ডেনে একদিন পিকনিক করতে গেলেন তাঁরা। আমাকেও নিমন্ত্রণ করলেন। সেইদিনই অরুণার সঙ্গে প্রথম কথা কইলাম। সেইদিনই অরুণা বললে, "আমরা পরশু চলে যাচ্ছি এখান থেকে।" "কোথা যাচ্ছ?"—প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বোধ হয় স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বেরোয় নি, কারণ অরুণা প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলেছিল। হেসে বললে, "জলপাইগুড়ি। ডক্টর রায় বদলি হয়ে গেছেন, শোনেন নি?" খবরটা আমি শুনিনি। খবরটা শুনে আমার মুখের ভাব কেমন হয়েছিল তা ওর মুখের দর্পণে দেখলাম। ও হাসি মুখে চেয়েছিল আমার দিকে, দেখতে দেখতে ওর মুখটাও বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ সরে গেল আমার কাছ থেকে। তার দু দিন পরেই চলে গেল ওরা—"

নিমাই সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মাথার চুলগুলো দু' হাতে মুঠো করে ধরে কয়েক সেকেণ্ড বসে রইল মাথা নীচু করে। তারপর উঠে দাঁড়াল। সোজা চলে গেল ছাতের রেলিঙের কাছে। চেয়ে রইল নক্ষত্রটার দিকে। নক্ষত্রটা তখন বকুল গাছের আড়ালে চলে গেছে।

"চিঠিপত্র চলেছিল নিশ্চয়।"

আমি একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেললাম অবশেষে। আমার কৌতূহল হয়েছিল বলে নয়, ওকে আকাশ থেকে মাটিতে টেনে আনবার জন্যে। ফল হল। নিমাই রেলিঙের ধার থেকে সরে এসে চেয়ারে বসল।

"চলেছিল। একটা দুটো নয়, অনেক। কিন্তু মাত্র তিন মাস। ওর চিঠি থেকেই জেনেছিলাম যে, ও ডক্টর রায়ের আপনার লোক নয়। ওর মা ওঁরাও, বাপ এক মিলিটারি সাহেব। অবৈধ

রিরংসার ফলে গত যুদ্ধের সময় জন্ম হয়েছিল ওর। যথাসময়ে সাহেব দেশে ফিরে গেলেন যথারীতি। ডক্টর রায় তখন রাঁচিতে। সাহেবের সঙ্গে ডক্টর রায়ের আলাপ ছিল, সেই সূত্রে ওঁরাও মেয়েটি এসে ডক্টর রায়ের কাছে আশ্রয় নিলে। আশ্রয় নিতে বাধ্য হল, কারণ নিজেদের সমাজে ওর স্থান হয় নি। ওর মাও বেশি দিন বাঁচে নি। অরুণা হবার মাস ছয়েক পরেই মারা যায়। সেই থেকেই অরুণাকে ডক্টর রায়ই মানুষ করছেন।"

নিমাই থেমে গেল।

"তারপর?"

"তিন মাস পরে অরুণা হঠাৎ চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলে।"

নিমাই আবার চুপ করে গেল। চুপ করে রইল অনেকক্ষণ।

"তারপর?"

"তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল।"

"হারিয়ে গেল মানে?"

"মানে তার আর কোন খোঁজ পেলাম না। আমার তখন পরীক্ষা সামনে, তবু জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। শুনলাম, জলপাইগুড়ি থেকেও ডাক্তার রায় চলে গেছেন। কেউ বললে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাটনায় গেছেন, কেউ বললে কটকে গেছেন। দু'একজন মজঃফরপুরেরও নাম করেছিল। তিন জায়গাতেই গেলাম আমি, কিন্তু আর তাদের নাগাল পেলাম না।"

"তারপর?"

নিমাই আবার চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর হঠাৎ হেসে বললে—"তারপর ফেল করলাম। একবার নয়, দু'বার। বকুনি দেবার মতো হিতৈষী কেউ ছিল না আমার। ব্যাঙ্কে ছিল বাবার সঞ্চিত অর্থ। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টেণ্ট নরেনবাবু ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। তিনি একদিন সস্নেহ ভর্ৎসনা করলেন একটু। তাঁর ভর্ৎসনাটা নয়, স্নেহটা কাবু করে ফেললে আমাকে। এখন মনে হয়, সেই সময়টা যদি পড়াশোনায় না মেতে অরুণার খোঁজ করতাম তাহলে হয়তো তাকে ধরতে পারতাম। আই কার্স দ্যাট নরেনবাবু নাউ। ধরবার অনেক পথ ছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারতাম অন্তত একটা। কিন্তু আমি কিছুই করলাম না, বসে বসে অ্যানাটমি মুখস্থ করতে লাগলাম খালি। অরণাকে কিন্তু আমি ভুলিনি। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকের মনেও যেমন সূর্যের স্মৃতি প্রছন্ন হয়ে থাকে, অরুণার স্মৃতিও তেমনিভাবে আমার মনে আঁকা ছিল। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকের মনেও যেমন বিশ্বাস থাকে যে সূর্য আবার উঠবে, আমার মনেও তেমনি বিশ্বাস ছিল যে, অরুণাকে আবার পাব। এখনও আছে!..."

আবার উঠে পড়ল নিমাই, আবার রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, আবার চেয়ে রইল লুব্ধকের দিকে। লুব্ধক তখন আরও নেমে গেছে, বকুল গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল—"এতকাল আমরা জানতাম না যে, পৃথিবীই ঘোরে; নক্ষত্র ঠিক থাকে। আমরাই দূরে সরে যাই বলে মনে হয় নক্ষত্র বুঝি অস্ত যাচ্ছে। নক্ষত্র অস্ত যায় না!"

"অরুণার কথা বল—"

"অরুণাকে খুঁজে পেলাম না। পড়তেই লাগলাম। এম. বি. পাশ করে বিলেত চলে গেলাম। যতদিন টাকায় কুলিয়েছিল বিলেতেই ছিলাম। গোটা তিনেক ডিগ্রী যখন জোগাড় হল, জার্মানি যাব কি না যখন ভাবছি তখন হঠাৎ ব্যাঙ্কে খবর দিলে টাকা ফুরিয়েছে। ফিরে আসতে হল। যখন ফিরে এলাম তখন আমি কপর্দকহীন। অরুণাকে কিন্তু ভুলিনি। যদিও আর খোঁজবারও চেষ্টা করিনি তাকে। মনে মনে একটা দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে আমার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলা, সে যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তখন আমাকে পেয়ে যেন গৌরব অনুভব করে। বিলেতে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিলাম, অরুণাই ছিল প্রেরণা।"

আবার চুপ করল নিমাই। সিগারেট ধরাল একটা। দু'চার টান খেয়ে শুরু করল আবার।

"আমি যখন ফিরলাম তখন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিল্। সুতরাং চাকরির চেষ্টা করতে হল। ছেলেবেলায় একবার স্বদেশীর দলে যোগ দিয়েছিলাম বলে সরকারের ব্ল্যাকবুকে নাম উঠেছিল। সরকারী চাকরি জুটল না। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যে, মেসের খরচ চালাতে পারি না। এমন সময় আমার এক বন্ধু এসে চাকরির খবর দিলে। একটা বিজ্ঞাপন দেখালে এসে। সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ে একটি শয্যাশায়ী রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্যে ডাক্তার দরকার একজন। মাসিক বেতন ৫০০্ টাকা, তাছাড়া খাবার খরচ এবং থাকবার বাড়ি পাওয়া যাবে। বিলিতি ডিগ্রি থাকলে ভাল হয়। দিলাম দরখাস্ত করে। পোস্টবক্সে ঠিকানা দেওয়া ছিল। দিন পাঁচ সাতের মধ্যেই পেয়ে গেলাম চাকরিটা। দেখলাম আমাকে বাহাল করছেন একজন সাহেব,—মিস্টার হডসন, বোম্বাই থেকে। একটু আশ্চর্য হলাম। কে ইনি? যাই হোক, অভাবের তাড়নায় বেশী গবেষণা করবার সময় ছিল না। সোজা চলে গেলাম। গিয়ে কি দেখলাম জানিস?"

"কি—"

"রোগী নয়, রোগিনী, আর সে রোগিনী অন্য কেউ নয়, অরুণা। টি-বি হয়েছে। অরুণার সঙ্গে দেখা হবে সে বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু তাকে ঐ ভাবে দেখব তা ভাবি নি। অরুণাও দেখবামাত্র আমাকে চিনতে পারলে। তার বড় বড় নীল চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু হাসিটি দেখলাম ম্লান হয়ে গেছে। ম্লান হেসে বললে, 'নিমাইবাবু আপনি এতদিনে এলেন। কতদিন যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছি মনে মনে। আমি জানতাম আপনি আসবেন, যাক, শেষ সময় তবু দেখাটা হল। দেখলাম, চোখের কোণে জল টলমল করছে। পরীক্ষা করে দেখলাম তাকে, এক্স-রে প্লেট দেখলাম, সব রিপোর্ট পড়লাম। আশা হল বেঁচে যেতেও পারে। বললাম, ভয় কি। তোমার সাংঘাতিক তো কিছু হয় নি। ভাল হয়ে যাবে। সে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, না, আমি আর বাঁচব না। আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা আর করবেন না।"

"কেন?"

"বেঁচে আমার সুখ নেই।"

আমি মনে মনে বললাম, বাঁচাবই তোমাকে।

তারপর তার ইতিহাস শুনলাম।

নিমাই উঠে দাঁড়াল আবার। আবার চলে গেল রেলিঙের ধারে লুব্ধক তখন অস্ত গেছে। অস্ত হয় তো যায় নি ঠিক, কিন্তু গাছপালার আড়ালে এত নেবে গেছে যে আর দেখা যাচ্ছে না। নিমাই কিন্তু বললে, "এখনও দেখা যাচ্ছে। তুই দেখতে পাচ্ছিস—?"

"না।"

"এদিকে সরে আয়। ওই যে—"

উঠতে হল।

"কই?—"

"ওই যে—"

খুব ঝুঁকে নিমাই দেখতে লাগল, আমারও ঘাড়টা ধরে যতদূর নোয়ানো সম্ভব নুইয়ে জিগ্যেস করলে, "এবার দেখতে পাচ্ছিস? ওই যে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে—"

"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"তুই অন্ধ—"

আমি ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম। একটু পরে নিমাইও এল।

এসেই শুরু করল—"ডাক্তার রায় অরুণার বিয়ে দিয়েছিলেন এক সাঁওতাল খৃষ্টানের সঙ্গে। সাম্ মিস্টার কচ্ছপ্। সে-ও ডাক্তার। অরুণার মা টি-বি-তে মারা গেছেন জেনেও লোকটা অরুণাকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের কিছুদিন পরে ওদেরও টি-বি হল। অরুণা আর তার স্বামী দুজনেরই। অরুণার বাবা, মানে সেই কর্ণেল সাহেব একেবারে বিবেকবুদ্ধি-বর্জিত লোক ছিলেন না। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহারের ফলে তিনি যখন জানলেন যে, তাঁর অবৈধ প্রণয়ের ফলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে—তখন তার নামে বেশ একটা মোটা টাকা তিনি বোম্বাইয়ের এক ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন। বোম্বাইয়ের তাঁর বন্ধু মিস্টার হডসন ব্যবসায় উপলক্ষে থাকতেন, তাঁরই জিম্মায় টাকাগুলো দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, অরুণার যখনই দরকার হবে তখনই তাকে এ টাকা যেন দেওয়া হয়। ডাক্তার রায়কেও এ কথা জানিয়ে দিলেন তিনি। ডাক্তার রায় এ টাকা স্পর্শ করেন নি। অরুণার সমস্ত খরচ তিনিই বহন করতেন। তাকে কন্যাবৎ পালন করেছিলেন তিনি। দেবতুল্য লোক ছিলেন ডাক্তার রায়। অরুণার সঙ্গে কচ্ছপের যখন বিয়ে হয়ে গেল, আর বিয়ের পর দুজনেই যখন যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তখনই দরকার হল টাকাটার। ডাক্তার রায় ডাক্তার কচ্ছপকে বললেন, অরুণার যে টাকা আছে তা দিয়ে তোমরা কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় অনায়াসেই একটা ছোটখাট বাড়ি কিনে বাস করতে পার। তিনিই সন্ধান করে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে ওই বাড়িটা তাদের কিনে দিয়েছিলেন।" নিমাই আবার চুপ করল।

মনে হল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার রায় কোথায় থাকেন?"

"সাউথ ইণ্ডিয়ায়। কিছুদিন হল তিনিও মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম আমি একবার। অরুণার এই ইতিহাস তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি। অরুণা আমাকে কিছু বলে নি।"

"তার যে বিয়ে হয়েছিল, একথাও বলেনি?"

"না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—"না, বলেনি। নোট দিস্।"

"তুই কিছু জিগ্যেস করিস নি?"

"করেছিলাম। কি করে সে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে এসে হাজির হল, নার্সের মাইনে, ডাক্তারের মাইনে, ওষুধ-পত্রের খরচ, খাওয়ার খরচ কি করে চলছে এসব জিগ্যেস করেছিলাম বইকি। সে উত্তরে বলেছিল, আমি কিছু জানি না, বাবা সব ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার রায়কে অরুণা বাবা বলে ডাকত। তার কাছেই আমি ডাক্তার রায়ের ঠিকানাও পেয়েছিলাম।

"তারপর?"

নিমাই কোন উত্তর দিলে না। দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ।

"অরুণার স্বামী ডাক্তার কচ্ছপ মাস ছয়েক আগে মারা গিয়েছিলেন। একথা আমি জানতামই না। নার্স বা চাকররাও জানত না, কারণ তারাও আমার আসার ঠিক মাসখানেক আগেই বাহাল হয়েছিল। ডাক্তার কচ্ছপের সময় যে নার্স, চাকর ছিল তারা তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই চলে যায়। কেন যায় তা পরে বুঝেছি, তখন বুঝতে পারিনি। ডাক্তার কচ্ছপ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন অরুণার জন্যে কোনও ডাক্তার দরকার হয়নি। তিনি নিজেই নিজের এবং অরুণার তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরই ডাক্তারের প্রয়োজন হল, মিস্টার হডসন তখন আমাকে পাঠালেন। আমি এসব খবর পরে শুনেছি, অরুণা আমাকে কিছুই বলেনি।"

নিমাই হঠাৎ উঠে আবার আলসেটার কাছে চলে গেল। খুব ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল। লুব্ধক তখন অস্ত গেছে। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

নিমাই ফিরে এসে বললে—"খুব উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় যদি দাঁড়াতে পারতাম তাহলে ওটাকে এখনও দেখতে পেতাম। কাল আবার পাব।"

"তারপর কি হল বল।"

"তারপর কি হল তা বলবার আগে আমি তোমাকে আমার তখনকার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে অনুরোধ করছি। কল্পনা করতে পারা শক্ত, তবু চেষ্টা কর। যে অরুণার কথা আমার মনে তীরের মতো গেঁথেছিল এতদিন ধরে, যাকে আমি একদিন না একদিন পাবোই জানতাম, সেই অরুণাকে যখন আমি এমন অবস্থায় পেলাম যে তার জীবনমরণ নির্ভর করছে আমার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর, তখন আমার একমাত্র কর্তব্য কি হওয়া উচিত তার বিস্তারিত বর্ণনা আশা করি নিষ্প্রয়োজন। দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, আমি একাই চিকিৎসা-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করতে আরম্ভ করলাম। টেলিগ্রাম করে প্রায় তিন চারশো টাকার বই-ই আনিয়ে ফেললাম। যত রকম ওষুধ, যত রকম খাবার, যত রকম ইন্‌জেকশন, সুলভ, দুর্লভ যত রকম যা কিছু সমস্ত সংগ্রহ করেছিলাম তার জন্যে। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। অরুণা বাঁচল না, তাকে বাঁচতে দিলে না।"

"কে—"

"তার স্বামী। ডাক্তার কচ্ছপ—"

"কি রকম—"

আমি ইজি চেয়ারে ঠেশ দিয়েছিলাম। উঠে বসলাম।

নিমাই বললে, "আমি প্রথম বুঝতে পারতাম না অরুণার ওজন বাড়ছে না কেন। ভাল ভাল খাবার তাকে প্রচুর খাওয়ানো হত, কিছু ওজন বাড়া উচিত ছিল, কিন্তু বাড়ছিল না, বরং কমছিল।

আমি নার্সকে জিগ্যেস করতাম—ঠিক খায় তো। আমার মন যদিও সদাসর্বদা অরুণাময় হয়ে থাকত কিন্তু আমি নিজে তার কাছে পারতপক্ষে থাকতাম না। আমি কাছে থাকলে সে বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ত, একদিন আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, আমি কিছুতে আর ছাড়াতে পারি না। যক্ষ্মারোগের ওটা একটা বড় লক্ষণ। তারা প্রায় কামুক হয়। আমি পণ করেছিলাম তাকে বাঁচাব, তাই যথাসাধ্য তার কাছ থেকে সরে থাকতাম। নার্সই তাকে ওষুধ খাওয়াতো, খাবার খাওয়াতো। আমার প্রশ্নের উত্তরে নার্স বললে, "খানতো উনি সব, কিন্তু বমি করে ফেলেন বাথরুমে গিয়ে।" "বমি করে ফেলেন? কেন?" নার্স চুপ করে রইল। তারপর নার্স বললে, "কেন, তা আমিও ঠিক বুঝতে পারি না। খাবার ঠিক পরেই জানলার দিকে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ, জানলার সামনেই যে শ্যাওড়া গাছটা আছে সেই দিকে। তারপরই কেমন যেন হয়ে যান, বাথরুমে ঢুকে পড়েন, তারপরই বমির শব্দ শুনতে পাই।" বললাম, "তুমি একথা আমাকে বলনি কেন?" সে ভয়ে ভয়ে বললে, "উনি মানা করেছিলেন।" নার্সকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করলাম। তারপর অরুণাকে জিগ্যেস করলাম, "তোমার বমি হয়ে যায় একথা আমাকে বলনি কেন?" অরুণা চুপ করে রইল। দেখলাম, তার চোখে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। আমি বললাম, "আজ তোমাকে আমার সামনে খেতে হবে। খাওয়ার পর তোমাকে একটা ওষুধও দেব যাতে বমি না হয়। তোমার যা অসুখ হয়েছে তাতে খাওয়াই হল আসল জিনিস। ভাল ভাল খাবার খেয়ে যদি হজম করতে পার তাহলে দুদিনে সেরে উঠবে। খাওয়া আর বিশ্রাম এই দুটিই হল আসল জিনিস।" অরুণা চুপ করে রইল। তখন রাত খুব বেশী হয় নি। অরুণাকে সামনে খাবার খাইয়ে, ওষুধ খাইয়ে আমি পাশের ঘরে এসে বই ওল্টাচ্ছিলাম। বার করবার চেষ্টা করছিলাম বমির জন্য আর কি কি ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। অরুণার পাশের ঘরেই থাকতাম আমি। হঠাৎ শুনলাম মোটা গলায় কে যেন বলে উঠল—"গলায় আঙ্গুল দাও। দাও—"

...পরমুহূর্তেই বমি করার শব্দ পেয়ে ছুটে গেলাম, দেখতে পেলাম, সাদা কোট-প্যাণ্ট-পরা একটা লম্বা কালো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে জানলার সামনে। আমাকে দেখেই সরে গেল। ঘরের মেঝে দেখি বমিতে ভেসে যাচ্ছে। অরুণা বুকটা দুহাতে চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে। আমি অরুণাকে বিছানায় শুইয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। জানলার কাছে কে এসেছিল, কেন এসেছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসরই পেলাম না তখন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, পাল্‌স-রেট হানড্রেড এণ্ড সিক্‌স্‌টি। গোনা যাচ্ছে না এ রকম অবস্থা। গোটা দুই ইন্‌জেকশন দেবার পর অনেক কষ্টে সামলাল। নার্সকে বসিয়ে আমি উঠে যাচ্ছিলাম, অরুণা নার্সের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি যাও।" নার্স উঠে গেল। অরুণা তখন আমাকে বললে, "আপনি যাবেন না, আপনি বসুন। আর একটু সরে আসুন না এদিকে!

আপনি কাছে বসে থাকলেই আমি ভাল হয়ে যাব। ওষুধ বিষুধ লাগবে না। আপনি দূরে দূরে সরে থাকেন কেন? আর একটু কাছে এসে বসুন না!" নিজেই সরে এল আমার কাছে। দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। কি বলব, কি করব, মাথাতেই এল না খানিকক্ষণ। হঠাৎ অনুভব করলাম, অরুণা কাঁদছে। তার চোখের জলে আমার কামিজ ভিজে যাচ্ছে। এতক্ষণ অরুণাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, সেই কালো লোকটার কথা মন থেকে একেবারে সরেই গিয়েছিল। কথাটা পরে ভেবে খুব আশ্চর্য হয়েছি। অত বড় একটা ঘটনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য। মেঘের আড়ালে সূর্য চন্দ্র যেমন লুপ্ত হয়ে যায়, অনেকটা তেমনি। হঠাৎ কিন্তু মনে পড়ল আবার। অরুণাকে জিগ্যেস করলাম—"একটু আগে কার সঙ্গে কথা কইছিলে? কেউ এসেছিল কি?"

"কই, কেউ না তো। আপনি আর একটু সরে আসুন না।" দু'হাত দিয়ে আমাকে আরও জোরে জাপটে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি উঠে পড়লাম।

"ঘুমোও। আমি পাশের ঘরেই আছি। নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে বরং এসে একটু হাওয়া করুক তোমাকে—"

"না, নার্সকে আসতে হবে না। কেউ ঘরে থাকলে ঘুম হয় না।"

"তাহলে আমাকে থাকতে বলছ কেন?"

"জেগে থাকব বলে। সমস্ত রাত জেগে থাকব।"

"না, ঘুমোও—"

চলে গেলাম। মনকে স্তোক দিলাম যা শুনেছি বা যা দেখেছি তা আমার মনের ভুল। সাহেবী পোশাক পরা কাফ্রির মতো চেহারা, এ রকম লোক তো এ অঞ্চলে চোখেই পড়েনি কখনও। কোথা থেকে আসবে ওরকম লোক। এলেও গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করতে বলবে কেন। সকালেই কিন্তু ভুল ভাঙল। অরুণার পুষ্টির জন্য যত রকম খাবারের আয়োজন আমি করেছিলাম, সকালে উঠে দেখি তার কিছু নেই। ছত্রিশটা মুরগী ছিল, প্রত্যেকটির গলা মোচড়ানো। শুধু গলা মোচড়ানো নয়, প্রত্যেকটা ছিন্ন-ভিন্ন করা। চারটে বড় বড় ছাগল ছিল দুধের জন্য, সকালে দেখা গেল চারটেই মরে পড়ে আছে। ভাঁড়ারের সমস্ত খাবার চারদিকে ছড়ানো, ডিমগুলো ভেঙে চুরমার, হর্লিকসের শিশি, ওভালটিন, মাখন, চীজ, কলা, কমলালেবু, চাল, ডাল, তরকারি, ওষুধপত্র সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে কে যেন ফেলে দিয়েছে চারদিকে। আমার ব্যাগটা পর্যন্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে। চাকর আর বাবুর্চি এসে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল। নার্সও যেতে চাচ্ছিল কিন্তু তাকে অনেক অনুরোধ করাতে সে থেকে গেল। আমি যে কি করব ভেবে পেলাম না। প্রথমেই মনে হল, অবিলম্বে খাদ্যদ্রব্যের জোগাড় করতে না পারলে সকলকেই অনাহারে থাকতে হবে। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে বাজার বেশ খানিকটা দূরে। অরুণাকে গিয়ে বললাম, "এখানে কি কোন বন্যজন্তুর উপদ্রব হয়েছে ইতিপূর্বে?"

"না। কেন বলুন তো—"

বললাম। শুনে সে চুপ করে রইল। দেখলাম, তার চোখে অদ্ভুত একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ভাবলাম অরুণার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। ভয় পেলে অসুখ বেড়ে যাবে। সুতরাং ও প্রসঙ্গ আর না তোলাই ভাল।

ঠিক করলাম নিজেই বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র সব কিনে নিয়ে আসি, আর পুলিশকেও একটা খবর দিয়ে আসি। তখনও আমি মনকে স্তোক দিচ্ছি যে কোনও বদমাইস লোক হয়তো এসে এই সব করেছে। নার্সকে বলে গেলাম, তুমি অরুণার কাছে থাকো। আমি জিনিসপত্র সব কিনে আনি গিয়ে। পুলিশেও একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা রাঁধুনীও জোগাড় করতে হবে। আমার ফেরার কথা দুপুরে। কিন্তু যখন ফিরলাম তখন রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। সেদিনও আজকের মতো পূর্ণিমা রাত্রি ছিল। আমার ফিরতে দেরি হল একটা অদ্ভুত কারণে। জিনিসপত্র সব কিনে একটা গরুর গাড়িতে সেগুলো বোঝাই করে থানায় গেলাম। দারোগাবাবু ছিলেন না, তাঁর অপেক্ষায় ঘণ্টা দুই বসতে হল। তিনি এসে সব শুনে বললেন, কোন বদমাইসেরই কাণ্ড। যাই হোক, কোন ভয় নেই, তিনি এসে এনকোয়্যারি করে সব ঠিক করে দেবেন। মাল-বোঝাই গরুর গাড়িটাতে চেপে বসলাম। খানিকক্ষণ বেশ এলাম। বেশ বড় বড় জোয়ান বলদ, মনে হল রাত আটটা নাগাদ পৌঁছে যাব। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে আমরা প্রকাণ্ড একটা মাঠে এসে পড়লাম। মাঠে এসে গরু দুটো হঠাৎ কি যেন দেখে ভড়কে গেল, তারপর ডান দিকে ফিরে ছুটতে লাগল। সে কি ছুট! গাড়োয়ান প্রাণপণে রাশ টেনে ধরেছে, কিন্তু তাদের থামাতে পারছে না। হঠাৎ রাশের দড়িটা ছিঁড়ে গেল। উদ্দাম বেগে ছুটতে শুরু করল তখন গরু দুটো। ছুটতে ছুটতে শেষ হুড়মুড় করে নেমে পড়ল একটা নদীতে, পা পর্যন্ত কাদায় পুঁতে গেল তাদের, আমার জিনিসপত্র কিছু রাস্তাতেই পড়ে গিয়েছিল, বাকীটা পড়ল নদীর জলে। আমি লাফিয়ে নেবে পড়লাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফিরলাম। ফিরে দেখি চারদিকে নিশুতি। নার্সের নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার, সাড়া পেলাম না। সন্তর্পণে অরুণার ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম অরুণা ঘুমুচ্ছে। তাকে আব জাগাবার চেষ্টা করলাম না। ভাবলাম নার্সও হয়তো নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু রাগ হল, অরুণার কাছেই তার থাকবার কথা। আচ্ছা দায়িত্বজ্ঞানহীন তো। তখনও বুঝতে পারি নি সেও মারা গেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। একবার ইচ্ছে হল অরুণার কাছেই জেগে বসে থাকি। যদি থাকতাম তাহলে যা ঘটেছিল তা ঘটত না হয়তো। কিন্তু অরুণার ভালোর জন্যে তার কাছ থেকে বরাবরই সরে ছিলাম, অত্যন্ত কষ্ট করে, নিরতিশয় আত্মনিগ্রহ করে সরে ছিলাম, সেদিনও সরে গেলাম। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ চেষ্টা করেছিলাম জেগে থাকতে। কিন্তু পারি নি। ঘুম ভাঙল আবার সেই গলার আওয়াজে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। শুনলাম, পাশের ঘরে মোটা গলায় কে যেন গুণছে—"চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ। থামছ কেন, আরও কর— তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ—" বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখলাম, সেই কালো লম্বা লোকটা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার সামনে অরুণা উঠ-বোস করছে। রেগুলার উঠ-বোস করছে।

"কে— কে— কে তুমি"—চীৎকার করে ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল লোকটা। অরুণা দেখি মেঝেতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে, মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। নাড়ি দেখে বুঝলাম, তার শেষ সময় উপস্থিত। পাঁজা-কোলা করে তুলে বিছানায় শোয়ালাম তাকে। আমার দিকে চাইলে একবার অরুণা, তারপর হাসলে একটু। বললে, "আপনাকেও এ জীবনে পেলাম না। কিন্তু আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।"

আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। তার রক্তাক্ত অধরে চুমো খেলাম একটা।

"কোথায় অপেক্ষা করে থাকবে অরুণা?"

"ওইখানে—"

আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে।

দেখলাম জানালা দিয়ে আকাশের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে লুব্ধক জ্বলছে দপ্ দপ্ করে।

"ও নক্ষত্রে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে?"—

"হ্যাঁ, ওই নক্ষত্রে অপেক্ষা করব। আপনি আসবেন ওখানেই।"

ওই তার শেষ কথা। একটু পরেই সে মারা গেল।

অনর্গল কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নিমাই।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। আমি তো চুপ করে ছিলামই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর নিমাই উঠে বসল, সিগারেট ধরাল একটা। আমাকেও একটা দিলে। তারপর বলল, "তোমাকে এ গল্প শোনালাম একটি কারণে। ফাঁদে পা দেবার আগে ফাঁদের স্বরূপটা জেনে নাও। বিবাহিতা অরুণা স্বামীকে ভালবাসে নি, আমাকে ভালবেসেছিল। এখনও ভালবাসে। অথচ তার স্বামী তার জন্যে না করেছিল কি? বাংলা ভাষা শিখেছিল, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেছিল, যক্ষ্মারোগ বরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ছিনিয়েও নিয়ে গেল, কিন্তু অরুণা তবু তাকে ভালবাসে নি। আমি জানি ভালবাসে নি। তুমি আজ যে আগ্রহ নিয়ে ফুলুকে বিয়ে করতে চাইছ, ঠিক তেমন আগ্রহ নিয়ে কচ্ছপও একদিন অরুণাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে অরুণাকে চিনত না। তুমি ফুলুকে ঠিক চিনেছ তো?"

"নিশ্চয় চিনেছি। সুখেনদা কি বললে তাই বল।"

"আমি যখন সুখেনকে অনুরোধ করেছি তখন তাকে রাজি হতেই হবে। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, যা নিয়ে দরকার তা সুখেনের এলাকায় নয়, তোমার এলাকায়। আমি নিজের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতা থেকে সে এলাকায় কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলাম শুধু।"

জোৎস্নায় আকাশ-পৃথিবী স্বপ্নাতুর। আকাশের প্রেম যেন জ্যোৎস্না হয়ে এসে পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে একা চলেছি। মোটর বাইকের আওয়াজও মোলায়েম হয়ে এসেছে এই জ্যোৎস্নায়। কেবলই মনে হচ্ছে—আহা ফুলু যদি এসময়ে কাছে থাকত। নিমাইয়ের গল্পটা মনে পড়ছে মাঝে মাঝে। অদ্ভুত গল্প, কিন্তু গল্প। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতোই এ গল্পও যুগপৎ সত্য এবং মিথ্যা। আরব্য উপন্যাসের গল্প যেমন আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নি, নিমাইয়ের গল্পও করবে না। নিমাইয়ের অভিজ্ঞতা নিমাইয়ের কাছেই সত্য, সে নক্ষত্র-লোকে তার প্রিয়ার সন্ধান করুক। আমি চাইব আমার ফুলুকে। সমস্ত বাধা সত্ত্বেও চিরকাল চাইব।

চৌদ্দ
অবনীশের কথা

কফি খাওয়ার পর সত্যিই আমরা দুজনেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। যে সব জটিলতা, যে

সব আবছা-স্বপ্ন, আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা যেন সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো কেটে গেল। শুধু তাই নয়, মনটা শিশুর মতো যেন স্বচ্ছ সজীব পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ সেই মন হয়ে গেল, যে মন সাগ্রহে রূপকথা শোনে, যে মন অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে না। বাইরের যে সব ঝামেলা সুখেনের মনকে বারবার বিক্ষিপ্ত করে গল্পের রস ভঙ্গ করছিল, সেসব ঝামেলাও অন্তর্ধান করেছিল জ্যোৎস্না-রাত্রির গভীরতার মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে পরে 'চিপ্ চিপ্ চিপ্' করে সেই পোকাটা ডাকছিল বটে, কিন্তু তা সুখেনের মনকে বিক্ষিপ্ত করছিল না। পোকার ডাকে বিচলিত হওয়ার মতো মনই নয় সুখেনদার। সে তাকিয়াটায় ঠেশ দিয়ে বেশ জুৎ করে বসেছিল, আর বেশ জুৎ করেই শুরু করেছিল গল্পটা।

"আমি যখন শূয়োরের দাঁতটা নিয়ে এলাম, আমাদের পূর্ণ-পুরুত তখন বাইরে অলক্ষ্মীর পুজো নিয়ে ব্যস্ত!"

"অলক্ষ্মীর?"

"হ্যাঁ, লক্ষ্মীপুজোর আগে অলক্ষ্মী-বিদায় করতে হয়। আমাদের দেশ ভদ্র দেশ তো, বিদায় করবার সময়ও পুজো করে তবে বিদায় করে। অনেকে বলে ভয়ে পুজো করে, কিন্তু আমার তো মনে হয় না, আমার মনে হয়, ওটা আমাদের ভদ্রতা। আমরা কাউকেই কষ্ট দিতে পারি না, এমনি কি অলক্ষ্মীকেও নয়।..."

"লক্ষ্মীর মূর্তি দেখেছি। কিন্তু অলক্ষ্মীর মূর্তি তো দেখিনি কখনও। সে আবার কেমন—"

"ভয়ঙ্কর। কালো রং, কালো কাপড় পরা, সর্বাঙ্গ তেল চুকচুকে, এলো চুল, বড় বড় দাঁত, এক হাতে ছাই, আর এক হাতে ঝাঁটা। বাহন গাধা, গায়ে লোহার গয়না, ভয়ানক কুরূপা, ভয়ানক ঝগড়াটে, বাস কুৎসিত স্থানে।"

"এর পুজো হয়?"

"হয়। অলক্ষ্মী-বিদায় না করলে লক্ষ্মী আসেন না। নিমাই অলক্ষ্মী বিদায় করতে পারে নি, তাই ওর জীবনে লক্ষ্মী আর এল না। এ জন্মে আসবেও না বোধ হয়।...."

নিমাই ডাক্তারের কথা জানতাম না আমি।

"কেন, কি হয়েছে নিমাইয়ের।"

"সে নিমাইয়ের মুখ থেকেই শুন একদিন আমি বলতে পারব না—"

থেমে গেল সুখেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সোজা হয়ে চাপটালি খেয়ে বসে, ডান হাঁটুটা নাচাতে লাগল অকারণে। বুঝলাম অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছে। যখন কথা কইল তখনও অন্যমনস্ক। নিমাইয়ের কথা আমার কাছে গোপন করতে চাইল কিন্তু অস্ফুটকণ্ঠে যা বললে তা নিমাইয়েরই কথা।

"নিমাই ছেলে খুব ভাল। কিন্তু কি যে ওর কপাল, অলক্ষ্মী ভর করে আছে ওর ওপর। দূরে সরে গেছে, ছেড়েও যাবে, কিন্তু কষ্ট দিচ্ছে।"

আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে সুখেন যা ব্যক্ত করলে, বুঝলাম সেটা অলক্ষ্মী-বিদায় সম্বন্ধে সুখেনের থিওরি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, প্রায় সব জিনিস সম্বন্ধেই আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক একটা 'থিওরি' খাড়া করে রেখেছি মনে মনে। ঘটি কেন গোল থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী কেন গোল পর্যন্ত, কোন বিষয় বাদ নেই।

সুখেন বলল—"আসল কথা কি জানিস আমাদের চরিত্রে যা কিছু মন্দ জিনিস আছে, ইংরেজিতে যাকে বেস্ এলিমেন্টস্ সেগুলো দূর না হলে লক্ষ্মী আসতে পারেন না—যিনি গৌরবর্ণা, সুরূপা, সর্বালঙ্কার-সমন্বিতা—যিনি পদ্মহস্তা পদ্মাসনা, তিনি নোংরামির মধ্যে এসে কি স্বস্তি পান কখনও? ভুল করে এসেও পড়েন যদি, বেশীক্ষণ টিকতে পারেন না। দেখিস না, এক একটা লোক হঠাৎ বড়লোক হল, কিছুদিন খুব ধুমধাম, তারপর সব ধুস্। আমার যে তিমিরে সেই তিমিরে। শয়তানের সঙ্গে ভগবানের যেমন লড়াই চলছে, ইংরেজিতে নিশ্চয় পড়েছিস তুই, তেমনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অলক্ষ্মীরও লড়াই চলছে। রীতিমত লড়াই। প্রত্যেক মানুষের জীবনই সেই যুদ্ধক্ষেত্র। অলক্ষ্মীও কম নন, তাঁর শক্তিও তুচ্ছ করবার মতো নয়। কত রকম ছদ্মবেশে এসে তিনি যে মানুষকে ভোলান তার আর ইয়ত্তা নেই। কাম প্রেমের রূপ ধরে আসে, অহঙ্কার আসে আত্মজ্ঞানের ছদ্মবেশে, ক্রোধ আসে বীরত্বের মুখোশ পরে, অলক্ষ্মীর জালই তো সারা সংসারে পাতা। কিন্তু সেই জালেরই ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম পথ আছে, সেই পথে আসেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে চঞ্চলা কেন বলেছে জানিস? অলক্ষ্মীই লক্ষ্মীকে চঞ্চলা করে তোলে! সুস্থির হয়ে থাকতে দেয় কি কোথাও। আমি যখন শূয়োরের দাঁত নিয়ে ফিরলাম তখন পূর্ণপুরুত পুজো প্রায় শেষ করে এনেছে—ভুল উচ্চারণ করে অলক্ষ্মীকে অনুরোধ করছে—

ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী
সুখ রাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহু পূজ্যঞ্চ শাশ্বতীম্।।

রীতিমত অনুরোধ—এমন সুখের রাত্রে তুমি এখানে থেকো না, তোমার প্রাপ্য পূজা তোমাকে দিচ্ছি, তুমি স্বস্থানে চলে যাও দয়া করে...."

সুখেন চুপ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করল আবার।

"সেদিন মামীমা সাজিয়েও ছিলেন অদ্ভুত। আলপনাগুলো মনে হচ্ছিল জীবন্ত। পদ্মের কুঁড়িগুলি যেন এখনি ফুটবে, লক্ষ্মীর পদচিহ্নের ধারে ধারে আলতার আভা যেন দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্মীর চৌকির উপর মুকুট আর পা দুটি কি অদ্ভুতই যে দেখাচ্ছিল। সব অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সেদিন। লক্ষ্মীর কড়িবসানো ঝাঁপি, ধানছড়া, কলমিলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর সরার উপর লাল নীল সবুজ হলুদ কালো দাগগুলি, স্তূপীকৃত খই, স্তূপীকৃত ধান চিঁড়ে, লক্ষ্মীর কাপড়ের রং সবুজ, গায়ের রং সোনার মতো—সবই অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন। মনে হচ্ছিল, ওরা সবাই যেন অপেক্ষা করছে কারও, এমন কি ঘটের উপর যে রুক্ষ নারকোলটা ছিল সেটাও যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল।"

সুখেন চুপ করল আবার। মনে হল নিজের মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে। মাথা হেঁট করে চোখ বুজে বসে আছে দেখলাম। যতটা কম শব্দ করে সম্ভব ততটা কম শব্দ করে আমি একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালাম একটি। সেই সামান্য 'খুস' শব্দেই কিন্তু সুখেনের ধ্যান ভঙ্গ হল। সে আমার দিকে চেয়ে মুখটা ঈষৎ উঁচু করে গলাটা ধীরে ধীরে চুলকুলে খানিকক্ষণ। তারপর ঈষৎ হেসে বললে—"আমি শুধু অদ্ভুত যোগাযোগের কথাটাই ভাবছি। বাগানের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় চকচকে এক জোড়া চোখ দেখে আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম খুব, পুজো শেষ হয়ে গেলেই আমি বাগানে যেতামও একবার নিশ্চয়ই। কিন্তু সরে পড়বার মতলব, মানে পুজোটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গা-ঢাকা দেওয়ার ইচ্ছে আমার হতো

না যদি না মামার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মামা কটমট করে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে একবার। তারপর বললেন, শক্তিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার? আমি বললাম, না, হয়নি। মামা বললেন, তিনি পুজোর প্রসাদ নিতে এখুনি আসবেন, তাঁর কাছ থেকে জেনে নিও পরীক্ষায় কোন্ কোন্ বিষয়ে ফেল করেছ। বুঝলে? চুপ করে রইলাম। মামা সংবাদটি দিয়ে ভিতরে চলে যাওয়া মাত্র ঠিক করে ফেললাম পুজোটি শেষ হওয়া মাত্র প্রসাদটি নিয়েই চম্পট দিতে হবে। সেই রাত্রে শক্তিধর সান্যালের সম্মুখীন হবার সাহস আমার ছিল না। শক্তিধর প্রকৃতই শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, এক ঘুষিতে কার যেন পাঁজরার হাড় ভেঙে দিয়েছিলেন শুনেছিলাম। শাঁখ বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই মামীমার হাত থেকে প্রসাদের খুরিটি নিয়ে লম্বা দিলাম। তখন ন্যাপলা ছিল আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। তার কাছেই গেলাম। খুলে বললাম তাকে সব কথা। সে বললে—'ভালই হয়েছে তুই এসেছিস। আমাদের লোক হচ্ছিল না। ফণী আর বিশু আসবে একটু পরে। আমাদের চিলে-কোঠার ঘরটাতে টোয়েনটি নাইন খেলব চল। তাস যোগাড় করেছি। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, রাত জাগতে হয়—।' টোয়েনটি নাই খেলাটা তখন খুব চলেছিল দিনকতক।"

আবার চুপ করলে সুখেন্দু। চুপ করে চেয়ে রইল মাঠের দিকে। আমিও চাইলাম। মনে হল সন্ধ্যার দিকে জ্যোৎস্না ফিকে ছিল, এখন যেন ঘন হয়েছে। কিশোরী যুবতী হয়েছে যেন। অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগলাম মৃদুলা জেগে আছে। পিছনের ঘরে কি একটা করছে যেন গোপনে গোপনে। হাওয়া বইছে না, কিন্তু তবু যেন সেই চেনা-অথচ-অচেনা সৌরভটা ভেসে এসেছে, ঘিরে ধরেছে আমাকে।

হঠাৎ সুখেন বলে উঠল—"কে যেন আসছে মনে হচ্ছে—"

আমিও দেখলাম কে যেন আসছে।

"নিরু কি?"

"না, নিরু বলে মনে হচ্ছে না। এর গায়ে ওড়না দেখছি—"

নারীমূর্তিটি আরও কাছাকাছি হতে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম যে এ অন্য লোক, নিরু বা ফুলু নয়।

সুখেন বলে উঠল, "ও বুঝেছি, এ সেই পাগলী বেগম—"

বেগম কাছাকাছি এসে বেশ সপ্রতিভভাবে বললে—"আদাব। আপনারা এখানে এসেছেন বুঝি আজ।"

"হ্যাঁ। আপনি কোথা যাচ্ছেন—"

"আমি বাদশাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

বলে মুচকি হেসে বাংলোর ডানদিক দিয়ে চলে গেল। তার ওড়নার মিহি কাপড় দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত মিহি কাপড় আমি আর দেখিনি। তার পায়ের নাগরা জুতো জোড়াও বিস্ময়কর! জুতোর গায়ে যে চুমকি বসানো ছিল, মনে হচ্ছিল তা যেন চুমকি নয় নক্ষত্রের সারি।

"বেগম সাহেবটি কে, চেন নাকি?"

"ঠিক চিনি না। তবে এমনি পূর্ণিমা রাত্রে ওকে আরও দু একবার দেখেছি এখানে। কেউ বলে পাগলী, কেউ বলে ভূত।"

"থাকে কোথায়, পাগলী হলে তো দিনেও দেখা যাবে।"

"দিনে কি সব জিনিস দেখা যায়? দিনে জোনাকী দেখেছিস, প্যাঁচা দেখেছিস?"

"কিন্তু ও তো প্যাঁচাও নয়, জোনাকীও নয়, ও মানুষ।"

"সব মানুষও দিনের বেলায় বেরোয় না। আমি একটি সাধুকে জানতাম, সে সমস্ত দিন একটা গুহায় লুকিয়ে থাকত। বার হত গভীর রাত্রে। দুনিয়াতে কত রকম আছে—"

দুজনেই চুপ করে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড।

সুখেন তারপর বললে, "হতে পারে ভূত। এ স্থানটা কবরস্থান ছিল। কিছুতেই আর অবিশ্বাস হয় না রে ভাই। নিজের চোখে ছেলেবেলায় সেই কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে যা দেখেছি তাতে চট করে কোন-কিছুকে হেসে উড়িয়ে দেবার সাহস নেই আর।"

"তোমার গল্পটা শেষ কর। তারপর কি হল—"

"নেপালের বাড়িতে সমস্ত রাত কাটানো গেল না। ঘণ্টাখানেক তাস খেলেছিলাম বোধ হয় আমরা। তারপরই নেপালের মা তাড়া লাগাতে লাগলেন। তাঁর তাড়ায় নেপালের বাবার ঘুম ভেঙে গেল। সিঁড়িতে খড়মের আওয়াজ পেয়ে দুদ্দাড় করে উঠে পড়লাম আমরা। ফণে আর বিশে বাড়ি চলে গেল। আমি পড়লাম সমস্যায়। শক্তিধর সান্যালের গোবদা মুখটা মনে পড়ল। মনে হল, তিনি নিশ্চয় এতক্ষণ আমাদের বাড়িতে বসে নেই, কিন্তু মামা তো আছেন। গিয়ে হয়তো দেখব সামনের বারান্দাতেই চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছেন। বাড়ি ফেরা নিরাপদ মনে হল না। কি করা যায়। হঠাৎ মনে হল, বাগানের ভিতরটা একবার ঘুরে আসা যাক। বনবেড়ালটা এখনও আছে কি? গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কি করি, ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। আম বাগানের পাশেই খানিকটা জমিতে মামা গোলাপ বাগান করেছিলেন। সেখানেও উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখলাম, বনবেড়াল টেরাল কিছু দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু একটা জিনিস যা দেখলাম তা অপূর্ব। খুব বড় ধবধবে সাদা গোলাপ ফুটেছিল একটি। স্নো কুইন। মনে হচ্ছিল, জ্যোৎস্নাই ফুল হয়ে ফুটেছে বুঝি। আমি কাছে যেতেই ফুলটা আস্তে আস্তে দুলতে লাগল। মনে হল নীরব ভাষায় যেন বলতে লাগল, আমায় তুলে নাও তুমি। ফেলে যেও না, তুলে নাও। মামার ভয়ে গোলাপ গাছে হাত দিতাম না কেউ আমরা। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ফুলটা ধীরে ধীরে দোল খেতে লাগল। তুলেই নিলাম শেষে। ভাবলাম, বলব যে লক্ষ্মীপুজোয় দেবার জন্যে তুলেছি। আর একটা কথা মনে পড়াতেও নির্ভয় হলাম খানিকটা। মনে হল কাল অন্তত আমার কোনও ভয় নেই। আমার জন্ম হয়েছিল পূর্ণিমার ভোরে, তাই প্রতিমাসে পূর্ণিমার পরদিন মা আমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা দিয়ে পায়েস করে খাওয়াতেন। মা মারা যাবার পর যখন মামীর কাছে এলাম, তখন তিনিও সেটা বজায় রেখেছিলেন কিছুদিন। তাই আমার ভরসা হল যে, কাল পায়েস না খাই মার অন্তত খাব না। স্নো কুইনকে তুলে নিলাম। ফুলটি হাতে করে বাগান থেকে যখন বেরোলাম তখনও দেখতে পাইনি কিছু। অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ির দিকেই আসছিলাম। ভাবছিলাম, এতক্ষণ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, আমিও গিয়ে মা লক্ষ্মীর ঘটের উপর ফুলটি রেখে চুপি চুপি গিয়ে শুয়ে পড়ব। কিন্তু কিছুদূর এসেই দেখতে পেলাম—ধবধবে বড় শাদা প্যাঁচা একটা গুট গুট করে আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর পিছু

পিছু চলেছে ছোট্ট মেয়ে একটি। বছরখানেক কি বড় জোর বছর দেড়েকের মেয়ে একটি। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অত বড় প্যাঁচা আমি দেখিনি কখনও, প্রথমে মনে হয়েছিল রাজহাঁস। কিন্তু সে যখন ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মেয়েটির দিকে, মাঝে মাঝে সে ফিরে ফিরে দেখছিল মেয়েটি আসছে কি না তার সঙ্গে, তখন দেখলাম এ তো রাজহাঁস নয়। গোল মুখ, টিকোলো নাকের মতো ঠোঁট, জ্বল্ জ্বল্ করছে চোখ। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু দূরে। মনে হল প্যাঁচাটা দু' একবার আমার দিকেও চাইলে! ভাবটা যেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন, তুমিও এস না। আমিও পিছু নিলাম। তখন দেখলাম, মেয়েটি ছোট হলে কি হবে, দিব্যি গুছিয়ে শাড়ি পরেছেন একটি। প্রতি অঙ্গে গয়না, চাঁদের আলো পরে চকমক করছে সেগুলো। মনে হল মাথায় ছোট মুকুটও যেন রয়েছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়—গায়ে হাত দিয়ে দেখ আমার—"

সুখেন আমার হাতটা টেনে তার গায়ের উপর রাখলে। দেখলাম, সত্যিই সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

অদ্ভুত সে দৃশ্য। কল্পনা করতে চেষ্টা কর। চারদিকে জ্যোৎস্না উথলে পড়েছে। একটা ধবধবে সাদা প্রকাণ্ড বড় প্যাঁচা গুট গুট করে চলেছে, তার পিছু পিছু চলেছে ছোট্ট মেয়েটি, আর তাদের পিছু পিছু চলেছি আমি। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, প্যাঁচাটা আমাদের বাড়ির দিকে ঘুরল। গেটটাও দেখলাম হাঁ করে খোলা রয়েছে। আমার জন্যই খুলে রেখেছিলেন বোধ হয় মামীমা। সেই গেট দিয়ে প্যাঁচা ঢুকল, আর তার পিছু পিছু সেই মেয়েটি। সামনেই পুজোর ঘর। পুজোর ঘরের কপাটও খোলা। মামীমা পাশের ঘরে ছিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্যাঁচা সোজা গিয়ে পুজোর ঘরে ঢুকল। সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে গেল যেন। আলপনার পদ্ম, কলমিলতা, দোপাটিলতা সবাই হেসে উঠল, তাদের প্রতীক্ষা সার্থক হল যেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, প্যাঁচাটা একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে আর সেই মেয়েটি লক্ষ্মীর পদ-চিহ্নগুলির উপর পা রেখে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ঘটের দিকে। প্রদীপের আলো পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। দেখলাম শাড়ির রং সবুজ, সত্যিই মুকুট রয়েছে মাথায়, গয়না ঝলমল করছে সর্বাঙ্গে। মেয়েটি এগিয়ে লক্ষ্মীর পটের মধ্যে অন্তর্ধান করলে মনে হল। তারপর দেখলাম প্যাঁচাটিও গুটি গুটি সেই দিকে যাচ্ছে। আমি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। গোলাপ ফুলটা ঘটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে মামীমাকে ওঠালাম, যা যা দেখেছি সব বললাম খুলে। মামীমা ধড়মড়িয়ে ছুটে এলেন পুজোর ঘরে—এসে দেখেন, কোথাও কিছু নেই। কেবল লক্ষ্মীর পটের পিছনে ছেঁড়া কাপড় পরা ফুটফুটে মেয়ে বসে আছে একটি। চুপচাপ বসেও নেই, নৈবেদ্যের উপরে যে মণ্ডটি থাকে সেইটি তুলে নিয়ে খাচ্ছে। আমাদের দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মামীমাকে আমি যা বলেছিলাম তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। প্যাঁচা ট্যাচা কিছু নেই, মেয়েটিও অন্য রকম! মামীমা আমার দিকে কোপদৃষ্টি হেনে বললেন, "ফাজিল কোথাকার। কোথা থেকে নিয়ে এলি একে! কার মেয়ে—"

"আমি আনি নি। নিজেই এল—"

সত্যি কথাই বললাম আমি।

"ঠাকুর দেবতা নিয়ে মিছে কথা বলতে লজ্জা করে না? তোর কি ভয়-ডর নেই—"

মামীমা ধমকে উঠলেন।

যতই বলি, "সত্যি বলছি আমি আনি নি—ও নিজে এসেছে"—কিন্তু আমার কথা শোনে কে।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মামীমা কিন্তু সকালেই রটিয়ে দিলেন, সুখেন রাস্তা থেকে কার মেয়ে কুড়িয়ে এনেছে একটা। কি জাত তার ঠিক নেই—কুড়ুনী বলে ডাকতে লাগলেন তাকে। তার কিছুদিন পরেই কিন্তু চোখ খুলল তাঁর। সেই স্নো কুইন গোলাপ গাছটা আস্তে আস্তে মরে গেল। বুড়ো হয়েছিল। মামা সেখানে আর একটা লাগাবেন বলে খুঁড়েছিলেন জায়গাটা। মামা বাগানের কাজ নিজে হাতেই করতেন। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং করে একটা শব্দ হল! তারপর সেখান থেকে কি বেরুল জানিস? এক ঘড়া মোহর। দেনার দায়ে মামার চুল পর্যন্ত বিকিয়েছিল, সব শোধ করে ফেললেন।"

চুপ করল সুখেন।

"তারপর। মেয়েটির কি হল?"

"হয়নি কিছু, আছে সে এখনও।"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর নীচু করে সুখেন বললে, "মৃদুলাই সেই মেয়ে। দ্বিজু, বিজু, রাজু কেউ জানে না একথা। ওরা তখন খুব ছোট ছিল তো, ওরা জানে মৃদুলা আমারই দূর সম্পর্কের বোন..."

আমি আন্দাজ করেছিলাম। চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুখেন বলল—"কিন্তু এখন মুশকিল হয়েছে কি জানিস্, ওর জন্যে সৎপাত্র খুঁজে পাচ্ছি না। ও-মেয়েকে যার তার হাতে দিতে পারি না। তুই আমাদের পালটি ঘর, তুই যদি—"

সেই চেনা-অথচ-অচেনা গন্ধটা নিবিড় হয়ে এল যেন আমার চারদিকে।

বললাম, "আপত্তি নেই। কিন্তু নিরুর বিয়ে না হলে আমি কি করে বিয়ে করি। বিজেনের সঙ্গে ওর মাখামাখি হয়েছে, দেখছি, তুমি যদি—"

"আরে হাঁ, হাঁ, সে তো মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি। আমাদের ঘরের লক্ষ্মী তোমাকে দেব, আমাদের লক্ষ্মীর আসন শূন্য থাকবে নাকি। ফুলু, নিরু দু'জনকে এনে বসাব তাতে। দুটি মেয়েই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মেয়ে দেখলেই আমি চিনতে পারি। বিজেনের সম্বন্ধ এসেছিল একটা খুব বড়লোকের বাড়ি থেকে। তারা জমিদারী লিখে দিতে চাইছে বিজেনকে। কিন্তু মেয়েটি মূর্তিমতী একটি অলক্ষ্মী। ঠোঁটে রং, হ-ব-ল করা শাড়ি, বব-করা চুল, মোটরে চড়ে দিনরাত টো টো করে বেড়াচ্ছে সিনেমায় পার্টিতে। ও মেয়ের সঙ্গে বিজেনের বিয়ে দিই কখনও আমি? তোকে বলব ভাবছিলাম।"

অতিশয় উত্তেজনা ভরে সুখেন উঠে দাঁড়াল।

'উঠছ যে—যাচ্ছ কোথা?'

"রামধনের বউটা কেমন আছে, খবর নিয়ে আসি একটু। তুই ঘুমো। এখানেই শুবি, না বিছানা করে দিতে বলব—"

"এখানেই বেশ আছি—"

সুখেন চলে গেল। চুপ করে বসে রইলাম সামনের দিকে চেয়ে। অমৃতসাগর থৈ থৈ

করছে চারিদিকে। চিপ্ চিপ্ চিপ্— সেই পোকাটা অনেকক্ষণ পরে ইঙ্গিতে কি যেন বললে আবার। মৃদুলা পিছনের ঘরটায় কি করছে? ছবিটা আবার চোখের উপর ফুটে উঠল—সেই লক্ষ্মীর ছবিটা, যেটা আমার মায়ের ঘরে ছিল, মা যাতে রোজ সিঁদুরের টিপ দিতেন।

পনের
ফুলুর কথা

নিরুদি তো বেশ মজা করলে। এখুনি আসছি বলে আমাকে এখানে একলাটি বসিয়ে কোথা চলে গেল। মৃদুলা যদিও আমাকে এখানে পাঠালে ওকে হাওয়া করবার জন্যে, কিন্তু এসে দেখি মৃদুলা সেই যে ওকে ঘুম পাড়িয়ে গেছে, আর ওঠে নি, সেই থেকে অগাধে ঘুমুচ্ছে। তবু বসে হাওয়া করলাম খানিকক্ষণ। সুখেনদা মাঝে এসেছিলেন একবার, এসে উঁকি দিয়েই চলে গেলেন। আমি একা বসে বসে কি করি এখন। কতক্ষণ হাওয়া করব। এই মাটি করেছে। ছেলেটা খুঁতখুঁত করছে। না ওঠে আবার। উঠে চীৎকার করলেই তো ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে মায়ের। ওই উঠে বসল। পালাই বাইরে নিয়ে। তা নাহলে ঠিক ঘুমটি ভাঙ্গিয়ে দেবে। নিরুদি আচ্ছা বিপদে ফেলে গেল তো আমাকে।.... বাঃ, বাইরে কি জ্যোৎস্না উঠেছে। পূর্ণিমা নাকি আজ? শহরে তো পূর্ণিমা অমাবস্যা বোঝবার উপায় নেই।

"ঘুমোও খোকন, ঘুমোও তো বাবা—"

কাঁধে করে নিয়ে পাইচারি করছি। তাছাড়া উপায় কি।

"ঘুমোও, আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোও তো বাবা। আমি গান করি, ঘুমোও তুমি—"

কে বকেছে খোকাবাবুকে কে বলেছে যা তা
খোকন সোনা চাঁদের কণা পদ্মকলির পাতা
হিমাসাগরের ঠাণ্ডা বাতাস হাত বুলুবে গায়ে
ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আসবে স্বপন নায়ে—

না বাবা, এ ছেলে ঘুমুবে না। খিদে পেয়েছে নাকি!

হ্যাঁ।

কি খাও তুমি রাত্তিরে?

ডুডু।

এত রাত্তিরে 'ডুডু' পাই কোথা। ও বাবা, ছেলের ঠোঁট ফুলছে দেখছি। আচ্ছা। ডুডু দেব তোমাকে। বললাম তো, কিন্তু কোথা পাই দুধ। ঘরে আছে নিশ্চয়ই কোথাও, কিন্তু অন্ধকারে সে কি আমি খুঁজে পাব। জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করতে গেলেই রামধনের বউয়ের ঘুমটি ভেঙে যাবে ঠিক। কি কবা যায়, মহা মুশকিল তো। নিরুদি কোথা গেল। ও, নিরুদি বোধহয় শ্বেতপত্রের সন্ধানে ঘুরছে। ঠিক। মৃদুলা আমাকে বলেছিল ভোরের আগেই মালা গাঁথতে হবে। আমি কিন্তু একে নিয়ে কি করি এখন। দুধ পাই কোথা? কে আসছে দূরে? পালাই বাবা ঘরের ভেতর। একা ভয় করে আমার এই মাঠের মাঝখানে। এই দিকে আসছে। সরে দাঁড়াই একটু। ও, রাজু আমাদের। রাজু সিগারেট খেতে শিখেছে দেখছি।

"রাজু না কি—"

"ফুলুদি? তোমার কাছেই আসছি আমি। বিজেনদা তোমাকে বলতে বললেন, নিরুদি পদ্মফুল এনেছেন, তুমি মালা গাঁথবে চল।"

"তা যাচ্ছি। কিন্তু একে ঘুম না পাড়িয়ে যাই কি করে! একটু দুধ জোগাড় করতে পার? জোগাড় করা মুশকিল। কিন্তু একে দুধ না খাওয়ালে ঘুমুবে না। ক্ষিদেয় উঠে পড়েছে।"

"কিচ্ছু মুশকিল নয়। তুমি আমাকে একটা ঘটি-টটি দাও, আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।"

"বাংলোয় এক ফোঁটা দুধ নেই। মৃদুলা সব পায়েস করে ফেলেছে—"

"আমি অন্য জায়গা থেকে আনব।"

"কোথা থেকে ?"

"ভজুয়ার অনেকগুলো ছাগল আছে দেখলাম। দুয়ে নিয়ে আসছি।"

ঘটি নিয়ে চলে গেল রাজু। কি উৎসাহ। চমৎকার ছেলে। এ বাড়ির সবাই চমৎকর। রাজু যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ বাইরেই ঘোরা-ফেরা করি। ঘরে যাওয়া নিরাপদ নয়। রামধনের বউ উঠে পড়লেই সর্বনাশ। মালা গাঁথা মাথায় উঠবে তা হলে। রামধন থাকলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর মৃদুলা কোথায় যে তাকে পাঠালে, এখনও ফেরবার নামটি নেই তার। না, দুষ্টুমি করো না। ছি, বুকের কাপড় ধরে টানতে নেই লক্ষ্মী ছেলে, আমার কাঁধে মাথা রেখে চুপটি করে শুয়ে থাক। আমি গান করি, কেমন? রাজু এক্ষুণি দুধ নিয়ে আসবে।

পা টিপব, গা টিপব, চুল কুরিয়ে দেব
পিঠে পেটে হাত বুলিয়ে সুড়সুড়িয়ে দেব
চুলকে দেব কানের গোড়া, বুজবে চোখের পাতা
খোকন সোনা চাঁদের কণা পদ্মকলির পাতা
ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আসছে চাঁদের আলোয়
ঘুমের লিখন লিখবে এসে কাজলটুকুর কালোয়—

ওই রাজু আসছে। সাইকেল পেলে কোথা থেকে। ভজুয়ারই বোধ হয়। ও-মা, এক ঘটি দুধ এনেছে প্রায়। কিন্তু একটা কথা তখন খেয়াল হয় নি, এখন মনে পড়ছে। বললাম, "রাজু, দুধ তো আনলে, কিন্তু গরম করতে হবে যে। কাঁচা দুধ খাওয়ানো যাবে না তো।"

"এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। রামধনের বাড়ির পিছনে খুঁটে থাক-করা আছে। এখুনি ধরিয়ে দিচ্ছি।"

রাজু বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে ঘুঁটে কাঠ-কুটো কাগজ নিয়ে এল। ইঁটও নিয়ে এল দু'খানা।

"দেশলাই আছে?"

"আছে।"

পকেট থেকে দেশলাই বার করলে। চট করে আমার মুখের দিকে চাইলে একবার। তারপর কাগজ ধরিয়ে নিমেষে ধরিয়ে ফেলল ঘুঁটে। ইঁট দিয়ে উনুনই করে ফেললে একটা। কি চটপটে ছেলে। ঘটিটাই চড়িয়ে দিলে ঘুঁটের আগুনে। দেখতে দেখতে উথলে উঠল দুধ। ভাগ্যে আঁচল দিয়ে ধরে টপ্ করে নাবিয়ে ফেললাম ঘটিটা, তা না হলে আগুনে পড়ে যেতো খানিকটা দুধ। আর এক সমস্যা। এই গরম আগুন দুধ, ওকে খাওয়াই কি করে। রাজুকে সে

কথা বলতেই সে বললে—রামধন চা খায়, ওর কাপ ডিশ নিশ্চয় আছে। ঘরে ঢুকে বার করে নিয়ে এল।

"আর কোনও কাজ আছে?" জিগ্যেস করলে তারপর।

"না। ঘুমোও নি তুমি—?"

"ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। বিজেনদার কাছে কোয়ানটম্ থিয়োরিটা বুঝছি—"

"নিরুদি কোথায়—"

"এক বোঝা ফুল নিয়ে এখুনি তো মৃদুলাদির কাছে গেল। তোমাকে সেই খবরটাই তো দিতে এসেছি। আমি যাই তাহলে।"

"যাও। আমি একে ঘুম পাড়িয়ে যাচ্ছি—"

ডিশে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে করে ওকে দুধ খাওয়াতে লাগলাম। রাজু চলে গেল।

"এ কি, এখানে কি হচ্ছে—"

বাবা, চমকে উঠেছি! ফিরে দেখি সুখেনদা দাঁড়িয়ে আছেন।

"এ উঠে পড়েছিল, তাই একে দুধ খাওয়াচ্ছি।"

"রামধনের বউ কেমন আছে?"

"ঘুমুচ্ছে। ভালই আছে।"

সুখেনদা'র চোখে মুখে আনন্দ ঝলমল করছে মনে হল।

"তুমি যে অমন চমৎকার সোয়েটার বুনতে পার তা তো জানতাম না। চমৎকার হয়েছে পানি-শঙ্খ প্যাটার্ন। আমাকেও হার মানিয়ে দিয়েছ। খুব খুশী হয়েছি, হিংসে হচ্ছে—"

সুখেনদা চলে গেলেন।

দুধটি পেটে পড়তেই ছেলে ঘুমুল। তাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে হাওয়া করছি, এমন সময় মোটর-বাইকের শব্দ শোনা গেল। এই দিকেই আসছে না কি! হ্যাঁ—ওই যে। কি জোরেই আসছে, কি দরকার অত জোরে চালাবার, দেখতে দেখতে এসে পড়ল। আমাকে দেখতে পেয়ে নেমেছে। আসছে এই দিকেই। কি অস্থির লোক, হাঁটছে না তো দৌড়ুচ্ছে যেন।

"কে ফুলু?"

"হ্যাঁ।"

"আর কে আছে?"

"আর কেউ নেই।"

"কেমন আছে রামধনের বউ?"

"ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটাও ঘুমিয়েছে—"

"চল তবে এক চক্কোর দিয়ে আসি।—"

"না, না, এখন আমাকে মালা গাঁথতে যেতে হবে। মৃদুলা, নিরুদি বাংলোয় অপেক্ষা করছে আমার জন্যে—"

"দশ মিনিটে এক চক্কোর দিয়ে পৌঁছে দেব তোমাকে সেখানে। চল—"

"না, সে বড় লজ্জা করবে আমার। তোমার গাড়িতে বসে আমি ওখানে যেতে পারব না।"

"আচ্ছা, বেশ এইখানেই নাবিয়ে দেব তাহলে।"

"থাক না আজ। কি যে পাগলের মতো করো—"

"চল, চল, প্লীজ—"

যেতেই হল। কি স্পীড্ গাড়িটার, সব উলটে পালটে দিচ্ছে যেন।

ষোল

অবনীশের কথা

ঘুমুচ্ছি, না জেগে আছি বুঝতে পারছি না ঠিক। নূতন জগতে এসেছি যেন।

আধ-বোঁজা চোখের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, জ্যোৎস্নার নূতন রূপ। বিগলিত আনন্দ বিকশিত হয়ে উঠেছে। আনন্দের সাগর। সামনের মাঠে ও তিনটে চেয়ার নয় তিনটে পদ্ম যেন। তাতে বসে আছে মৃদুলা, নিরু আর ফুলু। দেখতে দেখতে তিনজন মিশে এক হয়ে গেল। অপূর্ব রূপসী একজন। এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পরনে সবুজ শাড়ি, মাথায় মুকুট, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা, গৌরবর্ণা। হাতে পদ্ম। এগিয়ে আসছে আমার দিকে, পা ফেলছে চন্দনে আঁকা পদ্মপত্রের উপর।

আসছে, আসছে, আসছে....।

হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। তন্দ্রা ভেঙে গেল।

উঠে বসলাম। ভিতরেব দিকে সুখেনের গলা পেলাম।

"অবন কোথা গেল, তাকেও ডাক—"

তারপর সুখেন নিজেই বেরিয়ে এল।

"মৃ কি কাণ্ড করেছে দেখ। আমার যে আজ জন্মদিন তা মনেই ছিল না। ও এর মধ্যে কখন পায়েস করেছে, খাবার আনিয়েছে পদ্মফুল তুলিয়ে মালা গেঁথেছে কিছুই জানতে পারিনি।"

দেখি সুখেনের গলায় শ্বেতপদ্মের মালা দুলছে।

"চল, আমাদের খেতে দিয়েছে। চোখে মুখে জল দিয়ে নে একটু।"

চোখে মুখে জল দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি কার্পেটের আসনে দ্বিজু, বিজু আর রাজু বসে আছে! প্রত্যেকের গলায় পদ্মের মালা।

"তুমিও একটা পরে ফেল।"

সুখেন একটা মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলে।

"চল, বসা যাক এবার। ওই আসনটায় তুই বস। ওটা একটু বেশী রঙিন মনে হচ্ছে—"

বসলাম। আবার শাঁখ বেজে উঠল।

"ঠিক চারটে তেতাল্লিশ। ঠিক এই সময়ে জন্ম আমার।" সুখেনের কথা শেষ হতে না হতে পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল মৃদুলা, নিরু আর ফুলু! প্রত্যেকের হাতে পরমান্নের বাটি।

প্রচ্ছন্ন মহিমা

পূর্বাভাস

কল্পনার পটভূমিকায় পর পর যে দুইটি ছবি ফুটিয়া উঠিল, সে ছবি দুইটির কথাই প্রথমে লিখি। তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলা দরকার, কারণ কল্পনার পটভূমিকায় যে সব জীবন্ত ছবি ফুটিয়া ওঠে তাহারা বেশীক্ষণ থাকে না, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। ঊষার দীপ্তি, কুয়াশার রহস্য, উল্কাপাতের উজ্জ্বল প্রকাশের মতোই তাহা সত্য কিন্তু ক্ষণস্থায়ী।

সম্মুখে দুরারোহ বিরাট পর্বত, পিছনে তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বিরাট সমুদ্র। এই উভয় বিরাটের মাঝখানে যে সঙ্কীর্ণ জমিটুকু তাহা উপলাকীর্ণ। তীব্র বাতাস বহিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই পরিবেশে বসিয়া আছে বুজু (ভাল নাম ব্রজেন্দ্র) এবং কবি। কবিরও একটা সামাজিক নাম আছে, কিন্তু সেটা অবান্তর। কবির কবি-পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনে হয় উহারা দুইজনে বন্ধু। অনেক কালের বন্ধু।

কবি বলিলেন—"তুমি চুপ করে আছ কেন। তোমার কাহিনী শোনাও। আমি উৎসুক হয়ে আছি।"

বুজু উত্তর দিল, "বারবার তুমি বলেই চলেছ—শোনাও, শোনাও, শোনাও। বেশ শোনাচ্ছি। কিন্তু তার আগে জানতে চাইছি একটা কথা, তোমার শোনবার কান আছে তো? আছে তো সেই সূর্যালোকের মতো উদার দৃষ্টি যা অপবিত্রকেও পবিত্র করে, অনুজ্জ্বলকেও উজ্জ্বল করে, অধন্যকেও ধন্য করে, যার কাছে আঁস্তাকুড় আর সমুদ্র তুল্য-মূল্য, সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারবে তো আমাকে? সে দৃষ্টি কি আছে তোমার? তুমি আমাকে অনেক দিন থেকে জানো। কিন্তু পোশাক-পরা আমাকে জানো। জানো আমার সাজানো-পরিচয়। আমার উলঙ্গ সত্তা দেখেছ কখনও? দেখ নি। আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীল জঘন্য নগণ্য ব্যক্তি, এদেশের অসংখ্য ধূলিকণার একটি কণিকা মাত্র, স্বার্থের প্রয়োজনে আমি যে কোনও পাতালে নামতে পারি, যে কোনও পোশাকে সাজতে পারি। এসব তুমি জান না। জানলে আমার কাহিনী শোনবার আগ্রহ হত না তোমার। আমাকে নিয়ে বই লিখবে? আমার এই ভাগ্যহত জীবনের মর্মন্তুদ ঘটনাগুলোর মুখরোচক ব্যঞ্জন বানিয়ে তৃপ্ত করবে সেই আধা-অসভ্য, আধা-জানোয়ার জীবগুলোকে, যারা দৈবাৎ-পাওয়া বা চুরি-করা টাকার গরম কাটাবাব জন্যে, কিংবা লোকসমাজে বাহাদুরি দেখাবার জন্যে সংস্কৃতি-ফ্যানের তলায় বসে সাহিত্যের উদ্‌গার তোলে যখন তখন? আমার বুকের রক্ত বেচে বাড়াবে তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স?"

কবি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বুজু, তুমি এরকম কবিতাঘেঁষা ভাষায় কথা বলছ কেন? অবশ্য আমি আপত্তি করব না। আর একটা কথাও জেনে রাখ, আমার বই বিক্রি হয় না। প্রকাশকরা ছাপতে চায় না। তোমার কাহিনী শুনতে চাই, কারণ তোমার মধ্যে নিজেকেই দেখতে চাই আমি। যদি সরল চাঁছা-ছোলা গদ্যে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারতে তাহলে ভালো হত। বোঝবার সুবিধা হত। তোমাকে বুঝতে চাই। তোমার মনের কথা শুনতে চাই। সেই জন্যেই আমি উৎসুক। তুমি হয়তো বলবে, কেন খবরের কাগজ পড় না? প্রতিবেশীদের দেখ না? সাহিত্যের ইতিহাসে কি খুঁজে পাওনি আমার মনকে? ওইখানেই তো আমি লুকোতে

পারি নি নিজেকে, ভিন্ন নামে ওইখানেই তো আমি ধরা পড়েছি। কিন্তু আমি বলব, না, পাই নি। তোমার মুখেই শুনব তোমার কথা।"

বুজু বলিয়া উঠিল—"তুমি পেয়েছ। কিন্তু পেয়েছ এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে তোমার। আমাদের আচরণে, আমাদের ইতিহাসে, আমাদের সাহিত্যে আমাদের সত্য পরিচয় বিব্রত করছে তোমাকে। তুমি চেষ্টা করছ তোমার কবিত্ব দিয়ে সেটাকে চাপা দিতে। কিন্তু পারবে না। যে বাংলাদেশ অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেবের নেতৃত্বে এদেশে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র স্থাপন করতে পেরেছিল—সেই বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে আমারও জন্মভূমি, কিন্তু ওই গোপালদেব কি এই পা-চাটা হুজুকে বাঙালীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন? যে বাংলাদেশ সুরেন বাঁড়ুয্যেকে জুতোর মালা পরিয়েছিল, যেখানে খিস্তি-খেউড়ে সকলের মুখে ফেনা উঠছে অবিরত, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, যতীন সেনগুপ্তকে নিয়ে সুবিধাবাদী কাগজগুলো রাজনীতির 'ব্যাডমিণ্টন' খেলেছে, যে দেশে হুজুগের উত্তেজনায় এবং হুজুগেরই উত্তেজনায় যাদের মৃত্যুর পর তাদের গলায় মালা পরিয়ে হৈহৈ করেছে—সে দেশের মনের খবর তুমি জান না? বাংলাদেশে অনেক বড় বড় লোক জন্মেছিলেন মানছি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বিবেকানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ সম্ভব হয়েছিলেন এই দেশেরই মাটিতে, কিন্তু সেই মাটিতেই কি সেই একই যুগে জন্মায়নি অগণিত ট্যাঁসমার্কা মদ-খোর, গোখাদক, উন্নাসিক, সভ্যতার-পেঁচোয়-পাওয়া নব্য ধিঙ্গিরা? আর্য বাঙালীরা কি দলে দলে বৌদ্ধ হয় নি? বৌদ্ধ বাঙালীরা মুসলমান? তারপর খৃষ্টান? তারপর নব্য হিন্দু? কত রকম ভোল বদলেছে আমাদের, কত রকম খোল বাজিয়েছি আমরা! এই সেদিনকার কথা। ইংরেজকে তাড়াবার জন্য আমরা বোমা ফেলেছিলুম, পিস্তল চালিয়েছিলুম, জার্মানির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলুম—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ফেঁসে গেল। দলে দলে ধরা পড়ে ফাঁসি গিয়ে শহীদ হল বাঙালীর ছেলেমেয়েরা। আন্দামানে গিয়ে ঘানি টানতে লাগল, পাগল হয়ে গেল অনেকে। এদের ধরিয়ে দিয়েছিল কারা? লক্ষ লক্ষ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বাঙালী গুপ্তচররা। বাঙালী শহীদদের চেয়ে বাঙালী গুপ্তচর সংখ্যায় অনেক বেশী। এদের মধ্যেই আমি আছি, কারণ আমি চাকরি চাই, যে কোনও চাকরি। হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কশাইয়ের দোকানে রোজ গরু কাটতেও আমি প্রস্তুত আছি—যদি বেশী মাইনে পাই। স্বাধীনতার পর যাঁরা হিন্দী-প্রেমী হয়েছেন, বাংলা ভাষায় হিন্দী 'লবজ্' ঢুকিয়ে যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে 'মোকাবিলা' আর 'সমঝোতা' করছেন, যাঁরা প্রস্তাব না করে প্রস্তাব 'রাখছেন', নানারকম মোর্চায় যাঁদের পরিচয় পাচ্ছি—তাঁরাও এই একই জাতের সুবিধাবাদী তৈল-নিষেক-পটু বাঙালী সন্তান। পয়সা পেলে মাকে বা বউকে ঘাগরা পরিয়ে আম-দরবারে নাচিয়ে দিতেও এদের আপত্তি নেই। যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদের খোশামোদ করবার জন্যে বাঙালী মন সর্বদাই উৎসুক। এ মনের খবর রাখ না তুমি?"

কবি বুজুর মুখের দিকে স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার চোখের কোণে জল চক্‌চক্ করিতেছে। জল কিন্তু গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল না। স্মিত হাসিটাই মুখে জাগিয়া রহিল। গলা খাঁকারি দিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ বুজু, আত্মনিন্দায় এক ধরনের সুখ আছে। অনেকটা তিক্ত মদিরার মতো। খেতে প্রথমটা খারাপ লাগে, কিন্তু খেতে খেতে নেশা জমে যায়। তুমি যে মনের দিকে ইঙ্গিত করেছ সে মনের খবর আমি জানি। এ-

ও জানি ওটা শুধু বাঙালীদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, মানবজাতিরই বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, নকল-নবীশ মানুষ সর্বকালে সর্বদেশে ছিল, এখনও আছে, চিরকাল থাকবে। সব দেশেই মহৎ আদর্শও আছে, কিন্তু সেই আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করে, জীবন-পণ করবে এরকম মানুষের সংখ্যা কোনও দেশেই বেশী নেই। অধিকাংশ মানুষই পশু, পশুত্বের সুখই অধিকাংশ মানুষ উপভোগ করতে চায়। তাদের কেন্দ্র করেই এক ধরনের আপাত-মধুর পশু-সভ্যতাও গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের সহায়তায়। পশু-ধর্ম, পশু-রাজনীতি, পশু-সাহিত্য এমন কি পশু-সংস্কৃতিও আজকাল চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে সকলের। কিন্তু তবু তার মধ্যেও এমন মানুষ আছে যার মনে বিদ্রোহ জেগেছে এ-সবের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাইছি, তোমার মনেও জেগেছে কি না। নকল-করা খাঁটি বিদ্রোহ নয়, খাঁটি বিদ্রোহ যা তোমার বৈশিষ্ট্যে সুন্দর, তোমার সুগন্ধে সুরভিত। অর্থাৎ আমি তোমার মধ্যে সেই বস্তুর সন্ধান করছি যা গোলাপ নয়, জবা নয়, রজনীগন্ধা নয়, পদ্ম নয় অথচ যার যোগ্যতা আছে ওদের সঙ্গে সমাসনে বসবার। যা পুষ্প, কিন্তু কোনও বিশেষ পুষ্পের নকল নয়। যা অনন্য, যা অনবদ্য।"

বুজু হাসিয়া উঠিল। তাহার পর গম্ভীর হইয়া গেল। "দেখ বন্ধু, তোমার চোখে জলের আভাস দেখে যা মুখে আসছিল তা আর বললাম না। কিন্তু তোমার ওই লম্বা-লম্বা বুলির মোহে মুগ্ধ হয়ে আমি যদি ভুলে যাই যে আমি কুকুরের মতো খোশামুদে, চটকের মতো মৈথুন-প্রিয়, আমি যদি বলি আমি পরশ্রীকাতর নই, মিথ্যুক নই, অলস নই, নিন্দুক নই, অসমর্থ বাক্যবাগীশ নই, আমি যদি বলি আমার সমস্ত বাহ্যিক প্রসাধন আমার অন্তরের পশুত্বকে ঢাকবার কৌশল মাত্র নয়, তাহলে কি সেটা সত্যভাষণ হবে? মিথ্যার আবরণে মণ্ডিত, ভণ্ডামির কারুকার্যে শোভিত পরিচয় কি আমার সত্য পরিচয়? সেই মিষ্টি মিষ্টি লোক-ভোলানো সত্য তুমি চাও না কি!"

কবি উত্তর দিলেন—"তোমার সত্য পরিচয় কি, তা আমাকে ঠিক করতে দাও। তুমি তোমার দোষের যে তালিকা দিলে তাতে আমি হতাশ হই নি। আমি জানি ওই দোষগুলো তোমার বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তুমি যে তার-স্বরে সেটা বলতে পেরেছ এইটেই তোমার বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি সব মানুষেরই ওসব দোষ আছে। দোষের বীজ নিয়েই আমরা জন্মেছি, আগাছা জন্মাবেই নানারকম। বিদেশী পপুলার সাহিত্য পড়ে দেখ, বিদেশী মাসিকপত্রের পাতা ওলটাও, দেখতে পাবে তোমার চেয়েও বড় বড় পাষণ্ড বিদেশের রঙ্গমঞ্চ গুলজার করে রেখেছে। শুধু আজ নয়, চিরকাল। আমাদের মধ্যেও প্রচুর পশুত্ব আছে, চিরকালই আছে, কিন্তু তার জন্য আমরা বরাবরই লজ্জিত। ওদের দেশে সে লজ্জাটুকুও নেই। ওদের দেশে পার্কে কুকুর-কুকুরীর মতো মৈথুনরত নরনারীর ভীড়। ওদের সাহিত্যে ওইসব চিত্রই রূপায়িত হয়ে বাহবা পাচ্ছে নির্লজ্জ জনতার কাছে। আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে বিদেশী আবর্জনাও এসে জমছে আমাদের মনে। ওদের পশুত্বকেও আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি যে পশুত্বটাই ওদের পরিচয় নয়। ওদের পরিচয় সেইখানে যেখানে ওরা পশুত্বকে অতিক্রম করেছে, যেখানে ওরা মনুষ্যত্বের মহৎলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সাহিত্যে-বিজ্ঞানে যেখানে ওরা ভূমা-বিলাসী, সেখানেই ওদের সত্য পরিচয়। আমি জানি তোমার মধ্যেও পশুত্বের সীমা লঙ্ঘন করবার আকুলতা আছে। তোমার অসীম দুর্দশার মধ্যেও তোমার অশান্ত

মন তাই খুঁজছে, যা পেলে সে কৃতার্থ হয়ে যাবে। তা ধন নয়, মান নয়, মনুষ্যত্ব। তা নারীমাংস নয়, প্রেম। তা সেই পরশমণি যা তোমার সমস্ত লোহাকে নিমেষে সোনা করে দেবে। তোমার সর্বাঙ্গে কাদার দাগ, তোমার অপরিচ্ছন্ন মনে লালসার ক্লিন্নতা, মাঝে মাঝে তুমি সেই কাদার দাগ আর মনের মলিনতা নিয়ে আস্ফালনও করছ, ধূর্ত নেতাদের পাল্লায় পড়ে স্লোগান দিতে দিতে মিছিলে ভীড় বাড়াচ্ছ, পশু-লেখকের লালসা-বমনকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলে ভুল করছ, কিন্তু আমি জানি এসব করে অন্তরের নিভৃতে তোমার লজ্জিত সত্তা কাঁদছে। বাইরে সে তার দুর্দশার জন্যে দায়ী করছে অনেককে কিন্তু সে জানে এর জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। মনে মনে সে আকুল হয়ে আছে কোন্ পথে কোথায় গিয়ে স্নান করে সে পবিত্র হবে। কোন্ গঙ্গায়, কোন্ সাগরে, কোন্ ঝরনাতলায় গিয়ে কলঙ্কমুক্ত হয়ে নব-জীবন লাভ করবে সে, কবে বলতে পারবে আমি ধন্য হলাম। এই তার গোপন আকাঙ্ক্ষা। বাইরে যদিও সে উদ্ধত নাস্তিক, বাইরে যদিও সে ভুয়ো বিজ্ঞানের আপাত চাকচিক্যে মুগ্ধ, কিন্তু মনে মনে তাই সে হতে চায় যা সে হতে পারেনি। সেই সনাতন মনুষ্যত্বের দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে তার পঙ্গু পৌরুষ—যা সে পায়নি—যা সে পেতে চায়। তার সমস্ত ভণ্ডামি, তার সমস্ত নীচতা, তার সমস্ত বক্র-ভঙ্গী ওই নিদারুণ অসামর্থ্যকে ঢাকবার জন্যে। ওই মনুষ্যত্ব-তীর্থের দিকে এগিয়েও চলেছে সে দিবারাত্রি। কিন্তু সে জানে না যে সে এগোচ্ছে। অনেক সময় জেনেও স্বীকার করতে চায় না, অনুতপ্ত চরিত্রহীন লোক সতীস্ত্রীর কাছে এসে যেমন অসঙ্কোচে বলতে পারে না, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি—এ-ও অনেকটা সেই রকম। তোমাকে আমি চিনি, বুজ্রু।''

''আমাকে তুমি চেন? তাহলে আর আমার পরিচয় জানবার এ আগ্রহ কেন তোমার! তোমার ওই চেনার আলোকে ফুটিয়ে তোল আমাকে। আমার দোষ যদি তোমার কল্পনাকে বিচলিত না করে, আমার গায়ের পাঁক যদি তোমার স্বদেশী চোখে চন্দন বলে প্রতিভাত হয়, তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই! এঁকে ফেল আমার একটা রংচঙে ছবি, তোমার কল্পনার তুলি দিয়ে— হয়তো সিনেমার বাজারেও চলবে ছবিটা। আমি জানি, আমি কি বস্তু! অবাস্তব স্বর্গের মিথ্যা-মহিমার মুকুটে আমাকে সাজিয়ে যদি তৃপ্তি হয় তোমার, সে তৃপ্তির পথে আমি অন্তরায় হব না, যদি তোমার বিবেক না হয়।''

''আমার বিবেক তো শুধু আমারই বিবেক নয়, তোমারও বিবেক। বস্তুত সমস্ত জাতিরই বিবেক। যুগ যুগ ধরে সে বিবেক মহাকালের ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে, লক্ষ লক্ষ সংস্কারের শৃঙ্খল পরে ইতিহাসের আলো-ছায়া-বিচিত্র পথ পার হয়ে, বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় যে রূপ ধারণ করেছে, তাই আমাদের বিবেক। তোমার সবটা তুমি দেখতে পাও নি, কেউ পায় না। তোমার মহিমা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তোমার কাছে। সকলের কাছেই থাকে। কবির চোখেই মানুষের বা জাতির স্বরূপ ধরা পড়ে প্রতিভার দূরদর্শিতায়, ইতিহাসের পটভূমিতে। কবিই মানবজাতির চিত্রকর, ঐতিহাসিক এবং নিয়ন্তা। আমি হয়তো খুব বড় কবি নই, কিন্তু তোমার সত্য রূপ আমি দেখেছি। আমি যা দেখেছি তুমি তা দেখ নি। সেইটে আমি আঁকব।''

বুজ্রু কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর হাসিয়া উঠিল আবার।

''হঠাৎ একটা অদ্ভুত ছবি ভেসে উঠল আমার চোখে। একটা বাঁদরওলা বাঁদর নাচাচ্ছে।

আমিই সেই বাঁদর। আমি ঠিক আছি, কিন্তু বাঁদরওলাটার চেহারা বদলাচ্ছে। সে কখনও আর্য, কখনও বৌদ্ধ, কখনও মুসলমান, কখনও ইংরেজ, কখনও ব্রাহ্ম, কখনও কংগ্রেসী, কখনও কমিউনিস্ট—নানাবেশে সে আমাকে নাচিয়ে চলেছে। সকলের অন্তরালে তুমি আছ না কি! তোমার খুশি মতো তুমিই আমাকে নাচাচ্ছ কি চিরকাল?"

"যারা বাঁদর নাচায় তারাও কবির কাছ থেকে প্রেরণা নেয়, কবির ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু কবির কাজ বাঁদর নাচানো নয়, বাঁদরকে শিব করা। পশুত্বের পলিমাটির তলায় যে শিব চাপা পড়েছে তাকে আবিষ্কার করা। তুমি তোমার কথা বল, অকপটে বল, আমি সে কাহিনীর মধ্যে তোমার সত্য স্বরূপ আবিষ্কার করব।"

"কি ভাবে বলব—"

"যেমন খুশি তোমার—"

"যেমন খুশি? তুমি হংসের মতো নীরের ভিতর থেকে ক্ষীর বার করে নেবে? ক্ষীর তো নেই, পাঁকই আছে কেবল। আমি বদ লোক। অত্যন্ত বদ"

"বল না শুনি। পাঁক ঘাঁটা অভ্যাস আছে আমার—"

"অভ্যাস আছে?"

"আছে বই কি। পাঁক না ঘাঁটলে পঙ্কজের সন্ধান মেলে না। আর পঙ্কজের নাগাল না পেলে পঙ্কজিনীর পদপ্রান্তে পৌঁছব কি করে? ওই তো জীবনের লক্ষ্য, তুমি বল—"

"কিন্তু আমার জীবনের কাহিনী তো একসূত্রে গেঁথে রাখিনি কখনও। ছাড়া ছাড়া ঘটনা মনে আছে—"

"তাই বল—"

দুরারোহ পর্বত ও উত্তাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র অন্তর্হিত হইল। কবি এবং বুজুর ছবিও মিলাইয়া গেল। কল্পনা মেয়ের মতো আসে, কিন্তু থাকে না। আমার নিজেরই মন সম্ভবত কবি-রূপে আমার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। আর বুজু? বুজু অলীক কল্পনা নয়। বুজু আমার বাল্যবন্ধু। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক নিগ্রহ-নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাকে। কিন্তু তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিল বুজু। কোনোও পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হয় নাই। কিন্তু হায়, চরিত্রহীন ছিল সে। হেন কু-কাজ নাই যাহা সে করে নাই। নিত্য নূতন মেয়ে তাহার পিছু-পিছু ঘুরিত। নেশার রাজা ছিল। বড় বড় চাকরি পাইয়াও রাখিতে পারে নাই। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে, তহবিল ভাঙার দায়ে, জনৈক বড়লোকের পত্নীকে প্রকাশ্য সভায় অশ্লীল ভাষায় অপমান করিয়াছিল বলিয়া দেশত্যাগ করিতে হইল তাহাকে। হঠাৎ সে একদিন অন্তর্ধান করিল। না করিলে তাহার জেল হইয়া যাইত। দশ বছর তাহার কোনও খবর পাই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে মেয়েটিকে সে অপমান করিয়াছিল, সে মেয়েটি নাকি গোপনে গোপনে তাহার খবর রাখে, লুকাইয়া টাকা-কড়িও পাঠায়। আমার বোন কুশলার বান্ধবী সে। কুশলার মুখেই একথা একদিন শুনিয়াছি। কুশলা একদিন বলিল, "অমিলা বড় বেহায়া, দাদা। অত অপমানের পরও বুজুদাদাকে ও আবার চিঠি লিখেছে। টাকাও পাঠায় নাকি শুনেছি। এতটুকু আত্মসম্মান নেই ওর"

"অমিলা কি বুজুর ঠিকানা জানে না কি—"

"একজন পাইলট বুজুদার খুব বন্ধু। সে নাকি জানে। সেই পাইলটের সঙ্গে অমিলার ভাব হয়েছে। তার হাত দিয়েই চিঠিপত্র টাকাকড়ি পাঠায়। তুখোড় মেয়ে তো"

আমার সন্দেহ কুশলাও বুজুকে ভালবাসিত। এখনও বাসে। কারণ অনেক ভালো ভালো বিবাহের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

আজ সকালে একজন সৌম্যদর্শন ব্যক্তি একটি প্যাকেট হাতে করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল।

"নমস্কার। বুজুবাবু, এই প্যাকেটটি পাঠিয়ে দিয়েছেন—"

"বুজু? কোথা আছে সে"

এখন কোথা আছে জানি না। দিন সাতেক আগে দেখা হয়েছিল রোমে। শুনেছি সে আমেরিকায় প্রফেসারি করে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি একজন পাইলট—"

"ও। নমস্কার, বসুন"

"না, এখন বসব না। এখনি 'ফ্লাই' করতে হবে আমাকে। এই প্যাকেটটা যে আপনি পেয়েছেন তা একটু লিখে দেন যদি তাহলে ভালো হয়। আবার যখন দেখা হবে তাকে দিয়ে দেব আপনাব চিঠিটা—"

"তার ঠিকানা কি?"

"তা তো জানি না আমি। আমার গতিবিধির খবর রেখে সে-ই দেখা করে আমার সঙ্গে—"

"কোন্ ইউনিভার্সিটিতে সে প্রফেসার?"

"তাও আমি জানি না। প্রফেসার কিনা তা-ও জানি না ঠিক। একজন এয়ার-হোসটেস বলেছিল খবরটা। বুজু কিছু বলে নি। নিজের সম্বন্ধে সে কোনও কথাই বলতে চায় না কখনও"

"বসুন একটু। চিঠিটা লিখে দি। আপনার নামটা কি?"

"পাইলট মুখার্জি লিখলেই বুঝতে পারবে সে।"

পাইলট মুখার্জি সামনের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন।

লিখিয়া দিলাম—'ভাই বুজু, অনেকদিন পরে তোমার খবর পাইলট মুখার্জির কাছে পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। তিনি একটি প্যাকেট আমাকে দিয়ে গেলেন। প্যাকেটে কি পাঠিয়েছ বুঝলাম না। পাইলট মুখার্জি তোমার ঠিকানা বলতে পারলেন না। তুমি কোথায় আছ, কি করছ, জানতে ইচ্ছে করে। সব খবর দিয়ে চিঠি লিখো। আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।"

চিঠি লইয়া পাইলট মুখার্জি চলিয়া গেলেন।

প্যাকেটটি সামনে লইয়া আমি বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে মানসপটে একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। সম্মুখে দুরারোহ পর্বত, পিছনে বিশাল সমুদ্র। মাঝখানে উপলাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ তটে আমি আর বুজু মুখোমুখি বসিয়া আছি। কল্পনায় তাহার সহিত কথা হইল, অনেক কথা। তাহা আগেই লিখিয়াছি।

দুই

প্রথম চিঠি

প্যাকেটের ভিতর একটি চিঠি ও একটি পাণ্ডুলিপি ছিল। চিঠিটা এই। বেশ বড় চিঠি।

—ভাই কবি,

আমার আশা তোমরা ছেড়ে দিয়েছ এ সান্ত্বনা যদি নিজেকে দিতে পারতাম তাহলে আরাম পেতাম বোধ হয়। কিন্তু তা দিতে পারছি না নিজেকে। আমি বুঝতে পারছি কেউ তোমরা আমার আশা ছাড় নি। তোমরা আশা করে আছ ফুটবলটা একদিন-না-একদিন ফিল্ডে (field) আবার ফিরে আসবে তখন সকলে মিলে আবার লাথাব তাকে। একটা কথা জান? লাথাবার মতো লোক না পেলে তোমাদের জীবন বৃথা হয়ে যায়। ঘোঁট করবার মতো একটা পুরুষ বা নারী, একটা রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি, বা নিদেনপক্ষে বাংলা সাহিত্য নিয়ে দুশ্চিন্তা এসব না করলে তোমাদের ভাত হজম হয় না, জীবন বিস্বাদ হয়ে পড়ে। তোমরা যা কিছু কর তার ওই এক উদ্দেশ্য—বিস্বাদ জীবনকে সুস্বাদ করা। তোমাদের দেশভক্তির পনরো আনা তিনপয়সা হুজুগ এবং সে হুজুগের আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন। দেশে যথেষ্ট দুঃখ আছে, কিন্তু তোমরা সে দুঃখ মোচন করবার জন্যে ততটা সচেষ্ট নও যতটা সচেষ্ট সে দুঃখ নিয়ে বাগবিস্তার করতে—কবিতায়, থিয়েটারে, আড্ডায়, সভায়, খবরের কাগজে! কালোবাজারীরাও কালোবাজারের বিরুদ্ধে সাড়ম্বরে বক্তৃতা করে চলেছে, ঘোর মিথ্যাবাদী মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। কষ্ট অপরিসীম কিন্তু আর্তনাদ নেই, সবাই মজা দেখছে, বিক্ষত মর্মকে থেঁতলে দিচ্ছে ওরা ঠিকই—কিন্তু তবু সবাই মজা করছে তাই নিয়ে। মজাদার জাত তোমরা। মজা নদীর মতো। তোমরা যদি মর্মন্তুদ একটা আর্তনাদ করতে পারতে তাহলে ওই গজদন্তের মিনারটা কেঁপে উঠত, ফেটে যেত ওর মণিমাণিক্যখচিত ছাদটা, কিন্তু তোমরা আর্তনাদ করছ না, মজা করছ। তোমরা থিয়েটারের স্টেজে দাঁড়িয়ে ধার-করা গোঁফ-দাড়ি পরে নকল গদা ঘুরিয়ে বলছ—ছাদ ফাটাব, ছাদ ফাটাব। ওতে ছাদ ফাটে না, ছাদ ফাটাবার ইচ্ছেও নেই তোমাদের। তোমরা যাহোক কিছু নিয়ে মজা করতে চাও কেবল। কোথাও একটু কেচ্ছার গন্ধ পেলে নাক বাড়িয়ে ছুৎ ছুৎ করে যাও সেখানে। আমি এমন লোক দেখেছি যারা কেচ্ছার গল্প ছাড়া আর অন্য কোন গল্প জানেই না। পর্ণোগ্রাফি তাদের কাছে বড় সাহিত্য, যে লেখক কায়দা করে অশ্লীল ইঙ্গিত-ভরা লেখা লেখে, সে জিনিয়াস। শূকর-শূকরীরা কাদাই ভালবাসে। তোমরা নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দাও, তোমাদেরও কিন্তু ওই প্রবৃত্তি। কাদাতেই মজা পাও। আমি তোমাদের চক্ষে কাদার সমুদ্র ছিলাম একটি। আমি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করাতে তোমাদের অনেকেরই অন্তর্দাহ হয়েছে নিশ্চয়, কল্পনা-নেত্রে নিশ্চয়ই ভেবেছ সমুদ্র এখন মহাসমুদ্র হয়েছে, যথাকালে সব খবর পাওয়া যাবে, কারণ তোমরা জান ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। আমার আশা যে তোমরা ছাড়নি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। পাইলট মুখার্জি সে-সব প্রমাণ বহন করে নিয়ে আসে। বুঝতে পারি তোমরা আমাকে ভোল নি। আজ এমন অযাচিতভাবে তোমাকে চিঠি লিখছি কেন একথা নিশ্চয়ই তোমার মনে জাগছে। ভুরু এতক্ষণ কুঁচকে গেছে হয়তো। দেবার মতো কোনও জবাবদিহিও নেই আমার। যেটা আছে সেটা বাজে, অত্যন্ত বাজে। মেয়েলি

সেন্টিমেণ্ট। তোমাদের জন্য মন কেমন করছে ভাই। বিশেষ করে তোমার জন্যে। তুমি আদর্শবাদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতে—আমি খারাপ ছেলে ছিলাম—আমাকে দেখলে তোমার বক্তৃতাটা আরও উথলে উঠত—তাই আমি তোমাকে এড়িয়ে চলতাম। তোমাকে প্রিগ্ (prig) মনে হত। দুধ ভাল জিনিস, কিন্তু ওতে কোনোও দিন রুচি ছিল না আমার, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েই কাটিয়েছি চিরকাল। কিন্তু আর পাচ্ছি না ভাই। শরীর ভেঙে গেছে। অখাদ্য কুখাদ্যে আর রুচিও নেই। খাঁটি দুধেরই স্বপ্ন দেখি এখন, যদিও তা কোথাও পাবার উপায় নেই। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। এ বাজারে তুমি খাঁটি দুধ। আমার পরিচিত এলাকায় জল-মেশানো মাখন-তোলা দেশী দুধের কদর বেশী। টিনে-ভরা বিলিতি দুধেরও। দুটোই চড়া দামে বিক্রি হয় বাজারে। চড়া দামটা হয়তো কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করতে পারি কিন্তু ও জিনিস আর খাবার ইচ্ছে নেই। খেতে হলে খাঁটি টাটকা দেশী দুধই খাব। তাই তোমার কাছে এলাম। আমার চরিত্রের আর একটা পরিবর্তনও হয়েছে। নকল বিলিতি-মার্কা-মারা বাঁদরদের পাল্লায় পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে, অসভ্যরাই জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে, যারা সুসভ্য তাদের তৃষ্ণাও নাকি সুসভ্য, মদ্য ছাড়া সে তৃষ্ণা না কি অন্য কিছুতে নিবারিত হয় না। আমি মদ কম খাইনি, এখনও কিনে খাবার মতো পয়সা হাতে আছে, মদ খাওয়ার সঙ্গী-সঙ্গিনীও যথেষ্ট (আশে-পাশে সঙ্গী-সঙ্গিনী না থাকলে মদোচ্ছল হওয়া যায় না, নেশা জমে না), কিন্তু ভাই মদ খেয়ে তৃষ্ণা আর মিটছে না। এখন সন্ধান করছি কুঁজোর ঠাণ্ডা জল কোথায় পাই। কুঁজো বাজারে পাওয়া যায়, তাতে জল ভরে ঠাণ্ডাও হয়তো করা অসম্ভব নয় কিন্তু আমি যে কুঁজোর ঠাণ্ডা জল চাইছি তাতে জল ছাড়াও আরো এমন কিছু থাকবে যা বাজারে দুর্লভ। আমাকে মনে করে আমার তৃপ্তি হবে বলে বিশেষ করে আমার জন্যেই যে জল সস্নেহে তুলে সযত্নে ঢাকা দিয়ে ঠাণ্ডা ঘরেব কোণে রাখা হয়েছে, যে জলে প্রেমের ছোঁয়া আর মনের মাধুরী মিশেছে, তা বাজারে পাওয়া যায় না। বাজারে যা পাওয়া যায় তাতে অরুচি হয়ে গেছে। তাই তোমার কাছে এলুম। তুমি হয়তো বলবে—'এলে তো। কিন্তু কি করব আমি তোমাকে নিয়ে। তুমি ঝরঝরে ভাঙা মোটর-কারের মতো, তোমার হর্ন ছাড়া আর সব কিছুই শব্দ করছে। সত্যি সত্যি যদি মোটর-কার হতে অমলকে খবর দিতুম, সে ভাল মিস্ত্রি, মন দিয়ে কাজ করলে তোমাকে হয়তো খাড়া করে তুলত। কিন্তু তুমি তো মোটর-কার নও, তুমি মানুষ! ফোর্ড বা অস্টিন তোমাকে সৃজন করেনি করেছেন রহস্যময় বিধাতা। তার সৃষ্টি এই মানুষ নামক যন্ত্রটিকে মেরামত করবার জন্যে বহু পূর্বে বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দেরা বড় বড় ওয়ার্কশপ খুলেছিলেন—কিন্তু হেরে গেছেন। আমি কি করব তোমাকে নিয়ে! আমি সামান্য লোক।' তুমি ঠিক এইসব কথাই বলছ কি না তা জানি না, কল্পনা করছি হয়তো বলছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সব জেনে শুনেই তোমার কাছে এলাম। রোগী যেমন ডাক্তারের কাছে আসে, ঠিক সে মনোভাব নিয়ে আসি নি। আমার মনোভাবটা—ঠিক কি উপমা দিয়ে বোঝাই তোমাকে মাথায় আসছে না—উপমার অলঙ্কার পরিয়ে কথা কইতে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু মনে হয় ও ছাড়া উপায়ও নেই—আমরা যেমন উলঙ্গ হয়ে পথে বেরুতে পারি না, তেমনি নিরুপমা কথাও কইতে পারি না যদিও জানি পোশাক অলঙ্কার বা উপমা সত্যটাকে ঢেকে রাখে অনেকখানি। উপমা দিয়েই যদি বলতে হয় তাহলে বলব একটা ছেলে মুখ থুবড়ে রাস্তায়

পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মায়ের কাছে ছুটে যায় যে মনোভাব নিয়ে. আমি সেই মনোভাব নিয়েই তোমার কাছে এসেছি, যদিও তোমার সঙ্গে আমার মা ছেলের সম্পর্ক নয়। হ্যাঁ, একটা অবান্তর কথা মনে পড়ল। প্রকৃত প্রেমের নানারকম সামাজিক রূপ আছে—মা-ছেলে, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, প্রণয়-প্রণয়িনী, স্বামী-স্ত্রী, বান্ধব-বান্ধবী, কিন্তু আসলে সব প্রেমই এক যদি সেটা খাঁটি হয়, অনেকটা খাঁটি সোনার মতো, গয়নার চেহারা যা-ই হোক। আর আমার মনে হয় মা-ছেলের প্রেমটাই বোধ হয় আদি অকৃত্রিম প্রেমের মহত্তম প্রকাশ। তাই মা-ছেলের উপমাটা খুব যে বেখাপ্পা হল তা মনে হচ্ছে না। যাই হোক—এসে গেছি। প্রথমেই এবার রহস্যের যবনিকাটা তুলে ফেলি। আমি এই কলকাতা শহর ছেড়ে কোথাও যাইনি। আমিই গুজব রটিয়েছি আমি না কি বিলেত গেছি, আমিই প্রচার করেছি আমি আমেবিকায় প্রফেসারি করছি। কলকাতা বিশাল শহর, বিশাল সমুদ্র। এখানে আত্মগোপন করা খুব সহজ। আমি এখন যে জায়গায় আছি তা কলকাতা শহরেই অবস্থিত। যাদের মধ্যে আছি তারা কলকাতার লোক। অর্থাৎ এই কলকাতা শহরের নব পরিস্থিতিতে আমার নবজন্ম লাভ হয়েছে। আশ্চর্য, নয়? তোমাদের জগতে আমার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তোমাদের পাশেই একই নগরে আবার আমি জন্মেছি। তোমাদের জগতে আমার নাম ছিল বুজু। এখন আমি অন্য নামে পরিচিত। তোমাদের জগতে আমার পরিচয় ছিল শয়তান, এ জগতে আমি মহাপুরুষ। আমরা যখন মারা যাই তখনও এই কাণ্ড হয় বোধহয়। কাছেই থাকি, কিন্তু কেউ আমাদের ধরতে ছুঁতে পারে না। আমাদেরও বোধ হয় ইচ্ছে হয় না পুরাতন জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার। আমারও সে ইচ্ছে হয়নি এতদিন, আজ হঠাৎ হল। সেদিন মহাজাতি সদনে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। যৌবনে যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা আমার চিত্তহরণ করেছিলেন তাঁহারাই আবার একত্রিত হয়ে নেমেছিলেন একটা নাটকে। মহাজাতি সদনে ওই নাটক দেখতে তুমিও গিয়েছিলে। আমার কাছেই বসেছিলে, কিন্তু আমাকে চিনতে পারনি। পারবার কথাও নয়। আমার এক মুখ কাঁচা-পাঁকা গোঁফদাড়ির জঙ্গল, বড় বড় বাবরি চুল, আর কালো গগল্‌সের রহস্য ভেদ করে তোমার সেকালের বুজুকে চিনতে পার নি তুমি। আমি কিন্তু তোমাকে চিনেছিলাম। দেখলাম তুমি রোগা হয়ে গেছ, বুড়ো হয়ে গেছ একটু। মনে পড়ল যৌবনে তুমি আমাকে কবিতা গল্প পড়ে শোনাতে। তোমার কিছু লেখা ছাপাও হয়েছে, কিন্তু তুমি পপুলার হতে পারনি। দু'চারটে হিংসুকে বেরসিক সমালোচক আলতো আলতো ভাবে তোমার পিঠ চাপড়ে মুরিব্বিয়ানা প্রকাশ করেছিল বলে তুমি তোমার বই আর সমালোচনার জন্যে পাঠাওনি। ভাগ্যে এ দেশেও কিছু কিছু সত্যিকার রসিক আছে তাই তোমার লেখার কিঞ্চিৎ কদর হয়েছে। আমি অবশ্য তোমার কড়া সমালোচক ছিলাম, নানাভাবে তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছি, কিন্তু মনে মনে আমি বরাবরই তোমার ভক্ত ছিলাম, যদিও এ কথা তোমার সামনে কখনও বলিনি। বললে, খোশামোদের মতো শোনাতো। অনেকে দেখেছি, যারা সাহিত্যের 'স'-ও জানে না, ডাস্টবিন, আঁস্তাকুড় নিয়েই যাদের কারবার, সরস্বতীর কমল-বনের ধার কাছ দিয়েও যার হাঁটেনি কখনও—তারা তোমার লেখার অজস্র স্তুতিবাদ করে তোমার কাছ থেকে নানারকম সুবিধা আদায় করে নিয়েছে এবং সব জেনে-শুনেও তুমি সে-সব সুবিধা তাদের দিয়েছ। আমিও তোমার কাছে কম সুবিধা পাইনি। আমার বাবা যখন আমাকে ত্যাগ করলেন,

তুমিই তখন আশ্রয় দিয়েছিলে আমাকে। তোমার আশ্রয় না পেলে আমি এম. এ. পরীক্ষাটা দিতে পারতাম না। তোমার লেখার নির্জন ঘরটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের পড়ার ঘরে বসে তুমি লিখতে? ভীড়ে বার বার তোমার লেখার ছন্দপতন হত নানা গোলমালে, কিন্তু আমাকে তুমি তাড়াওনি! কিন্তু আমি এর কি প্রতিদান দিয়েছিলাম তোমার মনে আছে তো? আসবার সময় তোমার দামী 'টাইমপীস'টি চুরি করে এনেছিলাম। এর পরও তুমি তোমার বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দিয়েছ। টাইমপীসের কথা উল্লেখ পর্যন্ত কর নি। এমন ভাব দেখিয়েছ যেন ও জিনিস তোমার ছিল না। আমি শুধু 'টাইমপীস্' চুরিই করি নি, তার চেয়েও মহত্তর কাজ করেছিলাম একটা। তোমার নবোদ্ভিন্নযৌবনা ভগ্নী কুশলার সঙ্গে প্রেমও করেছিলাম। সে প্রেম কোন্ উলঙ্গ পরিণতিতে পৌঁছেছিল তা লিখে তোমাকে বা কুশলাকে লজ্জা দিতে চাই না। এইটুকু শুধু বলছি—জয়, জয় বিজ্ঞানের জয়। তাঁরা সাক্ষাৎ মৃত্যু ইলেকট্রিফায়েড্ (clectrified) তারকেই ওয়াড় পরিয়ে ইনস্যুলেট (insulate) করেন নি, অনেক পাশবিকতার গায়েও নানারকম ওয়াড় পরিয়েছেন। কামুকদের জন্যে কনট্রাসেপশন্ (contraception). ক্রোধীদের জন্য ট্র্যাংকিউলাইজার (tranquiliser), লোভীদের জন্য নানারকম হজমের ওষুধ বার করে বিজ্ঞান মোহ, মদ, মাৎসর্যের যে বর্ণাঢ্য বহ্যুৎসব করছে, আধুনিক জগতে তার নামই প্রগতি। কুশলাকে নিয়ে সে প্রগতির কিছু চর্চা করেছিলাম তোমার বাড়িতে বসে। এম. এ.-তে যদিও আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম কিন্তু কুশলা আমাকে পাসমার্ক দেয় নি। অসাধারণ মেয়ে ওই কুশলা। শুনেছি ও নামকরণ তুমি করেছিলে। চমৎকার নামটা দিয়েছ। কিন্তু তুমি বোমভোলা লোক, নামটা দেবার পরই অন্যমনস্ক হয়ে গেছ, লক্ষ্য করনি কিভাবে ও সে নামের মর্যাদা রক্ষা করেছে। বৌদি কিন্তু তোমার মতো অন্যমনস্ক নন, কুশলার লীলাকৌশল নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধিবলে তিনি সব লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু মুগ্ধ হতে পারেননি। ঈর্ষার কালো ধোঁয়া তাঁর দৃষ্টিকে মলিন করে দিয়েছিল, আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি কুশলার মহিমাটা দেখতে পান নি। ঈর্ষা কেন হয়েছিল জানো? আমি জানি। কারণ অনেক মেয়েমানুষ ঘেঁটেছি। এ কথা নিশ্চয় তোমার অবিদিত নেই যে ইয়ার-বক্সি মহলে ওরা আমার নাম রেখেছিল বুজু দি বায়রন্! হ্যাঁ, বায়রনই ছিলাম আমি। একপাল মেয়ে আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আধুনিক সাহিত্যের বাজারে যে-সব বই যুগান্তকারী বাস্তব উপন্যাস নামে ঘোষিত বিঘোষিত নিনাদিত সিনেমায়িত প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করছে, আমি ইচ্ছে করলে বস্তা কয়েক ওরকম রাবিশ বাংলা সাহিত্যের ধাপায় এনে হাজির করতে পারতুম। কিন্তু সে প্রবৃত্তিই আমার হয়নি। আমি প্রেম-ট্রেম, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ফ্যাশান-ট্যাশান বিষয়ে অত্যাধুনিক, বাজারে যখন রেঅন আর টেরিলিন্ উঠল, তখন আমি সেকেলে ভালো মুর্শিদাবাদী গরদ, চমৎকার আসামী মুগাকে বাতিল করে দিতে ইতস্ততঃ করিনি, ডশনের বাড়ির ভালো ডার্বি 'শু' ত্যাগ করে পাঞ্জাবি চপ্পলে পা ঢোকাতে দ্বিধা করি নি। ফ্যাশানের খাতিরেই জওহর জ্যাকেট পরেছি, ভালো ভালো দেশজ আতরের বদলে মেখেছি নানারকম বিলিতি এসেন্স, গোঁফ জুলফির উপরও অত্যাচার কম করিনি। কিন্তু সাহিত্যের বেলায় ভাই আমি সেকেলে। আমার মতে ভালো কাব্য হচ্ছে সেই অদৃশ্য 'ক্রেন্' (crane) যা মনুষ্যজাতিকে পাঁক থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করে। আমার কাছে গীতা

বাইবেল উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত জাতক ইলিয়াদ অডিসি সেক্সপীয়র মিলটন শেলী কীটস টলস্টয় ডস্টয়ভেসকি রবীন্দ্র বঙ্কিম এবং ওই জাতের লেখকরাই নমস্য হয়ে আছেন। আমার ধারণা কি করে একটা রসগোল্লা চুরি করে গোপনে সেটা চেটে চুষে কামড়ে খেলাম এর লালাসিক্ত বর্ণনা কাব্য নয়। তাই বায়রন হয়েও আমি কাব্য লিখিনি। কাব্য লিখিনি বটে কিন্তু নারীচরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করেছি। তাই বৌদির ঈর্ষার কারণটা বুঝতে পারি। অধিকাংশ নারীই অবচেতনলোকে আর একজন নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মা-ও মেয়ের রাইভাল হয়েছে—এ-ও দেখেছি। তাই অধিকাংশ নারীর মনে হ্লাদিনীশক্তিসম্পন্না মেয়েরা ঈর্ষা জাগায়, বিশেষ করে গতযৌবনা বুড়িদের মনে। কিন্তু তা বলে ওই বুড়িরা খারাপ লোক নয়। আমাদের বৌদি তো—গডেস্। 'দেবী' বললাম না, কারণ দেবী কথাটা আজকাল ঘসা-পয়সার মতো জৌলসহীন হয়ে গেছে। বৌদিরা না থাকলে সংসার মরুভূমি হয়ে যেত। এই বৌদিরা আমাদের সমাজে এক একটি বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যদিও, রাগের মরাই এক একজন, উপরে অনেক ময়লা জমে আছে, ভিতরে কিন্তু খাঁটি সোনা। এবড়ো-থেবড়ো কঠিন পাথরের তলায় স্বচ্ছ জলের ফল্গুধারা বইছে। ওরাই মধ্যবিত্ত সমাজের ধারক, বাহক, রক্ষক— যে সমাজ থেকে বাংলা দেশের প্রতিভাদ্যুতি সারা জগতে বিকীর্ণ হয়েছে—সেই সমাজ ওঁদেরই স্তন্যসুধা পান করে বেঁচে আছে এখনও। ওঁরা যদি অবলুপ্ত হন, ওঁরা যদি হাল-ফ্যাশানের প্রজাপতি-মার্কা রুজ-পাউডার-মাখা 'ডল' সেজে নানান আসরে ন্যাকামি করে বেড়াতে শুরু করে দেন—বাস্, তাহলেই খতম। তাহলেই এ জাতের দফা শেষ। কিন্তু ওরা নিঃশেষ হবে না। যদিও ধস্ ভাঙছে, যদিও আমরা রোজ ওদের পায়ের তলায় দলে দলে যাচ্ছি, তবু কিন্তু ওরা মরবে না। দূর্বাঘাসের মতো বেঁচে থাকবে, অক্ষয় বটের মতো ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে খাড়া থাকবে। ওরা মা, ওদের জীবনীশক্তি ঠুনকো শৌখিন পেয়ালার মতো নয়, বজ্রের মতো কঠিন, আগুনের মতো প্রদীপ্ত। বৌদিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর বকুনি খেয়েই আমি পালিয়েছিলাম তোমার বাড়ি থেকে।

তিনি একদিন তাঁর আড়ময়লা শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে আমার ঘরে এসে ঢুকে সোজা বললেন, "দেখুন বুজুবাবু, আপনার মতো বিদ্যে আমার নেই, কিন্তু যতটুকু বুদ্ধি থাকলে সংসারের গৃহিণী হওয়া যায়, ততটুকু বুদ্ধি আমার আছে। ঘরে সাপ ঢুকলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, এটুকু অন্তত আমি বুঝি। কুশী কলেজে-পড়া মেয়ে, অনেক রং-ঢং আছে ওর, আপনার কাছে পড়া করবার ছুতোয় যখন তখন আসে, আপনারা দুজনে মুখোমুখি বসে থাকেন। এর অর্থ যে কি তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে, এর পরিণাম যে কি তা-ও আমার অজানা নয়। আপনি আমাদের স্বজাতি নন, আপনার চাল-চুলোও কিছু নেই, সুতরাং আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে হোক একথা ভাবতেও পারি না। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এখান থেকে চলে যান। চোখের সামনে আমি এসব ঢলাঢলি দেখতে পারবো না। তাই আপনার বন্ধুটিকে এসব বলে হৈ-চৈ করবার ইচ্ছে নেই, তাঁকে বলে বিশেষ লাভও হবে না কোনও। তিনি চিরকাল যে উত্তর দিয়েছেন—'আমি কিছু বুঝি না, যা করবার তুমিই কর'—এবারও সেই উত্তরই দেবেন। তাই যা করবার আমিই করছি। অনুরোধ করছি আপনি চলে যান এখান থেকে— "

মনে পড়ছে নিজের আত্মসম্মানের মুখোশটা রক্ষা করবার জন্যে হেসে বলছিলাম—"যদি না যাই—"

তিনিও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"আশা করি অতটা অবুঝ আপনি হবেন না। যদি হনই তাহলে মনে রাখবেন আমাদের হাতে সাবেক কালের এমন সব অস্ত্র আছে যার সামনে আপনি দাঁড়াতে পারবেন না।"

"অর্থাৎ?—"

বৌদির চোখ দুটো থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে এল। বললেন—"ঝাঁটা—"

বলেই বেরিয়ে গেলেন। আমার মনে হল মুখে যেন সপাৎ করে ঝাঁটাটা লাগল। যদি বলি রাগ হয়নি তাহলে সেটা মিথ্যাভাষণ হবে। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম, আমার কালো মুখ বেগুনে হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টাও করেছিলাম। ভেবেছিলাম কুশলাকে নিয়ে ভেগে পড়ব। সে চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম কুশলা আমাকে পাস মার্ক দেয়নি। বুঝতে পারলাম সে যখন আমার সঙ্গে মাখামাখি করছিল, তখন সে আমাকে চেখে চেখে দেখছিল আসলে। প্রস্তাবটা যখন করলাম তখন মুচকি হেসে শুধু বললে—তোমার আস্পা তো কম নয়। দু'দণ্ডের ফুর্তিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দলিলে পাকা করবার সামর্থ্য যে তোমার নেই তা তুমিও জানো, আমিও জানি।' আর একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল। আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। সেই দিনই আমি তোমার বাড়ি ছেলে চলে আসি। কিন্তু ছেড়ে আসবার অব্যবহিত পূর্বে যা ঘটেছিল তা তোমার জানা নেই। তোমাকে বলে এসেছিলাম—আমার এক পিসিমা এসেছেন, সেখানেই আমি যাচ্ছি। কিন্তু আমি গিয়ে উঠেছিলাম একটা হোটেলে আর সেখান থেকে ফোন করেছিলাম অমিলাকে। গুজবের চশমা চোখে দিয়ে অমিলা মেয়েটিকে তোমরা যে রূপে দেখেছ, তার আসল রূপ তা নয়। মহীয়সীকে পাপীয়সী বলে ভুল করেছ একথা বলব না, কারণ ষোল আনা মহীয়সী বা ষোল-আনা পাপীয়সী কোনও নারীকে বিধাতা সৃষ্টি করেন নি। বিধাতার শিল্পভাণ্ডারে অনেক রং, প্রতিটি সৃষ্টিতেই তিনি অনেক রং অনেক কায়দায় ফলিয়েছেন, তাঁর দুটি সৃষ্টি একরকম হয়নি। দুটি নারীও একরকম নয়, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই অপরূপ। তা দেখবার চোখ তোমাদের নেই। সে মহীয়সী, না পাপীয়সী, সতী না অসতী এই নিয়ে ঘোঁট করতে তোমরা ওস্তাদ। সুতরাং অমিলার সম্বন্ধে তোমরা ভুল করেছ। এ ভুল সংশোধন করবারও আমার গরজ হত না। হয়তো, যদি না দুর্নিবার আকর্ষণে তোমার দিকে আকৃষ্ট হতাম। তুমি আমাকে দুর্নিবার টানে টানছ কবি। তোমার কাছে আসতে হলে সব কথা খুলে বলতে হবে। সব শুনেও তুমি যদি বল, ঠিক আছে, চলে এস—তাহলে যাব তোমার কাছে।

অমিলা মেয়েটি খারাপ নয়, সে আমাকে ভালবাসে এই অপরা ধেতোমরা তাকে দাগী করে রেখেছ। ভুলে গেছ ভালবাসা সেই দুর্লভ দ্যুতি যা ক্বচিৎ কারো জীবনে এসে তার জীবনকে ধন্য করে দেয়। তা গোপবধূ শ্রীরাধার জীবনে আলোর বন্যার মতো এসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে, উদ্ভাসিত করেছিল তার আত্মাকে। কুৎসার লেলিহান শিখা যাকে দগ্ধ করতে পারেনি, কবিদের উচ্ছ্বসিত বন্দনা-বর্ণনায় যা কাব্যলোকে চিরভাস্বর, আধ্যাত্মিক মহিমায় যা রসিকের চিত্তলোকে চিরপ্রতিষ্ঠিত তা পাপ নয়, তা পুণ্য। এ সৌভাগ্য সকলের জীবনে

আসে না। অবশ্য এ সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বহন করে আনে সাংসারিক জীবনে, পথ চলতে চলতে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, কলঙ্কের কালিমা-ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি—তবু যার জীবনে এ ভালবাসা এসেছে সে থামে না, ফেরে না। যে বাঁশী তাকে ডাকছে, যে রূপের আভা উদ্ভাসিত করছে তার সত্তাকে তারই দিকে সে চলতে থাকে, চলতেই থাকে আমরণ। সাবিত্রী সত্যবানকে ভালোবেসেছিল বলেই যমের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছিল তাকে। আমার বিশ্বাস অমিলাও এই জাতের মেয়ে। কিন্তু ট্রাজেডি হয়েছে আমি শ্রীকৃষ্ণও নই, সত্যবানও নই। আমার মধ্যে অমিলা যে কি দেখেছে তা আমি জানি না, কারণ আমার চোখ দিয়ে আমি আমার সবটা দেখতে পাই না, অমিলার চোখও আমার নেই, সুতরাং ও রহস্য আমি উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি, পারবও না। আমি জানি আমি চোর, চরিত্রহীন, মাতাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেছি বটে কিন্তু সে ডিগ্রীকে কাজে লাগাতে পারি নি। আমার মা নেই। বাবা দারোগা। ঘুষ দিয়ে, ঘুষ নিয়ে, সেলাম করে সেলাম কুড়িয়ে সারা জীবনটা কাটিয়েছেন তিনি। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ—তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা আমার কোনও দিনই হয়নি। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা তো করতে পারিইনি, ঘৃণা করেছি। যদিও হয়তো ধর্মত এবং ন্যায়ত তিনি ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য, তবু আমি তাঁর ঋণ শোধ করে দিয়েছি। স্নেহের ঋণ শোধ করা যায় না, কিন্তু তিনি আমাকে কোনদিনও স্নেহ করেছেন বলে মনে পড়ে না আমার। মুসলমান যেমন মুরগি পোষে, আমাকেও তেমনি ভাবে পালন করছেন তিনি। আমি টাকার অঙ্কটা হিসাব করে দেখলাম একদিন। দেখলাম বড় জোর দশ হাজার টাকা তিনি খরচ করেছেন আমার জন্যে। সে টাকাটা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। কি করে যোগাড় করলাম অত টাকা? বলা বাহুল্য অসদুপায়ে। তখন আমি দুটো বড় বড় পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলাম। কিছু বড় লোকের ছেলেকে প্রশ্নপত্র বলে দিয়ে এবং কিছু অযোগ্য ছেলেমেয়েদের ভালো নম্বর দিয়ে অনেকগুলো টাকা পেয়েছিলাম তখন। কম নয়, সাত হাজার টাকা। বাকী টাকাটা কিছু রোজগার করেছিলাম, কিছু ধার করেছিলাম। তুমি হয়তো ভাবছ এরকম নাটকীয় কাণ্ড করতে গেলাম কেন। নাটকীয় কাণ্ড করাই আমার স্বভাব, আমার নেশা। এর জন্যেই আমি নানারকম বিপদে পড়েছি জীবনে। আমি যদি সবদিক বাঁচিয়ে সোজা সহজ নিষ্কণ্টক নিরামিষ পথে সাধারণভাবে চলতাম, তাহলে হয়তো আর পাঁচজনের মতো সুখের জীবন হত আমার। বছরের পর বছর মাইনে বাড়ত, মোটা পণ নিয়ে কোনও সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ের পাণিপীড়ন করে নামজাদা কোনও ঘানির বলদ হয়ে আমি এতদিনে হয়তো অনেক তৈল নিষ্কাশন করে ফেলতাম। কিন্তু আমার ধাতে ও জিনিসটি নেই। আমি নাটক করতেই ভালবাসি। ওর জন্যেই আমি অনেক দুষ্কার্যও করে ফেলেছি। অমিলাকে যে এক তথা-কথিত সাংস্কৃতিক জলসায় কটূক্তি করেছিলাম, যার জন্যে অমিলার হোমরা-চোমরা স্বামী আমার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিলেন, যার জন্যেই আমাকে শেষ পর্যন্ত গা-ঢাকা দিতে হল, তার মূলে আছে ওই শয়তানী নাটক করার প্রবৃত্তি। সভায় অমিলা উঠে দাঁড়িয়ে যখন গুছিয়ে-সাজিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা আওড়াতে লাগল তখন আমার লোভ হল—দিই রঙীন বেলুনটা ফাটিয়ে? একটা আলপিনের খোঁচাতেই তো চুপসে যাবে! উঠে বললাম—অমিলা দেবী যদি গ্রামোফোন বা কাকাতুয়া হতেন ওঁর কথায় আপত্তি করতাম না, কিন্তু উনি মানুষ,

উনি জানেন, ভাল করেই জানেন, আমার ধারণা ওঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে, যে মানুষের অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ বারবার মানুষের তৈরী কৃত্রিম আইনকে লঙ্ঘন করে চলে যায়। তিনি নিজেই সে আইন লঙ্ঘন করেছেন একথা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। সুতরাং তাঁর মুখে এসব কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি ধাপ্পা দিচ্ছেন। তিনি কি মনে করেন সংস্কৃতি মানে একটা মুখোশ পরে লোক ভোলানো? না, কতকগুলো বিবর্ণ নীতিকথার ন্যক্কারজনক পুনরাবৃত্তি করা? আলপিনের খোঁচা খেয়ে রঙীন বেলুনটা চুপসে গেল। ওই চুপসে-যাওয়ার নাটকীয়তাটা আমি উপভোগও করলাম খুব। অবশ্য দামও দিতে হল, বেশ চড়া দাম। তার আগেই আমাদের আপিসে অডিট হয়ে গিয়েছিল, অডিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সন্দেহ করেছিল আমিই দশ হাজার টাকা গাপ করে বসে আছি। হাতে নাতে ধরতে পারেনি যদিও, কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়। অমিলার স্বামী হোমরা-চোমরা লোক, কলেজের একজিকিউটিভ কমিটির প্রভাবশালী সদস্য একজন, একদিন অমিলার আগ্রহে তিনিই সুপারিশ করে আমাকে কলেজের প্রিন্সিপাল পদে বাহাল করেছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে আমাকে বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু ওই ঘটনার পর তিনি সে ইচ্ছা আর করলেন না, পুলিশে খবর দিয়ে দিলেন। হয়তো আমি ধরাই পড়ে যেতুম, কিন্তু ওই অমিলাই আমাকে বাঁচালে। সে-ই আমাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বললে—তুমি কিছুদিন আত্মগোপন করে থাক। আমি কড়া ভাষায় একটা রেজিগনেশন লেটার (resignation letter) লিখে পাঠিয়ে দিলাম আপিসে। তারপর গা ঢাকা দিলাম। বেশী দূর যাইনি। কলকাতার একটা হোটেলেই আড্ডা গাড়লাম দিন কয়েকের জন্য। আর সেখানে বসে খান পঞ্চাশেক পোস্টকার্ড লিখে ফেললাম পরিচিত অর্ধ-পরিচিত পঞ্চাশ জন স্ত্রী-পুরুষকে। সব চিঠিরই এক বক্তব্য, এদেশ থেকে চললুম, আমেরিকায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছি। আমাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য কি জান? আমরা কেউ কিছু যাচিয়ে দেখি না, বাজিয়ে দেখি না। যে যা বলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করি সেটা। যেই কেউ ফুসফুস করে বললে যদুবাবু ডুবে ডুবে জল খান অমনি সবাই বিশ্বাস করে ফেললাম। বড় বড় লোকের নামে এরকম রাশি রাশি মিথ্যা গুজব প্রচলিত আছে। আমাদের মতো সাধারণ লোকও নিস্তার পায়নি। ও, অমুক আমেরিকায় পালিয়ে গেছে? যাবেই তো! ও তমুকের ছেলে ঘুষ দিয়ে পাস করেছে? তাই বলি, ওরকম গবেট ছেলে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করল কি করে। তাই না কি, ওই মেয়েটার এই কাণ্ড! এই ধরনের ছোট-বড় আবর্জনার টুকরো ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে আমাদের জীবন-স্রোতে। আমরা সত্য মিথ্যা যাচাই করি না। আমাদের থিয়োরি হচ্ছে—যা রটে তার কিছু বটে। রটন্তী কালী পুজো পাঁজিতে একদিনই লেখা আছে। কিন্তু আমরা ও পুজো অহোরাত্র বারো মাস করছি। করছি এবং কালি ছেটাচ্ছি। সুতরাং কালী পুজোই বলতে পার একে। ওই কালীপুজোর সুযোগ আমি নিয়েছি। আমার মতো মাতাল, বদমাশ, চোর যে আমেরিকায় পালিয়ে শেষে আত্মরক্ষা করবে একথা বিশ্বাস করতে কারও বাধেনি।

পাইলট মুখার্জিও আমার সহায়তা করেছে। ও মোটেই পাইলট নয়, মুখার্জিও নয়। ওর উপাধি পতিতুণ্ডি। চমৎকার ছেলে। বিজ্ঞানের ছাত্র, ভালো বোমা বানাতে পারে। কিন্তু গানও গায় চমৎকার, ছবি আঁকে আরও চমৎকার। আমার মতো বাউণ্ডুলে নয়। সচ্চরিত্র, বিনয়ী, মিতভাষী, বিড়িটি পর্যন্ত খায় না, আমার এক বক্তৃতা শুনে ও আমার ভক্ত হয়ে পড়ল।

বক্তৃতাটা দিয়েছিলাম এক চায়ের দোকানে। সেই শতবার-মোছা-রেক্সিন্-ঢাকা টেবিলের সামনে বসে হঠাৎ কেমন যেন প্রেরণা এসে গেল এক অচেনা ভদ্রলোকের টিপ্পনি শুনে। অচেনা ভদ্রলোকটি ডিশে ঢেলে ঢেলে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে চা খাচ্ছিলেন আর তার ফাঁকে স্বদেশী আলোচনা করছিলেন পাশের আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমাদের ছেলেবেলায় স্বদেশী আলোচনায় মদ উদ্দীপ্ত হত, আশার আলো দেখতে পেতাম, বুকে প্রেরণা জাগত, বিশ্বাস করতাম সত্যেন্দ্রাথের সেই অমর ভবিষ্যদ্বাণী—বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়। এখন স্বদেশী আলোচনা মানে পাঁক-ঘাঁটা। আমাদের অযোগ্যতা, আমাদের স্বার্থপরতা, আমাদের পশুত্ব নিয়েই আলোচনা করেন সবাই! ওই ভদ্রলোকও তাই করছিলেন। আমিও আগে এরকম অনেক আলোচনা করেছি। সিগ্রেট টানতে টানতে, বা মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমিও অনেকবার বলেছি—"এ দেশে কিস্‌সু হবে না। আমরা এতদিন ইংরেজের ক্রীতদাস ছিলাম, এখন দুনিয়ার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি। দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। পাওনাদারেরা যখন হিসেবের খাতা নিয়ে দেনা উসুল করতে আসবে তখন আজকের নেতারা—যাঁরা নানাভাবে 'মজাসে' জীবনটাকে উপভোগ করছেন আর বক্তৃতার খই ফোটাচ্ছেন—তাঁরা হয়তো তখন থাকবেন না—কিন্তু ওই পাওনাদাররা আমাদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। দেশ এখন দু'ভাগ হয়েছে, তখন শত ভাগ হবে। কেউ নেবে হাত, কেউ নেবে পা, কেউ ধড়, কেউ মুণ্ড। মহাকাল শিব ভারত-সতীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নাচন নাচবেন তখন, আর তার পরে বিষ্ণুচক্রে সেই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। বিষ্ণুচক্র মানে পলিটিক্‌স্। ছিন্নভিন্ন সতীদেহ যেখানে যেখানে পড়েছিল সেগুলিকে পৌরাণিকেরা পীঠস্থান বলে চিহ্নিত করছেন, কিন্তু ভারত-মাতার খণ্ডিত-বিখণ্ডিত দেহ যেখানে যেখানে পড়বে তার নাম পীঠ হবে না। হবে Zone কিম্বা টেরিটারি। আত্মনিয়ন্ত্রণ হবে তাদের মন্ত্র। আর সে মন্ত্র পাঠ করাবে বিদেশী পুরোহিতেরা"— এ ধরনের নানাকথা আমিও নানা আসরে বড় গলা করে বলেছি। কিন্তু সেদিন একটা কথা শুনে আমার মগজে রক্ত চড়ে গেল। ভদ্রলোক বলছিলেন—"ওরা দেখবেন এবার আমাদের দিয়ে বাসন মাজাবে আর মা-বেটিদের বক্ষিতা রাখবে। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমরা যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলাম তার শেষ পরিণতি ওই হবে। আমরা বাসন মাজব। না, বড় চাকরি পাব না—ওদের ফ্যাকটারিতে বা আপিসে বড় চাকরিতে ওদের জাত-ভাইরা ঢুকবে, আমরা খালি তেল দেব আর বাসন মাজব। আর আমাদের মা-বোন-বউরা ওদের বাগানবাড়িতে গিয়ে টুইস্ট্ নাচ নেচে সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা দেখাবে। এই আমাদের পরিণাম—"

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"আপনি কি জ্যোতিষী? সমস্ত জাতের বিরুদ্ধে এতবড় একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেললেন! আপনি কি সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানেন নাকি?"

"সকলের জানবার দরকার নেই। অধিকাংশ লোকেরই জানি—যা গতিক দেখছি—"

"আপনি কিছুই জানেন না। একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যদি বেঁচে থাকে সে-ই দেশের সব আবর্জনা পুড়িয়ে দেবে। একটি স্পর্শমণি যদি কোথাও আত্মপ্রকাশ করে সে-ই সোনা করে দেবে সমস্ত লোহাকে, একটি খাঁটি প্রাণের উদ্বোধন-শঙ্খ জাগিয়ে দেবে সমস্ত জাতকে। সে স্ফুলিঙ্গ, সে স্পর্শমণি, সে শঙ্খ কোথাও না কোথাও আছে এই আমার বিশ্বাস! সমস্ত দেশ

যখন মাৎস্যন্যায়ের কবলে কবলিত, তখন দেখা দিয়েছিলেন গোপাল দেব, বৌদ্ধ অনাচারের পঙ্কে সমস্ত দেশ যখন হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন আবির্ভূত হয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর, মুসলমানী সভ্যতা যখন গ্রাস করছিল আমাদের, তখন এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য, ইংরেজদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাতেই গর্জে উঠেছিল বোমা-পিস্তল, বাংলাদেশের সুভাষ বোসই গড়েছিল আই-এন-এ। বাংলাদেশের বুকেই আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে—আপনি চিন্তিত হবেন না, ঠিক সময়ে সে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দশদিক সচকিত করে আত্মপ্রকাশ করবে।"

"আপনি বিশ্বাস করেন একথা?"

"নিশ্চয় করি। বাংলাদেশ যদি না বাঁচে ভারতবর্ষ বাঁচবে না। আর বাঙালীই বাঁচাবে বাংলাদেশকে। তাদের ন্যাকামি, পেজোমি, ভণ্ডামি, অশিক্ষা, তাদের আলস্য, ঔদাসীন্য, জড়তা ভেদ করে দেখা দেবেন সেই বিরাট পুরুষ যিনি বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী, যিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধক। যিনি অবিচলিতকণ্ঠে বলবেন—সত্য, শিব, সুন্দরের জন্য জীবন-মরণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হবে। চল, আমি তোমাদের পথ দেখাচ্ছি। আমরা তাঁর অনুসরণ করব। এ ঘটনা ঘটবেই, কিন্তু কবে তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না—"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক"—বলে ভদ্রলোক আড়ময়লা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যঙ্গ-ক্রূর হাসি ঝিকমিক করে উঠল।

যাবার মুখে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন—"আপনার নামটি জানতে পারি কি?"

"আমি অনামা। বিনামাও বলতে পারেন।"

"কি রকম? আপনার পিতৃদত্ত নাম আছে নিশ্চয় একটা"

"ছিল, এখন নেই। এখন আমার পিতা ভারতবর্ষ, মা বাংলাদেশ। তাঁরা কোনও নামের ছাপ মেরে দেননি আমার কপালে। যে ছাপটা বাবা দিয়েছিলেন সেটা মুছে ফেলেছি"

"মাই গড! আপনি তো মহাপুরুষ দেখছি—"

কাউণ্টারে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বুরুশ বিশ্বাসের সঙ্গে এর বেশী পরিচয় হয়নি সেদিন। পরে হয়েছিল। ওঁর নাম বীরেশ, কিন্তু সকলের মন থেকে ময়লা ঝেড়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি ওঁর প্রবল বলে ওঁর বন্ধুরা ওঁর নামকরণ করেছিল 'বুরুশ'।

বুরুশ বিশ্বাস চলে গেলেন। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম রেস্তোরাঁর কোণের দিকে এক ভদ্রলোক নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছেন। চোখাচোখি হতে এগিয়ে এলেন এবং কাছে এসে প্রণাম করলেন আমাকে পায়ের ধুলো নিয়ে। হকচকিয়ে গেলাম।

"কে আপনি! এত বড় একটা দুষ্কার্য করে ফেললেন কেন? আমি তো অস্পৃশ্য চণ্ডাল—"

সবিনয়ে তিনি উত্তর দিলেন—"আমার নাম জীবন পতিতুণ্ডি। আপনার কথা শুনে আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। ও ভদ্রলোক আপনার যে নাম দিলেন তাই আপনার ঠিক নাম। সত্যিই আপনি মহাপুরুষ!"

"আপনি কি করেন?"

ফুটপাতে ফুটপাতে হেঁটে বেড়াই। আর কিছু করবার সুযোগ পাইনি। আমার একটা বাসা আছে অবশ্য, নেবুতলায়, সেখানে একটা পঙ্গু বোনও আছে। সে-ই আমার একমাত্র অবলম্বন। তার জন্যেই কিছু রোজগার করে নিয়ে যাই রোজ—"

"কি করে রোজগার করেন"

"কুলিগিরি করে। আমাদের দুজনের তাতে চলে যায় কোনরকমে"

লেখাপড়া কতদূর করেছেন—"

"বেশীদূর করতে পারিনি। মাত্র এম. এস.-সি. পাস করেছি। অনেক কিছু করবার ইচ্ছা ছিল, পারিনি। সুযোগ পাইনি। ব্যাকিং না থাকলে সুযোগ পাওয়া যায় না এদেশে। ইচ্ছে ছিল পাইলট হব। পাইলট মুখার্জি আমার আদর্শ ছিলেন, কিন্তু হল না।"

"কোন্ পাইলট মুখার্জি—"

"সুব্রত মুখার্জি। তাঁর নাগাল পেলে হয়তো হয়ে যেত কিছু। কিন্তু হল না। তিনি জাপানে হঠাৎ মারা গেলেন—"

পতিতুণ্ডির স্বর কেঁপে উঠল। চোখের কোণে জল চকচক করতে লাগল। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। পতিতুণ্ডি বলল—"আমরা গরীব হয়ে জন্মেছি এইটেই আমাদের মস্ত অপরাধ। সারাজীবন সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে। কিন্তু আপনার কথা শুনে বুকে বল পেলাম। হঠাৎ মনে হল হয়তো চিরদিন এমন থাকবে না। আপনি কোথায় থাকেন?"

"কোথাও না। আমিও আপনার মত পথচারী। আপনার তবু একটা বাসা আছে, ঠিকানা আছে। আমার তা-ও নেই। আপনার বোন আছে, আমার কেউ নেই। আমি একেবারে বন্ধনহীন, অবলম্বনহীন। চলুন আপনার বাড়ি যাই—"

"আমার বাড়ি। সেখানে আপনাকে বসাব কোথা?"

"আমি দাঁড়িয়েই থাকব। ভালো ভালো চেয়ারে সোফায় বিছানায় অনেক বসেছি, এবার কিছুক্ষণ দাঁড়ানোই দরকার। চলুন।"

তখন আমি নিঃস্ব হইনি। পকেটে ছিল কিছু টাকা।

রাস্তায় বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার বোন রাঁধতে পারে?"

"পারে"

"কি কি খেতে ভালোবাসে সে"

"যা খেতে ভালবাসে তা তো তাকে খাওয়াতে পারি না। মাছ খুব ভালবাসে। কিন্তু সে জিনিস তো আমাদের নাগালের বাইরে"

"মাছ কোথায় পাওয়া যেতে পারে এখন?"

"খোলাবাজারে কোথাও পাওয়া যাবে না। বৈঠকখানা বাজারে বেশী দাম দিয়ে পেতে পারেন। অনেক বেশী দাম নেবে—"

"চলুন দেখা যাক—"

বৈঠকখানা বাজারে গিয়ে কুড়ি টাকার মাছ কিনে ফেললাম। দশ টাকা দিয়ে একটা ইলিশ। আর দশ টাকা দিয়ে কাটা এক কিলো পোনা। ভালো কাটারিভোগ চাল কিনলাম পাঁচ কিলো। দাম নিলে পনরো টাকা। মুগের ডাল কিনলাম। কড়া দামে। ভাল ঘি আর ভাল তেলও কিনলাম। স্বচ্ছ দিবালোকে সবার সামনেই কিনলাম কালোবাজার থেকে। দূরে একটা পুলিশও দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। এদেশে কালোবাজার রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে খোলে না। সদর রাস্তার ধারে দিবা দ্বিপ্রহরেই কালোবাজারে কেনাবেচা চলে পুলিশের চোখের সামনে। যে

দেশে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই চোর, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশই ঘুষখোর, সেখানে নিয়ন্ত্রণ কবা মানেই কালোবাজার সৃষ্টি করা। আমাদের সরকারই কালোবাজারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সৃষ্টি করেছেন বললেও খুব ভুল হয় না। কালোবাজারের বিরুদ্ধে কাগজেপত্রে যে আইন আছে সে আইন কালোবাজার বন্ধ করতে পারেনি, ঘুষখোর কর্মচাবীদের ব্যাংক ব্যালান্স বাড়িয়েছে খালি। এদের সঙ্গে মহামান্য মন্ত্রীদের যোগসাজশ আছে কি না তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাইনি তাই কিছু বলতে চাই না, কিন্তু সন্দেহ হয়। না, আর এ প্রসঙ্গ নয়। এ নিয়ে তোমরা অনেক মাতামাতি কবেছ, ডিমের মতো ফদফদ করে ফেনিয়ে ওমলেট বানিয়ে বানিয়ে রোজ খাচ্ছ, আমার পক্ষে কিছু বলা বাহুল্য হবে।

বাজাব করে অগ্রসর হলাম পতিতুণ্ডির বাড়ির দিকে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি চড়ে। পতিতুণ্ডির দিকে চেয়ে বললাম, ''আপনাকে আর 'আপনি' বলব না, 'তুমি' বলব। আশা করি আপত্তি নেই—''

''না, না, কিছুমাত্র না''

''তাহলে আসল কথাটা ভেঙে বলি শোন। আমি মোটেই মহাপুরুষ-টুরুষ নই, আমি অতি পাষণ্ড লোক। প্রায় সবরকম খারাপ কাজই করেছি জীবনে, কতকটা অভাবে পড়ে, কতকটা স্বভাবের দোষে। যে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা, সে শিক্ষা আমরা পাইনি। প্রায় হাজার বছর ধরে পাইনি। কাকাতুয়াব মতো পরের শেখানো বুলি কপচেছি কেবল, আর সেই কপচানোব কেরামতিব জন্যেই বাহবা পেয়েছি, মেডেল পেয়েছি, চাকরিও পেয়েছি বড বড়। হাজার বছরেব অশিক্ষা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের দেশে যুগে যুগে জ্ঞানী, ধার্মিক, কবি, ভাবুক, বিদ্রোহী জন্মেছেন, তাব কারণ ভারতবর্ষ দেবভূমি। এদেশের মাটি থেকে আপনিই মহিমাব বিকাশ হয়। কিন্তু রাজনীতির আবর্জনায়, স্বার্থপরতার জঞ্জালে, পাশবিকতার প্রকোপে মাঝে মাঝে সে মহিমা চাপা পড়ে যায়। জীবনে অনেক পাপ করেছি, এখন ইচ্ছে হয়েছে কিছু প্রায়শ্চিত্ত করব। এখন দেশের বড় দুর্দিন। চারিদিকে চেয়ে এখন আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি জানি ওই আবর্জনা স্তূপের তলায় মণি-মাণিক্য লুকিয়ে আছে। আবর্জনা সাফ করতে হবে, সেইটেই এখন একমাত্র কাজ। কিন্তু কি করে যে করব তা জানি না। তোমার সঙ্গে এই অকস্মাৎ যোগাযোগটা ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হচ্ছে। তুমি ফুটপাথে হেঁটে বেড়াও, তুমি দেশকে চেন। তোমার অভিজ্ঞতা হযতো কাজে লাগবে। আমাকে তুমি একটা মেকি সিংহাসনে বসিয়ে দূরে হাত জোড় করে দাঁড়িযে থেকো না; আমাকে পাজি জেনেই আপন লোক করে নাও।''

পতিতুণ্ডি চুপ করে বসে রইল কয়েক মিনিট মাথা হেঁট করে। তারপর চোখ তুলে বলল—''এসব শুনেও আপনাকে আমি মহাপুরুষ বলব। পথ চলতে গেলেই পায়ে ধুলোকাদা লাগে, যারা সেটাকে ধুলোকাদা বলে চিনতে পারে তারাই মহাপুরুষ। আপনার নামটা জানতে পারি কি?''

''আমি দাগী লোক, নাম কাউকে জানাব না। তুমি নূতন নামকরণ করে দাও আমার—''

পতিতুণ্ডি হেসে বললে, ''বেশ, মহাপুরুষ নামই থাক''

''আপত্তি নেই। আমি গোঁফদাড়িও রাখব ভেবেছি। মহাপুরুষ নামটার সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যাবে। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষেরই গোঁফদাড়ি ছিল এখনও আছে—''

পতিতুণ্ডি নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন খুঁজছিল। হঠাৎ সে বলল—"আমি যখন বঙ্গবাসী কলেজে পড়তাম, তখন ব্রজেন মুকুজ্যে বলে একজন ইংরিজির অধ্যাপক এসেছিলেন। চমৎকার পড়াতেন। প্রিন্সিপালের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে যান। তাঁর চেহারার সঙ্গে আপানার চেহারার অদ্ভুত মিল কিন্তু"

আমিও নির্নিমেষ হয়ে গেলাম। তারপর অকম্পিতকণ্ঠে বললাম—"ঠিক ধরেছ। আমিই সেই লোক। কিন্তু একথা কারও কাছে ঘুণাক্ষরে প্রকাশ কোরো না। যদি কব, সঙ্গে সঙ্গে আমি সরে পড়ব"

পতিতুণ্ডি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—"না, তা করব কেন। কিন্তু এমনভাবে আত্মগোপন করবার মানেটা কি—"

"মানে খুব সহজ এবং সরল। কোন রকম পালিশ না দিয়েই বলছি আইনের চক্ষে আমি চোর বলেই আমাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে, কিছুদিন আগে আমি একটা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম। কলেজফাণ্ড থেকে দশ হাজার টাকা সরিয়েছিলাম। তার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলাম একটা কন্যাদায়গ্রস্ত কেরানীকে। তিন হাজার টাকা দিয়েছিলাম গ্রামের একটি স্কুল ফাণ্ডে, হাজার খানেক গয়না কাপড় কিনে দিয়েছিলাম মধ্যবিত্তঘরের একটি মেয়েকে আর হাজারখানেক টাকা দিয়েছিলাম আমার এক ছাত্রকে। সে টাকার অভাবে জার্মানি যেতে পাচ্ছিল না। ভেবেছিলাম অন্য কোথাও থেকে ধার করে টাকাটা ফাণ্ডে জমা করে দেব, কিংবা আমার মাইনে থেকে ক্রমে ক্রমে শোধ করে দেব। কিন্তু সে সুযোগ পাওযা গেল না, অডিটার এসে পড়লেন। কাজে ইস্তফা দিয়ে সরে পড়তে হল। আমাদের কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য আমার পেছনে পুলিস লাগিয়েছেন। নীতি-প্রণোদিত হয়ে লাগাননি, লাগিয়েছেন প্রতিশোধ নেবার জন্য। কেন তিনি প্রতিশোধ নিতে চাইছেন তা পরে জানতে পারবে। কারণ সব কথা তোমাকে এখন খুলে বলবার আমার অধিকার নেই। একজন ভদ্রমহিলা জড়িত আছেন এর সঙ্গে। তিনি যদি আপত্তি না করেন তোমাকে তাও বলব। কিংবা হয়তো না বললেও তুমি জানতে পারবে। এসব জিনিস বেশীদিন লুকানো থাকে না। তা ছাড়া সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাকে যোগযোগ স্থাপন করতেই হবে। হয়তো তোমাকেই দূত করে পাঠাব তার কাছে। যদি পাঠাই, আপত্তি করবে কি?"

"না, এতে আর আপত্তি কি—"

পতিতুণ্ডির চোখমুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন একটা রোম্যাণ্টিক উপন্যাসের গহনে প্রবেশ করছে। বললাম "যদি যাও, ছদ্মনামে যেতে হবে কিন্তু। তোমার ঠিকানাও কাউকে দেবে না। পাইলট মুখার্জি নামই নাও না। আমি প্রচার করে দিয়েছি যে আমি আমেরিকায় চলে গিয়ে সেখানকার কোন ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করছি। তুমি এমন একটা ভাব করতে পার যেন তুমি উড়ে উড়ে নানাদেশে ঘুরে বেড়াও এবং মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়। এটা মন্দ হবে না কি বল—"।

পতিতুণ্ডি চুপ করে রইল।

তারপর যা বলল তাতে তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল।

বলল, "দেখুন, ছল-চাতুরি করতে পারিনি বলেই আমি কোনও চাকরি করতে পারিনি। কুলিগিরি করি কারণ ওতে মিথ্যাচার নেই। চায়ের দোকানে আপনার কথাগুলো শুনে খুব

ভালো লাগল। মনে হচ্ছে আমাদের বাঁচাবার জন্যে আপনার একটা আকুলতা আছে, হয়তো একটা প্ল্যানও আছে। তাতে যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি কৃতার্থ হয়ে যাব। কিন্তু ছদ্মনাম নিতে বলছেন কেন! স্বামীজির একটা কথা মনে পড়ল—চালাকির দ্বারা কোনও মহৎকর্ম হয় না। তাই—"

একটু ইতস্তত করে থেমে গেল সে।

বুঝলাম একটা লম্বা লেকচার দিতে হবে।

বললাম "স্বামীজি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তুমি ছদ্মনাম নেওয়াটাকে চালাকি বলছ কেন। তুমি তো ছদ্মনামে ছদ্মবেশেই আছ। তুমি কি জীবন পতিতুণ্ডি? তুমি কি সত্যিই কুলি? একটা বিশেষ পরিবেশে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যে তোমাকে ওই পরিচয় দিতে হচ্ছে সকলের কাছে। আমাদের সকলের আসল পরিচয়ের কথা অনেকদিন আগে আচার্য শঙ্কর বলে গেছেন—চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্। দেশের দুর্দশামোচনই আমি করতে চাই, কিন্তু কি ভাবে কি করব তা এখনও জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি। যা-ই করতে যাই টাকার দরকার। টাকা সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে লোকসমাজে যেতে হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন মতো কিছু 'মেকআপ'ও করতে হবে। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে ছদ্মবেশ ধারণ নিন্দনীয় নয়। রাবণ ছদ্মবেশ ধারণ করে যোগী সেজেছিল, আমরা তার নিন্দা করি কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল সীতাহরণ। কিন্তু ভগবান ব্রাহ্মণের বেশে যখন কর্ণের বাড়ি গিয়ে তার ছেলে বৃষকেতুর মাংস খেতে চাইলেন এবং কর্ণের আতিথেয়তা দেখে তাকে বর দিলেন, তখন আমরা সেটার নিন্দা করি না, খুশি হই। আমাদের দেশে টেরারিস্টরাও নানা রকম ছদ্মবেশ ধারণ করত। তা দেখে আমরা বরাবর বাহবা বাহবা করেছি। অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে স্বয়ং মহাদেব কিরাত বেশে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এতে কাব্যের ছন্দপতন হয়নি। ভাগবতী শক্তি মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য চণ্ডীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, এতে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়নি। ছদ্মবেশটাকেই বড় করে দেখো না, উদ্দেশ্যটাকেই বড় করে দেখ। আমি অবশ্য তোমার উপর জোর জবরদস্তি করব না। আমি সামান্য খড়কুটো, এখন তোমার ঘাটে লেগেছি। তুমি যদি আমাকে না চাও অন্যত্র ভেসে যাব। আমার স্বপ্নটা হয়তো সফল হবে না। না হোক। সব স্বপ্নই কি সফল হয়?

পতিতুণ্ডি চুপ করে রইল। সমস্ত রাস্তা আর একটি কথাও বলল না সে। পতিতুণ্ডিকে অবশ্য সব কথা বলিনি, সব কথা বলবার সাহস হয়নি। যতটা শুনলে আমার উপর তার ভক্তি হয় ততটা বলেছিলাম, সেটা মিথ্যেও নয়, যে কোনও লোকই সেটাকে যাচিয়ে নিতে পারে দশহাজার টাকার হিসেবটার মধ্যে কোনও গলদ নেই। কিন্তু তবু ওটা পুরো সত্য নয়—মানে whole truth—নয়। পতিতুণ্ডির কাছে বলতে পারিনি সবটা, তাকে তখনও ভাল করে চিনিনি। পাগলেরাই বা বোকারাই অচেনা লোকের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে দেখায়। কিন্তু তোমার কাছে কিচ্ছু গোপন করব না। তোমার মধ্যে যিনি আদর্শবাদী আছেন, তাঁর নাকটা হয়তো কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, কিন্তু আশা আছে তোমার মধ্যে যিনি কবি, যিনি সৌন্দর্যপিপাসু, যিনি মানুষের সব রকম দুর্বলতার খবর রাখেন, who understands all, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। ক্ষমা কথাটা লিখলুম বটে কিন্তু ঠিক ক্ষমা আমি চাই না, সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা বোধ হয় কেউ কাউকে করতেও পারে না, আমি চাই তুমি আমাকে বোঝ, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেও

না। একদিন তোমার ভালবাসা পেয়েছিলুম, সে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত কোরো না আমাকে। আমি সেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতীক, যাদের মধ্যে অনেকে আদর্শ কি তা জানে, কিন্তু ষড়রিপু বিধ্বস্ত বলে সে আদর্শের নাগাল পায় না, কিন্তু যেহেতু তাদের বুদ্ধির অভাব নেই, যেহেতু তারা নানাবিধ 'ইজম'এ পারঙ্গম, যেহেতু তারা ফক্কোড় ফাজিল আর সবজান্তা হবার মতো বিদ্যে স্কুল কলেজে আর তৃতীয় শ্রেণীর বই আর সাময়িক পত্র থেকে আহরণ করতে পেরেছে, সেই হেতু তারা ওই আদর্শের নাগাল না-পাওয়াটাকেই একটা বিশেষ বাহাদুরি বলে জাহির করে বেড়ায়, একটা ঝুটো লালসা-ক্লিন্ন পশু-মনোহারী রংচঙে আদর্শ খাড়া করে সেইটেই আস্ফালন করে যেখানে সেখানে। মনে হয় ওরা বুঝি ভারি আধুনিক! কিন্তু আসলে ওরা আদিম পশু। সেটা ওরা জানেও, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশত স্পষ্টভাবে সেটা স্বীকার করতে পারে না। নানারকম মিথ্যা মুখোশের আড়ালে আত্মগোপন করে মহৎ আদর্শকে ভ্যাংচায়। যারা অমহৎ, মহত্ত্বকে বিদ্রূপ করাই তাদের স্বভাব। যাদের ছেলেরা থার্ড ডিভিশনে পাস করে তাদের অনেককে বলে বেড়াতে শুনেছি, আরে মশাই, ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেই বা কি হাতি ঘোড়া হবে! থার্ড ডিভিশনই হোক বা ফার্স্ট ডিভিশনই হোক—অমুককে তেল না দিলে চাকরি জুটবে না। অমুকের ছেলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েও ভেরেণ্ডা ভেজে বেড়াচ্ছে। অথচ দেখুন অমুকের ছেলে, কি বা তার ইউনিভার্সিটি কেরিয়ার, কিন্তু যথাস্থানে তেল দিতে পেরেছে বলে সাঁ সাঁ করে উপরে উঠে যাচ্ছে। যাদের মেয়েরা বিপথে গেছে, মেয়েদের সতীত্ব-বেচা রোজগারে যাদের সংসার চলছে, তাদের অনেকের মুখেও শুনেছি—আরে মশাই সতীত্ব নিয়ে কি ধুয়ে খাব? সমাজের ব্যাপার তো জানেনই। মেয়েটাকে গরু বাছুরের মতো দেখে গেল দলে দলে লোক এসে, তাদের জলখাবার খাওয়াতে খাওয়াতে আর আপ্যায়ন করতে করতে নাভিশ্বাস উঠল, ঠিকুজি-কুষ্ঠি, গান-বাজনা নিয়ে কত রকম বায়নাক্কা, তারপর পণের ফর্দ। অনেকে আবার মুখে মহত্ত্ব আস্ফালন করেন কোন ডিমাণ্ড নেই, মনে মনে কিন্তু প্রত্যাশা করেন যথাসর্বস্ব তাঁর পায়ে উজাড় করে দেব। এ সত্ত্বেও মেয়ের বিয়ে দিলুম এক হাড়-জিরজিরে কেরানীর সঙ্গে, তার মাইনে দুশো, কিন্তু পরিবার বিরাট। বিয়ের পর আমার মেয়ে এক ফোঁটা দুধ খেতে পায়নি বা একটুকরো মাছ চোখে দেখেনি। পেয়েছিল শুধু এক দজ্জাল শাশুড়ীর কাছে গঞ্জনা আর এক হাড়হারামজাদা ভাজের কাছে নীচ ব্যবহার। আমার মেয়ের প্রতিভা ছিল, সে এখন সমাজকে কলা দেখিয়ে সিনেমায় নেমে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে। তার অভিনয় দেখে বাহবা বাহবা করছে দেশশুদ্ধ লোক। সতীত্ব নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? তার প্রকাণ্ড মোটরখানা দেখে তোমাদের হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে বলেই ও কথা বলছ, কিন্তু আমার ধর্ম-ধ্বজী প্রতিবেশী যার গলাটা সব চেয়ে বেশী জোরে শোনা গিয়েছিল, সে-ও নাকি তার মেয়েকে স্টুডিওতে স্টুডিওতে পাঠাচ্ছে, প্রডিউসার ডিরেকটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরনা দিচ্ছে। মেয়েরা রোজগার না করতে পারলে তাদের মুক্তি নেই। এই নারীমাংসলোলুপ সমাজের জন্যে কতদিন আর মাংস সরবরাহ করবে তারা। আমার মেজ মেয়েটা একজন ভদ্র মুসলমানকে বিয়ে করেছে। বিয়ে করে সুখে আছে। সেজ মেয়েটা রূপের ছিপ ফেলে একটা বড় রুইকে গেঁথেছে, দেখি টেনে তুলতে পারে কিনা। সমাজের যে অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে তাতে কোন রকমে বেঁচে থাকাটাই প্রধান কথা। সতীত্ব অসতীত্ব এখন অবান্তর। তেষ্টা

পেয়েছে জল চাই, গেলাসটা মাটির, তামার, রূপার না সোনার তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করব—জল চাই। এই ধরনের কথা প্রায়ই শুনি। ওদের যুক্তি যে অকাট্য তাও বুঝি, তবু কিন্তু ভাই মনের মধ্যে খচখচ করে। আমিও ওদেরই একজন, আমারও দেহ-মনে দুর্গন্ধ পাঁক, সে পাঁকের মহিমা কীর্তন করে আমি তাকে সুগন্ধ চন্দনের মর্যাদাও দিতে পারি,—তুমি তো জানই আমি বাক্যবীর—কিন্তু মনের ভিতর খচখচ করে। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে যেন বার বার বলে তুমি পশু, লোলুপ পশুত্বের গায়ে যতই রং চড়াও, তা কখনই মহৎ মনুষ্যত্বের মর্যাদা পাবে না। মহৎ মনুষ্যত্ব লাভ করাই তো জীবনের পুণ্য-পরিণাম। সেখানে পৌঁছতে না পাবলে তুমি সুখী হবে না। সেখানে তোমাকে পৌঁছতেই হবে। তার মানে, আমার বিবেকটা এখনও মরেনি। সে বিবেক অহরহ আমাকে তোমার দিকে টেনে নিয়ে আসছে চুলের মুঠি ধরে। বুঝতে পারছি তোমাব কাছে অন্তত সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। না বললে তোমাব কাছে আসা যাবে না। আব কাবো কাছে বলতে পারিনি সবটা। পতিতুণ্ডি খানিকটা জানে, বুরুশ বিশ্বাসও খানিকটা জানে। তোমাকে সব বলতে চাই। না বলতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। ক্রিশ্চানদের 'কনফেশন' বলে একটা ব্যাপার আছে, সেটা মনের এই অস্বস্তি দূর কববার জন্যেই। এটাও আমার কনফেশন। প্রথমে ওই দশ হাজার টাকাটাব কথাই বলি। দশ হাজাব টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা এক কন্যাদায়গ্রস্ত কেবানীকেই আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তাব আগে ওই কন্যাটিকে নষ্ট করেছিলাম আমি। তাব প্রবল যৌবনের উদ্দাম স্রোতে আমার মতো ঐরাবতও ভেসে গিয়েছিল। বিয়ে দিয়ে দিতে না পারলে মেয়েটা আমাব ঘাড়েই পড়ে যেত। আমার মহত্ত্বেব মূলে আছে আমাব কামুক প্রবৃত্তি। কিন্তু আমাব সবচেয়ে আশ্চর্য কি লেগেছিল জানো? মেয়েটা একটুও আপত্তি কবেনি। সে যেন একটা ছোট চাকরি ছেড়ে আর একটা বড় চাকবিতে চলে গেল। ভাড়াটে বাসা ছেড়ে যেন নিজের বাসায় গেল। তার মনের এই জলবৎ ব্যবহাব বিস্মিত করেছিল আমাকে। গেলাসে যখন ছিল, তখনও বেশ ছিল, গাড়ুতে যখন ঢুকতে হল তখন গাড়ুর আকারই ধারণ করল সে অনায়াসে। মেয়েটার বাপ সব জানত কিন্তু ভান করত যেন কিছু জানে না। হাবাগোবা অন্ধ বধির সেজে থাকত লোকটা। অনেক রাত করে বাড়ি ফিরত, সম্ভবত আমাকে সুযোগ দেবার জন্যেই। মেয়েটার মা ছিল না। থাকলে হয়তো তাব সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকত। সেকেলে মায়েরা এ বিষয়ে খুব সজাগ, খুব কড়া। এঁরা কিন্তু ক্রমশ অন্তর্ধান কবছেন। আদর্শ মা তৈরি করা আমার জীবনের একটা লক্ষ্য। কিন্তু সে কথা পরে বলছি। এইবার আমার দ্বিতীয় মহত্ত্বের কথা বলি, আজকালকার ভাষায় অবদান বললে হয়তো আরও লাগসই হবে। একটি ছেলেকে জার্মানি যাবার জন্যে আমি এক হাজার টাকা দিয়েছি তা ঠিক। কিন্তু সে ছেলেটি তার আগে ধারস্বরূপ আমাকে ওর চেয়ে অনেক বেশী টাকা দিয়েছিল। ভাল ছেলে, স্কলারশিপ পেয়েছিল। আমি তাকে বাড়িতে পড়াতাম, অবশ্য বিনা-মাইনেতে। সে জানত আমি মদ খাই, বে-হিসাবি খরচপত্র করি, কিন্তু তবু সে আমাকে ভক্তি করত। হ্যাঁ হে, ভক্তি করত, এই চরিত্রহীন মাতালটাকে। আমার মধ্যে সে কি দেখেছিল জানি না। না, কথাটা ঠিক বলা হল না! আমার মতো শয়তানের মধ্যে দেবতা প্রত্যক্ষ করবার চোখ কে তাকে দিয়েছিল জানি না। যখনই আমি অভাবে পড়তাম, তাকে বললেই সে টাকা এনে দিত। কোথা থেকে দিত জানি না। শুনেছিলাম—তার বাবাই

বলেছিল— ছেলেবেলা থেকে ও যত স্কলারশিপ পেয়েছিল তা নাকি তিনি ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিলেন—হয়তো সেই টাকা থেকেই এনে দিতে। ঠিক জানি না। হীরের টুকরো ছেলে। সে যখন জার্মানি যাবার সুযোগ পেল তখন দেখা গেল ওর হাতে টিকিট কেনবার টাকাও নেই। তার বাবা বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকাটা জোগাড় করবার চেষ্টায় ছিল। আমিই দিয়ে দিলুম টাকাটা। অপ্রত্যাশিতভাবে ওই দেওয়াটার মধ্যে যে নাটকীয়তাটা আছে সেটা উপভোগ করবার জন্যেই দিলুম সম্ভবত। স্কুল ফাণ্ডে তিন হাজার টাকা দেওয়ার মধ্যেও একটু নাটকীয়তা আছে। যে স্কুলে টাকা দিয়েছিলাম আমি ছিলাম তার ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য। চেয়ারম্যান ছিলেন অবশ্য একজন এস. ডি. ও.। ওই এক আপদ হয়েছে আজকাল। যাদের শিক্ষা বা সংস্কৃতির ভাণ্ডারে কিছুমাত্র দান বা কৃতিত্ব নেই, তাঁরা গভর্নমেণ্ট অফিসার বা মন্ত্রী হওয়ামাত্র রাতারাতি ভুঁইফোড় বাদুলে পোকার মতো ভিড় করেন এসে শিক্ষামন্দিরে বা সংস্কৃতির মণ্ডপে। শুধু ভীড় করেন নয়, জাঁকিয়ে বসেন এসে পুরোধার আসনে। Fools rush in where angels fear to tread! বোধ হয় ওদেরও দোষ নেই। আমাদের দেশের পা-চাটা খোশামুদের দলই ওদের খোশামুদ করে নিয়ে আসে। আমাদের ওই স্কুলটার বিল্ডিং মেরামত করবার জন্যে তিনহাজার টাকার দরকার ছিল। মীটিং হচ্ছিল সেদিন। এস. ডি. ও. চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ইনিয়ে-বিনিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন—গভর্নমেণ্টের পক্ষে এখন টাকা দেওয়া শক্ত। ইরিগেশন, সার প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা গভর্নমেণ্ট বরাদ্দ করেছেন কিনা—তাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুদিন ধরে ইরিগেশন আর সারের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও গভর্নমেণ্ট আমাদের দুবেলা অন্ন জোটাতে পারেননি এখনও! বলেন জনসংখ্যা খুব বেড়েছে না কি! স্ট্যাটিসটিকস দেখান। ওই আর একটা ভাঁওতা—কে যেন বলেছিলেন ওটা হচ্ছে ফোর্থ লাই (fourth lie)ঃ আমি কিন্তু এস. ডি. ও.-র কথা মনে দিয়ে শুনছিলাম না। আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম লোকটিকে। নাদুসনুদুস গোলগাল বেঁটেসেটে মানুষটি, খুব ফরসা, যেন একতাল মাখন। মাথায় বিরাট চকচকে টাক। আমি একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলাম মীটিংয়ের মাঝখানে। এস. ডি. ও.-র চেয়ারের পিছনে গিয়ে তাঁর টাকে ছোট্ট একটা চাঁটি মেরে বললুম—আশ্চর্য, টাকটি বাগিয়েছেন আপনি। ওর উপর বীজ বুনে দিলে কিছু ফসল নিশ্চয়ই ফলবে। নীচে ভাল সার নিশ্চয় আছে। ভদ্রলোকের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ তিনি সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। হই-হই করে উঠলেন সকলে। সকলের মুখেই এক কথা—হঠাৎ এ কি করে বসলেন আপনি। আমি হাতজোড় করে বললুম—সত্যি খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। কিন্তু ভারী লোভ হল। কিছুতেই সামলাতে পারলাম না নিজেকে। সকলে বললেন—ওঁকে চুমরে কিছু টাকা আদায় করব ভেবেছিলাম আমরা, এখন উনি কি যে কাণ্ড করবেন কে জানে। বললাম, বড় জোর আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন। আপনাদের ভয় কি। আপনারা তো কিছু করেননি! আর আপনাদের স্কুল-ফাণ্ডে আমিই তিনহাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এস. ডি. ও. ভদ্রলোকের কিন্তু কিঞ্চিৎ রসবোধ ছিল। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। আমাকে কেবল ছোট্ট একটা চিঠি লিখেছিলেন—"হিতৈষী হিসাবে আপনাকে অনুরোধ করছি কোন ডাক্তারের কাছে যান। পাগলা-গারদের বাইরে বেশী

দিন থাকা উচিত নয় আপনার!' এই তো আমার স্কুল-ফাণ্ডে তিন হাজার টাকা দেওয়ার সত্য ইতিহাস। আমরা, বাঙালীরা, নাটুকে জাত। নাটক করবার জন্যে আমরা সব করতে পারি। ক্ষুদিরাম—কানাইলাল—বাঘা যতীনরা যে উন্মাদনায় মেতে আত্মবিসর্জন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ছিল নিশ্চয় কিন্তু তার চেয়ে·বেশী ছিল ওর ড্রামাটিক অ্যাপীল (dramatic appeal)। চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস সম্বন্ধেও ওকথা মনে হয় আমার। ধনকুবের চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের মাটির উপর যখন নগ্নপদে একবস্ত্রে দাঁড়ালেন, সুভাষ বোস যখন হেভেনবর্ণ (Heaven born) আই. সি. এস. চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এমন কি তার আগেও যখন তিনি ভারত-বিদ্বেষী ওটেন সাহেবকে ঠ্যাঙালেন, যখন তিনি ইংরেজ-পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে জার্মানি জাপান ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে আই. এন. এ. সৈনবাহিনী গঠন করে ইম্‌ফলে এসে স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়ালেন।—তখন ওসবের নাটকীয়তাই উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাদের। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও যা dramatic তাই করেছিল প্রদীপ্ত আমাদের। তাঁর দাণ্ডি মার্চ, তাঁর চম্পারণ বিদ্রোহ, তাঁর ছোট ছোট শাণিত উক্তি, তাঁর নন-কো-অপারেশনের অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তাঁর খদ্দর আর চরকা বাঙালীর মনে সাড়া জাগায়নি, কারণ ওর মধ্যে নাটক নেই। আমি বাঙালী বলেই আমার মধ্যে ওই নাটক করবার প্রবৃত্তি খুব প্রবল। সেইজন্যে আমি বিপদেও পড়েছি বারবার। আমার বিশ্বাস বাঙালী জাতটাও বিপদে পড়েছে ওই জন্যে। নাটক ভালো মদের মতো, তার উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী। চরিত্র বা দেশ গঠন করবার জন্যে প্রতি পলে পলে যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দরকার এবং সে সাধনার মূলে যে ভিত্তিভূমির, যে একনিষ্ঠতার প্রয়োজন, নাটকের উন্মাদক উত্তেজনায় তার উপাদান নেই। বাঙালী ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতের এই একলক্ষ্যমুখী সাধনা আছে, সে সাধনাটা বৈষয়িক বলে বৈষয়িক ব্যাপারে তারা উন্নতিও করেছে খুব। বাংলা দেশের রাজধানী কলকাতায় আজ বাঙালীদের স্থান নেই, তা নিয়ে আমরা যে আন্দোলন করছি তাতেও ওই নাটকই আছে কেবল। তাই স্থায়ী কোনও ফল হচ্ছে না। যে ছেলে শিশির ভাদুড়ী বা অহীন চৌধুরীর নকল করে হাততালি পায়, সে সামান্য একটি মনিহারী দোকানও টিকিয়ে রাখতে পারে না। তার কথার ঠিক নেই, কাজের বাঁধন নেই, সে বড়জোর প্রসেশনের ভীড়ে উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহু তুলে গলাবাজি করতে পারে। কিন্তু ওসব করে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্থির-লক্ষ্য বণিকদের একচুলও সরানো যাবে না। কারণ ওদের টাকা আছে, আইনও ওদের অনুকূলে। বিরাট অগ্নিকাণ্ডে সব নিশ্চিহ্ন করে দিতে না পারলে ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। যে স্ফুলিঙ্গ সে রকম অগ্নিকাণ্ড করতে পারে, তার উপাদান অবশ্য বাঙালী চরিত্রে আছে। কারণ স্ফুলিঙ্গও একটা নাটক। হয়তো একাঙ্ক নাটক, কিন্তু তার শক্তি আছে বিরাট একটা বহ্ন্যুৎসব করবার।

অন্য কথায় এসে পড়েছি। দশ হাজার টাকার তৃতীয় হিসাবটা দিয়েছি। এবার চতুর্থটা শোন। মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়েকে সত্যই গয়না কাপড় কিনে দিয়েছিলাম। তুমি হয়তো হাসছ, ভাবছ আর একটা প্রেমের ব্যাপার শুরু হল বুঝি। মোটেই তা নয়। মেয়েটিকে আমি একবার মাত্র দেখেছি। একটা বড় দোকানে 'শো' কেসের ধারে ধারে সসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লোলুপ দৃষ্টিতে সেই সব জিনিসের দিকে তাকাচ্ছিল যা কেনবার কথা সে

ভাবতেও পারে না। আমি গিয়েছিলাম ক্ষুরের ব্লেড কিনতে। মেয়েটিকেই লক্ষ্য করছিলাম। তার সস্তা শাড়ি, তার ফাঁপানো ছোট্ট খোঁপায় সস্তা পিন্ এঁটে বিলাসিতার প্রয়াস, তার করুণ দৃষ্টি, তার সঙ্কুচিত লোলুপ হাব-ভাব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমার বারবার। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে পড়ে গেল যার প্রথম দুটো লাইন হচ্ছে 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।" চারিদিকে বিলাসের রঙীন উৎসবে সেজে কত ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি দলে দলে চলেছে নানাভাবে আস্ফালন করে—তাদের চোখমুখে চলনে বলনে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অহমিকা আর আত্মপ্রসাদ—তারা ওই লোভাতুরা মেয়েটির পানে ফিরেও দেখছে না একবার। আমি হয়তো চলে যেতাম। হঠাৎ সেলসম্যান জিগ্যেস করলে—"আপনার আর কিছু চাই কি? আপনার বডিসের কাপড় তো দিয়ে দিয়েছি। আরও কিছু নেবেন?"

দেখলাম মেয়েটির হাতে একটি কাগজের খাম রয়েছে।

"না, আর কিছু কিনব না। আচ্ছা, ওই দিকে ওই যে শাড়িটা টাঙানো রয়েছে, ওটা একটু দেখতে পারি কি, ওর দাম কত হবে—"

"ওটার দাম সাড়ে পাঁচ শো টাকা। নেবেন কি"

"ওর জরিটা কেমন একটু দেখতুম—"

সেলস্ম্যান এব উত্তরে যা বললে তা হয়তো সঙ্গত, কিন্তু আমার কানে যেন খট্ করে লাগল কথাটা। মনে হল লোকটা অসভ্য। তার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাবও ফুটে উঠেছে দেখলাম।

সে বললে—"আপনি নেবেন কি? তাহলে নামাই—"

"না, আমি এখন নেব না। কি শাড়ি ওটা, ভারি চমৎকার"

"কাশ্মীরী শালের শাড়ি। দুখানা এসেছিল, একখানা একজন আমেরিকান টুরিস্ট কিনে নিয়ে গেছে—"

"ও। না, আমি এখন কিনব না। শুধু দেখতুম একবার কেমন জিনিসটা।"

"যখন কিনবেন তখন দেখাব ভাল করে। তবে কিনতে যদি চান তাড়াতাড়ি আসবেন। ও জিনিস পড়ে থাকবে না। বিড়লার বাড়ির একটি মেয়ে দেখে গেছে। সে বোধ হয় বিকেলেই আসবে।"

আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল মেয়েটি।

এগিয়ে গেলুম আমি। পকেটে টাকা ছিল।

বললাম, "শাড়িটা নাবিয়ে ওকে দেখান। ওর যদি পছন্দ হয় এখুনি কিনে নেব"

মেয়েটি অবাক হয়ে চাইল আমার মুখের দিকে।

আমি সপ্রতিভভাবে হেসে বললাম—"আমি সম্পর্কে তোমার কাকা হই। এতদিন আমেরিকায় ছিলুম। পরশু ফিরেছি। শাড়িটা যদি তোমার পছন্দ হয় কিনে নাও। আমার কাছে টাকা আছে—"

মেয়েটি তবু মনস্থির করতে পারছিল না।

"আপনাকে আমি চিনতে পারছি না কিন্তু"

"আমি যখন আমেরিকায় যাই তখন তুমি খুব ছোট ছিলে। তাই মনে নেই। তোমার বাবার নাম তো—"

"পৃথ্বীশ সরকার"

মেয়েটিই যুগিয়ে দিলে উত্তরটা।

"পৃথ্বীশ আমার সহপাঠী ছিল—"

"তাই না কি— "

"হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি যাব একদিন। সেই বাড়িতেই আছ তো এখনও?"

"হ্যাঁ, নিউগি পুকুর লেন—"

"যাব একদিন—"

সেলস্‌ম্যান ততক্ষণ শাড়িটা বার করেছিল। ঝুঁকে পড়ল মেয়েটি তার উপর। শুধু শাড়ি নয়, তার সঙ্গে ম্যাচ করে ভালো জুতো আর দুলও কিনে দিলাম তাকে। একটি ভ্যানিটি ব্যাগও। হাজার টাকাই খরচ হয়ে গেল। জীবনে ওই একটি পুণ্যকর্ম করেছি যা নির্মল, যার আনন্দ আমার মনকে এখনও পবিত্র করে রেখেছে। লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, এর অন্তরালেও ছিল আমার নাটক করার প্রবৃত্তি। আর ওইটেই হল আমাদের জাতীয় প্রবৃত্তি। আমি যদি কুল ক্যালকুলেটিং (cool calculating) বণিক হতাম তাহলে একাজ করতে পারতাম না। আমাদের দেশের অধিকাংশ বড়লোকরাই একাজ করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী মনে আছে? তাঁর সমস্ত জীবনটাই তো নাটকের সিরিজ। তাঁর বড়লাটের নাকের সামনে চটি-সুদ্ধ পা তুলে দেওয়া, তাঁর এককথায় অত বড় চাকরির মুখে লাথি মেরে চলে আসা, তাঁর মহাসমারোহে বাজনা বাজিয়ে প্রীতি-উপহার ছাপিয়ে বিধবা-বিবাহ দেওয়া, নিজের টাকায় পঞ্চাশটি বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচ চালানো, পাত্রে-অপাত্রে তাঁর অজস্র দান, তাঁর তীক্ষ্ণ রসিকতা, তাঁর একমাত্র ছেলেকে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া, ভার্সাই শহরে মাইকেল মধুসূদনকে তাঁর টাকা পাঠানো, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতরণ—সবই তো নাটক। রসিকরা উপভোগ করলেও দেশের লোক তাঁর এ সব নাটক তেমন উপভোগ করেনি। কারণ তাঁর অধিকাংশ নাটকই ছিল হয় চাবুক, না হয় কোদাল। অসাড় সমাজের পিঠে সপাসপ চাবুক লাগিয়েছেন তিনি। যাদের পিঠে চাবুক পড়েছে তারা তাঁকে ঘিরে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, এটা আমাদের দেশে আশা করা যায় না। যে সব আবর্জনা সমাজের বুকে অলঙ্কার হয়ে ছিল তা-ও তিনি নির্মম হস্তে পরিষ্কার করেছেন কোদাল দিয়ে। বুঝিয়ে দিয়েছেন এসব অলঙ্কার নয়—পাঁক। আবর্জনারা কোদালের জয়-গান করেছে, এ কথা কোথাও শোনা যায়নি। আমাদের দেশের লোক বিদ্যাসাগর মশায়ের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, শেষ জীবনে তিনি পালিয়ে এসে বাস করেছিলেন কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের মধ্যে। তিনি দেশের জন্যে এত করেছিলেন, তবু দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বলেই এ দেশের দাসমনোভাবাপন্ন জনসাধারণের কাছে কিছু খাতির হয়েছিল তাঁর, দেশের হুজুকে লোকেরা —যারা রবীন্দ্র-সাহিত্য ভাল করে পড়েও দেখে নি কখনও—তারা মালাচন্দন নিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে ভীড় করেছিল। কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সাহিত্যসাধনার সঙ্গে কটা

লোক পরিচিত? রেডিও গ্রামোফোনের কৃপায় তাঁর দু'চারটে গান তারা শুনেছে, দু'পাঁচটা বিখ্যাত কবিতার নামও হয়তো জানে। অধিকাংশ লোকই পরের মুখে ঝাল খায়। বাস্ ওই পর্যন্ত। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে কেউ অধ্যয়ন করে নি। করলে দেখতে পেত তিনি শুধু সাহিত্য-সাধনাই করেন নি, নানাভাবে সমাজসংস্কার করবার চেষ্টাও করেছেন, আমাদের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে কি করে আমরা উন্নতি করতে পারি, সে সম্বন্ধে নানারকম চিন্তা করছেন তিনি। তাঁর সে-সব প্রবন্ধ কেউ পড়ে নি। এর মধ্যেই তা গবেষকদের গবেষণার বিষয় হয়ে পড়েছে। তিনি কল্পনা-বিলাসই করেন নি শুধু। তিনি শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন গড়েছেন, ঘরে বসে বাংলাভাষার মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে সুশিক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন, তিনিই প্রথম এদেশে গ্রামের লোকেদের জন্যে ব্যাঙ্ক খোলেন, —যদিও সে ব্যাঙ্ক অসাধুতার চোরাবালিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এখন। সারা জীবনই দেশের মঙ্গলচিন্তা করেছেন, অনেক প্রবন্ধ, অনেক বক্তৃতা, অনেক কবিতা, অনেক গানে তার প্রমাণ সমুজ্জ্বল। কিন্তু তবু দেশ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরে আছে। আমরা আগে ইংরেজের পদলেহী ছিলাম, এখন দেশী হাইকমাণ্ডের পদলেহী হয়েছি। আমাদের লেহন-প্রবৃত্তি কিছুমাত্র কমে নি। এই পদলেহনের চমৎকার একটা গালভরা অজুহাতও পেয়েছি আমরা—সর্ব-ভারতীয়ত্ব। আমাদের আপন মা-বাবা-ভাই-বোন-প্রতিবেশীদের কথা বললেই সমুদায় সর্বভারতীয় উচ্চসঙ্গীত নাকি বেসুরো হয়ে যায়। আমাদের দেশে এসে আমাদের যারা লুটেপুটে খাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার জো নেই—বললেই সর্বভারতীয় সুরে ছন্দপতন ঘটবে। আমাদের এখন যা কিছু করতে হবে তা সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া চাই। অথচ ওই সর্বভারতীয় নেতারাই নিজেদের স্বার্থের জন্য আমাদের দেশকে দু'টুকরো করে তার একটা টুকরো তুলে দিয়েছেন মুসলমানদের বেনামীতে সেই পিশাচ ইংরেজদের হাতেই যারা শাসক হিসাবে এতকাল আমাদের পিষেছে তাদের লোহার নাল-বাঁধানো বুটের তলায়। পাকিস্তান যে আজ ইংরেজদের লীলাভূমি, পাকিস্তান যে তাদের পাদপীঠ, তাদের ষড়যন্ত্রই যে আজ সেখানকার রাজনীতি, একথা কে না জানে। অথচ টুঁ শব্দ করবার যো নেই, কেবল মিষ্টি মিষ্টি অংহিসার বুলি আওড়াতে হবে, তা না হলেই সর্বভারতীয় মহিমা ম্লান হয়ে যাবে। পাকিস্তানের হিন্দু রেফিউজিদের দলে দলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আন্দামানে, মধ্যপ্রদেশে, উড়িষ্যায়, বিহারে। বাঙালীদের স্থান বাংলাদেশে তাঁরা করে দিতে পারলেন না। অথচ বাংলাদেশে হাজার হাজার বিঘে জমি নাকি পড়ে আছে যেখানে তাদের স্থান সঙ্কুলান হতে পারত—একথা বলেছেন মাননীয় সতীশ দাশগুপ্ত স্বয়ং। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনে নি, কারণ তিনি আধুনিক মাপকাঠিতে আর সর্বভারতীয় নেতা নন। আমি যদি বলি বাঙালীদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সর্বভারতীয় মনোভাব ঈর্ষাক্লিষ্ট তাই তাঁরা সেটা নষ্ট করতে চান, আমি যদি বলি পূর্ববঙ্গের সব বাঙালীদের বাংলাদেশে বসবাস করালে পাছে ওই রেফিউজিরা বিরুদ্ধপক্ষের ভোটের পাল্লা ভারী করে দেয়—দেবার খুবই সম্ভাবনা, কারণ সর্বভারতীয় নেতাদের গদিতে বসবার অশোভন লালসার জন্যই তাদের ঘরবাড়ি পুড়েছে, মা-বোন ধর্ষিতা হয়েছে। দলে দলে স্বদেশ ছেড়ে dumb driven cattle-এর মতো অনেক দুঃখকষ্ট মাথায় নিয়ে তারা অজানা অচেনা দেশের

দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে, তাদের গরু-বাছুর বাক্স বিছানার মতো যে-কোনও খোঁয়াড়ে যে-কোনও গুদোমে পুরে দেওয়ার জন্যে সর্বভারতীয় নেতারা মহত্ত্ব আস্ফালনে ব্যস্ত। তারা যে তাদের পক্ষে ভোট দেবে সত্যিই তো তার নিশ্চয়তা নেই—আমি যদি বলি এই কারণেই বাংলার বাইরে—ভারতবর্ষের অরণ্যে, দ্বীপে, পর্বতে, মরুভূমিতে যেখানে হোক তাদের ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা বিহারী, উড়িয়া, রাজস্থানী, মধ্যপ্রদেশবাসী হোক—হিন্দী শিখুক, তাদের বাঙালীত্ব লোপ পাক, যাতে তারা বাঙালী হিসেবে আর যেন কখনও মাথা তুলতে না পারে। এসব বললেই সর্বভারতীয় মনোভাবের পান থেকে চুন খসে যায়।—আর আমরা সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিক বলে গণ্য হই। বাঙালী নেতারাই বা কি করেছেন ওদের জন্যে? তাঁরা তো জো-হুকুমের দল! অন্য প্রদেশবাসীরা কি খুব উদার, খুব মহৎ, ন্যায়ের নিক্তি হাতে নিয়ে চুলচেরা বিচার করে সর্বদা সব কাজ করে যাচ্ছেন? বাংলাভাষার জন্য শিলচরে গুলি চলল, বাংলাদেশের স্টেশনে এখনও হিন্দীতে নাম লেখা থাকে, বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য প্রশ্নপত্র হিন্দী ভাষায় ছাপা হয়। হিন্দী না জানলে কোথাও তার চাকরি জোটে না। কেন এসব জবরদস্তি? হিন্দীই বা রাষ্ট্রভাষা হবে কেন? কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করা যাবে না, করলেই বলবে তুমি সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিক। আইন বানিয়ে যদি খোলা বাজার থেকে চাল, গম, মাছ, সন্দেশ, সোনা কেনা বন্ধ করা যায়, আইন বানিয়ে বাংলাদেশের কালোবাজারীদের জমিকেনাও বন্ধ করা যাবে না কেন? বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতা শহরে বাঙালীদের সব জমি তো অবাঙালীরা কিনে নিলে। আইন বানিয়ে কি এটা বন্ধ করা যায় না? সর্বভারতীয় মনোভাব তো হরদম আইন ভাঙছে গড়ছে? অবাঙালীদের বড় বড় কারখানা, বড় বড় অফিস কলকাতায়। অথচ বাঙালী ছেলেমেয়েরা নাকি সেখানে চাকরি পায় না। যোগ্যতা থাকলে কেন পাবে না? বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, মাদ্রাজে কি বাঙালীদের স্থান আছে? সেখানেও নেই। বাঙালীর ছেলেরা—যাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতাযজ্ঞের হোতা, যারা আধুনিক ভারতের জন্মদাতা, যাদের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতার জন্যে দলে দলে প্রাণবিসর্জন করেছে—তারা না খেতে পেয়ে মরুক এইটেই কি সর্বভারতীয় মনোভাব? তা যদি হয় তাহলে ও মনোভাব যত শীঘ্র বদলায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। তার জন্যে যদি আরও কিছু রক্তপাত প্রয়োজন হয় তা করতে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা পশ্চাৎপদ হবে না। যে স্বাধীনতায় আমাদের বাংলাভাষায় শিক্ষালাভ করবার বিরুদ্ধে এতরকম ষড়যন্ত্র, যেখানে সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র হিন্দীর লেজুড় জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যে স্বাধীনতা আমাদের খেতে পরতে দিতে পারে না, যে স্বাধীনতায় সর্বভারতীয় মুখোশের আড়ালে খোশামুদেদের গদগদ মুখচ্ছবি, স্বার্থপরদের লুব্ধ দৃষ্টি আর কালোবাজারীদের লালায়িত জিহ্বা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, সে মেকি স্বাধীনতা নিয়ে আমরা কি করব? স্বাধীনতা তো গুটিকয়েক মতলব-বাজ স্বার্থপর লোকের খাস তালুক হয়ে দাঁড়িয়েছে—protected preserve—সেখানে সর্বভারতীয়ত্বের দোহাই দিয়ে তারা আত্মপোষণ আত্মতোষণ করে যাচ্ছে খালি। টাকার আর ঘুষের জাল ফেলে ওরা রাশি রাশি ভোট ছেঁকে তুলবে, আর democracyর নামে dictatorship চালাবে। এ ভণ্ডামি বাংলাদেশ কতকাল সহ্য করবে আর? শাসন বিভাগের সব জায়গায় তো পচ্ ধরেছে—ডাক্তারি ভাষায় যার নাম 'গ্যাংগ্রিন্'—আর যার চিকিৎসা অস্ত্রোপচার করে পচা

জায়গাটা কেটে বাদ দেওয়া। ছুরি নিয়ে কবে এগিয়ে আসবে সেই মহৎ ডাক্তার। আমি জানি. সে আসবেই। কিছু দেরি হবে কারণ বাংলাদেশের মধ্যেই অনেক মীরজাফর, উমিচাঁদ গিজগিজ করছে এখনও। তাদের আগে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কিন্তু ওই দেখ, কথায় কথায় আবার সেই কুম্ভীপাকে নেবে পড়েছি, ওর ঘূর্ণাবর্তে একবার নেবে পড়লে আর রক্ষে নেই। গল্পটার খেই হারিয়ে গেছে।

ছ্যাকড়া গাড়ি অবশেষে পতিতুণ্ডির বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। গলির গলি তস্য গলিতে একটা ভাঙা-চোরা একতলা বাড়ি, একটা নোংরা বস্তির মধ্যে।

পতিতুণ্ডি নেবে হাঁকাহাঁকি করতে লাগল—"ক্ষেন্তি, ক্ষেন্তি, কপাট খোল—"

খট্ করে খিল খুলে যেতেই জীর্ণ কপাটের একটা পাল্লা খুলে পড়ল।

"কবজাটা আজও লাগিয়ে দিয়ে যায় নি? বলেছিল আজ আসবে—"

"নগদ পয়সা না পেলে আসবে না।"

এই বলে ক্ষেন্তি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। তাকে দেখে চমকে গেলাম আমি। মেয়েটি খোঁড়া। নেংচে নেংচে চলে। যখনই ন্যাংচায়, মনে হয় একটা সাপ বুঝি ছোবল মারবার জন্যে ফণা উদ্যত করছে। ফরসা রং। মুখটা এককালে হয়তো সুন্দর ছিল। কিন্তু গালের উপর প্রকাণ্ড একটা লাল কাটা দাগ! স্কার টিসু (Scar tissue) ডান চোখের নীচে থেকে ডান দিকের ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ডান চোখটাও একটু যেন বেশী বড়। মনে হল যেন বিস্ময়-বিস্ফারিত।

"ইনি আজ আমাদের এখানে খাবেন। বাজার করে এনেছেন। তোকে রেঁধে খাওয়াতে হবে—"

ক্ষেন্তি ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ভিতরে ঢুকে গেল।

তারপর ফিরে এসে বললে—"কিন্তু কাঠ, কয়লা কিচ্ছু নেই। তোমার জন্যে আজ ছাতু মুড়ি আর শসা রেখেছি একটা—"

আমি তখন বললাম—"কতদূরে কয়লার দোকান?"

"কাছে—এই মোড়েই!"

"এখনি এনে দিচ্ছি—"

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম এবং একটু পরে একমণ কয়লা নিয়ে ফিরলাম। ইত্যবসরে পতিতুণ্ডি ক্ষেন্তির কাছে আমার কি পরিচয় দিয়েছিল জানি না। কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম ক্ষেন্তি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরে ঢুকল একবার। তারপর একটা ভাঙা মোড়া আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—"বসুন"। বসলাম। তারপর সে উনুন-ধরানো একটা ভাঙা পাখা নিয়ে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল। মানা করলাম, শুনলে না কিছুতে।

"উনুনে আঁচ দিয়ে দিয়েছি। উনুনটা ধরুক। ততক্ষণ আপনাকে বাতাস করি—"

আমার মতো পাষণ্ডও কেমন যেন দ্রবীভূত হয়ে পড়ল। মনে হল আমাদের দেশ এখনও তার সমস্ত সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে আছে এই গরীব নিম্নমধ্যবিত্তদের ঘরে। এদের বাঁচাতে পারলেই দেশ বাঁচবে। আমার মতো অজ্ঞাতকুলশীল লোককে অভ্যর্থনা করার জন্য কি

আগ্রহ, কি উৎসাহ ওদের। তথাকথিত বড়লোকদের বাড়িতেও আতিথ্য গ্রহণ করেছি অনেকবার। তাদের মধ্যে এ আন্তরিকতার স্পর্শ পাই নি। তারা মুখে ভদ্রতা করে, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি তাদের ভাব-ভঙ্গী অন্য কথা বলে। দামী দামী বাসনে উৎকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করে তারা তাদের ঐশ্বর্য আস্ফালন করতে কসুর করে না, কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি নীরব ভাষায় যেন বলতে থাকে—তুমি একটা আপদ। আর কতক্ষণ জ্বালাবে আমাদের। অবশ্য এ ভাষা শোনবার কান সকলের থাকে না, কিন্তু আমার মনের ভঙ্গীটা বক্র বলেই হয়তো আমার কান একটু বেশী তীক্ষ্ণ—তাই আমি ওসব শুনতে পাই। মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তাররা একে হয়তো বলবেন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স্ (Inferiority complex)—কিন্তু তাই শুনতে পাই, পাই না বললে মিথ্যা কথা বলা হবে।

আমাকে বসিয়ে পতিতুণ্ডি ছাতু মুড়ি আর শসা নিয়ে রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে বাধা দিলুম। "আজ আর বেরিও না। আজ তো খাওয়ার জোগাড় হয়েই গেছে। তাছাড়া আমার মতো একটা লোককে তুমি আজ রোজগার করে ফেলেছ। আমি অবশ্য একটা অপদার্থ বাজে লোক, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার কেনা কাজে লাগাতে। আজ আর বেরিও না। আজ এসো বসে একটু গল্পসল্প করা যাক। তোমাদের পরিচয় নিই"

বসবার জায়গা কিন্তু তেমন ছিল না। এক ফালি বারান্দা আর দুটি শোবার ঘর। একটি পতিতুণ্ডির আর একটি ক্ষেন্তির। এ দুটি ঘরের সংলগ্ন আর একটি টিনের ঘরও ছিল। সেখানে গেলাম। দেখলাম সেটি ওদের পুরনো জিনিস-পত্রে ভরতি। মেঝেতে সঙ্কীর্ণ একটু স্থান আছে। এককোণে একটা তুলো-বার-করা ফাটা গদি ছিল (পতিতুণ্ডিরা এককালে হয়তো গদিতে শুত)—সেই গদিটা আমি টেনে বার করে মেঝেতে বিছিয়ে ফেললুম। আর একটা ভাঙা ক্যাশবাক্স তার শিয়রের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে করে ফেললুম মাথার বালিশ।

বললাম—"এইটেই হল আমার শয্যা, এইখানেই থাকব। বস"

পতিতুণ্ডি সসঙ্কোচে বসল একধারে। তারপর বলল—"আপনি আমার ঘরটাতেও থাকতে পারেন। একটা দড়ির খাটিয়া আছে। আমি মেজেতেই শোব"

"চল, তাহলে তোমার ঘরটাও দেখে আসি"

দেখলাম ঘরটার দেওয়ালের চারদিকে সস্তা সেলফ্—আর তাতে অনেক বই। বিজ্ঞানের বই, সাহিত্যের বই, ইকনমিক্সের বই; আর কয়েকটা ফোটো আছে। দুটো ফোটো পতিতুণ্ডির, ইউনিভার্সিটি গাউন পরা। রোদে-পোড়া পতিতুণ্ডির নয়, প্রতিভাদীপ্ত যুবক পতিতুণ্ডির।

"কনভোকেশনের সময় তোলা বুঝি?"

সলজ্জ হাসি হেসে পতিতুণ্ডি বললে—"হ্যাঁ"

"দুটো ফোটো কেন"

আরও লজ্জিত হয়ে পড়ল পতিতুণ্ডি।

"একটা কেমিস্ট্রির, আর একটা ফিজিক্সের—"

"দুটোতেই তুমি এম. এস. সি.?"

হাসিমুখে চুপ করে রইল পতিতুণ্ডি।

আর একটা ফোটো দেখলাম, তার বাবার। বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মনে হল যেন অগ্নিগর্ভ পর্বত।

পতিতুণ্ডি বললে—"অসহযোগ আন্দোলনে পুলিশের লাঠির ঘায়ে বাবা মারা গিয়েছিলেন। মায়ের জেল হয়েছিল"

মায়ের ছবিও দেখলাম পাশেই রয়েছে। তেজোদীপ্ত মাতৃমূর্তি। আর একটা ছবিও দেখলাম। আশাভরা দৃষ্টি তুলে হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে রূপসী কিশোরী একটি।

"এ কার ছবি"

"ক্ষেন্তির"

"ক্ষেন্তির? কিন্তু এখন ওর এ চেহারা তো নেই"

"না। পূর্ববঙ্গে আমাদের বাড়ি ছিল। রায়টের সময় মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে পড়ে গিয়েছিল ও। একটা রাম দা নিয়ে ও তাদের সঙ্গে লড়েছিল। তারাও ছাড়েনি। সেই সংগ্রামের চিহ্ন এখন ওর সর্বাঙ্গে। অজ্ঞান অবস্থায় ওকে কাঁধে করে নিয়ে জঙ্গলের ভিতর পালিয়েছিলাম আমি। ক্রমাগত রক্ত পড়ছিল। ভেবেছিলাম মরে যাবে। কিন্তু মরেনি। নিরাপদ হিন্দুস্থানে যখন পৌঁছলাম তখন ওর গায়ের গয়না বেচে ওর চিকিৎসা করিয়েছিলাম। বিনা পয়সায় সুচিকিৎসা করবার মহত্ত্ব কেউ দেখায়নি। হাঁটুতে খুব বেশী লেগেছিল, তাই ন্যাংচাতে হচ্ছে ওকে। আমরা যে কি অকথ্য কষ্ট সহ্য করেছি তার জীবন্ত প্রমাণ ওই ক্ষেন্তি। আমরা দেশের জন্য গৃহহারা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ঢাকার অনেকেই তাই হয়েছে। ঢাকা থেকেই পাস করেছিলাম। কিন্তু তেল দিতে পারি না বলে একটা চাকরি জোটে নি!—অথচ যাঁরা দেশের জন্য কিছুই ত্যাগ স্বীকার করেননি তাঁরাই আজ লাট-বেলাট! ভি. আই. পি. হিসেবে আজ যাদের নাম খবরের কাগজওয়ালারা ছাপতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাদের নাম পর্যন্ত শোনা যায়নি। শুনতে পাই অনেকে নাকি জেল খেটেছে! আমাদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তার তুলনায় প্রথম শ্রেণীর বন্দী হয়ে জেলখাটা স্বর্গ-বাসের তুল্য। তবে ওসবের জন্য আমার ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। খানিকটা স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তাকে ভাল করে, আমরাই আবার দেশের মঙ্গলের কাজে তৈরি করে নেব। আমাদের কষ্টের জন্যে আমরাই দায়ী। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—এ আমার এ তোমার পাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। করছিও—"

যাকে মুখচোরা মনে করেছিলাম সে যে এতবড় বক্তৃতা দিয়ে ফেলবে তা প্রত্যাশা করি নি। দেখলাম তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট কাঁপছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত।

বললাম, "প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ স্খালন হয় শুনেছি। কিন্তু ভাঙা রাস্তা মেরামত করবার সময় পাথরের টুকরোর বদলে হীরের টুকরো দিলে কি সেটা সুবুদ্ধির পরিচয় হবে? কেমিস্ট্রি ফিজিক্সে কৃতবিদ্য লোক কুলির কাজ করছে, এটা কি দেশের পক্ষে মস্ত বড় ক্ষতি নয়?

"আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমাদের দেশে বিজ্ঞানীদের চাকরি করতে হয়, তারা পরীক্ষা পাস করাবার জন্য কতগুলো বাঁধা গৎ ছেলেমেয়েদের মুখস্থ করায়। অর্থাৎ তারাও প্রায় কেরানী। বিজ্ঞানের যেটা আসল অর্থ বিশেষরূপে জ্ঞান-লাভ করা, তার সুযোগ বড় একটা কেউ পায় না। যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরাও অপরের তাঁবেদারি করেন। সুযোগ পেলে আমিও হয়তো তাই করতাম। তবু এখন আমি যা করছি তাতেও কিছু কাজ হচ্ছে"

"কি রকম—"

"এখন যারা আমার সহকর্মী তারা কুলি-মজুর ফেরিওলা জাতীয় লোক। তারা নিরক্ষর। কিন্তু তা বলে তাদের বুদ্ধি কম নয়। আমি তাদের নিয়ে একটা আখড়া করেছি। সন্ধ্যের পর সেখানে আমরা জুটি। বস্তির ভিতর একটা বারোয়ারি উঠোন আছে। সেখানে বিড়ি, তামাক, পান এমন কি গাঁজা পর্যন্ত চলে। তাড়িও খেয়ে আসে দু'একজন। আমি কিছু খাই না বলে আমাকে খুব সমীহ্ করে ওরা। আমি ওদের বিজ্ঞানের নানারকম গল্প বলি। ওরা মন দিয়ে শোনে। বুঝিয়ে দিলে সব ওরা বুঝতে পারে। গ্রেগরি সাহেবের লেখা ডিস্কভারি (Discovery) বইটা থেকে অনেক গল্প শুনিয়েছি ওদের। ওরা এমন অকৃত্রিম কৌতূহল নিয়ে শোনে যে মনে হয় ছোটখাটো একটা ল্যাবরেটরি করে ওদের যদি হাতে-কলমে কিছু দেখাতে পারতুম, তাহলে হয়তো ওদের উৎসাহ আরও বাড়ত। কলেজের ভদ্রসন্তানদের মধ্যে এ উৎসাহ দেখিনি। সাঁইবাবা কিছু টাকা দেবেন বলেছেন।"

"সাঁইবাবা কে?"

"তিনি একজন বাউল। একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ান। চালটাল-ফলটল যা পান তাই খেয়ে থাকেন। কিন্তু পয়সা-কড়ি যা পান তার একটিও খরচ করেন না, সব জমিয়ে রাখেন। তিনি যেখানে গান ধরেন সেখানে ভীড় জমে যায়। অনেক পয়সা পড়ে সেখানে। সে-সব তিনি জমিয়ে রাখেন। আমাকে একশ টাকা দেবেন বলেছেন। বলেছেন—"যে জাদুকরীর কুহকে আমরা সবাই ঘুরছি তার নতুন রূপ যদি দেখাতে পার টাকা দেব। সাঁইবাবা অদ্ভুত লোক। হেঁয়ালীতে কথা বলেন"

আমি অবাক্ হয়ে শুনছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম এই উপেক্ষিত, অজ্ঞাত, অস্নাতদের নিয়ে যদি একটা দল গড়ি, কেমন হয় তাহলে। এরাই তো দেশের মেরুদণ্ড। এরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে। যে কর্মপ্রবাহ নিখিল বিশ্বকে প্রাণময় করে রেখেছে এরা তো সেই প্রবাহেরই তরঙ্গমালা। আমরা তথাকথিত ভদ্রলোকেরা তো সমাজের অলঙ্কারমাত্র, অধিকাংশক্ষেত্রেই বাজে অলঙ্কার, সমাজের সচ্ছল অবস্থায় হয়তো আমরা বেমানান নই, কিন্তু এখন তো আমরা অবান্তর। কিন্তু এদের যদি কাছে ডাকি, এরা আমার কাছে আসবে কি? আমরা তো 'বাবু-ভেইয়া', আমরা তো ওদের আপনজন হতে পারিনি। একটা মেকি বিলিতী কালচারের দেওয়াল তুলে আমরা তার ওপার থেকে হয় ওদের শোষণ করেছি, না হয় ওদের অনুগ্রহ বিতরণ করেছি; 'এস' বললেই কি ওরা আসবে? ওদের প্রতি দরদ দেখিয়ে, ওদের পাশবিকতাকে উত্তেজিত করে আমাদেরই মতো ভদ্র তথাকথিত শিক্ষিত একদল ভদ্রলোক নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সব দল গড়েছে—যে দলের অন্তর্নিহিত সুর পরশ্রীকাতরতা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, স্বার্থপরতা ছাড়া যারা আর কিছু ভাবতে পারে না, সে সব দলেই ওরা ভীড়ে যাচ্ছে আমাদের নেতাদেরই সর্বগ্রাসী লোভের ধাক্কায়। অনাহারক্লিষ্ট নানা অভাবে পীড়িত গরীব নিম্নমধ্যবিত্তরা যখন আমাদের নেতাদের এরোপ্লেনে উড়ে যেতে দেখে, যখন তাদের রাজকীয় বিলাসের পরিচয় পায়, তখন তারা ভাবতে পারে না যে ওরা আমাদের আপন লোক; তখন তারা আপন লোক বলে তাদের পাশেই এসে ভীড় করে যারা তাদের সুখের আশ্বাস দেয়, যারা বলে

তোমাদেরই তালুক-মুলুক পাইয়ে দেব, তোমরা রুখে দাঁড়াও। এ মিথ্যে আশ্বাসে তারা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে না। তাদের দোষ দিই না, তাদের প্রতি অনেক অত্যাচার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তারা খেতে পর্যন্ত পাচ্ছে না। ফুটপাথে শোয়।

পতিতুণ্ডিকে বললাম—"তোমাদের আখড়ায় আমাকে ভরতি করে নেবে? আমিও ওদের অনেক গল্প শোনাব?"

"আপনি সত্যিই এখানে থাকবেন?"

"থাকব, তোমার যদি অসুবিধা না হয়। রাত্রে তোমার আখড়ায় আড্ডা জমাব আর দিনের বেলায় কিছু রোজগার করব। তবে তোমার মতো কুলিগিরি করতে পারব না। প্রাইভেট ট্যুশনি করব। আমি ইংরিজি, অঙ্ক, বাংলা, লজিক, ফিলজফি, ইতিহাসে এম-এ ক্লাসের ছাত্রকেও পড়িয়ে দিতে পারব। তুমি যদি কিছু ছাত্র জোগাড় করে দাও—" ·

"তা অনায়াসেই পারি। ছাত্র অনেক আছে, ভালো শিক্ষকই নেই। সব ব্যবসাদার—"

"আমার সত্য পরিচয়টা কিন্তু গোপন রাখা চাই"

"কি বলব সকলের কাছে তাহলে বলে দিন—"

"বলতে পার আমি একজন সংসারত্যাগী প্রফেসার। তোমাদের বস্তিতে এসে বাস করছি। বস্তির গরীবদের সাহায্য করবার জন্যে কিছু অর্থোপার্জন করতে চাই—"

"কিন্তু কোথায় পড়াবেন আপনি?"

"জায়গা অনেক আছে কোলকাতা শহরে। এতগুলো স্কোয়ার আছে, পার্ক আছে, লাইব্রেরী আছে, ফ্রী রিডিং-রুম আছে। যখন যেখানে সুবিধা হয ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে। যা টাকা রোজগার করব তা গরীব আর নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্যই খরচ করব ঠিক করে ফেলেছি। ওরাই তো দেশ, ওরা যদি বাঁচে তাহলেই দেশ বাঁচবে। এখন তুমি রাজি হলেই লেগে পড়তে পারি"

পতিতুণ্ডি চুপ করে রইলো। বুঝলাম ওর মন খুঁতখুঁত করছে। আমার এই ছদ্মবেশটা ওর যেন পছন্দ হচ্ছে না। আমি নির্নিমেষে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, "আমি বুঝতে পারছি তোমার মন সায় দিচ্ছে না এই লুকোচুরিতে। বেশ, তা হলে এক কাজ করি। ধরা দিয়ে বরং জেলেই চলে যাই দিনকতক। তোমার চক্ষে তাহ'লে হয়তো নিষ্কলঙ্ক হয়ে যাব। তোমার দেখছি প্রায়শ্চিত্তে খুব বিশ্বাস—"

"না, আমি প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি যে টাকাটা আপনি কলেজ ফাণ্ড থেকে নিয়ে খরচ করেছিলেন, সে টাকাটা কি আগে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়?"

"উচিত। নিশ্চয়ই উচিত। আমি দেবও। কিন্তু হাতে তো এখন অত টাকা নেই। তাহলে এক কাজ করা যাক্। আমার যদি বেশী ছাত্র জুটে যায় তাহলে যা রোজগার করব তা জমা করে রেখে দেব। দশ হাজার টাকা জমলেই কলেজ ফাণ্ডে ফেরত দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে। মোটকথা তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

পতিতুণ্ডি মুচকি হেসে বললে—"বেশ। দেখি আমি কি করতে পারি—"

"একটা কাজ তুমি অনায়াসেই করতে পার। তুমি যদি পাইলট মুখার্জি সেজে অমিলার কাছে আমার একটা চিঠি নিয়ে যাও, তাহলে সে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে"

"অমিলা কে—"

অমিলার স্বামীর নামটা বললাম। অমিলার স্বামী যে পরিবেশে বিচরণ করেন, সে পরিবেশে ও নাম বিখ্যাত নাম, কিন্তু পতিতুণ্ডি চিনতে পারলে না। অথচ অ্যাটর্নিদের জগতে উনি প্রখ্যাত পুরুষ। নাম ঠিকানা বলতে হল।

পতিতুণ্ডি বললে—"এমনিই চলে যাচ্ছি। পাইলট মুখার্জি সাজবার দরকার কি—"

"দরকার এই জন্যে যে, কলকাতায় আমার পরিচিত মহল জানে যে আমি আমেরিকায় প্রফেসারি করছি। এই মিথ্যা-প্রচারটা কিছুদিন থাক, এইটে আমার ইচ্ছে। আমার পরিচিত মহল যদি হুড়মুড়িয়ে এখানে এসে পড়ে, তাহলে তুমিও বিপদে পড়বে, আমিও পড়ব। আমরা যে কাজ করতে চাইছি তা করতে পারব না। আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের বস্তিতে বাস করতে চাই। যে মুখসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য চালিয়াত সমাজে এতকাল আমি বাস করেছি তারা যদি এসে পড়ে তাহলে তারা আমাকে এখানে থাকতে দেবে না। সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। তাই আত্মপ্রকাশ করবার ইচ্ছে নেই। অমিলা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে (ভালবাসে কথাটা আর বললুম না)—সে আমার খবর পেলে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে আমাকে। একবার গিয়েই দেখ না কি হয়—"

পতিতুণ্ডি হেসে বলল—"পাইলট মুখার্জি সাজতে হলে একটা ফরসা প্যাণ্ট, ফরসা হাফশার্ট, আর ভদ্রগোছের জুতো চাই এক জোড়া—তা তো আমার নেই—"

"কিনে নাও। আমার কাছে এখনও কিছু টাকা আছে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই, তুমি কিছু ছাত্র জুটিয়ে দাও টাকা রোজগার করে ফেলব। গাছতলাতেই কলেজ খুলে বসব—"

পতিতুণ্ডি হেসে ফেলল।

হঠাৎ ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ পাওয়া গেল। উঠে পড়লুম।

"চল দেখা যাক, ক্ষেন্তি কি করছে—"

দেখলাম একটা জীর্ণ রান্নাঘরে দুটো উনুন জ্বালিয়ে ক্ষেন্তি রান্না করছে। আত্মহারা হয়ে পড়েছে যেন। আমাকে দেখে বলল—"সরষে বাটা দিয়ে ইলিশের মাছ ঝাল করলাম। আপনার জন্যে ভেজেও রাখছি কয়েকখানা। রুইমাছের ঝোল রাঁধব? আপনি ঝোল ভালবাসেন?"

"তুমি যা ভালবাস তাই কর। তোমার জন্যেই তো এনেছি সব"

"চারখানা মাছ সোনাকে দেব?"

"সোনা কে—"

"পাশের বাড়িতে থাকে। আমার বন্ধু—"

"নিশ্চয় দেবে। তুমিই তো বাড়ির মালকাইন্, তুমি যা করবে তাই হবে—"

ক্ষেন্তির মুখে অপূর্ব হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল একটা। ছবিতে তার যে হাসিটা দেখেছি একটু আগে, সেইটে যেন আত্মপ্রকাশ করল।

ক্ষেন্তি সেদিন যা রান্না করেছিল তার বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না। তা 'অপূর্ব' বললে ঠিক বলা হবে না। এক কথায় বলতে হলে একটা ইংরিজি কথা ব্যবহার করতে হবে, ওয়াণ্ডারফুল অ্যাণ্ড ইউনিক (wonderful and unique) ঃ সে রান্নায় শুধু নুন-তেল-মশলাই ছিল না, ছিল ক্ষেন্তির চরিত্র ও নিপুণতা।

সেদিন খাওয়াদাওয়া শেষ করে যখন উঠলাম তখন চারটে বেজে গেছে।

ক্ষেন্তিকে বললাম—"রাত্রে আমি আর কিছু খাব না—"

"আমরা খাই তো রাত বারোটায়। আমি তো বিকেলে কাজ করতে যাব। দু' জায়গায় কাজ করি। ফিরতে রাত্রি ন'টা হয়ে যাবে। তারপর এসে তো রান্না করব। ততক্ষণ ক্ষিধে পেয়ে যাবে আপনার। আপনি বেশী তো খাননি। রাত্রে লুচি ভেজে দেব আপনাকে। লুচি আর মাছের তরকারি। মাছ কিছু রেখে দিয়েছি!"

"দেখ, আমার সঙ্গে যদি এভাবে লৌকিকতা কর তাহলে তো আমাকে চলে যেতে হবে। তোমরা রাত্রে যা খাও আমি তাই খাব।"

ক্ষেন্তি নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ নেংচে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"আমি যেখানে কাজ করি সেখান থেকেই খাবার নিয়ে আসি। তারা এঁটো কাঁটা মিশিয়ে খানিকটা মোটা চালের ভাত, জোলো ডাল আর তরকারি দেয়। তাই আমি খাই। সে খাবার আপনাকে আমি দিতে পারব না। দাদার জন্যে চারখানা রুটি আর ডাল তরকারি সিদ্ধ করে রাখি। তাও আপনাকে দিতে পারব না। আপনাকে লুচি খেতে হবে—"

"ঘি পাবে কোথা—"

"আমার বন্ধু সোনা দেবে। তার স্বামী ডেয়ারিতে চাকরি করে—"

"সে কি করে ঘি পায়?"

আবার নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষেন্তি। তারপর আবার নেংচে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখলাম তার দৃষ্টি থেকে রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

"পায় না, চুরি করে। সবাই চুরি করে। ওপরওলা থেকে কুলি পর্যন্ত সবাই চোর। চোর না হলে ওখানে চাকরি করা যায় না। তা সত্ত্বেও কিন্তু সোনার স্বামী ভালো লোক। আমাকে বিনা পয়সায় ঘি দিতে চায় যখন দরকার পড়ে! আমি কিন্তু নিই না। দাম দিয়ে দি। না দিলে ওদের সংসারই বা চলবে কি করে?"

পতিতুণ্ডি এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। হাসিমুখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হ'ল ক্ষেন্তির উদার অতিথিপরায়ণতা বোধহয় তাকে বিব্রত করছে।

বললাম, "বেশ লুচিই হোক। সবাই লুচি খাব। আমিই আজ খাওয়াই তোমাদের। ভাল বুটের ডালও কর। কাল থেকে তোমরা যা খাও তাই খাব কিন্তু। আমি তোমাদের কাছেই থাকতে চাই, রোজ আমার জন্যে যদি পোশাকী বন্দোবস্ত কর তাহলে তো থাকতে পারব না। আমাকে যদি তোমাদের আপন লোক করে নিতে না পার তাহলে এখনি আমাকে চলে যেতে হয়। তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছে আমার নেই। যদি কিছু রোজগার করতে পারি সেটা তোমাদেরই দেব, সেটা সবাই ভাগ করে খাব। পৃথিবীতে আমার আপনার লোক কেউ নেই। তোমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছি। তোমরা যদি আপন করে না নিতে পার তাহলে চলে যেতে হবে"

ক্ষেন্তি ঘাড়া তুলে আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ বলল—"অচেনা লোকের সঙ্গে ভদ্রতা করা সহজ। তাকে আপন করা সহজ নয়। তার জন্যে সময় চাই। হঠাৎ পারব না—"

বলেই ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বেরিয়ে গেল সামনের দুয়ারটা দিয়ে।

"কোথায় যাচ্ছিস?"—পতিতুণ্ডি ডাক দিল।

"আসছি এখুনি—"

পতিতুণ্ডি বলল—"ক্ষেন্তি অনেক সময় বিজ্ঞের মতো কথা বলে। আপনি কি কোথাও বেরুবেন এখন?"

'চল পাড়ার সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও আমার"

"এখন কেউ বোধহয় নেই, সকলেই কাজে বেরিয়ে গেছে। তবু চলুন দেখা যাক—"

ক্ষেন্তি ফিরে এল একটি ঝাঁকড়া চুল যুবককে নিয়ে। তার হাতে একটা প্যাঁচকস্ আর কয়েকটা স্ক্রু। লোকটিকে ভদ্র বলে মনে হল।

পতিতুণ্ডিকে দেখে সে হেসে বললে—"আমার একটা প্যাঁচকস ছিল, কয়েকটা স্ক্রু (screw) কিনে নিয়ে এলাম। ক্ষেন্তি-দি তো ছাড়বে না, এখনি কপাটটা ঠিক করে দিতে হবে। মিস্ত্রি পাইনি"

পতিতুণ্ডি বললে—"ইনিই ডেয়ারিতে কাজ করেন। নাম বিশ্বেশ্বরবাবু। ক্ষেন্তির বন্ধু সোনার স্বামী। আজ আপিসে যাওনি?"

"আজ রবিবার যে—"

"তাহলে চলুন অনেকের সঙ্গে দেখা হবে হয়তো। আজ রবিবার সেটা খেয়াল ছিল না—"

পতিতুণ্ডির সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

রাস্তায় যেতে যেতে পতিতুণ্ডি বললে, "বিশুদা বিহারী। ওর উপাধি যাদব। ওর ঠাকুরদা কলকাতায় এসে খাটালে গরু রেখে দুধের ব্যবসা শুরু করেছিল। তারপর থেকে ওরা কলকাতাতেই থেকে গেছে। বিশুদা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস-সি. পাস করেছে। দুধ আর ঘি সম্বন্ধেও পড়াশোনা করেছে। ডেয়ারিতে কাজ করে, কিন্তু ওর যত মাইনে পাওয়া উচিত ছিল, যে পোস্ট পাওয়া উচিত ছিল তা পায়নি। একজন হোমরাচোমরা ভি. আই. পি-র গবেট ভাগ্নে সুপারিশের জোরে ওর উপরওলা। ওর কিন্তু এজন্যে রাগ নেই, ও আশ্চর্যরকম সন্তুষ্টচিত্ত লোক—"

পাড়ায় ঘুরে ঘুরে অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলাম সেদিন। দশরথ, ভরথা, মিনুবাবু, রোখন মিশির, ভোজুয়ার মা, সাঁইবাবা, এরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা জগৎ। প্রত্যেকেই মুখে যদিও ভদ্রতা করল আমার সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেকের চোখেই অবিশ্বাসের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলুম। যা ক্ষেন্তির মুখে ভাষা পেয়েছিল একটু আগে তাই যেন এদের হাবভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে অনুভব করলাম। পতিতুণ্ডি আমার পরিচয় প্রসঙ্গে বললে—ইনি এখানে আমাদের পাড়াতেই বাস করতে চান। খুব বিদ্বান লোক। এখানে একটা ইস্কুলের মতো খুলবেন, গরীবের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়াবেন।

সাঁইবাবা বললেন—খুব ভালো কথা। মাছ অনেক আছে। কিন্তু মাছ ধরবার কায়দাটা জানা আছে তো? প্রেমের জাল চাই। রুই কাতলা খলসে পুঁটি, এমন কি সাপও উঠবে সে জালে।

বলেই তিনি দুলাইন গান গেয়ে দিলেন—"প্রেমের জালের ব্যাপার চমৎকার। সে জালে রুই কাতলা খলসে পুঁটি—সাপ ব্যাং সব একাকার।"

আমি একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলাম। ওই ময়লা গেরুয়া-লুঙি-পরা সাঁইবাবাকে প্রণাম করে ফেললাম একটা। বললাম—"আমার কোন কায়দাই জানা নেই। আমার একমাত্র কায়দা আপনাদের কাছে এসে পড়েছি। এখানেই থাকব।"

সাঁইবাবা প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে। তাঁর সে প্রসন্নদৃষ্টি আজও প্রসন্ন আছে।

ভাই, চিঠি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তুমি হয়তো বিরক্ত হচ্ছ। কারণ এত বকবক করার পরও আসল কথাটা তোমাকে বলতে পারিনি। এখনি সেটা বলতেও চাই না। গোড়ায় যা বলেছি এখনও সেইটুকুই আবার বলছি। তোমার কাছে যেতে যাই। যাবার অধিকার অর্জন করেছি কি না সেটা তুমি ঠিক কোরো, আমার কেতাবের পাণ্ডুলিপিটা পড়ে। সেটাও এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমি নিয়মিত লিখি না। মাঝে মাঝে লিখি। তারিখও দিই না। কারণ তারিখ অনেক সময় মনেও থাকে না, আর যখন থাকে তখন মনে হয় আমার তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে তারিখের চিহ্নে চিহ্নিত করে ইতিহাসের মর্যাদা দেবার প্রয়োজনই বা কি। এর থেকে তুমি আমার বর্তমান জীবনের মোটামুটি আভাস পাবে। অনেকের পরিচয় পাবে যাদের তুমি চেন না, অথচ যাদের সম্বন্ধে কবিতা লিখেছ, "আমাদের দেশ" বলে যাদের সম্বন্ধে তোমাদের নেতারা বক্তৃতার খই ফুটিয়েছেন। এদের পরিচয় কেউ জানে না, এদের ব্যথা কেউ বোঝে না কারণ এদের সঙ্গে কেউ বাস করেনি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'মাস' (mass) নামক অচেনা আইডিয়া পিণ্ডকে নিয়ে অনেক খেলোয়াড়ই লোফালুফি করেছে কেবল। এদের পরিচয়ের মধ্যেই তুমি আমার পরিচয় পাবে। বিচিত্র এবং জটিল কাজের জালে জড়িয়েছি নিজেকে। বিরাট এক ছাত্রছাত্রী বাহিনী গড়ে তুলছি। তাদের অনেককেই পড়াই পার্কে পার্কে, কাউকে দুপুরের খালি ট্রামে এসপ্ল্যানেড থেকে বেয়ালা যেতে যেতে, গড়ের মাঠে গাছের তলায় আসে কয়েকজন, আমাদের পাড়ার আখড়ায় খুব বড় ক্লাস খুলেছি একটা ছোট ছেলেমেয়েদের। তাছাড়া ক্ষেন্তির ওই ভাঙা ঘরেও আসে অনেকে। সবাই আমাকে ভক্তি করে। কারণ তাদের কাছে আমার একমাত্র দাবি, তোমরা ভালো হও। ন্যায় ও সত্যের জন্য প্রাণবিসর্জন করতে প্রস্তুত হও। অন্যায় আর অসত্যে দেশ ভরে গেছে—তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরই লড়তে হবে। টাকাকড়ির দাবি কিছু করি না। তারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষেন্তিকে বা পতিতুণ্ডিকে যা দেয় তাই আমার রোজগার। প্রচুর রোজগার হয়। ক্ষেন্তিকে আর রাঁধতে দিই না। তাকেও ঘরে পড়িয়ে পড়িয়ে বি-এ পাস করিয়েছি। সে খুব ভালো বক্তা হয়েছে। আমাদের পাড়ার সভায় সে যখন বক্তৃতা করে, আগুন ছুটিয়ে দেয়। খুব ভালো মেয়ে হয়েছে সে, আমাদের স্কুলের সে-ই প্রধান শিক্ষিকা। সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে সে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য। ভাই, জীবনে দুটি জিনিস বুঝেছি। নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে না পারলে কোনও বড় কাজ করা যায় না। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যে মানুষ হচ্ছে না তার প্রধান কারণ তাদের মানুষ করবার জন্যে কেউ জীবন উৎসর্গ করেনি। শিক্ষকরা অধ্যাপকরা সবাই চাকুরে। তারা চাকরি করে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার দায়িত্ব তাদের নেই, সে সুযোগও তারা পায় না। তারা আপিসের কেরানী, রেলের বাবু, সাব-ডেপুটি, ডেপুটি, দারোগা বা ম্যাজিস্ট্রেটের দলভুক্ত হয়ে গেছে, তারা নিজেদের আস্ফালন করে, বাগাড়ম্বর করে, আর শাসন করে—শিক্ষা দেবার যোগ্যতা তাদের নেই। তারা জীবন উৎসর্গ করে না। যদি করত দেখতে পেত কি

সম্মান, কি আদর, কি শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর তাদের মা বাবারা তাদের মাথায় করে রাখত। কিন্তু সে রকম শিক্ষক-শিক্ষিকা দেশে নেই। তাই মানুষ তৈরি হচ্ছে না। আজকালকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের প্রতিমূর্তি। কেউ বিলাসের বিগ্রহ, কেউ কঠিন পাথর। এরা ফসল ফলাতে পারবে না। ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে আমরা রাগ করি, রাগ হয়ও, কিন্তু এটা বুঝেছি দোষ তাদের নয়, দোষ আমাদের। যে সব সরল নিষ্পাপ শিশুর দল আমাদের ঘরে ঘরে রোজ জন্মাচ্ছে, তাদের আমরাই কুটিল, পাপী, মূর্খ, বাঁদরের দল তৈরি করছি। বাঁদর তৈরি করবার কারখানা আমাদেরই ঘরে ঘরেই রয়েছে। কিন্তু বলে দিচ্ছি এই বাঁদর সেনারাই একদিন লঙ্কাজয় করবে। রাক্ষসদের প্রতিষেধক বাঁদর, মহর্ষি বাল্মীকি এই মহাসত্য একদিন দিব্যচক্ষে দেখে তাঁর অমর কাব্যে সেটা লিখে গেছেন। আমরা যদিও প্রাণপণে চেষ্টা করছি বাঁদরদের মানুষ করবার, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি, হবেও না। কারণ বিধাতার অভিপ্রায় তা নয়। জগতে রাক্ষসদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে—তাদের উৎখাত করবার জন্য তাই বাঁদর পাঠিয়েছেন তিনি। রাক্ষসরা নিশ্চিহ্ন হলে বাঁদররা নিজেরাই কিষ্কিন্ধ্যাতে গিয়ে অন্তর্ধান করবে। দেখ, কথায় কথায় আবার অন্য কথায় এসে পড়েছি। হ্যাঁ, কি বলছিলাম সবাই আমাকে ভক্তি করে। এদের—যাদের আমরা ছোটলোক বলি—তাদের ভক্তি করবার ক্ষমতা অসীম। আমি আগে তোমাদের যে ভদ্রসমাজে বাস করতুম, সে সমাজে কেউ কাউকে ভক্তি করে না। অবশ্য আমি ভক্তিভাজন লোক ছিলুম না। কিন্তু ভক্তিভাজন যাঁরা আছেন তাঁরাই কি তোমাদের ভক্তি আকর্ষণ করতে পেরেছেন? আমাদের বর্তমান সমাজে গুণীকে প্রশংসা বা ভক্তি করবার রেওয়াজ আর নেই। তারা বড়জোর অভিভাবকী ভঙ্গীতে আলতো আলতো তোমার পিঠ চাপড়ে তোমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে পারে। ইংরেজিতে ওকে বলে পেট্রনাইজ্ (patronise) করা। প্রশংসা কেউ করবে না। কাউকে ভাল রেঁধে খাওয়াও, ভাল লেখা পড়ে শোনাও, ভাল ছবি এঁকে দেখাও, ভাল গান গেয়ে শোনাও—বাঃ বলে কেউ তোমাকে কৃতার্থ করবে না। বড়জোর একটু মাথা নাড়বে কিংবা মুচকি হাসবে। আমাদের দেশের বড় বড় সমালোচকদেরই বা কি মনোভাব? তারা তো সব কুমীর! পুরোনো পচা মড়া খেয়ে পেট মোটা করে ডিগ্রী পেয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে মধুকর কি একটাও দেখেছ? আজকাল কেউ কিছু লিখতে পাচ্ছে না। এই বাক্য আউড়ে তাঁরা ভারী একটা মুরুব্বিয়ানা করে বেড়ান কিন্তু আসলে হয় তো তাঁরা পরশ্রীকাতর, সমসাময়িক লেখকের ভালো লেখার প্রশংসা করতে তাঁদের বুক ফেটে যায়, কিংবা তাঁরা মূর্খের শিরোমণি—কিচ্ছু পড়েন না, ভালো বই কোথায় বেরুচ্ছে তারও খবর রাখেন না। যারা তাঁদের খোশামোদ করে তাদেরই পিঠ চাপড়ান কেবল। এরই নাম সমালোচনা। তথাকথিত সুধী সমাজেই এই অবস্থা। অর্থাৎ ও সমাজে ডিগ্রীধারী মানেই বিদ্বান, অহঙ্কারী পাজি নিন্দুকরাই তোমাদের সংস্কৃতির কচুবনে এরণ্ড। আমার মতো পাজি দুশ্চরিত্র লোকও ও সমাজে একদিন নামী অধ্যাপক ছিল। কিন্তু কেউ আমাকে শ্রদ্ধা করত না। কিন্তু এখন আমি যে সমাজে বাস করছি সে সমাজে কেউ জানে না আমার ডিগ্রীর দাম কত, কিন্তু তবু আমি সত্যিই শ্রদ্ধার আসন পেয়েছি এখানে। এটা আমার কৃতিত্ব নয়, ওদেরই কৃতিত্ব। গুণীকে ভক্তি করবার ওদের একটা সহজ প্রবণতা আছে! ওদের এই সরল সহজ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে অনেক ধাপ্পাবাজ গুরু ওদের দলে

টেনেছে। আমার দলেও ওরা জুটে গেছে। আমি অবশ্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করছি কিসে ওদের ভালো হয়। কিন্তু আমার এই চেষ্টাটাকে ওরা যদি শ্রদ্ধার সম্মান না দিত তাহলে এও কি আমি করতে পারতাম? ভালো করবার আন্তরিক চেষ্টা এবং ভালো হবার ঐকান্তিক আগ্রহ—এই যোগাযোগই মণিকাঞ্চন যোগাযোগ। ঠিক সে রকমটা ষোল আনা হয়তো হয়নি কিন্তু যতটুকু হয়েছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তুমি নিখুঁত—মানে খুঁতখুঁতে—আদর্শবাদী লোক। তোমাকে খুশি করতে পারব কি না জানি না। তবে তোমার ডাক পেলেই তোমার কাছে যাব। তোমার কাছে যাওয়ার জন্যে তোমার অনুমতি চাইছি কেন, সোজাসুজি গেলেই তো পারতাম, এ কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে হচ্ছে। মাত্র চারি চক্ষুর মিলনের জন্য তোমার কাছে যেতে চাইছি না, তোমার সারাজীবন ধরে যে সহস্রচক্ষু (কিংবা তারও বেশী) তোমার সত্তায় বিকশিত হয়েছে, তোমার সেই সহস্রচক্ষু দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে চাইছি আমার জীবনের সহস্রচক্ষুর সঙ্গে মিলন কামনা করে। এই যে সহস্রচক্ষুর কথা বলছি এর সবগুলোর অস্তিত্ব তুমি হয়তো জান না, আমিও জানি না, কিন্তু জানি ওরা আছে। ওরা নিষ্পলক, নির্মম, নির্ভীক। বহুবর্ণের, বহুমেজাজের। ওদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে সেই অদৃশ্য কষ্টিপাথর যেখানে সব সোনা যাচাই হয়, যেখানে নকল সোনার দাগ পড়ে না। আমার কষ্টিপাথর থেকে আমি বলতে পারি তুমি আসল সোনা। তোমার মধ্যে কোনও খাদ নেই। আমাকে তোমার ওই কষ্টিপাথরে যাচাই করতে তুমি সম্মত হবে কি না, আমার মতো পাষণ্ডের জীবন কাহিনী নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কি না, তুমি আমার চিঠি যদি এতদূর পড়ে থাক বাকিটা পড়বে কিনা, যে পাণ্ডুলিপিটা তোমাকে পাঠাচ্ছি তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে তোমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠবে কি না—শিউরে ওঠা অসম্ভব নয়, কারণ ওতে যাদের কথা লিখেছি ভদ্রলোকদের অভিধানে তাদের নাম 'ছোটলোক'। ওদের মধ্যে বেশ্যা আছে, মানে খোলাখুলি বেশ্যা, সতীত্বের লোক-দেখানো ঘোমটা তাদের নেই—ওদের মধ্যে চোর আছে, পকেটমার আছে, ভিখারী আছে, খুনীও আছে দু-একজন, মাতাল আছে, আমার মতো চূর্ণবিচূর্ণ-চরিত্র লোক আছে, সাঁইবাবার মতো ভালো লোকও আছে, আর আছে অসংখ্য রাস্তার ছেলেমেয়েরা যারা রাস্তাতে জন্মায়, রাস্তায় বড় হয়, রাস্তা যাদের ঘর বাড়ি, রাস্তার অলিগলি, মানুষ, জানোয়ার, রিক্‌শওলা, ফেরিওলা, সমস্ত রাস্তা যাদের নখদর্পণে— এদের আমি পড়াই, এদের আমি অর্থসাহায্য করি, এদের আমি খাওয়াই, এদের দুষ্টুমি করবার জন্যে, খেলা করবার জন্যে প্রায়ই পয়সা দিই—এরা আমার বন্ধু, এরাই আমার সৈন্যবাহিনী, এদের সাহায্যেই আমি আমার জীবনের সেই সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যটি করব ঠিক করেছি—এদের কাহিনী তুমি পড়তে রাজি হবে কি না, রাজি হলেও আমার জীবনবীণার সুরে তোমার জীবনবীণা ঝংকৃত হয়ে উঠবে কি না এটা জানতে না পারলে তোমার কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। আমি অবশ্য সশরীরে যাব না। দ্বিতীয় আর একটা চিঠিরূপে যাব। কুশলার কাছে সশরীরে যাওয়ার সাহস নেই। আমি তার কাছে অপরাধী হয়ে আছি, আমার অপরাধ সে ক্ষমা করেনি। আমি অতি খারাপ লোক তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তবু অমিলা আমাকে ভালবাসে এবং প্রশ্রয় দেয়, কুশলাও আমাকে ভালবাসে (আমার মন একথা বরাবর বলেছে, এখনও বলে, এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই) কিন্তু সে আমাকে প্রশ্রয় দেয়নি। নিষেধের একটা তীক্ষ্ণ খড়্গ সে বরাবর উদ্যত করে রেখেছে আমার সামনে। দশবছর ধরে সেই উদ্যত

খড়্গের ঝলক আমার মনের আয়নায় ঝকমক করছে। সশরীরে তার কাছে যাওয়ার সাহস নেই! বৌদি যদিও মারা গেছেন তবু তাঁর অর্ধচন্দ্রটা অস্ত যায় নি, বরং মারা গেছেন বলেই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেটা। তাই সশরীরে যাওয়া যাবে না ভাই। সশরীরে নাই বা গেলাম। শরীরটা অতি বাজে জিনিস—মলমূত্র-পঙ্কিল, কামনার নরককুণ্ড একটা—শাস্ত্রকারদের এ বচন আমি আওড়াব না, কারণ এই শরীরকে কেন্দ্র করেই অনেক বহ্যুৎসবের মহিমা উপভোগ করেছি, শরীরটা ছিল বলেই তোমাদের নাগাল পেয়েছি। ফোন যন্ত্রটা এমন কিছু জিনিস নয় কিন্তু ওর ভিতর দিয়ে অনেকের নাগাল পাওয়া যায় তাই ওটাকে তুচ্ছ করতে পারি না। শরীরটাও তুচ্ছ করবার নয়, শরীরের ভিতর দিয়েই সেই তীব্র সুখ সেই তীব্র দুঃখ অনুভব করেছি, তাই একদিন হয়তো সেই পরমসত্যের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে আমাকে যা মনুষ্যজীবনের একমাত্র কাম্য। রাবণ বধ করবেন বলেই ভগবানও নরদেহ ধারণ করেছিলেন, সুতরাং দেহটাকে তুচ্ছ করছি না। তবু তোমার কাছে সশরীরে যাব না। প্রথমত কুশলা আছে, দ্বিতীয়ত আমার যে রূপ তোমাকে দেখাতে চাই তা আমার দেহে নেই, মনে আছে। চিঠির ভিতর দিয়েই আমার সেই মনটাকে মেলে ধরতে চাইছি। যে পাণ্ডুলিপিটা পাঠাচ্ছি, তার ভিতরেও আমাকে পাবে। এর একজনও ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে, আমার সঙ্গে তাকে কিন্তু পাবে না। তার কথা লিখে প্রকাশ করা যায় না বলেই লিখিনি কিছু। লিখলে সে হয়তো আপত্তি করত না। স্তুতি-নিন্দার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে সে। অমিলার কথা বলছি। তার কথা শোনবার তোমার হয়তো কিছু কৌতূহল জেগেছে এতক্ষণ। আর তার কথা না বললে আমার কথা সবটা বলাও হবে না। সে আর আমি অভিন্ন হয়ে গেছি। না, কথাটা ঠিক বলা হল না। সে ভিন্নরূপেই আছে, কিন্তু দিবারাত্রি সর্বদা আমার সঙ্গেও আছে, দিনের বেলা আলোর মতো রাত্রে অন্ধকারের মতো সর্বদা আমাকে ঘিরে আছে সে। স্বামীর সঙ্গে সে থাকে না, আমার সঙ্গেও না। স্বামীর সঙ্গে সে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেনি, সে তার কাছ থেকে চলে এসেছে শুধু। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করবার তার প্রয়োজনই নেই, কারণ মানুষের তৈরি আইনের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে সে। সে বুঝেছে যেখানে তার মিলন তীর্থ, সে তীর্থে সমাজের আইন অচল, শুধু অচল নয়, কুৎসিত কদর্য বাধা। আমাদের অধিকাংশ আইনেরই এলাকা দেহ বা স্বার্থের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। অমিলা ও দুটোর সীমাই পার হয়ে গেছে, ও আমাকে কিছুদিন আগে যে চিঠিটা লিখেছে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি ঃ

'‘আমি এখন এলাহাবাদে আছি। বাবার একমাত্র উত্তরাধিকারিণীরূপে বাবার যে সম্পত্তি আমি পেয়েছি তাতে আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে এসেছি। সে খারাপ লোক নয়। কিন্তু আমার পক্ষে তার সঙ্গে থাকা সম্ভব নয় বলেই এসেছি। কেন নয় তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমার সেজন্য কোনও কষ্ট হচ্ছে না। আমার বাবা বড় ডাক্তার ছিলেন, তিনি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন তাঁর নির্বাচন তাঁর ডায়োগনোসিস্ ভুল হয়েছিল। সুপাত্র বলে যাঁর হাতে তিনি আমাকে সমর্পণ করেছিলেন—সামাজিক দিক দিয়ে হয়তো তিনি সুপাত্রই—কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর বনল না। আমি যে মানুষ, আমারও যে আলাদা একটা জীবন্তসত্তা আছে, এটা তিনি বুঝলেন না। মানতে চাইলেন না! তাই চলে এসেছি। ওর জন্যে কোনও কষ্ট নেই আমার। আমার প্রধান কষ্ট তোমার জন্যে। আমার ফরমাশ মতো তুমি চলবে না, তোমার দুর্দম রথ দুর্গম পথেই চলবে চিরকাল। তোমার সঙ্গে

যদি থাকতাম তোমার দুঃখকষ্টের সঙ্গিনী হয়ে হয়তো সান্ত্বনা পেতাম কিছু। কিন্তু ইচ্ছে করেই আমি নিজেকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি। লোক-চক্ষে তোমাকে হেয় করতে চাই না। তবে আমার ভয় হয় অর্থাভাবে হয়তো তুমি কষ্ট পাচ্ছ। তাই একটা চেক বুকের প্রত্যেক পাতায় সই করে পাঠিয়ে দিচ্ছি পাইলট মুখার্জির হাত দিয়ে। তোমার যখন যেমন দরকার টাকা বার করে নিও। ওই ব্যাঙ্কে আমার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আছে। ওর শেষ কপর্দক পর্যন্ত তুমি নাও। কষ্ট করে থেকো না। দারিদ্র্যে তুমি অভ্যস্ত নও। আমার এই অনুরোধটি তুমি রেখ। পাইলট মুখার্জি তোমার কথা কিছুই বলতে চান না। মনে হয় তিনি সব জানেন, অথচ কিছু বলবেন না। তোমার খবরটা যেন মাঝে মাঝে পাই। তুমিই এখন সেই অদৃশ্য রজ্জু যা আঁকড়ে ধরে আমি মহাশূন্যে ঝুলছি।.....নিরবলম্বন হবার সাধনা করিনি আমি....”

এই চিঠি থেকে অমিলার কিছু খবর এবং কিছু পরিচয় পাবে। তার চেক বুকটা আমার কাছে আছে। কিন্তু একটা চেকও এখনও কাটিনি। দরকার হয়নি। যা রোজকার করি তাতে আমাদের তিনজনের রাজহালে চলে যাচ্ছে। ক্ষেন্তি রোজ মাছ খাচ্ছে। মাসে একটা করে ফিস্ট (feast) হয়, তাতে বস্তিসুদ্ধ সবাই খায়। রাস্তার ছোঁড়াগুলোকে প্রায়ই আইসক্রীম খাওয়াই। মুঠো মুঠো লজেন্‌স্ বিতরণ করি। একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার জগ্‌জিৎ সিংয়ের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। তাকে 'নান্' আর মাংস প্রায়ই খাওয়াই হোটেলে। তারই মধ্যস্থতায় আমি কলকাতার পাঞ্জাবী আনডার-ওয়ার্লডের (under-world) সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সে জগতের অধিবাসীরা বলিষ্ঠ, ভয়ঙ্কর, নির্ভীক, নিষ্ঠুর—কিন্তু মাহাপুর্সজির (মহাপুরুষজির) জন্যে তারা সব করতে প্রস্তুত। ওরা সবাই আমাকে মহাপুরুষজি বলেই ডাকে! বুঝেছি নিঃস্বার্থ ভালবাসায় পৃথিবী জয় করা যায়। আমি আরও দুটো বিদ্যে ওদের জন্যেই শিখেছি—হোমিওপ্যাথী আর হাত-দেখা। কোনটাতেই তেমন বিশেষ যে পটুত্ব অর্জন করতে পেরেছি তা নয়। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি, মাঝে মাঝে লেগে যায়। এতেই ওরা খুশি। যখন লাগে না তখনও ওদের বিশ্বাস টলে না। কারণ ওদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আমার বিদ্যের উপর নয়, ভালবাসার উপর। আমি যে জগতে এখন আছি সেখানে মেকি কিছু নেই। আছে জীবন-যুদ্ধের আপোষবিহীন নির্মম সংগ্রাম, আর তারপরে আছে নিখাদ ভালবাসার আর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অজস্র অসংযত প্রকাশ। ভালবাসাটা নিখাদ কিন্তু তোমাদের মাপকাঠিতে হয়তো অনাবিল নয়। তোমরা অনেক সময় তোমাদের হাস্যকর নিয়মের নিক্তিতে ওজন করতে গিয়ে হিমালয়কেও বাতিল করে দাও, কারণ তা তোমাদের নিক্তিতে আঁটে না। দোলের সময় যে কাণ্ড করে ওরা তাকে তোমরা 'বীভৎস' বলবে, তাড়ি খেয়ে জগদেও যে ধরনের খিস্তি করে, মদ খেয়ে দিনু রিক্‌শাওলা যে ভাবে হাউ হাউ করে কাঁদে তা তোমাদের সভ্য নাসাগ্রকে কুঁচকে দেয়, কারণ তোমাদের মতে ওসব ভালগার (vulgar)। সাজানো ড্রইংরুমে বসে পরস্ত্রীদের সঙ্গে সভ্য সমাজের ভদ্রসন্তানরা মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অথবা কচুরি সিঙাড়ায় কামড় দিতে দিতে যে সব ন্যাকা ন্যাকা মুখস্থ করা বুলি আওড়াও এবং তার সঙ্গে দু' একটা রবীন্দ্রনাথের গান বা দু'একজন বিদগ্ধব্যক্তির বক্তৃতা জুড়ে দিয়ে যে কাণ্ড কর, 'সংস্কৃতি' আখ্যায় সে সব বার্তা নামজাদা খবরের কাগজে ছাপা হয় হয়তো। আমার মতে জগদেও আর দিনুর স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস ওই একধরনেরই জিনিস এবং মেকি নয় বলে তার একটা সত্য রূপ আছে। সে রূপ দেখবার দৃষ্টি তোমরা হারিয়েছ, তোমরা

ছোট্ট একখানা ঘর বার বার মুছে তার চারিদিকে বাজার-থেকে-কেনা নানারকম জিনিস সাজিয়ে তথাকথিত যে সুরুচির পরিচয় দাও সে সুরুচি অত্যন্ত ঠুনকো, তা প্লাস্টিকের ফুল প্ল্যাস্টিকের পাখি দেখে বাহবা বাহবা করে কিন্তু আসল ফুল আসল পাখি চেনে না। প্যান্ট শার্ট পরে সারাদিন ভীড়ে ধাক্কাধাক্কি করে তথাকথিত সভ্যলোকেরা সন্ধ্যের পর তাদের ফ্ল্যাটের খাঁচায় ফিরে দু চারটে বাজে সাময়িক পত্রিকার পাতা উলটে অথবা রেডিওর গান শুনে অথবা মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার দেখে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করে কিন্তু তা অস্বাভাবিক অবাস্তব কাল্পনিক আত্মপ্রসাদ, তারা নিজেকেই ঠকায়, ভাবে তাদের আত্মা এতে বুঝি প্রসন্ন হচ্ছে, কিন্তু অত সহজে আত্মা প্রসন্ন হয় না। যে আত্মা ভূমাকামী তা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আনন্দ পায় না। ওই ভদ্রসন্তানদের মধ্যে সুস্থ প্রাণের প্রকাশ দেখিনি। বরং ওই জগদেও, দিনু, জগ্‌জিৎ, রাস্তার ওই দুষ্টু ছোঁড়ারা, ক্ষেন্তি, নবুর মা (এ পাড়ার ঝিদের নেত্রী) ঢের বেশী প্রাণবন্ত। এদের নিয়েই দশ বছর কাটল আমার। আমি বুঝেছি এরাই দেশের শক্তি। যে মধ্যবিত্ত সমাজ আগে দেশের মেরুদণ্ড ছিল সে মধ্যবিত্ত সমাজ চোখে ঠুলি বেঁধে দাসত্বের ঘানিতে ঘুরে ঘুরে নিজের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানদের রাজত্বকালে এই মধ্যবিত্ত সমাজ আর একটু জীবন্ত ছিল, কারণ মুসলমানদের অত্যাচারটা খোলাখুলি অত্যাচার ছিল, তারা মন্দির ভাঙত, মন্দিরের দেবতাদের নিয়ে গিয়ে মসজিদের সিঁড়ি বানাত, জিজিয়া কর আদায় করত, হিন্দুকে কাফের বলত, হিন্দুর মেয়ে বউকে টেনে নিয়ে গিয়ে জোর করে হারেমে পুরত—এই প্রচণ্ড মারের বিরুদ্ধে যে প্রবল একটা প্রতিবাদ ঘনিয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্ত সমাজের মনে তার প্রকাশ নানারকম হয়েছে। রাজা গণেশ প্রমুখ হিন্দু জমিদারদের বিদ্রোহে আর অস্পৃশ্যতার কট্টর কঠোরতায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবও মুসলমানযুগে, তা-ও বিদ্রোহ, নূতন ধরনের বিদ্রোহ, হাত বাড়িয়ে শত্রুকে বুকে টেনে নেবার আন্দোলন। যদিও তাতেও শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। তারপর ইংরেজ এল। যতক্ষণ তারা শত্রু ছিল ততক্ষণ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মন জীবন্ত শজারুর মতো কাঁটা উঁচিয়ে তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কিন্তু ইংরেজ চতুর ব্যবসায়ীর জাত। তারা অবিলম্বে ভোল বদলে ফেললে। আমাদের হিতৈষী সাজল তারা। আমাদের ইংরেজি শেখাল, আমাদের চাকরি দিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা গদগদ এবং বিগলিত হয়ে যা যা করলাম তা অবশ্য সাময়িক মোহ। ইংরেজের স্বরূপ আবিষ্কার করতে দেরি হয়নি আমাদের। কংগ্রেস আমরাই গড়লুম। তারপর এল লর্ড কার্জনের প্রচণ্ড পদাঘাত—বাংলা দু'ভাগ হয়ে গেল। এসব ইতিহাস তো তুমি জানই। কিন্তু এর শেষ ফল কি হয়েছে? আমরা স্বাধীনতা-নামধেয় কিছু একটা পেলাম বটে, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু যা নিয়ে হয়েছিল সেই বঙ্গভঙ্গই করে দিয়ে গেল ওরা শেষ পর্যন্ত। আর আমাদের নেতারা সেটা মেনে নিয়ে হুড়মুড়িয়ে গদিতে উঠে বসলেন। শুনতে পাই মহাত্মা গান্ধী নাকি দেশভাগে আপত্তি করেছিলেন, যদি করেও থাকেন সেটা ক্ষীণ আপত্তি, তিনি অত্যন্ত সব তুচ্ছ কারণে প্রায়োপবেশন করতেন, এটাতেও যদি তিনি ফাস্ট আনটু ডেথ (fast unto death) করবেন বলে মনোবল সংগ্রহ করতে পারতেন তাহলে হয়তো দেশ-ভাগ হত না। তা তিনি করেননি। দেশভাগের ফলে বাঙালীরা—যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল—তারাই আজ সব দিক থেকে মার খাচ্ছে। তারা প্রাণপণ করে যে দই সংগ্রহ করেছিল নেপোরা তা খাচ্ছে। তাদের মন

ভেঙে গেছে তাই। হতাশ আর ব্যর্থতার ক্ষোভে আচ্ছন্ন হয়ে তারা আধুনিক কবিতা লিখছে এখন, তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যাদের মধ্যে আমি এখন বাস করছি তারা ততটা নষ্ট হয়নি। তাদের দেখে আমার আশা হয়েছে, মনে হয়েছে এরাই আবার গড়বে নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ। এদের মধ্যেই আবার দেখা দেবে নূতন রামমোহন, নূতন বঙ্কিম, নূতন ক্ষুদিরাম, নূতন বাঘা যতীন, নূতন চিত্তরঞ্জন, নূতন নেতাজি। পুরাতন মধ্যবিত্ত সমাজ পচে গেছে। বহুকালের দাসত্ব, ইয়োরোপের চোখে নিজেদের আধুনিক প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা, নানারকম হুজুকের অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন, বিষতুল্য বিলাসের মারণক্রিয়া, মেকি সভ্যতার অন্তর্নিহিত পশুত্ব এদের জীর্ণ করে ফেলেছে। এদের দ্বারা আর কিছু হবে না। কিন্তু যে নূতন সমাজ আমি আবিষ্কার করেছি, মনে হয়ে তারা কিছু করতে পারবে। তাদেরই কিছু খবর আমার এই পাণ্ডুলিপিতে পাবে। ভাই, আসল কথা রাবণ বধ করতে হবে, তারপর সীতা উদ্ধার। আগে বানরবাহিনীর পরিচয়টা নাও। ওরা আর কিছু না পারুক বিকট একটা আর্তনাদ করবে, যা তোমরা পারনি। পাপীকে সাজা দেবার জন্য একটা যে বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল বোমারু বারীনের দল, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে মনোভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি'—এদের মধ্যেও সেই মনোভাবের প্রদীপ্ত রূপ দেখছি ঘনকৃষ্ণ মেঘের কোলে সূর্যোদয়ের মতো। এদের নিয়ে নূতন অনুশীলন সমিতি গড়েছি আমি এত বড় দম্ভ বাক্য উচ্চারণ করবার সাহস নেই আমার। কিন্তু যা করেছি তা যে নিতান্ত তুচ্ছ নয় এর প্রমাণ আশা করি তোমাকে দিতে পারব একদিন। পতিতুণ্ডির মতো সৎ মহৎ এবং বৃহৎ লোক আমি বেশী দেখিনি। ও খুব কম কথা বলে, কিন্তু যেটা বলে সেটা সত্য কথা এবং কাজের কথা। ওকে মনুষ্যরূপী ডায়নামো বলে মনে হয়। ডায়নামোর মতই নীরব, ডায়নামোর মতই শক্তিধর! মাঝে মাঝে এ-ও মনে হয় ও বোধ হয় নির্বিকার সন্ন্যাসী, ওর মন সেই উঁচু পর্দায় বাঁধা যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলতে পারে—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুভব করতে পারে 'শিবোহম্ শিবোহম্', যার স্বাভাবিক প্রবণতা অনাসক্ত অনাড়ম্বর কর্তব্যপরায়ণতার দিকে। ও গীতার অর্জুনের মতো লোক। বিবেকই ওর শ্রীকৃষ্ণ। এই বস্তির মধ্যে সত্যি সত্যি ও ছোটখাটো ল্যাবরেটরি তৈরি করেছে। প্রতি রবিবারে নানারকম এক্স্পেরিমেণ্ট (experiment) করে দেখায় পাড়ার ছেলেদের। আমিও যাই ওর ক্লাসে। লাল লিট্মাস (litmus) গোলা জল যখন উৎসাকারে একটা নল দিয়ে একটা শূন্য ফ্লাস্কে (flask) ঢুকে নীল হয়ে গেল তখন অবাক হয়ে গেলাম আমরা। পরে শুনলাম ওই শূন্য ফ্লাস্ক্টা শূন্য ছিল না, অ্যামোনিয়া গ্যাসে (Ammonia Gas) ভরতি ছিল। সেটা না কি অ্যালকালি (alkali) যার সংস্পর্শে এলে লাল লিট্মাস্ নীল হয়ে যায়। কিন্তু লাল জল ওই অ্যামোনিয়া ভরা ফ্লাস্কে ঢুকল কি করে? প্রশ্ন করল রিক্শওলা রামেশ্বর। পতিতুণ্ডি জবাব দিলে—আমি ওর উপরে বরফ জল ছিটিয়ে দিলুম যে। ঠাণ্ডায় সব জিনিস সঙ্কুচিত হয়। অ্যামোনিয়া গ্যাসটাও সঙ্কুচিত হয়ে গেল, ভিতরে খানিকটা জায়গা খালি হল, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ভ্যাকুয়াম (vacuum)। প্রকৃতি কোথাও খালি জায়গা থাকতে দেন না, তাই ওই লাল লিটমাসগোলা জল তার ভিতরে ঢুকে নুন যেমন জলে গুলে যায়, অ্যামোনিয়া গ্যাসও তেমনি। জল ঢুকতেই অ্যামোনিয়া গ্যাস জলে গলে গেল, আরও ভ্যাকুয়াম হল, আরও জল ঢুকতে লাগল। আমরা

তো অবাক। চুম্বক নিয়েও নানারকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দেখায়। একটা ব্যাটারি কিনেছে, ইলেকট্রিসিটিরও নানা লীলা দেখছি আমরা। তাছাড়া ও বম্‌ (bomb) তৈরি করেছে। জিগ্যেস করলে বলে—একটা বিয়ের জন্যে করছি। কার বিয়ে? জিগ্যের করতেই ও হেসে উত্তর দিলে—"এ বিয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন আগে লিখে গেছেন।

যবে বিবাহ চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ হে মোর মরণ
তাঁর কত মত ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে
তাঁর ববম্‌ ববম্‌ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ
তাঁর বিষাণে ফুকারি ওঠে তান
ওগো মরণ হে মোর মরণ।"

বিলোচন আর একবার বিবাহ করতে আসবেন। তখন এই বোম্‌ ফোটাব।"

"বিলোচন আবার তৃতীয় পক্ষ করবেন না কি?"

এর উত্তরে গান গেয়ে উঠলেন সাঁইবাবা—

পাখির থাকে দুটি পক্ষ
বিলোচনের পক্ষ নাই
লক্ষ পাখায় উড়ে বেড়ান
পক্ষাপক্ষে লক্ষ্য নাই।

এ হেঁয়ালী তখন বুঝতে পারিনি। এখন ক্রমশ বুঝছি। শিবহীন দক্ষযজ্ঞেরও আসল অর্থ সাঁইবাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন একদিন। বলেছেন শিবহীন যজ্ঞ পণ্ড হবেই। যা শিবহীন অর্থাৎ মঙ্গলহীন, যাতে কারো ভালো হয় না তা শিবই ধ্বংস করেন। শিবহীন যজ্ঞের মধ্যেই সে ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে। আরও অনেক কিছু বুঝেছি। তার কিছুটা তোমাকেও বোঝাবার চেষ্টা করেছি এতক্ষণ ধরে। নিজের উপলব্ধি অপরের মনে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত করা যায় না এটা আমি জানি, তবু চেষ্টা করছি একটি আশায়। কারণ এটাও আমি জানি প্রেম নিঃশব্দে প্রেমাস্পদের কাছে প্রণয়ীর মর্মবাণী বহন করে। তোমাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, এটা মিথ্যা কথা নয়, অলীকও নয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কি এ খবরটা কুয়াশায় ঢাকা এখনও। তাই সন্দেহ হচ্ছে আমার উপলব্ধিটা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে কি না। একদিন অবশ্য স্পষ্ট করবই সেটা। আমার যে কথাগুলো বুদ্বুদের মত ফুরফুর করে উড়িয়ে দিচ্ছি সেগুলো আসলে যে বুলেট তার নিঃসংশয় প্রমাণ তোমাকে একদিন দেবই। এখন এখানেই থামি। যদিও থামতে ইচ্ছে করছে না। অফুরন্ত ধারায় বয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তোমার দিকে—তোমার ধৈর্যের যে একটা সীমা আছে একথা মন মানতে চাইছে না। তবু থামলাম এখন। সময় করে পাণ্ডুলিপিটি নিশ্চয় পোড়ো।

তিন

পাণ্ডুলিপিটি খুলিয়া পড়িতে যাইতেছিলাম এমন সময় কুশলা আসিয়া প্রবেশ করিল। কুশলা একটা কলেজে প্রফেসরি করে। সে-ও নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় সে জগৎ রুটিনের (routine) জগৎ, প্রাণহীন যন্ত্রের নিয়মেই সে চলে, সেখানে কোমলতার বা দুর্বলতার স্থান নাই। আমরা এক বাড়িতেই বাস করি, কিন্তু তাহার সহিত আমার ক্বচিৎ দেখা হয়, কথাবার্তা প্রায় হয়ই না। আমার এক ছেলে এক মেয়ে। কুশলাই তাহাদের অভিভাবক। কুশলার ব্যবস্থাতেই তাহারা হস্টেলে থাকে। কুশলার মতে হস্টেলে থাকাও একটা ট্রেনিং। তাছাড়া আমার স্ত্রী যখন বাঁচিয়া নাই, তখন উহাদের দেখাশোনা কে করিবে। আমি যে দেখাশোনা করিতে পারি তাহা কুশলা বিশ্বাস করে না। তাহার মত পুরুষরা এসব পারে না। এসব মেয়েদের কাজ। কুশলার সঙ্গে তর্ক করি নাই। তর্ক করিলে বলিতে পারিতাম বোর্ডিং হস্টেলের দেখাশোনাও তো পুরুষে করে। এমন কি মেয়েদের হস্টেলের নেপথ্যেও একাধিক পুরুষের কর্তৃত্ব বর্তমান। তর্ক কিন্তু করি নাই, কারণ জানি তর্ক করিলে কুশলার জেদ আরও বাড়িয়া যাইবে। আর একটা কারণও আছে। কুশলা আমার ছেলেমেয়ের ভার লওয়াতে আমি যেন বাঁচিয়া গিয়াছি। নির্বিঘ্নে-তাহাই করিতেছি যাহাকে ভদ্র ভাষায় সাহিত্যসেবা বলা হয়। যতটা পারি সাহিত্যের সেবা অবশ্য করি, কিন্তু কুলিগিরি কেরানীগিরিও করিতে হয়। সাহিত্যের বাজারেও কুলি কেরানীরা আছে এবং তাহাদের বাজার দর সাহিত্যসেবকের বাজার দর অপেক্ষা বেশী। বস্তুত বিশুদ্ধ সাহিত্যসেবকদের বাজার দর প্রায় নাই বলিলেই চলে। তাই লোকের—বিশেষত স্ত্রীলোকের এবং লাইব্রেরির পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এমন জিনিসও লিখিতে হয় যাহা খুব উঁচুদরের সাহিত্য নহে। একটা দৈনিক পত্রিকার সহিতও যুক্ত হইয়া আছি। তাহাতে নানারকম রিপোর্ট লিখি, মাঝে মাঝে আধুনিক হইবার চেষ্টা করি, মাঝে মাঝে অতি-বিজ্ঞ সাজিয়া মূর্খতার পরিচয় দিই। কিন্তু এসব না করিলে রোজগার হয় না। আগে একটা সাহেবের আপিসে ভালো চাকরি করিতাম। সেখানে ভালো মাহিনা ছিল, ইজ্জতও ছিল। এখন সাহেবরা তাঁহাদের ব্যবসায় গুটাইয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবসায় দেশী লোকের হাতে পড়িয়াছে। তাহারা অভদ্র। মাহিনা কম দেয়। ইজ্জতও নাই। তাই সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছি। সাহিত্যের হাটেই ঘুরিয়া বেড়াই, যখন যাহা পাই রোজগার করি। মোটামুটি সুখেই আছি। অবান্তর কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের কথা সাতকাহন করিয়া বলিবার সুযোগ পাইলে আমরা ছাড়িতে চাই না। আশ্চর্য, আমাদের স্বভাব।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া পাণ্ডুলিপির পুলিন্দাটি খুলিতে যাইব এমন সময় কুশলা প্রবেশ করিল।

"একটু আগে কে এসেছিল দাদা—"

"পাইলট মুখার্জি। বুজু এই সব পাঠিয়েছে—"

কুশলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। যে তীক্ষ্ণ তীব্রতা ইদানীং তাহার চোখেমুখে সর্বাঙ্গে প্রকট হইয়া থাকিত তাহা সহসা যেন তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে নীরবে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "ওকে তুমি আর প্রশ্রয় দিও না দাদা—"

"ও চিঠিতে যা লিখেছে তার থেকে মনে হয় ইচ্ছে করলেও ওকে আর প্রশ্রয় দিতে পারব না। ও আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে"

কুশলা নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ আমার মনে হইল—ভিতরে-ভিতরে ও যেন পুড়িতেছে। ওর চোখমুখের প্রখরতা যেন অন্তর্নিরুদ্ধ দহনের দীপ্তি। প্রফেসার ঘোষাল উহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু কুশলার সম্মতি মেলে নাই। প্রফেসার ঘোষাল আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওর মনের মধ্যে একটা মশাল জ্বলছে। সেই মশালকেই ও আঁকড়ে ধরে আছে। সাইকো-এনালিসিস (psycho-analysis) করলে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে—হয়তো ও সহজ হতে পারবে"

সাইকো এনালিসিস করিবার সুযোগ তিনি কিন্তু পান নাই।.... বুজুর পাণ্ডুলিপিটা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলাম। মনে হইল চিঠিতে যাহা সে লিখিয়াছে তাহারই বাস্তব রূপ সম্ভবত সে ইহাতে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

পড়িতে শুরু করিলাম।

চার
পাণ্ডুলিপি

আমি ডায়েরি লিখিতে বসিনি। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিকে সুন্দর করে ফোটাবারও সামর্থ্য আমার নেই। বড় বড় লেখকরা 'জার্নাল' নাম দিয়ে যা লেখেন তত বড় মর্যাদাও এ লেখার নেই। আমি যে জীবন আজকাল যাপন করছি, যারা আমাকে ঘিরে আছে সদা-সর্বদা, তাদেরই কথা লিখছি। তাতেও আমি যে খুব সফলকাম হয়েছি তা-ও মনে হয় না। কারণ যাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছি তাদের এত রং, এত রূপ, এত বৈচিত্র্য, তাদের চরিত্রের এত বিভিন্ন দিক, এবং সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা অপরূপ অভিব্যক্তি, তার প্রচ্ছন্ন মহিমা এত ভাস্বর যে তা বর্ণনা করবার শক্তি থাকলে আমি বড় লেখক হতে পারতাম। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা যেমন বিরাট একটা ব্যাপারের আনাচে-কানাচেতে ঘুরে দু'একটা স্ন্যাপ-শট্ (snap-shot) ফোটো তুলে আনে, আমিও অনেকটা তাই করেছি। এতে ওদের খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে মাত্র। ওদের সঙ্গে না মিশলে ওদের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না।

শীতলের কথাই প্রথমে বলি। শীতল রোগা লম্বা লোক। মাথার সামনের দিকটায় চুল নেই। পিছনের দিকে লম্বা চুলে জটা হয়ে গেছে। রোগা মুখটায় দাড়ি গোঁফও আছে খাবছা-খাবছা। নাকটা খাঁড়ার মতো। আজানুলম্বিত বাহু, কিন্তু বাহু দুটো খুব শীর্ণ, পা দুটোও তাই। মনে হয় রক্তমাংসের নয়—কাঠের বা বাঁশের যেন। প্রকাণ্ড ঢোল্লা কালো একটা জামা গায়ে দেয়, সেটা আলখাল্লার মতো। হাঁটু পার হয়ে পায়ের গোছের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুলে থাকে সেটা। কাপড় না পরলেও চলত, কিন্তু তবু কাপড় একটা পরে। কখনও কাপড়, কখনও কৌপীন, কখনও হাফপ্যান্ট। যখন যা জোটে। কোনও ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে ও ভালো স্কেয়ার-ক্রো (scare-crow, যাকে চলতি বাংলায় বলে কাকতাড়ুয়া) হতে পারত। কিন্তু ও কোথাও দাঁড়ায় না, সমস্ত দিন হেঁটে বেড়ায় কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায়, যা পায় কুড়িয়ে নেয়, ওর খাওয়া দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই কুড়িয়ে-পাওয়া। সেকালে যে

উঞ্ছবৃত্তি-ধারী সন্ন্যাসীদের উচ্চসম্মান দেওয়া হত—শীতল সেই শ্রেণীর লোক—কিন্তু এ যুগে ধূর্ত বণিকরা উচ্চসম্মান পেয়ে থাকে, শীতলরা তুচ্ছ হয়ে গেছে। আমরা তুচ্ছ করলেও কিন্তু শীতলরা তুচ্ছ হয়ে যায়নি। কারণ তুচ্ছ-উচ্চ একটা তুলনামূলক ব্যাপার, কার চেয়ে তুচ্ছ বা কার চেয়ে উচ্চ এই হল সাধারণ মাপকাঠি, ও মাপকাঠিতে শীতলকে মাপা যায় না, কারণ সে কারও চেয়েই উচ্চ নয়, কারও চেয়েই তুচ্ছ নয়। সে জীবনের নিম্নতম স্তরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এমন একটা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত যে-সিংহাসন অটল, কারণ তা কারও কৃপার উপর দাঁড়িয়ে নেই, তা দাঁড়িয়ে আছে নিজের জোরে নিজের পায়ে। তোমরা না খেয়ে না গায়ে দিয়ে যা রাস্তায় ফেলে দাও তাই তার সম্বল। আর এ সম্বল অফুরন্ত। কারণ রাস্তায় ফেলে দেওয়ার প্রবৃত্তি তোমাদের কোনও কালে কমবে না, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তোমরা রাস্তায় জিনিস ফেলে দেবে ক্রমাগত। কাক-শকুনিদের কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, শীতলদের কাছেও থাকা উচিত। শীতলের ভাব ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। রবিবার দিন সে খবরের কাগজের তৈরি প্রকাণ্ড একটা নৌকোর মতো টুপি মাথায় দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিছিল বার করে— মার্চের তালে তালে বলে, চলো চলো সামনে চলো, সামনে চলো, সামনে চলো। 'সামনে'টা মাঝে মাঝে 'সামলে' হয়ে যায়। ছেলের পাল নিয়ে মাঝে মাঝে সে বড় রাস্তাতেও বের হয়। ছেলেমেয়েরা ওকে ভালবাসে কারণ ও রাস্তা থেকে নানারকম জিনিস কুড়িয়ে এনে ওদের দেয় রোজ। কাচের টুকরো, খেলনা-ভাঙা, চমৎকার ছুরির বাঁট, টিনের কৌটো, আয়নার টুকরো, রঙীন ফিতে, ছবি, বাঁশী, ব্যাট-ভাঙা, ফাটা রবারের বল—আরও কত কি। মাঝে মাঝে ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিছিল বার করে। উদ্দেশ্য খানিকটা হৈ হৈ করে ঘুরে আসা। শীতলের আর একটা কাজ হচ্ছে রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনের গোদ-ওলা পায়ে গরম তেল মালিশ করা। এর পরিবর্তে রাজলক্ষ্মী ঠাকরুন ওকে নিজের ঘরের বারান্দাটায় বিনা পয়সায় শুতে দেয়। রাজলক্ষ্মী ঠাকরুন এ বস্তির একজন বাড়িউলি। স্থূলাকৃতি মহিলা, মুখটাও হাতির মতো। প্রকাণ্ড নাকটাকে শুঁড়েরই অপভ্রংশ বলে মনে হয়। দু'পায়ে গোদ, কোমরে বাতের ব্যথা। শীতল ওর পায়ের গোদে তেল মালিশ করে। একদিন বলেছিল—কোমরটাতেও একটু তেল দিয়ে দেব? ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল রাজলক্ষ্মী—পোড়ারমুখ হাড়হাবাতে, আস্পর্ধা তো কম নয় তোর! আমার কোমরে হাত দিতে চাস! তোর পেটে পেটে এত কুমতলব! ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেব, জানিস? শীতল রাগ করেনি। হেসে বলেছিল, দাও না, কাল থেকে কেষ্ট মুদির বারান্দায় গিয়ে শোব। রোজই ডাকে সে। যাই না তোমার জন্যে! তীব্রতর ঝঙ্কার দিয়ে রাজলক্ষ্মী বলে ওঠে—দূর হ, এখনি দূর হ তুই, ঘাটের মড়া, যমের অরুচি, উনি আমার জন্যে যান না! যা, যেখানে খুশি যা—এক্ষুনি যা—। শীতল হাসি মুখে বসে থাকে, কোথাও যায় না। রোজই সন্ধেবেলা রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনের পায়ে তেল মালিশ করে। হঠাৎ একদিন দেখলাম রাজলক্ষ্মী সদয় হয়েছেন, কোমরটাও পেতে দিয়েছেন, শীতল হাসিমুখে দলাইমলাই করে যাচ্ছে। শীতল একদিন এসে আমাকে জিগ্যেস করল—আপনি ছেলেমেয়েদের পড়ান শুনেছি। কেন পড়ান? তার মুখে এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করিনি। এর উত্তরও হঠাৎ মুখে জোগাল না আমার। খানিকক্ষণ নীরবে তার মুখের দিয়ে চেয়ে রইলাম। শীতলের চোখের দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য জ্বলজ্বল করছিল, অনুভব করলাম উত্তর না দিয়ে উপায় নেই। যে উত্তর সবাই চিরকাল দিয়েছে সেই

উত্তরটা দিয়ে কিন্তু বেকুব হয়ে গেলাম; বললাম—লেখাপড়া শিখলে জ্ঞান হয়। শীতল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল—জ্ঞান কি? মুশকিলে পড়ে গেলাম। মাথা চুলকে বললাম—জ্ঞান মানে, সব বিষয়ে জানা। মানে—। শীতল প্রশ্ন করলে, বিষয় কি? আবার মাথা চুলকে বললাম—যা আমরা দেখি, শুনি, ভাবি তাই বিষয়। সেই সবকে আরও ভালো করে জানা, আরও ভালো করে শোনা, আরও ভালো করে ভাবার নাম জ্ঞান। শীতল বললে—আরও ভালো করে কি জানা যায়? ওই ভাঙা পাইপটার সম্বন্ধে আরও ভালো করে কি জেনেছেন আপনি, আর জেনে থাকলেই বা লাভ কি, ও পাইপ আগে কি ছিল আর পরে কি হবে তা জেনে সময় নষ্ট করে কি হবে। তার চেয়ে যা যেমন আছে, যার যতটুকু দেখছি বুঝছি তাই মেনে নেওয়াই তো ভালো। আমি থতমত খেয়ে গেলাম ওর কথা শুনে। হঠাৎ কুয়াশার ভিতরে পড়লে লোকে যেমন দিশাহারা হয়ে যায়, আমারও অনেকটা তেমনি হল। মনে হল আমাদের 'লজিক' দিয়ে ওকে বোঝাতে পারব না। একটা কথা মনে পড়ে গেল। দিন কয়েক আগে আমাদের বস্তির কাছে একটা যাত্রা হয়েছিল—পালা 'রাবণবধ'। লক্ষ্য করেছিলাম শীতল সেই পালা তন্ময় হয়ে উপভোগ করছিল এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বললাম—কথাটা অন্যভাবেও বলতে পারি। লেখাপড়া শিখলে রাবণবধ করা যায়। রামই জ্ঞান। আর সীতা আমাদের প্রাণ। রাবণ বধ না করলে সীতাকে উদ্ধার করা যাবে না। রাক্ষস রাবণ আমাদের প্রাণকে বন্দী করে রেখেছে লঙ্কার গারদে, অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে, তিলে তিলে মেরে ফেলছে। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওই রাবণকে মেরে সীতা উদ্ধার করবার জন্যে। রামেরই আর একটা নাম জ্ঞান। রাজা দশরথ যজ্ঞ করে তবে রামচন্দ্রকে পেয়েছিলেন। যজ্ঞ মানে তপস্যা। তপস্যা না করলে জ্ঞানলাভ হয় না। আমি যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি তারও ওই উদ্দেশ্য, রামকে পাওয়া। রাবণবধ করে সীতা উদ্ধার করতে হবে।

কথাটা শুনে শীতলের চোখ দুটো নির্নিমেষ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—ও, তাই বুঝি। এতক্ষণে বুঝলুম। কিছুদুর গিয়েই সে ফিরে এল আবার। জিগ্যেস করল—রাবণ কোথায় থাকে। লঙ্কায়? লঙ্কা কোথায়? বললাম—লঙ্কা এখানেই আছে, এই কলকাতায়। শীতল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল—তাই নাকি! আচ্ছা। বলেই চলে গেল।

দিনকতক পরে একটা নয়া পয়সা এনে আমাকে দিয়ে বললে, 'আপনার ইস্কুলে দিলাম! তারপর থেকে সে যখনই পয়সা কুড়িয়ে পায় আমাকে দিয়ে যায়! আর একটা প্রশ্ন সে জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে একদিন। বলেছিল, আচ্ছা, একটা ধন্ধ আমার মিটছে না। রাম তো রাবণকে মেরে ফেলেছিল। আবার সে এল কি করে! বললাম, সে রাবণ তো মরেই গেছে। এ নূতন রাবণ। কোথাও ময়লার স্তূপ জমলে যেমন সেখানে পোকা জন্মায়, তেমনি যেখানে পাপ জমে সেখানেই রাবণ জন্মায়। তাকে মারবার জন্যে রামকে আবার নতুন করে ডাকতে হয়। তাকে ডাকবার জন্যেই তো লেখাপড়ার আয়োজন। শীতল ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর জিগ্যেস করল, পাপ কি? এর সহজ উত্তর দেওয়া সহজ নয়। একটু ভেবে বললাম—আমাদের মনের কুমতলবগুলো যখন আমাদের সুবুদ্ধিকে মেরে ফেলে তখনই পাপের জন্ম হয়, আর সেই পাপ থেকে রাবণ জন্মায়। শীতল আবার প্রশ্ন করল—কুমতলব কি? বললাম—যে মতলবের পাল্লায় পড়লে আমাদের নিজেদের অনিষ্ট হয়,

অপরেরও অনিষ্ট হয় তাই কুমতলব। পণ্ডিতরা ওই মতলবগুলোকে আমাদের শত্রু বলেছেন। ছ'টা শত্রু আছে আমাদের। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। শীতল বলে উঠল—শত্রু শত্রু কথার মানে বুঝি না। তবে খানিকটা বুঝলুম। শীতল সেদিনও মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। শীতল নির্বোধ নয়। ওই সেই 'সব পেয়েছি' দেশের লোক যেখানে কোনও চিন্তা বা প্রশ্নের জটিলতা জীবনের প্রবাহকে বাধা দেয় না। চিন্তা বা প্রশ্ন যে আসে না তা নয়, মেঘের মতো আসে, আমার মেঘের মতো চলে যায়। শীতলকে প্রায়ই দেখতে পাই না, ও সমস্তদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। যখন পয়সা কুড়িয়ে পায় তখনই সেটা আমাকে দিয়ে যায়। সেদিন একটা ছেঁড়া কার্পেটের আসন নিয়ে এসেছিল। বললে, এটা দামী জিনিস, এর উপর বসেই আপনি পড়াবেন। তাই পড়াই।

শীতলকে সম্মান করি। মনে মনে ভয়ও করি। অনুভব করি ও আমার চেয়ে অনেক বড়।

ক্ষেন্তির বন্ধু সোনা একটি আশ্চর্য মেয়ে। ছেলেপিলে হয়নি। আঁট-সাঁট যৌবন সর্বাঙ্গে এখনও অম্লান। ঝি-গিরি করে। একটা অদৃশ্য নিষেধের বেড়া ঘিরে আছে তাকে। আমার দিকে চেয়ো না, আমার দিকে এগিয়ো না, আমার দিকে হাত বাড়িও না, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না—এধরনের অনেক রকম অদৃশ্য বিজ্ঞপ্তিও টাঙানো আছে সে বেড়ার গায়ে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেরই সেটা দেখতে পাওয়া উচিত। কিন্তু সোনা জানে যে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মধ্যেও পাজি লোকেদেরও অভাব নেই। তাই পেট-কাপড়ে সে একটা ছোরা নিয়েও বেড়ায়। আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করিনি। বরং তাকে এড়িয়েই চলেছি বরাবর। ক্ষেন্তির কাছে সে আসে, দূর থেকেই তাকে লক্ষ্য করি। দূরত্বটা অবশ্য মানসিক দূরত্ব, অতটুকু বাড়িতে দৈহিক দূরত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু সে মানসিক দূরত্বটুকুও ঘুচে গেল একদিন। ক্ষেন্তি এসে বললে—সোনাকে আমি অ আ ক খ থেকে পড়িয়েছি। ও বাংলা মোটামুটি পড়তে পারে। খবরের কাগজ, শরৎবাবুর বই বেশ গড়গড় করে পড়ে। অঙ্কও কিছু কিছু শিখেছে। ইংরেজি পড়াতেও শুরু করেছি ওকে। কিন্তু ওর ইচ্ছে হয়েছে বাড়িতে পড়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার। আপনি কোনও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? ঝি-গিরি করতে ওর আর ভালো লাগছে না। বিশুর মাইনে কিছু বেড়েছে, দুধ-ঘি-ছানার কন্ট্রোল হওয়াতে উপরিও বেশ পাচ্ছে আজকাল। ও বলছে, সোনা যদি পড়তে চায় পড়ুক যা খরচ লাগে আমি দেব। বিশুর ইচ্ছে আপনিই ওর ভারটা নিন। আমার সাহস হল না। কারণ আমি নিজেকে চিনি। অন্তরের পশুটা এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে বটে কিন্তু কখন যে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গর্জন করবে সে বিষয়ে তখন ততটা নিশ্চিন্ত ছিলাম না এখন যতটা হয়েছি। সোনা আমাদের পাড়ার সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মোহিনী, তার সান্নিধ্যে আসার সাহস হল না। ঘি আর আগুনের উপমাটা যে অর্থহীন নয় তা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই জানতুম। তাই দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। যেখানে আমি একটা আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করছি, সেখানে আমিই যদি পা পিছলে পড়ে যাই বড়ই হাস্যকর হবে সেটা। বললাম, সোনার ভার আমি নিতে পারব না। ওর অন্য ব্যবস্থা কর। নিবারণবাবুকে বল না, উনি তো কোন ইস্কুলের হেডমাস্টারের বাড়িতে রোজ পাঁউরুটি দেন শুনেছি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে হলে তো প্রাইভেটে 'টেস্‌ট' দিতে হবে তুমি তো জানই। ওই স্কুলের মাস্টাররা যদি ওকে প্রাইভেট পড়ায়, টেস্‌টে পাস করে যাবে।

আমি তোমাকে যখন কোচ করেছিলাম তখন আমার অনেক সময় ছিল এখন তো সময় নেই। সকালে দেশবন্ধু পার্কে যেতে হয়, দুপুরে বেহালার ট্রামে কয়েক জন ছেলেমেয়েকে পড়াই, তাছাড়া দুপুরে স্কুল আছে, রাত্রে দুজন ছেলে আসে পড়তে। সময় কই। সোনার কথা তুমি নিবারণবাবুকে বল গিয়ে। ক্ষেন্তি সোজা হয়ে নেংচে দাঁড়িয়ে উঠল। সাপের ফণাটা উদ্যত হয়ে রইল ক্ষণকাল তারপর সে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলে গেল। মনে হল একটা ঢেঁকি যেন আমার প্রস্তাবটার উপর মুষল প্রহার করতে করতে চলে গেল। দুদিন পরে শুনলাম বিশু একজন প্রফেসারের শরণাপন্ন হয়েছে। তিনি না কি বিলেতফেরত। একজন বড়লোকের পোষ্যপুত্র, আর একজন বড়লোকের ঘরজামাই, তাছাড়া বাংলা সংস্কৃতির সুন্দরবনে একটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার না কি তিনি। সভায় সভায় ক্রমাগত ল্যাজ আছড়ে আছড়ে চীৎকার করেন—এই দেখ, জার্মানির আধুনিক সাহিত্য, এই দেখ আফ্রিকার আধুনিক আর্ট, এই দেখ ইংল্যান্ডের নিও-রিয়্যালিজম্—এই দেখ হেন, এই দেখ তেন। তোমরা এখনও বঙ্কিম রবীন্দ্র নিয়ে বসে আছ ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘেঁটুবনে। ও দেশে টলস্টয়, গ্যয়েটে, দান্তে, ডিকেন্স, বহুদিন আগে বাতিল হয়ে গেছে। অর্থাৎ রত্ন একটি। শুধু রত্ন নয়, জহুরীও। —সোনার ভার নিতে তিনি রাজী হয়ে গেছেন শুনলাম। চোঙা-প্যান্টপরা ঠোঁটে-ধবল কালো সুঁটকো ছোকরাটিকে দেখেছিলাম একদিন। একটা কাঁধ সর্বদাই যেন উঁচু হয়ে আছে, ঠোঁটের একটা কোণও উঁচু। বিদেশী সভ্যতার ডাস্টবিন থেকে এই সব মাল আমাদের সমাজে সর্বদাই আবির্ভূত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নানাবেশে আবির্ভূত হয়ে নানারকম গোলমাল করছে, আর আমরা সেইসব কুৎসিত কদর্যতাকে মাথায় তুলে নাচছি। এইটেই আজকাল আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আমাদের স্বদেশী মহামান্য মহামহোপাধ্যায়ের খাতির করি না, খাতির করি এই সব ওঁছা-ছোঁচাদের। দিনকতক পরে লক্ষ্য করলুম সোনাকে একটা গাড়ি এসে নিয়ে যায়। সেখানে ওই বিলাতফেরত ছোকরার তত্ত্বাবধানে দু'জন শিক্ষক নাকি তাকে পড়ায়। আমি মনে মনে ভয় পেয়ে গেলুম। কিন্তু ক্ষেন্তিকে কিছু বলতে সাহস হল না আমার। সে তো প্রথমে ওকে আমার কাছেই এনেছিল। বিশুকে একদিন জিগ্যেস করলুম, সোনার লেখাপড়া কেমন হচ্ছে। বিশু কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে চেয়ে রইল আমার দিকে। লক্ষ্য করলাম সে হাত দুটো মুঠো করছে আর খুলছে। এর দ্বারা সে কি প্রকাশ করতে চাইছে বুঝলাম না। তার চোখের দৃষ্টিতে মনে হল একটা কাতরতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। বললাম, কি, ব্যাপার কি। সোনার লেখাপড়া—। হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বললে, সোনা পড়তে চায় না, উড়তে চায়। আমি বাধা দিই নি, কারও উচ্চকাঙক্ষার পথে বিঘ্ন হতে আমি চাই না। সোনা যেন না মনে করে যে, আমি তাকে বিয়ে করেছি বলে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করব। আমি তার স্বামী, তার পায়ের শিকল নই। আবার সে তার হাত দুটো মুঠো করে করে খুলতে লাগল। বললাম, কিন্তু স্বামী হিসেবে তোমার একটা কর্তব্য আছে। স্ত্রী যদি বিপথে যায়—। আবার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বিশু বললে,—কোনটা বিপথ, কোনটা সুপথ তা ঠিক করবার আমার অধিকার নেই। আমি ঘুষ নি, দুধে জল মিশিয়ে দুধ চুরি করি, খাঁটি ঘি-এ ভেজিটেবল অয়েল মেশাই। আমারও পদস্খলন হয়েছিল, সিফিলিস হয়েছিল, গণোরিয়া হয়েছিল। সেই জন্যেই সোনার ছেলেপিলে হয়নি। ছেলেপিলে হলে সোনা হয়ত সুখে থাকত। এই বস্তির নোংরামির মধ্যে

একা একা ওর দম আটকে আসছে। ও ভাবছে লেখাপড়া শিখে বাইরের জগতে গিয়ে ও শান্তি ভাবে। ক্ষেন্তিদি ওকে উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন,—বাইরের আকাশ অনেক বড়। বড় আকাশে উড়ে দেখুক, শেষ পর্যন্ত তো আমি আছি। বাইরের আকাশ বড় সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আকাশের ঝড়ঝাপটাগুলোও বড়। সে আকাশে বাজ ওড়ে, সে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে শিকারীরা গুলি ছোঁড়ে উড়ন্ত পাখি মারবার জন্যে। বিশু আর কিছু বলতে পারল না, ক্রমাগত হাত মুঠো করে করে খুলতে লাগল সে। দেখলাম তার মুখে একটা অপ্রস্তুত হাসি সম্ভবত তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে রয়েছে। আমি বললাম—আমি ওর পড়ার ভার নিতে পারতাম, কিন্তু আমার যে মোটে সময় নেই, দেখতেই তো পাচ্ছ, ভোর থেকে উঠেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হয়। বিশু বলল—আপনার সময় থাকলেও ও আপনার কাছে থাকত না। ও রোজই আমার কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করত আমার পড়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমি বাইরের দুনিয়াটা একটু দেখতে চাই। বাইরের দুনিয়াটা দেখবারই ওর কৌতুহল বেশী। ওই যে প্রফেসারের কাছে ওঁকে দিয়েছি সেই প্রফেসার আমার কাছ থেকে খাঁটি দুধ, খাঁটি মাখন, খাঁটি ঘি নিয়ে যান, আমি যে চুরি করে ওসব বেচি তা জেনেও নিয়ে যান, যদিও খুব বিদ্বান বিলেত-ফেরত অধ্যাপক, কিন্তু চোরাই মাল কিনতে ওঁর দ্বিধা হয়নি একদিনও। আমার স্ত্রীর কথা শুনে উনি বললেন, নিয়ে আসুন তাঁকে, দেখি একটু আলাপ করে। আলাপ করলেন। তারপর বললেন, আমি ব্যবস্থা করে দেব। খুব ভালো ব্যবস্থা। ব্যবস্থা ভালোই করেছেন। একটা ক্রাইসলার গাড়ি এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছে। দুজন মাস্টার ওকে পড়াচ্ছে। আমি তাদের মাইনে দিতে চেয়েছিলাম, দিতে পারিনি। মাইনে নিচ্ছে না। রোজ বড় গাড়িটা আসছে। সোনাকে জিগ্যেস করলুম—পড়া কেমন হচ্ছে। 'খুব ভালো' বলে হাসলে সে একটু। কিন্তু দেখলাম ওর চোখ দুটো জ্বলছে। ওর জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ ও আরও জোরে হেসে উঠল। বলল—ভয় নেই।—আমি নিজেকে বাঁচাতে পারব! আমি জানি ও পারবে। কিন্তু—। আবার হাত মুঠো করে করে খুলতে লাগল বিশু।

সোনার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। ক্ষেন্তির সঙ্গেও হয় না। খুব ভোরে ওর জন্যে গাড়ি আসে, অনেক রাত্রে সে বাড়ি ফেরে। বস্তিতে ওকে নিয়ে একটা ফুসফুস গুজ্‌গুজের সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ি-উলি রাজলক্ষ্মী না কি শোভাকে বলেছে—প্রথম প্রথম ওরকম মোটর-টোটর আসে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তোর মতই রাস্তায় হেঁটে হেঁটেই ভাত-কাপড় জোটাতে হবে। শোভা খিলখিল করে হাসে। শোভা রূপ-জীবা। কিন্তু বেচারীর রূপই নেই। তবু পাউডার পমেড রুজ কাজল মেখে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন মন্দ দেখায় না। খুব রোগা বলে মনে হয় বুঝি কিশোরী। শোভার ভালই প্র্যাকটিস। কিন্তু ওর প্রধান গুণ—ও রাঁধে ভাল। আমাকে বাবা বলে, মাঝে মাঝে ওর রান্না নিয়ে আসে আমার জন্যে। ওর হাতের কাঁকড়ার ঝাল, ডিমের শুকনো শুকনো ডালনা, ওর হাতের লাউচিংড়ি অপূর্ব। ওর এ গুণের কদর কেউ করে না। পাতানো-বাবাকে মাঝে মাঝে খাইয়ে আর তার মুখে অজস্র প্রশংসা শুনে ওর নারীজন্ম যেন সার্থক হয়ে যায়। ক্ষেন্তি একদিন বলল—ওকে বেশী প্রশংসা কোরো না। ও নিজে না খেয়ে তোমার জন্যে রেঁধে নিয়ে আসে। বললাম—ও নিয়ে এলে আমি তো 'না' বলতে পারব না, ওর দামও দিতে পারব না। তুই বরং ওকে রঙীন শাড়ি-টাড়ি কিনে দিস

মাঝে মাঝে। ক্ষেন্তি মনে হল এতে একটু অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু অবাধ্যতা করেনি, গজগজ করতে করতে দুটো শাড়ি কিনে দিয়েছিল শোভাকে। কোন মেয়ে আর কোনও মেয়ের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না।

ভর্থা (ভারতের অপভ্রংশ সম্ভবত) সেদিন ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে পড়ল আমার ঘরে।

—আমাকে লুকিয়ে ফেলুন শিগ্‌গির, তা না হলে ওরা মেরে ফেলবে আমাকে।

আমি প্রকাণ্ড একটা বড় সিন্দুক তৈরি করেছিলাম। পতিতুণ্ডির যে ফাটা গদিটা আমি দখল করেছিলাম সেই মাপেরই করিয়েছিলাম সিন্দুকটা। সিন্দুকের ভিতর থাকত আমার সংসার। বই, খাতা, বালিশ, পাখা, শতরঞ্জি, আরও নানা জিনিস। তাড়াতাড়ি গদিটা সরিয়ে ভর্থাকে ঢুকিয়ে দিলাম ওই সিন্দুকের ভিতর। তারপর গদিটা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে বসলাম তার উপরে গদিয়ান হয়ে। ভর্থা বাঁই বাঁই করে ছুটতে পারে। যারা তার পিছু-পিছু ছুটছিল তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। একটু পরেই এসে হাজির হল তারা।

'কোথায় গেল শালা—এইদিকেই তো এল'।

আমার ঘরে একজন উঁকি মেরে বলল—"দেখেছেন এইদিকে একটা ছোঁড়া ছুটতে ছুটতে এল—"

বিস্ময়েব ভান করে বললুম—কই না!

কসাই রহিম মিঞা গর্জন করে উঠল—কি সব হাল্লা মাচাচ্ছেন বেফজুল মশাইরা। এটা ভদ্দরলোকের পাড়া। কোনও ছোঁড়া ফোঁড়া আসেনি এদিকে। কেটে পড়ুন। জনতার ভিতর থেকে একজন বললে—একটি ভদ্রমহিলার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে ছোঁড়াটা। ব্যাগটার ভিতর পার্স ছিল। সেই পার্সটা নিয়ে ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই দেখুন সেই ব্যাগটা। ভদ্রলোক একটা ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে দেখালেন। আমি বললাম, না, এদিকে কেউ আসেনি। রহিম মিঞা চোখ পাকিয়ে এমনভাবে চাইলে তাঁর দিকে যে তিনি আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। ভীড় ক্রমশ কমে গেল। রহিমের চোখের অগ্নিদৃষ্টিই ছত্রভঙ্গ করে দিলে তাদের। রহিমের বলিষ্ঠ চেহারা, হামদো মুখ, চেক-চেক লুঙ্গী পরা, ময়লা ছেঁড়া-ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে। আমাদের বস্তিতে এসে মাংস বিক্রি করে রোজ, যদিও সে এ-বস্তির লোক নয় কিন্তু এদের হিতৈষী সে। আমি তার বাঁধা খদ্দের, তাই আমাকে খাতির করে। নিউ মার্কেট থেকে মাঝে মাঝে ভালো 'মাটন্' (mutton) দিয়ে যায় আমাকে। সবাই যখন চলে গেল তখন রহিম এসে বললে—এবাবে ছেড়ে দিন শালাকে। সিন্দুক থেকে ভর্থাকে বার করে দিতেই রহিম তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় মেরে বললে—আর একটু হলে তো গিয়েছিলিরে শালা। ধরতে পারলে ওরা তোকে ছাতু করে দিত যে। বেকুবের মতো একি করলি। যখন হাতসাফাই নেই তখন আমার দোকানে বসে মাংস বিক্রি কর। ক্রুদ্ধ ভিমরুলের মতো তেড়ে গেল তাকে ভর্থা। যে হাত দিয়ে রহিম তাকে চড় মেরেছিল সেই হাতটা সে কামড়ে ঝুলতে লাগল। রহিমের কিল চড় ঘুষি সব ব্যর্থ হয়ে গেল। আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে লাগল রহিম—ছেড়ে দেরে হারামির বাচ্চা। তোকে আমি খুন করব। ভর্থা তবু ছাড়ে না। আবার ভীড় জমে গেল। ভর্থার মা কিক্‌নি (সম্ভবত কৈকেয়ীর অপভ্রংশ) এসে হাউ হাউ করে চেঁচাতে লাগল। গোদা পা ফেলে ফেলে রাজলক্ষ্মী ঠাকুরুনও এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, ওরে পোড়ারমুখো,

ও যে তোর বাপ্, বাপের হাতে কামড়ে ধরেছিস। বাঘ ভাল্লুকেও তো অমন করে না। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—ভর্থা তবু ছাড়ে না। শেষে কিক্‌নি একগাছ ঝাঁটা এনে সপাসপ্ বসাতে লাগল তার পিঠে। আমিও এগিয়ে গিয়ে বললাম—ভর্থা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ঝাঁটার প্রতাপেই হোক বা আমার কথাতেই হোক ভর্থা ছেড়ে দিলে। ছুটে এসে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। রহিমের হাত দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিল। তবু সে মারমুখী হয়ে ছুটে এসে আমার ঘরের কপাটে লাথি মারতে লাগল। কিক্‌নির হাতে তখনও ঝাঁটা—সে তীক্ষ্ণ রিনরিনে কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—খবরদার, আমার ছেলের গায়ে তুমি হাত দিও না বলছি। রহিম থেমে গেল, বিড়বিড় করে অস্ফুটকণ্ঠে বলল—"কস্‌বি হারামজাদী"—তার পর নিজের মাংসের ঝুড়িটা মাথায় তুলে চলে যাচ্ছিল, আমি ডাকলুম তাকে। টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে তার হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম আমার পাঞ্জাবির খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে। রহিম চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল নিঃশব্দে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে নিঃশব্দে চলে গেল। সবাই চলে গেল আস্তে আস্তে। কলকাতা শহরে এইরকমই হয়। তুচ্ছ কারণে ভীড় জমে যায়, আবার একটু পরেই সরে পড়ে সবাই। ভীড় ধোঁয়ার মতো আসে, ধোঁয়ার মতো চলে যায়। দেখলুম—কিক্‌নি কেবল বসে আছে আমার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে। 'ও ভর্থা, কপাট খোলো। কেউ নেই সবাই চলে গেছে।' ভর্থা তবু কপাট খোলে না। 'খোল না বাবা—' কাতর মিনতি ফুটে ওঠে কিক্‌নির কণ্ঠে। তবু কপাট খোলে না। আমি এগিয়ে গিয়ে কপাটে ধাক্কা দিলুম। 'ভর্থা কপাট খোল'। ভর্থা ভিতর থেকে জবাব দিলে—'ওকে চলে যেতে বলুন'। কিক্‌নি এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর উঠে গেল। কিক্‌নি যে ভর্থার মা আর রহিম যে ভর্থার বাবা, এ খবর আমি জানতুম না। এধরনের খবরে আগে বিস্মিত হতাম। এখন হই না। এখন বুঝেছি পৃথিবীতে সব রকম হয়, সব রকম হতে পারে। আমি এখন যে পরিবেশে আছি সেখানে কে কার ছেলে কে কার বাবা এ সব খুঁটিনাটি খবর মূল্যহীন মনে হয়। যে মানুষটাকে হাতের কাছে পেয়েছি সে কেমন লোক এইটেই আমার কাছে এখন বড় কথা। সেদিন ভর্থার একটা বড় পরিচয় পেয়ে গেলাম অপ্রত্যাশিতভাবে। ভর্থা এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাদের নানারকম আবদার আমি সহ্য করি। টিকিট কিনে ফুটবল ম্যাচ দেখতে নিয়ে যাই। সিনেমা দেখবার জন্য প্রায়ই পয়সা দিই। তাছাড়া টুকিটাকি নানারকম খাবার প্রায়ই ওরা পায় আমার কাছে। ওদের খুশী করা খুব সহজ। এক ঠোঙা চানাচুর, বা দু, একটা লজেনস্ পেলেই ওরা মহা খুশী। ওরা সভ্যসমাজের ভদ্র নর-নারীর মতো বস্তুতান্ত্রিক নয়, ওরা কোনও উপহার পেলে সে জিনিসটার দাম কত তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, ভাবগ্রহী জনার্দন ওরা, উপহারদাতার মনের ভাবটি ধরতে পারে, ভালবাসার দান যত তুচ্ছই হোক তা নিয়ে আত্মহারা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ওদের আছে। আমাদের (মানে, ভদ্রলোকদের) তা নেই। আমরা আত্মহারা হতে ভুলে গেছি। আমরা কোনও জিনিসের প্রাণখুলে প্রশংসাও করতে পারি না। কিক্‌নি চলে যাওয়ার পর ভর্থা কপাট খুলে মুখ বাড়াল। মা চলে গেছে দেখে কপাটটা সম্পূর্ণ খুলে বেরিয়ে এল। সেই প্রথম আমার চোখে পড়ল— ছেলেটা বড্ডই রোগা। বুকের হাড় পাঁজরা গোনা যায়, কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। প্রথম যেদিন ওকে দেখেছিলাম সে দিনের কথাও মনে পড়ল। রাস্তার একটা হাইড্রান্ট থেকে ময়লা জল

উৎসাকারে ছিটিয়ে পড়ছিল চারদিকে, তাতেই উলঙ্গ ভর্থা মহানন্দে স্নান করছিল হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর এই অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর স্নানলীলা দেখছিলাম মুগ্ধ হয়ে। এমন সময় একটা ট্যাক্সি পিছন থেকে এসে আমাকে ধাক্কা দিল। জোরে ধাক্কা দিলে মরে যেতাম, কিন্তু অদৃষ্টে মৃত্যু ছিল না, তাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। তারপর যা হল তা অভাবনীয় কাণ্ড। ভর্থা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ট্যাক্সি ড্রাইভারের টুঁটিটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে এমন চীৎকার শুরু করে দিলে যে বিরাট ভীড় জমে গেল একটা। লিংস (Lynx) নামে একরকম নেউলজাতীয় জানোয়ার আছে। সে জানোয়ার আমি চোখে দেখিনি, তার ছবি দেখেছি, ভর্থাকে সেদিন ওই লিকলিকে সরু লিংসের সমগোত্র মনে হয়েছিল। ভর্থা চীৎকার করে বলছিল—আমাদের গুরুজিকে এই খুনে ড্রাইভারটা এখুনি মেরে ফেলেছিল। আমার কোথাও তেমন লাগেনি, কিন্তু দেখলাম ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়ির একখানা কাচ ওরা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। ভীড়ের হাত থেকে আমিই বাঁচালাম ড্রাইভারটাকে। তারপর ভীড় যখন কমে গেল ভর্থাকে জিগ্যেস করলাম, তুমি আমাকে চেন নাকি? ভর্থা বললে, বাঃ আমি তো ওই পাড়াতেই থাকি। আমার বন্ধুরা—মিণ্ড, কৌটো, খাটাস্, হুতুম সবাই সন্ধ্যেবেলায় যায় আপনার কাছে। আমিও গেছি দু একদিন। আপনি কি চমৎকার চমৎকার গল্প বলেন। কাস্‌বাংকার গল্পটা খুব ভাল লেগেছিল আমার। ক্যাসাবিয়াঙ্কার গল্পটা বলেছিলাম ওদের একদিন। সেদিন কপাট খুলে যখন ভর্থা বেরিয়ে এল তখন বললাম—তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন। কি খাস সমস্ত দিন। ভর্থা হেসে উত্তর দিলে—যা পাই তাই খাই। ফুলুরি, বেগনি, চানাচুর, এই সবই বেশী খাই। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে একবার কেক আর চা খেতে চেয়েছিলাম। আমি যে দাম দিয়ে খাব তা বিশ্বাসই করলে না লোকটা। বললে—ভাগ শালা। বলে হি হি করে হাসতে লাগল। দুলে দুলে হাসতে লাগল। আমার কাছে সন্দেশ ছিল কিছু। নামী দোকানের দামী সন্দেশ। বললাম—এইগুলো খা। কেকের চেয়ে অনেক ভালো। গপ্ গপ করে খেতে লাগল। গোটা দশেক সন্দেশ ছিল। জিগ্যেস করলে—সবগুলো খাব? বললাম খা। খাওয়া শেষ করে সে তার ছেঁড়া হাফপ্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট রঙীন পার্স বার করলে একটা। বললে এইটে নিন। আপনার স্কুলের ফাণ্ডে চাঁদা দিলুম। পার্স খুলে দেখি তাতে একশ টাকার নোট রয়েছে একটা। আর একটা ছোট কার্ড। কার্ডে ঠিকানা লেখা রয়েছে—রানী বিশ্বাস, নিউগী পুকুর লেন। নম্বরটা গোপন রাখলাম। নিউগী পুকুর লেন? একটা মেয়ের ছবি ফুটে উঠল মনে। ভর্থাকে জিগ্যেস করলুম—এতে কত টাকা আছে জানিস? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না—না, খুলে তো দেখি নি। 'একশ টাকা আছে'। সবটাই আপনি নিয়ে নিন। ফের আমি রোজগার করে নেব। ভর্থা ভদ্দরলোক নয়, পকেটমার! কিন্তু টাকা সম্বন্ধে ওর মোহ নেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি চুপ করে আছি দেখে ভর্থা আবার বললে—আমি আরও টাকা এনে দেব আপনাকে। আরও এনে দিবি? টাকা নিয়ে কি করিস রোজ? জুয়া খেলি, সিনেমা দেখি। খাটাস আর হুতুম বড় পাজি। আমার চেয়ে গায়ে জোর বেশী তো। মাঝে মাঝে আমার টাকা কেড়ে নেয়। আর আমাদের ওস্তাদ রোখোন মিশিরকেও দিতে হয় রোজ দু'টাকা করে। ধরা পড়লে ওই আমাদের বাঁচায়। ও নাকি পুলিষকে ঘুষ খাওয়ায়। পুলিশরা নাকি আবার তাদের উপরওয়ালাদের খাওয়ায়। আমাদের পকেট-মারা টাকাটা সবাই ভাগাভাগি করে নেয়। আমরা

চোর, আর সবাই সাধুপুরুষ। আবার দুলে দুলে হাসতে লাগল ভর্থা। ভর্থা আমার প্রধান অস্ত্র। ও নানা জায়গা থেকে নানারকম খবর যদি এনে না দিত তাহলে আমি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যটি করতে পারতাম না। ওর বন্ধুরা—মিগু, কৌটো, খাটাস আর হুতুমও আমার সহায় হয়েছে। ওরা এমন সব খবর এনে দিয়েছে যা ওরা ছাড়া আর কেউ পারত না। ওরাই রাবণের খবরটা এনে দিয়েছে আমাকে—যে রাবণ দেশের প্রাণলক্ষ্মীকে বন্দী করে রেখেছে অশোক বনে নয়, কুবেরের কারাগারে; আজ দেশের ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য বরুণ যে রাবণের মাথায় ছাতা ধরে আছে, যে রাবণ যথেচ্ছাচারী কিন্তু যার মুখে ধর্মের মুখোশ.........।

একটা দোকানে পান কিনছিলাম সেইখানেই বুরুশ বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়ে গেল। দেখলাম তিনি আমাকে ভোলেননি। নমস্কার করে বললেন, মহাপুরুষের আবার যে দেখা পাব তা প্রত্যাশা করিনি। কোথায় থাকেন? বললাম সর্বত্র। প্রশ্ন করলেন, হাওয়ার মতো? উত্তর দিলাম না, ধুলোর মতো। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। তারপর পকেট থেকে একটা নিমন্ত্রণপত্র বের করে দিলেন আমার হাতে। বললেন, যদি যান সুখী হব। দেখলাম একটা নামজাদা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটা সভা হবে নাকি সন্ধ্যাবেলা। বীরেশ বিশ্বাস সেখানে প্রধান বক্তা। সভাটা যেখানে হচ্ছে সেটা কোনও নামজাদা 'হল্' নয় মনুমেন্টের নীচেও নয়। জায়গাটা গলির গলি তস্য গলিতে। বললাম—এ জায়গায় সভা করেছেন কেন? ভালো 'হল' বা 'স্টেডিয়ম' পেলেন না? বুরুশ বিশ্বাস হেসে বললেন, না ও সব জায়গায় আমাদের স্থান নেই। খবরের কাগজের পাতাতেও আমাদের সংবাদ ছাপা হয় না। আজকাল যাঁরা ওসব 'হলে' বক্তৃতা করেন বা সংবাদপত্রের শিরঃসংবাদে যাঁরা বিরাজ করেন—তাঁদের অধিকাংশেরই নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবে, কিন্তু—কি বলব—বিধাতা এরকম পরিহাস হামেশাই করছেন। ওই দেখুন না বিরাট জগদ্দল লরিটা চমৎকার ওই গাড়িটার পথ আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওইটেই এখন এই পথ-সংবাদপত্রের হেডলাইন। কিছুক্ষণ পরে ও অবশ্য থাকবে না। ওর কথা লোকের মনেও থাকবে না। গলিটার নাম দেখে ঘাবড়াবেন না। গলিটা একটা নরক বিশেষ। কিন্তু ওই নরকই আমরা গুলজার করে ফেলব একটা ছোট্ট ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি বসে। আপনি গেলে খুব খুশী হব। ধর্ম-প্রতিষ্ঠান দেখে চমকাবেন না। সবাই প্রায় মুর্গি খাই, কিন্তু মিথ্যে কথা বলি না। আপনি এলে সত্যিই আনন্দিত হব। আপনি সেদিন যে স্ফুলিঙ্গের কথা বলেছিলেন সেটা মনে এখনও জ্বলছে। প্রতিশ্রুতি দিলাম যাব। নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের পাড়াতেও আপনার পায়ের ধুলো দিতে হবে। বুরুশ বিশ্বাস বললেন—ধুলো তো নেই, পীচের দাগ আছে। সেটা চামড়ার মর্মে গিয়ে ঢুকেছে। সহজে তা দেওয়া যাবে না, দিতে চাইও না।

বিকেল চারটেয় বুরুশ বিশ্বাসের সভায় গিয়েছিলাম। বুরুশ বিশ্বাস যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন সেটি পরে ছাপা হয়েছিল সাইক্লোস্টাইলে। আমিও এক কপি পেয়েছিলাম। উদ্ধৃত করছি তার থেকে—

আপনাদের এ সভায় বক্তৃতা করবার চাপরাস আমার নেই। আমার বয়স যদিও সত্তরের কাছাকাছি তবুও কোনও গুরুর কাছে আমি মন্ত্র নিই নি, কোনও ধর্মসংঘের খোঁয়াড়ে নিজেকে

আবদ্ধ রাখবার প্রেরণা পাইনি। নানা মাঠে আমি যথেচ্ছ চরে বেড়িয়েছি। বিশেষ করে সাহিত্যের মাঠে। যে আনন্দ, যে প্রেরণা, আমরা ধর্মের কাছে প্রত্যাশা করি, সাহিত্য-চর্চা করেই তা আমি প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি! কিন্তু আমাদের সমাজে বাস করতে গেলে ধর্মকে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই। আমার কপালে যে হলদে রঙের ফোঁটাটা দেখছেন সেটা আমার পিসিমা পরিয়ে দিয়েছেন ষষ্ঠীপুজোর আশীর্বাদস্বরূপ। আপনাদের অনেকেই এখনি বললেন যে, আমাদের দেশ থেকে ধর্ম লোপ পেয়েছে। আপনাদের সংঘের খাতায় যাঁরা নাম লেখাননি তাঁরা যদি অধার্মিক হন তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু যা আমাদের ধরে রাখে বা যাকে আমরা ধরে থাকি তাই যদি ধর্ম হয় তাহলে তা আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে আছে। বস্তুত ও ছাড়া আর কিছু নেই বোধ হয়। সে ধর্মের চেহারা অবশ্য নানারকম, কিন্তু ধর্মের ছাপ-মারা একটা নীতি-নির্দিষ্ট পথ ধরেই চলতে আমরা অভ্যস্ত। আর সে ধর্মের মূল লক্ষ্য, বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকাটাই অধিকাংশ লোকেব কাছে একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা বন্য পশু ছিলেন, তাঁরাও বেঁচে থাকবার জন্যে নখদন্ত প্রস্তর-লগুড়ের সহায়তায় যা করতেন, এই অতি-আধুনিক সভ্যযুগে আমরাও তাই করছি। আমরা দাবি করি আমাদের 'প্রগতি' হয়েছে—সে প্রগতি আমাদের ওই সাবেক অস্ত্রগুলোর রূপ পরিবর্তন করতে সমর্থ করেছে, তাদের সংহার শক্তিও আমরা বহুগুণ বাড়াতে পেরেছি, এ সমস্তকে আবৃত করে একটা নীতি-সুগন্ধী ধর্মের আবহাওয়াও আমরা সৃষ্টি করেছি। হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডন (White man's burden), পীসফুল কো-একজিস্টেন্স্ (Peaceful co-existence), শাদা পায়রা উড়িয়ে শান্তির অমৃতময় বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, প্রকাণ্ড সশস্ত্র বাহিনী রেখে অহিংসার ঢং করা—এই ধরনের প্রগতির মহিমা খবরের কাগজে, রেডিওতে, নেতাদের বক্তৃতায়, নানারকম সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞাপনে নানা সুরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা ওসব ধাপ্পায় ভুলি না। মুখে যাই বলি মনে মনে একটি ধর্মকেই আমরা আঁকড়ে থাকি—সেটি হচ্ছে জীব-ধর্ম। বাঁচতে হবে। মাদুলী পরে হোক, মানত করে হোক, সিন্নি দিয়ে হোক, চাকরি করে হোক, খোশামোদ করে হোক, ঘুষ দিয়ে হোক, যেমন করে হোক বাঁচতেই হবে। জ্ঞানী শাস্ত্রকাররাও আমাদের কথায় সায় দিয়ে বলেছেন—আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে বেদ হিন্দুধর্মের মূল বলে কীর্তিত সেই বেদের অগ্নি দেবতার মাধ্যমে যজ্ঞস্থলের আবহনীয় বেদীতে ইন্দ্র-বরুণ-অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি শক্তিধব দেবতাদের আহ্বান করে বৈদিক ঋষিরা যে প্রার্থনা জানিয়েছেন সে প্রার্থনারও সারবস্তু—আমাদের বাঁচাও, আমাদের শতায়ু কর, অমিতবীর্য কর। আমাদের দেহমনে শক্তি সঞ্চার করবার জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আমাদের অনুকূল কর। পর্জন্য বৃষ্টিধারা বর্ষণ করুক, বসুন্ধরা ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, আমরা যেন শতায়ু হতে পারি, আমরা যেন শত্রু-বিজয়ী হতে পারি। সোমরসের অমৃতধারা আমাদের ম্রিয়মাণ উৎসাহকে যেন বারবার সঞ্জীবিত করে। ভালোভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাকেই সেই অনাদিকাল থেকে অধিকাংশ মানুষই এখনও ধর্মরূপে অবলম্বন করে আছে। আমরা সাধারণ লোকেরাও তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে যে প্রার্থনা প্রত্যহ নানা মন্ত্রে জানাই তারও মর্ম—আমরা বড় অসহায়, বড় আর্ত, হে শক্তিমান দেবতা তুমি আমাদের শোব থেকে, দুঃখ থেকে, রোগ থেকে রক্ষা কর। আমাদের অন্ন দাও, শক্তি দাও, রূপ দাও,

পুত্রকলত্র দাও—এই দেহি দেহি রবই অধিকাংশ লৌকিক ধর্মের ভিত্তি। এই উদ্বাহু ভিখারীর দলকে মাঝে মাঝে বিশ্ববিশ্রুত ধর্মাচার্যগণ অন্য রকম উপদেশও দিয়ে গেছেন। বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনব্যাপী সাধনার যে বাণীমূর্তি আজ আমাদের কাছে দেদীপ্যমান তা অতি সরল, অতি সহজ, তার শোভা অতিশয় সহজবেদ্য, অত্যন্ত মনোহারী। ওঁরা বলছেন—তোমরা সংসার জ্বালায় জর্জরিত তা ঠিক, কিন্তু তবু তোমাদের অনুরোধ করছি তোমরা একটু ভদ্র হও। মিথ্যা কথা বোলো না, চুরি কোরো না, পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরো না, পরশ্রীকাতর হোয়ো না, যতটা পার পরের উপকার কর, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখবার চেষ্টা কর। সবাইকে ভালবাস। ভালবাসাই একমাত্র চাবি যা দিয়ে সকলের হৃদয়-দ্বার খোলা যায়। সে চাবি তোমার মনের মধ্যেই আছে, সেই চাবিটির সন্ধান কর। ভদ্র হও। কিছু ত্যাগ না করলে ভদ্র হওয়া যায় না। যতটা পার পরের জন্য ত্যাগ কর। তোমরা সবাই দুঃখী, পরস্পরকে সাহায্য করলেই তোমাদের দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। সবাই ভদ্র হলে এই দুঃখের অন্ধকারে সুখের আলো ফুটবে। এরই নাম ধর্মাচরণ, এই ভদ্র আচরণই জীবনকে সার্থক করে। এই সহজ সরল আটপৌরে ধর্মকে আমরা যদিও মনে মনে মান্য করি কিন্তু ষড়রিপুর দাপটে এটাও জীবনে রূপায়িত করতে পারি না। কারণ আমাদের মনে কামনার যে রং লেগেছে— এ রং কে যে লাগিয়ে দিয়েছে তা জানি না—সে রংটা খুব পাকা। বহু বহু শতাব্দীর ধোলাই সত্ত্বেও এ রং ওঠে নি। মানবসভ্যতাব বাইরের প্রসাধনটাই একটু চাকচিক্যময়, ভিতরে ভিতরে আমরা অধিকাংশ লোকই এখনও সেই আদিম পশুই আছি। পশুদের চেয়েও হীনতর বলতে পারেন। সত্যিই পশুদের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর আমরা। পশুরা পশুত্বের প্রয়োজন-অনুসারে সহজবুদ্ধি-চালিত যে জীবন যাপন করে, তা মানব-পশুর জীবনের মতো অত ভয়ঙ্কর নয়। পশুরা প্রয়োজনের সময় বা আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র হয় কিন্তু আমরা কারণে-অকারণে পিশাচ। তথাকথিত আধুনিক মানব-সভ্যতা পিশাচ সভ্যতা। রাবণরা এখনও সীতাহরণ করছে, কংসের কারাগারে কৃষ্ণ-জননী দেবকী এখনও বন্দিনী, কুরুসভায় এখনও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করবার প্রচেষ্টা চলছে, এখনও দুর্যোধনেরা ষড়যন্ত্র করছে পঞ্চ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে—অবশ্য সবই হচ্ছে ভিন্ন নামে, ভিন্ন মুখোশের তলায়, আধুনিক শ্লোগান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমারোহসজ্জার অন্তরালে। ধর্মের প্রসঙ্গে যদি ইতিহাসের কথা স্মরণ করি তাহলে দেখব ধর্মের নামে যত পাশবিকতা, যত রক্তপাত, যত নারীধর্ষণ, যত শিশু-হত্যা হয়েছে এমন আর কিছুতে হয়নি। আজও যে-সব যুদ্ধ হচ্ছে তাও ধর্মের নামে, ন্যায়ের নামে। ওই ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে যে, ওই সব ধর্মের শেষ পর্যন্ত যে পরিণতি হয়েছে তা-ও ভয়াবহ। খৃষ্টান ধর্মের ইনকুইজিশন্ (Inquisition). পোপেদের অত্যাচার, এবং পরে ভণ্ড পাদরিদের রাজ্য অপহারক বণিকদের আওতায় বিদেশে গিয়ে হিদেনদের (heathen) আলোকদান করা, আর সেই ছুতোয় প্রতি দেশে আত্মকলহের বীজবপন করা—এসব কথা আজ আর গুপ্তকথা নয়। আমাদের দেশেই বুদ্ধধর্মের ন্যক্কারজনক পরিণতি হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ধর্ম জঘন্য ব্যভিচারের আবিলতা সৃষ্টি করেছিল, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে মুখোশ-পরা ঘোর সংসারী তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এখনও, আমাদের যুগেও, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করে যেসব দল

গড়ে উঠেছে, নানা মিশনে, নানা ধর্মসঙ্ঘে আমাদের চোখের সামনেই যা ঘটছে তাতে স্বচ্ছ-দৃষ্টি লোকেরা যা দেখতে পাচ্ছেন, তা ওই কামনার পাকা রং, তা সেই সনাতন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রসাধনলীলা, সেই সাবেক ষড়রিপুর অত্যাধুনিক কৌশল সংস্কৃতি নামধেয় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ধর্মকে জৈব-প্রবৃত্তিরই একটা উচ্ছ্বাস বলে মনে হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সাধারণ লোকসমাজে ধর্মের একটা ভদ্র প্রভাব আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভদ্র বিবেকী লোক যে একেবারে বিরল তা নয়। তারা সাধারণ সংসারীর জীবনযাপন করে, সমাজের দায়-দায়িত্ব বহন করে, মানীকে শ্রদ্ধা করে. পূজ্যকে প্রণাম জানায়। পূজা-পার্বণে রাস্তায় তারাই দল বেঁধে বের হয়, গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে, মন্দিরে মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য সাজায়। ভগবান কি, আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, এ-সব প্রশ্নের উত্তর তারা হয়তো দিতে পারবে না, কিন্তু তাদের বিশ্বাস-পবিত্র চোখ-মুখের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হবে যে, শত কুসংস্কার সত্ত্বেও ওরাই বোধ হয় জেনেছে ধর্ম কি। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যের ধারা ফল্গুর মতো ওদের মধ্যেই বোধ হয় বইছে। আমাদের সাধারণ জীবনে ধর্মের এইটেই সাধারণ চেহারা—এ ধর্ম নিষ্কাম নয়, সকাম। এ নিজেদের জন্য এবং সকলের জন্যই ভগবানের করুণা প্রার্থনা করে। কিন্তু এ ছাড়াও ধর্মজগতে আর একটা জিনিস আছে যা সাধারণ নয়, যা অসাধারণ। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে যা বিস্ময়কর। তাঁরা যেন মানুষ নয়, তাঁরা যেন মূর্তিমতী আকুলতা। আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথা যাব, সত্য কি, ব্রহ্মাই বা কি, ব্রহ্মাকে জানবার পথ কি—এইরকম অসংখ্য প্রশ্ন তাঁদের পাগল করে তোলে। শুধু ধর্মজগতে নয় সত্য-সন্ধানের যত রকম জগৎ আছে—যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান—সে-সব জগতেও এঁদের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের কেউ বলেন প্রতিভাশালী, কেউ বলেন সাধক, কেউ বলেন পাগল। এঁরাই সন্ন্যাসী, নিজেদের সাংসারিক অস্তিত্ব লোপ করে এঁরাই যুগে যুগে অজানা পথে সহসা বেরিয়ে পড়েন একদিন। সমাজের সাধারণ আইনকানুন এঁদের বাঁধতে পারে না। এঁরাই প্রকৃত বিদ্রোহী। মনের জোর , চিত্তের একাগ্রতা, মনোবৃত্তিকে একীভূত করবার অদ্ভুত ক্ষমতা—চলতি ভাষায় যাকে বলে 'যোগ' এই এঁদের সম্বল। ধন, মান, প্রতিপত্তি, যোগলব্ধ বিভূতি কোন কিছুই চান না এঁরা, এঁদের একমাত্র লক্ষ্য সত্য। এঁরাই সত্যদ্রষ্টা, এঁরাই মানব-সমাজের পথপ্রদর্শক। এঁরা অসাধারণ। এঁদের বাইরের চেহারা একরকম নয়। কেউ খাপে-ঢাকা ইস্পাতের তলোয়ার, কেউ বিষধর সাপের মাথার উপর জ্বলন্ত মানিক, কেউ গভীর সাগরজলের তরঙ্গবিলাসী মুক্তো-গর্ভ শুক্তি, কেউ প্রস্ফুটিত শতদল, কেউ প্রজ্বলন্ত অগ্নি-শিখা, কেউ আকাশচুম্বী পর্বত, কেউ রহস্যময় নিবিড় অরণ্য, কেউ শান্ত স্থির, কেউ অশান্ত উন্মাদ, কেউ সুন্দর, কেউ ভয়ঙ্কর। বাইরের চেহারায় সবাই মানুষ, কিন্তু মনের ভিতর প্রবেশ করুন দেখবেন দু'জন সত্যদ্রষ্টা একরকম নন। বামাক্ষেপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহর্ষি রমণ, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা বিস্ময়কর জগৎ। একই সূর্যকে কেন্দ্র করে হয়তো সবাই ঘুরছেন, কিন্তু মরকতশ্যাম বুধের সঙ্গে জ্যোতির্বলয়শোভিত শনির কোনও মিল নেই। সাধারণ লোকেরা ওঁদের নকল করতে গিয়ে ভণ্ডে পরিণত হয়। কারণ কারও নকল করে সত্যকে জানা যায় না। নিজের জানা দিয়ে, নিজের উপলব্ধি দিয়ে, নিজের সমস্ত সত্তাকে দিয়ে

সত্যকে জানতে হয়। সে 'জানা' নিজের নিঃসংশয় অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই—এ ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খাওয়া চলে না। সত্যকে জানবার হয়তো অসংখ্য পথ আছে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারেরা মাত্র তিনটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞানের পথ, ভক্তির পথ, আর কর্মের পথ। বিপুল অধ্যয়ন, বিশাল প্রতিভা, বিবিধ গবেষণা, কঠিন অধ্যবসায় জ্ঞানের পথে পাথেয়। এই পাথেয় অবলম্বন করে জ্ঞানীরা সাগর মরু পর্বত পার হন। তারপর সত্যের দেখা পান। যখন পান তখন তাঁর সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত গবেষণা, সমস্ত উপকরণ তুচ্ছ হয়ে যায়, যেমন তুচ্ছ হয়ে যায় সিঁড়িটা ছাতে ওঠবার পর। সাধারণ লোকের পক্ষে জ্ঞানের পথ সুগম নয়, কারণ এর জন্য যে মেধা, যে একনিষ্ঠ চরিত্রবল আবশ্যক, তা সকলের আয়ত্তাধীন নয়। ভক্তির পথও সকলের জন্য নয়। ভগবানের বিশেষ দয়া না থাকলে কারও মনে ভক্তি জাগে না। আমি কবি হব বললেই যেমন কবি হওয়া যায় না, তেমনি আমি ভক্ত হব বললেই ভক্ত হওয়া যায় না। ভগবান যেমন বিশেষ বিশেষ মানুষকে রূপ দেন, প্রতিভা দেন, শৌর্য, বীর্য মহিমা দেন, তেমনি বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে অচলা ভক্তির বিপুল-বিশ্বাসও তিনিই সঞ্চারিত করেন। শাস্ত্রে বলেছে ভগবান ভক্তের দাসানুদাস। কিন্তু সে রকম ভক্তি সকলের হয় না। অবিশ্বাসের প্রদাহে, স্বল্পজ্ঞানের অহংকারে, ভক্তির সুকুমার চারা জ্বলে পুড়ে যায়। যিনি প্রকৃত ভক্ত, তিনি নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ। তিনি জানেন ভগবান তাঁর কাছে আসবেনই। তাঁকে আসতেই হবে। তাঁর মাটির ঘরে, তাঁর খোড়ো-চালের বারান্দাতেই আসবেন তিনি, তাঁর সিংহাসনের আসন থেকে নেমে। তিনি জানেন, তাঁকে নইলে তাঁর সৃষ্টির লীলা ব্যাহত হবে। একটি কথা কিন্তু তিনি জানেন না। তিনি জানেন না, কখন কিভাবে তিনি আসবেন, গভীর রাত্রে না নির্জন দ্বিপ্রহরে, ভিখারীর বেশে না রাজার রূপ ধরে, জনতার মধ্যে, না একাকী কোন্ ছদ্মবেশে কোন্ মুহূর্তে যে তিনি আসবেন তার তো ঠিক নেই। তাই তিনি সর্বদাই তাঁর জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করেন, প্রতি মুহূর্তেই তাঁর দেহ, তাঁর মন, তাঁর পরিবেশকে শুচি সুন্দর পবিত্র করে রাখেন। গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রতীক্ষা করাই ভক্তের সাধনা। তাঁর এ প্রতীক্ষা নিষ্ফল হয় না। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন একদিন না একদিন ঘটেই। কিন্তু এই পরমাশ্চর্য অলৌকিক অবিশ্বাস্য ব্যাপার আপনার আমার জীবনেও ঘটবে এ প্রত্যাশা করতে পারি কি? আমরা ক্ষণভঙ্গুর যুক্তি-তর্কপটু অগভীর জলবিহারী শফরীর দল। ভক্তি আমাদের সোফিস্‌টিকেটেড্ (sophisticated)। মনে কোনও সাড়া জাগাতে পারে না। তাই সাধারণ লোকের পক্ষে কর্মের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু কর্ম তো আমরা সবাই করছি কিন্তু কই আমাদের সত্য দর্শন তো হচ্ছে না। গীতা বলেছেন কর্মটি নিষ্কাম হওয়া চাই। নিষ্কামকর্ম মানে উদ্দেশ্যহীন ফল-বিবর্জিত কর্ম নয়। কর্মের অনিবার্য পরিণতি ফলে। গীতার উপদেশ ফললোলুপ হয়ে কর্ম করলে দুঃখ পাবে, তোমার কর্মের প্রেরণা হবে তোমার কর্তব্য। ফল যাই হোক সেদিকে তোমার লক্ষ্য থাকবে না, সেকথা তুমি চিন্তাও করবে না। কর্তব্যই হবে তোমার একমাত্র লক্ষ্য। এই কর্তব্যের চেহারা যুগে যুগে বদলায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে খল কপট আত্মীয়নিধনই ছিল অর্জুনের কর্তব্য। ধর্মকে জয়ী করবার জন্যই অধর্মের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু সে যুদ্ধ নিষ্কাম হওয়া চাই, তার ফলাফল তোমাকে যদি প্রভাবিত করে তাহলে তোমার কর্মের মহাকাব্যে বার বার ছন্দপতন হবে। এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে 'আমিত্ব' ক্রমশ

লোপ পায়, কামনার কলুষ অপসারিত হলে সেই বিরাট সত্যের, সেই ব্রহ্মের আভাস পাওয়া যায়, যিনি সর্বত্র স্বয়ম্প্রভ, কিন্তু চোখে কামনার ঠুলি বাঁধা থাকে বলে যাঁকে আমরা দেখতে পাই না। নিরাসক্ত-অনুভূতির উজ্জ্বল পটভূমিকাতেই তিনি প্রতিভাত হন। যিনি 'নিত্যোহ নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্', যিনি শাশ্বত, যিনি অক্ষত অমলিন চৈতন্যস্বরূপ, তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে নিজের মতে দৃঢ় থেকে নিজের পথে অবিচলিত চরণে চলে আকুল হৃদয়ে, উন্মুখ অন্তরে সদাসর্বদা সমনস্ক জাগরূক থাকতে হবে তবেই হয়তো তাঁকে পাওয়া যাবে। সত্যের সন্ধান, সত্যের উপলব্ধি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পথ অনেক, মতও অনেক। হিন্দু দার্শনিক বলেছেন. যে-কোনও পথে, যে-কোনও মতে চললেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। হিন্দুধর্ম বহুর মধ্যে 'এক'কে পাওয়ার সাধনাই করেছে, নাস্তিত্যবাদও এদেশে মুক্তিলাভের পথ বলে স্বীকৃত। হিন্দুধর্ম শুধু ধিক্কার দিয়েছে ভীতুকে, ভণ্ডকে আর মিথ্যুককে। নির্ভীক সুস্পষ্ট সত্যসন্ধীই প্রকৃত হিন্দু। যুগে যুগে এদের সংখ্যা কমেছে বেড়েছে, কিন্তু এরা কখনও একেবারে লোপ পায়নি। যে মিথ্যার পলি মানব-সমাজকে বারবার ঢেকে দিচ্ছে, এরাই সেই পলি পরিষ্কার করে যুগে যুগে। এরাই সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গুলির সামনে এগিয়ে যায়, ফাঁসিকাঠে ঝোলে, তবু নিঃশেষ হয় না। এরকম হিন্দু শুধু ভারতবর্ষেই নেই, পৃথিবীর সর্বত্র আছে। এরাই মানবজাতির আশা।

সভার পর বেশ ভালো খাওয়া হল। মুর্গির দো-পিঁয়াজি আর পাঞ্জাবি নান রুটি। যে ধর্ম-সংঘের উদ্যোগে সভা হল তাঁরা বড়লোক এবং গোঁড়া নন। তাঁদের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বললেন—সভা করা ছাড়া এখন আর কিছু করবার নেই তাঁদের। উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে চিন্তাশীল লোকদের দিয়ে বক্তৃতা করানো। রাস্তায় বেরিয়ে বুরুশ বিশ্বাসকে বললাম, আপনার বক্তৃতাটি ভালো লাগল।

বুরুশ বিশ্বাস উত্তর দিলেন—খারাপ লাগলেও কিছু আসত যেত না। কারণ আমি টাকা নিয়ে বক্তৃতা করি এবং টাকা অগ্রিম নিয়ে নি। এটা আমার পেশা।

হেসে বললুম, কিন্তু নেশারও আমেজ পেলাম যেন।

"আমার একটি মাত্র নেশা আছে।"—

"কি সেটা?"

"পর-চর্চা"

"আপনি যা যা বললেন তাতে আপনাদের বিশ্বাস নেই?"

"ওতো সব মুখস্থকরা কেতাবী কথা উগরে দিলুম। বিশ্বাস আছে একটি জিনিসে। সেটি এই--"

তাঁর হাতে একটি মোটা লাঠি ছিল, সেইটি তুলে দেখালেন। তারপর হেসে বললেন—"কাদের ভক্তি করি জানেন? যারা রোজ সকালে 'হোজ' পাইপ দিয়ে রাস্তা ধোয়। আর ভয় করি ছারপোকা মশাদের। ওদের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া ডিফেন্স অ্যাক্ট্‌ও অচল। ওরা বেপরোয়া রক্ত-শোষক।"

"ভক্তি আর ভয়ের খবর পেলাম। ভালবাসেন না কাউকে—"

"বাসি বইকি। কিন্তু তারা ভদ্র নয়। কানাই ময়রাটা একটা চোর কিন্তু কি চমৎকার জিলিপি যে করে! কানা কুঁজো গোবরার 'রজনীগন্ধা' কেবিনে গিয়ে তার হাতের তৈরি এক

কাপ চা যদি খেয়ে আসেন, তাহলে তাকে আপনিও ভালবেসে ফেলবেন। ঘোর মিথ্যেবাদী ব্যাটা, সিফিলিস গণোরিয়ার আড়ত একটি, কিন্তু চা করে চমৎকার। যেদিন মেজাজে থাকে সেদিন অপূর্ব কাটলেটও করে। ওদের ভালবাসি। আর ভালবাসি রেমোকে—ভালো ফোটো তোলে, ভালো ছবি আঁকে, কিন্তু খেতে পায় না। অর্থাৎ শিল্পীদেরই ভালবাসি। উঁচুদরের শিল্পী সাহিত্যিকরা আমার নাগালের বাইরে, তাঁদের ভালবাসতে পারি না, ভক্তি করি। আমার স্বভাব হচ্ছে যাদের ভালবাসি তাদের গাল দি, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি। তাদের সঙ্গে খুনসুড়ি করতে না পারলে আমার ভালবাসা চরিতার্থ হয় না। ও গড্—নিজের কথাই ক্রমাগত বলে যাচ্ছি। আর নয় থামলুম।"

থেমে গেলেন বীরেশ বিশ্বাস। আবার চলতে লাগলেন। লক্ষ্য করলাম তিনি ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। সেইজন্যই বোধ হয় লাঠি ব্যবহার করেন।

"খুঁড়িয়ে হাঁটছেন দেখছি, পায়ে ব্যথা আছে না কি!"

"বাঁ পায়ের হাড়টা একদা ভেঙে গিয়েছিল"

"ফুটবল খেলতেন?"

"না—"

"ক্রিকেট?"

"তা-ও নয়। আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারব না, মাপ করবেন"

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন। আমার কৌতূহল ক্রমে ক্রমে অদম্য হয়ে উঠল। হঠাৎ বললাম " বুঝেছি। দাঁড়ান। আপনাকে প্রণাম করব—"।

সত্যিই প্রণাম করলাম তাঁকে। কয়েক মুহূর্তে নির্বাক থেকে বুরুশ প্রশ্ন করলেন—"এর মানে?"

"মানে আমারও পা ভাঙা, শুধু পা নয়, সর্বাঙ্গ। আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ ব্যক্তি। অনেক দেওয়াল ডিঙোতে গিয়ে অনেকবার মার খেয়েছি—"

"কিন্তু আপনি তো খুঁড়িয়ে হাঁটছেন না!"

"আমার সে পা বাইরের পা নয়। আমার সে বিচূর্ণিত সত্তা বাইরে দেখানো যাবে না।"

বুরুশ বিশ্বাস আরও কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—"নারীঘটিত ব্যাপার না কি! বুঝেছি—"

আবার চলতে লাগলেন।

বললাম, "নারীঘটিত ব্যাপার তো বটেই, তাছাড়া আরও অনেক ব্যাপার আছে। সমাজের মাঠে সবাই আমাকে ফুটবলের মতো লাথিয়েছে, ক্রিকেট বলের মতো ঠেঙিয়েছে। দোষ ঠিক আমার নয়। আমার মনে হয়, কামনার পাকা রং যে লাগিয়েছিল দোষটা তারই। কিন্তু তাকে ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। সবাই আমাকে ধরেই ঠ্যাঙাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকে সামনাসামনি পেলে দুর্যোধনের মতো আমিও বলতে পারতুম—জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি, ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তদা করোমি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সামনাসামনি পাওয়ার মতো ভক্তি আমার নেই। আপনার খোঁড়া পা দেখে কেন জানি না আমার মনে হল যে, ওই কামনারই কোনও প্যাঁচে পড়ে আপনার পা-টাও ভেঙেছে। তাই প্রণাম করতে ইচ্ছে হল। আপনি কথাটা গোপন রাখতে চান রাখুন, আমি জোরজবরদস্তি করব

না। করবার অধিকার এখনও অর্জন করিনি। একটি কথা শুধু জেনে রাখুন কামনা-জর্জরিত লোকদেরই আমি ভালবাসি। আমি যেখানে থাকি সেখানে সবাই অত্যন্ত নীচুস্তরের এবং সবাই কামনা-জর্জরিত। কেউ বেশ্যা, কেউ ভিকিরি, কেউ বাড়ি-উলি, কেউ চোর, কেউ পকেটমার, কেউ গুণ্ডা। ওরা সবাই আমার-আপন লোক। ওদের মধ্যেই আমি সেই দুর্লভ জিনিস পেয়েছি যাকে আপনারা নিষ্কাম প্রেম বলেন। আমার কেন জানি না মনে হল, আপনিও বোধ হয় ওদের সমগোত্র তাই প্রণাম করে ফেললুম। প্রেমকে প্রণাম করেই অভ্যর্থনা করতে হয়।''

বুরুশ বিশ্বাস আরও দু'এক মিনিট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার।

আবার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, ''আমার খোঁড়া হওয়াব কারণও প্রেম—''

আবার প্রণাম করলাম তাঁকে।

''এ আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। নারীব প্রেম যাকে খঞ্জ করে সেই খঞ্জই পৌরুষের গিবি-লঙ্ঘন করে শেষে''

''আমার প্রেম নারী-প্রেম নয়। দেশ-প্রেম''

তাঁর চোখমুখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল সহসা। মনে হল সমস্ত মুখটা যেন জমে পাথর হয়ে গেল। মনে হল যেন স্ফিংসের (sphinx) দিকে চেয়ে আছি। স্ফিংস বলল—'আমি সেই বিধ্বস্ত বাহিনীর এক অখ্যাত সৈনিক যারা একদিন বোমার ঘায়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিযাদ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একথা কাউকে বলবেন না। এ নিয়ে আর বাহাদুরি করবার কিছু নেই। আমরা হেবে গেছি। আমরা হারিয়ে গেছি। বিষধর গোক্ষুর এখন লাউ হয়ে গেছে। যে পুলিশ বীরেশ বিশ্বাসের গায়ে গুলি করেও তাকে ধরতে পারে নি, সে পুলিশও নেই, সে বীরেশ বিশ্বাসও নেই। বীরেশ বিশ্বাস এখন লাইফ ইনসিওরেন্সের দালাল, বীরেশ বিশ্বাস এখন পেশাদার বক্তা। সে যা বক্তৃতা করে তা সব সময়ে বিশ্বাস করে না। বুড়ো বয়সে বিয়ে করে এক যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রীর গর্ভে একটা হ্যাংলা ছেলের জন্ম দিয়ে সে এখন এলোপাথাড়ি সবাইকে গাল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি কাকে জানেন? নিজেকে! যমের অরুচি আমি, মরতে পারি নি। যে স্বাধীনতার জন্যে আমার বন্ধুরা ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছে, সে স্বাধীনতার এই রূপ দেখবার পরও বেঁচে আছি। আত্মহত্যা করতে পারি নি, এখনও মরতে ভয় পাই। তুবড়ির মসলা ফুরিয়ে গেছে, পথের ধারে ভাঙা খোলাটা পড়ে আছে তাব! চললুম। গুড বাই।''

আবার হাঁটতে লাগলেন। আমি কিন্তু সঙ্গ ছাড়লাম না। আমিও পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে আবার দাঁড়ালেন বুরুশ বিশ্বাস।

''আপনি কোথা যাবেন''

''আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। আপনি কোথায় থাকেন''

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন বুরুশ বিশ্বাস।

বললেন—''হাওড়ায়—''

''চলুন। আপনার আস্তানাটা দেখে আসি''

বুরুশ বিশ্বাস কোনও উত্তর দিলেন না। নীরবেই দু'জনে হাঁটলাম খানিকক্ষণ। কিছুক্ষণ পরে আবার থেমে গেলেন বুরুশ বিশ্বাস।

"সত্যি কথা শুনবেন? আমার কোন আস্তানা নেই। আমি একটি ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে শুই। আমি এখন হাওড়ায় যাচ্ছি একটা লাইব্রেরিতে। সেখানে ফ্রি রিডিং রুমে বসে দশ বারোটা খবরের কাগজ নিয়ে পর-চর্চা করব। তারপর সময়ে কুলুলে যাব লাইফ ইনসিওরেন্সের এক খদ্দেরের কাছে। তারপর যাব ময়দানের এক গাছতলায়, সেখানে পড়ব আর রাত্রের খাওয়াটা শেষ করব। তারপর ফিরব মঙ্গল সিংয়ের বাইরের ঘরে। সে একটা খাটিয়া দিয়েছে, তার উপরেই শুয়ে পড়ব। কিন্তু ঘুম আসবে না। অসংখ্য ছারপোকা, অসংখ্য মশা—। আপনি আমার সঙ্গে কত ঘুরবেন। ফিরে যান—"

কিন্তু আমি ফিরলাম না।

বললাম—"ফিরতে ইচ্ছে করছে না—"

"বেশ, চলুন তবে। অনেক হাঁটতে হবে। ট্রামে বাসে যাওয়ার পয়সা আমার নেই"

আরও কিছুদূর হেঁটে বললাম—"আমার প্রতি একটু কৃপা করবেন?"

"কি বলুন—"

"আমার কাছে পয়সা আছে। যদি একটা ট্যাক্সি ডাকি—"

"পরের পয়সায় আমি ট্যাক্সি চড়ি না—"

আরও হন হন করে হাঁটতে লাগলেন তিনি। মনে হল আমার কাছ থেকে পালাতে চাইছেন। পালাতে কিন্তু পারেননি। রাস্তায় আর বিশেষ কথা বলবার সুযোগ অবশ্য পাইনি। হাওড়ার লাইব্রেরিতে তিনি যখন গিয়ে ঢুকলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। লাইব্রেরির বারান্দায় একটা বেঞ্চি ছিল আমি তাতেই বসে রইলাম। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম তিনি খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেছেন। ঘণ্টাখানেক নানারকম খবরের কাগজ উলটে-পালটে শেষকালে তিনি লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

"এ কি, আপনি এখানেও এসেছেন—!"

স্মিতমুখে চুপ করে রইলাম।

"নাছোড়বান্দা লোক দেখছি আপনি—"

চুপ করেই রইলাম।

"এ কি আপনার জুতোর স্ট্রাপ্‌টা (strap) ছিঁড়ে গেছে দেখছি। আমি গড়ের মাঠে যাব। আপনিও পিছু পিছু যাবেন না কি আবার। এ জুতো পরে যাবেন কি করে?"

"জুতো হাতে করে নেব"

হাওড়া স্টেশনের কাছে এসে বুরুশ বিশ্বাস একটু সদয় হলেন।

"আচ্ছা, চলুন ওই বাসটায় ওঠা যাক—"

আমি যখন টিকিটের পয়সা দিতে গেলাম আমাকে বাধা দিলেন। নিজেই টিকিট কিনলেন দু'খানা। কিনে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন। আমার বলবার সাহস হল না যে আপনার পয়সায় আমি বাসে চড়ব কেন যখন আপনি আমার পয়সায় ট্যাক্সি চড়তে চান নি। চৌরঙ্গীতে পৌঁছে তিনি এক ঠোঙা চিনে বাদাম কিনে বললেন—"আপনি খাবেন?"

"খাবো"

আর এক ঠোঙা কিনলেন।

"চলুন এবার একটা চায়ের দোকানে ঢুকি—"

ঢুকলাম। চায়ের পয়সাটাও তিনি দিলেন।

তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—"আজ আর সে লাইফ ইনসিওরেন্সের খদ্দেরকে ধরা যাবে না। সে এতক্ষণ" থেমে গেলেন, চীৎকার করে উঠলেন—"হেল্ (hell)!"

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি ব্যাপার?"

"সে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার সময় তার রক্ষিতার কাছে চলে যায়। আজ তাকে ধরা যাবে না। মাঠে গিয়েই বসা যাক। আচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে ঘুরছেন কেন শুধু শুধু বলুন তো—"

"আপনাকে পাব বলে। আপনাকে ভালো লেগেছে। সেই ভালোলাগাটা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে আমাকে। আমি নিরুপায়—"

"তাহলে তো আমার পড়াশোনার দফাও গয়া হয়ে গেল আজ। এই মোটা বই সাতদিনের মধ্যে পড়ে ফেরত দিতে হবে"

দেখলাম গান্থারের (Gunther) ইনসাইড এশিয়া (Inside Asia) বইটা এনেছেন তিনি।

মাঠে গিয়ে একটা গাছতলায় বসলাম দু'জনে।

সভয়ে জিগ্যেস করলাম—"আপনার ফ্যামিলি (family) কোথায় আছে—"

"স্ত্রী আছে স্যানাটোরিয়ামে। ছেলেটা আছে মামার বাড়িতে। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি বাদাম ভাজা আর চা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। যা রোজগার করি তার বেশীর ভাগ দিতে হয় ওই স্যানাটোরিয়ামে। ছেলেটার জন্যেও মাঝে মাঝে দিতে হয় কিছু। তারও শুনছি ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে। তারও হয়তো টি. বি. হবে"

"আপনি যার ওখানে শোন সে আপনার কে হয়?"

"কেউ হয় না। সে বাঙালীও নয়, বিহারী। নাম মঙ্গল সিং। একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার বৃটিশ আমলের লোক; অনেক টেরারিস্টকে নির্যাতন করেছিল লোকটা। আমি যখন জেলে ছিলুম তখন আমাকে ফ্লগ (flog) করেছিল একবার। সে হঠাৎ আমাকে রাস্তায় চিনতে পারলে একদিন। বললে, বাবু সাহেব, আপনারা এতো তক্লিফ করে স্বরাজ আনলেন, এখন রাস্তায় হাঁটছেন। গদ্দিতে গিয়ে বসুন। আপনার দোস্তরা সব তো প্লেনে উড়ছেন। বললাম, ওরা আমার দোস্ত নয়। আমরা দোস্তরা ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছে, আন্দামানে মরে গেছে, জেলে পাগল হয়ে গেছে। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। আমার মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। কখনও শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে, কখনও হাওড়া প্ল্যাটফর্মে, কখনও হুগলি ব্রিজের জেটিতে, কখনও কারো বাড়ির বারান্দার তলায় শুয়ে রাত কাটাই। মঙ্গল সিং হঠাৎ আলিঙ্গন করলে আমায়। বললে, বাবুজি আমার বাড়িতে বাইরের বারান্দায় টুটা-ফুটা একটা ঘর আছে, তাতে খাটিয়াও আছে একটা। আপনার যদি 'হিন্ছা' হোয় সেখানে আপনি শুত্তে পারেন। মঙ্গল সিং ইচ্ছাকে 'হিনছা' বলে, আরও অনেক বাংলা কথা বেঁকিয়ে বলে—কিন্তু সে লোক খারাপ নয়। যে একদিন আমাকে ঠেঙিয়েছিল সে-ই আজ আমাকে বুকে টেনে নিয়েছে। কোনও বাঙালী আমাকে আশ্রয় দেয়নি, কিন্তু ওই 'মেড়ো'টা দিয়েছে। আমাকে খেতে দিতেও চেয়েছিল—প্রথম দিন রাত্রে তার নাতনী রুকমিনিয়া রুটি আর ভুজিয়া এনেছিল আমার জন্যে। তখন যদিও ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলছে তবু আমি বলেছিলাম রাত্রে আমি খেয়ে আসি, আমার জন্যে খাবার ব্যবস্থা কোরো না। অর্থাৎ ওদেরও আমি আপন করতে পারি নি। আসল কথা কি

জানেন কারও মধ্যে ভালো কিছু দেখতে পাই না! মাঝে মাঝে মনে হয় মঙ্গল সিং বোধ হয় আমাকে বিনা-পয়সার পাহারাদার হিসেবেই রেখেছে। কারণ ও রাত্রে কীর্তন শুনতে চলে যায় এক জায়গায়, ফেরে অনেক রাত্রে। আমি ওর বাড়ির বাইরের ঘরে মশা ছারপোকার কামড়ে বিনিদ্র নয়নে ছটফট করি। খাটটা বার করে দিয়েও সুবিধে হয় নি। দেওয়াল বেয়ে ছারপোকা নামে। মঙ্গল সিংয়ের উপরও প্রসন্ন হতে পারি না। এর মানে কি জানেন? আমি নিজেই লোকটা অত্যন্ত খারাপ। মনটাই এমন হয়ে গেছে যে চারিদিকে ময়লা আর ধুলো ছাড়া কিছু দেখতে পাই না। এখানকার শিশুদের মুখেও সরলতা দেখতে পাই না, এখানকার জলও বিষাক্ত মনে হয়, ফুলগুলোও যেন ধুলোমাখা! আমি ঘৃণ্য লোক, আমার সংসর্গ পরিত্যাগ করুন। আপনি সেদিন যে স্ফুলিঙ্গের কথাটা বলেছিলেন তা আমার মনে আছে। আপনার কথা শুনে সেদিন মনে হয়েছিল আপনি অসাধারণ লোক। এই অন্ধকারের যুগে এখনও অগ্নির স্বপ্ন দেখতে পাবেন। আমি পারি না, আমি দেখি সব অঙ্গার, অগ্নি নেই। আমার সঙ্গে থাকলে আপনার অগ্নিও নিবে যাবে। আপনি এবার যান। আমি বইটা শুরু করি—"

"আমার কথাটাও শুনুন তাহলে। আমি অসাধারণ তো নইই, আপনার পায়ের নখের তুল্যও নই। আপনি অগ্নি-যুগের বীর, আমি অতি সাধারণ দুশ্চরিত্র লোক একটা। আপনি ভেঙে গেছেন তা ঠিক কিন্তু আপনি ভগ্ন মহারথ, আর আমি একটা দোমড়ানো মোচড়ানো মরচে-ধরা বিস্কুটের খালি কৌটো। আপনার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। তবু দয়া করে আমার জীবনকাহিনীটা শুনুন আপনি। আমার ঠিকানাটাও রেখে দিন। যদি একদিন যান কৃতার্থ হব"

"আমাকে আপনার জীবনকাহিনী শোনাতে চাইছেন কেন। ও শুনে আমার লাভ কি—"

"আপনার লাভ নেই। কিন্তু আমার লাভ আছে। আমি এখন জীবনের যে স্তরে এসে পৌঁছেছি সেটা বাইরে কুৎসিত কিন্তু ভিতরে খাঁটি। আমার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, হয়তো সেটা দুরাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার কবল থেকে নিজেকে কিছুতেই আমি ছাড়াতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে যে, হয়তো এদের সাহায্যেই আমি আমার জীবনের মহোত্তম কাজ করতে পারব। কিন্তু সেটা যে কি, তা আমার মনে স্পষ্ট হয় নি এখনও। দূর থেকে গন্ধ পাচ্ছি, মনে হচ্ছে বুঝি নন্দনকাননের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি, আবার সন্দেহ হচ্ছে তা কি সম্ভব। ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রশান্ত যামে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে গভীর স্তব্ধতার মধ্যে আসন্ন ঊষার যে পদধ্বনি একদিন শুনেছি, এখন যেন সে পদধ্বনি আবার শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা কিছু হবে। কিন্তু কি হবে, কেমন করে হবে, এ যুগের মহোত্তম কর্ম কি, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট হয় নি এখনও। আপনি হয়তো আমাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।"

বুরুশ বিশ্বাস গানথারকে বাঁ হাঁটুর তলায় চেপে আমার মুখের দিকে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে চেয়ে ছিলেন। বললেন, "আপনি সেন্টিমেন্টাল কবি একজন । কবিরা প্রায়ই কর্মী হয় না। ফেনার উপর ইমারতের ভিত্তিও গাঁথা যায় না! আচ্ছা বলুন, শুনি। সংক্ষেপে বলুন, বেশী ফ্যানাবেন না"

নাম ধাম গোপন রেখে বললাম সব! তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। নমস্কার করে বললেন, "ব্রজেনবাবু, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন একটি। আপনার নাম আমি শুনেছি। শেক্সপীয়রের উপর আপনার বইখানাও পড়েছি। আপনার সঙ্গে এভাবে দেখা হবে তা প্রত্যাশা করি নি। বোমারু বীরেশ বিশ্বাসেরও যে এ দশা হবে তা কে ভেবেছিল? হেঃ, হেঃ, হেঃ হেঃ"

অদ্ভুত হাসি হাসলেন একটা, তারপর বললেন—"এ যুগের মহোত্তম কাজ কি জানেন? শুধু এ যুগের নয়, সব যুগেরই ওটা মহোত্তম কাজ। পারবেন সেটা করতে?"

বুরুশ বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন আবার। আবার দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে হাতটা নাড়তে নাড়তে বললেন—"না, আপনি পারবেন না। আপনি বড্ড বেশী বাক্যবাগীশ, আমরা সবাই বাক্যবাগীশ, আমরা কেবল কথাই বলি, কাজ করতে পারি না। আপনি পারবেন না"—আবার বসে পড়লেন।

"কাজটা কি বলুন না—"

"বহুপূর্বে আদি কবি বাল্মীকি ওর নাম দিয়েছিলেন রাবণবধ। ওই রাবণই আরও নানা নামে বার বার জন্মেছে এবং নিহত হয়েছে আমাদের পুরাণে। বেন, কংস, হিরণ্যকশিপু, দুর্যোধন—এসব নাম আমাদের পরিচিত। আধুনিক ইতিহাসের কাইজার, হিটলার, বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিস্টরা, রাশিয়ার অত্যাচারী জারেরা, তৈমুর, নাদির, নেপোলিয়ন—সব ওই রাবণ। যুগে যুগে ওদের উত্থান হয়েছে, পতনও হয়েছে। ওদের পতন হয়—হবেই—এইটেই আমাদের মস্ত আশ্বাস। ইতিহাসের দিকে চেয়ে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব আজ জোর গলায় বলতে পারছে, রাবণরা যত প্রতাপশালীই হোক না কেন, তাদের আমরা ধ্বংস করবই। বস্তুত রাবণদের উত্থান-পতনকে কেন্দ্র করেই আমাদের সভ্যতার ইতিহাস। বর্তমান যুগে রাবণের ভাই কুবেরই রাবণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সে কোথাও কোটিপতি, কোথাও অর্বুদপতি, কোথাও বৃন্দপতি। টাকা দিয়ে, সে এ যুগের ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য বরুণ অন্ন বস্ত্র হাওয়া আলো সব কিনে ফেলেছে। এ যুগের জ্ঞানী গুণীরা তারই কারাগারে বন্দী। এ যুগের সতীত্বকে সেই উলঙ্গ করে অট্টহাস্য করছে নানা প্রেক্ষাগৃহে, এ যুগের কর্ণ দ্রোণ ভীষ্ম কৃপরাও তারই দলে, তারই প্ররোচনায় এ যুগের অশ্বত্থামা জয়দ্রথরা বধ করছে অভিমন্যুদের, হত্যা করছে দ্রৌপদীর শিশুপুত্রদের, আর্ত পীড়িতদের হাহাকারে চতুর্দিক আজ পরিপূর্ণ, এ যুগের ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আর্তনাদ করছেন, তাঁর মুখে কি শান্তির বাণী মানায়? তাই তাঁকে উপহাস করে চীৎকার করছে ভুষণ্ডীর কাকের কর্কশ কণ্ঠ—ধ্বংস কর, ধ্বংস কর, রক্তের আশায় আমি ঠোঁট ফাঁক করে বসে আছি, শেষ করে দাও সব। এই কুবেররা পৃথিবীর সর্বত্র আছে। এখানে ওদের নাম ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। কালোবাজারী। গদি পাওয়ার আগে জওহরলাল বলেছিলেন, ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওদের nearest lamp post-এ hang করবেন। লটকে দেবেন রাস্তার থামে। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি তা করেন নি। আপনি পারবেন? ওইটেই এ যুগের মহোত্তম কাজ! পারবেন আপনি?"

বুরুশ বিশ্বাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে রইলেন। আমিও নিষ্পলক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। গলার কাছটা কেমন ব্যথা - ব্যথা করতে লাগল, গুরগুর করে উঠল বুকের ভিতরটা। তারপর হঠাৎ চমকে উঠলাম। 'হংক্, হংক্, হংক্'—একটা প্রকাণ্ড মোটরের তীব্র ইলেকট্রিক হর্নের শব্দ যেন চাবুকের মতো পড়ল আমার মুহ্যমান চেতনার উপর। হেঁট হয়ে বুরুশ বিশ্বাসের পদধূলি নিলাম আবার। কথা বলতে যাচ্ছিলাম, বুরুশ বিশ্বাস মানা করলেন।

'না থাক। কিছু বলতে হবে না। মনেই থাক ওটা। অপ্রকাশিত সঙ্কল্পই দৃঢ় হয়। প্রকাশ করলেই হালকা হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায় সেটা।"

বললাম—"আপনি একটু আগে যে বক্তৃতাটা দিলেন তার অর্থ আরও যেন স্পষ্ট হল আপনার পরিচয় পেয়ে। ওটা নিতান্ত পেশাদারী বক্তৃতা নয়"

বুরুশ বিশ্বাস হেসে বললেন—"একদম পেশাদারী। আচ্ছা, এবার সরে পড়ুন। আমি পড়ব। আপনার ঠিকানাটা জানা রইল। হঠাৎ একদিন গিয়ে পড়ব। গেলে দুপুরের দিকে যাব। সে সময় বাড়ি থাকেন তো?"

"থাকি"

ড্রাইভার জগ্‌জিৎ সিং হঠাৎ এসে বললে একদিন, 'মাস্টারবাবু সব তো খতম্ হো গয়া। শালা চোট্টা লুটেরা লুট লিয়া সব্। আপকো রুপিয়া ভি ডুব গ্যয়া—মগর আপকা রুপেয়া ম্যয় দে দুঙ্গা"

"কি হল!"

জগ্‌জিৎ সিং যা বললে তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। জগ্‌জিৎ আমার ব্যাঙ্কার। স্কুল ফাণ্ডের যত টাকা জোগাড় করতে পারতাম তা জগ্‌জিৎকেই দিতাম। সে সেটা নিজের নামে কোনও ব্যাঙ্কে রাখত এই আমার ধারণা ছিল। তিন হাজার টাকা তুলেছিলাম আমি। জগ্‌জিৎ বলল—ও সেটা ব্যাঙ্কে রাখত না। রাখত এক শালা কালোবাজারী কুত্তার কাছে। সে মাটির নীচে নাকি টাকা পুঁতে রাখে ইনকাম্ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে। তার কাছে টাকা রাখলে বেশী সুদ পাওয়া যাবে এই লোভে টাকা রাখত তার কাছে জগ্‌জিৎ। জগ্‌জিৎ লরি চালিয়ে যা রোজগার করত তা-ও রাখত ওই কুত্তাটার কাছে। সুদও পেত নিয়মিত। কিন্তু কুত্তা এখন হঠাৎ বলছে তার পোঁতা টাকা নাকি চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে।

"চোর চুরি করে নি—ওই চুরি করেছে। ওই উল্লুকা পাঠ্‌ঠাই আত্মসাৎ করেছে অনেকের টাকা—" তারস্বরে বলতে লাগল জগ্‌জিৎ।

'টাকা দিয়ে কোনও রসিদ নিতে না—"

"নিতাম। কিন্তু এ রসিদের কোনও 'কিমৎ' আদালতে দিবে না। দেখিয়ে না—"

দেখলাম একটা লম্বা খাতায় হিন্দীতে লেখা আছে কোন্ তারিখে কত জমা করা হয়েছে। সবসুদ্ধ দেখলাম পঁচিশ হাজার টাকা জমা করেছে জগ্‌জিৎ। সুদও পেয়েছে প্রায় দু হাজার খানেক টাকা। কোথাও কারও সই নেই। মুখ তুলে জগ্‌জিতের মুখের দিকে চাইতেই মনে হল একটা সিংহ যেন আমার দিকে চেয়ে আছে।

'ইস্‌কা বদলা ম্যয় লে লুঙ্গা মাস্টার সাব্। আপকা রুপৈয়া ভি লৌটা দুঙ্গা"

(এর প্রতিশোধ আমি নেব মাস্টার-মশাই। আপনার টাকাটাও ফেরত দিয়ে দেব)

সেইদিন বিকেলে জগ্‌জিৎ তিনহাজার টাকা নিয়ে হাজির।

'টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে!"

সত্যি অবাক হয়ে গেলাম আমি।

"পত্নীকী সব্ জেবর বেচ ডালা—"

(স্ত্রীর সব গয়না বিক্রি করে ফেললাম)

স্তম্ভিত হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর বললাম, "বেশ, চল তাহলে আমার সঙ্গে—"

"কাহা?"

"গয়নার দোকানে"

"কাহে—"

"আমার পুতহুর জন্যে গয়না কিনে দিই—"

জগ্‌জিৎ সিংহের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল যেন।

'ইয়ে ক্যা বাত হ্যয়—"

("কি বলছেন আপনি—")

"বাত ঠিকই হ্যয়। হামরা স্কুল গাড়্‌ডেমে যায় ইস্‌কা লিয়ে হমরা কুছ পরোয়া নেহি। মগর হম পুতুহুকো গহ্‌না বেচ কর স্কুল নেহি বানায়েংগে—চলো দোকানমে—"

"ঠিকই বলছি। আমার স্কুল ডুবে যাক আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু এটা ঠিক পুত্রবধূর গয়না বিক্রি করে আমি স্কুল বানাব না। চল দোকানে চল—"

"আপ তো কামাল কিয়া মাস্টার সাব্—"

("এ তো আপনি অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, মাস্টার সাহেব!")

জগজিৎ সিংয়ের সিংহের মতো মুখটা চাপা আনন্দে সেদিন ভীষণতর হয়ে উঠেছিল। চাপ দাড়ির গোছা কাঁপছিল, চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল মোটরের হেড লাইটের মতো। সেদিন দোকানে গিয়েছিলাম। জগ্‌জিতের গয়নাগুলো রেখে টাকা দিয়েছিল যে স্বর্ণকার সে তখনও সেগুলো হাত-ছাড়া করে নি। ফিরে পাওয়া গেল প্রত্যেকটি। যে লোকটা আমাদের টাকা আত্মসাৎ করেছে তার নামও সেদিন বলেছিল আমাকে জগ্‌জিৎ। শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। নামজাদা ধনী একজন। সে এই রকম চুরি করেছে?

জগ্‌জিৎ বললে—"চোরি করকে, গরীব কা খুন চোষকে উহ্ শালে কুত্তা আজ শের বানা হ্যয়। মগর উসকো হাম ঘায়েল করেঙ্গে"

(চুরি করে গরীবের রক্ত শোষণ করে ওই শালা কুকুর আজ বাঘ হয়েছে। কিন্তু ওকে আমি ঘায়েল করব)

ওই কালোবাজারীর নাম তোমরা সবাই জান। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রায়ই ওর কীর্তিকলাপ ছাপা হয়। উনি বিখ্যাত লোক। ওঁর নামটা আমি উহ্য রাখলাম। রাবণ বলেই ওঁর উল্লেখ করব।

জগ্‌জিৎকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও তোমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে সুদ দেয় তাতো ব্যাংকের সুদের চেয়ে অনেক বেশী। ওর পোষায় কি করে?"

জগ্‌জিৎ বললে, "ও আমাদের টাকা নিয়ে গরীব নিরুপায়দের সেই টাকা 'চোটা' সুদে ধার দেয়। এই পাড়াতেই সাইকেল চড়ে ওর এজেন্ট আসে। টাকাপিছু রোজ এক পয়সা সুদ দিতে হয়। রোজ সেটা দেওয়া চাই। না দিতে পারলে সুদের উপর সুদ চড়ে। শেষে ঘটিবাটি গয়না-গাঁটি যা পায় কেড়ে নিয়ে যায়। রোখন মিশিরের সঙ্গে লোকটার যোগসাজস আছে। তারই মারফত ওর চর ওই সাইকেলওলা মিনুবাবু ধারের জাল পেতেছে এই বস্তিতে।" মিনুবাবু লোকটাকে আমি দেখেছি। মুখমিষ্টি অমায়িক প্রকৃতির লোক। শোভ্‌নার বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছি তাকে মাঝে মাঝে। তাই মনে হয়েছিল সম্ভবত ও শোভ্‌নার খদ্দের একজন। জগ্‌জিতের কাছে ওর এ-পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম একটু। রাবণের চর ও?

রোখন মিশির একটি গম্বুজাকৃতি ব্যক্তি। টাইট্ ভুঁড়ি, ছোট্ট গর্দান, মাংসল বুক। হাত-পা ছোট ছোট। মনে হয় ছোট্ট গম্বুজ একটি। মাথায় টাক। কপালে ত্রিশূলাকৃতি তিলক। গলায় তিন হালি রুদ্রাক্ষের মালা। রোখন মিশির উত্তর প্রদেশবাসী। উত্তর প্রদেশে অন্নসংস্থান করতে

না পেরে একদা কলকাতা শহরে এসেছিল। আর ফিরে যায় নি। শুনেছি আগে ও নাকি ফেরি করত। তখন বাড়ি-উলি রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনের নাকি যৌবন ছিল। পায়ে গোদ হয়নি। তখন রোখন মিশির না কি ওর প্রণয়ী ছিল। সেই প্রণয়ের পথেই এই বস্তিতে এসেছিল রোখন মিশির। এখনও বোধ হয় কিঞ্চিৎ প্রণয় আছে। কিন্তু রূপান্তরিত হয়েছে সেটা। আগে তারা পরস্পরকে কি ভাষায় সম্বোধন করত জানি না কিন্তু এখন খোলাখুলিভাবে রাজলক্ষ্মী ওকে বলে—মুখপোড়া গুজরাটি হাতী, আর রোখন মিশির বলে 'গোদরানী'। রোখন যে ঘরটায় থাকে সেটাও রাজলক্ষ্মীর। লোকে বলে রাজলক্ষ্মী সে ঘরের ভাড়া নেয় না। কিন্তু ভাড়ার দাবি সে ছাড়েনি। ভাড়ার তাগাদা দেবার ছুতোয় মাঝে মাঝে সে গালাগালির তুফান বইয়ে দেয় তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। বলে—"ওরে পোড়ারমুখো, অলপ্পেয়ে হাড়হাবাতে, এটা মানুষের বাস করবার ঘর, হাতীর পিলখানা নয়। তুই গুজরাটি হাতী, তুই ও-ঘরে মৌরসীপাট্টা করে জগ্ গেড়েছিস কেন। একটি পয়সা তো ভাড়া দিস না, যত ছিঁচকে চোর আর পকেটমার নিয়ে কারবার ফেঁদেছিস। কপালের উপর রক্তচন্দনের ত্রিশূল কেটে আমাকে ভোলাবি হারামজাদা—রাজি বামনীকে ভোলানো অত সহজ নয়—"

রোখন মিশির কোন উত্তর দেয় না। চোখটি বুজে ছোট ছোট হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। তবু থামে না রাজলক্ষ্মী। থপ থপ করে এগিয়ে গিয়ে তার মুখের সামনে দুহাত প্রসারিত করে চীৎকার করে ওঠে।

"কেন থাকিস তুই এখানে? যা টাকা কামাস, শুনেছি তাতে তো চৌরঙ্গীর গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে থাকতে পারিস। এখানে পড়ে আছিস কেন গিনিপিগ্‌মুখো বাঁদর? এখানে কি গুড় আছে—"

রোখন মিশিরের জোড়-হাত খুলে যায়। মিটি মিটি চেয়ে মৃদুকণ্ঠে সে বলে, "তুমি যে এখানে আছ গোদরানী। তোমাকে রোজ দেখতে পাব বলেই—"

কথা শেষ করতে পারে না রোখন। গগন-বিদারী চিৎকার করে ওঠে রাজলক্ষ্মী—"চোপরও হারামজাদা—"

সঙ্গে সঙ্গে রোখনের চোখ বুজে যায়। জোড়হস্তে আবার নিস্পন্দ হয়ে পড়ে সে।

রাজলক্ষ্মীর চীৎকারটা গগন-বিদারী হলেও তার প্রকাণ্ড নাকটার নীচে মিশি-মাখা দাঁতের উপর কালোমেঘে বিজলীর মতো যে হাসিটা চকিতের জন্য ফুটে ওঠে তার ভাষা অন্যরকম।

যে দৃশ্যটা বর্ণনা করলাম এটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, আমি নিজেই দেখেছি একদিন। রোখন মিশিরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই নি কোনদিন। অবশ্য যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে আমাকে নমস্কার করত। আমিও বলতাম—"কি মিশিরজি, ভালো আছেন তো?" মিশিরজি ঘাড়টা আরও ঝুঁকিয়ে বলত—"আপনার কৃপা—"। আলাপ এর বেশী এগোয় নি। জগ্‌জিতের কথা শুনে তার সঙ্গে আর একটু আলাপ করবার ইচ্ছে হল। একদিন দেখলাম রোখন তার ঘরের বারান্দায় মোড়ায় বসে খইনি ডলছে। আমি যেতেই খইনিতে থাপ্‌পড় মেরে মুখবিবরে ফেলে দিয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল সে।

"আসুন মাস্টারমশাই। কি সৌভাগ্য, আসুন, আসুন—" রোখন চমৎকার বাংলা বলে।

"একটু বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে মিশিরজি—"

"বলুন, বলুন—"

"আমি এই বস্তির ছেলে-মেয়েদের জন্য ছোটখাটো একটা ইস্কুল করব ভেবে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। আপনিও আট আনা চাঁদা দিয়েছিলেন—"

"হাঁ হাঁ, মনে আছে—"

"টাকাটা রাখতাম জগ্‌জিতের কাছে। ওই আমার সব টাকাকড়ি রাখে। আমার ধারণা ছিল ও টাকা ব্যাংকে জমা করে। কিন্তু এখন বলছে ও টাকাটা রাখত একজন কালোবাজারী শয়তানের কাছে বেশী সুদের লোভে। সে আবার নাকি ইনকম্ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে টাকা পুঁতে রাখে। আমাদের টাকাও না কি পুঁতে রাখত। এখন বলছে পোঁতা টাকা চুরি হয়ে গেছে!"

খুব তেতো ওষুধ খেলে যে রকম মুখভাব হয় রোখনের মুখভাব সেই রকম হয়ে গেল। বললে—"আপনি জগ্‌জিতের গলায় গামছা লাগিয়ে মোচড় দিন। গলায় গামছা না দিলে—"

বললাম—"জগ্‌জিৎ স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে টাকা আমাকে এনে দিয়েছিল, কিন্তু সে টাকা আমি নিই নি। আমি সেই কালোবাজারীটার কাছে যেতে চাই। আপনি তার ঠিকানা বলতে পারবেন?"

"নামটা জানেন?"

নামটা বললাম। শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোখন মিশিরের মুখ। বললে—"ওর ঠিকানা কেউ জানে না। ও এক জায়গায় থাকেও না। আজ দিল্লী, কাল বম্বে, পরশু লণ্ডন, তার পরদিন নিউইয়র্ক যাচ্ছে। প্লেনে চড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে অনবরত। ও হয়তো জানেও না যে আপনার টাকা ও চুরি করেছে। নানারকম সুড়ঙ্গপথে ওর ব্যাংকে টাকা জমে, ও জানেও না কোথা থেকে কত জমছে। ওর ম্যানেজাররা জানে কিম্বা তাদের অধীনে যারা কাজ করে তারা। কিন্তু তাদের সংখ্যা কম নয়। আমি ওদের দলের মিনুবাবুকে চিনি। কিন্তু তিনি মাইনে - করা চাকর। এই বস্তিতে টাকা ধার দিয়ে সুদ আদায় করেন।"

"তাহলে তার সঙ্গে দেখা হবে না?"

"মন্ত্রীরা তার কাছে যেতে পারলে বর্তে যান। দেখা করতে হলে অনেক দিন আগে থেকে তার প্রাইভেট সেক্রেটারির মারফত আবেদন নিবেদন জানান। কারো আবেদন মঞ্জুর হয়, কারো হয় না। একটি বিষয়ে ওঁর দুর্বলতা আছে শুনেছি। ভদ্রঘরের সতী স্ত্রীদের উপর ওঁর না কি ভারী লোভ। মিনুবাবু ওঁর জন্যে দু একটি জিইয়ে রাখে। উনি যখন কলকাতায় আসেন তখন ভোগ চড়ায়। আর একটি বিলেত-ফেরত প্রফেসার আছে, যে ওই সোনাকে পড়ানোর ভার নিয়েছে। সে-ও একটি দালাল। আমি বিশুকে সাবধান করে দিয়েছি। কিন্তু ও ছোকরা কেমন যেন ভ্যাবলা গোছের। খালি পরের দুধে জল মেশাতে ব্যস্ত। তার ঘরের দুধ যে বেহাত হয়ে যাচ্ছে সেদিকে—আরে এ আমি করছি কি!" হঠাৎ চোখ বুজে জিভ কেটে ফেললে রোখন। তারপর নিজের গালেই নিজের ছোট ছোট হাত দিয়ে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে মারতে বলতে লাগল—"কি করলি রে উল্লুক। জানাজানি হয়ে গেলে যে তোকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে, টুকরো টুকরো করে ডালকুত্তাকে খাইয়ে দেবে, জন্মের মতো লোপাট হয়ে যাবি। একি বেকুবি করে ফেললিরে হতভাগা"

তারপর হঠাৎ আমার হাত দুটি ধরে সানুনয়ে সাশ্রু-লোচনে বলে উঠল, "দোহাই মাস্টারমশাই, এসব যে আপনি আমার কাছ থেকে শুনেছেন তা যেন ঘুণাক্ষরে না প্রকাশ পায়। পেলে ওরা আমাকে আর আস্ত রাখবে না। লোপ করে দেবে, গিলে ফেলবে। আপনি আমাকে অভয় দিন মাস্টারমশাই—"

রোখন থর থর করে কাঁপতে লাগল। এটা যদি ওর অভিনয় হয় তাহলে ওকে উঁচুদরের অভিনেতা বলতে হবে। কিন্তু আমার মনে হল ও সত্যি ভয় পেয়েছে। মনে হল সেই ভীষণ হিংস্র কদর্য শক্তিমান দৈত্যটার মূর্তি সত্যিই ওর মানসপটে ফুটে উঠেছে যার নিশ্বাসে বিষ, ভ্রূকুটিতে বজ্র, যার দৃষ্টিতে পিশাচের নিষ্ঠুরতা; টাকার অ্যাটম্ বম্ (atom bomb) ফেলে যে যাকে-যখন খুশী নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, দেশের শাসকরা যার বশম্বদ ভৃত্য, যে এক মুণ্ড হয়েও সহস্র-মুণ্ড যার বহু বাহু বহু দিকে প্রসারিত হয়ে বহু অসহায় কণ্ঠকে টিপে ধরেছে, যার বৃহৎ মাংসল স্থূল পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট হচ্ছে অগণিত আর্ত আতুর স্বল্পবিত্তের দল, আধুনিক যুগের সেই সর্বশক্তিমান রাবণের ছবিটা সতিাই বোধ হয় তখন ফুটে উঠেছিল রোখনের কল্পনানেত্রে।

বললাম, "আমার মুখ দিয়ে তোমার নাম কখন বেরুবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আর একটা কথাও বলতে পারি, আমার প্রাণ থাকতে তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আমি যদি মরেও যাই তাহলে আমার দল তোমাকে বাঁচাবে।"

"আপনার দল আছে না কি—"

"যাদের উপর অত্যাচার অবিচার হচ্ছে, যাদের সবাই দু'-পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে—তারা সবাই আমার দলে। আপনিও আমার দলে। ওই যে মিনুবাবুর কথা বললেন, তিনি হয়তো এটা জানেন না, কিন্তু তিনিও আমার দলে। তাঁর সঙ্গে যেদিন দেখা হবে সেদিনই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন তিনি। ওই কালোবাজারীটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতেই হবে। কি করে তা পারব সে উপায় আপনিও ভাবুন। কিন্তু এটা জেনে রাখুন দেখা করবই আমি—"

রোখন হাত জোড় করে বলল, "আমাকে বাদ দিন মাস্টারমশাই। আমি কম-জোর লোক। শিবমন্দিরে পূজারীর কাজ করে আর সামান্য দালালি-টাললি করে কোনক্রমে দিন গুজরান করি"

"শুনেছি পুলিশের সঙ্গে আপনার খাতির-টাতির আছে—"

এ শুনে ব্যায়ত-আনন হয়ে গেল রোখন। তারপর ঢোঁক গিলে বললে—"এ খবর কে আপনাকে বললে—"

"যেই বলুক, কথাটা সত্যি কিনা"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে শেষে বলল—"সত্যি—"

বলেই বলল, "তাহলে সব কথা শুনুন আমার। বিশ বছর আগে আমি যখন এখানে আসি তখন ফেরিওলা হয়েছিলাম। নানারকম জিনিস ফেরি করতাম। তখনই দেখলাম মাঝে মাঝে পুলিশদের ঘুষ না দিলে তারা নানাভাবে জ্বালাতন করে। নির্বিঘ্নে ফেরিও করা যায় না। দিতাম ঘুষ। থাকতাম একটা মোটরের গারাজে। গারাজটা আমাদেরই দেশের লোক রঘুবীর প্রসাদের। নানারকম মোটর সেখানে সারাবার জন্যে আসত। রোজই একটা-না-একটা মোটরে শুতে দিত আমাকে রঘুবীর প্রসাদ। তাঁকে আমি "মামাজি" বলে ডাকতাম। তিনি একদিন বললেন—"তুই ফেরিওলার কাজ ছেড়ে মোটরের কাজ শেখ। আখেরে ভাল হবে।" তাই শিখতে লাগলাম। মামাজি আমাকে খেতে দিতেন। চার বছর কাজ শেখবার পর ভালো মেকানিক তো হলামই, ড্রাইভারিটাও শিখে ফেললাম। লাইসেন্স পেয়ে মামাজির একটা ট্যাক্সি চালালাম দিনকতক। সে সময়ও দেখলাম পুলিশকে ঘুষ দিতে হয়। তারপর ভালো চাকরি জুটে গেল আমার একটা। এক বড় পুলিশ অফিসারের গাড়িতে বাহাল হয়ে গেলাম। আড়াইশ টাকা মাইনে। গোঁফে চাড়া

দিয়ে—তখন আমার গোঁফ ছিল—আর চোখ পাকিয়ে হুমকি দিয়ে বেড়াতাম সবাইকে। কিন্তু কপালে দুঃখ লেখা ছিল। ওই পুলিশ অফিসারের জোয়ান মেয়েটা আমাকে চোখ মারত। আমিও তার জবাব দিতাম। হঠাৎ একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে আমার চাকরি গেল। আমার লাইসেন্সটাও গেল। ওই পুলিশ সাহেব আমার বিরুদ্ধে এমন কড়া রিপোর্ট করলেন যে, দ্বিতীয়বার আর লাইসেন্স রিনিউ (renew) করতে পারলাম না। এসব শুনে মামাজিও ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তুই পাপী, তোর আর মুখদর্শন করব না। দূর হ। আমি পাপী তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু ওই পুলিশ সাহেব আর মামাজিও নিষ্পাপ ছিলেন না। আমি জানতাম ওই পুলিশ সাহেব ঘুষ নিতেন আর মামাজি মোটর পার্টসের চোরা-কারবার করতেন। কতগুলো ছোঁড়া রোজই কোন-না-কোন মোটর পার্টস চুরি করে এনে বিক্রি করত তাঁর কাছে। সেই সময়েই কতকগুলো ছিঁচকে চোর আর পকেটমার ছোঁড়াদের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। তাদের মধ্যে ছিল গোদরানীর দূরসম্পর্কের ভাই কেউটে। খলিফা চোর ছিল সে। তবু সে একদিন ধরা পড়ে গেল। পুলিশদের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম আগে থাকতেই ছিল। কিছু ঘুষ কবুল করে ছাড়িয়ে নিলাম তাকে পুলিশের হাত থেকে। কেউটেই আমাকে নিয়ে আসে এ বস্তিতে। কেউটের সুপারিশেই গোদরানী—তখন নাম ছিল ঝাঁসির রানী—আমাকে আশ্রয় দেয় এখানে। তখন আমার কাইজারি গোঁফ ছিল, ব্যাক্ ব্রাশ করা চুল ছিল, খাকি সুট আর মিলিটারি বুট ছিল। বাঁ হাতের কব্জিতে রিস্টওয়াচ্ বাঁধতুম। কেউটে বললে—তুমি যদি পুলিশের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পার তাহলে তোমার একটা রোজগারের রাস্তা বাতলাতে পারি। এ পাড়ার চোর আর পকেটমাররা পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে রোজ তোমাকে প্রিমিয়ম দেবে। সেই প্রিমিয়মই তখন আমার রোজগার। তার অর্ধেকটা অবশ্য দিতে হয় পুলিশদের। তাদের বলা আছে—'রোখন' নাম বললেই তারা তাদের ছেড়ে দেবে। এই এখন আমার জীবিকা মাস্টারমশাই। আমি বেনারসের ছেলে, শিব-ভক্ত। ঘরে একটি লিঙ্গ রেখেছি, তারই পূজা করি দুবেলা। আর প্রতি সপ্তাহে একবার তারকেশ্বরে যাই। রোজই বাবাকে হাত-জোড় করে বলি।—বাবা আমি মহাপাপী, কিন্তু তুমি তো নীলকণ্ঠ, বিষের জ্বালা যে কি তুমি তো বোঝ, তুমি রণরঙ্গিনী কালীকে বুকে ঠাঁই দিয়েছ, তোমার গলায় বিষধর ফণী, তুমি কি না পার! রণরঙ্গিনী কালীকে উমা করতে পার, বিষধর ফণীকে রূপান্তরিত করতে পার পারিজাতের মালায়। সমুদ্র-মন্থনের বিষ তোমার কণ্ঠে গিয়ে অমৃত হয়ে আছে। আমার মতো মহাপাপী পাষণ্ডকে তুমিই উদ্ধার করতে পার, আর কেউ পারবে না—"

রোখন মিশিরের চোখ বুজে এল। দেখলাম দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামছে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে আবার বললে—"মাস্টারমশাই, আমি পাপী হতে পারি, মূর্খ হতে পারি, কিন্তু আলোকে আলো বলে চিনতে আমার ভুল হয় না কখনও। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার সাহস পাই নি, কিন্তু আপনি যে পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পাঁকের মধ্যে কি করে পাঁকাল মাছ হয়ে থাকতে হয়, তা আপনি রোজ দেখিয়ে দিচ্ছেন। অকপটে সব কথা আপনাকে বললুম। কিছুতেই জিভকে রোধ করতে পারলুম না। আপনার পুণ্যের চুম্বক আমার পাপের লোহাকে টেনে বার করে নিলে?

বললাম, "ভাই রোখন, তোমাকে আর আপনি বলব না। এখন থেকে তুমি আমার ভাই হলে। তুমি আমাকে যত বড় পুণ্যাত্মা মনে করছ তত বড় পুণ্যাত্মা আমি নই। আমি জানি

তুমিও ষোলআনা পাষণ্ড নও। আমরা সবাই অবস্থার দাস। দাসরা কখনও কলঙ্কহীন হয় না, হতে পারে না। তুমি শিব-ভক্ত এ কথা শুনে বড় আনন্দ হয়েছে। এখন শিব-ভক্তই চাই আমাদের। এ যুগের দক্ষরা শিবহীন যজ্ঞের যে সাড়ম্বর আয়োজন করেছেন চতুর্দিকে সে যজ্ঞ ধ্বংস করবার জন্যে শিব-জটা থেকে বীরভদ্রের আবির্ভাব একদিন হবেই। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে, তাঁর তাণ্ডবে যোগ দেবার জন্যে শিব-ভক্তদেরই প্রস্তুত থাকতে হবে। তুমি শিব-ভক্ত এটা তাই বড় সুখবর। তোমাকে সেই দলে থাকতে হবে রোখন। তুমি নির্ভাবনায় থাকো, তোমার কোনও কথা প্রকাশ পাবে না আমার মুখ থেকে। তুমি আমার আত্মীয়, তুমি আমার দলের লোক—"

রোখন মিশির আমাকে প্রণাম করে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বীরভদ্র সত্যি কি আবির্ভূত হবেন?"

"হবেন। যেদিন সতীর মৃত্যু হবে সেইদিন—"

রোখন হাত জোড় করে চোখ বুজে ফেলল।

সাঁইবাবা এক-তারা বাজিয়ে গান গাইছিলেন—

মাকালকে তুই করবি রসাল
বরফ দিয়ে জ্বালবি মশাল
　　তোর যে দেখি আস্বা বড়
তোর যে দেখি উচ্চ আশা
ওরে মূর্খ ওরে চাষা
মরুর বুকে ফলিয়ে ফসল
তুলবি বাড়ি মস্ত মহল
আগে থাকতে বায়না দিয়ে
　　কিনে বসলি খাম্বা বড়
　　তোর যে দেখি আস্বা বড়।

গান থামলে জিগ্যেস করলাম—"আস্বা করাটা কি অন্যায় সাঁইবাবা?"

আবার গান গেয়ে তাঁর উত্তর দিলেন সাঁইবাবা—

"ন্যায়ের বিচার কোথায় আছে
　　মনের বিচার জগৎময়
অন্যায়কে ন্যায় বানিয়ে
　　সেই তো করে জগৎ জয়
　　　　মনকে চেন।
কন্টকে সে কুসুম ভাবে
　　চিনিকে দেয় বালির দাম
　　সদসতের শতদলে
　　মানুষেরই মনস্কাম
　　　　মনকে চেন।"

সাঁইবাবা আমার দিকে মিটিমিটি চেয়ে হাসতে লাগলেন।

বললাম, "এ সব গান কি আপনারই রচনা? চমৎকার গান"

আবার হেসে দু' লাইন গানেই উত্তর দিলেন—

বুকের ভিতরে যে কাঁদে
সেই তো বাবা গান বাঁধে"

অবাক হয়ে গেলাম। সাঁইবাবা সাধারণ বাউল নন। 'হরে কৃষ্ণ চাট্টি ভিক্ষা দাও মা' এ বুলি তাঁর মুখে কখনও শুনি না। ভিক্ষা দিলে নেন, কিন্তু ভিক্ষা চান না কখনও। সাঁইবাবা রহস্যময়। কিন্তু এ রহস্য ভেদ করবার উপায় নেই। নিজের কথা কখনও বলেন না। মনে হল তবু চেষ্টা করতে হবে যদি ওঁকে চিনতে পারি। কিন্তু পারি নি।

ভর্থার অনেকদিন দেখা পাই নি। সে রাস্তায় রাস্তায় পকেটকাটার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায়। আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। রহিম কশাই আমাকে মাংস দিয়ে যায়। তাকে একদিন ভর্থার কথা জিগ্যেস করেছিলাম।

"ভর্থাকে আজকাল দেখি না, কোথায় থাকে ছোঁড়াটা—"

রহিম তার অদ্ভুত ভাষায় যা বলেছিল তার সরল বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—"হুজুর, নেড়ি কুত্তীদের সঙ্গে নেড়ি কুত্তাদের রাস্তায় ভাব হয়। সবার সামনে দাঁড়িয়ে তারা যা করে তা আপনি জানেন। বাচ্চাও রাস্তায় হয়। মায়ের পিছু-পিছু ঘোরে দিন কতক। তারপর ছিটকে পড়ে এদিকে ওদিকে! কেউ না খেয়ে মরে, কেউ মোটরের তলায় চেপ্‌টে যায়, কেউ ঘেয়ো হয়ে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকে। ভর্থাও ওই দলের। চেহারাটা মানুষের মতো, কিন্তু আসলে কুত্তা। দেখুন না, আমার হাতটা কামড়ে ধরেছিল, শালার দাঁতের দাগ এখনও আছে। কুত্তা, কুত্তা, ওর খবর কুত্তারাই জানে—।" রহিম অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে পাঁঠার রাংটা থুড়তে লাগল।

বললাম, "খুব বড় খাসীর গোটা মুড়ো চাই আমার একটা। গর্দানাসুদ্ধ মুড়ো দিতে, পারবে তো?"

"দু' একদিন আগে বলবেন। এনে বানিয়ে দেব।"

"বানাতে হবে না। চামড়াসুদ্ধ গোটা মুণ্ডু চাই—"

"কেন, কি করবেন?"

"দরকার আছে—বলব পরে"

তখন কিছু ভাঙলাম না। রহিম চলে গেল।

সেইদিনই ভর্থা আর তার বন্ধু—ভুতুম এসে হাজির হল একটু পরে।

ভর্থা বললে—"মাস্টারমশাই, ভুতুমের আজ ডিউটি ছিল নিউগী পাড়ার দিকে। সেই মেয়েটার সঙ্গে ও আলাপ করে এসেছে। তাকে বলে এসেছে যে আপনি যদি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে না দেন, তাহলে আপনার টাকা আর মনিব্যাগ আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাব। ভুতুমকে বললাম—কি বললে সে। 'বললে, আচ্ছা দিয়ে যেও। পুলিশ ডাকব না। কিন্তু তেরছা চোখে চেয়ে এমনভাবে মুচকি হাসল যে আমার মনে হচ্ছে ঠিক ও আমাকে ধরিয়ে দেবে—"

ভর্থা বললে—"তুই শালা ভীতু। আমাকে দিন, আমি দিয়ে আসব মাস্টারমশাই। দিয়েই ছুটে পালিয়ে আসব"

ভুতুমকে জিজ্ঞাসা করলাম—"মেয়েটা কি রকম দেখতে? ফর্সা, না কালো—"

ভুতুম ফাজিল। সে এক কথায় জবাব দিলে—"মাল একটি। মালবাবুটিকেও দেখেছি। টেরিকাটা দিব্যি পুরুষ্টু পাঁঠা—"

"মেয়েটি ফর্সা, না কালো?—"

"এত পাউডার ক্রীম মেখেছে যে রং বোঝা গেল না। চোখ টানা-টানা, চোখের কোলে সুর্মা, সামনের দাঁত একটু উঁচু—"

বহুকাল আগে যে মেয়েটিকে দামী কাশ্মীরী শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম ভাবতে চেষ্টা করলাম তার চোখ টানা-টানা ছিল কি না, সামনের দাঁত উঁচু ছিল কি না, কিন্তু দেখলাম স্মৃতির পটে একটি লোভাতুরা মেয়ের অস্পষ্ট ছবি আঁকা আছে কেবল তার চোখ, মুখ বা দাঁতের কোনও ছাপ নেই সেখানে, আছে কেবল উন্মুখ লোভের একটা অস্পষ্ট প্রকাশ মাত্র। বললাম—"আমিই নিয়ে যাব ওটা। তোরা আমাকে নিয়ে চল"

ভুতুম বললে—"আজ তো আমাকে বাগবাজারে ঘুরতে হবে। কাল চিৎপুর। পরশু দিন যেতে পারি—"

"আমি আজই যাব। তোদের যাবার দরকার নেই—"

ভর্থার চোখদুটো কপালে উঠল। একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত সে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তার বোধ হয় মনে হল আমি চটেছি।

"আমি যাব আপনার সঙ্গে মাস্টারমশাই। আমিও সে বাড়ি চিনি। তিনবার গেছি সেখানে, দেখা পাই নি। তাই ভুতুমকে ঠিকানাটা দিয়েছিলাম, ও যদি দেখা পায়। চলুন, এখুনি যাবেন?"

ভুতুমের কালো গোল মুখ, তার উপর বসন্তর দাগ। চোখ দুটোও গোল গোল। একটা চোখের তারায় সাদা দাগ। সে-ও নির্নিমেষ হয়ে গেল। তার মনে হল ভর্থা তার উপরে টেক্কা মারছে।

"তোর যে এখনি হাওড়া স্টেশনে ডিউটি। যাবি না? রামের বাবা জুতিয়ে লম্বা করে দেবে যদি শোনে—"

"দিক। তবু আমি যাব—"

ভর্থা দমবার ছেলে নয়।

বললাম, "তোদের কাউকে যেতে হবে না। তোরা 'ডিউটি'তে যা। আমি একাই যাব—"

ভর্থার কণ্ঠে আবদারের সুর ফুটে উঠল। পা ঠুকে ঠুকে নাকিসুরে বলতে লাগল—'আমি যাব মাস্টারমশাই'।

ভুতুম বললে—"আপনি যদি কৌশল্যার স্বামীকে একটু বলে দেন তাহলে আমিও যেতে পারি। বড্ড মারে শালা—"

ভুতুমের বয়স প্রায় কুড়ি। শুনেছি কোনও স্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। এখন পকেটমার হয়েছে। মহা ফাজিল। ওদের দলপতির নাম দশরথ। তাকে ও নানারকম নাম দিয়েছে—কখনও রামের বাবা, কখনও কৌশল্যার স্বামী, কখনও কৈকেয়ীর ভেড়া ইত্যাদি। দশরথও আমার ভক্ত। সে-ও তার যে-সব চোরাই মাল তড়ি-ঘড়ি পাচার করতে পারে না সেগুলো আমার কাছে জমা রেখে যায়। এখনও একটা দামী বেনারসী শাড়ি আমার ওই সিন্দুকের ভিতরে আছে। দশরথের চেহারা নিরীহ প্রকৃতির। দেখলে মনে হয় ভালোমানুষ লোক। চাকর হিসাবে উৎকৃষ্ট। হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না, জুতো সেলাই থেকে

চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। কোন-না-কোন গৃহস্থ বাড়িতে সর্বদাই সে চাকর হয়ে বাহাল থাকে, তারপর কোন একটা দামী গয়না, শাড়ি বা জামা হাতিয়ে নিয়ে অন্তর্ধান করে আবার এক জায়গায় বাহাল হয়। কারণ কলকাতার মধ্যবিত্ত লোকেরা দাসানুদাস। অর্থাৎ তারা তাদের চাকরেরও দাস। একা হাতে বাসন মেজে, কাপড় কেচে, ঘর নিকিয়ে, ছেলেমেয়ে সামলে, নটার সময় স্বামী পুত্রের আপিসের ভাত দেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। তাই চাকর-চাকরানীদের কাছে জোড়হস্ত হয়ে থাকে তারা। দশরথরা সেই জোড়হস্তের সুবিধাটা নেয়। দশরথ রোগা লোক, নিঃশব্দ-পদক্ষেপে হাঁটে, কথা কম বলে। এই পকেটমারদের সমস্ত পকেট-মারা পয়সা নিয়ে সেই বিলি ব্যবস্থা করে। প্রত্যেককে সমান সমান ভাগ করে দেয়। রোখনকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়, নিজেও কিছু নেয়। কিন্তু নিজে যেটা নেয় সেটা নিজের জন্যে খরচ করে না। পতিতুণ্ডির নামে যে পাশ-বুকটা আছে তাতেই জমা করে, আর ওই পকেটমারদেরই আপদে বিপদে খরচ করে সে টাকাটা। ভুতুমের যখন বসন্ত হয়েছিল তখন চিকিৎসার সব খরচ দশরথই চালিয়েছিল। তাই দশরথ ভোটের জোরে নয় গুণের জোরে, ভালবাসার জোরে ওদের দলপতি হয়েছে। এই হতভাগা ছোঁড়াগুলোকে ওই সত্যি ভালবাসে। বেচাল হলে নির্দম করে মারে, কিন্তু ভালবাসে। রোজগার না করে যদি ওরা ফাঁকি দেয় তাহলে ভয়ানক চটে যায়। আমি যদি বলি আমি ওদের নিয়ে গিয়েছিলাম তাহলে ও কিছু বলবে না জানি, কিন্তু সেই জন্যেই আমার সঙ্কোচ বেশী।

বললাম—"তোরা রোজ কত করে রোজগার করিস—"

ভর্থা বলল—"তার কি ঠিক আছে। কোনও দিন একটাকা দুটাকা, কোনও দিন একশো দুশো—"

"তাহলে এক কাজ কর, আমি তোদের পাঁচটাকা করে দিচ্ছি—তোরা দশরথকে ওই টাকাটা দিয়ে বলিস আজ এই পেয়েছি—"

চোখ বড় বড় করে ভর্থা বললে—"আপনিই না বলেছেন মিথ্যে কথা কখনও বলবি না, আপনিই মিথ্যে কথা বলতে শেখাচ্ছেন!"

ভুতুম বললে—"উনি তো পকেট মেরে পেয়েছি বলতে বলছেন না। শুধু 'পেয়েছি' বললে মিথ্যে কথা বলা হবে না।"

হেসে উঠলাম তিনজনেই।

আমাদের আলোচনায় কিন্তু বাধা পড়ল। ক্ষেন্তি এসে বলল, "আজ একটি ছেলে খবর পাঠিয়েছে, তোমার কাছে আসবে বিকেলে। সে নাকি গলস্‌ওয়ার্দিকে নিয়ে একটি থিসিস্ লিখবে। তোমার পরামর্শ চায়—"

"কখন আসবে—"

"পাচটায়। আমি একটু আগে বাজারে বেরিয়েছিলাম, তোমার এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। খবরটা সেই তোমার কাছে দিতে আসছিল। আমি বললুম, আচ্ছা, আমি দিয়ে দেব, তোমার আর কষ্ট করে অতদূর যাবার দরকার নেই—"

"এখন কটা বেজেছে?—"

"বারোটা—"

"তাহলে তো এখনই আমাকে বেরুতে হবে—"

"কোথা যাবে এখন"

"নিউগীপুকুর লেন, খাবার হয়েছে? খেয়েই বেরুই"

"রুটি হয়েছে, কিন্তু মাংস সিদ্ধ হয়নি এখনও"

"যা হয়েছে তাই নিয়ে আয়। একটু বেশী করে আনিস, আমরা তিনজনেই খাব।"

আধসিদ্ধ মাংস আর গরম রুটি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা তিনজন। রাস্তায় ঠিক হল ওরা দুজন গলির দুপ্রান্তে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। আমি কড়া নেড়ে বাড়িতে ঢুকে শ্রীমতী রানী বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ করব। যদি দরকার হয় ওদের ডাকব। অর্থাৎ ওরা আমার বডি-গার্ড হয়ে থাকবে। এ সবের অবশ্য কিছু দরকার ছিল না। কিন্তু ওরা না-ছোড়।

কড়া নাড়তেই একটি ছোঁড়া-চাকর এসে কপাট খুলে দিল। ফর্সা গেঞ্জি গায়ে, ফর্সা খাকি প্যাণ্ট, দশআনা-ছআনা-চুলছাঁটা। চোখে বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। ইংরেজিতে যাকে বলে স্মার্ট (smart)—তাই।

"কাকে চান?"

"রানীর সঙ্গে দেখা করতে চাই—"

"কি নাম বলব গিয়ে। আপনার কি কোনও কার্ড আছে?"

"না—"

"তাহলে এই শ্লেটে নামটা লিখে দিন"

শ্লেটে লিখলাম—"অনেকদিন আগে আমি তোমাকে একটা দোকান থেকে কাশ্মীরী শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। আজ তোমার ঠিকানা জানতে পেরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তোমার একটা হারানো জিনিসও এনেছি, তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব—"

একটু পরেই আমার ডাক এল। আমি দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের আসবাবপত্রে সাজ-সজ্জায় সুরুচির পরিচয় দেখলাম। এক কোণে তে-পায়ার উপর চমৎকার একটি ফুলদানি রয়েছে, দেখতে ঠিক যেন ঊর্ধ্বমুখী একটি অঞ্জলির মতো। তাতে রক্তগোলাপ রয়েছে একগোছা। একটি মাত্র ছবি আছে— অজন্তার সেই ভিখারিনীর ছবিটা। রানী প্রবেশ করেই কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি যখন তাকে শাড়িটা কিনে দিয়েছিলাম, তখন আমার গোঁফ-দাড়ি ছিল না, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি ছিল। গোঁফ-দাঁড়ি-ওলা খদ্দরের আড়ময়লা লম্বা-কোট-পরা লোকটার সঙ্গে আগেকার-দেখা সেই ছবিটার কিছুমাত্র মিল নেই দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে আমার মুখের দিকে।

"কে আপনি—!"

আগে যা বলেছিলাম এবারও তাই বললাম।

"আমি তোমার বাবার বন্ধু। তোমার বাবা কোথায়"

"তিনি মারা গেছেন অনেক দিন আগে"

"ও! তোমার মা—"

"তিনিও নেই। ওই ভ্যানিটি ব্যাগ আপনি কোথায় পেলেন"

"একটা পকেটমার ছোঁড়ার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম ওটা। ওতে তোমার রুমাল, কার্ড আর মনি-ব্যাগ ছিল। মনি-ব্যাগে একশ টাকার নোটও ছিল একখানা। সেই ছোঁড়াটাকেই বলেছিলাম তোমাকে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে যেতে। কিন্তু সে সাহস করে আসতে পারল না। তার ভয় হল পাছে তুমি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দাও। তাই আমি এলাম—। নাও এটা!"

সামনের টেবিলে ব্যাগটা রাখলাম। রানী অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েই রইল। তারপর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—

"আপনি গোঁফ-দাড়ি রেখেছেন কেন!"

হেসে বললাম—"যদি বলি প্রত্যহ কামাবার পয়সা নেই, তাহলে কি বিশ্বাস করবে সেটা—"

রানী কোনও উত্তর দিল না। চুপ করে চেয়েই রইল আমার দিকে। আমার চোখ দুটোই সে দেখছিল নির্নিমেষে। চোখের মধ্যেই বোধ হয় মানুষের সত্য পরিচয় লেখা থাকে। সেইটেই সে খুঁজছিল। হয়তো সেটা পেয়ে গেল শেষকালে। এগিয়ে এসে প্রণাম করল আমাকে।

"সত্যি, আপনি এত বদলে গেছেন, প্রথমে চিনতেই পারি নি। কোথায় থাকেন আপনি, কি করেন"

"আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি হারিয়ে গেছি। তোমার খবর বল। বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—"

একটি সোফায় সে বসল। তখন লক্ষ্য করলাম তার পরনের শাড়িটাও বেশ শৌখীন সুরুচির পরিচয় বহন করছে। স্যাণ্ডালটিও।

মৃদু হেসে বলল—"আমিও হারিয়ে গেছি। যে মেয়েটিকে একদিন আপনি দামী শাড়ি জুতো দুল কিনে দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন, সে মেয়ে অনেকদিন আগে হারিয়ে গেছে। তার সেকালের সাধ আশা স্বপ্ন সবই হারিয়ে গেছে।"

"কি সাধ আশা স্বপ্ন ছিল তোমার—"

মেয়েটি নতমুখে চুপ করে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—"সব মেয়েরই যে সাধ আশা স্বপ্ন থাকে আমারও তাই ছিল। ছোট্ট একটি সংসার। কিন্তু আমার বাবা গরীব কেরানী ছিলেন, আমারও তেমন একটা চোখ-ঝলসানো রূপ ছিল না, তাই বিয়ের বাজারে অবিক্রীত অপছন্দ জিনিসের দলে পড়ে গেলাম। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, বাবাও কিছুদিন পরে মারা গেলেন। একা পড়লাম। তারপর—"

থেমে গেল মেয়েটি। আমিও চুপ করে রইলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল রাস্তায়-দাঁড়ানো সারি সারি রূপ-জীবার দল, ভেসে উঠল ধর্মান্তরিতা সেই সব মেয়েরা যারা মুসলমান বা খৃষ্টান হয়েছে অবস্থার চাপে পড়ে, যারা অসবর্ণ বিবাহ করে গোঁড়া সমাজের সমর্থন পায় নি, যারা মা না হয়ে পুরুষের পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, আর ভেসে উঠল সেই পঙ্গু লোভী নিশ্চেতন পৌরুষহীন ভীরু সমাজের ছবি যে খালি উপদেশ দেয়, আর কিছু করে না, যে অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কেবল তারস্বরে চীৎকার করে আর গালাগালি দেয়।

"তারপর?"

"তারপর আমি নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিলাম। আমি এখন অভিনেত্রী"

আবার কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে সে বলল—"আপনাকে কিন্তু আমি ভুলি নি। আপনার দেওয়া সেই শাড়ি দুল আর স্যান্ডাল আমাকে আমার নূতন জীবনে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে। ওইগুলো পরেই আমি অভিনয়-জগতে প্রথমে প্রবেশ করেছিলাম। এগুলো পরা না থাকলে আমার কু-শ্রী হয়তো ঢাকা পড়ত না। যিনি আমাকে প্রথমে অভিনয়-জগতে

নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হয়তো আমাকে পছন্দ করতেন না। আপনার দেওয়া ওই পোশাক আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। দেখবেন?"

উঠে গিয়ে সে ফিরে এল দামী একটি ছোট স্যুটকেস নিয়ে। খুলে দেখাল তার মধ্যে রেশমের কাপড়ে মুড়ে সযত্নে আমার-দেওয়া জিনিসগুলি সে রেখে দিয়েছে।

বলল, "মাঝে মাঝে এই বাক্সটাকে প্রণাম করি। আপনাকেই প্রণাম করি। আপনি যে আবার ফিরে আসবেন এ আশাই করিনি কোন দিন—আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে সত্যি সত্যি আপনি এসেছেন—"

"ভাগ্যে ওই পকেটমার ছোঁড়াটা তোমার ব্যাগটা আমাকে দিয়ে গেল, তাই তো তোমার ঠিকানা জানতে পারলাম। তুমি বলেছিলে নিউগী পাড়া লেনে তুমি থাক। রানী বিশ্বাস, নিউগী পাড়া লেন—এই ঠিকানা দেখে তোমার সেই অনেকদিন আগেকার দেখা মুখটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। ভাববার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু কিছু মনে পড়ল না, দেখলাম স্মৃতি আবছা হয়ে গেছে। ওই ছোঁড়াটাকেই পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে এই ব্যাগটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সে যদিও তোমাকে দেখে গেছে কিন্তু সাহস করে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে পারে নি। আমিই চলে এলুম তাই। মনে হচ্ছে এসে ভালই করেছি। অনেকদিন পরে হারানো মেয়েকে ফিরে পেলুম।"

"সত্যি কি আমার বাবার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল?"

হেসে বললাম—"না, ছিল না। তোমার বাবাকে দেখিওনি কখনও। কিন্তু ওই মিথ্যে কথাটুকু না বললে সেদিন তুমি ও-জিনিসগুলো নিতে না। নিয়েছিলে বলেই আজ তোমাকে পেলাম। মিথ্যে কথা বলেছিলাম বলে একটুও অনুতাপ হচ্ছে না আমার। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। আবার আসব, কিম্বা চিঠি লিখব।"

"আমার ফোনও আছে। ফোন নম্বরটা লিখে দিচ্ছি—"

একটুকরো কাগজে সে ফোন নম্বরটা লিখে দিলে।

"এখুনি চলে যাবেন? একটু বসবেন না? একটু চা করতে বলি?"

"না, কিছু খাব না। আমি খেয়ে এসেছি। আবার আসব"

"কোথায় থাকেন আপনি?"

"যেখানে থাকি সেটা ভদ্রপাড়া নয়। চোর-ছ্যাঁচড়, পকেটমার, পতিতাদের পাড়া। সত্যিকার ভদ্রলোকও নেই যে তা নয়, কিন্তু তাদের বাইরের চেহারাটা বড্ড নোংরা। বড্ড গরীব ওরা।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন একদিন?"

"তুমি সেখানে বেমানান—"

"না, তবু আমি যাব"

তারপর হঠাৎ বললে—"জানেন, আমার ভিতরটাও নোংরা। আমার বাইরেটাই ছিমছাম কেবল। আমার—"

বলতে বলতে চুপ করে গেল। দেখলাম তার চোখ দুটো জ্বলছে। ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে। উঁচু দাঁত দুটো ঠোঁটের ঢাকনা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

"কোথায় থাকেন আপনি, আমি যাব সেখানে একদিন"

"আচ্ছা। নিয়ে যাব। আচ্ছা, চলি—"

উঠে পড়লাম। রানী প্রণাম করে এগিয়ে দিলে আমাকে দ্বার পর্যন্ত।

আবার বললে—"আমি যাব কিন্তু একদিন—"

"বেশ যেও। নিয়ে যাব এসে—"

ট্যাক্সি করেই ফিরছিলাম। ভুতুম আর ভর্থা পিছনের সীটে ছিল। আমি বসেছিলাম ড্রাইভারের পাশে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার। পুলিশ একটা মোড়ে হাত তুলে গাড়ি থামিয়েছে। পিছনের একটা গলিতে মনে হল সাঁইবাবা গান গাইছেন। ভর্থাও বললে—সাঁইবাবা! ট্যাক্সিওলাকে বললাম—তুমি একটু দাঁড়াও, দেখে আসি। ট্যাক্সিওলা বললে—দাঁড়াব না। ভর্থাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললাম,—ভাড়াটা দিয়ে দে তাহলে। আমি সাঁইবাবার খবর নিয়ে আসি একটু। যদি আমাদের সঙ্গে যান তো তুলে নেব।

একটা গলিতে দেখলাম সাঁইবাবা একতারা বাজিয়ে গান ধরেছেন একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

ওর মনের পাখি, শিকল কেটে
উড়বি কবে আকাশে
হাঁফ ছেড়ে তুই উড়বি কবে বলরে
বিরাট নভে মেলবি কবে ডানা
তুচ্ছ করে সকল বিধি মানা
ডানা মেলে উড়বি কেবল উড়বি
ডানা দিয়ে সারা আকাশ জুড়বি
ওখানে সূর্য চন্দ্র তারার মেলা
তবু অনেক ফাঁকা সে—
উড়বি কবে আকাশে।

গান শুনেই বাড়ি থেকে একটি ছোকরা বেরিয়ে এল। দেখলাম আমারই ছাত্র মহাব্রত। আমার কাছে ইতিহাস পড়ে। এবার অনার্স দেবে। তার যে এখানে বাড়ি তা জানতাম না। এস্‌প্ল্যানেড টু বেয়ালা ট্রামে দুপুরে তাকে সপ্তাহে দু'ঘণ্টা করে পড়াই। পতিতুণ্ডিই যোগাযোগ করেছে।

সাঁইবাবা তাঁর ময়লা গেরুয়া ঝোলা থেকে কাগজে মোড়া একটি গোলাকার জিনিস বার করে বললেন—"তারকেশ্বরে গিয়েছিলাম। তোমার জন্যে একটি বেল এনেছি বাবা, নাও। বাবা তারকেশ্বর মহাকাল। তাঁর প্রসাদ মাথায় তুলে নাও—"

মহাব্রত বেলটি মাথায় ঠেকিয়ে সেটা নিয়ে ভিতরে চলে গেল। আমি গলির ভিতর ঢুকি নি। দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। ভর্থা কখন যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। সে চুপি চুপি বললে, "ওটা বেল নয়। জীবনদা যে বোমা তৈরী করেন সেই বোমা। সাঁইবাবা ওই বোমা বিলিয়ে বেড়ায়। চিৎপুরেও একটা গলিতে ওঁকে এই বেল দিতে দেখেছি—"

"তাই না কি"

অবাক হয়ে গেলাম। জীবন যে এ কাণ্ড করছে তা জানা ছিল না। সাঁইবাবা গলির আরও ভিতরে ঢুকে গেলেন। তাঁর আর একটা গানের এককলি শুনতে পেলাম—"জীবনটা তো একটুখানি, মরণটা যে মস্ত!" তাঁকে ডাকা সমীচীন মনে করলাম না। ফিরে এসে দেখি সেই ট্যাক্সিটাই দাঁড়িয়ে আছে। আমি আসতেই সে মোটর থেকে নেমে আধা বাংলা আধা হিন্দীতে

বললে—"আপনি জগ্‌জিৎ দাদার গুরুজি মহাপুর্সজি—এই ছোকড়ার কাছে মালুম হোলো। চলিয়ে—"

পৌছে দিয়ে ভাড়াও নিতে চাইছিল না লোকটা। জবরদস্তি করে দিতে হল। যাবার সময় বলে গেল—"ম্যয় জগ্‌জিৎ ভেইয়া সে আপকা বাত সব শুনা হুঁ। জুরুরৎ পড়ে গা তো জান দে দুঙ্গা! খুন বাহা দুঙ্গা।"

সে যখন চলে গেল তখনও আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। মনে হল অতি তুচ্ছ নগণ্য লোক আমি একটা, কিসের জোরে এদের হৃদয় অধিকার করেছি? ভালবাসার? কিন্তু কতটুকু ভালেবেসেছি ওদের! কতটুকু জেনেছি ওদের সম্বন্ধে! কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছি ওদের! শুধু চেষ্টা করেছি আর সম্মান করেছি ওদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বকে। যে লাঞ্ছনার জন্যে ওরা দায়ী নয় সে লাঞ্ছনা কিছু লাঘব করতে পেরেছি কি? কিছুই তো পারিনি। তবু ওরা আমাকে এত ভালবাসে?

একটা পুঁটুলি হাতে করে শোভনা এল একদিন আমার বসবার ঘরটায়। তার ঠিক একটু আগে আমার একটি ছাত্র এসেছিল। আমিও বেরুব ভাবছিলাম। কারণ এর একটু পরেই দেশবন্ধু পার্কে দুজন ছাত্রের আসবার কথা। শোভনা এসে বললে—"এইটে আপনার কাছে রেখে দিন, বাবা। তা না হলে ও মুখপোড়া কেড়ে নিয়ে যাবে—"

"কে —"

"ওই মিনুবাবু। পাঁচ বছর আগে ওর কাছে দেড়শ টাকা ধার নিয়েছিলাম। সুদই দিয়েছি দুশো টাকার উপর, তবু সে ধার এখনও শোধ হয় নি। বাঁদরটা মাঝে মাঝে সোহাগ জানাতে আসে আমার কাছে। কাল ঘরে ঢুকতে দিই নি। আজ হয়তো একটা সেপাই নিয়ে এসে আমার ঘর তছনছ করবে, আর যা পাবে তুলে নিয়ে যাবে—"

"সেপাই কোথা পাবে?"

"এ পাড়ার সব সেপাই ওর আর রোখন মিশিরের ক্রীতদাস। ওদের হাত থেকে নগদ টাকা পায় যে রোজ। এগুলো বাবা আপনি রেখে দিন আপনার কাছে। তা না হলে লুটেপুটে নিয়ে যাবে সব—"

"কি আছে ওতে— "

"আপনার দেওয়া সেই রঙীন শাড়ি দুটো। আর মায়ের কানের একজোড়া সেকেলে মাকড়ি। আর—"

থেমে গেল শোভনা।

"আর কি— ?"

"আমার স্বামীর লেখা খান কয়েক চিঠি! আমার স্বামী কলেজে পড়তেন। আমার পোড়াকপাল, তাই অকালে তিনি চলে গেছেন আমাকে ফেলে। তারপর—যাক আমার জীবনের কথা আর নাই শুনলেন। এগুলো রেখে দিন আপনার কাছে। আজ কুঁচোচিংড়ি দিয়ে বেগুনের তরকারি করেছি। দিয়ে যাব আপনার জন্যে একটু? ক্ষেন্তিদির ভয়ে আসতে পারি না। বড্ড মুখঝামটা দেয়—"

"দিয়ে যেও, তুমি তো ভালই রোজগার কর। টাকা ধার করতে গেলে কেন?"

"যখন ধার নিয়েছিলাম তখন রোজগার বেশী ছিল না ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলুত না।

খবর পেলুম আমার মামাতো বোন শৈলীর বিয়ে হচ্ছে নাকি বাগবাজারের একটি ছেলের সঙ্গে। সেই পাড়ার একটি লোক তখন আমার কাছে আসত। তার পকেটেই গোলাপী কাগজের উপর সোনালি অক্ষরে ছাপা নিমন্ত্রণপত্রটা ছিল। সে যেমনি রুমাল বার করতে গেল, অমনি বেরিয়ে পড়ল সেটা। পড়লাম চিঠিটা। বুঝলাম আমারই বোন শৈলীর বিয়ে হচ্ছে। খুব ভালোবাসতুম শৈলীকে। ছেলেবেলায় একসঙ্গে দুজনে তালপুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়তুম। ঘাটের ধারে জলে পা ডুবিয়ে বসে ছোট মাছের পোনাদের শ্যাওলার ফাঁক দিয়ে দিয়ে দেখতাম। গামছা দিয়ে ছেঁকে তুলতাম, কত রকম ফড়িং আর প্রজাপতি ধরতাম ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে ঘুরে। দুজনে মিলে কত কুল আর তেঁতুল জরিয়ে লুকিয়ে খেয়েছি। হিসেব না করেই লোকটাকে বললাম—এ আমার বোন। একে একটা হার পাঠাতে চাই। তুমি গিয়ে দিয়ে আসবে? বোলো কৈলি পাঠিয়েছে। আমার ডাক নাম—কৈলি। লোকটা রাজি হল। সেই সময় মিনুবাবুর কাছে দেড়শ টাকা ধার করেছিলাম। আজও শোধ হয়নি। হবেও না কখনও—"

বললাম, "মিনুবাবু কখন আসবে?"

"আজই আসবে হয়তো"

"এলে আমার কাছে নিয়ে এস। আর রোখন যদি থাকে তাহলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও এক্ষুনি।"

"এগুলো কিন্তু আপনি রেখে দিন"

পুঁটুলিটা আমার সিন্দুকে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম।

সিন্দুকটায় কত জিনিস যে জমেছে!

শোভনা চলে যাওয়ার পরই ক্ষেন্তি এল। সে পড়াতে গিয়েছিল। বললাম, "তোর কাছে টাকা আছে?"

"কত?"

"আড়াইশ' টাকা—"

"তোমাব ছাত্ররা যা মাইনে দিয়েছে সবই তো আছে। তা প্রায় শ' পাঁচেক হবে। আগের সব টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"সংসার চালাচ্ছিস কি করে"

ক্ষেন্তি মুচকি হেসে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলে গেল। একটু পরে আড়াইশ টাকা নিয়ে এসে বলল—"ক্ষেন্তিকে খাইয়ে-পড়িয়ে মানুষ করেছ, সংসারের ভাবনা সে-ই ভাববে এখন। তোমাকে ভাবতে হবে না। তবে বাজে খরচ করে টাকাগুলো নষ্ট কোরো না।"

ক্ষেন্তিই আজকাল আমার গার্জেন। পতিতুণ্ডিরও গার্জেন সে। একটু পরেই রোখন মিশির এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

"আজ্ঞা করুন"

"মিনুবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে চাই। শুনলাম তিনি একটু পরে শোভনার ঘরে আসবেন। তুমি তাঁকে নিয়ে এস। কি খেতে ভালবাসেন তিনি? জানা আছে সেটা?"

"তা তো জানি না। শোভনার ঘরে বসে বেগনি পেঁয়াজি চপ কাটলেট খান দেখেছি"

"মদ খান?"

"খান বই কি!"

"তাহলে এক কাজ কর"

মনিব্যাগ বার করে দেখলাম ক্ষেন্তি যে আড়াইশ টাকা দিয়ে গেল তাছাড়া আরও কুড়িটা টাকা রয়েছে আমার কাছে। সেই কুড়িটা টাকা রোখনের হাতে দিয়ে বললাম, "ওই ময়নার দোকানেই তো সব পাওয়া যাবে?"

"যাবে—"

"এখন তো পেঁয়াজি বেগনি ভাজবার সময় নয়।"

তবু আপনার নাম শুনলে ভেজে দেবে। তাছাড়া আমি যখন অর্ডার দেব তখন না ভেজে কি উপায় আছে ওর? লুকিয়ে মদ বেচে। পুলিশদের আমি সামলাই"

"বেশ তাহলে ব্যবস্থা করে ফেল। কুড়ি টাকাতে হবে তো?"

"খুব হবে। এক বোতল 'রম্' (Rum) আছে ওর কাছে জানি। যদি কিছু বেশী লাগে পরে দিলেই চলবে—"

"তুমি তো ধার্মিক লোক। তোমার ওসব চলবে কি?"

"না, না। আমি বাবার প্রসাদ রাবড়ি খাই আর মাঝে মাঝে ভাং। আমি আসবই না। আমি থাকলে আপনার আলাপ জমবে না। আমি ওকে পাঠিয়ে দেব। ময়নাকে বলে যাচ্ছি—"

ময়না এই বস্তির রেস্তোরাঁর মালিক। সব রকম জিনিসই রাখে। খাতা পেন্সিল কাগজও পাওয়া যায়, মশলা চাল ডালও রাখে, আবার বিকেলের দিকে বেগনি পেঁয়াজি চপ কাটলেট এবং ওসবের আনুষঙ্গিক উপচারও বিক্রি করে। ময়না দর্শনীয় ব্যক্তি একটি। কালোকোলো চেহারা। নাকটা বসা। মাথায় বাবরি চুল। বিনয়ের অবতার। গুনগুন করে আধুনিক গান গায়। সিনেমা-গগনের নক্ষত্রদের নির্ভুল জ্যোতিষী। সমস্ত খবর রাখে। সামনাসামনি হলেই মুখটা ফিরিয়ে নেয়, বোধহয় চ্যাপটা নাকটার জন্যে, কিন্তু আড়চোখে লক্ষ্য করে সব। বয়স ত্রিশের নীচেই। কোন কিছু বললেই তৎক্ষণাৎ বলে—"হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই" ঠিক আছে—এইটে ওর মুদ্রাদোষ। নিতান্ত মূর্খ বলে মনে হয় না। কারণ ওকে বার্নার্ড শ পড়তে দেখছি। আমি যে গল্পবলার আখড়াটা করেছি, তাতেও মাঝে মাঝে আসে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার করে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়—ওর চেপ্টা নাকটার জন্যে ও সবর্দাই যেন অপ্রস্তুত হয়ে আছে।

সেদিন একটা পুরোনো বইয়ের দোকানে যাব ভেবেছিলাম। যাওয়া হল না, মিনুবাবুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিকেল নাগাদ মিনুবাবুকে নিয়ে রোখন মিশির হাজির হল এসে। এসেই বলল—"আমাকে শিউজির মন্দিরে যেতে হবে একটু। আমি বসব না। মিনুবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন, তাই নিয়ে এলাম ওঁকে। আপনারা গল্প করুন দুজনে। মিনুবাবু মীনাকরা লোক। অনেক রং ওঁর গায়ে। পরিচয় পেলে খুশি হবেন"

মিনুবাবুর পিছন থেকে রোখন মিশির বাঁ-চোখটা ঈষৎ কুঁচকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। তারপর শিউজির মন্দিরে চলে গেল।

"আসুন, আসুন, আসুন। এই গদিটার ওপরই বসুন। আপনার মতো ভদ্রলোককে বসাবার মতো জায়গা আমার নেই। তবু কষ্ট করে বসুন একটু"

মিনুবাবুর মুখে একটি মিষ্টি হাসি সর্বদাই ফুটে থাকে। সবিনয়ে বললেন, "আপনার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে আপনার কাছে বসতে পারাটাই পরম সৌভাগ্য। আমাকে অত খাতির করছেন কেন, আমি সামান্য লোক"

"বসুন। আমিও সামান্য লোক। তাই আশা করি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে দেরি হবে না"

"আপনার বন্ধু হবার যোগ্যতা আমার নেই"

মিনুবাবু ক্রমাগত খোলসের উপর খোলস চড়াতে লাগলেন।

"আপনাকে যে জন্যে স্মরণ করেছিলাম সেই ব্যাপারটা আগে সেরে নি—"

আড়াইশ' টাকার নোটের তাড়াটা তাঁর সামনে ধরলাম।

"কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। টাকা কিসের?"

"অনেক দিন আগে শোভনা আপনার কাছে দেড়শ টাকা নিয়েছিল, সেইটে শোধ করে দিচ্ছি। ওকে এ নিয়ে আর বিরক্ত করবেন না। আরও একশ টাকা বেশী আছে এতে। সুদটুদ যদি বাকি থাকে কিছু তাও শোধ করে দেবেন। ও বেচারী বড্ড গরীব—আর দিতে পারবে না।"

মিনুবাবু নোটের তাড়াটা নিয়ে গুনে দেখলেন ঠিক আড়াইশ টাকা আছে কি না, তারপর যখন দেখলেন ঠিক আছে তখন সেটা 'ইনার' পকেটে পুরে ফেললেন। তাঁর মুখে কোন বিস্ময় ফুটল না।

"রসিদ দেবেন কোনো?"

"নিশ্চয় দেব। একটা কাগজ দিন।"

কাগজ দিতেই সেটার উপর লিখে দিলেন—"শোভনার কাছে আজ পর্যন্ত যা পাওনা ছিল সব শোধ হয়ে গেল।" এই লিখে নীচে নাম সই করে তারিখ দিয়ে দিলেন।

"শোভনা কি কোনও হ্যাণ্ডনোট দিয়েছিল?"

"না। আমাদের সব কারবার মুখে মুখে। ওরা কখনও আমাদের ঠকায় না। আমরাও আমাদের পাওনা পেয়ে গেলে ওদের কিছু বলি না। অবশ্য মাঝে মাঝে কেউ কেউ দমবাজি করে, তখন পুলিশ ডেকে বা গুণ্ডা ডেকে ঘরের জিনিসপত্তর যা পাই তুলে নিয়ে যাই— ব্যাপার ওইখানে মিটে যায়। তবে মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়, এ পাড়ার নবুর মাকে বড় ভয় করি আমি। ও মেয়েছেলে নয়, ও গণ্ডার। ও যদি গাছকোমর বেঁধে ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়ায় তাহলে পুলিশ, কাবলে, গুণ্ডা কেউ কিছু করতে পারে না। মাস দুয়েক আগে সেই ভজুয়ার মায়ের বাড়িতে যে হাল্লাটা হয়ে গেল, আপনি তো জানেন"

"জানি। নবুর মাকে আমিও ভয় করি—"

নবুর মা এ-পাড়ার ঝিয়েদের নেত্রী। বলিষ্ঠ, কালো মহিষাকৃতি নারী। কচিৎ তার সঙ্গে দেখা হয়। ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়। রাত দশটায় ফেরে। ফিরেই তার পুত্রবধূর সঙ্গে কলহ করে খানিকক্ষণ। অশ্রাব্য অশ্লীল কথা অনর্গল খানিকক্ষণ চীৎকার করে বলে যায়। ওইটেই ওর একমাত্র আরাম—ইংরেজিতে যাকে বলে রিল্যাক্সেশন (Relaxation)। রোগা ভালোমানুষ নবুর বউ কোনও উত্তর দেয় না। নবু হাঁপানির রুগী। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে হাঁপায় আর মা-কে মাঝে মাঝে বলে—এইবার ক্ষ্যামা দে। খেটেখুটে এসেছিস, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় এবার। নবুর মার যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ সে 'ক্ষ্যামা' দেয় না। আমার সম্বন্ধেও নবুর মার ধারণা ভালো নয়। আড়ালে বলে—বোকা বুজরুক একটা। সবার উপকার করতে চায় মুখপোড়া। ন্যাংটোর দেশে ধোপার দোকান খুলেছে। মরণ আর কি! কাগদের সামনে ভাত ছিটোচ্ছে! আমার সম্বন্ধে এইরকম মন্তব্য সে মাঝে মাঝে করে শুনেছি। নবুর যখন হাঁপানির টান বাড়ে তখন নবুর বউ আমার কাছ থেকে হোমিওপ্যাথী ওষুধ নিয়ে যায় এসে।

সাময়িকভাবে কমে। আবার বাড়ে। অ্যালোপাথী পেটেন্ট ওষুধও এনে দি মাঝে মাঝে। নবুর মায়ের ধারণা কিন্তু বদলায় নি। সুযোগ পেলেই বলে—মুখপোড়া কাগদের সামনে ভাত ছিটোচ্ছে? কত ছিটোবে? আমার সঙ্গে মুখোমুখি হলে নবুর মা মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে হনহন করে চলে যায়। তার সঙ্গে আলাপ হয় নি। নবুর মার কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মিনুবাবু বললেন—"শোভনার জন্যে টাকা খরচ করছেন করুন, কিন্তু একটা খবর আপনাকে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি। মেয়েটা বড় ফিক্‌ল্ (fickle)। আজ আপনাকে আশা দিয়েছে কিন্তু কাল অন্য জায়গায় যদি বেশী টাকার লোভ দেখায় কেউ, সেইদিকে ঢলে পড়বে—"

বললাম—"শোভনা আমার মেয়ে!"

"মেয়ে! কি রকম?"

"আপনি যেমন আমার ভাই। আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?"

"বলুন—"

"মেকি মুখোসটা খুলে ফেলে সত্যি আমার ভাই হোন। আপনার সুখ দুঃখের অংশীদার হবার সুযোগ দিন আমাকে।"

একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন মিনুবাবু।

এক ঝলক মেকি হাসি হেসে বললেন—"মানে, বেশ তো! মেকি মুখোসের কথা বলছেন? ইচ্ছে করে তো কোনও মুখোস পরিনি দাদা, মনিবের কাজ বাজাতে বাজাতে মুখটাই হয়তো মুখোসেব মতো হয়ে গেছে। ওতো খেলা যাবে না। মায়ের কোলে একদিন যে সরল শিশু জন্মেছিল সে তো অনেকদিন আগেই চলে গেছে, তার জায়গায় এসেছে এক তুখোড় মতলববাজ লোক, ঠিকই ধরেছেন দাদা, মুখটা মুখোসের মতোই দেখাচ্ছে—"

স্বৈরিণী ভজুয়ার মা ডগমগে রঙের একটা শাড়ি পড়ে আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আমার জানালার দিকে চাইতে চাইতে। ভজুয়ার মা নবুর মায়ের দল-ভুক্তা। দিনের বেলা ঝি গিরি করে, রাত্রে বেশ্যাবৃত্তি। তার ছেলে ভজুয়া শৈশবেই মারা গেছে না কি। ভজুয়ার মায়ের চালতার মতো মুখ। কাজল-পরা চোখ দুটি বড় বড়। সে যখনই এদিকে আসে, আমার দিকে চাইতে চাইতে যায়। দৃষ্টির ফাঁদে আমাকে ফেলতে চায় সম্ভবত। কিন্তু আমি পোড়-খাওয়া পুরোনো পাজি, ওসবে বিচলিত হওয়ার মতো লঘুতা অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলেছি। ওসবে প্রবৃত্তিও আর নেই। সুতরাং নির্বিকার হয়ে থাকি। এই জন্যে ভজুয়ার মা আমার উপর চটা। তার অব্যর্থ বাণ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এতে একটু অপমানিত বোধ করে সে। আমি এ পাড়াব সব মেয়েকেই মাতৃসম্বোধন করি। ভজুয়ার মা-কেও করি।

বললাম—"মা, তুই তো ওই দিকেই যাচ্ছিস, ময়নাকে একটু বলে যা আমার খাবারগুলো যেন দিয়ে যায়। মিনুবাবু এসে গেছেন—"

ভজুয়ার মা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াল। তার দেহের মনোহারিণী রেখাগুলি প্রকট হয়ে উঠল শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। সে বিহারিণী, স্বাস্থ্যবতী এবং লোভনীয়া। মিনুবাবু দেখলাম ঈষৎ চনমনে হয়ে উঠলেন। ভজুয়ার মায়ের কথায় ঈষৎ বিহারী টান আছে। কিন্তু সে বাংলাই বলে।

"কি বোলসেন—"

যা বলেছিলাম আবার বললাম।

'ময়নার সঙ্গে আমার 'কাজিয়া' (ঝগড়া) আছে। ওর সঙ্গে কথা বলি না"

হেলতে দুলতে চলে গেল।

মিনুবাবু বললেন, "একের নম্বর খচ্চড় মাগী—"

হেসে বললাম, "আমরা কেউ খচ্চর, কেউ ঘোড়া, কেউ হাতী, কেউ উট—সবই অবস্থার বিপাকে। আসলে আমরা কেউ খুব খারাপ লোক নই।"

হঠাৎ মিনুবাবুর মনের কপাট যেন খুলে গেল।

"নই? আমার তো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। পেটের জন্যে এই নরকে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে। অথচ আমি কত বড় বংশের ছেলে। বাবা অধ্যাপক ছিলেন, ঠাকুর্দা ছিলেন একজন সিদ্ধ যোগী—"

বললাম—"আপনি মোটেই খারাপ লোক নন। যে হাঁস সরস্বতীর বাহন সেও পাঁক থেকেই খাবার সংগ্রহ করে!"

"কিন্তু আমি তো দানবের বাহন। তার জন্যেই—"

বলেই থেমে গেলেন মিনুবাবু। হঠাৎ একটা বিরাট গহ্বরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন যেন।

আমি অন্য কথা পাড়লাম। তাঁর পারিবারিক কথা, তাঁর ছাত্রজীবনের কথা। দেখলাম লোকটি সত্যিই ভালোবংশের ছেলে, ইংলিসে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছেন। চাকরিও করেছেন নানা জায়গায়, কিন্তু ভালো মাইনে কোথাও পান নি। দারিদ্র্যের দায়ে কলকাতার বসতবাটি অবাঙালীর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই টাকা নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। সে ব্যবসাও ডুবে গেছে। স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। এই ধরনের নানা কথা।

হঠাৎ ময়নার দোকান থেকে একটা ছোঁড়া এসে বলল—"ভজুয়ার মা খবর পাঠিয়েছিল আপনাকে খাবার পাঠিয়ে দিতে। উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে, একটু পরেই আনছি সব ভেজে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি—"

মিনুবাবু বললেন—"আমার জন্যে খাবার আনতে দিয়েছেন? কেন?"

বললাম—"ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—কারো হৃদয়ে যদি প্রবেশ করতে চাও, তাহলে উদরের পথে যেও। ওই মহাজনবাক্য যে মিথ্যা নয় তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি"

খাবার আসার পূর্বেই মিনুবাবুর হৃদয় দ্বার খুলে গেল। তিনি নিজের জীবনের অনেক কথাই বক বক করে বলে যেতে লাগলেন। তিনি কবিতাও লিখতেন নাকি। জীবনে অনেক বড় বড় আদর্শ ছিল। সব কিছু চুরমার হয়ে গেছে। এখন টাকার জন্যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। ওই দানবের পয়সায় গ্র্যান্ড হোটেলে থাকেন। দানবই তাঁর সব খরচ বহন করেন। অর্থাৎ যা চান, তাই পান। সব বলে শেষকালে বলে উঠলেন—"কিন্তু দাদা, সুখ নেই, শান্তি নেই। বুকে দিনরাত চিতা জ্বলছে— কার চিতা তা জানি না, কিন্তু জ্বলছে, দিনরাত জ্বলছে।"

খাবার এসে পড়ল। গরম গরম বেগ্‌নি, পেঁয়াজি, চপ, কাটলেট, ওমলেট, চা আর এক বোতল 'রম্'। তিনখানা রঙীন ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এল ময়না।

"আরে এসব কি কাণ্ড করেছেন দাদা!"

'রম্'-এর বোতলটা তুলে দেখালাম।

"এসব জিনিস তো দুর্লভ আজকাল"

বললাম, "পয়সা ফেললে কিছুই দুর্লভ নয় কোলকাতা শহরে। দুর্লভ হচ্ছে 'প্রেম'।"

তিন পেগ খেয়েই টলমল অবস্থা হয়ে পড়ল মিনুবাবুর। চতুর্থ পেগে চুমুক দিতে দিতেই হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

"আমি পাপিষ্ঠ, আমি নরাধম, সতীদের চোখের জলে যে পথ পিছল হয়ে গেছে সেই পথেই হাঁটছি আমি, পথের শেষ কুম্ভীপাক, না রৌরব কি যে অপেক্ষা করে আছে জানি না। ওই শালা, ওই রাক্ষস, ওই দানবটা চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে— থামতে দিচ্ছে না, থামতে দিচ্ছে না—"

হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। এরপর রাবণের নাম-ঠিকানা জানতে অসুবিধা হল না। নিজেই সব বলে ফেললেন তিনি।

ক্ষেন্তি উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকল ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে।

"দাদা, সোনা কাল থেকে বাড়ি ফেরে নি!"

"বিশু কোথা? সেই প্রফেসারের কাছে গিয়ে খোঁজ নিক না।"

"বিশু গিয়েছিল। প্রফেসারের ঘরে অন্য ভাড়াটে। তারা বললে প্রফেসার নাকি আমেরিকা চলে গেছে! কি করা যায় বল তো—"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। ক্ষেন্তি কিন্তু আমাকে বিমূঢ় হয়ে থাকতে দিল না। সে নেংচে নেংচে ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিকে। কিছু বললে না, কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল ছটফট করে। মনে হল ওর যেন যন্ত্রণা হচ্ছে একটা।

"বিশু কোথায়?"

"সে আবার বেরিয়েছে"

"কোথায়"

"তা তো জানি না। আমার কেমন যেন ভয় করছে দাদা"

এরপরই ভর্থা ছুটে এল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—"পুলিশ এসেছে, জীবনদাকে অ্যারেস্ট (arrest) করেছে। বিশুদাকে খুঁজছে—"

আমি বেরিয়ে এলাম।

যে পুলিশ অফিসারটি এসেছিল দেখা করলাম তার সঙ্গে।

"কি ব্যাপার মশাই—"

তিনি বললেন, "এ পাড়ার একটি মেয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ছোরা মেরে খুন করেছে একটা লোককে।"

যার বাড়ির নাম করলেন সে রাবণ।

"বলেন কি!"

"খবর পেলাম এই জীবন নাকি তার দাদা, আর বিশু বলে একটা লোক তার স্বামী। বিশু তো গা ঢাকা দিয়েছে দেখছি। আপনি কিছু খবর বলতে পারেন? তার নামেও ওয়ারেণ্ট আছে একটা—লোকটা ডেয়ারিতে কাজ করে শুনছি—"

"আমি তো কিছুই জানি না। ছোরা মেরেছে? কোথায় সে মেয়েটা?"

"সে-ও মারা গেছে। তার 'বডি' এখন মর্গে"

"বলেন কি!"

তিনি আমার কথার জবাব দিলেন না। একজন পুলিশকে হুকুম দিলেন—"জীবনকে থানায় নিয়ে যাও। আর দুজন এখানে থাক। আমি সার্চ করব।"

বললাম—"আমার ঘরটাই আগে সার্চ করুন তা হলে। আমি বেরুব একটু—"

"আপনি কি করেন এখানে"

"আমি ছেলেদের পড়াই—ছোট স্কুল আছে এখানে একটা—"

"কোথায় থাকেন?"

"জীবনেরই বাইরের ঘরটায়।"

"চলুন দেখে নি আপনার ঘরটা—"

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখলেন।

"এটা কি? ওই উঁচু মতন—?"

"ওটা একটা ছেঁড়া গদি। আমার বিছানা। একটা সিন্দুকের উপর পাতা আছে। সিন্দুকটা খুলে দেখাব?"

"সিন্দুকে কি আছে—"

"আমার বই-টই বালিশ চাদর এইসব আর কি। ওটা আমার ভাঁড়ার ঘর। খুলে দেখাব?"

"দেখান—"

ছেঁড়া গদিটা নামিয়ে সিন্দকের ডালাটা খুললাম। বেশ কয়েকটা আরশোলা ফরফর করে বেরিয়ে পড়ল।

"থাক, বন্ধ করে দিন—আপনি কোথায় যাবেন এখন"

"টিউশনি করতে—"

"আচ্ছা যান—"

বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে ক্ষেন্তির তীক্ষ্ণকণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"আমি জীবন্ত থাকতে আমার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেব না।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম বিষধর শঙ্খচূড়ের মতো ফণা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষেন্তি। তার হাতে একটা বঁটি। পাড়ার লোকেরা পিল পিল করে ছুটছে দেখলাম ক্ষেন্তির ঘরের দিকে। আমি দাঁড়ালাম না। আমাকে মর্গে যেতে হবে। দেখতে হবে সোনার মৃতদেহটা। স্বচক্ষে দেখতে হবে মৃতদেহটা সোনারই কি না। মর্গে যখন পৌঁছলাম দেখলাম কেউ নেই। ডোমরা আছে খালি। আর আছে একটা পুলিশ কনেস্টবল। দশ টাকাতেই কাজ হয়ে গেল। ঠাণ্ডা ঘরে দেখলুম উলঙ্গিনী সোনা শুয়ে আছে। মনে হল কতকগুলো শকুনে যেন তাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। গালে বুকে উরুতের দুপাশে কালো কালো দাগ। চোখ দুটো খোলা, তাতে নির্নিমেষ বিস্মিত দৃষ্টি। যখন ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে। মনে হল সমস্ত পাড়াটা যেন থমথম করছে। ঝড়ের পূর্বাভাষ? ঝড় উঠবে কি? সত্যি উঠবে? বাসায় এসে দেখি কেউ নেই।

"ক্ষেন্তি—"

ভর্থা বেরিয়ে এল একটা বাড়ির পিছন থেকে।

"ক্ষেন্তিদিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ক্ষেন্তিদি দারোগার কাঁধে বঁটির কোপ বসিয়ে দিয়েছিল—"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ শীতলকে দেখা গেল। সে তার শিশু-বাহিনীদের নিয়ে মার্চ করে চলেছে—চলো, চলো, সামনে চল সামনে চল; সামনে চল। 'সামনে' টা মাঝে মাঝে 'সামলে' হয়ে যাচ্ছে। একটা গলি দিয়ে বেরিয়ে গেল সে বড় রাস্তার দিকে।

নির্বাক হয়েই দাঁড়িয়েছিলাম। কি যেন ভাবছিলাম, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

"বাবা—"

দেখি শোভনা এসে দাঁড়িয়েছে। আঁচল দিয়ে একটা থালা ঢেকে রেখেছে।

"আপনার খাবার এনেছি। খাবেন চলুন। সকাল থেকে তো কিছু খান নি।"

বাড়িতে ঢুকলাম। দেখলাম উঠোনে জিনিসপত্র ছড়ানো। ক্ষেন্তিকে যে শাড়িগুলো কিনে দিয়েছিলাম সেগুলো উঠোনে কাদায় পড়ে আছে। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। উঠোনে প্যাচপেচে কাদা।

"এই বারান্দাতেই জায়গা করে দি"—

শোভনা একটা আসন পেতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাবারের থালাটা রাখলে। দেখলাম অনেক রকম তরকারি। চিতি কাঁকড়ার ঝালও করেছে। তাছাড়া মাছ, আলুর দম, বুটের ডাল।

"এত সব তুই করেছিস্"—

"বুটের ডাল আর আলুর দম ভজুয়ার মা দিয়েছে। ওর তো খুব নিষ্ঠা, মাছ মাংস খায় না। বললে, আমার এসব দিতে লজ্জা করে, তুই নিয়ে যা—যদি খান—"

যন্ত্রচালিতবৎ বসলাম এবং খেয়ে ফেললাম সব। খেতে বসে বুঝলাম খুব ক্ষিদে পেয়েছিল।

"মহাপুরুষ বাড়ি আছেন না কি—"

বুরুশ বিশ্বাসের গলা। খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কি করব। কিছু করতেই হবে একটা—! বুরুশ বিশ্বাস আসাতে অকূলে কূল পেলাম যেন। ক্ষেন্তির জিনিসপত্র তখনও ছড়ানো ছিল চারদিকে।

"এ কি কাণ্ড। জিনিস পত্র ছড়ানো কেন"

"পুলিশ এসেছিল—"

"আসবেই আন্দাজ করেছিলাম। জীবনবাবু পালাতে পেরেছেন? তিনিই বোমা তৈরি করেন তো?"

বিস্মিত হলাম।

"আপনি কি করে জানলেন?"

"এক বাউল আমাকে একদিন দিয়েছিল একটা। বলেছিল আপনি বেল ভালবাসেন তাই আপনার এক বন্ধু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলে এটা। তার বেলগাছ আছে—বাউলের মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলাম তার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর মনে পড়ল। বীরেন গোস্বামীকে চিনতে পারলাম। বীরেন না কি? প্রশ্ন করতেই আবার পায়ের ধুলো নিলে সে। তারপর সব বললে। জীবন পতিতুণ্ডি বোমা তৈরি করে আর ও বিলি করে বেড়ায় সেগুলো। এই তার কাজ এখন। পুলিশ এসেছিল? আসবেই জানতাম! দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে?"

"জীবনকে ধরে নিয়ে গেছে। সাঁইবাবা এখানে ছিলেন না।—"

"সাঁইবাবা আবার কে—"

"আপনি যাকে বীরেন গোস্বামী বলছেন আমরা ওঁকে সাঁইবাবা বলে চিনি। কিন্তু জীবনকে বোমার জন্যে ধরেনি। আর এক কাণ্ড হয়েছে—"

"কি সেটা"

সব বললাম। শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন বুরুশ বিশ্বাস। বললেন—"রাবণের ঠিকানাটাও পেয়েছি। এখন কি ভাবে কি করা যায় বলুন তো—"

"মাঠে চলুন। বদ্ধ ঘরে বসে এ সব পরামর্শ করা চলে না—"

"চলুন"

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি আমার ঘরের সামনে একটা ভীড় জমে গেছে। ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাড়ি-উলি রাজলক্ষ্মী। গোদা পায়ে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে এসে বলল, "কি হয়েছে আমরা সব শুনেছি। আমি সকলের হয়ে আপনাকে বলতে এসেছি—আমরা প্রাণ দিয়েও এর জবাব দেব। আপনি আমাদের আগ বাড়িয়ে নিয়ে চলুন। সোনাকে আমরা সবাই ভালবাসতুম। সে আমার মেয়ের মতো ছিল—"। হঠাৎ রাজলক্ষ্মী থেমে গেল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ভীড়ের ভেতর দেখলাম ভর্থা, ভুতুম, দশরথ, রোখন মিশির, ভজুয়ার মা, নবুর মা, রিক্‌শওলার দল, ময়না, এ পাড়ার মুদি, দর্জি, নাপিত, মুচি, রমজান, কিক্‌নি, আরও বহুলোক এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের চোখে উৎসুক, উন্মুখ জ্বলন্ত দৃষ্টি।

বললাম—"তোমাদের এ আদেশ আমি মাথা পেতে নিলুম। তা পালন করবার জন্যে দরকার হলে আমিও প্রাণ দেব।"

জনতা চীৎকার করে উঠল—বন্দে মাতরম্।

বুরুশ বিশ্বাস হাতজোড় করে উঠল—বন্দে মাতরম্।

বুরুশ বিশ্বাস হাতজোড় করে প্রণাম করছেন দেখলাম। তারপর বললেন—"চলুন, মাঠে গিয়ে বসা যাক।"

ভীড় ক্রমশ কমে যেতে লাগল। আমরা বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগলাম।

বললাম, "ট্যাক্সি ডাকব?"

বুরুশ বিশ্বাস এবার আপত্তি করলেন না।

"ডাকুন। কিন্তু পাবেন কি?"

"দেখি—"

ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগলাম দুজনে। কিছুদূরে গিয়ে ডানহাতি একটা গলি থেকে সাঁইবাবার গান ভেসে এল। দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"দাঁড়ালেন কেন—"

"সাঁইবাবা গান গাইছেন। শুনি একটু—"

"গান তো অনেক শুনেছেন, রোজ শুনছেন। এখন কাজ করা দরকার—নষ্ট করবার মতো সময় নেই"

"আপনি ট্যাক্সি একটা দাঁড় করান না। আমি গলির মোড়েই দাঁড়িয়ে আছি—"

আমি গলির ভিতর একটু ঢুকে সাঁইবাবার গান শুনতে লাগলাম।

প্রলয় নাচন নাচার আগে
উলঙ্গিনী হবেন কালী
মুণ্ডমালা দুলবে গলায়
শিব থাকবে পায়ের তলায়
চন্দ্রহারের জায়গাটাতে

হাত-পা-গুলো ঝুলবে খালি।
চন্দ্র-সূর্য পালিয়ে যাবে
ধূমকেতুরা আসবে ছুটে
ডাকিনীদের অট্টহাসে
যাবে মোহ-তন্দ্রা টুটে
নাগ উঠবে পাতাল ফুঁড়ে
বাজ বাজবে আকাশ জুড়ে
ওরে মহাপাষণ্ডেরা
তোদের গুড়ে পড়বে বালি
উলঙ্গিনী হবেন কালী।

সেদিন মাঠে অনেকক্ষণ ছিলাম। বুরুশ বিশ্বাস আমার সমস্ত পরিচিত লোকদের খুঁটিনাটি পরিচয় নিতে লাগলেন। রানী বিশ্বাসের কথাও বললাম তাঁকে। জগজ্জিতের কথা বললাম। মিনুবাবু, রোখন মিশিরের কথাও বললাম। ভর্থা, ভুতুম, দশরথ, রিক্‌শওয়ালারা—সকলের কথাই শুনলেন তিনি। রাবণের দুর্বলতার কথাটা শুনে অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন বুরুশ বিশ্বাস। তাঁর চোখ দুটো বাঘের চোখের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"আচ্ছা, আপনাকে কাল একটা প্ল্যান দিয়ে আসব। আপনি টুকে নেবেন সেটা। বর্ণে বর্ণে সেটা যদি পালিত হয় তাহলে আপনি যা চাইছেন তা হবে। দিবা দ্বিপ্রহরেই করতে চান?"

"দিবা দ্বিপ্রহরেই—"

"চৌরাস্তার মোড়েই টাঙাবেন?"

"হ্যাঁ। সবাই যাতে দেখতে পায়—"

"বেশ। ভেবেচিন্তে প্ল্যান দিয়ে আসব একটা—"

এইখানেই আমার পাণ্ডুলিপি শেষ হল।

দ্বিতীয় আর একটা চিঠির রূপ ধরে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে যাব। তুমি যদি আস হয়তো আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু দেখতে পাবে তাদের প্রচ্ছন্ন মহিমা যাদের তোমরা এতদিন ঘৃণা করে এসেছ।

বুজুর চিঠি এবং পাণ্ডুলিপি আমার টেবিলের উপর রাখা ছিল। হঠাৎ একদিন দেখিলাম সেগুলি নাই। খোঁজাখুঁজি করিয়া আবিষ্কার করিলাম কুশলা সেগুলি লইয়া গিয়াছিল। আমাকে আনিয়া দিল এবং বলিল—"আমি বুজুদার ঠিকানাটা জেনেছি—"

"কি করে? ও তো কোন ঠিকানা দেয় নি"

"অমিলা চিঠি লিখেছে একটা—"

"ও"

আর কোন কথা হইল না। অনুভব করিলাম যে অদৃশ্য অগ্নি কুশলাকে ঘিরিয়া অহোরাত্র জ্বলিতেছে তাহা যেন প্রখরতর হইয়াছে। মনে হইল প্রত্যক্ষ অগ্নিশিখারূপে এবার বুঝি তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

পাঁচ
দ্বিতীয় চিঠি

ভাই কবি,

এ যুগে কালোবাজারীই রাবণ। তার সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতাপে আজ রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি, ব্যষ্টি, রাজনীতি, সাহিত্য বস্তুত মানব সভ্যতার সব কিছু ভীত, অভিভূত। সে টাকা দিয়ে সব কিছু কিনতে পারে, সব কিছু কিনতে চায়। তার কামনা অসতী রমণীকে ভোগ করেই তৃপ্ত নয়, সতী রমণীকে সে ধর্ষণ করতে চায়। আমি আগামী কাল এই রকম একটি রাবণকে প্রকাশ্য রাজপথে দিবা-দ্বিপ্রহরে ল্যাম্পপোস্টে লটকে দেব। অভিনেত্রী রানী বিশ্বাস সতী রমণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছে। সে নিজের বাড়িতেই থাকবে। মিনুবাবু রাবণকে খবরটি দেবে। রাবণ তার বাড়িতে লুকিয়ে যাবে গভীর রাত্রে। প্রবেশ করবামাত্র জগ্‌জিতের দল ধরে ফেলবে তাকে। ধরে মুখ বেঁধে নিয়ে আসবে আমাদের পাড়ায়। রাজলক্ষ্মীর কাছে মা কালীর একটা পট আছে। তার সামনে বলিদান দেওয়া হবে পশুটাকে। রমজান একটা গলা-শুদ্ধ খাসির মুণ্ড আনবে। জনার্দন মুচি সেই মুণ্ডটাকে সেলাই করে বসিয়ে দেবে ওই কবন্ধের উপর। ওর মুণ্ডটা ওর কোমরে বেঁধে দেওয়া হবে। সেটা ঝুলবে ওর পায়ের তলায়। ভর্থা আর ভুতুম একটা লম্বা বাঁশের সিঁড়ি নিয়ে হাজির থাকবে ওই চৌমাথায়। জগ্‌জিৎ আর তার বন্ধুরা বড় বড় লরি নিয়ে চারটে রাস্তাই বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ট্রাফিক পুলিশটাকে ঘুষ খাইয়ে বশ করবার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে গুম করে দেবার ব্যবস্থা করেছে ভজুয়ার মায়ের প্রণয়ী শিউলাল। সে একজন বিখ্যাত গুণ্ডা। তার দলবলও অনেক। প্রত্যেক লরিতে বোমা নিয়ে থাকবে এক একজন। পুলিশ যদি আসে তাদের সঙ্গে লড়বে। শোভনা, রাজলক্ষ্মীও থাকবে বোমা নিয়ে। আমাদের পাড়ার প্রত্যেকে থাকবে। শীতল, সাঁইবাবা—সব। ছাগমুণ্ড কবন্ধটাকে বস্তায় পুরে নিয়ে আমিও সামনের একটা লরিতে থাকব তিরপলের তলায়। বুরুশ বিশ্বাস উপস্থিত থাকবেন একটা হুইস্‌ল নিয়ে। তিনি যখন হুইস্‌ল দেবেন তখন আমি বস্তাটা নিয়ে বেরিয়ে আসব কিছু শক্ত লাকলাইনের দড়ি বগলদাবা করে। ভর্থা আর ভুতুম সিঁড়িটা ল্যাম্পপোস্টে লাগিয়ে শক্ত করে ধরে থাকবে। আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে রাবণকে ল্যাম্পপোস্টে টাঙিয়ে দেব। জানি পুলিশ আসবে, গুলি চলবে, আমরা মরব, কিন্তু তবু যা ঠিক করেছি তা করব। ঘটনাটা কোথায় ঘটবে তার একটা ম্যাপ পাঠালাম এই সঙ্গে। তুমি যাবে কি? এই দেখ আমি এসেছি তোমার কাছে। ইতি— বুজু।

এই চিঠিখানা আমার টেবিলের উপর পাইলাম। খাম খুলিয়া কে যেন পড়িয়াছে। কখন আসিয়াছিল, কে দিয়া গিয়াছিল? কুশলাকে ডাকিলাম। চাকরটা বলিল সে অনেকক্ষণ আগে বাহির হইয়া গিয়াছে।

আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছিলাম তখন যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে। পুলিশের গুলি চলিয়াছে। রাস্তায় অনেক মৃতদেহ। হঠাৎ কুশলার মৃতদেহটা দেখিতে পাইলাম। সে একটা জীর্ণ-শীর্ণ গোঁফ-দাড়িওলা মরা লোকের পাশে পড়িয়া আছে। এই কি বুজু? এই মহাপুরুষ? রক্তে তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত।

অজ-মুণ্ড রাবণটা তখনও ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিতেছিল।

পরদিন কাগজে দেখিলাম দোষী নাকি ধরা পড়িয়াছে। অমিলা চৌধুরী নাকি পুলিশ কমিশনারের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছেন—এ ষড়যন্ত্র আমিই করিয়াছি, ইহার জন্য যে শাস্তি আমাকে দিতে চান দিন।

মানদণ্ড

সেদিন স্টেশন প্লাটফর্মে খুব ভিড়। ট্রেন এসেছে অনেক দেরিতে। এর আগে যে ট্রেনখানা এসে পৌঁছবার কথা সেটাও এসে পৌঁছয় নি। দুটো ট্রেনের যাত্রী তাই ভিড় করেছে। ট্রেনটা আসবামাত্র হুড়োহুড়ি পড়ে গেল একটা, যে যেখানে পারল চড়ে বসল। যথাসময়ে গার্ড সাহেব হুইস্‌ল্ দিলেন, সবুজ আলো দেখালেন, যথারীতি ঘণ্টা পড়ল। শ্রীমতী তুঙ্গশ্রী যখন এলেন তখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ছুটোছুটি করেও ট্রেনটা ধরতে পারলেন না তিনি। অপসৃয়মান গার্ড-গাড়িটার দিয়ে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ট্রেনটা চলে গেল। কোথায় থাকবেন তিনি এখন রাত্রে এই বিদেশে! তা ছাড়া থাকা নিরাপদও নয় যে! কুলিটার দিকে ফিরে চাইলেন। সে তাঁর সুটকেস ও বিছানাটা মাথায় করে দাঁড়িয়েছিল পিছনেই। সমস্ত রাগ পড়ল তার উপরে। লোকটা নিজে যেচে এসে মালটা নাবালে লরি থেকে। তারপর মাল মাথায় নিয়ে গল্প করলে একটা লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তারপর বিড়ি কিনতে গেল তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে। রোষ-বহ্নি ধকধক করে উঠল তুঙ্গশ্রীর চোখের দৃষ্টিতে। কুলিটার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে তিনি বললেন—"তোমার জন্যেই তো ট্রেনটা পেলাম না। এখন কি করি বল তো? কুলিটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর দিকে। তারপর বললে—"ওয়েটিং রুমে থাকবেন কি?"

"না।"

"ধরমশালায় নিয়ে যাব?"

"না।"

"হোটেলও একটা আছে স্টেশনের কাছে।"

"না, সেখানেও যাব না।"

"তাহলে—"

ইতস্তত করে থেমে গেল কুলিটা। তুঙ্গশ্রীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি এমন কোনও স্থানে থাকতে চান না, যেখানে আর পাঁচজনে তাঁকে দেখতে পায়। তিনি যে এখানে এসেছিলেন, এ কথা কাউকে জানতে দিতে চান না তিনি। গোপনে এসে গোপনে চলে যাবেন—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু এই কুলিটার জন্যে সব মাটি হয়ে গেল। কুলিটা আবার বললে—"আপনি তাহলে কোথায় যাবেন বলুন, সেইখানেই নিয়ে যাই।"

"আমি এমন কোনও জায়গায় রাত কাটাতে চাই, যেখানে বাইরের লোক থাকবে না। মানে, একা থাকতে চাই। এমন কোনও জায়গা জানা আছে তোমার?"

"আছে। সেটা কিন্তু শহর থেকে বাইরে।"

"কত দূর?"

"তা মাইল দুই হবে। আমার জানা-শোনা একটি বাবুর বাড়ি। তিনি এখন এখানে নেই। আমি তাঁর বাড়ি দেখাশোনা করি, চাবি আমার কাছে আছে।"

তুঙ্গশ্রী ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন ক্ষণকাল। কাল সন্ধ্যার আগে ফেরবার ট্রেন নেই। সকালের দিকে আছে অবশ্য একখানা ট্রেন, কিন্তু দিনের ট্রেনে যাবেন না তিনি। যাওয়া নিরাপদ

নয়। আজ সমস্ত রাত কাল সমস্ত দিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে তাঁকে। কুলিটা যে রকম বলছে সে রকম একটা বাড়ি যদি থাকে, তাহলে মন্দ কি!

"সেখানে যাব কি করে?"

"হেঁটে যেতে পারেন। গাড়িও পাওয়া যায়।"

"বেশ, গাড়িই কর একটা তাহলে—"

"চলুন।"

"প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি কুলিকে অনুসরণ করে। ছ্যাকড়া গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে কুলিটা সেই দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে যে গাড়িটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল তা মোটেই ছ্যাকড়া গাড়ি নয়, বেশ দামী একটা ফিটন। ঘোড়াটাও অভিজাত-বংশীয়। এই মফস্বলে এ রকম গাড়ি যে পাওয়া সম্ভব, তা তুঙ্গশ্রীর ধারণাতীত ছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, অর্থনৈতিক চাপেই এটা সম্ভব হয়েছে বোধ হয়। যা বিলাসের দ্রব্য ছিল একদিন, প্রয়োজনের তাগিদে ভাড়া দিতে হচ্ছে তা, বড় মানুষি আর চলছে না। যারা মাথা উঁচু করে থাকত, তাদের মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অনিবার্যগতিতে সাম্য আসছে। আনন্দ হল তুঙ্গশ্রীর। এরই জন্য তো জীবনপাত করছেন তিনি। ফিটনটা এগিয়ে আসতেই উঠে পড়লেন। কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দিলে সামনের দিকটায়। তারপর বললে—"আমি কোচোয়ানের পাশে বসছি। এখনই পৌঁছে যাব আমরা।" বলেই সে কোচোয়ানের পাশে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। হঠাৎ তুঙ্গশ্রীর মনে হল, কুলিটার কথাবার্তাও ঠিক সাধারণ কুলির মতো নয়, একটু যেন ভদ্রগোছের। হয়তো অভাবের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেই কুলিগিরি করছে। মাথার ঘাম পয়ে ফেলে রোজগার করতে হবে সবাইকে, সুদের টাকায় নবাবী করবার দিন শেষ হয়েছে। হঠাৎ ঝনঝন করে ঝনাৎকার দিয়ে উঠল গাড়ির ঘণ্টাটা—হাঁক দিয়ে উঠল পিছনের সহিস—"সাম্‌হালকে।" চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী, তাঁর চিন্তাধারাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল যেন কেউ।

খপ্ খপ্ খপ্ খপ্—ছুটে চলেছে বলিষ্ঠ ঘোড়া। বিলাতী স্প্রিং-দেওয়া গদির উপরে দোলায়িত হচ্ছে তুঙ্গশ্রীর যৌবন-পুষ্ট দেহটা। অজানা পথের চারিদিকে অন্ধকার, গাছকে মনে হচ্ছে দৈত্য, গৃহকে মনে হচ্ছে স্তূপ, তারা দ্রুতবেগে আসছে আর চলে যাচ্ছে—নিজের পরিচয় রেখে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। গ্রাম্য কুকুর ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে, দু একটা আলো দেখা যাচ্ছে দূরে। কুকুরের ডাক থেমে যাচ্ছে আবার, আলোও মিলিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে দাঁড়াল বিরাট একটা অট্টালিকার সামনে। অন্ধকারে মনে হতে লাগল, ছোট পাহাড় যেন একটা। কুলিটা নেমে এল। এসে তুঙ্গশ্রীকে বললে—"আমরা এসে গেছি। নামুন আপনি।"

তুঙ্গশ্রী নেমে পড়লেন।

"আসুন আমার সঙ্গে।"—পথে দেখিয়ে নিয়ে চলল কুলি তাঁকে। নিয়ে গেল বিশাল

বাড়িটার এক প্রান্তে। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তালা খুললে, তারপর তুঙ্গশ্রীকে বললে—"আসুন।"

অজানা জায়গায় অন্ধকার ঘরে একজন অপরিচিত পুরুষের আহ্বানে এগিয়ে যাবার সাহস হল না তুঙ্গশ্রীর। দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন—"একটা আলোর ব্যবস্থা হলে ভালো হতো।"

"আপনি আসুন না, আলো আছে, ইলেকট্রিক আলো।"

ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলে সে। জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"আপনার জিনিসগুলো নিয়ে আসি।"

তুঙ্গশ্রী আলোকিত ঘরটায় ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন রীতিমত। সোফা সেটি, চমৎকার চমৎকার ছবি, বইয়ের শেল্‌ফ, দেওয়াল ঘড়ি—বেশ বড়লোকী কাণ্ডকারখানা। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চেয়ে তিনি নিজের হাত-ঘড়িটাও দেখলেন একবার। দেওয়াল-ঘড়ি ঠিক চলছে কাঁটায় কাঁটায়। অথচ কুলিটা বললে—বাড়িতে কেউ নেই। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী। জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করল কোচোয়ানটা।

"আপনি ভিতরের দিকে আসুন—"

পাশের একটা দরজা খুলে ভিতরের দিকে একটা ঘরে প্রবেশ করলে লোকটা। সেটা পার হয়ে আর একটা দরজা খুলে তৃতীয় একটা ঘরে ঢুকল সে। যন্ত্রচালিতবৎ তার অনুসরণ করে তুঙ্গশ্রী যে ঘরটিতে প্রবেশ করলেন তার সাজসজ্জা দেখে মনে হল, সেটি শয়নকক্ষ। একধারে চমৎকার একটি খাট, খাটে নেটের মশারি টাঙানো বিজলী পাখাও রয়েছে। খাটে বিছানা পর্যন্ত পাতা। মাথার কাছে একটি টেবিলে টেবিল-বাতি। ইংরেজী বাংলা আধুনিক বই কয়েকটি। খাটের হাতলের উপরই বেডসুইচ রয়েছে। নিখুঁত বন্দোবস্ত। কেউ যেন কারও জন্যে করে রেখেছে।

জিনিসপত্র ঘরের একধারে রেখে সুইচ টিপে বিজলী পাখা চালিয়ে দিলে কোচোয়ানই। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে সসম্ভ্রমে ফিরে বলল—"এই দিকটায় বাথরুম, চান করবার ব্যবস্থাও আছে—" আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ঘরগুলো।

তুঙ্গশ্রী নির্বাকবিস্ময়ে দেখছিলেন সব। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না তাঁর। কোচোয়ানটা যখন চলে যাচ্ছে তখন খেয়াল হল, ভাড়া দেওয়া হয় নি।

"তোমার ভাড়াটা নিয়ে যাও। কত দিতে হবে?"

"ভাড়া দিতে হবে না।"

তাঁকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে নিঃশব্দ চরণে বেরিয়ে গেল সে। পর পর দুবার কপাট বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। তুঙ্গশ্রী দাঁড়িয়ে রইলেন আরও ক্ষণকাল। তারপর এগিয়ে গেলেন ব্যাপারটা ভাল করে জানবার জন্যে। পারিপার্শ্বিকটা কেমন যেন অদ্ভুত রকম লাগছে। তা ছাড়া লোকটা ভাড়াই বা নেবে না কেন? দ্বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে সমস্ত বুকটা কেঁপে উঠল তাঁর। টেনে দেখলেন, বাইরে থেকে কপাটটা বন্ধ। তিনি বন্দিনী! হঠাৎ চমকে উঠলেন... ঝন ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল কোথায় যেন। মনে হল, অনেক দূরে—বাড়ির ওদিককার কোনও ঘরে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আরও কিছুক্ষণ তিনি। ভাবতে লাগলেন, এখন কি করা উচিত? চিৎকার করবেন? কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে না তো! আশেপাশে এমন কেউ নেই যে, তাঁকে উদ্ধার করতে পারে এসে,

যদি কেউ থাকে তো তারা শত্রুপক্ষ। খুট করে শব্দ হল একটা পিছন দিকে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ ঘুরে দাঁড়ালেন তুঙ্গশ্রী, দেখলেন, একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। সুশ্রী তন্বী যুবতী একটি। চোখাচোখি হতেই নমস্কাব করে এগিয়ে এল সে।

"আপনাকেই দাদা স্টেশনে আনতে গিয়েছিলেন বুঝি? আসুন।"

"আমাকে কেউ তো স্টেশন থেকে আনতে যায় নি। আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কুলি।"

"কুলি? কি জানি, দাদারই তো স্টেশনে যাবার কথা ছিল। আপনিই তুঙ্গশ্রী দেবী?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাকে আনতেই তো দাদা গেছেন স্টেশনে। যা খামখেয়ালী মানুষ, কোথাও কিছুতে মেতে গেছেন হয়তো, একটা চাকরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্টেশনে। আসুন, হাত-মুখ ধুয়েছেন আপনি? চা আনছে।"

"না, কিছু করি নি। কিন্তু দেখুন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি—"

"কোন ব্যাপারটা?"

"এখানে আমাকে এমনভাবে নিয়ে আসা হল কেন?"

"দাদা এলেই বুঝতে পারবেন। আমি কিচ্ছু জানি না। দাদা শুধু আমাকে বলে গিয়েছিলেন যে, ঠিক আটটার সময় আমি এসে যেন আপনাকে অভ্যর্থনা করি। আমি তাই এসেছি। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন। বাথরুমে জল-টল সব ঠিক করা আছে, ইচ্ছে করলে স্নানও করতে পারেন। আমি চা জলখাবার নিয়ে আসছি, আপনি ততক্ষণ যা করবার করে ফেলুন।"

মেয়েটি চলে যাচ্ছিল। তুঙ্গশ্রী আবার ডাকলেন তাকে।

"আচ্ছা, আপনার দাদার নাম কি বলুন তো?"

"শ্রীহিরণ্যগর্ভ বর্মন।"

তুঙ্গশ্রীর শরীরের রক্তস্রোত সহসা থেমে গেল যেন, তারপর উদ্দামবেগে বইতে লাগল আবার। মুখটা ক্ষণিকের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে লাল হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি ধরা পড়ে গেছেন।

মেয়েটিই আবার কথা কইলে।

"দাদার সঙ্গে আপনার আলাপ নেই না কি?"

"না। তেমন নেই, তবে—"

মেয়েটির কাছে সরাসরি ধরা দেবার প্রবৃত্তি হল না তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু তার চোখে চাপা একটা হাসি ফুটে উঠতে দেখে সন্দেহ হল যে, মেয়েটিও হয়তো ভিতরের কথা জানে।

"আলাপ হলে অদ্ভুত মনে হবে। আমাদের বংশের সবাই ছিটগ্রস্ত। যাক, সে সব কথা পরে হবে। আপনি এখন হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি চা নিয়ে আসি।"

মেয়েটি চলে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী ক্ষণকাল, তারপর মনস্থির করে ফেললেন। বিপদে পড়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবার মতো চরিত্র তাঁর নয়, তাই তিনি এত অল্পবয়সেও অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়েছেন। মৃত্যুকে ভয় করেন না তিনি। অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়ে গিয়ে নিজের কাছেই ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন শুধু, মানসিক সাম্যটা ক্ষণকালের জন্যে বিচলিত হয়েছিল। পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করবামাত্র নিজেকে সামলে

নিলেন। দেখাই যাক, কী করেন হিরণ্যগর্ভ বর্মন। মেরে ফেলবেন? ফেলুন। কিন্তু যে আদর্শকে জীবনে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, তা জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবেন তিনি। প্রয়োজন হলে রক্তের স্বাক্ষর দিয়েও সমর্থন করে যাবেন সেটা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে। মাথা নোয়াবেন না কিছুতেই। হিরণ্যগর্ভকে দেখেন নি তিনি কখনও, কিন্তু শ্রমিকদের দাবির উত্তরে যে চিঠিখানা তিনি লিখেছেন সেটা দেখেছেন। তাঁর মিলের কর্মচারীদের একটি দাবিও তিনি গ্রাহ্য করেন নি। তারা ধর্মঘট করেছিল। কোনও ফল হয়নি। অনির্দিষ্টকালের জন্যে মিল বন্ধ করে দিয়েছেন তাই হিরণ্যগর্ভ। সমস্ত কর্মচারীর চাকরি গেছে, বেকার হয়ে পড়েছে বহুলোক। হিরণ্যগর্ভ নূতন কর্মচারীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। দপ করে জ্বলে উঠল তুঙ্গশ্রীর চোখের দৃষ্টিটা। আরও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার ফিরে এলেন বাক্স থেকে নিজের কাপড় বার করবার জন্যে। তাঁর জিনিসপত্রগুলো কোচোয়ানটা কোণের দিকে রেখে দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে আবার একবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে বজ্রাহতবৎ। তাঁর অ্যাটাচি কেসটা নেই। একটা রিভলভার ছিল তার মধ্যে।

.... বাথরুমটি নিখুঁত। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। স্নান করে তৃপ্তি হবার কথা। কিন্তু তুঙ্গ শ্রীর সমস্ত অঙ্গ জ্বলে গেল যেন, বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে যে কথাটা কাঁটার মতো বিঁধে আছে বুকের মধ্যে, সেইটেই যেন নড়ে-চড়ে উঠল আবার। সাদা মার্বেল পাথর দেখে মনে হল, এ যেন বহুযুগের অশ্রু জমে পাথর হয়ে গেছে—সেই সব বঞ্চিত হতভাগ্যদের অশ্রু, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও খেতে পায় নি, দুর্ভিক্ষে রোগে জর্জরিত হয়ে অবশেষে মারা গেছে অত্যাচার-অবিচারের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে।

স্নান সেরে বেরিয়ে এলেন তুঙ্গশ্রী। এসেই দেখতে পেলেন, সেই সুশ্রী মেয়েটি তাঁর জন্যে চা জলখাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে।

"স্নান হল? একটু চা খান এবার। দাদাকে আপনার কথা বললাম। তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন একটু, তা না হলে নিজেই আসতেন এখনই। আসবেন একটু পরে বোধ হয়। আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করে নিন।"

তুঙ্গশ্রী খেতে খেতে ভাল করে লক্ষ্য করলেন মেয়েটিকে। পরনে খদ্দরের শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, চমৎকার মুখশ্রী, অপরূপ চোখ দুটি। এমন নিবিড় কালো চোখের তারা আর কখনও দেখেন নি তিনি।

"তোমার নামটি কি ভাই?"

"আমার নাম শিখরিণী।"

"বাঃ, আমার নামের সঙ্গে তো মিল আছে অনেকটা। এ নাম তোমার বাবা-মাই রেখেছিলেন, না, নিজেই বানিয়ে নিয়েছ আমার মতন?"

"আমার বাবা রেখেছিলেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন কিনা, তাই সংস্কৃত ছন্দের নামে নাম রেখেছিলেন। ও-নামে কিন্তু কেউ ডাকে না আমাকে। অধিকাংশ লোকেই বলে—শিখু, দাদা বলেন—খরিণী। আপনার নাম আপনি নিজেই বানিয়ে নিয়েছেন? আপনার বাপ-মা কি নাম রেখেছিলেন আপনার?"

"মিনতি দাসী। সেটা বদলে আমি করে নিয়েছি—তুঙ্গশ্রী দেবী। ভাল হয় নি?"

"চমৎকার হয়েছে। কিন্তু আপনি কিছু খাচ্ছেন না যে!"

"খাচ্ছি তো! বেশি মিষ্টি আমি খেতে পারি না।"

"নোনতা খাবার এনে দি আরও?"

"না থাক।"

"গোটা দুই সিঙাড়া?"

"না, দরকার নেই আর।"

পিছনের একটা দ্বারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে শিখরিণী বললে, "তুমি তাহলে যাও যোগেন। আর কিছু লাগবে না। মণিকে পাঠিয়ে দাও, বাসনগুলো নিয়ে যাক।"

চিত্রার্পিতবৎ যে ভৃত্যটি দ্বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল সে সরে গেল। ঐশ্বর্যের আতিশয্য নীরবে আর-একটা খোঁচা দিয়ে গেল তুঙ্গশ্রীকে। মনে পড়ল, না খেয়ে তাঁর মা মারা গেছেন, ভাই যক্ষ্মায় ভুগছে এখনও। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কেশব সামন্তকে, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে উঠল আবার ধীরে ধীরে।

"আপনি খেয়ে দেয়ে কি বিশ্রাম করবেন একটু?"

"হিরণবাবু যদি দেখা করতে পারেন এখন, তাহলে সেইটেই সেরে ফেলব আগে।"

"আচ্ছা।"

দুই

তুঙ্গশ্রী আশা করেছিলেন যে, এই অট্টালিকারই আর-এক অংশে বোধ হয় হিরণ্যগর্ভ থাকেন। কিন্তু শিখরিণীর অনুসরণ করে অট্টালিকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল।

"কোথায় থাকেন তোমার দাদা?"

"আসুন না।"

একটা বড় বাগান পার হতে লাগলেন দুজনে। ফুলের বাগান। ধনী জমিদারদের বাগানে সাধারণত যে সব জিনিস থাকে, এখানেও তার অভাব ছিল না। মাঝে মাঝে পাথরের তৈরি নগ্ন অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি নানা ভঙ্গীর, জলের ফোয়ারা, লোহার বেঞ্চি, মাঝে মাঝে আলোকস্তম্ভ, লতাকুঞ্জ, সম-চতুষ্কোণ সবুজ সবুজ মাঠ, টেনিস খেলবার প্রাঙ্গণ। অভাব কিছুরই ছিল না। সমস্তটা ঘিরে সু-উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর ঘেঁষে কিছুদূর অন্তর বড় বড় গাছ।

"আচ্ছা, আমি যদি এখন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি, তুমি আটকাতে পার আমাকে?"—হঠাৎ তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

শিখরিণী সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—"পালিয়ে যাবেন! কেন? পালিয়ে যাবার কথা মনে হল হঠাৎ যে!"

"এমনি।"

তুঙ্গশ্রী নিঃসংশয় হলেন যে, তাঁকে যেভাবে এখানে আনা হয়েছে তা শিখরিণী জানে না। সুতরাং তিনি যে কে এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন তাও তার অজ্ঞাত। নিঃসংশয় হয়ে একটু আরাম পেলেন যেন। আরাম পাওয়া মাত্রই মনে মনে কিন্তু প্রশ্ন জাগল একটা এবং সে প্রশ্নের উত্তরটা আবিষ্কার করে নিজের কাছেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। শিখরিণীর কাছে নিজের সত্য-পরিচয়টা গোপন রাখবার এ আগ্রহ কেন? শিখরিণীকে তাঁর ভালো লেগেছে। কিন্তু সেইজন্যই তার কাছ থেকে নিজের সত্য-পরিচয়টা গোপন করা দরকার না কি! সে পরিচয়

যদি মহৎ হয়, তাহলে তো সেটা জাহির করবার আগ্রহটাই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তাহলে কি তাঁর নিজের বিবেকের কাছেই তাঁর আদর্শের কোন গলদ ধরা পড়েছে? মনের আর-একটা অংশ তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল—'গলদের প্রশ্ন উঠেছে কি করে? বাইরের লোকের কাছে নিজের সত্য-পরিচয় দেওয়া যায় না কি সব সময়ে? তাতে শুধু যে নিজের বিপদ তা নয়, পার্টিরও বিপদ।'—অন্যমনস্ক হয়ে আত্মবিশ্লেষণ করছিলেন তুঙ্গশ্রী।

"আমরা এসে গেছি। ওই বাড়িটায় দাদা থাকেন।"

তুঙ্গশ্রী সবিস্ময়ে দেখলেন, অতি ছোট—অতি সাধারণ বাড়ি একটা। না বলে দিলে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, ওটা চাকরদের থাকবার ঘর। পাশাপাশি গোটা চারেক ঘর, অনেকটা ব্যারাকের মতো। পাকা অবশ্য, কিন্তু কোনও আড়ম্বর নেই।

"তোমাদের ওই বড় বাড়িতে কে থাকে তাহলে?"

"ওখানে আমরা থাকি, কাকা থাকেন আর অতিথিরা থাকেন। দাদার ল্যাবরেটারির কিছু জানোয়ারও থাকে এক ধারে।"

বিস্মিত কণ্ঠে তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন—"ল্যাবরেটারি? কিসের ল্যাবরেটারি?"

"দাদা যে ডাক্তার। কী সব রিসার্চ করেন!"

"উনি যে ডাক্তার তা তো জানতাম না! উনি বড় জমিদার. মিলের মালিক—এই তো জানি।"

"উনি প্র্যাকটিস করেন না. কিনা, তাই ডাক্তার বলে চেনে না অনেকে। এই যে আমরা এসে গেছি। আসুন।"

কপাট ঠেলে শিখরিণী একটি আলোকিত ঘরে ঢুকল। তুঙ্গশ্রীও প্রবেশ করলেন তার পিছু পিছু। ঘরটি বেশ প্রশস্ত। ঘরের এক কোণে একটি টেবিলে একটি ছেলে খুব ঝুঁকে কী যেন করছিল। শিখরিণী প্রবেশ করতেই সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

"নরেন, দাদা কোথায়"—শিখরিণী প্রশ্ন করল তাকে।

"তিনি পাশের ঘরে আছেন।"

"ও। আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি খবর দি দাদাকে।"

তুঙ্গশ্রী একটি চেয়ারে বসলেন। নরেন আবার কাজে মন দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল শিখরিণী।

"দাদা কী একটা করছেন, আপনকে ওখানেই যেতে বললেন। আমি বাড়ি যাচ্ছি, আপনি কথা বলুন।"

"আমি আবার ফিরব কি করে?"

"দাদার সঙ্গেই ফিরবেন। আমি থাকতাম, কিন্তু কাকা খাবেন এখনই, আমাকে সেখানে থাকতে হবে। আপনি যান, দাদা ডাকছেন আপনাকে।"

শিখরিণী চলে গেল।

তুঙ্গশ্রী বসে রইলেন খানিকক্ষণ। যদিও একটা অদম্য কৌতূহল তাঁকে পাশের ঘরের দিকে টানছিল, তবু বসে রইলেন। জীবনে নানা রকম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। পুলিশের গুলির সামনে পড়েছেন, বাঘের মুখেও পড়েছিলেন একবার সুন্দরবনে, কিন্তু এমন রহস্যময় বিপদের মধ্যে আর কখনও পড়েন নি। পুলিশ এবং বাঘের কাছ থেকে পালাবারই চেষ্টা

করেছিলেন, কিন্তু এই লোকটির কাছ থেকে পালাবার ইচ্ছা হচ্ছিল না, যদিও এঁর সম্মুখীন হওয়াটাও কম বিপজ্জনক নয়, হয়তো মেরেই ফেলতে পারেন—কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এই ভয়েই যে তিনি উঠছিলেন না, তা ঠিক নয়। তাঁর ভয়টা হচ্ছিল একটু অন্য ধরনের। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, মনে মনে লোকটিকে যেভাবে কল্পনা করছেন, সত্যিই তিনি যদি তা না হন।

...হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন তুঙ্গশ্রী। দেখলেন, দেওয়ালের ধারে একটা টেবিলের উপর কাচের পাত্রে কি যেন একটা ফুটছে এবং হিরণবাবু ঝুঁকে সেটাকে দেখছেন। কপাটের দিকে পিছন ফিরে ছিলেন বলে তাঁর মুখটা প্রথমে দেখতে পেলেন না তুঙ্গশ্রী। হিরণবাবুও যে তাঁর আগমন টের পেয়েছেন তাও মনে হল না, কারণ তিনি ঝুঁকে দেখতেই লাগলেন। পরনে খদ্দরের আলখাল্লাগোছের একটা কোট আর ঢিলে পাজামা।

হঠাৎ মুখ ফেরালেন হিরণবাবু। মুখটা দেখেই চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী। এ কি, এ যে স্টেশনের সেই কুলিটা!

চোখাচোখি হতেই হিরণ্যগর্ভের সমস্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"নমস্কার, আসুন, আসুন! কেমন, ঠকিয়েছি তো?"

"এ রকম করবার মানেটা কি বুঝলাম না ঠিক।"

"বোঝেন নি? সত্যি? দাঁড়ান এক মিনিট, এটা আবার ফেটে না যায়, হার্ডগ্লাস যদিও, তবু ফ্লেমটা কমিয়ে নি—"

বুনসেন বার্নারের ফ্লেমটা কমিয়ে দিয়ে হিরণ্যগর্ভ একটা ঘণ্টা টিপলেন। নরেন এসে মুখ বাড়াল।

"না, তুমি নয়। তোমার গ্রাফটা হল?"

"এখনও হয় নি।"

"তাহলে সেইটে শেষ কর আগে। কুঞ্জকে পাঠিয়ে দাও।"

কুঞ্জ নামক ভৃত্যটি এসে দাঁড়াতেই হিরণ্যগর্ভ বললেন—"এঁর জিনিসপত্র দক্ষিণ দিকের শোবার ঘরে আছে বোধ হয়, নিয়ে এস তো। খরিণীকে জিজ্ঞেস করলেই সে দেখিয়ে দেবে।" কুঞ্জ চলে গেল। তুঙ্গশ্রী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—"আমার জিনিসপত্র আনতে বলছেন কেন?"

"হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে চাই, কেন আপনাকে আজকের ট্রেনে যেতে দিলাম না। আমার ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আপনার সুটকেস খুললেই বেরিয়ে পড়বে সম্ভবত। তার সঙ্গে যদি এই চিঠিটার মর্মার্থ জুড়ে দেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন আপনাকে আটকেছি।"—হিরণ্যগর্ভ একটা ড্রয়ার টেনে একটা চিঠি বার করলেন এবং সেটা পড়ে শোনালেন—

"তুঙ্গশ্রী দেবী কাল সকালে রওয়ানা হচ্ছেন। এঁরা ঠিক করেছেন যে, আপনার ফ্যাক্টরিটা 'ডিনামাইট' দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। তুঙ্গশ্রী দেবী যাচ্ছেন আপনার ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আনতে, ফ্যাক্টরিরই কোনও লোক বোধ হয় তৈরি করে রেখেছেন প্ল্যানটা। তুঙ্গশ্রী যাচ্ছেন নিজের চোখে সব দেখতে এবং প্ল্যানটা নিয়ে আসতে। উনি একজন নামজাদা টেররিস্ট। তুঙ্গশ্রী দেবীকে চেনা শক্ত হবে না, কারণ উনি রূপসী, বাঁ দিকের গালে ছোট একটা তিল আছে। দেখলেই চিনতে পারবেন।"

চিঠিটা পড়ে হিরণ্যগর্ভ চাইলেন তুঙ্গশ্রীর মুখের দিকে।

"বর্ণনার সঙ্গে চেহারা হুবহু মিলে যাচ্ছে; সুতরাং আশা করছি যে, ফ্যাক্টরির প্ল্যানটাও

আপনার সুটকেসে পাওয়া যাবে। আর তা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমার আচরণের অর্থটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করি।"

তুঙ্গশ্রীর মুখটা পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে আবার লাল হয়ে উঠল। তিনি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, আত্মগোপন করবার চেষ্টা এখন বৃথা। সমস্ত ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, হাসি বা পরিহাস দিয়ে সেটাকে হালকা করা যেতে পারে।

তাই হেসে বললেন—"না, তাতেও এটা বোঝা যাবে না যে, কি কারণে প্রতাপশালী হিরণ্যগর্ভকে কুলি সাজতে হয়েছিল।"

"স্টশনে সিপাহী পাঠিয়ে আপনাকে চলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলেই ভালো হতো বলছেন?"

আর একটু হেসে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আজকালকার দিনে অতটা কি পারতেন? জমিদারদের সে দিন আর নেই।"

"জমিদারদের দিন হয়তো ফুরিয়েছে, কিন্তু বুদ্ধিমানদের দিন ফুরোয় নি, কখনও ফুরোবেও না। আমার অনেক ক্যাপিটালিস্ট বন্ধু মুখোশ বদলে শ্রমিকনেতা সেজেছেন, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আপনারাও তাদের কথায় বেশ নাচছেন।"

হিরণ্যগর্ভের চোখে যে হাসির দীপ্তি ঝলমল করে উঠলো তা যে শাণিত ছোরার মতো নয়—প্রসন্ন সূর্যালোকের মতো, তা লক্ষ্য করে তুঙ্গশ্রী শুধু যে আশ্বস্ত হলেন তা নয়, আকৃষ্টও হলেন ঈষৎ। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ যে সাধারণ জমিদারদের মতো শূন্যগর্ভ নন, এর চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে তাঁর মনের আর-একটা অংশও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ রকম লোক তাঁদের দলে না এসে বিপক্ষ দলে থাকবার মানেটা যে কি, তাও তিনি জানেন। শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য! ধনীর দম্ভ। তুঙ্গশ্রীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হিরণ্যগর্ভের মনে হল, যে তাঁর কথাতেই বুঝি আহত হলেন ভদ্রমহিলা। মনে হওয়ামাত্র লজ্জা হল তাঁর, আভিজাত্যে আঘাত লাগল। আর একটু হেসে বললেন—"দেখুন, আমাদের আলাপ আর বেশিদূর অগ্রসর হবার আগে প্রথমেই একটা কথা বলে নিই। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি আপনাকে এমনভাবে ছলনা করে এখানে এনে ফেলার জন্যে। বিশ্বাস করুন, ব্যক্তিগতভাবে আপনার ওপর আমার কোনও রাগ নেই, আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছা বা অবসর কোনটাই আমার নেই—আবার বোধ হয় রূঢ় হয়ে পড়ছে কথাগুলো।"—হা-হা করে হেসে উঠলেন হিরণ্যগর্ভ—"বিজ্ঞান নিয়ে কারবার আমার, চাঁচাছোলা সত্যি কথাগুলোই বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে। রেখে-ঢেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে যে পারি না তা নয়, খুব ভাল অভিনয় করতে পারি তার তো প্রমাণই পেয়েছেন আজকে, কিন্তু অভ্যাস নেই। মাপ করবেন। হ্যাঁ, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আপনার প্রতি আজ যে এই অশোভন আচরণ করে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন, তা নিছক কর্তব্যের খাতিরে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক আর একজন সৈনিকের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করে যে মনোভাব নিয়ে—অবশ্য আজকালকার সৈনিকদের ঠিক এ রকম মনোভাব আছে কি না জানি না, যদিও 'অল কোয়াএট্ অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট" বইখানাতে এর আভাস আছে খানিকটা—'গীতা' পড়েছেন? ও, পড়েন নি—গীতাতে অর্জুনকে যে মনোভাব নিয়ে নিজের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করতে বলেছেন, আমার মনোভাব অনেকটা সেই ধরনের, মানে, নিষ্কামভাবে কর্তব্য করে যাচ্ছি কেবল।"

"আপনার কর্তব্যটা কি?"

"যা ভাল বলে মনে করি তাকেই রক্ষা করা"—এবং একটু থেমে বললেন—"প্রয়োজন হলে তার জন্যে যুদ্ধ করা।"

"কি ভাল বলে মনে করেন তার একটু আভাস পেতে পারি কি? কারণ আমরাও তো ওই একই উদ্দেশ্যে জীবনপাত করছি।"

কুঞ্জ এসে প্রবেশ করল তুঙ্গশ্রীর সুটকেস-বিছানা নিয়ে।

"ওই টেবিলটার ওপর রেখে দিয়ে তুমি চলে যাও। দেখো, ফ্লাস্কগুলো ভেঙ্গো না যেন।"

কুঞ্জ টেবিলের উপর জিনিসপত্রগুলো রেখে চলে গেল। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "ফাক্টরির প্ল্যানটা দিন বার করে।"

তুঙ্গশ্রী প্রদীপ্ত চক্ষে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ; তারপর বললেন—"দেব না।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা টিপলেন হিরণ্যগর্ভ। নরেন আবার এসে উঁকি দিলেন। "কুঞ্জকে ডেকে দাও আর-একবার। তোমার গ্রাফের কতদূর?"

"কয়েকটা ফিগার খুঁজে পাচ্ছি না। ওই ড্রয়ারটাতেই তো রেখেছিলাম।"

"ফিগার খুঁজে পাচ্ছ না! বল কি! ফিগার খুঁজে না পেলে ডালকুত্তা দিয়ে তোমাকে খাওয়াব।"—হিরণ্যগর্ভের চোখের দৃষ্টি ভীষণ হয়ে উঠল সহসা। নরেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। নরেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকদীপ্ত হয়ে উঠল আবার হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটি। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"ইনি মস্ত বড় একজন কমিউনিষ্ট, দল পাকাতে ওস্তাদ, অথচ কাজের বেলায় অকর্মার ধাড়ী একটা।"

তুঙ্গশ্রী চুপ করে রইলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। কুঞ্জ এসে হাজির হল আবার দ্বারপ্রান্তে।

"দেখ কুঞ্জ, এই সুটকেসটা খুলতে হবে। চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। ভেঙে বা যেমন করে হোক খুলে নিয়ে এসো তো ওটাকে।" কুঞ্জ সুটকেসটা নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেল। তুঙ্গশ্রীর দিকে একনজর চেয়ে মৃদু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"চাবিটা দিলেই পারতেন। আপনাকে যেতে দিই নি যখন, তখন প্ল্যানটা যে আপনার কাছ থেকে না নিয়ে আমি ছাড়ব না, তা আপনার বোঝা উচিত ছিল।"

"তা আমি বুঝেছি। আপনার দৌড়টা কতদূর তাই কেবল আমি দেখছি।"

"দেখুন।"

হিরণ্যগর্ভ গিয়ে বুনসেন বার্নারটার শিখা বাড়িয়ে দিলেন আর-একটু। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন—"ও হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটার জবাব দেওয়া হয় নি এখনও। আদর্শটা কি জানতে চেয়েছিলেন। আমার আদর্শটা ভারতীয় আদর্শ, নতুন কিছু নয়।"

তুঙ্গশ্রী হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন যেন।

"ভারতীয় আদর্শ বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না, কিন্তু ওই ভারতীয় আদর্শের মুখোশ পরে মুষ্টিমেয় কতকগুলো লোক অগণিত লোকের ওপর যে অত্যাচার চালিয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, তার বর্ণনা ইতিহাস খুললেই পাবেন। তাই যদি আপনার আদর্শ হয়—"

"না, তা আমার আদর্শ নয়, কারণ সেটা ভারতীয় আদর্শ নয়। জ্ঞাতসারে কারও ওপর অত্যাচার করা ভারতের আদর্শ হতে পারে না। জ্ঞাতসারে কথাটা মনে রাখবেন, কারণ

অজ্ঞাতসারে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ওপর কিছু না কিছু অত্যাচার করছি। বেঁচে থাকা মানেই—অপরকে কিছুটা বঞ্চিত করা। ভারতীয় আদর্শ সে বিষয়েও পদে পদে সাবধান করেছে আমাদের। ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—ভারতীয় আদর্শের মূলমন্ত্র বলতে পারেন।"

"কিন্তু ইতিহাসে আমরা যা পড়ি, তা—"

"ভুল পড়েন। সাহেবদের লেখা বইয়ে ভারতের ইতিহাস নেই। ভারতের ইতিহাস আছে রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে, জাতকে, পুরাণে, রূপকথায়, আমাদের দৈনন্দিন জীনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটিতে, যাদের আমরা অশিক্ষিত জনসাধারণ বলি তাদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, তাদের সামাজিক জীবনের কর্মসূচীতে। এই ইতিহাস যদি পড়ে দেখেন দেখবেন, ভারতীয় আদর্শে নীচতার স্থান নেই।"

তুঙ্গশ্রীর অধরে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল একটা।

"তাহলে আপনি যে এই মিল বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন আর এতগুলো শ্রমিককে অল্প বেতন দিয়ে অভাবগ্রস্ত করে রেখেছেন, এটাও কি আমাকে ভারতীয় আদর্শের নমুনা বলে ধরতে হবে?"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ হিরণ্যগর্ভ। তারপর বললেন—"আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি নি এটা। আমি আশা করেছিলাম যে, আমার মিলের সমস্ত খবর আপনি রাখেন। আমার মিলে অত লাভ হলে আপনি আমার মিল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার জন্যে আসতেন না, আসতেন হয়তো বড়গোছের একটা চাকরি পাবার জন্যে। আপনাদের সবাইকে অনায়াসে কিনে রাখতে পারতাম, অন্যান্য বড়লোকেরা যেমন রেখেছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তা নয়। চিরাচরিত পথে চললে আমার শত্রু জুটত না, আমি নূতন ধরনের একটা কিছু করেছি বলেই এবং তা অনেকের স্বার্থে আঘাত করছে বলেই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযান।

তুঙ্গশ্রী বিস্মিত হয়ে গেলেন একটু। তাহলে এঁর সম্বন্ধে যা তিনি শুনেছিলেন তা কি ভুল? এখানকার পার্টির লোকেরা তাঁকে যে খবর পাঠিয়েছিল, যে রিপোর্ট দেখিয়েছিল, তার কোনও ভিত্তি নেই তাহলে? ইনি মিল করেছেন, অথচ লাভের জন্যে করেন নি। এই বা কেমন যুক্তিহীন কথা! ছলনা করছেন বোধ হয় ভদ্রলোক?

"আপনি কি আপনার মিলের কর্মীদের কম বেতন দিতেন না?"

"দিতাম। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কাজও কম নিতাম। আমার মিলে যত কাপড় তৈরি হওয়া সম্ভব, তত কাপড় আমি কোনও দিনই করাই নি। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার জমিদারির লোকদের বস্ত্রকষ্ট দূর করা। আমার পূর্বপুরুষরা যেমন প্রজাদের জলকষ্ট দূর করবার জন্যে জলাশয় খনন করাবার ব্যবস্থা করতেন, বিদ্যা বিতরণের জন্য চতুষ্পাঠী বিদ্যালয় করতেন, আমিও তেমনি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বস্ত্রকষ্ট দূর করবার চেষ্টায় ছিলাম। কাপড় বিক্রি করে লাভ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আশা করেছিলুম, যাদের জন্যে কাপড় তৈরি করা হচ্ছে তারা এই যন্ত্রের সাহায্যে নিজেরাই সেটা তৈরি করে নেবে, আমি যন্ত্রটা দিয়ে তাদের সাহায্য করছি, কিছু কিছু মজুরি দিয়েও সাহায্য করব কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না আপনাদের জ্বালায়। মিল বন্ধ করে দিয়েছি। আপনারা এখন বাড়িটাও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু তা পারবেন না।"

হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ।

কুঞ্জ ভাঙা সুটকেসটা নিয়ে প্রবেশ করল।

"চাবিটা ভাঙতে হল হুজুর।"

"আচ্ছা, রেখে যাও। হ্যাঁ, শোন, খরিণীর কাছ থেকে আমার নতুন সুটকেসটা চেয়ে আন, চাবিটা আনতে ভুলো না।"

কুঞ্জ চলে গেল। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর সুটকেসটা খুলে খুঁজে দেখতে লাগলেন তন্ন তন্ন করে। কিছু পাওয়া গেল না। বিছানাটা খুলে দেখলেন। বিছানাতে কিছু নেই। বালিশের ওয়াড় খুলছিলেন, এমন সময় তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনার কি ফুটছে সেইটে দেখুন আগে, পুড়ে কালো হয়ে গেল যে!"

ফ্লাস্কটার দিকে চকিতে একবার চেয়ে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ও ঠিক আছে। ওই কালোটা যখন কালারলেস্ (colourless) হয়ে যাবে, তখনই আমার মনোযোগ দেবার সময়, জেল্ডহাল হচ্ছে কি না।"

বিছানা খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না।

তুঙ্গশ্রীর দিকে চকিতে একবার চেয়ে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"কুঞ্জ আসবার আগেই সামলে ফেলতে চাই সব। তার কাছে আপনাকে অপ্রস্তুত করবার ইচ্ছে নেই।"

"আমার চেয়ে আপনারই তো বেশি অপ্রস্তুত হওয়ার কথা, কিছু পেলেন না যখন।"

হিরণ্যগর্ভের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"জিনিসটা কোথায় রেখেছেন বলুন তো?"

তুঙ্গশ্রী চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল শুধু। ত্বরিত নিপুণ হস্তে হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর বিছানা বেঁধে ফেললেন, সুটকেস গুছিয়ে দিলেন। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। এখানে ভাল চেয়ার নেই যদিও, ওই উঁচু টুলটার ওপর বসতে আপনার অসুবিধে হবে বোধ হয়, দাঁড়ান, চেয়ার আনাই একটা—"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না, টুলের ওপরই বসছি আমি।"

"হ্যাঁ ভাল করে বসুন। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। এক মিনিট, আমি কয়েকটা সাব-কালচার (sub-culture) করে নিই দাঁড়ান, টাইফয়েড ব্যাসিলাসগুলো মরে যাবে না হলে।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গেলেন একটা আলমারির দিকে। আলমারি থেকে বার করলেন লোহার জাল দিয়ে তৈরি একটা চৌকোণা বাক্স। বাক্স থেকে কয়েকটা 'আগার টিউব' (Agar Tube) নিয়ে তিনি ইন্‌কিউবেটারের (Incubator) কাছে এলেন। তারপর ইন্‌কিউবেটারের থেকেও একটা জালের বাক্স বার করলেন। এর মধ্যেও 'আগার টিউব ছিল । তারপর হঠাৎ একটা সুইচ টিপে এমন জোর একটা আলো জ্বালালেন যে, চোখ ঝলসে গেল তুঙ্গশ্রীর। তারপর প্ল্যাটিনাম লুপটা (Platinum Loop) বুনসেন বার্নারে পুড়িয়ে নিলেন ভাল করে। টকটকে লাল হয়ে উঠল সেটা। তারপর যে আগার টিউবগুলো ইন্‌কুউবেটার থেকে বার করেছিলেন, প্ল্যাটিমান লুপের সাহায্যে সেইগুলো থেকে সন্তর্পণে ব্যাসিলাস বার করে করে প্রথম আগার টিউবগুলো খুলে আগারে লাগিয়ে দিলেন একে একে। তারপর সবগুলো ইন্‌কিউবেটারে বন্ধ করে দিয়ে জোর আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

"হ্যাঁ, এইবার অসুন। প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনি আমার শত্রুতা করছেন

কেন? আপনার সব খবর আমি জানি বলেই আপনার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। দেশের ভালো হোক—আপনিও চান আমিও চাই। বিরোধটা কোথায়? হঠাৎ আমাকে শত্রু মনে করার হেতুটা কি?''

''ধনী মাত্রকেই আমি শত্রু মনে করি, কারণ তারা দেশের শত্রু।''

''কথাটা কি যুক্তিযুক্ত হল? রূপসী মাত্রেই পতিতা, বুদ্ধিমান মানেই চোর, বলবান মানেই ডাকাত নাকি তাহলে? এ যে অদ্ভুত যুক্তি আপনার!''

''উপমা দিয়ে কথা বলা আমার স্বভাব নয়। তবে আপনি যখন উপমা দিলেন তখন উপমা দিয়েই তার উত্তর দিচ্ছি। সাপ মাত্রই বিষাক্ত নয়, কিন্তু তবু সাপ মাত্রকেই আমরা ঘৃণা করি, সুযোগ পেলে মেরেও ফেলি।''

''ঠিক। কিন্তু সাপের আকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখে চিনতে পারা যায় যে, ওটা সাপ। ধনীর সে রকম কোনও বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে পেয়েছেন কি?''

''ধনীর বৈশিষ্ট্য তো আপনার চতুর্দিকেই ছড়ানো রয়েছে, এত বড় বাড়ি, এত বড় বাগান, এত বড় জমিদারি, এত বড় মিল—''

''এর একটাও আমার নয়। সমস্তই আমাদের কুলদেবতা জগদ্ধাত্রী দেবীর। আমি তাঁর সেবক মাত্র।''

তুঙ্গশ্রীর অধরে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল।

''জগদ্ধাত্রী দেবী কিন্তু বিষয় ভোগ করেন না। বিষয় ভোগ করেন আপনি?

''সেটা ঠিক জানেন কি?''

''এত বড় বিষয় ভোগ করে কে তাহলে ?''

''প্রজারা। বিষয়ের যা কিছু আয় তা তাদেরই হিতার্থে খরচ হয়। তাদের হয়ে অবশ্য আমিই খরচ করি। কিন্তু সবটা তাদেরই জন্যে খরচ হয়।''

''আপনি নিজের জন্যে কিছুই খরচ করেন না?''

''এক কপর্দক নয়। ওই বড় বাড়িতেও আমি থাকি না। এখানে যা দেখছেন, সেটা অবশ্য সবই আবার এবং স্বোপার্জিত।''

''স্বোপার্জিত? তবে যে শুনলুম, আপনি ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন না!''

''প্র্যাকটিস করি কিছু কিছু, কিন্তু তার বদলে অর্থ নিই না। আমি বেশ কিছু টাকা রোজগার করে ফেলেছি অন্য উপায়।''

হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটি হাস্যপ্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দুষ্কৃতি গোপন করে দুষ্টু ছেলের চোখ মুখ যেমন হয়, তাঁর মুখের ভাবটাও তেমনি হল খানিকটা।

তুঙ্গশ্রী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার প্রত্যাশাই করেন নি তিনি। এ অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় নেই তাঁর ভাল করে। তিনি কাজ করেছিলেন পূর্ব্ববঙ্গে, কিছুদিন চট্টগ্রাম অঞ্চলেও। সহসা সমস্ত বর্তমানটাই যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে। হিরণ্যগর্ভের শেষ কথাগুলো তার কানেই ঢুকলো না। চট্টগ্রামে পাহাড়তলী ক্লাবের কাছে প্রীতি ওয়াদ্দাদার পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মারা যায় যেদিন, সেদিন ঘটনাচক্রে তুঙ্গশ্রী উপস্থিত ছিলেন সেখানে। প্রীতি ওয়াদ্দাদারের গায়ে বোমাও লেগেছিল। তার রক্তাক্ত চেহারাটা ভেসে উঠল তুঙ্গশ্রীর চোখের উপর। মেয়েরাও যে নির্ভয়ে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ

করতে পারে—এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই নাকি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছিল সে। ইচ্ছে করলে পালাতেও পারত। বহু-দিনের সেই পুরাতন কাহিনীটা এখন মনে পড়ল কেন, ভাবতে গিয়ে যোগসূত্রটা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললেন তিনি। মেয়েরাও নির্ভয়ে দেশের জন্যে মরতে পারে—এ প্রমাণ করবার জন্যে প্রীতিলতা যেমন মরেছিল এই ভদ্রলোক তেমনি কি প্রমাণ করতে চান যে, ক্যাপিট্যালিস্ট হয়েও জনসাধারণের হিতৈষী বন্ধু হওয়া সম্ভব? এমন একটা লোককে কেশব সামন্ত চেনে না—এই বা কেমন!

"আপনি হয়তো সমর্থন করতে পারবেন না ব্যাপারটা।"

আত্মস্থ হলেন তুঙ্গশ্রী।

"কোন ব্যাপারটা বলছেন?"

"আমার টাকা রোজগারের পন্থাটা। কিন্তু কি করি বলুন, ব্যাঙ্কে নির্ভরযোগ্য কিছু টাকা না থাকলে আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখা কঠিন। বিশেষত আমার মতো রিসার্চ-পাগল লোকেব পক্ষে। গভর্ণমেণ্ট বা সমাজ কেউ তো সাহায্য করবে না। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, সুতরাং সে রকম বশিষ্ঠও থাকতে পারে না। বশিষ্ঠকে এখন স্বোপার্জিত ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের ওপর নির্ভর করতে হবে। তাই আমার পন্থাটা যদিও খুব—"

"শুনিই না কেন পন্থাটা কি, অবশ্য শত্রুপক্ষকে বলতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে—"

"কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তা ছাড়া কারও শত্রুতাকে ভয় করি না আমি। আপনারা তো বাইরের লোক। কতটা শত্রুতা আর করবেন। আমার নিজের কাকাই মস্ত বড় শত্রু রয়েছেন, তাঁকে যখন সামলে রেখেছি, তখন আপনাদের—"

আবার হাসলেন হিরণ্যগর্ভ।

"তাহলে বলুন শুনি, আপনার উপার্জনের পন্থাটা কি?"

প্রশ্নটা করেই তুঙ্গশ্রী নিজেব কাছেই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন একটু। এ রকম কৌতূহল প্রকাশ করাটা কি অশোভন হচ্ছে না?"

"পন্থাটা খুব সোজা। কয়েকটা পেটেণ্ট ওষুধের ফরমুলা বিক্রি করে দিয়েছি। দশটা ফরমুলা বিক্রি করে লাখখানেক টাকা মাত্র পেয়েছি। এইগুলি নিয়ে নিজে যদি ব্যবসা করতুম, তাহলে হয়তো আরও ঢের বেশী রোজগার হতো; কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছি, বৈশ্য হবার বাসনা নেই, ব্রাহ্মণ হওয়ার দিকে লোভ আছে বরং।"

"ওরই সুদ থেকে আপনার চলে?"

"হ্যাঁ, কোনও রকমে। আর একটু সচ্ছলভাবে চলত, কিন্তু আমার এই ল্যাবরেটারি করতে প্রায় হাজার কুড়ি টাকা বেরিয়ে গেছে!"

তুঙ্গশ্রী পিছনের টেবিলটায় ঠেস দিয়ে বসলেন, কনুই দুটোও তুলে দিলেন টেবিলের ওপর। তারপর নির্নিমেষে হিরণ্যগর্ভের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—"জিনিসটা এতই অসম্ভব যে রূপকথার মতো শোনাচ্ছে।"

"তার মানে?"

"অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অঘটন ঘটে গেল একটা। তুঙ্গশ্রীর পিছন দিকে ফোঁস করে গর্জন করে উঠল এক গোক্ষুর সর্প। তুঙ্গশ্রী লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন। হিরণ্যগর্ভ ধরে তুললেন তাঁকে।

"ভয় পাবেন না, ওর বিষদাঁত নেই। ওটা বেরিয়ে পড়ল কখন? খিদে পেয়েছে বোধহয়। ও, বাক্সর ডালাটা খোলা আছে দেখছি।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে নির্ভয়ে সাপটাকে ধরে টেবিলের একধারে যে বাক্সটা ছিল তার মধ্যে ঢুকিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিলেন। বিস্রস্তবাসা তুঙ্গশ্রী দু হাতে চোখ ঢেকে আর একটা টুলের উপর বসে পড়েছিলেন। তাঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছিল যেন কেউ। জীবনে তিনি অনেক রকম ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন, পুলিশের গুলিরও সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু এমন ভয় জীবনে আর কখনও পান নি। শুধু ভীত নয়, লজ্জিতও হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

হিরণ্যগর্ভ সাপটাকে বন্ধ করে তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে চাইলেন। কিন্তু মেঝের উপর ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিলেন কাগজটা। তারপর সেটার ভাঁজ খুলেই সমস্ত মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর।

"ও, প্ল্যানটা আপনার কাপড়ের মধ্যেই ছিল তাহলে। আমিও আন্দাজ করেছিলাম সেটা। কিন্তু আপনাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। খরিণীর সাহায্য নেব কি না ভাবছিলুম। যাক, ভুজঙ্গবাবু সমস্যাটার সমাধান করে দিলে।"

তুঙ্গশ্রী যখন মুখ তুলে চাইলেন চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেছে তখন তাঁর। অধর স্ফুরিত হচ্ছে।

"একজন ভদ্রমহিলাকে ঘরে এনে তারপর তাঁকে সাপের মুখে ঠেলে দেওয়া কোনদেশী ভদ্রতা জানতে পারি কি?"

"আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সাপটার কথা আমার মনেই ছিল না। তা ছাড়া ওটা যে বেরিয়ে পড়বে তা ভাবতেই পারিনি আমি।"

"সাপ পুষেছেন কেন?"

"ওটার ওপর আমি এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করছি। ওকে টাইফয়েড ব্যাসিলাস্‌ ইনজেকসান করে দেখছি, ওর টাইফয়েড হয় কি না? মানে—"

কুঞ্জ একটা সুটকেস নিয়ে প্রবেশ করল। চাবিটা হিরণ্যগর্ভের হাতে দিয়ে বললে—"দিদিমণি জিগ্যেস করলেন, ইনি কি এখন খাবেন?"

"খাবেন বইকি। আমরা যাচ্ছি এখুনি। তুমি জায়গা করতে বল।"

কুঞ্জ চলে গেল।

হিরণ্যগর্ভ তখন তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আমারও খিদে পেয়েছে খুব। আপনি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আমার খাবারটা খেয়ে নিই, তারপর আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"আপনি এখানেই খান?"

"হ্যাঁ, এখানেই। স্বপাক আহার করি। বিশেষ কিছু নয়—গোটা দুই সিদ্ধ ডিম, টু টুকরো রুটি আর এক গ্লাস দুধ। পাশের ঘরেই সব বন্দোবস্ত আছে আমার। আসবেন?"

তুঙ্গশ্রী আড়চোখে একবার সাপের বাক্সটার দিকে চেয়ে পাশের ঘরে যাওয়াটাই ঠিক করলেন।

হিরণ্যগর্ভ পাশের ঘরে ঢুকেই একটা বুনসেন বার্নার জ্বেলে ফেললেন। তারপর দেওয়ালের

জালের আলমারি খুলে দুধ আর ছোট অ্যালুমিনিয়মের প্যান বার করলে একটি। প্যানে দুধটা ঢেলে একটা ট্রিপডের উপর বসিয়ে বুনসেন বার্নারটা টেনে দিলেন তার নীচে।

"আপনি বসুন এই চেয়ারটায়। ততক্ষণ গান শুনুন একটা—দিল্লী পাওয়া যাবে বোধ হয় এখন?"

কোণে একটা ছোট রেডিও ছিল। দিল্লীতে বেশ ভাল গানও পাওয়া গেল একটা।

"বসুন। আমার বেশি দেরি হবে না, পাঁচ মিনিট, ডিম সিদ্ধ করাই আছে।"

সিদ্ধ ডিমগুলি ভাঙতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তুঙ্গশ্রী বলে উঠলেন—"হাতটা ধুয়ে ফেলুন আগে।"

"ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।"

এক ধারে দেওয়ালে চিনেমাটির সিঙ্ক ছিল একটা। কলও ছিল।

সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"এই গ্যাস প্রভৃতি করতে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে আমার।"

তুঙ্গশ্রী কোনও উত্তর দিলেন না।

দুধটা ফুটে উঠেছিল। সেটা নাবিয়ে, বার্নারটা নিবিয়ে, ডিম ছাড়াতে শুরু করলেন হিরণ্যগর্ভ।

নিস্পন্দ হয়ে বসে দেখতে লাগলেন তুঙ্গশ্রী।

সুদূর দিল্লী থেকে গান ভেসে এসে আকুল করে তুলতে লাগল চতুর্দিক।

...পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খাওয়া শেষ হয়ে গেল হিরণ্যগর্ভের। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুঙ্গশ্রীও নিজেকে সামলে নিলেন খানিকটা। অপ্রত্যাশিতভাবে পা পিছলে পড়ে গেলে লোকের যে রকম দৈহিক বিপর্যয় ঘটে, তাঁর মনে তেমনি একটা ঘটনা ঘটে যাওয়াতে শুধু যে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তা নয়, ধরবার ছোঁবার মতো কিছু একটা না পেয়ে দিশাহারাও হয়ে পড়েছিলেন। অন্ধকারে সাপ ভেবে যেটাকে মারবার জন্য আস্ফালন করে লাঠি তুলেছিলেন,—হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় সেটা দূরেই সরে গেল না শুধু অপ্রত্যাশিত টর্চের আলো এসে পড়ল কোথা থেকে, দেখতে পেলেন ওটা সাপ নয়, ফুলের মালা। অনেকে মনে করবেন এতে আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল তাঁর, কিন্তু তা তিনি হলেন না। একটা নিরুপায় আক্রোশ তিক্ত করে তুলল তাঁর সমস্ত মনকে। মনে হতে লাগল—ভুল দেখছেন, ভুল বুঝছেন, ওটা ফুলের মালা নয়, সাপই ছদ্মবেশ ধরে আছে, ধরতে পারছেন না তিনি। তাঁর সমস্ত বুদ্ধি একাগ্র হয়ে উঠল ছদ্মবেশের কৃত্রিমতা আবিষ্কার করবার জন্যে। উপর্যুপরি বিস্ময়ের যে চমকে তাঁর সমস্ত চিত্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিল তার তীব্রতা কমে আসছিল ক্রমশ। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থেকে তিনি আত্মস্থ হলেন। অন্তত তাঁর নিজের তাই মনে হল।

"চলুন এবার যাওয়া যাক।"

ল্যাবরেটারি থেকে বেরিয়েই আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন হিরণ্যগর্ভ।

"ও, দাঁড়ান, আপনার জিনিসপত্রগুলো আনতে বলে দি। কুঞ্জ ও কুঞ্জ—" কুঞ্জ বেরিয়ে এল।

"এঁর সুটকেস বিছানা আর নূতন সুটকেসটা এঁর ঘরে দিয়ে এস।"

কুঞ্জ চলে যেতেই নরেন নামক যুবকটি বেরিয়ে এল।

"এবারটি মাপ করুন আমাকে। এবার থেকে ঠিক করে রাখব ফিগারগুলো। ওই টেবিলের উপরেই রেখেছিলাম, হাওয়ায় উড়ে গেছে বোধ হয় কাগজটা।"

"পেপার-ওয়েটের তো অভাব নেই। একটু আগে তুমি যে বললে ড্রয়ারে রেখেছিলাম?"

নরেন প্রত্যুত্তরে হাত কচলাতে লাগল শুধু।

"ওই গ্রাফ করে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার আজ ছুটি নেই।"

"ফিগারগুলো পেলেই করে দেব। ইউরিয়াটা হয়ে গেছে, সুগারের ফিগারগুলো পেলেই করে দেব।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ তার দিকে ক্ষণকাল।

তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে বললেন—"এক মিনিট। একে ফিগারগুলো দিয়ে আসছি।" নরেনের সঙ্গে ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

তুঙ্গশ্রী বাইরে থেকে শুনতে পেলেন—"এই ভদ্রমহিলা এসেছেন বলে খুব বেঁচে গেলে তুমি। তা না হলে টেরটি পাওয়াতাম আজ তোমায়। এই নাও আমার খাতাটা আবার হারিও না যেন।"

পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন।

"চলুন এবার, বড় দেরি করিয়ে দিলাম আপনার।"

হিরণ্যগর্ভের কণ্ঠস্বরে উষ্মার লেশমাত্র নেই আর।

আবার বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন দুজনে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনার বিষয়ের সমস্ত আয় প্রজাদেরই হিতার্থে ব্যয় করেন বলছেন, তাহলে বিষয়টা প্রজাদেরই দিয়ে দিন না একেবারে।"

"যা আমার নয়, তা অপরকে দান করব কি করে?"

"বিষয় আপনার নয় তো কার?"

"বললাম তো, জগদ্ধাত্রী দেবীর। আমি তাঁর সেবকমাত্র।"

"আপনি বৈজ্ঞানিক হয়েও দেব-দেবীতে বিশ্বাস করেন?"

"আপনার কি ধারণা বৈজ্ঞানিক হলেই নাস্তিক হতে হবে? তা ছাড়া এতে তো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসছে না, আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত বিষয়, দেবতাদের নামে দিয়ে গেছেন তাঁরা, আমি সেই দেবতার সেবায়েত হিসেবেই সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবার অধিকারী—এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না কেন! ও-বিষয় আমি দান বা বিক্রি করতে পারি না।"

একটু হেসে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনি ইচ্ছে করলে একজন সেবায়েত নিযুক্ত করতে পারেন প্রজাদের ভিতর থেকে বেছে।"

"বাছব কি করে?"

"ভোট নিয়ে।"

"তাহলে তো জগন্নাথ মারোয়াড়ী টাকা দিয়ে কিনে নেবে সব ভোট। কথাটা যদিও একটু আত্মপ্রশংসার মতো শোনাবে তবু আমি বলতে বাধ্য যে, জগন্নাথ মারোয়াড়ীর চেয়ে আমি ভাল লোক।"

"ডেমোক্র্যাসিতে আপনার আস্থা নেই তাহলে?"

"কাগজে-কলমে আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেই। মানব-সমাজ এখনও তেমন উন্নত হয় নি। তাই ডেমোক্র্যাসির নামে অটোক্র্যাসি চলছে এখনও। চরিত্রবান নয়, প্রতিভাবান নয়, বুদ্ধিমান ধনীই এখনও প্রভুত্ব করতে চাইছে এবং করতে পারছে। মাপ করবেন, আমি আপনার যে শ্রমিকদের হয়ে লড়তে এসেছেন তারা এতই মূঢ় যে নিজেদের ভাল মন্দ কিসে হয়—সে জ্ঞান তাদের নেই। প্রলুব্ধ পশু যেমন ফাঁদে পা দেয়, এরাও তেমনি অতি সহজে শ্রমিকনেতা নামধেয় মতলব-বাজ লোকদের খপ্পরে পড়ে। ওই মতলব-বাজ লোকগুলি সর্বহারা শ্রমিকদের কেউ নয়, সর্বগ্রাসী ধনিকদেরই এজেন্ট। সকলের কথা আমি বলছি না, যাদের কথা আমি জানি তাদের কথাই বলছি। ব্যক্তিগতভাবে আপনি হয়তো আদর্শের প্রেরণায় এসেছেন, কিন্তু যে দল আপনাদের আদর্শটিকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করে আপনাকে গেঁথেছে তাদের স্বরূপ আপনি বোধ হয় জানেন না।"

শেষের কথাগুলিতে তুঙ্গশ্রীর সর্বাঙ্গ রিরি করে উঠল। কিন্তু আত্মসংবরণ করে ধীর কণ্ঠেই তিনি বললেন—"আপনি যা বললেন, তা হয়তো সবই ঠিক। কিন্তু এইটেই হচ্ছে এ-যুগের হাওয়া। একে আপনি ঠেকাবেন কি করে?"

"বাহুবলে কিংবা বুদ্ধিবলে। আপনাকে ধরে আনলাম কি করে?" একটা ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠল হিরণ্যগর্ভের অধরে, উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেল ভ্রূযুগল।

"আমি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি, কিন্তু যুক্তিটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। আপনাকে ক্যাপিট্যালিস্ট বলে যদি—"

"দোহাই আপনার, ও-কাজটি করবেন না। ক্যাপিট্যালিস্ট বলতে আপনারা যাদের বোঝেন, আমি তাদের দলে নই, বরং আমি তাদের বিরোধী বলতে পারেন। কিন্তু আপনারা যেভাবে এই ক্যাপিট্যালিস্ট সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন তারও আমি বিরোধী। এক হিসেবে আপনারা তাদেব বিরোধিতা করেই সম্মান দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে, আপনারাও ওই জাতের। ওদের ভাগে বখরাটা বেশি বলেই আপনাদের আপত্তি, টাকার বখরা সমান হয়ে গেলেই আপনাদের আপাতত আর ঝগড়া থাকবে না।"

"আপনি তাহলে কি ভাবে সমস্যার সমাধান করতে চান?"

"আমি চাই বললে ভুল হবে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতা যেভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল, আমিও সেই ভাবেই ভাবতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে সৎপথে থেকে ধনোপার্জন করতে বাধা ছিল না। কারও স্বোপার্জিত সম্পত্তি কেড়ে নেবার চেষ্টাও করত না কেউ। কিন্তু একটা জিনিস ছিল, কেবলমাত্র ধনী হলেই খাতির পেত না লোকে। আজকাল যেমন সাহিত্য শিল্প ধর্ম—সব সমাজেই ধনীর প্রতিপত্তি, আগে সে রকম ছিল না। সেকালে মনুষ্যত্বই ছিল সম্মানের মেরুদণ্ড। ত্যাগীই সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পেত, ভোগী নয়। সমাজের শিরোমণি ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ। রাজ জনক যখন মহর্ষি জনক হলেন, তখনই হল তাঁর খাতির; কান্যকুব্জের রাজা গাধিনন্দন তেমন খাতির পান নি, তপস্যা করে তিনি যখন বিশ্বামিত্র হলেন তখনই সমাজের লোক সম্মান দিল তাকে; রূপসী গণিকা আম্রপালী পাংক্তেয় হলেন ভিক্ষুণী হয়ে—এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। একটা জিনিস তাঁরা বুঝেছিলেন যে, শুধু ধন নিয়েই মানুষ তৃপ্ত হয় না, মানও চায় সকলে। সমাজে অপরের শ্রদ্ধা সম্মান লাভ করতে সবাই

উৎসুক। এই দ্বিতীয় জায়গাটিতে খুব কড়াকড়ি ছিল তাদের। মনুষ্যত্ব লাভ না করলে, ব্রাহ্মণ না হলে সেকালে খাতির পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। এই খাতিরের লোভে সেকালে অনেকে ভদ্রলোক হয়ে যেত। ভণ্ডও হতো অবশ্য—"

তুঙ্গশ্রী হেসে বললেন—"আপনার কি ধারণা যে, এখন খাতিরের লোভ দেখালেই সমস্যাব সমাধান হবে? ধনীরা গরিবদের আর শোষণ করবে না?"

"এ পরিবর্তন হঠাৎ হয় কি! শিক্ষারই আমূল পরিবর্তন করতে হবে, দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে ফেলতে হবে? ঐহিক ঐশ্বর্যটা যে কিছুই নয়, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-বিদ্বান সকলেই যে নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করছে, এই জীবনে সৎকর্ম করে গেলে প্রত্যেকেই যে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছতে পাবে—এই বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল করতে হবে, ধনী-দরিদ্র সকলেই যে মুক্তিপথের যাত্রী এটা শুধু মুখের বুলি বলেই হবে না, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে সেটা। কিন্তু এসব তো একদিনে হবে না।"

"এই সব কুসংস্কার আপনি দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল করতে চান। এ সবের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি?"

"আপনি নিজে যদি বৈজ্ঞানিক হতেন তাহলে অত সহজে কথাটা বলতে পারতেন না। দেখুন, কিছুদিন আগে বৈজ্ঞানিকেরাই বলতেন—খারাপ হাওয়ার জন্যেই ম্যালেরিয়া হয়, তখন সেইটেই বৈজ্ঞানিক সত্য ছিল; রস সাহেব যেই মশার তত্ত্ব বার করলেন অমনি সেটা কুসংস্কার হয়ে গেল। এখন আমার নিজের মনে হচ্ছে, মশার তত্ত্বটাও কুসংস্কার বোধ হয়। ব্যাকটিরিয়ারাই সত্যি সত্যি অসুখের কারণ কি না তাতেই সন্দেহ হচ্ছে আমার। বিজ্ঞানের আলোচনা করলে দেখতে পেতেন, প্রতি বিষয়েই বৈজ্ঞানিক থিয়োরী রোজ বদলে যাচ্ছে। কিন্তু যে সব জিনিসকে আপনি কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলেন, সেইগুলো অবলম্বন করে অনেক বড় বড় সভ্যতা টিকে আছে এখনও।"

"আফিং জিনিসটা টিকে আছে এখনও।" হেসে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী—"ধর্মের আফিং খাইয়ে জুজুর ভয় দেখিয়ে সেকালে শ্রমিক-জগৎ'কে পঙ্গু করে রেখেছিল ওই ক্ষমতাপ্রিয় পুরোহিতের দল—ইতিহাস পড়ে এই তো মনে হয়।"

"একালের পুরোহিতের দল টাকার আফিং খাইয়ে পঙ্গু করে বেখেছে তাদের। নিজেই ভেবে দেখুন, কোন্ আফিংটা ভাল। আপনার শ্রমিক-জগৎ কথাটা শুনে একটা কথা মনে পড়ল। আজকাল ডিগ্‌নিটি অব লেবার কথাটা যেখানে-সেখানে যখন-তখন খুব শুনি, কিন্তু সত্যিই কি লেবারদের ডিগ্‌নিটি আজকাল আছে? তাদের মাইনে বাড়িয়ে দিলেই কি তাদের ডিগ্‌নিটি বাড়ে?"

"মাইনে বাড়িয়ে দেখুনই না, বাড়ে কি না!"

"আমার কাকার মিলে সে চেষ্টা করেছিলাম একবার। কাকার সঙ্গে ঝগড়া করে তিন গুণ করে দিলাম সকলের মাইনে। ফলে কি হল জানে? তাদের ডিগ্‌নিটি বাড়ল না, আশেপাশে তাড়ির দোকান বেড়ে গেল কয়েকটা, দু ক্রোশ দূরে যে গণিকাপল্লীটা ছিল তার আয় বেড়ে গেল অনেক।"

"আপনারা ধনীরা যদি মদ খেতে পারেন, গণিকা নিয়ে আমোদ করতে পারেন, ওরাই বা বঞ্চিত হবে কেন সে সব থেকে?"

"ঠিক। আপনি আপনার অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় সায় দিয়ে ফেলেছেন আমার কথায়। আমার মতে আজকালকার শ্রমিক ধনিক দুই-ই একজাতের লোক। তফাতটা কেবল আর্থিক। দুই দলই কষ্ট পাচ্ছে। আপনি মনে করবেন না যে, ক্যাপিট্যালিস্টরা খুব সুখে আছে—আমার কাকাকে যদি দেখেন বুঝতে পারবেন সেটা। টিপিকাল ধনী তিনি—"

"এই বললেন আপনাদের বিষয়-সম্পত্তির মালিক জগদ্ধাত্রী দেবী! আপনার কাকা টিপিকাল ধনী হবার সুযোগ পেলেন কি করে তাহলে?"

"আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির দুটো ভাগ আছে। আমার ভাগটা জগদ্ধাত্রী দেবীর, আমার কাকার ভাগটা নয়। উনি আমার বাবার সহোদর নন। আমার ঠাকুরদার বাবারা দুই ভাই ছিলেন, সেই সময় সম্পত্তি দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা ভাগ দেবোত্তর করেন একজন, আমরা সেইটেরই সেবায়েত। বাকি অর্ধেকটার বর্তমান উত্তরধিকারী আমার নিঃসন্তান কাকা।"

"ও!"

"কাকার সঙ্গে আলাপ করবেন? দ্রষ্টব্য ব্যক্তি একজন।"

"করতে পারি।"

"আচ্ছা, আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।"

বড় অট্টালিকার কাছাকাছি হতেই দপ করে আলো জ্বলে উঠল—একটা ইলেকট্রিক আলো। যে পথে তাঁরা প্রবেশ করবেন, আলোকিত হয়ে উঠল সেটা।

"আপনারা এই মফস্বলে ইলেকট্রিক পান কি করে? ডায়নামো বসিয়েছেন?"

"কাকা বসিয়েছেন। আমার ল্যাবরেটারিটার অবশ্য সুবিধে হয়েছে সেজন্যে। টাকা দিয়ে যা যা হওয়া সম্ভব কাকা সব করেছেন। এমন কি ফোন পর্যন্ত বসিয়েছেন একটা নিজের ঘরে।"

দ্বার প্রান্তে হাস্যমুখী শিখরিণী এসে দাঁড়াল।

সবাই ভিতরে প্রবেশ করলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরও হিরণ্যগর্ভ গল্প করতে লাগলেন তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে বসে। তুঙ্গশ্রীর প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছিলেন তিনি যেন। অন্য কোনও কারণে নয়, তুঙ্গশ্রী বিদ্রোহিনী বলে। তিনি যে চিরাচরিত পথ ছেড়ে প্রাণ তুচ্ছ করে দেশের কাজে নামতে পেরেছেন এতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। পথ যতই বিভিন্ন হোক, কিন্তু তিনি যে তাঁরই স্বজাতি—এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না তাঁর। তাই তিনি নিজেই তাঁকে স্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন এবং হঠাৎ একটা উদ্ভট ফন্দি মাথায় এসে পড়াতে যা করেছিলেন তা তাঁর খেয়ালী শিশুসুলভ স্বভাবেরই পরিচয় দেয় মাত্র। অভিনব একটা কিছু করতে পারলে তিনি যত আনন্দিত হন, এমন আর কিছুতেই হন না। আনন্দের স্বর্গলোকে আজ তাঁর মন তাই ডানা মেলে উড়ছিল। সোচ্ছ্বাসে বক্তৃতা করছিলেন তিনি। যে আলোচনা খাওয়ার আগে শুরু হয়েছিল সেইটেই চলছিল তখনও।

"দেখুন, আজকাল যা হয়েছে তাতে লেবারের ডিগ্‌নিটি মোটে নেই। মানুষের মূল্য আমরা টাকা দিয়ে ঠিক করছি। আগে কিন্তু তা ছিল না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাকেই খাতির করতাম আমরা। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রত্যেক মানুষই তার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের জগতে সম্রাট হয়ে জন্মেছে। সেই সম্রাটকে যদি আমরা তার প্রাপ্য না দিই, তাহলে তাকে ঠিক সম্মান করা হয় না, তাকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। এখন আমরা প্রত্যেক

লোককে এক ছাঁচে ঢেলে ফেলবার চেষ্টা করছি। বড় শিল্পী বা প্রতিভাবান কারিগরকে ফ্যাক্টরিতে চাকরি দিয়ে আমরা তাকে দিয়ে ক্রমাগত বল্টু বানিয়ে নিচ্ছি বা হাতল ঘুরিয়ে নিচ্ছি। যত বেশি মাইনেই দি, সে তৃপ্তি পাবে না তাতে। কারণ তার মধ্যে যে সম্রাট আছে তাকে আমরা খাতির করছি না। মুড়ির মহিমাও আমরা উপলব্ধি করছি না, মিছরিরও না। আমরা কেবল তাদের একটা ঠোঙায় ঢুকিয়ে ঠোঙার গায়ে দরের লেবেল সেঁটে দেবার চেষ্টা করছি। এই যে নরেনকে এক্ষুণি দেখলেন, ওর বাবাকে কি রকম খোশামোদটা করতুম আমরা ছেলেবেলায়! ওরা জাতে তাঁতী, ওর বাবার তাঁত ছিল। আমাদের সমস্ত কাপড় সেই করত। বাবা মিলের কাপড় কেনার বিরোধী ছিলেন। আমি আর শিখরিণী জীবন তাঁতীর বাড়িতে প্রায়ই গিয়ে ধরনা দিতাম কাপড়ের পাড় যাতে ভাল হয় একটু। তার সঙ্গে আমাদের শুধু পয়সার সম্বন্ধ ছিল না, প্রাণের সম্বন্ধও ছিল। তার মধ্যে যে শিল্পী ছিল তাকে আমরা খাতির করতুম। তার ছেলে নরেন, বি-এস-সি পাস করেছে, কেরানীগিরি কিংবা মাস্টারি যে কোনও একটা চাকরি করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় চাকরি পেয়েওছিল, কিন্তু স্ট্রাইকে যোগ দেওয়ার জন্যে চাকরি গেছে। কিছুতেই কোথাও খাপ খাওয়াতে পারছে না নিজেকে। পারছে না তার কারণ, ওর মনের মধ্যে যে সম্রাট আছে সে ঠিক মর্যাদা পাচ্ছে না। ও বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি তাই ওকে সুযোগ দিয়েছি ল্যাবরেটারিতে যদি ও আত্ম-আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু যা দেখছি, ভয়ানক কুঁড়ে আর অন্যমনস্ক। আমাদের সমস্ত শিক্ষাটাই হচ্ছে ভুলপথে।"

তুঙ্গশ্রী চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন সব। তিনিও স্বজাতি বলে চিনতে পেরেছিলেন হিরণ্যগর্ভকে। তিনিও নীরবে ভাবছিলেন কি উপায়ে এই পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনা যায়।

শিখরিণী পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল।

"কাকা আসতে বললেন তোমাদের। গানের আসর বসবে কিন্তু এক্ষুণি।"

"চলুন যাই। গান শুনতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়?"

"কি গান?"

"বাইজীর।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তুঙ্গশ্রী। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাঁর মুখভাবে তাঁর অজ্ঞাতসারেই এমন একটা কঠোরতা ফুটে উঠল যে তাঁর মনোভাবটা হিরণ্যগর্ভের অগোচর রইল না।

"বাইজী শুনে চটে যাচ্ছেন কেন? বাইজী নামক শ্রমিকার মজুরি বেশ ভালোই দেন কাকা। তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন খুব। গেলেই দেখতে পাবেন।"

"চলুন।"

যে প্রত্যুত্তরটা জিহ্বাগ্রে এসে পড়েছিল সেটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তুঙ্গশ্রী। কারণ যে সম্ভাবনাটা তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছে কিছুক্ষণ আগে থেকে, বাক্‌বিতণ্ডা করে সেটাকে নষ্ট করতে চান না তিনি। অকারণে অসময়ে গর্জন করে ব্যাঘ্রিনী যেমন তার শিকারকে সচকিত করে তোলে না, হিরণ্যগর্ভকে তেমনি অনর্থক উত্তেজিত করতে প্রবৃত্তি হল না তাঁর।

শিখরিণীকে অনুসরণ করে উভয়েই ঘরের পর ঘর, বারান্দার পর বারান্দা পার হতে লাগলেন। সমস্ত ঘরগুলোই ছবিতে আসবাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু দেখে মনে হল না যে, কেউ তাতে বাস করে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বারান্দা। একটা বারান্দায় সারি সারি খাঁচায় খরগোশ, গিনিপিগ, পায়রা, সাদা ইঁদুর, এমন কি বাঁদরও রয়েছে।

"ওগুলো হচ্ছে আমার ল্যাবরেটারির জানোয়ার।"

হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী।

"কাকা হাঁচলেন।"—মুচকি হেসে শিখরিণী বললে।

"যাক, আপনার কপালটা ভালো। সন্ধ্যের দিকে কয়েকটা হেঁচে না ফেলতে পারলে কাকা স্বস্তি পান না।"

প্রকাণ্ড একটা দালান শেষ হয়েছে যেখানে, সেইখানে পরদা-দেওয়া দরজার সম্মুখে সশস্ত্র দারোয়ান দেখেই তুঙ্গশ্রী বুঝলেন যে, এইবার কাকাবাবুর মহল আরম্ভ হল। হিরণ্যগর্ভকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল দারোয়ান এবং মিলিটারি স্যালুট করলে।

"আসুন।"—শিখরিণীই আহ্বান করলে।

ভিতরে প্রবেশ করলেন সবাই।

প্রকাণ্ড একটি হলের এক প্রান্তে বসেছিলেন মেঘসুন্দর বর্মন। দীর্ঘকান্তি সুপুরুষ। ধপধপে গায়ের রঙ, ধপধপে মাথার চুল। পাকা চুলেও চমৎকার তেড়ি। শুকচঞ্চু নাকের দু পাশে খাঁজ। চোখ দুটি খুব বড় নয়, কিন্তু জীবন্ত। গোঁফ-দাড়ি কামানো। তাঁর বলিষ্ঠ চিবুক, মজবুত চোয়াল, চোখের প্রদীপ্ত দৃষ্টি, ভাষাভরা পাতলা ঠোঁট তাঁর যে ব্যক্তিত্বের সূচনা করছে সে ব্যক্তিত্বের মূলকথা অনমনীয়তা। তা যেন নীরব ভাষায় ঘোষণা করছে—তোমরা কি বল না বল না তা গ্রাহ্য করি না আমি। তোমাদের স্তুতি নিন্দার অনেক ঊর্ধ্বে আমার বাস।

শিখরিণী এগিয়ে গিয়ে বললে—"এই যে কাকা, ইনিই তুঙ্গশ্রী দেবী।"

"ও।"

তুঙ্গশ্রী নমস্কার করতেই বললেন—"বস বস। হিরণ, তুমি তোমার অমূল্য সময় এভাবে নষ্ট করছ যে আজ হঠাৎ?"

"এঁকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে।"—মৃদু হেসে কথা কটি বলে একটা চেয়ার টেনে বসলেন হিরণ্যগর্ভ এক ধারে. তুঙ্গশ্রীও বসলেন। মখমলের গদিআঁটা চেয়ারে বসে কেমন যেন স্বস্তি পেলেন না তিনি। নরম নরম কেমন যেন।

মেঘসুন্দর ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়েছিলেন তুঙ্গশ্রীর দিকে।

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"নামটা যে রকম হেঁইও-গোছের, চেহারাটা সে রকম নয় তো। আমাদের শিখুর মতোই অনেকটা।"

শিখরিণী একপাশে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। সে বললে—"আমি এবার যাই কাকু।"

"গান শুনবি না?"

"আসব একটু পরে।"

"তোমার পতিদেবতা কি ফিরেছেন এর মধ্যেই? জগন্নাথপুর গেছে তো?"

"হাতিতে গেছেন। এসেই হয়তো খেতে চাইবেন।"

"ওকে টমাটোর রস দিয়ে হরলিক্স্ করে দিয়েছিলি একদিনও?"

"না, দেওয়া হয় নি এখনও।"

"ওই তো তোমাদের দোষ। যেটি বলব সেটি কিছুতে করবে না। ওসব কাগজি লেবুর শরবত-টরবতের চেয়ে ঢের ভালো। কি বল হিরণ।"

"ভালো তো হওয়া উচিত।"

"শুনলি? করে দিস আজকে।"

"আচ্ছা।"

শিখরিণী চলে যাচ্ছিল। মেঘসুন্দর আবার ডাকলেন।

"ওই বিনি হারামজাদী কি করছে দেখ তো। কমপ্রেসটা এখনও পর্যন্ত আনতে পারলে না। তুই দেখ দিকি।"

শিখরিণী পাশের একটা দরজা দিয়ে চলে গেল।

মেঘসুন্দর হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে বললেন—"হাঁটুর বাতটা কিছুতেই বাগ মানছে না. বুঝলে! একটা ব্যবস্থা করতে পার কিছু? রামচন্দ্র তো হিমসিম খেয়ে গেল. কিছুই হচ্ছে না, ব্যথাও বাড়ছে, তার বিলও বাড়ছে।"

"দেখি!"—উঠে দাঁড়ালেন হিরণ্যগর্ভ।

"দাঁড়াও! বেশি টেপাটিপি করো না যেন, তোমাকে দেখাতে ভয় করে।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে হাঁটুটা দেখলেন।

"পারগেটিভ নিন একটা। আর মাংস ডিম এগুলো বন্ধ করে দিন একেবারে।"

"এর নাম কি চিকিৎসা? তার চেয়ে সোজা বল না—আপনি চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি আপনার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি আপনাকে। আপদ চুকে যাক। এত খরচ করে কি পড়াশোনা যে করলে তোমরা. তা তো বুঝি না। কোথায় অসুস্থ মানুষকে একটু আরাম দেবে,, তা না, তাকে আরও উত্যক্ত করে তুলছ। রামচন্দর বোরিক কম্প্রেসের ব্যবস্থা করে গেছেন। এমন দুর্গন্ধ ওষুধটার—"

বিনি ওরফে বিনোদিনী গরম কম্প্রেস নিয়ে প্রবেশ করল। বিনোদিনীর বয়স পনেরো-ষোল বছরের বেশি নয়। বেশ সুন্দরী। পিঠে চমৎকার বেণী দুলছে একটি। চোখের ভ্রূযুগল ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত। অভিমানে সমস্ত মুখ থমথম করছে।

"ও বাবা, চোখে-মুখে মেঘ আর বিদ্যুৎ দুই যে দেখছি। কি হল? শিখুর কাছে বকুনি খেলে বুঝি?"

বিনু কোনও উত্তর না দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল কম্প্রেস দিতে।

"আতর দিয়েছ ভালো করে?"

"দিয়েছি।"

চমৎকার গোলাপী আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। আনতমস্তকে বিনু সেঁক দিতে লাগল হাঁটুতে। বিনির বেণীটা হাত দিয়ে তুলে গুনগুন করে গান ধরে দিলেন মেঘসুন্দর—

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বিনি—"আঃ, ছাড় না, লাগছে যে।"

বিনু মেঘসুন্দরের নাতনী। তাঁর ভাগনীর মেয়ে। মা-বাপ-মরা মেয়ে। মেঘসুন্দরই মানুষ করেছেন।

তুঙ্গশ্রী স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো—কাতারে কাতারে লোক ভাতের জন্য ফ্যানের জন্য হাহাকার করে বেড়িয়েছে যে দেশের পথেঘাটে, যে দেশের

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ইজ্জত দিয়েছে দুটি উদরান্ন সংগ্রহের জন্য, মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যে কোনও উঞ্ছবৃত্তির শরণাপন্ন হয়েছে কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দেশে; সেই দেশে এই সব ধনী মজুতদারেরা গা ভাসিয়ে দিয়েছে বিলাসের স্রোতে। ষোড়শী সুন্দরীকে দিয়ে হাঁটুতে দেওয়াচ্ছে গোলাপী আতরের সেঁক।

সেঁক দেওয়া শেষ করে বিনু উঠে যাচ্ছিল। মেঘসুন্দর বললেন—"হীরা বাইজীকে আজ নাচটা দেখাতে হবে।" এক ছুটে বেরিয়ে গেল বিনু। তার গমনপথের দিকে চেয়ে হাসিমুখে আওড়ালেন মেঘসুন্দর—

গোরি ধীরে চল, গাগরি ছলক না যায়
পাতরি কমরই তেরি লচক না যায়।

তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"ওহো, অন্যায় হয়ে যাচ্ছে তো! আমি নিজের ব্যাপার নিয়েই মত্ত আছি, তোমার দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না। তুঙ্গশ্রী? হুঁ। হিরণের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে নাকি। ওর মতো লোকের সঙ্গে কারও যে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব তা তো মনে হয় না। সাপ ব্যাঙ ইঁদুর কচ্ছপ নিয়ে কারবার ওর দিনরাত! ভালো কথা হিরণ, তোমার সেই স্বদেশহিতৈষী মিলের কি হল শেষ পর্যন্ত?"

"মিল বন্ধ করে দিয়েছি।"

"তা তো দিতেই হবে জানতাম। জবরদস্তি করে কারও উপকারও যে করা যায় না, তা তো আগেই বলেছিলাম তোমাকে। দিন দশেক আগে কেশব সামন্তদের লোক এসেছিল আমার কাছে। ওরা যদি জমিটা লীজ নিতে চায় দিয়ে দাও না, তোমাদের মিলের জিনিসপত্রও কিনে নেবে ওরা। পূর্ববঙ্গে নিজেদের একটা মিল স্টার্ট করবার ইচ্ছে ওদের। তাছাড়া তোমার ওই জমিটাতে ওরা—"

"গাঁজা চাষ করতে চায়।" হেসে জবাব দিলেন হিরণ্যগর্ভ—"আমার কাছেও এসেছিল ওরা।"

"তা করলেই বা। ওরা কি চাষ করবে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? তোমাকে মবলগ টাকা দিচ্ছে, নিয়ে নাও না সেটা।"

"না, আমি গাঁজার চাষ করতে দেব না।"

"ওই পাগলামো দেখ। লোকে ধানও খায়, গাঁজাও খায় যে। তুমি তোমার জমি না দিলে কি গাঁজার চাষ উঠে যাবে দেশ থেকে?"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে বসে রইলেন। উত্তর দিলেন না কোনও। আড়চোখে তুঙ্গশ্রীর দিকে চাইলেন একবার কেবল।

কেশব সামন্ত নামটা শুনেই তুঙ্গশ্রীর সমস্ত সত্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। কেশব সামন্তও যে ধনী জমিদারের ছেলে তা অবিদিত ছিল না তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু তিনি কেশব সামন্তর অন্য যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। জমিদারের ছেলে হয়েও কেশব সামন্ত জমিদারি প্রথার বিরোধী, তাঁদের পার্টি পরিচালনের অধিকাংশই খরচই তিনি দেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর কংগ্রেস নেতারা যে ক্যাপিট্যালিস্টদের হাতে রেখে ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিচ্ছেন—এ সম্বন্ধে তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা একাধিক বার শুনে তুঙ্গশ্রীর মনে কেশব সামন্ত সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে তা শ্রদ্ধাবিষ্ট। জেল থেকে বেরিয়ে এসে নিরাশ্রয়ের মতো তিনি যখন পথে পথে

ঘুরছিলেন, তখন মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া আর কেউ তো কিছু করে নি. কেউ তো সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি এক কেশব সামন্ত ছাড়া। দেশের জন্যেই তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, দেশের জন্যেই কারাবরণ করেছিলেন, কিন্তু দেশের লোক তাঁর জন্যে কি করল? তাঁর মাকে একমুঠো খেতে পর্যন্ত দেয় নি। না খেয়ে মারা গেছেন তিনি। নাবালক ভাইটা যক্ষ্মায় ভুগছে। ওই কেশব সামন্তই বলেছেন তাঁকে, কোনও স্যানাটোরিয়ামে ঢুকিয়ে দেবেন এবং প্রয়োজন হলে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন। পূর্ববঙ্গে জন্ম তাঁর, পূর্ববঙ্গেই শিক্ষাদীক্ষা, বাকী জীবনটাও হয়তো পূর্ববঙ্গেই কাটত: কিন্তু সেখানে থাকতে পারলেন না। মুসলমান গুণ্ডাদের অত্যাচারে পালিয়ে আসতে হল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন না কেন? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করবার জন্যে প্রাণ তুচ্ছ করে যেমন তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তেমন করে এগিয়ে গেলেন না কেন? এ প্রশ্ন অনেকে করেছে তাঁকে। যে উত্তর তিনি দিয়েছেন তার মর্ম কেশব সামন্ত ছাড়া আর কেউ বুঝল না। মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবি তিনি ন্যায্য বলে মনে করেন। এই শুনেই ক্ষেপে গেল সকলে। পাকিস্তানে যে আজ গুণ্ডার আধিক্য তার কারণ, তারা এতদিন শিক্ষিত ভদ্রলোক হবার সুযোগ পায়নি হিন্দুদের আওতায় থেকে। এইবার তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেয়েছে। আশা করা যায় যে, অল্পদিনের মধ্যে তারাও সভ্য হয়ে উঠবে। এর জন্যেই তাদের পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। কেশব সামন্তই কেবল বুঝেছিলেন তাঁর যুক্তি এবং বাঁচিয়েছিলেন তাঁকে তথাকথিত স্বদেশভক্তদের হাত থেকে। পূর্ববঙ্গ থেকে ছোট ভাইটিকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় যখন পালিয়ে এলেন তিনি, তখন একমাত্র ওই কেশব সামন্তই তাঁকে সত্যিকার আশ্রয় দিয়েছিলেন কলকাতা শহরে তাঁর নিজের বাড়িতে। তাঁর মন তাঁর মতবাদ সমস্তই আশ্রয় পেয়েছিল এক ঐ কেশব সামন্তের কাছে। কলকাতায় এসে যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী তিনি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন. কেশব সামন্তই তার প্রাণ। সে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আদর্শ—শ্রমিকদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, দেশের শত্রু পুঁজিবাদীদের ধ্বংস করা। এরই মধ্যে অনেক মিল স্ট্রাইক করিয়েছেন তাঁরা, চূর্ণ করেছেন অনেক ধনীর অহেতুক দম্ভ। হিরণ্যগর্ভের নানা কাহিনী তিনি শুনেছিলেন কলকাতায় বসে। কেশব সামন্তকে লেখা চিঠিখানাও দেখেছেন তিনি। চিঠিটা পড়ে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল তাঁর। কিন্তু সে রাগের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন তিনি অকাট্য প্রমাণ পেলেন যে, কেশব সামন্তকে অপমান করেছেন হিরণ্যগর্ভ। সেইদিন ঠিক করলেন, এমন একটা কিছু করতে হবে, এমন চমকপ্রদ একটা কিছু, যাতে হিরণ্যগর্ভেরই শিক্ষা হবে না শুধু, কেশব সামন্তেরও তাক লেগে যাবে। ডিনামাইট দিয়ে হিরণ্যগর্ভের মিলটা উড়িয়ে দেবার প্রস্তাবে সত্যিই তাক লেগে গিয়েছিল কেশব সামন্তের।..এমন ভাবে ধরা পড়ে যাবেন তা তুঙ্গশ্রী কল্পনা করেন নি। তার চেয়েও বেশি কল্পনাতীত ছিল হিরণ্যগর্ভের যে রূপটা এখন তিনি দেখছেন। খাপছাড়া রকম এ ধরনের অদ্ভুত একটি ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হবার কল্পনা জীবনে করেন নি তিনি।

কেশব সামন্তের প্রসঙ্গ এসে পড়াতে সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠল তাঁর। হিরণ্যগর্ভের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মেঘসুন্দর, বললেন—"মিল তো বন্ধ করে দিলে। কি হবে ওটা তাহলে এখন? অত যন্ত্রপাতি, অত বড় বাড়ি, এক শো বিঘে জমি, সব পড়ে থাকবে অমনি?"

"থাক্ না কিছুদিন। ভেবেচিন্তে পরে যা হয় কিছু ঠিক করা যাবে একটা।"

"আপাতত কোনও প্ল্যান নেই তাহলে তোমার?"

"ঠিক প্ল্যান নেই। কিন্তু আমি ভেবেছি মুরারিপুরে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়টা স্থাপন করেছি, তার ছাত্রদের কাপড়ের কল সম্বন্ধে হাতে-কলমে কিছু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না এখানে। তারাই কলটা চালিয়ে হাতে-কলমে বুঝুক— মিল ভালো, না, চরকা ভালো।"

"এত আজগুবি বুদ্ধি মাথায় আসে তোমার! ছ্যা ছ্যা! লাল কালো যে কোনও কালিতে বল আমি লিখে দিচ্ছি যে, কিচ্ছু হবে না। পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে সব। যন্ত্রটাতে প্রথমে জং লাগবে, তার পরে চুরি যাবে আস্তে আস্তে। কেশবকে যদি জিনিসটা এখন গছিয়ে দিতে পারতে, তোমার ঘরের টাকাটা ঘরে ফিরে আসত। আমারও কিছু হতো—"

"আপনার? আপনার কি হতো?"

"কেশব তার সুনরিঘাটার সমস্ত মহালটা বাঁধা রেখে আমার কাছে টাকা নিতে চাইছিল যে এর জন্যে। তুমি রাজী হয়ে গেলেই হয়ে যেত। সিক্স পার্সেন্ট সুদ দিতে চাইছিল সে। তোমার জবরদস্তিতে পরে স্যানাটোরিয়ামের জন্যে যে টাকাটা দেব বলেছি, সেটা স্বচ্ছন্দে উঠে আসত ওর থেকে। মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়ে যেত।"

হিরণ্যগর্ভ হাসিমুখে চেয়ে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। মেঘসুন্দর তখন তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"অহো আবার দেখ, আমরা নিজেদের ঘরোয়া কথা নিয়েই মেতে উঠেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করাই হচ্ছে না! তুমি কি জাতের কি ধাতের লোক তাও তো জানি না। কি নিয়ে কথা কইব তোমার সঙ্গে? রাজনীতি, সাহিত্য, কালোবাজার, না, ট্রেনের ভিড়—কিসের আলোচনা তোমার ভালো লাগবে তাও তো জানি না।"

"বেশ তো, রাজনীতি নিয়েই কিছু বলুন না।"

"ওবে বাবা! খবরের কাগজ আমি আমার ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিই না। সকালবেলা উঠেই দুনিয়ার দুঃসংবাদ নিয়ে বেফয়দা মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। সে সময় বরং ভৈরবী বা টোড়ি ভাঁজলে কাজ দেয়। শেয়ার মার্কেটের খবরের জন্যে দু-একখানা কাগজ যা আসে তা মন্মথই দেখে। আমি খবর নিই রেডিও থেকে, ফোনও আছে। রাজনীতির বিষয় কিছু জানি না, জানতে চাইও না। একটি জিনিস জানি, যদি বল সেই সম্বন্ধেই কিছু শোনাতে পারি।"

"কি সেটা?"

"সঙ্গীত। তোমার তুঙ্গশ্রী নামটার অংশটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। কারণ ওটা একটা রাগের নাম। তোমার নাম তুঙ্গশ্রী না হয়ে যদি মালবশ্রী হতো তাহলে আরও ভালো লাগত। শ্রী রাগের প্রথমা ভার্যার নাম মালবশ্রী। লতার মতো তন্বী, মুখে মৃদু হাসি, হাতে একটি রক্তকমল—এই তার বর্ণনা। শ্রী রাগের আলাপ শুনবে নাকি একটু? হিরণ, আমার বেহালাটা দাও তো, চেষ্টা করে দেখি একটু—"

হিরণ্যগর্ভ পাশের ঘরে গেলেন।

মেঘসুন্দর বলতে লাগলেন—"সারা জীবন গান নিয়েই আছি। ওই আমার শখ, ওই আমার স্বপ্ন"—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। তুঙ্গশ্রী দেখলেন, খোলা জানালাটার দিকে সোৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন তিনি, মুখে ফুটে উঠেছে একটা মৃদু হাসি, যেন স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করছেন।

হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করলেন বেহালা নিয়ে।

শুরু হয়ে গেল শ্রী রাগের আলাপ। দেখতে দেখতে অন্য রকম মানুষ হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সমস্ত মুখে আগ্রহ আর তৃপ্তির এমন অপূর্ব একটা সমন্বয় ফুটে উঠল যে, তাঁর মুখের চেহারাটাই বদলে গেল। তুঙ্গশ্রীর একটা ছবি মনে পড়ল। যখন জেলে ছিলেন, তখন একটি স্ত্রীলোক-কয়েদীর ছেলে হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে সে যখন বসে দুধ খাওয়াত তখন সেই স্তন্যপানরত শিশুর মুখে যে ভাব ফুটে উঠত তাই যেন মেঘসুন্দরের মুখেও ফুটে উঠেছে, তুঙ্গশ্রীর মনে হল। অর্ধনিমীলিত নেত্রে তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন। মনে হচ্ছে যেন ক্ষুধিত শিশু প্রাণদ সুধা পান করছে। হঠাৎ ঝন ঝন করে উঠল পাশের ফোনটা। মেঘসুন্দরের মুখটা ব্যথাতুর হয়ে উঠল নিমেষে, চোখে ফুটে উঠল আতঙ্ক একটা, চোখ দুটো যেন বলে উঠল—ওই রে! বেহালা বন্ধ করে ফোনটা ধরলেন। কলকাতা থেকে ফোন এসেছে। ব্যবসা-সংক্রান্ত কি একটা জরুরী খবর। দুঃসংবাদ সম্ভবত। চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল মেঘসুন্দরের। তড়বড় করে কত কি বলে গেলেন। শেষে বললেন, আবার ফোন করতে। ফোনটা নামিয়ে রেখে তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"রসভঙ্গ হয়ে গেল। সারা জীবনই এমনি হচ্ছে। আবার শুরু করি, কি বল?"

তুঙ্গশ্রীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই শুরু করলেন। কিন্তু এবারও শেষ হল না। ব্যাগ হাতে ডাক্তার রামচন্দ্র দাস প্রবেশ করলেন।

"তোমার আবার কি! এর মধ্যেই ইন্‌জেক্‌শনের সময় হয়ে গেল?"—একটু রুক্ষ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন মেঘসুন্দর।

"নটা তো বেজে গেছে অনেকক্ষণ।"

"তা বাজুক, দাঁড়াও একটু।"

"বেশ তো, আমি অপেক্ষা করছি।"

বাধ্য কুকুরের মতোই একধারে গুটিশুটি হয়ে বসলেন রামচন্দ্র। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে হল না তাঁকে। পরক্ষণেই মত পরিবর্তন করালেন মেঘসুন্দর।

"দাও, দিয়েই দাও। কানের কাছে ছুঁচ উঁচিয়ে বসে থাকলে স্বস্তি পাওয়া যায় না।"

ইনজেক্‌শন দিলেন রামচন্দ্র। তারপর বললেন—"ব্লাড প্রেসারটাও মাপা দরকার আজ।"

"মাপবে? মাপো।"

ব্লাডপ্রেসার মাপা হল।

"কত?"

"সিস্টোলিক দুশো দশ, ডায়াস্টোলিক একশো ষাট।"

"বিশেষ কমে নি তো তাহলে!"

"ওষুধটা খাচ্ছেন?"

"খাচ্ছি বইকি।"

"কমবে আস্তে আস্তে। বিশেষ কোন কষ্ট নেই তো আপনার?"

"আছে বইকি। রগের কাছটা সমানে টিপ টিপ করছে।"

পড়া বলতে না পারলে সেকালে গুরুমশাইরা ছাত্রের দিকে যেভাবে চেয়ে থাকতেন, তেমনি ভাবে মেঘসুন্দর চেয়ে রইলেন ডাক্তারের দিকে। ভাবটা—করছ তো অনেক কিছু কিন্তু

হচ্ছে না তো কিছুই। ডাক্তার মেঘসুন্দরের দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে চেয়ে নিজের যন্ত্রপাতি গোটাতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি গুটিয়ে চলে গেলেই পারতেন, কিন্তু অনিবার্য আর একটি প্রশ্ন তাঁকে করতে হল।

"আপনার হাঁটুর ব্যথাটা কেমন আছে?"

এর উত্তরে মেঘসুন্দর যা করে বসলেন, তা অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হলে তুঙ্গশ্রীর। হঠাৎ তিনি দু হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে কীর্তনের সুরে গান ধরে দিলেন একটা—

হল না, কিছু হল না, কিছু হল না—
ওহে, ডিগ্রী পুচ্ছধারী
কত করলে তো রকমারি
কত কপচালে কত তড়পালে
কিছু হল না, কিছু হল না।
বলিহারি বলিহা—রি
ওহে বিলাতী-পেখমধারী
পেটেন্টের মহাসমুদ্রে
কৌশলী কাণ্ডারী
কিছু হল না, কিছু হল না।

রামচন্দ্র এসবে অভ্যস্ত। সুতরাং চটলেন না। বরং গদ্‌গদ হবার ভান দেখালেন একটু।

"চমৎকার হয়েছে তো গানটা!"

"ভালো লাগল তোমার?"

"সুন্দর! আপনিই তৈরি করলেন নাকি?"

"না, আমি করব কেন। তোমার যে কম্পাউণ্ডার চটচটে মলম তৈরি করে সেই করে দিয়ে গেছে এসে।"

আর-একটু হেসে বিদায় নিলেন ডাক্তারবাবু।

মেঘসুন্দর তখন হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি তো বেশ লোক, ডাক্তারকে একবার জিগ্যেসও করলে না যে, কি ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে, কি ওষুধ দিচ্ছে! পাথরের মতো বসে রইলে বেশ!"

"জিগ্যেস করে লাভ কি বলুন! ওর মতের সঙ্গে যদি না মেলে তাহলে একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে শুধু। আপনি তো ওকে ছাড়বেন না।"

"তা বলে একবার জিগ্যেসও করবে না? ওই বাঁদরটার টেম্পারেচার নিচ্ছ তিন ঘণ্টা অন্তর এসে, আর তোমার কাকার খবরটা নিতে পার না একবার?" তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"উনি আবার হতে চান আমার উত্তরাধিকারী।"

"আমি হতে চাই না তো!"—বিস্মিত হিরণ্যগর্ভ বললেন।

"না হতে চাইলে খাবে কি, হাড়ির দুর্গতি হবে যে! এক-একটা আজগুবি খেয়ালে ব্যাঙ্কের টাকাগুলি তো উড়িয়ে দিচ্ছ সব।"

"আমি খরচ করেছি আমার রোজগার-করা টাকা। জমিদারির একটি পয়সা আমি খরচ করি না।"

"ওই যে তোমার মুরারিপুরের ইস্কুল, ওর খরচ তো তোমার জমিদারি থেকেই যায়।"

"প্রজাদের উপকারের জন্যে করা হয়েছে, জমিদারি থেকেই তাই ওর খরচটা দেওয়া হয়।"

"খাজনাও তো তেমন আদায় হয় না শুনতে পাই। যা খুশি কর।"

তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"এ রকম লোকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হল কি করে? ও কি মানুষ? জার্মানি থেকে ডাক্তারি পড়ে এল—কোথায় ভালো জায়গায় বসে প্র্যাক্টিস করবে—তা নয়, সাপ ব্যাং ইঁদুর বাঁদর এই সব নিয়ে বসে আছে। বেদে একটা।"

তুঙ্গশ্রীর মনে এমন বিবিধ বিচিত্রভাবের দ্বন্দ্ব চলছিল যে, সহসা কোনও উত্তর দিলেন না তিনি। হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন কেবল একটু। তাঁর এখানে আর বসে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না। নির্জনে গিয়ে নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবাব জন্যে সমস্ত মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোন্ অজুহাতে যে উঠে পড়বেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ একটা অভাবিত ঘটনা ঘটল। বাইরের বারান্দায় হিরণ্যগর্ভের বাঁদরটা চিৎকার করে উঠল।

"ওটার আবার কি হল?" উঠে পড়লেন হিরণ্যগর্ভ।

তুঙ্গশ্রীও উঠলেন।

"তোমরা চললে না কি? আলাপ শেষ হল না যে।"

"আমি আসছি এখুনি। বাঁদরটা চেঁচাচ্ছে কেন দেখে আসি।" তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি বসুন না।"

"চলুন, আমিও দেখে আসি একটু।"

উভয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের প্রস্থান-পথের দিকে আকুল নয়নে চেয়ে রইলেন মেঘসুন্দর। তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—"যেও না তোমরা। আর একটু বসে যাও। শ্রী রাগের আলাপটা শুনে যাও। বাঁদরের ডাকের চেয়ে ভাল জিনিস এটা।" সারাজীবনই তাঁর এই হচ্ছে। গানের আসর জমছে না কিছুতে। সমঝদারই নেই দেশে। পয়সা খরচ করে করে কত ওস্তাদ, কত বাইজী আনাচ্ছেন, কিন্তু তারা নিজের নিজের কেরামতি দেখাতেই ব্যস্ত। মেঘসুন্দরের আলাপ শোনবার আগ্রহ নেই কারও। জোর করে শোনাতে লজ্জা করে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ডাক্তার রামচন্দ্রকে মাঝে মাঝে ডেকে শোনান, সে তারিফও করে; কিন্তু তার মুখভাব দেখে মনে হয় না যে, সে রসিক সমঝদার; মনে হয় একটা বিড়ালকে যেন জোর করে গোলাপ ফুল শোঁকানো হচ্ছে।

হিরণ্যগর্ভ বেরিয়ে দেখলেন, তাঁর বাঁদরের খাঁচার সামনে অ্যালশেসিয়ান কুকুরটা থাবা গেড়ে বসে আছে। নিবিষ্টচিত্তে দেখছে বাঁদরটাকে ঘাড় হেঁট করে।

"দুষ্টু।"

নাম শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দুষ্টু। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তুঙ্গশ্রীর দিকেও তাকাল একবার। তারপর তাকিয়ে হঠাৎ উঠে এসে তুঙ্গশ্রীর কাপড়-চোপড় শুঁকলে ঘুরে ঘুরে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

"দুষ্টু, যাও, ভেতরে যাও।"

বাধ্য বালকের মতো চলে গেল দুষ্টু।

হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন—"বাঁদরটার ওপর ওর ভয়ানক হিংসে। এরকম পাজি একটা জানোয়ারকে এত তোয়াজ কেন করা হচ্ছে তা ওর বুদ্ধির অগম্য। মানুষই বুঝতে চায় না, ও তো একটা সামান্য কুকুর। কাকা, খরিণী, বাড়ির সবাই বাঁদরটার ওপর চটা। ওকে যে এত ভালো খাবার খেতে দি এটা কেউ বরদাস্ত করতে পারে না।"

"দেন কেন?" তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

"ওর ভাইটালিটি বাড়াবার জন্য। আমি দেখাতেই চাই যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারা অসুখের কারণ নয়, অসুখের কারণ ভাইটালিটির অভাব।"

বাঁদরটা মিটিমিটি চাইছিল হিরণ্যগর্ভের দিকে। যদিও এটা খাবার সময় নয়, তবু হিরণ্যগর্ভ পাশের বাক্স থেকে একটা পেয়ারা বার করে দিলেন তার হাতে। তারপর তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে বললেন—"চলুন, কাকা বোধহয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

"আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না হিরণবাবু। আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।"

"চলুন, তাই বলে আসা যাক কাকাকে।"

আবার ফিরে এলেন দুজনে। ফিরে এসে দেখলেন হীরা বাইজী এসে গেছেন। তবল্‌চীও এসেছেন। তানপুরাতে সুর দেওয়া হচ্ছে, তবল্‌চী তবলা বাঁধছেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে চোখ বুঝে বসে আছেন মেঘসুন্দর। দুটো বিভিন্ন যন্ত্রের সুর দুটো, বিভিন্ন হাতের তাড়নায় শূন্যে এসে মিলছে কেমন করে—এরই রহস্য প্রণিধান করছিলেন তিনি তন্ময় হয়। তুঙ্গশ্রী আর হিরণ্যগর্ভ কখন এসে ঢুকলেন টের পেলেন না তিনি। ঘরের সমস্ত মেঝে কার্পেট দিয়ে মোড়া থাকাতে পদশব্দও হল না তেমন। হীরা বাইজীকে দেখে চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী। এ কি, এ যে অলকা! তাঁর সহপাঠিনী ছিল স্কুলে। অলকাই হীরা বাইজী? অলকার গান বাজনার শখ ছিল বটে। অলকা তুঙ্গশ্রীর দিকে একটি পিছন ফিরে চোখ বুজে তানপুরায় ঝঙ্কার দিচ্ছিলেন, তুঙ্গশ্রীকে দেখতে পেলেন না তিনি। তুঙ্গশ্রী নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর কানের কাছে চুপি চুপি বললেন—"চলে যেতে চান তো এখুনি কাকাকে বলে সরে পড়ি চলুন। একবার আরম্ভ হয়ে গেলে ওঠা শক্ত হবে।"

"একটু শুনেই যাই।"—নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী।

"বেশ। আমি তাহলে ল্যাবরেটারি থেকে ঘুরে আসি একটু। আমার সেইটে ফুটছে, দেখে আসি কতদূর হল সেটা, কাকা যদি খোঁজ করে বলবেন।"

"আচ্ছা।"

সন্তর্পণে আবার বেরিয়ে গেলেন হিরণ্যগর্ভ।

তবলার সঙ্গে তানপুরার সুর মিশে গেল। মেঘসুন্দরের কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হয়ে গেল। তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল মুখে। স্নেহভরে চাইলেন তিনি বাইজীর দিকে। বাইজীও চোখ খুলে চেয়েছিলেন।

"কি গাইব আজ?"

"যা খুশি তোমার।"

দু-তিনবার গলা খাঁকারি দিয়ে তানপুরার উপর আঙুল চালাতে লাগলেন হীরা বাইজী ধীরে ধীরে। একটা গম্ভীর সুর মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল, মনে হতে লাগল একটা বিরাট কিছুর আবির্ভাব হচ্ছে যেন। সহসা হীরা বাইজী অভ্যর্থনা করলেন যেন সেই বিরাটকে—

তানা না দেরে দেরে তুম, দেরে দেরে তুম্
দ্রে দ্রে না দেরে দেরে না, দেরে না তা দিম্।
তা না দেরেনা দেরোনা দিম্
না দ্রে দ্রে তুম্ দ্রে দ্রে দিম্
তা দিম্ তা দারে দিম্, দেরে না তা দিম্।

তুঙ্গশ্রী যদিও কিছু বোঝেন না, এ গানে কথাও নেই তেমনি কিছু, তবু তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। অলকার কৃতিত্বে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এমন একটা পরিবেশ যে কেবলমাত্র সুর দিয়ে সৃষ্টি করা সম্ভব—এ ধারণা ইতিপূর্বে ছিল না তুঙ্গশ্রীর। গরিবের ঘরে মানুষ তিনি, সত্যিকার সঙ্গীতসভায় প্রবেশ করার সুযোগই পান নি জীবনে। এমন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন যে, পাশে কখন যে বিশু এসে বসেছে তা টেরই পান নি; হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলিষ্ঠ সুপুরুষ যুবকটিকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। বিশু ওরফে বিশ্বেশ্বর বিনোদিনীর নৃত্য-শিক্ষক। বিনোদিনীও এর মধ্যে কখন এসে যে মেঘসুন্দরের পাশে বসেছে তা টের পান নি তুঙ্গশ্রী। বেশ একটি চমৎকার শাড়ি আঁটসাঁট করে পরে এসেছে সে। চমৎকার মানিয়েছে। গান খুব জমে উঠেছে, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। মেঘসুন্দরের সামনে যে দরজাটা খোলা ছিল সেখানে দারোয়ানটা এসে দাঁড়াল সেলাম করে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন মেঘসুন্দর।

"হুজুর, এক বাবু আপ সে মিলনে চাহতহেঁ। কুছ জরুরি কাম হ্যায়।"

"এ আবার কি আপদ এসে জুটল! আচ্ছা বোলাও।"

কাবুলি-স্যাণ্ডাল-পরা এক ছোকরা এসে হাজির হল একটু পরেই। গায়ে খাকি হাফশার্ট। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। এসে মেঘসুন্দরের দিকে চেয়ে বিনা ভূমিকাতেই বলল সে—"আমি আপনার যুগলগঞ্জ মিল থেকে এসেছি।"

"কি চান?"

"আমাদের ইউনিয়নের আজ বিকেলে একটা মীটিং হয়েছে, তারই রেজলিউশনগুলোর কপি আপনার কাছে এনেছি।"

"ম্যানেজার মন্মথবাবুকে দিন গিয়ে।"

"আপনাকেই দিতে চাই আমরা।"

"বেশ দিন।"

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলেন মেঘসুন্দর। তারপর কাগজখানার দিকে চেয়ে বললেন—"কি আছে এতে?"

"পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

"তা তো পারব। তবু আপনার মুখ থেকেও শুনি—"

"আমাদের সাত দফা দাবি আছে, তা পূরণ করতে হবে। প্রথম, মাইনে অন্তত তিন গুণ করে দিতে হবে, দ্বিতীয়—"

"আপনি কি মিলে কাজ করেন?"

"আজ্ঞে না। আমি কলকাতা থেকে এসেছি।"

"ও!"—চোখের দৃষ্টি দপ করে জ্বলে উঠল মেঘসুন্দরের। আত্মসম্বরণ করে বললেন—"যাদের দুঃখ, কথাটা তাদের মুখ থেকেই শুনলে ভালো হতো না?"

"আমি তাদের মুখপাত্র হয়ে এসেছি। আপনার যা বলবার আমাকেই বলুন।"

কাগজটা খুলে মেঘসুন্দর বললেন—"এটা কি আল্‌টিমেটাম্?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ আল্‌টিমেটাম্ দেবার অর্থ বুঝতে পারছি না।"

"এরকম তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বাইজীর গান শুনতে শুনতে এর অর্থ ঠিক বুঝতে পারবেন না। যদি বুঝতে চান—"

কথা আর শেষ করতে পারলেন না ভদ্রলোক। পর-মুহূর্তেই 'গণপৎ সিং' বলে মেঘসুন্দর এমন একটা চিৎকার করে উঠলেন যে, হকচকিয়ে থেমে যেতে হলে তাঁকে। গণপৎ সিং নামক ভীমকায় সশস্ত্র দারোয়ানটি দাঁড়াল এসে দ্বারপ্রান্তে।

"কান পাকাড়কো গরদানিয়া দেকে ইস্‌কো নিকাল দো।"

"চলিয়ে বাবু।"—একটু ইতস্তত করে বললেন দারোয়ান।

"কান পাকাড়কে লে যাও"—পুনরায় তারস্বরে আদেশ দিলেন মেঘসুন্দর। গণপৎ সিং সম্ভবত কান ধরেই টান দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার অবসর দিলে না ছোকরা। গণপৎ সিং কাছে আসতেই ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল তাকে। ফলে গণপৎ সিংও উত্তেজিত হল। উত্তেজিত সিংহের কবলে মেষশাবকের যে দুর্দশা হয়, পরমুহূর্তেই ছোকরারও সেই দুর্দশা হল। কিল চড় লাথি মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল তাকে গণপৎ সিং।

"অসভ্য ভূত কোথাকার! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানে না—"

অস্ফুট কণ্ঠে কথা কটি উচ্চারণ করে অবনত মস্তকে বসে রইলেন খানিকক্ষণ মেঘসুন্দর। ধীরে ধীরে নিজের পক্ক কেশে হাত বুলোতে লাগলেন। মনে হল, কোনও এক অদৃশ্য গণপৎ সিং এসে তাঁকেও যেন ধর্ষণ করে গেছে। যখন মুখ তুললেন তখন সমস্ত মুখ বেদনাতুর। শিশুর হাত থেকে রঙিন খেলনা পড়ে ভেঙ্গে গেলে তার মুখভাব যেমন হয়, তাঁর মুখও তেমনি হয়ে গেছে যেন। ভাঙা খেলনাটার দিকে তবু হাত বাড়ালেন তিনি আবার। বাইজীর দিকে চেয়ে বললেন—"এমন জমাটি ইমনটা মাটি করে দিলে। আর জমবে কি? চেষ্টা কর তবু।"

আবার শুরু হয়ে গেল—"তা না দেরে দেরে তুম্—"

নিশ্চল পাথরের মতো বসেছিল তুঙ্গশ্রী। কিন্তু সেই পাথরের তলায় টকবগ করে ফুটেছিল নিরুদ্ধ লাভা-স্রোত। তাঁর কানে গান আর ঢুকছিল না। মেঘসুন্দরের বজ্রকণ্ঠের আদেশটাই বারংবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তাঁর কানের কাছে—কান পাকাড়কে গরদনিয়া দেখে ইস্‌কো নিকাল দো! অপমান করে মেরে দূর করে দিল! ক্রোধে অপমানে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল তাঁর। ছেলেটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেছেন বলে তো মনে পড়ল না তুঙ্গশ্রীর। তাঁদেরই পার্টির লোক কি? হওয়া অসম্ভব নয়। সকলকে তিনি তো চেনেন না। এ অঞ্চলে কেশববাবুর লোকেরাই তো কাজ করে। একটা ক্ষোভও ঘনিয়ে উঠল ধীরে ধীরে। তাঁর মনে হতে লাগল, আহা, এই কাজের ভারটাও যদি তাঁর উপরে থাকত তাহলে আজ দেখিয়ে দিতেন শ্রমিকের রক্ত শোষণ করার প্রায়শ্চিত্তটা কি করে করতে হয়। রিভল্‌বারের এক গুলিতে উড়িয়ে দিতেন তিনি ওই ঝুনো খুলিটা। স্পর্ধিত শির লুটিয়ে পড়ত রক্তাক্ত হয়ে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল রিভল্‌বারটা চুরি গেছে। হিরণ্যগর্ভের মুখটা মনে পড়ল। দ্বারের দিকে ফিরে

তাকালেন একবার। না, তিনি এখনও আসেন নি। ল্যাবরেটারির কাজে মশগুল হয়ে গেছেন হয়তো। সেই সাপটাকে মনে পড়ল—অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন খানিকক্ষণের জন্যে। এই খানিকক্ষণ কিন্তু অনন্তকাল মনে হল তাঁর কাছে। মনে হল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত খেই হারিয়ে অতি অস্পষ্ট একটা ভেলায় অকূল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছেন যেন, কোন্‌দিকে চলেছেন তার ঠিক নেই, যেটাকে দ্বীপ বলে মনে হয়েছিল সহসা সন্দেহ হচ্ছে—সেটা দ্বীপ নয়, কুণ্ডলীকৃত প্রকাণ্ড সরীসৃপ একটা ওত পেতে আছে, কাছে গেলেই গ্রাস করে ফেলবে। মেঘসুন্দরের ব্যবহারে তাঁর সমস্ত দেহে মনে আগুন ধরে উঠেছিল, এই পুঁজিবাদী অলস ধনীরাই যে দেশের দুর্দশার আসল কারণ, এর আর-একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে এর বিরুদ্ধেই যে সারাজীবন যুদ্ধ করে কাটাতে হবে—এ সঙ্কল্পটাকে পুনরায় মনে মনে দৃঢ় করে তুলছিলেন তিনি। কিন্তু সংশয়ের যে ক্ষুদ্র ফাটলটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছিল সেটার দিকে হঠাৎ চেয়ে তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। সহসা তাঁর মনে হল, সত্যিই তো, কেশব সামন্তর সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানেন তিনি! জেল থেকে বেরিয়ে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় কলকাতায় এসে যখন সকলের সহানুভতি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন ওই কেশব সামন্ত তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল বলে তিনি কৃতজ্ঞতায় এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর গুণাগুণ খুঁটিয়ে দেখবার অবসরই হয়নি। ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পেয়ে আরও মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। সাম্যবাদী শুনে, জমিদারের ছেলে হয়েও তিনি যে রাশিয়ান সাম্যবাদের স্বপক্ষে, একটা বিস্ময় উদ্রেক করেছিল তাঁর, অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন সহসা তাঁর মনে হচ্ছে, কেশব সামন্তর ভিতরের খবর, পারিবারিক খবর কিছুই তো তিনি জানেন না। তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, কিন্তু আসল লোকটার পরিচয় পেয়েছেন কি? গাঁজা চাষ করতে চান তিনি হিরণবাবুর জমিটা নিয়ে? তাই মিলটা ডিনামাইট নিয়ে উড়িয়ে দেবার প্রস্তাবে অত সাগ্রহে রাজী হয়েছিলেন? পূর্ববঙ্গে মিল করবার একটা স্কীম করেছিলেন বটে।—খানিকক্ষণের মধ্যে অনেক কথাই তাঁর মনের মধ্যে খেলে গেল। কেশব সামন্তকে ঘিরে তাঁর নবজাগ্রত যৌবনের গোপনে যে স্বপ্ন রচনা করে চলেছে, যে স্বপ্নকে আচারে ব্যবহারে আভাসে ইঙ্গিতে রঙিনতর করে তুলেছেন কেশব সামন্ত নিজে, তা কি স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যাবে শেষে! অতিশয় অযৌক্তিকভাবে তাঁর মন রুখে দাঁড়াল। সব মিথ্যা, এরা শত্রুপক্ষ, বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছে সব। কিন্তু মেঘসুন্দর তো জানেন না যে, তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে কেশব সামন্তর কোনও সম্পর্ক আছে। তিনি তাহলে শুধু শুধু মিথ্যার আশ্রয় নিতে যাবেন কেন? কিন্তু না, অযৌক্তিকভাবে বলে উঠল আমার তাঁর মন—মিথ্যা, এরা যা বলছে সব মিথ্যা...

হঠাৎ সমে এসে থেমে গেল গানটা। তুঙ্গশ্রী আত্মস্থ হলেন এবং ফিরে চাইলেন বাঈজীর দিকে। নূতন করে বিস্ময় জাগল আবার অলকাকে দেখে। ও কি এখন তাঁকে চিনতে পারবে?

"বাঃ, চমৎকার! বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবি হও।"—সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন মেঘসুন্দর। মেঘসুন্দরের প্রতি তুঙ্গশ্রীর সমস্ত চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কি করে লোকটার দম্ভ চূর্ণ করা যায়? কেশব সামন্তর সহায়তায় হয়তো পারা যেত, কিন্তু তিনি যদি—নিজের মনের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তুঙ্গশ্রী। এর মধ্যেই কেশব সামন্তকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন তিনি নিজেও। না, না, ভুল হচ্ছে।

"বিনুর নাচটা দেখবে নাকি আজ?"—মেঘসুন্দরের কথায় মন দেবার চেষ্টা করলেন তুঙ্গশ্রী।

"বেশ তো।" হেসে জবাব দিলেন বাইজী—"আমি সেতার বাজাই।"

"শুরু হয়ে যাক তাহলে; নূপুর এনেছিস? বিশু কোথা গেল?"

বিশু বিনু দুজনেই উঠে দাঁড়াল। প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন দুজনেই। নাচ শুরু হয়ে গেল। অপূর্ব নাচ। নূপুরের নিক্বণ, তবলার বোল সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে বিনোদিনী আর বিশ্বেশ্বরের সুললিত অঙ্গভঙ্গি যে সুরলোক সৃষ্টি করে তুলল তুঙ্গশ্রীও তাতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁর হৃদয় অঞ্জলি ভরে যেন সুধা পান করতে লাগল এই আনন্দ-প্রস্রবণ থেকে। মনে হল সারাজীবন অজ্ঞাতসারে যা তিনি সন্ধান করেছেন তা অপ্রত্যাশিতভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন এই তরুণ-তরুণীর যুগলনৃত্যের মধ্যে। সুরে তালে ছন্দে মূর্ছনায় জীবনকে তিনিও তো উপভোগ করতে চান প্রিয়তমের সঙ্গে, দানে ও গ্রহণে, আনন্দসৃষ্টি ও পরিবেশন করে। আদর্শ জীবনের এই তো রূপচ্ছবি। শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল মেঘসুন্দর। চোখের দৃষ্টি থেকে আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল তাঁর, হিল্লোলিত হচ্ছিল সর্বাঙ্গ। আনন্দের সাগরে সন্তরণ করে বেড়াচ্ছিলেন তিনি যেন। আবার কিন্তু রস-ভঙ্গ হল। পিছনের একটা দ্বার দিয়ে নিঃশব্দ চরণে শিখরিণী প্রবেশ করে মেঘসুন্দরের কানে কানে কি যেন বললে। বলতেই সমস্ত মুখটা বিরক্তিতে ভরে উঠল তাঁর।

"মন্মথ এখনই আবার যেতে চায়? কেন?"

"জগন্নাথপুরের সেই বাঁধটা নিয়ে দাঙ্গা হবার সম্ভাবনা আজ রাত্রে। কেশবাবুর লোকেরা বাঁধটা জোর করে কেটে দিতে চায় নাকি।"

"কেশব তো ভারি জ্বালালে দেখছি। আচ্ছা, মন্মথকে পাঠিয়ে দে এখানে।"

শিখরিণী চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করলেন অপর দিক দিয়ে। বাধা পড়াতে নাচ থেমে গিয়েছিল।

হীরা বাইজী বললে—"চমৎকার নাচতে শিখেছে আপনার নাতনী।"

"মাস্টারটি ভালো পাওয়া গেছে কিনা।"

হীরা বাইজী হাসিমুখে বিশ্বেশ্বরের দিকে চাইলেন।

"আপনি শিখেছিলেন কোথা?"

"কাশীতে। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, উদয়শঙ্করের কাছেও ছিলাম—"

"ও আমাদের এখানকারই ছেলে। ওর বাপ ছিল ছুতোর। আমাদের এ অঞ্চলে একটা যাত্রাপার্টি ছিল, তাতেই ওর নাচ দেখলাম একদিন। মনে হল বাঃ, বেশ নাচে তো, ওকে ভালো করে শেখালে বড় নাচিয়ে হবে। আমিই খরচ দিয়ে পাঠাই ওকে কাশীতে।"

"চমৎকার শিখেছেন।" খানিকক্ষণ নীরবতার পর হীরা বাইজী বললেন—"আমি আজ তাহলে উঠি এবার।"

"উঠবে? তা বেশ। মন্মথ আবার এক বখেড়া জুটিয়েছে—"

"আমিও যাই।"—বিশ্বেশ্বর বললে।

"বেশ। তুই তোর বাসা উঠিয়ে এনেছিস?"

"হ্যাঁ, আমি ওই আউট হাউসটারই এক ধারে আছি এখন।"

"বেশ। আপাতত ওখানেই থাক। তোর ঘর আমি করিয়ে দেব।"

বাইজী, তবল্‌চী, বিশ্বেশ্বর চলে গেল।

বিনোদিনীর দিকে চেয়ে মেঘসুন্দর বললেন—"আমার বসন্ত-কুসুমাকরটা নিয়ে এস তাহলে এবার।"

বিনোদিনীও চলে গেল।

হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আমরাও এবার উঠি, চলুন।"

মেঘসুন্দরের দিকে চেয়ে তারপর বললেন—"আমরাও এবার উঠি কাকু।"

"একটু বসে যাও। জগন্নাথপুরের বাঁধ নিয়ে মন্মথ কি আবার কাণ্ড বাধিয়েছে শুনে যাও সেটা। আঃ, আর পারা যায় না।"

"কি কাণ্ড?"

"কি জানি?"

পর মুহূর্তে মন্মথ এসে প্রবেশ কবলেন। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। পরিধানে ব্রিচেস, মিলিটারী কোট, মিলিটারী বুট। কাঁদে একটা ওয়াটার প্রুফ, হাতে বন্দুক।

"ও বাবা, তুমি যে একেবারে মিলিটারী বেশে এসে হাজির হলে!"

মন্মথ সিং স্বল্পভাষী লোক। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। কিছু না বলে তিনি পাশের চেয়ারটায় উপবেশন করলেন।

"কি হয়েছে বল দেখি?"

"কেশব সামন্ত তার সমস্ত জেলে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারা শুনলাম আজ জোর করে এসে বাঁধটা কেটে দেবে। বাধা দেবার জন্যে আমিও লোকজন ঠিক করে এসেছি। আমাকে নিজেও গিয়ে থাকতে হবে।"

"কেশব নিজে এসেছে?"

"না। বাইরে থেকে একটি মেয়ে এসেছে, শিডিউল্ড কাস্টের। বীরা তার নাম। কয়েকদিন থেকেই সে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জমিদারিতে। জেলেদের মনে এই ধারণা করিয়ে দিয়েছে যে, আমরা নাকি জেলেদের ব্যবসাটা নষ্ট করে দেবার জন্য বাঁধ কাটতে দিচ্ছি না। বাঁধ না কাটতে দিলে ওদের বিলে জল ঢুকবে না, মাছ হবে না, ওদের ব্যবসা নষ্ট হবে।"

"কিন্তু বাঁধ কাটলে আমাদের প্রজাদের হাজার হাজার বিঘে জমি ডুবে ফসল নষ্ট হবে যে!"

"তাতে ওদের কি? ওরা জোর করে বাঁধ কাটবে।"

"তাহলে উপায়?"

"জোর করে রুখতে হবে।"

"ভেতরে মেয়েমানুষ রয়েছে, শেষকালে আবার একটা ফ্যাসাদে না পড়ে যাও। তুমি কি বল হিরণ?"

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"রুখতে হবে জোর করে বা বুদ্ধি করে—যেমন করে হোক। তা ছাড়া উপায় কি?"

মন্মথ হিরণ্যগর্ভের দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি আসবে আমার সঙ্গে?"

"ঠিক এখনই তো যেতে পারছি না। জেল্‌ড্‌হাল চড়িয়েছি একটা, কয়েক ঘণ্টা পরে যেতে পারি।"

"বেশ যদি দরকার বুঝি তোমার কাছে হাতি পাঠাব।"

"আচ্ছা।"

"আমি তাহলে চলি।"

মন্মথ সিং চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেঘসুন্দরের চোখ দুটি হাস্যপ্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"জগৎ সিংহ আর ওসমানে লেগে গেল আবার। তুমি যদি তোমার ওই জমিটা ওকে দিতে হিরণ, তাহলে মিটমাট হয়ে যেত। খুব বুদ্ধিমানের কাজ হতো সেটা!"

"আপনিই বা শিখরিণীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেন না কেন, তাহলে তো কিছুই হতো না!"

"অন্য জাত যে। একজাত হলে কি আপত্তি করতুম?"

মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন হিরণ্যগর্ভ। জাতিভেদের কুসংস্কার নিয়ে কাকার সঙ্গে আর তর্ক করতে ইচ্ছা হল না তাঁর। বহুবার করেছেন, কোনও ফল হয় নি। মেঘসুন্দর তাঁর সেকেলে মতামত কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না। পারলে কেশব সামন্তর সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত না হয়ে মধুর হতো।

"আমরা তাহলে চলি।"

"এস।"

তুঙ্গশ্রী আর হিরণ্যগর্ভ উঠে চলে গেলেন। হিরণ্যগর্ভ বেরিয়ে আবার তাঁর বাঁদরের খাঁচাটার কাছে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। তুঙ্গশ্রী এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে একটি প্রশ্নই জাগছিল কেবল—বীরা? শিডিউল্‌ড কাস্টের মেয়ে? কই, কখনও এর নাম শুনি নি তো কেশববাবুর মুখে? কলকাতার মেয়ে কি?...

সবাই যখন চলে গেল, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন মেঘসুন্দর। অত্যন্ত অসহায়ের মতো বসে রইলেন। বার বার তিনি গড়ে তুলছেন, বার বার ভেঙে যাচ্ছে। নিজের আকাঙ্ক্ষিত লোকে কিছুতেই তাঁকে থাকতে দিচ্ছে না কেউ, বার বার সেখান থেকে টেনে নামিয়ে আনছে।... অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বেহালাটি আবার তুলে নিলেন তিনি। খানিকক্ষণ বাজিয়ে নিজের তৈরী একটি গান গুনগুন করে গাইতে লাগলেন বেহালার সঙ্গে—

এ কি মাটি এ দেশের যাহা গড়ি ভেঙে যায়,
যত গড়ি সযতনে কিছুতে থাকে না হায়।
তবুও জানি না কেন হৃদয়ে বাসনা হেন,
শতবার ভেঙে গেছে আবার গড়িতে চায়।
জীবনের বেলা-ভূমে বালু নিয়ে এ কি খেলা,
নামিছে আঁধার ওই শেষ হয়ে এল বেলা।
ছল ছল করে জল বায়ু বলে চল চল,
ভাঙা গড়া নিয়ে শুধু বসে থাকি অসহায়।

"দাদু!"

বিনোদিনী এসে দাঁড়াল—হাতে তার খল।

"আঃ, একদণ্ড কি স্বস্তি দিবি না তোরা আমাকে?"—আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর।

"বা রে, তুমিই তো আনতে বললে বসন্তকুসুমাকর।"

অভিমানে ফুলে উঠল বিনোদিনীর ঠোঁট দুটি।

"কই দে।"

খলটা তার হাত থেকে নিয়ে স্নায়ুস্নিগ্ধকর ওষুধটা চেটে চেটে খেতে লাগলেন মেঘসুন্দর।

তিন

বাগানটা পার হতে হতে হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"কাকুকে কেমন লাগল?"

"সাধারণ বড়লোকেরা যেমন হয় তেমনি।"

"তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাধারণ বড়লোক হওয়ার জন্যে যে শাস্তিটা উনি পাচ্ছেন সেটা চোখে পড়ল? টাকা ওঁর অনেক আছে, কিন্তু ওঁর দুঃখের অন্ত নেই। বেশি টাকা থাকার ফলে ব্যাধি জুটেছে অনেকগুলি—বাত, বহুমূত্র, হাই ব্লাডপ্রেসার। টাকার লোভে ডাক্তারও জুটেছে এমন, যার উদ্দেশ্য ওঁকে চিকিৎসা করা নয়—তুষ্ট রাখা। গালাগালি খেয়েও নড়বে না লোকটা, টাকার লোভে যখন তখন এসে পা চাটছে কুকুরের মতো। চিকিৎসা কিছু হচ্ছে না জেনেও উনি ওকে তাড়িয়ে দেবেন না, কারণ ওঁর পারিষদ দরকার একজন। সত্যিকার চিকিৎসা উনি সহ্যও করতে পারবেন না। রোগও সারছে না, টাকাও খরচ হচ্ছে। এ ছাড়াও খুঁটিনাটি নানারকম অশান্তি লেগেই আছে। দশবার ফোন আসছে কলকাতা থেকে। জমিদারিতে একটা না একটা হুজ্যুত লেগেই আছে। নানা ধরনের লোক এসে নানাফন্দি ঢুকিয়ে দিচ্ছে মাথায়—কি করে কোথায় টাকা খাটালে বেশি সুদ পাওয়া যাবে, আর সেই সব ফন্দিতে পড়ে উনি চিন্তার বোঝা বাড়িয়েই চলেছেন। অথচ আসলে উনি হচ্ছেন আর্টিস্ট, সত্যিকার সঙ্গীত-শিল্পী কিন্তু সেটা—"

হিরণ্যগর্ভের কথার মাঝখানেই তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন একটা। যদিও অবান্তর শোনাল, তবু না করে পারলেন না তিনি।

"আচ্ছা, কেশব সামন্তর সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের?"

"ওর সঙ্গে আমি একসঙ্গে ছেলেবেলায় পড়েছি স্কুলে। ওর তো এই অঞ্চলেই বাড়ি, আমাদের ঠিক পাশেই জমিদারি ওর। ওর বাবার সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্বও ছিল—আমাদের বাড়িতেই তো আড্ডা ছিল ওর।"

"তাহলে এখন এত শত্রুতা কেন?"

"তার অনেকগুলো কারণ আছে। আমার ওপর ছেলেবেলা থেকেই ওর হিংসে—ক্লাসে কখনও ফার্স্ট হতে পারত না বলে। স্কুলের সমস্ত মাস্টারকে একসঙ্গে প্রাইভেট টিউটর রেখেছিল তবু পারে নি। তারপর—। কিন্তু এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না, আপনি হয়তো ভাববেন, মিছিমিছি তার নামে নিন্দে করছি। আপনি হলেন তার বন্ধু একজন। তাছাড়া ওর কথা বলতে গেলেই এমন একটা কাজ করতে হবে, যা আমি করতে নারাজ।"

"কি সেটা?"

"নিজেদের প্রশংসা।"

কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করলেন দুজনে।

"আচ্ছা, শিখরিণীর সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল নাকি?"

"সম্বন্ধ ঠিক হয় নি। ও আগে তো আমাদের বাড়িতে আসত যেত, শিখরিণীকে ভালো লেগেছিল ওর খুব। বাবা মারা যাবার পর কাকার কাছে ও বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠায়। কিন্তু কাকা তাতে রাজী হন নি। তারপর থেকে ও আরও ক্ষেপে গেছে যেন. কিসে আমাদের অনিষ্ট হয় ক্রমাগত তারই চেষ্টা করছে।"

"কি রকম ধরনের চেষ্টা? জমিদারি নিয়ে খিটিমিটি?"

"জমিদারি নিয়ে খিটিমিটি নয় ঠিক। যে ধরনের চেষ্টার ফলে আপনি এসেছেন, বীরা দেবী বলে আর-একজন কে এসেছেন এখনি শুনলাম। জমিদারদের ধ্বংস কর, পুঁজিবাদীদের ধ্বংস কর, মুনাফাখোরেরা দেশের সর্বনাশ করছে—এই যে সব ধুয়ো উঠেছে আজকাল—এইগুলোর সুযোগ নিয়ে ও আমাদের বিপন্ন করবার চেষ্টা করছে। এখানে আমাদের সবাই চেনে, তাই বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। ওর নিজের জমিদারিতে নিজের দলের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছে যারা ওর ওপর চটা, যাবা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। ওর অনেক কুমতলব আমাদের কাছে ফাঁস করে দেয় তারা। এই যেমন আপনার আসাটা আগেই জানতে পেরেছিলাম আমি। আমাদের কিছু করতে না পেরে ও আরও চটে যাচ্ছে। বাইরে থেকে লোক আমদানি করছে।"

একটু বাঁকা হাসি হেসে তুঙ্গশ্রী বললেন—"কিন্তু এও তো হতে পারে যে, এটা ব্যক্তিগত রাগ নয়. মতবিরোধ। উনি ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরোধী. তাই আপনাদের সঙ্গে বিরোধ বাধছে। এটা তো ঠিক যে. উনি জমিদার হয়ে থাকতে চান না। ওঁর বক্তৃতা পড়েছেন নিশ্চয় কাগজে।"

"বক্তৃতা পড়ি নি. কিন্তু ইচ্ছে করলেও উনি বোধ হয় জমিদার হয়ে আর থাকতে পারবেন না। কারণ জমিদারি বাঁধা দিয়ে যে পরিমাণ টাকা ধার নিয়েছেন, তাতে জমিদারি আর বেশিদিন থাকবে না ওঁর হাতে। সুতরাং এখন জমিদারির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাতে অলাভ নেই ওঁর। তাছাড়া ভবিষ্যতে সব জমিদারই উঠে যাবে। এখন ওটাকে আঁকড়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। ওই জামিদারি থেকে যে কোনও উপায়ে হোক যতটা সম্ভব নগদ টাকা তুলে সরে পড়াই ভালো। কেশব করছেও তাই।"

"অত নগদ টাকা দিয়ে কি করবেন উনি?"

"তা তো জানি না।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করলেন দুজনে।

হঠাৎ তুঙ্গশ্রী আবার বলে উঠলেন—"কিন্তু যাই বলুন আপনি, আমি ওঁর যতটা দেখেছি তাতে আমার ধারণা যে, উনি খুব উঁচুদরের দেশপ্রেমিক একজন। আপনারা ক্যাপিটালিস্ট কিনা তাই—"

কথাটা বলে তাঁর নিজেরই মনে হল, তিনি যেন নিজের কাছে জবাবদিহি করছেন। তাঁর নিজের মনের সন্দিগ্ধ অংশটাকে স্তোক-বাক্যে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করছেন।

হিরণ্যগর্ভ হেসে উত্তর দিলেন—"আমি ক্যাপিটালিস্ট নই—সে কথা তো আগেই বলেছি আপনাকে। কিন্তু আপনাদের সঙ্গেও আমার মতের মিল নেই। জু মাত্রেই খারাপ—এ কথা মনে করে হিটলার যেমন ভুল করেছিল, মুসলমান মাত্রেই খারাপ—এ কথা মনে করে যেমন ভুল করেছেন অনেকে, আপনারাও তেমনি ভুল করছেন ক্যাপিটালিস্ট মাত্রেই খারাপ এই কথা ভেবে। কিন্তু এ কি করলাম আমরা—আপনি যে আমার বাড়িতে চলে এলেন, আপনার শোবার কথা যে ও-বাড়িতে। একা ফিরতে পারবেন? চলুন, আবার না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"এসেই পড়েছি যখন আপনার ল্যাবরেটারিটা দেখেই যাই না হয় আর একবার। জেল্‌ঢাল না কি করছেন বললেন, ব্যাপারটা কি?"—একটু হেসে ছদ্ম-কৌতূহল প্রকাশ করলেন তুঙ্গশ্রী। আসলে তাঁর উদ্দেশ্য কেশব সামন্ত সম্বন্ধে আর-একটু আলোচনা করা।

"জেল্‌ডহাল হচ্ছে নাইট্রোজেন এস্টিমেশন।"

"কি উদ্দেশ্যে করছেন?"

"তাহলে বক্তৃতা দিতে হয়। তা এখন আপনারও ভালো লাগবে না, আমারও না।"

ল্যাবরেটারির ভিতরে ঢুকেই প্রথমে একটা ঘর্ঘরধ্বনি শোনা গেল। হিরণ্যগর্ভ ঘাড় ফিরিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। তুঙ্গশ্রীও দেখতে পেয়েছিলেন। নরেন টেবিলের উপর পা তুলে চেয়ারে ঠেস দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

"নরেন—"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল নরেন। পা লেগে টেবিলের উপর দোয়াতটা উলটে পড়ল।

"আমার গ্রাফ হয়ে গেছে।"

"কই, দাও।"

গ্রাফের দিকে চেয়ে কিন্তু নরেনের বাক্যস্ফূর্তি হল না আর। দোয়াতের সমস্ত কালিটা গ্রাফের উপর পড়েছে।

"কি হল?"

"কালি পড়ে গেছে।"

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে দেখলেন। নরেনের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আজ অভদ্রা লেগেছে, কাল কোরো। যাও, আজ ঘুমোও গে যাও। তার আগে এক কাজ কর, এঁকে পৌঁছে দিয়ে এস। খাতাটা রেখে দাও আমার ড্রয়ারে।"

নরেন খাতাটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। তুঙ্গশ্রী হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, হিরণ্যগর্ভ তাঁর সঙ্গে এখন আর গল্প করতে রাজী নন।

"আপনি নরেনের সঙ্গে যান তাহলে, অনেক রাত হয়েছে।"

"আপনি এখন শোবেন বুঝি?"

"শোব। তবে শুয়ে শুয়ে পড়াশোনা করব একটু। ও হ্যাঁ, একটা কথা—আপনি কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছেন কি?"

"আপনি ছেড়ে দিলেই যেতে পারি।"

হিরণ্যগর্ভের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আমার কাজ তো হাঁসিল হয়ে গেছে, আর আপনাকে আটকে রেখে কি করব? তবে আপনি যদি থাকতে চান খুব খুশী হব আমি।"

"এসেছি যখন, দেখেই যাই এ অঞ্চলটা।"

"বেশ। কাল সকালে দেখা হবে তাহলে। এখানেই চা খান না কাল সকালে।" তারপর হেসে বললেন—"সাপটাকে অবশ্য আমি সামলে রাখব।"

"কিন্তু আপনি কাল সকালে থাকবেন কি? মন্মথবাবু যে বলে গেলেন, জগন্নাথপুরে যেতে হতে পারে।"

"ও, হ্যাঁ ঠিক তো। হাতি এলে যেতে হবে।"

এর পর-মুহূর্তেই তুঙ্গশ্রী যে অনুরোধটি তাঁকে করে বসলেন তার জন্যে হিরণ্যগর্ভ তো প্রস্তুত ছিলেনই না, তুঙ্গশ্রী নিজেও ছিলেন না। তাঁর অবচেতন মানসে অগোচরে যে বাসনাটা জেগেছিল, হঠাৎ সেটা বাঙ্ময় হয়ে ওঠাতে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি।

"আপনি যদি যান, আমাকেও নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে?"

"কোথা? জগন্নাথপুরে? সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে আপনার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? গুলিও চলতে পারে।"

"গুলিতে তত ভয় করি না।"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী।

"ও, আপনি টেররিস্ট ছিলেন—সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"আমার রিভল্‌বারটা ফেরত দেবেন না?"

"নিশ্চয় দেব। এখনই চাই?"

"না, কাল নিলেও চলবে।"

হিরণ্যগর্ভ ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভাবছিলেন।

"সত্যি আপনি যেতে চান?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে।"

"বেশ, চলুন।"

নরেন ফিরে এল পাশের ঘর থেকে।

হিরণ্যগর্ভ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার বাইকটা এখানে আছে?"

"আছে।"

"তুমি এঁকে পৌঁছে দিয়ে বোঁ করে মহাবীর জেলেকে একবার ডেকে নিয়ে এস তো।"

"আচ্ছা।"

"আপনি তাহলে যান এর সঙ্গে।"

হিরণ্যগর্ভ ঢুকে গেলেন নিজের ল্যাবরেটারির ভিতরে। নরেনের অনুগমন করে আবার সেই বাগানটা পার হতে লাগলেন তুঙ্গশ্রী। মিনিটখানেক নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী আর লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। অশোভন প্রশ্নটা করেই ফেললেন।

"আচ্ছা, হিরণবাবু লোক কেমন বলুন তো?"

"দেবতুল্য লোক। আমি এরকম লোক জীবনে কখনও দেখি নি।"

এর পর আর কোন প্রশ্ন করার দরকারই মনে হল না তুঙ্গশ্রীর। যে লোককে একটু আগে এত বকছিলেন হিরণ্যগর্ভ, তার মুখে এ কথা শোনার পর আর কোন সংশয় রইল না তাঁর। তিনি আশা করেছিলেন যে, এই ছোকরা অন্তত তাঁর বিরুদ্ধে বলবে কিছু। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেলেন, একটি ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে এগিয়ে আসছেন। নরেনকে দেখেই থেমে গেলেন তিনি।

"কে বাবা নরেন? বন্ধ করে বাড়ি চললে নাকি? আমার একটু দেরি হয়ে গেছে বাবা আজ। ফিরে যাব?"

"না, আপনি বসুন গিয়ে, আমি আসছি।"

বৃদ্ধ ল্যাবরেটারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন—"কোনও রুগী না কি?"

"না। উনি হচ্ছেন কেশববাবুর শ্বশুর। মাসোহারা নিতে এসেছেন।"

"কেশব সামন্তর? তাঁর বিয়ে হয়েছে নাকি? জানতাম না তো!"

"উনি স্ত্রীকে নেন না।"

"কেন?"

"তা আমি ঠিক জানি না। বড় কষ্টে সংসার চলে ওঁদের। হিরণদা মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেন। সেই টাকাতেই সংসার চলে।"

"হিরণবাবু টাকা দেন কেন?"

"ওঁর ছেলে, মানে—কেশববাবুর শালা, হিরণদার সঙ্গে পড়তেন। তিনি অবশ্য মারা গেছেন এখন।"

তুঙ্গশ্রী সমস্ত পথ আর একটিও কথা বললেন না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা আলোকিত কক্ষ দেখে নরেনকে বললেন—"আপনি যান। ওই ঘরটা তো?"

"না, ওটা নয়। ওটাতে তো হীরা বাইজী আছেন। আপনার ঘর কোন্‌টা কুঞ্জকে জিগ্যেস করতে হবে।"

বিশাল অট্টালিকার মধ্যে কোন্ কোণে যে তাঁর ঘরটা আছে তা ঠিক করা যত সহজ ভেবেছিলেন, দেখলেন তত সহজ নয়।

গেটের কাছেই কুঞ্জ দাঁড়িয়েছিল। সেই তুঙ্গশ্রীকে ভিতরে নিয়ে গেল।

"হীরা বাইজী ঠিক পাশেই আছেন না কি?"

"হ্যাঁ। এই বারান্দাটা দিয়ে ঘুরে গেলেই ওঁর ঘর।"

"ও।"

কুঞ্জ চলে গেল। তুঙ্গশ্রী চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি নেই। মাথার কাছে এক গ্লাশ জল পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া রয়েছে। সবাই যখন চলে গেল, নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ঘরের কপাটটা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে দিয়ে আবার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মাঝখানে। তারপর গিয়ে বিছানাটার ওপর বসলেন। নিজেকে অত্যন্ত হাল্কা মনে হতে লাগল। এতদিন অন্তরের মধ্যে যা কিছু সঞ্চিত ছিল, একটা ঝড়ে যেন সব

উড়ে চলে গেল। কি সঞ্চিত ছিল এতদিন? ক্ষুদ্র অহমিকার তুচ্ছ জঞ্জালের রাশি কেবল? ক্ষুদ্র? তুচ্ছ? স্বদেশের জন্য এতদিন ধরে যা ভেবেছেন, যা সহ্য করেছেন, কিছুই নয় সে সব? না, সে কথা কিছুতেই মানবেন না তিনি। কিছুতেই মানবেন না যে তাঁর এত ত্যাগ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিছুতেই মানবেন না যে ক্যাপিটালিজ্‌ম্ ভালো, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে পথে পথে যখন হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, তখন মুনাফাখোরেরা চাল জমা করে রেখেছে গুদোমে, পচিয়ে ফেলেছে তবু বার করে নি।... হঠাৎ মনে হল, হিরণ্যগর্ভ তো সে কথা স্বীকার করেছেন, তিনিও তো ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরোধী। তবে? সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল আবার। কিসের তবে? কেশব সামন্ত তাঁকে ঠকিয়েছে, নিদারুণ সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ। সমাজ তাঁকে ঠকিয়েছে, বিদেশী শাসনকর্তা তাঁকে ঠকিয়েছে, তাদের ক্রূর ক্লেদাক্ত হৃদয়হীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হয়ে তিনি যখন লুটিয়ে পড়েছেন তখন যে ব্যক্তি তাঁকে ধরে তুলেছিল, যাকে তিনি দেবতা বলে ভেবেছিলেন সেও তাঁকে ঠকিয়েছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আবার মনে হল, সত্যি কি ঠকিয়েছে? দেবতাটা তাঁর নিজেরই অচরিতার্থ কল্পনার সৃষ্টি নয় তো—তৃষ্ণার্ত মৃগ মরুভূমিতে ছুটতে ছুটতে মরীচিকা সৃষ্টি করে যেমন! কেশব সামন্ত এমন কিছুই করে নি বা বলে নি, যার উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করা চলে। সে টাকা খরচ করেছে, বুলি আউড়েছে, আর তো কিছুই করে নি! দেবত্ব অর্জনের জন্য ওই কি যথেষ্ট? তিনি জানেন, ওই যথেষ্ট নয়। তিনি—যিনি মাস্টারদার জীবন-কাহিনী শুনেছেন, আধুনিক যুগের বাদল চোদ্দ বছরের কিশোর টেগরার বীরত্ব-কাহিনীর মর্মন্তুদ মর্ম গ্রহণ করেছেন, দেখেছেন ধলঘাটের বৃদ্ধা অশিক্ষিতা সাবিত্রী দেবীকে, পুলিশের অত্যাচারে অর্থলোভ তুচ্ছ করেও যে সাবিত্রী দেবী নিজের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন, তিনি কি করে ভুললেন কেশব সামন্তের ভণ্ডামিতে! কি করে ভুললেন, চিন্তা করতে গিয়ে ভারি অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। ভুললেন, কারণ ভোলবার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে ছিলেন। প্রতি মানুষের মনের মধ্যে সে সত্তা মুগ্ধ হবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে, যাকে মুগ্ধ করতে না পারলে জীবনের কোন অর্থই থাকে না, তাঁর সেই অন্তরতম সত্তাকে এমন কিছু তিনি দিতে পারেন নি যা নিয়ে সে তন্ময় হয়ে থাকতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি করতে করতে তিনি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, বিচার করে দেখবার আর শক্তি ছিল না। শূন্য অন্তরের নিরবচ্ছিন্ন হাহাকারকে থামাবার জন্যে হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন তাকেই বেদীতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, বেদীতে বসবার তার যোগ্যতা আছে কি না যাচিয়ে দেখেন নি, দেখবার ধৈর্যই ছিল না মোটে। দিনের পর দিন সে কি একঘেয়ে জীবন! কলকাতা শহরের রাস্তায় জনস্রোত বয়ে চলেছে, কিন্তু কি একঘেয়ে জনতা—সেই ট্রাম ট্যাক্সি রিক্‌শ, দেওয়ালে দেওয়ালে সেই একঘেয়ে বিজ্ঞাপন, যে বাড়িগুলো প্রত্যহ দেখতে হয় সেইগুলোই আবার প্রত্যহ দেখা, গলির মোড়ে চেনা মুখগুলির সেই পৌনঃপুনিক আবির্ভাব, পাশের বাড়ির গ্রামোফোনে সেই একই রেকর্ড বাজানো, রেডিওতে নিয়মিতভাবে সেই একই ধরনের গান, বক্তৃতার সুনির্দিষ্ট পুনরাবৃত্তি, অজস্র ভিড় কিন্তু বৈচিত্র্যহীন, কমিউনিজ্‌ম্ ক্যাপিটালিজ্‌ম্ নিয়ে সেই একই ধরনের আলোচনা একই ধরনের লোকের সঙ্গে—যন্ত্রচালিতবৎ এরই মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি

দিনের পর দিন, অকৃতজ্ঞ সমাজের প্রতি একটা আক্রোশ নিয়ে, যক্ষ্মাগ্রস্ত ভাইয়ের বোঝা বহন করে। জেলের ভিতর আর জেলের বাইরে তেমন কোনও তফাতই অনুভব করতে পারছিলেন না—ঠিক সেই সময় এসেছিল কেশব সামন্ত তার উদ্দাম উৎসাহ আর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য নিয়ে, চোখের সামনে তুলে ধরেছিল আদর্শ-উজ্জ্বল কর্মপন্থা, আশ্রয় দিয়েছিল তাঁকে নিজের বাড়িতে, দূর করেছিল তাঁর প্রাত্যহিক অভাবের গ্লানি। না, বিচার করবার অবসর পান নি তিনি, স্বপ্নই রচনা করেছিলেন ওই লোকটিকে ঘিরে, অনেক স্বপ্ন।... হঠাৎ আবার সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি, কেশব সামন্ত তাঁকে ঠকিয়েছে। বীরা দেবী? কে মেয়েটি? নামও তো শোনেন নি কখনও। কেশব সামন্ত যে বিবাহিত তাও তো বলেন নি কোনদিন? স্ত্রীকে নেন না? কেন? নিজের পারিবারিক এসব ঘটনা তাঁকে বলেন নি বলে একটা ক্ষোভ ঘনিয়ে উঠল তাঁর মনে। পরক্ষণেই আবার মনে হল, কেনই বা তিনি বলবেন তাঁকে। কতদিনেরই বা পরিচয়? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। জুতোটা খুলে ফেললেন। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন—ওই যে জিনিসপত্র দিয়ে গেছে! নূতন সুটকেসটি পাশে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, সেইটেতেই তাঁর কাপড়-চোপড় গোছানো রয়েছে। ভাঙা সুটকেসটাও রয়েছে পাশে। তাঁর নিজের অগোচরেই একটা মৃদু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখে-মুখে। সুটকেসটা থেকে কাপড়-জামা বার করে বদলালেন। কাপড়-জামা ছেড়ে না শুলে ঘুমই হয় না। এর জন্যে জেলে কি অশান্তিই যে ভোগ করতে হয়েছে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু ঘুম এলো না। খাঁ-খাঁ করতে লাগল প্রাণের ভিতরটা। নিজেকে একটা শূন্যগর্ভ হাউইয়ের মতো মনে হতে লাগল; শেষ হয়ে গেছে যার ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিঃস্ফুরণ, অন্ধকারে মাধ্যাকর্ষণের টানে একা নামছে যে দ্রুতবেগে নিজের নিরুৎসব শূন্যতা নিয়ে। নিজেকে পূর্ণ করা যায় না আবার? কাজ? কাজ নিয়েই তো আছেন, যা আদর্শ কাজ বলে মনে করেন তাই তো করছেন, তবু মন ভরে না কেন? কেন তা বলতে পারবেন না। কিন্তু ভরছে না। সেই লেবার মীটিং, শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে ধনিকদের প্রতি সেই একঘেয়ে বিষোদগার, স্ট্রাইকের সেই অভ্যস্ত ঝামেলা—না, মন ভরে না। যে উন্মাদনা নিয়ে তিনি টেররিস্ট হয়েছিলেন, এতে তা যেন নেই। দেশের জন্যে যে কোনও মুহূর্তে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত আমি—এই সর্বত্যাগী নিষ্ঠা সমস্ত হৃদয়টা যে ভাবে পরিপূর্ণ করে রাখত, শ্রমিকদের স্ট্রাইকে উত্তেজিত করিয়ে ঠিক সে ভাবে পূর্ণ করে না। প্রথমটার মূল সুর ত্যাগ, দ্বিতীয়টার ভোগ। কিন্তু ভোগই বা করবেন না কেন তিনি? সকলেই ভোগ করছে, তিনিই বা করবেন না কেন? মেঘসুন্দরকে মনে পড়ল। দাম্ভিক লোকটা গরিবের রক্ত শোষণ করে ভোগের শিখরে বসে আছে। কিন্তু ঐশ্বর্য নিয়েও সুখী হয়েছে কি? দুঃখই পাচ্ছে বরং। ওর আনন্দ গানে, গান নিয়ে মেতে থাকতে চায় লোকটা। ঠিক বলেছেন হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভের মুখটা ভেসে উঠল মনের উপর। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি—দুষ্টুমিভরা। ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, আবার অতিশয় সজাগ হয়ে উঠছে পরমুহূর্তেই। উনিও মেতে আছেন নিজের রিসার্চ নিয়ে। তুঙ্গশ্রীর সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে উঠল ওই রকম কিছু একটা নিয়ে মেতে থাকবার জন্যে। কিন্তু সেই কিছুটা কি?.. হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন তাও বলা শক্ত, ঘুমটা যখন ভাঙল তখন একটা অপূর্ব সুরে সমস্ত অন্ধকার আকুল হয়ে উঠেছে যেন। তানপুরায় আলাপ করছে কে? পরক্ষণেই মনে পড়ল,

অলকা পাশেই আছে। গানের সভায় অলকা যখন তাঁকে চিনতে পারে নি, তখন তার কাছে আত্মপ্রকাশ করবার ইচ্ছে ছিল না তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু এখন এই নির্জন অন্ধকারে সুরের অদ্ভুত পরিবেশে সমস্ত সঙ্কোচ চলে গেল। নিশীথের নিবিড়তায় অতীত জীবনের বাল্য-সঙ্গিনীর কাছে যাবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠল মনটা বরং। মনে পড়ল একটা সরু অন্ধকার গলি দিয়ে অলকার বাড়ি যেতে হতো, মনে হল সেই সরু গলিটা যেন আজ অন্ধকার রাত্রির রূপে এসেছে।...বেড-সুইচ জ্বেলে উঠে পড়লেন, তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—জুতো পায়ে না দিয়েই। ঘর থেকে বেরিয়েই কিন্তু বিপদে পড়লেন তিনি। তাঁর ঘরের সামনে যে বারান্দাটা রয়েছে সেটা দক্ষিণে বামে দু দিকে ঘুরে গেছে, অথচ তানপুরার আলাপটা হচ্ছে তাঁর শয়নঘরের পিছন দিকে। দক্ষিণ, না বাম—কোন্ দিক দিয়ে গেলে অলকার ঘরে তিনি পৌঁছতে পারবেন তা ঠিক করতে পারলেন না সহসা। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন আন্দাজে। দক্ষিণ দিকে ঘুরেই কিন্তু বিশাল একটা বারান্দার সম্মুখীন হতে হল। দালানগোছের অনেকটা, বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো রয়েছে। দালানের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড সাদা-'ডোম' দিয়ে ঢাকা একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে, স্তিমিতালোক। সেই স্বল্পালোকে সদ্যনিদ্রোত্থিতা তুঙ্গশ্রীর চোখে অতি অদ্ভুত মনে হতে লাগল দালানটা। দু পাশে সারি সারি অয়েল-পেন্টিং ছবি।— বোধ হয় হিরণ্যগর্ভের পূর্বপুরুষদের ছবি, তার মাঝে মাঝে দুলছে বহু শাখা-সমন্বিত বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন, তার মাঝখান দিয়ে গভীর রাত্রে একা হেঁটে চলেছেন তিনি—রূপকথালোকের একটা রহস্য যেন ঘনিয়ে উঠেছে চারদিকে। এই অপূর্ব অনুভূতিটা এতই তন্ময় করে তুলেছিল তাঁকে যে, তানপুরার শব্দটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে যে আর শোনাই যাচ্ছিল না তা তিনি খেয়াল করলেন না। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ এগিয়ে যেতে লাগলেন। দালানের এক প্রান্তে সহসা কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। কোথা থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ আসছে! ঘাড় ফিরিয়ে যা দেখতে পেলেন, তা এতই অপ্রত্যাশিত যে সহসা যেন তাঁর হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার মতো হল। পাশেই যে ঘরটা ছিল তার ঈষৎ-খোলা জানলাটা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, একটা বিছানার উপর নৃত্য-শিক্ষক বিশু বসে আছে এবং মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বিনোদিনী তার কোলের ওপর মুখ রেখে কাঁদছে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ তুঙ্গশ্রী। তাপর ধীরে ধীরে সরে গেলেন জানালাটার কাছে। কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না তিনি। বিশু বলছে শুনতে পেলেন—"আমি কিছুতেই বলতে পারব না তোমার দাদুকে। সে অসম্ভব। কিছুতেই রাজী হবেন না উনি। কেশববাবু যখন শিখাদিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মনে নেই সে কি কাণ্ড!"

বিনোদিনী কোনও উত্তর দিল না। সমস্ত দেহটা তার কেঁপে কেঁপে উঠল কয়েকবার। বিশ্বেশ্বরের হাঁটু দুটো আরও জোরে চেপে ধরল সে শুধু। তুঙ্গশ্রী আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হয়তো চলে যেতেন, কিন্তু দালানের এক প্রান্তে সেই অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে দেখে আপাদমস্তক শিউরে উঠল তাঁর। নিমেষের মধ্যে তিনি তাদের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সৌভাগ্যক্রমে কপাটটা খোলা ছিল। খোলা না থাকলে তাঁকে ডাকতে হল। হতভম্ব বিশু দাঁড়িয়ে উঠল তাড়াতাড়ি, বিনোদিনীও একপাশে সরে দাঁড়াল। অপ্রত্যাশিত এই আবির্ভাবের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

তুঙ্গশ্রী বললেন—"যে বাইজী এসেছেন, তিনি কোন্ ঘরটায় থাকেন বলতে পারেন? তিনি আমার পরিচিত লোক, তাঁর কাছে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছি মনে হচ্ছে।"

"তিনি তো ও-দিকটায় থাকেন।" যতদূর সম্ভব সপ্রতিভভাবেই বিশু বললে,—"আপনি উলটো দিকে চলে এসেছেন।"

"ও। বাইরে আপনাদের কুকুরটা ঘোরাফেরা করছে দেখে তাড়াতাড়ি এই ঘরটায় ঢুকে পড়েছি।"

বিনু নতমস্তকে এক ধারে দাঁড়িয়েছিল। বিশু তার দিকে চেয়ে বললে—"বিনু, দুষ্টুকে তুমি সরিয়ে নিয়ে যাও।"

বিনু বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে দেখে, তার লজ্জাকাতর অপ্রতিভ মুখের পানে চেয়ে তুঙ্গশ্রীর মনে সহসা বিপর্যয় ঘটে গেল যেন। সন্ধ্যা থেকে মেঘসুন্দরের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ তাঁর মনের ভিতর নিরুপায় আক্রোশে কোণঠাসা সাপের মতো অবরুদ্ধ হয়ে গজরাচ্ছিল, মেঘসুন্দরের অত্যাচারের আর-একটা উদাহরণ দেখে সেটা হঠাৎ যেন ফণা ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি জীবন-মরণ পণ করে দাঁড়াবার যে প্রেরণা পেয়েছিলেন হঠাৎ এই সন্ত্রস্ত প্রণয়ীযুগলের ভীত-চকিত অসহায় অবস্থা দেখে সেই প্রেরণা পেলেন যেন। তাঁর মানসপটে অতীত যুগের একটা নিষ্ঠুর ছবি ফুটে উঠল—স্পর্ধিত ধনী নিরীহ ক্রীতদাসকে চাবকে চলেছে...Uncle Tom's Cabin-এর সাইমন লেগ্রি হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠল চোখের সামনে। তা ছাড়া এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের মধ্যে মেঘসুন্দরকে আঘাত করবারও একটা সুযোগ তিনি আবিষ্কার করলেন। মেঘসুন্দরকে আঘাত করবার একটা আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হয়ে উঠেছিল তাঁর মনে। গমোন্মুখ বিনুকে বাধা দিয়ে তাই তিনি বললেন—"শুনুন।" বিনু দাঁড়িয়ে পড়ল। তুঙ্গশ্রী এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—"দেখুন, এখনই হঠাৎ যে ব্যাপারটা আমি দেখে ফেলেছি, তার জন্যে আপনাদের কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। একটা কথা জেনে রাখুন, আমি আপনাদের স্বপক্ষে। দরকার হলে আপনাদের হয়ে লড়ব আমি।"

বিনু ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বিশু সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললে—"আপনি বসুন।"

"না, এখন বসব না আর। হীরা বাইজীর ঘরটা কোন্ দিকে আমাকে দেখিয়ে দিন বরং।"

"চলুন, বিনু কুকুরটাকে সরিয়ে নিয়ে যাক।"

"বিনুকে আপনি বিয়ে করতে চান সত্যিই?"

"হ্যাঁ।"

"মেঘসুন্দরবাবুকে সে কথা বলতে পারছেন না, এই তো? আমি যদি কথাটা বলি তাঁর কাছে।"

"তাতে কোনও লাভ হবে না। উনি আমাকে দূর করে দেবেন। তা ছাড়া ওঁর মনে এত বড় একটা আঘাত দিতেও কেমন যেন লাগে। উনি আমাকে মানুষ করেছেন। উনি টাকা দিয়ে আমাকে কাশীতে না পাঠালে আমি নাচ শিখতে পারতাম না, সামান্য ছুতোরই থেকে যেতাম। এ কথাটা আমার ভোলা উচিত কি?"

"ভোলা উচিত নয়।" মৃদু হেসে বললেন তুঙ্গশ্রী—"কিন্তু আর একটা কথাও ভোলা উচিত নয় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবার অজুহাতে জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্যকে অবহেলা করার নাম —কাপুরুষতা। বিনুকে যখন প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তখনই এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল আপনার।"

"বিনুকে আমি ইচ্ছে করে প্রশ্রয় দিই নি। ওর কাছে যাবার আমার সাহসও হতো না যদি মেঘুবাবু নিজে ডেকে আমাকে ওর নাচের মাস্টার করে না দিতেন। আমি আমার সমস্ত বিদ্যে বিনুর পায়ে ঢেলে দিয়েছি। বিনুর মতো মেয়েকে নাচ শেখাতে পেরে কৃতার্থ হয়ে গেছি আমি। এতদিন ধরে সমস্ত প্রাণ দিয়ে নিজের স্বপ্নকে ফুটিয়ে তুলেছি ওর মধ্যে—বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য ছিল না আমার। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম, মানে—"

অভিভূত হয়ে থেমে গেল বিশু। তুঙ্গশ্রীও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বঞ্চিত হৃদয়ও সঙ্গোপনে যেন সুধাপান করছিল।

তিনি বললেন—"আমি বুঝেছি। কিন্তু এটা ঠিক যে দু'দিক রক্ষা করা যাবে না। বিনুকে পেতে হলে ওঁকে আঘাত করতেই হবে।"

"কিন্তু ওঁর সাহায্য না পেলে বিনুকে নিয়ে আমি দাঁড়াব কোথা?"

"ব্যাপারটা হিরণবাবুকে বললে কেমন হয়?"

"হিরণদা ইচ্ছে করলে আমাদের আশ্রয় দিতে পারেন অবশ্য, কিন্তু তা উনি দেবেন না।"

"কেন?"

"দিলে মেঘুবাবুর বিষয় থেকে বঞ্চিত হবেন। মেঘুবাবুর ছেলেপিলে তো নেই, অথচ অগাধ সম্পত্তি। শিখুদি আর হিরণদা পাবেন সব। মন্মথবাবু মানে শিখুদির স্বামী, জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজার এখন যদিও। কিন্তু হিরণদারও অংশ আছে ও সম্পত্তিতে। কেউ কেউ একথাও বলে যে, মেঘুবাবু সব সম্পত্তি হিরণদাকে দিয়ে যাবেন বলেছেন যদি হিরণদা বিয়ে করেন। কিন্তু আমাদের যদি উনি আশ্রয় দেন, তাহলে মেঘুবাবু নির্ঘাত ওঁকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবেন। ভয়ানক একরোখা লোক কিনা। আমাদের জন্যে হিরণদা এত বড় সম্পত্তিটা কি ছেড়ে দিতে চাইবেন?"

তুঙ্গশ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"যদি চান, আপনি রাজী আছেন তো?"

"হিরণদা যদি আশ্রয় দেন তাহলে—। কিন্তু হিরণদাও একটু ইয়ে-গোছের লোক, মানে—এ কথাটা শুনে তিনি না আবার—"

"আপনি আমার ওপর নির্ভর করুন। এরা কেউ যদি আপনাদের আশ্রয় না দেয় তবু আশ্রয়ের ভাবনা হবে না আপনাদের, কারণ আপনারা দুজনেই যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তার মূল্য কম নয়। যাই হোক, আমি চেষ্টা করে দেখব কি করতে পারি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন চলুন, অলকার ঘরটা দেখিয়ে দিন আমাকে।"

"অলকা? ওঁর নাম তো হীরা বাইজী শুনেছি।"

"ওটা ওর পোশাকী নাম।"

দুজনে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে।

"এই দিক দিয়ে আসুন, এইটে শর্টকাট হবে।"

বিশু পাশের একটা ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র তানপুরার আওয়াজ শোনা গেল। ছোট একটা বারান্দা পার হয়েই হীরা বাইজীর ঘরও দেখা গেল। কপাটের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

"ওই ঘরটায় উনি আছেন। আমি এখন যাই তাহলে?"

"আচ্ছা।"

বিশু চলে গেল। তুঙ্গশ্রী অগ্রসর হলেন হীরা বাইজীর ঘরের দিকে। বন্ধ দ্বারটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তানপুরার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে গানও গাইছে অলকা। দুটো লাইন শুনতে পেলেন।

ঈশ্বর নাম তুম্‌হারি, বৃন্দারণ্যবিহারী, গিরিগোবর্ধনধারী....

তন্ময় হয়ে গাইছে, মনে হল, পুজো করছে সমস্ত অন্তর উজার করে দিয়ে। এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয় মনে হল তুঙ্গশ্রীর। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হিংসা হল। একটু সজোরে করাঘাত করলেন তিনি। বন্ধ হয়ে গেল গান। কপাট খুলে হীর বাইজী মুখ বাড়ালেন।

"কে?"

"আমাকে চিনতে পারিস?"

তুঙ্গশ্রী ঢুকলেন গিয়ে ঘরের ভিতর। অলকা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে।

তারপর বললে—"ঠিক পারছি না।"

"মিনতিকে ভুলে গেলি এর মধ্যেই?"

"আরে! মিনতি? বস বস। তারপর তুই এখানে হঠাৎ কোথায়?"

চিনতে পেরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অলকা। সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ অপ্রস্তুত এবং সন্দিগ্ধও হয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। মিনতি তার কতটুকু খবর জানে এবং জেনে থাকলে ও কি ধারণা করেছে তার সম্বন্ধে? হঠাৎ মনে হল তার।

"আমি আজকাল আর মিনতি নই, আমি এখন তুঙ্গশ্রী। যা দিনকাল পড়েছে এখন আর মিনতিতে চলে না, তুঙ্গশ্রী হতে হয়।"

"তোরই নাম তুঙ্গশ্রী? তোর বিষয়ে অনেক কথাই শুনেছি লো, কাগজে পড়েওছি। টেররিস্ট দলে ছিলি? জেল হয়েছিল তোরই?"

বাল্যসঙ্গিনীর মুখে তাঁর কীর্তিকলাপ একটু নূতন রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠল যেন। স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

"এখন কি করছিস তুই?"—অলকাই প্রশ্ন করল আবার।

"দেশের কাজ। যে লোভী ধনিক সম্প্রদায় নিজের সর্বগ্রাসী লোভে দেশের সর্বনাশ করছে, তাদের উচ্ছেদ করাই এখন আমার কাজ।"

"এখানে এসেছিস কি সূত্রে?"

"ওই সব ব্যাপার নিয়েই এসেছি।"

"মেঘসুন্দরবাবুর মিলে স্ট্রাইক না কি সব হচ্ছে, তাই নিয়েই না কি? সন্ধেবেলা আমি যখন ওখানে গান গাইছিলাম, তখন একটি ছেলেকে নিয়ে কি কাণ্ড! ওর মধ্যে তুইও আছিস নাকি?"

"প্রত্যক্ষভাবে ঠিক নেই, থাকলে আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দিতেন বোধ হয় মেঘসুন্দরবাবু, সে বিক্রমটুকু এখনও আছে ওঁদের।"

"তুই ছিলি না কি ওখানে, দেখতে পাই নি তো?"

"আমি পিছন দিকে একধারে বসেছিলাম। ওসব কথা থাক, তোর খবর বল শুনি।"

"খবর তো দেখতেই পাচ্ছিস। বাইজী হয়েছি।"

অলকার ম্লান হাসির সঙ্গে চোখে বিদ্যুৎও চকমক করে উঠল একটু।

"দুজনে এক কাজই করছি বোধ হয়, যদিও ধরনটা আলাদা। তোদের মিলের শ্রমিকরা বড়লোকের লাভে বখরা বসাতে চাইছে, আমরাও চাইছি। তফাতটা তোরা কেড়ে নিতে চাইছিস, আর আমাদের ওঁরা সেধে দিচ্ছেন।"

"অনেক টাকা রোজগার করছিস, না?" মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন তুঙ্গশ্রী।

"অনেক আর কোথা? মাসে তিন হাজারও তো হয় না।"

"মাসে তিন হাজারেরও চেয়েও বেশি চাস তুই?"

"কেন চাইব না?"

হীরা বাইজীর চোখের দৃষ্টিতে একটা সদর্প প্রশ্ন ফুটে উঠল।

তুঙ্গশ্রীও হাসিমুখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ তার দিকে। তারপর বললেন—"আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা আয় কত জানিস বছরে? মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা।"

"সে জেনে আমি কি করব? আমি নিজের আয় বাড়াতে পারি, পরের আয় বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই, অবসরও নেই।"

অতিশয় যুক্তিযুক্ত এ কথার উত্তরে তুঙ্গশ্রী কিছু বলতে পারলেন না সহসা। যেমন করে হোক, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করানো তাঁরও কাজ। অলকাও শ্রমিকা একজন। সে যদি কোনও কৌশলে তার আয় বৃদ্ধি করতে পেরে থাকে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্নও তাঁর মনে জাগল। শ্রমিকদের আয়েরও একটা সীমা থাকা উচিত কি? কোথায় যে সীমারেখা টানা উচিত? বেঁচে থাকবার দাবি প্রত্যেকেরই আছে, সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করতে হলে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা সকলেরই চাই অবশ্য। কিন্তু ওই সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মানদণ্ড সকলের সমান নয়। একজনের পক্ষে যা প্রয়োজন আর একজনের কাছে তা বিলাস। সঙ্গীতচর্চা করা মেঘসুন্দরের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, সোভিয়েট ব্যবস্থায় তো শুধু সঙ্গীত কেন, সব রকম শিল্পচর্চার সুন্দর ব্যবস্থা আছে—তবে সেটা শুধু কেবল মেঘসুন্দরের জন্যে নয়, সকলের জন্যে। অলকা কমিউনিজম সম্বন্ধে কিছু জানে কি? কে জানে? সরাসরি কিন্তু কথাটা জিগ্যেস করতে পারলেন না তিনি। হঠাৎ তিনি যেন অনুভব করলেন, ছেলেবেলায় তিনি যে অলকাকে চিনতেন এ সে নয়, এ অন্য ব্যক্তি। যদিও সংজ্ঞা অনুসারে এ-ও শ্রমিক একজন, কিন্তু এর শ্রমলব্ধ আয়ের পরিমাণ এত বেশি দাঁড়িয়েছে যে ওকে ধনিকের পর্যায়ে ফেললেই ঠিক হয়। একটা চিন্তার ঢেউ হঠাৎ তাঁর মনে খেলে গেল—শ্রমিকই শেষকালে ধনিকে পরিণত হয় না কি! কিন্তু এ চিন্তাকে তিনি আমল দিলেন না। বহুকাল পরে বাল্যসঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা হলে যে সুরে কথা কওয়া উচিত আবার সেই সুর ধরলেন একটু হেসে।

"অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভারি ভালো লাগছে সত্যি—"

"আমারও। আচ্ছা, তুই দেশেরই কাজ নিয়ে আছিস? বিয়ে-থা করিস নি?"

"বিয়ে করবার সময় পেলাম কখন? জেলে জেলেই তো কাটল সারা জীবনটা।"

"মা কোথা? দেশেই আছেন?"

"মা মারা গেছেন আমি যখন জেলে ছিলাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরে মারা গেছেন, অনাহারে। একটু ফ্যানও জোটে নি।"

"ছোট ভাইটি?"

"তার যক্ষ্মা হয়েছে, সে-ও বোধ হয় বাঁচবে না!"

দুজনেই নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তুঙ্গশ্রীর চোখ দুটো জ্বলছিল, অলকা শান্তভাবে বসেছিল চুপ করে।

"সবই ভগবানের ইচ্ছে।"—মৃদুকণ্ঠে বলল অলকা।

"ভগবানে বিশ্বাস করিস তুই?"

"করি।"

"তোর অবস্থা স্বচ্ছল বলেই করিস বোধ হয়। আমি করি না। ছেলেবেলা থেকে আমার ওপরে যে অবিচার, যে অত্যাচার চলছে তার দায়িত্ব আমি এক অনির্দিষ্ট ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অত্যাচারী পিশাচদের নির্মূল করতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।"

"শান্তি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলে পাবি না। সবাইকে ভালোবাসার চেষ্টা করলেই পাবি।"

"মুখে ওসব কথা বলা খুব সোজা, তুই যদি আমার অবস্থায় পড়তিস তাহলে—"

"পড়েছিলাম, তোর চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়েছিলাম, দারিদ্র্যের ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমিও হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, কেবল ভালোবাসার জোরেই উঠে আসতে পেরেছি সেখান থেকে।"

একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

অলকাও এর বেশি আর কিছু বললে না, চুপ করে গেল।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী বললেন—"তুই হয়তো পেয়েছিস, কিন্তু আমি ভালোবাসার মতো লোক পাই নি এখনও। সে রকম লোক চোখেই পড়ে নি আমার।"

"লোককেই যে ভালোবাসতে হবে, এমন মানে নেই। কাজকে ভালোবাসলেও সমান ফল হবে। কিন্তু সে ভালোবাসাটা নিষ্কাম আত্মসমর্পণ হওয়া চাই।"

"তুই মানুষকে ভালোবাসিস নি?"

"না, আমি ভালোবেসেছি গানকে। আর সেই ভালোবাসার পথেই আমি ভালোবাসতে পেরেছি গানের সমঝদারদের। আমার বিশ্ব আমার প্রেমের পথে এসেই ধরা দিয়েছে আমার কাছে। যে মেঘসুন্দরের ওপর তোর অত রাগ, আমি তাঁকে ভক্তি করি। অন্য কোনও কারণে নয়, তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে গুণী বলে।"

তুঙ্গশ্রী তর্কে অপটু নন।

বললেন—"কিন্তু যিনি তোমার গানের সমঝদার নন, তাঁর প্রতি তোমার রাগ হয় না?"

"সে সব লোক আমার ত্রিসীমানায় আসে না। তাদের সম্বন্ধে ঘৃণা বা ভালোবাসার কথাই ওঠে না। তারাও আমাকে চেনে না, আমিও তাদের চিনি না। চেনবার আগ্রহও নেই, কারণ প্রয়োজনও নেই। আমি যাদের পেয়েছি, তাদের নিয়েই আমার জগৎ পরিপূর্ণ। আর বেশি নিয়ে আমি কি করব?"

তুঙ্গশ্রীর হঠাৎ মনে হল, একে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা অনুচিত হবে। বাল্যসঙ্গিনীকে দেখবার কৌতূহল মিটে গেছে। তানপুরা পাশে নিয়ে নিশ্চিন্ত আয়ের নিঃসংশয় আরামের মধ্যে বসে যে মহিলাটি হিতকথার বাঁধা বুলি আওড়াচ্ছে, তার সঙ্গে তাঁর বাল্যসঙ্গিনীর চেহারাটি ছাড়া আর কিছুরই মিল নেই। সেই কলস্বরা স্বতঃস্ফূর্তপ্রাণা কিশোরীর লাস্যলীলা (যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ছেলেবেলায়) অবলুপ্ত হয়ে গেছে নিঃশেষে, রূপান্তরিত হয়ে যা হয়েছে তা এই ভারতবর্ষের মাটিতেই হওয়া সম্ভব—শাস্ত্রের বুলি-কপচানো যন্ত্র একটি—যে যন্ত্রের সহায়তায় মেঘসুন্দরেরা নিজেদের সঞ্চিত সম্পত্তি আগলাচ্ছেন বংশপরম্পরা ধরে। লোকে সুরের মোহে গানের কথাগুলোও বিশ্বাস করছে। ক্ষুধিত বঞ্চিতরাও ওই নিষ্কাম প্রেমের ভাঁওতায় ভুলে আত্মসমর্পণ করছে যুগের পর যুগ। নিজেদের কামনা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা মিটিয়ে এবং ভবিষ্যতে মেটাবার সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিষ্কাম প্রেমের ধর্ম আওড়ানো খুবই সহজ। উঠে পড়লেন তুঙ্গশ্রী।

"আমি উঠি ভাই এবার। কাল হয়তো কলকাতায় চলে যেতে হবে, তাই এত রাত্রে এসে তোকে বিরক্ত করে গেলাম। তুই যে হীরা বাইজী তা হঠাৎ আবিষ্কার করে তোর সঙ্গে দেখা না করে পারলাম না। সঙ্গীতচর্চায় বাধা দিয়ে গেলাম একটু—"

"আমিও খুব খুশি হয়েছি তোকে দেখে। আরও খুশি হতাম যদি তোকে সুখী দেখতাম। কলকাতায় তুই থাকিস কোথায়, ঠিকানাটা কি? আমিও তো যাই মাঝে মাঝে কলকাতায়।"

অলকা উঠে দাঁড়াল এবং একটি ছোট অ্যাটাচি খুলে একটি কলম আর খাতা বের করে দিল তুঙ্গশ্রীকে।

"এতে তোর ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যা। কলকাতায় গেলে দেখা করব।"

তুঙ্গশ্রী খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর লিখে দিলেন ঠিকানাটা।

"আচ্ছা, চলি ভাই তাহলে।"

"আচ্ছা।"

তুঙ্গশ্রী বেরিয়ে গেলেন। বিশুর ঘরে গিয়ে দেখলেন, বিশু জেগে আছে তখনও। বিশুই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এল তাঁর ঘরে। যেতে যেতে বিশুকে তিনি জিগ্যেস করলেন আবার—"আমি চেষ্টা করি তাহলে?"

"করুন। কিন্তু দেখুন, মেঘুবাবু যদি—"

"মেঘুবাবু যথাসাধ্য বাধা দেবেন, এটা ধরে নিয়েই চেষ্টা করতে হবে। আপনি যদি সম্মতি দেন, আমি আমার যথাসাধ্য করব।"

"হিরণদাকে বলবেন না কি? হিরণদা যদি আবার —"

তুঙ্গশ্রী ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলন বিশুর মুখের দিকে। আর্ত অসহায় মুখচ্ছবি। আবার মনে পড়ল সাইমন লেগ্রির কথা। সাইমন লেগ্রিরা ভোল বদলেছে। তাঁদের চোখ এড়াতে পারবে না কিন্তু।

"কাকে বলব, কি করব, তা আমার ওপর ছেড়ে দিন না। আপনাদের যাতে বিয়ে হয় সে চেষ্টা আমি প্রাণপণে করব। কিন্তু তার আগে আপনার সম্মতিটা চাই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বিশু বললে—"করুন।"

নিজের ঘরে পৌঁছে তুঙ্গশ্রী দেখলেন যে, আলোটা তিনি জ্বেলেই রেখে গিয়েছিলেন। কপাটটা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বিছানায় গিয়ে বসলেন। আজ সন্ধ্যা থেকে কি বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা সব ঘটছে একে একে! একটা ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। হাত একটু নাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে নূতন ছবি দেখা যাচ্ছে। হিরণ্যগর্ভ, শিখরিণী, মেঘসুন্দর, হীরা বাঈজি, বিশু, বিনু—প্রত্যেকটাই অদ্ভুত। নিজের মনেই একটু হেসে বেডসুইচটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজেই মনে হল, কেশব সামন্ত তাকে ঠকিয়েছে। চোখ খুললেন আবার। অন্ধকার। মনে হল, সারা জীবনই তো চোখের সামনে অন্ধকার যবনিকা প্রসারিত হয়ে আছে, আশা হয়েছিল, কেশব সামন্ত হয়তো সেটা সরিয়ে দেবে। কিন্তু কেন আশা করেছিলেন তিনি? মনে মনেও কেন ভিখারিণীর মতো ভিক্ষাপাত্র পেতে দাঁড়িয়েছিলেন? দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। মনের দুর্বলতার টুঁটি টিপে ধরলেন যেন সবলে। তারপর পাশ ফিরে আঁকড়ে ধরলেন পাশ-বালিশটাকে। টং টং করে ঘড়িতে দুটো বাজল। চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়....গুনে যেতে লাগলেন মনে মনে একাগ্র হয়ে।...ঘুমিয়েছিলেন কি? সমস্ত অন্ধকার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আবার তানপুরার সুরে। কাঁপছে যেন। মুগ্ধ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন...সহসা মনে হল, অলকা যা বললে তা কি সত্যি? সত্যিই কি ও গানকে ভালোবেসে আত্মসমর্পণ করেছে তার কাছে? ভৈরোঁ-আলাপ-নিরতা অলকাকে তিনি যদি এ সময় দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁর আর সন্দেহ থাকত না।

...হঠাৎ বাইরে পদশব্দ শুনে উঠে বসলেন তিনি বিছানায়। আলোটা জ্বাললেন। দ্বারে মৃদু করাঘাত করলে কে যেন।

"কে?"

"আমি কুঞ্জ।"

তুঙ্গশ্রী উঠে কপাট খুলে দিলেন।

"বাবু বললেন, হাতি এসেছে, আপনি যদি যেতে চান, চলুন এখনই।"

"চল।"

হঠাৎ তুঙ্গশ্রী আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়ে গেলেন যে, এই আহ্বানটির জন্যে মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন।

.....হিরণ্যগর্ভ তখনও ল্যাবরেটারির কাজ শেষ করে উঠতে পারেন নি। খানিকটা ঘি নিয়ে কি যেন করছিলেন। তুঙ্গশ্রীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার চেয়ে বললেন—"একটু বসুন, আমার হয়ে গেছে।"

তুঙ্গশ্রী বসলেন না, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"ঘি পরীক্ষা করছেন নাকি?"

"না। কয়েক রকম ঘি দিয়ে 'মিডিয়া' তৈরি করছি।"

"মিডিয়া কি?"

"মিডিয়মের প্লুরাল। সোজা ভাষায়, চাষের জমি তৈরি হচ্ছে ঘিয়ের সার দিয়ে।"

"জমি?"

"হ্যাঁ। ব্যাক্টিরিয়া বুনব।"

তুঙ্গশ্রী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন।

হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন—"ব্যাক্টিরিয়া শুনে আপনার গোলমাল লাগছে সম্ভবত। ব্যাক্টিরিয়ারাও উদ্ভিদ। গম যব ধান আম জাম কাঁঠাল গোলাপ চামেলী রজনীগন্ধা যেমন উদ্ভিদ, ব্যাক্টিরিয়াও তেমনি উদ্ভিদ। তফাৎ শুধু ওরা ছোট ক্ষুদ্রতম—"

হিরণ্যগর্ভ কয়েকটা টেস্ট টিউব তুলে তুলে দেখলেন, তারপর সেগুলির মুখে তুলো গুঁজে গুঁজে দিতে লাগলেন।

"বাস্, এইবার নরেন্দ্রনাথকে একটা স্লিপ লিখে চলুন যাই। ওই টেবিলে আমার একটা প্যাড আছে, দিন তো। লাল-নীল পেন্সিলটাও আছে ওখানে।"

পাশের টেবিল থেকে প্যাড আর পেন্সিল এনে দিলেন তুঙ্গশ্রী।

হিরণ্যগর্ভ বড় বড় অক্ষরে লিখলেন, "নরেন আমি চললাম। ফিরতে দেরি হতে পারে। আটটার মধ্যে যদি না ফিরি, তুমি এইগুলোকে অটোক্লেভ করে রেখো ১৫ পাউণ্ড প্রেসারে ১৫ মিনিট। গ্রাফটাও যেন ঠিক হয়ে থাকে।"

"আটটার মধ্যেই ফিরতে পারব কি আমরা?"—তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

"আশা তো করছি। দেখি। চলুন, এবার যাওয়া যাক। ও হ্যাঁ, একটা অনুরোধ যদি করি রাগ করবেন কি?"

"কি বলুন?"

"দাঙ্গা করার ইচ্ছে নেই। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তাহলে অনর্থক রক্তারক্তিটা হয় না। মন্মথ অবশ্য বাঁধের ওপর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, আমাকে ডেকেছে হতাহতদেব তদ্বির করবার জন্যে। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়ে যেতে লিখেছে। কিন্তু আপনি যদি এ সাহায্য করেন, দাঙ্গা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।"

"আমি? আমি কি সাহায্য করব?"

"ওই যে বীরা দেবী না কে এসেছে, তারই ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে একটু।"

হিরণ্যগর্ভর হাস্যদীপ্ত চোখ দুটি মিটমিট করতে লাগল।

"অভিনয়! মানে?"

"কিছুই নয়। ক্রুদ্ধ জেলের দল যখন ভৈরবপুরের মাঠ পেরিয়ে বাঁধের দিকে আসবে, তখন আপনি হাতির ওপর থেকে গ্রামোফোনের একটা চোঙে মুখ রেখে বলবেন—তোমরা বাঁধ কেটো না। মন্মথবাবু নিজেই বাঁধ কেটে দেবেন বলেছেন। তোমরা ফিরে যাও এখন।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা। বীরা দেবী বলে নিজেকে চালাব কি করে? তিনি হয়তো নিজেই থাকবেন ওদের সঙ্গে।"

"থাকবেন না, সে খবর পেয়েছি। আপনি চলে যাবার পর মহাবীর জেলেকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। মহাবীর ওই জেলেদের সব খবর রাখে। সে বললে— বীরা দেবী গেছেন

মহিমগঞ্জে আজ রাত্রে। সেখানে আজ বক্তৃতা করবেন তিনি অস্পৃশ্যদের কাছে। সুতরাং কোস্ট ইজ ক্লীয়ার। আপনি স্বচ্ছন্দে বীরা দেবী হয়ে যেতে পারেন।"

"আমাকে চিনতে পারবে না ওরা?"

"যাতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাকে কালো গগ্‌ল্‌স্ পরতে হবে, বীরা দেবী তাই পরেন শুনলাম; কালো শাড়িও যদি পরতে পারেন আরও ভালো হয়। মহাবীর ওঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল, সে বললে, উনি কালো গগলস্ আর কালো শাড়ি পরেছিলেন। ওঁর গায়ের রঙও আপনারই মতো ফরসা। আপনি থাকবেন হাতির ওপরে। তা ছাড়া তখন আলোও তেমন জোর থাকবে না, কাণ্ডটা হবে ভোরবেলায়।"

"কালো শাড়ি আর কালো গগল্‌স্ কোথা পাব?"

"সে সব ঠিক করে রেখেছি আমি। দাঁড়ান, এই স্লিপটা এই টেস্ট টিউবগুলোর ওপরে রেখে দি। এই নিন আপনার গগল্‌স্।"

একটা টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা গগল্‌স্ বার করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"কুঞ্জ!"

কুঞ্জ দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল।

"খরিণী যে শাড়িটা দিয়ে গেল সেটা কোথায় রাখলি? নিয়ে আয়। আর নরেনবাবু এলে তাঁকে এই চিঠিটা দেখতে বলিস, এখানেই রইল এটা।"

"আচ্ছা।"

কুঞ্জ শাড়ি আনতে চলে গেল।

তুঙ্গশ্রী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। ব্যাপারটার আকস্মিকতায় তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন।

"মাপ করবেন হিরণবাবু। ও আমি পারব না।"

"কি পারবেন না, অভিনয় করতে? কিছুই তো করতে হবে না আপনাকে!"

"অভিনয় করতে হয়তো পারব। কিন্তু জেলেদের ন্যায্য দাবির পথে বাধা-সৃষ্টি করতে হয়তো পারব না।"

"জেলেদের ন্যায্য দাবি মেটাব আমরা। সে ব্যবস্থার কথাও আমি ভেবে রেখেছি।"

"কি বলুন?"

"কেশবের যে বিলটা ওই জেলেরা বন্দোবস্ত নেয়, যে বিলে জল ঢোকাবার জন্যে ওরা বাঁধ কেটে হাজার হাজার বিঘের ফসল নষ্ট করে দিতে চাইছে, তার চেয়ে ঢের বড় বিল একটা আমার জমিদারিতে আছে, সে বিল আমি বন্দোবস্ত করি নি এখনও কাউকে। সেইটেই ওদের দিয়ে দেব ভেবেছি।"

"দিয়ে দেবেন? সেলামি নেবেন না?"

"কেশবকে ওরা যত দিত ততই নেব। তার বেশি নেব না। যদিও আমার বিল কেশবের বিলের চারগুণ, ইচ্ছে করলে চারগুণ সেলামিও পেতে পারি।"

"কিন্তু আপনি এ ক্ষতি স্বীকার করতে যাচ্ছেন কেন?"

"দাঙ্গা নিবারণ করার জন্যে। অনর্থক রক্তারক্তি করে কি হবে বলুন? তাছাড়া জমিদারি

প্রজাদেরই। এর থেকে যা আয় হয় তা ওদেরই জন্যে খরচ করি আমি। এ বছর ও-বিলটা আমার বন্দোবস্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছে ছিল, একজন ফিশারি এক্সপার্টকে আনিয়ে কি করলে মাছের উন্নতি হয় তারই ব্যবস্থা করার। এ বছর সেটা থাক না হয়।"

"এসব অভিনয়ের মধ্যে না গিয়ে বীরা দেবীকে এই খবরটা পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন।"

"সময় পেলাম কই? তিনি তো মহিমগঞ্জে চলে গেছেন। হুকুম দিয়ে গেছেন জোর করে বাঁধ কেটে দেবার জন্যে। মন্মথও ছাড়বার লোক নয়। বন্দুক-টন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে সে। আপনি ইচ্ছে করলে এখন এতগুলো প্রাণিহত্যা নিবরণ করতে পারেন। অন্য আর কোনও উপায় নেই।"

কুঞ্জকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল আবার। কালো সিল্কের একখানা শাড়ি নিয়ে এসেছে।

"ওই টেবিলের ওপর বাখ। হাতির খাওযা হল কি না দেখ। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, এখনই বেরুতে হবে।"

কুঞ্জ বেরিয়ে গেল। হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি তাহলে আর দেরি করবেন না। এই নিন গগল্‌স্‌, আপনার রিভল্‌বারটাও নিয়ে নিন, এই যে"—আর একটা ড্রয়ার খুলে অ্যাটাচিটা বার করে দিলেন—"ও-ঘরে গিয়ে শাড়িটা বদলে আসুন চট করে, আমি ততক্ষণ একটু কফি করে ফেলি।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে পাশের ঘরে চলে গেলেন হিরণ্যগর্ভ, যে ঘরে সন্ধ্যাবেলা তিনি খাবার খেয়েছিলেন।

তুঙ্গশ্রী বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে বইলেন খানিকক্ষণ। তারপর শাড়িটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। অবশ্য আর-একটা ঘরে।

চার

ভৈরবীর পালা শেষ হয়ে আরম্ভ হয়েছে তোড়ী। মেঘসুন্দর মেতে উঠেছেন একেবারে। যে পিনাকধারী নীলকণ্ঠ অহিভূষণ সন্ন্যাসীর প্রেমাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সতী, যাঁর স্বপ্ন রাজকন্যা উমাকে তপস্বিনী করেছিল, সেই চন্দ্রমৌলি ভৈরবের আরাধনা করছিলেন এতক্ষণ ভৈরবী রাগিণী সমস্ত অন্তরের আকূতি দিয়ে। গম্ভীর সুরের অন্তরালে মধুর মিনতির সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী হতাশার, নিশীথিনীর বিরহের সঙ্গে প্রভাতের প্রত্যাশার যে সূক্ষ্ম মিলন ঘটছিল, যে অরূপ প্রতি মুহূর্তেই অপরূপ হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় আবিষ্ট করে তুলেছিল কল্পনাকে, তার অবসান হয়েছে একটু আগে। মেঘসুন্দর তন্ময় হয়ে ভৈরবী রাগিণীর রূপটাই দেখছিলেন যেন চোখের সামনে। স্বচ্ছ স্ফটিকের গৃহে বসে সুনয়নী তন্বী আকুলকণ্ঠে গান গাইছে যে ভৈরবের উদ্দেশ্যে, কোথায় সে আত্মভোলা গঙ্গাধর! হাতের পদ্ম যে শুকিয়ে এল! আকাশের নীলে যার নীলকণ্ঠের আভাস, সূর্যালোকের প্রশান্ত মহিমায় যার প্রসন্নতার প্রতিচ্ছবি, অভ্রভেদী হিমালয়-শীর্ষ যার গম্ভীর রহস্যে বিরাট, কোথায় সে, কোথায় সে! দুই বাহু প্রসারিত করে লুটিয়ে পড়েছিল যেন ভৈরবী রাগিণী—আও আও পিয়তম তুহি। হঠাৎ থেমে গেল সব সুর, শেষ হয়ে গেল ভৈরবী, থেমে গেল হীরা বাইজী। আচ্ছন্ন হয়ে

বসেছিলেন মেঘসুন্দর। কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা সরে নি অনেকক্ষণ। ভৈরবী রাগিণীর করুণ মিনতি নীরব কুয়াশার মতো দিশেহারা করে রেখেছিল মেঘসুন্দরকে খানিকক্ষণ। তানপুরার ঝঙ্কারে আবার তাঁর ঘোর কেটে গেল। তিনি চোখ খুললেন। কুয়াশা কেটে গেল ধীরে ধীরে। আবির্ভূতা হলেন তোড়ী। তোড়ীও ভৈরবের পূজারিণী। কিন্তু এঁর পূজার ধরনটা একটু বিভিন্ন। ভৈরবীর ব্যর্থতা ইনি যেন বুঝতে পেরেছেন। কমলপাণি হয়ে মহাকালকে ভোলাবার চেষ্টা তাই ইনি করছেন না। উদাসীনকে ভোলাবার চেষ্টা করা মানে—নিজের আত্মসম্মান হানি করা, এ কথাটা যেন বুঝেছেন তোড়ী। তাই তিনি ভৈরবকে গান শোনাচ্ছেন না। কিন্তু সমস্ত অন্তর গানে ভরে উঠেছে যে! উদ্বেলিত অন্তরের আবেগ যে বুক ফেটে বেরুতে চাইছে শত ধারায়। তাই নির্জন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তন্বী তোড়ী অস্থির হয়ে, আর গান শোনাচ্ছেন—ভৈরবকে নয়, হরিণদের। তাঁর হিমকুন্দকান্তিতে তাঁর অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠেছে যেন মহাদেব-শিরোলগ্ন শিশু-শশীর রজতাভা, নয়নযুগলে সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছে শঙ্কাতুর প্রত্যাশা। নূতন রসে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে মেঘসুন্দরের মন। ...হঠাৎ ঝন ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। স্বপ্নের প্রাসাদ ঝনঝন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

"হ্যাঁ—হ্যালো, হ্যালো, শুনছি, বল—কি খবর? তাই না কি?"

যে খবর শুনলেন তাতে মুখটা শুকিয়ে গেল তাঁর। শেয়ার মার্কেটের দালাল অতিশয় দুঃসবাদ দিলে একটা, ফোনটা রেখে সোজা হয়ে বসতে গিয়ে হাঁটুর ব্যথাটা টন টন করে উঠল।

"উঃ, উঃ, গেলুম গেলুম—নারায়ণ—নারায়ণ।"

একটু সামলে পর-মুহূর্তেই চড়া গলায় হুকুম দিলেন।—"গণপৎ সিং, রামবাবুকো বোলাও।"

নেপথ্যে একটা 'জি হুজুর' শোনা গেল।

মেঘসুন্দর আপন মনেই গজগজ করতে লাগলেন—"কোথা থেকে একটা অঘা ডাক্তার জুটেছে এসে আমার ভাগ্যে! ইন্‌জেক্‌শন করে কাঁথা সেলাই করে ফেললে, হাঁটুর ব্যথাটা কমাতে পারলে না এখনও।"

পর-মুহূর্তেই কিন্তু হাঁটুর ব্যথা ভুলতে হল তাঁকে দ্বারপ্রান্তে শিখরিণীকে দেখে। মন্মথ এখনও ফেরে নি তিনি জানেন। শিখরিণীকে দেখে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন তিনি। মন্মথর এই গোঁয়ারতুমির জন্যে তিনিই যেন অপরাধী। তাঁকে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত করে নি, তিনি নিজেই মনে মনে এটা ঠিক করে নিয়েছেন। তাঁর জমিদারি রক্ষা করবার জন্যেই তো মন্মথ যখন-তখন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে বসে! তাঁর জন্যেই শিখরিণীকে এখানে থাকতে হয়, মন্মথকেও থাকতে হয়। মন্মথর কলকাতায় যা বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাতে রাজার হালে থাকতে পারে সে কলকাতায়। তাঁর জন্যেই এখানে থাকতে হয়েছে ওকে। হিরণটা তো বিয়ে-থা করলে না। মন্মথকে অবশ্য সর্বেসর্বা করে রেখেছেন তিনি। মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছে হয়, উইল করে বিষয়টা মন্মথকেই দিয়ে দেন। কিন্তু তখনই আবার মনে হয়, পূর্বপুরুষের বিষয় পরের ঘরে চলে যাবে। হিরণ যে রকম উড়ন-চণ্ডে, ওকেও দিতে ভয় করে। হয়তো বিষয়-আশায় বেচে বড় বড় চিড়িয়াখানা বানাতে শুরু করে দেবে।

কিন্তু তবু বংশধর তো। এখনও কিছু ঠিক করতে পারেন নি মেঘসুন্দর। শিখরিণীকে দেখে একটু বিপন্ন বোধ করলেন। মন্মথ এখনও ফিরল না—মাটি করলে দেখছি। তিনি জানেন, শিখরিণী কিছু বলবে না। ও কখনও কিছু বলে না, চুপটি করে থাকে। কিন্তু ওই চুপ করে থেকেই ও নিজের বক্তব্যটি বেশ প্রকাশ করে। কেশব যখন ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তখনও ও চুপ করে ছিল, বিয়ে করতে যখন দেওয়া হল না তখনও চুপ করে ছিল। কিন্তু ওই চুপ করে থাকার মধ্যেই মেঘসুন্দর এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেশবকে বিয়ে করতে ওর আপত্তি ছিল না। অথচ শিখরিণী মুখ ফুটে কিচ্ছু বলে নি। ওর কুচকুচে কালো চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত ভাষা আছে একটা। মন্মথকে বিয়ে করে ও অসুখী হয় নি, কিন্তু সুখীও হয় নি খুব। পত্নীর কর্তব্যনিষ্ঠাটা তাই ঠিক আস্ফালন করে না, একটু বেশি করে যেন আঁকড়ে থাকতে চায়। ত্রুটির কোনও ছিদ্র দিয়ে তার মনের কথাটা যেন প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন। মুখ ফুটে কিচ্ছু বলে না। কিন্তু মেঘসুন্দর বোঝেন সব। আর সেইজন্যে ভয়ও করেন ওকে।

শিখরিণী এসে বললে—"কাকু, তোমার খাবার কি এইখানেই আনব।"

"কি খাবার করেছিস?"

"তুমি তো ডিমের হালুয়া করতে বলেছিলে।"

"বেশ, নিয়ে আয়।"

শিখরিণী তবল্‌চীর দিকে চেয়ে বললে—"আপনার জন্যেও আনব তো?"

তবল্‌চী মুসলমান, আদাব করে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

হীরা বাইজী পুজো না করে খাবেন না—শিখরিণী তা জানে, সুতরাং তাঁকে আর জিজ্ঞাসা করলে না।

"বিনি পোড়ারমুখীকে সকাল থেকে দেখছি না। আমার হাঁটুতে সেঁক পড়ে নি এখনও।"

"বিনুর মাথা ধরেছে বলছে। ঘুমুচ্ছে শুয়ে। সেঁকের ব্যবস্থা করছি।"

শিখরিণী ভিতরে চলে গেল। মেঘসুন্দর মনে মনে বললেন—মন্মথর কথা জিগ্যেস পর্যন্ত করলে না একবার, অথচ—। হঠাৎ যেন অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। এই অনুক্ত অভিযোগের কি যে প্রতিকার করবেন, তা তাঁর মাথায় এল না। তা ছাড়া কি-ই বা করতে পারেন? মন্মথই বা ফিরছে না কেন এতক্ষণ? কাল সেই ছোকরা যে আলটিমেটাম্‌খানা দিয়ে গিয়েছিল, সেটা সামনেই পড়েছিল। সেটা তুলে চোখ বুলিয়ে দেখলেন একবার। যুগলগঞ্জের মিলেও স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণ! ক্যাণ্ডিল কোম্পানির শেয়ারের দাম এত পড়ে গেছে। ছি, ছি। আল্‌টিমেটাম্‌টা আর-একবার তুলে দেখলেন। মন্মথকে এসেই হয়তো আবার যুগলগঞ্জে ছুটতে হবে! শিখরিণী আবার চুপ করে থাকবে।....সর্বরঞ্জন এসে বিনীত-ভাবে নমস্কার করে বসল। সর্বরঞ্জন দে স্থানীয় উকিল একজন। খোশামোদ করবার জন্যে রোজ আসে একবার। গানের যদিও কিছু বোঝে না, সমঝদারের মতো মাথা নাড়ে তবু। লোকটাকে দেখে অকারণে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল তাঁর। বেঁটে লোকটা ছুং ছুং করে কেবলই আসে মকদ্দমার সন্ধানে। মানুষ নয় যেন, বেড়াল একটা। এসেই গলা বাড়িয়ে তবল্‌চীর সঙ্গে কি ফুসফুস গুজগুজ শুরু করে দিয়েছে! দামোদর ভট্‌চাজ্জিও হাজির হলেন এসে। ইনিও একজন

স্তাবক। গানের বিষয়ে নানা শ্লোক মুখস্থ করে এসে শোনাবে খালি, অথচ গানের 'গ' বোঝে না। মেঘসুন্দরের হঠাৎ মনে হল, সর্বরঞ্জনকে কাজে লাগালে মন্দ হয় না। এক ঢিলে দুটো পাখিই মারা হবে। লোকটাকে বিদায় করাও হবে. মন্মথর ধকলটাও কমবে হয়তো।

"সর্বরঞ্জন, একটা কাজ করতে পারবে?"

"তা আর পারব না কেন? হুজুরের কাজ করবার জন্যেই আমরা হাজির আছি।"—ফোড়ন কাটলেন দামোদর।

মেঘসুন্দরের ইচ্ছে হল, লোকটার গালে গিয়ে ঠাস করে চড় মারেন একটা। কিন্তু তা মারবার উপায় নেই। প্রথমত—ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়ত—অপরিহার্য প্রয়োজনও একটা। আশেপাশে দু-চারটে তাকিয়া থাকা যেমন প্রয়োজন, তাকিয়ার মতো দু-চারটে লোকও থাকা প্রয়োজন তেমনি। ওগুলোকে ঠেসে মেড়ে দুমড়ে অদ্ভুত ধরনের আরাম পাওয়া যায় একটা।

সর্বরঞ্জন উৎসুক নয়নে আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন।

"যুগলগঞ্জ মিলে আবার গোলমাল বেধেছে! কাল এক ছোঁড়া এসে আলটিমেটাম্ দিয়ে গেছে একটা। মন্মথ এখানে নেই, তুমি একবার খবরটা নাও দিকি!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও যাও"—বলে উঠলেন দামোদর।

দামোদরের দিকে চাপা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সর্বরঞ্জন বেরিয়ে গেলেন। এই রোদে আট মাইল বাইক করা কি সহজ কথা! কিন্তু যেতেই হবে, উপায় নেই।

দন্তসর্বস্ব একটা হাসি হেসে দামোদর তখন বললেন—"হুজুরের হাঁটুটা কেমন আছে? আমি একটা—"

কিন্তু কথা তিনি শেষ করলেন না, হীরা বাইজীকে কথা কইতে দেখে সসম্ভ্রমে থেমে গেলেন।

হীরা বাইজী বললেন—"কাল যে মেয়েটি এসেছিল, সেও একজন শ্রমিকনেতা শুনলাম।"

"নেত্রী বলুন।"—বিকশিতদন্ত দামোদর ব্যাকরণটা সংশোধন করে দিলেন।

"কে, তুঙ্গশ্রী?"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মেঘসুন্দর।

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি করে জানলে?"

"কাল রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। আমরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়তাম।"

"আমার মিলে স্ট্রাইক করাতে এসেছে?"

"তা বললে না ঠিক।"

"তা কি বলে কখনও?"— চোখ মটকে ফোড়ন দিলেন আবার দামোদর।

"কিন্তু ওকে তো হিরণের সঙ্গে দেখলুম। সে রকম কিছু হলে হিরণ কি—"

"ও, ছোট হুজুরের সঙ্গে ছিলেন! তাহলে ও কিছু নয়।"—অনাহূতভাবে আবার মন্তব্য করলেন দামোদর। তাঁর চোখে মুখে কিন্তু যে ভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল, তার সঙ্গে তাঁর মুখের কথার মিল আছে বলে মনে হল না। কথাটা বলে আড়চোখে ভিজে বেড়ালের মতো এমনভাবে চাইতে লাগলেন তিনি মেঘসুন্দরের দিকে, যার অর্থ—এত লোকের সামনে ছোট হুজুরের নিন্দাটা কেমন করে করি, কিন্তু হুজুরের তো কিছুই অবিদিত নেই।

দুজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে দ্বারপ্রান্তে শিখরিণী আবির্ভূত হল আবার। খাবার নিয়ে এসেছে। মেঘসুন্দর আর তবলচীর সামনে ছোট ছোট তেপায়ায় নিপুণভাবে খাবারগুলি পরিবেশন করিয়ে শিখরিণী দামোদরের দিকে তাকিয়ে বললে—"ভটচাজ্জি মশাই, আপনাকে কিছু ফল-টল এনে দি?"

"তা দিতে পার, দু-একটা মিষ্টি দিলেও আপত্তি নেই।"

মেঘসুন্দরের দিকে চেয়ে শিখরিণী বললে—"কাকু, তোমার সেঁকের জল চড়িয়েছি। তুমি খেয়ে নাও, তারপর সেঁক দিয়ে দিচ্ছি।"

শিখরিণী চলে গেল আবার ভিতরে।

"হুজুরের হাঁটুর ব্যথাটা সারে নি তাহলে এখনও! মাদুলিটা তাহলে বেঁধে দিয়েই যাই। যজ্ঞেশ্বরের হাঁটু এতেই সেরেছে।"

"মাদুলি! কিসের মাদুলি?"

"ও একটা তুক। সাত ছেলের মাকে দিয়ে একটু আদা, একটু বেলের ছাল, আর গোটা চারেক গোঁদো পোকা বাটিয়ে তামার মাদুলিতে সেটা পুরে ধারণ করলে অব্যর্থ ফল হয়। স্বচক্ষে দেখা আমার। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়ে জিগ্যেস করে দেখুন। বললে বিশ্বাস করবেন না, হাঁটুটি তার ওই তানপুরার তুম্বাটার মতো হয়েছিল। এই মাদুলিতেই সারল। হুজুরকে কয়েকদিন থেকেই দেব ভাবছি—আদা, বেলের ছাল, গোঁদো পোকা সব জোগাড় করে রেখেছিলাম, কিন্তু সাত ছেলের মা পাওয়াই মুশকিল কিনা, একটি মেয়ে থাকতে পাবে না, উপর্যুপরি সাতটি ছেলে হওয়া চাই, আটটি হলেও চলবে না। এ অঞ্চলে এক আছে আমাদের ওই সমরের মা, সে কাল এসেছিল, তাকে ধরে বাটিয়ে নিয়েছিলাম। ধারণ করে ফেলুন ওটা আজই—"

লাল সুতোয় লটকানো ঢোলকের মতো বেশ বড় একটা মাদুলি বার করে উঠে দাঁড়ালেন দামোদর।

"কোথা পরতে হবে ওটা?"

"গলায়।"

"মাথা খারাপ নাকি তোমার! গলায় আমি ওই ঢোল ঝুলিয়ে বসে থাকব?"

"বেশি নয়, মাত্র তিনটি দিন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথাটা রাখুন হুজুর।"

করজোড়ে করুণকণ্ঠে এমনভাবে কথাগুলি বললেন দামোদর যে, মেঘসুন্দর আর আপত্তি করতে পারলেন না।

"দাও, ছাড়বে না যখন।"

দামোদর ভক্তিভরে মাদুলিটিকে প্রণাম করে ঝুলিয়ে দিলেন সেটা মেঘসুন্দরের গলায়।

"কি যন্ত্রণা!"—অস্ফুটকণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন তিনি।

দামোদর ভট্‌চাজ্জিরও খাবার দিয়ে গেল একজন ভৃত্য। খেতে শুরু করলেন সবাই।

"মাদুলি পরে ডিম-টিম খাওয়া চলবে তো?"

"সব চলবে।"

আহারপর্ব নীরবেই সমাধা হল। তারপর শিখরিণী নিয়ে এল সেঁকের সরঞ্জাম।

"আতর দিয়েছিস তো ভালো করে? বাবা, যা গন্ধ ওষুধটার!"

"দিয়েছি।"

"আস্তে, উঃ, তুলে তুলে দে না, মেরে ফেলবি না কি? নাঃ, আতর দিয়েও গন্ধ যায় নি—"

শিখরিণী নীরবে সেঁক দেওয়া সমাপ্ত করে চলে গেল।

তারপরেই এলেন ডাক্তার রামচন্দ্র। আসবামাত্রই গান গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন মেঘসুন্দর—

সব বীরত্ব হল যে ভোঁতা
গন্ধমাদন আনলে বয়ে,
বিশল্যকরণী কোথা—
কোথায় বল, কমল ব্যথা!

"কম হয় নি?"—স্মিতমুখে প্রশ্ন করলেন হৃষ্টপুষ্ট রামচন্দ্র।

"বেড়েছে।"

"আপনি সেই ওষুধটা খান—"

"ও বাবা! ওতে লিভার খারাপ হয় শুনেছি। লিভার খারাপ করতে হলে হুইস্কির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিতে পারি, ও-ওষুধ খেতে যাব কোন্ দুঃখে?"

"স্যালিসিলেট মিকশ্চারটা খেয়েছিলেন কাল?"

"এক দাগ খেয়েছি। বড্ড বিশ্রী খেতে।"

"সিরাপ তো দিয়েছিলাম।"

"তাতে আরও খারাপ হয়েছে।"

"আচ্ছা আজ অন্য ওষুধ দিয়ে একটা পিল করে দি তাহলে?"

"আবার কি ওষুধ! লিভার-টিবার জখম করবে না তো আবার?"

"না। স্যালিসিলেট মিকশ্চারটাও খাবেন দু-একবার।"

"তুমি খাওগে যাও।"

"জিবটা দেখি।"

রামচন্দ্র রুটিন অনুযায়ী মেঘসুন্দরের নাড়ী, জিব, চোখ, পেট, বুক—সব পরীক্ষা করে দেখলেন। না দেখলে মেঘসুন্দর চটে যান মনে মনে। ব্লাডপ্রেসারও মাপলেন।

"কত এখন?"

মিছে কথা বললেন রামচন্দ্র—"আজ তো কম দেখছি। ১৭০ আর ১২০। অদ্ভুত কন্‌ষ্টিট্যুশন আপনার!"

খুশি হলেন মেঘসুন্দর। চোখে একটা ছদ্ম বিস্ময় প্রকাশ করে তবু প্রশ্ন করলেন—

"অদ্ভুতটা কি দেখলে?"

"এত বয়সে প্রত্যেকটি অর্গান একেবারে পার্‌ফেক্ট্। বাত বা ব্লাডপ্রেসার—ও কিছু নয়, আর ও বয়সে ইউরিনে সুগার অ্যালবুমেন থাকাটা স্বাভাবিক, চুলে পাক ধরাটা যেমন।"

এইটুকুই রামচন্দ্রের চাকরি। নানা ছলে এবং ছুতোয় মিথ্যা ভাষণটুকু একজন ডিগ্রীধারী ডাক্তারের মুখ থেকে শোনবার জন্যেই তাকে মাইনে দিয়ে রেখেছেন মেঘসুন্দর।

ডাক্তার-পর্ব সমাপ্ত হল। রামচন্দ্র চলে গেলেন। ফোন এল আবার। কলকাতার দালাল বলছে—আজকের দরেই শেয়ারগুলো বেচে দিলে দশ হাজার টাকার ওপর দিয়ে যাবে। কিন্তু ধরে রাখলে আরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কেমন যেন দুর্বল বোধ করতে লাগলেন মেঘসুন্দর, জবাব দিলেন—মন্মথর সঙ্গে পরামর্শ করে জানাবেন একটু পরে।

হীরা বাইজী তানপুরায় ধীরে ধীরে ঝঙ্কার দিলেন আবার। উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর। মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ ওয়েসিস দেখতে পেলেন যেন।

"কি ধরবেন?"—ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন দামোদর।

"তোড়ী।"

"ওঃ তোড়ী বল ভালো জিনিস। প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে এর—তোড়ীনাদাদিরামক্রী ভৈরবী বসন্তাশ্চ—"

"আমাকে একটুও কি রেহাই দেবে না তোমরা?" বোমার মতো ফেটে পড়লেন মেঘসুন্দর—"তোমার খোঁড়া ভাইপোটার চাকরি করে দেব দেব দেব, শপথ করছি। বাড়ি যাও তুমি।"

"যে আজ্ঞে।"—কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে দামোদর উঠে পড়লেন এবং সুট করে চলে গেলেন।

হীরা বাইজী তানপুরা রেখে দিয়ে সেতারে গত ধরলেন একখানা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। চোখ বুজে এল মেঘসুন্দরের। "বাঃ বাঃ, সাবাস সাবাস"—অস্ফুটকণ্ঠে বলতে লাগলেন।

কিন্তু আবার বাধা পড়ল। জুতো মশমশিয়ে রাইফেল কাঁধে মন্মথ এসে প্রবেশ করলেন।

"কি হল ওখানকার ব্যাপার?"— মেঘসুন্দর প্রশ্ন করলেন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে।

"দাঙ্গা হয় নি।"

"যাক, বাঁচা গেল। তোমাদের দেখে সরে পড়ল বুঝি সব?"

"না, ওরা কেউ আসেই নি?"

"আসেই নি? তাহলে কি ভুল খবর পেয়েছিলে না কি?"

"খবর ঠিকই পেয়েছিলাম। ওরা দাঙ্গা করবে বলে তৈরিও হয়েছিল জানি, কিন্তু কেন যে এল না—তা বুঝতে পারলাম না।"

"যাক, তাতে দুঃখের কিছু নেই। বাঁচা গেছে। যাও, তুমি বিশ্রাম করগে একটু।"

"হিরণদা কোথায় গেলেন, তাও বুঝতে পারলাম না। হিরণদাকে নেবার জন্যে হাতি পাঠিয়েছিলাম কাল রাত্রে। এখনও পর্যন্ত হাতিও ফেরে নি, হিরণদারও পাত্তা নেই। সকালে একটা লোক গিয়ে খবর দিয়ে এল—হিরণবাবু সবাইকে ফিরে আসতে বললেন, দাঙ্গা আর হবে না। তিনি হাতি নিয়ে বাইরে যাচ্ছেন, বিকেল নাগাদ ফিরবেন। কোথায় যাচ্ছেন, কি বৃত্তান্ত—কিছুই সে বলতে পারল না। এখানে এসে কুঞ্জর মুখে শুনলাম, খুব ভোরে হিরণদা বেরিয়েছেন সেই ভদ্রমহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে।"

"কোন ভদ্রমহিলাটিকে?"

"কাল যিনি এখানে বসেছিলেন, তুঙ্গশ্রী না কি নাম যেন।"

"তুঙ্গশ্রীকে নিয়ে হাতিতে করে বেরিয়েছে? বল কি! হীরা বাইজীর মুখে যা শুনছি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ ও! আমাদের যুগলগঞ্জ মিলে স্ট্রাইক করাবার চেষ্টায় এসেছে। কাল এক ডেঁপো ছোঁড়া এসে এই আল্‌টিমেটাম্‌ দিয়ে গেছে, এই দেখ।"

আল্‌টিমেটাম্‌খানা মন্মথর হাতে দিলেন। মন্মথ ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখতে লাগলেন।

"খেয়ে উঠেই আবার ছুটতে হবে সেখানে দেখছি।"

"সর্বরঞ্জনকে পাঠিয়েছি। সে ঘুরে আসুক। তুমি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করে নাও। হ্যাঁ, আর একটা বিষয়েও পরামর্শ করবার আছে। শেয়ারমার্কেটের ঘোষাল এখনই ফোন করেছিল। সেদিন ওই লোকটার পাল্লায় পড়ে অতগুলো টাকার শেয়ার কিনলাম, হু হু করে তার দর পড়ে যাচ্ছে নাকি! কেরোসিন তেল আর কয়লার দুর্ভিক্ষ দেখে ভেবেছিলুম যে, মোমবাতিব চাহিদাটা বুঝি বাড়বে, কিন্তু ঠিক উলটো হল দেখছি। তোমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখব না, চল, আমিই না হয় ভেতরে যাই। লাঠিটা দাও তো, হ্যাঁ, একটু ধর আমাকে—এই ঠিক হয়েছে—"

মন্মথর কাঁধে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেঘসুন্দর।

তারপর হীরা বাইজীর দিকে চেয়ে করুণ হেসে বললেন—"এ বেলা ঝামেলার পর ঝামেলা জুটছে ক্রমাগত, এ বেলা আর জমবে না। ও-বেলা চেষ্টা করা যাবে। যাও তুমি পুজো সেরে খাওয়া-দাওয়া করগে।"

মন্মথর কাঁধে হাত দিয়ে লাঠি ধরে ধরে অস্ফুট কাতরোক্তি করতে করতে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসব হলেন মেঘসুন্দর।

পাঁচ

তুঙ্গশ্রী-হিরণ্যগর্ভ সংবাদ নিম্নলিখিতরূপ।

ভোরবেলা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েই তুঙ্গশ্রী দেখলেন, বিরাট এক হাতির পিঠে বিরাট এক হাওদা। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ইতিপূর্বে তিনি কখনও হাতিতে চড়েন নি। চড়তে অবশ্য কষ্ট হল না কিছু। সিঁড়ি ছিল। হাওদাতে বিছানাও ছিল বেশ। তুঙ্গশ্রী চড়বার পর হিরণ্যগর্ভ চড়লেন। হাতি চলতে শুরু করল গজেন্দ্রগমনে। কিছুক্ষণ নীরবেই বসে বইলেন দুজনে। হিরণ্যগর্ভ প্রত্যাশা করছিলেন, দাঙ্গার কথাই তুলবেন বোধ হয় তুঙ্গশ্রী। কিন্তু তুঙ্গশ্রী হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করলেন একটা—"আচ্ছা, কেশববাবু তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন কেন বলতে পারেন।"

"সে বড় শোচনীয় ঘটনা। ওর স্ত্রীর লেপ্রসি হয়েছে।"

"লেপ্রসি? কুষ্ঠ?"

"হ্যাঁ।"

"স্ত্রীকে উনি খেতে পরতেও দেন না?"

"এত সব কথা কে বললে আপনাকে?"

"যেই বলুক, সত্যি কি না বলুন না।"

"দেয় না। ওর ধারণা, সুষমার বাবা— কেশবের স্ত্রীর নাম সুষমা—সব জেনেশুনে লেপ্রসির ব্যাপারটা লুকিয়ে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, আর এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমিও আছি।"

"আপনি আছেন—এ মনে করবার কারণ?"

"কারণ সম্বন্ধটা আমিই করেছিলাম।"

"আপনি করেছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ, করেছিলাম। শিখরিণীর সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হল না, তখন ও ক্ষেপে গেল যেন। সাত দিন খায় নি, স্নান করে নি, একটা ঘরে খিল দিয়ে চুপ করে পড়েছিল। তারপর হঠাৎ চলে গেল কলকাতা। শুনলাম, বিষয়ের খানিকটা বাঁধা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা ধার করেছে এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে। সেই টাকা নিয়ে ফিরে এল এখানে, এসে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করে দিলে দিনকতক নিজের জমিদারিতে। গেরস্ত-ঘরের ঝি-বউরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম, কেন করছে!"

"কেন?"—প্রশ্ন করলেন তুঙ্গশ্রী।

"লোকে ডিলিরিয়ামে প্রলাপ বকে যে জন্যে। ক্ষ্যাপা কুকুর সবাইকে কামড়ে বেড়ায় যে জন্যে।"

"তারপর?"

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আমার কিন্তু এসব কথা আপনাকে বলা ঠিক হচ্ছে না বোধ হয়, কি দরকার পরচর্চা করে? আপনি দেশের উন্নতির জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন—আপনাকে অন্য অনেক কথা বলবার আছে আমার। আমি যে সব স্কীম করেছি তার জন্যে লোক পাচ্ছি না ভালো, আপনারা অনেক রকম খোঁজ রাখেন, হয়তো ভালো লোক যোগাড়ও করে দিতে পারেন, তা ছাড়া আমার ওপর যে শত্রুতাবোধটা জেগেছে সেটাও হয়তো কেটে যাবে আমার কথা শুনলে। বুঝতে পারবেন যে, আসলে আমরা একজাতেরই লোক, একসঙ্গেই কাজ করা উচিত, শুধু শুধু—"

"কেশববাবুর কথাটা শেষ করে ফেলুন আগে। ওঁর স্বরূপটা আমার আগে জানা দরকার, কারণ ওঁকে কেন্দ্র করেই দেশের কাজ আরম্ভ করেছি আমি। ওঁর সঙ্গে মতেরও মিল আছে আমার—"

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"দেখুন, কারো স্বরূপ ঠিকমতো জানতে হলে তাকে ভালোবাসতে হবে। তার সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনা শুনলেই তার স্বরূপ জানা যাবে না। আমি তার বাল্যবন্ধু, তাকে ভালোবাসি, তাই তার সম্বন্ধে কতকগুলো কটু সংবাদ আপনাকে দিতে ইচ্ছে করছে না, আপনি হয়তো ভুল বুঝবেন তাকে।"

"আপনি তার স্বরূপটা চিনেছেন তো?"

"চিনেছি।"

"সেইটেই কি বলুন?"

"ও অসুস্থ।"

তুঙ্গশ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"বন্ধুকে অসুস্থ জেনেও তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলেন যে হঠাৎ?"

"ভেবেছিলাম, বিয়েটা হয়ে গেলে ও সুস্থ হবে। অবশ্য বিয়ের কথা আমার মনেই হতো না, যদি না কেশব সুষমাকে চিঠি লিখে বসত। সুষমার বাবা নবীনবাবু কেশবদেরই স্বজাতি।

সুষমা মেয়েটি রূপসী, কিন্তু গরিব বলে বিয়ে হচ্ছিল না। তাকে কেশব একদিন এক কুৎসিত প্রস্তাব করে চিঠি লিখে বসল। এতেই বুঝতে পারছেন, ওর মাথা কতটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নবীনবাবু আমাদের প্রজা, তিনি কাঁদতে কাঁদতে এবং কাঁপতে কাঁপতে চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির হলেন।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে হেসে বললেন—"এতক্ষণে আমার স্বভাবের একটু আঁচ পেয়েছেন আশা করি। কৌশল করে কাজ হাঁসিল করতে পারলে হাঙ্গামার মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না। আমি ভাবলাম, ঢিলটা যদি ঠিক লেগে যায় একসঙ্গে তিনটি পাখি মরবে—কেলেঙ্কারি নিবারণ হবে, দরিদ্র নবীনবাবুর কন্যাদায় উদ্ধার হবে, কেশবের মাথাও ঠিক হয়ে যাবে। নিজেই গিয়ে কেশবকে বললাম। সে রাজী হয়ে গেল। দিনকতক ভালো রইল, কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, মেয়েটার হল লেপ্রসি। কে কেশবের মাথায় ঢুকিয়ে দিলে যে, আমিই ষড়যন্ত্র করে নাকি ওকে ওই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মেয়েটা গছিয়ে দিয়েছি—বাস্, আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। তারপর থেকে সেই যে কলকাতা চলে গেছে—আর ফেরে নি।"

আবার খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ।

তারপর বললেন—"ওর মতো ও-রকম সাহসী প্রাণবন্ত লোক খুব কম দেখেছি। শক্তি আর উৎসাহ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। কিন্তু একটি দোষেই ওর সর্বনাশ হয়ে গেছে, ভয়ঙ্কর দাম্ভিক, ইংরেজীতে যাকে বলে—Passionately vainglorious"

আবার খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললেন—"আমার মনে হয়, শিখরিণীর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হতো তাহলে এসব কিছুই হতো না। কাকুর গোঁয়ারতুমির জন্যেই এই সর্বনাশটা হয়েছে। এ যুগে যে ও-সব গোঁড়ামি অচল তা তিনি বুঝলেন না।"

এ সুযোগ তুঙ্গশ্রী ত্যাগ করলেন না।

"আর একটা সর্বনাশও হবার যোগাড় হয়েছে কিন্তু—"

"কি?"

বিশু আর বিনুর কাহিনীটি তখন বললেন তিনি।

হিরণ্যগর্ভ বিস্মিত হলেন। বললেন—"আমি ওই রকম কিছু একটা আশঙ্কা করছিলাম। কিন্তু কাকুকে কিছু বলবার জো নেই, উনি একেবারে পাক্কা অটোক্র্যাট একটি।"

"আমি কিন্তু আশ্বাস দিয়ে এসেছি ওদের।"

"ও!"—হিরণ্যগর্ভের চোখে বিস্মিত কৌতুক চিকমিক করতে লাগল একটা। ক্ষণকাল তুঙ্গশ্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—"আপনার প্ল্যানটা কি শুনি?"

"প্ল্যান কিছুই করি নি। প্ল্যান আপনাকেই করতে হবে।"

"আমার ওপর নির্ভর করে আপনি আশ্বাস দিয়ে এলেন? বেশ তো! আমি যদি প্ল্যান না করতেই পারি?"

"বাঃ, তা কি হয়, করতেই হবে।"

এই দাবির মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠল যে, তা তুঙ্গশ্রীর নিজের কাছেই অশোভন ঠেকল একটু।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"কোনও রকম কৌশল করে এ কাজ

করা যাবে না। জোর করে করতে হবে। মুশকিল হয়েছে, বিনুকে কাকাই মানুষ করেছেন কি না! ভয়ানক আঘাত পাবেন।"

"যে কোন সংস্কার করতে গেলে কতকগুলো লোক আঘাত পাবেই। তা বলে কি চুপ করে থাকতে হবে?"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে রইলেন। শেষরাত্রের আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত নীরবতা ঘনিয়ে এল একটা। তিক্তকণ্ঠে তুঙ্গশ্রী সহসা বলে উঠলেন—"আপনারা—যাঁরা ভারতীয় আদর্শবাদী তাঁরা—আসল কাজের বেলায় পিছিয়ে পড়েন। কাকাকে আঘাত দিতে হবে শুনেই আপনার নিশ্চয় রামায়ণের রামের কথা মনে পড়ছে।"

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"রামায়ণে শুধু রামও নেই, ভরতও আছে, পরশুরামও আছে। রামের চরিত্রটাই বা আপনার খারাপ লাগছে কেন? যে প্রিন্সিপ্‌ল্‌ অর্থাৎ সত্য রক্ষা করার জন্যে আপনি আমাকে কাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলেছেন, রাম তো সেই সত্য রক্ষা করার জন্যেই রাজ্যত্যাগ করেছিলেন, পত্নীত্যাগ করেছিলেন!"

"কিন্তু রামের ওই প্রিন্সিপ্‌ল্‌ কি আজকাল চলবে, না, চলা উচিত?"

"কেন উচিত নয় তা তো বুঝি না। ওর রাজ্যত্যাগের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে সে সম্বন্ধে আশা করি কোনও সন্দেহ নেই আপনার। পত্নীত্যাগের মধ্যে যে মহত্ত্বটা আছে তা বুঝতে হলে সেকালের সমাজবিধি জানতে হয়। সেকালে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন আইনকর্তা, ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল—সেই আইন মানা এবং অপরকে মানানো। সীতা যে ভাবে রাবণের গৃহে ছিলেন, সে ভাবে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক থাকলে স্বতই তাকে সমাজ পরিত্যাগ করত। ওই ছিল আইন। সে আইন বদলাবার ক্ষমতা রামেরও ছিল না। রাম সীতাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যখন কানাঘুষো উঠল যে—রাম নিজের বেলায় আইন মানছেন না, তখন রাম ভেবে দেখলেন যে, তাঁর নিজের বা সীতার ব্যক্তিগত দুঃখ যত বড়ই হোক, রাজা হিসেবে তাঁকে আইন মানতেই হবে। তিনি সীতাকে যে কত ভালোবাসতেন—এ কথা মনে রাখলে তাঁর মহত্ত্বটা বুঝতে পারবেন। সমাজে থাকতে গেলে সমাজে প্রচলিত আইন মানতেই হবে। এই আইন মানার মধ্যেই যে কত বড় প্রচণ্ড পৌরুষ আছে তা যুদ্ধক্ষেত্রে বুঝতে পারা যায়, প্রাণ তুচ্ছ করে গুলির মুখে এগিয়ে যেতে হয় যখন কেবল আইনের খাতিরে।"

"কিন্তু পত্নীত্যাগের ও-রকম আইনটা কি ঠিক?—আমার এইটেই প্রশ্ন।"

"আপনি আমি প্রশ্ন করতে পারি, কিন্তু রামের সে রকম প্রশ্ন করবারও অধিকার ছিল না। পত্নীত্যাগ তো আজকালও করছে লোকে। যে ইয়োরোপের আদর্শে আপনারা আত্মহারা, তাদের পত্নীত্যাগের আইনই কি নিখুঁত? তবু সবাই মানছে। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডকে আইন মেনে সিংহাসন ত্যাগ করতে হল। উনি যদি সেকালে জন্মাতেন, ওঁকেও হয়তো পত্নীত্যাগই করতে হতো। কারণ তখন নিয়ম ছিল পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। সমাজের যার যেটুকু কর্তব্য, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তা সকলকে করতেই হবে। আজকাল লোকে দশটা পাঁচটা আপিস করে যেমন। এইবার কিন্তু আমাকে নেমে পড়তে হবে। আমরা ভৈরবপুর মাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছি।"

"নেমে পড়বেন? কেন?"

"আমাকে হয়তো ওরা চিনে ফেলবে। আপনি একাই যান না। আপনি শুধু বসে থাকবেন। যা বলবার রহমনই বলবে, ওকে আমি সব শিখিয়ে দিয়েছি।"

মাহুত রহমন ঘাড় ফিরিয়ে বললে—"হ্যাঁ, মাইজী, আপ চুপসে বৈঠে থাকেন। যে বলবার হামি বলে দিব।"

রহমান বহুকালের প্রাচীন মাহুত। প্রায় মেঘসুন্দরের সমবয়সী।

"আপনি নেমে কোথায় যাবেন?"—জিগ্যেস করলেন তুঙ্গশ্রী।

"আমি আকাশ-বিহারে যাচ্ছি। আপনি কাজটা সেরেই চলে আসুন সেইখানেই।"

"আকাশ-বিহার মানে?"

"ওই যে, দেখুন না।"

তুঙ্গশ্রী এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা টাওয়ারের মতো রয়েছে।

"কি ওটা?"

"আকাশ-বিহার। এলেই বুঝতে পারবেন। এইখানে হাতিটা বসাও রহমন, অত দূর আর যেতে হবে না। আমি এটুকু হেঁটেই চলে যাব।"

বিপুলকায় মাতঙ্গ যখন মাহুতের আদেশে বসছিল, তখন তুঙ্গশ্রী হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়লেন হিরণ্যগর্ভের গায়ে। অপ্রতিভ ভাবটা সামলে নিতে অবশ্য দেরি হল না তাঁর। সোজা হয়ে বসে হিরণ্যগর্ভকে বললেন—"বিশু-বিনুর কথাটা ভাবুন কিন্তু একটু।" এমনভাবে বললেন যেন কিছুই হয় নি।

"আচ্ছা।"—নামতে নামতে উত্তর দিলেন হিরণ্যগর্ভ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভৈরবপুরের মাঠে এসে পড়লেন তুঙ্গশ্রী। প্রত্যাশিত জনতাও দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কোদাল কাঁধে করে এগিয়ে আসছে সব। হঠাৎ হাতির উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল রহমান গ্রামোফোনের চোং মুখে লাগিয়ে—"এই, রোককে— "

উর্ধ্বমুখ হয়ে থেমে গেল সবাই।

"বীরা দেবী আজ বাঁধ কাটনে মনা কর্ রহি হ্যাঁয়। ফয়সালা হো গিয়া। তুমি সব ঘর যাও।"

তুঙ্গশ্রীও হাত নেড়ে তাদের ফিরে যেতে বললেন।

তারা উর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর 'জয় বীরা দেবী কি জয়' বলে ফিরে গেল।

আকাশ-বিহারের ঠিক নীচেই হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষা করছিলেন। তুঙ্গশ্রী হাতি থেকে নামামাত্রই তিনি রহমনকে বললেন—"রহমন, তুমি একটা কাউকে দিয়ে মন্মথবাবুর কাছে খবর পাঠিয়ে দাও যে, দাঙ্গা হবে না বলে আমরা আর গেলাম না। হাতিটা রাখো। এখনই মুরারিপুর যাব।"

"বহুত খুব।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আসুন, ওপরে ওঠা যাক।"

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দুজনে ওপরে উঠতে লাগলেন।

"এ ব্যাপারটা কি?"

"কিছুই নয়, উঁচু টাওয়ার একটা—সাত তলা উঁচু—প্রত্যেক তলায় একটি করে ঘর আছে। সাততলার ওপর রেলিং দিয়ে ঘেরা খোলা ছাদ। বাস্, আর কিছু নেই। লটারিতে একবার হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে যাই। সেই টাকা দিয়ে এটা করিয়েছিলাম।"

"কী হয় এটাতে? এমনি পড়ে থাকে।"

"আমি মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার জন্যে পালিয়ে আসি এখানে। একটা ছোটখাটো টেলিস্কোপও আছে আমার, সেইটে দিয়ে মাঝে মাঝে জ্যোতিষ-চর্চাও করি। আমার মুরারিপুর স্কুলের ছেলেরাও মাঝে মাঝে আসে এখানে। রাত্রে থাকে, টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখে। তাদের উৎসাহ যদি দেখেন একবার—"

চারতলা পর্যন্ত উঠে হাঁপিয়ে পড়লেন তুঙ্গশ্রী।

"এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লেন! আচ্ছা, বসুন, এই ঘরটায় ঢুকে বিশ্রাম করে নেওয়া যাক একটু। এ ঘরটায় চৌকি-টৌকি আছে বোধ হয় একখানা।"

চৌকি ছিল। তুঙ্গশ্রী কিন্তু বসলেন না। ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগলেন। ঘরটা প্রকাণ্ড এবং সম্পূর্ণ গোল। চতুর্দিকে জানলা। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দুটি জানলার মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের ছবি। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন তুঙ্গশ্রী। সিঁড়িতে পদশব্দ শুনে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঘাড় ফেরালেন তিনি হিরণ্যগর্ভের দিকে।

"মাস্টার মশাই আসছেন বোধ হয়। উনিই আকাশ-বিহারের ইন্-চার্জ। আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করে এখানেই আছেন। তিনকুলে কেউ নেই—"

দ্বারপ্রান্তে দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লা-পরিহিত একটি পুরুষ এসে দাঁড়ালেন। হাতে একগোছা ঘেঁটুফুল। মাথার চুল পাকা, বাবরির আকারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। গোঁফ-দাড়িও পাকা। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা। হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন।

"অনেক দিন আস নি। তোমার স্কুলের ছেলেদের খবর পাঠাব ভাবছিলাম। শনি আজকাল সন্ধের একটু পরেই দেখা যাচ্ছে বেশ। মঙ্গলও। দুজনেই সিংহ রাশিতে এসেছেন।"

"আমি এঁকে মুরারিপুর স্কুলে নিয়ে যাব এখনি, তখন বলে আসব তাদের।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে মাস্টার মশাই বললেন—"এঁকে আগে তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না!"

"না, ইনি আর কখনও আসেন নি।"

"তোমাদের স্কুলের গৃহস্থালীতে লক্ষ্মীর প্রয়োজন একটি। মায়েদের কাছে না শিখলে শিক্ষাটা ছেলেদের ঠিক মনের ভেতর প্রবেশ করে না। শিক্ষা ব্যাপারে এঁর ঝোঁক আছে বুঝি?"

"আছে কি না ঠিক বোঝা যায় নি এখনও।"—মৃদু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন।

"ও।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে মাস্টার মশাই বললেন—"তোমরা ওপরে যাচ্ছ তো? আমি ছিলাম এতক্ষণ ওপরে। নীচে যাই এবার। সারাদিন আর কোনো কাজ নেই তো, কেবল ওপর আর নীচে, ওপর আর নীচে। সারাজীবনই মনে হচ্ছে এই করেছি কেবল"—একটু হেসে দ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন মাস্টার মশাই।

হঠাৎ আবদারের সুরে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"একটা গান শোনাবেন মাস্টার মশাই। অনেক দিন গান শুনি নি আপনার।"

"গান?"

একটু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"আচ্ছা, বেশ, শোন। গলা তো আমার তেমন মিষ্টি নয়, তোমার ভালো লাগতে পারে। এঁর লাগবে না বোধ হয়—"

"আমারও লাগবে।"— হেসে বললেন তুঙ্গশ্রী।

"না শুনেই ঠিক করলে কি করে সেটা? আচ্ছা, শোন।"

মাস্টার মশাই গান ধরে দিলেন।—

মোদের দেশে,
ওরে ভাই মোদের দেশে,—
আকাশ নেমেছে গঙ্গার কূলে
গঙ্গার ধারা সাগরে মেশে।
আঁধারে শুনিয়া আলোর ভাষণ
তুচ্ছ করে যে পাঁকের শাসন।
সেই শতদলে নিজের আসন
পাতেন মোদের বাণী যে এসে।
যে দূর্বা রহে পায়ের তলায়
পূজার ডালায় সেই তো আগে
মাটি আর খড়ে স্বপন মিশায়ে
দেবতারে গড়ি কি অনুরাগে
সহস্র রবি যে আকাশে জ্বলে
আকাশ-প্রদীপ জ্বালি তার তলে।
তুলিয়া ধরি যে মাটির মহিমা
আকাশের বুকে মোরাই হেসে।
মোদের দেশে।

গানটা শুনতে শুনতে তুঙ্গশ্রীর মনে হল, এদেশের আদর্শে সত্যিই বড় কিছু ছিল বোধ হয় একটা—যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। পায়ের তলায় মাটি আর দূর্বাকে পূজার উপকরণ করেছিল যারা, তাদের কাছে মানুষ নিশ্চয়ই ছোট ছিল না, যতই অবনত হোক সে মানুষ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি একটু।

"হল তো এইবার! চলি আমি।"—উঠে পড়লেন মাস্টার মশাই।

"চমৎকার লাগল গানটা। আপনারই তৈরি না কি?"

"এসব গান কোনও বিশেষ লোকের তৈরি নয়। এদেশের মাটিই এর কবি। বেদের যুগ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাই এই গান গেয়েছেন কথার একটু অদল-বদল করে। আমার কি এত বড় স্পর্ধা হতে পারে যে আমি বলব, এটা আমার তৈরি!" একটু হাসলেন, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

"চলুন ওপরে যাওয়া যাক।"

"চলুন।"

উপরে উঠতে উঠতে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"অদ্ভুত লোক মাস্টার মশাই!"

"উঠি কি আপনার মুরারিপুর স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছেন এখন নাকি?"

"না। উনি মুরারিপুর স্কুলের কেউ নন, অথচ সব। যখন খুশি যান, যতক্ষণ খুশি থাকেন। হেন বিষয় নেই যা জানেন না।"

"মাইনে কত দেন?"

"মাইনে? ওঁকে মাইনে দেবার কথা ভাবতেও পারি না; তবে ওঁর প্রয়োজন সব মিটিয়ে দিই।"

"এইখানে একলা থাকেন?"

'উনি আর ধনপৎ সিং থাকেন। ধনপৎ এখানকার রক্ষক। ওঁর রান্না-টান্নাও করে দেয়। ওঁর হাঙ্গামাও নেই বেশি। একাহারী লোক। বেশির ভাগ দিনই দুধ আর ফল খান।"

আবার কয়েক মিনিট নীরবে কাটল।

হিরণ্যগর্ভ মাস্টার মশাইয়ের কথাই বললেন—"আমার রিসার্চের প্রেরণা উনিই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—খোঁজ খোঁজ, সারাজীবন খোঁজবার সাধনাই বিজ্ঞানের সাধনা। বিলিতী ওষুধের ফেরিওলা হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিও না শুধু—"

"আচ্ছা, আপনার রিসার্চটা কী নিয়ে বলুন তো?"

"রিসার্চটা? বলছি, বসুন আগে ভাল করে।"

ছাতের উপর এসে পড়েছিলেন তাঁরা। গোল ছাতের চারিদিকে সিমেন্টের গোল বেঞ্চিও ছিল। বসবার আগে তুঙ্গশ্রী দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। এত বড় বিরাট দিক্‌চক্রবালরেখা দেখেন নি তিনি আর ইতিপূর্বে। কলকাতায় মনুমেণ্টে উঠেছিলেন একবার, কিন্তু অসংখ্য পাকা বাড়ি আর কলের চিমনির আবরণে দিগন্তের রূপটা যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। যোজনবিস্তৃত রৌদ্রোদ্ভাসিত সবুজ মাঠের প্রান্তে আকাশের এমন বিরাট নীল রূপ আর কখনও দেখেন নি তিনি। হিরণ্যগর্ভের কথায় আত্মস্থ হয়ে বসলেন।

"আমার রিসার্চটা খুব যে একটা আজগুবি ব্যাপার তা নয়। আমি প্রমাণ করতে চাইছি যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারাই রোগের আসল কারণ নয়। কাল আপনাকে বলেছিলাম, আপনার মনে আছে বোধ হয় যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারা উদ্ভিদ। অসুস্থ মানুষের দেহে ব্যাক্‌টিরিয়া নামক উদ্ভিদ আমরা পাই বটে, কিন্তু তার থেকে এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় না যে, ব্যাক্‌টিরিয়ারাই রোগের কারণ। অসুখের সময় মানুষের দেহের তাপও বেড়ে যায় অনেক সময়, কিন্তু সেটা তো অসুখের কারণ বলে ধরি না আমরা। ওটা অসুখের একটা লক্ষণ বলে ধরি। আমার মনে হয়, অসুস্থ দেহে ব্যাক্‌টিরিয়ার আবির্ভাবও তেমনি একটা লক্ষণ। পোড়ো বাড়ির ছাতে যেমন অশ্বত্থচারা গজায়, মেঝেতে যেমন ঘাস হয়, তেমনি অসুস্থ দেহে এই ব্যাক্‌টিরিয়ারাও জন্মায়। জলে স্থলে চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে ব্যাক্‌টিরিয়ার বীজ, সকলেই আমরা প্রতি মুহূর্তে ব্যাক্‌টিরিয়া খাচ্ছি, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নিচ্ছি, কিন্তু সকলেই তো একসঙ্গে অসুখে পড়ছি না! আমাদের শাস্ত্রে অবশ্য 'ভাইটালিটি' বলে একটা জিনিসের উল্লেখ আছে। আমি চেষ্টা

করছি, রসায়নের ভাষায় ওই অস্পষ্ট কথাটাকে তর্জমা করতে। আমি বার করতে চেষ্টা করছি শরীরের কোন্ জিনিসটার ঘাটতি বা বাড়তি হলে টাইফয়েড নামক উদ্ভিদ আমাদের দেহে জন্মাবার সুযোগ পায়। আমি সুস্থ জানোয়ারটাকে টাইফয়েড খাইয়ে দেখছি তাদের কিছু হয় কি না, ওই বাঁদরটাকে খাওয়াচ্ছি। ওই সাপটাকে দুধের সঙ্গে খাইয়ে দেখেছি—কিছু হয় নি, ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি—তাও কিছু হয় নি। বাঁদরটাকেও ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি একটা। এতেও যদি ওর কিছু না হয়, আমি নিজে পিওর কালচার খেয়ে দেখব খানিকটা। অর্থাৎ কক্‌স্ পশটুলেটগলো হাতে-কলমে করে দেখছি আর কি—"

"সাপটাকে ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছেন কেন?"

"সাপ হচ্ছে রেপ্‌টাইল। কোল্ড-ব্লাডেড অ্যানিম্যাল। যে সব ব্যাক্‌টিরিয়া আমাদের, মানে, হট্-ব্লাডেড্ অ্যানিম্যালদের অসুখের কারণ তাতে ওদের কিছু হয় কি না—এই দেখছি আর কি! কৌতূহল—"

"ব্যাক্‌টিরিয়ার কাল্‌চার আপনি নিজে খাবেন?"

"হ্যাঁ, যদি দরকার হয়।"

"দরকার কখন হবে?"

"যদি বাঁদরটার কিছু না হয়। বাঁদরটার যদি কিছু হয়, তাহলে ওর রক্ত নিয়ে দেখব যে, রক্তে কোনও জিনিসের অভাব হয়েছে কি না! বাঁদরটা যখন সুস্থ ছিল, তখন ওর রক্তের সমস্ত রকম পরীক্ষা আমি করেছি। আমার নিজের রক্তেরও করে রেখেছি। অনেক টাইফয়েড-রোগীরও রক্ত-পরীক্ষার রেকর্ড আছে আমার কাছে।"

তুঙ্গশ্রী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। লোকটা বলে কি! টাইফয়েডের ব্যাকটিরিয়া নিজে খাবে!

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি নিজে টাইফয়েড ব্যাক্‌টিরিয়া খাবেন? আপনার ভয় করে না?"

"আপনার মুখে তো একথা সাজে না তুঙ্গশ্রী দেবী। পুলিশের গুলির মুখে আপনি এগিয়ে গিয়েছিলেন কি করে? আপনার ভয় করে নি?"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল।

তারপর হিরণ্যগর্ভ বললেন—"সত্যের সন্ধানে যারা যাত্রা করেছে, অসত্যের বিরুদ্ধে যাদের অভিযান, তাদের নিজেদের সুখ-দুঃখ বা ভয়-ভাবনা থাকতে নেই।"

একটা অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল তুঙ্গশ্রীর বুক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন—"কাল ঘি নিয়ে কী করছিলেন?"

একটু হেসে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"যক্ষ্মার সম্বন্ধে একটা উদ্ভট ধারণা আমার মাথায় ঢুকেছে। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকই বোধহয় এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা। সেইটেকেই আর একটু নেড়ে-চেড়ে আমি দেখছি।"

"যক্ষ্মা সম্বন্ধে? কিছু করছেন নাকি আপনি"

নিজের যক্ষ্মাগ্রস্ত ভাইটির কথা মনে পড়ে গেল তুঙ্গশ্রীর।

"না করি নি কিছু এখনও। রিসার্চের ব্যাপারে চট করে কিছু করা যায় না। কেবল

হাতড়ে বেড়াতে হয়। সত্যটা কেবলই যেন এড়িয়ে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের গানের চমৎকার একটা লাইন আছে— সেটা সুন্দর খেটে যায় এ সম্বন্ধে—'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে'। কিছুতেই যেন ধরা যায় না।"

হাসিমুখে চেয়ে বসে রইলেন।

"তবু কী করছেন শুনি না?"

"কিছুই করি নি, কল্পনা করেছি খালি। কল্পনাটা বলতে অবশ্য আপত্তি নেই। তাহলে আমাদের খাদ্যদ্রব্য কি করে হজম হয় তা একটু বলতে হয়। আমাদের খাদ্যদ্রব্য হচ্ছে—প্রোটিন অর্থাৎ আমিষ-জাতীয়, কার্বোহাইড্রেট শ্বেতসার-জাতীয়, ফ্যাট ঘি-জাতীয়, তাছাড়া ভিটামিন, সল্ট্স্, জল—এসবও আছে। আমরা যখন খাই, তখন এক জল-টল ছাড়া প্রত্যেকটা জিনিস হজম হয়, মানে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, যাতে সেগুলো আমাদের রক্তে সহজে প্রবেশ করে দেহের কাজে লাগতে পারে। রক্তে প্রবেশ করবার বেলায় কিন্তু বেশ একটা মজা হয়। সব খাবারই লিভারের ভিতর দিয়ে যায়, কেবল এক ফ্যাট ছাড়া। ফ্যাটকে রক্তে নেবার জন্যে প্রকৃতি আলাদা একটা রাস্তা বানিয়েছেন। সেটা একটা সরু নলের মতো জিনিস, পেটের ভিতর থেকে বুকের ভিতর দিয়ে সোজা সেটা এসে আমাদের গলার কাছে ভিনাস সিস্টেমে মিশেছে। অর্থাৎ ফ্যাট এসে ভিনাস ব্লাডে পড়েছে। সেখান থেকে যাচ্ছে রাইট হার্টে, রাইট হার্ট থেকে লাংসে। সেজন্যে মনে হয় যে, লাংস্ হয়তো কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার যন্ত্রই নয়, হয়তো ফ্যাট হজম করারও সাহায্য কিছু কিছু করে। এখন যক্ষ্মার যে জীবাণু আমরা দেখি, তার বিশেষত্ব হচ্ছে সেটা অ্যাসিড-ফাস্ট। অর্থাৎ ফুক্সিন নামক একটা লাল রঙের সঙ্গে তাকে যদি কিছুক্ষণ গরম করা যায়, তাহলে ওর গায়ের লাল রঙের একটা ছোপ ধরে যায়। সব ব্যাক্টিরিয়ারই ধরে। কিন্তু ওর গায়ের লাল রঙটা খুব পাকা হয়ে যায়, অ্যাসিড দিয়ে ধুলেও ওঠে না, তাই ওর নাম অ্যাসিড-ফাস্ট। ওর এই অ্যাসিড-ফাস্টত্বের কারণ বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে, ওর গায়ে নাকি ফ্যাটের তৈরি একটা ওয়াড় পরানো থাকে— ফ্যাটি ক্যাপসুল বলেছেন তাঁরা এই ওয়াড়টাকে। আমি ভাবছি লাংস নামব পরিপাক যন্ত্রের কোন প্রকার অপটুতার জন্য যদি ফ্যাট হজম না হয়, তাহলে সেই অর্ধেক হজম-করা ফ্যাট হয়তো লাংসে থেকে যায়, খাবার হজম না হলে খাবার যেমন পেট থেকে নামতে চায় না, তেমনি ফ্যাটও হয়তো লাংসে থেকে যায় এবং সাধারণ যেসব ব্যাসিলাস লাংসে সাধারণত বাস করে তারা ওই ফ্যাটের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে এবং ক্রমশ তাদের গায়ে একটা ফ্যাটের ওয়াড় মানে ক্যাপসুল হয়ে যায়। যক্ষ্মার যে জীবাণু আমরা যক্ষ্মা রোগের কারণ মনে করেছি সেটা হয়তো কারণ নয়, লক্ষণ। আসলে যক্ষ্মা হয়তো ঘি-জাতীয় জিনিস পরিপাক করবার ক্ষমতার অভাব, ডায়বিটিস যেমন কার্বোহাইড্রেট পরিপাক-করবার অক্ষমতা। যক্ষ্মায় জ্বর হয়, তার কারণ সম্ভবত ওই অজীর্ণ ফ্যাট। ফ্যাট শরীরে ঢুকলে যে জ্বর হয় তার প্রমাণ আমরা পাই মিলক্ ইন্জেকশান করলে। তাছাড়া আর একটা জিনিস দেখুন, বহু প্রাচীন কাল থেকে যক্ষ্মার চিকিৎসা হচ্ছে সহজপাচ্য ফ্যাট খাওয়ানো। যক্ষ্মা হলে শরীরের চর্বির ডিপোগুলো আগে খালি হয়ে যায়। আপনার বোধ হয় বিরক্তি ধরছে, নয়? এবার চলুন ওঠা যাক। কেমন লাগল আপনার এ জায়গাটা?"

"চমৎকার! আচ্ছা, আমার এক ভাইয়ের টি. বি. হয়েছে, কী করি বলুন তো?"

"ও, তাই নাকি? স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিন।"

"কেশববাবু স্যানাটোরিয়ামে একটা ব্যবস্থা করবেন বলেছেন।"

"আমি খুব ভালো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনার। একটা স্যানাটোরিয়ামে কিছু টাকা দিয়েছি আমি, কাকুও দিয়েছেন, সেখানে আমাদের রোগীদের বিনাখরচে যাতে চিকিৎসা হয়, সে ব্যবস্থা আছে। আমি একটা চিঠি দিয়ে দেব আপনাকে। সেইটে নিয়ে আপনার ভাইকে পাঠিয়ে দিন কারো সঙ্গে, আপনি যদি যান আরও ভালো।"

"বেশ, যাবার সময় আপনার কাছ থেকে তাহলে একটা চিঠি নিয়ে যাব।"

"চলুন, তাহলে যাওয়া যাক এবার। আমার মুরারিপুর স্কুলটা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। স্কুল অবশ্য সবে শুরু হয়েছে, দেখাবার মতো বিশেষ কিছু হয় নি?"

"চলুন।"

হস্তিপৃষ্ঠে চড়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মুরারিপুর স্কুল পৌঁছে গেলেন তাঁরা। বাইরে থেকে অবশ্য চমকপ্রদ কিছু চোখে পড়ল না তুঙ্গশ্রীর প্রথমে। ভিতরে ঢুকে একটু হতাশই হয়ে গেলেন। সারি সারি কতকগুলো খোড়ো ঘর। এক ধারে বাইকে ঠেসানো রয়েছে কয়েকটা পুরানো পুরানো চেহারার। দূরে একটা আটচালার ভিতর ছোটখাট একটা কারখানার মতো কি যেন। লাউ কুমড়ো শশা ঢেঁড়স প্রভৃতির ছোট ছোট ক্ষেত চারিদিকে। কিছু কিছু মুরগী হাঁসও আছে। গোরুও আছে কয়েকটা। গোরুর গাড়িও আছে দুটো তিনটে।

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ছেলেরা এখন চরকা কাটছে বোধ হয়।"

"কজন ছাত্র থাকে এখানে?" তুঙ্গশ্রী প্রশ্ন করলেন।

"আপাতত পঁচিশ জন আছে। সকলেরই বয়স কম। কিন্তু এ যা দেখছেন সবই ওরা করেছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জমি আছে। নিজের হাতে চাষ করে এসব গাছ লাগিয়েছে ওরা। এই গোরু মুরগী হাঁসের সেবা সব ওরাই করে। এমন কি দুধ দুইতে পর্যন্ত শিখেছে। মহাত্মাজীর আদর্শেই করেছি এটা। তবে বেশির মধ্যে ছোট একটা মোটরের ওয়ার্কশপও করেছি, একজন মোটরমেকানিক আছে, সে হাতে-কলমে এদের এ-কাজটাও শেখাচ্ছে। কাপড় তৈরির যাবতীয় কাজ তো শিখবেই, এটাও শিখুক। আমার ইচ্ছে আছে, আমার মিলটাকে ফের যদি চালাতে পারি, তাহলে মিলের কাজটা হাতে-কলমে এদের শেখাব।"

"লেখাপড়া কিছু করে না এরা?"

"করে বইকি। হিন্দী শেখে, বাংলা শেখে, মোটামুটি অঙ্ক শেখে। অঙ্ক শিখতেই হয় ওদের—কারণ নিজেদের দোকান আছে, নিজেদেরই সব করতে হয় সেখানে। ওদের মোটামুটি ইতিহাস-ভূগোলও শেখানো হয়। আর ওরা প্রশ্ন করে করে এতরকম জিনিস শেখে যে তার ফর্দ দেওয়া শক্ত। ছোট ছেলেদের মনে কত অসংখ্যরকম প্রশ্ন জাগে জানেন তো, এখানকার শিক্ষক তার যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। নিজে না পারলে বই টই খুঁজে উত্তরটা বার করতে হয়। তাছাড়া আর একটা মস্ত জিনিস, পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে পরস্পরের সাহায্য নিয়ে সমাজে কি করে বাস করতে হয়, সেটা শিখছে ওরা। নাচ গান ছবি

আঁকা—এসব শেখাবারও ইচ্ছা আছে, কিন্তু লোক পাচ্ছি না, ভালো শিক্ষকের বড্ড অভাব।"

"এই স্কুল চালাতে মাসে কত করে খরচ পড়ে আপনার?"

"আমি আপাতত দুজন শিক্ষকের মাইনে দিই। আর এই জমিটা আমি দিয়েছি। ছেলেরা নিজেরাই চালিয়ে নেয়। আমি ওদের খাবার চালটা দিচ্ছি আপাতত। কিন্তু কথা আছে, সে খরচটাও ওরা নিজেরাই তুলে নেবে। এই সব আসছে।"

তুঙ্গশ্রী দেখলেন, একটা আটচালা থেকে একদল ছেলে বেরিয়ে আসছে। পিছনে একজন শিক্ষকও আসছেন। হিরণ্যগর্ভ ও তুঙ্গশ্রীও এগিয়ে গেলেন তাদের দিকে। হিরণ্যগর্ভকে দেখে ছুটে এল ছেলের দল তাঁর দিকে।

"কি খবর? সব ভালো তো?"

তাদের হাস্যোদ্ভাসিত মুখই তাঁর এ কথার জবাব দিয়ে দিলে।

শিক্ষক জীবনবাবু এগিয়ে হেসে বললেন—"আপনি এসে গেছেন ভালো হয়েছে, একটা সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারছি না, আপনি যদি পারেন করুন।"

"কি সমস্যা?"

"কেষ্ট জিগ্যেস করছে, আকাশ নীল কেন? কারণটা আমি ঠিক জানি না। আমার সায়ান্স ছিল না তো।"

হিরণ্যগর্ভ তুঙ্গশ্রীর দিকে ফিরে বললেন—"আপনি জানেন?"

"না"— হেসে উত্তর দিলেন তুঙ্গশ্রী।

"কেষ্ট কই?"

সাত বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এল। দেখলেই মনে হয় খুব ছটফটে দুষ্টু ছেলে; প্রশ্ন করে মাস্টার মশাইকে পর্যন্ত ঠকিয়ে দিয়েছে—এই গর্ব তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

"তোমার কি মনে হয়?"—তাকেই প্রশ্ন করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"আমি তো যোগেনকে বলছিলাম; কিন্তু মাস্টার মশাই বলছেন তা নয়।"

"কি বলেছিলে যোগেনকে?"

"বল্ না।"— যোগেনের দিকে চেয়ে কেষ্ট বললে।

যোগেন একটু লাজুক-প্রকৃতির ছেলে। সে ঘাড় হেঁট করে বললে—"ও বলছিল যে আকাশে ধোপা আছে, যারা কালো মেঘগুলোকে কেচে কেচে সাদা করে দেয়, সেইজন্যে আকাশ অত নীল। নীল দিয়ে কাপড় সাফ হয় কিনা!"

সবাই হেসে উঠলেন।

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ও কবি হবে দেখছি। আকাশের রঙ নীল কেন তা জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে যে, পৃথিবীতে আমরা যত রঙ দেখছি তার কারণ সূর্যের আলো। সূর্যের আলোয় সাতটা রঙ আছে, আমি একদিন আতশী কাচ এনে দেখিয়ে দেব—সাতটা রঙ মিশে আছে বলে সাদা দেখায়। আমাদের চারিদিকে এমন সব জিনিস আছে যারা সূর্যের এক-একটা রঙকে শুষে নেয় নিজের ভেতর, সে রঙটা তখন আর দেখা যায় না, দেখা যায় বাকিগুলি। সূর্যের আলো যখন আকাশের ভিতর দিয়ে আসে তখন আকাশ নীল রঙটা ছাড়া

বাকিগুলোকে শুষে নেয়, তাই কেবল নীল রঙ দেখতে পাই আমরা। ঘাস সবুজ, তার কারণ ঘাষ সবুজ রঙ ছাড়া আর সব রঙ শুষে নিয়েছে।"

"কি কি রঙ আছে সূর্যের আলোতে?"—আর-একটি ছেলে জিগ্যেস করলে।

"বেগুনী, ঘন-নীল, নীল, সবুজ, হলদে, জরদা, লাল।"

"তাহলে যার রঙ কালো, তাকে কালো দেখায় কেন?"

"সে সূর্যের সব রঙ শুষে নেয়। কোনও রঙ যাতে নেই তাই কালো দেখায়। আর যে সব জিনিস সাদা, তারা কোনও রঙই শুষতে পারে না।"

"ও"—গম্ভীরভাবে কেষ্ট বললে।

"এক-একটা জিনিস কেমন রঙ শুষে নিতে পারে একটা যন্ত্র নিয়ে তা বেশ দেখানো যায়। দেখি, যদি সেটা যোগাড় করতে পারি, তোমাদের দেখাব এনে।"

"কবে আনবেন?"—লাজুক যোগেন উৎসুক হয়ে উঠল।

"সব জিনিস আমার কাছে নেই, কলকাতা থেকে আনাব। ইনি আজ কলকাতা ফিরে যাবেন, এঁর হাতে আনতে দেব।"

তারপর শিক্ষক জীবনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—"আমার কাছে কতকগুলো বিজ্ঞানের সহজ বই আছে। পাঠিয়ে দেব সেগুলো। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মাস্টার মশাই এদের নিয়ে যেতে বলেছেন একদিন, শনি আর মঙ্গল দেখাবেন। এরা এখন কি করবে?"

"এরা জমি খুঁড়বে এখন কার্পাস বীজ লাগাবার জন্যে। আমাদের কম্পাউণ্ডের চার ধারে লাগিয়ে দিচ্ছি পনেরো হাত অন্তর অন্তর কার্পাস গাছ।"

"বেশ। তোমরা তাহলে কাজ করগে যাও। আমি এঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই একটু।"

ছেলেরা সব চলে গেল। শিক্ষক জীবনবাবু এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগলেন।

তুঙ্গশ্রী বললেন—"আকাশের নীল রঙের এ ব্যাখ্যা জানা ছিল না আমার।"

"আকাশের নীল রঙের ব্যাখ্যা মানে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা জানা আরও জটিল। প্রফেসর রমনের স্ক্যাটারিং এফেক্ট প্রভৃতি অনেক কাণ্ড আছে। তবে ছোট ছেলেদের কৌতূহল মেটাবার জন্যে আপাতত যা বললাম তাই যথেষ্ট।"

"পড়তে হবে তো।"

"ভারি অদ্ভুত!"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

"এদের ইতিহাস ভূগোল কি বই থেকে পড়ান? তুঙ্গশ্রী জীবনবাবুকে জিগ্যেস করলেন।

"বই থেকে পড়ানো ঠিক আরম্ভ করি নি এখনও। মুখে মুখে এইখানকারই ভূগোল ইতিহাস পড়াচ্ছি প্রথমে। প্রথমে আমাদের এই বিদ্যালয়ের ভূগোল শিখেছে ওরা, ছবি এঁকেছে। তারপর এই গ্রামটার ভূগোল পড়াচ্ছি, এরও ছবি আঁকবে ওরা। ইতিহাসও ঠিক ওইভাবেই হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস, এই গ্রামের ইতিহাস থেকে শুরু করে তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

হঠাৎ দেখা গেল, সামনের একটা বটগাছ থেকে একটি ছেলে লাফিয়ে নামল।

"ও ওখানে কী করছিল?"— বিস্মিত হিরণ্যগর্ভ প্রশ্ন করলেন জীবনবাবুকে।

"ও বোধ হয় পাখির বাসা দেখতে উঠেছিল।"

ছেলেটি কাছে আসতেই জীবনবাবু জিগ্যেস করলেন—"কি হল বিনোদ?"

হতাশার সুরে বিনোদ বললে—"অনেক উঁচুতে শালিকটা বাসা বানিয়েছে দেখলাম। আমার ঝুড়িতে যায় নি।"

"কি হয়েছে?"—হিরণ্যগর্ভ জিগ্যেস করলেন।

জীবনবাবু বললেন—"গাছের ওপর ও একটা ছোট্ট ঝুড়ি বেঁধে রেখে এসেছে। ওর ইচ্ছেটা কোনও পাখি এসে তাতে বাসা বাঁধুক। একটা শালিক কাল থেকে খড়কুটো নিয়ে যাচ্ছে ওখানে, তাই ও দেখতে গিয়েছিল, কোথায় বাসা বাঁধছে।"

"আমার ঝুড়িতে বাঁধছে না কেন? কি বোকা শালিকটা!"

"তোমার ঝুড়ি পছন্দ হচ্ছে না বোধহয় ওর!"—হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন।

"কেন, বেশ চমৎকার ঝুড়ি তো—"

"তোমার কাছে চমৎকার মনে হচ্ছে। ওর কাছে চমৎকার নয় হয়তো!"

"আসলে বোকা বড্ড।"

মুচকি হেসে একছুটে চলে গেল বিনোদ।

হিরণ্যগর্ভ ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন তুঙ্গশ্রীকে। ছোট যে ডিস্‌পেন্সারিটি আছে সেখানেও নিয়ে গেলেন। একটি বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার আপাতত সেখানকার কাজ করে। ছেলেরাই সাহায্য করে তাঁকে। ছোটখাট অসুখের চিকিৎসা এঁর সাহায্য নিয়েই করে সবাই। কারও অসুখ বাড়াবাড়ি হলে হিরণ্যগর্ভের ডাক পড়ে। তিনি মাসে দুবার করে এসে স্বাস্থ্যতত্ত্বও পড়ান, নানারকম রঙিন ছবি আর ম্যাজিক লণ্ঠনে স্লাইড দেখিয়ে।

...ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তুঙ্গশ্রী। রাত্রেও ঘুম হয় নি ভালো। চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ক্লান্তির ছাপ। তাঁর মনে হচ্ছিল, তিনি যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এসব যেন বাস্তব নয়, অলীক! একটু পরে স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

"কোন্ ট্রেনে আপনি যাবেন?"

"এগারোটার সময় ট্রেন আছে না একটা?"

"আছে। সেটাতে যদি যেতে চান তাহলে এখানে আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

"চলুন। যাওয়া যাক তাহলে।"

"চলুন। হাতিতে করেই আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি একবার। বাড়িতে একবার নামতে হবে। আপনার জিনিসগুলো আছে। খেয়েও নেবেন একটু কিছু। আপনাকে স্যানাটোরিয়ামের সেই চিঠিটাও দিয়ে দেব। আর সায়েন্স কলেজে আমার একজন বন্ধু আছে, তাকে একটা চিঠি দিয়ে দেব। যদি একটা স্পেকট্রোস্কোপ যোগাড় করে পাঠাতে পারে, ছেলেদের তাহলে দেখাব। কাকুর সঙ্গে দেখা করবেন কি?"

"না, দরকার নেই। বাইরে বাইরেই আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিন। খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা আর না-ই করলেন। রাস্তায় কোথাও কিছু খেয়ে নেব এখন।"

"আমি আসবার সময় কুকারে রান্না চড়িয়ে এসেছি। ভাতে ভাত। দুধ আছে অবশ্য। পেয়ারাও দিতে পারি গোটা কতক। পেয়ারা ভালোবাসেন নিশ্চয়।"

হিরণ্যগর্ভের চোখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল, যেন তিনি বালক, সঙ্গীকে পেয়ারার কথা বলে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করছেন।

"পেয়ারা বিশ্রী লাগে আমার।"—ঠোঁট উলটে বললেন তুঙ্গশ্রী।

"কলা? গোটা চারেক আছে বোধ হয় আমার বেতের বাক্সটায়।"

"আমার খাবার জন্যে এত ভাবছেন কেন?"

হাতঘড়িটা দেখে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"নটা পনেরো, যেতে চান তো পা চালিয়ে চলুন একটু।"

তুঙ্গশ্রীর হঠাৎ মনে হল, তাঁকে তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচেন হিরণ্যগর্ভ। মনে হওয়ামাত্র মনটা বিষাদে ভরে উঠল। প্রচ্ছন্ন অভিমানও হল একটু।

ছয়

কেশব সামন্ত নিবিষ্টচিত্তে তাঁর গুম্ফপ্রান্তে কস্‌মেটিক লাগাচ্ছিলেন। সত্যিই দেখবার মতো গোঁফজোড়া তাঁর। পুরুষোচিত। যখনই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন তখনই তিনি গুম্ফপ্রান্তে মনোনিবেশ করেন। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করবার চেষ্টা করেন সে দুটোকে। তিন-তিনজন লোক পাঠিয়েছেন তিনি, একজনও এখনও ফিরল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনজনেরই ফেরার কথা। অথচ সকলেই বিশ্বাসযোগ্য। কথাটা মনে হওয়া মাত্র ভুরু কুঁচকে গেল। পৃথিবীতে কেউ বিশ্বাসযোগ্য আছে না কি? শিখরিণীকেই যখন বিশ্বাস করতে পারা গেল না, তখন ও-প্রশ্নের সঠিক উত্তর তো বহুকাল আগেই পাওয়া গেছে। না, বিশ্বাসযোগ্য কেউ নেই পৃথিবীতে। সকলের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক। শিখরিণীর সঙ্গেও যদি স্বার্থের সম্পর্ক থাকত, কুকুরের মতো লেজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়াত তাঁর পিছু পিছু, পায়ে ধরে সাধ্যসাধনা করত—ওগো দয়া করে বকল্‌সটা আমার গলায় পরিয়ে দাও। গুম্ফপ্রান্তে আরও দুবার পাক দিলেন। না, একমাত্র ভরসার কথা, যাদের তিনি খেলাচ্ছেন তাদের স্বার্থের আঠাটা এত বেশি রকম চটচটে যে যোগাযোগটা সহজে বিচ্ছিন্ন হবে না। নগদ টাকার সম্পর্ক। যে তিনটি মেয়ে তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মানসলোকে যে নীহারিকা সৃষ্টি করেছে এবং তার মধ্যে যে-সব সূর্য-তারার সম্ভাবনা প্রত্যাশা করছে তার আকর্ষণও কম নয়।

আবার ভুরু কুঁচকে গেল কেশব সামন্তের। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কি এ কথা খাটে? ওই জেল-ফেরত অভাবগ্রস্ত বুভুক্ষু তুঙ্গশ্রীর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই খাটে, বি. এ. পাশ-করা নমঃশূদ্রের মেয়ে বীরা দেবীর সম্বন্ধেও খাটে বোধ হয়—ঠিক, বলা যায় না, মেয়েটা কেমন একটু কাঠখোট্টা-গোছের। কিন্তু চপলা? ওই পতিতাটাও কি তাঁর সম্বন্ধে মোহ পোষণ করে না কি? কেশব সামন্ত তার কাছেও অভিনয়ের ত্রুটি করেন না যদিও, কিন্তু এরকম বহু অভিনয় দেখে বারংবার প্রতারিত হয়ে চোখ ফোটে নি কি ওর? ফোটা তো উচিত। চপলাকে প্রেম-বিহ্বলরূপ কল্পনা করে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

চপলার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রেখেছেন গান শোনবার জন্যে নয়, চপলা-জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে লোকে সাধারণত যেজন্যে সম্পর্ক রাখে সেজন্যেও নয়—ও-সব দিকে আর লক্ষ্যই নেই তাঁর আজকাল—তাঁর জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য এখন মেঘসুন্দর আর হিরণ্যগর্ভকে

ধ্বংস করা। সেইজন্যেই চপলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়েছে। অনেক গুণ্ডা ওর হাতে আছে। গুণ্ডার সাহায্য এখনও নিতে হয় নি তাঁকে যদিও, কিন্তু দরকার হলে তিনি নেবেন। আপাতত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলে, মিলের শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলে, হিরণ্যগর্ভের বড় সাধের আদর্শ মিলকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করবেন একটা। তারপর দরকার হলে প্রজাদের উত্তেজিত করবেন যাতে কেউ খাজনা না দেয়। আজকাল অভাবের দিনে এসব উত্তেজনা সৃষ্টি করতে বেগ পেতে হয় না,—বারুদ হয়ে আছে সবাই, স্ফুলিঙ্গ একটা ফেললেই হল। আর ওই ভূপশ্রী আর বীরা দেবীরা আর কিছু না পারুন কথার চকমকি ঠুকে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে পারবেন এনতার। যে চিন্তাটা মাঝে মাঝে তাঁর মনে বিদ্যুৎঝলকের মতো হানা দিয়ে যায় সেইটে আবার হানা দিয়ে গেল একবার। ভ্রূকুঞ্চিত করে গোঁফের ডগায় আবার পাক দিলেন বার দুই। সাম্যের এত বড় আদর্শটাকে এমনভাবে মুখোশের মতো ব্যবহার করা কি ঠিক হচ্ছে? তখনই আবার মনে হল, ঠিক নয়ই বা কেন! জীবন মানে যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে যেন-তেন-প্রকারেণ জয়লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মুখোশ কে না ব্যবহার করছে? মহাত্মা গান্ধীর নাম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে না খদ্দরধারী চোরের দল? ধর্মের মুখোশ পরে শিষ্যলোলুপ গুরুর দল আসর জমাচ্ছে না? হিরণ্যগর্ভের ওই আদর্শবাদটাও একটা মুখোশ, একটা 'পোজ'। মেঘসুন্দরের মুখোশও নেই, অনাবৃত পিশাচ একটা। তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে গেল কেশব সামন্তর, স্বভাবত-লাল টানা টানা চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার মতো হল। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বার দুই। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ। তারপর উঠে পড়লেন। উঠে তেতলার সেই ঘরটায় গেলেন, যে ঘরে কাউকে ঢুকতে দেন না তিনি। প্রথমে সিঁড়িতে তারপর ঘরে খিল বন্ধ করে দিলেন।

ঘরে একটা ক্যামেরা ছিল, ফোটো এনলার্জ করবার ক্যামেরা। সেইটের দিকে নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, মাতাল যেমন ভাবে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে মদের বোতলের দিকে চেয়ে থাকে। পাশেই ডার্ক-রুম। সন্তর্পণে ঢুকলেন সেখানে। লাল আলো জ্বালালেন একটা। যে নেগেটিভ তিনখানা ট্রেতে ভিজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তুলে দেখলেন সে তিনটেকে। তারপর প্রিন্ট করতে দিলেন সেগুলোকে। একটা ড্রয়ার টেনে আর তিনটে ফোটো বার করলেন। এগুলো তৈরি রয়েছে। এইবার ব্যবহার করা যেতে পারে। ডার্ক-রুম থেকে বেরিয়ে এসে ফোটো তিনখানা বেশ মজবুত করে টাঙালেন দেওয়ালে সারি সারি। একটা হিরণ্যগর্ভের, একটা মেঘসুন্দরের আর একটা শিখরিণীর। ফোটো তিনটের দিকে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল বাঘের চোখের মতো। তারপর হঠাৎ পা থেকে চটি-জুতো খুলে মেঘসুন্দরের মুখে বসিয়ে দিলেন এক ঘা। হিরণগর্ভের মুখেও। তারপর পাগলের মতো ক্রমাগত মারতে লাগলেন। দেওয়াল থেকে পড়ে গেল ছবিগুলো। আবার তুলে টাঙালেন। তারপর আলমারী থেকে একটা রিভলবার বার করে উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ করলেন ছবি দুটির উপর। রিভলভারের সব কটা গুলি যখন শেষ হয়ে গেল, তখন একটা চেয়ারের উপর বসে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। ছবিগুলোর দিয়ে চেয়ে দেখলেন আবার। হ্যাঁ, ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছে। মাথায় বুকে মুখে তিন জায়গাতেই লেগেছে।

তারপর শিখরিণীর ছবিটার কাছে এসে বললেন—"তোমাকে গুলি করব না, তোমাকে আমার চাই। মন্মথকে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে আমি অধিকার করব। মন্মথ নির্দোষ জানি, কিন্তু হি ইজ এ ট্রেস্‌পাসার। তাকে সরতে হবে। যে সিঁদুর সে তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে, সে সিঁদুর মুছে দেব আমি। নিজের রক্ত দিয়ে নতুন করে সিঁদুর পরিয়ে দেব তোমাকে।"

এই বলে পাশের টেবিল থেকে একটা ছুঁচ তুলে নিয়ে নিজের আঙুলে ফুটিয়ে দিলেন সেটাকে। টিপে রক্ত বার করলেন। সেই রক্তের টিপ পরিয়ে দিলেন শিখরিণীর কপালে। নির্নিমেষে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা। খানিকটা শান্তি পেলেন যেন। এই তাঁর নিত্যকর্ম। দিনের পর দিন তিনখানা ফোটো এন্‌লার্জ করে এই করছেন তিনি। অদ্ভুত নেশার মতো হয়ে গেছে একটা। রিভল্‌বারটায় নূতন টোটা পুরে আবার সেটা আলমারিতে পুরে রাখলেন। তারপর টেবিলের ধারে এসে বসলেন চুপ করে দুই হাতের উপর মাথা রেখে। যে অশ্রুধারা একটু আগে ঝরে পড়েছিল তা শুকিয়ে গেল ক্রমশ। মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল আবার। ঈর্ষার ফুটন্ত আবর্তে সমস্ত মন আবর্তিত হতে লাগল। ক্রোধে ক্ষোভে পুড়ে যেতে লাগল যেন সর্বাঙ্গ। কলিং বেলের ঝনৎকারে হঠাৎ চমকে উঠলেন। নীচে নিশ্চয় এসেছে কেউ। হয় নগেন না হয় তুঙ্গশ্রী। বীরা দেবী এখানে আসবে না, কারণ এখানকার ঠিকানা তার জানা নেই। তার জন্যে একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করেছেন কেশব। বেলটা আবার বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন তিনি। কপাটটা বন্ধ করতে ভুলে গেলেন। নীচে গিয়ে দেখলেন, নগেন এসেছে। নগেনই মিলে স্ট্রাইক করাবার জন্যে গিয়েছিল. একেই মেঘসুন্দর অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

"কি হল?"—হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন কেশব।

"আল্‌টিমেটাম্ দিয়ে এসেছি। আমাদের দাবি যদি না মেটান, স্ট্রাইক হবে।"

"তুমি নিজে গিয়ে আল্‌টিমেটাম্ দিয়ে এসেছ? বাঃ, ব্রেভো।"

"হ্যাঁ। মেঘসুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে এসেছি।"

"কি বললেন তিনি?"

"কি আবার বলবেন, ক্ষেপে গেলেন আর ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তেড়ে এলেন আমাকে।"

"তেড়ে এলেন? কি রকম?"

"দারোয়ান ডেকে মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেন।"

"দারোয়ান ডেকে মারধোর করলেন? বল কি!"

"ও তো ওঁরা করবেনই। ওই দারোয়ানই তো ওঁদের সম্বল। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বাইজীর গান শুনছিলেন, আমি গিয়ে পড়াতে রসভঙ্গ হয়ে গেল একটু। চটবেন না?"

"বস বস। আস্পর্ধা তো কম নয়, দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিলে—"

নিজের পূর্বস্মৃতিটা হঠাৎ আবার মনে জেগে উঠল তাঁর। ক্রোধে লাল হয়ে উঠল সমস্ত মুখটা।

নগেন একটা চেয়ারে বসে বললে—"তাতে কি হয়েছে! ভালো কাজ করতে গেলে লাঞ্ছনা তো সহ্য করতেই হবে। দরকার হয়তো আবার আমি যাব। ওসব আমি গ্রাহ্য করি না।"

মৃদু হেসে নির্ভীক দৃষ্টি তুলে সে চাইলে কেশবের মুখের দিকে। আদর্শবাদী কলেজের ছেলে। আদর্শের জন্যে দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে সে। সরল চোখ দুটিতে উৎসাহের আলো ঝলমল করে উঠল নিমেষে।

"তোমাকে যেতেই হবে আবার। স্ট্রাইকটা করিয়ে আসতে হবে। হয়তো ভয় দেখিয়ে বা ভাঁওতা দিয়ে ওরা স্ট্রাইকটা হতে দেবে না।"

"বেশ, যাব আবার। আজই যাব?"

"বেশ তো। ওদের মধ্যেই থাক গিয়ে। কিছু টাকা না হয় দিয়ে দিচ্ছি তোমায়। কারণ স্ট্রাইকের সময় ওদের খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!"

"বেশ।"

"আচ্ছা, তুঙ্গশ্রী দেবীর কোনও খবর জান?"

"তিনি তো দেখলাম আসরে বসে বাইজীর গান শুনছেন।"

"বাইজীর গান শুনছেন?"

"তাই তো দেখলাম!"

"মেঘুবাবুর আসরে বসে?"

"হ্যাঁ। আমাকে যখন দারোয়নাটা অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল তখন সেখানেই বসেছিলেন। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না।"

কেশব সামন্ত গোঁফের অগ্রভাগে পাক দিলেন দু-একবার অন্যমনস্কভাবে। তারপর নগেনের দিকে চেয়ে বললেন—"তোমাকে তো চেনেন না উনি। তাই হয়তো কিছু বলেন নি।"

"বাঃ, আমাকে না চিনলেও আমি যে শ্রমিকদের জন্যেই লাঞ্ছনা সহ্য করেছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন উনি। সেখানে যারা ছিল সবাই বুঝতে পেরেছিল। উনি একটা প্রতিবাদও করতে পারতেন অন্তত। কিচ্ছু করলেন না।"

"কেন যে করেন নি, সেটা ওঁর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। হয়তো এমন কোন ব্যাপার ছিল যার জন্যে সেখানে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।"

নগেন চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখ চোখ দেখে বেশ মনে হতে লাগল যে, তুঙ্গশ্রীর ব্যবহারে মোটেই সে খুশি হয়নি। কেশব সামন্ত আড়চোখে চেয়ে দেখলেন এবার তার দিকে। নিজের দলের লোকেদের মধ্যে ঝগড়া যাতে না হয় সে বিষয়ে সর্বদা তিনি সচেষ্ট। তিনি জানেন, এই আত্মকলহই সব পণ্ড করে দেয় শেষে। তিনি আর এ বিষয়ে অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে দেওয়াল-আলমারিটা খুললেন এবং একশো টাকার পাঁচখানা নোট নগেনের হাতে দিয়ে বললেন—"তুমি চলে যাও। যদি বোঝ যে কোনও বিষয়ে আমার পরামর্শ নেওয়া দরকার তাহলে চলে এস। তা না হলে যতদিন স্ট্রাইক চলে ততদিন ওখানে থেকো। আরও টাকার দরকার যদি বোঝ খবর দিও, পাঠাবার ব্যবস্থা করব।"

নগেন এই চাইছিল। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজের একটা ভার পেয়ে সে যেন ধন্য হয়ে গেল। সোৎসাহে বেরিয়ে গেল টাকা নিয়ে।

কেশব সামন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে; শঙ্কা, চিন্তা, অনিশ্চয়তার অস্পষ্ট অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন খানিকক্ষণের জন্যে। কিছু একটা করতে হবে অবিলম্বে, মনের নিরালম্ব অবস্থা সহ্য করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। আবার তিনখানা ছবি নিয়ে পড়বেন? ছবি

তৈরি নেই এখন, যেগুলো প্রিন্ট করতে দিয়ে এসেছেন, সেগুলো হয়েছে কি? উপরের ঘরে যাবার সিঁড়ির দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন খানিকটা। আর একটা কথা মনে পড়াতে থেমে গেলেন হঠাৎ। বীরা ফিরেছে কি না খবর নিয়ে নিলে কেমন হয়? ট্যাক্সি করে যেতে কতক্ষণই বা লাগবে? ভ্রূকুঞ্চিত করে ডান দিকে গোঁফের ডগাটায় পাক দিলেন দুবার। কিন্তু তুঙ্গশ্রী যদি এসে উপস্থিত হয়? এসে তার ভাইকে দেখতে না পেয়ে সে আবার বেরিয়ে যাবে হয়তো। তার ভাইকে তিনি এখানকার একটা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার অনুপস্থিতিতে। ও-রকম একটা টি.বি রোগী বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। এর জন্যে তুঙ্গশ্রীর মানসিক বিপর্যয়টা সামলাবার জন্যে তাঁর নিজের থাকা দরকার। তা ছাড়া আর কেউ শোনবার পূর্বে ওখানে কি হল তা তিনিই প্রথমে শুনতে চান তুঙ্গশ্রীর মুখ থেকে। সে হয়তো কাউকে দেখতে না পেয়ে ওর পার্টির কারও বাড়িতে চলে যাবে। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে গেল কেশবের। যদিও ওই পার্টির খবর তিনিই বহন করছেন, কিন্তু পার্টির ছোঁড়াগুলোকে তিনি পছন্দ করেন না তেমন। তুঙ্গশ্রীকে হাতে রাখবার জন্যেই ওই চার-পাঁচটা বখাটে ছোঁড়ার খরচ জুগিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে। নগেনের পার্টির ছেলেরা এদের চেয়ে ঢের ভালো। না, থাকাই স্থির করলেন তিনি বাড়িতে। কিন্তু কি করা যায়? চুপ করে বসে থাকতে হবে? সে তো অসম্ভব। গ্রামোফোন রেকর্ড দেওয়া যাক দু-একখানা। বিলিতী নাচের অনেক রেকর্ড আছে তাঁর। উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে উদ্দাম বাজনা দিলেন একখানা। এর সঙ্গে আর একটা জিনিসও করে থাকেন তিনি। প্রাইমাস স্টোভটাও জ্বেলে দেন এর সঙ্গে। প্রাইমাস স্টোভের হু-হু শব্দের সঙ্গে জ্যাজ্ আর ক্যাকোফোনের কর্কশ সঙ্গীত যে আবহাওয়া সৃষ্টি করে তোলে, তাতে অদ্ভুত একটা আনন্দ পান কেশব সামন্ত। রেকর্ডটা দিয়ে স্টোভটা জ্বাললেন। তারপর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়। একটা রেকর্ড শেষ হয়ে গেল, আর একটা রেকর্ড দিলেন, তাবপর আর একটা। কিছুক্ষণ পরে এ-ও ভালো লাগল না আর। একটা বই নিয়ে বসলেন। ডিটেকটিভের গল্প আর অপরাধীদের জীবনচরিত ছাড়া আর কিছু পড়েন না তিনি। বিখ্যাত ফরাসী খুনে ল্যানড্রুর জীবনচরিত থেকেই প্রথমে তিনি নারীচরিত্রের চিরন্তন দুর্বলতার আভাস পান। ল্যানড্রু বুঝেছিল যে, বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ও-দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের অতি সহজে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়। তিনিও ঠিক ওই ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তুঙ্গশ্রী আর বীরাকে আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের ঠিক বিবাহের প্রলোভন দেখান নি, আকারে ইঙ্গিতে বিবাহের সম্ভাবনাটা ফুটিয়ে তুলেছেন কেবল। তাতেই কাজ হয়েছে। তুঙ্গশ্রী এবং বীরার মতো মেয়ে অপরিহার্য তাঁর পক্ষে। ওরা শক্তির জাত, ওদের তেজ আছে, ইচ্ছে করলে ওরাই আগুন জ্বালাতে পারে।

হিরণ্যগর্ভ আর মেঘসুন্দরের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে ওরাই পারবে। সাম্যবাদের প্রতি ওদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা। আদর্শের জন্যে যে-কোনও বিপদের মুখে ওরা এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। ওদের একটিমাত্র দুর্বলতা, ওরা পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে চায়, এবং হৃদয়ও আকর্ষণ করতে চায় সম্ভবত। ওদের এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছেন কেশব সামন্ত।...অস্ট্রিয়ার ক্রাউন প্রিন্স রুডল্ফের নিদারুণ প্রণয়কাহিনীটাই আবার নিবিষ্টচিত্তে পড়তে লাগলেন তিনি। অনেকবার পড়েছেন, তবু আবার পড়তে লাগলেন। গল্পটা তাঁর ভারি ভালো লাগে। হতভাগ্য ওই রাজকুমারের বাসনাতপ্ত ক্ষুব্ধ জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের সুর

যেন মেলে খানিকটা। রুডলফও সুখী ছিল না জীবন। যে রাজপরিবারের মেয়েকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল তাকে একটুও পছন্দ হয় নি তাঁর। পড়তে পড়তে নিজের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীকে মনে পড়ল। যদিও তাঁর বিবাহের কারণ পরম্পরার সঙ্গে রুডলফের বিবাহের কারণ-পরম্পরার কোনও মিল নেই, তবু রোষে ক্ষোভে ঘৃণায় ঈর্ষায় সমস্ত মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কেশব সামন্তর। হিরণ্যগর্ভের প্রতি মনটা নতুন করে বিরূপ হয়ে উঠল। হিরণ্যগর্ভই ষড়যন্ত্র করে এ সর্বনাশটা করেছে তাঁর। রুডল্‌ফ যেমন প্রণয়িনী মেরী ভেটসেরাকে নিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু আলিঙ্গন করেছিল, সেও কি তা পারবে? নিশ্চয় পারবে? শিখরিণী যদি আসে, নিশ্চয়ই পারবে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন কেশব সামন্ত। শিখরিণীকে আসতে লিখলে সে কি আসবে না? যদি লেখা যায় যে, তাঁর জীবন বিপন্ন—মৃত্যুকালে তাকে একটিবার চোখের দেখা শুধু দেখতে চায়? তিনি জানেন, শিখরিণী তাঁকে ভালবাসে। হয়তো আসতে পারে, হয়তো সব বাধা তুচ্ছ করে চলে আসবে সে। ক্ষতি কি একখানা চিঠি লিখতে! হয়তো চিঠি পাবেন না, হয়তো মন্মথ বা মেঘসুন্দরের হাতে পড়বে চিঠিখানা। হয়তো তাকে দেবেই না। ছিঁড়ে ফেলে দেবে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে। এসব সম্ভাবনা যে আছে তা জানেন তিনি। কিন্তু যদি পেয়ে যায়? পেয়ে যেতেও পারে। শিখরিণী ছাড়া আর কারও হাতে যদি চিঠিটা পড়ে, তাতে নতুন কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই তেমন, কারণ শিখরিণীর প্রতি তাঁর মনোভাবটা যে কি তা তো আর অবিদিত নেই কারও। শিখরিণীর কোন নূতন বিপদ হতে পারে এতে? ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন খানিকক্ষণ। চিঠিখানা এমনভাবে লেখা যেতে পারে যাতে শিখরিণীর দিকে থেকে যে কোনও দোষ নেই, তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। উত্তেজনা ভরে কাগজ আর কলম টেনে নিলেন কেশব সামন্ত। লিখলেন—

"শিখরিণী, আজ পর্যন্ত কোনও খবর পাই নি তোমার কাছ থেকে। তুমি হয়তো আমাকে ভুলেছ, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলি নি। আজ আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে শুধু একবার মাত্র চোখের দেখা দেখতে চাই। এসো। ইতি কেশব।"

চিঠিখানা লিখে খামে পুরে ঘণ্টা টিপলেন। চাকরটা এসে দাঁড়াল।

"তুঙ্গশ্রী ফেরে নি এখনও?"

"না বাবু।"

"এই চিঠিটা।—আচ্ছা থাক্, আমিই যাচ্ছি। তুঙ্গশ্রী এলে অপেক্ষা করতে বলিস, আমি আসছি এখুনি।"

চাকরের হাতে চিঠি পোস্ট করতে দিতে ভরসা হল না। নিজেই দ্রুতপদে নেবে গেলেন। একবার ইচ্ছে হল রেজেস্ট্রি করে দেন, কিন্তু তখনই মনে হল রেজেস্ট্রি চিঠি নির্ঘাত মেঘসুন্দর বা মন্মথর হাতে পড়বে। এমনই পাঠাতে হবে। কিছুদূরে গিয়ে রাস্তায় মোড়ে পোস্টবাক্স দেখতে পেলেন একটা, থমকে দাঁড়ালেন সেটার সামনে। তারপর ঠিক করলেন পোস্ট অফিসে ফেলবেন—একেবারে বড় পোস্ট অফিসে।

"এই ট্যাক্সি—"

ধাবমান ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠে পড়লেন তাতে কেশব সামন্ত।

"চলো জেনারেল পোস্ট অফিস।"

চলতে শুরু করল ট্যাক্সি। কেশব সামন্তের কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি চিঠিটা পেয়ে যায়—যদি এসে পড়ে!...উনপঞ্চাশ বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে মন ভেসে চলেছিল তাঁর। এলোমেলো একটা ঝড়ো হাওয়াও বইছিল, রাস্তার খড়কুটো কাগজের টুকরো উড়িয়ে।

তুঙ্গশ্রী এসে দেখলেন, নীচে কেউ নেই। নীচের যে ঘরটায় তাঁকে থাকতে দিয়েছিলেন কেশব সামন্ত, সে ঘরটায় তালা বন্ধ। তুঙ্গশ্রীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল ক্ষণকালের জন্যে। কেশববাবু সব কথা টের পেয়ে গেছেন না কি? তাড়িয়ে দিয়েছেন নাকি খোকনকে? এ ঘরে তালাবন্ধ কেন? খোকন তো কখনও বাইরে যায় না, বাইরের যাবার ক্ষমতাই নেই তার। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। উপরে গিয়ে কেশব সামন্তর খোঁজ করবেন কি না ভাবছিলেন এমন সময় চাকরটা হাজির হল। সে পাশের গলিতে বিড়ি কিনতে গিয়েছিল। কুলিটা তাঁর জিনিসপত্র নামিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

"দিদিমণি, আপনি এসেছেন? আপনাকে বাবু ওপরের ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছেন. তিনি একটু বাইরে বেরিয়েছেন। জিনিসগুলো এখানেই থাক, আমি আছি।"

"খোকন কথা?'

"তাঁকে বাবু কাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"হাসপাতালে, কোন্ হাসপাতালে?"

"তা তো জানি না। জ্বর বেশি হয়েছিল, তাই বাবু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।"

"ও।"—ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে উপরে উঠে গেলেন তুঙ্গশ্রী।

উপরে গিয়ে দেখলেন সামনের টেবিলে চিঠি লেখবার প্যাড রয়েছে একটা। নেড়ে-চেড়ে দেখলেন সেটাকে একবার। সেদিনের খবরের কাগজটা পাশেই ছিল। সেইটা তুলে দেখতে লাগলেন উলটে উলটে। হঠাৎ রাস্তার এলোমেলো দমকা হাওয়াটা ঘরে ঢুকল। উপরের ঘরের খোলা কপাটটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল, আবার খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। তুঙ্গশ্রী বেরিয়ে তেতলার সিঁড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন তেতলার ঘরটা খোলা রয়েছে। একটা গন্ধ পেলেন। ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর। বারুদের গন্ধ কি করে এল এখানে? সিঁড়ি বেয়ে তেতলার ঘরে উঠলেন তিনি। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। চারিদিকে রিভলবারের টোটা ছড়ানো। শিখরিণীর ছবিটা টাঙানো ছিল। তার কপালে লাল টিপ একটা। প্রথমে চোখে পড়ল সেইটেই, কিন্তু পরমুহূর্তেই হিরণ্যগর্ভ ও মেঘসুন্দরের গুলি বিদীর্ণ ফোটো দুটোও দেখতে পেলেন। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপব ঘাড় ফিরিয়ে ক্যামেরাটা দেখলেন। সমস্ত ব্যাপারটা যেন জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর কাছে। নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন যে হিরণ্যগর্ভ কেশব সামন্তর সম্বন্ধে যা যা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। কথাটা বুঝতে পারা মাত্র তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটিটা যেন সরে গেল। হঠাৎ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায় নিঃসম্বল মনে হতে লাগল।

এর পর তো আর এখানে থাকে সম্ভব নয়, কিন্তু যাবেন কোথা? এই বিশাল কলকাতা শহরে কে আশ্রয় দেবে তাঁকে? ধীরে ধীরে নেমে এলেন নীচে। একবার ইচ্ছে হল সোজা নেমে বেরিয়ে চলে যান। কেশব সামন্তর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যাক এইখানেই। কিন্তু

যাবেন কোথায়? আবার মনে হল কথাটা! না, যাবার মতো কোনও স্থান নেই আপাতত। যে দেশের জন্যে তিনি জীবন পর্যন্ত পণ করেছেন সে দেশের এমন একজনও কেউ নেই যে, তাঁর সত্য পরিচয় শুনে আশ্রয় দিতে পারে। দেশ কি দেশপ্রেমের মূল্য দেয় কোনও? দেশের জন্যে প্রাণবিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করল যেসব বীর, তাদের সকলের নামও মনে নেই আজ দেশবাসীর। তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় নি কেউ। উদ্বুদ্ধ হয়েছে কেবল চতুর ব্যবসায়ীরা, তারাই তাদের ছবি আর জীবনচরিতের পসরা সাজিয়ে টাকা রোজগার করছে। দেশপ্রেমের আদর্শকে কাজে লাগাচ্ছে কেশব সামন্তের দল নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে।

নীচে নেমে এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়লেন তিনি অবসন্ন হয়ে। পরমুহূর্তেই আবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। না, শঠের সঙ্গে ভদ্রতা করে কোনও লাভ নেই। যতক্ষণ নিজের নিরাপদ আশ্রয় একটা খুঁজে বার করতে না পারছেন, ততক্ষণ এইখানেই থাকতে হবে ভণ্ডামির মুখোশ পরে। খোকনকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে। তাঁর এক দূর-সম্পর্কের কাকা আছেন এখানে—মাধবকাকা—তিনি যদি খোকনকে নিয়ে যেতে রাজী হন, ভালো হয়। কারণ তিনি কিছুকাল মাদ্রাজে ছিলেন। ও-অঞ্চলের পথঘাট চেনা তাঁর। তুঙ্গশ্রী নিজেই যাবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে এখন নতুন আশ্রয় খুঁজতে হবে একটা। তা ছাড়া যে ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন সেইটেই চুম্বকের মতো টেনে রাখতে চাইছে তাঁকে এই কলকাতা শহরে। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটা উপন্যাসের কৌতূহলজনক পরিচ্ছেদে আটকে পড়েছেন তিনি যেন।

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল।

সোজা হয়ে উঠে বসলেন তুঙ্গশ্রী। কেশব সামন্ত প্রবেশ করলেন এসে।

"ও, আপনি ফিরেছেন? তারপর কি হল? আপনার জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম আমি।"

"হল না।"

"হল না মানে?"

"ধরা পড়ে গেলুম।"

"কি রকম?"

"প্ল্যানটা নিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় স্টেশনে হঠাৎ হিরণবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সোজা এসে বললেন—মাপ করবেন, আপনার জিনিসপত্র সার্চ না করে আপনাকে আমি যেতে দেব না। যদি বাধা দেন, পুলিশ ডাকব।"

"তার পর?"

"তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে ট্রেনটা ছেড়ে গেল। দেখলাম, রাত্রে যখন ওখানে থাকতেই হবে তখন ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও লাভ নেই। ফিরে এলাম তাঁর সঙ্গে তাঁরই গাড়িতে।"

"জিনিসপত্র সার্চ করলে আপনার।"

"আমি নিজেই বার করে দিলুম। তারপর ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার জন্যে হেসে বললুম—ডিনামাইট দিয়ে ওড়াবার যে কথা আপনি বলছেন তা ভুল। কেশববাবু আপনার এই

মিলের প্ল্যান অনুসারে নিজে একটা মিল করাবেন, তাই আমাকে পাঠিয়েছিলেন প্ল্যানটা আনতে।"

"ডিনামাইটের কথা ও শুনেছে না কি?"

"সব শুনেছে। আমাদের দলের মধ্যে ওর গুপ্তচর আছে কে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন কেশব সামন্ত।

"আপনার ওই বানানো গল্পটা বিশ্বাস করলে হিরণ?"

"বিশ্বাস করেন নি বোধ হয়। তবে ও-সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনাও করেন নি। একটু চাপা-গোছের লোক মনে হল। বিশেষ কথাবার্তা আর বলেন নি আমার সঙ্গে। তবে অভদ্রতাও করেন নি তেমন কিছু।"

"কাল মেঘুবাবুর আসরে বসে বাইজীর গান শুনেছেন খবর পেলাম।"

"ও পেয়েছেন না কি!"—খুব সপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন তুঙ্গশ্রী—"কে বললে আপনাকে?"

"নগেন। কাল সে মেঘুবাবুর কাছে আল্‌টিমেটাম্‌ নিয়ে গিয়েছিল একটা।"

"ও, হ্যাঁ, সে সময়ে আমি ছিলুম। হিরণবাবু আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন সেখানে, কি করি বলুন? মোগলের হাতে পড়েছিলুম তো, তাই খানাও খেতে হয়েছে একটু-আধটু। খোকনকে হাসপাতালে দিয়েছেন না কি?"

"একটা নার্সিং হোমে দিয়েছি আপাতত। আমার চেনাশোনা একজন ডাক্তারের নার্সিং হোম। ভালোই থাকবে সেখানে।"

"ঠিকানাটা কি? দেখে আসি তাকে একটু।"

"এই যে। ঠিকানা-লেখা কার্ডই আছে একখানা।"

ড্রয়ার খুলে কার্ডটি দিলেন তাঁকে।

"আমার ঘরের চাবিটা দিন। জিনিসপত্র বাইরে পড়ে আছে সব।"

"ও, হ্যাঁ। এই যে।"

চাবিটা নিয়ে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আমি খোকনকে দেখে আসি একটু। ফিরতে হয়তো আমার রাত হয়ে যাবে। আমার জন্যে আপনি অপেক্ষা করবেন না যেন।"—হেসে বেরিয়ে গেলেন তুঙ্গশ্রী।

গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেশব সামন্ত। নগেনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে মেঘসুন্দর, আর তুঙ্গশ্রীর কাছ থেকে মিলের প্ল্যান ছিনিয়ে নিয়েছে হিরণ্যগর্ভ। গোঁফের সূক্ষ্ম ডগাকে সূক্ষ্মতর করতে করতে চিন্তা করতে লাগলেন তিনি—এখন কি কর্তব্য? ঠিক করলেন বীরার খবর নিতে হবে। বাঁধের ব্যাপারটা কতদূর কি হল দেখতে হবে। ঘণ্টা টিপলেন। চাকরটা আসতেই বললেন—"চা দে আমায় তাড়াতাড়ি। আমাকে এখনি বেরুতে হবে।"

চাকর চা করতে চলে গেল।

কেশব সামন্ত আর একটি বিলিতী অর্কেস্ট্রার রেকর্ড চড়ালেন গ্রামোফোনে।

ডাক্তার সেনগুপ্ত (যাঁর নার্সিং হোমে খোকনকে পাঠিয়েছিলেন কেশববাবু) তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন। গোলগাল নাদুসনুদুস ফরসা ভদ্রলোকটি। হেসে হেসে অনেক গল্প

করলেন। নিজের সমস্ত রোগীর কাছে নিয়ে গেলেন তাঁকে। খোকনের কাছেও নিয়ে গেলেন। দিদিকে দেখে খুশি হল খোকন। তার রোগা মুখে প্রদীপ্ত চোখ দুটি আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। এতগুলি যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীকে একসঙ্গে দেখে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন তুঙ্গশ্রী। তিনি আরও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যখন ডাক্তার সেনগুপ্ত বললেন যে, প্রতি বৎসর কোটি কোটি লোক মারা যাচ্ছে এই রোগে। দেশের স্বাধীনতা ভোগ করবার জন্যে বেঁচে থাকবে তাহলে কে? তাঁর মনে হল ডাক্তাররাই দেশের সেবক। হিরণ্যগর্ভের কথাও মনে পড়ল।

"একটা অবান্তর কথা জিগ্যেস করছি ডক্টর সেনগুপ্ত, কেউ যদি টাইফয়েড কালচার খেয়ে ফেলে তার কি হবে?"

প্রশ্নটা শুনে ডাক্তারবাবু বিস্মিত হয়ে গেলেন একটু।

"টাইফয়েড কাল্‌চার খাবেন? কেন?"

"যদি কেউ খায়, তাহলে কি হবে জানতে চাইছি।"

"খুব সম্ভবত টাইফয়েড হবে।"

"টাইফয়েড তো খুব সাংঘাতিক অসুখ, নয়?"

"খুব সাংঘাতিক। সে কথা আবার বলতে।"

চুপ করে রইলেন তুঙ্গশ্রী। ডাক্তারবাবুও চুপ করে রইলেন।

"আমার ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠানোই ভালো তাহলে?"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা, দেখুন তো, এটা কি রকম স্যানাটোরিয়াম?'

পকেট থেকে হিরণ্যগর্ভের চিঠিটা বার করে দেখালেন।

"এটা খুব ভালো। এখানে যদি ফ্রী সীট পান সে তো ভাগ্যের কথা। এঁরা কি ডোনার সেখানকার?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব সেইখানেই নিয়ে যান।"

"আচ্ছা সেই ব্যবস্থাই করি তাহলে।"

হাসপাতাল থেকে তুঙ্গশ্রী চলে গেলেন তাঁর মাধবকাকার কাছে।

বীরা দেবী একটু বলিষ্ঠ প্রকৃতির মহিলা। যদিও ফরসা তবু হঠাৎ দেখলে সাঁওতালনী মনে হয়। দেহের গঠন বেশ আঁটসাঁট। ঠোঁট বেশ পুরু, ভ্রূযুগলও বেশ চওড়া, চোখের দৃষ্টি শুধু নির্ভীক নয়, একটু উদ্ধতও। তিনিও একটু আগেই ফিরেছিলেন। তিনি সোজা ট্যাক্সিতে গিয়েছিলেন এবং ট্যাক্সিতে ফিরেছেন। তিনি ট্রেনে যেতে রাজী হন নি। তাঁর মতে ট্রেনে অযথা সময় বেশি লাগে। বলা বাহুল্য, সমস্ত খরচই কেশব সামন্তর। অস্পৃশ্য এবং অত্যাচারিতদের উদ্ধারসাধনকল্পে যে ছোট বাড়িটি কেশব সামন্ত ভাড়া করে দিয়েছিলেন বীরা দেবীকে, সে বাড়িতে বীরা দেবী এবং বীরা দেবীর একটি ভাই থাকেন। ভাইটি কলেজে পড়ে। বাইরের ছোট ঘরটি অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অফিসের জন্য যে পিওনটা কেশব সামন্ত রেখেছেন সে বীরা দেবীর ঘরের কাজকর্মও করে। ট্যাক্সি থেকে কেশববাবু যখন নামলেন, তখন এই পিওনটি বাইরের ঘরে বসে ভজন গাইছিল। কেশববাবুকে দেখে সে ভজন থামিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"মাইজী ফিরেছেন?"

"হাঁ বাবু, একটু আগেই ফিরেছেন।"

"খবর দাও।"

চাকর একটু ইতস্তত করতে লাগল।—মাইজী বলেছেন যে, ছোটদাদাবাবু বাড়িতে না থাকলে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করবেন না।"

কেশববাবু ধমকে উঠলেন।

"তুমি বলগে যাও— কেশববাবু এসেছেন। তোমাকে ডেঁপোমি করতে হবে না।"

ধমক খেয়ে চাকরটা চলে গেল। কেশববাবু বাইরের ঘরের চেয়ারটায় বসলেন গিয়ে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল তাঁকে। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বীরা দেবী এলেন।

"আপনি অনর্থক শিবুকে বকলেন কেন? ব্রাহ্মণ কাঁদছে। সত্যিই আমি চাই না যে, নিখিল যখন থাকবে না তখন বাইরের কেউ আসুক।'

বীরা দেবী ইচ্ছে করেই বেশী মাইনে দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ চাকর রেখেছেন। তাকে দিয়ে জুতো পরিষ্কার পর্যন্ত করান। যে কুসংস্কার এতদিন তাঁর পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে এই সফল প্রতিবাদ করতে পেরে প্রতি মুহূর্তেই তিনি আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন। কিন্তু তাই বলে তিনি শিবুর প্রতি নিষ্ঠুর নন। বরং একটু অধিক মাত্রায় সদয়। অভাবের তাড়নায় বেশি বেতনের লোভে শিবুকে এই অস্পৃশ্যার সেবা করতে হচ্ছে বলেই তার মনটা বেশি স্পর্শকাতর সম্ভবত। একটু ধমকালেই তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে। তার চোখে জল দেখে বীরা দেবী একটু বিচলিত হয়েছিলেন এবং একটু রুষ্ট হয়েই বেরিয়ে এসেছিলেন।

"আমি আসি, এটাও আপনি চান না?"—কেশববাবু বললেন বিস্মিত কণ্ঠে।

'না।"—দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন বীরা দেবী।

নির্বাক হয়ে রইলেন কেশব সামন্ত। এর উত্তরে কি যে বলবেন তা মাথাতেই এল না তাঁর। কোনও যুবতী যদি একা কারও সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে কি-ই বা বলবার থাকতে পারে? ক্রোধপ্রকাশ না করাটাই এখন আত্মসম্মান বজায় রাখবার একমাত্র উপায়। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল সেটা।

একটু তিক্ত হাসি হেসে এবং গোঁফের ডগায় একবার পাক দিয়ে কেশব বললেন—"বাঁধের ব্যাপারটা কি হল তাই জানতেই আমি এসেছি। এমন সময় আপনার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করার আর কোনও উদ্দেশ্য নেই আমার।"

শেষে এই অংশটুকু না বললেও পারতেন। তাহলে বীরা দেবীর মুখ দিয়ে নিরানন্দজনক উত্তরটাও এত রূঢ়ভাবে হয়তো নির্গত হতো না।

"বাঁধ কাটলে জেলেদের যা লাভ হতো, তার চেয়ে ঢের বেশি লাভের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তাদের হিরণবাবু। সেইজন্যে বাঁধ কাটা হয় নি।"

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কেউ যেন বিঁধিয়ে দিলে কেশব সামন্তর ব্রহ্মরন্ধ্রে।—"হিরণবাবু জেলেদের বেশি লাভের কি বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তা জানতে তো আপনাকে পাঠাই নি ওখানে এত খরচ করে। আপনাকে পাঠিয়েছিলাম জেলেদের নিয়ে গিয়ে বাঁধটা কাটিয়ে দিতে। তার কি করেছেন, সেইটেই জানতে চাই।"

মৃদু হেসে বীরা দেবী বললেন—"একটা কথা মনে রাখবেন কেশববাবু, আমি আপনার চাকর নই। আমার জীবনের ব্রত অস্পৃশ্যদের সেবা করা। আপনারও সেই একই উদ্দেশ্য বলেই আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আপনি এ কাজে সাহায্য করেছেন অর্থ দিয়ে, আমি করছি সামর্থ্য দিয়ে। আমরা সহকর্মী, আমাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। আমি বাঁধ কাটবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে মহিমগঞ্জে চলে গিয়েছিলাম একটা হরিজনদের সভায় বক্তৃতা দিতে। এসে শুনলাম, যা শুনলাম, তাতে একটু আশ্চর্য লাগল—"

বীরা দেবীর কথার সুরে যদিও কেশব সামন্তর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল, তবু তিনি আত্মসংবরণ করে বলেন—"কী শুনলেন?"

"শুনলাম, হিরণবাবুদের হাতিতে চড়ে ঠিক আমার মতো পোশাক-পরা একটি মেয়ে ভৈরবপুরের মাঠে এসে জেলেদের নাকি ফিরে যেতে বলেছে। তাঁরা বাঁধ কাটতেই আসছিল।"

"আপনার মতো পোশাক-পরা মেয়ে, হাতিতে চড়ে? তারপর?"

"আমি ফিরে এসে শুনলাম। শুনে দলবল নিয়ে আবার বাঁধ কাটাবার আয়োজন করছিলাম। এমন সময় হিরণবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোকে এসে হাজির হল। এই দেখুন চিঠি—"

বীরা দেবী উঠে গিয়ে একটি চিঠি এনে দিলেন। কেশব সামন্ত পড়তে লাগলেন রুদ্ধশ্বাসে—

"সুচরিতাসু,—

বীরা দেবী, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। গরিব জেলেদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে যে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করে এবং প্রাণ তুচ্ছ করে এত দূরে এসেছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদও গ্রহণ করুন। জেলেদের দাবি যে ন্যায্য, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু বাঁধটা কেটে দেওয়ার একটু অসুবিধা আছে। বাঁধটা কেটে দিলে অনেকগুলি চাষীর ফসল ডুবে যাবে। আবার কতকগুলি গরিব লোক অসুবিধায় পড়ে যাবে। এই উভয় সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আমি তাই একটা মতলব করেছি। আমার নিজের জমিদারিতে মাছপোখরা বলে যে বড় বিলটা আছে, সেইটে ওই ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের এ বছরের জন্যে দিতে রাজী আছি। কেশববাবুকে ওরা যে সেলামি দিত, সেই সেলামি পেলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। এ বছরের সেলামি ওরা কেশববাবুকে যদি দিয়ে ফেলে থাকে তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার বিলে ওরা বিনা সেলামিতেই এ বছর মাছ ধরুক। দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত অশান্তির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এ মূল্য আমি দিতে রাজী আছি। আশা করি, আমার এ প্রস্তাব আপনি মঞ্জুর করবেন। আজ সকালে ভৈরবপুরের মাঠে ক্রুদ্ধ জেলেদের নিবৃত্ত করবার জন্যে সামান্য যে কৌশলটুকু অবলম্বন করেছিলাম তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। আপনার অবর্তমানে দাঙ্গা থামানোর আর কোনও উপায় আমার বুদ্ধিতে এল না। আশা করি, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উৎসুক আছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশকে এখন গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের মতো কর্মীরই এখন প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের কর্মপন্থা একটু বিশিষ্ট ধরনের। পূর্বদিগন্তের বাণী আলোকের বাণী, আশার বাণী। ভালোবাসা, বিশ্বাস, সাম্য— এই সব আমাদের পাথেয়। ঝগড়া মারামারি হিংসা-দ্বেষ নয়। যদি কখনও আপনার

সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়, তাহলে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাতত বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীহিরণ্যগর্ভ বর্মন"

"মহৎ ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন নাকি?"

"না, সময় পেলাম না। এখানে কাল সকালে একটা মীটিং আছে আমাদের। লোকটিকে কিন্তু সত্যিই মহৎ বলে মনে হল। আপনার জমিদারিতেও দেখলাম সবাই ওঁকে খাতির করে।"

"হ্যাঁ, তা করে। লোক ভালো। আচ্ছা, তবে উঠি।"

কেশব সামন্ত উঠে দাঁড়ালেন। আর বসে থাকতে পারছিলেন না তিনি। সারাজীবন প্রতিপদে যে লোকটার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, তারই হাতে আবার নতুন মার খেয়ে তাঁর রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। সমস্ত মুখখানা পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবু যাবাব সময় দেঁতো হাসি হেসে তাঁকে বলতে হল—"দাঙ্গা-টাঙ্গা যে হয়নি, তা ভালোই হয়েছে এক পক্ষে। বিনাযুদ্ধে যদি কাজ হাঁসিল হয়ে যায়, তাহলে দাঙ্গা করবার দরকারই বা কি?"

"তা তো বটেই।"

"আচ্ছ, নমস্কার—"

"নমস্কার ।"

কেশব সামন্ত বেরিয়ে গেলেন।

সাত

হীরা বাইজী মল্লারের যে নূতন গানটি বিনুকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেইটিই গাইছিল বিনু মেঘসুন্দরের কাছে বসে। মেঘসুন্দরের হাঁটুর ব্যথা অনেক কম, বাঁধ কাটা নিয়ে যে অনর্থক একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হয় নি এর জন্যে মনও বেশ প্রফুল্ল। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির খুব তারিফ করেছেন তিনি। মনে মনে প্রায় সঙ্কল্প করে ফেলেছেন যে, হিরণ্যগর্ভকে উত্তরাধিকাবী করে যাবেন। তাঁকে বঞ্চিত করবার যে বাসনা মাঝে মাঝে তাঁর মনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেটা আপাতত চাপা পড়ে গেছে। তাঁর মিলে স্ট্রাইক শুরু হয়েছে। হিরণ্যগর্ভকেই সেখানে পাঠিয়েছেন মন্মথর সঙ্গে। আশা করছেন, সেখানেও একটা মিটমাট করে ফেলতে পারবে সে। আকাশ মেঘ-মেদুর। ভিজে হাওয়ায় কদমফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাঁর বুড়ো তবল্‌চী তমিজ মিঞা কাওয়ালি চমৎকার বাজাচ্ছে। গান জমে উঠেছে খুব। বিনু দু-একদিন ভয়ে ভয়ে ছিল। কিন্তু তুঙ্গশ্রী চলে যাওয়ার পরও যখন কোনও গোলমাল হল না তখন সে বুঝতে পারলে যে, ভদ্রমহিলার সত্যিই কথার ঠিক আছে। এবং এই সূত্র ধরে ক্রমশ তার মনে গোপনে গোপনে যে দুরাশা জেগে উঠেছিল, তারই মাধুর্য মদির করে তুলেছিল তার চিত্তকে। ভাবছিল, উনি যখন কথা দিয়ে গেছেন তখন অসম্ভব হয়তো সম্ভব হবে। যতই ভাবছিল, ততই রঙিন হয়ে উঠছিল তার কল্পনা। সমস্ত প্রাণ ঢেলে সে গাইছিল—

নিশি দিন বরষণ লাগে
উমড়ি ঘুমড়ি ঘন আএ

দাদুর ঘোর ঘন গরজ, গরজ দামিনী
চমকত ডর লাএ।

গান যখন খুব জমে উঠেছে, মেঘসুন্দরের মন যখন মহানন্দে সুরলোকে পাখা মেলে বেড়াচ্ছে, মর্ত্যের সমস্ত বন্ধন-গ্লানি থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তির আনন্দে যখন তিনি মশগুল, তখন সহসা রসভঙ্গ হল হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করাতে।

"কি হল?"—একটু বিরক্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন মেঘসুন্দর।

"মিটমাট করে ফেললুম। ওদের দাবি মোটামুটি মেনেই নিলুম আপাতত।"

"মেনে নিলে! তাহলে তো পথে বসতে হবে আমাকে।"

"তা হবে না। তবে লাভ কিছু কম থাকবে। আজকাল প্রত্যেক জিনিসই দুর্মূল্য, আগেকার দামের চেয়ে তিন গুণ, ওদের মজুরি বাড়িয়ে না দিলে ওরা বাঁচবে কি করে?"

"কিন্তু আমি ব্যবসা করতে বসেছি, দানছত্র তো খুলি নি।"

মন্মথও প্রবেশ করেছিলেন হিরণ্যগর্ভের পিছু পিছু। তিনিও আড়চোখে একবার চাইলেন হিরণ্যগর্ভের দিকে । ভাবটা—আমি তখনই বলেছিলাম, চটে যাবেন উনি।

হিরণ্যগর্ভ একটু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—"দানছত্র খুললে তো লাভের কোনও প্রশ্নই থাকত না। এতে লাভ থাকবে আপনার। কিন্তু কিছু কম থাকবে।"

"তিন গুণ মাইনে দিলে লাভ থাকবে?"

"তিন গুণ থেকে কমিয়ে দ্বিগুণ করেছি। আর একটা শর্তও করেছি। ব্যাপারটা শুনুন তাহলে ভালো করে।"

গতিক সুবিধার নয় দেখে বিনু উঠে ভিতরে চলে গেল। বিনুকে উঠে যেতে দেখে মেঘসুন্দর তবলচী তমিজ মিএগকে বললেন—"তুমিও যাও এখন তমিজ। এখন আর জমবে না, ফাঁকে পড়ে গেছি।"

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"ওদের আমি বলেছি যে, মিলটা তোমরাই চালাও। ওর হিসেবপত্তর তোমরাই কর। এক বছর আমরা তোমাদের দাবি অনুসারে দ্বিগুণ মাইনে দিচ্ছি, কিন্তু পরের বছর থেকে অর্থাৎ মিলের ভার যখন থেকে তোমরা নেবে, তখন থেকে আর মাইনের কোনও দায়িত্ব আমাদের থাকবে না। কত মাইনে তোমাদের নেওয়া উচিত সেটা তোমরাই ঠিক করে নিও। আমাদের বছরে শতকরা দশ টাকা দিয়ে যেতে হবে আমরা যত টাকা ইনভেস্ট করেছি তার ওপর। মিল বাড়াবার জন্যে যদি টাকার দরকার হয় সে টাকাও আমরাই দেব এবং ওই হারে সুদ নোব। এতে ওরা রাজী আছে।"

"তার মানে, আমার মিলটা তুমি ওদের সঁপে দিয়ে এলে?" আর্তনাদ করে উঠলেন যেন মেঘসুন্দর।

"না, মিলের ওপর পুরো কনট্রোল আমাদেরই থাকবে। মিল চালাচ্ছে যারা, তারা শুধু ন্যায্য লাভের ন্যায্য অংশীদার হবে। আপনি টাকা দিয়েছেন বলে আপনি শতকরা দশ টাকা করে পাবেন। সেটা কি কম হল?"

"কম নয়? হানড্রেড্ পার্সেন্ট টু হানড্রেড্ পারসেন্ট লাভ করছে মাড়োয়ারীরা, সে খবর রাখ?'

"ও জিনিস বেশি দিন আর চলবে না।"

"যতদিন চলে ততদিন চালাতে হবে। ব্যাঙ্কে টাকা না থাকলে হাঁড়ীর দুর্দশা হবে যে!"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে রইলেন।

"লক্ষ্মীছাড়া উড়নচণ্ডে কোথাকার—"

হিরণ্যগর্ভ তবু কোনও উত্তর দিলেন না।

"পূর্বপুরুষের বিষয়-সম্পত্তিগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে সব!"

হিরণ্যগর্ভ তবু নীরব! মন্মথ সিং উসখুস করে কান চুলকুলেন দু-একবার, তারপর ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, হিরণ্যগর্ভ তাঁকে বললেন—"কন্‌ট্রাক্টটা কোথা?"

"ছোট সুটকেসটাতে আছে রহমনের কাছে। আচ্ছা, আমি ডাকাচ্ছি তাকে।"

একটা ছুতো পেয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি হনহন করে।

"কিসের কন্‌ট্র্যাক্ট?"

"ওদের সঙ্গে যেটা করেছি, তাতে আপনাকে সই করতে হবে।"

"আমি সই করব না।"

ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে ধরলেন।—"হ্যালো, হ্যাঁ, আমি মেঘসুন্দর। অ্যাঁ, ক্যাণ্ডেলের দাম আরও নেমেছে? আচ্ছা, জানাচ্ছি একটু পরে।"

রিসিভারটা নামিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি—"আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেল তোমরা। মন্মথর কথায় ধরে রাখলুম শেয়ারগুলো, দাম হু-হু করে পড়ে যাচ্ছে।"

হিরণ্যগর্ভ কোনও জবাব দিলেন না। দেওয়ালে একটা সেতার টাঙানো ছিল, সেইটের তারগুলোয় আঙুল দিয়ে মৃদু মৃদু আওয়াজ করতে লাগলেন পিছন ফিরে।

"ওটার দফা নিকেশ করবার চেষ্টা করছ কেন আবার?"

বৃদ্ধ মাহুত রহমান ছোট একটা সুটকেস নিয়ে প্রবেশ করল।

হিরণ্যগর্ভ এগিয়ে গিয়ে সুটকেসটা খুলে কন্‌ট্রাক্টটা বার করলেন তারপর মেঘসুন্দরের কাছে এগিয়ে গেলেন।

"সই করে দিন। আমি আপনার হয়ে তাদের কথা দিয়ে এসেছি।"

মেঘসুন্দর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি তুলে তার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সই করে দিলেন খচখচ করে। হিরণ্যগর্ভ সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু দূরে গিয়ে ফিরলেন আবার।

"আপনার হাঁটুর ব্যথাটা কেমন আছে?"

"সে খোঁজে তোমার দরকার কি?"

"গাউটের ভালো একটা ওষুধ এসেছে আমার কাছে। খেয়ে দেখবেন?"

"না।"

মুচকি হেসে আবার বেরিয়ে গেলেন হিরণ্যগর্ভ। কাকুর 'না' মানেই যে শেষ পর্যন্ত 'হ্যাঁ' তা ভালো করেই জানেন তিনি। ঠিক করলেন, ওষুধটা এখনই এনে নিজে হাতে এক দাগ খাইয়ে যাবেন। সত্যি বড় দুঃখ হয় তাঁর কাকুর জন্যে। স্নেহের কাঙাল, সুরের কাঙাল, কেবল বিষয়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে উপভোগ করতে পারেন না জীবনকে। ক্রমাগতই সব জট পাকিয়ে যায় যেন।

মাহুত রহমান কিন্তু গেল না। সে প্রায় মেঘসুন্দরেরই সমবয়সী। যদিও ভৃত্য, কিন্তু

আযৌবন সহচর বলে বন্ধুত্বের দাবিও তার আছে একটু। বাবু আজকাল হাতিতে চড়েন না, রহমনের সঙ্গে দেখাও হয় না আজকাল। তাই এ সুযোগ সে ছাড়বে না ঠিক করলে। সেদিন হাতিতে তুঙ্গশ্রী ও হিরণ্যগর্ভের কথোপকথন থেকে বিনু-বিশু সম্পর্কে যে সাংঘাতিক সংবাদটুকু সে সংগ্রহ করেছিল, সেটা মেঘসুন্দরকে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে হল তার। না জানালে নিমকহারামি হবে। সেলাম করে দাঁড়াল সে এসে মেঘসুন্দরের সামনে।

"কি রহমন, ভালো আছ তো? অনেকদিন তোমায় দেখি নি।"

"হুজুরের দোয়াসে চলে যাচ্ছে কোই সুরতসে।"

"তারপর কি খবর আর?"

"চুপসে একঠো বাত কহনে চাহতে হেঁ হুজুরকা পাস।"

"কি বাত?"

রহমন উবু হয়ে বসল এসে মেঘসুন্দরের কাছে এবং চোখ-মুখ রহস্যময় করে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে গেল।

মেঘসুন্দর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যেন। সমস্ত শুনে গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন—"আচ্ছা, তুমি বিশুকে ডেকে দিয়ে যাও।"

"হ্যাঁ, একটু সমঝিয়ে শাসন করে দিন।"

রহমন চলে গেল। অস্থির হয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর। অস্থিরভাবে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। তারপর হঠাৎ বেহালাটা তুলে বাজাতে আরম্ভ করে দিলেন পাগলের মতো। সারঙের একটি গতে আগুন ছুটতে লাগল যেন। খানিকক্ষণ বেহালা বাজাবার পর মনটা যেন শান্ত হল। চুপ করে বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে গুনগুন গান ধরলেন। খুট করে শব্দ হতেই চেয়ে দেখলেন বিশু এসেছে।

"আপনি কি ডেকেছেন আমাকে?"

"হ্যাঁ। এস।"

"কেন?"

"জুতিয়ে তোমার পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব বলে।"

স্তম্ভিত বিশু দাঁড়িয়ে রইল বজ্রাহতবৎ।

"এদিকে সরে এস।"

বিশু এগিয়ে এল আর একটু।

"বিনুকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ না কি? খবরটা শুনে কৃতার্থ হয়ে গেছি একেবারে। ইচ্ছে করছে গান গাই—" বলেই কীর্তনের সুরে ধরে দিলেন—

এস এস নাগর প্রেম-সওদাগর
ঘুড়িতে ছেড়েছ নাকি সুতো,
ধরেছি ছাড়িব না তো এস এস পিঠ পাতো
খুলিয়া রেখেছি চটিজুতো।

আগুন ছুটতে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। বিশু নীরব।

"কথার জবাব দিচ্ছ না যে? যা শুনলাম তা কি সত্যি?"— গর্জন করে উঠলেন

মেঘসুন্দর। আমতা আমতা করে বিশু বললে, "সত্যি, বিনুকে আমি ভালোবাসি। বিনুও আমাকে ভালোবাসে।"

"বলতে লজ্জা করল না তোমার—পাজি নচ্ছার শুয়ার হারামজাদা? বামন হয়ে চাঁদে হাত! ছুতোরের ছেলে হয়ে আমাদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবে তুমি? বেরিয়ে যাও আমার এলাকা থেকে এই মুহূর্তে। বেরিয়ে যাও—"

চটিজুতোটা তুলে ছুঁড়ে মারলেন, লাগল গিয়ে সেটা বিশুর কপালে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হিরণ্যগর্ভ প্রবেশ করলেন পিছনের দ্বার দিয়ে ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে।

"কী হল!"—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

"বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।"—পুনরায় গর্জন করে উঠলেন মেঘসুন্দর। বিশু ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেল।

"কি হয়েছে তা তো তুমিও জান। তোমারই উচিত ছিল শোনামাত্র ওকে ঘাড় ধরে দূর করে দেওয়া জমিদারি থেকে। সব শুনে চুপ করে আছ কি করে তাই তো মাথায় আসছে না আমার।"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে রইলেন। কি উত্তর দেওয়া উচিত সহসা ঠিক করতে পারলেন না।

"চুপ করে আছ যে?"

গলাটা একটু পরিষ্কার করে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আমি আজই আপনাকে বলব ভাবছিলাম যে, ওদের বিয়ে দিয়ে দিন।"

"বিয়ে দিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ। তাই উচিত। কেশবের বেলাতে এটা করেন নি বলেই চারদিকে এমন অশান্তির আগুন জ্বলছে।"

"এ নিয়ে আর তর্ক করবার ইচ্ছে নেই তোমার সঙ্গে। অনেক তর্ক করেছি। আমার বাড়িতে আমার মত আঁকড়ে থাকবার স্বাধীনতা দাও আমাকে। দোহাই তোমাদের!"

"আপনার বাড়িতে আপনার মত আঁকড়ে আপনি থাকুন। আমার বাড়ি থেকে ওদের বিয়ে হোক।"

"ওদের বিয়ে হবে না। অসম্ভব। এ নিয়ে আমাকে আর একটি কথা বোলো না বলছি।"

"ওরা যদি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে, কি করবেন আপনি?"

"বিশুকে চাবকে দূর করে দেব আমার জমিদারি থেকে, আর বিনুকে তালা বন্ধ করে রেখে দেব। এই গণপৎ সিং—"

দারোয়ান গণপৎ সিং দাঁড়াল এসে।

"মন্মথবাবুকে ডাক একবার।"

গণপৎ সিং চলে গেল।

মেঘসুন্দর বললে—"মন্মথকে এখনই বলছি চাবি বন্ধ করে রাখুক ওকে।"

হিরণ্যগর্ভ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল, তারপর বেরিয়ে গেলেন। মেঘসুন্দর উঠে দাঁড়ালেন আবার। আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। সারা ঘরময়। উঃ, কি কালভুজঙ্গিনী! একেই দুধকলা খাইয়ে পুষেছেন তিনি ছেলেবেলা থেকে। বিনুর মুখটা মনে

পড়ল হঠাৎ। সত্যিই ভালোবাসার মতো চেহারা। কিন্তু ও কি বলে প্রশ্রয় দিতে গেল ওই ছুতোরের ছেলেটাকে? একবার ইচ্ছে হল, ডেকে জিগ্যেস করেন ওকে। কিন্তু কেমন যেন ভয় হল। মনে হল, ও যদি দাবি করে এসে তাহলে হয়তো কিছু বলতে পারবেন না তিনি। সব গুলিয়ে যাবে। না, না,—এ কিছুতে হতে দিতে পারেন না, এ অসম্ভব। ওকে আটকে রাখতে হবে। যেমন করে হোক বাধা দিতে হবে। কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হলেই ভুলে যাবে। শিখরিণী তো ভুলেছে। ভুলেছে কি? দ্বারপ্রান্তে শব্দ হতেই ফিরে দেখলেন, শিখরিণী দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে। ফলের রস এনেছে তাঁর জন্যে।

আট

সাত দিন অবিশ্রান্ত ঘুরেও তুঙ্গশ্রী একটা আশ্রয় যোগাড় করতে পারলেন না কোথাও। কলকাতায় এসে যে রাজনৈতিক দলটি তিনি গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে এক কেশব সামন্ত ছাড়া এমন আর কেউ নেই যার আর্থিক সঙ্গতি আছে। অধিকাংশই পরনির্ভরশীল কিংবা দরিদ্র। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বেকার যুবক-যুবতী, স্বল্পবিত্ত মিলের কর্মী, কলেজের দু-একজন তরুণ অধ্যাপক এরাই সে দলের সভ্য। নিয়মমতো পার্টি-ফাণ্ডে কিছু কিছু টাকা প্রত্যেকেই দেন বটে, কিন্তু সে কেবল নিয়ম রক্ষা করবার জন্যে। দু-একজন চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেও সে নিয়ম পালন করছেন—এ খবর তুঙ্গশ্রী নিজে জানেন। কিন্তু সে চৌর্যবৃত্তির মধ্যে হীনতা ছিল না—এও তিনি জানেন। দরিদ্রের যদি ধনীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে সেকেলে নীতি-কথার মানদণ্ড আঁকড়ে থাকার অর্থ নেই কোনও। বাঁচতে হবে এবং যেমন করে হোক—এই চিরন্তন নীতিই এখন একমাত্র নির্ভরযোগ্য নীতি। এই 'যেমন করে হোক বাঁচবার'—নীতি অবলম্বন করেই কেশব সামন্তকে দলে নিয়েছিলেন তিনি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ-খবর না করেই। তাঁর বক্তৃতা বা আদর্শবাদের জন্যে নয়, আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর অর্থ-সামর্থ্য দেখে। এখন হঠাৎ আবার পরিত্যাগ করতে চাইছেন তাঁকে কোন্ নীতি অনুসারে? তিনি তো এখনও অকুণ্ঠিতভাবে অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন, দিচ্ছেনও। কেশব সামন্তর যে উদ্দেশ্যই থাক। তাঁদের উদ্দেশ্য তো সফল হচ্ছে ওঁর সহায়তায়। যেমন করে হোক কাজ হাঁসিল করতে হবে—এই নীতি অবলম্বন করলে তুঙ্গশ্রীর অন্য আশ্রয় খোঁজ করার তো প্রয়োজন নেই। যতদূর সম্ভব ওই লোকটাকে ভুলিয়ে ওর ঈর্ষাক্লিষ্ট মনের সুযোগ নিয়ে ওকে দোহন করাই তো উচিত। চাচা-আপন-বাঁচা নীতি অনুসরণ করতে পারছেন না কেন তিনি তবে? কিন্তু পারছেন না। কার্যক্ষেত্রে নেমে সত্যের সম্মুখীন হয়ে অনুভব করছেন তিনি—স্বার্থ নয়, মহত্ত্বই উদ্বুদ্ধ করে মনকে...

না, কেশব সামন্তর টাকার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না তিনি, তাঁর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তাঁর সব।.... বাস্তবের সঙ্গে আদর্শ মিলছে না বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে আদর্শ খাড়া করছেন তাতেও মন ভরছে না। না, আদর্শকেই আঁকড়ে থাকতে হবে যত কষ্টই হোক। অন্য আশ্রয় একটা যোগাড় করতেই হবে। কিন্তু কোথায়, কেমন করে সম্ভব হবে তা? একটু আগেই জিতেনবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর বাইরের একটা ঘর খালি আছে নাকি। তিনি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন—"দিতে পারলে খুবই সুখী হতাম, কিন্তু ও-ঘরটায় আমার একজন আত্মীয় এসে থাকবেন পাকিস্তান

থেকে। কেন, কেশববাবুর ওখানে কি হল?" এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নি তিনি। কয়েকদিন আগে যে কেশববাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, হঠাৎ তাঁর বিরুদ্ধে বলতে পারলেন না কিছু। আমতা-আমতা করে সরে পড়তে হল সেখান থেকে। হোটেলে থাকবার পয়সা নেই। নিজেদের দলের আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। তাঁকে আশ্রয় দেবার মতো সঙ্গতি কারও নেই। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করলেন এই সর্বপ্রথম। কেশব সামন্ত তাঁর প্রতি একটু বেশি প্রসন্ন বলে, তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন বলে অনেকে যেন ঈর্ষান্বিতও একটু তাঁর প্রতি। অনেকের বাঁকা হাসি, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আর ছদ্মবেশী বিস্ময় থেকে এই তথ্যটি আবিষ্কার করে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন তিনি যে, ও আশ্রয় ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে করবেন? একটা খালি বাড়ির সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন সেটা দেখতে। এঁদো গলির মধ্যে আলো-বাতাসহীন দুখানি ঘর। তারই ভাড়া চাইছে মাসে পঞ্চাশ টাকা। শুধু তাই নয় সেলামি দিতে হবে দু'হাজার টাকা। যাঁর বাড়ি, তিনি মিলের কেরানী একজন। মুনাফাখোর পুঁজিবাদী মিলওয়ালার বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন ইনিই তুঙ্গশ্রীর নেতৃত্বে। চক্ষুলজ্জাবশত নিজে তুঙ্গশ্রীর সঙ্গে দেখা করলেন না। একজন আত্মীয়ের মারফত ভাড়া আর সেলামির বার্তাটা জানিয়েছেন। এ লোকটার সঙ্গে ওই মুনাফাখোরটার তফাত কি? দুজনেরই মনোবৃত্তি এক। একজন লাভ করবার সুযোগ পাচ্ছে, আর একজন পাচ্ছে না। হিরণ্যগর্ভের কথাটা মনে পড়ল, আজকালকার শ্রমিক আর ধনিক— একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ। সমাজ ব্যবস্থা বদলে ফেললেই কি সুফল ফলবে? অভাব ঘুচলেও লোভ কি ঘুচবে? ন্যায়পরায়ণ হবে কি সবাই? একটা চাকরির খবর পেয়ে একজনের কাছে একটু আগে গিয়েছিলেন। ইনি কিছুকাল পূর্বে নামজাদা দেশনেতা ছিলেন একজন। এখন তাঁর হাতে অনেক চাকরি আছে, অনেকের চাকরি করেও দিয়েছেন। তুঙ্গশ্রীর কিন্তু সে চাকরি হল না। প্রধান কারণ তুঙ্গশ্রী তাঁর আত্মীয়া নন। দেশে যদি আজ সোভিয়েট ব্যবস্থা হয়ে যায়, এসব কি ঘুচবে? কালক্রমে ঘুচবে হয়তো, যখন অভাব থাকবে না কারও। কিন্তু অভাব না থাকলেই কি লোভ ঘোচে? আবার প্রশ্নটা মনে জাগল তাঁর। ধনীদের তো কোনও অভাব নেই, কিন্তু তারাই তো সবচেয়ে বেশি লোভী। কাজ করলেই গ্রাসাচ্ছাদন এবং আশ্রয় পাওয়া যাবে যে ব্যবস্থায়, সে ব্যবস্থাতেও কার্যনিয়ন্ত্রণ করবেন যে মানুষ—তিনি যদি পক্ষপাতহীন না হন তাহলে সে কাজ শাস্তি হয়ে উঠবে। নির্লোভ পক্ষপাতহীন ন্যায়পরায়ণ মানুষই দরকার সকলের আগে।...

নানারকম এলোমেলো চিন্তা করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তুঙ্গশ্রী ক্রমাগত। বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার, শিয়ালদা থেকে হাওড়া—কখনও বাসে, কখনও ট্রামে, কখনও হেঁটে। আশ্রয় পাবার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে যেখানে সেখানেই গেছেন। কোথাও আশ্রয় মেলেনি। আর একটা মুশকিলেও পড়েছিলেন তিনি। ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যেতে তাঁর মাধবকাকা রাজী হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে গাড়িভাড়া দিতে হবে। সবশুদ্ধ প্রায় দুশো টাকা দরকার। যতদিন ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে না পাঠাতে পারছেন, ততদিন নার্সিং-হোমে দৈনিক দশ টাকা হিসাবে লাগবে। এ টাকাটা কেশব সামন্ত দেবেন কি না ঠিক নেই। তুঙ্গশ্রী চাইলে তিনি দেবেন, ওই দুশো টাকাও হয়তো দেবেন, কিন্তু তুঙ্গশ্রী চাইবেন না। তাছাড়া ওই দুশো টাকা চাওয়ার পথ আর এক দিক দিয়েও বন্ধ হয়েছে। কেশববাবু নিজেই খোকনকে

স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন; এখন তুঙ্গশ্রী কি করে তাঁকে বলবেন যে, হিরণ্যগর্ভের সহায়তায় সে বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন তিনি? অন্য কোথা থেকে টাকা যোগাড় করে ফেলতে হবে। কিন্তু কি করে যে ফেলবেন তাও অনিশ্চিত। চেনাশোনা কয়েকজনের কাছেই ধারের প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু সকলেই একটা না একটা ছুতোয় এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটি। সহায়-সম্বল-হীনা তাঁকে ধার দেবেই বা কেন লোকে? উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরছিলেন তিনি। কেশব সামন্তর বাড়ি দুবেলা দুটি খেতে যান শুধু। গভীর রাত্রে গিয়ে শুয়ে পড়েন, ভোরেই উঠে বেরিয়ে যান। মাধবকাকাকে হিরণ্যগর্ভের চিঠিখানা দিয়ে এসেছেন। খোকনের জিনিসপত্রও নিয়ে গিয়ে রাখতে বলেছেন তাঁর বাসায়। টাকাটা যোগাড় হলেই হয় এখন। হাওড়ায় তাঁর এক মাসতুতো ভাই আছে। তারই ঠিকানাটা যোগাড় করে চলেছিলেন তিনি তাঁর কাছে। সে যদি দয়া করে টাকাটা দেয়! যে ভগবানকে কোন দিন ডাকেন নি, মনে মনে তাঁকেই ডাকতে লাগলেন আজ।

মোড়টা ঘুরতেই পিওনের সঙ্গে দেখা হল। চেনা পিওন।

একটু হেসে সে বললে—"আপনার খোঁজে দু'দিন গিয়ে আমি ঘুরে এসেছি। আপনার নামে ইন্‌সিওর এসেছে একটা। নোটিশটা নিয়ে নিন, তারপর পোস্ট আপিসে গিয়ে ছাড়িয়ে নেবেন। না হয় আমার সঙ্গে চলুন, একেবারে দিয়েই দেব। আমি পোস্ট আপিসেই যাচ্ছি—"

"ইন্‌সিওর? আমার নামে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; এই যে—শ্রীমতী তুঙ্গশ্রী দেবী, কেয়ার অফ কেশব সামন্ত।"

নোটিশটা বার দেখালে সে। নোটিশ দেখে তুঙ্গশ্রী অবাক হয়ে গেলেন। পাঠিয়েছে অলকা। এক হাজার টাকা।

পিওনের সঙ্গে পোস্ট আপিসের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ এগিয়ে চললেন তিনি।.... খামটা হাতে করেও খানিকক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। পিওনটাই এগিয়ে এসে বললেন—"খুলবেন? কাঁচি দেব?"

"দাও।"

খুলে হাজার টাকার নোট পেলেন, আর পেলেন ছোট একখানা চিঠি।—

"ভাই মিনতি,

ছেলেবেলার বন্ধুত্বের দাবিতে আজ সামান্য কিছু পাঠাতে সাহস করলাম। গ্রহণ করলে খুশী হব। যদি কলকাতা যাই দেখা করব তোর সঙ্গে। আশা করি, ভালো আছিস। তোর ভাইটি কেমন আছে? ভালো করে চিকিৎসা করা। তারপর সবই ভগবানের ইচ্ছা। টাকার দরকার হলে আমাকে লিখতে সঙ্কোচ করিস না। আমার আন্তরিক ভালবাসা নে। ইতি অলকা।"

আঁকাবাঁকা বিশ্রী হাতের লেখাটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তুঙ্গশ্রী।

নয়

"ওখানেও সব মিটমাট হয়ে গেল?"

ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠেই কেশব প্রশ্নটা করলেন নগেনকে। নগেন একটু বিস্মিত হল, সে আশা করেছিল খবরটা পেয়ে কেশববাবু খুশী হবেন।

"মিটমাট হয়ে যাবে না? আমাদের সব দাবিই তো ওঁরা মেনে নিলেন। মাইনে আমরা

তিনগুণ করতে বলেছিলাম, তার বদলে ওঁরা দ্বিগুণ দিতে রাজী হয়েছেন এক বছরের জন্যে। কিন্তু পরের বছর থেকে সমস্ত মিলটাই যে শ্রমিকদের হাতে এসে যাচ্ছে! মেঘসুন্দরবাবু মাত্র দশ পারসেন্ট পাবেন। এটা একটা মস্ত লাভ নয়? অবশ্য হিরণবাবু না থাকলে এতটা হতো কি না সন্দেহ। কাকার সঙ্গে ওঁর এ নিয়ে ঝগড়াই একটা হয়ে গেছে শুনলাম।"

কেশব সামন্তর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করছিল, অন্যমনস্কভাবে গোঁফ পাকিয়ে যাচ্ছিলেন কেবল তিনি। নগেন থেমে যেতে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন তিনি। ক্ষণকাল অর্থহীনভাবে চেয়ে থেকে বললেন—"ও তাই নাকি!"

"হ্যাঁ, খুব একচোট হয়ে গেছে শুনলাম।" সোৎসাহে বলে উঠল নগেন—"নরেন আমার বন্ধু কিনা, তার মুখেই খবর পেলাম। হিরণবাবু অতি চমৎকার লোক। আর একটা ব্যাপার নিয়েও নাকি তাঁর লাগব-লাগব হয়েছে মেঘুবাবুর সঙ্গে।"

"কি ব্যাপার?"

"একটা বিয়ে নিয়ে। বিনোদিনী বলে ওঁর এক নাতনী আছে, সে নাকি গানের মাস্টারকে বিয়ে করতে চায়। জাতে মিলছে না বলে মেঘুবাবু ঘোর আপত্তি করছেন। হিরণবাবু বলছেন, এ বিয়ে হবেই। এই মাসের বিশ তারিখে দিন ঠিকও করে ফেলেছেন তিনি নাকি। নরেন বলছিল— সেদিন খুড়ো-ভাইপোতে মারপিট না হয়ে যায়! খুবই টেন্‌স সিচুয়েশন।"

সামনের দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন কেশব সামন্ত। তারপর নগেনের দিকে ফিরে বললেন—"আচ্ছা, যাও তুমি এখন। আমি বেরুব।"

"টাকা দিয়ে যাই তাহলে?"

"কোন্ টাকা?"

"ওই যে পাঁচশো টাকা আমাকে দিয়েছিলেন, কিছুই খরচ হয়নি তাব থেকে।"

"তোমার ভাড়া লাগে নি?"

একমুখ হেসে নগেন বললে—"না, লাগে নি। যাবার সময় একজন চেনাশোনা চাকরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে টিকিট করতে দিলে না। ফেরবার সময়ও দেখি, সে-ই ফিরছে আবার। আর ওখানে তো নরেনের বাসাতে ছিলাম, কিছু খরচ হয় নি! স্ট্রাইক তো হয়ই নি।"

সমস্ত টাকাটা ফেরত দিয়ে চলে গেল নগেন।

নগেন চলে যাবার পর কেশব সামন্ত উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চাকরটা এসে খবর দিল যে, মাধববাবু বলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

"মাধববাবু? কে সে?"

"বললে—দিদিমণির কাকা হয়।"

"তুঙ্গশ্রীর?"

"তাই তো বলছেন।"

"আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।"

তুঙ্গশ্রীর মাধবকাকা প্রবেশ করলেন। একটু আস্ফালনপ্রিয় লোক।

"কি চান আপনি?"

"আমি আমাদের খোকনের বাক্স-বিছানা নিতে এসেছি। মিনু আমাকে কদিন আগেই নিয়ে যেতে বলেছিল, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি আমি।"

"মিনু কে?"

"ওই আপনারা যাকে 'তুঙ্গশ্রী' বলে ডাকেন। তার আসল নাম মিনতি তো! তার ভাই খোকনকে নিয়ে আমি স্যানাটোরিয়ামে রেখে আসতে যাব কিনা, তাই জিনিসপত্তরগুলো নিতে এসেছি। স্যানাটোরিয়ামে না নিয়ে গেলে আর চলছে না।"

"স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে না কি? কে ব্যবস্থা করলে?"

"ওই যে হিরণবাবু না কে একজন বন্ধু আছে তার। সে-ই চিঠি দিয়েছে। এই যে দেখুন না চিঠি।"

সাড়ম্বরে চিঠিটা বার করে দিলেন তিনি। চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কেশব সামন্ত। তারপর বললেন—"আচ্ছা, নিয়ে যান আপনি জিনিসপত্র। তুঙ্গশ্রী কোথা?"

"কি জানি, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি দুদিন।"

কেশব সামন্ত চাকরকে ডেকে জিনিসপত্র দিয়ে দিতে বললেন।

চাকরের সঙ্গে নেমে গেলেন মাধবকাকা নীচে। কেশব সামন্ত বসে রইলেন চুপ করে। মনে হল, সব দিক দিয়েই হেরে গেলেন তিনি। তুঙ্গশ্রীর ভাইকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে তুঙ্গশ্রীর কাছে যে মহত্ত্বটা আস্ফালন করবেন ভেবেছিলেন, তাও ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেল হিরণ্যগর্ভ। চোখ দুটো জ্বলে উঠল, বিস্ফারিত হয়ে গেল নাসারন্ধ্র। উঠে জ্বেলে ফেললেন স্টোভটা। তারপর চড়িয়ে দিলেন গ্রামোফোনের রেকর্ড। অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। হঠাৎ রেকর্ডটা থামিয়ে দিলেন আবার, নিবিয়ে দিলে স্টোভটা। তারপর দ্রুতপদে নেমে গেলেন নীচে। রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলেন উন্মাদের মতো। নিজে যেতে হবে এবার..

'ট্যাক্সি—''

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সিটা। উঠে বসলেন কেশব সামন্ত।

"জোরে হাঁকাও— সিধা চল।"

দশ

যে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তা মিটে গেলে কিছুকালের জন্য যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যলোকে মানুষ আর একটা প্রয়োজনকেই খুঁজে বেড়ায় আবার। প্রয়োজনের অবলম্বন না থাকলে জীবন অর্থহীন। ভাই যখন স্যানাটোরিয়ামে চলে গেল, সমস্ত কলকাতা শহর চষে ফেলে যখন তিনি নিঃসংশয় হলেন যে বাড়ি বা আশ্রয় পাওয়া যাবে না, নিজের আদর্শকে রূপ দেবার জন্যে যে দলের তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই দলের প্রধান পাণ্ডা কেশব সামন্তের ওপর শ্রদ্ধা যখন আর কিছুতেই রাখা গেল না, তখন তুঙ্গশ্রীর মন অবলম্বনহীন হয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। টাকা পাওয়ার পর থেকে কেশব সামন্তের বাড়িতে খেতে-শুতেও আর যেতেন না তিনি। তাঁর জিনিসপত্রগুলো সেইখানে পড়ে ছিল, কিন্তু তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন একটা হোটেলে। মনে মনে তিনি যে শুধু নূতন একটা অবলম্বন খুঁজছিলেন তাই নয়, পুরাতন যে অবলম্বনটাকে এতদিন আঁকড়ে ধরে ছিলেন, তার স্বপক্ষে নানারকম যুক্তিও আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি প্রাণপণে। কেশব সামন্তর সম্বন্ধে মোহ কিছুতেই কাটতে চায় না যেন। অমন একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যদি ঈর্ষার প্ররোচনাতেই এত সব

কাণ্ড করে থাকে, তাহলে তা কি অস্বাভাবিক কিছু? শিখরিণীর মতো মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল—এটা তো অন্যায় কিছু নয়; শিখরিণীকে সে যদি বিয়ে করবার সুযোগ পেত, তাহলে তার জীবন অন্য রকম হতো হয়তো। হিরণবাবুর কথাগুলো মনে পড়ল—ও অসুস্থ, ওকে যদি ঠিকমতো বুঝতে চান, ওকে ভালোবাসতে হবে। তিনি কি পারবেন না? মিথ্যা অভিমানের তুচ্ছ অহঙ্কারকে আঁকড়ে থাকা কি তাঁর সাজে? তাঁর কি উচিত নয় হিরণ্যগর্ভ আর কেশব সামন্তর মতো দুটো বিরাট ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে দেশের কাজে নিযুক্ত করা? হিরণ্যগর্ভের আদর্শের সঙ্গে তাঁদের আদর্শের তফাত তো নেই বিশেষ। অন্তরের নিভৃত প্রদেশে আর একটি যুক্তিও তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল—শিখরিণীকে দেখবার আগে তো তিনি তাঁকে দেখেন নি। তাঁর সঙ্গে আগে দেখা হলেও হয়তো কেশব সামন্তর জীবন অন্য রকম হতে পারত। এখনও কি তা করা অসম্ভব? কেশব সামন্তর সমস্ত চিত্ত এখন শিখরিণীর দিকেই উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু তা কি থাকবে চিরকাল? বীরা দেবী সম্পর্কে তাঁর যে সন্দেহটা জেগেছিল, সেটা কি অমূলক, তা হঠাৎ টের পেয়ে গেছেন তিনি। তাঁদের দলেরই একজন কর্মী হরিবাবুর সঙ্গে কাল যখন দেখা হয়েছিল রাস্তায়, তখন আর একজন ভদ্রলোকও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। হরিবাবু পরিচয় প্রসঙ্গে বললেন—"ইনি একজন অধ্যাপক। হরিজনদের একটি স্কুল খোলবার জন্যে এসেছেন এখানে। হরিজনদের নেত্রী বীরা দেবীর সঙ্গে এঁর বিয়েও হবে শিগ্‌গির।" সুতরাং বীরা দেবীর সঙ্গে কেশববাবুর সে রকম কোনও সম্পর্ক নেই নিশ্চয়। হোটেলে নিজের ঘরে বসে বসে তিনি ভাবছিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে সোজা হয়ে বসলেন। বিশুকে তিনি যে কথা দিয়ে এসেছেন, সে কথা রাখবার কি ব্যবস্থা করেছেন তিনি? হিরণ্যগর্ভকে বলে এসেছেন অবশ্য। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? এখন তো কোনও কাজ নেই। সেখানে গেলে হয় এখন। ব্যাপারটা কেশববাবুকে বললে কেমন হয়? অদম্য পৌরুষের জোরে তিনি হয়ত কিছু করতে পারেন। হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন যে, কেশব সামন্তর সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করবেন না।

কেশববাবু তো এখনও পর্যন্ত কোনও অসদ্ব্যবহার করেননি তাঁর সঙ্গে। তিনিই বা শুধু শুধু করতে যাবেন কেন? না, আজই ফিরে যাবেন তিনি কেশব সামন্তর বাড়িতে। উঠতে যাবেন, এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত করলে কে যেন। কে করেছে, তা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন। কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলেন। হোটেলে ঠিক পাশের ঘরেই যে ভদ্রলোকটি থাকেন, তিনি কয়েক দিন থেকে একটু বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন তাঁর প্রতি। তিনি সকালে যে প্রস্তাবটি করেছেন, যুক্তির দিক থেকে তাতে আপত্তি না থাকলেও রুচির দিক থেকে তাঁর বাধছিল। বার্নার্ড শ'র 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেশন' বইখানা তাঁকে পড়তে দেখেই আলোচনাটা তুলেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন—"এ দেশেও মিসেস ওয়ারেন কম নেই। এদেশেও সুশ্রী বুদ্ধিমতী মেয়েরা পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, সৎপথে ভদ্রভাবে থাকতে পায় নি বলে। আপনার মতো মনের জোর সকলের নেই। তাছাড়া আর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আপনার, চমৎকার বোঝাতে পারেন আপনি। আপনি যদি পতিতাদের মধ্যে কাজ করেন, তাহলে দেশের মস্ত কাজ হয় একটা। ওদের যদি নিজের দলে টানতে পারেন, তাহলে দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, আপনি যদি চান, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। আলাপ

করলে সুখী হবেন।" তুঙ্গশ্রী আপত্তি করতে পারেন নি। যদিও মনের ভিতরে খুঁতখুঁত করছিল একটু, কিন্তু যে সংস্কারমুক্ত যুক্তির স্তরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তিনি, সেখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না যে, তিনি পতিতার সঙ্গে আলাপ করতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী কেমন যেন ভালো লাগে নি তাঁর। তাঁর যেচে এসে আলাপ করার মধ্যে, তাঁর ওই ভদ্রতার আতিশয্যের অন্তরালে কি যেন একটা ছিল যা মনোরম নয় মোটেই। ভদ্রলোকের পড়াশুনো আছে, চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর হাসির ধরনে, চোখের চাহনিতে যা তাঁর অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ করছিল, তা মনকে মোটেই মুগ্ধ করে না।

...কপাট খুলেই তুঙ্গশ্রী দেখলেন, সেই ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

"সকালে আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার পর আমি ফোন করেছিলাম সে মেয়েটিকে। মেয়েটি বললে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেলে সে খুবই খুশী হবে। চলুন। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি—ট্যাক্সি ডেকেছি।"

তুঙ্গশ্রী আপত্তি করতে পারলেন না—"চলুন।"

খানিকক্ষণ পরে যে বাড়িটির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল, তা ঠিক খোলার ঘর নয়। গেটে দারোয়ান আছে এবং গাড়িটা দাঁড়াবামাত্র ভিতর থেকে যে কুকুরটি ডেকে উঠল সে যে অভিজাতবংশীয় তা স্বর থেকেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোক নেমে বললেন—"আসুন।"

তুঙ্গশ্রী নেমেই যে কথাটি প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন সেইটেই সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল তাঁকে—"এত বড় বাড়িটা ওঁরই নাকি?"

"না এদিককার অংশটা মাধবীর। ওদিকে আর একজন থাকেন।"

অলকার কথা মনে পড়ছিল তাঁর। অলকাও কি ঠিক এই শ্রেণীর? তার তো টাকার অভাব নেই। তারপর সহসা মনে হল, সে যে শ্রেণীরই হোক তার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু কৃতজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় অন্তর থেকে উৎসারিত হচ্ছে না কেন ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। অন্যমনস্ক ভাবেই ভদ্রলোকের অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকলেন।

"আসুন।"—হাসিমুখে এসে অভ্যর্থনা করলে মাধবী। মাধবীকে দেখে মনে হয় না যে, সে পতিতা। তার চেহারায় কথায় ভাবভাবে এমন কিছু নেই যা দৃষ্টিকটু, যা ভদ্রসমাজে অচল। বসবার ঘরটি বেশ চমৎকার সাজানো, দেখলেই মনে হয় মার্জিতরুচি মেয়েটি। টেবিলের পাশেই বইয়ের যে শেল্‌ফ্‌টি আছে তাতে যে সব বই চোখে পড়ল, তা অনেক ভদ্রগৃহেও চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শ, জোয়াড্‌, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, রোঁলা তো আছেই, কমিউনিজমেরও অনেক ভালো ভালো বই আছে। এক কোণে একটা অর্গানও রয়েছে।

"আপনার নাম শুনেছি। অনেক দিন থেকেই আলাপ করবার ইচ্ছে আপনার সঙ্গে। কমলদার কাছে হঠাৎ শুনলাম যে, আপনি ওঁর পাশের ঘরেই আছেন। কতদিন এসেছেন কলকাতায়? জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন কবে?

"ছাড়া পেয়েছি তা বেশ কিছুদিন হল। কলকাতাতেও মাস তিনেক হয়ে গেল।"

"মাস তিনেক আপনি ওই হোটেলেই আছেন?"—কমলবাবু প্রশ্ন করলেন।

"আমি অবশ্য দিন দশেক মাত্র ওখানে। আমার পাশের ঘরে তো প্রথমে আর একটি ভদ্রলোক ছিলেন। আপনি তেতলায় ছিলেন না কি?"

"না, আমি ওই হোটেলে ছিলাম না, অন্য জায়গায় ছিলাম। দিন তিনেক এসেছি হোটেলে।"

"একটু চা হোক, কী বলেন?"—মাধবী মৃদু হেসে প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়।"— সোৎসাহে সায় দিলেন কমলবাবু।

চায়ের ফরমাশ দিয়ে ফিরে আসতেই কমলবাবু বললেন—"তুমি আগে একটা গান শুনিয়ে দাও এঁকে। তারপর আলাপটা জমবে।"

"কমলদা সবাইকে আমার গান শোনাবার জন্যেই ব্যস্ত কেবল। অথচ গলা আমার মোটে ভালো না, জানেন, তা ছাড়া টন্‌সিল দুটো এমন বিশ্রী হয়ে আছে—"

তুঙ্গশ্রীর মনে হল, ভদ্রঘরের মেয়েরাও গান গাইতে বললে ঠিক এই ধরনের কথাই বলে। বিশেষ কোনও তফাত নেই। মাধবী মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে রইল ক্ষণকাল। তারপর হঠাৎ উঠে অর্গ্যানের সামনে গিয়ে বসল। রবীন্দ্রনাথের একটি গান ধরল। গলাটা সত্যিই মিষ্টি। তুঙ্গশ্রীর আরও ভালো লাগল গানটি নির্বাচন দেখে। মেয়েটির রসবোধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বার বার করে গোড়ার চারটি কলিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল সে—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যত?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো?

শুধু তাই নয়, তুঙ্গশ্রীর মনে হতে লাগল, গানের ভিতর দিয়ে সে যেন আবেদন জানাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের জবানিতে নিজের কথাই বলছে যেন। বলছে যেন— ওগো, যে বেদনায় তুমি কাতর, 'ঐ বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুখে,' তুমি আমাকে অবহেলা করে চলে যেও না, আমাকে জান, বোঝ।

গানটা শেষ হবার পরও একটা সুরের রেশ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল যেন ঘরের ভিতর। নিভৃততম সত্তার গূঢ়তম কান্নায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন চতুর্দিক। চা এল। চা খাওয়া শেষ হল প্রায় নীরবেই।

"আর একখানা হোক।"—কমলবাবু ফরমাশ করলেন।

মাধবী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে শুরু করল—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল

তুঙ্গশ্রী স্তব্ধ হয়ে বসে বসে শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, এই যে এত সব আয়োজন, এত জেলখাটা, এত কমিউনিজমের বক্তৃতা, স্বাধীনতার জন্য এত প্রাণপণ—সবই বৃথা যদি বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ এসে না থামে। সেই রথের চক্রধ্বনির জন্যেই তো আজীবন উৎকর্ণ হয়ে আছেন তিনি মনে মনে। দুঃখের বরষায় চক্ষের জলও তো প্রচুর নেমেছে; কিন্তু বন্ধুর রথ কই? কেশব সামন্তর মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। বিচ্ছেদে বেদনায় পূর্ণ মিলনের পাত্রটি কি তাঁরই হাতে তুলে দিতে হবে? যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন ছেলেবেলা থেকে; বহুদিনবঞ্চিত অন্তরের সঞ্চিত সে আশা সফল হবে কি ওঁরই মধ্যে?....হঠাৎ রসভঙ্গ হল।

উন্মত্ত একটা হা-হা হাসি ভেসে এল খোলা জানলাটা দিয়ে। চমকে উঠলেন তুঙ্গশ্রী। চেনা গলা, চেনা হাসি। মাধবীও থেমে গিয়েছিল ভ্রূকুঞ্চিত করে।

কমলবাবু বললেন—"এ বাড়িটা ছাড় তুমি মাধবী। তোমার প্রতিবেশিনীটি মোটেই সুবিধের নয়।"

"চপলার দোষ নেই তত। কেশববাবু এলেই হুল্লোড়টা হয় কেবল। এসেছেন বোধ হয় ভদ্রলোক। ওঁর আবার দেশকর্মী হবারও 'পোজ' আছে শুনেছি। টাকার জোরে অনেক সমিতির পেট্রন হয়েছেন নাকি।"

তুঙ্গশ্রীর দিকে চেয়ে মাধবী হাসল। তুঙ্গশ্রীর মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবুও তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন একটু। "কলকাতায় এসে আমারও এক কেশববাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে— কেশব সামন্ত—ইনি তিনিই নাকি?"

"হ্যাঁ তিনি। আমার তেতলার ঘরটা থেকে ওদের বসবার ঘরটা দেখা যায় বেশ। ইচ্ছে করেন তো স্বচক্ষে দেখতেও পারেন ভদ্রলোককে।"

"চলুন তো দেখি।"

মাধবীর সঙ্গে উঠে গেলেন তিনি তেতলার ঘরে। খোলা জনালা দিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর সমস্ত স্বপ্ন দাউ দাউ করে পুড়ে গেল যেন এক নিমেষে। বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করে চপলা নাচছে আর হা-হা করে হাসছেন কেশব সামন্ত। উন্মত্ত চোখের দৃষ্টি। হঠাৎ নাচটা থেমে গেল। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন কেশব—"কেয়াবত কেয়াবাত! কিন্তু আসল কথাটা ভুলো না যেন মানিক, গুণ্ডা আমার চাই—অন্তত গোটা বারো। বন্দুক ছোরা কুড়ুল কাটারি নিয়ে নিজেই যাব আমি এবার—"

তুঙ্গশ্রী আর শুনতে পারলেন না। নেমে এলেন।

মাধবীর গান আর জমল না। আবার আসবেন বলে বিদায় নিলেন তুঙ্গশ্রী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হোটেলে ফিরেই তিনি গেলেন কেশব সামন্তর বাসায়। নিজের ঘরটা খুলে দেখলেন অলকার একখানা চিঠি এসেছে। লিখেছে, তিন-চার দিনের মধ্যেই কলকাতা আসবে সে। তার কলকাতার বাড়ির ঠিকানাটাও দিয়েছে একটা। তুঙ্গশ্রী চাকরটাকে জিগ্যেস করে জানলে, কেশব সামন্ত তখনও ফেরেন নি। নিজের সমস্ত জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে তাকে বললেন—"বাবু এলে বলে দিও—আমি চললাম। এই নাও।" চাকরটাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়ে ট্যাক্সিতে চড়লেন তিনি। কেশব সামন্তর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল।

এগার

হিরণ্যগর্ভের ল্যাবরেটারির সামনে মুরারিপুর স্কুলের ছাত্ররা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। সকলেরই কাপড় ভিজে, হাতে পায়ে কাদা, মাথায় জামাতে শেওলা লেগে আছে। হিরণ্যগর্ভ একটি রোরুদ্যমান বালকের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। তারও কাপড়-চোপড় ভিজে এবং পায়ে কাদা। পাশে একটি ট্রেতে তুলো আয়োডিন প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নরেন। ভিড় ঠেলে প্রবেশ করলেন মন্মথ সিং।

"এ কি হচ্ছে?"

"বিমল পুকুরে নেমেছিল। ওর পা-টা কেটে গেছে। জলের নীচে কাচ ছিল বোধ হয়।"

"পুকুরে নামতে গেল কেন এখন?"

"আমরা সবাই নেমেছিলুম।"—ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে হাসিমুখে ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিলেন হিরণ্যগর্ভ।

"হঠাৎ এ খেয়াল?"

"ডাক্তার পৃথ্বীশ রায়ের টোপাপানার এক্সপেরিমেণ্টটা আমাদের গ্রামেও করে দেখছি।"

"ডাক্তার পৃথ্বীশ রায় আবার কে?"

"মুর্শিদাবাদের হেল্‌থ্ অফিসার ছিলেন। মারা গেছেন ভদ্রলোক। তিনি আমরণ ওই একটি কাজই করে গেছেন— কি করে সহজ উপায়ে আমাদের দেশ থেকে ম্যালেরিয়া তাড়ানো যায়! কিন্তু হাতে-কলমেও দেখিয়ে গেছেন যে, গ্রামের সমস্ত পুকুর থেকে যদি টোপাপানা তুলে ফেলা দেওয়া যায়, তাহলে ম্যালেরিয়া অনেক কমে যাবে। রামপাড়া, চক, ভবতপুর, মুনিগ্রাম, খোসবাসপুর প্রভৃতি গ্রামে নিজহাতে কাজ করে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এটা। আমিও আমাদের নসীবপুরে করিয়েছি, ফল হয়েছে। এখানেও তাই শুরু করেছি আমরা—গত বছরের পীলের ফিগারগুলো রেখেছি আমরা। ফিগারগুলো ঠিক আছে তো নরেন?"

নরেন চোখ মিটমিট করে বললেন—"আছে বোধ হয়।"

"বোধ হয় মানে? একটি ফিগার যদি হারায় তোমায় খেয়ে ফেলব আমি, জান?"

"আছে এই ড্রয়ারের মধ্যে।"

"এখুনি দেখে ঠিক করে রেখো।"

"আচ্ছা।"

মন্মথ সিং আর এ ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করলেন না। ঘরের দিকে অগ্রসর হতে হতে তিনি বললেন—"কাজ সেরে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা।"

"আমার হয়ে গেছে, এখুনি আসছি।"

মন্মথ সিং ঘরের মধ্যে ঢুকলেন গিয়ে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। রোরুদ্যমান বালকটির দিকে চেয়ে হিরণ্যগর্ভ বললেন— "আরে, ছিঃ ছিঃ, এখনও কাঁদছ তুমি! এঃ, কী বলবে সবাই?"

"আমি ফিরে যাব কি করে?"— ঠোঁট ফুলিয়ে বলল ছেলেটি।

"এসেছিলে কি করে তোমরা?"—জিগ্যেস করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"আমরা গোরুর গাড়িতে এসেছিলাম।"

"আমি নিজে হাঁকিয়ে এনেছিলাম।"—একটি ছেলে বললে সগর্বে।

"সকলের এঁটেছিল তিনখানা গাড়িতে?"

"চারজন বাইকে এসেছি আমরা।"—উত্তর দিল আর একটি ছেলে।

"বিমল তাহলে যাবে কি করে? আচ্ছা, আমার ফিটনটা ওকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। টগবগ টগবগ টগবগ করে চলে যাবে বিমলবাবু।"

হাসি ফুটে উঠল বিমলের মুখে।

কিন্তু পর-মুহূর্তেই সে বললে—"আমি আকাশ-বিহারে উঠব কি করে? আজ যে মাস্টার মশাই আমাদের নক্ষত্র দেখাবেন!"

"ও, আজ তোমাদের আকাশ-বিহারে যাবার কথা বুঝি? আচ্ছা, আমি কোচোয়ানকে বলে দিচ্ছি, সে তোমাকে কোলে করে পৌঁছে দেবে ওপরে।"

"আমিও বয়ে নিয়ে যেতে পারি ওকে। ও আর কত ভারি হবে।" বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে মুরুব্বির মতো।

"চল তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দি।"

ছেলেদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

ছেলেদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলেন হিরণ্যগর্ভ।

মন্মথ সিং গম্ভীরভাবে বসে পা নাচাচ্ছিলেন।

"কি, ব্যাপার কি?"—হিরণ্যগর্ভ জিগ্যেস করলেন।

"সংক্ষেপে একটা কথার উত্তর দাও। বিনুর সঙ্গে বিশুর বিয়ে কি সত্যিই দেবে ঠিক করেছ না কি?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ মানে?"

"মানে, দেব।"

"বিশু কোথায় আছে?"

"আকাশ-বিহারে মাস্টার মশায়ের কাছে।"

"বিনুকে পাবে কি করে? তাকে তো কাকামণি তালা-চাবির মধ্যে রেখেছেন।"

"চাবি কোথায়?"

"চাবি তাঁর নিজের কাছে। সেদিক দিয়ে সুবিধে হবে না। তবে বিনু ওপরে যে ঘরটায় আছে, সে ঘরে জানলায় গরাদ নেই। সিঁড়ি-টিঁড়ি দিয়ে যদি কোন রকমে নামিয়ে নিতে পার। কিন্তু এত বড় প্রকাণ্ড সিঁড়ি লাগানো কি সম্ভব হবে লুকিয়ে?"

"দড়ির সিঁড়ি লাগানো যেতে পারে।"

"কিন্তু তাই বা পাচ্ছ কোথায় এখানে?"

"কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আনাতে হবে।"

"কিন্তু দড়ির সিঁড়ি দিয়ে অতখানি উঁচু থেকে বিনু কি নামতে পারবে? পড়ে টড়ে গিয়ে হাত-পা যদি ভাঙে, সে আর এক কাণ্ড হবে।"

হিরণ্যগর্ভ ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন চুপ করে।

মন্মথ সিং আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে গলা-খাঁকারি দিয়ে বলেন—

"আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি বল?"

"ও-সবের মধ্যে তুমি যদি না থাক কেমন হয়? কি দরকার এই সব বাজে ঝামেলা জুটিয়ে? কাকু ক্ষেপে আছেন একেবারে। বিয়েটা যদি হয়ে যায় তাহলে কুরুক্ষেত্রে কাণ্ড করবেন একটা। তার চেয়ে বিশুকে সরিয়ে দাও এখান থেকে। দিনকতক কলকাতায় বা কাশীতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"তা হয় না মন্মথ। যে স্বাধীন ভারত আমরা চাই, তাতে এ রকম জাতিভেদ থাকবে না। সমাজের এ রকম জবরদস্তির স্থান নেই সেখানে। যেটা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না। শিখরিণীর সব ব্যাপার তো তুমি জান, ওর মনের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না জানি না।"

"হয়েছে, আমি 'ওয়াচ' করে যাচ্ছি।"

"ও হয়তো সামলে যাবে, কিন্তু কেশবের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।"

উভয়েই চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

"তুমি হঠাৎ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ যে?" হিরণ্যগর্ভ প্রশ্ন করলেন হঠাৎ।

"আমি ঘামাই নি, শিখরিণী ঘামাচ্ছে।"—হেসে উত্তর দিলেন মন্মথ সিং।

"ও।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। কেশব সামন্ত যে চিঠিটা শিখরিণীকে লিখেছিলেন, সেটা হিরণ্যগর্ভের হাতে পড়েছিল। কিছুক্ষণ ভেবে সেটা মন্মথকে না দেখানোই স্থির করলেন তিনি।

"ওই তাহলে ঠিক?"—মন্মথ সিং এই বলে উঠে দাঁড়ালেন।

"হ্যাঁ, ঠিক।"

"কাকুর মনে অত বড় আঘাতটা দেবে?"

"উপায় কি তা ছাড়া? কাকুর মনে আঘাতের বেদনা বেশিদিন থাকে না। ভুলেও যান উনি খুব শিগগির।"

"তাই বলি গিয়ে তাহলে শিখুকে।"

বলিষ্ঠকায় মন্মথ সিং চলে গেলেন। গোলমালে বা সাতেপাঁচে থাকতে চান না ভদ্রলোক; কিন্তু এদের বাড়ির কাণ্ডকারখানা এমন গোলমেলে যে, বার বার নানারকম জালে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। শিখরিণীর হৃদয় জয় করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, সেইজন্যে জালটা মাঝে মাঝে বড় বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে। শিখরিণীকে বুঝতে পারেন না ঠিক যেন তিনি। বড্ড বেশি চুপ করে থাকে। অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত ভালো, অথচ কেমন যেন!...সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে...নানাকরম চিন্তা করতে করতে মন্মথ সিং বাগানটা পার হতে লাগলেন। কাকুরই বা কি দরকার ছিল ওই ছুতোরের ছেলেটাকে গানের মাস্টার রাখবার। অত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলে হবেই তো এসব...অথচ....। কোনও বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের ছেলেমানুষি যে ভাবে সহ্য করেন, অনেকটা সেইভাবে মন্মথ সিং এদের সহ্য করছেন। তিনি একজন ভালো হকি খেলোয়াড়। তার মনোভাবটা স্পোর্টস্‌ম্যানের মতো। সব জেনে-শুনে তিনি শিখরিণীকে বিয়ে করেছিলেন, কারণ তিনি ভালো জিনিসের সমঝদার। পছন্দসই ভালো হকিস্টিক পেলে সেকেণ্ডহ্যাণ্ডও কিনতে আপত্তি করেন না কখনও। সব জেনে-শুনেও তিনি এই খামখেয়ালী পরিবারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। কারণ এদের ভালো লেগেছে। অদ্ভুত ধরনের লোক প্রত্যেকেই এবং সেইজন্যেই চমৎকার। খেলার মাঠে প্রত্যেক স্পোর্টস্‌ম্যান উন্মুখ হয়ে থাকে যে মনোভাব নিয়ে জীবনের খেলার মাঠে ইনিও উন্মুখ হয়ে আছেন অনেকটা সেই মনোভাব নিয়েই। খেলার আইন-কানুন বাঁচিয়ে জিততে হবে শেষ পর্যন্ত। শিখরিণীর হৃদয় জয় করতেই হবে। নানারকম বাধাবিঘ্ন আছে বলেই ব্যাপারটা আরও মনোরম।

ইলেকট্রিক বাতি জ্বেলে হিরণ্যগর্ভ নিবিষ্টমনে বসে রক্ত পরীক্ষা করছিলেন মাইক্রোসকোপে। পাড়ার মুন্সী মিস্ত্রির টাইফয়েড হয়েছে, তারই রক্ত। ডিফারেনশ্যাল কাউন্ট (Differential count) করছিলেন। লিম্‌ফোসাইটগুলো (Lymphocytes) বেড়েছে। টাইফয়েডের প্রথম দিকে বাড়ে ওগুলো। যক্ষ্মাতেও বাড়ে, কালাজ্বরেও বাড়ে। এই তিনটে বিভিন্ন ধরনের রোগে শরীরে সাড়া এক রকমের কেন? এই তিনটে রোগের মধ্যে নিগূঢ় মিল আছে কোথাও নাকি? চিন্তা করতে করতে ডিফারেনশ্যাল কাউন্ট করে চলেছিলেন তিনি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কোঁক কোঁক কোঁক শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। সাপটাকে ব্যাঙ খেতে দিয়েছেন। মুমূর্ষু ব্যাঙটা শব্দ করছে। টাইফয়েড ইন্‌জেকশন করে এখনও কিছু হয় নি সাপটার। কথায় কথায় এখনও ফণা তুলছে। বাঁদরটারও কিছু হয় নি।.... ডিফারেনশ্যাল কাউন্ট শেষ হয়ে গেল, উঠতে যাবেন এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত করলে কে যেন।

"কে? নরেন? ভেতরে এস। ওই টেস্টটিউব দুটো রেখে দাও রেফ্রিজারেটারে। ভিডাল (Widal) কাল করব।"

কপাট খুলে প্রবেশ করলেন নরেন নয়, তুঙ্গশ্রী।

"এ কি, আপনি এমন সময় হঠাৎ। আসুন, আসুন।"

যে অজুহাতটাকে সম্বল করে এসেছিলেন, সেইটেই প্রকাশ করলেন তিনি।

"বিশু আর বিনুর বিয়ের কতদূর কি হল জানতে এলুম।"

"আপনি যাবার পর অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। আসুন আমার খাবার ঘরে। চা খেতে খেতে গল্প করা যাক। চা খাবেন, না কফি? আপনি তো সোজা স্টেশন থেকেই আসছেন, না? তাহলে তো ক্ষিদে পাওয়ার কথা। কুঞ্জ— ও কুঞ্জ—"

ছেলেমানুষের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন হিরণ্যগর্ভ।

"চলুন, জলটা চড়িয়ে দিই ও-ঘরে।"

কুঞ্জ এসে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে।

খরিণীকে খবর দাও গিয়ে যে, তুঙ্গশ্রী দেবী এসেছেন। রাত্রে থাকবেন। তাঁর খাওয়ার শোয়ার সব ব্যবস্থা যেন হয়। আর কর্তা যেন কথাটা না জানতে পারেন।"

"আচ্ছা।"

কুঞ্জ চলে গেল।

"চলুন, ও-ঘরে যাওয়া যাক এবার। আমার কাজকর্ম সব হয়ে গেছে। অনেক গল্প করা যাবে।"

"ও-শব্দটা হচ্ছে কিসের?"

"সাপে ব্যাঙ ধরছে। ভয় নেই, বন্ধ আছে বাক্সের মধ্যে। চলুন ও-ঘরে।"

"আপনি ব্যাঙ ধরে দেন ওকে?"

"আমি ধরি না। চেথরু মেথর ধরে। আসুন।"

চা খেতে খেতে বিশু-বিনুর সমস্ত ঘটনাটা বললেন তিনি তুঙ্গশ্রীকে।

"বিনুকে এখন উদ্ধার করতে পারলেই বিয়ে হয়ে যায়। আর সব ঠিক করে রেখেছি আমি। এমন কি পুরোহিত পর্যন্ত।"

"কে পুরোহিত হবেন?"

"মাস্টারমশাই।"

"আপনার কাকা কিছু গোলমাল করবেন না?"

"গোলমাল তো করছেনই। তাঁর ক্ষমতায় যতটুকু আছে ততটুকু করছেন। শুনলাম, উইল করে আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছেন। বিনুকে তালা বন্ধ করে আটক রেখেছেন, গালাগালি দিয়ে বিশুর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছেন। ভাগ্যে বিশুর পরিবারে কেউ বেঁচে নেই; থাকলে তাদের দূর করে দিতেন হয়তো। রামচন্দ্র ডাক্তারকে উঠতে বসতে গালাগাল দিচ্ছেন। এই সব করছেন আর কি। কোথায় বিয়ে হবে তা জানতে পারলে হয়তো সেখানেও সিপাহী পাঠিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেটা জানতে দেব না তাঁকে। বিয়ে হয়ে যাবার পর জানাব যে, বিয়ে হয়ে গেছে।"

স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ।

তারপর বললেন—"বিনুকে উদ্ধার করাটাই এখন প্রধান সমস্যা। আপনি বরং এক কাজ করুন, কাল কলকাতায় গিয়ে ভালো দেখে দড়ির সিঁড়ি যোগাড় করে পাঠিয়ে দিন একটা। সিঁড়িটা যদি বিনুর ঘরে ফেলে দেওয়া যায়—তা দেওয়া সম্ভব—তাহলে তারই সাহায্যে ও হয়তো নেমে পড়তে পারবে।"

"বেশ, আমি কালই গিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

কিছুক্ষণ নিরবতার পর হিরণ্যগর্ভ হেসে প্রশ্ন করলেন—"আপনার বন্ধু কেশব সামন্তর খবর কি? আপনার এখানকার ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী সব বলেছিলেন তাকে খুলে নাকি?"

তুঙ্গশ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—"ওঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি আমি। ওঁর সঙ্গে কাজ করতে পারব না। ওঁর আসল পরিচয় জানতাম না বলেই এতদিন ছিলাম ওঁর দলে।"

সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন হিরণ্যগর্ভ ক্ষণকাল।

তারপর বললেন—"তাহলে?"

"কিছু ঠিক করি নি এখনও। দেশের কাজই করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে করব, তা ঠিক করতে পারি নি।"

"আমাদের এখানে আসবেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আমাকে নেবেন কি আপনারা?"

"আমাদের তো কাউকে বাদ দিলে চলবে না। সবাইকে মিলতে হবে এই আমাদের স্বপ্ন।"

"দেখুন, ওই সব বড় বড় বুলিকে আমি বড় ভয় পাই। ওগুলো মুখোশ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে টেররিস্ট হয়েছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে দেখছি, অন্যায় তেমনি আছে। ক্যাপিটালিস্টদের অত্যাচারে দেশের জনসাধারণ মরে যাচ্ছে, তাই তাদের উচ্ছেদ করবার কাজে লেগেছিলাম আপনার বন্ধুর সাহায্য নিয়ে। এখন দেখছি, আপনার বন্ধুর উদ্দেশ্য ক্যাপিটালিস্টদের উচ্ছেদ করা নয়, আপনাদের উচ্ছেদ করা এবং সেটার প্রেরণা কমিউনিজম নয়, তাঁর ব্যক্তিগত প্রণয়কলহ। তাই ওর মধ্যে থাকতে পারলাম না। কিন্তু মত আমার বদলায় নি, এখনও আমি মনে করি—ক্যাপিটালিস্টরাই দেশের শত্রু, ওদের উচ্ছেদ করতেই হবে। এই আমার পথ, এই পথে যদি আমাকে কোন কাজ দিতে পারেন আমি আসতে পারি।"

আপনার মতের সঙ্গে আমার মতেরও অমিল নেই। যে ধরনের সামাজিক স্বার্থলোলুপ নাস্তিক্যবুদ্ধিচালিত ক্যাপিটালিজম প্রচলিত হয়েছে পৃথিবীতে, এমন কি আপনাদের সোভিয়েট রাশিয়াতেও যে ধরনের স্টেট-ক্যাপিটালিজম আছে, আমি তার বিরোধী। আমিও তার উচ্ছেদ কামনা করি। কিন্তু দু-চারটে মশা মেরে যেমন দেশ থেকে ম্যালেরিয়া তাড়ানো যায় না, ম্যালেরিয়া তাড়াতে হলে যেমন মশা যাতে জন্মাতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, লোকের জীবনী-শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করতে হয়, তেমনি দু-চারটে ক্যাপিটালিস্টকে উচ্ছেদ করেও ক্যাপিটালিজম তাড়ানো যাবে না, ব্যাপকভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ ধরনের ক্যাপিট্যালিস্ট মনোবৃত্তিই লোকের না হয়। তাই আমাদের আসল কর্মক্ষেত্র এখন বিদ্যালয়ে, আমাদের ভবিষ্যৎ-বশধররা যেখানে মানুষ হচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাব আওতায় মানুষ হয়ে যারা পচে গেছে, তাদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করে সময় এবং শান্তি নষ্ট করা এখন উচিত নয়। তারা যতদিন আছে তাদের মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে, বুজিয়ে-সুজিয়ে ফাঁকি দিয়ে স্তোক দিয়ে তাদের সাহায্যেই আমাদের নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। দেশকে গড়ে তোলাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। আর প্রধানতম কাজ হচ্ছে দেশের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলা। তারা যাতে অলস না হয়, পরনির্ভরশীল না হয়, আদর্শবাদী হয়, তারা যাতে রাবণকে রাজা না ভেবে রাক্ষস বলে ভাবতে শেখে, ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে বিদুর যাতে বড় হয় তাদের কাছে, 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে'—এটা যাতে সত্যিই প্রাণের কথা হয় তাদের, তারই চেষ্টা করতে হবে। এসব যদি আমরা করতে পারি, দেখবেন এ ধরনের ক্যাপিটালিজম আপনিই উঠে যাবে দেশ থেকে। আসুন, আপনি আমার মুরারিপুর স্কুলের ছেলেদের ভার নিন। সত্যিই যদি দেশ থেকে ক্যাপিটালিজম উচ্ছেদ করতে চান, তাহলে তার জন্যে আসল সৈন্যবাহিনী তৈরী করুন—দু-চারটে মিলে স্ট্রাইক করিয়ে এক অশান্তি ছাড়া আর কী লাভ হবে বলুন?"

হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটো উৎসাহে উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছিল।

তুঙ্গশ্রী জিগ্যেস করলেন—"সোভিয়েট রাশিয়ার কর্মপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা নেই আপনার?"

"কে বললে নেই, খুব আছে। তারা হাতে-কলমে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছে, কি করে বিরুদ্ধ শক্তির প্রচণ্ডতাকে জয় করা যায়! এস্‌কিমোদেরও আমি শ্রদ্ধা করি—বরফের দেশে বরফেরই ঘর বানিয়ে সীল মাছের মাংস খেয়ে অদ্ভুত রকম পোশাক পরে তারাও জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে আছে ওই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে। কিন্তু আমি এস্‌কিমোদের নকল করতে যাব না, সোভিয়েটদেরও না। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, সংস্কৃতি আছে, আমাদের সাম্যবাদ ঢের বেশি বনিয়াদি, আমরা পরের নকল করে মরব কেন? বিদেশের ভালো জিনিস গ্রহণ করেও আমরা নিজেদের ভিত্তির উপর নির্মাণ করব নিজেদের ভবিষৎ নিজের মতো করে। আমাদের পরমতসহিষ্ণুতা, আমাদের নিষ্কাম কর্মযোগ্য এক কথায়—আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী কিছুতেই ত্যাগ করব না আমরা। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। সে ধর্ম কোনও বিশেষ 'ইজম্' মাত্র নয়, তা উদার মনুষ্যত্ব, এ থেকে নড়ব না আমরা কিছুতেই—"

কুঞ্জ দ্বারপ্রান্তে এসে খবর দিলে—"দিদিমণি বললেন, সব ঠিক আছে।"

"আচ্ছা, তুমি কোচোয়ানকে বলে রেখো ভোরে গাড়ি যেন ঠিক রাখে। ইনি হয়তো সকালের ট্রেনেই ফিরবেন।"

কুঞ্জ চলে গেল।

"তালটা কেমন যেন কেটে গেল। আসবেন মুরারিপুরে?"

"এখন বলতে পারছি না ঠিক।"—একটু হেসে জবাব দিলেন তুঙ্গশ্রী। সত্যই তুঙ্গশ্রী ঠিক করতে পারছিলেন না কিছু। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, কথার আতসবাজি দেখিয়ে কেশব সামন্তও তো তাঁকে মুগ্ধ করেছিল! না, কেবলমাত্র কথাতেই আর তিনি ভুলবেন না।

"ওহো, ভালো মনে পড়ে গেছে কথাটা। আমি স্পেক্‌ট্রোস্কোপের জন্যে যে চিঠিটা দিয়েছিলাম আপনার হাতে, সেটা দিয়েছিলেন কি?"

"না, আমি ভুলে গেছি একেবারে।"

"ছেলেরা আমাকে তাগাদা পাঠিয়েছে। দেবেন এবার গিয়ে। জিনিসটা চাই আমার।"

"আচ্ছা, এবার গিয়ে দেব। নিশ্চয় দেব।"

"চলুন তাহলে যাওয়া যাক। শিখরিণী হয়তো বসে থাকবে।"

"চলুন।"

যে ঘরে তুঙ্গশ্রী প্রথম দিন এসেছিলেন, সেই ঘরেই আবার এসে ঢুকলেন তাঁরা। শিখরিণী কিন্তু ছিল না। অপেক্ষা করছিল একজন চাকর এবং একজন ঠাকুর। তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল এবং বললে যে, পাশের ঘরে খাবার জায়গা করা হয়েছে।

"আচ্ছা, খাবার দাও তোমরা।"

চাকর ঠাকুর চলে গেল।

হিরণ্যগর্ভ হেসে বললেন—"শিখু বোধ হয় লজ্জায় আসে নি। বোধ হয় টের পেয়ে গেছে যে, কেশবের সঙ্গে তার ব্যাপারটা আপনিও জেনে ফেলেছেন। আচ্ছা, কেশবের শরীর খারাপ নাকি?"

"না। রীতিমতো সুস্থ রয়েছেন দেখে এলাম।"

হিরণ্যগর্ভ হাসলেন একটু।

"হাসছেন কেন?"

"ও, পাগল হয়ে গেছে বোধ হয়। শিখুকে একটা চিঠি লিখেছে আজ—ভাগ্যে চিঠিটা আমার হাতে পড়েছিল—চিঠিটা বোধহয় ওখানেই ফেলে এলাম—না, এই যে রয়েছে পকেটেই—মাথা খারাপ না হলে এরকম চিঠি লিখতে পারে কেউ?"

চিঠিটা দিলেন তিনি তুঙ্গশ্রীকে।

তুঙ্গশ্রী পড়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন ক্ষণকাল।

চাকরটা পাশের ঘরের দরজা থেকে বললে—"খাবার দেওয়া হয়েছে।"

"চলুন।"

একজনের মতোই খাবার দেওয়া হয়েছিল।

"আপনি খাবেন না?"

"আমি তো স্বপাক খাই। গিয়ে খাব'খন। আমার সব ঠিক করাই আছে। আপনি বসুন।"

তুঙ্গশ্রী খেতে শুরু করলেন।

হিরণ্যগর্ভ বললেন—"এবার আঁচলে গেরো বেঁধে রাখনু—দুটো গেরো। একটা দড়ির

মইয়ের জন্যে, আর একটা স্পেকট্রোস্কোপের জন্যে। আর একটা ব্যাপারেও যদি সাহায্য করতে পারেন ভালো হয়। কিন্তু পারবেন কি?"

"কি বলুন?"

"আপনার বান্ধবী হীরা বাইজীকে আনাতে পারেন এখন কোনরকমে?"

"অলকা তো দু-একদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসবে—আমাকে চিঠি লিখেছে।"

"তাই নাকি?"—হিরণ্যগর্ভের চোখ দুটো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"কেন, তাকে কি দরকার?"

"এদের বিয়েটা হয়ে গেলে কাকু যে কাণ্ডটা করবেন তো সামলাতে পারেন এক ওই হীরা বাইজী। কাকু যদি একবার গানে তন্ময় হয়ে যান, তাহলে আর কিছু হবে না। তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পারেন এখানে?"

"চেষ্টা করব।"

"হ্যাঁ করবেন, নিশ্চয় করবেন।"

"আচ্ছা।"

আহারাদি শেষ করে তুঙ্গশ্রী শুয়ে পড়লেন।

হিরণ্যগর্ভ বেরিয়েই দেখতে পেলেন, অ্যালসেশিয়ন কুকুরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঠে। সহসা তাঁর কৈশোর ফিরে এল যেন। ছুটোছুটি করে খেলা করতে লাগলেন তার সঙ্গে। আনন্দের হিল্লোল উথলে উঠল যেন মনে, উৎসাহের আবেগ সঞ্চারিত হতে লাগল দেহের শিরায় উপশিরায়।

বারো

সন্ধে থেকেই সপ্তমে চড়ে বসেছিলেন মেঘসুন্দর। কেউ আসে নি। এমন কি সর্বরঞ্জন দামোদর পর্যন্ত না। মন্মথ জমিদারি পরিদর্শন করবার অজুহাতে চলে গেছে দূরের একটা মহালে। পনের কুড়ি দিনের আগে ফেরবার আশা নেই। শিখরিণী এত চুপচাপ যে ওর সঙ্গে কথা কওয়া আর দেওয়ালের সঙ্গে কথা কওয়া একই ব্যাপার। মনের বিরুদ্ধে উত্তাপ জমে জমে তিনি নষ্ট-সেফটি-ভালভ্ বয়লারের মতো হয়ে বসেছিলেন। কারো সঙ্গে কথা কইতে পেলে—হিরণ, বিশু, বিনু, তুঙ্গশ্রী, কেশব, আজকালকার প্রগতিওলা ওই ছোঁড়াছুঁড়ীগুলোকে প্রাণভরে গাল দিতে পারলে মনের ভার অনেকটা লাঘব হতো হয়তো—কিন্তু কাকে বলবেন? কেউ আসে নি। গণপৎ সিং কেবল সঙ্গিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিনরাত। দু বেলা খেতে যায় কেবল। ও ছাড়া আর সবাই পরিত্যাগ করেছে তাঁকে। শিখরিণীর মারফত বিনুর সঙ্গে আবার ভাব করবার চেষ্টা করেছিলেন, চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। বিনু বলে পাঠিয়েছে যে, সে মরে যাবে তবু বিশুকে ভুলতে পারবে না, ওকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করতে পারবে না। মরুক তবে। হারামজাদী! নিজের বেহালাটা নিয়েই তিনি একটা গৎ বাজিয়ে চিত্তবিনোদনের ব্যর্থ প্রয়াস করছিলেন। হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে আবার, নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে বেশ। ফোনটা বেজে উঠল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন সেটার দিকে। যেন শত্রু একটা। তারপর বেহালাটা নামিয়ে তুললেন রিসিভারটা। শেয়ার গছাতে চাইছে একজন। আঃ! "না, আমি আর কিনব না

এখন।"—কি মুশকিল, তবু ছাড়ে না—"না না, না, নেব না আমি, নেব না, নেব না, নেব না"—দুম করে নামিয়ে দিলেন রিসিভারটা। যত সব পাপ এসে জোটে। আবার তুলে নিলেন বেহালাটা। অর্ধসমাপ্ত কেদারার গৎটাকে আবার শুরু করলেন গোড়া থেকে। হঠাৎ জমে উঠল। তমিজের অভাবটা অনুভব করলেন, ডুগি-তবলা থাকলে আরও জমত। চোখ বুজে বাজিয়ে যেতে লাগলেন তন্ময় হয়ে। খট করে শব্দ হতেই চোখ খুলে দেখলেন, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন ডাক্তার রামচন্দ্র। হাতে ব্যাগ, মুখে মুচকি হাসি। শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল তাঁর। ইন্‌জেক্‌শন দিতে এসেছে আবার।

"কি—"

হাতঘড়ি দেখে ডাক্তার রামচন্দ্র বললেন—"ইনজেক্‌শন দেবার সময় হয়েছে এবার।"

"লজ্জা করে না তোমার! ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দিয়ে 'পিন-কুশন' করে ফেললে, তবু ব্যথা এতটুকু কমাতে পারলে না! সকালেই তো ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে গেলে, এখন আবার কি?"

"সিভিল সার্জনকে কন্‌সালট্‌ করেছিলাম, তিনি বললেন—ভিটামিন-বি আর পেনিসিলিন দিতে, সকালে একটা, সন্ধ্যাবেলা একটা—"

বোমার মত ফেটে পড়লেন মেঘসুন্দর।

"বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। যত হাতুড়ে গণ্ডমূর্খ জুটেছে দেশে। ভিটামিন-বি আর পেনিসিলিন! সিভিল সার্জন! পয়সা লোটবার ফিকির খালি! বেরোও, বেরোও, বেরিয়ে যাও—"

হাতের বেহালাটা সবেগে ছুঁড়ে দিলেন তিনি ডাক্তারের দিকে। সেটা একটা চেয়ারের হাতলে লেগে চুরমার হয়ে গেল। রামচন্দ্র স্মিতমুখে আরও মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন। বাইরের ঘরে বসে ব্রোমাইড মিকশ্চারের একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে সন্তর্পণে দিয়ে গেলেন সেটা গণপৎ সিংকে, আর বলে গেলেন, "শিখুদিদিকে বোলো এটা যেন ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাবুকে খাইয়ে দেয় আজ রাত্রেই। বাবুর তবিয়ত খুবই খারাপ।"

ডাক্তার চলে গেলে মেঘসুন্দর পাগলের মতো নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের মধ্যে বসে অসহায় আতুরের মতো কাঁদতে লাগলেন একা।

গভীর রাত্রি।...

মেঘসুন্দরের অন্তঃপুরের দালানটা অদ্ভুত রকম দেখাচ্ছে। স্তিমিত আলোকে দেওয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর ছবিগুলো আর ছবি নেই যেন, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রখর আলোকে রেখা ও রঙের কারাগারে বন্দী ছিল যারা, তারা যেন মুক্তি পেয়েছে গভীর আলো-আঁধারিতে। বিশেষ করে দালানের একপ্রান্তে বিলম্বিত অম্বিকাসুন্দরীর ছবিখানা কথা কইছে যেন নীরব ভাষায়। তাঁর মুখের মৃদু হাসিটা শাণিত তরবারির মতো চকমক করছে। অম্বিকাসুন্দরী মেঘসুন্দরের প্রপিতামহী। স্বেচ্ছায় সহমৃতা হয়েছিলেন। চিত্রটি তাঁর যৌবনকালের। যে চিত্রকর এঁকেছিলেন, তিনি এঁর চোখে-মুখে যে মৃদু আভাটি ফুটিয়ে রেখে গেছেন তা অনবদ্য। ব্যঙ্গ এবং স্নিগ্ধতা, শালীনতা এবং মহিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন হাসিটিতে। স্বল্পালোকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্তগামী শুক্লা একাদশীর চন্দ্রকে। কালো মেঘের স্তূপকে রজতধারায় অভিষিক্ত করে দিগন্তরেখায় অবতরণ করছেন তিনি। মৃদু হাওয়ায়

পরদা নড়ছে একটা, তার সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে অদ্ভুত একটা কালো ছায়া, মনে হচ্ছে ছায়াময়ী কোন রমণী যেন উঁকি দিচ্ছে আর সরে যাচ্ছে। জগদ্ধাত্রীর সিংহের চোখ দুটো জ্বলছে। মহাকালীর মুণ্ডমালার প্রত্যেক মুণ্ডটি হাসছে। শ্রীদুর্গার পদতলে বল্লমবিদ্ধ মহিষাসুর চিৎকার করছে নীরব ভাষায়—"আমি মরি নি, আমি মরব না।"... দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামটা টক টক টক শব্দে দুলে চলছে অবিরাম...বিচিত্রপক্ষ একটা প্রজাপতি পক্ষ বিস্তার করে বসে আছে নীরবে ঘড়ির ডায়ালটার উপর। আকাশের চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে ওই প্রজাপতিটা পর্যন্ত নীরবে যোগ দিয়েছে যেন কোন গোপন ষড়যন্ত্রে। দালানের এক প্রান্তে বিনুর ঘর। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে দ্বারে। বিনুর চাপা কান্না ভেসে আসছে মাঝে মাঝে খোলা জানালাটা দিয়ে।

...খুট করে একটা শব্দ হল। দালানের অপর প্রান্তে একটা ঘরের কপাট খুলে গেল। নিঃশব্দ চরণে বেরিয়ে এল শিখরিণী। নিস্তব্ধ হয়ে বিনুর চাপা কান্নাটা সে শুনতে লাগল উৎকর্ণ হয়ে। তার মনে হল, এ শুধু বিনুর কান্না নয়, অনেকের কান্না মিশে আছে এর সঙ্গে, তার নিজেরও। অনাদিকাল থেকে ভেসে আসছে মর্মান্তিক এই রোদন। যাকে চাই তাকে পেলাম না, পেলাম না, কিছুতেই পেলাম না। যুগ-যুগান্তর থেকে বয়ে চলেছে এই কান্নার ফল্গু অন্ধকারের তলায় তলায়। অম্বিকাসুন্দরীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ল শিখরিণীর। নির্নিমেষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সেই ছবিটার দিকে। তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে গেল দালান থেকে।

ব্রোমাইডের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন মেঘসুন্দর। তবু তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর শিয়রের কাছে কী যেন করছে!

"কে?"

"আমি শিখু।"

"কী করছিস এত রাত্রে?"

"তোমার মশারিটা গুঁজে দিচ্ছি ভালো করে। খুলে গেছে এ দিকটা।"

মেঘসুন্দর আর কিছু না বলে পাশ ফিরে শুলেন। মেঘসুন্দরের মাথার শিয়র থেকে চাবির গোছাটা বার করে নিয়ে দালানে এসে আবার দাঁড়াল শিখরিণী। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বিনুর ঘরের দিকে।

...বিনু কাঁদছিল শুয়ে শুয়ে। শিখরিণীকে দেখে উঠে বসল সে বিছানায়। শিখরিণী তাকে নাইয়ে খাইয়ে যায় রোজ, কিন্তু এ সময়ে কোনদিন তো আসে না!

"তোর শাড়িগুলো কোথা?"—শিখরিণী জিগ্যেস করলে নিম্নকণ্ঠে। তারপর নিজেই এগিয়ে গেল আলনাটার দিকে। চার-পাঁচখানা শাড়ি ছিল আলনায়। নিজেই সেগুলোকে পেড়ে গাঁট বেঁধে বেঁধে লম্বা দড়ির মতো করলে একটা, তারপর ঝুলিয়ে দিলে সেটাকে জানলায় বেঁধে বাইরের দিকে।

"আয় আমার সঙ্গে।"

"কোথা?"

"আয় না।"

তুঙ্গশ্রীর ঘুম হয় নি ভালো। এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন তিনি বিছানায় শুয়ে। বাইরে এক পেচক-দম্পতির কর্কশ প্রেমালাপ তাঁর তন্দ্রাকে বিঘ্নিত করছিল বার বার। হঠাৎ একযোগে

পাখিগুলো ডেকে উঠল একবার চতুর্দিকে। সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল আবার। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ডেকে উঠল তারপর। আবার চুপচাপ হয়ে গেল সব। কেশব সামন্তর শেষ কীর্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণটা যেন মূর্তি ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর মুদিত নয়নের সামনে—'তুমি হয়তো আমাকে ভুলেছ, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলি নি। এসো।' পর মুহূর্তেই ফুটে উঠল—চপলার সেই নৃত্য হিল্লোলিত রূপটা আর তার সামনে গদগদ কেশব সামন্তর ছবিটা। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। স্বপ্ন দেখলেন, যেন মাস্টার সূর্য সেন এসেছেন। তাঁকে যেন বলছেন—"ভয় কি? সত্যকে আশ্রয় করে থাক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াও, মৃত্যুভয় যখন তুচ্ছ করতে পেরেছ তখন আবার কিসের ভয় তোমার?"

"ভিতরে আসতে পারি কি?"—মৃদুকণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করল।

তন্দ্রাটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখলেন, দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কে যেন। বেড-সুইচটা জ্বালতেই দেখতে পেলেন শিখরিণী আর বিনুকে। বিছানা থেকে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি।

শিখরিণী এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বললে—"বিনুকে আপনার কাছে রেখে গেলাম। দাদার কাছে পৌঁছে দিন একে। আমি পৌঁছে দিতুম, কিন্তু ফরসা হয়ে গেছে, আমাকে যদি কেউ দেখে ফেলে এর সঙ্গে, আমি একটু মুশকিলে পড়ে যাব। আমি চললুম।"

পর-মুহূর্তেই চলে গেল সে। নিঃশব্দচরণে চলে গেল।

বিনুকে নিয়ে ফিটনে করে যখন হিরণ্যগর্ভ আর তুঙ্গশ্রী আকাশ-বিহারে পৌঁছলেন তখন ভোর হচ্ছে। পূর্বাকাশ অরুণরাগরঞ্জিত। ছাতে গিয়ে তাঁর দেখলেন, মাস্টার মশায় ছেলেদেব নিয়ে প্রভাত-বন্দনা করছেন পূর্বাচলের দিকে চেয়ে। সারি সারি হাত জোড় করে বসে আছে ছেলেরা। বিশুও বসে আছে এক পাশে। মাস্টার মশায়ের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই গান ধরেছে—

অন্ধকার হর অন্ধকার হর
জয় জয় জয় জয় হে সূর্য-শঙ্কর
দূর কর ভয় হে
মৃত্যুঞ্জয় হে
উদ্ভাসিত কর বিবর্ণ অম্বর
হে সূর্য-শঙ্কর
অন্ধকার হর।
কণ্টক-কুণ্ঠিত জীবনের পন্থা
বিঘ্ন-বিহীন কর সঙ্কট-হন্তা
বল বল বল হে
আলোকোজ্জ্বল হে
চির-অপরাজিত যৌবন নির্জর।
হে সূর্য-শঙ্কর
অন্ধকর হর।

অন্ধ চিত্ত জুড়ি কবন্ধ শঙ্কা
নির্মূল কর কর দাও জয়-ডঙ্কা
নির্মল কর হে
বৈশ্বানর হে
সুন্দর পবিত্র মঙ্গল কর কর।
হে সূর্য-শঙ্কর
অন্ধকার হর।

সেই দিনই ফিরে গেলেন তুঙ্গশ্রী।

তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ। ট্রেনটা যখন ছেড়ে গেল, তখন তিনি আর একবার মনে করিয়ে দিলেন—"হীরা বাইজীকে গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন। আর আসবার সময় স্পেক্‌ট্রোস্কোপটা নিয়ে আসবেন। আর আপনি চেষ্টা করবেন বিয়ের দিন আসতে।"

চলন্ত ট্রেনের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে তুঙ্গশ্রী বললেন—"আচ্ছা।"

তেরো

নির্দিষ্ট দিনে গোধূলি-লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল বিনুর সঙ্গে বিশুর। আকাশ বিহারের ছাতে নহবত বসেছিল। ইমন-কল্যাণের সুর উতলা করে তুলছিল সন্ধ্যার আকাশকে।

তেতলার ঘরটায় বসে কথা কইছিলেন তুঙ্গশ্রী আর হিরণ্যগর্ভ।

"আপনার বান্ধবী হীরা বাইজী কলকাতায় কি জন্যে এসেছিলেন?"

"এমনিই এসেছিল বোধহয়। তার নিজের বাড়ি আছে একটা, সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকে।"

"আপনি কি বলে ওকে নিয়ে এলেন?"

"সব খুলে বললাম। শুনেই রাজী হয়ে গেল।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তুঙ্গশ্রী বললেন—"আপনার মুরারিপুর স্কুলের যে ছাত্রটি হরপার্বতীর মূর্তি আজ উপহার দিয়ে গেল, সেটা কি ওর নিজের হাতের গড়া?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"—একটু থেমে হিরণ্যগর্ভ সোচ্ছ্বাসে আবার বলে উঠলেন—"বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যই তো ওই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্রষ্টা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন, তাঁকেই প্রকট করে তোলা। সৃষ্টির আনন্দে মশগুল হয়ে যেতে না পারলে জীবনই বৃথা। একটা বৃহৎ কিছুতে মেতে না থাকতে পারলে মনুষ্যজীবনের স্বাদই পাওয়া যায় না..."

"আমি তো দেশপ্রেম নিয়ে মেতেছিলুম, কিন্তু জীবন আমার বিস্বাদ হয়ে গেল কেন তা বলতে পারেন?"

"বিস্বাদ হয়ে গেল? হতেই পারে না। তাহলে আপনি মাততে পারেন নি ভালো করে। কিংবা মেতেছিলেন একটা ছোট জিনিস নিয়ে বা একটা মতবাদ নিয়ে। তাই সেটা ফুরিয়ে গেল চট করে।"

"সবই কি ফুরিয়ে যায় না শেষ পর্যন্ত? ওই যে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট নিয়ে মেতে আছেন, তাও কি ফুরিয়ে যাবে না একদিন? ওটাও কি একটা থিয়োরি নিয়ে পরীক্ষা নয়?"

"কিন্তু থিয়োরিটাই ওর সব নয়, থিয়োরিটা সত্যের নাগাল পাওয়ার একটা কাল্পনিক পথ মাত্র। আমার আসল উদ্দেশ্য—সত্যকে পাওয়া। আমি কল্পনায় একটা রাস্তা ঠিক করলাম এবং সেই রাস্তায় শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখলাম, সত্যকে যদি পাওয়া গেল ভালোই, না যদি পাওয়া যায় আর-একটা রাস্তা ঠিক করব ভেবে, নূতন রাস্তা সৃষ্টি করবার অভিনব আনন্দে মেতে উঠব আবার। ওর কি শেষ আছে কোনও?"

"আচ্ছা, আপনি যে এই এক্স্‌পেরিমেন্ট করছেন, তা কতদিন চলবে?"

"গত পাঁচ বৎসর থেকে অনেক রকম পরীক্ষা করে দেখেছি, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সব বিবরণ লেখা আছে আমার কাছে, সেগুলো মিলিয়ে হিসেব করে দেখতে হবে। বাঁদরটার ওপর যে এক্স্‌পেরিমেন্টটা করছি, দেখি সেটা কি রকম দাঁড়ায়। এখনও পর্যন্ত তো কিচ্ছু হয় নি ওর।"

"আচ্ছা, ওই সব এক্স্‌পেরিমেন্ট করতে আপনার খুব ভালো লাগে?"

"ভালো না লাগলে করতে পারি কখনও? আমার ল্যাবরেটারির আলমারিতে আমার এক্স্‌পেরিমেন্টের যে সব রেকর্ড আছে, তাতে আছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলির পরিচয়। ওতে যে কী আনন্দ পাই—তা আপনাকে বোঝাতে পারব না ঠিক।"—একটু থেমে তারপর বললেন—"আপনি কি আজই ফিরে যাবেন?"

"হ্যাঁ বিয়ে তো হয়ে গেল, থেকে কী করব?"

"কলকাতায় কোথায় আছেন এখন? কেশবের বাড়ি থেকে তো চলে এসেছেন বলছেন।"

"আমি এখন অলকার বাসায় আছি।"

"ওঃ। এই ট্রেনেই যদি যেতে চান তাহলে উঠতে হয় এখন।"

"চলুন।"

ফিটনে চড়ে আসছিলেন দুজনে।

রাস্তায় দেখা হল নরেনের সঙ্গে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইকে চড়ে আসছিল। সে যা খবর দিলে, তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি ভয়ানক। একদল লোক মোটরে চড়ে এসে হঠাৎ নাকি হিরণ্যগর্ভের ল্যাবরেটারি আক্রমণ করেছিল একটু আগে। কুড়ুল দিয়ে চেলিয়ে কপাট ভেঙে ল্যাবরেটারির জিনিসপত্র ভেঙে পুড়িয়ে তছনচ করে দিয়ে চলে গেছে। সে দলের মধ্যে নরেন নাকি কেশব সামন্তকেও দেখেছে। তুঙ্গশ্রীর চোখের সামনে ফুটে উঠল চপলার বাড়িতে নাচের সেই দৃশ্যটা, আরও মনে পড়ল কেশব সামন্তর সেই কথাগুলো—"গুণ্ডা চাই আমার, বন্দুক, ছোরা, কুড়ুল, কাটারি নিয়ে নিজেই যাব আমি এবার!"

কিন্তু তিনি কিছু বললেন না, নির্বাক হয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলতে লাগল কেবল।

চোদ্দ

উপর্য্যুপরি কয়েকটা দ্রুত আঘাতে এমন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন মেঘসুন্দর যে, বিশু-বিনুর বিয়ের খবরটা যখন তিনি পেলেন তখন তাঁর আর রাগ করবার শক্তি নেই। খবরটা পেলেন তিনি একটা চিঠির মারফত। আগের দিনই চিঠিটা লিখে ডাকে দিয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ, যাতে তিনি ঠিক বিয়ের পরদিন চিঠিটা পান। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শ্রীচরণেষু,

বিশু আর বিনুর বিয়ে দিয়ে দিলাম। যা অনিবার্য তাকে নিবারণ করতে পারেন নি বলে মনে গ্লানি রাখবেন না। ওরা দুজনেই আপনাকে ভক্তি করে।

ওদের আশীর্বাদ করুন। ওরা আকাশ-বিহারে আছে। আমি একান্ত মনে আশা করে রইলাম যে, আপনি আমাদের বিরাট বংশমর্যাদার মান রাখবেন ইতি— প্রণত

হিরণ

এই চিঠি পেয়ে মেঘসুন্দর হয়তো বোমার মতো ফেটে পড়তেন, কিন্তু তাঁর আর শক্তি ছিল না। সকালে উঠে শিখরিণীর মুখে যখন তিনি শুনলেন যে. বিনু জানলার সঙ্গে শাড়ি বেঁধে তারই সাহায্যে নেমে পালিয়েছে তখন হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। বিনুর উপর তাঁর যে জোর ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, যে জোরের অহঙ্কারে তিনি তাকে তার অন্যায় আচরণের জন্যে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, সহসা আবিষ্কার করলেন তার উপর সে জোর তাঁর নেই। সে তাঁকে অনায়াসে ছেড়ে চলে গেছে। অহঙ্কারের স্ফীত রবারের বেলুনটা চুপসে গেল যেন সহসা পিনের খোঁচা খেয়ে। সমস্ত দিন তিনি একটি কথা বলেন নি, কিছু খানও নি। চুপ করে বসেছিলেন। শিখরিণী নিঃশব্দে এসে নিঃশব্দে ফিরে গেছে কয়েকবার। কথা বলতে সাহস করে নি। তার পরদিন সকালবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে হীরা বাইজী এসে পড়াতে আরও বিমর্ষ হয়ে গেলেন তিনি, একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন যেন। মনে হল. আন্তরিক আনন্দ-সহকারে তাঁকে অভ্যর্থনা করার শক্তিও যেন নেই তাঁর, ভিতরটা হঠাৎ ফোপরা হয়ে গেছে, বাইরে ব্যর্থ আড়ম্বরটা পড়ে আছে শুধু। এতদিনের সঙ্গী বেহালাটাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল হঠাৎ। হীরা বাইজী তাঁর আগমনের যে কারণটা বলেছেন এসে, তাতে আরও লজ্জিত হয়ে পড়েছেন তিনি। হীরা বাইজী বললেন যে, কলকাতায় এসে তিনি নূতন যে কয়েকটা বাংলা গান শিখেছেন তাই তাঁকে শুনিয়ে যাবেন বলে এসেছেন, কারণ তাঁর মতো সমঝদার গুণীকে গান শোনাতে পারা একটা সৌভাগ্য বলে মনে করেন তিনি। শুনে লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেছে তাঁর, বুকের ভিতরটা 'হায় হায়' করে উঠেছে। তিনি সারা জীবন ওই গান নিয়েই আছেন, কিন্তু কিছু পান নি। সারা জীবন হাতড়ে বেরিয়েছেন শুধু। পিপাসিত লোক জলের সন্ধানে ছুটে বেড়ায় যেমন তেমনি ছুটে বেরিয়েছেন শুধু। আকুল হয়ে ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়েছেন বারংবার, মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন কিন্তু জল পান নি। ছোটাই সার হয়েছে শুধু। বাইরের লোক তাঁকে ঘিরে যতই বাহবা বাহবা করুক, তিনি নিজে জানেন কত বড় সঙ্গীতবিশারদ তিনি। বাইরের লোকের বাহবাকে তিনি গ্রাহ্য করেন না, কারণ তিনি জানেন যে ওই অপদার্থ পারিষদগুলোর বাহবা দেবার প্রেরণা তাঁর সঙ্গীত-বিদ্যা নয়, তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। কিন্তু হীরা বাইজীর মুখে এ কথা শুনে তিনি সত্যিই লজ্জিত হয়েছেন। হীরা বাইজী তাঁর পারিষদ নন, সত্যিই গানের উপর অসাধারণ দখল আছে তাঁর, তিনি এ কথা বললেন কেন? তবে কি তাঁকেও ঠকিয়েছেন তিনি তাঁর ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে? তাঁর মুখোশটা কি এমন বেমালুম মিশে গেছে তাঁর মুখের সঙ্গে যে, তাঁর স্বরূপ চিনতে হীরা বাইজীরও ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। সত্যিই কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন তিনি।

হীরা বাইজী কিন্তু জমিয়ে তুললেন ক্রমশ। তোড়ী, ভৈরবী, আশাবরী, গৌরসারং, পিলু,

পূরবী, মূলতান, ইমন-কল্যাণ গেয়ে গেলেন পর পর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। সুরসপ্তকের বিভিন্ন বিচিত্র ধারায় অবগাহন করে মেঘসুন্দরের মন ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হল যেন। একটা উদার ঔদাসীন্য ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ করে তুলল তাঁর হৃদয়কে, গানের দোলায় দুলতে দুলতে তিনি ক্রমশ আবার নিজের আত্মমর্যাদালোকে গিয়ে হাজির হলেন, খুঁজে পেলেন যেন নিজেকে।

...ইমন-কল্যাণের গুরুগম্ভীর আলাপ চলছিল, এমন সময় খবর এল, হিরণ্যগর্ভের ল্যাবরেটারিতে ডাকাত পড়েছে—হিরণ্যগর্ভ বাড়িতে নেই। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর। তাঁর নিজের গোটা দশেক বন্দুক ছিল। অবিলম্বে দশজন সিপাই নিয়ে গণপৎ সিং ডাকাতের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে দিলে। তিনি নিজেও খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠলেন ছাতে নিজের রাইফেলটা নিয়ে এবং গুলি চালাতে লাগলেন। এককালে খুব ভালো শিকারী ছিলেন তিনি। ডাকাতের দল পালাল। মেঘসুন্দরের সিপাহীরা গিয়ে না পড়লে সমস্ত ল্যাবরেটারিটাই ধ্বংস করে দিত তারা। সিপাহীরা গিয়ে পড়াতে তবু কিছুটা বেঁচেছে।

...এর পর আর গান জমল না। হিরণ্যগর্ভের খোঁজে থানাতে লোক পাঠালেন তিনি। তারপর অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। শিখরিণী নীরবে দাঁড়িয়ে সব শুনলে, তারপর নীরবে বেরিয়ে চলে গেল। তাতে আরও অস্থির হয়ে পড়লেন মেঘসুন্দর। কিছু বলছে না কেন ও? ও-রকমভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে যাবার মানে কি? মন্মথও কোথায় গিয়ে বসে রইল এই সময়ে? একটু পরে কম্প্রেস নিয়ে এল শিখরিণী। বোঝা গেল, খুব বেশী আতর ঢেলেছে। নিমেষের মধ্যেই ঘরটা গোলাপী আতরের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

"কাকু, তুমি বস, সেঁকটা দিয়ে দিই।"

মেঘসুন্দর কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন। এই রকম কিছু একটার জন্যে যেন মনে মনে তৃষিত হয়েছিলেন। বাধ্য বালকের মতো বসলেন।

"কি কাণ্ড! খুব দুর্বৎসর এবার। লোকে খেতে পাচ্ছে না, ডাকাতি তো হবেই।"

শিখরিণী কোনও উত্তর না দিয়ে সেঁক দিয়ে যেতে লাগল নীরবে।

"কোনও কথা বলছিস না কেন তুই?"

আরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে মৃদু হেসে শিখরিণী বললে—"কী বলব আমি?"

মেঘসুন্দরেরও মনে হল, তাই তো, এ বিষয়ে শিখরিণীর আর কি বক্তব্য থাকতে পারে?

"হিরণের কোনও পাত্তা পাওয়া যায় নি?"

"কি জানি।"

"সে ওই ছুতোর ছোঁড়াটাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছে? এদিকে তার নিজের বিষয়সম্পত্তি যে উড়ে-পুড়ে শেষ হয়ে গেল, সেদিকে খেয়াল নেই!"

এ কথারও কোনো জবাব দিলে না শিখরিণী। নীরবে সেঁক দেওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

"রাত্রে কি খাবে তুমি কাকু?"

"কিছু খাব না।"

"ডিমের পুর দিয়ে কচুরি কয়েকটা—"

"না, না, আমার জন্যে কিছু করতে হবে না।"—অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন মেঘসুন্দর।

"তোমার জন্যে করতে যাচ্ছি না, আমি করেছি, তুমি যদি খাও আনি তাহলে।"

"থাক, দরকার নেই।"

শিখরিণী চলে গেল। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন মেঘসুন্দর। এলোমেলো চিন্তার বিক্ষুব্ধ স্রোতে ছেড়ে দিলেন মনটাকে। অতীতের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল দাদাকে— পণ্ডিত বিশুদ্ধসুন্দরকে। নামের মর্যাদা তিনি রেখেছিলেন। বিশুদ্ধ এবং সুন্দর জীবনই যাপন করে গেছেন। লেখাপড়া নিয়েই কাটিয়ে গেছেন সারাজীবন। উপনিষদ্ নিয়ে যখন মেতেছিলেন, তখন হিরণের জন্ম হয়, তাই ওর নাম রেখেছিলেন হিরণ্যগর্ভ। বলেছিলেন—ও কেবল আমাদের নয়, ও সকলের। ওর জন্ম আজই হয়নি, ও চিরন্তন। পঞ্চভূতে মিশে আছে ও অনাদিকাল থেকে ও হিরণ্যগর্ভ। হঠাৎ মেঘসুন্দরের মনে হল, পিতার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেছে হিরণ। সত্যিই ও কারও নয়, অথচ সকলের। নিজের বলে ওর কিছু নেই, সব বিলিয়ে দিচ্ছে, এমন কি নিজেকেও বিলিয়ে দিচ্ছে গানের সুরের মতো। একটা গানের উপমা মনে এল সহসা। একজন বড় ওস্তাদ যেমন একটা যন্ত্রকে অবলম্বন করে নিজের মনের সুর বাজায়, হিরণও তেমনি ওই ল্যাবরেটারি অবলম্বন করে নিজেকেই বাজাচ্ছে। আসলে ও সুরশিল্পী একজন। কথাটা মনে হওয়ামাত্র মনটা প্রসন্ন হল তাঁর। হবে না? তাঁদের বংশে সবাই যে সুরের সমঝদার ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ বসন্তসুন্দরের নাম আজও অভিজাত ওস্তাদরা মনে করে রেখেছে। অনেকে বলে, বসন্ত সুরের তিনিই নাকি স্রষ্টা। এ কথাটা অবশ্য বিশ্বাস করেন না মেঘসুন্দর, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রেও এ সুরের নাম রয়েছে। টাকার লোভে খোশামোদ করে কেউ রটিয়েছে বোধ হয় কথাটা। হঠাৎ মেঘসুন্দরের মনে হল আশ্চর্য জিনিস এই টাকা; ও না হলে চলে না, অথচ থাকলেও নানা ঝঞ্ঝাট। নানা ফন্দি করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে সবাই। খোশামোদ করে, শেয়ার বিক্রয় করে, স্ট্রাইক করে, শেষ পর্যন্ত ডাকাতি করে। হিরণের ল্যাবরেটারিটা তো ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল—এখন কী করবে ও, কী করে বাঁচাবে নিজেকে? হঠাৎ মনে পড়ল, তাঁর বেহালাটাও ভেঙে গেছে। মনে হল, হিরণ যেন তাঁর অতি কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। লুণ্ঠিত বিধ্বস্ত বিক্ষত হিরণ। ও কি আবার ওর ল্যাবরেটারি গড়তে পারবে? তিনি হয়তো আবার একটা বেহালা কিনতে পারবেন, কিন্তু ও কি পারবে আবার একটা ল্যাবরেটারি করতে? পেটেণ্ট ওষুধের ফরমুলা বেচে যে টাকাটা পেয়েছিল, তা নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিয়েছে এতদিন। নিজের জমিদারি থেকে একটি পয়সা তো ও নেবে না। হঠাৎ উত্তেজনাভরে উঠে দাঁড়ালেন। সেঁক দিয়ে হাঁটু র ব্যথাটা অনেক কমে গেছে মনে হচ্ছে। খচ করে লাগল না তো! এগিয়ে গেলেন তিনি একটা দেওয়াল-আলমারির কাছে। সেদিন রেগে হিরণকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে যে উইলটা করেছিলেন, সেটা বার করলেন: ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেটার দিকে, তারপর কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারি আনন্দ হল। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘরের চারিদিকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই গুনগুন করতে লাগলেন একটা গানের কলি—"ভঁওরা ঘুর ঘুর যাতি হায়।

তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—"ওরে, কে আছিস—"

একটি চাকরানী আধঘোমটা দিয়ে দাঁড়াল দ্বারপ্রান্তে।

"শিখুকে ডেকে দে।"

শিখরিণী আসতেই ধমকে উঠলেন তিনি—"কই, কোথায় তোর কচুরি, আনলি না?'

তিনি নিজেই যে খাবেন না বলেছিলেন, সে কথার উল্লেখমাত্র করলে না শিখরিণী। মৃদু হেসে শুধু বললে—"আনছি।" বলেই চলে গেল।

...অনেকগুলো কচুরি খেলেন মেঘসুন্দর। বেশ তৃপ্তি করেই খেলেন। রাত্রে বেশ ভালো ঘুমও হল তাঁর। এমন সুনিদ্রা বহুকাল হয় নি।

সকালে পিওন যখন চিঠিটা দিয়ে গেল, তখন হীরা বাইজী উদাত্ত সুরে একটা বাংলা গান গাইছিলেন—

হে মহাসুন্দর হে সঙ্কাশ,
সবার ঊর্ধ্বে তুমি বিরাজ
হে মহারাজ, হে মহাকাশ।
তোমারে ঘিরিয়া করে আনন্দ
লক্ষ তপন তারকা চন্দ্র
পাখি পতঙ্গ জলদমন্দ্র
তোমারি মাঝারে হয় বিকাশ।
বিশ্বের বিষ হরণ করিয়া
যোগীশ্বর হে নীলকণ্ঠ,
হে মহানিঃস্ব, হে মহাঋদ্ধ,
সবারে সুধা যে তুমিই বণ্ট।

তব মাঝে কত গিরি কত সমুদ্র
হে মহাশান্ত, হে মহারুদ্র,
ছোট ধূলিকণা অতীব ক্ষুদ্র
তারও আছে ঠাঁই তব সকাশ।

চিঠিখানা আর একবার পড়লেন মেঘসুন্দর।—"ওদের আশীর্বাদ করুন। ওরা আকাশ-বিহারে আছে। আমি একান্ত মনে আশা করে রইলাম যে, আপনি আমাদের বিরাট বংশমর্যাদার মান রাখবেন।"..হীরা বাইজীর কণ্ঠে উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হচ্ছিল—সবার ঊর্ধ্বে তুমি বিরাজ, হে মহারাজ, হে মহাকাশ।

মেঘসুন্দর ঠিক করে ফেললেন, আকাশ-বিহারে গিয়ে ওদের আশীর্বাদ করবেন। গানটা শেষ হতেই গণপৎ সিংকে বললেন, হিরণবাবুকে ডেকে আনতে। গণপৎ সিংয়ের সঙ্গে এল নরেন।

"হিরণদা আকাশ-বিহারে আছেন।"

"তাকে খবর পাঠাও যে, আমি ওদের আশীর্বাদ করতে যাব আজ বিকেলে।"

নরেন চলে যাচ্ছিল, মেঘসুন্দর আবার ডাকলেন।

"শোনো। ল্যাবরেটারির কতটা পুড়েছে?"

"টাইফয়েডের কালচারগুলো নষ্ট হয় নি, আর সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে।"

"ও, আচ্ছা। খবর পাঠিয়ে দাও এক্ষুণি।"

"আমি নিজেই যাচ্ছি।"

নরেন চলে গেল।

হীরা বাইজী ভজন ধরলেন একটা।

পনেরো

কেশব সামন্তর তেতলার ঘরেও ঐকতান জমে উঠেছিল খুব। হু-হু করে জ্বলছিল স্টোভটা, বেজে চলেছিল বিলিতি অর্কেস্ট্রা, স্যাক্সোফোনটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসছিল যেন প্রেতিনীর মতো। কেশব সামন্ত নিজে বাজাচ্ছিলেন একটা ঝাঁঝর ঝম-ঝম করে। চতুর্দিকে ছড়ানো পড়েছিল হিরণ্যগর্ভের আর মেঘসুন্দরের গুলিবিদীর্ণ ফোটোগুলো, শিখরিণীর ফোটোটার কপালে আর একটা তাজা রক্তের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছিল। মাঝে মাঝে হা-হা-হা-হা করে অট্টহাসি হাসছিলেন কেশব সামন্ত। হঠাৎ নীচে ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল। গ্রামোফোনের রেকর্ডটাও থেমে গেল। বাজনা থামিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ কেশব সামন্ত। তারপর স্টোভটা নিবিয়ে নীচে নেমে গেলেন তিনি। বিশেষ কিছু নয়, পিওন দাঁড়িয়ে ছিল একটা রেজেস্ট্রি চিঠি নিয়ে। চিঠিটা সই করে নিলেন তিনি। পিওন চলে গেল। অপরিচিত হস্তাক্ষরের চিঠি খুলেই বুকটা কেঁপে উঠল। শিখরিণীর চিঠি। লিখেছে —"তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি এসেছি কলকাতায়, উপরের ঠিকানায় আছি। তোমার বাড়িতে যাওয়া অসম্ভব, কারণ উনি সঙ্গে আছেন। তুমি যদি কোনও রকমে উপরের ঠিকানায় আসতে পার দেখা হবে। ইতি"—নাম নেই। হাতের লেখাও শিখরিণীর নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করে গোঁফ পাকাতে লাগলেন কেশব সামন্ত।

ষোল

মেঘসুন্দর উঠছিলেন আকাশ-বিহারে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করবার জন্যে। পিছনে আসছিল পুরোহিত এবং অনুচরের দল আশীর্বাদের উপকরণ ও উপহারের সম্ভার বহন করে। হিরণ্যগর্ভও সঙ্গে ছিলেন। সকলের পিছনে আসছিল শিখরিণী শাঁখ বাজাতে বাজাতে। তেতলা পর্যন্ত উঠে হাঁফ ধরতে লাগল মেঘসুন্দরের। সেইখানেই থেমে গেলে পারতেন, কিন্তু থামলেন না। তাঁর কেমন যেন রোখ চড়ে গেল, সাততলার উপরেই উঠবেন। ওদের বাসরঘরে গিয়েই আশীর্বাদ করবেন। নিজের কষ্টের কথা কাউকে কিছু বললেন না। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। সাততলার সিঁড়িতে যখন উঠছেন, তখন বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছে তাঁর। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। তারপর — চোখের সামনে অন্ধকার—মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। নূতন যুগের বাসরঘরের দ্বারে মৃত্যু হল প্রাচীন আভিজাত্যের।

আর একটা মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটল, কলকাতায় হীরা বাইজীর বাড়িতে। তুঙ্গশ্রীর গুলিতে মারা গেলেন কেশব সামন্ত।

সতেরো

হিরণ্যগর্ভ নিজের ল্যাবরেটারিতেই বসেছিলেন কম্বলের উপর। বই পড়ছিলেন একটা। পরিধানে সাদা থান, সাদা উত্তরীয়। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। ছ দিন না-কামানোর ফলে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি উঠেছে। কাকার মৃত্যুতে অশৌচ পালন করছেন।

...তুঙ্গশ্রী এসে প্রবেশ করলেন।

"আসুন।"—সুমিষ্ট হাসি হেসে অভ্যর্থনা করলেন হিরণ্যগর্ভ, যেন কিছুই হয় নি। তাঁর হাসি দেখে বিস্মিত হলেন তুঙ্গশ্রী।

"কাকা মারা গেছেন—"

"সব শুনলাম আমি এখনই নরেনের কাছে। কেশববাবুও মারা গেলেন, শোনেন নি বোধহয়?"

"তাই না কি! না, শুনি নি তো! কী করে মারা গেল?—আহা!"

"তুঙ্গশ্রীর গুলিতে।"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"অন্যায় করেছেন।"—হিরণ্যগর্ভ বললেন শেষে।

"ন্যায় অন্যায় জানি না। আমি আমার বিবেকের আদেশ পালন করেছি শুধু।"

আবার খানিকক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলেন।

"আপনার ল্যাবরেটারি তো ভেঙে গেল। এইবার কী করবেন?"

"আবার গড়ব। যন্ত্রপাতি সব বাজারে পাওয়া যাবে। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে আমার এতদিনের রেকর্ডগুলো পুড়ে গিয়ে। বাঁদরটা ভাগো ও-বাড়িতে ছিল। বাঁদরটার এখনও কিছু হয় নি। ওর যদি কিছু না হয় তাহলে আমার শেষ এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা আমি করব অশৌচটা শেষ হয়ে গেলে।"

"টাইফয়েড কাল্‌চার খাবেন?"

"হ্যাঁ।"

কিন্তু কলকাতায় একজন ডাক্তারকে জিগ্যেস করেছিলাম, তিনি বললেন—টাইফয়েড কাল্‌চার খেলে নিশ্চয়ই টাইফয়েড হবে।"

"হলই বা, যদি মরেই যাই তাতেই বা ক্ষতি কি?"

অত্যন্ত শান্তভাবে কথাগুলি বললেন হিরণ্যগর্ভ।

তারপর একটু হেসে বললেন—"একটা কথা শুধু মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি যদি মারা যাই, আমার মুরারিপুর স্কুলটা হয়তো উঠে যাবে। আপনি ভার নিন না আমার স্কুলটার। মাস্টার মশাই তো আছেন, আপনিও যদি থাকেন—"

"আমার মতো খুনে মেয়েকে বিশ্বাস হয় আপনার?"

কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হিরণ্যগর্ভ বললেন—"হয়।"

জানলার দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন তুঙ্গশ্রী অনেকক্ষণ।

তারপর বললেন—"আপনিই এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আপনি যদি না থাকেন তাহলে—"

"আমি? আমি কে? দেশের কাজই যদি সবচেয়ে বড় আকর্ষণ না হয় আপনার, তাহলে আপনাকে আসতে হবে না।"

আবার নীরবে বসে রইলেন দুজনে।

তারপর হিরণ্যগর্ভ বললেন—"আমি আকাশ-বিহারে যাচ্ছি এখনই। এ ক'দিন সেখানেই থাকব। আপনি শিখুর কাছে থাকুন। আপনি যে স্পেক্‌ট্রোস্কোপটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেইটে দিয়ে ছেলেদের দেখাব আজ সূর্যালোকে কেমন চমৎকার সাতটা রঙ আছে। তারা আসবে

আজ সেখানে, সেইজন্যেই এই ফিজিক্সের বইটা পড়ছিলাম বসে। আপনি বরং বাড়িতে যান। কুঞ্জ—"

তুঙ্গশ্রী একটু আহত হলেন মনে মনে । তাঁর সম্বন্ধে কিছুমাত্র মোহ নেই ভদ্রলোকের। একেবারে নির্বিকার। সমস্ত মনটা মুচড়ে উঠল যেন। কিন্তু মুখের একটি পেশীও বিচলিত হল না। অন্তরের অন্তস্তলে যে বঞ্চিতা অভাগিনী নিঃশব্দ উপুড় হয়ে পড়েছিল, তার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি। কুঞ্জ আসতেই উঠে দাঁড়ালেন।

"আচ্ছা, তাহলে উঠি এখন। দু-এক দিনের মধ্যেই চলে যাব আমি বোধ হয়।"

"ও, আচ্ছা। নমস্কার।"

"নমস্কার।"

আঠারো

আকাশ-বিহারের ছাতে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন হিরণ্যগর্ভ একটা বাইনাকুলার নিয়ে। বিরাট আকাশের পটভূমিকায় বিশাল দিগবলয়ের দিকে চেয়ে সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত শোক, সমস্ত গ্লানি ঘুচে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর মনে হচ্ছিল, ভারতবর্ষের শাশ্বত রূপ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে চারদিকে। কোথাও কোন নীচতা নেই, দীনতা নেই, সঙ্কীর্ণতা নেই। সবুজ মাঠের উপর নেমে এসেছে শুভ্র সূর্যালোক নির্মল নীল আকাশ থেকে— যে সূর্যালোক অন্ধকারকে হরণ করে, যে সূর্যালোক সপ্তবর্ণের সমন্বয় এবং সেইজন্যেই যা সর্বপাপঘ্ন।

বাইনাকুলার দিয়ে দেখতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে চারদিক। হঠাৎ দেখতে পেলেন তুঙ্গশ্রী আসছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন দ্রুতবেগে। হিরণ্যগর্ভও নামতে লাগলেন। মধ্যপথে দেখা হল।

তুঙ্গশ্রীর বুকের ভিতরটা কাঁপছিল। মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

"কি খবর? আসুন।"— হেসে অভ্যর্থনা করলেন হিরণ্যগর্ভ।

"আপনার বাঁদরটার অসুখ করেছে। চুপ করে শুয়ে আছে, কিছু খাচ্ছে না।"

"আপনাকে কে বললে?"

"আমি গিয়েছিলাম সেটাকে দেখতে।"

"ও। তাহলে বোধ হয় হয়েছে কিছু।"

"তাহলে তো আপনার ওই এক্স্‌পেরিমেন্ট করবার দরকার হবে না?"

"না, ওর যদি টাইফয়েড হয় তাহলে তো আমার এক্স্‌পেরিমেন্ট শেষ হয়ে গেল।"

তুঙ্গশ্রীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"চলুন, ওপরে যাওয়া যাক। ছেলেরা আসে নি এখনও?'

"না। এইবার আসবে।"

"চলুন, ওপরে যাই, আপনার স্পেক্‌ট্রোস্কোপের এক্স্‌পেরিমেন্টটা আমিও দেখব।"

দুজনে উপরে উঠতে লাগলেন।

দুই পথিক

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে তুমুল মেঘ, ঝড় আসন্ন। গোবর্ধনবাবু পারঘাটায় এসে পৌঁছলেন পারের আশায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশা অবশ্য হতাশায় পরিণত হল। এও তিনি অনুভব করলেন পিতৃবাক্য অমান্য করে অন্যায় করেছেন। যখন জেনেছিলেন আজ ত্র্যহস্পর্শ তখন তাঁর আসা উচিত হয়নি। পারঘাটার ঘরটির দিকে তাকালেন তিনি। তাকিয়ে কোনও আশ্বাস পেলেন না। পারঘাটায় যাত্রীদের জন্য যে ঘরটি আছে সেটি একটি অদ্ভুত সমন্বয়। একটা দেওয়াল পাকা, সাবেক আমলের চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা। বাকি তিনটে দেওয়াল কাঁচা, মাটি দিয়ে তৈরি। মাথার উপর যে চালাটা আছে সেটাও অদ্ভুত। সেটার খানিকটা খড়, খড়ের উপর খাপরাও আছে কিছু, আর খানিকটা টিন। একটু হাওয়া হলেই খড় খড় শব্দ হয়। গোবর্ধনবাবু দেখলেন পারঘাটায় যাত্রীদের কাছে পয়সা নেবার জন্য যে ট্যারা লোকটি এখানে সাধারণত থাকে সে-ও অনুপস্থিত। বস্তুত, কেউ নেই আশেপাশে। থমথম করছে চতুর্দিক। গঙ্গাও যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কিসের প্রত্যাশায়। তারপরই শোঁ শোঁ করে শব্দ হল। ঝড় এসে গেল। খড় খড় করে উঠল টিনটা। গোবর্ধনবাবু দৌড়ে ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করলেন।

"দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই, পা-টা মাড়িয়ে দেবেন না।"

চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গোবর্ধনবাবু।

"টর্চ আছে আপনার পকেটে?"

"না।"

"আমার কাছেও নেই। অথচ বাড়িতে ফুল্‌লি লোডেড্ ভালো টর্চ আছে একটা। আসবার সময় আনতে ভুলে গেলাম। আমি তো সব জিনিসই ভুলি, আমার গিন্নীও ভুলে গেলেন, মেয়েটাও ভুলে গেল। দাঁড়ান, আমি একটু সরে যাচ্ছি ঘেঁষটে ঘেঁষটে। আপনি একটু বাঁ-দিকে ঘেঁষে আসুন। ঘাটের কাছে এই গর্তটায় পড়ে গিয়ে পা-টি বেশ মচ্‌কেছি, বেশ জমাটি রকম মচ্‌কেছি। একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে এসে ওই বাঁ-দিকের কোণটাতেই বসে পড়ুন। যা গতিক দেখছি আজ সমস্ত রাত্রিই এখানে অবস্থান করতে হবে। নৌকা আজ আর আসছে না, এলেও তাতে চড়া নিরাপদ নয়, যাক্, তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। আসুন, আসছেন?"

"আসছি, বাঁ-দিক ঘেঁষেই আসছি।"

খুব সন্তর্পণে গিয়ে বাঁ কোণটাতে বসে পড়লেন গোবর্ধন।

"আপনিও কি ওপারের যাত্রী না কি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আসুন আজ এইখানেই দুজনে মিলে রাত্রিবাস করা যাক। আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সহ-অবস্থান। ভালই হল, কথা কয়ে সময়টা কাটবে, অবশ্য ঘরটা যদি হুড়মুড় করে মাথার উপর না পড়ে— "

"যদি পড়েও উপায় কি, মাথা পেতে নিতে হবে। বাইরের অবস্থা বেশ ঘোরালো—"

"এবং জোরালো। ওই কোণের দিকে খড় আছে, ভাল করে গুছিয়ে বসুন যতক্ষণ পারেন।"

"বসছি। দাঁড়ান কুকুরটাকে ডেকে আনি।"

"কুকুর? কুকুর আছে নাকি সঙ্গে আপনার?"

"সঙ্গে ছিল না, রাস্তায় জুটে গেল। নেড়ি কুকুর। ভাব হয়ে গেছে। দেখি, কোথা গেল।"

"ঘরের তো এই অবস্থা। এর ভেতর কুকুর ঢোকাবেন? ভেবে দেখুন।"

"আমি ঢোকাতে চাইলেই ঢুকবে কি? ওরা মনমর্জি প্রাণী। বাইরে দাঁড়িয়ে বা কোনও আঁস্তাকুড়ের ছাইগাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঠকঠক করে কাঁপবে তবু ভিতরে আসবে না। তবু দেখি কোথা গেল।"

বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু।

খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললেন, "এল না। ভজুয়ার বউটার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে।"

"ভজুয়া আবার কে?"

"ট্যারা ভজুয়াকে চেনেন না? এখানে প্রথম এসেছেন বুঝি। ভজুয়াই তো এখানকার মালিক। পারাণির পয়সা নেয়, ট্যাক্স কলেক্টার।"

"আমি যখন এলাম তখন তো সে ছিল না।"

"মদটদ আনতে গেছে বোধহয়। বউটা তো চাট্ তৈরি করছে দেখলাম।"

"আমাদের জন্যে কিছু খাবার তৈরি করে দেয় না। পয়সা দেব?"

"পয়সা দিলে দেবে না। এমনি যদি দেয়। বলে তো এলাম। মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, দেব। দেবে কি না ভগবানই জানেন। ওদেরই আজকাল রাজত্ব, বুঝলেন—"

"রাজত্ব মানে?"

"মানে কারও পরোয়া করে না। মানুষেরও নয়, প্রকৃতিরও নয়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই গতর খাটিয়ে খায়। ঝড় বৃষ্টিতে আমরা বেকায়দায় পড়েছি, ওদের গ্রাহ্য নেই। স্বামীটা মদ আনতে গেছে, স্ত্রী চাট্ তৈরি করছে। আমরা কি ও রকম পারি?"

"রাম কহ। তবে আমরা যা পারি তা আবার ওরা পারে না। বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ হবে মনে হচ্ছে। অদৃষ্টে যদি থাকে ভজুয়ার বউ সদয় হবে। হয় তো চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সবই জুটে যাবে শেষকালে। অদৃষ্টের খেল তো আগে থাকতে বোঝবার উপায় নেই। ভজুয়ার বউয়ের কানে একটা কথা তুলে দিলে হয় তো কাজ হত।"

"কি কথা?"

"একজন সাধুবাবা এখানে আছেন। অন্ধকার বলে দেখতে পাচ্ছেন না, আমার আপাদমস্তক সব গেরুয়া।"

"ও, তাই নাকি। আমার প্রণাম নিন। গেরুয়ার উপর আমার খুব ভক্তি।"

"শুধু আপনার কেন, অনেকেরই। আমি গেরুয়ার উপযুক্ত হতে পেরেছি কি না জানি না—খুব সম্ভব পারি নি—কিন্তু ওরই জোরে বেশ চালিয়ে যাচ্ছি। এ দেশে গেরুয়াধারীরা অনেকেই বেশ বড়লোক, অনাহারে তো কেউ মরেই না। ভক্ত জুটে যাবেই। ওই ভজুয়ার

বউ যদি শোনে একজন সাধুবাবা এখানে বসে আছে, খাবার নিয়ে আসবে ঠিক। অন্তত ফলও আনবে দু'একটা। এ এক অদ্ভুত দেশ।"

গোবর্ধনবাবু সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের লোক?"

"আরে না মশাই। আমি এই সেদিন পর্যন্ত পুলিশে চাকরি করেছি। আমার জীবন-কাহিনী বিচিত্র। আপনার নামটি কি?"

"আমার নাম গোবর্ধন। গোবরও বলতে পারেন, ষাঁড়ের গোবর," বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

"বাড়ি কোথা? বিহারেই?"

"আজ্ঞে না। বাংলা দেশে। তা না হলে এমন দুর্দশা হয়। কোলকাতায় আমার কাজ ছিল কি জানেন? ফাটা একটা পেয়ালায় পানসে চা খেয়ে বেরিয়ে যেতাম সকাল বেলা। তারপর সারাদিন চক্কোর মারতাম, যদি কোথাও কিছু লেগে যায়। অনেক জায়গায় লাগব-লাগবও হয়েছিল। কিন্তু লাগল না। ভায়ারা শত্রুতা করলেন। বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু কে জানেন? বাঙালী।"

"বিহারে কেন এসেছেন?"

"ওই চাকরির চেষ্টায়। ওপারে বিটলা গ্রামে সৌদামিনী দেবী বলে কে আছেন, তিনি যদি একটা চিঠি লিখে দেন, একজন উপমন্ত্রী তাহলে নাকি আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন। করবেন, মানে করতে পারেন। নদীর ওপারে বিটলা গ্রাম। ও গ্রামের উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এসে দেখছি নৌকো নেই, নৌকোর আশাও নেই! যে রকম ঝড় বৃষ্টি নেবেছে তাতে এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

"সাহেবগঞ্জ থেকে। সেখানে আমার এক আত্মীয় রেলে চাকরি করেন, তিনিই খবরটা দিলেন। আর সেখানে বটুদা নামে এক পরোপকারী শিক্ষক আছেন তাঁর কাছ থেকে চিঠিও যোগাড় করে দিলেন একটা। এককালে সৌদামিনী দেবী নাকি বটুদার ছাত্রী ছিলেন।"

গেরুয়াধারী চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ। হঠাৎ টিকটিকি ডেকে উঠলে যেমন শোনায় তেমনি শোনাল। কয়েক মুহূর্ত উসখুস করে গোবর্ধনবাবু বললেন, "ভজুয়ার বউয়ের কানে তুলে দিয়ে আসব নাকি কথাটা। ঠিকই বলেছেন সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর ওদের অগাধ ভক্তি।"

"কুকুর খুঁজতে গিয়ে এই তো খানিকটা ভিজে এলেন। আবার যাবেন?"

"তাতে কি হয়েছে। বৃষ্টিতে আমার কিছু হয় না।"

আবার উঠে বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। ফিরতে প্রায় আধঘণ্টা খানেক দেরি হল। গেরুয়াধারী মচকানো পায়ে হাত বুলুতে বুলুতে নিবিষ্ট চিত্তে বাইরে ঝড়ের আওয়াজ শুনছিলেন। তাঁর মনে হল ঝড়ের বেগটা যেন কমছে। গোবর্ধনবাবু ফিরলেন।

"ঝড়টা কমল। কিন্তু বৃষ্টিটা চেপে এল।"

"কি বললে ভজুয়ার বউ?"

"কিছু বললো না, ঘাড়টি তুলে মুচকি হাসল একটু। আর এইটে করে দিলে—। এইটের জন্যই দেরি হল একটু।"

গোবর্ধন কোঁচার টেপ দিয়ে একটা বাটি ধরে এনেছিলেন, অন্ধকারে গেরুয়াধারী দেখতে পাচ্ছিলন না।

"কি করে দিলে?"

"এই চুনে-হলুদটা। ভজুয়ার টর্চটাও এনেছি। দাঁড়ান লাগিয়ে দিচ্ছি ভাল করে।"

টর্চ জ্বেলে অবাক হয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। দিব্যকান্তি গৈরিকধারী কে এই মহাপুরুষ! টকটক করছে গায়ের রং, বড় বড় প্রদীপ্ত চোখ, কুচকুচ করছে চোখের কালো তারা।

"চুনে-হলুদটা এনে ভালই করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। দিন, লাগিয়ে দিই।"

"আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি, কোন্ পা-টা? আপনার মতো একজন সন্ন্যাসীর পদসেবা করতে পাওয়া তো পরম সৌভাগ্য।"

"ভুল করবেন না। আমি সন্ন্যাসী নই। সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছি। রিহার্সাল দিচ্ছি। আচ্ছা করুন পদসেবা, আমি ঠিক লাগাতেও পারব না।"

এই বলে একটা পা তিনি বাড়িয়ে দিলেন।

"এই পা-টায়। গোড়ালিটার একটু ওপরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইখানে" গোবর্ধন সসম্ভ্রমে গেরুয়াধারীর পায়ে চুনে-হলুদ লাগাতে লাগলেন।

গেরুয়াধারী বললেন, "অন্ধকারে আপনার কথা শুনে এবং কাজকর্মে উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিল আপনার কম বয়স। কিন্তু আপনার চুলে পাক ধরেছে দেখছি, অনেকের অবশ্য কম বয়সেই চুলে পাক ধরে—"

"না, না, তা নয়। মেঘে মেঘে আমার বেশ বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি। গত জুনে আটচল্লিশ পার হয়েছি।"

"এ বয়সে তো লোকে রিটায়ার করবার কথা ভাবে। আপনি এখনও চাকরি খুঁজছেন? আশ্চর্য তো। চাকরি করেছিলেন এর আগে?"

"কতবার। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি কি জানেন? আমার বাবা। তাঁর জন্যেই আমার কিছু হল না। জীবনে প্রথম চাকরি পেয়েছিলাম একটা বইয়ের দোকানে—"

গেরুয়াধারী বললেন, "আমারও তাই—"

"ও তাই নাকি! গ্রেট মেন থিংক্ অ্যালাইক শুনেছিলাম, কিন্তু এ যে গ্রেট মেন বিগিন অ্যালাইক দেখছি।"

আবার সেই ঘর-কাঁপানো হাসি।

"আপনার বাবার কথা কি বলছিলেন?"

"আমার বাবা এক অদ্ভুত লোক। এককালে জমিদার ছিলেন, মেজাজও সেই রকম। কিন্তু দেশ হয়ে গেল স্বাধীন এবং নেতাদের ভাগবাটোয়ারায় আমাদের জমিদারিটি পড়ে গেল পাকিস্তানে।—ভাগাভাগি হবার আগেই বাবা ভাগ্যে কোলকাতায় একটা আস্তানা করেছিলেন তাই কোনরকমে সেখানে মাথা গুঁজে আছি—"

"আপনার ভাই বোন—"

"কেউ নেই! একশ্চন্দ্রো তমো হন্তি। আমিই একমাত্র বংশধর। আর সেইটেই হয়েছে ট্র্যাজিডি। বাবা কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে আমি জমিদারের বংশধর। তাই চাকরি পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেন, কি করতে হয়, ওদের ব্যবহার কেমন, মালিক ভদ্রলোক কি না, কোথাও একটু খুঁত বেরুল, ব্যস আর রক্ষে নেই। ছেড়ে দাও ও চাকরি। এ ভাবে যে কত চাকরি গেছে তা আর কি বলব আপনাকে। অথচ বাড়িতে আমার কি কাজ জানেন? বাবার তামাক সাজা। ওরে গোবরা তামাক দে, ওরে গোবরা আর এক ছিলিম সাজ—হরদম লেগেই আছে। সারি সারি বারো চোদ্দটি কলকে সেজে রাখি আর যখন দরকার হয় টিকেটি ধরিয়ে দিই। শুধু কি টিকে ধরিয়েই নিস্তার আছে, ফুঁ দিতে হবে যতক্ষণ না ধরছে। বেশ করে ধরিয়ে গড়গড়ার উপর কলকেটি বসিয়ে নলটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলতে হবে, নিন টানুন। তিনি তখন চোখ বুজে ভড়াক ভড়াক করে টানবেন। রাত্রেও নিস্তার নেই। গোবরা ঘুমিয়েচিস নাকি? একটা কলকে ধরিয়ে দে তো বাবা। রোজ এই ব্যাপার। আমার হাতের তামাক সাজা না হলে বাবার কিছুতেই পছন্দ হয় না। বউকে তামাক-সাজা শেখালুম। লুকিয়ে বউয়ের সাজা কলকে দু-একটা দিলুম ধরিয়ে। কিন্তু একটান দিয়েই ভুরু কুঁচকে গেল বাবার। কে সেজেছে? এটা সুবিধে হয় নি তো? বুঝুন, এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাবার তামাক সাজতে হচ্ছে। আসলে এই তামাক-সাজার জন্যে সম্ভবত আমাকে উনি কাছছাড়া করতে চান না। যেই একটি চাকরি যোগাড় করি, অমনি জেরা শুরু হয়। তোমার মালিক কি জাত? সোনার বেণে? ব্রাহ্মণের ছেলে সোনার বেণের অধীনে চাকরি করবে কি! ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিতে হয়। ছেড়ে দিয়ে আবার এসে তামাক সাজা। এই চলেছে সারাজীবন। কিছু রেস্ত ছিল এতদিন, তাই ভাঙিয়ে চলছিল, আর কিছু নেই তাই বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে। এখন ওই সৌদামিনী দেবী যদি দয়া করেন—"

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"তা মা ষষ্ঠী কৃপা করেছেন। চারটি মেয়ে, চারটি ছেলে। বড় মেয়েটির বয়স কুড়ি, বড় ছেলেটির বয়স পনরো। কি যে অকূল পাথারে পড়েছি দাদা তা আর আপনাকে কি বলব—"

"হ্যাঁ, বুঝতেই পারছি। আমার এই গেরুয়া চাদরটাই নিন্, একধারটা ছিঁড়ে ফেলুন, ইতস্তত করবেন না, পুরোনো চাদর। এইবার বেশ করে ব্যাণ্ডেজটা করুন।"

ব্যাণ্ডেজ করা শেষ হলে গোবর্ধন বললেন, "ভজুয়ার টর্চটা দিয়ে আসি। অন্ধকারে বউটা না হলে আতান্তরে পড়বে।"

"যান।"

আবার বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। বৃষ্টিটা আরও চেপে এল। গেরুয়াধারী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন একটু। আমি কি একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের জন্য এতটা করতুম? এই আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

গোবর্ধনবাবু আবার ফিরলেন মিনিট দশেক পরে। হাতে একটা লণ্ঠন, মাথায় গায়ে একটা কাপড় জড়ানো।

"লণ্ঠন পেয়েছেন একটা? ভালই হয়েছে। গায়ে মাথায় কি জড়িয়েছেন ওটা?"

"ভজুয়ার বউয়ের একখানা শাড়ি। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কি না, কিছুতেই ছাড়লে না, বললে

কাল ওটা কাচতেই হবে, আপনি এখন গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিন ওটা, তা নাহলে আপনার সব ভিজে যাবে।”

“আপনার সঙ্গে চেনা ছিল বুঝি ওদের?”

“হ্যাঁ, এদিকে এসেছিলাম বার দুই ফুটবল ম্যাচ খেলতে। ওদের বাড়ির কাছেই ফুটবল ফিল্‌ড। ম্যাচ খেলবার পরও ছিলাম দিন দুই। এই ঘাট পেরিয়েই শিকারে গিয়েছিলাম। ওপারের জঙ্গলে বটের আছে অনেক। সেই সময় ভাব হয়েছিল এদের সঙ্গে। অনেক পাখি মেরেছিলাম, শুধু বটের না, হাঁসও। এদেরও দিয়েছিলাম, কি করব অত পাখি নিয়ে, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছত না। এইখানে একটা পিকনিক গোছের করা হয়েছিল। ভজুয়ার বউ মসলা পিষেছিল আর জল তুলেছিল ভজুয়া। অনেক লোক জুটে গিয়েছিল। তখন থেকেই আলাপ। ওরা লোক ভালো। এই যে লোকে বাঙালী-বিহারী ফিলিং বলে, সাধারণ লোকের মধ্যে তা তো দেখতে পাই না। যত ফিলিং শিক্ষিতদের মধ্যে—”

“ঠিকই বলেছেন। শিক্ষিতরাই পাজি। শিক্ষিতরা ওদের মতো খেটে খেতে পারে না। তাদের অধিকাংশই নির্ভর করে চাকরির উপর। তাই চাকরিতে কেউ বখরা বসাতে এলে ফিলিংয়ের সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা গুণের কদর করত, এরা ভাইপো-ভাগনেদের কদর করে। ইংরেজরা যখন এদেশের প্রভু ছিল তখন তাদের অধীনে আমি চাকরি করেছি। তাদের মহত্ত্বে আমি অভিভূত। আমার বিদ্যে সাধ্যি তেমন ছিল না, কিন্তু আমি কর্তব্যপরায়ণ ছিলাম, আর অসাধুও ছিলাম না। আমার এই দুটো গুণের মর্যাদা তারা দিয়েছিল, এরা দিত না।”

“আপনি পুলিশে কাজ করতেন?”

“সে অনেক পরে। আমার জীবন-কাহিনী বড় বিচিত্র। আর এ বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি আগে থাকতে প্ল্যান করে ঢুকিনি। আমার বিশ্বাস কি জানেন? আমাদের প্রত্যেকেরই মাথায় একটি অদৃশ্য টিকি আছে এবং একটি অদৃশ্য হস্ত ধরে আছে সেই টিকিটি। টিকি ধরে সেই হস্ত আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছে আমরা যাচ্ছি, যেখানে দাঁড় করাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছি, যেখানে বসাচ্ছে বসছি। অথচ আমাদের ধারণা আমরাই সব নিজেরা করছি। নিজেদের করবার ক্ষমতা আমাদের কিছু নেই। আমরা সবাই নিয়তির দাস। নিজের জীবন থেকে এই শিক্ষাটি পেয়েছি। আর এও জেনেছি প্রত্যেকের জীবনেই উত্থান পতন দুইই আছে। একটানা উত্থান বা একটানা পতন কারো জীবনেই নেই। হয় না। প্রাইম মিনিস্টার নেহেরুকেও জেল খাটতে হয়েছিল—”

গোবর্ধনবাবু স্মিতমুখে কথাগুলি শুনলেন। কৌতুক মিশ্রিত ঈষৎ কৌতূহল জাগল তাঁর মনে।

“এখন তো আর কিছু করবার নেই, যদি আপত্তি না থাকে শোনান আপনার জীবন-কাহিনী। শুনে হয়তো কিছু শিক্ষালাভ করব—”

“বলতে আপত্তি নেই, বলছি। কিন্তু যদি ভাবেন শুনে কিছু শিক্ষালাভ করবেন তা হলেই ভুল করবেন। অপরের জীবন-কাহিনী শুনে বা অপরের জীবন-চরিত পড়ে কারও কোন শিক্ষা হয় না। মনে একটু সুড়সুড়ি লাগে শুধু। সাধু মহাপুরুষদের জীবনী তো কত রয়েছে বাজারে, স্কুল কলেজে পড়ানোও হয়, কিন্তু সাধু মহাপুরুষ কটা দেখতে পান? ‘ম’ কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হাজার হাজার বিক্রি হয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন মাত্র একটি। দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় বিবেকানন্দ আর তো হল না। হয় না। ওই যে গোড়াতেই বললুম অদৃশ্য টিকি আর অদৃশ্য হাত, আমাদের জীবন ওদেরই লীলা-খেলা। মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে মহাপুরুষ হবার আস্থা জাগে অনেকেরই, কিন্তু হবার উপায় আছে? টিকি ধরে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেইখানে যেতে হচ্ছে। সুতরাং আমার জীবন-কাহিনী শুনে শিক্ষা পাবেন সে আশা করবেন না। শিক্ষার কথা অনেক আছে কিন্তু সে শিক্ষা আপনার কাজে লাগবে না। আপনাকে আপনার টিকির টানে চলতে হবে—"

"কিন্তু একই শিক্ষা বহু লোকের কাজে লাগে না কি? এই ধরুন স্কুল কলেজে অঙ্ক বা ভাষা আমরা সবাই শিখেছি, সেটা কি আমাদের কাজে লাগছে না?"

"কিন্তু সে শিক্ষা পেয়ে আমরা কি সবাই একরকম হয়েছি, যিনি অঙ্কে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট তিনি রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর যিনি অঙ্কে লাস্ট ক্লাস তিনি তার পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড মোটর হাঁকিয়ে সাঁ করে চলে যাচ্ছেন? এটা কোন্ মন্ত্রবলে হচ্ছে? স্কুল কলেজে আমর' যে শিক্ষা পাই তা অনেকটা জামাজুতোর মতো। সবাই জামাজুতো পরে, কিন্তু সবাই একই রকম হয় না। যে শিক্ষা আমাদের জীবনপথে চালিত করে, যার জোরে আমি আমার বৈশিষ্ট্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই তার নামই শিক্ষা। আর সে শিক্ষার প্রেরণা আসে নিজের ভিতর থেকে এবং আমার বিশ্বাস সেটা যোগায় আমাদের অদৃশ্য টিকিধারী অদৃশ্য চালকটি—তার নাম ভগবান, অদৃষ্ট, নিয়তি—যা ইচ্ছে দিতে পারেন, কিন্তু আসল মালিক তিনি—। আমি একবার আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—বড় অদ্ভুত স্বপ্ন—"

"কি রকম?"

"আচ্ছা সেটা যথাস্থানে বলা যাবে। জীবন জিনিসটাই বড় মজার—"

"বলুন শুনি আপনার জীবন-কাহিনী। আপনার সঙ্গে কথা কয়ে মনে হচ্ছে যেন কোনও উপন্যাস পড়ছি—"

"জীবনই তো উপন্যাস। উপন্যাসে তো জীবনের কথাই সাজিয়ে গুছিয়ে বলেন লেখকেরা। বেশ শুনুন। তবে আমার ওই থলিটা একটু এগিয়ে দিন। নস্যি আছে বার করি—"

গেরুয়ার থলিটা এগিয়ে দিলো গোবর্ধন। তার থেকে ফাঁকমুখো বেশ বড় একটি কৌটো বার করলো গেরুয়াধারী। কৌটোটির উপর বার দুই তিন তর্জনী দিয়ে টোকা দিলেন। তার পর ঢাকনাটি খুলে বেশ বড় এক টিপ নস্যি নিয়ে ভর্তি করে দিলেন নাসারন্ধ্র দু'টি। তার পর টান দিলেন জোরে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। গেরুয়া পাঞ্জাবির আস্তিনে চোখের জল মুছে গোবর্ধনের দিকে চাইলেন আর একবার।

"সত্যিই শুনবেন?"

"হ্যাঁ, বলুন না?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে চেয়ে রইলেন গেরুয়াধারী।

"কোন্খান থেকে আরম্ভ করব? একেবারে ছেলেবেলা থেকে?"

"তাই করুন না। সমস্ত পিক্চারটা পাওয়া যাবে তাহলে।"

"না, তা যাবে না। শেষের দিকটা আঁকাই হয় নি এখনও। আচ্ছা গোড়া থেকে বলছি। নাম ধাম গোপন করে বলব কিন্তু। যাঁদের কথা অনিবার্য ভাবে এসে পড়বে তাঁদের সম্বন্ধে সত্যভাষণ হয় তো তাঁরা পছন্দ করবেন না, সুতরাং নাম-ধাম চেপে যাচ্ছি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর শুরু করলেন :

"ছেলেবেলাটা বড় কষ্টে কেটেছে আমার। বাবা বড় ডাক্তার ছিলেন। খুব বিলাসে লালিত পালিত হচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে বাবা মারা গেলেন। সব ফুরিয়ে গেল। রঙীন ফাঁপা বেলুনটা চুপ্‌সে গেল যেন। শোক কাটতে না কাটতে মা-ও গেলেন। অনেকে সন্দেহ করেন তিনি আফিং খেয়েছিলেন, অনেকে বলেন শোকের আঘাত সহ্য করতে পারেননি। সে যাই হোক, আমি চক্ষে অন্ধকার দেখলুম। অনেক বাড়িতেই দেখবেন বাড়ির রোজগেরে বাপটি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন বাড়বাড়ন্ত। বাজার থেকে রোজ কাটা মাছ আসছে, হপ্তায় দুদিন মাংস, ছেলে-মেয়েদের টিউটার, বউয়ের নিত্য নতুন শাড়ি গয়না, বন্ধুবান্ধবদের বৈঠকখানায় বসে তাস পেটা আর চা খাওয়া—কিন্তু কর্তাটি যেই চোখ বুজলেন সব শেষ। যে বাড়ি একটু আগে ইলেকট্রিক আলোতে ঝলমল করছিল হঠাৎ কে যেন তার মেন সুইচ্‌টা অফ করে দিলে। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমি অনাথ হয়ে পড়লুম। বাঙালীর ছেলের জীবন-তরী সাধারণত ছ'টি বন্দরের কোন-না-কোন একটাতে ঠেকে থাকে—"

"ছ'টি?" প্রশ্ন করলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ ছ'টি সিক্‌স্‌। বন্দর ছ'টি হচ্ছে—বাবার বাড়ি, মামার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি, রাস্তা এবং শ্মশান। বাবার বাড়ির বন্দর থেকে আমার নৌকো ছাড়ল। মামারা সেটাকে গুন টেনে নিয়ে এলেন নিজেদের বন্দরে। মামার বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলাম। প্রথম দু একদিন বড্ড কষ্ট হয়েছিল। খাওয়া সাধারণ ডাল-ভাত-তরকারি আর এক-আধ টুকরো মাছ। বাবার বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন একাই ছিলাম তো, দুতিন রকম মাছই খেতাম রোজ, মাংস প্রায়ই হত। রাত্রে শুতাম স্প্রিংয়ের গদি-দেওয়া খাটে, নেটের মশারি ছিল। এখানে শুতে হত একটা খাটে, ছারপোকা-ভর্তি দড়ির খাটিয়ায় ময়লা তোশকের উপর। একটা মশারি ছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল মস্‌কুইটো নেট নয়, মস্‌কুইটো ট্র্যাপ্‌। অজস্র মশা ঢুকত তার ভিতর। দিনকতক পরে অবশ্য সবই সয়ে গেল। যে শহরে মামারা বাস করতেন সে শহরের নামটা করব না। হোয়াট ইজ্‌ ইন্‌ এ নেম। মামাদের নাম করব না। তিন মামা ছিলেন আমার। তিনটি টাইগার। মামার বাড়িতে এসেই কাকার খবর শুনলাম। আমার যে একজন কাকা আছেন সে কথা এক-আধবার বাবা-মার মুখে হয় তো শুনে থাকব, কিন্তু মনে ছিল না। কাকাকে কখনও চোখে দেখিনি। তাঁর সম্বন্ধে মামার বাড়িতে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম তিনি একটি নমস্য ধনুর্ধর। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, সিভিল সার্জন; তাঁর একটা বিখ্যাত পেটেন্ট ওষুধ ছিল ম্যালেরিয়ার। আমার কাকা সেই ওষুধের কারবারের দেখাশোনা করতেন। বাবা ভাইয়ের উপর বিশ্বাস করে নিজে কিছুই দেখতেন না। বাবা সরকারী চাকরি করতেন তো, তাই ওষুধের ব্যবসাটা ভায়ের নামে বেনামী করেছিলেন। তাঁর

মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর ভাই লক্ষ্মণ নন, দুর্যোধন। বাবার সম্পত্তির একটি পয়সা পেলুম না আমি। অথচ শুনলাম কাকা টাকার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন, রোলিং ইন্ ওয়েলথ্! আমি কিচ্ছু পেলুম না। সম্পূর্ণরূপে মামাদের পোষ্য হয়ে পড়তে হল আমাকে। সবাই আমাকে অনুকম্পা করত। এমন কি বাড়ির চাকরগুলো পর্যন্ত। খুব খারাপ লাগত। সেই সময়ে সকলের মুখে মুখে যে আলোচনা শুনতাম এবং কাকার ব্যবহারে যেটা আমার মনে ছাপ রেখে গেল সেটা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় টাকা জিনিসটা তুচ্ছ নয়। ওটার এমন একটা ভয়ানক দাম আছে যা অনায়াসে ভাইকে ভাইয়ের শত্রু করে তুলতে পারে। আমারও শিশুমনে আকাঙ্ক্ষা জাগল টাকা রোজগার করতে হবে। দিদিমাকে চুপিচুপি একদিন জিগ্যেসও করলাম, দিদিমা আমি কবে টাকা রোজগার করব? শুনে তো তিনি হেসেই আকুল। তারপর বললেন, "আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, তবে তো টাকা রোজগার করবে। মুখ্যুরা তো টাকা রোজগার করতে পারে না। লেখাপড়া শিখলে তখন তো চাকরি হবে। সাহেবদের কাছে কদর হলেই সব হবে।"

গোবর্ধন বললেন, "আমার বাবারও ওই ধারণা ছিল। তাই যতদিন না আমি এম-এ পাশ করলুম ততদিন ফিঙের মতো লেগেছিলেন আমার পিছনে। বাবার তামাক সাজতুম আর পরীক্ষার পড়া পড়তুম। কিন্তু কি হল, কিছুই হল না—"

"আপনি এম-এ পাশ নাকি? বাঃ!—আমি মশাই মুখ্যু মানুষ, কোনও রকমে ছেঁচড়ে-মেচড়ে ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলুম। মামারা আমাকে ওখানকারই একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমার মা সরস্বতীর সঙ্গে যা কিছু পরিচয় হবার হয়েছিল। মা সরস্বতী না বলে ম্যাডাম সরস্বতী বলাই ভালো, কারণ স্কুলটি ছিল ক্রিশ্চান মিশনারিদের।"

আর এক টিপ নস্য নিলেন গেরুয়াধারী।

"লেখাপড়ায় মোটেই ভালো ছেলে ছিলাম না। ওই কোনরকমে ঘেঁষটে-মেষটে প্রমোশনটা পেতাম। ফেল করিনি একবারও। আমি লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম না বটে, কিন্তু 'চলতা পুর্জা' ছিলাম। মাস্টার মশাইরা সক্কলে ভালোবাসতেন আমাকে। স্কুলেরও অনেক ছেলে ভালোবাসত, অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ক্রিশ্চান স্কুলে নানা জাতের ছেলে থাকে। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান তো থাকেই, হিন্দু মুসলমানও থাকে। আমাদের স্কুলে 'জু'ও ছিল দু'একটা। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের, বিশেষত সাঁওতাল ক্রিশ্চানদের, খুব ভালো লাগত আমার। তাদের মধ্যে সাঁওতালি সরলতার সঙ্গে সাহেবী আদব-কায়দার সমন্বয় এত ভালো লাগত যে কি বলব। এই স্কুলে ডেভিস আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে-ও আমার মতো পড়াশোনায় তেমন ধারালো ছিল না, কিন্তু সে জানত কোন্ গাছে হলদে পাখি বাসা বাঁধছে, কাদের গাছে পেয়ারা পাকছে, শীতকালে নদীর চড়ায় হাঁসরা আসতে আরম্ভ করেছে কি না। হাঁসের খবর সে দিত আমাদের থার্ড মাস্টার লম্বোদরবাবুকে। তিনি শিকার করতে ভালোবাসতেন খুব। কোন্ মাস্টার কি খেতে ভালোবাসেন তার খবরও রাখত সে। হেড মাস্টার মশাইকে প্রায়ই মুলোটা কলাটা এনে ভেট দিত নিজেদের বাগান থেকে। আরও খবর রাখত নানারকম। বিশেষ করে চেনাশোনা কারও বাড়িতে কেউ অসুখে পড়েছে কি না। চেনাশোনা কারও বাড়িতে অসুখ করলে আমরা সেখানে নাইট-ডিউটি করতে যেতাম। আমাদের স্কুলে সমাজ-

সেবা দল ছিল, কোথাও কলেরা হলে, কোথাও বন্যা হলে, কারও বাড়িতে অসুখ করলে সেই দলের ছেলেরা যেত সেবা করতে। তাদের সঙ্গে একজন শিক্ষকও থাকতেন। ডেভিস ছিল সেই দলের সেরা পাণ্ডা। আমিও সেই দলের ছিলাম।"

গোবর্ধন বললেন, "আমাদের স্কুলেও ওই রকম একটা দল ছিল। কিন্তু বাবা আমাকে কোথাও যেতে দিতেন না।"

"তামার সাজার অসুবিধা হবে বলে বোধ হয়।"

"না, তা ঠিক নয়। বাবা এক অদ্ভুত ধরনের আদর্শবাদী লোক। তাঁর বিশ্বাস ছেলেরা কচি গাছের মতো, তাদের যদি ঠিক মতো বেড়া দিয়ে ঘিরে রক্ষা না করা যায় তাহলে গরু ছাগলে তাদের মুড়িয়ে খাবে। তারা আর বাড়তে পাবে না। আমাকে তাই চিরদিন বাবার কাছেই থাকতে হয়েছে। বাবা আমাকে যেখানে সেখানে যে সে মনিবের কাছে চাকরি পর্যন্ত করতে দেননি।"

"হ্যাঁ, ও ধরনের একটা হিসেব আছে বটে। কিন্তু সবাই এ হিসেব রাখতে পারে না! আমার তো বাবা মা কেউ ছিল না, হিসেব রাখবে কে। মামাদের মধ্যে একজন কোলকাতায় ডাক্তারি করতেন আর বাকী দুজন বাড়ির খেয়ে চাকরি করতেন, একজন কমিশনার্স আপিসে, আর একজন কালেক্টারের আপিসে। সেকালের বাঙালী সমাজের দুটি স্তম্ভ ছিলেন দুজন। তাঁরা নটার সময় খেয়ে আপিসে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যার সময়। ফিরে চা জলখাবার খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে আবার বেরিয়ে যেতেন তাস পাশার আড্ডায়। আমি কি করছি না করছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না কেউ। মামীরাও করতেন না, তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন রান্নাঘরে । আশ্রিত ভাগনেটা কি করছে না করছে, পড়াশোনা করছে কি না এ সব খোঁজ রাখা তাঁরা তাঁদের জুরিসডিক্শনের বাইরে মনে করতেন, ছেলেদের খোঁজ রাখাটাই তাঁবা তাঁদের জুরিসডিক্শনের বাইরে মনে করতেন। নিজেদের ছেলেদেরও খোঁজ রাখতেন না। সন্ধ্যের সময় পড়াতে আসতেন জগু মাস্টার। ক্ষীণ-দৃষ্টি ভীতু লোক। তারই উপর ভার ছিল আমাদের পড়াশোনার। মেজমামা বাঘা লোক ছিলেন, কথায় কথায় লোককে জুতো নিয়ে মারতে দৌড়তেন, শহরের সকলেই তাঁকে ভয় করত, কমিশনার সাহেবের দক্ষিণহস্ত ছিলেন তিনি। ভয় না করে উপায় ছিল না। যাদের বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা তিনি 'কচে বারো ছত্তিন্ নয়' প্রভৃতি পাশার বোল সগর্জনে আউড়ে বাড়িসুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন, তারাও কেউ কখনও বিরক্ত হয় নি তাঁর উপর। বরং তিনি তাদের বাড়িতে এসে অনুগ্রহ করে পাশা খেলছেন এতে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত সবাই। এর কারণ আতিথেয়তা নয়, এর কারণ প্রতাপ এবং টাকা। কোনও বাজে মার্কা গরীব লোক যদি রোজ বাড়িতে এসে ওইরকম হাল্লা করত তা হলে তারা তাড়িয়ে দিত তাকে?"

"তা ঠিক বলা যায় না সব সময়ে"—কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন গোবর্ধন—"ছোটবেলা থেকে আমার কুকুর পোষার শখ। ভালো কুকুরের অনেক দাম তা কেনবার মতো পয়সা অবশ্য ছিল না, কিন্তু দেশী কুকুরের বাচ্চা পেলেই পুষতাম। পুষে বেঁধে রাখতে হত, তা না হলে ঘরদোর নোংরা করত। কিন্তু কুকুরের বাচ্চাকে বেঁধে রাখলে যে কি রকম চেঁচামেচি করে তা জানেন বোধহয়। দিনরাত চেঁচাত। কিন্তু বাবা-মা কেউ বিরক্ত হন নি—"

"হন নি তার কারণ আপনি। ছেলের খেয়াল মেটাবার জন্য মা বাপ সব সহ্য করতে পারে। আমি মাতাল ছেলের হাতে বাপকে মার পর্যন্ত খেতে দেখেছি, মাকে অম্লান বদনে গয়না খুলে দিতে দেখেছি। হ্যাঁ, কি বলছিলুম জগু মাস্টারের কথা। ভীতু ক্ষীণদৃষ্টি লোক ছিল সে। মাসে পাঁচ টাকা পাইনে পেত। আমাদের পড়াত না, খোশামোদ করত, পাছে মামাকে আমরা তার নামে কিছু বলে দি। তবে একটা ভাল কাজ করত সে। আমাদের সঙ্গে সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলত। আমাদেরও ইংরেজিতে উত্তর দিতে হত। এর ফলে ইংরেজিটা বেশ বলতে কইতে পারতাম। এ জিনিস পরে কাজে লেগেছিল, খুব কাজে লেগেছিল। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

হঠাৎ চুপ করে গেলেন গেরুয়াধারী। কান পেতে কি শুনতে লাগলেন বাইরে। ঝড় জলের শব্দের সঙ্গে আর একটা আলোড়নের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

"ওটা কিসের শব্দ বলুন তো—"

"গঙ্গাব জল তোলপাড় কবছে।"

"ও!"

আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

তারপর শুরু করলেন আবার।

"আগেই বলেছি ছেলেবেলা থেকে সবাই একটা ধারণা মনের মধ্যে যেন কাঁটির মতো ঠুকে বসিয়ে দিয়েছিল—টাকা রোজগার করতে না পারলে জীবনই ব্যর্থ। টাকা চাই, টাকা। লেখাপড়া শিখে কি হবে? লাদুরাম-মাড়োয়ারি কি লেখাপড়া জানে? ক অক্ষর গোমাংস। কিন্তু তার দুটো ল্যাণ্ডো, তিনটে মিল, প্রকাণ্ড বড় কাপড়ের দোকান। সবাই তাকে সেলাম করে। আজকাল মিনিস্টাররা পর্যন্ত তার ভয়ে জুজু হয়ে আছে। অনেক ভোট তার হাতে! লাদুরামকে আমার হিংসে হত, কিন্তু এ-ও আমি জানতাম আমি লাদুরাম হতে পারব না। বামন চাঁদে হাত দিতে পারে না, ওদের মতো টাকা রোজগার করবার শক্তি সামর্থ্য ফন্দি ফিকির আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল—আমি চাকরি করে বড়বাবু হতে পারি। আমার মামা সেকালের এন্ট্রান্স পাশ, কিন্তু কি তাঁর প্রতাপ, কি দবদবা, কমিশনার সাহেব হাতের মুঠোর মধ্যে। বাড়িতে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, সরস্বতী পূজা সব হত। কমিশনার সাহেবের বড়বাবু ছিলেন বলেই এত সব পেরেছেন। অবশ্য তিনি কমিশনার সাহেবকে খুব ঝুঁকে সেলাম করতেন এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ও-রকম চাকরি পেলে আমিও সেলাম করতে রাজী ছিলাম। মোটকথা ছেলেবেলা থেকেই চাকরিই আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল, লেখাপড়া নয়—"

গোবর্ধন বললেন, "সেলামের কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। বলব? আমার বাবা যে কি রকম খামখেয়ালী তাহলে বুঝতে পারবেন।"

"বলুন—"

"অনেক ধরাধরির পর এক জায়গায় অনেক কষ্টে আমার চাকরি হল একটা। চাকরিতে গিয়ে জয়েন করলাম। বেশ ভালই লাগল। মাইনে দেড়শ টাকা। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—'কি রকম আপিস?' বললাম, 'ভালই, তবে একটা রুল

দেখলুম একটু ইয়ে গোছের।' বাবা জিগ্যেস করলেন—'ইয়ে মানে?' 'মানে আপিসের প্রথম রুলটা হচ্ছে কোনও ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা হলেই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করতে হবে।' বাবা তৎক্ষণাৎ বললেন, 'ও চাকরি করতে হবে না। মানুষের আত্মসম্মান সবচেয়ে বড়। যেতে হবে না ও আপিসে। এক কলকে তামাক সাজ—"

"অদ্ভুত লোক তো আপনার বাবা। চাকরি কখনও করেন নি কি না, তাই চাকরির মর্ম বোঝেন না। স্বাধীন জীবিকা শুনতেই ভালো, কিন্তু ওই স্বাধীন জীবিকায় যত লোককে তেল দিতে হয় চাকরিতে তত হয় না।"

গোবর্ধন উসখুস করছিলেন, শেষে উঠে দাঁড়ালেন।

"আসছি একবার—"

"আবার এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরুচ্ছেন?"

"ভিজতে আমার ভারি ভালো লাগে।"

ভজুয়ার বউয়ের শাড়িখানা মাথায় গায়ে জড়িয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন গোবর্ধন। গেরুয়াধারী বলে উঠলেন, "ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গোবর্ধন ফিরলেন মিনিট কুড়ি পরে।

"আর একটু হলেই ফসকে গিয়েছিল—"

"কি?"

"তামাক খাওয়াটা। অনেকক্ষণ থেকেই ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সঙ্গে তো কোন সরঞ্জাম নেই। হঠাৎ মনে পড়ল ভজুয়ার বউ তামাক খায়। শিকারে যখন এসেছিলাম তখন তাকে তামাক খেতে দেখেছিলাম। গিয়ে দেখি খাচ্ছে। আর একটা মুশকিল হল দ্বিতীয় হুঁকো নেই। স্বামী-স্ত্রীর একটি হুঁকো। শেষে হাতে করে গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গীতেই খেলাম। ভজুয়ার বউ বললে ও বাজার থেকে আমার জন্য একটা হুঁকো আনবে—"

"এই বৃষ্টিতে আপনার জন্যে হুঁকো কিনতে বাজার গেল নাকি?"

"ও ভজুয়াকে খুঁজতে বেরুচ্ছে। ওর ভয় হচ্ছে মদ খেয়ে যদি নর্দমায় পড়ে এ দুর্যোগে, তাহলে আর বাঁচবে না। এতক্ষণ তার ফেরা উচিত ছিল। নিন্, এইবার শুরু করুন আপনার গল্প, চমৎকার লাগছে—"

"এখনও তো কিছুই শোনেননি। ওই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্য টিকি ধরে যে কত জায়গায় ঘুরিয়েছে তা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ—"

"যদি একটা কথা জিগ্যেস করি, মনে কিছু করবেন কি?"

"না। স্বচ্ছন্দে করুন।"

"মধ্যে মধ্যে ওঁ তৎসৎ বলছেন কেন অমন করে?"

"সম্প্রতি যাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছি, তিনি বলেছেন যে আমার অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার সূর্য উঠবে, তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন দিনে রাত্রে যতবার পার ওঁ তৎসৎ বলবে। তাঁর আদেশ পালন করে যাচ্ছি।"

"এইবার বলুন আপনার গল্প।"

"হ্যাঁ, কোন্ পর্যন্ত বলেছিলাম?"

"আপনার স্কুলের জীবনের কথা বলছিলেন।"

"ম্যাট্রিক পাশ করবার পর মামা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন আর এক মামার কাছে। উদ্দেশ্য তাঁর কাছে থেকে কলেজে পড়া। মামা ডাক্তার ছিলেন, কলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন। রয়াল বেঙ্গল টাইগার একটি। চোখের দিকে চাইলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যেত। ইয়া ভারী থমথমে মুখ, ভুঁড়ো নাক, থ্যাবড়া চিবুক, মজবুত চোয়াল। ভাঁটার মতো বড় বড় চোখ। ভুরু নেই। প্রকাণ্ড টাক এসে মিশেছে চওড়া কপালে। দুটোয় মিলে গড়ের মাঠ হয়ে গেছে একেবারে। এই মামার পাল্লায় এসে পড়লাম। প্রথম দর্শনেই তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ। মনে হল একটু যেন হাসির আভাস ফুটি ফুটি করছে তাঁর গম্ভীর মুখে। বললেন, 'খুব লম্বা হয়েছিস তো। প্রায় আমার সমান হয়ে গেছিস।' এটা আমার অপরাধ না গৌরব তা বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। মামা বললেন, 'স্কটিশ চার্চ কলেজে বলে রেখেছি। কাল সকাল সকাল খেয়ে তৈরি হয়ে থেকো, সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' পরদিন তিনি আমাকে সোজা স্কটিশ চার্চে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন। তারপর সংক্ষেপে বলে দিলেন, 'মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আর একটি কথা মনে রেখো, আমি বেশী উপদেশ দিই না, দরকার হলে হাত চালাই। তাতেও যদি কাজ না হয় দূর করে দি।' ভয়ে জুজুটি হয়ে রইলাম। রোজ কলেজে যাই, নিয়মিত সময়ে ফিরে আসি। মামা বই পত্তর খাতা পেন্সিল সব কিনে দিলেন। তখন ফাউনটেন পেনের এত ছড়াছড়ি হয় নি। কলেজের নোটটোট সব পেন্সিলেই লিখতে হত। তারপর দরকার হলে দোয়াত কলমের সাহায্যে সেগুলো 'ফেয়ার' করতে হত বাড়িতে। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ভালই হত। দু'পীস করে পাকা মাছ দুবেলাই পেতাম। সকালে বাসি রুটি আর গুড়। কলেজ থেকে এসে পরোটা বা লুচির সঙ্গে আলুর ছেঁচকি। সে বিষয়ে কোনও খুঁত ছিল না। আমি অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলাম অন্য কারণে। আমার 'পকেটমানি' বলে কিছু ছিল না। আমার যখন যা দরকার হত মামা নিজেই গিয়ে কিনে দিতেন। জামা, কাপড়, জুতো সব। আমার হাতে কাঁচা পয়সা দিতেন না কখনও। আমারও যে একটা হাত-খরচ দরকার এ হুঁশ তাঁর হত না। একটি পয়সা হাতে তুলে দেননি কখনও। তাঁর ধারণা ছিল হাতে পয়সা পেলেই ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। পয়সা না পেয়েও বিগড়ে গেলাম। কলকাতা শহরে প্রলোভন কত। আর আমার সঙ্গীরা কলেজে সর্বদাই এটা-ওটা কিনত। কখনও চানাভাজা, কখনও ঝালমুড়ি, কখনও ডালমুট, কখনও ঘুগনি কত কি। রেস্টুরেণ্টে চা কফি কেক বিস্কুট সবাই খেত। আমি মুখটি চুন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম দূর থেকে। কখনও কমনরুমে বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতুম। কিন্তু প্রাণের ভিতরটা খাঁ খাঁ করত। আত্মসম্মানে আঘাত লাগত যেন। ক্রমশ জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। ভাবলুম এমনভাবে পরের হাত-তোলা হয়ে কতদিন আর থাকব। লেখাপড়া শিখেই বা হবে কি! তাছাড়া লজিকটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না। বড়ই মনমরা হয়ে দিন কাটাতে লাগলুম। একদিন হেদোর ধারে বেড়াচ্ছি এমন সময় ডেভিসের সঙ্গে দেখা। আমার সেই স্কুলের বন্ধু ডেভিস। তার চেহারা দেখে আমি তো অবাক! ঠোটের কোণে সিগারেট ঝুলছে, পরনে সাহেবী পোশাক, পায়ে চকচকে জুতো। তার চলন বলন হাবভাব ভঙ্গী একেবারে সাহেবের মতো। দেখে তাক লেগে গেল।"

আমিই এগিয়ে গিয়ে সম্বোধন করলাম তাকে। সে আমাকে দেখতে পায়নি।

"কি রে ডেভিস যে। কোথা আছিস? খুব সুখেই আছিস মনে হচ্ছে।"

"আরে সান্ডেল নাকি! তুই এখানে কোথা?"

"আমি স্কটিশে পড়ি। তুইও পড়ছিস নাকি কোথাও?"

"না, আমি চাকরি করি। কলকাতাতেই থাকি।"

"চাকরি? কি চাকরি করছিস? তুই তো ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারিস নি।"

"আমি যে চাকরি করছি তাতে কোন পাশের দরকার নেই, ডাঁট থাকলেই হল। তুই যদি চাস তাহলে তোকেও জুটিয়ে দিতে পারি সে-চাকরি। খালি হয়েছে একটা পোস্ট— "

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

"কি রকম চাকরি?"

"ভাল চাকরি। ত্রিশ টাকা মাইনে পাবি। তোর নাম হবে সাহেব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তোর under-এ একটা কেরানী থাকবে। তুই থাকবি ঠিক সাহেবের মতো। Stair-case আলাদা, closet আলাদা, কোম্পানি তোকে লাঞ্চ খেতে দেবে। তোর মাইনে তোকে গিয়ে আনতে হবে না। খামে ভরে তোর টেবিলে দিয়ে যাবে ঠিক তারিখে। কিন্তু একটি কথা ভাই, সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। তোর under-এ বা অপর কারুর under-এ যে বাবুরা থাকবে তাদের কারও সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারবে না। আপিসের ভিতর কদাচ বাংলা কথা উচ্চারণ করবে না। পারবি তো?"

"তা চালিয়ে নেব কোনরকমে। ভুলটুল হবে হয়তো, কিন্তু চালিয়ে নেব।"

"কি করছিস তুই আজকাল—"

"স্কটিশে পড়ছি।"

"ছোঃ, কলেজে পড়ে তো অক্স্‌ডাং (oxdung) হবি। চলে আয় তুই আমার আপিসে।"

"কিন্তু আমার যে ভাই সাহেবী পোশাক নেই। পোশাক কেনবার পয়সাও নেই। মামার গলগ্রহ হয়ে আছি। সাহেবী পোশাক পরিওনি কখনও, টাই বাঁধতেও জানি না।"

"ডেভিস আমার পিঠ চাপড়ে বললে—'সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ভয় নেই তোর। আমি তোর ওল্ড ফ্রেণ্ড, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আজ মাইনে পেয়েছি। তুই কাল সকাল সাড়ে সাতটায় সাত নম্বর চাঁদনি চকে চলে আয়! আমি থাকব সেখানে। আমার চেনা দোকান। সব ঠিক করে দেব তোর।'...পরদিন ভোরবেলা উঠে কাউকে কিছু না বলে পৌঁছে গেলাম সাত নম্বর চাঁদনি চকে। ডেভিস উপস্থিত ছিল। সে আমাকে নিয়ে দোকানে ঢুকলো। পাঁচ টাকা দিয়ে জিনের একটা সাদা স্যুট কিনে দিলে। তখনকার দিনে হত, অবশ্য স্যুট মানে প্যাণ্ট, কোট আর টাই। দোকানের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে আমাকে শিখিয়ে দিলে কি করে টাই বাঁধতে হয়। বার কয়েক বেঁধে আর খুলে রপ্ত করে নিলাম ব্যাপারটা। তারপর ডেভিস নিয়ে গেল আমাকে চিনেবাজারে। সেখানে ন'সিকে দিয়ে এক জোড়া জুতোও কিনে দিলে। এই সাত টাকা চার আনা ধার করে আমার চাকরি জীবন আরম্ভ হল। পরের মাসেই অবশ্য টাকা শোধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার স্নেহের ধার শুধতে পারিনি। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গেরুয়াধারী চুপ করে যেন আত্মস্থ হয়ে রইলেন। বাইরের হাওয়ার দাপটে একটা ছোট জানালা দম্ করে খুলে গিয়ে আলোটা নিবে গেল। গোবর্ধনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

"তারপর? চাকরিতে জয়েন করলেন?"

"হ্যাঁ, সেই দিনই ডেভিস আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির দোকানে ম্যাকফারসন্ সাহেবের কাছে। রাস্তায় যেতে যেতে সে আমাকে বললে, 'তোমাকে কিন্তু নিজেকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দিতে হবে।" শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বললাম না। তারপর বললে, 'তোমার নামের বানানটা এমনভাবে করবে যেন সাহেবী-সাহেবী মনে হয়। অনিল সাণ্ডেল লিখলে চলবে না। বানান করতে হবে O'neil Sawnyell—এই ভাবে। আপিসে গিয়ে ডেভিস নিজেই একটা দখাস্ত লিখে নিয়ে এসে বলল—এইখানে সই কর। ঠিক ওই রকম বানান করবি। ওই রকম বানানেই সই করলাম বটে, কিন্তু মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, এ করছি কি? হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে, অতবড় বংশের বংশধর, এ কি দুর্মতি ঘিরেছে আমাকে। কিন্তু তখন আর পিছুবার উপায় ছিল না। স্যুট জুতো কেনা হয়ে গেছে।... ডেভিস দরখাস্ত নিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই সাহেব ডাকল আমাকে। সেলাম করে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চেহারাটা আমার ভালই ছিল। আপাদমস্তক দেখলেন আমাকে। নতুন জুতো নতুন স্যুটে মানিয়েছিল বেশ। প্রথমেই জিগ্যেস করলে—What are you? আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, I am a man. শুনে হা হা করে হেসে উঠল ম্যাকফারসন্। দরাজ হাসি ছিল লোকটার। তারপর বলল—I know you are a man, but what is your nationality? বললাম, I am an Indian. Anglo-Indian কথাটা আর মুখ দিয়ে বেরুল না। তারপর ম্যাকফারসন্ যা করলে তা অদ্ভুত। পকেট থেকে দুটো গুলি বার করে একটা টেবিলের উপর রাখলে, আর একটা আমার হাতে দিলে। তারপর বাঁ চোখটা কুঁচকে বললে—Strike! গুলি খেলায় বাল্যকাল থেকেই দক্ষ ছিলাম, টকাস্ করে মেরে দিলাম। সাহেব বললে—অল্ রাইট্, I appoint you. সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডেভিস্ বললে, সাহেবের একটু মাথার ছিট্ আছে। আমাকে পাঞ্জা ধরতে বলেছিল। ও একটু পাগলাটে গোছের—"

গোবর্ধন হেসে বললেন, "একবার এক পাগলাটে সাহেবের পাল্লায় পড়ে আমার একবার চাকরি গিয়েছিল। শুনবেন গল্পটা?"

"বলুন—"

"পাগলাটে সাহেবরা সাধারণত লোক ভাল হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের উপকার করে। আপনার যেমন করেছিল, কিন্তু আমার বেলায় ঠিক উল্টো হয়ে গেল। তখন একটা পোস্টাফিসে চাকরি করি, টেলিগ্রাম স্কুল থেকে পাশ করে টেলিগ্রামে চাকরি পেয়েছিলাম। বেশ চাকরি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। বাবাও আপত্তি করে নি। কিন্তু কোত্থেকে ওই ম্যাজিস্ট্রেট শনির মতো জুটল আমার কপালে। কোন্ সময়টা জানেন? তখন বিহারে ভূমিকম্প হয়েছিল। নাইন্‌টিন থার্টিফোর। চারদিকে তখন হাহাকার। বাড়ি ঘর-দোর পড়ে গেছে অনেকের, ট্রেন চলাচলও বন্ধ। টেলিগ্রাফের লাইনও ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়। দোকান-পাটও বন্ধ। সে এক বিশৃঙ্খল ব্যাপার। চারদিকে কেমন যেন থমথমে আবহাওয়া—"

"খুব জানা আছে আমার। আমি তখন রিলিফ গাড়ি নিয়ে ঘুরছি ব্রেট সাহেবের সঙ্গে। আমার ভাগ্যোদয় হয়েছে তখন। পরে বলব সে কথা। তারপর বলুন—"

"সেই সময় একটা ম্যাজিস্ট্রেট ছিল ওখানে, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক সে। মোটর ছিল, মোটর চালাতে জানত, কিন্তু ঘুরত সাইকেলে। তার মত ছিল মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ালে সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। শুনতাম খুব নাকি বিদ্বান লোক। আসবাবের মধ্যে ছিল কয়েক কেস মদ, আর কয়েক বাক্স বই। কামাতো না। কটা কটা এক মুখ গোঁফ দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত, আর সিগারেট খেত অনবরত। কালো কালো সিগারেট, লোকে বলত ইজিপসিয়ান সিগারেট। একদিন তার বেড্ সুইচটা খারাপ হয়ে গেল। দোকানদার বললে, বেড্ সুইচ আমার নেই। কোলকাতা থেকে আনিয়ে দেব, কিন্তু যেরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখছেনই তো, আজই যদি অর্ডার দিই মাসখানেকের আগে আসবে না। শুনে সাহেব গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, তোমার কাছে হাণ্ড্রেট ওয়াটের বাল্‌ব কটা আছে? দোকানদার বলল—তা শ' দুই হবে। সব পাঠিয়ে দাও আমার ওখানে—বলে সাহেব চলে গেল। রাত্রে শুয়ে শুয়ে না পড়লে সাহেবের ঘুম আসত না। পড়তে পড়তে যখন ঘুম পেত তখন বেড্ সুইচটি টিপে আলো নিবিয়ে দিত। বেড্ সুইচ্ যখন পাওয়া গেল না, তখন সাহেব কি করলে জানেন, যেই ঘুম আসত অমনি মাথার শিয়র থেকে রিভলবার বার করে বাল্‌বটা লক্ষ্য করে গুলি করত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। দম্ করে ফেটে যেত বাল্‌বটা, সাহেব ঘুমিয়ে পড়ত। যতদিন না বেড্ সুইচ পাওয়া গেল ততদিন রোজ এইভাবে একটা করে বাল্‌ব ভাঙ্‌তো। অদ্ভুত খেয়ালী লোক ছিল। দিনে আপিস করত না। কোর্টে আসত খালি। আর আপিসের ফাইল যেত বাড়িতে। স্টেনোকে বলত দিনের বেলা তোমাকে আপিসে আসতে হবে না। রাত্রি নটার পর আমার বাড়ি যেও। স্টেনোর নাম ছিল মতিবাবু। তাঁর মুখে শুনেছি, সে এক দুর্গতি হয়েছিল তাঁর । সাহেব বসে ডিক্টেশন দিত না। লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দিত। আর মতিবাবু তাঁর পিছনে পিছনে খাতায় সেগুলো টুকতে টুকতে যেতেন। টোকা হয়ে গেলে সাহেব সংশোধন করতেন সেগুলো। মতিবাবুর দিকে চেয়ে বলতেন, মোটি, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল। আমি যা বলেছি তার প্রায় অর্ধেক ঠিক লিখেছ। গুড্। এই সাহেব আমার চাকরি খেয়ে দিলে।"

"কেন, কি হয়েছিল? সাহেবরা প্রায় চাকরি খায় না।"

"সমস্ত দিন সিগারেট খেতে না পেয়ে ক্ষেপচুরিয়াস্ হয়ে গিয়েছিল। তখন ভূমিকম্পের সময় তো, নানারকম গুজব উঠেছে শহরে। মুঙ্গের মজঃফরপুর ধ্বংস হয়ে গেছে। গুজব উঠতে লাগল এর চেয়েও প্রচণ্ড ভূমিকম্প আবার হবে। সবাই বলতে লাগল এটা যা হয়েছে সেটা ভূমিকা মাত্র। গ্রন্থারম্ভ পরে হবে। একটা গুজব উঠলেই আর ঘরে ঢুকতে সাহস হত না কারও। সেই দুর্জয় শীতে সবাই খোলা মাঠে শুত। আর রোজই নূতন গুজব। হিমালয় নাকি ধসে পড়েছে। সমস্ত নদী নাকি ফুলে ফেঁপে সমস্ত দেশ ডুবিয়ে দেবে। টেলিগ্রাফেও এই সব খবর আসত কোলকাতা থেকে। টেলিগ্রাফের বাবুরা যে যা শুনত তা জানিয়ে দিত পরের স্টেশনে। এইভাবে আমি একদিন জানতে পারলুম যে তার পরেরদিন এমন একটা 'শক্' (shock) হবে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনদিন হয় নি। ফেটে চৌচির হয়ে যাবে চতুর্দিক,

তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি আর বান হবে। আমি যখন মেসেজটা পেলাম তখন শহরের একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন টেলিগ্রাফ করতে। তাঁকে বললুম আমি খবরটা। তারপর দিন শহরের দোকান-পাট সব বন্ধ, শহরের সমস্ত লোক জড় হয়েছে গিয়ে শহরের বাইরে মাঠে। আর হবি তো হ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরও সেদিন দেশলাই ফুরিয়েছে। সাহেবের চাপরাশি বাজার থেকে ফিরে এসে তাঁকে বললে, দেশলাই কোথাও পাওয়া গেল না। বাজার সব বন্ধ। সাহেব জিগ্যেস করলে—বন্ধ কেন? সে বললে, শুনতে হেঁ আজ বড়া জোর ভূকম্প হোগা। হাম ভি ছুট্টি মাংতে হেঁ। সাহেব কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে। মাঠে গিয়ে দেখে লোকে লোকারণ্য। একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলে—তোমরা এখানে ভিড় করছ কেন? সে বললে—শুনছি আজ ভয়ানক ভূমিকম্প হবে। সাহেব বলল—ভূমিকম্প হবে কি না তা তো আগে থাকতে বলা যায় না। তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ? লোকটা আমতা আমতা করতে লাগল। সাহেব বললে—লুক হিয়ার, আমি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, কে তোমাকে এ খবর দিয়েছে তার কাছে আমাকে নিয়ে চল, তা না হলে এখুনি তোমাকে অ্যারেস্ট করব। আমি ধরে নেব তুমিই এই প্যানিক সৃষ্টি করেছ। এমনিভাবে ট্রেস (trace) করতে করতে সাহেব শেষে আমার কাছে হাজির। জিগ্যেস করলে, তুমিই এই খবর ছড়িয়েছ? সত্যি কথা বললাম। সাহেব পোস্টাফিসে দাঁড়িয়েই ফোন করলে পি. এম. জি-কে। বললে, তোমাদের একজন টেলিগ্রাফ ক্লার্ক শহরে ভয়াবহ মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে সমস্ত শহরকে তোলপাড় করে তুলেছে। ওকে এখুনি দূর করে দাও। তারপর আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলে, তোমার পুরো নাম কি? নাম বললাম। তার পরদিনই বাই ওয়্যারে আমার চাকরি গেল। আমার দোষ কি বলুন? এক হিসেবে অবশ্য নিশ্চিন্ত হলাম। ওই, ভূমিকম্পের আবহাওয়া থেকে বাবার কাছে পালিয়ে গেলাম। বাবা বললেন, বেশ হয়েছে। ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য। ভাল করে তামাক সাজ দিকি এক কলকে। তুই যাওয়ার পর থকে জুৎ করে তামাকই খেতে পাইনি। এরা কেউ কিছু সাজতে জানে না। তোর বউ তো এমন টিপে টিপে তামাক দেয় যে ধোঁয়াই বেরোয় না।"

গেরুয়াধারী বললেন, "আমারও চাকরি বেশীদিন থাকে নি।"

"কি করতে হত আপনার চাকরিতে—"

বিশেষ কিছুই নয়। একমাত্র কাজ বই ডেসপ্যাচ করা অর্থাৎ অর্ডার অনুসারে ভি. পি. করা। আমরা পাঁচ জন ডেসপ্যাচার ছিলাম। একজন মোলার (অর্থাৎ মোল্লা), একজন প্যাটার (অর্থাৎ পাত্র), একজন ডেভিস্ নির্ভেজাল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চতুর্থটি জন হেনরি আব্লুসের চেয়েও কালো। আর পঞ্চমজন আমি সন্ইয়েল। চেহারায় আমি ওদের তুলনায় কন্দর্প-কান্তি ছিলাম। দিনকতক পরেই একটু মুশকিলে পড়তে হল। আমার একটি মাত্র স্যুট। সেটি থাকত ডেভিসের বাসায়। আপিস থেকে গিয়ে সেটি তার বাসায় খুলে রাখতুম। আবার আপিস যাবার সময় পরে যেতুম। সাদা জিনের স্যুট দু'চার দিনেই ময়লা হয়ে গেল। আমাদের যিনি ওপরওলা ছিলেন, তিনি বললেন ওরকম ময়লা স্যুট পরে আসা চলবে না। পরিষ্কার পোশাক পরে আপিসে আসতে হয় এ জ্ঞানটাও কি নেই? মুশকিলে পড়ে গেলাম। কিন্তু বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। বুদ্ধির জোরে এড়িয়ে গেলাম বিপদটা। আমার মাতুলটি ছিলেন

শৌখীন লোক। তিনি দুদিনের বেশী কোন স্যুট ব্যবহার করতেন না। পনরো ষোলটা স্যুট ছিল তাঁর। আজ যেটা ছেড়ে দিলেন মাস খানেকের আগে আর সেটি পরবেন না। মামীমা ছাড়া-স্যুটটি নিজের হাতে ইস্ত্রি করে রেখে দিতেন। আমি মামীমাকে বললাম, "মামীমা, কলেজে স্যুট পরে গেলে প্রফেসররা একটু সুনজরে দেখে। মামার ছাড়া স্যুটটা আমাকে পরে যেতে দেবে?"

মামীমা বললেন—"তোর গায়ে কি হবে?"

আমার হাইট্ প্রায় মামার সমান হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ বেমানান হল না। দেখলুম একটু আধটু ঢিলে হচ্ছে বটে, কিন্তু কাজ চলে যাবে।

মামীমা বললেন—"পরে যাও তাহলে। কিন্তু দেখো যেন দাগটাগ লাগিয়ে বা ছিঁড়েটিড়ে এনো না।"

"না, ছিঁড়ব কেন। এসেই আবার ছেড়ে রেখে দেব। তুমি যেন আবার মামার কানে কথাটা তুলে দিও না। মামা শুনলে আর পরতে দেবে না।"

মামীমা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। কি মিষ্টি হাসি যে ছিল তাঁর। হাসলে মনে হত মুখ চোখের ভিতর থেকে একটা আভা বেরুচ্ছে। বুঝতে দেরি হল না যে মামীমা কথাটা প্রকাশ করবেন না। মামা ঠিক আটটা নাগাদ বেরিয়ে যেতেন তাঁর চেম্বারে। ঠিক তার পরেই আমি বেরুতাম। আর ফিরতাম মামা ফেরবার আগেই। মামার ফিরতে রাত আটটা ন'টা হয়ে যেত। কিন্তু অতি লোভে সব মাটি হয়ে গেল। ওখানে ওভার-টাইম খাটলে বেশ রোজগার হত, সুবিধা পেলেই ওভার-টাইম খাটতাম। একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি মামা রেগে কাঁই হয়ে বসে আছেন। আমার চালচলন দেখে অনেক আগেই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। বাড়ির কাছেই কলেজ অথচ আমি নটার আগেই রোজ তাড়াহুড়ো করে খেয়ে বেরিয়ে যাই কেন? মামীমাকে বলেছিলাম আমি একজন প্রফেসারের কাছে পড়তে যাই। মামা কলেজে খোঁজ নিলেন, দেখলেন আমি একদিনও কলেজ যাই না। জেরা করতেই সত্যি কথা বলতে হল। মামা কান ধরে একটি চড় মাড়লেন। তারপর বললেন, এখানে আর থাকতে হবে না। কালই বাড়ি চলে চাও। এখানে থাকলে উচ্ছন্ন যাবে।

আমি মামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম ডেভিসের বাসায়। সব শুনে ডেভিস বললে, "তাতে কি হয়েছে। তুমি আমার বাসায় থাক। আমি তো একলা থাকি একটা মেসে। দুজনে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে। আমার ঘরেই একটা সীট খালি আছে—। একটা খবর কিন্তু তোমায় দিচ্ছি। গ্যাব্রিয়েল গসী তোমার পিছনে লেগেছে।"

গোপাল ঘোষ নামটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে ওই রকম করে নিয়েছিলেন আমাদের বড়বাবু। তিনি ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ ছিলেন। ইনিই আমাকে পরিষ্কার স্যুট পরে আসতে বলেছিলেন কিছুদিন আগে। ডেভিসের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার পিছনে লেগেছে মানে? আমার অপরাধ?

ডেভিস বললে, "ওর ইচ্ছে ছিল ওর গবেট শালাটিকে ঢোকাবে তোমার চাকরিতে। ও আশা করতে পারে নি যে আমি তোকে টপ করে ঢুকিয়ে দেব। ও এখন তোর খুঁত ধরবার তালে আছে। সাবধান থেকো—"

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। আমরা থাকতাম ঠনঠনের কালীবাড়ির কাছে একটা মেসে। একদিন সকালে খুব জোরে বৃষ্টি এল। দু'ঘণ্টা এক-নাগাড় বৃষ্টি। কালীতলায় জল জমে গেল। ট্রাম বন্ধ। সময়ে আপিসে পৌঁছতে পারলাম না। তার পরদিন যখন গেলাম তখন দেখি আমার টেবিলের উপর লেখা রয়েছে—In view of your irregular attendance your service will be dispensed with এই irregular কথাটা যেন চড়ের মতো এসে লাগল। সোজা চলে গেলাম ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের কাছে। তাকে বললাম, "একদিন বৃষ্টির জন্য আসতে পারি নি বলে তোমার গসী আমাকে এই নোটিশ দিয়েছে। আমি যে এতদিন পাংচুয়ালি কাজ করেছি, তার কি কোনও recognition নেই? একদিন বৃষ্টির জন্যে আসতে পারলাম না আর অমনি আমাকে irregular বলে নোটিশ দেওয়া হল। যে আপিসের এরকম ব্যবহার সেখানে আমি চাকরি করি না। Appoint his blessed brother-in-law গুড বাই।

সেই দিনই রেজিগ্‌নেশন দিয়ে চলে গেলাম। ডেভিসকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। তাকে হোটেলে খাওয়ালাম একদিন। তারপর আমার কলকাতার লীলা সাঙ্গ হল। অন্য মামাদের কাছে আবার ফিরে এলাম বিহারের সেই শহরে। গিয়ে দেখলাম মামারা আমার জন্যে খুব চিন্তিত, কারণ আমার অনেক আগেই আসবার কথা। জিগ্যেস করলেন, "এত দেরি হল কেন? কোথায় ছিলি?" বললাম, "থিয়েটার দেখছিলাম।" কেন জানি না বড়মামা সেইটেকেই যথেষ্ট কারণ বলে গণ্য করে নিলেন। কিছু বললেন না। তার পরদিন বললেন, "এখানকার কলেজে ভর্তি হও গিয়ে আর মন দিয়ে লেখাপড়া কর।" আমি মামাদের বললাম, "আমার পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না। আমাকে একটা চাকরি করে দিন।" ছোটমামা বললেন, "বেশ, যতদিন চাকরি না হচ্ছে ততদিন পড়ো। ঘরে বসে কি করবে? চাকরি তো গাছের ফল নয় যে টপ করে পেড়ে দিয়ে দেব।" তাই হল, কলেজেই ভর্তি হলাম। মানে, মামাদের কতকগুলো টাকা জলে পড়ল আবার।

চুপ করলেন গৈরিকধারী। চুপ করতেই বোঝা গেল ঘরের বাইরে বৃষ্টিতে আর হাওয়ায় যে আলাপ হচ্ছে তা-ও নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয়।

গোবর্ধন বললেন, "ঝড় বাদলের শব্দ অনেক শুনেছি। কিন্তু আজকে বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। রিম্ রিম্ সোঁ সোঁ ঝর্ঝর বর্ষার অনেক রকম বর্ণনা পড়েছি। কিন্তু এ মনে হচ্ছে দু'হাতে তালি দিয়ে কেউ যেন খিকখিক করে হাসছে। শুনতে পাচ্ছেন?"

"পাচ্ছি। সত্যি হয়তো হাততালি দিয়ে খিকখিক করে হাসছে কেউ। আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

"আমি? আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি মূল্য আছে বলুন। তবে স্বপ্নে আমি একবার ভূত দেখেছিলাম।"

"স্বপ্নে? স্বপ্নে অবশ্য মৃত লোককে দেখা যায়। সেটাকে ঠিক ভূত-দেখা বলে না। জাগ্রত অবস্থায় যদি মৃত কাউকে দেখা যায় তাহলেই সেটাকে ভূত দেখা বলে—"

গোবর্ধন বললেন, "অনেক দার্শনিকের মতে আমাদের জাগ্রত অবস্থাটাও স্বপ্নের নামান্তর।"

"...হ্যাঁ, তা বটে। কাশীর কৌটোর মতো একটা স্বপ্নের ভিতর আর একটা স্বপ্ন থাকে। খোলা ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই থাকে না পেঁয়াজের মতো। স্বপ্ন জিনিসটাই আশ্চর্য—।"

বাইরে মেঘ ডেকে উঠল গমগম করে।

মনে হল ভারী গলায় কে যেন হেসে উঠল।

গেরুয়াধারী বললেন—"আমি একবার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ছিলাম। একটু আগে আপনাকে বলছিলাম, না?"

"কি রকম স্বপ্ন?"

"সে খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন মশাই। শুনবেন? এখনও সেকথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।"

"বলুন।"

"দ্বিতীয়বার কলেজে যখন ভর্তি হয়েছি তখনই দেখেছিলাম স্বপ্নটা। আমি একটা যেন বিদেহী আত্মা মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার দেহ নেই, কিন্তু মন আছে, কামনা আছে। আমি আকাশে সেই গ্রহদের যেন খুঁজে বেড়াচ্ছি যাঁরা পরজন্মে আমার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করবেন। অনেক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ টক্‌টকে লাল এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখতে পেলাম। বুঝলাম ইনিই জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য। আমি বিদেহী, কথা তো বলতে পারি না, মনে মনেই বলতে লাগলাম, হে দেব, আমার জন্মকুণ্ডলীতে তুমি এমন স্থানে অবস্থান কর যাতে আমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। সূর্য কিছু বললেন না, একটু মুচকি হেসে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে পূর্বাকাশে দেখলাম চাঁদ উঠছে, গোল রুপোর থালার মতো। ওমা, কাছে গিয়ে দেখি অন্যরকম। রুপোও নয়, থালাও নয়। দিব্যি ফুটফুটে একটি যুবক, শাঁখের মতো রং। নবগ্রহ স্তোত্রে যা পড়েছিলাম ঠিক তাই। ক্ষীরোদার্ণব থেকে উঠেছেন তো, বললে বিশ্বাস করবেন না, গা থেকে ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ ছাড়ছিল একটা। সূর্যকে যা বলেছিলাম তাঁকেও তাই বললাম। ইনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। মনে হল আমার প্রার্থনা বুঝি শুনতে পান নি। দূরে রোহিণী নক্ষত্র উঠেছিল, সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। মঙ্গলের দেখা আর পাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অনেক বাজে নক্ষত্রকে প্রথমে মঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমার নবগ্রহ স্তোত্র মুখস্থ, বাজে নক্ষত্রকে মঙ্গল বলে ভুল করবার ছেলে আমি নই, খুঁজতে লাগলাম। তারপর দেখতে পেলাম। দেখলাম যেন প্রবাল-রঙের বিরাট একটা বাল্‌ব জ্বলছে, সাধারণ বাল্‌ব নয়, কোটি পাওয়ারের বাল্‌ব। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম ইনিই সেই লোহিতাঙ্গ বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভ ধরণী-গর্ভসম্ভূত কুমার। এঁকেও মনে মনে প্রার্থনা জানালাম। কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। দেখতে দেখতে সেই বিরাট বাল্‌ব একটি মনুষ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হল। মনুষ্য মূর্তি বলছি বটে, কিন্তু আসলে তা যেন বিদ্যুতে-তৈরি জ্যোতির্ময় শাণিত তরবারি একটি। তারপর দেখলুম কোথা থেকে বিরাট এক ভেড়া এসে হাজির হল। তার গায়ের লোমগুলো যেন আগুনের শিখা, শিং দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে তৈরি, চোখের দৃষ্টিতেও হুতাশন। সেই ভেড়া পিঠ পেতে দাঁড়াল, মঙ্গল তার উপর চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন অনন্ত অন্ধকারে। আমিও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। এর পর বুধকে খোঁজবার পালা। খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু এ-ও বুঝলাম যে ওঁরা নিজে যদি না দেখা দেন

দেখা পাব না। আকুল হয়ে খুঁজতে লাগলাম। কতক্ষণ খুঁজেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখলাম শ্যামবর্ণ এক কিশোর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। গা দিয়ে ফিকে সবুজ জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। —চেহারাটা দুষ্টু দুষ্টু। চোখের তারা অদ্ভুত। কালো নয়, নীল নয়, সবুজ। যেন দুখানি বেদাগ পান্না জ্বলছে। মনে মনে তাঁকে প্রার্থনা জানালাম। তিনি হাত দিয়ে দূর আকাশের একটা জায়গা নির্দেশ করে দিলেন। দেখলাম সে জায়গাটা আলোয় আলো হয়ে গেছে। আলোটা কিসের হতে পারে তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। মহাকাশে আলোর উৎস তো অসংখ্য। যেমন আলো, তেমনি অন্ধকার। ওই আলোটা কি তা জিগ্যেস করবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বুধ চম্পট দিয়েছে। তখন ওই আলোটার দিকেই অগ্রসর হলাম। কিন্তু একটা মুশকিল হল। যতই যাই, ততই যেন সেটা সরে সরে যায়। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, পথ আর ফুরোয় না। একটা সুবিধে ছিল অবশ্য, দেহ তো ছিল না তাই ক্লান্তি হচ্ছিল না একটুও। বরং জেদ চড়ে যাওয়াতে গতিবেগ হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সেই আলোর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম লক্ষ লক্ষ যোজন ব্যাপী বিরাট এক আলোক পরিমণ্ডল। তার ভিতরে অনেকে হাতজোড় করে বসে আছেন এক বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষকে কেন্দ্র করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে চিনতে পারলাম। মার্কামারা চেহারা ওঁদের। ব্রহ্মা চতুর্মুখ, মহেশ্বর পঞ্চানন, আর বিষ্ণু চতুর্ভুজ। তখন বুঝতে পারলাম আর যাঁরা বসে আছেন তাঁরাও দেবতা, আর ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি। আবক্ষ সাদা দাড়ি, মাথায় ঘন সাদা চুল বাবরির মতো। চোখের দৃষ্টি প্রশান্ত গভীর, এবং সুদূর-প্রসারী। তিনি যে কারও স্তব শুনছেন তা মনে হল না। গায়ের রং ঠিক কাঁচা সোনার মতো। আর তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে আলো তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমার নেই। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর সভয়ে মনে মনে জানালাম—হে দেবগুরু, হে বৃহস্পতি, পরজন্মে আমার জন্মলগ্নে শুভস্থানে অবস্থান করবেন এই প্রার্থনা জানাই। তিনি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। তাঁর দৃষ্টি যেমন সুদূর-প্রসারী ছিল তেমনিই রইল। মনে হল তিনি যেন সমাধিস্থ।"

গোবর্ধন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—"এই সব আপনি একটানা দেখে গেলেন স্বপ্নে?"

"হ্যাঁ মশাই। দেখলাম। Truth is stranger than fiction"

"তারপর?"

"তারপর বৃহস্পতির এলাকা ছেড়ে চলে গেলাম। খুঁজতে লাগলাম শুক্রকে। বেশী বেগ পেতে হয়নি। একটু পরেই পেলাম তাঁকে। কি রকম দেখতে জানেন? সাহেবের মতো। ধপধপে সাদা রং, কটা চুল, কটা দাড়ি-গোঁফ। লম্বা জোব্বা পরা। হঠাৎ মনে হয় যেন মিশনারি প্রফেসার। আর তাঁর চারিদিকে ঘিরে আলোর উৎসব চলছে। রামধনুর সাতটা রং একে একে ফুটছে আলাদা আলাদা, তারপর সব মিলে মিশে হয়ে যাচ্ছে দুধের মতো সাদা আলো। আমার দিকে সকৌতুকে একবার চাইলেন। ভাবটা যেন—কি হে, তুমি এখানে কেন? মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, কিন্তু তাঁর মুখের কোন ভাব-পরিবর্তন হল না। আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, যদি কিছু বলেন। কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আবার ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে শনিরও দেখা

পেলাম। যেন একটা বিরাট গোঁপ-দাড়ি-জটা-ওলা টাওয়ার। টাওয়ারটা যেন নিয়ন-লাইটের বালবের মতো জ্বলছে, নীল আলো বেরুচ্ছে তার থেকে। টাওয়ারের কোমরে পেটে আর বুকে তিনটে বড় বড় রিং—তা-ও নিয়ন-লাইটের। সে তিনটে থেকেও নানা রকম নীল আলো বেরুচ্ছে। বেরুচ্ছে বললে কিছুই বলা হবে না। ছুটে বেরুচ্ছে ফোয়ারার মতো। দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। মনে মনে প্রার্থনাটা জানিয়ে সরে পড়লাম সেখান থেকে। শনিকে চিরকালই ভয় করি। আমার প্রার্থনায় তিনি সাড়া দিলেন কি না তা দেখবার জন্যে সেখানে আর দাঁড়ালাম না। বেগে পলায়ন করলাম। কিছুক্ষণ পরেই থমকে দাঁড়াতে হল। সামনে দেখি বিরাট একটা কালো ফুটবলের মতো কি যেন এগিয়ে আসছে। তার উপর দুটো ভাঁটার মতো চোখ আঙরার মতো জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কি সর্বনাশ—এ যে রাহু। ঠোঁটের উপর একজোড়া মোচার মতো গোঁফ। সমস্ত মুখে একটা তেরিয়া-তেরিয়া ভাব। অনেকটা দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মতো দেখতে। সেখানেও বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না। কোনও রকমে প্রার্থনাটা পেশ করে দিলাম চম্পট। বাবাঃ ওরকম বিরাট মুণ্ডের সামনে দাঁড়ানো যায় কখনও। কেতুর দেখা অনেকক্ষণ পাই নি। অনেকক্ষণ আকুল প্রার্থনার পর তিনি নিজেই আবির্ভূত হলেন আমার সামনে। পোয়াল গাদায় আগুন লাগলে যেমন ধোঁয়া বেরোয় তেমনি ধোঁয়ার মতো তার চেহারা। চোখ মুখ নাক কিচ্ছু নেই। বিরাট ধোঁয়া খানিকটা। প্রার্থনা জানালাম এঁর কাছেও। ইনি উত্তর দিলেন। সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বললেন, রে বিদেহী আত্মা (আত্ত বললেন না আৎমা বললেন) তুই বৃথাই ছটফট করে মরছিস। তোর জন্মকুণ্ডলীতে আমরা কে কোথায় থাকব তা তোর জন্মের আগেই ঠিক হয়ে আছে। তোর পূর্ব-জীবনের কর্মফলই তা ঠিক করেছে। তা বদলাবার সাধ্য আমাদের কারো নেই, কারণ আমরাও অমোঘ নিয়মে আবদ্ধ। তোর ভাগ্যনিয়ন্তা তুই নিজেই। তোর ভবিষ্যৎ জন্মকুণ্ডলী দেখবি? ওই দেখ!

অন্ধকার আকাশপটে আলোর রেখায় আমার জন্মকুণ্ডলীটা আঁকা হয়ে গেল দেখলাম। তারপর সব মিলিয়ে গেল। আমারও ঘুমটা ভেঙে গেল—।"

গোবর্ধন বিস্ফারিত নয়নে শুনছিলেন।

বললেন, "অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্ন। আপনি যতই লুকোবার চেষ্টা করুন আপনার ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ নিশ্চয়ই আছে। না থাকলে এবকম স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে না—।"

"তা হবে। কিন্তু সে সম্পদের উপর এত গরদা জমা হয়েছে যে সেটা ভাল ঠাহর হয় না। ভগবান অবশ্য গরদা সাফ করবার চেষ্টা করছেন যথেষ্ট, ধোপা যেমন করে পাটাতনের উপর কাপড় আছড়ায়, আমাকেও তেমনি তিনি আছড়াচ্ছেন। কিন্তু গরদা যে প্রচুর, সহজে কি সাফ হয়!"

দুজনেই চুপ করে রইলেন। বাইরে ঝড় জলের মাতন তুমুল থেকে তুমুলতর হতে লাগল।

"প্রলয় শুরু হয়ে গেল নাকি— " গেরুয়াধারী বললেন।

"হলেই বা উপায় কি। ওসব ভেবে লাভ নেই। আপনার জীবনকাহিনীই শোনা যাক। কলেজেই আবার পড়তে লাগলেন?"

"পড়তে লাগলাম বললে ভুল হবে। কলেজে নাম লেখানো রইল। মর্জি মাফিক কখনও যেতুম, কখনও যেতুম না! কোলেদের বাড়িতে আড্ডা দিতুম। থিয়েটারে মেয়ে সাজতুম। ফিমেল পার্ট করে বেশ নাম করেছিলাম। মামারা কিচ্ছু বলতেন না। কারণ শহরের তিনটে ক্লাবেরই তাঁরা পেট্রন ছিলেন। এইভাবেই চলছিল, এমন সময় অদৃশ্য হস্ত অদৃশ্য টিকিটি ধরে আবার টান দিলেন। গোপাল মল্লিকের চোখে পড়ে গেলাম একদিন। আমার এই চেহারাটার জন্যে অনেক সুবিধা হয়েছে আমার। সেকালে ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে সিনেমা স্টার সংগ্রহের এমন ঢালাও রেওয়াজ ছিল না, থাকলে ওই লাইনেই বাজিমাৎ করতে পারতাম। চেহারাটা সত্যই ভালো ছিল। যে দেখত মুগ্ধ হয়ে যেত। অভিনয় করে মেডেলও পেয়েছি। হিন্দীতে একটা কথা আছে—আগে দর্শনধারী, পিছু গুণ বিচারি। খুব ঠিক কথা। গোপাল মল্লিকের চোখে পড়ে গেলাম আমাদের বাড়ির সামনের গলিটার মোড়ে। সেকালে তুই তোকারি করলেই আত্মীয়তা প্রকাশ করা হত।

বললেন, "তুই কে রে? তোকে তো দেখিনি কখনও।"

বললাম, "আমি জনকবাবুর ভাগ্নে।"

"কি করছিস?"

"কলেজে নাম লিখিয়ে চুপ করে বসে আছি বাড়িতে।"

"টাইপ-রাইটিং জানিস?"

"না।"

"আচ্ছা আমার আপিসে চলে আয়, একটা খালি টাইপ-রাইটার পড়ে আছে, সেইটেতে হাত মক্‌শ কর।"

অবাক হয়ে গেলাম। গোপাল মল্লিক আমার বন্ধু, শেতলার বাবা। তিনি আমাকে রোজ রাস্তায় দেখেন, কিন্তু ভাবটা করলেন যেন আমাকে চেনেন না, জানেন না। যেন রাস্তা থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিলেন। এক গোপাল আমার চাকরি খেয়েছিলেন, আর এক গোপাল চাকরি দিলেন। মামারা আপত্তি করলেন না, খুশিই হলেন বরং। গোপাল মল্লিক PWD আপিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। হেড্ ক্লার্কদের প্রবল প্রতাপ তখন। আমি যেতেই আমাকে একটা টাইপ-রাইটার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওইটেতে বসে প্রাকটিস্ কর।' আর একজন টাইপিস্টকে বললেন, 'ওহে ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও তো। একেবারে মাকাল ফলটি। কিচ্ছু জানে না।' শেখ রহিমুদ্দিন প্রবীণ টাইপিস্ট। তিনি এগিয়ে এসে আমাকে আদাব করলেন। হ্যাঁ মশাই, আদাব করলেন। আমি তাঁর ছেলের বয়সী। এই আদব কায়দাটা মুসলমানদের আছে, কিন্তু বাঙালীদের নেই। বাঙালী ছেলেরা আজকাল গুরুজনদের পর্যন্ত প্রণাম করে না। কেউ কেউ দুহাত তুলে এমন একটা ভাব করে যেন পাঁঠা কাটছে। যাক্ অবান্তর কথায় এসে পড়েছি। শেখ রহিমুদ্দিনের কাছে আমি টাইপ-রাইটিংয়ে প্রথম পাঠ নিলাম। আপিসে বসে সমস্ত দিন প্র্যাক্‌টিস্ করতাম। শহরে একটা শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শেখবার স্কুল ছিল। সেখানে রাত্রেও পড়ানো হত। ভর্তি হয়ে গেলাম সেখানে এবং ক্রমাগত প্র্যাকটিস্ করতে লাগলাম। একমাসের মধ্যে আমার স্পীড ফিফটি ওয়ার্ডস পার মিনিট হল। ওই স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হলাম। তখন All India Remington

Typewriter কম্পিটিশন হত। সে পরীক্ষাটাও দিয়ে ফেললাম কলকাতায় গিয়ে। তাতেও ফার্স্ট হয়ে গোল্‌ড্ মেডেল পেলাম। তখন আমার স্পীড সেভেনটি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট। একেবারে নির্ভুল। হবেই তো, আপিসে তো আর কোন কাজ ছিল না, কেবল বসে বসে প্র্যাকটিস করতাম। এইবার এক বাঙালী মহাপ্রভুর টনক নড়ল। তাঁর ন্যায়-বুদ্ধি জাগরিত হল। আমার মতো আনাড়ি যে গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে মাইনে নিয়ে আপিসে বসে টাইপরাইটিং শিখছে বড়বাবুর কৃপায়, এ অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। ওই আপিসের অন্য ডিপার্টমেন্টের কেরানী ছিলেন তিনি। সাহেবকে কানে কানে গিয়ে লাগালেন—হেড ক্লার্ক ওই যে লাল টুকটুকে ছেলেটিকে বাহাল করেছে ও একটি গবেট। টাইপ করতে পারে না, আপিসে বসে প্র্যাক্‌টিস করে খালি। প্রথম প্রথম আমি তাই করতুম বটে কিন্তু পরে যে আমি দিনরাত খেটেখুটে expert হয়ে গেছি এ খবর রাখতেন না বাছাধন। ফলও পেলেন। তার কথা শুনে সাহেব হঠাৎ একদিন টাইপ-রুমে এলেন সারপ্রাইজ চেক করতে। আমাকে লম্বা রিপোর্ট দিয়ে বললেন, এটা এখুনি টাইপ করে নিয়ে এস! আমার তখন সেভেনটি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট স্পীড। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল টাইপ করে নিয়ে গেলাম। সাহেব আমার উপর মহা খুশী হলেন। যে বঙ্গসন্তানটি আমার নামে গোপনে নালিশ করেছিল তার কি হল জানেন? একজন ভালো লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্যে সাহেব তার বিরুদ্ধে proceedings ড্র করলেন। চাকরি যায় যায়। আমার পায়ে কেঁদে পড়ল সে তখন। আমি আমার পেট্রন গোপাল মল্লিককে গিয়ে বললাম। তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

"ও, তাই নাকি। বেশ, সাহেবকে বলতে পারি, ও যদি সবার সামনে তোমার কাছে ক্ষমা চায়।"

চাইতে হল। গোপালবাবু গিয়ে সাহেবকে বলাতে চাকরিটা রয়ে গেল তার।

সাহেব আমার কাজ দেখে এত খুশি হয়েছিলেন যে আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে কন্‌ফিডেনশাল্ সেক্‌শনের সব কাজ করতে দিতেন। আমার মাইনেও বাড়িয়ে দিলেন। গভর্ণমেন্ট থেকে মাসে ৩৫্ করে পেতাম, আর সাহেব নিজের পকেট থেকে ৩৫্ দিতেন তাঁর নিজের কন্‌ফিডেনশাল কাজ করাতেন বলে। তখন আমার শনি তুঙ্গী চলছে, শনি আমার ভাগ্যাধিপতি, তখন আমায় আটকায় কে। আয় আরও বাড়ল। প্রাইভেট যে স্কুলটার কথা বলেছিলাম তার প্রিন্সিপাল মামার খুব বন্ধু ছিলেন। তিনিও আমাকে তাঁর নিজের ও স্কুলের কাজ করবার জন্যে বাহাল করলেন। পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে দিতেন। রাত জেগে তাঁর কাজ করতুম। দেবতুল্য লোক ছিলেন। ক্রিশ্চান, কিন্তু দেবতুল্য।"

হঠাৎ থেমে গেলেন গেরুয়াধারী।

"ও মশায়, আলোটা একবার জ্বালাতে পারেন?"

"দেশলাই তো নেই। ভজুয়ার বউ ফিরেছে কিনা সন্দেহ। আলো জ্বালাতে চাইছেন কেন?"

"গুরুতর কারণ আছে। আমার পায়ের উপর দিয়ে খুব ঠাণ্ডা দড়ির মতো খরখরে কি একটা চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কদ্রুর বংশধর কেউ—"

"কদু? মানে, লাউ?"

"আরে না না, সাপ। মহাভারতও পড়েননি!"

"আজ্ঞে না, ওটা তো কোর্সে ছিল না। সাপ? বলেন কি!"

"চেঁচামেচি করবেন না। চুপ করে থাকুন, ও আপনিই চলে যাবে। আমার পা-টা তো পার হয়ে গেল। আপনি আলোটা জ্বালবার চেষ্টা করুন। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

"আচ্ছা, দেখছি। বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ভজুয়ার বউয়ের শাড়িটা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে।"

"নিংড়ে নিন না।"

"তাই নিই।"

গোবর্ধন কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে বললেন, "অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সম্ভবত আলকাতরার মতো কালো জল বেরুচ্ছে কাপড়টা থেকে। যা দুর্গন্ধ— ।"

তবু ওই গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন গোবর্ধন।

গেরুয়াধারী একা বসে ঝড়বৃষ্টির গর্জন আর সাপের সান্নিধ্য উপভোগ করতে লাগলেন। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, গোবর্ধন ফিরলেন না। গেরুয়াধারীর মনে দার্শনিক ভাবের আমেজ এল একটা। তিনি ভাবতে লাগলেন এক নতুন ধরনের মজার মধ্যে ফেলেছেন তাঁকে ভাগ্যবিধাতা। তাঁর জীবনে অনেক রকম মজার আয়োজন করেছেন তিনি ইতিপূর্বে। সবগুলোই তিনি উপভোগ করেছেন, এমন কি তাঁর ছেলের মৃত্যুটাও। আজকের এই অবস্থাতেই বা ঘাবড়াবেন কেন? এটাকেও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হবে। হঠাৎ তাঁর গোবর্ধনের জন্যে চিন্তিত হল। এখনও আসছে না কেন? এই অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটিকে ভালো লেগে গিয়েছিল। বেশ লোকটি। সারাজীবন চাকরির চেষ্টা করছে, অথচ কোথাও লাগছে না। তারপর একটা কথা মনে হওয়াতে নিজেরই আশ্চর্য লাগল। লোকটি যদি সব দিক দিয়ে কৃতী হত তাহলে হয়তো অত ভাল লাগত না। কৃতী হলে লোকের ভালবাসা পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা অনেক সময় পাওয়া যায়, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক কিংবা স্বার্থদুষ্ট। তার মেজমামার একটা কথাও মনে পড়ল। মেজমামার দুই ছেলে। একটি বেশ কৃতী। কম্‌পিট করে বড় চাকরি পেয়েছে। বড় বড় শহরে থাকে। আর ছোট ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি। সে মেজমামার কাছে থাকত। শেষ বয়সে মেজমামার পক্ষাঘাত হয়েছিল। ওই ছোট ছেলেই সেবা করত তাঁর। ওই পিণ্টু কাছে না থাকলে অশেষ দুর্গতি হত মেজমামার। পিণ্টুর দাদা তখন লাহোরে। সেখানে মেজমামাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মেজমামা তাই জড়িয়ে জড়িয়ে প্রায়ই বলতেন—বাবা পিণ্টু, ভাগ্যে তুই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারিস নি, তাই বুড়ো বয়সে তোকে কাছে পেয়েছি। শণ্টুর মতো ভালো ছেলে হলে অসীম দুর্গতি হত আমার। গেরুয়াধারীর মনে হচ্ছিল যারা জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি, তারাও অধন্য নয়। তারা অনেকের ভালবাসা পায়।

.... বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। তারপর গোবর্ধন এলেন। সঙ্গে দুজন লোক নিয়ে। একজনের হাতে লণ্ঠন আর লাঠি। আর একজনের হাতে বালতি একটা।

"ভজুয়ার বউ এখনও ফেরেনি। তাই আমি মাঠ পেরিয়ে মাইল খানেক দূরে গ্রামটার ভিতর চলে গিয়েছিলাম। যখন শিকারে এসেছিলাম তখন এখানকার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনিও খুব ভাল শিকারী। গেলাম তাঁর বাড়িতে। কিন্তু বরাত খারাপ, শুনলাম তিনি কলকাতা গেছেন। খুঁজে বার করলাম তাঁর কম্পাউণ্ডারকে। সব শুনে তিনি বললেন, "বালতি করে স্ট্রং কার্বলিক লোশন নিয়ে যান। সেইটে ঘরের চারিদিকে ছিটিয়ে দিলে সাপ পালাবে। সঙ্গে দুজন লোক দিলেন, লাঠি আর লণ্ঠনও দিলেন। সাপটাকে যদি দেখা যায় মারা যাবে। লোকটি প্রকৃতই সজ্জন। আমাদের বিপদ শুনে নিজেই আসতেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর প্রসব-বেদনা উঠেছে বলে আসতে পারলেন না। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।"

যে দু'জন লোক এসেছিল তাদের মধ্যে একজন বললে—"ও, এইখানে সাপ বেরিয়েছিল? তা তো বেরোবেই। পীরবাবার সাপ। ও সাপকে আমরা মারতে পারব না। আপনারা নির্ভয়ে বসে থাকুন। ও সাপ কাউকে কিছু বলবে না। দাবাইটা ছিটিয়ে দিন ভাল করে।"

দেখা গেল চালের অনেক জায়গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। গেরুয়াধারীর গেরুয়া ঝুলিটি ভিজেছে। তিনি সেটি তাড়াতাড়ি নিজের কোলের উপর টেনে নিলেন। বললেন, "দরকারি চিঠি আছে এতে একটা। সেটা ভিজে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

ঘরের মেজে বেশ ভিজেই গিয়েছিল। কার্বলিক লোশন ছিটানোতে আরও ভিজে গেল সব। মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধের বদলে কার্বলিক এসিডের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চারিদিক।

গেরুয়াধারী প্রশ্ন করলে, "এখানে পীরবাবার সাপ এল কি করে?"

লোকটি বলল, "আপনারা যে পীরবাবার কবরের উপরই বসে আছেন। ওই যে পাকা দেওয়ালটা দেখছেন ওটা কবরের একটা অংশ। কবরের বাকি অংশটা ধসে গেছে বহুকাল আগে। ভজুয়া ওই পাকা দেওয়ালটা কাজে লাগিয়েছে। এ অঞ্চলের মুসলমানেরা এতে অসন্তুষ্ট। কোনদিন হয় তো দাঙ্গা বেধে যাবে।"

একটু থেমে লোক দুটি বলল, "লাঠিটা আপনারা রাখতে চান তো রেখে দিন। লণ্ঠনটা কিন্তু আমাদের নিয়ে যেতে হবে। বালতিটাও।"

লণ্ঠন এবং বালতি নিয়ে তারা চলে গেল।

গোবর্ধন স্বস্থানে বসলেন এবং বললেন, "অনেক আগে এ ঘাটটার নামই ছিল নাকি পীরবাবার ঘাট। এক গোঁড়া হিন্দু ক্ষত্রিয় পঞ্চাশ বছর আগে এ অঞ্চলের সব জমিদারি কিনেছিল। সে-ই এই ঘাটের নাম বদল করে দিয়েছিল, নাম রেখেছিল সিংজির ঘাট। এ পীরবাবা খুব জাগ্রত শুনলাম।"

"এত সব খবর কে দিলে আপনাকে—"

"ওই লোক দুটি। ওরা এ অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে আছে। অনেক খবর জানে।"

"ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গোবর্ধন চোখ বুজে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর হাতজুড়ে প্রণাম করলেন।

"ওটা কি হল"—জিগ্যেস করলেন গেরুয়াধারী।

"পীরবাবার কাছে একটা মানত করলাম। দেখি তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন কি না।"

"কিসের মানত?"

"কিসের আবার চাকরির। তবে ওই সৌদামিনীর ব্যাপার নয়, অন্য একটা। কোলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছেই একটা ভাল ব্যাঙ্কে কেশিয়ারের চাকরি খালি আছে একটা। কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন যে হাজার দশেক টাকা জমা রাখতে হবে ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি স্বরূপ। বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স একদম 'নীল' না হলেও নীলচে। দেখি, পীরবাবা যদি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। টাকা দিতে পারলে ওরা আমাকে রাখবে।"

"ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরের অবিশ্রান্ত বর্ষণ যেন একটু কমেছে।

গোবর্ধন বললেন, "থামলেন কেন? বলুন আপনার জীবনকাহিনী। বেশ লাগছিল।"

"ভাল লাগছিল?"

"খুব।"

"আমি সেই PWD আপিসেই চাকরি করতে লাগলাম। সাহেবের খুব প্রিয়পাত্রও হলাম। চাকরি-জীবনে ওইটেই তো লক্ষ্য, আর ওটা হতে পারলেই মোক্ষ। সাহেব খুব ভালবাসতে লাগল আমাকে। এই ভাবেই চলছিল। এমন সময় হঠাৎ 'সার্চলাইটে' একদিন দেখলাম এক বিজ্ঞাপন। গভর্ণমেণ্ট হাউস পাটনায় এক টাইপিস্টের পোস্ট খালি আছে। মাইনে ৫০ থেকে শুরু। আমি P.W.D থেকে পাচ্ছিলাম ৩৫ আর সাহেব আমাকে নিজের পকেট থেকে দিত ৩৫। কিন্তু এ ৩৫ টাকা তো ফাউ, অনিশ্চিত, যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সাহেবকে দেখালাম বিজ্ঞাপনটা। সাহেব বললেন, দরখাস্ত কর। দরখাস্তে তিনি জোর কলমে রেকমেণ্ড করে দিলেন। দিন তিনেক পরে জবাব এল বাই ওয়্যারে। Meet Private Secretary to His Excellency। তখন ব্রেট সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারি। ইণ্টারভিউ করবার জন্যে ডেকেছে। টেলিগ্রাম নিয়ে চলে গেলাম বড় সাহেব এক্‌জিকিউটিভ এনিজিনিয়ারের কাছে। তিনি বললেন, 'খুব ভালো হয়েছে, তুমি আজই চলে যাও।' আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেলাম। একটু ইতস্তত করে সাহেবকে অবশেষে বললাম, "—সার, আমি আমার বাড়িতে ডিপেন্‌ডেন্টের মতো থাকি। পাটনায় যাওয়ার মতো আমার টাকা, পোশাক, বিছানা, মশারি এসব কিছুই তো নেই। এখন শীতকাল। How shall I go to the Government House like a begger?"

সাহেব—(মনে রাখবেন, সাহেব)—সাহেব আমাকে বললেন, 'সব ঠিক করে দিচ্ছি। সাতদিনের ছুটি দিচ্ছি তোমাকে। পঁচিশটা টাকাও দিচ্ছি। একটা 'রাগ' দিচ্ছি আর এই ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগটাও নিয়ে যাও। উইশ্‌ ইউ গুড লাক। তোমার যা পোশাক আছে ওতেই চলবে।' ঠিক যেন বাবা ছেলেকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল আমার।... যে ট্রেনটায় পাটনা গেলাম সেটা তখন পাটনায় পৌঁছত ভোর চারটেয়। পাঞ্জাব মেল। আমি যে টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম তাতে লেখা ছিল দশটায় দেখা করতে। আমি স্টেশনে একটু চা জলখাবার খেয়ে সোজা গভর্ণমেণ্ট হাউসেই চলে গেলাম। সেখানে দেখা হল চ্যাটার্জি মশায়ের সঙ্গে। তিনি হচ্ছেন শালার শালা, অর্থাৎ হেড্‌ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টু প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁকে টেলিগ্রাম দেখালাম, তিনি বাঙালী, আমিও বাঙালী, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন ইংরেজিতে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'গো ব্যাক্‌, দি পোস্ট ইজ্‌ ফিল্‌ড আপ।' আমি বললাম 'প্রাইভেট

সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করব।' তিনি বললেন, 'হবে না।' আমি সবিনয়ে কেঁচোটি হয়ে বললাম, 'দয়া করে যদি একবার দেখাটা করিয়ে দেন—।' ক্ষেপে গেলেন চ্যাটার্জি মশায়। তাঁর বিলিতি স্যুটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল এক ছোটোলোক চাষা। অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়ে বললেন, 'গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ফ্রম্ মাই অফিস।' অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু আমার রোখ চড়ে গেল যেমন করে হোক ব্রেট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবই। সাহেবের আপিসের সিঁড়ি দিয়ে যে-ই উঠতে যাব অমনি প্লেন ড্রেসের এক সাহেব কনেস্টবল এসে বাধা দিলে। বললে 'পাশ কই, বিনা পাশে ওপরে ওঠা মানা।' আমি তাকে টেলিগ্রামটা দেখালাম। তখন সে নরম হল। বলল, 'ও আই সী, কাম উইথ্ মি।' তিনি উপরে গিয়ে সার্জেন্ট মেজর গড্‌ফ্রের হাতে আমাকে সঁপে দিলেন। গড্‌ফ্রে আমাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিলেন ব্রেটের দরজা পর্যন্ত। ভারি পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। সেলাম করে সাহেবের দিকে টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে চটে আগুন হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জি কি তোমাকে বলে নি যে পোস্ট ফিলড্ আপ্ হয়ে গেছে? তবে আবার এসেছ কেন?' বললাম, 'আপনার ওয়্যার পেয়েই এসেছি সার। আমি অত্যন্ত গরীব মানুষ। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে আমার যা কিছু জমানো টাকা ছিল খরচ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি as ordered by you. এখন আমার ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নেই।' সাহেবের মুখে একটা পাইপ ঝুলছিল, সেটা খাড়া হয়ে উঠল! বুঝলাম সাহেব সেটা কামড়ে ধরেছেন। সেই অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যে শব্দটি নিঃসৃত হল সেটি একটি হুঙ্কার। হতাশ হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় আর একটি সাহেব ঢুকল তাঁর ঘরে। গায়ে ঢিলে-ঢালা পোশাক, চলার ভঙ্গী অনেকটা নাচের মতো। খাঁটি সাহেব, ওরকম নীল চোখ আর কারও দেখিনি। মনে হল শরতের নীল আকাশের দুটি ছোট ছোট টুকরো কে যেন বসিয়ে দিয়েছে চোখের মধ্যে। তার আর একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ল—বেল্ট্ থেকে তলোয়ার ঝুলছে। ব্রেট সাহেবকে কি বলে ব্রেট সাহেবের শেল্‌ফ থেকে কি একখানা বই নিল। আবার লক্ষ্য করলাম চলাটাতে চমৎকার নাচের ছন্দ আছে। পরে জেনেছি ভাল Waltz নাচ নাচতে পারত। হঠাৎ তার নজর পড়ল আমার দিকে। এগিয়ে এসে স্নিগ্ধকণ্ঠে জিগ্যেস করল— What do you want, my son? 'Son' শুনে ঘাবড়ে গেলাম আমি। তার পর সব কথা বললাম তাকে। ব্রেটের দিকে ফিরে দেখি সে ঘসঘস করে কি লিখে যাচ্ছে। আমার কথা শেষ হতেই সে মুখ তুলে বললে— What he says is true. তখন ওই সাহেবটি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে ইংরেজিতে যা বলল তা বঙ্কিমবাবু অনেক আগে তাঁর একটা বইতে লিখে গেছেন।

"কি—"

"মামনুসর। Follow me."

গেলাম পিছু পিছু। লোকটা গভর্ণরের A.D.C. ঘরে ঢুকে তো আমি অবাক। মনে হল যেন ইন্দ্রপুরীর একটা কক্ষে ঢুকেছি। সুন্দর কার্পেট পাতা, ভুরভুর করছে ফুলের গন্ধ, পুরু-গদি-আঁটা ড্রইংরুম স্যুট, দামী দামী চেয়ার চারদিকে। ঘরের মাঝখানে চমৎকার একটি সেক্রেটারিয়েট টেব্‌ল আর তার উপর নানান সব জিনিস সাজানো। আবুহোসেনের যে রকম অবস্থা হয়েছিল, আমারও অনেকটা সেইরকম হলো। 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন সাহেব আমাকে চেয়ারে বসতে বলল। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে যে গদি-আঁটা চেয়ারটা ছিল

সেইটে দেখিয়ে বলল, 'Sit down and take dictation.' বললাম, 'May I take your pen and paper sir?'

'ইয়েস, ইয়েস।'

সাহেব ডিকটেশন দিলেন। লিখলাম, বেশ স্পষ্ট আওয়াজ। বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হল না। তারপর বললেন, 'বেশ ধরে ধরে মন থেকে বানিয়ে কিছু লেখ। তোমার হাতের লেখা কি রকম দেখব।' তৎক্ষণাৎ লিখলাম—'My handwriting is very bad. But my teacher says it is good Yor Sire. now judge'। সাহেব পড়ে হেসেই আকুল। তারপর পাশের ঘর থেকে ব্রেটকে ও আর একটি সাহেবকে ডাকলেন। বলতে ভুলেছি লর্ড সিন্‌হা তখন বিহারের গভর্ণর। এই দ্বিতীয় সাহেবটিকে লর্ড সিন্‌হা বিলাত থেকে আসবার সময় অ্যাডিশনাল প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নিয়ে এসেছিলেন। মিস্টার প্যাট্রিক এঁর নাম। আর যে সাহেবটি আমাকে ডেকে ডিক্‌টেশন দিলেন তাঁর নাম ক্যাপটেন হ্যাসকেট স্মিথ। লর্ড ডাফ্‌রিনের খাস ভাগ্নে। এঁদের নাম আর পরিচয় পরে জেনেছিলাম। হ্যাসকেট, ব্রেট আর প্যাট্রিককে ডেকে আমার লেখা দেখাতে লাগল আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা কইতে লাগল। আমি একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। একটু পরেই ব্রেট আর প্যাট্রিক চলে গেল। তখন হ্যাসকেট আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, 'বেশ আমি তোমাকে বাহাল করলাম। মাইনে কত চাও?' বললাম 'আমি যে পোস্টের জন্য এসেছিলাম সেটার মাইনে ৫০্ টাকা আর আমার আগেকার পোস্টে পাচ্ছিলাম ৩৫্ টাকা। দুটোতে যোগ করে পঁচাশি হয়। আশি টাকা পেলেই আমি খুব খুশি হব।' সাহেব বললেন, 'অল রাইট।' কিন্তু appointment letter তখন দিলে না। বললে, 'তোমাকে আজ থেকেই বাহাল করছি। কিন্তু গভর্ণর হাউসের চাকরিতে এসব জামা কাপড় চলবে না। গভর্ণমেণ্ট হাউসের মর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে হবে।' আমি বললাম 'আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যে বড্ড গরীব। দামী পোশাক কেনবার পয়সা কোথায় পাব।' বললে বিশ্বাস করবেন না, সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাকে ৩০০্ টাকার একটা ড্রাফট্ লিখে দিলেন। বললেন, 'করিয়ে নাও সব।' আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ড্রাফ্‌ট্ আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, এ টাকা তোমায় শোধ করতে হবে না।' আমি তখন বললাম, 'কোথায় কিনতে হবে, কিরকম জিনিস মানানসই হবে, আমি তো ঠিক জানি না।' সাহেব বললেন, 'ওয়েট্ এ বিট।' ফোন করলেন উড্‌ল্যাণ্ড বলে কোন সাহেবকে। বললেন তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিতে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কাম।' আমি তার পিছু পিছু নেমে গেলাম। গিয়ে দেখি পোর্টিকোতে বিরাট উল্‌সে কার দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আমাকে নিয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসলেন। নিয়ে গেলেন আমাকে পাটনার একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দোকানে। তার দোকানেই তখন পাটনার সাহেবরা আর রইসরা কাপড় কিনতেন। সেই দোকানে গিয়ে হ্যাসকেট সাহেব আমার জন্যে সানপ্রুফ সোলারো তিন পিস্ স্যুট কিনলেন। তখনকার দিনে ১৮্ টাকা গজ ছিল। তারপর কিনলেন গ্রে ফ্ল্যানেলের আর একটি স্যুট। এ ছাড়া ব্লু ব্রেজার স্যুটের অর্ডার দিলেন একটি! বললেন সাতদিনের মধ্যে চাই, গভর্ণমেণ্ট হাউসে। তারপর নিয়ে গেলেন চান্‌লিনের কাছে। চান্‌লিন তখনকার দিনের নামজাদা চীনে জুতো-ওলা। সেখানে একজোড়া পেটেণ্ট লেদারের শু, এক জোড়া বেস্ট ব্রাউন ব্রোগ শু, আর কার্পেটের উপর চলবার জন্য এক জোড়া মোলায়েম চটির অর্ডার দিলেন।

তারপর নিয়ে গেলেন আর একটা দোকানে। সেখানে কিনে দিলেন ড্রেসিং গাউন, শ্লীপিং গাউন, বেঁটে বেঁটে কোট, কালো টাই, লং কোট সাদা টাই, ডবল breasted সাদা কামিজ, এক ডজন নানারঙের মোজা. মানে আমাকে একটি মিনিয়েচার গভর্ণমেণ্ট-হাউস গেস্ট বানিয়ে ছাড়লেন। আমি হতবাক্, চেয়ে চেয়ে দেখলুম সাহেব নিজের চেক বই থেকে কচাকচ চেক কাটছেন। সবসুদ্ধ ৯০০ টাকা লাগল। আমি মনে মনে ভাবছি আমার ৮০ টাকা মাইনে থেকে এসবে শোধ হবে না কি! তাহলেই তো গেছি! লোকটা বোধ হয় অন্তর্যামী ছিল। আমার দিকে ফিরে বলল—'এ সবের দাম তোমাকে দিতে হবে না। তোমাকে সাতদিনের ছুটি দিচ্ছি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে এস।' নিজে আমাকে স্টেশনে নিয়ে গেলেন, কেলনারে খাওয়ালেন, তারপর ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে দিলেন একটা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা। কোনও বাঙালীকে পরের জন্য এরকম করতে দেখেছেন?"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে গোবর্ধন বললেন, "দেখেছি বই কি! ডক্টর বিধুভূষণ রায় সায়েন্স কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসার ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি তাঁর জার্মানি যাওয়ার আগে আশু মুকুজ্যে তাঁকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে স্যুটের কাপড়-চোপড়, হোল্ডল, স্যুটকেস—সব কিনে দিয়েছিলেন। হরেন মুকুজ্যের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো তাঁর সব উপার্জন পরকেই দিতেন—"

যে গোবর্ধন কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন বাঙালীই বাঙালীর শত্রু, এখন তাঁর গলা আবেগভরে কাঁপতে লাগল।

গেরুয়াধারী বললেন, "ওঁরা তো মহাপ্রাণ দেবতা। ওঁদের কথাই আলাদা। আমি সাধারণ বাঙালীর কথা বলছি। ওই যে মিস্টার চ্যাটার্জি, যে আমাকে অভদ্রের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, সে তার ভাইপোটিকে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওই ব্রেট সাহেবের আপিসে টাইপিস্ট করে। ব্রেট সাহেব বলেছিলেন আমাকে খবর দিয়ে দিতে। কিন্তু দেয় নি। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি-ফ্যাটার্জির সাধ্য কি আমার গতি রোধ করে? আমার ভাগ্যদেবেতা তখন প্রসন্ন হয়েছে, আমাকে রুক্‌বে কে? ও ব্যাটা চাষার মতো ব্যবহার করে শুধু আত্মপরিচয়টা দিলে—।"

হেসে উঠলেন গোবর্ধন।

"ঠিক বলেছেন। শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম, সেইটে মনে পড়ল আপনার কথা শুনে।"

"কি গল্প—?"

"তাঁদের গ্রামে তাঁদের প্রতিবেশী একজন মুসলমানের মেয়ে হঠাৎ বিধবা হল। ক্ষিতিমোহন বাবুদের মনে হল প্রতিবেশীর এমন বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করতে যাওয়া উচিত। তিনি এবং তাঁদের বাড়ির আরও দু'একটি ছেলে সন্ধ্যার পর সন্তর্পণে হাজির হলেন তাদের বাড়ির উঠোনে। যাওয়া মাত্রই তাঁরা শুনতে পেলেন মেয়ের বাবা বলছেন—আল্লা, এডা তুমি কি করল্যা! এ কি হেঁদুর মাইয়া পাইছ? আমি তো আমার ফতিমার আবার বিয়া দিমু। তুমি শুধু তোমার মুখডা চিনাইল্যা। আপনার চ্যাটার্জি মশায়ও তাঁর মুখটা চেনালেন কেবল—।"

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরুয়াধারী। তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন।

বাইরে ঝপ্ ঝপ্ করে শব্দ হচ্ছিল একটা।

"কিসের শব্দ ওটা বলুন তো?"

গোবর্ধন বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন আবার।

"গতিক খুব খারাপ মনে হচ্ছে। গঙ্গার পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।"

"ভজুয়ারা কেউ আসে নি?"

"তাতো জানি না। ওদিকে তো যাই নি।"

"ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে একটু। এমন বিপদে পড়ব কে জানত। খাবার আনতুম তাহলে সঙ্গে করে। আপনার সঙ্গেও বোধ হয় কিছু নেই?"

"না। তবে ভজুয়ার বৌয়ের কানে যখন উঠেছে কথাটা তখন সে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। আপনি ততক্ষণ জীবনকাহিনীই শোনান।"

"তা ছাড়া কি আর করবার আছে এখন। বসুন, আবার শুরু করি তা হলে। ভালো লাগছে তো?"

"খুব। অদ্ভুত ঘটনাবহুল আপনার জীবন। পাটনা থেকে তো বাড়ি চলে গেলেন। তারপর?"

"সাতদিন পরে ফের পাটনায় গেলাম। এবার বেশ জমিয়ে বসলাম গভর্ণরের প্রাসাদে। এসেই বেশ সুসজ্জিত Suite পেলাম আমার নিজের জন্য। শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর। চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। আমার পাশেই রয়েছেন মিস্টার এণ্ড মিসেস্ হ্যানকক্‌স। বিলেত থেকে আসবার সময় লর্ড সিন্‌হা এঁদেরও নিয়ে এসেছিলেন। হাউস-হোলড্ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট করে। আমার থাকা ফ্রি, খাওয়াও ফ্রি। যে খাবার লর্ড সিনহার ফ্যামিলি, তাঁর অতিথিবর্গ এবং স্টাফরা (staff) খেতেন আমিও তাই খেতে লাগলাম। কারণ আমিও স্টাফের একজন হয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার আলাদা চাকরও ছিল একজন, একটা 'বয়'। আরও সুবিধা পেলাম অনেক। ফ্রি ওয়াশ্ (wash), ফ্রি মোটরকারের ইউস্ (use) ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সব তো পেলাম। কিন্তু কোন কাজ নেই। সেজেগুজে টিপ্‌টপ্ হয়ে আপিসের চেয়ারে বসা আর ম্যাগাজিনের পাতা-ওলটানো। দিন সাতেক এইভাবে কাটল। আমাকে যে কি কাজ করতে হবে তা-ও বুঝতে পারছি না। খাঁচার পাখিদের যে কি কষ্ট তা সেই ক'দিনে অনুভব করেছিলাম। দিন সাতেক এইভাবে কোনক্রমে কাটালাম। তারপর আর পেরে উঠলাম না। এ. ডি. সি. সাহেবকে গিয়ে বললাম, আমাকে কাজ দাও তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব যে। সাহেব তখন আমার হাতে appointment letter-টি দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ফ্রেঞ্চ জানো?' রিপ্লাই নেগেটিভ। সাহেব তখন বললেন, 'ফ্রেঞ্চ শিখতে হবে! বই আনিয়ে দিচ্ছি।' একটি 'ক্যাসেলস ফ্রেঞ্চ টু ইংলিশ' ডিক্‌শনারি আনিয়ে দিয়ে বললেন, 'গেট্ দি হাউস মেনু।' গভর্ণমেণ্ট হাউসের মেনুটা নিয়ে এলাম। তাতে যে ফ্রেঞ্চ নামের ডিশগুলো ছিল সেইগুলোতে দাগ দিয়ে বললেন, 'এগুলো মুখস্থ করে ফেল। আর ডিক্‌শনারি থেকে এদের মানে আর ঠিক উচ্চারণগুলো জেনে নাও। যেখানে বুঝতে পারবে না, আমার কাছে এস, বুঝিয়ে দেব।' যাক্, কাজ পেলাম একটা। যদিও বদখত কাজ—তবু এক সপ্তাহ মেহনত করে খানিকটা রপ্ত হল। উচ্চারণটা হল না, মানেগুলো বুঝলাম—।"

"ফ্রেঞ্চ কাটলেট খেতে খুব ভাল, না?"

হঠাৎ গোবর্ধন বলে উঠলেন।

"চমৎকার।"

"আমার বড় ছেলেটা কাটলেট বড্ড ভালবাসে। আপনার গল্প শুনে তার জন্যে হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। সত্যি, জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। তাকে একদিনও কাটলেট খাওয়াতে পারি নি হোটেলে। এক বিয়ে-বাড়িতে কোথায় যেন খেয়েছিল। অথচ কি-ই বা দাম!"

"আপনি একটা মহৎ কাজ করেছেন যা আমি পারি নি।"

"কি?"

"বাবার সেবা।"

"হ্যাঁ, তা যতটা পেরেছি করেছি। একটু আগেই বাবার কথা মনে হচ্ছিল। কোলকাতাতেও এইরকম বৃষ্টি নেবেছে কি না কে জানে। বৃষ্টির সময় বাবার ঘনঘন তামাক চাই। জগন্নাথ পারছে কিনা কে জানে।"

"জগন্নাথ কে?"

"আমার মেজ ছেলে। তাকে তামাক সাজাটা শিখিয়েছি ভাল করে। বাবা তার সাজা তামাক পছন্দও করছেন আজকাল। নিন বলুন। তারপর কি হল—?"

"তারপর সাহেব একদিন আমাকে মেনু তৈরি করতে বললেন। তিনিই আগে মেনুটা করতেন। আমি নির্বোধের মতো অনেক ভুল করলাম। বকলেন আমাকে, কিন্তু যত্ন করে শিখিয়ে দিলেন। মাসখানেক মক্‌শ করার পর মেনুর ব্যাপারটা সড়গড় হল। একমাস পরে আমিই স্বাধীনভাবে মেনু তৈরি করতে লাগলাম নির্ভুলভাবে। তারপর সাহেব আমাকে কেটারিং শেখালেন। তারপর শেখালেন হাউস ম্যানেজমেন্ট। তারপর পেট্রোল বিল চেক্ করা। তারপর ক্রমশ আরও বিবিধ বিষয়ে পরিপক্ক করে তুললেন আমাকে। সিণ্ডেরিলা নাচ, অ্যাট হোম ডিনার, Dejeunor, গার্ডেন পার্টি, Priority table (এটা বড় শক্ত কাজ) সব শিখে ফেললাম একে একে। তারপর আস্তে আস্তে কনট্রোলার অব্ হাউস্‌হোল্ডের যা যা কর্তব্য তাও শেখালেন। আমিই সব চালাতে লাগলাম শেষে। দিনকতক পরে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সর্বঘটেই আমি বিরাজমান। আমার চাহিদাই হল সবচেয়ে বেশী। A D C নামেই রইলেন, তাঁর সব কাজ আমিই করতে লাগলাম। গভর্ণমেণ্ট হাউসের স্টাফ্ সবাই আমার উপর খুশি। এমন কি His Excellency-ও নাকি একদিন বলেছিলেন সান্যাল is indispensable যে ব্রেট সাহেব আমার প্রতি অবিচার করে আমাকে দূর করে দিয়েছিলেন তিনিও আমার উপর সন্তুষ্ট হলেন। এই ব্রেট সাহেব উত্তর-জীবনে আমার মস্ত বড় পেট্রন হয়েছিলেন, সে কথা পরে বলব। সাহেবরা যার উপর তুষ্ট হয় তাকে চড়চড় করে তুলে দেয়, আর যার উপর রুষ্ট হয় তাকে এক কোপে সাফ করে ফেলে।"

বাইরে ঝড়ের বেগটা আবার বাড়ল। সেই ঝপ্‌ঝপ্ শব্দটাও। গেরুয়াধারী নীরব হয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, "ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ। জানি না ভগবান আজ কপালে কি লিখেছেন।"

গোবর্ধন সান্ত্বনার সুরে বললেন, "ওসব ভেবে আর কি হবে! যা বলছিলেন বলুন। অন্যমনস্ক থাকাই ভাল। তারপর কি হল—"

"এরপর সব হিল্ স্টেশনে টুর হতে লাগল। সব জায়গাতে A.D.C.র বদলে আমিই সব চালাতে লাগলাম। ডিনার পার্টি, গার্ডেন পার্টি, সিণ্ডেরিলা নাচ—সব আমিই ব্যবস্থা করতাম। এর পরই লর্ড সিন্‌হা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হৈ হৈ পড়ে গেল। কোলকাতা থেকে

ডক্‌টার আহ্‌মেদ এসে দু'দিনে তাঁর বারোটা দাঁত তুলে দিলেন। তখন আমরা পাটনা গভর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে এসেছি। লর্ড সিন্‌হার রাত্রে ঘুম হয় না, ভালো হজম হয় না। তিনি তখন দুমাসের ছুটি নিয়ে সিমলা চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তো গেলেনই, আর কয়েকজন চাকর-বেয়ারাও গেল। কিন্তু তিনি A.D.C কে সঙ্গে নিলেন না। বললেন, সান্যাল থাকুক, তাহলেই হবে। সিমলায় থাকতে থাকতেই তিনি রেজিগ্‌নেশন দেন। তারপর এলিশিয়ম রো-এ তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে যান। আমিও তাঁর সঙ্গে কোলকাতায় গেলাম। তিনি বললেন, 'পাটনায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে আমার Personal silver kits, type-writer প্রভৃতি অনেক জিনিস আছে, সেগুলো এখানে তুমি পৌঁছে দিয়ে যাও।' মার্ক, এসব জিনিস তাঁর A.D.C. বা প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নিয়ে যেতে বললেন না, আমাকে বললেন। সত্যিই আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন তিনি। তিনি এবং লেডি সিন্‌হা আমাকে বললেন, 'তুমি আপাতত আমাদের কাছে থাক। পরে ভাল চাকরি করে দেব। বর্ধমানের মহারাজা তোমারই মতো একজন করিৎকর্মা অথচ ভদ্র ছেলে খুঁজছেন A.D.C. করবেন বলে। আট শ' টাকা মাইনে দেবেন। সেটা বেড়ে বেড়ে ১৫০০্‌ পর্যন্ত হবে। আমি পাটনায় ফিরে এলাম সোল্লাসে। লর্ড সিন্‌হার জায়গায় বিহার এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার তখন অ্যাক্‌টিং গভর্ণর হয়েছেন। আমি এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু যে A.D.C. আমাকে চাকরি দিয়ে মানুষ করেছিল সেই কাপ্টেন হ্যাসকেট্‌ আমাকে যেতে দিলে না। বলতেই মাথা নেড়ে বলে উঠল— 'ও, নো, নো, নো, নো।' মিস্টার ব্রেটও আপত্তি করলেন। শুনলাম নতুন গভর্ণরও নাকি আমাকে ছাড়তে চান না। তখন আমি মাইনে পাচ্ছি ৫৬০্‌ প্লাস ফ্রি বোর্ডিং, ফ্রি ধোবি, ফ্রি মোটরকার, ফ্রি পার্সোনাল চাকর। তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের চাকরি, আখের অনেক ভাল। থেকে গেলাম। এক হিসেবে ভালই হল, কারণ ঠিক তার পরই এলেন প্রিন্স অব ওয়েলস্‌। ও মশাই, থপ্‌ করে কি একটা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। দেশলাই এনেছেন তো?"

"এনেছি, জ্বালাচ্ছি—"

গোবর্ধনবাবু দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছিলেন। ভিজে গিয়েছিল, সহজে জ্বলে না। খস খস শব্দে হতে লাগল কেবল। অবশেষে একটা কাঠি জ্বলল, ভজুয়াদের লণ্ঠনটা তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু গেরুয়াধারীর ঘাড়ে কি লাফিয়ে পড়েছে সেটা বোঝা গেল না। অনেক চেষ্টা করে লণ্ঠনটা জ্বালা হল শেষকালে। তারপর আবিষ্কৃত হল কোণে একটা কোলা ব্যাং বসে রয়েছে। বড় বড় চোখ বার করে চেয়ে রয়েছে গেরুয়াধারীর দিকে একদৃষ্টে। গোবর্ধনের মনে হল যেন অবাক হয়ে গেছে গেরুয়াধারীকে দেখে। যেন বলতে চাইছে লাট বেলাটের সঙ্গে যার দিন কেটেছে সে এখানে কেন!

"বাবু, বাবু—"

দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে এক নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

"কে, ভজুয়ার বউ?"

"জি, হাঁ।"

"কি?"

কোন উত্তর দেয় না। গোবর্ধন আলোটা তুলে ধরলেন। মুখে আলো পড়তেই মুচকি হাসল ভজুয়ার বউ, তারপর ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে। দেখা গেল তার হাতে একটা ডালার মতো কি রয়েছে।

"কি ওতে?"

ক্ষীণ লজ্জিত কণ্ঠে যা বললে তার থেকে বোঝা গেল কিছু খাবার এনেছে।

"নিয়ে আয় দেখি—"

খুলে দেখা গেল অনেকখানি মালাই, কয়েকটা কলা এবং কিছু সন্দেশ এনেছে সে। আর একটা ছোট্ট ঘটিতে দুধ আর ছোট্ট একটা নতুন সরা।

গোবর্ধন বলেন, "মালাই এনেছিস আবার দুধ কেন?"

গেরুয়াধারী বললেন, 'দুধ আমার পেটে সহ্যও হয় না। ক্ষীর, মালাই সহ্য হয় কিন্তু এমনি জোলো দুধ হয় না। এ এক আশ্চর্য রহস্য।"

ভজুয়ার বউ এর উত্তরে মৃদুকণ্ঠে যা বললে তাতে শিউরে উঠতে হল দুজনকেই। ও দুধ আর কলা এনেছে পীরবাবার সাপের জন্যে। বললে রোজ রাত্রে ও সাপকে দুধ কলা দিয়ে যায়। ব্যাংও ধরে দিয়ে যায়। কাল একটা বড় ব্যাং ধরে গর্তে পুরে দিয়েছিল।

"সাপকে এরকম আশকারা দেওয়া কেন!" বলে উঠলেন গেরুয়াধারী।

ভজুয়ার বউ বললে, "পীরবাবা খুব জাগ্রত। তাঁরই গা ঘেঁষে তাই যাত্রীর ঘর বানিয়েছি আমরা। পীরবাবা কোনও অনিষ্ট করেন নি তাদের। ভালই করেছে। আর ওই সরপ্ (সর্প) মহারাজও এই কবরের আশে-পাশে বরাবর আছেন। কারও কোনও অনিষ্ট করেন নি, তাই আমরা ওকে খেতে দি——।"

গেরুয়াধারীর কানের পাশ দিয়ে লাফিয়ে ব্যাংটা ঘরের এক কোণ থেকে ও কোণে চলে গেল।

ভজুয়ার বউ বললে,—"এই যে সেই ব্যাংটা। এখনও খায়নি ওটাকে। বড় ভাল সাঁপ, খুব শুধ্ধা।"

গেরুয়াধারী বললেন—"এ তো বড় ভয়ঙ্কর সিচুয়েশনে পড়া গেল মশাই!"

"কুছ্ ডর নেই সাধু বাবা।"

সাহস দিলে ভজুয়ার বউ।

গোবর্ধন বললেন, "যা হবার হবে। আপাতত তো দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।"

গোবর্ধন আর গেরুয়াধারী দুজনেই ভূরিভোজন করলেন। মালাই অনেকখানি ছিল। সন্দেশও কম ছিল না।

"ভজুয়া ফিরেছে?"

জিজ্ঞেস করলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ। আমি না গেলে ফিরত না। কালালিতে হাল্লা করছিল। আপনার জন্যে একটা হুক্কাও এনেছি। দোকানদার দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল। দোকান খুলিয়ে নিয়ে এলাম। তামাক খেতে না পেলে কি রকম কষ্ট হয় তা তো জানি! আমি এখানেই তামাক হুঁকো বোড়শি সব দিয়ে যাচ্ছি। জলটা একটু ধরেছে—।"

গোবর্ধন বললেন, "এ ঘরের তো চারদিকেই চুঁইছে। তোর ঘর কেমন?"

"আমার ঘরেরও ওই হাল (অবস্থা)। পিয়ক্কড় (মাতাল) লোককে নিয়ে ঘর করি, ও কি কিছু দেখে!"

"সাধুবাবার থলিটা ভিজে যাচ্ছে—"

"আচ্ছা, ওটা আমাকে দিন, আমার সিন্দুকে রেখে দিচ্ছি গিয়ে।"

"বেশ, সেই ভালো। ওতে দরকারি একটা চিঠি আছে। ভিজে গেলে লেখাটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

গেরুয়াধারী তার থলিটা দিয়ে দিলেন ভজুয়ার বউকে। নস্যির ডিবেটা বার করে রাখলেন শুধু। ভজুয়ার বউ যাবার আগে দুধে কলাটা চট্‌কে পাকা দেওয়ালের এক কোণে রেখে গেল।

সে চলে যাবার পর গেরুয়াধারী এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বললেন, "ওয়াণ্ডারফুল। আজ এই অশিক্ষিতা বিহারী গ্রাম্যবধূর যে পরিচয় পেলাম তা অপূর্ব। এরই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে! সে কথা পরে বলব। আমরা এদের হতশ্রদ্ধা করে ওই হারামজাদীদের নকল করি। তাই আমাদের এই দুর্দশা। বেশ্যা আর লুচ্চায় দেশ ভরে গেল!"

গোবর্ধন বললেন—"মানুষের পশুত্ব তা সহজে যেতে চায় না—"

"চায় না তা মানি। কিন্তু পশুত্ব নিয়ে আস্ফালন, পশুত্বের পূজা এখন যতটা হয়েছে আগে ততটা ছিল না।"

একটু পরেই ভজুয়ার বউ নতুন হুঁকোয় এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর নিয়ে এল কিছু তামাক আর কাঠকয়লা। তারপর একটা মাটির বোড়শিও দিয়ে গেল। বিহার অঞ্চলে এ জিনিসটার খব চলন গরীবদের ঘরে। এতে আগুন থাকে। একটি ছোট লোহার চিমটেও নিয়ে এসেছিল সে। সব গুছিয়ে দিয়ে বললে, "আমি এবার চললাম। ওকে খাওয়াই গে—"

"ভজুয়া কি করছে?"

"কি আর করবে. পড়ে আছে মড়ার মতো।"

মুচ্‌কি হেসে চলে গেল ভজুয়ার বউ।

হুঁকোয় একটা টান দিয়ে গোবর্ধন বললেন, "এবার বেশ জমেছে। নিন এবার শুরু করুন আপনার জীবন-কাহিনী। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার।"

"হয়েছে। কিন্তু তাতে আমার কৃতিত্ব আছে বলে মনে করি না। ওই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্য টিকি ধরে আমাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানেই আমি গেছি।"

"তাবপর কি হল বলুন—"

"আমি তো ওই গভর্ণমেণ্ট হাউসের চাকরিতে রয়ে গেলাম। তারপরই নতুন হিড়িক — প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ভারত ভ্রমণে আসছেন। বিহারে সাতদিন থাকবেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসেই থাকবেন। থাকলেনও তাই। গভর্ণর তাঁকে পুরো গভর্ণমেণ্ট হাউসটি ছেড়ে দিয়ে নিজে টেণ্টে গিয়ে রইলেন।"

"প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ মানে?"

"যিনি এড্‌ওয়ার্ড দি এইট্‌থ হয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরে মিসেস্ সিম্পসনকে বিয়ে করে সে সিংহাসন ত্যাগ করেন—যিনি এখন ডিউক অব উইণ্ডসর নামে পরিচিত। তিনিই—"

"ও। তারপর?"

"তাঁর আসবার খবর আসতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল গভর্ণমেণ্ট হাউসে। শুধু গভর্ণমেণ্ট হাউসে নয়, সারা দেশময়। তাঁকে দেশের নেতারা অভ্যর্থনা করেন নি, ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসে কিন্তু অভ্যর্থনার চূড়ান্ত আয়োজন করতে হল। মিস্টার ব্রেট আমাকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন নতুন জিনিসপত্র কিনতে। রাজপুত্র স্বয়ং আসছেন তাঁর জন্যে সব নতুন জিনিস চাই। মানি ইজ্ নো কোশ্চেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসকে রিজুভিনেট করতে হবে। চলে গেলাম কোলকাতায়। নতুন কাট্‌লারি, নতুন পর্দা, নতুন কার্পেট, নতুন বিছানা—আরও সব নানা রকম নতুন জিনিস কিনলাম আর্মি নেভি স্টোর্স এবং আরও অনেক বড় বড় দোকান থেকে। ছিলাম গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। প্রায় লাখ খানেক টাকা খরচ হল আমার হাত দিয়ে। কর্তারা আমার কাজের খুব তারিফ করলেন। পাঁচ হাজার টাকার একটি 'চেক্' পেলাম বকশিশ হিসাবে। আর্মি নেভি স্টোরের কর্তাও আমাকে একটি হাজার টাকার বেয়ারার 'চেক্' অফার করেছিলেন, কিন্তু আমি সেটি নিই নি। ব্রেট সাহেব আমার অনেস্টি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।"

গোবর্ধন সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন—"আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি অনেস্ট লোক।"

"তাই না কি! কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যা চকচক করে তা-ই সোনা নয়! সোনার শেষ বিচার কষ্টিপাথরে—"

"যাক ও কথা। তারপর কি হল বলুন—"

"তারপর নির্দিষ্ট দিনে এসে পড়লেন হিজ রয়াল হাইনেস। আমরা তাঁর জন্যে প্রস্তুতই ছিলাম। যদিও বাইরে সব 'বয়কট্' চলছিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট হাউসে সাড়ম্বরে স্টেট ডিনারের বন্দোবস্ত হল। এখন স্টেট ডিনারের নিয়ম হচ্ছে রাজার পাশে রানী থাকবে। কিন্তু প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ অবিবাহিত, তাই তাঁর জন্যে একটি অ্যাক্‌টিং রানীও ঠিক করতে হল। এক বড় অফিসারের একটি সুন্দরী পালিতা কন্যা ছিলেন, তাঁকে রানীর পদে বরণ করা হল। তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন ভজুয়ার বউকে দেখে তার কথাই তার মনে হচ্ছিল। সাত দিনের জন্য রাজপুত্রের স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার হয়ে এলেন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুজন স্পেশাল চীফ কনেস্টবল, তাছাড়া পার্সোনাল A D C , পার্সোনাল সেক্রেটারি, পার্সোনাল মোটর ড্রাইভার, স্পেশ্যাল ভ্যালেটস্। দস্তুর-মতো রাজকীয় আড়ম্বরে এলেন রাজপুত্র। সমস্ত ভারতবর্ষের সি. আই. ডি. অফিসাররা, বিহার পুলিশের আই. জি., ডি. আই. জি., এস. পি., ডি. এস. পি. আর ইন্‌স্পেকটররা সবাই চাপরাশি উর্দি পরে পাহারা দিতে লাগলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউস সরগরম হয়ে উঠল—"

গোবর্ধন বললেন, "আমাদের গরীব গৃহস্থদের ঘর সরগরম হয়ে ওঠে বিয়ে-টিয়ে হলে। যাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় তাদের বাড়িও সেই সময় গমগম করে—"

"ঠিক বলেছেন, এ-ও অনেকটা সেই রকম। তবে বিয়েবাড়িতে বা দুর্গাপুজোতে যে আনন্দ হয় সে আনন্দটা এখানেই নেই। সব যেন চুপ-চাপ, নিস্তব্ধ। স্টেস্ট ডিনার হচ্ছে, কিন্তু আনন্দ-কলরব নেই, ফিসফিস কথা, মাঝে মাঝে ছোট্ট মেকি হাসি, আর কাঁটা চামচের শব্দ—ব্যস্—"

"আমাদের দেশের বাড়িতে একবার দুর্গাপুজো হয়েছিল, কি যে আনন্দ হয়েছিল! গ্রামের

সব গরীব দুঃখীদের বাবা খাইয়েছিলেন আর একখানা করে কাপড় দিয়েছিলেন। কি দিন ছিল! আজ আমাদের নিজেদের কাপড় কেনবার পয়সা নেই—"

"সবই টিকির টানের ব্যাপার। তাঁর যদি মর্জি হয়, তবে সব হবে আবার।"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। বলুন, তারপর কি হল—"

"হিজ্ রয়াল হাইনেস যে কদিন রইলেন সে কদিন খুব সরগরম ছিল গভর্ণমেণ্ট হাউস। তারপর চলে গেলেন তিনি। যাবার সময় আমাকে একটা সোনার সিগারেট কেস দিয়ে গিয়েছিলেন, আর শেকহ্যাণ্ড করে বলেছিলেন—Remember me when you wish আমার সেবায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। জিগ্যেসও করেছিলেন আমি কি চাই। উত্তরে আমি বলেছিলাম, কিছু না। যদি বলতাম—আমাকে কোথাও District Magistrate করে দিন তাও দিতেন বোধ হয়। কিন্তু আমার তখন সাংসারিক বুদ্ধি কিছু হয় নি। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ চলে যাবার পর যিনি পার্মানেণ্ট গভর্ণর হবেন তিনি এলেন। তিনি সব নিজের স্টাফ নিয়ে এলেন। নতুন A.D.C., নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারি এল। ব্রেট্ সাহেব গয়াতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেলেন। হ্যাসকেট্ সাহেব চলে গেলেন বিলেতে। আমি অভিভাবকহীন হয়ে একটু অসুবিধায় পড়লাম। ব্রেট সাহেব আমাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি পুলিশে ঢোক। তাঁরই রেকমেণ্ডেশন পেয়ে অবশেষে নমিনেশন পেলাম। ট্রেনিং নিতে গেলাম হাজারিবাগে। জীবনে আবার নতুন পর্ব আরম্ভ হল। অদৃশ্য হস্তটি আমার অদৃশ্য টিকি ধরে আবার আমাকে নতুন জায়গায় নিয়ে এলেন।"

"আমিও পুলিশে ঢোকবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। পুলিশ হলেই যে মন্দ হবে এমন কি কথা আছে। আমাদের সীতারামবাবু দারোগা দেবতুল্য লোক ছিলেন।"

"দেবতুল্য লোক যে দৈত্যদের মধ্যেও আছে এ কথা তো আমাদের পুরাণেই আছে। শেষনাগ, প্রহ্লাদ এরা তো দৈত্যকুলের লোক।"

"আপনার পুলিশ লাইন কেমন লাগল?"

"চাকরি, চাকরি! ওর আবার লাগালাগি কি আছে। মনিবকে খুশি রেখে যতটা পার নিজের কোলের দিকে ঝোল টান, এই হল মন্ত্র। এই ভাবে কাটল কিছুদিন। বেশ কিছুদিন। কয়েক বছরের কথা বাদ দিয়েই যাচ্ছি, কারণ বলবার মতো কোনও ইণ্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেনি ও ক' বছরে। কেবল দিনগত পাপক্ষয়—"

"দারোগাদের জীবনে তো অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে শুনেছি। আপনার জীবনেও নিশ্চয় ঘটেছে দু'একটা। তাই শুনি না—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"রোমাঞ্চকর ঘটনা? তা ঘটেছে বইকি। আচ্ছা একটা ঘটনা বলি। এর থেকে বুঝতে পারবেন কি ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে আমাকে। আমি তখন ছাপরা জেলার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টার হয়ে কাজ করছি। এমন সময় একদিন এক সি. আই. ডি. এলেন। তাঁর নামটা আর করব না, ধরুন ইন্দ্রবাবু। তিনি এলেন একটা নোট জাল কেসের মাল-মসলা নিয়ে। তিনি ওই নোট জালের আখড়া কোথায় তা আন্দাজ করেছেন, কিন্তু প্রমাণের অভাবে হাতে-নাতে তাদের ধরতে পারছেন না। তিনি আমাকে তাঁর সহকারী রূপে নির্বাচন করলেন অতীব গোপনে। তিনি গিয়ে এস. পি.-কে

অনুরোধ করলেন যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে ডেপিউট (depute) করা হয়। এস. পি. রাজী হলেন, আমিও রাজী হলাম। তখন খাতায় পত্রে পুলিশের সার্ভিস থেকে আমাকে লোপাট করে দেওয়া হল। গেজেটে ছাপা হয়ে গেল যে আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। এর কারণ পরে জানবেন, আমারই হিতার্থে করা হল এটা। আমার বাড়িতে গিয়ে বলা হল যে খবরটা গেজেটে বেরিয়েছে। আমার চাকরি যায় নি, ঠিকই আছে। পুলিশ আপিস থেকে পুলিশের লোক এসে আমার স্ত্রীর হাতে মাইনে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। তবে ব্যাপারটা যেন কিছুতেই জানাজানি না হয়, কারণ এটা একটা টপ্ সিক্রেট। পাবলিক জানবে আমি আর পুলিশে চাকরি করছি না। এই বন্দোবস্ত হবার পর আমি আর ইন্দ্রবাবু একদিন বস্তি অভিমুখে যাত্রা করলাম। বলা বাহুল্য ছদ্মবেশে। ওখানে পৌঁছে ইন্দ্রবাবু আমাকে যা নির্দেশ দিলেন তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। বললেন—"এখান থেকে সোজা উত্তরে চলে যাও। দিঘ্‌ওয়ারা গ্রামে পৌঁছবে। সেখান থেকে দক্ষিণমুখে চলতে হবে। রাস্তায় ভোল বদলে ফেলতে হবে একেবারে। কামাতে পাবে না, খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি গজানো চাই। তোমার লম্বা চুল কেটে ছোট ছোট করে ফেলে একটি টিকি রাখবে। চুলে তেল দিও না, উস্কখুস্ক হওয়া চাই। বাঁ চোখটি ঈষৎ বুজে থাকবে, দাঁতে মিশি দেবে। গায়ে জামা থাকবে না, কাপড়টি হবে ময়লা এবং ছেঁড়া। অর্থাৎ একটি আস্ত উজবুক পাড়াগেঁয়ে ভূত সাজতে হবে তোমাকে। দিঘ্‌ওয়ারা থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণ-মুখো চলে একটি বটগাছ দেখতে পাবে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে দেখতে পাবে একটি প্রকাণ্ড মাঠ। সেই দিকে গুটিগুটি এগুবে। একটু পরেই দেখতে পাবে প্রকাণ্ড একটি আউট হাউস রয়েছে, খড় দিয়ে ছাওয়া। তারই আশপাশে ক্যাবলার মতো ঘোরাফেরা করতে থাকবে। তারপর সবই অনিশ্চিত। ভগবান যা করেন তাই হবে। তোমায় একটি কাজ রোজ করতে হবে। ওখানে যা দেখবে বা শুনবে তা প্রতি বৃহস্পতিবার কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখে যেমন করে পার রাত বারোটার পর তিন মাইল পশ্চিমে যে পুকুরটা আছে তার তীরবর্তী তালগাছের পাশে যাবে। সেখানে দেখবে নুড়ি-দিয়ে-চাপা-দেওয়া আর একটা কাগজ রয়েছে। সেই দুটো কাগজ নিয়ে আরও দু মাইল গিয়ে পোস্ট আপিসে—Crime assistant to D.I.G., C.I.D.—ঠিকানায় বেয়ারিং পোস্ট করে দেবে until further orders."—এই ভয়ঙ্কর নির্দেশ দিয়ে ইন্দ্রবাবু চলে গেলেন। আমিও রওনা হলাম। যথাসময়ে সেই বটবৃক্ষ আর খোড়ো আউট-হাউসের সাক্ষাৎ পেলাম। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে এল। আমি সেই খোড়ো চালাটার কাছে এগিয়ে গেলাম আর একটু, তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। গা-টা ছমছম করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটি আলোর রেখা একটা ঘর থেকে বেরুচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখলাম একটা ঘোড়াও সেই ঘরে রয়েছে। কি করব ভাবছি এমন সময় গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনলাম—"কৌন হ্যায়রে শালা!" আমি তো অবাক। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের মতো একটা লোক বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসেই বলল, "তু শালা হিঁয়া কি কবত্‌বানি?" —বলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে প্রচণ্ড চড় মারলে একটা। টাল খেয়ে পড়ে গেলাম এবং পুলিশে চাকরি করার যে কি অপরিসীম আনন্দ তা তৎক্ষণাৎ অনুভব করলাম। তারপর উঠে হাতজোড় করে করুণ কণ্ঠে বললাম—"জী অন্‌দাতা, ম্যয় ভিখারী ছি, নোকরি ঢুঁড়েইছি। তিনদিন কুছু না খাইলবানি"—বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। থিয়েটার করা

অভ্যাস ছিল তো, পার্টটা বেশ জমিয়ে ফেললাম। ডাকাত ব্যাটার প্রাণেও করুণার সঞ্চার হল। বললে—"ঘোড়াকা কাম জানতানি? সহিস রে শালা।" বললাম, "হাঁ হুজুর।" চাকরিটি হল। আমার কাজ-হল একটি ছোট সাদা নেপালী ঘোড়ার ঘাস কাটা, ডলাই মলাই করা আর রোজ বিকেলে তাকে একটি খুঁটিতে বেঁধে চক্র-দৌড় করানো। আমার শোবার জায়গা হল ওই আস্তাবলেই। ঘোড়ার মুত আর লিদ্দির উপর। মনিব একটি ছেঁড়া বিরাটগঞ্জের কম্বল দিলেন। সেইটিই আমার সম্বল হল। ভাঙা মাটির সানকিতে লাল মোটা চালের ভাত দিত। ভাত ছাড়া তাতে থাকত প্রচুর কাঁকর আর ধান। তাই খুব মিষ্টি লাগত, কারণ হাঙ্গারের সস-টি ছিল। সমস্ত দিনে ওই একটিবার মাত্র খাওয়া জুটত তিনটে আন্দাজ। আস্তাবলটা আমি যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখতাম। 'লিদ্দী' বেশী জমতে দিতাম না। তাই বেশী গন্ধও হত না, মাছিও হত না। কিরকম মাছি শুনবেন, বিরাট বড় গো-মাছি। রামমাছি বললে আরও ঠিক হয়। ঘোড়াদের শত্রু। সর্বাঙ্গে ঘা করে দেয়। আমি আস্তাবলটা পরিষ্কার রাখাতে মাছির উপদ্রব কমল। আমিও বাঁচলুম, ঘোড়াটাও বাঁচল। সুযোগ পেলে মাছি মারতুমও। মেরেই প্রায় নির্মূল করেছিলুম। এই সব দেখে ঘোড়ার মালিক একটু সদয় হলেন আমার প্রতি। ঘোড়ার চেহারা দেখে খুশী হলেন। ভাতের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু আচার দিতে লাগলেন।"

গোবর্ধন বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে যেন শার্লক হোম্‌স্‌-এর গল্প পড়ছি। তারপর?"

"আমার কাছে ক্যালেণ্ডার ছিল না। দেওয়ালে একটি করে দাগ কেটে রাখতাম কবে বৃহস্পতিবার ঠিক করার জন্যে। প্রতি বৃহস্পতিবারে গভীর রাত্রে শুধু পায়ে হেঁটে কম্বল জড়িয়ে তিনটি মাইল পথ অতিক্রম করে সেই পুকুরধারে গিয়ে পৌঁছতাম আর সেই তালগাছের আশে-পাশে হাতড়াতাম নুড়ি-চাপা-দেওয়া কোনও কাগজ আছে কি না। সেখানে সাপ বিছে কাঁটা, বড় বড় মশা সবই ছিল, ভগবান আমাকে রক্ষা করতেন। প্রতিবারই কাগজ পেতাম এবং সেটা গিয়ে নির্দেশমতো পোস্ট করে দিতাম দুমাইল দূরের সেই পোস্টাফিসে। আমি নিজেও কিছু কাগজ আর পেন্সিল লুকিয়ে যোগাড় করেছিলাম। আমার রিপোর্টও সেই সঙ্গে পাঠাতাম as ordered by Indra Babu. চিঠি পোস্ট করে ওই পাঁচ মাইল পথ আবার হেঁটে ফিরে আসতাম নগ্নপদে ও নগ্নগাত্রে কম্বল জড়িয়ে। ফিরে এসেই শুয়ে পড়তাম। সকালে উঠে ঘোড়ার ডলাই মলাই তারপর ঘাস কাটা।.....

আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। ওই খোড়ো ঘরটার সামনে একটা ইঁদারা ছিল আর সেই ইঁদারার ধারে ছিল কিছু ফুলগাছের ঝোপ-ঝাপ। তার মধ্যে ছিল একটা পাথরের চৌতারা গোছের। ওই ডাকাতের মতো লোকটা তার উপর প্রায় সমস্ত দিন বসে থাকত। কখনও রুটি বানাচ্ছে, কখনও ডন করছে, কখনও খাটিয়া বিছিয়ে শুয়ে আর একটা লোককে দিয়ে গা হাত-পা টেপাচ্ছে। আমি যা যা দেখতাম প্রতি বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিতাম। এইভাবে চলল প্রায় চৌদ্দ সপ্তাহের খেল। তারপর একদিন খুব ভোরে যবনিকা উঠল। দেখি এক বিরাট পুলিশ বাহিনী সমস্ত মাঠটা ঘিরে ফেলেছে। রাত্রেই ঘিরেছে। ভোর না হতেই প্রায় পঁচিশটি মিলিটারি পুলিশ বন্দুক নিয়ে এগিয়ে এল, সঙ্গে তাদের স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ, তাঁর হাতেও রিভলভার। তারা এগিয়ে গেল ইঁদারাটার দিকে। তারপর সেটাকে ঘিরে ফেললে। তারপর সেই চৌতারাটার পাথর তুলে সরিয়ে দিলে দূরে। প্রকাণ্ড একটা টানেল বেরিয়ে পড়ল।"

"টানেল?"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ মশাই টানেল। বিরাট টানেল—"

"তারপর?"

'টানেলে ঢুকে পড়ল সবাই। পুলিশ সাহেবসুদ্ধ—। দুম্ করে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর সব চুপচাপ। একটু পরে বারোটি লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে বেরুলেন তাঁরা। সবিস্ময়ে দেখলাম অ্যারেস্টেড লোকেদের মধ্যে ইন্দ্রবাবুও রয়েছেন। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। ইন্দ্রবাবু ছদ্মবেশে ওদের বিশ্বাস উৎপাদন করে ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। তিনিই তালগাছের নীচে গুপ্তখবর লিখে রেখে আসতেন প্রতি বৃহস্পতিবারে। আর আমি সেটা পোস্ট করে আসতাম। টানেলের ভিতর একটু খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। এস. পি. একটি লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন, আর ওরা গড়াশা দিয়ে একটি পুলিশের একটি হাত কেটে দিয়েছিল। সেই নিহত ব্যক্তি এবং আহত পুলিশটিকে পুলিশ ভ্যানে চড়ানো হল। নোট জাল করবার সব জার্মান-মেড যন্ত্রপাতিও ধরা পড়ল। শুধু তাই নয়, নোট ছাপাবার কাগজ, একশ টাকা আর দশটাকার অনেক ছাপা নোটও পাওয়া গেল। বামালসুদ্ধ ধরা পড়লেন জালিয়াত মহেন্দর মিশির দলবল সমেত। আমি অ্যারেস্টেড হলাম। আমাকে আর অন্য বারোজন আসামীকে স্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। বারো মাইল রাস্তা। আর সে কি রাস্তা! তাছাড়া পুলিশদের অকথ্য অত্যাচার, গালাগালি আর মার। প্রস্রাব করতে বসলেও মারছে। পুলিশদের ব্যবহারে বেশ জখম হলাম মনে মনে। আমার সেই ঈষৎ-বোজা চোখ আরও বুজে গেল, ঝোলা-ঠোঁট আরও ঝুলে পড়ল। অবশেষে ছাপরা জেলে গিয়ে হাজির হলাম এবং ঢুকলাম একটা সেলে। প্রত্যেকেরই আলাদা সেল। কারও সঙ্গে কথা বলবার জো নেই। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন।"

"তারপর?"

"কি আর করব? বসে রইলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। এক-একবার সন্দেহ হতে লাগল গভর্ণমেন্ট কি আমার কথা ভুলে গেল? তা না হলে একি ব্যাপার! যার জন্যে চুরি করে সেই বলে চোর! মনের মধ্যে হতাশার অন্ধকার ঘনীভূত হতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই ভগবান প্রসন্ন হলেন। গভীর রাত্রে অন্ধকার দূর করে সূর্য উঠল। মানে, আমার পূর্ব-পরিচিত জেলারবাবু একটি টিফিন-কেরিয়ার আর ফ্লাস্ক হাতে করে আমার সেলে ঢুকলেন। টিফিন-কেরিয়ারে মাখন, পাঁউরুটি আর ডিম, ফ্লাস্কে গরম চা। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। অনেকদিন পরে ভদ্র-খাওয়া খেয়ে বাঁচলাম। জেলারবাবু বললেন, কোনও ভয় নেই। আমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার লোক-দেখানো, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার খাবার জেলারবাবু রোজ দিয়ে যাবেন। এস. পি. নিজে এই নির্দেশ দিয়েছেন। ইন্দ্রবাবুও আলাদা একটা সেলে আছেন এবং তাঁকেও জেলারবাবু চা-পাঁউরুটি খাইয়ে এসেছেন। এস. পি. বলেছেন আমি যেন আমার চোখটা আধবোজা করে রাখি। অন্তত যখন কোর্টে দাঁড়াব তখন যেন চোখটা ওইরকমই থাকে। পরদিনই ছাপরা কোর্টে আমাদের হাজির করা হল। খালি পা, শুধু গা, লম্বা গোঁফ দাড়ি, মাথার লম্বা চুলে জটা। ভারি লজ্জা করছিল, মনে হচ্ছিল ওই বুঝি কেউ চিনে ফেলল। সেখানে বাঙালীদের মধ্যে আমি খুব পপুলার ছিলাম তো, কালীবাড়িতে 'সীতা' প্লেতে রাম সেজে প্রভূত খ্যাতি ও একটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলাম। আমি হাঁটবার সময় মাথা হেঁট করে প্রায় দু চোখ বুজেই চলছিলাম, খরগোশরা যেমন বিপদে পড়লে চোখ বুজে একজায়গায় বসে

পড়ে—আমারও মনোভাব অনেকটা তেমনি হল। এস. ডি. ও. সাহেবের কোর্টে হাজির হলাম। সেখানে গভর্ণমেন্ট প্লীডার এবং কোর্ট-সাবইন্সপেক্টার দরখাস্ত করলেন যে আমরা গভর্ণমেন্ট অ্যাপ্রুভার হয়েছি, আমাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছাড়া পেয়ে গেলাম। তারপর দিনই ভোলও বদলে ফেললাম। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে, চুল ছেঁটে সাবান দিয়ে স্নান করে পূর্ব্ববৎ হয়ে গেলাম আবার। আধ-বোজা চোখ আর আধ-বোজা রইল না, পুরো খুলে গেল। তার পরদিন থেকে পুলিশের পোশাক পরে পুলিশের কাজ করতে লেগে গেলাম। এমন কি ওদের ট্রায়াল দেখতেও যেতাম। মহেন্দ্র মিশির আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আমাকে আর ইন্দ্রবাবুকে আর চিনতেই পারল না। তাদের চক্ষে আমরা লোপাট হয়ে গেলাম। যথানিয়মে বিচার হল তাদের এবং যথাকালে জেল হয়ে গেল সব ক'টার। আমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হল এবং যাতে আমি ইন্সপেক্টার হতে পারি তার জন্যে রেকমেণ্ড করা হল। ইন্দ্রবাবু ডি. এস. পি. হলেন এবং দু হাজার টাকা পুরস্কার পেলেন। তিনি যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অসাধারণ—"

গেরুয়াধারী চুপ করলেন।

বাইরের ঝড়টা প্রবল হয়ে উঠল আবার! গঙ্গার পাড়-ভাঙার শব্দটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গোবর্ধন বললেন—"আপনার অভিজ্ঞতাটাও অসাধারণ।"

গেরুয়াধারী মৃদু হাসলেন।

"আপনাদের কাছে যেটা অসাধারণ মনে হয় আমাদের কাছে সেটাই সাধারণ। ওই আমাদের জীবন। তবে একটা কথা বলব, এ জীবনে যেমন মন্দও দেখেছি তেমনি ভালও দেখেছি অনেক। পঙ্ক আছে কিন্তু পঙ্কজও দেখা যায় মাঝে মাঝে দু'একটা।"

"তাই নাকি! শোনান না তাদের কথা। আপনি না থাকলে কি করে যে এই দুর্যোগের রাত্রি কাটত কে জানে। গল্পের নৌকায় চড়ে যেন উদ্দাম পদ্মা অতি সহজে পার হয়ে যাচ্ছি।"

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরুয়াধারী।

"আপনি কবি লোক দেখছি—"

তারপর চুপ করে ভাবলেন একটু। তারপর বললেন,—"আচ্ছা শুনুন তবে। দুটো ঘটনা মনে পড়েছে। প্রথমটা পঙ্কের, দ্বিতীয়টা পঙ্কজের। প্রথমটা আগে শুনুন। তখন আমি কটকে ডি. আই. জি'র সঙ্গে আছি। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম, ফিরে যাচ্ছি। সাদা পোশাকেই স্টেশনে এসেছি, কোমরে অবশ্য রিভলভার বাঁধা ছিল। পুরী এক্স্প্রেস তখন রাত আটটা কুড়ি মিনিটে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ত। আমি আমার কম্পার্টমেণ্টটির সামনে দাঁড়িয়ে নস্যি নিচ্ছি এমন সময় একটি সুন্দরী মেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। রীতিমতো সুন্দরী, তাছাড়া ঠোঁটে রং, গালে রং, চোখে কাজল। মুখেচোখে একটা উতলা অসহায় ভাব। মাথার আঁচল আর বুকের কাপড় বারবার খুলে খুলে পড়ছে। এসে কমনীয় কণ্ঠে বললেন,—"আমাকে একটু সাহায্য করবেন? বড় বিপদে পড়েছি।" জিগ্যেস করলাম,—"কি করতে পারি বলুন।" তিনি বললেন যে কটকের আদালতে কালই আমার একটা জরুরি মকদ্দমা আছে। সেইজন্যে কটক যাচ্ছি। কিন্তু এখানে হঠাৎ আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা চুরি হয়ে গেল। তাতে আমার টিকিট টাকাকড়ি সব আছে। আপনি দয়া করে আমাকে কটক পর্যন্ত পৌঁছে দিন।" হেসে উত্তর দিলাম, "মাফ করবেন, আমি পারব না।" শুনে সরে গেলেন তিনি। সঙ্গে

সঙ্গে ট্রেনটাও ছাড়ল। আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাশের খালি কামরায় উঠে পড়লুম। ওমা, দেখি মেয়েটাও উঠেছে আমার পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে একটা গণ্ডামার্ক গুণ্ডা গোছের ছোকরা ট্রেনের ফুটবোর্ডে উঠে হাতল ধরে দাঁড়াল। ট্রেন ইতিমধ্যে 'স্পীড্' নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়েছে। গুণ্ডাটাও ঢুকল কামরার ভিতরে এবং মেয়েটা তাকে দেখে বলে উঠল—'আরে, তুমি এখানে!' লোকটি ভুরু আর চোখের ইশারায় মানা করল তাকে কোন কথা বলতে। আমি বুঝলাম ব্যাপার সুবিধের নয়, গড়বড় আছে কিছু। ট্রেন তখন ফুল স্পীডে চলেছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলাম একটি—"আমি পুলিশের লোক, সঙ্গে লোডেড রিভলভার আছে। বাড়াবাড়ি করলে নিজেরাই বিপদে পড়বেন।" একথা শুনে দুজনেই নির্বাক হয়ে গেল। ট্রেন চলছে, খড়গ্‌পুরের আগে থামবে না। পাক্কা দেড়টি ঘণ্টা লাগবে খড়গ্‌পুর পৌঁছতে। তিনজনই নির্বাক হয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম সময়টা। ট্রেন খড়গ্‌পুর স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই তিনজন টি. টি. আই. উঠে পড়লেন আমাদের কামরায়। তিনজনই আমার খুব চেনা—মার্টিন, উইলিয়ামস্ আর মজুমদার তিনজনেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, হ্যালো, স্যানিয়েল কোথা চলেছ? বললাম, কটক। তারপর তাঁরা 'চেকিং' শুরু করলেন। মেয়েটির কাছে টিকিট চাইতেই তিনি কি বললেন জানেন? আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "উনি আমার স্বামী। ওঁর কাছে টিকিট আছে!" আমি শুনে বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম। মজুমদার আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন—"সত্যি না কি?"

আমার বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল। মনে একটু রসসঞ্চারও হল। বললাম, "আমার সাত পাকের বউ তো আমার বাড়িতে আছে। ইনি বোধহয় বিপাকের বউ হতে চাচ্ছেন!" হেসে উঠলেন মজুমদার। মার্টিন বাংলা জানেন না। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—What's the fun? বললাম, She poses to be my wife. It is a damn medacious lie ওদের দুজনের কারো কাছেই টিকিট ছিল না, পয়সাও ছিল না। তাদের পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে টি. টি. আই-রা অন্য গাড়িতে গিয়ে উঠল। বুঝুন ব্যাপারটা। পথে ঘাটে কত রকম বিপদেই যে পড়তে হয়। ভগবানই রক্ষা করেন সব।"

গেরুয়াধারী নীরব হলেন।

গোবর্ধন বললেন, "আমিও কখনও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাল্লায় পড়িনি। একবার ট্রেনে এক বাইজির সঙ্গে এক কামরায় গিয়েছিলাম কিছুদূর। আমি একধারে চুপ করে বসেছিলাম, সে-ও আমার দিকে নজর দেয়নি বিশেষ। এক দাড়িওলা মিঞাসাহেবের সঙ্গেই গল্প করছিল সারাক্ষণ।"

"আপনি কুনো লোক। সারাজীবন কেবল বাবার তামাক সেজেছেন। দুনিয়ার কোন খবর রেখেছেন কি? রাখেন নি বলেই গায়ে কাদা লাগে নি। আমাকে যে কাদা-ঘাঁটার চাকরিই করতে হয়েছে সারাজীবন। তবে মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে ভাল লোকও দেখেছি। পাঁকের গল্পটা তো শুনলেন, এবার পঙ্কজিনীর গল্পটা শুনুন।"

"বলুন—"

গল্পটি রোমাঞ্চকর। কলকাতায় গেছি এক বিয়ের ব্যাপারে। সঙ্গে প্রায় হাজার তিনেক টাকা। গিয়ে উঠলাম এক বন্ধুর বাড়িতে। টালিগঞ্জ ব্রীজের ওপারে তার বাড়ি। বন্ধুটির নাম দ্বিজেন পাল। পাল বলেই ডাকি তাকে। গিয়ে দেখলাম বন্ধুর স্ত্রী নেই, বাপের বাড়ি গেছে।

বড়ই বিক্ষিপ্তমনা তিনি। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে আমি একাই একটা ঘরে শুলাম। বন্ধু শুলেন আলাদা ঘরে। শোবার সময় চিরকাল লুঙ্গি পরে শুই। ব্যাগ থেকে একটি চেক-চেক মুসলমানী লুঙ্গি বার করে সেইটি পরে শুলাম। রাত চারটে আন্দাজ ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম বাইরে ভয়ানক হট্টগোল হচ্ছে। বাইরের বারান্দায় উঠে এসে দেখি রাস্তায় পিলপিল করছে লোক। মশাল জ্বলছে। লোকগুলোর মুখে মুখোশ। তাদের হাতে তলোয়ার, লাঠি আর গাড়াশা। বুঝলাম ডাকাত পড়েছে। মার মার শব্দে দরজা ভেঙে আশেপাশের লোকেদের বাড়ি ঢুকে যাচ্ছে। শিশুদের চিৎকার আর মেয়েদের আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হতে লাগল। বুঝলাম ঘরে ঘরে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে। আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে তিন হাজার টাকার নোটগুলো আমার কোটের পকেটে পুরে ফেললাম। তারপর খিল দিলাম দরজায়। বাক্সের তালাটা খুলে লাগিয়ে দিলাম দরজার কড়ায়। তারপর 'পাল' 'পাল' বলে চিৎকার করতে লাগলাম। সাড়া পেলাম না তার। শুনতে পেলাম গুণ্ডার দল মার মার শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমি একটা রুলের মতো হাতের কাছে পেলাম, সেইটে নিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলাম যদি পালাবার কোন পথ পাই। হঠাৎ নজরে পড়ল জানালার সামনে ওপর থেকে একটা পাকানো কাপড় ঝুলছে। জানলার গরাদ ছিল না। তড়াক করে সেই কাপড় বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় আমার ঘরের দরজা ভেঙে গেল। চার পাঁচজন লোক এসে আমায় ধরে ফেললে, তারপর চ্যাংদোলা করে ঘরের মধ্যে এনে চিৎ করে শুইয়ে দিলে। একটা লোক আমার বুকে চেপে বসল, চারটে লোক ধরে রইল আমার হাত পা। তারপর এগিয়ে এল একটা বিরাটকায় গুণ্ডা, তার হাতে মস্ত ছোরা। আর একটু দেরি হলে ছোরাটা বসিয়ে দিত আমার বুকে। কিন্তু বিপত্তারণ মধুসূদন রক্ষা করলেন। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটি স্ত্রীলোক আর উপুড় হয়ে পড়ল আমার উপর। বললে, "আগে আমায় মারো তারপর একে মেরো।" গুণ্ডাটা ওর হাত ধরে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিল ওকে। ইতিমধ্যে ঘটেছে আর এক কাণ্ড। একটা গুণ্ডা আমার কোটের পকেট থেকে নোটের তাড়া আবিষ্কার করে চিৎকার করে উঠল—টাকা, অনেক টাকা। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল আর নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেজেতে। তখন আমাকে ছেড়ে সবাই সেই নোট কুড়াতে লাগল। তিন হাজার টাকা, সব দশ টাকার নোট ছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই তার উপর। সেই স্ত্রীলোকটি সুযোগ পেয়ে তখন হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আমাকে বার করল ঘর থেকে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। আমার পরনে ছিল লুঙ্গি, সকলে ভাবলে আমিও মুসলমান। ডাকাতের দলটাই ছিল মুসলমানের। নিচে যারা ছিল তারা আমাকে কিছু বলল না। মেয়েটি আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হল একটা মাঠের মাঝখানে। তার উপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে বলল, "তোমার চেহারা ঠিক আমার ভায়ের চেহারার মতো। আমার সেই ভাই আর বেঁচে নেই। তুমি আমার নতুন ভাই। তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। তাই নিজের জান কবুল করে তোমাকে বাঁচিয়েছি। তুমি দৌড়ে পালাও এখান থেকে।" আমি জিগ্যেস করলাম, "তুমি কে!" সে বললে—"আমি ওই গুণ্ডাটার বউ যে তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। আমি সন্ধ্যে থেকেই এই বাড়ির ছাতে লুকিয়ে বসেছিলাম, আমিই ওদের বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছি। আমি যখন তোমাকে দেখলাম তখন ওরা ঢুকে

পড়েছে। তখন আমি ছাত থেকে একটা শাড়ি পাকিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম, যদি পালাতে পার। কিন্তু পারলে না। যাক—এখন পালাও।''

আমি লাইন বরাবর ছুটতে ছুটতে যাদবপুর স্টেশনে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্যোদয় হয়েছে। একবার ভাবলাম, থানায় খবর দি। কিন্তু তখনই মনে হল তাহলে বিশ বাঁও জলে পড়ে যাব। তাছাড়া পুলিশে খবর দিলে যদি ওই গুণ্ডার বউটাও ধরা পড়ে! যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে তাকে কি ধরিয়ে দেওয়া উচিত? সুতরাং ও আইডিয়া ছেড়ে দিলাম। গিয়ে উঠলাম আর এক বন্ধুর বাড়িতে লেকের ধারে। দিন পাঁচেক পরে খবর পেলাম পালকে ওরা কেটে ফেলেছে। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।''

চুপ করলেন গেরুয়াধারী।

গোবর্ধন বললেন, ''আপনার একটা জীবনে এত সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে এ যেন বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না!''

''এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। আমার জীবনটি একটি আশ্চর্য ঘটনার অভিধান বিশেষ। ঠিকই বলেছেন, বিশ্বাস করা কঠিন। সেজন্যে কারও কাছে বলিও না। আজ এই দুর্যোগের রাত্রে আপনাকে পেলাম, তাই সময় কাটাবার জন্য বললাম কয়েকটা—হয়তো অবিশ্বাস্য।''

গেরুয়াধারীর কণ্ঠে একটা অভিমানের সুর যেন ধ্বনিত হল।

গোবর্ধন বললেন, ''না, না আপনার কথা অবিশ্বাস আমি করি না। ফার ফ্রম ইট্। আরও কি ঘটনা ঘটেছে বলুন। অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছি—''

গেরুয়াধারী এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, ''আনন্দ পাচ্ছেন এইটেই পরম লাভ। আর আমারও পরম লাভ যে আপনার মতন সহৃদয় শ্রোতা পেয়েছি একজন। অনেক ঘাটের জল খেয়েছি তো। অনেক স্রোতে ভেসেছি। তাই অভিজ্ঞতাও নানারকম হয়েছে। শুনুন তাহলে আর একটা ঘটনা। এটাও আমার পুলিশ-জীবনেই ঘটেছিল। এ ঘটনা রূপান্তরিত করে দিয়েছিল আমার পরবর্তী জীবনকে।''

''বলুন, বলুন শুনি। তামাক সাজি দাঁড়ান আর এক কলকে—''

সোৎসাহে তামাক সাজতে লাগলেন গোবর্ধন। কলকেটি ধরিয়ে, হুঁকোর মাথায় বসিয়ে একটি লম্বা টান দিলেন। প্রচুর ধোঁয়া বেরুল।

''এইবার বলুন—''

''তখন আমি রেলের পুলিশে কাজ করি। সার্জেন্ট মেজর হয়েছি। ট্রেনে গার্ডের ডিউটি। কিউলে পাঞ্জাব মেলটা এসে দাঁড়িয়েছে। কোন একটা কম্পার্টমেণ্টে উঠব বলে ছুটোছুটি করছি। হঠাৎ সামনে একটা ফার্স্ট ক্লাসের দরজা খোলা পেয়ে উঠে পড়লাম তাতে। উঠে দেখি শালপ্রাংশু মহাভুজ এক ইংরেজ ভদ্রলোক একটি বেঞ্চির এক কোণে বসে নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়ছেন। ট্রেনটা যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল ততক্ষণ আমি বসে রইলাম। কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই ফুল মিলিটারি বাও করে বললাম—''একটি আইরিশের টিকিট নেবেন কি?''

সাহেব আমার হাত থেকে টিকিটের বইটি নিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর আমার হাতে সেটা ফেরত দিয়ে বললেন। 'সরি'। শুধু 'সরি' বলেই যদি থেমে যেতেন তাহলে ওইখানেই ব্যাপার চুকে যেত। কিন্তু তিনি আমাকে ধমকে উঠলেন।

বললেন, "আপনি পুলিশের ইউনিফর্ম পরে কি করে এই টিকিট বিক্রি করছেন? এটা বি allowed ? আমি আপনার নামে রিপোর্ট করব!"

আমিও দমবার ছেলে নই। বললাম, "স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। এই আমার নাম আর ঠিকানা। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখুন—হিজ্ এক্সেলেন্সি দি গভর্ণর অব বেহার একজন পাকা আই. সি. এস। তিনি রেড ক্রশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। রেড ক্রশ সোসাইটির জন্য চাঁদা আদায় করতে তিনি ইতস্তত করেন না, কারণ রেড ক্রশ হচ্ছে আর্ত আতুরদের জন্য। স্বয়ং গভর্ণর যদি এ কাজ করতে পারেন তাহলে আমিই বা এ কাজ করতে পারব না কেন? আইরিশ হস্‌পিটাল ট্রাস্ট একটি বিশ্বব্যাপী হিউম্যানিটেরিয়েন্ অরগ্যানিজেশন্। এর জন্যে টিকিট বিক্রি করা মানে রোগীদের সাহায্য করা। আপনি রিপোর্ট করলে যদি আমার চাকুরি যায় তাহলে সেটা আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করব। তখন সব সময়ই এ কাজ করতে পারব তাহলে—"

সাহেব হিপ্‌নোটাইজ্‌ডের মতো হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমার ঠিকানা লেখা যে কার্ডখানা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম সেটা পকেটে পুরে ফেললেন। তারপর পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে একটি পাতায় গোটাকতক আঁচড় টানলেন। ঠিক যেন বক উড়ে যাচ্ছে। তারপর কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "মাই বয়, এই কাগজটা যত্ন করে রেখে দিও। ভবিষ্যতে এটা তোমার প্রভূত উপকারে আসবে।"

আমি অবাক হয়ে কাগজটা নিলাম, নিয়ে নিজের মানিব্যাগে রেখে দিলাম। সন্দেহ হতে লাগল লোকটা সম্ভবত পাগল। সাহেব কাগজটি আমার হাতে দিয়ে আবার বইয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন, আমার দিকে আর ফিরেও চান নি। আমি আর একটা বেঞ্চির কোণে বসে মাঝে মাঝে তাঁর দিকে চেয়ে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন একটা স্ট্যাচু। অনেকক্ষণ দুজনে এক কামরায় রইলাম, কিন্তু নীরবে। উনি যদি সাহেব না হয়ে বাঙালী হতেন তা হলে পরস্পরের হাঁড়ির খবর আমরা জেনে ফেলতাম। কিন্তু তা হল না, আমার প্রাণ যদিও আনচান করছিল কিন্তু সাহেবের মুখ ওলোপ দেওয়া হাঁড়ি! একটি বাক্য বেরুল না সেখান থেকে। অবশেষে পাটনা জংশনে এসে গাড়ি থামল। আমি আবার মিলিটারি বাও করে নেমে যাচ্ছি, সাহেব উঠে এসে আমার সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করলেন। এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে মনে হল কব্জিটা বুঝি ভেঙে গেল। বাড়ি ফিরে গিয়ে গিন্নীকে বললাম—এটা রেখে দাও, দরকারি জিনিস। গৃহিণী মাত্রেই পুরুষকে বোকা, উড়নচণ্ডে, খামখেয়ালী—এইসব বলে মনে করেন। গিন্নী কাগজটি দেখে বললেন, কি ছবি আঁকা শিখছ নাকি? বক-ওড়ার ছবি ভালোই হয়েছে। ও নিয়ে আমি কি করব, তুমি রেখে দাও তোমার চিত্রশালায়। ভালো ছবি সংগ্রহ করার বাতিক ছিল আমার, এখনও আছে। ওই কাগজের চিরকুটটা সেখানেই রেখে দিলাম একটা চামড়ার কেসের মধ্যে। এর কিছুদিন পরেই হল ভূমিকম্প, ভয়াবহ ভূমিকম্প, যার কথা আপনি বলছিলেন একটু আগে। ওই ভূমিকম্পতে আপনার চাকরি গেল, কিন্তু আমার হল পোয়া বারো।"

"কি রকম?"

"বলছি দাঁড়ান। এক টিপ নস্যি নি।"

তিনবার 'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করে গেরুয়াধারী নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "ও মশায়,

আলোটা একটু উসকে দিন তো। ও পাশটায় কি যেন খসখস করছে, সাপটা আবার বেরুল না কি। হ্যাঁ, ওই যে সরাতে মুখ দিয়ে দুধ কলা খাচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড! কার্বলিক লোশনের তোয়াক্কাই করলে না!"

গোবর্ধন বললেন—"পীরবাবার সাপ যে। ওহো একটা জিনিস তো বড় ভুল হয়ে গেছে—"

"কি?"

"আমাদের এঁটো খাবারগুলো পড়ে আছে। সেই কুকুরটাকে ডেকে দি। দেখি কোথায় গেল—"

গোবর্ধন বাইরে বেরিয়ে ডাকতে লাগলেন—আঃ, আঃ তু, তু—তারপর ঘরে ঢুকে বললেন, "ভাগ্যে বেরিয়ে দেখলাম। আশা করে বসেছিল।"

এঁটো খাবারগুলো নিয়ে গেলেন বাইরে।

গেরুয়াধারীর মনে হল এই ভাঙা ঘরে, এই সাপ, কুকুর আর ওই অচেনা লোকগুলোকে নিয়ে এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই যেন একটা সংসার গড়ে উঠেছে। সাপটাকেও আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

গোবর্ধন ফিরে এসে বললেন, "আকাশে আবার বেশ তোড়জোড় শুরু হয়েছে। গঙ্গাও বাড়ছে। রাতটা পোয়ালে বাঁচি। বলুন আপনার ভূমিকম্পের কাহিনী। ভূমিকম্পে আপনার পোয়াবারো হয়ে গেল কি রকম?"

"ব্রেট্ সাহেব যে আমার উপর প্রসন্ন ছিলেন। নানারকমে চেষ্টা করে ছিলেন কি করে আমাকে ওপরে তুলে দেবেন। সাহেব প্রসন্ন হলে সে যুগে পাথর-চাপা কপালেও রাজসম্মান জুটে যেত। আমি তখন জামালপুরে বদলি হয়ে এসেছি। ছেলে-মেয়েরা মজঃফরপুরে, পিসের বাড়িতে। ভয়াবহ সব খবর শুনছি আর ভগবানকে ডাকছি ভগবান রক্ষা কর। গৃহিণীকে উপর্যুপরি ছ'টা টেলিগ্রাম করেছি, কোন জবাব নেই। আমার মনের অবস্থা বুঝুন। হঠাৎ একদিন তিনি এসে হাজির হলেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। বললেন, টেলিগ্রাম পাননি। প্রচণ্ড শীত। তারপর টেলিগ্রাফের লাইন সব ঠিক হল। সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিগ্রাম পেলাম আই. জি.-র কাছ থেকে—একজন দারোগা পাঠাচ্ছি, তাকে চার্জ দিয়ে দাও। তুমি মিস্টার ব্রেটের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেণ্ট সিলেকটেড হয়েছ। মিস্টার ব্রেট তখন রিলিফ ও রিকনস্ট্রাক্শন বিভাগের সেক্রেটারি হয়েছেন। একজন স্পেশাল মেসেঞ্জারও এল ওই সব খবর নিয়ে। স্পেশাল ট্রেনও এল সেইদিন রাত্রে। তাতে গভর্ণর, তাঁর স্টাফ, মিস্টার ব্রেট এবং আরও সব সাহেব ছিলেন। আমার জন্যে একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা ঠিক করা ছিল। আমি মিস্টার ব্রেটের পি. এ. হলাম। ১৯৩৪ সালটা তাঁর সঙ্গে টুর করে কাটল। অনেক টাকা কামালাম। রিকনস্ট্রাক্শনের অতবড় একটা রাজসূয় ব্যাপার আমার হাত দিয়েই তো হল। আমার মাইনেই ছিল পাঁচশো টাকা। ফার্স্ট ক্লাসে বরাবর গেছি। কখনও কখনও এরোপ্লেনে। ১৯৩৫ সালে রিলিফ কমিশনারের আপিস উঠে গেল। আমি আবার পুনর্মূষিক হলাম। ব্রেট সাহেব চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ইন্সপেক্টার করে দিতে, কিন্তু হল না। সি-আই-ডিতে বদলি হয়ে চলে গেলাম পাটনায়। ওই লাইনেই কাটল কয়েক বছর। ১৯৪৮ সালে পেন্সন পেলাম। তারপরই হল ভানুমতীর খেল। ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিলেত থেকে হঠাৎ এক চিঠি এল।

আইরিশ সুইপের আপিস থেকে। চিঠিতে লেখা—'অনেকদিন আগে একজন সাহেব তোমাকে একটুকরো কাগজে কয়েকটা আঁচড় কেটে দিয়েছিলেন। তোমরা একই ট্রেনের একই কম্পার্টমেন্টে ছিলে। সে কাগজ যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে সেইটে নিয়ে অবিলম্বে বিলেতে চলে এস বাই প্লেনে। তোমার আসা-যাওয়া এবং লণ্ডনে থাকার খরচ আমরা দেব।' আকাশ থেকে পড়লাম! ভাগ্যে সেই কাগজটা ভাল করে রেখেছিলাম। আর কালবিলম্ব না করে বিলেত চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম ওই সাহেব ওঁদের বড় চাঁই একজন—ম্যানেজিং ডিরেক্টার অব্ আইরিশ সুইপ। সেই কাগজের টুক্‌রো দেখে তাঁরা আমাকে আইরিশ সুইপ্ স্টেকের ওয়ান অব্ দি ডিস্ট্রীবিউটার্স ইন্ ইণ্ডিয়া করে দিলেন। ফিরে এসে অনেক টাকা কামাতে লাগলাম। হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছি ওর দৌলতে। ওই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্য টিকি ধরে নিয়ে গিয়ে যেন লক্ষ্মীর দরবারে বসিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। কিছুদিন পরে আবার সব ধুস্। ফরেন এক্‌স্‌চেঞ্জের রেস্ট্রীকশন হয়ে গেছে আজকাল। আমাদের টিকিট বিক্রি একেবারে বন্ধ। এখন বিরলে বসে প্রহর গুণছি কবে আবার সুদিন আসবে, কবে আবার সূর্য উঠবে। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

চুপ করলেন গেরুয়াধারী।

গোবর্ধন বললেন, "সত্যি আশ্চর্য আপনার জীবন-কাহিনী। একজন লোকের জীবনে যে এত রকম ঘটনা ঘটেছে তা বিশ্বাসই হয় না। মনে হয় যেন বানানো গল্প—"

"একটিও মিছে কথা বলি নি। সব সত্যি—"

"ফোঁস্—"

দু'জনেই চমকে দেখলেন সেই সাপটা ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে আর গেরুয়াধারীর দিকে ছোবল মারছে। গেরুয়াধারীর মধ্যে অদ্ভুত একটা পবিবর্তন হল সহসা। তিনি সাপটার দিকে হাতজোড় করে বলে উঠলেন, "না, সব সত্যি নয়, অনেক মিছে কথা বলেছি। নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে অনেক বাড়িয়ে বলেছি, না বললে গল্প জমে না। মাফ কর আমাকে।"

সাপটা ফণা নামিয়ে গর্তের ভিতর চলে গেল।

নির্বাক হয়ে বসে রইলেন গোবর্ধন। বাইরে শব্দ হতে লাগল— ঝপ ঝপ্ ঝপ্। গঙ্গার কূল ভাঙছে।

"ও মশাই, এ কি হল—"

হঠাৎ সেই পাকা দেওয়ালটা ভেঙে পড়ে গেল। তারপর সেই ঘরটাও। গেরুয়াধারী ধ্বসের সঙ্গে তলিয়ে গেলেন। গোবর্ধন ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে।

পরদিন বেলা দশটা।

ভজুয়া, ভজুয়ার স্ত্রী দুজনেই ব্যস্ত। গোবর্ধন আর গেরুয়াধারীর সেঁক সর্বাঙ্গে দিচ্ছে তারা। দুজনেরই জ্ঞান হয়েছে। গোবর্ধন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে লাফিয়ে পড়েছিলেন বলেই গেরুয়াধারীকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কারণ তিনি সাঁতার জানেন না।

ভজুয়ার স্ত্রী বক্‌রির দুধ গরম করে চামচ দিয়ে খাওয়াচ্ছে দুজনকে। ভজুয়ার কাছে মদ ছিল, সে খানিকটা মদ মিশিয়ে দিয়েছে দুধের সঙ্গে।

শরীরে একটু বল পেতেই গেরুয়াধারী উঠে বসলেন। ভজুয়ার স্ত্রীকে বললেন, "আমার থলিটা বার করে দাও তো মা—"

ভজুয়ার স্ত্রী সিন্দুক খুলে থলিটা বার করে নিয়ে এল। গেরুয়াধারী তখন তার থেকে একটা চিঠি বার করে গোবর্ধনকে বললেন, "পীরবাবা সত্যিই জাগ্রত দেবতা। তিনি আপনার কথা শুনছেন। নিন—"

"কি ওটা?"

সৌদামিনী দেবীর স্বামীকে অ্যারেস্ট করবার ওয়ারেণ্ট। আমি আত্মগোপন করবার জন্যে আপনাকে অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু আসলে আমি একজন সি. আই. ডি অফিসার। সৌদামিনীর স্বামীটা দুর্ধর্ষ ডাকাত। অনেক খুন করেছে। একে যে ধরে দিতে পারবে গভর্ণমেণ্ট তাকে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দেবেন ঘোষণা করেছেন। আপনি সেই বকশিশটা নিন। কি করে তাকে ধরতে হবে তার সুলুক সন্ধান আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। অতি সহজে পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। আর বাকি পাঁচ হাজার আমি আপনাকে নিজে দেব, কারণ আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে আপনি কেশিয়ার হয়ে যান—"

গোবর্ধন সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "সে কি হয়! আপনার টাকা আমি নেব কেন, বাবা আমাকে নিতেই দেবেন না—"

গেরুয়াধারী সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন গোবর্ধনের দিকে।

গোবর্ধন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।